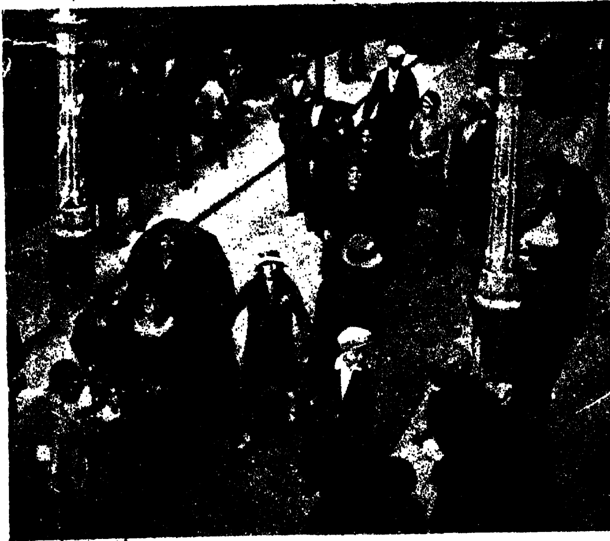


মাল্টার বাড়ী-ঘর



পথে সেকেলে-একেলে পোষাকের মিলন-বৈচিত্র্য

বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে। সেখানে ইংরেজী, মালটীজ ও ইতালীয় ভাষায় শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা। তার উপর লেখাপড়া শিখিতে প্রতি-বৎসর বহু ছাত্র বিদেশে যায়। রোম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দিকেই মাল্টীজ ছাত্রের বেশী ঝোঁক।

লেখক লিখিতেছেন, মাল্টীজদের সৌজন্যে এবং আতিথ্যে আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি। রোগে এখানকার চিকিৎসকেরা দেখিয়াছেন, ফী লন নাই। ডাক্তারখানা বিনামূল্যে ঔষধ দিয়াছে। এখানকার খবরের কাগজওয়ালারা নিমন্ত্রণে আমাদের আপ্যায়িত করিয়াছেন; কাগজে-কাগজে আমাদের ছবি ছাপাইয়াছেন। এখানকার ছোট-লাট আমাদের আপ্যায়িত করিয়াছেন। বেতার-আসর সসম্মানে আমাদের লইয়া গিয়া আধ ঘণ্টা করিয়া বেতারে বক্তৃতা দেওয়াইয়াছেন, সেজন্য মূল্য দিয়াছেন—মিনিট-পিছু পঁচিশ সেণ্ট হিসাবে।

মাল্টার রেডিয়ো ঠিক রেডিয়ো নয়। ইহাকে টেলিফোন বলিলে চলে। এ রেডিয়ো-রীতিকে বলে রি-ডিফিউশন (Re-diffusion)। অর্থাৎ একটি সেণ্ট্রাল রেডিয়ো-ষ্টেশন আছে; সারা য়ুরোপ হইতে সে-ষ্টেশন প্রোগ্রাম গ্রহণ করে; তার পর সে-গুলির মধ্য হইতে বাছিয়া উৎকৃষ্ট প্রোগ্রামগুলিকে এখানকার গ্রাহকদের পরিবেশন করেন। বছরে পৌনে চার সেণ্ট ভাড়া দিলে বাড়ীতে রেডিয়ো-যন্ত্র পাওয়া যায়।

...মাল্টীজদিগের খুব অনুরাগ। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ১১৫৭; এ-সব স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩২২২১। হাই স্কুলের সংখ্যা দশটি; এবং দশটি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৮৪৫। একটি

মাল্টায় অনেকগুলি সিনেমা-গৃহ আছে। সে সব গৃহে বৃটিশ ও আমেরিকান ফিল্ম দেখানো হয়। একটি থিয়েটার আছে—মানয়োল থিয়েটার। থিয়েটার-গৃহটি ১৭৩১

খৃষ্টাব্দে তৈয়ারী হইয়াছে। ভ্রাম্যমান বহু নাট্য-সম্প্রদায় এ-থিয়েটারে মাঝে-মাঝে আসিয়া টিকিট বেচিয়া অভিনয় দেখান। শীতকালে ভালেটার রয়েল অপেরা হাউসে বহু অপেরা-কোম্পানি আসিয়া জমায়েৎ হয়। মাল্‌টীজরা গান-বাজনার খুব ভক্ত।

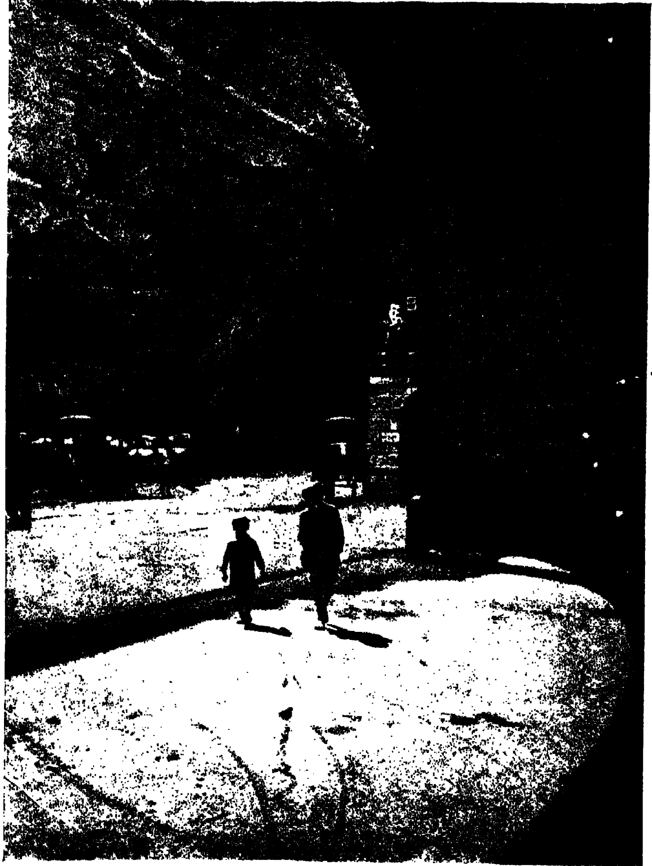
বাইসিক্‌ল্‌ এখানে প্রচুর। প্রতি গৃহেই একখানি করিয়া বাইসিক্‌ল্‌ আছে। ঘোড়ার গাড়ী মেলে। মোটর গাড়ী আমদানি হইয়াছে। এখানে মোটর-গাড়ীর সংখ্যা এখন প্রায় ২৮০০।

মাল্‌টায় বহু সাইকেল্‌-ক্লাব আছে। এ সব ক্লাবের উদ্যোগে প্রতি মাসে প্রতিযোগিতা চলে। সে প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণে খুব ঘটা হয়।

এ-দ্বীপে নদী বা লেক নাই, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। গাছ-পালাও খুব কম। যে-দিকে চাহিবেন, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। রুক্ষ, শুষ্ক, ধূম্র পাহাড়!

এখানকার কৃষিজীবীদের বাহাদুরি এই যে, পাহাড়ের পাথরের বুকে মাটী বাহির করিয়া সে-মাটীতে তারা ফশল্‌ ফলাইতেছে। গম, যব, তুলা, আলু, পেঁয়াজ এবং বিবিধ ফলের চাষ হয়। পাহাড়ের গায়ে বহু ঝর্ণা আছে। পাইপ-সংযোগে এই সব ঝর্ণা হইতে নানা দিকে জল জোগান করা হইতেছে। বৃষ্টির জল পাহাড়ের গা ফুঁড়িয়া মাটীর নীচে গিয়া জমা হয়। এখানকার লোকেরা কুয়া খুঁড়িয়া সে জল তুলিয়া স্নান-পান করে; ক্ষেতে সে জল ঢালিয়া ফশল ফলায়।

এখানকার মাল্‌টীজ-জ্বরের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। চারণ-ভূমির অভাব-বশতঃ মাল্‌টীজরা বাড়ীতে যে গাভী ও ছাগল পোষে, তাদের স্নান করানোর পাট নাই। নোংরা আবর্জ্জনায় তারা পড়িয়া থাকে, নোংরা উচ্ছিষ্ট খাইয়া বেড়ায়; এবং ছাগলওয়ালারা এক-পাল ছাগল লইয়া বাড়ী-বাড়ী দুধ জোগান দেয়। পথে ছাগলের দলে এই যে মেলামেশা হয়, তার ফলে একের রোগ অন্য ছাগলের দেহে সঞ্চারিত হয় এবং ছাগদুগ্ধে রোগের



পথের নীচে পথ-ঘাট

বীজাণু মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। দুধ ফুটাইয়া তাহা পান করার রীতি নাই। সেজন্য রোগের সংক্রামকতা অগ্নিশিখার মতো দিকে-দিকে জ্বলিয়া বাতাসে-বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে! বিশেষজ্ঞেরা প্রাণপণে প্রয়াস করিতেছেন, এ রীতির পরিবর্ত্তন করিতে। তাঁরা বলেন, দুধ ফুটাইয়া খাও, না হয় ছাগ-বংশ ধ্বংস করো! কিন্তু দু'টার কোনো কথায় মাল্‌টীজদের কাণ দিতে বহিয়া গিয়াছে!

ছোট দ্বীপে লোকের যেমন ভিড়, তেমনি ভিড় ছাগলের! পথ একেবারে লোকারণ্যে পরিণত হয়। এজন্য গাড়ীতে চড়িয়া দ্বিচক্রবাহীদের চলিবার উপায় নাই! দ্বিচক্রযান হাতে ঠেলিয়া অনেক সময় তাদের পথ চলিতে হয়!

এখানকার বাড়ী-ঘর মাল্‌টীজ পাথরের তৈয়ারী। এ-পাথর বেলে-পাথরের মতো। কাল-চক্রের আবর্ত্তনে রৌদ্র-জল খাইয়া পাথরের গায়ে নানা বর্ণের 'শেড' পড়ে; তাহাতে বাড়ী-ঘরে বাহার খোলে চমৎকার!



ছাগলের ভিড়ে পথ চলা দায়

এখানকার বাড়ী-ঘরের ডিজাইন ইতালীয়ান ছাঁদের। বাড়ীর সদর একেবারে পথের উপর। ভিতরে খোলা উঠান, বাগান। বাগানে-উঠানে নকল ফোয়ারা, নকল পাহাড়। সে পাহাড়ের গায়ে মর্শুমী ফুলের ফশল। দেওয়ালের গায়ে শাক-সব্জী লতাইয়া উঠিয়াছে। এই বাগানে ও উঠানে পারিবারিক আসর-বৈঠক বসে।

মাল্‌টীজরা ধর্ম্মপ্রবণ; রোমান কাথলিক মতাবলম্বী খৃষ্টান।

এখানে অলিতে-গলিতে চার্চ্চ এবং স্ত্রী-পুরুষ পালে-পর্ব্বণে চার্চ্চে আসিয়া উপাসনায় যোগ দিতে কোনো দিন ঔদাস্য-অবহেলা করে না।

মাল্‌টার পথ-ঘাট সরু। ফুটপাথ নাই। এই গলি-পথে গাড়ী-ঘোড়ার অভাব নাই। মোটর চলিবার উপযোগী পথের সংখ্যা কম; তবু মাল্‌টায় ২৮০০খানি মোটর-গাড়ী আছে।

দেশের লোক সাধারণতঃ গরীব বা গৃহস্থ। ধনী মাল্‌টীজ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দারিদ্র্য-সত্ত্বেও যেমন করিয়া হোক্, পয়সা জমাইয়া চার্চ্চ-প্রতিষ্ঠায় বা চার্চ্চের সংস্কার-কার্য্যে পয়সা দিতে স্ত্রী-পুরুষ কাহারো এতটুকু কার্পণ্য নাই।

ছুতার, রাজমিস্ত্রী, প্লাম্বার এবং ব্যবসায়ীর দল মিলিয়া ভালেটায় যে সেণ্ট জন্‌স্‌ কাথিড্রাল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তার চূড়া এত উচ্চ যে, উচ্চতার হিসাবে পৃথিবীতে এ-চার্চ্চের চূড়াটি তৃতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। এ-চার্চ্চের চেয়ে বড় চার্চ্চ আছে রোমে—সেণ্ট পীটার্স চার্চ্চ এবং ইস্তাম্বুলে সেণ্ট সোফিয়া চার্চ্চ! এই চার্চ্চের নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যবসায়ীরা বিনামূল্যে রসদ-পত্র জোগাইয়াছিলেন

এবং ছুতার, রাজমিস্ত্রী ও প্লাম্বারের দল বিনা-পারিশ্রমিকে কাজ করিয়াছিল।



সেণ্ট জনস্ চার্চ্চ

মাল্‌টার তরুণ-সমাজের মন শিক্ষা-ব্যাপারে যেমন আগ্রহে পূর্ণ, সে মন তেমনি সমুদার। লেখক লিখিতেছেন, We were struck more and more by the broad scope of knowledge of Maltese youth. তারা পৃথিবীর সব খবর রাখে। মাল্‌টীজ সংবাদ-পত্রাদিতে শিক্ষা-সম্পর্কীয় নানা প্রবন্ধ নিত্য প্রকাশিত হয়। শিখিবার ও জানিবার নেশায় মাল্‌টার তরুণ-সমাজ যেন একেবারে মাতিয়া আছে!

ছুটিছাটা পাইলেই তরুণ-তরুণীরা ইতালীতে যায়, গ্রীসে যায়, ইংলণ্ডে যায়। দেশ দেখা উদ্দেশ্য নয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য শিখিতে যায়, দর্শন-বিজ্ঞান শিখিতে যায়। নিজেদের ছোট দ্বীপের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করুন, ছেলে-বুড়া সকলে যেন মুখস্থ বলিয়া যাইবে! তুচ্ছ কথাটি বলিতে ভুল করিবে না।

মাল্‌টায় একটি বহু-প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরের নাম হাইপোজিয়াম। কিম্বদন্তী, প্রাগৈতিহাসিক জাতির মানুষ এ-মন্দিরে উপাসনাদি করিত। মন্দিরের চত্বরের নীচে ত্রিশ ফুট গভীর গহ্বর আছে। সে গহ্বর প্রকাণ্ড নাট-মন্দিরের মতো। নক্সা-করা আটটি থামের উপর এই নাট-মন্দির স্থাপিত। তার আশে-পাশে অসংখ্য কামরা। মন্দিরে একটি তোষাখানা আছে। সে তোষাখানায় দুই শত লোক স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে শয়ন করিতে পরে।

নাট-মন্দিরের দেওয়ালে বড় বড় আয়না—উপরের রন্ধ্রপথ দিয়া প্রচুর আলো আসে; সেজন্য মাটীর নীচে নাট-মন্দিরের অবস্থান হইলেও সেখানে এতটুকু অন্ধকার নাই!

মাল্‌টায় পথের নীচে মৌচাকের মত হাজার-হাজার



মেয়েদের সাবেকী পরিচ্ছদ

রন্ধ্র-নির্ম্মিত আছে। এই রন্ধ্রপথে মাটীর নীচে যাওয়া যায়। সেখানে নাকি পথ-ঘাট আছে, গৃহ আছে! সে গৃহে ও পথে-ঘাটে এখন লোক-জন যায় না। শুনা যায়, ভিতরে বহু স্থলে মাটী ধ্বশিয়া পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একবার ক'জন ভদ্রলোক মাটীর নীচে এই অজানা-রাজ্যের সন্ধানে নামিয়াছিলেন; তাঁরা আর ফিরিয়া আসেন নাই! সকলের বিশ্বাস, ধ্বশা-মাটীর নীচে তাঁদের জীবন্ত সমাধি হইয়া গিয়াছে! সেজন্য গবর্ণমেণ্ট দশ-বারো বৎসর পূর্ব্বে এই রন্ধ্রপথগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।


গৃহস্থ-পরিবার

আজ এই যুদ্ধের কলকোলাহলে বহু রন্ধ্রপথ খুলিয়া—মাটীর নীচে সুড়ঙ্গ-পথ খুঁড়িয়া গৃহ-আবিষ্কার এবং সংস্কার-সাধন হইতেছে। বোমা এবং আগ্নেয়াস্ত্র বর্ষণ সুরু হইলে লোক-জন ধন-সম্পদ লইয়া সে সব সুড়ঙ্গ-আশ্রয়ে নিরাপদ হইতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যেই সংস্কার-ক্রিয়া চলিয়াছে।

এবারকার মহাযুদ্ধে ১০ই জুন তারিখে মুসোলিনি প্রথমেই ঘোষণা করিয়াছিলেন, বোমা ফেলিয়া মাল্‌টাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দাও! কিন্তু সে সঙ্কল্প সফল হয় নাই।


প্রাচীন দুর্গ আজও দুর্ভেদ্য

মাল্টীজরা মিতব্যয়ী, ধর্ম্মপ্রাণ এবং বুদ্ধিমান্। তারা শান্তিতে বাস করিতে চায়। নেভাল-বেস্ হিসাবে মাল্‌টা দুর্ভেদ্য; তার উপর সম্প্রতি বৈমানিক সুব্যবস্থায় মাল্‌টা আজ ভূমধ্য-সাগরের প্রহরী-স্বরূপ হইয়াছে।

বিজ্ঞান-জগৎ

ছাতার নব-পর্য্যায়

বৃষ্টিবাদলায় ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইলেও যদি বাতাসের বেগ থাকে, তাহা হইলে ছাতায় মাথা রক্ষা পাইলেও গা, মুখ রক্ষা করা যায় না! গায়ে-মুখে জলের ছাট লাগিয়া ভিজিয়া একশা হয়। এ অস্বাচ্ছন্দ্য-দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নিউ ইয়র্কের ছাতা-ওয়ালারা মোটর-গাড়ীর শীল্ড-স্ক্রীনের মতো সেলুলয়েডের শীল্ড-যুক্ত ছাতা তৈয়ারী করিতেছেন। স্বচ্ছ সেলুলয়েড দিয়া বর্ম্মাবরণ তৈয়ারী করিয়া এমন কৌশলে তাঁরা এ-ছাতায় ঝালরের মতো আঁটিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, এ-ছাতা মাথায় দিলে বৃষ্টির জলে ভিজিতে হইবে না। ছাতা মুড়িয়া সেলুলয়েডের এ-আবরণ যেমন স্বচ্ছন্দে মোড়া যায়, ছাতা খুলিবার প্রয়োজন হইবামাত্র তেমনি এ-আবরণ সহজে খুলিতে পারিবেন। শীল্ডদার এ-ছাতা মাথায় দিয়া বৃষ্টির সময় পথ চলিতে অসুবিধা হইবে না—কারণ, সেলুলয়েডের আবরণ স্বচ্ছ বলিয়া দৃষ্টি কোন দিকে বাধিবে না বা অবরুদ্ধ হইবে না।



ছাতা মুড়ুন



খোলা ছাতা

আমিষাশী ফুল

ফ্লোরিডায় অজস্রভাবে এক-জাতের ফুল ফোটে। এ ফুলের আকার হাঁসের মতো। এ ফুল ঘোর আমিষাশী! কীট-পতঙ্গ নহিলে এ ফুলের প্রাণ বাঁচে না। ফুলের-গন্ধে পোকা-মাকড় আসিয়া পাপড়ির উপর বসে; বসিবামাত্র তাদের সম্মোহ-দশা! তার পর পাপড়িটি পোকা ও মাকড়-সমেত মুদিয়া যায়; এবং সে পাপড়ি আবার যখন চোখ চাহিয়া প্রসারিত হয়, তখন তার গায়ে সে পোকা-মাকড়ের চিহ্ন দেখা যায় না! অর্থাৎ পোকা-মাকড় বেমালুম হজম! এ ফুলের বর্ণ প্রবালের মতো—গন্ধ উগ্র মদিরময়।



ফুলের খোলা মুখে উগ্র মদির গন্ধ



হাঁস-ফুল

মুখ-হাত ধোওয়া

মুখ-হাত ধুইবার জন্য অনেকের বাড়ীতেই এখন 'ওয়াশ-বেশিন্' বা বিশেষ জলাধার আছে। এ জলাধারের মস্ত একটা দোষ এই

যে, আমার যদি খোশ-পাঁচড়া বা সর্দ্দি থাকে বা দাঁতের রোগ থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে অপরেও যদি মুখ-হাত ধুইবার জন্য সে জলাধার ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমার রোগ তাঁর দেহে সংক্রামিত হইবে। ছবিতে যে-জলাধার বা 'ওয়াশ-বেশিন্' দেখিতেছেন, এমন ছাঁদের জলাধারে এ-সংক্রামকতার ভয় নাই।



জলের বেশিন্

জলের জন্য এ-'বেশিনে'র উপরে 'ট্যাপ' টিপিতে হয় না; নীচে যে ভাল্‌ভ দেখিতেছেন, পা দিয়া সেই ভাল্‌ভে চাপ দিলেই পিচকারীর ধারায় জল পাইবেন। আমেরিকার বহু স্কুলে ছেলে-মেয়েদের মুখ-হাত ধুইবার জন্য এখন এমনি বেশিনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ-জলাধার সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বর্ষাতি-কোটে কারিগরি

বৃষ্টিতে পথে দাঁড়াইয়া যদি লিখিতে চান, তাহা হইলে নূতন জার্ম্মান বর্ষাতি-কোট কিনিবেন। এ বর্ষাতি-কোটের বুকের কাছে সেলুলয়েডের স্বচ্ছ আবরণ সংযোজিত আছে। তার মধ্যে কাগজ রাখিয়া বর্ষাতির নীচে দিয়া হাত চালাইয়া ফাউণ্টেন-পেন বা পেনসিল দিয়া যাহা লিখিতে চান, লিখুন। হাত, কাগজ ও লেখা কিছুই ভিজিবে না। এ বর্ষাতি-কোট জার্ম্মান রিপোর্টারের দল সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের এখানে বর্ষার দিনে ফুটবল-খেলার মাঠে রিপোর্টারেরা যদি এ বর্ষাতি-কোট ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁদের রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গ হইবে; সে রিপোর্টে কল্পনার ফাঁকি বা গোঁজামিল্ চালাইবার প্রয়োজন হইবে না।



নূতন বর্ষাতি-কোট

হৃদ্রোগে আরাম

যাঁদের হার্টের রোগ আছে, তাঁদের অস্বাচ্ছন্দ্যের সীমা থাকে না। শ্বাস-প্রশ্বাসে এমন কষ্ট হয়, মনে হয়, বুঝি, প্রাণটা এখনি



দোলন-শয্যা

বাহির হইয়া যাইবে! হার্টের অসুখে শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণে যাঁদের খুব অস্বস্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্য ধরে, তাঁদের জন্য এক-রকম শয্যা তৈয়ারী করা হইয়াছে। রোগীকে এ-শয্যায় শোয়াইয়া পাম্প-সংলগ্ন বৈদ্যুতিক মোটর চালাইয়া দিলে শয্যাটি দোলনার মতো ধীরে ধীরে একবার এদিকে উঠিবে, পরে ওদিকে উঠিবে। এই দোলনের জন্য দেহে রক্ত-চলাচল হইবে স্বচ্ছন্দ, এবং এই রক্ত-চলাচল-হেতু রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণে এতটুকু অস্বস্তি হইবে না।

পোষাকের মাপ

দর্জীকে পোষাকের মাপ দেওয়া যেন লটারির খেলা! গায়ের মাপ সব দর্জী কি লইতে পারে? কতবার 'ট্রাই' দিতে হয়, তার পরেও হয়তো দেখা গেল, ঘাড়ের কাছে কোঁচ, হাতের কাছটা যেন কেমন-কেমন! এ-দায় ঘুচাইবার জন্ম আমেরিকায় পোষাকের মডেল তৈয়ারী করিয়া সেই মডেল লইয়া পোষাক তৈয়ারী হইতেছে। এ-মাপ যেন একেবারে গায়ের "কার্বন-কপি"! এ-কপি কি করিয়া লওয়া হয়, জানেন? গায়ে অন্ধ কাপড় চাপা দিয়া তার উপর এক-রকম প্লাষ্টিকের প্রলেপ লাগাইয়া সেই প্রলেপকে প্লাষ্টার-অফ-পারিসের মতো কঠিন ভাবে গড়িয়া তোলা হয়। তার পর সে কঠিন প্লাষ্টার কাটিয়া খোলের মতো খুলিয়া সেই ছাঁচে কাপড় কাটিয়া মার্কিন দর্জী যে সব পোষাক তৈয়ারী করিতেছে, সে পোষাক গায়ে চমৎকার ফিট করে! এ-প্লাষ্টার গায়ে আঁটিতে কষ্ট বা অস্বাচ্ছন্দ্য-বোধ হয় না—সে-কথা বলা বাহুল্য।



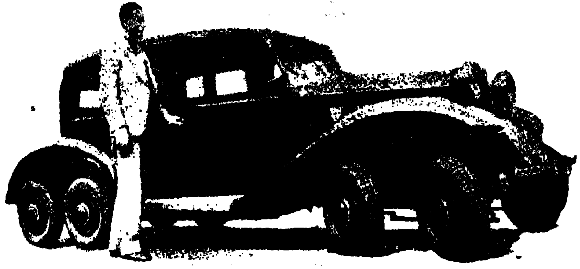
ফিট্-করা পোষাক



মাপের মডেল্

আট-চাকার মোটর-গাড়ী

কাদা বা বালির উপর দিয়া মোটর-গাড়ী চলিতে চায় না। জার্ম্মানীতে আট-চাকার গাড়ী তৈয়ারী হইতেছে। এ গাড়ীর সামনে-পিছনে দু'জোড়া করিয়া অর্থাৎ চারখানি করিয়া চাকা আছে। এ-চাকা শিল্পী সুকৌশলে এমন নিখুঁত করিয়া সংলগ্ন করিয়াছেন যে, বাঁকিতে ও মোড় ঘুরিতে এতটুকু অসুবিধা ঘটে না; তার উপর মস্ত সুবিধা, এই যে, পঙ্ক-কর্দ্দমে বা বালির উপর দিয়া এ-গাড়ী বেশ দ্রুত ও স্বচ্ছন্দ ভাবে চলে।



আট-চাকার গাড়ী

জলের বুকে বন্ধু

আর-এক রকম জীবন-রক্ষক আধারের কথা বলি। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের শিল্পীরা এক-রকম জলের রক্ষা-আধার তৈয়ারী করিয়াছেন। এটিতে দু'দিনের উপযোগী খাবার ধরে; অর্থাৎ জলে পড়িলে এ-খাবার যদি সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে এই আধারে বসিয়া জলের বুকে দু'দিন দু'রাত্রি ভাসিলেও খাবারের অভাব ঘটিবে না, দেহও গরম থাকিবে—জল লাগিয়া হিমাঙ্গ হইবার কোনো আশঙ্কা থাকিবে না! আধারটি এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, ইহার মধ্যে জল ঢুকিবে না। রবারের বেল্ট গলায় আঁটিয়া লইলেই আধারের কামরায় স্বচ্ছন্দ ভাবে বসিতে পারিবেন এবং জলের স্রোতে এ-আধার যেখানে ভাসিয়া চলুক, রক্ষা পাইবার আশা দুরাশা হইবে না! ছবি দেখিলে মনে হইবে, আধারে বিষম জটিলতা! এ-আধারে বসিতে হয় না—পোষাকের মতো এ-আধার গায়ে আঁটিতে হয়—তার পর জলে ঝাঁপ দিন—আপনা হইতেই বসিবার কায়দা রপ্ত হইবে।



জলের বুকে ভাসিয়া চলুন



ত্রিধারা

(উপন্যাস)

১

"ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু!"—ব্যাকুল নারী-কণ্ঠ।

সুধীশ ডাক্তার এমন সময়ে ঘুমাইয়া পড়ে; আজ অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একটা কল হইতে ফিরিয়া সে আহার শেষ করিয়া মুখ-হাত ধুইতেছিল, সহসা আর্ত্ত নারী-কণ্ঠের আহ্বান শুনিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দার দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিল, এবং নিম্নদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

র্যাপারে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া একটি রমণী দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখখানি অবগুণ্ঠনাবৃত। রমণী কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "একবার দয়া ক'রে আসবেন কি?"

ভৃত্য রামু দ্বার খুলিয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিল, "ভেতরে এসে বসুন মা! বাবু আসছেন।"

রমণী বসিল না; বলিল, "আমার বসবার সময় নেই, ডাক্তার বাবুর নীচে আস্‌তে কি দেরী হবে?"

রামু বলিল, "না মা! বাবুর কাণে যখন আপনার ডাক পৌঁছেছে, তখন তিনি নীচে এলেন ব'লে।"

সুধীশ পরমুহূর্ত্তে নামিয়া-আসিয়া বলিল, "আপনি ভেতরে এসে বসুন। কি হ'য়েছে, কার অসুখ?"

রমণী অবগুণ্ঠন আর একটু নামাইয়া দিল; এমন ভাবে র্যাপারখানা সে গায়ে জড়াইয়াছে যে, পায়ের শুধু পাতা দু'খানি ছাড়া দেহের অন্য কোন্ অংশ দেখিবার উপায় নাই। সে বলিল, "আমার ছেলের অসুখ; বোধ হয়, কলেরা। আমরা বড় বিপন্ন!"—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল।

বহুদিন পূর্ব্বে শ্রুত সঙ্গীত-ধ্বনির মত এই কণ্ঠস্বরটি সুধীশের কর্ণে প্রবেশ করিল। সে ক্ষণেকের জন্য অন্যমনস্ক হইল, পরমুহূর্ত্তেই বলিল, "চলুন।"—প্রথম প্রয়োজনে যাহা যাহা আবশ্যক হইতে পারে, তাহা সে ক্ষিপ্রহস্তে ব্যাগে পুরিতে লাগিল, এবং সেই অবসরে রমণীকে রোগীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

রামু বলিল, "দারুণ শীত, বড় কোটটা দেব, বাবু?"

সুধীশ র্যাপারখানা গায়ে জড়াইয়া বলিল, "না।—তুই একটু জেগে থাকিস, এসে ডাকাডাকি ক'রতে না হয়।"

স্ত্রীলোকটি বোধ হয় কাঁদিতেছিল, অবগুণ্ঠনের মধ্যেই অঞ্চলে চক্ষু মুছিল; তাহার পর অগ্রগামিনী হইল। বাড়ীখানি নিকটেই। দুই-একটা গলি পার হইয়া একটা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দুয়ারে ঘা দিতেই ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে কেহ বলিল, "কে, বৌদি'? ডাক্তার বাবু এসেছেন?"

"হাঁ, দোর খোল।"—বলিয়া মহিলাটি পুনরায় দুয়ারে করাঘাত করিল। উদ্বেগে তাহার হাত কাঁপিতেছিল।

হারিকেন-হস্তে একটি যুবতী আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল; বয়স বোধ হয় কুড়ি-একুশ বৎসর, দেখিয়া কুমারী বলিয়া মনে হয়। তরুণীর বর্ণশ্রী সুগৌর, তবে অযত্নে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তাহা ম্লান দেখাইতেছিল। নাসিকা খুব সমুন্নত না হইলেও সে খেঁদা নয়; ললাট মধ্যমাকৃতি, দুই পাশে গোছা গোছা কোঁকড়ান রুক্ষ চুল উড়িতেছে। বোধ হয়, দুই দিন কেশচর্চ্চা হয় নাই; রুক্ষ বড় খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে ঢিলা ভাবে পড়িয়াছিল। চক্ষু দু'টির সৌন্দর্য্য দেখিবার মত,—যাহাকে পদ্মপত্র বলে, সেই ধরণের,—আয়ত নেত্র; সুগঠিত, সুদর্শন। সুনীল ক্ষেত্রের মাঝে সুপ্রশস্ত

কালো অক্ষি-গোলক দু'টি আলোক-সম্পাতে চক্-চক্ করিয়া উঠিল। আলোটা উঁচু করিয়া ধরিয়া সে পথ দেখাইল।

প্রথমা উদ্বেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, "ঠাকুরঝি! খোকা এখন কেমন?"

দ্বিতীয়ার কণ্ঠে বেদনার সুর; বলিল, "আর একবার বমি ক'রে একেবারে যেন নেতিয়ে প'ড়েছে।" সে আলো লইয়া অগ্রগামিনী হইল।

সুধীশ নারী দু'টির পশ্চাতে উঠান পার হইয়া দালানে উঠিল। এই দালানের এক পাশে একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের বালক, ও তিন-চার বৎসরের বালিকা শঙ্কিত ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। শিশু দু'টি যেমন প্রিয়দর্শন, তেমনই স্বাস্থ্যবান্। মেয়েটির মুখপানে চাহিয়া সুধীশের বুকের ভিতরটা যেন কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। যেন বড় পরিচিত, কিন্তু বিস্মৃত একখানি মুখ! সুধীশ ভালো করিয়া বার-বার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কবে—কোথায় দেখিয়াছিল—স্মরণ করিতে পারিল না।

রোগীর কক্ষে সে প্রবেশ করিয়া দেখিল—জীর্ণ শয্যায় ছোট একটি শিশু শুইয়া আছে—চোখের নীচেটা গাঢ় কালিমা-মাখা।

বসিবার অন্য আসন না থাকায় ঐ শয্যারই এক পাশে সুধীশ বসিয়া পড়িল, পরীক্ষা শেষ করিয়া মুখ-তুলিয়া কুমারী মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল, "দাস্ত, বমি —কোথায় ফেলেছেন?"

তরুণীর নাম গায়ত্রী; সে বলিল, "ফেলিনি; যদি দেখতে চান, এ জন্য বাইরে রেখেছি। উঠে একবার বাইরে আসতে হবে।"—সে হারিকেনটা তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইল।

সুধীশ বাহিরে আসিয়া বলিল, "ছেলেটি আপনার ভাইপো?"

গায়ত্রী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

সুধীশ প্রশ্ন করিল, "আপনার দাদা কোথায়?"

তরুণী নিরুত্তর রহিল। এমন ভাবে নিস্তব্ধ রহিল যে, প্রশ্নটা যে তাহাকে ব্যথিত করিয়াছে, তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই সুধীশ বুঝিতে পারিল। অজ্ঞাতে হয় তো কোন বেদনার স্থানে খোঁচা দিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ কথাটা সে ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অভিভাবক কেউ নেই বাড়ীতে?"

গায়ত্রীর সজল চক্ষু অবনত, সে কথা কহিল মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল, "না।"

অগত্যা সুধীশ মুখ বন্ধ করিয়া স্বকার্য্যে মনঃসং- করিল।

পরীক্ষা শেষ হইলে সে পুনরায় রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াই হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। শিশুর পাশে তাহার মাতা যুক্তকরে ধ্যানমগ্না,—বাহ্যজ্ঞান যেন রহিত। মুখে তাহার অবগুণ্ঠন নাই,—তাহার তুষারশুভ্র গণ্ড দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

গায়ত্রী চোখে অঞ্চল দিল।—আর ডাক্তার?···

সুধীশের মনে হইল, কে যেন তাহার গায়ে পেরেক ঠুকিয়া দিয়াছে! তাহার পায়ের তলার মাটী বিষম বেগে দুলিতে লাগিল, চোখের সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। একি? একি? হিমানী!...এত কাছে পাইয়াও সে এতক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারে নাই? সুধীশ আড়ষ্ট ভাবে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

চোখে আলো লাগিয়াই বোধ হয় হিমানীর চমক ভাঙ্গিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া দিল। মনে হইল, ডাক্তারের সম্মুখে মুখ অনাবৃত করিতে তাহার ইচ্ছা নাই।

সুধীশ তখনও আত্মসম্বরণ করিতে পারে নাই। উষ্ণ রক্তস্রোত তাহার ধমনী বাহিয়া দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি মেনিন-জাইটিসের আক্রমণ হইতেছে। আড়ষ্ট ঘাড় সে ফিরাইতে পারিল না। পাথরের মত কঠিন, অসাড় নির্নিমেষ চক্ষু অবগুণ্ঠনবতী হিমানীর দিকে নিবদ্ধ রহিল!

কথা বলিল গায়ত্রী; নিম্নস্বরে বলিল, "খোকাকে কেমন দেখলেন আপনি?"

সুধীশ যেন লুপ্ত-চেতনা ফিরিয়া পাইল; অর্থহীন, উদাস দৃষ্টি প্রশ্নকারিণীর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিবার পর কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "ভয় নেই, ভাল হ'য়ে যাবে।"

গায়ত্রী দুই হাতে আঙ্গুলগুলি কচলাইতে কচলাইতে,

বলিল, "খোকাকে কি আপনি এখন ওষুধ দেবেন? আমি তা হ'লে আপনার সঙ্গে যাবো।"

হিমানী অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতেই মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি থাকো, আমিই যাচ্ছি।"

গায়ত্রী বলিল, "তুমি এই তো একবার গেলে; এবার আমিই যাই।"

হিমানী মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, থাক্; রাত্তিরে তোমায় একা পথে যেতে হবে না। তুমি ততক্ষণ খোকার কাছে থাক।"

ক্ষোভে সুধীশের দক্ষিণ হস্ত দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ হইল। বুকের প্রত্যেক শিরা যেন প্রচণ্ড আলোড়ন সহিতে না পারিয়া ছিঁড়িয়া গেল! হায়, যে নিষেধ করিতেছে, তাহার বয়স আজিও পঁচিশ পার হয় নাই! শত অভাবে, ও অযত্নে তাহার দেহে ধূলা-কাদা যতই লাগুক, আজিও সে রূপের তুলনা হয় না,—তাহা শারদ জ্যোৎস্নার মত মাধুরীমাখা, স্নিগ্ধ! ননদভাজের মতান্তরের মধ্যেই সে বলিল, "আপনাদের কারুকেই যেতে হবে না! আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।"—একটুখানি থামিয়া বলিল, "যদি বাড়ীতে কোন পুরুষ অভিভাবক থাকতেন, তা হ'লে আজ এই অসময়ে আমায় ফিরে যেতে হ'ত না।" আবার মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনি এবার দোরটা বন্ধ ক'রে দিন; আমি ওষুধ পাঠাচ্ছি।"—সুধীশ উঠিয়া দাঁড়াইল, অবগুণ্ঠনবতী হিমানীর দিকে মুহূর্ত্ত কাল চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস দমন করিল; জিহ্বাগ্রে যে কথা আসিতেছিল, তাহা ব্যক্ত করিবার পথ ছিল না। মনে-মনেই বলিল, "হিমু, তোমার এত-বড় দুঃসময়ে আমি তোমায় একটা সান্ত্বনার কথাও ব'লতে পারলুম না! আজ তোমার বিশ্বাস ক'রতে প্রবৃত্তি না হ'তে পারে, কিন্তু তোমার ছেলেকে বাঁচাতে দরকার হ'লে আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব দিতে পারি।"

গায়ত্রী সসঙ্কোচে বলিল, "আবার আজ এই শীতের রাতে কাকে পাঠাবেন, তার চেয়ে আমিই যাই না।"

সুধীশ তরুণীর মুখপানে চাহিয়া সক্ষোভে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এত বেশী রাতে আপনার মত মেয়েকে একা কি কেউ পথে বেরুতে দিতে পারে? কাউকে নিতান্তই যদি না পাই, তবে নিজেও দিয়ে যেতে পারি। আপনি দোরটা বন্ধ করুন।"

গায়ত্রী তাহার আঁচলের মুড়ার গাঁট খুলিতে উদ্যত হইয়াছে লক্ষ্য করিয়া সুধীশ হাত নাড়িয়া ব্যস্ত ভাবে বলিল, "ছেলে আগে সেরে উঠুক না, এখন আমাকে আরও বার-কতক আসতে হবে তো? ওটা পরেই দেবেন।"

গায়ত্রী শুষ্কমুখে বলিল, "দরকার হ'লেও বার-বার দেখাতে পারব কি না, ভগবানই জানেন; কিন্তু আজকের ফি-টা দয়া ক'রে নিয়ে রাখুন। আমাদের ঋণী ক'রে রাখবেন না।"

সুধীশের কুণ্ঠিত চক্ষু রোগীর কক্ষে সন্নিবিষ্ট হইল; কি যে তার অন্তরের ভিতর হইতেছে, এই তরুণী যদি তাহার বিন্দুমাত্র আভাস পাইত!

সে একটুখানি নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা করুন। আপনাদের পুরুষ অভিভাবক কেউ বাড়ী থাকলে তাঁর হাত থেকে নিতে পারতুম; কিন্তু আপনার হাত থেকে ওটা নেওয়া আমার অসাধ্য।"

গায়ত্রী বিপন্ন-কণ্ঠে বলিল, "তবে তো এর পরে যত দরকারই হোক—ডাকতে পারব না।"

সুধীশ বলিল, "ডাকতে আপনাদের আর হবে না; আমি নিজেই আসব। তবে সে জন্যে সঙ্কোচ ক'রে ছেলেটির চিকিৎসা যেন বন্ধ ক'রবেন না, এই আমার অনুরোধ।"

কৃতজ্ঞতায় গায়ত্রীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; অশ্রু তাহার চোখ ছাপাইয়া গাল ভাসাইয়া সুধীশকে সম্মতি জানাইল।

সুধীশ ধীরে-ধীরে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

২

অবশিষ্ট রাত্রিটুকু সুধীশ কি ভাবে কাটাইল, তাহা পরমেশ্বরই জানিলেন। সে বিছানায় পিঠ ঠেকাইতে পারিল না, ছটফট্ করিয়া সারা ঘরটায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার এ-জানালায়, একবার ও-জানালায়, একবার বা দ্বারের কাছে সে ক্রমাগত পাদচারণ করিতে লাগিল। মনে হইল, তাহার সর্ব্ব-দেহে কি একটা উগ্র বিষক্রিয়া চলিতেছে!

…এই হিমানী তার বড় পরিচিত, বড় আপন ছিল; কিন্তু সুধীশের নিজের হঠকারিতাতেই সে আজ তাহার যৎপরোনাস্তি পর হইয়া গিয়াছে।

সে অনেক দিন পূর্ব্বের—পনের-ষোল বৎসরের কথা। যখন হিমানীর মাতার সহিত সুধীশের মাতার দীর্ঘকাল পরে দেখা হয়, বাল্যসখী 'গঙ্গাজল'কে সুধীশের মাতা রাজকুমারী ঐশ্বর্য্যের স্তূপে বসিয়াও ভুলিতে পারেন নাই। দু'জনে যখন দেখা হইল, তখন উভয়ের অবস্থার পার্থক্য আকাশ-পাতাল। রাজকুমারী ধনী জমীদারের পত্নী আর প্রভা এক দরিদ্র সাব-পোষ্টমাষ্টারের স্ত্রী। জমীদার-বাড়ী পূজা দেখিতে আসিয়া দুই সখীতে বহুকাল পরে সহসা সাক্ষাৎ।

হিমানী তখন দশ-এগার বৎসরের অস্ফুট কুসুম-কোরক। রাজকুমারী তাহার হাত ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া-লইয়া বলিলেন, "ওমা, যেন প্রতিমার মত মেয়ে! কি নাম রেখেছিস ভাই?—হিমানী? তা খাসা নাম হ'য়েছে। এ মেয়ের নাম হিমানী রাখবি না তো কি? ঘর-সংসার আলো-করা মেয়ে!"

কিশোর সুধীশও বাড়ীর মেয়েদের সহিত সেখানে ছিল, তাহার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, "ঐটিই ভাই আমার বড় ছেলে। এই বছর পাশ দেবে।—আয় রে সুধা, তোর মাসীকে প্রণাম কর।"

সুধীশ কাছে আসিলে হিমানীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে বলিলেন, "দেখ তো, কি সুন্দর মেয়েটি! তোর বউ ক'রব। গঙ্গাজল! আমি ভাই তোর মেয়েটিকে নিলুম, সুধার বউ ক'রব।"

সুধীশের পিসিমা বলিলেন, "হাঁ, বউ, তুমি মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যবন্দী হ'লে! দাদার মতটাও তো নিলে না?"

রাজকুমারী বলিলেন, "অমত হবার ভয় নেই, ঠাকুরঝি! মেয়ে দেখেছ—যেন পদ্মফুল! ছেলেবেলায় দু'জনে কাচের পুতুলের বিয়ে দিতুম; ভগবান্ যখন রক্ত-মাংসের পুতুল দিয়েছেন, তখন সে সাধই বা অপূর্ণ রাখি কেন? আর এই দেখ না, ওই বা কোথায় ছিল, আমিই বা কোথায় ছিলুম,—ভগবান্ হঠাৎ দু'জনে দেখা করিয়ে দিলেন। আবার দেখ, দেবার উপযুক্ত ছেলে-মেয়েও দিয়েছেন! কালো-কুঞ্চিত বাবরি-খোঁচা হ'লে কি আর বলতুম? দেখ দেখি, দু'টিকে কেমন মানিয়েছে!"—বলিয়া হিমানীকে সুধীশের পাশে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "যেন হর-গৌরী, না ভাই?" তিনি উপস্থিত মহিলাবৃন্দের দিকে চাহিয়া এই মন্তব্য করিলেন।

সকলেই একবাক্যে তাঁহার সমর্থন করিল।

রাজকুমারী বলিলেন, "দু'জনে হাত ধ'রে মা-দুর্গাকে প্রণাম করো। বলো, মা আমাদের সুখী করো।"

ইহার পর হিমানী সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে সুধীশের বধূরূপে গৃহীতা হইয়া গেল।

রাজকুমারীর ইচ্ছা ছিল, সেই বৎসরেই বিবাহ দিয়া ফেলিবেন, কিন্তু কর্ত্তা সম্মত হইলেন না। হিমানীর বয়স ও সুধীশের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি দিলেন না। তিনি স্বয়ং বাল্য-বিবাহের বিরোধী ছিলেন। স্থির হইল, হিমানীর বয়স পনের বৎসর হইলে বিবাহ হইবে।

রাজকুমারী ক্ষুণ্ণ হইলেও জেদ করিলেন না; কেবল হিমানীকে অধিকাংশ সময় নিজের কাছে রাখিয়া এ গৃহের ভবিষ্যৎ গৃহিণীত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

* * * *

তার পর!…

তার পরের কথা ভাবিতে গিয়া শীতের রাতেও সুধীশ ঘামিয়া উঠিল।

মনে পড়িতে লাগিল, সেই কত দিনের হিমানীর সহিত প্রণয়-খেলা। কত গোপন আদর, গোপন সোহাগ,—কত উপহার!

কত দিন সে নির্জ্জনে হিমানীকে সপ্রেম আলিঙ্গনে বাঁধিয়া প্রশ্ন করিয়াছে, "হিম, আমায় তুমি ভালবাস?"

সহকারের অঙ্গে স্বর্ণলতিকার মত তাহার দেহের উপর সোহাগে লতাইয়া পড়িয়া সে নতমুখে চুপি-চুপি বলিত, "আহা! যেন তা জানেন না।…"

আজ এত দিন পরে সে কথা স্মরণ করিতে গিয়া সুধীশের মনে হইল, কি একটা আকস্মিক যন্ত্রণায় তাহার হৃদ্‌পিণ্ড একেবারে অকর্ম্মণ্য—প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে। শ্বাসটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আর তাহার নাই!

সেই কবেকার বিস্মৃত কথাগুলি আজ এত দিন পরে দূরাগত সমুদ্রকল্লোলের মত সুধীশের কর্ণে নিরন্তর ধ্বনিত হইতে লাগিল! কিন্তু যেন তাহার সকরুণ, মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ!

* * * * *

তার পর!

বায়স্কোপের মত চোখের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল, তার নিজের মায়ের মৃত্যুশয্যা। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন তিনি হিমানী ও সুধীশের হাত দু'খানি বুকের উপর রাখিয়া সক্ষোভ কণ্ঠে স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "যখন আমি বলেছিলুম, তখন যদি বিয়ে দিতে,—আজ আমি নাতির মুখ দেখে যেতে পারতুম।"

সুধীশকে বলিয়াছিলেন, "আমি হিমুকে ঘরে তুলে যেতে পারলুম না, বছর কাটলেই এনো। সংসার বড় অগোছাল হ'য়ে রইল।"

তাহার পর বিগলিতাশ্রু হিমানীর হাতখানি সুধীশের হাতের উপর রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "সুধাকে, অতীকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম, এ সোণার-সংসার ভাঙতে দিও না। সুধা, হিমুকে তোমায় দিয়ে গেলুম, দেখো, আমার বড় আদরের হিমু,—কখন ওর প্রাণে ব্যথা দিও না। ওকে চোখের জল কখন যেন ফেলতে না হয়।—" মায়ের অন্তিম কালে তাঁহার পবিত্র মৃত্যু-শয্যায় বসিয়া সুধীশ সেই প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার ক্ষোভ দূর করিয়াছিল!

* * * *

তার পর!…

আবার দৃশ্য পরিবর্ত্তন, নূতন দৃশ্যের অবতারণা!…

ডাক্তারী পড়িতে-পড়িতে কলেজের প্রথিতযশা ছাত্রী নেলী রায়ের সহিত তাহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা, এবং ক্রমশঃ হিমানীর প্রতি অনুরাগ-হ্রাস।

অশৌচের বৎসর অতীত হইল, পিতা এক দিন সুধীশকে বলিলেন, "আর দেরী করতে ইচ্ছে নেই, হিমুও বড় হ'য়েছে। আমি মনে ক'রছি, এই আষাঢ়ে তোমাদের বিবাহটা দিয়ে ফেলি। তিনি দেখতে পেলেন না, আমারও শরীর যে রকম ভেঙ্গে গেছে, দেরী করলে আমিও হয় তো দেখতে পাব না।

সুধীশ তখন হিমানীকে মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে। তাহার স্থানে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে নেলী রায়। সুধীশ জানে, সে নেলীর প্রীতিভাজন—সে জন্য ছাত্র ও তরুণ শিক্ষকমহলে তাহার প্রতি বিদ্বেষের অন্ত নাই।

হিমানী,—সেই শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী তরুণীর পার্শ্বে অত্যন্ত নিষ্প্রভ। গ্রাম্যবালিকা ও উন্নত শিক্ষায় মার্জ্জিত-রুচি তরুণীতে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, তাহা সুধীশ তখন মনে-প্রাণে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিজের শিক্ষার যতই উন্নতি হইতে লাগিল, হিমানীকে ততই অশিক্ষিতা বলিয়া অবজ্ঞা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হিমানীকে লইয়া সে যে স্বপ্নলোক রচিয়াছিল,—এখন তাহা ছেলেমানুষী বলিয়া মনে হইত। তাই সে পরদিন কনিষ্ঠ ভাই অতীশকে দিয়া পিতাকে জানাইল,—হিমানীকে বিবাহ করিতে সে একেবারেই অক্ষম।

শুনিয়া ক্ষোভে পিতা সে দিন দ্বার মুক্ত করেন নাই। তাহার পর এক সময় সুধীশের দু'খানি হাত হাতে ধরিয়া প্রৌঢ় পিতা সাশ্রুনেত্রে অনুরোধ করিয়াছিলেন,—যে ভাবে পিতা-পুত্রে কথা হয়, সে ভাবে নহে,—যে ভাবে বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য চায়,—সেই ভাবে!—

সে স্মৃতি মনে উদিত হইবামাত্র সুধীশ কণ্টকিত হইয়া উঠিল,—নিজের অজ্ঞাতেই মুখ দিয়া একটা আর্ত্ত রব বাহির হইয়া গেল।

সুধীশ সে দিন পিতার ব্যাকুল অনুরোধে আদৌ কর্ণপাত করে নাই; হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিয়াছিল, এ হ'ল মানুষের নিজস্ব বিচার্য্য বিষয়, এতে কোন বাপ-মার হাত দেওয়া উচিত নয়।

আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন পিতা আর কথা বলেন নাই।

বৎসরখানেক বাদে উড়ো-ভাষা একটা কথা শুনিয়াছিল,—হিমানীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কথাটায় সে একটুও গুরুত্ব দেয় নাই,—বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সে তখন নেলীর প্রেমে উন্মত্ত!…

আবার দৃশ্য পরিবর্ত্তন!…

নেলীর সহিত প্রণয়ের মধ্যে ধূমকেতুর মত আসিয়া-পড়া,—নেলীর বিলাত-যাত্রা।

একটা স্কলারশিপ পাইয়া নেলী বিলাত গেল। সে সময়ের কথা স্পষ্ট সুধীশের কানে বাজিতে লাগিল। সে

মনের চাঞ্চল্য যদি কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ে! একটু নীরব থাকিয়া, একটা গভীর শ্বাস বহু আয়াসে দমন করিয়া বলিল, "বাড়ীতে যে রকম বিপদ-আপদ, আপনি একা কি করবেন? আপনার দাদা কোথায়,—তাঁকে খবর দিন।"

গায়ত্রী দৃষ্টি নত করিল; তাহার নিটোল গণ্ড বহিয়া দু'টি তপ্ত অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। সে রুদ্ধকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলিল, "খবর দেওয়ার উপায় নেই।"

সুধীশ চকিতে একবার হিমানীর সীমন্তের দিকে নেত্রপাত করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "আমি কিন্তু বুঝতে পারলুম না। উনি—উনি তো সধবা দেখছি!"

গায়ত্রীর দুই চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতেছিল; সে দ্বিধা-সঙ্কুচিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কি বলব! বছর আড়াই হ'ল, একটা বারাঙ্গনাকে খুনের অভিযোগে জড়িত হ'য়ে তিনি পাঁচ বছরের জন্যে জেলে গেছেন।"—সে উভয় করতলে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

সুধীশ শিহরিয়া উঠিল। হিমানী সত্যই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! অভাগীর বুঝি মৃত্যুই শ্রেয়ঃ! উঃ, এত দুঃখও তার অদৃষ্টে ছিল!

গায়ত্রী তখনও কাঁদিতেছিল.—সুধীশ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কত হাল্কা দুঃখে সে কাঁদিতেছে, আর সুধীশের অন্তরে দুঃখের পারাবার উথলিয়া উঠিয়াছে, অথচ তাহা বিন্দুমাত্র ব্যক্ত করিবার উপায় নাই! সে-ও যদি উহার মত প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারিত।

জ্বালাময় দৃষ্টি ফিরাইয়া সে রোগিণীর দিকে চাহিয়া রহিল। রাত্রে মুখে অবগুণ্ঠন ছিল, এখন নাই; করাল ব্যাধি হিমানীর মুখে তাহার সুস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়াছে,—হিমশীর্ণ কমলের মত সে রূপ পরিম্লান।

এই সময় হিমানীর ছেলে-মেয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সুধীশের ইচ্ছা করিতেছিল, একবার তাহাদের দু'টিকে নিজের ক্ষুধিত বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া হিমানীর সন্তাকে বহু দিন পরে প্রাণ ভরিয়া অনুভব করে; কিন্তু তাহার সাহস হইল না।

গায়ত্রী শান্ত হইয়া মুখ তুলিলে সুধীশ ধীরে-ধীরে বলিল, "এঁদের এখন যে অবস্থা, তাতে সেবা ও চিকিৎসার প্রয়োজন খুব বেশী। কিন্তু এ দু'টি ছেলেমেয়েকে রোগীর পাশে রাখা চলে না, ওদেরও হবার ভয় আছে। আর আপনিও দু'দিক তো সামলাতে পারবেন না।"

গায়ত্রী ধরা-গলায় বলিল, "সে তো আমিও বুঝেছি, কিন্তু উপায় কিছু দেখ্‌ছিনে যে!"

সুধীশ প্রশ্ন করিল, "আপনাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ কি কাছাকাছির মধ্যে নেই? ওদের মামার বাড়ী কোথায়?"

গায়ত্রী ম্লানমুখে বলিল, "বৌদি'র বাবা অনেক দিন মারা গেছেন। দু'টি ভাই ছিল, বছর ৫।৭ হ'ল, তারা দু'জনেই মারা গেছে। ওঁর মা কাশীতে প'ড়ে আছেন, তাঁর নিজেরই কায়ক্লেশে চলে।

সুধীশ গোপনে নিশ্বাস ফেলিল। চারি দিকেই দুঃসংবাদ! হতভাগিনীর পিতৃকুলও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, এবং আজ একান্ত অসহায়ার মত—অনাথার মত নিজেও বিনা-চিকিৎসায় মরিতে বসিয়াছে!

মৃত্যু অবশ্য কেহ ঠেকাইতে পারে না, সে ধনী-দরিদ্র সকলকেই সমভাবে গ্রাস করে; কিন্তু এক দিন যদি সে তেমন করিয়া মরীচিকার পিছনে না ছুটিত, তবে আজ এমন করিয়া এত কষ্ট পাইয়া হিমানী মরিত না। আর তার এই সুকুমার সন্তানগুলিও কি এমন অনাথ—এমন নিরাশ্রয় ভাবে ভাসিয়া বেড়াইত?

গায়ত্রী বলিল, "কি করব তা হ'লে? আমি যে কোন উপায়ই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে!"

সুধীশ একটু ভাবিয়া বলিল, "এঁদের যে রকম সেবা আর চিকিৎসার এখন দরকার, আপনি বাড়ীতে রেখে তা করতে পারবেন না। যদি বলেন, হাসপাতালের ব্যবস্থা করি।"

গায়ত্রী চমকিয়া উঠিল; চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল। অপরিচিত ডাক্তার সুধীশ বাবু এমন দরদভরা ব্যবহার করিতেছে, যেন সে তাহাদের কত দিনের চেনা, যেন পরমাত্মীয়! কিন্তু প্রস্তাবটা শুনিয়াই গায়ত্রী কাতর হইয়া বলিয়া উঠিল, "উঃ! বৌদি' কি শেষটা অনাথার মত হাসপাতালে যাবে? দাদা গো!"

সে আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

আর সুধীশ? সে নিশ্চল, নিস্পন্দ ভাবে হিমানীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, "তা হ'লে কি ক'রব?"

গায়ত্রী নিরুপায় হইয়া বলিল, "আমি আর কি ব'লব? যা ভাল হয়, তাই করুন।"

সুধীশ বলিল, "ওঁরা না হয় হাসপাতালে থাকলেন, কিন্তু এই ছেলেমেয়ে দু'টি নিয়ে আপনি কোথায় যাবেন?"

গায়ত্রীর মুখ নিষ্প্রভ হইয়া গেল; মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া সে কহিল, "বৌদি' হয় তো দুঃখের বোঝা এড়িয়ে চল্‌ল। ছেলেমেয়ে নিয়ে তো আমাকে এখানেই থাকতে হবে।"

সুধীশ তাহার হতাশ উক্তিতে ব্যথিত হইল; বলিল, "পরের কথা পরে ভাববেন। কিন্তু উপস্থিত এ-বাড়ীর যে রকম অবস্থা, তাতে এখানে থাকলে রোগের আক্রমণের আশঙ্কা খুবই বেশী।"

শিশু দু'টির পানে চাহিয়া গায়ত্রীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল; পাংশুমুখে সে বলিল, "তবে ওদের একটা ব্যবস্থা করুন ডাক্তার বাবু, ওদের বাঁচান।—বলিতে বলিতে সে দুই করতল যুক্ত করিল।

সুধীশ বলিল, "কিন্তু ওদের সঙ্গে যে আপনাকেও বাঁচতে হবে। ওদের বাপ-মা দুই-ই যখন অনিশ্চিতের মধ্যে, তখন আপনি না হ'লে ওদের চলবে কিরূপে? আপনি না থাকলে ওদের অবস্থাটা কি রকম শোচনীয় হবে, তা একবার ভেবে দেখুন।"

গায়ত্রীর ভীত, শোকাচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া সুধীর বলিল, "আপাততঃ ওদের নিয়ে আপনাকে আমার বাড়ী যেতে হবে। অবশ্য বাড়ীতে আমি একাই থাকি,—কিন্তু এখন তা' ভেবে আপনার আপত্তি করা চলবে না। মা-বাপ ছাড়া এই শিশু দু'টির জীবনের দায়িত্ব এখন আপনার। আমি এখন যাচ্ছি, এদের হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করিগে। আর আপনাকে এ-বাড়ী ছাড়বার জন্যে তৈয়েরী হ'তে হবে।"—সুধীর উঠিয়া পড়িল।

পথ চলিতে লাগিল সে অন্ধের মত; তাহার বুক বিদীর্ণ করিয়া হাহাকার যেন সবেগে বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে কি করিতে চলিয়াছে?.........

তাহার পরম স্নেহের পাত্রী হিমানীকে সে নিতান্ত পরের মত, দুঃস্থের মত,—দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাহার অন্তিম-কালে রাখিয়া আসিতে চলিয়াছে! কিন্তু হায়! আজ ইহা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। সে অনাত্মীয়া, সে এখন অপরিচিতা, এবং পরস্ত্রী,—ইহার বেশী তাহার জন্য করিবার অধিকার সুধীশের আর কি আছে?

স্বেচ্ছায় যে ফুলের মালা নির্ম্মম হৃদয়ে সে ছিঁড়িয়াছিল,—আজ তাহার ছিন্নসূত্রটুকু রক্ষার জন্য প্রাণপণ আকিঞ্চন করিয়াও সুধীশ কোন দিক হইতেই সান্ত্বনা পাইল না।

৪

অগত্যা গায়ত্রীকে সুধীশের প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল, ছেলে-মেয়ে লইয়া সে সুধীশের গৃহে আসিল। হিমানীর শিশু দু'টিকে যে ঐ অপয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া আনিতে পারিয়াছে, ইহাতে সুধীশ আশাতীত তৃপ্তি পাইল। কম্পাউণ্ডার বাবুকে দিয়া দরজীকে খবর পাঠাইয়া ছেলেমেয়ে দু'টির জন্য দুই-তিন প্রস্থ গরম পোষাক নির্ম্মাণের আদেশ দিল। উহাদের গায়ের গরম জামা যতক্ষণ না আসিয়া পৌছিল, ততক্ষণ সুধীশ নিজেও শীতবস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিল না।

গায়ত্রীকেও সুধীশ তার দিক দিয়া যতটুকু সম্ভব যত্নের ত্রুটি করে না। ঠাকুর, রামু, যদু, সকলকে বলিয়া দিয়াছে, তাহারা যেন সর্ব্বদা গায়ত্রীর ও শিশু দু'টির তত্ত্বাবধান করে। গায়ত্রীর খাওয়া হইয়াছে কিনা, দুই-বেলা স্বয়ং খোঁজ করে। অপরিচিতার সংবাদ ইহার বেশী রাখা শোভন নয়, এবং তার মনেরও সেরূপ শক্তি নাই।

তিন-চার দিন কাটিয়া গিয়াছিল। হিমানীর রক্ষা পাইবার আশা হইয়াছে বটে, কিন্তু শিশুটি মারা গিয়াছে।

গায়ত্রী প্রত্যহ সুধীশের সঙ্গে যায়, হিমানীকে দেখিয়া আসে। চতুর্থ দিনে হিমানীর জ্ঞান হওয়ায় সে গায়ত্রীর নিকট ছেলেমেয়ের খোঁজ লইল; এবং তাহারা সুধীশের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে জানিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

সুধীশ হিমানীর কাছে যাইত না; দুর্ব্বল দেহে না জানি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

ফিরিবার পথে গায়ত্রী খানিক ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদিকে ওরা কবে ছাড়বে?"

দু'জনে পাশাপাশি বসিয়াছিল বটে, কিন্তু সুধীশের

দৃষ্টি ছিল কোন্ দিগন্তে, মন কি-জানি কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে হাঁটুর উপর হাঁটু তুলিয়া তাহার উপর দুই হাত রাখিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া ছিল। প্রশ্ন শুনিয়া সুপ্তোত্থিতের মত বলিল, "কি ব'লছেন? কবে ছাড়বে?—হাঁ, শনিবারে আনা চলবে। কেমন দেখলেন আজ?"

গায়ত্রী বলিল, "একটু ভালই মনে হ'ল। আজ ছবি-মৃণার খবর জানতে চাইলে। খোকন নেই, বৌদি' তা' জানে, নার্স ব'লেছে।"

সুধীশের জানিতে ইচ্ছা করিতেছিল, গায়ত্রী শিশু দু'টি লইয়া তাহার আশ্রয়ে আছে, ইহা জানিয়া হিমানী কি বলিল? কিন্তু ঔৎসুক্য দমন করিয়া সে নীরব রহিল।

সুধীশের বাড়ীর বহির্দ্দেশে যদু ছবি-মৃণাকে লইয়া বসিয়া ছিল! মোটর আসিয়া দাঁড়াইলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সুধীশ নামিয়া আসিল, গায়ত্রী নামিতে গেল, কিন্তু সাড়ীর আঁচলটা কেমন করিয়া হাতলে জড়াইয়া সে পড়িয়া যাইতেছিল; সুধীশ তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "লাগল?"

গায়ত্রীর মুখ তখন লজ্জায় হিঙ্গুলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে;—বলিল, "না।"

সে তখন ভিতরে ঢুকিতে পারিলে বাঁচে! কিন্তু ছবি-মৃণা আগাইয়া আসিল; মৃদুস্বরে বলিল, "মা কেমন আছেন, পিসিমা?"

হিমানীর অবস্থা জানিয়া আজ সুধীশের মন হাল্কা ছিল; সে মৃণার কাছে আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল, তাহার আয়ত ত্রস্ত চক্ষুর দিকে চাহিয়া বুঝিল, সে বড়ই ভয় পাইয়াছে। সত্যই সুধীশকে তাহারা ভয় করে, কি জানি, সে তাহাদের মা'কে ও ভাইটিকে কোথায় লইয়া গিয়াছে!

সুধীশের মনে পড়িতেছিল, হিমানীর ছোট-বেলার কচি মুখখানি। এমনই সুনীল চক্ষু দু'টি, এমনই কোঁকড়ান-চুলে-ঘেরা মুখখানি, এমনই আলতা-মাখা টুকটুকে ঠোঁট জোড়াটি!

সুধীশ তাহাকে বুকে চাপিয়া তাহার নরম গালে চুমা খাইতে-খাইতে বলিল, "এস, আমি তোমায় তোমার মায়ের গল্প বলি।" হ্যাটটা খুলিয়া লইয়া সে মৃণার মাথায় পরাইয়া দিল। ছবির দিকে একটা আঙ্গুল বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "এসো ছবি বাবু!"

ছবি ভয়ে-ভয়ে আঙ্গুল ধরিয়া তাহার সহিত চলিল।

গায়ত্রী বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল; সুধীশের গৌরবর্ণ সমুন্নত দেহ, গতিভঙ্গী, এবং কোলে মৃণাকে দেখিয়া তাহার দাদাকে মনে পড়িয়া গেল। এমনই করিয়া মেয়েটিকে বুকে লইয়া ছেলের হাত ধরিয়া অনুপ ঘুরিয়া বেড়াইত।

সহোদরকে স্মরণ হওয়ায় গায়ত্রীর দুই চক্ষুর দৃষ্টি অশ্রুতে ঝাপ্সা হইয়া উঠিল। কত গুণময় ছিল অনুপ, কি স্নেহময়, শান্ত সংযত প্রকৃতি; কিন্তু কি অধঃপতনই হইল তাহার। আজ তাহার অনুপস্থিতির জন্যই ছেলে-মেয়ে লইয়া সে একান্ত পরের আশ্রয়ে পড়িয়া আছে।

রাস্তার দিকে বাড়ীটার দ্বিতলে দুইখানি ঘর, এক খানিতে সুধীশ শয়ন করে, আর দ্বিতীয়খানা ছোট-বড় করিয়া পার্টিশন দিয়া একটা পড়ার ও একটা কাপড়-ছাড়ার জন্য ব্যবহার করে। ছবি ও মৃণাকে লইয়া সে পড়ার ঘরে গেল, তাহাদের তুলিয়া টেবিলের উপর বসাইয়া দিল। চিকিৎসকের ঘরে এমন কোন বস্তু ছিল না—যাহা দিয়া শিশুদের সহিত ভাব করা যায়। রামু পোষাক খুলিয়া দিতে আসিয়াছিল, সুধীশ তাহাকে বলিল, "ওরে, তুই একটা টাকা নিয়ে যা, চট্ ক'রে সুরেশের দোকান থেকে কিছু খেলনা কিনে আন্। আমি কাপড় ছাড়ছি, আর দেরী করিসনি, যা।"

রামু চলিয়া গেল। সুধীশ কাপড় ছাড়িয়া-ফেলিয়া তাহাদের বলিল, "পুতুল পেলে আমার সঙ্গে ভাব ক'রবে তো?"

ছবি-মৃণা ভয়ে কথা কহিল না।

রামু খেলনা দিয়া গেলে সুধীশ জিজ্ঞাসা করিল, "কে কোন্টা নেবে?"

এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার মত সাহস তাহাদের ছিল না; দু'জনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া নির্ব্বাক্ রহিল। সুধীশ বার-কতক বলিয়াও দেখিল—উহারা লইতে সাহস করে না। তখন দু'জনকে ভাগ করিয়া দিয়া বলিল, "আমাকে একটা চুমো দাও।"

প্রথমে ছবিই অগ্রসর হইল, অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভীত ভাবে। তাহা দেখিয়া মৃণাও আসিল।

সুধীশ দুই চক্ষু মুদিয়া তাহাদের বুকের উপর চাপিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। কত শীতল, কত প্রাণময় স্পর্শ এই সুকুমার শিশু দু'টির! এ যে তার বড় পরিচিত, বড় প্রিয়—হিমানীর স্পর্শ!···হিমানীর সন্তান,—এ তো সুধীশের নিজেরই সন্তান! এদের জননীর প্রতি অণু-পরমাণু যে সুধীশের পরিচিত, সুধীশের সুপরিজ্ঞাত! হিমানীকে তার অপেক্ষা আর কে বেশী জানে? ছবি-মৃণার জন্মদাতা নিশ্চয়ই তাকে তেমন জানে না!···হিমানী যদি তাহার হইত, তবে সুধীশের রক্তে-মাংসে গঠিত এই দু'টি নয়নপুত্তলী তাহারই—একান্ত তাহারই নিজস্ব হইত!···

কিন্তু আজ ইহাদের উপর সুধীশের এক তিলও দাবী নাই; সে তাহাদের কেহ নয়, বরং উত্তরকালে যদি কোন দিন তাহারা সুধীশের সহিত জননীর ঘনিষ্ঠতার পরিচয় জানিতে পারে, তবে অসীম ঘৃণায় তাহারা সুধীশকেই অভিসম্পাত করিবে।

বুকের ভিতরটা যেন তাহার মুচড়াইয়া উঠিল। সে ছবি ও মৃণাকে বুকে চাপিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "এ কি সান্ত্বনা আমায় তুমি দিলে, হিমানী!"

ক্ষণপরে সে যখন চোখ মেলিয়া চাহিল, তখন আস্তে-আস্তে তাহার সরলতাপূর্ণ ত্রস্ত চক্ষু দু'টি সুধীশের মুখের উপর স্থাপন করিয়া ছবি প্রশ্ন করিল, "আপনি আমাদের কে?

কে? সে তাহাদের কে?—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে তাহার প্রাণের ভাষা মূক হইয়া গেল। সুধীশ জানে না, সে এই বালকের সরল প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? সে দন্তে অধর দংশন করিয়া ছবির মুখপানে চাহিয়া রহিল।

ছবি নিজেই বলিল, "আপনি আমাদের বাবা?"

সুধীশ সহসা যেন শরবিদ্ধ হইয়া চমকিয়া উঠিল; শ্বসিত স্বরে বলিল, "কেন ছবি?"

ছবির ভয় আজ অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল, তাই সে সহজ ভাবে বলিল, "বাবাকে যখন পুলিশে নিয়ে গেল, তখন থেকেই পিসিমা বলেন, আমরা বড় হ'লে বাবা ফিরে আসবেন। কিন্তু লক্ষ্মী হ'য়ে থাকা চাই।···আচ্ছা, আমরা এখন লক্ষ্মী হইনি? আমরা কাঁদিনে, ঝগড়া করিনে, দুধ খেতে—খাবার খেতে চাইনে—খিদে পেলেও চুপ ক'রে থাকি—"

সুধীশ স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিল না; কিন্তু চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া উঠিল।

ছবি বলিয়াই চলিল, "এখন তো আমরা অনেক বড় হ'য়েছি, মীণাও অনেক বড় হ'য়েছে; ও নিজে নাইতে পারে, খেতে পারে। সত্যি কি আপনি আমাদের বাবা?"

হিমানীর সন্তান সুধীশকে প্রশ্ন করিতেছে, সে তাহাদের পিতা কি না!···জগদীশ্বর, দয়াময়! এ তোমার কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

ছবি আব্দারের স্বরে বলিল, "বলুন না, সত্যি আপনি আমাদের বাবা?"

সুধীশের মনে প্রচণ্ড দুর্নিবার লোভ জাগিতেছিল; তথাপি সে তাহা সম্বরণ করিয়া বলিল, "কে ব'ললে তোমায়, ছবি?"

ছবি বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "কে আবার ব'লবে? আমি জানি। পিসিমা জানে না বুঝি। আমি আজ ব'লব—"

"কি ব'লবে ছবি?"

"ব'লব, আপনি আমাদের বাবা।"

সুধীশ স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহার মুখপানে চাহিয়া-থাকিয়া বলিল, "হাঁ।"—কিন্তু পরক্ষণেই চমকিয়া উঠিল, সে এ কি করিয়া ফেলিল! শিশুর নিকট নতি স্বীকার করিয়া সে নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইতে চাহিল, "এ কথা কারুকে যেন বল না, ছবি! ব'লতে নেই।"

ছবি বলিল, "ওঃ, আবার বুঝি তা হ'লে পুলিশে ধরবে?"

নিরুপায় সুধীশ বলিল, "হাঁ।—আর যেন বল না।"

ছবি বলিল, "আচ্ছা। শুধু কানে-কানে একবার ডাকি, কেমন?" সে সুধীশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানে মুখ রাখিয়া সুকোমল মৃদু স্বরে ডাকিল, "বাবা, বাবা, বাবা গো!"

হিমানীর সন্তান সুধীশকে পিতৃ-সম্বোধন করিতেছে! ভগবান্! কোন মতে কি মাঝখানের কয়টা বৎসরের অপ্রিয় স্মৃতিকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া ইহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না? [ক্রমশঃ

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-রহস্য

গীতোক্ত সাধন-পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গীতার আলোচনায় ভগবৎশরণাপত্তি ও ভক্তিকেই মুক্তি বা ঈশ্বরলাভের মুখ্য উপায় বলিয়া অনেক স্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার কারণ, গীতায় অব্যক্ত, নির্গুণ, ব্রহ্মবাদ অপেক্ষা ব্যক্ত, সগুণ, ঈশ্বরবাদই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্যক্ত ঈশ্বরবাদে ভক্তিবাদই প্রধান অবলম্বন, এই জন্যই ভক্তিবাদের বর্ণনায় গীতা মুখরিত। ভগবান্ বলিয়াছেন, "আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই জীবনের ধ্রুবতারা কর। এইরূপে তোমার আত্মাকে আমার আত্মার সহিত যোগ করিলে আমাতেই তুমি মিলিত হইবে।" "যাঁহারা চিত্ত, প্রাণ আমাতেই অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করিয়া এবং পরস্পরকে আমার কথা বুঝাইয়া সন্তোষ ও শান্তি প্রাপ্ত হন।" "হে অর্জ্জুন! কেবল অনন্যভক্তি দ্বারা আমাকে জানিতে ও দেখিতে এবং আমার সহিত মিলিত হইতে পারা যায়। যে আমার প্রীতির জন্য কর্ম্ম করে, আমিই যাহার পরমধন, যে আমার ভক্ত, যে অনাসক্ত এবং সর্ব্বভূতে বৈরহীন, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যাহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া অনন্যযোগে আমাকে ধ্যান করে, আমাতে অর্পিতচিত্ত, সেই সাধক-দিগকে আমি অচিরে মৃত্যু-ভীষণ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি। অতএব, হে অর্জ্জুন! আমাতেই চিত্ত স্থির কর, মন অর্পণ কর, এইরূপ করিলে দেহান্তে আমাতেই বাস করিবে। সর্ব্বদা আমাতে অর্পিত-চিত্ত এবং প্রীতি-পূর্ব্বক আমার ভজনাকারী সাধকগণকে আমি বুদ্ধিযোগ বা শুভবুদ্ধি প্রদান করি, তাহারই ফলে তাঁহারা আমাকে লাভ করে। সেই সাধকদিগের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া আমি উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করি। ভগবান্ প্রাণিসমূহের হৃদয়-গুহায় বাস করিয়া স্বীয় মায়াবশে এই মানব-সমাজকে খেলার পুতুলের ন্যায় স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করাইতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই হৃদয়-গুহাবাসী পরমেশ্বরের (আমারই) শরণাপন্ন হও, তাঁহারই অনুগ্রহে তুমি শাশ্বত শান্তি ও দিব্যধাম লাভ করিবে—" আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর, এইরূপ করিলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। (১) তোমার যা কিছু আছে, সকল আমাতে সমর্পণ কর, আমাকেই পরম গতি, পরম সুহৃৎ মনে করিয়া আমাতে আত্ম-সমর্পণ কর, এবং "ঈশ্বরের আমি", "ঈশ্বর আমার" ও "ঈশ্বরই আমি" এইরূপে একান্ত ভাবে শরণাপন্ন হও, তাহা হইলেই আমি তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' ভগবানে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইলে, আমি তোমার, তুমি আমার, এবং তুমিই আমি, আমিই তুমি, এইরূপে ভগবান্‌কে একান্ত আপন করিয়া লইতে হয়। হে অখিলনাথ! যদিও সমুদ্রে এবং তরঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ নাই সত্য, তবুও লোকে সমুদ্রেরই তরঙ্গ বলে, তরঙ্গের সমুদ্র বলে না, সেইরূপ হে নাথ! তোমাতে ও আমাতে বস্তুতঃ কোন বিভেদ না থাকিলেও আমি তোমারই। (২) আমি তোমার এই ভাব হইতেই ক্রমে "তুমি আমার" এই বোধ উদিত হয়। ব্রজগোপিকাগণ

১। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।১০।১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।১০।১১
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।১৮।৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।১৮।৬২
মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।১৮।৬৫

২। সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রোহিতরঙ্গঃ কচনো সমুদ্রো তারঙ্গঃ।
সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।

"ভগবান্ আমার" এই ভাবে ভগবান্‌কে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, সেই জন্যই বলিয়াছিলেন—"হে কৃষ্ণ!, তুমি যে আমাদিগের হাত ছাড়াইয়া বলপূর্ব্বক পলায়ন করিলে, ইহাতে তোমার পৌরুষ কি? আমাদের হৃদয় ছাড়িয়া যদি পলাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারি। ভক্তির এই অবস্থায় ভক্ত ভগবান্‌কে একান্ত আপনার করিয়া ভাবেন—স্বীয় সত্তাকে ভগবৎসত্তায় হারাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন, ফলে ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া "আমিই তুমি" "তুমিই আমি" এইরূপে অভেদ বোধ উদিত হয়। এইরূপ অভেদ বোধ উদিত হইলে "স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং আমিই জীব বাসুদেবস্বরূপ এবং সেই বাসুদেবই এক অদ্বিতীয় পরমপুরুষ, এই বেদান্তবেদ্য সর্ব্বাত্মৈক্যবোধ বা সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন (ব্রহ্মদর্শন) স্থির হয়। গীতায়ও শ্রীভগবান্ "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" (৭।১৯) সমস্তই বাসুদেবাত্মক, এই কথা দ্বারা অদ্বৈত জ্ঞানেরই সূচনা করিয়াছেন। গীতার মতে জ্ঞানী ভক্ত চরমাবস্থায় ঐ অদ্বৈততত্ত্বেই উপনীত হয়, সুতরাং ভক্তিবাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে অবিরোধ প্রদর্শনই গীতোক্ত ভক্তিবাদেরও লক্ষ্য বলা যায়। জ্ঞানী ভক্ত গীতার ভাষায় ভগবানেরই আত্মা (জ্ঞানী ত্বাত্মৈবমেমতম্)। এইরূপ ভক্তি দ্বারা স্পষ্টতঃ জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের মধ্যে যে কোন প্রকার বিরোধ নাই, তাহাই বুঝা যায়। গীতায় স্থূলধী সাধকের জন্য ভগবানের বিবিধ ব্যক্ত রূপের উপাসনার কথা বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে এবং ঐ সকল বিভিন্ন ব্যক্ত রূপের মধ্যে যে সর্ব্বান্তর্যামী বাসুদেবই বিরাজ করিতেছেন—সমস্ত মূর্ত্তিই বাসুদেবের মূর্ত্তি, এ কথা গীতায় স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। অজ্ঞতাবশতঃ লোকে ভগবান্‌কে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখে বটে, জ্ঞানীর চক্ষুতে কোন ভেদদৃষ্টি নাই। সাধক যে ভাবে যে মূর্ত্তিতে পূজা করুক না কেন, সেই পূজা বাসুদেবেরই পূজা, বাসুদেবই সকলকে পূজার ফল দান করেন, ভক্তিপ্রবাহের পথ মুক্ত করিয়া দেন। অব্যক্ত ব্রহ্মে চিত্ত স্থির করা স্থূলধী সাধকগণের কষ্টসাধ্য বিধায় প্রত্যক্ষ নামরূপাত্মক ব্যক্ত রূপে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির করিবার উপদেশ গীতায় পুনঃ পুনঃ প্রদত্ত হইয়াছে। নিরাকার নির্গুণ অব্যক্ত পরব্রহ্মে স্বীয় চিত্তকে, পরিশেষে নিজ সত্তাকে বিলীন করিবার জন্য অব্যক্ত ব্রহ্মের সাধন-পদ্ধতি গীতায় উপদিষ্ট হইলেও ব্যক্তকে একেবারে ত্যাগ করা চলে না। প্রথমতঃ মনের সম্মুখে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ নামরূপাত্মক বস্তু না থাকিলে সাধারণ মানুষের পক্ষে অব্যক্তের কল্পনাই মনে আসিতে পারে না। ইহা মানব-মনের দোষই বল, স্বভাবই বল, যাহাই বল না কেন, যে পর্য্যন্ত মনের এই স্বভাব দেহধারী জীব পরিবর্ত্তন করিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত দেহীর পক্ষে উপাসনার জন্য অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যক্ত রূপ শ্রেষ্ঠ। এই ব্যক্ত উপাসনাও অব্যক্ত উপাসনার ন্যায় স্মরণাতীত কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই ব্যক্ত উপাসনামার্গকে ভক্তিমার্গ, আর অব্যক্ত উপাসনামার্গকে জ্ঞানমার্গ বলা হইয়া থাকে। ব্যক্তকে অবলম্বন করিয়া পরিশেষে অব্যক্তে পৌছিতে হয়, সুতরাং ভক্তি ত্যাজ্য নহে, ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানে পৌছিতে পারা যায়। এই মার্গদ্বয় বিভিন্ন হইলেও চরম ফলে কোন বিভেদ নাই।, একটি আর একটিতে পৌছিবার সোপানমাত্র। তবে (প্রথমটি) ভক্তিমার্গ সাধনমাত্র, সাধ্য নহে, জ্ঞানসাধনও বটে সাধ্যও বটে। এই জন্যই জ্ঞানমার্গকে "জ্ঞাননিষ্ঠা" বা সিদ্ধাবস্থার চরম অবস্থা বলা হয়। অধ্যাত্মবিচার অর্থে জ্ঞানকে সাধন বা জ্ঞানমার্গ বলা যায়, আবার অপরোক্ষ অনুভব অর্থে ঐ জ্ঞানকেই জ্ঞাননিষ্ঠা বা জ্ঞানের চরম পরিণতি বলা হইয়া থাকে। ভক্তি জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধন বলিয়া তাহা "নিষ্ঠা" বা সাধ্য চরম ফল নহে। কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে বলা যায় যে, শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে চিত্তশুদ্ধির জন্য যে কর্ম্ম করা যায়, ঐ কর্ম্ম সাধনমাত্র। ঐ কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে নিষ্কাম কর্ম্মফলে পরিণামে জ্ঞান ও শাশ্বত শান্তিলাভ করা যায়, কর্ম্ম তখন কর্ম্মযোগে পরিণত হয়, এই কর্ম্মযোগই কর্ম্মনিষ্ঠা। এই জন্য গীতার প্রারম্ভে জ্ঞাননিষ্ঠা, কর্ম্মনিষ্ঠা এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথাই বলা হইয়াছে।

গীতোক্ত জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিবাদ আলোচনা করা গেল এবং দেখা গেল যে, যে পথই অনুসরণ কর না কেন, চরমে জ্ঞানের রাজ্যে, শাশ্বত শান্তিধামে শ্রীভগবানের ক্রোড়েই গিয়া পৌছিবে। গীতার জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া গীতায় কর্ম্ম ও ভক্তিতত্ত্বের

উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি"—এই জ্ঞানই গীতার চরম জ্ঞান বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। তুমি কর্ম্মীই হও, ভক্তই হও আর জ্ঞানীই হও, সমস্তই বাসুদেবাত্মক, এই বুদ্ধি যদি স্থির করিতে পার, তবেই তোমার জীবন চরিতার্থ হইবে। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি যাহাই সাধনরূপে গ্রহণ কর না কেন, চরমে একই তত্ত্বে গিয়া পৌঁছিবে—সমস্তই বিষ্ণুময়, সমস্তই কৃষ্ণাত্মক, সমস্তই বাসুদেবস্বরূপ। ইহাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান, বেদান্তবেদ্য অদ্বৈতজ্ঞান। এই জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপদর্শনে অর্জ্জুনকে প্রত্যক্ষতঃ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তুমি যন্ত্র, আমি যন্ত্রী, তুমি আমার হাতের পুতুল। তুমি কোন কর্ম্ম কর না, সমস্ত কর্ম্মই আমি করি, তুমি উপলক্ষ্য মাত্র। কর্ম্মও আমি, কর্ত্তাও আমি, ক্রিয়াও আমি, কর্ম্মফলও আমি, আমিময় এই ত্রিভুবন। এইরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে সর্ব্বকার্য্যে আমাকে ভাবনা করিতে অভ্যাস কর, বিশ্বরূপে আমাকে দেখিতে চেষ্টা কর, দেখিবে, তোমার মধ্যেও আমার প্রকাশ, তুমি কিছু কর না, তোমার মধ্যেও আমিই করি। বৃথা অভিমান, বৃথা অহমিকা পরিত্যাগ কর, ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে, অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম কর এবং সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে আমাকে স্মরণ কর, দেখিবে, কর্ম্ম তোমার বন্ধন নহে, কর্ম্ম দিবে তোমাকে দিব্য জ্ঞান। সর্ব্বভূতের প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিলে সর্ব্বভূতে প্রেম আসিবে এবং নিখিল জীব-জগৎ ভগবানেরই আবাস-গৃহ, এই বুদ্ধিতে জীবজ-গতের হিতার্থে কর্ম্ম করিলে, তাহা হইবে ভগবানেরই সেবা এবং ঐ সেবা দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাঁহার সমস্ত কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে শাশ্বত শান্তি ও দিব্য আনন্দ দান করিবেন। ঐ আনন্দই ভগবানের স্বরূপ, আর জড়-জগৎও আনন্দময়েরই প্রকাশ। এই আনন্দভাব ও চিদ্ভাব চিত্তে স্থির হইলে জীবের কোন অপূর্ণতা থাকে না, কোন দুঃখ থাকে না। জীব যে অসীম আনন্দঘন ব্রহ্মেরই সখণ্ড অভিব্যক্তি, ইহা বুঝাই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। ঐ জ্ঞান সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন বা ব্রহ্মদর্শন ব্যতীত লাভ হয় না। সেই জন্যই গীতা ঐরূপ ব্রহ্মদর্শনেরই উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই উপনিষদুক্ত অদ্বৈত-তত্ত্বজ্ঞান। অবশ্যই শঙ্করাচার্য্যের সময়ে বা তদুত্তর কালে অদ্বৈতমত যে ভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, গীতার আলোচনা ঠিক সেরূপ নহে। গীতা দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সম্প্রদায় বাহির হইবার বহু পূর্ব্বেই বিরচিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে কোন বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক যুক্তি থাকিতে পারে না। শঙ্কর বা রামানুজের যুক্তিজাল গীতায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। গীতার বেদান্তমত উপনিষদের ভিত্তিতেই আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তবে অদ্বৈত-সিদ্ধান্তই যে চরম তত্ত্ব হিসাবে গীতায় পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গীতার অদ্বৈতবাদ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ নহে, তাহা উপনিষদের অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদই উপনিষদের দার্শনিক রহস্য, অদ্বৈতবাদ ব্যতীত উপনিষদের অন্য কোন রহস্য আছে বলিয়া মনে হয় না। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে দ্বৈতবাদ, সগুণ ব্রহ্মবাদ উপনিষদে আলোচিত হইয়াছে সত্য, তবে তাহা চরম সিদ্ধান্ত হিসাবে আলোচিত হয় নাই। অদ্বৈতবাদে পৌঁছিবার সোপান হিসাবেই আলোচিত হইয়াছে। গীতায়ও সেইরূপ সগুণ ব্রহ্মবাদ নির্গুণ ব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশ, বা স্থূল অভিব্যক্তি এবং স্থূলদর্শীর তত্ত্বজ্ঞান রাজ্যে পৌঁছিবার সোপান হিসাবেই আলোচিত হইয়াছে। "সমস্ত ভূতের নাশ হইলেও একই বজায় থাকে, (গী ৮।২০) তাহাই প্রকৃত সত্য। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র তাহাই ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছে" (গীতা ১৩।৩১) এইরূপ অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত গীতার মুখ্য সিদ্ধান্ত। গীতার মতে আমরা দেখিয়াছি যে, "জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম ভাস্বান্ জ্যোতিঃ, জীব তাহার স্ফুলিঙ্গ। ব্রহ্ম সিন্ধু, জীব তাহার বিন্দু।" এই বিন্দুকে সিন্ধুতে, স্ফুলিঙ্গকে বহ্নিতে নিমজ্জিত করিতে হইবে, এক কথায় জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে হইবে, ইহাই গীতার উপদেশ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, সুতরাং ব্রহ্মাংশ জীবও সচ্চিদানন্দ। জীব স্বীয় অজ্ঞানবশতঃ এই স্বীয় সচ্চিদানন্দ ভাব ভুলিয়া গিয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের ইহাই প্রকাণ্ড প্রভেদ যে, ব্রহ্মে এই সদ্ভাব, চিদ্ভাব ও আনন্দভাব সুব্যক্ত, আর জীবে ঐ ভাব অব্যক্ত। অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ ভাবকে সাধনা দ্বারা সুব্যক্ত করিতে পারিলেই জীব ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। ইহাই জীব-জীবনের চরম লক্ষ্য, চরম গতি। এই গতি ও

পরিণতির কথাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতোক্ত জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিবাদের মধ্য দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গীতা জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিবাদের সমন্বয়সাধক মহাগ্রন্থ। গীতার দৃষ্টি অধ্যাত্মদৃষ্টি। এই দৃষ্টিতেই গীতার্থ বিচার করিতে হইবে। এজন্য গীতার অনেক সিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হইলেও অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, গীতোক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান, সাংখ্যের ক্ষরাক্ষর বিচার ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচারের সঙ্গে ভক্তি ও কর্ম্মবাদের অবিরোধ স্থাপন করিয়া যথার্থ জ্ঞানের উপদেশ দেওয়াই গীতার মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য। এই প্রতিপাদনে একবার আধ্যাত্মিকদৃষ্টিতে, আর একবার ভক্তিদৃষ্টিতে বিচার করায় ব্যক্ত ও অব্যক্ত ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে, সগুণ ও নির্গুণ-বাদের মধ্যে গীতায় অবিরোধই ঘোষিত হইয়াছে। উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান গীতায় উপনিষদের দৃষ্টিতেই আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে। এই জ্ঞানই পরে বেদান্ত নামে পরিচিত হইয়াছে। সাংখ্যও জ্ঞানমার্গী, গীতার মতে সাংখ্যজ্ঞানীও তত্ত্বজ্ঞানী, তাহার সহিত বেদান্ত জ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞান হিসাবে কোন বিরোধ নাই। মীমাংসোক্ত কর্ম্মবাদের সহিত সাংখ্য এবং বেদান্ত এই দুইএরই বিরোধ তুল্য। এই জন্যই জ্ঞান ও কর্ম্মবাদের মধ্যে অবিরোধ স্থাপনের জন্য মীমাংসোক্ত সকাম কর্ম্মবাদ গীতায় গৃহীত হয় নাই, প্রত্যাখ্যাতই হইয়াছে। তার পর, জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে বিরোধ থাকায় জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কর্ম্মত্যাগই বিধেয়। এই কর্ম্ম-সন্ন্যাসবাদ বৃহদারণ্যক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপনিষদের স্বীকৃত হইলেও গীতা এই মত অনুমোদন করে নাই। ঈশাবাস্য প্রভৃতি উপনিষদে জ্ঞানোদয়ের পরেও নিষ্কাম বুদ্ধিতে বৈরাগ্য যোগে কর্ম্ম করার যে উপদেশ আছে, সেই উপদেশই গীতোক্ত কর্ম্মযোগে গৃহীত হইয়াছে। কর্ম্ম-সন্ন্যাসমার্গ ও কর্ম্মযোগমার্গ, এই দুইই জ্ঞানমার্গ। এই জ্ঞান-মার্গে পৌছিবার জন্যই যোগমার্গ এবং ভক্তিমার্গ গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভের জন্য ব্রহ্মচিন্তন নিতান্ত আবশ্যক এবং চিন্তন, মনন ও ধ্যান করিবার জন্য চিত্তকে একান্ত ভাবে স্থির করা প্রয়োজন। ইহাই যোগ-মার্গ এবং এই চিত্তস্থিতির জন্য পরমেশ্বরের মানবরূপধারী ব্যক্ত প্রতীকের উপাসনাই ভক্তিমার্গ। এই ব্যক্তকে অবলম্বন করিয়াই অব্যক্তে পৌছিতে হয়; সুতরাং ভক্তি-মার্গ ও জ্ঞানমার্গ পরস্পর সম্বদ্ধ। এই মার্গচতুষ্টয় যে পরস্পর বিযুক্ত নহে, ইহাই গীতোক্ত সমন্বয়বাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই দৃষ্টিতেই গীতা সর্ব্বধর্ম্মের ও সর্ব্বশাস্ত্রের সার সংকলন। এই শাস্ত্রসারই শ্রীভগবান্ প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে গীতায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কেবল উপদেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভগবদ্দত্ত প্রজ্ঞানেত্রের সাহায্যে স্বীয় বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করাইয়া অর্জ্জুনের অপরোক্ষ ব্রহ্মদর্শন উৎপাদন করিয়াছেন। ফলে, অর্জ্জুনের চিত্তবিভ্রম ও বৃথা কর্ত্তৃত্বাভিমান বিদূরিত হইয়া "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই নির্ম্মল জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। অর্জ্জুন বুঝিয়াছিলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্ত মায়ার খেলা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সমস্তই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামও ভগবানের সংসারময়ী মায়ারই প্রকাশ। ভগবান্ই জীবের হৃদয়গুহায় বিরাজ করিয়া জীবকে কর্ম্ম-ময় সংসার-পথে চালিত করেন। জীব যদি একান্ত ভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া স্বীয় কর্ম্মফল তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারে, তবে জীবকে তিনি প্রজ্ঞা-চক্ষুঃ দান করেন। সেই দিব্য-নেত্রের সাহায্যে বিশ্বের অন্তরবিহারী বিশ্বম্ভরের যথার্থ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানী জীব ভগবৎ-সত্তার মধ্যে স্বীয় সত্তাকে নিমজ্জিত করিয়া দুঃখময় সংসার-বারিধির পরপারে চলিয়া যাইতে পারে। ইহাই জীব-জীবনের চরম ঋদ্ধি। এই ঋদ্ধি লাভ করিতে হইলে জীবনের সর্ব্বকার্য্যের মধ্যেই, সেই কার্য্য যতই কঠোর হউক না কেন, ভগবৎপ্রেরণা অনুভব করিয়া "যাহার ইচ্ছায় আমি এই কার্য্য করিতেছি, আমার কার্য্য দ্বারা তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক"—এইরূপে স্বীয় সত্তা, কর্ত্তৃত্ব ও ব্যক্তিত্বকে পিছনে রাখিয়া ভগবৎসত্তা ও ভগবৎ-প্রীতিকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে ভগবানের অনুগ্রহে জীবনের মহাকুরুক্ষেত্রে বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। জীবনযুদ্ধে এই জয়ই প্রকৃত জয়। শ্রীকৃষ্ণশিষ্য অর্জ্জুন এইরূপ বিজয়কামনায়ই "করিষ্যে বচনং তব" বলিয়া কুরুক্ষেত্র-মহাহবে পরিত্যক্ত গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে গুরুবধ ও জ্ঞাতিবধে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী (এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ)



দুই বোন

১

অচলা আর চপলা দুই বোন। খুব ভাব দু'জনের মধ্যে, কিন্তু প্রকৃতিটা পরস্পরের বিপরীত। অচলা দুই বছরের বড়, কিন্তু সে বড় চঞ্চল; কাজেই লোকে ভাবে—সে-ই ছোট। চপলা গম্ভীর; তাই লোকে তাকেই বড় মনে করে। আকৃতিও তাদের বিপরীত। অচলা মাঝারি রকমের লম্বা, খুব ফর্সা, কোঁকড়া চুল। আর চপলা বেশী লম্বা, শ্যামবর্ণা। তবে দু'জনেই সুন্দরী বটে।

এক দিন অচলা একটা ইজিচেয়ারে কাত হ'য়ে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখ ক'রে গাচ্ছিল—

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখী জাগো, সখী জাগো…"

আর চপলা গম্ভীর ভাবে একটা সেলাই নিয়ে ব'সে সেলাই করছিল; সে অচলার মুখের দিকে একবার চেয়ে আবার সেলাইয়ে মন দিল। তার পর কি ভেবে বললো—কে সে পাখী, শুনি?

অচলা গম্ভীর ভাবে বললো—আপাততঃ আমাদের কলেজের ইংলিশের প্রফেসার।

অচলা পড়ে সেকেণ্ড ইয়ারে, আর চপলা পড়ে ফার্ষ্ট ইয়ারে।

চপলা উত্তেজিত স্বরে বললো - দিদি…

অচলা বললো—আমি তো কাছেই রয়েছি, অত জোরে ডাকবার দরকার নেই, আস্তে ব'ললেই শুনতে পাব। তোমার বক্তব্যটা কি বলো, শুনা যাক্।

চপলা বললো—এবার আবার প্রফেসারকে নিয়ে প'ড়েছ? লঘু-গুরু জ্ঞান নেই তোমার? এত দিন তো ছাত্রদের দলে মিশে তাদের মুণ্ড ঘুরিয়েছ, এখন আবার প্রফেসারকে নিয়ে প'ড়লে?

—কেন, তাঁর উপর এত দরদ?—বলে চোখ অর্দ্ধ-নিমীলিত ক'রে গানের সুরে ব'ললো—'দিল দর্দ্দ ভরে দিলকি…'

চপলা সেলাই ছুড়ে ফেলে ক্রোধে মুখ আরক্ত ক'রে বলে উঠ্লো—তুমি না আমার দিদি?

অচলা তখনই ইজিচেয়ারে সোজা হ'য়ে বসে, মুখ গম্ভীর ক'রে বললো—তাই না কি? আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি তোমার দিদি!

চপলা জোরে জোরে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাদের মা হঠাৎ দুয়ারে এসে দাঁড়াতেই চপলা বাধা পেয়ে থমকিয়ে দাঁড়ালো। মা চপলার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কি আবার হ'ল তোদের?

চপলা অবজ্ঞাভরে অচলার দিকে চেয়ে বললো—দেখ মা, দিদি নিজের মর্য্যাদা রাখতে জানে না। আমাকে যা-না-তাই ব'লে ঠাট্টা ক'রছে।

অচলা মার দিকে চেয়ে বললো—না মা, আমি শুধু একটা গান গেয়েছি, তাতেই তোমার আদরের মেয়ে একেবারে গলে' গেলেন। এই যে এই রকম—ব'লে গুন্ গুন্ ক'রে গাইলো—

"মানিনী, মান ক'রেছে…"

চপলা আর অপেক্ষা না ক'রে দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে চলে গেল। মাও একটু হেসে প্রস্থান ক'রলেন। অচলা আবার ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লো, তার পর মৃদু হাসলো।

আজ রবিবার…

এমন সময় তাদের কলেজের একটি ছাত্রী লীলা এলো। সে ডাকলো—অচলা-দি'।

—এই যে—তোমার আশায় বসেছিলাম কাল-গুণে।

মেয়েটিও যোগ দিলো—দেখা পেলাম ফাল্গুনে!

দু'জনেই খিল-খিল ক'রে হেসে উঠলো। তাদের হাসি শুনে চপলাও ফিরে এলো।

সে বললো—এই যে মিলেছেন দু'টিতে।

লীলা বললো—'কচ ও দেবযানীতে' তোমায় কিন্তু দেবযানীর পার্ট নিতে হবে অচলা-দি'।

অচলা সজোরে মাথা নেড়ে বললো—না ; তার চেয়ে ওকে দাও দেবযানীর পার্ট, ও ভাল পারবে।—ব'লে চপলার দিকে ইঙ্গিত করলো। আবার বললো—আমাকে বরং চড়াই পাখীর লড়াই আবৃত্তি করতে দিও, সুন্দর হাত-পা নেড়ে আবৃত্তি ক'রে আসবো।

শীলা হেসে উঠলো, অচলাও যোগ দিলো। চপলাও হাসি চাপতে পারলো না, সে-ও হাসলো।

অচলাদের বাড়ীতে একটা জল্‌সা হবে। তাদের কলেজের মেয়েরাও এতে যোগ দেবে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হবেন—তারই আয়োজন চ'লছে। কে কি আবৃত্তি করবে, কে কি গান করবে, সে সকল এখনও ঠিক হয়নি। শীলাই পরিচালিকা, সে এ-সব বিষয়ে খুব 'এক্সপার্ট।' আজ রবিবার ; আজই সব ঠিক ক'রে ফেলবে, তাই সে এসেছে। শীলা বললো—না, অচলাদি' ঠাট্টা নয়, তুমিই দেবযানী হবে।

—না শীলা, আমি গান গাইব। চপলা দেবযানী হ'ক।

শীলা রাজী হলো, বললো—চপল, তুমি দেবযানী হও।

চপলা খুব সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে, আর অচলা খুব ভাল গান গাইতে পারে।

চপলা বললো—আচ্ছা।

শীলা বললো—অচলাদি' তুমি কি গান গাইবে ?

—তার এখন কি ? একটা গাইলেই হবে ; এখনও তো এক মাস আছে।

—না না, আজই সব স্থির ক'রে ফেলতে হবে ; তুমি গাইবে—'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়' ; আর 'তিমির অবগুণ্ঠনে'...

অচলা বললো—আচ্ছা। দেবযানী তো স্থির হ'লো, কচ হবে কে ?

শীলা বললো—তাই তো—সমস্যা বটে !

অচলা মুখ টিপে হেসে বললো—মিঃ তিমিরবরণ বসুকে অনুরোধ কোরো, তিনি যদি রাজী হ'ন।

শীলা বললো—কিন্তু তিনি কি রাজী হবেন ? হ'লে কিন্তু বড্ডো ভাল হয়। তিনি আবৃত্তি করেন চমৎকার।

বলা বাহুল্য, এই তিমির বসুই ইংলিসের তরুণ প্রফেসার। চপলা মুখ রাঙা ক'রে বললো—আমি দেবযানীর পার্ট নিচ্ছিনে।

শীলা বিরক্ত হ'য়ে বললো—কি হ'ল আবার তোমার ?

অচলা শীলাকে ইসারা করলে ইঙ্গিত বুঝে শীলা বললো—না অচলাদি', ওকে ঠাট্টা কোরো না। কচ হবে অরুণা ; সে-ও তো খাসা আবৃত্তি করে। আমি যাই, অরুণাকে ব'লে আসি।

শীলা চলে গেলো। চপলা কেতাব খুলে বসলো। অচলা অর্গ্যানে সুরের তরঙ্গ তুলে গাইতে লাগলো,—

'তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি।
কে তুমি মম অঙ্গনে (এসে) দাঁড়ালে একাকী॥'

২

জল্‌সার দিন দেখতে দেখতে এগিয়ে এল। সে-দিন সকাল থেকে অচলা, চপলা আর শীলা বড় হল-ঘরটায় ষ্টেজ বাঁধতে ব্যস্ত। অন্যান্য মেয়েরা এখনও এসে জোটেনি। পরিশ্রমে চপলার কপালে আর নাকের ডগায় ঘাম জমেছে ; অচলার গাল দু'টি আপেলের মতো রাঙা। শীলা শ্রান্ত হ'য়ে চেয়ারে গা ঢেলে দিয়েছে। মা এসে তাগাদা দিয়ে গেলেন স্নান করে নেবার জন্যে। তাই তারা তিন জনেই বাথরুমে ঢুকলো।

অচলা বললো—শীলা, আমার মাথায় সাবান মাখিয়ে দাও।

শীলা তার মাথায় সাবান মাখিয়ে মাথা ধুয়ে দিলো। অচলা শীলার মাথা ধুয়ে দিলো ; চপলার মাথাও ধুয়ে দিল অচলা। তিন জনের কলহাস্যে সমস্ত বাড়ীখানা মুখরিত ; তারা তিন জন একসঙ্গে পাশাপাশি খেতে ব'সলো।

শীলা বললো—এঃ, কতো তরকারী দিয়েছো, ঠাকুর !

অচলা বললো—বেশী ক'রে তরকারী খাও, তাতে চেহারা খোলে ভাল।

চপলা বললো—আমি তো ডিস্ বোঝাই তরকারী খাই, আমার চেহারা ভাল হচ্ছে কি ?

অচলা গম্ভীর ভাবে বললো—বড় হ'লে হবে ; যখন আমার মত বড় হবে, তখন হবে।

চপলা বললো—ইস্, ভারী তো বড় বড় তো মোটে দু' বছরের !

অচলা মাথা নেড়ে বললো—মোটে নয়; দু'বছর আগে এসেছি বলেই তো মা আমাকে তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসে।

চপলা বললো—বাজে কথা! মা আমাকেই বেশী ভালবাসে।

অচলা বললো—জিজ্ঞেসা করো মাকে। 'মা' 'মা' শব্দে চীৎকার আরম্ভ হ'লো। ভীষণ চীৎকার!

মা দৌড়ে এলেন—কি হ'ল রে?

অচলা বললো—মা, তুমি কাকে বেশী ভালবাসো? আমাকে, না চপ্‌লীকে?

মা হেসে বললেন—ও, এই কথা! আমি মনে ক'রেছিলুম, কি না কি ভীষণ কাণ্ড হ'য়েছে!—এই মেয়েগুলোকে নিয়ে আর পারলুম না। যত বয়েস হচ্ছে, ততই যেন কচি খুকি হ'চ্ছেন।

হেসে মা চলে গেলেন। চপলার খাওয়া শেষ হ'য়েছিল, সে উঠে পড়লো।

অচলা রুখে উঠলো—না বোলে উঠলে যে বড়ো? আমরা তোমার চেয়ে বড় নই? এ-সব এটিকেট জানো না? ভদ্রসমাজে চ'লতে গিয়ে তোমাকে নিয়ে বিষম বিপদে পড়তে হবে দেখছি।

অচলা তদুত্তরে কোনও কথা না বলে কেবল দুই হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আন্দোলিত ক'রে চলে গেলো।

শীলা বললো—তুমি ওর সঙ্গে অমন করো কেন বল দেখি?

অচলা হেসে বললো—ও একটুতেই রেগে যায় কি না, তাই ওকে রাগাতে আমার মজা লাগে।

শীলা বললো—তোমরা দু'টিতে আছ খাসা—বন্ধুর মতো। আমার দিদি কিন্তু আমার সঙ্গে কথাই কয় না!

—হ্যাঁ, আমরা দিন-রাত কথা-কাটাকাটি করি, সে মৌখিক; কিন্তু আমাদের দুই বোনে এত ভাব যে, এমন আর বড়-একটা দেখা যায় না। সত্যি!

—সত্যি, তাই তো দেখছি।

তাদেরও খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়েছিল, তারা উঠলো। মিনিট-পনের পরেই দলে-দলে মেয়ে এসে জুটলো। বাইরে মুহুর্মুহু মোটরের হর্ণ শোনা যাচ্ছে, আর তার ভেতর থেকে দলে-দলে মেয়ে বেরিয়ে আসছে। —কলহাস্যে ঘর মুখরিত।

মেয়ে-বাহিনীর ভেতর থেকে একটি মেয়ে ডলি বললো—অচলাদি' খাসা ষ্টেজ বেঁধেছো কিন্তু; লাল সিল্কের পর্দ্দাটা দেওয়াতে আরও চমৎকার দেখাচ্ছে।

অপর এক জন তরুণী চাঁপা বললো—অচলাদি', এই জলসার বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা মেয়েদের পরিশ্রমে, মেয়েদের দায়িত্বে এবং মেয়েদেরই পরিচালনায় গড়ে উঠেছে, পুরুষের হাত এতে একেবারেই নেই।

এ কথার সমর্থনে কমলা মাথা নেড়ে বললো—হ্যাঁ, সবাইকে এইটেই আমরা দেখাব যে, পুরুষের সাহায্য না নিয়ে কেবল মেয়েরাও একটা কিছু গড়ে তুলতে পারে। আর তা সুন্দর হওয়াও অসম্ভব নয়।

ষ্টেজটি খুব সুন্দর ভাবেই সাজান হ'য়েছিল, তাতে বহুমূল্য কার্পেট বিছানো, লাল সিল্কের পর্দ্দা টাঙানো। একটা সিনে নদীর দৃশ্য চিত্রিত, নদী এঁকে-বেঁকে প্রবাহিত হয়েছে; তার দুই তীরে গাছপালা—অতি সুন্দর দৃশ্যপট!

সন্ধ্যা হ'ল। 'হল'-ঘরটি উজ্জ্বল আলোকমালায় উদ্ভাসিত। অভ্যাগত অতিথিগণ তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে উপবিষ্ট। একটা সুন্দর অর্কেষ্ট্রা বাজছে; লাল পর্দ্দা দু'পাশে সরে গেলো—দেখা গেলো, প্রায় ১৫।১৬টি কিশোরী সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই নীল শাড়ী ও লাল ব্লাউজ-পরিহিতা। একসঙ্গে সকলে করজোড়ে অভিবাদন করলো; তার পর সমস্বরে উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইলো—

'জনগণ-মন-অধিনায়ক হে,
জয় হে…'

গান শেষ হ'লে ড্রপ প'ড়ল; দু' মিনিটের মধ্যেই কিন্তু আবার ড্রপ উঠলো! চপলা ও অরুণা এবার 'কচ ও দেবযানী'র উক্তি আবৃত্তি করবে। চপলা খুব ভাল আবৃত্তি করতে পারলেও, ষ্টেজে দাঁড়িয়ে তার বলবার অভ্যাস ছিলো না; তার বুক কাঁপছিলো, কিন্তু ষ্টেজে দাঁড়িয়ে ভয় ভেঙ্গে গেল। তার পরণে ছিল কালো-পেড়ে খুব ফিন-ফিনে পাতলা হলুদে রঙের সাড়ী; গায়ে ছিল কালো সাটিনের ব্লাউজ, এক গোছা রুক্ষ চুল ডান কাঁধের উপর দিয়ে বুকের

উপর ছড়ানো। অরুণাও একটা গৈরিক কাপড় পরেছিলো, পায়ে তার খড়ম, কোঁকড়া চুলগুলো কাঁধ পর্য্যন্ত লতানো; সত্যই যেন পৌরাণিক যুগের 'কচ ও দেবযানী' যুগ যুগ পরে কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছে। অভিনয়ের শেষে কচ যখন শান্ত-সংযত স্বরে বললো—

আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে
ভুলে যাবে সর্ব্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

তখন অনেকেরই চক্ষু অশ্রুসজল হ'য়েছিলো।

এবার কয়েকটি মেয়ে সাঁওতালী নাচ দেখালো। এলোখোঁপা কাঁধে ঝুলে প'ড়েছে, তাতে গুচ্ছ গুচ্ছ বনফুল গোঁজা, টকটকে লাল জমির ওপর কালো-পাড় শাড়ী একটু উঁচু ক'রে পরা, এরা সংখ্যায় আটটি, এদের রঙও ময়লা। একটি মেয়ে সাঁওতালী পুরুষের বেশে সজ্জিত হ'য়ে বুকে মাদল ঝুলিয়ে সেটা সবেগে বাজাচ্ছিলো, আর মেয়েগুলি তারই তালে তালে নাচছিলো। এদের চেহারা ও নাচ দেখে সত্য সত্যই সাঁওতালী মেয়েদের নাচ বলেই ভ্রম হচ্ছিলো। সর্ব্বশেষে অচলার দু'টি গান হ'ল।

মোটের উপর জল্‌সাটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিলো,—যদিও খুব উচ্চাঙ্গের নয়, তবু নিখুঁত বটে, অর্থাৎ যার যতটুকু সামর্থ্য, সে ততটুকু প্রয়োগ ক'রতে ত্রুটি করেনি।

অচলা লঘুপদে এসে হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললো; কেউ চ'লে যাবেন না এখনই, একটু জলযোগ ক'রে যাবেন। নিমন্ত্রিত অতিথিরা চার-পাঁচ জন একত্র হ'য়ে এক-একটি দল গঠন ক'রেছিলেন, কিন্তু তিমির একাই ব'সেছিলো। সে সুপুরুষ এবং বয়সে তরুণ। অচলা তার কাছে গিয়ে বললো,—একা বসে আছেন? আচ্ছা, সঙ্গী জুটিয়ে দিচ্ছি। চপলাকে চেনেন—আমার বোন?

—নিশ্চয়, তাঁকে আবার চিনি না?

—তাকে কেমন দেখলেন?

—Very nice girl! I like her.

—পছন্দ হয় বউ হিসেবে?

—এই তো মুস্কিলে ফেল্লেন! ও মতলবও আছে নাকি?

—পছন্দ হ'লে ঘটকালি করি।

—তা করতে পার।

অচলা আনন্দের আতিশয্যে তার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বললো—থ্যাঙ্ক উ। You are great—তখনই জিভ কামড়িয়ে বললো,—ক্ষমা করবেন, গুরুমশায়! দু'হাত জোড় ক'রে সে নমস্কার ক'রলো।

একটু থেমে বললো—আপনার নাম ক'রলেই কিন্তু চপল আরক্ত হ'য়ে ওঠে।

—রাগে—না অনুরাগে?

—দুই-ই।

—তাই নাকি?—ব'লে তিমির হাসলো।

অচলা বললো—দেখুন, একটা মজা করি।

—কি প্রকার?

—আপনি ওকে না চেনার ভাণ করবেন, দেখবেন, ও কি রকম রেগে যায়।

—বেচারাকে কেন শুধু-শুধু রাগাবে?

—বাপ রে! এখনই এত দরদ!

চপলা পার্টিতে বড় বেশী যায় না, কাজেই লোকের সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা ক'রতে পারে না। কোথাও যেতে হবে শুনলেই সে আপত্তি করে, বলে—আমার পড়া আছে, আমি যেতে পারবো না। সে একা অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরছিলো; ঘুরতে-ঘুরতে যেখানে অচলা ও তিমির কথা ব'লছিলো, সেইখানে এসে দাঁড়ালো।

অচলা বললো—এ-দিকে স'রে এসো চপল, মিষ্টার বসুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

চপলা এগিয়ে গেলো।

অচলা বললো—এ আমার ছোট বোন—যে আজ দেবযানীর পার্ট নিয়েছিলো।

তিমির বললো—আপনার ছোট বোন? আমি মনে ক'রেছিলুম—বড় বোন বুঝি।

চপলা মনে-মনে ক্রুদ্ধ হ'ল। ক্রোধ দমন ক'রে দু'হাত তুলে নমস্কার করলো। ইচ্ছে ক'রেই তিমির প্রতিনমস্কার করলো না। তা দেখে চাপা ক্রোধে চপলার মুখ লাল হ'য়ে উঠলো—তিমির মনে-মনে কৌতুক বোধ করলো।

অচলা বললো,—কেন, একে কলেজে দেখেননি?

—লক্ষ্য করিনি।

ক্লাশে তাকে লক্ষ্য করেনি শুনে ক্ষোভে-দুঃখে চপলার কান্না পেলো। দিদির দিকে সে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। সে এত নগণ্য যে, তিমিরের চোখেই পড়েনি? অথচ সে রোজই কলেজে যায়, ইংলিসের

পিসিয়তে তিমিরের মুখের দিকে চেয়ে মনোযোগ সহকারে তার লেকচার শোনে।

এমন সময় কে যেন ডাকলো—অচলা···

ঈষৎ রুক্ষস্বরে চপলা বললো—কেন, আমি ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ি। আমার নাম···

—Oh yes, এখন মনে প'ড়েছে বটে! মনে হচ্ছে, আপনি ইয়ে—চপলা ঘোষ। কেমন?

—হ্যাঁ।

—আপনার দিদি কিন্তু ওয়ানডারফুল!

এটা চপলা সানন্দেই স্বীকার ক'রলো—কথাটা সত্যি।

—তিনি যে দু'খানা গান গাইলেন, তা অতি চমৎকার! কি মধুর!

চপলা বললো—দিদি খুব ভাল গায়। গলা ভারী মিষ্টি।

কিন্তু মনে ক্ষোভ হ'ল, তিমির দিদির গানই শুনলো, সে যে এমন নিখুঁত আবৃত্তি করলো, তা তার কেমন লাগলো, সেটা তো একবারও বললো না।—চপলা আর সামলাতে পারলো না, ক্ষোভে-অভিমানে তার চোখে জল এলো।

দেখে তিমির মনে-মনে হেসে বললো—কি হ'ল হঠাৎ?

—কি যেন চোখে প'ড়লো।

—দেখি।—তিমির হাত-বাড়িয়ে চোখটা টেনে ফাঁক ক'রে চোখের ভিতর চেয়ে দেখলো (যদিও এটা অভিনয়), হতাশ ভাবে ব'ললো—কই, কিছু তো দেখছি নে।

ইতিমধ্যে অচলা এসে দাঁড়িয়েছে, সে হাসতে হাসতে বললো, আনাড়ীর কাজ নয়! যাও, ঐ যে ডাক্তার র'য়েছেন, তাঁর কাছে যাও।

চপলার তথাকরণ। ডাক্তার সমীর গুহ তরুণ ডাক্তার; বিলেত থেকে পাশ ক'রে সংপ্রতি দেশে ফিরে এসেছেন। চপলা তাঁর কাছে গিয়ে মিষ্টি হেসে ব'ললো, একা বোসে আছেন?

—তাই তো দেখ্‌চি, তোমার দিদি কোথায়?

মনটা তার দিদির প্রতি বিরূপ ছিল, সে গরম হ'য়ে বললো—ঐ যে দেখছেন না? ঐখানে ব'সে গল্প জমিয়েছে তিমির বোসের সঙ্গে। আপনারা সবাই যদি দিদিকেই চান, ও-বেচারা কাকে খুসী ক'রবে বলুন তো?

ডাক্তার গুহ মনে-মনে আমোদ অনুভব করলেন। তিনি এ-বাড়ীর বন্ধু, বিলেত যাবার আগে থেকে এ-বাড়ীর সকলেরই সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল; হয় তো এত দিন অচলার সঙ্গে তাঁর একটা মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হ'ত; কেবল অচলার আপত্তিতেই তা ঘটে ওঠেনি।

ডাক্তার গুহ চপলার স্বভাব জানিতেন; এ জন্য তিনি তাকে বললেন—আমি তোমার দিদির প্রত্যাশায় কখন্ থেকে বসে আছি, অথচ তিনি একবারও এ-দিকে পদার্পণ করা তো দূরের কথা, কটাক্ষপাতও ক'রলেন না!

চপলা বললো—দিদিটা ঐ-রকমই উড়নচণ্ডী মেয়ে! দাঁড়ান, আমি ওর মন আপনার দিকে কি ক'রে ফেরাই—দেখুন।

—মন ফেরাতে পার তো খুব ভালই হয়; কিন্তু আমাকে যে দাঁড়িয়ে থাকতে আদেশ ক'রলে, সে আদেশ বাতিল করো। এতক্ষণ ব'সেছিলুম, সেটা বরং সহ্য হচ্ছিল, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা—ওটা বাল্যকালের স্কুলের শাস্তির কথা—

চপলা বাধা দিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললো—আপনাদের নিয়ে আর পারা যায় না, সিরিয়াস কথা নিয়েও ঠাট্টা!

ডাক্তার গুহ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; মাথা চুলকিয়ে ব'সে পড়ে—ভাল ছেলের মতো বললেন—আর ক'রবো না।

চপলা চললো দিদির কাছে। শীলা ডাক্‌লো—চপল, তোরা দু'বোনে একবার তিমির বোসের কাছে আর একবার ডাক্তার গুহর কাছে ঘুর-ঘুর ক'রে বেড়াচ্ছিস কেন বল দেখি?

চপলা বল্‌লো—কেন আবার? ওঁরা একা আছেন কি না, তাই।

শীলা ও আর তিনটি মেয়ে তাস খেলছিলো। শীলা বল্‌লো—তাস খেলবি? আয়।

—না, আমি তাস খেলতে জানি নে।

—জানো তুমি কচু, বলে শীলা খেলায় মনোনিবেশ ক'রলো।

তিমির ও অচলা কি একটা কথা নিয়ে খুব হাসাহাসি ক'রছিলো।

চপলা গম্ভীর ভাবে বললো—যাও দিদি! ডক্টর গুহ তোমার প্রতীক্ষায় গড়ুর পক্ষীর মতো ব'সে আছেন।

—তাই নাকি?—বলে হাসির লহর তুলে লঘুপদে অচলা গড়ুর পক্ষীর সমীপস্থ হ'ল; অভিনয়ের ভঙ্গীতে করজোড়ে বললো—'বৈদ্যরাজ, আসিয়াছি আমি, দেহ আজ্ঞা, শিরোধার্য্য করিব আদেশ।'

—এত দিনে সুমতি হ'ল? ব্যাপার কি?

—শুভ, চপলের বিয়ের জোগাড় ক'রলুম।

—আচ্ছা, তোমার মা-বাবা থাকতে চপলের বর তুমি স্থির ক'রলে—তস্য হেতু?

—ও-একটা খেয়াল। প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, আমি পছন্দ ক'রে চপলার বর স্থির করবো, তার পর নিজের বিয়ে।

গুহ মিট-মিট ক'রে চেয়ে ব'ললেন—নিজের পছন্দ করা পাত্র বোনকে দিয়ে দেবে কেন?

চোখ পাকিয়ে অচলা বললো—চুপ করো, ডাক্তারের অত হাল্কা হ'তে নেই, ওতে পশার নষ্ট হয়। শেষে কি বিয়ে ক'রে আমাকে অনাহারে মারবে?

গুহ হেসে বললেন—তোমার সঙ্গে কথায় পারবে কে? আচ্ছা···চপল খুব ছেলেমানুষ এবং সরল, নয়?

—হ্যাঁ।—অচলা ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

চাকর এসে অচলাকে খবর দিলো, খাবার জায়গা হ'য়েছে। অচলা সকলকে খাবার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে খেতে বসালো।

উৎসব শেষে যে যার ঘরে ফিরে গেলো, বাড়ীটা হ'য়ে গেল নিঝুম, নিস্তব্ধ।

হল-ঘরটায় সিগারেটের ছাইয়ে পা-বাড়ানো দুষ্কর! বহুমূল্য কার্পেট দলিত—মথিত। একটু সেন্টের গন্ধ মাঝে-মাঝে হাওয়ায় ভেসে আসছে; ফুলদানীতে ফুলের তোড়া নেই, ফুলগুলি মেঝেয় ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত।

অচলা বললো—কোন জিনিষ হবে, এটা ভাবতেই আনন্দ, হ'য়ে গেলেই ফুরিয়ে গেলো। এখন বড্ড বিচ্ছিরি লাগছে।

চপলা বললো—আমার কিন্তু জলসা হবার আগেই হৃৎকম্প হ'য়েছিলো। আমি অত ভীড় সইতে পারিনে। আমার এখন বেশ ভাল লাগছে।

অচলা বললো—তুমি একটি সৃষ্টি-ছাড়া মেয়ে, ভূত, অর্থাৎ পুরুষ হ'লে তোমায় ভুত বলা যেতে পারতো···

চপলা রুখে উঠে বল্‌লো—কি! আমাকে ভুত বলা যেতে পারতো?

—আলবৎ!

তখনই দু'জনে এক বিছানায় শুয়ে প'ড়লো গলা জড়াজড়ি ক'রে।

পরদিন···

চপলা সমস্ত বাড়ীটা তন্নতন্ন করে খুঁজে কোথাও দিদিকে না দেখতে পেয়ে, মার কাছে হাজির হ'ল।

—মা···

—কি রে?—মা সাড়া দিলেন।

—দিদি কোথায় গেছে?

—কি জানি, মোটর নিয়ে তো বেরিয়েছে সেই সকাল বেলায়।

—তোমার আস্কারা পেয়েই তো দিদি অমন বিগড়ে গেছে। কোথায় বেরিয়েছে, তা-ও তুমি জানো না? আশ্চর্য্য!

—এখন থেকে তুই শাসন করিস তাকে।

—আমার কথা যে শোনে না।

এমন সময় মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

—ঐ যে তারা এলো বলে মা চলে গেলেন।

তারা কে কে? অচলা ড্রইং-রুমের পর্দ্দার আড়ালে আত্মগোপন ক'রলো।

অচলার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো,—বাবা, তোমার ছোট-মেয়ের পাত্র স্থির ক'রেছি।

বাবা ব'ললেন—কে সে পাত্র?

—এই যে···তিমির বাবু।

—সত্যি? তিমির, তুমি কি চপলকে বিয়ে করতে রাজী আছ?

হ্যাঁ।—তিমিরের শান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

চপলার মুখ পর্দ্দার আড়ালে রাঙা হ'য়ে গেল··· দিদিটা কি দুষ্টু!···

এমন সময় আর একটা মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। বোধ হয়, ডাক্তার গুহ এসেছেন।

বাবার কণ্ঠস্বর—সমীর, এবার আর কোন বাধা নেই। এত দিন কেবল অচলা-মায়ের আপত্তি ছিল। জান বোধ হয়, তার প্রতিজ্ঞা।

ডাক্তার গুহ বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অচলা ছুটে ঘরের ভিতর চলে এলো।

অচলাকে দেখে চপলা বললো—দিদি, তুমি কি দুষ্টু!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অচলা বল্‌লো—বোনের জন্য এত করলুম, তবুও বলে কি না দুষ্টু! হায় রে কলিকাল!

তখন সমীর আর তিমির দু'জনেই চলে গেলো।

চপলা অন্যমনস্ক হ'য়ে গুন্ গুন্ ক'রে গাইতে লাগলো—

'—তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি
কে তুমি কে তুমি মম অঙ্গনে
দাঁড়ালে একাকী…'

অচলা আড়চোখে তার দিকে চেয়ে বল্‌লো—বিয়ে হবার আগেই আজকাল মেয়েরা স্বামীর নাম জপ করে। সুরে ধরলো—

'—চপলা চপল হ'ল কিসের পরশ পেয়ে?'

চপলা ক্রোধের ভাণ ক'রে চেঁচিয়ে বল্‌লো—দিদি!

অচলা বল্‌লো—উঁ—উঁ—!

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী।

অনিত্য

এক দিন অতীত স্বপনে,
ধ্বংসেরে করিনি ভয় ভেবেছি যতনে,

'যেটুকু গড়িব আমি
সেই সত্য হবে,
দুনিয়ার ঝড়-ঝঞ্ঝা যবে
উন্মত্ত প্রলয় নৃত্যে
জাগাইবে ভবে—
একমাত্র বিনাশের সুর
আমার রচনাটুকু তারি হ'তে
থাকি বহু দূর
চির সত্য রবে।'

কিন্তু আজ জীবনের শেষপ্রান্তে নামি,
অস্থির চঞ্চল চিত্তে
ফিরিতেছি আমি।
কাঁপিতেছে শুধু মোর
ভীরু হিয়াখানি
কোথা যেন বাজিয়াছে
ভুল-করা বাণী।
এ কখনও সত্য নয়, সত্য নয় মোর
এ আমার ভুলে-গড়া—
স্বপনের ঘোর।

দুনিয়ার সব যদি কাল-স্রোতে ঝরে
আমার রচনাটুকু কোন্ শক্তিভরে
দাঁড়াইয়া চিরদিন অকম্পিত স্বরে
ক'য়ে যাবে—"মোর বাণী
সত্য চির তরে?"

সব ভুল, সব মিছে
এতোটুকু সত্য কোথা নাই
ধরার ধূলির পরে
চিরদিন নাই কারো ঠাঁই।
ধরণীর সব যবে
মুছে যাবে ধীরে—
অতি ধীরে
আমারও রচনাটুকু
তারি সনে
যাবে নত-শিরে—
বিশ্বগ্রাসী অতীতের পানে
বিদায়ের সম্ভাষণ তার
উঠিবে না আর
কারো ছন্দে-গানে।

শ্রীমতী নেলী তালুকদার।



খাইবার গিরিপথ ও ল্যাণ্ডিকোটাল



(ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)

শ্রীনগরের পথে ক'দিনের জন্য পেশোয়ারে থেমেছিলাম; আগ্রায় গিয়ে 'তাজমহল' না দেখে, আর পেশোয়ারে গিয়ে 'খাইবার' না দেখে দেশে ফিরলে ভ্রমণটা ব্যর্থ ব'লেই মনে হয়।

তখন মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি; তখনও পেশোয়ারে আমাদের ক'লকাতার পৌষ মাসের মত প্রচণ্ড শীত; এমনই কন্‌কনে একটি শীতের প্রভাতে আমরা দুই বন্ধু পেশোয়ার-ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে গিয়ে ল্যাণ্ডিকোটালগামী 'ফ্রন্টিয়ার মেলে' চাপ্‌লাম। আর একটি নব পরিচিত বাঙালী যুবক কোন কাজে পেশোয়ারে গিয়েছিলেন; তাঁকেও আমাদের ভ্রমণের সঙ্গী পাওয়া গেল। সমগ্র ট্রেণখানিতে আর চতুর্থ বাঙালীর মুখ দেখা গেল না।

সে-দিন বুধবার। বারের কথা উল্লেখের প্রয়োজন, কারণ, এ-ট্রেণ প্রতিদিন ছাড়ে না; সপ্তাহে মাত্র চার দিন,—মঙ্গল, বুধ, শুক্র, আর শনিবার ছাড়ে। আমাদের ট্রেণ বেলা আটটার সময় ছেড়ে, মুক্ত প্রান্তর ভেদ ক'রে ধাবিত হ'ল। মাঝে-মাঝে কোথাও সৈন্যরা কুচকাওয়াজ ক'র্‌ছে, কোথাও বা বন্দুকের সাহায্যে লক্ষ্য-ভেদ অভ্যাস ক'র্‌ছে।

প্রায় মিনিট-পনের পরে রেল-লাইনের অদূরেই 'ইস্‌লামিয়া কলেজ' দৃষ্টিগোচর হ'ল। সুবিস্তীর্ণ আঙ্গিনার উপর কলেজের মিনার-শোভিত অমল ধবল অট্টালিকাটি যেন আভিজাত্যের গর্ব্বে স্ফীত। সীমান্তে এই কলেজটির অসামান্য খ্যাতি; সমগ্র সীমান্ত প্রদেশের অভিজাতবংশের ছেলেরা এই কলেজের ছাত্র। কলেজ-সংলগ্ন উদ্যান ও একটি ছাত্রাবাস আছে। এই ছাত্রাবাসে কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি বহু দূরদেশাগত ছাত্রেরাও অবস্থান করে। এই কলেজের এক জন অধ্যাপক বাঙালী মুসলমান, এ কথা শুনে একটু আনন্দ হ'ল; ধর্ম্মের দিক দিয়ে নয়, —জাতির দিক দিয়ে। কিন্তু আজ বাঙলার অনেক পুঁই-চচ্চড়িভোজী মুসলমান আপনাদিগকে বাঙালী ব'লে স্বীকার ক'র্‌তে লজ্জিত, যেন আরব তুরস্কই তাঁদের—হোম্—হোম্—'সুইট হোম!'

ইস্‌লামিয়া কলেজ অতিক্রম ক'রবার প্রায় কুড়ি মিনিট পরে আমাদের ট্রেণ জাম্‌রুদ্ ষ্টেশনে এসে থামলো। গাড়ীতে ব'সেই অদূরে দেখা গেল জাম্‌রুদ্ দুর্গ—সুদৃঢ় ও



জাম্‌রুদ্ দুর্গ

সুগঠিত। এই দুর্গের সঙ্গে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের বীর সেনাপতি হরিসিং নালিয়ার স্মৃতি বিজড়িত। জামরুদকে বলা হয় খাইবার গিরিসঙ্কটের প্রবেশ-মুখ।



জাম্‌রুদ্ ষ্টেশনে খাইবার রেল—প্লাটফরমে সশস্ত্র কৌতূহলী আফ্রিদি

জামরুদের পর থেকেই "No man's land" লা-ওয়ারিস (অশাসিত) দেশের সীমা। এ অঞ্চলে সভা ক'রে ইংরেজের আইন-অমান্য আন্দোলন চালাবার প্রয়োজন হয় না;

কারণ, এ-সব অঞ্চলের আফ্রিদি, মাশুদ প্রভৃতি পার্ব্বত্য-জাতি ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত আইনকে মান্য ক'রতে কোন দিন অভ্যস্ত হয়নি। এরা নিজেদের আইন ভিন্ন অপর কারও আইন গ্রাহ্য করে না। "জিরগা"ই এদের হাইকোর্ট, "জিরগা"ই প্রিভি-কাউন্সিল; তা'র বিচারের বিরুদ্ধে আর আপীল চলে না। এরা কা'রও প্রভুত্ব-স্বীকার অথবা দাসত্ব ক'রতে চায় না। এরা নিজেরাই নিজেদের প্রভু; আর বন্দুকই এদের একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু ও চব্বিশ ঘণ্টার সাথী। এই দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য জাতিগুলি সবই মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী; যদিও প্রকৃত মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত অনুশাসনের সঙ্গে এদের বিশেষ কোন পরিচয় আছে কি না সন্দেহ। বেদান্তদর্শনে এদের জ্ঞান অবশ্য কিছুই নেই, কিন্তু আমাদের এই মানবজীবন যে একটা নিছক মায়া-মাত্র, সে বিশ্বাস এদের বিলক্ষণ আছে বলেই মনে হয়; কেন না, এদের কাছে "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য"; অপরের জীবন নষ্ট ক'রতে ও নিজের জীবন উৎসর্গ ক'রতে এরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বা ভীত নয়।

খাইবার রেলপথের ষ্টেশনগুলিতে ট্রেণ অনেকক্ষণ থামে। জামরুদে গাড়ী থামতেই আমরা ষ্টেশনে নেমে প'ড়লাম। পার্ব্বত্য অধিবাসী যতগুলি দেখা গেল, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই হাতে বন্দুক। ট্রেণের দিকে চেয়ে যেন তা'দের কৌতূহলের অন্ত নেই! দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, খাঁটি পুরুষোচিত চেহারা; বিস্তৃত বক্ষ; মাথায় অবিন্যস্ত রুক্ষ বাব্‌রি চুল; গুম্ফশ্মশ্রু লোহিতাভ; গায়ের রঙ অনেক ক্ষেত্রে প্রায় ইংরেজদের মতই ফর্সা; চোখের তারাও যেন বিড়াল-চক্ষুর মত কটা। এদের পরিচ্ছদের বিশেষ আড়ম্বর নেই। একটি ঢিলে পায়জামা, একটি আজানুলম্বিত (পাঞ্জাবীর মত) আলখেল্লা, মাথার বাব্‌রি চুল বেষ্টন ক'রে একটি পাগড়ি, ও পায়ে কাবুলি চপ্পল। সাধারণতঃ এই হ'ল ওদের পরিচ্ছদ। শীতের সময় এই পরিচ্ছদের ওপর একখানা মোটা চাদর ব্যবহার করে। ওরা মেটে অথবা ধূসর রঙের পোষাক পরিধান ক'রে থাকে; কারণ, পার্ব্বত্য অঞ্চলে ঐ রঙের পোষাকে আত্মগোপন করা সহজ। কিন্তু বুলেটের একটি বেল্টও ওদের পরিচ্ছদের একটি অঙ্গ; অথবা ওদের অঙ্গের একটি পরিচ্ছদ বলা চলে। আর বন্দুক একটি অপরিহার্য্য বহুমূল্য অলঙ্কার। এ সব বন্দুক আফ্রিদিরা নিজেদের কারখানায় প্রস্তুত করে; এবং বলা বাহুল্য, তা'র জন্য এরা কোন রকম লাইসেন্সের ধার ধারে না। বন্দুকগুলি খুব আধুনিক ধরণের নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা'দের পশ্চাদ্দিকে টোটা ভর্ত্তি ক'রতে হয়; বেশীর ভাগই হেনরি-মার্টিনি টাইপের। কিন্তু এই সব সেকেলে বন্দুকই তাদের কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট। বন্দুকে লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা এদের অসাধারণ বিস্ময়কর! বহু ইংরেজ মিলিটারী অফিসারও ওদের এই শক্তির ভূয়সী প্রশংসা ক'রেছেন।



আফ্রিদিরা কামান ছুড়ছে



আফ্রিদি পল্লী

খাইবার রেলপথের প্রায় পাশে তার সমান্তরাল একটি রাজপথ বর্ত্তমান। এই পথ দিয়ে মাঝে-মাঝে

মোটর-বাস ধাবিত হচ্ছে—ল্যাণ্ডিখানা ছাড়িয়ে সোজা কাবুল অভিমুখে। অবশ্য, জাম্‌রুদ্ অতিক্রম করবার পূর্ব্বে স্থানীয় আফিসে বাস-আরোহীদের নাম, ধাম প্রভৃতি লিখিয়ে দিতে হয়।

ট্রেণের আরোহীদের অবশ্য ও-হাঙ্গামা ছিল না; বিশেষতঃ সম্প্রতি ভারতীয় পর্য্যটকদের পক্ষে জাম্‌রুদ্ অতিক্রম করা সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হ'য়েছে। খাইবার গিরিপথে এই রেলপথ ও মোটর-পথ ছাড়াও ঐ দু'টি



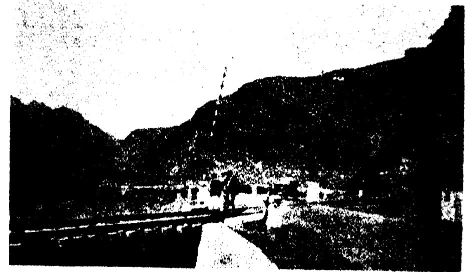
আফগান্ বণিকরা আফগানিস্থান থেকে মেওয়া প্রভৃতি পণ্য বোঝাই দিয়ে অনেক উট নিয়ে আসছে

পথের ওপর দিয়ে তৃতীয় পথ আছে; সেই পথ দিয়ে আফগান সার্থবাহরা উট ও অশ্বতরের পিঠে মেওয়া, গালিচা, চামড়া প্রভৃতি পণ্য বোঝাই দিয়ে সপ্তাহে এখনও দু'দিন কাবুল থেকে পেশোয়ারের বাজারে তা' বিক্রয় করতে আনে।

ষ্টেশনে ট্রেণের ঘণ্টা প'ড়তেই গাড়ীতে উঠে বসা গেল। আমাদের সঙ্গে উঠল আরও ক'জন বন্দুকধারী বিশালকায় আফ্রিদি। সশঙ্ক ও সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তা'দের ওপর একটু নজর রাখতে হ'ল। তা'রা কিন্তু আমাদের ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে দুর্ব্বোধ্য পুস্তু ভাষায় নিজেদের মধ্যে আলাপ আরম্ভ ক'রলে। পরে শুনেছি, এরা রেল-কর্ত্তৃপক্ষের নিযুক্ত আফ্রিদি খাসাদার; বিদেশী আরোহী-দের সঙ্গে রেলের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত রক্ষী হিসাবে যাওয়ার জন্যই এদের এই ভাবে আবির্ভাব।

ট্রেণ চ'লেছে কখনও ধীরে, কখনও দ্রুতবেগে, কখনও সোজা, কখনও বিসর্পিত গতিতে এঁকে-বেঁকে—হয় ত' কোন গিরি-অঙ্গ পরিবেষ্টন করে। আমরা মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে দেখ্‌ছি,—কখনও গাড়ী পাহাড়ের গা বয়ে চড়াইএ উঠছে, আবার কখনও ব্রেক-ক'ষে ধীরে ধীরে নেমে আসছে। দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলে যাঁরা ভ্রমণ ক'রেছেন, 'লুপ' (Loop) ও 'রিভার্শে'র (Reverse) সঙ্গে তাঁদের নিশ্চয়ই পরিচয় আছে। সেই রকম বহু 'লুপ' ও 'রিভার্শ' খাইবার রেলপথেও বর্ত্তমান। উপরন্তু, পাহাড় ভেদ ক'রে ট্রেণকে আঁকা-বাঁকা অসমতল পার্ব্বত্য পথ দিয়ে নিয়ে যেতে হ'য়েছে—৩৪টি টানেল ভেদ ক'রে! এই সব কারণে খাইবার-রেলপথ পূর্ত্তবিজ্ঞানের গৌরবের নিদর্শন। রেলপথ নির্ম্মাণের পর থেকে এই গিরিপথে এক স্থান হ'তে স্থানান্তরে দ্রুত সৈন্য প্রেরণ করা অত্যন্ত সহজসাধ্য হ'য়েছে। জাম্‌রুদ্ থেকে ল্যাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত সাড়ে ২৬ মাইল দীর্ঘ এই খাইবার-রেলপথ নির্ম্মাণ ক'রতে ব্যয় হ'য়েছিল – দুই কোটি একাত্তর লক্ষ টাকা! আর এজন্য সময় লেগেছিল পাঁচ বৎসরেরও অধিক। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর এই পথ উন্মুক্ত হয়।

জাম্‌রুদ্ থেকে প্রায় দশ মাইল গিয়ে পাওয়া গেল "আলি মস্‌জেদ"। অদূরবর্ত্তী একটি বৈশিষ্ট্যহীন নাতি-বৃহৎ মস্‌জেদের নাম থেকেই স্থানটির এই নামকরণ।



খাইবার রেলপথ ও মোটর-পথের একটি সংযোগস্থল—দক্ষিণের টানেলটি দ্রষ্টব্য

মাল-বহনের জন্য আলি মস্‌জেদ গ্রামের মধ্যে একটি রজ্জু-পথ আছে। অদূরে আলি মস্‌জেদ দুর্গ। খাইবার গিরিবর্ত্মের ইতিহাসের সঙ্গে আলি মস্‌জেদ দুর্গের নাম

অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। এই দুর্গ আশ্রয় ক'রেই দুর্দ্ধর্ষ আফ্রিদিরা বহুবার ইংরেজদের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা ক'রেছিল। অবশেষে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের আমীরের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধির ফলে গিরিপথটি ইংরেজদের হস্তগত হয়। সেই



আলি মস্‌জেদ দুর্গ ও ছাউনি

সন্ধির সর্ত্তানুসারে গিরিপথ বন্ধ ও উন্মুক্ত রাখবার জন্যে এক জন পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিযুক্ত করা হয়। অবশ্য ঐ অরাজক দেশে এই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য পলিটিক্যাল এজেণ্টকে ঐ আফ্রিদিদেরই আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছে। খাইবার অঞ্চলের প্রত্যেক আফ্রিদি-গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিই বেতনভোগী মালিক নিযুক্ত হয়। সেই মালিক মারফৎ বর্ষে-বর্ষে [illegible] মধ্যে বহু অর্থ বণ্টন ক'রে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ফলতঃ, তা'রা গিরিপথ ও রেল-লাইন রক্ষণাবেক্ষণে মালিকের সহযোগিতা করে। এইরূপে ভারত সরকারকে বর্ত্তমানে বার্ষিক তিন লক্ষাধিক টাকা কেবল বণ্টনের জন্য ব্যয় ক'রতে হয়, ও মালিকদেরও প্রত্যেককে পাঁচশ' থেকে প্রায় এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন দিতে হয়। প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারকে এই অর্থের বিনিময়ে যা'দের সহযোগিতা লাভ ক'রতে হয়, তা'রা কি ধাতুতে নির্ম্মিত, তার আলোচনা বাহুল্যমাত্র।

আলি মস্‌জেদ পশ্চাতে রেখে আরও কিছু পরে লাইনের ধারে দেখা গেল—সাঘাই দুর্গ। খাইবার রেলপথের ষ্টেশনগুলিও দুর্গাকৃতি। লাইনের ধারে পর্ব্বতের মাথায়-মাথায় চৌকী-ঘর (picket)। সেই ঘরে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে। এ পথে বরাবরই এ রকম বহু চৌকী-ঘর আছে। দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য প্রত্যেক ঘরের ও দুর্গের সঙ্গে টেলিফোনের সংযোগ আছে; এতদ্ভিন্ন, বেতার-বার্ত্তা প্রেরণেরও ব্যবস্থা আছে। এ অঞ্চলের কোথাও শান্তিভঙ্গের সূচনামাত্র সংবাদ সমস্ত পিকেটে ও দুর্গে প্রেরিত হয়।

একটি ষ্টেশনে পাহাড়-প্রমাণ গাঁটরী ঘাড়ে নিয়ে আপাদমস্তক কৃষ্ণবসনাবৃতা কতকগুলি আফ্রিদি রমণী ট্রেণ থেকে নেমে গেল। আমি এ সুযোগ উপেক্ষা না ক'রে তাড়াতাড়ি ট্রেণ থেকে নেমে ক্ষিপ্রহস্তে তা'দের একখানি 'স্ন্যাপ' তুলে নিলাম। পরে শু'নেছি, ও-দেশে ঐ ভাবে পর্দ্দানশীন আফ্রিদি মেয়েদের ফটো-তোলা আমাদের পক্ষে খুব দুঃসাহসের কাজ হ'য়েছিল; সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কোন বিপদে প'ড়তে হয়নি।



আলি মস্‌জেদ দুর্গ ও রজ্জুপথ

অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত-গাত্রে গুহার মত যে সকল গহ্বর দেখা যাচ্ছিল, বিবাদ-বিসম্বাদ বা যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় প্রয়োজন বোধ ক'রলে আফ্রিদিরা সেই সব গুহায়

আশ্রয় গ্রহণ করে। ঘরে ঘরে কলহ-বিবাদ, এমন কি, হত্যাকাণ্ড এদের প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা। দুই বংশের, কখনও বা দুই গ্রামের মধ্যে এমন প্রচণ্ড শত্রুতা থাকে যে, এক দলের লোকের সঙ্গে অপর দলের লোকের দৈবাৎ সাক্ষাৎ হ'লেই খুনোখুনি সুনিশ্চিত! অথচ এই রকম বংশগত বা দলগত শত্রুতার আদি কারণ সম্বন্ধে হয় ত উভয় পক্ষের কারও কোন ধারণাই নেই; কিন্তু তবু তা'দের বংশানুক্রমিক শত্রুতার অবসান হয় না। এই মনোভাবের কথা চিন্তা ক'রলে, আফ্রিদিদের অহোরাত্র বন্দুক-বহনের কারণ বুঝিতে বিলম্ব হয় না; এই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আফ্রিদিদের বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়। এদের বাড়ীগুলি কেল্লার মত উচ্চ প্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত; তার এক কোণে একটি উচ্চতর বুরুজ। সেই বুরুজের চতুর্দ্দিকে বহু ফুকর। রাত্রিকালে বাড়ীর পুরুষরা পালা ক'রে এই বুরুজের ফুকরের ভিতর দিয়ে চার দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন ক'রে পাহারা দেয়। কোন ব্যক্তির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হ'লে, তৎক্ষণাৎ তা'কে গুলী ক'রতে দ্বিধা বোধ করে না। আফ্রিদিদের এই রকম বহু বাসভবন ও পল্লী আমাদের চোখে প'ড়েছিল। মধ্যপথে এক জায়গায় ট্রেণ থেকেই পর্ব্বত-শৃঙ্গস্থ একটি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ দৃষ্টিগোচর হ'য়েছিল।

ট্রেণ যখন ল্যাণ্ডিকোটালে এসে থামলো, বেলা তখন এগারটা বেজে গেছে। সেই-খানেই আমাদের নামতে হ'ল; কারণ, আরও সাড়ে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী ল্যাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত লাইন থাকলেও, সেখানকার ছাউনি তুলে-দেওয়ায় কয়েক বৎসর থেকে ট্রেণ ল্যাণ্ডিকোটাল পার হ'য়ে যায় না। আমাদের সঙ্গে বেতের একটি নাতিবৃহৎ টিফিন-বাক্স ছিল। আমরা প্ল্যাটফরমে নামতেই একটি আফ্রিদি বালক আচম্বিতে সেখানে এসে বাক্সটি সাগ্রহে তুলে নিলে এবং ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে ব'ললে, সে আমাদের সঙ্গে যেতে চায়! বালকটির মুখে নারীসুলভ কমনীয়তা এবং চাহনীতে সঙ্কোচের ভাব দেখে বিস্মিত হ'লাম। চার দিকে এই রুক্ষ কঠোরতার মধ্যে কুসুমের মত সুকুমার সুদর্শন সেই আফ্রিদি বালকটিকে যেন এক বিস্ময়কর অসঙ্গতি ব'লেই আমাদের মনে হ'য়েছিল।

নিকটেই ল্যাণ্ডিকোটালের বৃহৎ ছাউনি। প্রায় চার-পাঁচ শ' গোরা সৈনিক রাইফেল ঘাড়ে-নিয়ে সেই ছাউনির দিকে মার্চ্চ ক'রে যাচ্ছিল। তাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী ক'জনের সঙ্গে আমরা জুটে গেলাম, এবং তাদেরই অনুরোধে বন্ধু চট্ ক'রে একখানা 'স্ন্যাপ' তুলে নিলেন। তখন তারা আবার হাসিমুখে মার্চ্চ ক'রে ছাউনির মধ্যে প্রবেশ করলে।

তারা অদৃশ্য হ'ল, কিন্তু আমরা ছাউনির মধ্যে যাই কি উপায়ে? ফটকের সম্মুখে কাটখোট্টা চেহারার একটা শিখ রাইফেল নিয়ে যমদূতের মত দাঁড়িয়েছিল; মনে ভয় থাকলেও আমরা বেশ সপ্রতিভ ভাবেই ফটকের দিকে অগ্রসর হ'লাম। আমাদের দেখে শিখটা মিলিটারী কেতায় সশব্দে পা ঠুকে ও হাত তুলে আমাদের লম্বা এক সেলাম দিলে! আমাদের বন্ধুযুগলের শর্ট, কোট, হ্যাটমণ্ডিত সাহেবী পোষাক ও গোরা সৈনিকদের সঙ্গে হাস্যালাপ লক্ষ্য ক'রেই সে আমাদের এতটা খাতিরের যোগ্য ব'লে মনে করলে কি না, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না; তবে তার অন্য কারণ ত কিছুই ছিল না।



ল্যাণ্ডিকোটালের ছাউনি

গেট অতিক্রম ক'রে রাস্তার বাঁ-ধারে সৈনিকদের সমাধিভূমি। এই সুদূর প্রবাসে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ ক'রেছে—এমন বহু ইংরেজ সৈনিকের সমাধি সেখানে বর্ত্তমান।

সম্মুখেই ল্যাণ্ডিকোটাল-ফোর্টের ওপর পত্-পত্ ক'রে 'ইউনিয়ন জ্যাক্' উড়ছে। এই ফোর্টের মধ্যে গোরা ও দেশীয় সৈন্য নিতান্ত কম নেই। খাইবার গিরিপথের ওপর অনেকগুলি ফোর্ট আছে; কিন্তু তাদের মধ্যে প্রধান কেল্লা তিনটি—জামরুদ্ ফোর্ট, আলি মস্জেদ ফোর্ট, আর এই ল্যাণ্ডিকোটাল ফোর্ট। ল্যাণ্ডিকোটালের পর আর ফোর্ট নেই। খাইবার গিরিপথে ল্যাণ্ডিকোটালই উচ্চতম স্থান; সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা তিন হাজার পাঁচ শ' ফিট্। ল্যাণ্ডিকোটাল ফোর্টের সম্মুখে সৈন্যদের ফুটবল খেলার 'গ্রাউণ্ড'। অদূরে একটি সিনেমা-হাউসও বিদ্যমান। এগুলি অতিক্রম্ ক'রে আমরা বাজারে উপস্থিত হ'লাম। এ সমস্তই ছাউনির মধ্যে। বাজারটি বেশ বড়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সৈন্যরাই এ বাজারের প্রধান খরিদ্দার। পেশোয়ার থেকে খুব লঘু প্রাতরাশ-মাত্র সেরে বেরিয়েছিলাম; টিফিন-বাক্সে যৎসামান্য খোরাক যা' আছে, তা' আমাদের মত তিনটি বুভুক্ষু প্রাণীর প্রবল জঠরানলে ইন্ধনের হিসাবে নিতান্তই তুচ্ছ। সুতরাং আফ্রিদি বালকটির পরামর্শে একটি শিখের দোকানে ব'সে ব্যঞ্জন ও ডাল সহযোগে প্রচুর ঘৃত-লিপ্ত গরম গরম রুটী ভোজনে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা গেল।



খাইবার গিরিপথে একটি দুর্গ

এবার আমাদের কয়েক মাইল পদব্রজে যেতে হবে। ছাউনির বাইরে পথে এসে একবার চতুষ্পার্শের পটভূমির দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রইলাম। মাইলের পর মাইল ধ'রে তরুগুল্মহীন রুক্ষ ঘনকৃষ্ণ পর্ব্বতশ্রেণী তরঙ্গাকারে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে; তা'দেরই মধ্যবর্ত্তী এই খাইবার-গিরিসঙ্কট যুগে যুগে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহের নির্ব্বাক্ সাক্ষী। প্রায় দু'হাজার বছর আগে আলেকজান্দার এই গিরিপথে এসেই ভারতবর্ষ আক্রমণ ক'রেছিলেন। তার পর গজনীর মামুদ, চেঙ্গিস্ খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, বাবর, নাদির শা, আহম্মদ শা দুর্‌রাণি, শাজামান দুর্‌রাণি প্রভৃতি কত দিগ্বিজয়ী দস্যু—কেউ ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠনের জন্য, কেউ ভারতে রাজ্যস্থাপনের জন্য এই পথে এসে ভারতের বক্ষে পদাঘাত করেন।

আমরা এ্যাস্‌ফাল্‌টাম্ দেওয়া সুন্দর পথটি ধ'রে নেমে চ'ললাম উৎরাইতে। এটি মোটরের পথ; পথের অনেক নীচে এক পাশ দিয়ে চ'লেছে একটি স্বচ্ছতোয়া ক্ষীণস্রোতা পার্ব্বত্য তটিনী। আরোহিপূর্ণ মোটর-বাস পথ দিয়ে মাঝে-মাঝে কাবুলের দিকে চ'লে যাচ্ছে, আবার ও-দিক থেকে দু'-একখানা আস্‌ছে; শুনলাম, নানা রকম মেওয়া-ভর্ত্তি মোটর-লরী আজকাল কাবুল থেকে ক'লকাতায় একটানা যাতায়াত করে। এক জায়গায় একটুখানি সমতল পার্ব্বত্য ভূমিতে গুটিকতক তৃণ গজিয়েছিল; সেই-খানে চার-পাঁচটি গাভী চ'র্‌ছে, অদূরে একটি ঢিবির ওপর ব'সে এক জন আফ্রিদি গো-পালক কাঁধে বন্দুক নিয়ে (হাতে পাচন-বাড়ি নেই) গরুর খবরদারী ক'র্‌ছে। আমাদের সহগামী আফ্রিদি বালকটির সঙ্গে তা'র দৃষ্টি



খাইবার মোটর-পথ

মিল্‌তেই উভয়ে উভয়কে "তেড়ে মাশু" ব'লে সম্ভাষণ করলে।

বালকটিকে প্রশ্ন ক'রে জানলাম, ওটা ওদের সুপ্রভাত-জ্ঞাপনের ভাষা। এর পর পথে যতবার আমাদের সঙ্গে কোন আফ্রিদির সাক্ষাৎ হ'য়েছে, আমরা তা'কে "তেড়ে মাশু" ব'লে সহাস্যে সম্বোধন করেছি, আর তারাও প্রথম বিস্ময়ের চমক কাটতেই "তেড়ে মাশু" ব'লে আমাদের প্রতি-সম্ভাষণ জানিয়েছে। তার পর বালকটির মুখে তারা শুন্‌লে আমরা বিদেশী পর্য্যটক, তা'দের দেশ দেখতে এসেছি; তখন তা'দের সে কি প্রাণ-খোলা উচ্চ হাসি! ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও তা'দের কেবল সেই শিশুসুলভ সরল হাসি দিয়েই তা'রা আমাদের বন্ধুর মর্য্যাদা দান ক'রলে। বস্তুতঃ, আফ্রিদিদের ক্রুর পাশব চরিত্রের বিষয় যে সব গল্প আমরা অনেক সময় শুনে থাকি, তা'র অধিকাংশই অতিরঞ্জিত। তবে এটা সত্য যে, আমাদের জীবনধারণের নীতির সঙ্গে ওদের নীতির আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আফ্রিদিরা কাম্বার-খেল, কামরাই, কুকিখেল, মালিক-দিন-খেল, সিপা ও জাক্কা-খেল এই ছ'টি প্রধান উপজাতিতে বিভক্ত। আফ্রিদিদের একটি দুর্লভ গুণ আছে, যা' তথাকথিত অনেক সভ্য জাতিরও নেই। কলহ-বিবাদে যদিও ওরা শতখণ্ডিত, বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুঝবার সময়ে কিন্তু ব্যক্তিগত, বংশগত, বা দলগত বিবাদ বিস্মৃত হ'য়ে এক-হওয়া ওদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়। আফ্রিদিদের আর একটি গুণ, তা'দের ওপর বিশ্বাস ন্যস্ত করলে, তা'রাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণপণে সে বিশ্বাস রক্ষা করে। তা'দের সঙ্গে ভাল আচরণ ক'রলে, তা'রাও হৃদ্যতা জানায়। খাইবার-গিরিসঙ্কটের ভূতপূর্ব্ব পলিটিক্যাল এজেণ্ট কর্ণেল ওয়ারবার্টন বহু বৎসর আফ্রিদিদের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে থেকে তাদের চরিত্র অধ্যয়ন ক'রেছিলেন। তিনি তাদের সম্বন্ধে লিখেছেন,—

"The Khyberee lad from his earliest childhood is taught by the circumstances of his existence and life, to distrust all mankind and very often his near relations, heirs to his small plot of land, by way of inheritence are his deadliest enemies. Distrust of all mankind and readiness to strike the first blow for the safety of his own life have therefore become the maxims of the life. If you can overcome this distrust and be kind in words to him, he will repay you by great devotion."—আফ্রিদি-চরিত্রের পরিস্ফুট চিত্র!

আমরা হাস্য-পরিহাস ক'রতে ক'রতে যাচ্ছিলাম বটে, এটা কিন্তু লক্ষ্য ক'রতে ভুলিনি যে, পথিপার্শ্বের পর্ব্বত-গাত্রের উপরস্থ চৌকীঘর থেকে আমাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছিল। তা হোক্, তবু মাথার ওপর সুনীল স্ফটিক-স্বচ্ছ আকাশ, বহু নীচে ধীরস্রোতা উপলব্যহতা তটিনী, আর তার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত-ঘূর্ণিত সঙ্কীর্ণ জনবিরল অপূর্ব্ব রহস্য-মণ্ডিত গিরিপথ দিয়ে আমরা সুদূর ক'লকাতার তিনটি বাঙালীর ছেলে চ'লেছি, এ-কথা চিন্তা ক'রতে ভারী ভাল লাগছিল। রেলের লাইন আর টানেল প্রায়ই মাঝে-মাঝে লক্ষ্য ক'রছি; এক জায়গায় আমাদের পথের অনেক ওপর দিয়ে রেলের লোহার পুল চলে গেছে।



ল্যাণ্ডিকোটালে গোরা সৈন্যের সহিত লেখক (দক্ষিণে); পশ্চাতে পাহাড়ের উপর চৌকীঘর



ল্যাণ্ডিকোটাল থেকে মিছনিকাণ্ডোর পথে; নীচে মোটর-পথ, উপরে লৌহ-সেতুর উপর রেল-লাইন

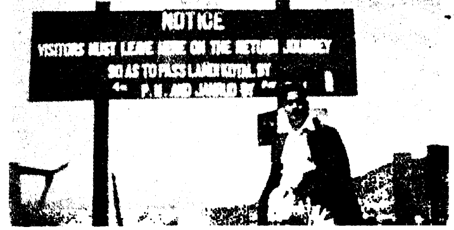
কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করার পর সম্মুখে আর অগ্রসর হওয়া চ'লল না; কারণ, পথের মধ্যস্থলে লৌহফটক রুদ্ধ ক'রে সশস্ত্র আফ্রিদি খাসাদার পাহারা দিচ্ছে। স্থানটির নাম "মিছনিকাণ্ডো"। খাসাদার উর্দ্দু ভাষায় বেশ ভদ্রভাবে আমাদের জানিয়ে দিলে, বিনা-পাশ-পোর্টে কোন ব্যক্তিকে মিছনিকাণ্ডোর ওই লৌহ-ফটক অতিক্রম ক'রে আর অগ্রসর হ'তে দেওয়া হয় না। পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট থেকে যাঁরা পূর্ব্বে অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করেন, কেবল তাঁরাই অনতিদূরবর্ত্তী ব্রিটিশ-ভারতের সীমান্ত "তোরখাম" পর্য্যন্ত যেতে পারেন। পূর্ব্বে এই তোরখামের অনতিদূরে ছিল ল্যাণ্ডিখানার সেনানিবাস। তখন ট্রেণের আরোহীদের বিনা-পাশে শ্যাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত যেতে দেওয়া হ'ত।

বোধ করি, আমাদের আফগান সীমান্ত অদর্শনের নৈরাশ্য উপলব্ধি ক'রেই সেই খাসাদার স্বয়ং আমাদের



মিছনিকাণ্ডো থেকে আফগানিস্থানের আভাস

সঙ্গে ক'রে নিকটস্থ একটি নাতিউচ্চ টিলার ওপর পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল, এবং সেখান থেকে বহু দূর-সীমান্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলে, ঐখানেই ব্রিটিশ-ভারত ও আফগান রাজ্যের সীমানা। দূরে আকাশের গায়ে ধূম্রবর্ণ হিন্দুকুশ পর্ব্বতশ্রেণীও দেখা যাচ্ছিল। নিকটেই একটি পর্ব্বতের ওপর ছিল মহারাজা অশোকের "চারবাগ দুর্গ," সে কথাও খাসাদারের নিকটেই শুনলাম। মিছনিকাণ্ডোর লৌহফটকের নিকট একটি সাইন-পোষ্টে ইংরেজীতে লেখা একটি নির্দ্দেশ দেওয়া



মিছনিকাণ্ডোর সাইনপোষ্টের নীচে লেখক

ছিল,—"পর্য্যটকেরা যেন যথেষ্ট সময় থাকতে এই স্থান ত্যাগ করেন, যা'তে তাঁরা বেলা চারটার মধ্যে ল্যাণ্ডি-কোটাল ও পাঁচটার মধ্যে জামরুদ্ অতিক্রম করতে পারেন।" সুতরাং তখন আড়াইটা বেজে গেছে দেখে আর বৃথা কালহরণ না ক'রে, খাসাদারটিকে ধন্যবাদজ্ঞাপন ক'রে, প্রত্যাবর্ত্তনে মনোনিবেশ করা গেল।

আফ্রিদি বালকটির কষ্ট লাঘব করবার সাধু ইচ্ছা মনে উদিত হ'তেই মধ্যপথে একটি সাঁকোর ওপর নিরিবিলিতে ব'সে ক'জনে মিলে টিফিন-বাক্সটি খালি ক'রে দিলাম। ল্যাণ্ডিকোটালে যখন উপনীত হ'লাম, তা'র বহু পূর্ব্বে ট্রেণ ছেড়ে চ'লে গেছে। সুতরাং ছাউনির মধ্যে গিয়ে বালটিকে কিছু বক্‌শিস্ ক'রে, অগত্যা একটি মোটর-বাসের আরোহী হওয়া গেল। মোটর-পথ ধ'রে বাস ছুটে চ'লল আবার পেশোয়ারে। দেশে ফিরছে ঘর-মুখো বাঙ্গালী!

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়।

স্বকীয়া ও পরকীয়া

নিরুপায় প্রিয়া দিল যেই প্রেম,
সে প্রেমে কোথায় আছে সুখ সেই?
খাঁচায় আবদ্ধ যে পাখী মোর—
খোসামুদে গান সে তো গাইবেই!

পরের প্রিয়ার মুখে কখনো
যদি ভালোবাসা পাই নির্ভীক—
তবেই তা প্রেম বলে জানবো,
ভয়েতে যে বাসে ভালো, তারে ধিক্!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।



ঠাকুর শ্রীনরোত্তম দাস

বৈষ্ণব-চূড়ামণি ঠাকুর শ্রীনরোত্তম দাস রাজসাহী সহরের অদূরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রাম খেতরির রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত, এবং মাতার নাম রাণী নারায়ণী দেবী। ধন, মান, সুখ, বিলাস,—পার্থিব কোন সম্পদই তাঁহাকে সংসারে আসক্ত বা আবদ্ধ করিতে পারে নাই। শৈশবকাল হইতে তিনি সর্ব্বক্ষণই হরিনামশ্রবণে ও হরিগুণ-কীর্ত্তনে বিভোর হইয়া থাকিতেন। সংসারের প্রতি তাঁহার এইরূপ বীতস্পৃহা দেখিয়া তাঁহার পিতামাতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন, এবং পুত্রের মন সংসারে আকৃষ্ট করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল! শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর নরোত্তমের জন্মের পূর্ব্বেই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হরি-নামামৃতে প্লাবিত করিয়াছিলেন; তাঁহার তিরোধানকালে নরোত্তম নিতান্ত শিশু।

নিত্যসিদ্ধ প্রিয় অনুচর নরোত্তমের দ্বারা মহাপ্রভু জীব-শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরে অনেক কার্য্য সাধন করাইবেন, তাহার আভাস তিনি তাঁহার (নরোত্তমের) জন্মের অনেক পূর্ব্বেই ভক্তগণকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পরে নরোত্তমের শৈশবকালেই মহাপ্রভু লীলাসম্বরণ করিলে বালক মহাপ্রভুর শোকে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া দীর্ঘকাল উদ্দাম নৃত্য ও হরিনাম-সংকীর্ত্তন চলিলে তাঁহার চেতনা-সঞ্চার হয়; কিন্তু সংজ্ঞালাভ করিয়াও তিনি 'হা মহাপ্রভু'! 'হা মহাপ্রভু!' বলিয়া বিপুল বিলাপ ও পরিতাপ করেন। শ্রীশ্রীভগবানের বিরহে এই শোক ও ব্যাকুলতাই ভক্ত ও বৈষ্ণবের সকল সাধনার মূল। কি করুণ আক্ষেপ,—

"যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
নদীয়া নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম
মিছামাত্র বহি ফিরি ভার॥"

আবার ভগবদ্বিরহজনিত গভীর বিলাপ,—

"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥"

তরুণ বয়সেই সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া নরোত্তম তাঁহার সাধনার প্রথম মার্গ শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করেন—যে বৃন্দাবনের জন্য তাঁহার হৃদয় হাহাকার করিয়া নিরন্তর আক্ষেপ করিতেছিল,—

"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর নিকট নরোত্তম যাবতীয় ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার প্রেম ও ভক্তি উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি প্রদান করেন। সমস্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থে "ঠাকুর মহাশয়" বলিলে শ্রীশ্রীনরোত্তমকেই বুঝায়।

শ্রীশ্রীভগবানের নিত্যলীলার স্থান—

"বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণিধাম,
রতন-মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী নীরে, রাজহংস কেলি করে,
তাহে শোভে কনক কমল॥
তার মধ্যে হেম-পীঠ, অষ্ট দলে বেষ্টিত,
অষ্ট দলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুই জনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ওরূপ লাবণ্য-রাশি, অমিয় পড়িছে খসি,
হাস্য-পরিহাস-সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
সদাই স্ফুরুক মোর মনে॥"

এমন যে বৃন্দাবন—সে স্থানই চিদানন্দ-চিন্ময় বস্তুর নিত্য-লীলার একমাত্র ক্রীড়াস্থল! তাই তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয় পারিষদ ছয় গোস্বামীকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

"এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলা বাস।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এই লীলা নিত্য এবং অপ্রাকৃত—শ্রীবৃন্দাবনই এই নিত্যলীলার একমাত্র স্থান। শ্রীবৃন্দাবন নিত্য—কারণ, শ্রীশ্রীভগবান্ এবং তাঁহার নিত্য সহচর ও সহচরী—প্রিয় ও প্রেয়সী—সখা ও সখী সেখানে নিত্য বিরাজিত! সেই যমুনা, সেই গোপ-বালক, সেই ধেনু, সেই গোপী, সেই মাধবীলতা, সেই কদম্বতরু, সেই বংশীবট, সেই গোবর্দ্ধন, সেই শুক-সারি—সবই অনন্ত—অনাদি, অক্ষয়। ঠাকুর শ্রীশ্রীনরোত্তমের সাধনার প্রথম অঙ্গ শ্রীবৃন্দাবন বাস, লালসার সহিত সংসারে বীতরাগ এবং শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি।

"হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা!
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন ধামে
এই মনে করিয়াছি আশা।

ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে
একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি
মাধুকরী মাগিয়া খাইব।

ঠাকুর নরোত্তমের শ্রীবৃন্দাবন-বাসের এই তীব্র ব্যাকুলতা তাঁহার সমস্ত প্রার্থনা-সঙ্গীতের ভিতরেই উজ্জল ভাবে বিরাজিত। শ্রীবৃন্দাবনবাস সহজ বস্তু নহে; সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বিলাস, ভোগ ও আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিন্দুমাত্র ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও শ্রীবৃন্দাবন-বাস বা শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ সম্ভব হয় না। তাই তিনি নিজের সাধনাঙ্গের প্রথম স্তরে এই ভাবে প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"করঙ্গ কৌপীন ল'য়া ছেঁড়া কান্থা গায় দিয়া
তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হ'বে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়।"—ইত্যাদি

—কারণ, বৈষ্ণবের প্রাণবল্লভ সাধনার একমাত্র বস্তু শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীমতী রাধিকার পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত, ইহার প্রত্যেকটি স্থান—সকলই তাঁর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—তাঁর প্রিয় স্থান—প্রিয় তরুলতা—পত্র-পুষ্প—বন-কুঞ্জ—বংশীবট—যমুনার তীর—ধীর সমীর—সেই প্রিয়তমের নিত্য প্রিয়বস্তু। ইহাই শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ—শ্রীভগবানের বিরহ-জ্বালা—গোপীভাব—বৈষ্ণবের সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু। ইহাই শ্রীমতী রাধারাণীর বিরহের আগুন—ভাব ও মহাভাব। এই মহাভাবেই তিনি একটি ভ্রমরকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কিম্বা তাঁহার দূতভ্রমে ভগবৎ-প্রেমের মহাভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন—এবং ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে ভ্রমর-গীতা বলিয়া পরিচিত। ভক্তের সাধনা ও আকাঙ্ক্ষা—

শ্রীবৃন্দাবনের তরু গুল্মলতা,
শ্রীকৃষ্ণ নামাঙ্কিত ফল-ফুল-পাতা,
(আমি) সুধাব তা সবে আমার প্রাণকৃষ্ণ কোথা,
ওগো মনোব্যথা করি নিবেদন।
—৺বিশ্বরূপ গোস্বামী।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত দুঃখ সমস্ত বৈষ্ণবজীবনের মূল। কোথায় গেলে তাঁহাকে পাই, কোথায় তাঁহার প্রিয়জন- কোন্ স্থান এবং বস্তু তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, ইহাই বৈষ্ণবের ধ্যানন্ ও মনন্। ইহাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পরের তীব্র আকর্ষণ ও মিলনের আকাঙ্ক্ষা! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু—ভক্ত ব্যতীত তিনি কিছুই জানেন না। তিনি ভক্তের ইচ্ছাধীন, ভক্তই তাঁহার আপন জন—ভক্তের তুষ্টিতেই তাঁহার তুষ্টি। ভক্তকে তুষ্ট না করিলে, ভক্তের কৃপা অর্জ্জন করিতে না পারিলে তাঁহাকে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাই বোধ হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের শরণাগত হইতে বলেন—কারণ, শ্রীমতী রাধিকার পূর্ণশক্তি শ্রীশ্রীনিতাই ব্যতীত শ্রীগোবিন্দকে কে দিতে পারে? তাই পরম ভাগবত ৺বিশ্বরূপ গোস্বামী ভক্ত ও ভগবানের এই সম্বন্ধকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ মুখেই সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজমোহিনী শ্রীমতী রাধারাণীই শ্রীগোবিন্দ-নিত্যলীলার স্থান শ্রীবৃন্দাবনের প্রকৃত মালিক। তিনি ব্যতীত কে উহার সম্যক্ খবর দিতে পারে? শ্রীবৃন্দাবন কেন, শ্রীভগবানকেও একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। তাই মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন পথে যেন জীব-শিক্ষার জন্যই শ্রীনিত্যানন্দের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন—

"আমায় বল নিত্যানন্দ শ্রীপাদ অবধূত।
আর কত দূর আছে বৃন্দাবন।"

আর ঠাকুর মহাশয় গায়িয়াছেন, সেই অপূর্ব্ব অবিনশ্বর সঙ্গীত—যাহা বৈষ্ণবের অতুল সম্পদ—

"নিতাই পদ-কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জীবন জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়।"

শ্রীভগবানকে লাভ করিবার প্রধান অবলম্বন শ্রীনিত্যানন্দ বা ভক্তের শরণাগতি। কেবল শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিলেই হইবে না—সেখানে শ্রীভগবানের অভিন্ন-হৃদয় নিত্যসঙ্গীদের কৃপা অর্জ্জন করিতে হইবে। এই প্রেরণা ও ব্যাকুলতাই শ্রীনরোত্তমকে তন্ময় রাখিয়াছে। একমাত্র প্রেম দ্বারাই শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় এবং শ্রীভগবানের অভিন্ন-হৃদয় ভক্ত নিত্য পারিষদগণই এই প্রেমের একমাত্র অধিকারী।

"গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীনিবাস গঙ্গাধর,
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
শ্রীরূপ দামোদর, হরিদাস বক্রেশ্বর,
এ সব প্রেমের অধিকারী।"
—শ্রীনরোত্তমবিলাস।

আবার—

"স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহা সভার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ
আর কিসে পুরিবেক সাধ।"

ভক্তের কৃপা অর্জ্জন ব্যতীত কিরূপে শ্রীগোবিন্দকে লাভ করা সম্ভব হইবে? ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই তাঁহার সাধনার বস্তু—কারণ, উভয়ের সম্বন্ধ অভিন্ন—অচ্ছেদ্য—যেখানে ভক্ত, সেখানে শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই থাকিবেন—

"তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ॥"

প্রবল বৈরাগ্য—ভোগবিলাসে বিতৃষ্ণা—শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ—শ্রীবৃন্দাবন বাস—শ্রীভগবানকে পাইবার উদ্দেশ্যে ভগবৎভক্তের কৃপা অর্জ্জন—নরোত্তমের সাধনার বিভিন্ন অঙ্গ এবং এক-কথায় বলিতে গেলে এই সবগুলিকেই তাঁহার সাধনার প্রথম স্তর বলা যাইতে পারে।

এখন আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের সাধনার দ্বিতীয় বা চরম অঙ্গের বিষয় আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীবৃন্দাবনবাস এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবা শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় এবং সকল বৈষ্ণবের একমাত্র সাধনা। আবার এই শ্রীবৃন্দাবনবাস এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবার দুইটি স্তর। প্রথমতঃ, এই নশ্বর কায়া ধারণকরতঃ নিষ্ঠা এবং শাস্ত্রানুসারে

শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তন, পূজা, সেবা-বিধির অনুসরণ, এবং শ্রীবৃন্দাবনে নিয়ত বাস। ভক্ত বৈষ্ণব বিশ্বাস করেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা—সেখানেই শ্রীবৃন্দাবন—কারণ, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্য কোথাও বাস করেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগানন্তর নিত্য বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ ও রাধারাণীর প্রকৃতির দেহে নিত্যসেবা। বৈষ্ণব আত্মার মুক্তি বা নির্ব্বাণ কামনা করেন না—স্বর্গ বা মোক্ষধাম তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নহে। শ্রীরাধারমণই একমাত্র পুরুষ—বাকি সমস্ত জীব প্রকৃতি—একমাত্র তিনিই তাহাদের স্বামী। বৈষ্ণবের সকল সাধনার গতি এই দিব্য অবস্থা লাভ করা, এবং ইহাই তাঁহার স্বাভিষ্ট কামনা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই নিকট-সম্বন্ধ—পুরুষ ও প্রকৃতির এই মধুর সম্পর্ক, রাসলীলা, ঝুলনানন্দ এবং নিকুঞ্জ-অভিসারে ব্রজাঙ্গনাদিগকে উপলক্ষ করিয়াই শ্রীভগবান সমস্ত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের চরম অভিলাষ—পুরুষদেহ ছাড়িয়া প্রকৃতিদেহ ধারণ, এবং শ্রীভগবানের নিত্যসেবা—ইহাই তাঁহার সমস্ত সাধনার চরম বা শেষ স্তর।

"হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষদেহ কবে বা প্রকৃতি হব
দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব।
টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নব গুঞ্জাহারে বেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীত বসন অঙ্গে, পরাইব সখীসঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর।"

ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের সমস্ত অভিলাষের সার মর্ম্ম। এই সেবা অনন্ত—নিত্য—অনাদি—অক্ষয়। নিত্য বৃন্দাবনে সেই সেবার অধিকার শ্রীরাধারমণ ও শ্রীমতী রাধিকা ললিতা, বিশাখা, চম্পকাদি নিত্যসেবিকা ও সখীবৃন্দকে দান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের সাধনার চরম সমাপ্তি ও তৃপ্তি এইখানেই।

ব্রজগোপীর সাধনা সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ। শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় এই সাধনার রহস্য ভক্তের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন,—এই সাধনার দ্বারাই সাধক ব্রজগোপীর নিত্য প্রেম ও সেবার অধিকার পাইতে পারেন। সাধনার এই নিগূঢ় তত্ত্ব একমাত্র ব্রজগোপীই জানিতে পারিয়াছিলেন।

"নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণনাতে, আমারে গণিবে তাতে
তবহু পূরিবে অভিলাষ।"

—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

শ্রীপাদ রূপসনাতন প্রভৃতি নশ্বর দেহ পরিহার করিয়া নিত্য-সেবাদাসীর পদ পাইয়াছেন—শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ও তাঁহাদের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষী।

"এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কত দিনে হবে।
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জাকার্য্য করহ ত্বরায়।"

সে সেবা কি রকম? সে সেবার মাধুর্য্য ও তুলনা জাগতিক নশ্বর বস্তুর উপাদানে সম্ভব নহে। যেমন সকলই অবিনশ্বর—নিত্য—অপ্রাকৃত—লীলা—লীলাময়—লীলার স্থান; তেমনি সেবা ও সেবার উপাদান সকলই অপ্রাকৃত বস্তু—মন ও চিন্তার গণ্ডীর বাহিরে। অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা ও ভূষণ একমাত্র বৃন্দাবনের ফুল দ্বারাই সম্ভব। প্রাকৃত জগতের ফুল সে সেবার যোগ্য নহে, কারণ, উহা অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, এবং এই নশ্বর জগতেরই যোগ্য। শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত ফুলের অপূর্ব্ব সুষমা ও সৌরভ নিত্য এবং অবিনশ্বর—নিত্যবৃন্দাবনে নিত্যশ্রীভগবানের পূজার সম্পূর্ণ যোগ্য উপাদান।

"বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥"

রাসলীলায় যেমন মদনমোহন ব্রজাঙ্গনাদিগের সঙ্গে রমণ করিয়াছিলেন—যে রমণে জাগতিক কামের গন্ধ নাই, এবং যাহা কেবল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ আস্বাদনের নিমিত্ত, এবং যে অপ্রাকৃত লীলার মায়া-বিস্তারে সমস্ত ব্রজভূমিকে মুগ্ধ রাখিয়া এক শত আশ্বী কৌমুদী-প্লাবিত রজনীতে বৎসরের সমস্ত ঋতুর সৌন্দর্য্য ও সেবার একত্র সমাবেশের ভিতর যে অদ্ভুত লীলা করিয়াছিলেন, সেই লীলার সুষমা ও উপলব্ধি একমাত্র অবিনশ্বর ব্রজভূমিতেই সম্ভব। যেখানে ৺বিশ্বরূপ গোস্বামীপাদের ভাষায়—

"সুখদ কালিন্দীকূল, ঝঙ্কৃত অলিকুল
কেলি কদম্বমূল দুঁহুরূপে করে আলা।
নাগরী নব সাজে, সাজাও ত নটরাজে
(ঐ) চরণে নূপুর বাজে গলে দোলে বনমালা।"

শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও সাধনার বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য্য এই যে, তিনি নটরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীকে কেবলমাত্র বৃন্দাবনের ফুল ও উপাদানেই সজ্জিত করিতে চাহেন। শ্রীবৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্য—প্রকৃতি—যমুনা—গোপনারী—পল্লবন—চন্দ্রালোক—ফলফুল—সেবার উপাদান এই জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—তাহারা শ্রীগোবিন্দের অনুচর এবং তাঁহার লীলার সহায়ক। আমাদের ক্ষুদ্রত্ব এবং অনিত্যতার সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের সাধনার—যাহা সমস্ত আদর্শ বৈষ্ণবের সাধনা—আর একটি সুন্দর স্তর আছে, ইহা সাধনার সহায়ক একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া ধরিতে হইবে,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

সমস্ত বৈষ্ণবের সাধনার মূল এইখানেই; অভিমান, অহংভাব সম্পূর্ণ নষ্ট করিতে না পারিলে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে।

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় রে।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় রে।"

যে নিতাই—

"যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি রে।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি রে।"
"ওরে আমি হাতে ধরি পায়ে পড়ি
একবার বল গৌরহরি।"—ইত্যাদি

ইহাই ব্রজভাব—ব্রজে অভিমানের স্থান নাই। শ্রীগোবিন্দ-পদরজ-পরিপূর্ণ ব্রজের ধূলি সকলেরই কাম্য। এমন কি, ব্রজের বৃক্ষ, তরু, গুল্মলতা সকলই নিম্নমুখী—নিরভিমানিতার প্রতিমূর্ত্তি—ব্রজের

ধূলিলাভের আকাঙ্ক্ষী—প্রয়াসী। এই মধুর ভাবই শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধব-সংবাদ এবং সাধকের মুখে বিকাশ লাভ করিয়াছে!

"বিধি যদি গুল্মলতা (আমায়) করিত নিকুঞ্জবনে।
(তবে) সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আভরণে।"—ইত্যাদি
—প্রভু জগবন্ধু।

শ্রীশ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ-সখা উদ্ধব সম্বন্ধেও তাহাই বলিয়াছেন। উদ্ধব বলিতেছেন—

"আসাম্ অহো চরণরেণুজুষাম্ অহং স্যাম্—
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।"
—ভাগবত ১০।৭।৬১

"এই বৃন্দাবনে তরুগুল্মাদি গোপীদিগের যে চরণ-রেণু ধারণ করিতেছে, সেই রেণু শিরে ধারণ করিবার সৌভাগ্য আমার যেন হয়।"

উদ্ধব আবার বলিতেছেন—

"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুম্ অভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।
—ভাগবত ১০।৪৭।৬৩

"আমি সেই ব্রজগোপীর পাদরেণু অনুদিন বন্দনা করি—যাঁহাদের হরিকথা সঙ্গীত এই ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়াছে।"

বৈষ্ণব-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ঠাকুর নরোত্তম বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রাণ। বৈষ্ণব-ভাব ও সাহিত্যের যাহা কিছু সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক—বৈষ্ণব-সাধনায় ভগবৎপ্রেম, নিষ্ঠা ও অনুরাগ শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও সঙ্গীতে জ্বলন্ত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। নিজের জীবনে ভগবদ্-বিরহের আগুন জ্বালাইয়া তিনি জীব শিক্ষা দিয়াছেন যে, বিরহের জ্বালা ও আগুন ভগবদ্-প্রাপ্তির সকল সাধনার মূল!

"কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া।"

আবার—

"যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।"

ঠাকুর নরোত্তম গরাণ-হাটী কীর্ত্তনের স্রষ্টা ও প্রবর্তক। বস্তুতঃ, শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত হরিনাম সংকীর্ত্তনের সুর, তাল, অঙ্গের নিয়মাবলী শ্রীশ্রীনরোত্তমই নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, এবং এই কীর্ত্তনের ভিতরই তাঁহার সাধনার সমস্ত স্তর প্রস্ফুটিত হইয়াছে!

ঠাকুর নরোত্তম সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না। এই মহাপুরুষ সাধনায় যে চরম উৎকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন, ত্রিতাপজ্বালায় তাপিত ক্লিষ্ট জীবকে যে আনন্দ ও অমৃতের সংবাদ তিনি দিয়া গিয়াছেন—ব্রজরসের যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে তিনি ভক্তকে তৃপ্ত করিয়াছেন—যে অনুপম ভাব ও ভাষা তিনি মাতৃভূমিকে উপহার দিয়াছেন—তাহার তুলনা নাই। তাঁহার প্রার্থনাসঙ্গীতগুলি ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা যতই পাঠ করা যায়, হৃদয়ে ততই শান্তি ও আনন্দের বারি সিঞ্চন হয়।

শ্রীভূপতিনাথ দত্ত (এম-এ, বি-এল)।

বাঙ্গালা ভাষার রূপ

যে আলোচনা উত্থাপনের ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে—অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা—তাহা অরণ্যবিশেষ! ভাষাতত্ত্বের সেই গহন-বনে আপনাদিগকে প্রবেশ করাইতে আদৌ আমার মন সরিতেছে না। তাই মনস্থ করিয়াছি যে, আপনাদের নিরাপত্তার জন্যই জটিল ভাষারণ্যের শ্বাপদসঙ্কুল পথ পরিহার করিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল পথে বিচরণ করিব। বস্তুতঃ, যে সমস্যাটি আজ উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

...সম্মেলনের কার্য্যতালিকা বা প্রোগ্রামের একটি বিশেষ অঙ্গ হইল বাঙ্গালা ভাষার প্রচার ও প্রসার—প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে এবং বিশেষ করিয়া অবাঙ্গালীদের মধ্যে। এই প্রচারকল্পে সম্মেলনের পক্ষ হইতে নানা কেন্দ্রে বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে ইঁহারা একটা বার্ষিক পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুই-এক বৎসর পরীক্ষা লওয়াও হইয়াছে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, শাস্ত্রগ্রন্থ, ইত্যাদি নানা বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। এই সমস্ত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা কি রকম বাঙ্গালায় উত্তর লিখিবে? এই হইল প্রথম সমস্যা। কারণ, আজকাল অনেক খ্যাতনামা লেখক ক্রমশঃই বেশী পরিমাণে নানাপ্রকার "চলতি" ভাষার অবতারণা করা হেতু, বালক-বালিকাদের মধ্যেও সেই অভ্যাস সংক্রামিত হইতেছে; কাজেই নানাবিধ বাঙ্গালা রূপের আবির্ভাব পরীক্ষার্থীদিগের উত্তরে দেখা দিতেছে। এখন ইহার কোন্‌টি গ্রহণীয়? এ যাবৎ প্রচলিত "সাধু" রূপ, না এই সব নব্য আমদানী "চলতি" রূপ? এ বিষয়ে একটা কিছু নির্দ্দেশ পাইলে সম্মেলন উপকৃত হন। দ্বিতীয়তঃ, অবাঙ্গালীদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রচারকল্পে ইঁহারা বঙ্গভাষায় সহজ ব্যাকরণ ও শিক্ষার পুস্তকাদি রচনা করিতে চান। কোন্ প্রকার বঙ্গভাষায় এই সব রচিত হইবে? কোন্ প্রকার বঙ্গভাষার রূপ এই সব গ্রন্থে অবলম্বিত ও প্রদর্শিত হইবে? মোটামুটি "একরূপী" সাধুভাষায়, না "বহুরূপী" চলতি ভাষায়? এ নিমিত্তও একটা নির্দ্দেশ আবশ্যক। আপনাদের সমক্ষে সমস্যাটি সংক্ষেপে উপস্থিত করিলাম—যে সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান সম্মেলনের পক্ষে একান্ত ভাবে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এখন এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনাদের নিকট নিবেদন করিব। প্রসঙ্গক্রমে বর্ত্তমানে আবার বাণান ঘটিত একটা বিভ্রাট যে ঘটাইবার চেষ্টা হইতেছে, সে বিষয়েও সামান্য কিছু আলোচনা করিব।

আপনারা সকলেই জানেন যে, প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া নানাবিধ খ্যাতনামা লেখকদিগের চেষ্টার ফলে "লিখিত" বাঙ্গালা ভাষার রূপের একটা কাঠাম একরূপ ঠিক হইয়া আসিয়াছিল—মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, শিষ্টপ্রয়োগে ভাষার একটা রূপ "সাধু" বা সর্ব্বজনসম্মত রূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল; এবং এই রূপগুলি প্রাচীন বাঙ্গালার নানা অঞ্চলে কথিত রূপের সমন্বয়ের ফলে ভাষাবিবর্ত্তনের স্বাভাবিক ধারাক্রমেই আকার ধারণ করিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—যেমন ক্রিয়াপদের রূপগুলি; করিয়া + আছি = করিয়াছি, করিতে + আছি = করিতেছি,

ইত্যাদি। স্বভাবতঃই এই সব রূপ হইয়াছে, কৃত্রিম ভাবে নহে, এবং এই সব রূপগুলিই লিখিবার সময়ে বড় বড় লেখকগণ ব্যবহার করিবার ফলে বাঙ্গালাতে এমন একটি সুসংযত ভাষারূপ দাঁড়াইয়া যায়, যাহা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র—দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত, চট্টগ্রাম হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত—সর্ব্বত্রই ভাষায় "সাধু"রূপ বা standard হিসাবে গণ্য হয়, এবং সকলেই ইহা বুঝিতে পারে। লেখক যে কোন জিলার অধিবাসী হউন না কেন, তিনি মুখে সে ভাষারূপই ব্যবহার করুন না কেন, লিখিবার সময়ে এই আদর্শ "সাধু" ভাষারূপই ব্যবহার করিতে থাকেন। বাঙ্গালা ভাষায় যে সমস্ত রচনাকে classic বলা যায়, সে সমস্ত রচনাই—রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয়, মাইকেল, বিদ্যাসাগর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, এমন কি প্রাক্-নোবেল প্রাইজ, রবীন্দ্রনাথের পর্য্যন্ত—প্রায় সমুদয় রচনাই এই "সাধু" ভাষায় রচিত। ইহাতে কাহারও বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া কখনও শুনা যায় নাই। এইরূপ একটা standard "লৈখিক" ভাষার বিবর্তন—যাহা নানা জিলার বা উপবিভাগের "মৌখিক" উপভাষা বা dialect হইতে কতকটা পৃথক্—ইহা যে শুধু বাঙ্গালা ভাষাতেই দেখা যায়, এমন নয়; অল্পবিস্তর সকল দেশের ভাষাতেই এইরূপ বিবর্তন দেখা যায়—ইংরেজীতে, ফরাসীতে, জার্ম্মাণে, সর্ব্বত্রই এইরূপই হইয়াছে। বিশেষতঃ, লেখাপড়ার সমধিক প্রসারে, এবং মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে ছাপান বইএর অত্যধিক প্রচলনের ফলে "লিখিত" ভাষার রূপের নিয়ন্ত্রণের দিকে লোকের নজর বেশী পড়ে; কাজেই নিয়ন্ত্রণও বহুল পরিমাণে সংসাধিত হয়। "মৌখিক" ভাষা ও "লৈখিক" ভাষার উদ্দেশ্য বা functionএর মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে, এবং উপায়ের পার্থক্য ত আরও বেশী। "মৌখিক" ভাষা শুধু শ্রোতার অবগতির জন্য; "লৈখিক" ভাষা পাঠকসাধারণের অবগতির জন্য। "মৌখিক" কথাবার্ত্তা শুধু ধ্বনির সাহায্যে শ্রোতার বোধগম্য হয়—একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ই এ বিষয়ে কাজ করে; পরন্তু "লৈখিক" রচনা লেখার আকৃতি বা বর্ণমালার রূপের সাহায্যে পাঠকের বোধগম্য হয়—এ ক্ষেত্রে দর্শনেন্দ্রিয়ই প্রধান। সুতরাং "লৈখিক" ভাষার রূপের একত্ব বা uniformity নিতান্তই আবশ্যক; ধ্বনির তারতম্যে তেমন কিছু আসিয়া যায় না। যেমন ধরুন, ত-এ একার ল "তেল" কথাটি; আপনারা রাঢ় দেশের লোক "তেল"ই উচ্চারণ করিবেন; আমরা বঙ্গদেশীয়গণ বা বাঙ্গালগণ কিঞ্চিৎ বিকৃত উচ্চারণ করিয়া যাহা বলিব, তাহা আপনাদের বর্ণমালায় লিখিলে রূপধারণ করিবে "ত্যাল"। কিন্তু এই স্থানীয় উচ্চারণ-বিভ্রাটে "লিখিত" রূপের কিছু আসে যায় না—"তেল" ঠিক খাঁটিই থাকুক, উচ্চারণের ভেজাল উহাতে দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না। আজকাল কিন্তু "মৌখিক" উচ্চারণানুযায়ী বাণানের উৎকট প্রচেষ্টায় "মতো" দেখিতেছি, "যতো" দেখিতেছি, "ভালো" দেখিতেছি, "বিশেষতো" দেখিতেছি—এমন কি, রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বপরিচয়" বইখানিতে আমাদের সাবেকী চল্লিশ-সেরী মণের "মোন" রূপও দেখিতেছি—এই সব দেখিয়া-শুনিয়া হাস্যরসের সঞ্চার হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সময় সময় আবার "মোনটা" খারাপ হইয়া যায়; এবং এই দৌর্ম্মনস্যের ফলে মাঝে-মাঝে "বোনে" যাইবার প্রবৃত্তিও যে জাগিয়া না উঠে, এমন নয়।

উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গভাষার চর্চ্চা ও বিকাশের ফলে উহার একটা সুনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বজনমান্য লিখিত "সাধু"রূপ গঠিত হইয়াছিল। দুই-চারিখানা "মৌখিক" ভাষায় লিখিত গ্রন্থ—"আলালের ঘরে দুলাল" প্রভৃতির ন্যায় রচিত হইয়াছিল সত্য, এবং নাটক উপন্যাসাদিতে কথোপকথন-প্রসঙ্গে কিছু কিছু "মৌখিক" রূপ ব্যবহৃত হইত সত্য; কিন্তু মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে এইগুলি লঘু বা চটুল রচনা। পরন্তু গম্ভীর রচনায়, প্রবন্ধাদিতে, এমন কি, উপন্যাস প্রভৃতিতেও কথোপকথন ভিন্ন অন্য স্থলে "সাধু" ভাষাতেই লেখা হইত। এই "সাধু" রীতির উপর প্রথম প্রবল আক্রমণ আরম্ভ হইল প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে—খ্যাতনামা "বীরবল" প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদিত "সবুজ পত্র" কাগজের মারফতে। রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্য 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়াছেন; তিনিও সহসা "মৌখিক" চলতি-ভাষীদিগের দলে ভিড়িয়া গেলেন; রবিদীপিত হইয়া "সবুজ পত্র" তর্-তর্ বেগে বাড়িয়া উঠিয়া দিকে-দিকে কচি ও কাঁচা ডগার হরিৎ শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। এই শোভা বাঙ্গালার "তরুণ" সাহিত্যিক মনের উপর মায়ারও বিস্তার করিল নিতান্ত অল্প নয়। কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া শোভা ও মায়াবিস্তার করিবার পর কালের অলঙ্ঘ্য বিধানে "সবুজ পত্র" ঝরিয়া পড়িল—"মৌখিক" দাপট উহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না। কিন্তু ঘটিল একটা অঘটন। পত্র ঝরিয়া পড়িয়া লুপ্ত হইয়া গেল বটে, কিন্তু 'সবুজটি' রহিয়া গেল। শুধু যে সবুজটি রহিয়া গেল, তাহা নহে, গঙ্গাতীর হইতে বুড়ীগঙ্গাতট পর্য্যন্ত—দিকে-দিকে—অঙ্গে-বঙ্গে-কলিঙ্গে—সর্ব্বত্র সেই "সবুজিমা" ছড়াইয়া পড়িল। এ যেন সেই মদন-ভস্মের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি,—

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে ক'রেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!"

"সবুজ-পত্রের" আবির্ভাব ও তিরোভাবের ফলে ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে, সে "গাঙ্গেয়" উপভাষা মোটামুটি রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং কলিকাতা রাজধানী হওয়ায় স্বভাবতঃই যে ভাষার প্রভাবের কিঞ্চিৎ আতিশয্য হইয়াছিল, এবং তৎকারণে পশ্চিম-বঙ্গের লেখকদিগের লেখাতে কতকটা বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল—বিশেষতঃ, প্রমথ বাবু, রবি বাবু প্রভৃতি বড়-বড় লেখকদিগের দৃষ্টান্তে—সেই গাঙ্গেয় ভাষার মোহ ক্রমশঃ প্রায় সারা বাঙ্গালারই তরুণ লেখকদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, এমন কি, পাণ্ডববর্জিত চট্টগ্রাম বিভাগ পর্য্যন্ত এই ছোঁয়াচ হইতে রক্ষা পাইল না। এখন, আমাদের বাঙ্গালদের রকম-সকম ত আপনাদের জানাই আছে। আমরা বাঙ্গালরা—চাটগাঁই বাঙ্গাল, ঢাকাই বাঙ্গাল, বাখরগঞ্জের বাঙ্গাল—আমি ত নিজে এক জন বাখরগঞ্জের বাঙ্গাল—বাঙ্গালদের মধ্যে supreme বা সেরা বাঙ্গাল—আমরা—বাঙ্গালরা যদি একবার কোন একটা কিছু আঁকড়িয়া ধরি—তা কি Terrorism, কি Civil Disobedience, কি কলকাত্তাই-ভাষা—কোন হুজুগে যদি একবার মাতিয়া যাই, তবে একেবারে শেষ না দেখিয়া তা ছাড়ি না! তাহা আমাদের কোষ্ঠীতে নাই। সুতরাং এই ভাষা-ক্ষেত্রেও তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হইল না। খাস্ ক্যালকেশিয়ানের চাইতেও বেশীমাত্রায় বাঁকা-বাঁকা পশ্চিমা কলকাত্তাই-ভাষা নবীন ঢাকাই, চাটগাঁই, রংপুরী ইত্যাদি লেখকেরা চালাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, এই রেঢ়ো মৌখিক

ভাষা—যাহা বঙ্গজ ও বারেন্দ্র লেখকদের পক্ষে কোন পুরুষে মৌখিক নয়, লৈখিক ত নয়ই—সেই ভাষা চালান যেন সাহিত্যিক তরুণিমার একটা hall-mark হইয়া দাঁড়াইল। যে উৎসাহ ও উদ্যম এই বিষয়ে তরুণ উদীয়মান বাঙ্গাল লেখকগণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমাদের মূল সভাপতি ব্রতচারী গুরুসদয় বাবু মালকোঁচা মারিয়াও তদপেক্ষা বেশী কিছু করিতে পারেন কি না, সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। আমাদের বাঙ্গালদেশে একটা প্রবচন প্রচলিত আছে—"বোষ্টম যদি পীর হয়, তবে গোস্ত খায় তুনো"—এই প্রবচনানুসারে বাঙ্গাল লেখকগণ দ্বিগুণিত উৎসাহে "মৌখিক" গাঙ্গের বুলিকে তাঁহাদের "লৈখিক" ভাষায় রূপায়িত করিতে লাগিলেন। এই অত্যুৎসাহের ফলে মজার মজার শাব্দিক "পরিস্থিতির"ও উদ্ভব হইতে লাগিল—তবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই যা রক্ষা! সাধু ভাষার "আসিলেন" শব্দ বঙ্গজদিগের হাতে পড়িয়া "আস্‌লেন" আকার ধারণ করিল; রাঢ়ীয় মৌখিক "এলেন" পর্য্যন্ত আর পৌছিলেন না। "সাথী" কথাটি এ যাবৎ কল্পলোকের কাব্যকাননেই পথের সাথী ছিল; ইহার আটপৌরে 'গাত্বিক' ব্যবহার বড় একটা ছিলই না; কিন্তু ভাবুকতাগ্রস্ত বাঙ্গালদিগের হাতে পড়িয়া ইহা একেবারে মাঠে-ঘাটে-হাটে-বাজারে নিত্যসঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। "জুতা মোজা" বাঁকা হইয়া একেবারে—"জুতোমুজো" আকার ধারণ করিল। বাঙ্গাঙ্গেয়দিগের উৎসাহের তোড়ে বক্র গাঙ্গেয় ভাষার প্লাবনের জলতরঙ্গ দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইল।

ফলতঃ ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে, বিগত পঁচিশ বৎসরের ভাষাগত ইন্‌থিলাপের ফলে এখন চিরপ্রচলিত সুপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বজনমান্য, লিখিত ভাষার সাধুরূপের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। নাটক-উপন্যাসাদির ত কথাই নাই। গম্ভীর প্রবন্ধাদিতে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক কিংবা ঐতিহাসিক আলোচনাদিতে পর্য্যন্ত "মৌখিক" রূপের প্রচলন অত্যধিক পরিমাণে চলিতেছে। বস্তুতঃ, যে কোন মাসিকপত্র খুলিলেই দেখিতে পাইবেন, হয় ত অর্দ্ধেক লেখা "সাধু" বাকী অর্দ্ধেক "অসাধু"। আপনারা হয় ত ভাবিতে পারেন যে, "অসাধু" হইয়াও যদি "চলতি" ভাষা বুঝিতে একটু সহজতর হয়, তবে মন্দ কি? কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এই তথাকথিত মৌখিক রূপের মৌখিকত্ব থাকে প্রধানতঃ সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া-পদের বিভক্তি ব্যবহারে এবং বহুলপ্রচলিত দুই-একটি বিশেষ্য বিশেষণের "বাঁকা" রূপের ব্যবহারে; যেমন,—"তাহাদের" স্থলে "তাদের", "তাহাদিগকে" স্থলে "তাদেরকে", "করিয়াছি" স্থলে "করেছি", "করিব" স্থলে "করব", "করিয়া" স্থলে "ক'রে", "পূজা" স্থলে "পূজো", "ইচ্ছা" স্থলে "ইচ্ছে", "অবশ্য" স্থলে "অবিশ্যি" "খুড়া" স্থলে "খুড়ো", "বুড়া" স্থলে "বুড়ো" ইত্যাদি। এইগুলি বাদ দিলে তথাকথিত "মৌখিক" ষ্টাইলের রচনায় শব্দসমাবেশ প্রাবৃটের ঘনসমাবেশের ন্যায়ই গুরুগম্ভীর, ঘোরঘটাচ্ছন্ন সংস্কৃত-বহুল—প্রাকৃত ইতর লোকের পক্ষে শুধু দুষ্পাচ্য নয়, একেবারেই দুষ্পাঠ্য। বুঝিবার পক্ষে একেবারেই সুগম নহে। এবং-বিধ রচনায় 'মৌখিক' অভিধান একেবারেই পরিহাসজল্পিতং অথচ লাভের মধ্যে হইয়াছে এই যে, এই অতি নিরর্থক "মৌখিক" ফোড়ন রচনাসম্ভারে মিশাল দেওয়াতে কতকগুলি contracted এবং corrupted রূপ বাঙ্গালা ভাষাতে প্রবেশ করিয়া শুধু শুধু বাণানের বিশৃঙ্খলার আমদানী করিয়াছে। কোন উপকার যে হইয়াছে, এমন ত দেখিতে পাই না।

"করিয়াছি" এই সাধু ভাষার ক্রিয়াপদটি অপেক্ষা "করেছি" মৌখিক রূপটি বুঝিতে সহজতর, এ কথা বোধ করি কেহই বলিবেন না। তবে কিনা আজকাল hundred percent spendএর যুগ—তাই চারি syllableএর পরিবর্ত্তে তিন syllable-এর আমদানীতে কিঞ্চিৎ timeএর economy বা সময়-সংক্ষেপ হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু অপর দিকে যে ঘোরতর গোলমাল! "করিয়াছি" শব্দটির বর্ণবিন্যাস একেবারে সুস্থির সুদৃঢ়—কোন অনিশ্চয়তা, কোন হাঙ্গামা নাই—আর বাঙ্গালী মাত্রেই অক্লেশে বুঝিতে পারে। এখন মৌখিক রূপ ধরা যাউক কত রকমারী রূপ হয় একবার দেখুন:—করেছি, করেচি, কোরেছি, কোরেচি; ইহার উপর আবার কেহ কেহ ইলেক বা apostropheর পক্ষপাতী, সেই ইলেক্‌টি্ক মতে আরও দুইটি রূপ দাঁড়ায়—ক'রেছি, ক'রেচি। মোট রূপ দাঁড়াইল ছয়টি। কোন বঙ্গভাষা-শিক্ষার্থী অবাঙ্গালী নিরীহ "সাধু" "করিয়াছি" পদের এই "মৌখিক" ষড়ানন রূপের ষড়্‌যন্ত্রে যে একেবারে আক্কেল গুড়ুম হইয়া যাইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবু ত একটা অতি সহজ দৃষ্টান্ত দিলাম। যদি মনে করুন "করিতেছি" পদটি ধরিলাম, তবে শ্রাদ্ধ কত দূর গড়াইত, একবার ভাবুন দেখি? করছি, করচি, কোরছি, কোরচি, কর্‌ছি, কচ্চি, কোর্চ্ছি কোর্চ্চি, কর্চ্ছি, কর্চ্চি, কোচ্ছি, কোচ্চি, ইত্যাদি ইত্যাদি। "করিলাম" পদটির অবস্থা কি দাঁড়ায় দেখুন দেখি? করলাম, করলেম, করলুম, কোরলাম, কোরলেম, কোরলুম, কর্ল্লাম, কর্ল্লেম, কর্ল্লুম, কল্লাম, কল্লেম, কল্লুম, ইত্যাদি লাম-লুম-লেম-সংরক্ষিত ত্রিধারার একেবারে উদ্দাম প্লাবন! গণিতজ্ঞ বলিয়া আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে; কিন্তু Permutation and Combinationএর সমবায়ে এক একটি "সাধু" বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের যে কতগুলি রূপান্তর সম্ভব, তাহা গণনা করিতে আমিও হিমসিম্ খাইয়া যাই। কিন্তু কোন দিক্ দিয়াই কোন সুবিধা হয় না, অর্থবোধ সুগম হয় না—শুধু-শুধু বিশ-পঞ্চাশ রকম বিচিত্র বাণানের অবতারণা করিয়া নিষ্কাম ভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কেন? ভাষাশিক্ষার্থীদের পক্ষে—তা কি বাঙ্গালী, কি অবাঙ্গালী শিক্ষার্থী—তাহাদের পক্ষে ত রীতিমত এক বিভীষিকার সৃষ্টি হয় এই "মৌখিক" বঙ্গবুলি আয়ত্ত করিতে।

শুধু "গাঙ্গেয়" মৌখিক ভাষায় রূপেরই খেলা কিঞ্চিৎ দেখাইলাম; বাঙ্গালায় অন্যান্য অঞ্চলের "মৌখিক" রূপ আমদানী করিলে ত বোধ করি ভূতের উপদ্রব মনে করিয়া আপনারা সভাস্থল পরিত্যাগ করিবেন। তাই তাহা আর করিলাম না। বস্তুতঃ, কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষাতেই এইরূপ "মৌখিক" রূপের আমদানী করা হয় না—কারণ, "মৌখিক" উচ্চারণ স্থানভেদে, কালভেদে, পাত্রভেদে পরিবর্ত্তিত হইবেই, এবং তদনুসারে শব্দবিন্যাস করিতে গেলে কোন দিনই শব্দের রূপের স্থিরতা থাকিবে, না। ধরুন, ইংরেজী ভাষা। ইংলণ্ডেও নানা স্থানীয় dialect প্রচলিত আছে; Dorsetshireএর কথা আর Yorkshireএর কথা এক রকম নহে; আবার খাস-লণ্ডনের Cockneyদের উচ্চারণ অন্যবিধ। কিন্তু "সাধু" ইংরেজী ভাষায় ও-সব dialect ব্যবহৃত হয় না; এমন কি, রাজধানীর Cockney dialectও নহে। আমাদের

বাঙ্গালাদেশের মত বিলাতে রাজধানী-প্রীতি এতটা উৎকট ভাবে দেখা দেয় নাই। এমন কি, স্কচ্-লেখকরাও "সাধু" ইংরেজীতেই পুস্তকাদি লেখেন। কোন কোন সময়ে দুই-এক জন লেখক ঐ সব উপভাষার নমুনা দেখাইবার জন্য তাহাতে কবিতাদি লিখেন, এই মাত্র। বস্তুতঃ, "সাধু" ইংরেজী ভাষার একটা কাঠাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে—লিখিবার সময়ে সকলেই সচরাচর সেই ভাষাতেই লেখেন, মৌখিকের ছড়াছড়ি করেন না। ফরাসীতেও তদ্রূপ। খামকা ভাষায় বিশৃঙ্খল আনয়ন করিবার এই যে দুষ্প্রবৃত্তি, ইহা আমাদের বাঙ্গালীদেরই একটা একচেটিয়া বিশেষত্ব বলিয়া মনে হয়! এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সহিত আমার বাঙ্গালা ভাষা-ঘটিত আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাম, "জানি না, কি অপরাধে "সাধু" বাঙ্গালা আপনার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হইল। "সাধু" বাঙ্গালা ত আর কোন অপরাধ করে নাই।"

বস্তুতঃ, এই "মৌখিক" বুলির সাম্প্রতিক উৎপাত যদি দূরীভূত হয়, তাহা হইলে "সাধু" বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহারে বিশেষ বিশৃঙ্খলা থাকে না। ক্রিয়াপদের ও সর্ব্বনামের রূপে ত কোনই বিশৃঙ্খলা নাই। এমন কি, বিশেষ্য বিশেষণ প্রভৃতির মধ্যেও যে শব্দগুলি সংস্কৃতমূলক, তাহাদের রূপে কোন অনিশ্চয়তা নাই। শুধু সংস্কৃতের ভাষা হইতে আগত কিংবা খাঁটি দেশজ শব্দের বাণানে কিছু কিছু রূপান্তরের ব্যবহার আছে—বাঙ্গালাতে দুই জ, দুই ন, তিন শ, এবং হ্রস্বদীর্ঘের উচ্চারণ প্রায় একই রকম হইয়া দাঁড়ানতে। যেমন, জিনিষ, জিনিস; খুসি, খুশি; ইত্যাদি। আমরা আজ জামশেদপুরে উপস্থিত; কেহ হয় ত তালব্য শ দিয়া লেখেন, কেহ দন্ত্য স দিয়া। সংস্কৃত যে এমন কঠিন ব্যাকরণের নিগড়ে আবদ্ধ, তাহাতেও এইরূপ রূপান্তর বিরল নহে। শ্রেণী, শ্রেণি; আবলী, আবলি; ইত্যাদি হ্রস্ব দীর্ঘ দুই-ই হয়। সংস্কৃতেও অবনী, অবনি, দুই-ই হয়। আমরা ছেলেবেলা "কেশরীকে" তালব্য শ-যুক্তই জানিতাম, এখন শুনি নাকি "কেসরীও" হয়। "বশিষ্ঠ" মুনিও তদ্রূপ; ধারণা ছিল, তাঁহার দৌড় শুধুই তালব্য-শ পর্য্যন্ত, এখন শুনি, মুনিঠাকুর দন্ত্য-স-কেও আয়ত্ত করিয়াছেন। তালব্য-শ যোগে যে সমস্ত উপাদেয় খাদ্যসামগ্রীর "পরিবেশন" পূর্ব্বে হইত, এখন মূর্দ্ধন্য ষ যোগে "পরিবেষণ" হওয়াতেও উপাদেয়ত্বের কিঞ্চিন্মাত্রও হানি হয় নাই। তারপর শুনুন এক অতি অত্যাশ্চর্য্য বার্ত্তা। সে-দিন "শব্দকল্পদ্রুম" উল্টাইতে উল্টাইতে দেখি যে, জনকনন্দিনী বৈদেহী সীতা—নাকি "শীতা"-রূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন! অপরং কিং বা ভবিষ্যতি? এই যে রূপবাহুল্য, ইহাতে সংস্কৃত অচল বা অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া পড়ে নাই। তার পর ধরুন, ইংরেজী। Axe, Ax; Connection, Connexion; rhyme, rime—নানাবিধ রূপই প্রচলিত। এমন কি, আজ যে হাকিম সাহেব (সুলেখক শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায়) আমাদের সভাপতিরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তিনি যখন এজলাসে বসেন, তখন বোধ করি, রায় লিখিবার সময়ে Judg-ment, ও Judgement উভয়বিধ বর্ণবিন্যাসই গ্রাহ্য করিয়া থাকেন—তাহাতে হুকুমের রদ-বদল হয় না। ইহাতে এই সহজ কথাটাই বুঝা গেল যে, অল্প কিছু শব্দে যদি রূপবাহুল্য থাকেও, তজ্জন্য সাতিশয় শিরঃপীড়ার কোন কারণ নাই। এই সব বহুরূপী শব্দেরও কালক্রমে বহু স্থলেই প্রয়োগে একটাই রূপে দাঁড়াইয়া যায়। অবশ্য, এই সব স্থলে কোন একটা রূপকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বড় কথা এই যে, "সাধু" বাঙ্গালা ভাষায় শিষ্ট প্রয়োগে তেমন বেশী কিছু বিশৃঙ্খলা নাই; এবং এই "সাধু" ভাষাই সচরাচর রচনাতে লেখকদিগের ব্যবহার করা উচিত।

তবে এ প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা কথা বলা যাইতে পারে। "মৌখিক" ভাষার প্রয়োগ কোন কোন স্থলে করিলে তেমন অনিষ্ট হয় না, যেমন কথোপকথন-স্থলে। নাটক বা উপন্যাসে যেখানে পাত্র-পাত্রীর কথাবার্ত্তা লিপিবদ্ধ হয়, সেখানে "মৌখিক" ভাষা ব্যবহার করিলে একটু বেশী স্বাভাবিক ও শ্রুতিমধুর হয়। সংস্কৃতেও এই রীতি অনেকটা প্রচলিত আছে। আপনারা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত নাটকে যেখানে স্ত্রীলোকের এবং ইতর লোকের কথাবার্ত্তা আছে, সেখানে প্রায়শঃই প্রাকৃতের ব্যবহার; আর যেখানে প্রধান নায়কেরা বা উচ্চ শ্রেণীর পুরুষেরা কথাবার্ত্তা বলেন, সেখানে সংস্কৃতের ব্যবহার। আজ এই সভায় অনেক মহিলা উপস্থিত আছেন—স্ত্রীলোক এবং ইতর লোককে এক-পর্য্যায়ভুক্ত করায় তাঁহারা আমার প্রতি কুপিতা হইবেন না—দোষ আমার নয়, দোষ সেই প্রাচীন বুড়া সংস্কৃত কবিদের—তাঁহারাই এইরূপ বিধান করিয়া গিয়াছেন। তার কারণ যাহাই হউক, তাঁহাদের বিধানে নায়িকাদের শ্রীমুখ হইতে "অজ্জউত্ত" ব্যতীত "আর্য্যপুত্র" সম্ভাষণ বহির্গত হইত না। সংস্কৃতের নজীর বাঙ্গালা নাটক-উপন্যাসেও বোধ করি চালাইলে মন্দ হয় না। যে স্থলে লেখক নিজে কথা বলিতেছেন, পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়া বলাইতেছেন না, সে স্থলে "সাধু" ভাষারই প্রয়োগ করিবেন। আমাদের বড় বড় ঔপন্যাসিকগণ—শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পর্য্যন্ত—এই রীতিই অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ একটা মাঝামাঝি বন্দোবস্ত অশোভন মনে হয় না। আবশ্যকমত পাত্রপাত্রীদিগের মুখে বাঙ্গালার অন্যান্য অঞ্চলের "মৌখিক" বুলিও ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং হইয়াও আসিতেছে। "মৌখিক" বুলির এই প্রকার সীমাবদ্ধ প্রয়োগে "মৌখিকের" বিশেষত্ব বেশ পরিস্ফুট হয়।

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এখন বর্ত্তমানে কয়েক বৎসর ধরিয়া যে "সাধু" ভাষার বাণান-সংস্কার ও বাণান-পরিবর্ত্তনের একটা প্রয়াস দেখা দিয়াছে—বিশেষতঃ, বোলপুর বিশ্ব-ভারতী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির অতিরিক্ত উৎসাহের ফলে—তৎসম্পর্কে দুই-একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। আপনারা অনেকেই বোধ করি অবগত আছেন যে, যখন এই প্রচেষ্টার প্রথম উদ্ভব হয়, তখন এ বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করি। সেই বাদ-প্রতিবাদের ব্যাপারে বন্ধুবর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন এক পক্ষে, আমি ছিলাম বিরুদ্ধ পক্ষে। অবশ্য, বলাই বাহুল্য মাত্র যে, তিনি ছিলেন শুক্লপক্ষ, আমি ছিলাম কৃষ্ণপক্ষ। আমার ভয় হইতেছে যে, এই ভাষাগত পক্ষাঘাতের ফলে আমার সম্বন্ধে বোধ করি একটা prejudiceই দাঁড়াইয়া গিয়া থাকিবে যে, উঁহারা যাহাই বলুন না কেন, আমি অমনি তাহার বিরুদ্ধতা করিব! সেই জন্যই এ বিষয়ে কিছু বলিতে আমি একটু সঙ্কোচ অনুভব করি। সে যাহাই হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি যথাসম্ভব prejudice-বর্জ্জিত হইয়া আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। সংস্কারক-দের কার্য্যকলাপে আমার প্রধান আক্ষেপ এই যে, যদিও "মৌখিক"

ভাষার বিষম বাণান-বিশৃঙ্খল: ফল দূরীভূত করিবার জন্য উঁহাদের প্রয়াসের সূত্রপাত, কিন্তু সে বিষয়ে উঁহারা বিশেষ কিছুই করিলেন না কিংবা করিতে ভরসা পাইলেন না।—"মৌখিক" ভাষার লাম-লেম-লুম অবাধে স্বীকৃত হইল, মত-মতো, ভাল-ভালো, ইত্যাদিও মানিয়া লওয়া হইল, এমন কি, কি-কী সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিতেও উঁহাদের সাহসে কুলাইল না; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে উঁহারা করিলেন কি? না—"সাধু" ভাষার শব্দের সুপ্রতিষ্ঠিত বাণান পরিবর্ত্তনে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন—তখন Slogan হইল "সরলীকরণ"। সেই ধাক্কায় "রাণী" হইল "রানি", "কার্য্য" হইল "কার্য", "ধর্ম্ম" হইল "ধর্ম", "সর্ত্ত" হইল "শর্ত", "সৌখীন" হইল "শৌখিন", "পোষাক" হইল "পোশাক" ইত্যাদি ইত্যাদি। রেফের পরে কোন-কোন ব্যঞ্জনের দ্বিত্বভাব—বাঙ্গালা ভাষাতে চিরপ্রচলিত, এবং যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুমোদিত—তাহার উপর একেবারে উঁহারা খড়্গহস্ত হইলেন। ফতোয়া বাহির হইল যে, আর সব সংস্কার-প্রস্তাব যদি তুলিয়া লইতে হয়, তাও স্বীকার—কিন্তু রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব কিছুতেই চলিবে না। এতাদৃশ অত্যুৎসাহের ফল যাহা হইবার তাহাই হইল; অর্থাৎ "মৌখিক" ভাষার বাণানে বিশৃঙ্খলা ত পূর্ব্ববৎ অব্যাহত রহিলই, পরন্তু সাধুভাষার বাণানে যে সব স্থলে কোন অনিশ্চয়তা ছিল না, সে সব স্থলেও নূতন করিয়া বিশৃঙ্খলা আমদানী করা হইল। একেবারে 'উল্টা বুঝ্‌লি রাম!' এখন দেখিতে পাইবেন, মাসিকপত্রাদিতে পাশাপাশি প্রবন্ধে একটিতে প্রচলিত বাণান, অপরটিতে "নয়া" প্রস্তাবিত সংস্কৃত বাণান সমানে চলিয়াছে। "সরলীকরণে"র ধাক্কায় ভাষার আত্মশ্রাদ্ধ হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত সংসাধিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত—এবং আমি আশা করি, আপনারা সকলেই ইহা অনুমোদন করিবেন। আমার বক্তব্য এই, ভাষাতে যে শব্দের বর্ণবিন্যাসে কোন রূপান্তর নাই, কোন অনিশ্চয়তা নাই, তথায় নূতন করিয়া বিকল্প বা রূপান্তর বা বিশৃঙ্খলা আনয়ন করা অবিধেয়—তা কি উচ্চারণের খাতিরেই হউক, কি সরলীকরণের খাতিরেই হউক, কি ভাষাগত ব্যুৎপত্তির খাতিরেই হউক, এমন কি, এই প্রয়োগ-বাহুল্যের ফলে অনেক ব্যাকরণদুষ্ট পদকেও শেষটা নিপাতন-সিদ্ধ মনে করিয়া বৈয়াকরণিকদিগকেও মানিয়া লইতে হয়—সংস্কৃতের মত rigid ভাষাতেও ইহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, ইংরেজীর ত কথাই নাই। এ বিষয়ে আর অধিক বলা বাহুল্য মাত্র, বিষয়টি এতই সহজ এবং যুক্তি এতই সমীচীন। আশা করি, অত্যুৎসাহী সংস্কারকগণ সংস্কারের বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া অতঃপর একটু কাণ্ডজ্ঞানের আশ্রয় লইবেন। *

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ (এম-এ, বি-এল, অধ্যাপক)।

* জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ, বি-এল-প্রদত্ত বক্তৃতার সার-সঙ্কলন।

আনাগোনা

আধেক চাঁদের স্বপন এখনো আছে কি জেগে
অমাবস্যার আঁধারে আঁধারে ভিক্ষা মেগে?
বন-দীঘিকার আঁকাবাঁকা তীরে
কদম-কেশর ঝরে ফিরে ফিরে,
সেথায় চমকি' থামিয়া প'ড়েছি কাহারে দেখে?
—আধেক চাঁদের স্বপন এখনো আছে কি জেগে!

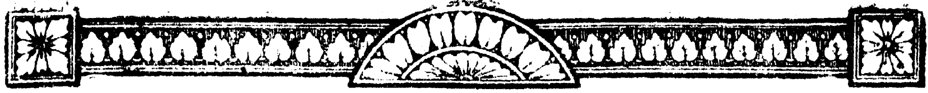
শেষ-প্রহরের তারাদের গান এখনো বাকী,
আঁধারের কালো কার জাগরণ দিয়াছে ঢাকি'।
একটু সরায়ে রাতের আঁচলে
ভীরু মুখখানি পূর্ব্ব-অচলে
আধেক খুলিয়া কৌতুকভরে কে দেয় রাখি?
শেষ-প্রহরের তারাদের গান এখনো বাকী।

আপন আড়ালে আপনারে রাখি হে কৌতুকি!
বার বার তুমি যাযাবর প্রাণে দিতেছ উঁকি।
নিশীথ-কানন স্বপনে শিথিল,
চুপি চুপি যাহা গড়ি তিল তিল
তব আঁখিতটে ধরা পড়ি' সব গেল গো চুকি'!
বার বার তুমি যাযাবর প্রাণে দিতেছ উঁকি।

ভিক্ষার ঝুলি শুধু লয়ে ফিরি—মেলেনি ভিখ্!
সম্মুখে ঘেরে নিরালা আঁধার দিগ্বিদিক।
বন্ধ হেরিয়া তব বাতায়ন
নিশ্চুপে রচি আমার শয়ন,—
গুণ্ঠন খুলি' অমনি তাকাও নির্নিমিখ!
ভিক্ষার ঝুলি শুধু লয়ে ফিরি—মেলেনি ভিখ্!

নিমীল নয়নে পৃথিবী ঘুমায় আপনা-ঢেকে'
তারি পাশে পাশে একা মোর পথ গিয়াছে বেঁকে।
এত কাল খুঁজি' যারে পাই নাই
আজি আপনারে তারে দিয়ে যাই—
হঠাৎ রাতের কোকিল জাগিয়া উঠিল ডেকে!
আধেক চাঁদের স্বপন এখনো আছে কি জেগে?

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।



দিদির গহনা

চব্বিশ পরগণার বড় উকীল শ্যামাধব বাবুর ওকালতী-জীবনের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ণ হইয়াছে। সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া তাঁহার উকীল-বন্ধুরা একটা উৎসবানুষ্ঠান করিলেন। সেই অনুষ্ঠানেই তিনি বলিলেন, পরদিন হইতে তিনি আর কোন নূতন মোকর্দ্দমা লইবেন না—যেগুলিতে তিনি উকীল আছেন, সেগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র শেষ করিবার চেষ্টা করিবেন। তখন তাঁহার পশার ও প্রতিপত্তি দুই-ই যেরূপ, তাহাতে তাঁহার এই উক্তিতে অনেকে বিস্মিত হইলেন। বিস্ময় কেবল উকীলের দলেই নিবদ্ধ রহিল না—তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিও বিস্মিত হইল। যিনি প্রাতে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিতেন, ঘর মক্কেলে পূর্ণ, আর রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত উকীল-মক্কেলের সঙ্গে মামলার বিষয় আলোচনার পর নথি পড়িয়া নজির বাহির করিয়া মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে শয়ন করিতে যাইতে পারিতেন না, তিনি ওকালতী ত্যাগ করিয়া কি করিবেন, তাঁহারা ভাবিয়া পাইল না। গৃহিণী কয় বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে রোগজীর্ণ দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন; ছেলেরা তাঁহার কোন সঙ্কল্পে বাধা দিতে সাহস করিত না। তাঁহার কন্যা ছিল না। কেবল পৌত্রবা বলিল, "তুমি কায ছেড়ে এসে কি করবে?" তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তোমাদের সঙ্গে খেলা করব।"

পরদিন রবিবার। ছেলেরা দেখিল, পূর্ব্বদিন তিনি খাতা আনাইয়াছিলেন। রবিবার মধ্যাহ্নে তিনি যখন সেই খাতায় কি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলের কৌতূহলের অন্ত রহিল না। শ্যামাধব বাবু তাঁহার স্মৃতি-কথা লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি বলিতেন, তিনি এক জীবনে বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজে যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা যাহারা দেখে নাই, তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিবে না—যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা—দেখিলেই বিশ্বাস হইলেও মনে করিতেছে, স্মৃতি কি সত্য? আর মানুষ? তিনি যে কতরূপ লোকের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা মনে করিয়া তিনিই বিস্মিত হইতেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে কাহার কথা লিখিবেন, তাহা লইয়া পৌত্রদিগের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইল। শেষে জ্যেষ্ঠ পৌত্র সাহস করিয়া তাঁহাকে যখন সে কথা জিজ্ঞাসা করিল, তখন তিনি তাঁহার বসিবার ঘরের প্রাচীরে বিলম্বিত একখানি প্রতিকৃতি দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ নন্দকুমার বাবুর।" ঐ কথা বলিয়া তিনি বলিলেন—"অনেকেই জানে, উঁহার জীবন অনাবিল সাফল্যের জীবন—তাহা 'কমিডী',—তাহাতে কেবলই আনন্দ ও প্রাচুর্য্য; কিন্তু উঁহার জীবনে যে 'ট্রাজেডী' ছিল, তাহা অনেকেই জানে না; আমি তাহা জানি—সেই শোচনীয় ঘটনায় তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ—শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।"

নন্দকুমার বাবু যে শ্যামাধব বাবুকে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন—তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, শ্যামাধব বাবুর পৌত্ররাও তাহা জানিত। কিন্তু শ্যামাধব বাবুর জীবনে যে কোন "ট্রেজেডী" ছিল, তাহা তাহারা কখন শুনে নাই। সেই জন্য পিতামহের কথায় তাহারা বিস্ময়ানুভব করিল।

তাহাদিগের বিস্ময়-ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্যামাধব বাবু বলিলেন, "কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত যে দেখাইতে নাই, তাহা ভুলিয়া তোমাদের ও কথা বলিয়া ফেলিলাম। ছেলেরা যেমন গাছের কলম পুতিলে প্রতিদিন ডালটি তুলিয়া দেখে, শিকড় কত দূর গজাইল—তোমরাও এখন তাহাই করিবে—যখন তখন আসিয়া আমার খাতা উল্টাইবে। তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আমি ব্যাপারটা বলিয়া দিতেছি।"

পৌত্ররা সকলে বলিল, "বল।"

তাহারা তাহাদিগের ভগিনীদিগকেও ডাকিয়া আনিল।

শ্যামাধব বাবু বলিতে লাগিলেন :—

"আমার বাবা যখন তাঁহার দুই বন্ধুর সঙ্গে জাহাজে রসদ প্রভৃতি সরবরাহ করিবার ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন 'ঠাণ্ডা ঘরে' আহার্য্য রক্ষার ব্যবস্থা ছিল না—জাহাজও এত দ্রুতগামী ছিল না; কাযেই কলিকাতা বন্দরে আসিলে জাহাজ অনেক জিনিষ লইত। সে কাযে তখন

লাভও ভাল ছিল। কিন্তু বাবা উপার্জ্জন করিলেও সঞ্চয় করিতে পারিতেন না—তাঁহার 'খরচের হাত'টা বড় ছিল।"

জ্যেষ্ঠ পৌত্রটি বলিল, "সেই জন্য কি তুমি সে অভ্যাসের ত্রুটিটা সুদ সমেত পোষাইয়া লইতেছ?"

শ্যামাধব বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমার ত মনে হয়, আমি বাবার স্বভাবই পাইয়াছি। যদি সে বিশ্বাস সত্য না হয়, তবে এটুকু ত তোমরা স্বীকার করিবে—আমি সঙ্গে কিছু লইয়া যাইব না।"

তাহার পর তিনি বলিলেন :—

"বাবার শ্রাদ্ধের পর দেখিলাম, ব্যয় যতই কেন থাকুক না—আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। বাবার অংশীদার বন্ধুদ্বয় আইন দেখাইলেন, বাবার মৃত্যুতে ব্যবসায় তাঁহার অংশ গিয়াছে। সে বার আমি বি, এ, পরীক্ষা দিব। আমি উপার্জ্জনের উপায় সন্ধান করিতে লাগিলাম। মা চক্ষুর জল ফেলিয়া বলিলেন, তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া তিনি সংসার চালাইবেন, আমি যেন মনোযোগ দিয়া পড়ি। মা'র গহনা—উহাই ত সম্বল! সংসারে বিধবা মা ব্যতীত আমরা দুই ভাই আর সকলের বড় এক ভগিনী, ভ্রাতাদিগের মধ্যে আমিই বড়। আপদ-বিপদ ঘটিতে পারে—রোগভোগ অপ্রীতিকর হইলেও যখন অতিথি হয়, তখন তাহাদিগকে তাড়ান ব্যয়সাধ্য হয়। কাযেই মা'কে না বলিয়া অর্থার্জ্জনের উপায় সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু উপায় কোথায়? উপায় কেবল চাকরী, আর চাকরীর মধ্যে যদি একটা গৃহ-শিক্ষকের কায পাই। তাহারই সন্ধান করিতে এক দিন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া নন্দকুমার বাবুর গৃহে উপনীত হইলাম। তখন বেলা সাতটা হইবে ও তাঁহার বাহিরের ঘরে তখনই অনেকগুলি মক্কেল জড় হইয়াছে। ঘরটির আসবাব কেবল বড় বড় আলমারী—আইনের পুস্তকে অতিপূর্ণ; ঘরে একখানিমাত্র ছবি - নন্দকুমার বাবু যে স্থানে বসিয়া আছেন, তাহার সম্মুখে প্রাচীরে বিলম্বিত এক তরুণীর প্রতিকৃতি। যে পরিবেষ্টনে সেখানি স্থাপিত, তাহার মধ্যে তাহার অসামঞ্জস্যের অন্ত নাই।

"আমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নন্দকুমার বাবু আমার দিকে চাহিলেন; বোধ হয়, বিস্মিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কাহাকে চাহ?' আমি আমার আগমনের কারণ জানাইলে তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিয়া পার্শ্বের ঘরে গমন করিলেন। আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। সে ঘরেও সেই তরুণীর প্রতিকৃতি! আমার আগমনের কারণ শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'তুমি যে বড্ড ছেলেমানুষ! পড়াইতে পারিবে?' আমি বলিলাম, 'বোধ হয় পারিব।' আমি বি, এ, পড়ি শুনিয়া তিনি—আমি কোন্ কলেজের ছাত্র, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি চাকরীর চেষ্টা করিতেছি কেন?"

এক জন পৌত্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

শ্যামাধব বাবু হাসিয়া বলিলেন, "সেকালে লোক সামান্য আয়েও সুশৃঙ্খলভাবে সংসার প্রতিপালন করিত, একালে আয় বাড়িলেও 'ডাহিনে আনিতে বাঁয়ে কুলায় না'—একালে প্রেসিডেন্সী কলেজে বেতনের আধিক্য হইলেও, তথায় পাঠ যত সাধারণ, সেকালে তত ছিল না, যাহারা বৃত্তি পাইত, আর যাহারা অবস্থাপন্ন তাহারাই তখন তথায় পড়িত।"

তাহার পর তিনি আবার বলিতে লাগিলেন :—

"আমি বলিলাম, এত দিন পড়িয়াছি বটে, কিন্তু আর তাহা হইবে না। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন আমার বয়স অল্প—কোন্ কথা বলিতে আর কোন্ কথা গোপন করিতে হয়, সে বিষয়ে আমার ধারণা ছিল না। তাই আমি বাবার মৃত্যু, আমাদিগের সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, মা'র অলঙ্কার বিক্রয়ের প্রস্তাব, আমার সঙ্কল্প সব ব্যক্ত করিলাম। তিনি সাগ্রহে সব শুনিতে লাগিলেন—মনে হইল, তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইল। তখন মনে করিয়াছিলাম, সে আমার ভুল—পরে বুঝিয়াছি, ভুল নহে।

"আমি যতক্ষণ কথা বলিতেছিলাম, ততক্ষণে নন্দকুমার বাবুর মুহুরী দুই বার আসিয়া উকি মারিয়া গিয়াছিল—মক্কেলরা অপেক্ষা করিতেছে। নন্দকুমার বাবু আমাকে বলিলেন, যে বাড়ীতে আমরা বাস করি, তাহা কি আমাদিগের? আমি বলিলাম—তাহাই বটে, তবে আমরা সে বাড়ী ভাড়া দিয়া একটা ছোট বাড়ী ভাড়া

লইব। তাহাতে কি আয় হইতে পারে, তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, বাড়ীর ভাড়া ষাট টাকা পাইতে পারি, তাহা হইলে কুড়ি টাকা বাড়ীভাড়া দিয়া চল্লিশ টাকা মাসে থাকিতে পারে।

"সহসা তিনি বলিলেন, 'মা'র গহনা যে বিক্রয় করিতে দাও নাই, খুব ভাল করিয়াছ। বাড়ী ছাড়িয়া ছোট বাড়ীতে যাইও না—হয়ত স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবে। আমি আজই তোমাকে চাকরী দিলাম। আমার একটি ছোট ছেলে আছে; টাইফয়েডে ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়াছে, পড়ার পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিবে না—সপ্তাহে তিন দিন তাহার সহিত গল্প করিয়া শিখাইতে হইবে, সে সব আমি বুঝাইয়া দিব। তোমার মাসিক বেতন ষাট টাকা হইল।'

"আমি বিস্মিত হইলাম—এ যে 'মেঘ না চাহিতে জল!' তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেও ভুলিয়া যাইলাম। নন্দকুমার বাবু ছেলেটিকে ডাকিলেন, 'তপন! তপন!' বালক আসিল। তিনি আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ইনি তোমার শিক্ষক, গল্প করিবেন।' সে দাঁড়াইয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি ডাকিলে আসিল না। নন্দকুমার বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'অত সহজ হইবে না।' তিনি জামার পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন, 'কাল আসিবার সময় খানকয়েক ভাল ছোট ছবির বহি আনিও।' তিনি চলিয়া যাইলেন।

"সে দিন কি আনন্দ মনে লইয়া বাড়ীতে ফিরিলাম! মা সব শুনিলেন, বলিলেন, এ সংবাদ এত উত্তম যে, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না—ইহা ভগবানের দান।

"সেই দিন হইতে উকীল না হওয়া পর্য্যন্ত সেই বাড়ীতে ছেলে পড়াইয়াছিলাম। পরীক্ষার পূর্ব্বে ছুটী—নন্দকুমার বাবু পূর্ব্বেই বলিয়া দিতেন। তাঁহার স্নেহের ঋণ আমি কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে ভগবানের দানরূপে তাঁহাকে না পাইলে, হয়ত মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনের কেরাণী হইয়াই জীবন কাটিত।"

এক পৌত্রী জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনি তোমাকে অত ভালবাসিলেন কেন?"

শ্যামাধব বলিলেন, "সেই কথাই আজ তোমাদিগকে বলিব; তাহার কারণ, তাঁহার জীবনের নিষ্ঠুর 'ট্রাজেডী'—তাহাই তাঁহাকে আমার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন করাইয়াছিল।"

তিনি বলিতে লাগিলেন :—

"সে বাড়ীতে দুইটি বিস্ময়কর জিনিষ লক্ষ্য করিলাম—যে ঘরে যাইতাম, সেই ঘরেই সেই তরুণীর প্রতিকৃতি—কোন ঘরে বড়, কোন ঘরে ছোট। আর একটি বৈশিষ্ট্য—গৃহিণীর ও বাড়ীর ছোট মেয়েদের অঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারের একান্ত অভাব। গৃহিণীর মণিবন্ধে 'লোহা' আর শাঁখা—গলায় হার নাই; ছোট ছোট মেয়েদের কাহারও কোন স্বর্ণালঙ্কার নাই। যে লোক আমার জন্য মাসিক ষাট টাকা বেতন মঞ্জুর করিলেন, তাঁহাকে কৃপণ মনে করিতে পারি না। তবে? তাহাই বুঝিতে পারিতাম না; মনে করিতাম, খেয়াল। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য কয় মাস পরে জানিতে পারিলাম। বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যায় মা'র নির্দ্দেশে নন্দকুমার বাবুকে প্রণাম করিতে যাইয়া দেখিলাম—বাড়ী অন্ধকার; শুনিলাম, সে দিন তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না। এই সময় তিনি সাধারণতঃ কলিকাতায় থাকেন না—এ বার ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ায় যাইতে পারেন নাই। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই এক কারণ হইতে উদ্ভূত।

"সে কারণ কি, তাহা কোন দিন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি নাই। বাড়ীতে কেহ কখন তাহার উল্লেখ করিত না। দীর্ঘকাল তাঁহার গৃহে প্রথমে শিক্ষক ও পরে তাঁহার 'জুনিয়ার' থাকিয়া আমি 'বাড়ীর ছেলের' মত হইয়াছিলাম—তিনিই আমার বিবাহের সব ব্যবস্থা করিয়া দেন, ওকালতীতে হাতে ধরিয়া বড় করিয়াছিলেন। তিনি আমার গুরু ও অভিভাবক ছিলেন। সকল বিষয়ে আমি তাঁহার উপদেশে কায করিতাম, কখন তাঁহার উপদেশানুসারে কায করিয়া বিফলপ্রচেষ্ট হই নাই।

"যে রোগশয্যা তাঁহার মৃত্যুশয্যা হইয়াছিল, তিনি যখন সেই শয্যা গ্রহণ করিলেন, তখন আমি প্রতিদিন অনেক সময় তাঁহার নিকটে থাকিতাম। সেই সময় এক দিন তিনি আমাকে সেই তরুণীর প্রতিকৃতির কথায় বলিলেন, 'উনি কে জান?' আমি জানি না বলিলে, তিনি বলিলেন, 'আমার দিদি—আমার জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। তুমি যে দিন প্রথম আমার কাছে

আসিয়াছিলে, সে দিন তোমার মাতার অলঙ্কার বিক্রয়ের প্রস্তাবে আমার উঁহার কথাই মনে পড়িয়াছিল—তাই তোমাকে তখনই তপনের শিক্ষক বলিয়া মাসিক ষাট টাকা বেতন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। তুমি যখন তোমার মা'র গহনা বিক্রয়ের প্রস্তাবের কথা বলিয়াছিলে, তখন দিদির কথা মনে পড়ায় আমি আর কিছু বিবেচনা করিতে পারি নাই—তোমাকে রক্ষা করিব—এই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম।'

"তিনি যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিলাম। তিনি বলিলেন, 'তোমাকে ছেলের মত মনে করি। তুমি হয়ত আমার—আমাদিগের কতকগুলি কাযে বিস্মিত হইয়াছ। কিন্তু বিস্ময়ের কিছুই নাই। আমিও দরিদ্রের সন্তান। দিদির বিবাহ দিয়া তিন বৎসর পরে বাবা যখন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইলেন, তখন যে বিপদ ঘটিল, তুমি—তোমার অভিজ্ঞতায় তাহা বুঝিয়াছ। দিদি তাঁহার অসাধারণ রূপের জন্য ধনীর পুত্রবধূ হইয়াছিলেন। তুমি আমার বাড়ীতে দিদির অনেক ছবি দেখিয়াছ; কিন্তু ছবিতে দিদির রূপ বুঝিতে পারা যায় না; তাহার প্রধান কারণ, দিদির চক্ষুর সৌন্দর্য্য ছবিতে বুঝা যায় না। আমাদিগের সংসারে বিধবা মা, আমি, আর আমার একটি ছোট ভাই। মা'র গৃহিণীপনায় আমরা অভাব অনুভব করিতে পারিতাম না। কিন্তু দুর্দ্দিনের জন্য কোন সঞ্চয় ছিল না। এই অবস্থায় যখন আমার বি, এ, পরীক্ষার 'ফীস' দিবার সময় আসিল, তখন তাহা চিন্তার বিষয় হইল। মা তখন কি করিবেন ভাবিতেছিলেন, সেই সময় দিদি বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যার পর মা'কে প্রণাম করিতে আসিলেন। আমরা দুই ভাই পূর্ব্বেই যাইয়া দিদির শ্বশুরবাড়ীতে প্রণাম করিয়া আসিয়াছিলাম। দিদির সহিত মা'র আমার 'ফীস' দিবার কথার আলোচনা হইল। মা বলিলেন, বড় সিন্দুকে কতকগুলা ভারী বাসন আছে—তিনি সেইগুলি বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিবেন। শুনিয়াই দিদি বলিলেন, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি তাঁহার হাত হইতে চুড়ী খুলিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। মা আপত্তি করিলেন—"বৎসরকার দিনে" পরিহিত স্বর্ণালঙ্কার খুলিতে নাই। অগত্যা দিদি বলিলেন, তিনি পরদিন চুড়ী পাঠাইয়া দিবেন। মা বলিলেন, তাঁহার শ্বশুরালয়ে সকলে কি বলিবেন? দিদি হাসিয়া বলিলেন, 'সে ভাবনা তোমাদের নাই।' মা ভাবিলেন, তিনি জানেন, কেহ কিছু বলিবেন না। তখন আমিও তাহাই বুঝিয়াছিলাম।'

"বলিতে বলিতে সেই বৃদ্ধ ব্যথিত বালকের মত কান্দিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, 'আপনি বিচলিত হইবেন না, আর এক দিন আমি সব শুনিব।' কিন্তু তিনি আমার কথা শুনিলেন না তখন তিনি তাঁহার সেই দুঃখের কথা বলিতেই ব্যাকুল। তাই তিনি স্থির হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন :—

"পরদিন দিদি গোপনে এক জোড়া চুড়ী পাঠাইয়া দিলেন। তাহা বন্ধক দিয়া আমার পরীক্ষার 'ফীস' সংগ্রহ হইল। কিন্তু—কিন্তু আমরা জানিতাম না, দিদি কেন সে কায করিয়াছিলেন। পরে দিদি মা'কে তাঁহাকে ক্ষমা করিবার জন্য যে পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা সব জানিতে পারি। দিদি তখন সঙ্কল্প স্থির করিয়া ভয় জয় করিয়াছিলেন। শ্বশুরবাড়ীতে দিদির সুখ ছিল না—অসুখই ছিল। তাঁহার শাশুড়ী যখন তখন তাঁহার পিতৃগৃহের দারিদ্র্যের জন্য তাঁহাকে গঞ্জনা দিতেন। তাহার প্রধান কারণ, শাশুড়ীর রূপ ও গুণ উভয়ের একান্ত অভাব তাঁহার পিতৃগৃহের অর্থের আধিক্যে পূরণ করা হইয়াছিল। দিদির স্বামী কখন তাঁহার মাতার ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না। মা উগ্রপ্রকৃতি এবং সে সংসারে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। স্বামীও তাঁহাকে ভয় করিতেন। তাঁহার ব্যবহার দিদির পক্ষে দুঃসহ হইয়াছিল—দিদি তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাই তিনি নির্ভয়ে ঐ চুড়ী দিয়াছিলেন। সমুদ্রে যাহার শয়ন, সে কি শিশিরে ভয় পায়? যখন ঐ চুড়ীর অভাব লক্ষিত হইলে তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি কেবল বলিয়াছিলেন, তিনি উহা দান করিয়াছেন। তখন আমার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল, তখন জানা গেল, আমি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি। সংবাদ পাইয়া দিদিকে তাহা জানাইতে যাইয়া দেখিয়া আসিলাম, দিদি বড় দুর্ব্বল। তিনি

আমার সাফল্যের সংবাদে বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করিলেন। যে ফুল সৌন্দর্য্যে বিকশিত, তাহা কীট-দষ্ট হইলে তাহা বুঝিতে যেমন বিলম্ব হয়, তেমনই দিদির সৌন্দর্য্য অসাধারণ ছিল বলিয়াই তাঁহার অসুখ সহজে বুঝিতে পারা গেল না। কিন্তু ছয় মাসে তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। মা এক বার দিদিকে আনিতে চাহিলেন। তাহাতে দিদির শাশুড়ী তাঁহাকে বলিলেন, 'না খাইয়ে মারবে ব'লে? না—আরও যে ক'খানা গহনা গায় আছে, তা' আত্মসাৎ করবে ব'লে?' দিদি সেই দিন মা'কে বলিলেন, তিনি যেন আর তাঁহাকে দেখিতে গমন না করেন। মা কান্দিতে কান্দিতে গৃহে আসিলেন। সে রাত্রিতে মা'র ও আমার আহার-নিদ্রা কিছুই হইল না; উভয়ে কান্দিয়া রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন মা'কে উঠিতে হইল তাঁহার সন্তানদিগের জন্য, আমাকেও উঠিতে হইল চাকরীর জন্য।

"'তাহার পর? শ্যামাধব, তাহার পরের সেই বেদনা-দীর্ঘ কথা আর কি বলিব? পরের বিজয়া দশমীর দিন দিদির সব জ্বালা জুড়াইল—তাহার পর মা'র জ্বালাও জুড়াইয়াছে; কিন্তু আমার?' বলিতে বলিতে সেই বৃদ্ধ আবার কান্দিতে লাগিলেন এবং শান্ত হইয়া বলিলেন;—

"'আজ আমার আশা হইতেছে, এত দিন পরে আবার মা'র ও দিদির কাছে যাইব। বল, শ্যামাধব, আমার এই আশা কি ভ্রান্তি?'

"আমি বলিলাম, 'না'।

"তিনি বলিলেন, 'তাহাই বল, শ্যামাধব। মা-ও দিদিরই মত বেদনা লইয়া গিয়াছেন। দিদির মৃত্যুর আঘাত মা সহ্য করিতে পারিলেন না—তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। এদিকে আমি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কায করিতে করিতে উকীল হইলাম, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। মা জিদ্ করিতে লাগিলেন আমার বিবাহ দিবেন। মা'র কথার কখন প্রতিবাদ করি নাই—বিশেষ দিদির মৃত্যুর পর হইতে মা'র অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অপ্রীতিকর কোন কায করিবার কল্পনাও আমি করিতে পারিতাম না। তবুও আমি মা'কে বলিলাম, আমাদিগের অবস্থায় তিনি যেন আমাকে ঐ আদেশ না করেন। মা চক্ষুর জল ফেলিলেন, বলিলেন, আমার প্রতি ও আমার ভ্রাতার প্রতি আমার কর্ত্তব্য আছে—পিতার গৃহে প্রতিদিন সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবার, তাঁহার তুলসীমঞ্চে জল দিবার ব্যবস্থাও আমাকে করিতে হইবে। মা'র কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না, বলিলাম, মা, কিন্তু আমার স্ত্রী সোণার গহনা পরিবেন, তাহা কি আমি সহ্য করিতে পারিব? আমিও কান্দিয়া ফেলিলাম, মা-ও কান্দিতে লাগিলেন। আর কি বলিব? তুমি দেখিয়াছ, আমার স্ত্রী কখন স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করেন না। আর প্রতি বৎসর বিজয়া দশমীর দিন আমি ও আমার স্ত্রী অনাহারে থাকিয়া দিদির স্মৃতি-তর্পণ করি। আমি চাকরী করিয়া প্রথমেই দিদির সেই চুড়ী জোড়ার উদ্ধার করিয়াছিলাম। তাহা আমাদিগের লক্ষ্মীর কৌটায় রক্ষিত—কোজাগরী পূর্ণিমায় যে দিন প্রকৃতি আমার দিদির মত সুন্দরী মনে হয়, সেই দিন তাহার পূজা হয়।'

"নন্দকুমার বাবুর কথা শেষ হইল। তাঁহার পরিবারের যে বৈশিষ্ট্য এত দিনেও বুঝিতে পারি নাই, তাহা বুঝিলাম; বুঝিয়া তাঁহার প্রতি ও তাঁহার পত্নীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। আজ তোমাদিগকে আর একটি কথা বলিব, তিনি দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষালাভের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা ন্যাসরূপে রাখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে আমিই সে টাকার সুদ উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া বণ্টন করিয়া দিয়া থাকি। তিনি পুত্রদিগকে সে কাযের ভার ও দায়িত্ব দেন নাই—আমাকে দিয়া গিয়াছেন; কারণ, আমি দারিদ্র্য-দুঃখ সহ্য করিয়াছি, দরিদ্রের ব্যথা আমি বুঝিতে পারি। তিনি সে ব্যথা বুঝিয়াই দুর্দ্দিনে আমার সহায় ও আশ্রয় হইয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, আমি তাঁহার উদ্দেশ্যানুরূপ কায করিতে পারিব। তাহাতে তাঁহার—আমার গুরুর, আমার দুর্দ্দিনের আশ্রয়ের—আত্মার তৃপ্তি হইবে মনে করিয়া আমি যথাসাধ্য যত্ন-সহকারে তাঁহার সেই কায করিয়া আসিতেছি। যদি তাহাতে কোন ত্রুটি না হইয়া থাকে, তবে তাহাই আমার পুরস্কার।"

বলিতে বলিতে শ্যামাধব বাবুর নয়ন অশ্রু-সজল হইল। তিনি উদ্দেশে নন্দকুমার বাবুকে প্রণাম জানাইলেন।

যাহারা তাঁহার কথা শুনিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ইতিহাসের অনুসরণ

প্রাচীন ভারতে রাজকরের ব্যবস্থা

রাজ্য-পরিচালনের জন্য রাজাকে প্রজার নিকট হইতে কর লইতে হয়; না লইলে রাজার বা রাজ্যের পরিচালকদিগের পক্ষে রাজকার্য্য-পরিচালন অসাধ্য—অসম্ভব হয়। এই জন্যই মানব-সমাজ স্থাপনের প্রারম্ভকাল হইতে রাজ-কর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। অতি প্রাচীন কালে রাজকরের নাম ছিল 'বলি।' ঋগ্বেদে দেখা যায়, জনসাধারণ যাহাতে রাজকর দিতে পারে, সেই জন্য তাহাদিগের সমৃদ্ধি কামনা করা হইতেছে। (১) 'বলিহৃৎ' শব্দের অর্থ করভার-বহনে সমর্থ অর্থাৎ সমৃদ্ধ। দেশের লোক সমৃদ্ধিসম্পন্ন না হইলে করভার-বহনে সমর্থ হয় না। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, কোশ বা রাজস্ব দ্বারাই রাজ্য রক্ষিত হইয়া থাকে। রাজ্যের মূলই রাজস্ব। কৌটিল্য, শুক্র, কামন্দক প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণও ঐ কথা বলিয়াছেন; পাশ্চাত্য দেশের অর্থনীতিবিশারদ ফসেট বলিয়াছেন, প্রচুর অর্থ ব্যয় না করিলে সরকারের কার্য্যসাধন সম্ভব হয় না। সেই অর্থ সংগ্রহের জন্য কর ধার্য্য করা আবশ্যক। (২) জন ষ্টুয়ার্ট মিলও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন। (৩) সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান যুগের বার্ত্তাবিশারদদিগের উক্তির সহিত অতি প্রাচীন যুগের ভারতীয় বার্ত্তিক লেখকদিগের মতের বিশেষ পার্থক্য নাই। হিন্দু-রাজত্বে কি ভাবে কর ধার্য্য করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করা হইত, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সে-কালের আর এ-কালের করাবধারণের পার্থক্য কিরূপ এবং কোথায়,—ইহাতে তাহা বোধগম্য হইবে।

হিন্দুদিগের করাবধারণ-ব্যাপার আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, উহা পরস্পরের কার্য্য-বিনিময়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রাজা বা সরকার প্রজাপালন করিবেন,—প্রজাদিগকে অরাজকতা হইতে রক্ষা করিবেন,—প্রজারা তাহার প্রতিদানে রাজা বা সরকারকে সেই কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ কর দিবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে উহা রাজার ঐ কার্য্যসাধনের জন্য ভৃতি বা বেতন বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাভারতে ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, রাজা প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের উৎপন্ন শস্যের ছয় ভাগের এক ভাগ লইবেন। (১) তখন প্রজাদিগকে এই একমাত্র করই প্রদান করিতে হইত। রাজা যে তাঁহার কার্য্যের বিনিময়ে প্রজার নিকট হইতে কর লইয়া থাকেন, সে কথা ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে সুস্পষ্টরূপেই বলিয়াছিলেন। সেইখানে স্পষ্ট ভাষাতেই বলা হইয়াছে যে, রাজা ঠিক ভাবে গণনা করিয়া (গণনায় অধিক না হয় এমন করিয়া) উৎপন্ন দ্রব্যের যে ষষ্ঠাংশ বলি বা রাজস্ব হিসাবে লইবেন, তাহা এবং অপরাধিগণকে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে অর্থদণ্ড করিয়া এবং পথিমধ্যে বণিকদিগকে রক্ষা করিয়া যাহা পাইবেন, তাহাই তাঁহার বেতন; তিনি তদ্দ্বারাই ধনসঞ্চয় করিবেন। (২) এখানে উহা যে রাজার বেতন, এ কথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। ইহাতে রাজা এবং প্রজা উভয়ের কার্য্য-সাধনের বিনিময়ত্বই সূচিত হয়।

রাজা কদাচ কঠোর (নিষ্ঠুর) ভাবে করগ্রহণ করিবেন না। যাহাতে দেশের শিল্প এবং বাণিজ্যের ক্ষতি হয়, এমন কার্য্য কদাচ করিবেন না। মনুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা। ইনি ক্ষত্রিয় রাজা; পরিণত বয়সে রাজকার্য্যে বিরত হইয়া মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া বনবাসী হইলে, তদানীন্তন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বেদের

---

(১) ঋগ্বেদ ১০।১৭৩

(২) Political Economy, p. 196.

(৩) J. S Mill's Principles of Political Economy, p. 485.

(১) আদদীত বলিঞ্চাপি প্রজাভ্যঃ কুরুনন্দন।
স ষড়্ভাগমপি প্রাজ্ঞস্তাসামেবাভিগুপ্তয়ে॥
মহা, শান্তি, ৬৯ অ।২৫।

(২) বলিষষ্ঠেন শুল্কেন দণ্ডেনথাপরাধিনাম্।
শাস্ত্রানীতেনলিপ্সেথা বেতনেন ধনাগমম্। ম,—শা, ।৭১।১০



স্মৃতি

[শিল্পী—শ্রীব্রজেন্দ্র আচার্য্য]

মর্ম্মানুসারে ব্যবস্থাশাস্ত্র বা আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাই অতি প্রাচীন আইন। তাঁহার রচিত আইন—মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে, "রাজা বাণিজ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য—কত দূর হইতে তাহা আনীত হইয়াছে, এবং সে জন্য ব্যবসায়ীদিগের খোরাকী প্রভৃতিতে কত ব্যয় হইয়াছে, আর চৌরাদির আক্রমণ নিবারণের জন্যই বা কত ব্যয় হইয়াছে, তাহা সমস্তই ধরিয়া, অধিকন্তু ব্যবসায়ের লভ্যাংশও ঐ সঙ্গে হিসাব করিয়া বাণিজ্য-দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করিবেন। যাহাতে রাজা স্বয়ং এবং প্রজাবর্গ স্ব স্ব কার্য্যের ন্যায়সঙ্গত ফললাভ করিতে পারেন, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া রাজ্যে কর স্থাপন করিবেন। যাহাতে মহাজনদিগের মূলধনের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি না হয়, সেই ভাবে, বৎসের দুগ্ধপানের ন্যায়, এবং ভ্রমরের মধুপানের ন্যায় স্বল্প হারে প্রজাদিগের নিকট বার্ষিক কর আদায় করিবেন।" কিন্তু মনু সকল পণ্যের উপর সমান ভাবে কর ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা দান করেন নাই। তাঁহার রচিত আইন অনুসারে স্বর্ণ, রৌপ্য, পশু এবং রত্নাদি ব্যবসায়ে বণিকদিগের যাহা লাভ হইবে, সেই লাভের ৫০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা মাত্র দুই টাকা হারে রাজা করস্বরূপ গ্রহণ করিবেন। জমির গুণের তারতম্য অনুসারে লব্ধ ফশলের ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশাংশ রাজার প্রাপ্য। (মনুসংহিতা, অষ্টম অধ্যায় ১২৭—১৩০ শ্লোক)। এতদ্ভিন্ন, মনু ইহাও বলিয়াছেন, যাহারা সামান্য দ্রব্যের ব্যবসা করে, এবং যে সকল প্রজার অবস্থাও সচ্ছল নহে, তাহাদের নিকট হইতে রাজা যৎ-সামান্য (অতি অল্প পরিমাণে) কর লইবেন। (ঐ, ১৩৩) শিল্প-বাণিজ্যজীবী এবং সাধারণ প্রজাবর্গকে করভারে পীড়িত হইতে না হয়, সে জন্য ভারতের আদি বিধানকর্ত্তা মনু কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সেই আদিম যুগে, যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আদিম অধিবাসিবর্গ বন্যভাবাপন্ন, এবং জ্ঞানের অভাবে নিবিড় অজ্ঞতা-তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন মনু করধার্য্য-বিষয়ে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকবর্গের বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে বহু প্রাচীন যুগের বার্ত্তা-শাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই ধারণা হয়। এখন নীতিশাস্ত্রে এবং বিধানগ্রন্থে উহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুক্রনীতি, কামন্দকীয় নীতিসার প্রভৃতি গ্রন্থে বার্ত্তা-বিষয়ক অনেক তথ্য আছে সত্য, কিন্তু ঐ পুস্তকগুলিকে খাঁটি বার্ত্তাশাস্ত্র বলা যায় না। সেই জন্য বলিতে হয়, প্রাচীন হিন্দুদিগের বার্ত্তা-সম্পর্কিত নীতির স্থূলসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন আলোচনা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাতে Theory নাই, সিদ্ধান্তগুলি সূত্রাকারে বিবৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বা বিজ্ঞানকল্প গ্রন্থে একটা 'আজামৌজা' সিদ্ধান্ত বা 'থিওরী' প্রায়ই বর্ত্তমান।

প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি-বিষয়ক গ্রন্থে তাহা ছিল কি না, নির্ণয় করা দুরূহ। কারণ, সে-কালের খাঁটি অর্থনীতির পুস্তক এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যাহা আছে, তাহার রচনাভঙ্গি দেখিয়া সে-কালের লোকের 'থিওরী' অনুমান করিয়া লইতে হয়। গৌতমসংহিতায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে—প্রজামাত্রই রাজাকে কর দিতে বাধ্য; কারণ, রাজা প্রজার ধন-প্রাণের রক্ষক। মহাভারতের আপদ্ধর্ম্ম-পর্ব্বে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, রাজা প্রজার প্রাণ এবং সম্পত্তি রক্ষা করেন বলিয়া প্রজা তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য। মহাভারতে ভীষ্মও ঐ কথা বারংবার বলিয়াছেন। সুতরাং কর-প্রদান পরস্পর উভয় পক্ষেরই উপকারসাধনের জন্য চুক্তিমূলক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ, প্রাচীন ভারতে প্রজাদিগের অধিকার যে রাজার স্বাধীন ইচ্ছা বা খেয়ালের উপর নির্ভর করিত, ইহা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না।

বস্তুতঃ, রাজা বা রাজকর্ম্মচারীরা স্ব স্ব রুচি অনুসারে প্রজাদিগের উপর কর ধার্য্য করিতে পারিতেন না। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং মহাভারতের রাজধর্ম্মানুশাসন-পর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাজা ধার্ম্মিক এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক দ্বারা যথাশাস্ত্র কর গ্রহণ করিবেন। এখানে বলা আবশ্যক, পুরাকালে নরপতিরা হিন্দুদিগের বিধিনিয়ম প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেন না; সর্ব্বভূতে সমদর্শী ঋষিরাই উহা করিতেন। একমাত্র মনুস্মৃতি ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই সংসারত্যাগী, তপোবনবাসী ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ প্রণয়ন করেন নাই। কিরূপ হারে কর ধার্য্য করিতে হইবে, ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং নীতিশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে

সত্য, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের উপর ন্যস্ত সেই করস্থাপনের ভার যাহাতে পক্ষপাতমূলক, বা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ না হয়, সে-জন্য রাজা সর্ব্বার্থকুশল সচিব নিযুক্ত করিতেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্মের উপদেশ-দানকালে বলিয়াছিলেন, ক্রয়, বিক্রয়, পথ, ভুক্তি (খাদ্য বস্তু), পরিচ্ছদ, এবং যোগ-ক্ষেম (বাণিজ্যদ্রব্যের খরিদ এবং ভাড়া প্রভৃতি) দেখিয়া রাজপুরুষরা বণিকদিগের উপর করধার্য্য করিবেন। উৎপত্তি এবং দানবৃত্তি (production and consumption) আর শিল্পকার্য্য দেখিয়া শিল্পীদিগের অর্থাৎ পণ্যোৎপাদকদিগের উপর করধার্য্য করিতে হইবে। প্রজারা যাহাতে অবসন্ন না হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া মহীপতি বা তাঁহার কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগের উপর অল্প-বিস্তর করধার্য্য করিবেন।(১) কত যুগযুগান্ত পূর্ব্বে ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন,—হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রও এই বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; আর আডাম স্মিথ সে-দিন মাত্র য়ুরোপকে এই কথা শুনাইয়াছেন যে, কর নিশ্চিত হওয়া চাই,—উহা যেন নিরঙ্কুশ এবং যথেচ্ছাচারপ্রণোদিত না হয়। যে সময়ে কর দিতে হইবে, যে পরিমাণে কর দিতে হইবে, তাহা যেন করদাতার এবং জনসাধারণের নিকট সরল হয়।(২) পাছে করাবধারণ কার্য্যে বিশেষ গোল ঘটে, সেই জন্য ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন, যাহাদের বিনয়বতী বুদ্ধি, সুশোভন প্রকৃতি, তেজ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, শৌচ, অনুরাগ, মর্য্যাদা এবং ধারণা—এই সকল গুণ আছে, রাজা তাহাদিগকে সর্ব্বদা পরীক্ষা করিয়া প্রৌঢ়ভাবধুরন্ধর অকপট পাঁচ জন পুরুষকে কর-ধার্য্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। এক জনের হস্তে এইরূপ দায়িত্বভার অর্পণ করা হিন্দু-রাজত্বে নিষিদ্ধ ছিল; কারণ, এক জনের ভুল-ভ্রান্তি হইতে পারে।(৩) লোভী এবং মূর্খদিগকে কোন-ক্রমেই করধার্য্য প্রভৃতি আর্থিক ব্যাপারে নিযুক্ত করা উচিত নহে। কারণ, আর্থিক ব্যাপারে অধিকার পাইলে প্রবৃত্তির বশে তাহারা প্রকৃতিপুঞ্জকে উৎপীড়িত করিয়া থাকে। এই জন্য হিন্দুনীতি অনুসারে করধার্য্য-ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বিত হইত।

তৃতীয়তঃ, ধার্ম্মিক রাজা দেশ, কাল, বুদ্ধি, এবং সামর্থ্য অনুসারে প্রজার নিকট হইতে কর-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন। ইহার অর্থ, রাজা সময় থাকিতেই করধার্য্য করিবেন। রাজা আচম্বিতে করধার্য্য করিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই কর-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না। দেশ অনুসারেও করধার্য্য করিবেন; অর্থাৎ যে সময়ে কর প্রদান দেশের লোকের পক্ষে সুবিধাজনক, সেই সময়েই কর-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে প্রকার চুক্তি সহকারে সেই করধার্য্য করা হইয়াছে, অর্থাৎ যে লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া করধার্য্য করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই যেন কর আদায় করা হয়। অধিকন্তু, প্রজাদিগের কর-প্রদানের সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া, অর্থাৎ তাহারা কি পরিমাণ করভার সহজে বহন করিতে পারে, তাহা লক্ষ্য করিয়া, মতিমান রাজা কর-সংগ্রহ করিবেন। মহাভারতের রাজধর্ম্মানুশাসন-পর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, প্রজাদিগের নিকট হইতে একযোগে অত্যন্ত অধিক অর্থ আদায় করা পীড়নেরই নামান্তর। অন্ধ, জড়, কুব্জ, এবং সপ্ততিবর্ষীয় বৃদ্ধের নিকট কর-গ্রহণ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ—ইহাই মনুর অভিমত। সাধুর ও শ্রোত্রীয় ব্যক্তির প্রতিপালক-গণের নিকট রাজ-কর গ্রহণ নিষিদ্ধ। পাশ্চাত্য জগতের আডাম স্মিথ, ফসেট, এবং মিলও স্পষ্টই বলিয়াছেন, সর-কারের এ ভাবে কর-গ্রহণ করা উচিত—যাহাতে কাহারও কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। ভারতীয় নীতিশাস্ত্র-প্রণেতা-গণও ঠিক ঐ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন ভারতের করধার্য্য করিবার ব্যবস্থা বর্ত্তমান যুগের কর-ধার্য্যের ব্যবস্থা অপেক্ষা যে বহু পরিমাণে উদার ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বাণিজ্য-কর

বণিক বা সার্থবাহদিগের নিকট হইতে রাজা কি ভাবে কর-গ্রহণ করিতেন, তৎসম্বন্ধে কোন কোন কথা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মহাভারতের রাজধর্ম্ম-প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, 'গোমী' অর্থাৎ বৈশ্যদিগের উপর অতি অল্পহারে করধার্য্য করিতে হইবে। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে

(১) মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, ৮৭ অধ্যায় ।১৩—১৫ শ্লোক।
(২) Fawcett's Political Economy. p. 197.
(৩) মহাভারত—শান্তি, ৮৩ অ, ২১-২২ শ্লোক।

বলিয়াছেন, গোমিগণকে নিরন্তর ফলবান করা রাজ্যপালদিগের কর্ত্তব্য। তাহার কারণ, তাহারাই কৃষি এবং বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন দ্বারা রাষ্ট্রকে সমুন্নত করিয়া থাকে। সেই জন্য যাঁহারা বিচক্ষণ, তাঁহারা গোমীদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন। রাজা দয়াবান এবং অপ্রমত্ত হইয়া ইহাদিগের উপর অতি মৃদুভাবে করধার্য্য করিবেন। (মহাভারত—শান্তি, ৮৭ অ, ৩৮-৩৯ শ্লোক)। রাজা যদি গোমিগণকে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তাহারা বিনষ্ট হয়। সেই জন্য রাজাদিগের তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। নীলকণ্ঠ মহাভারতের টীকায় লিখিয়াছেন, গোমী শব্দের অর্থ 'বৈশ্য', কিন্তু বৈশ্যমাত্রই গোমী নামে অভিহিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। গোমী শব্দ 'বলদে' বা সার্থবাহ (caravan) অর্থে ব্যবহার করাই সঙ্গত ; কারণ, সার্থবাহরাই পণ্যের আমদানী-রপ্তানী কার্য্য দ্বারা কৃষক ও শিল্পীদিগের অবস্থার উন্নতিসাধন করিত।

শ্রমশিল্পের উপর রাজ-কর

প্রাচীন কালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় অতিকায় কলকারখানা প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় না ; তবে সেকালে যে বহু লোকের সহযোগে শ্রমশিল্পের ও কারুশিল্পের পরিচালনা হইত, তাহার প্রমাণ দুর্লভ নহে। এই শ্রেণীর কারুশিল্পী এবং শ্রমশিল্পীদিগের কারবারের উপর কি প্রণালীতে করধার্য্য হইত, তাহা জানিতে অনেকের আগ্রহ হইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহাতে বণিকদিগের মূলধনের হানি হয়, বা তাহাদিগের ক্ষতি হয়, সে-ভাবে তাহাদের উপর করধার্য্য করা রাজার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। মনু সাধারণ ভাবে নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, যাহাতে রাজা স্বয়ং, এবং তাঁহার করদাতা প্রজা স্ব স্ব কার্য্যের ফল ভোগ করিতে পারে, ইহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়াই প্রজার উপর রাজ-কর ধার্য্য করা উচিত। মনু আরও বলিয়াছেন, যাহারা কারুকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে, এবং যাহারা শিল্পী, তাহারা সমগ্র মাসে এক দিন মাত্র রাজার জন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে ; অর্থাৎ রাজা মাসে এক দিন তাহাদিগকে খাটাইয়া লইলেই তাহাদের রাজকর দেওয়া হইবে। ইহা হইতে প্রতীতি হয়, শিল্পীদিগকে তাহাদের মাসিক শিল্পজাত পণ্যের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ রাজাকে দিতে হইত ; অর্থাৎ লাভের শতকরা সওয়া-তিন টাকার কিছু অধিক হারে তাহাদিগকে রাজকর দিতে হইত। বিষ্ণুসংহিতায় কথাটা পরিস্ফুটরূপে বর্ণিত হইয়াছে ; যথা,—শিল্পী, কারুশিল্পী, ও শূদ্রগণ প্রতিমাসে রাজার এক একটি কাজ করিয়া দিবেন।(১) শিল্পী, কারুশিল্পী, এবং শূদ্রগণ (শ্রমিক) স্ব স্ব কার্য্যের ক্ষতি না করিয়াও অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বারা রাজার জন্য কাজ করিয়া দিতে পারিতেন।

মনু বলিয়াছেন, রাজা সকল দিক বিবেচনা করিয়া করের হার এ-ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিবেন যে, সেই কর দ্বারা রাজা এবং পণ্যজীবীরা স্ব স্ব কার্য্যের ফল ভোগ করিতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্রে করের হার এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে ; কিন্তু আপৎকালে সেই হারেও যদি প্রজাদিগের কষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজা বিবেচনা সহকারে তাহারও হার হ্রাস করিবেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, শিল্পী প্রভৃতির যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, রাজা সেই ভাবে তাহাদের উপর করধার্য্য করিবেন। রাজা শিল্পী ও কারবারীদিগকে অর্থদানে পোষণ করিবেন। ইহার পর শুক্রনীতিতে শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, অবস্থা বুঝিয়া রাজা শিল্পীদিগকে তাহাদের প্রয়োজনানুসারে পোষণ করিবেন। ফলতঃ, সে-কালে হিন্দু রাজগণ শিল্পীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট থাকিতেন। কারবারীদিগকে শিল্পকার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য রাজা তাহাদিগকে অর্থানুকূল্যও (bounty) করিতেন।

পথ-কর

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন, মহাভারতের পর শুক্রনীতি রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই শুক্রনীতি কত দিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে উহাতে পথ-করের (Road-cess) উল্লেখ আছে। এই শুক্রনীতিতে বলা হইয়াছে, রাজা পথিকদিগের নিকট হইতে পথের সংস্কার-সাধন এবং

(১) বিষ্ণুসংহিতা ৩।১৭

রক্ষার জন্য শুল্ক লইবেন। এইরূপে রাজা সকলের রক্ষার জন্য দাসের ন্যায় রাজস্ব-স্বরূপ বেতন লইবেন।(১) পথ সকলকেই ব্যবহার করিতে হইত, সুতরাং পথকরও সম্ভবতঃ সকলকেই দিতে হইত। এই উপলক্ষে একটা কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলিয়া থাকেন, ভারতীয় রাজারা স্বৈরাচারী ছিলেন; তাঁহাদের ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু এই উক্তি সঙ্গত নহে। রাজা এবং প্রজার সম্বন্ধ পরস্পর অনুবন্ধী ছিল। রাজা প্রজার কাজ করিতেন বলিয়া (সেই সেবা-কার্য্যের জন্য) ভৃত্যের ন্যায় বেতন হিসাবে প্রজার নিকট হইতে করগ্রহণের অধিকারী ছিলেন। রাজা প্রজার কার্য্য সম্পাদন করিয়া ভৃত্যের ন্যায় প্রজার নিকট হইতে বেতন লইবেন। "সর্ব্বতঃ ফলভূক্ ভৃত্য দাসবৎ স্যাত্তু রক্ষণে"—ইহাই শুক্রাচার্য্যের বিধান। মহাভারতেও ঠিক এই কথারই উল্লেখ দেখা যায়, অর্থাৎ রাজা প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন বলিয়াই (তাসামেবাভিগুপ্তয়ে) কর লইবেন। ব্যাঘ্রী যেমন তাহার সন্তানদিগকে কোনরূপে পীড়িত না করিয়া, তাহাদিগকে দংষ্ট্রা সাহায্যে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়, রাজাও সেইরূপ প্রজাদিগকে কোন প্রকার উৎপীড়ন না করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর-গ্রহণ করিবেন। (২) বস্তুতঃ, ইহা হইতে বলা যায়—রাজা প্রজাদিগকে যথাযোগ্যরূপে পালন বা রক্ষা না করিয়াই করগ্রহণ করিলে সিংহাসনে উপবেশনের অযোগ্য বিবেচিত হইতেন।

আমদানী-রপ্তানী-কর

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে শ্রীযুত যশোয়াল—এ দেশে প্রাচীন কালে আমদানী-রপ্তানীর যেরূপ মাশুল ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়াছেন। ডক্টর শ্যাম শাস্ত্রীও 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারীতে' এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নে তাহার সার সঙ্কলিত হইল,—

(১) যে সকল পণ্য রাজ্যের পক্ষে হানিকর, তাহার এবং বিলাস দ্রব্য প্রভৃতির উপর উচ্চহারে করধার্য্য করিয়া তাহার আমদানী বন্ধ করিতে হইবে।

(২) যাহা রাজ্যের পক্ষে হিতকর, তাহা বিনা-শুল্কে রাজ্য মধ্যে আমদানী করিতে হইবে।

(৩) দেশে যে সকল পণ্য পাওয়া যায় না, এবং যে সকল পণ্য ভবিষ্যৎ-উৎপাদনের বীজস্বরূপ হইবে, তাহা বিনা-শুল্কে আমদানী করিতে দিতে হইবে।

(৪) কতকগুলি পণ্য বিদেশে চালান দিতে পারা যাইবে না; পরন্তু তাহাদিগের উপর আমদানী শুল্ক না বসাইয়া তাহা অবাধে আমদানী করিতে দিতে হইবে। যথা—অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক রথ, বর্ম্ম, ধাতু, দুষ্প্রাপ্য বস্ত্র, শস্য এবং গৃহপালিত পশু।

(৫) মদ্যাদির উপর আমদানী ও স্বদেশী শুল্ক এমন ভাবে ধার্য্য করিতে হইবে যে, যেন তাহারা রাজকীয় ভাটিতে প্রস্তুত মদ্য অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে না পারে (১)।

অতিরিক্ত-কর

মনুর বিধানে আছে—আপৎকালে অর্থাৎ যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে, রাজা শস্যের আট ভাগের এক ভাগ কর লইবেন। আর অত্যন্ত আপৎকালে বৈশ্যের অর্থাৎ ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে তাহাদের আয়ের সিকি ভাগ কর লইতে পারিবেন (২)। লভ্যাংশের শতকরা ৫০ ভাগ বা সাড়ে ৬৬ ভাগ কর লইবার ব্যবস্থা কোন কালেই ছিল না। ইহার পরবর্ত্তীকালে কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে বলিয়াছেন, আর্থিক সঙ্কটকালে রাজা শস্যের সিকি পরিমাণ বা তিন ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত করস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিবেন, অর্দ্ধেক লইবার ব্যবস্থা কোথাও নাই। কৌটিল্য সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া আপৎকালে কার্য্য উদ্ধারের কথা বলিয়াছেন। শুক্রাচার্য্যও সে কথা অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, অর্থাৎ আপৎকালে রাজা ধনীদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবেন, এবং তাঁহারা যাহাতে স্বচ্ছন্দে খাইতে-পরিতে পান, তাহারও ব্যবস্থা

(১) শুক্রনীতি ৪।২।১২৯-৩০

(২) ব্যাঘ্রী চ হরেৎ পুত্রান্ সন্দশেন্ন চ পীড়য়েৎ।
মহাভারত—শান্তি, ৮৮ অধ্যায়।৫।

(১) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। ২য়। ২৫। যশোয়ালের Hindu Polity, p. 169.

(২) মনু, ১০।১২০

করিবেন। কিন্তু সেই আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার পর প্রজাকে মায় সুদ সেই সমস্ত অর্থই পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। (১)

শুক্রনীতিতেও বলা হইয়াছে, রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সকলকে সুদ সমেত গৃহীত অর্থ প্রত্যর্পণ করিবেন। (২)

এখানে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। য়ুরোপীয় বুধগণ বলিয়া থাকেন,—প্রাচীন ভারতের রাজগণ সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ শক্তির অধিকারী ছিলেন, প্রজাদিগের কোন ক্ষমতাই ছিল না। তাঁহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। রাজাকে রাষ্ট্রীয় বিপদকালে প্রজাবর্গকে বুঝাইয়া এবং অনুনয়-বিনয় সহকারে অর্থ গ্রহণ করিতে ও যুদ্ধশেষে সুদ সমেত সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে হইত। এখন দেখা যাইতেছে, মহাভারতের রাজধর্ম্মানুশাসন-পর্ব্ব লিখিত হইবার সময় হইতে শুক্রনীতি রচিত হইবার সময় পর্য্যন্ত ভারতের প্রজাগণকে যে স্বৈরি-শক্তি প্রয়োগে শাসন করা হইত না,—তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। এই শুক্রনীতি কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। য়ুরোপীয়দিগের পন্থার অনুসরণে যাঁহারা প্রাচীন পুস্তকাদি রচনার কাল নির্ণয় করেন, তাঁহাদের বহু মত দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্র তাঁহাদের মতের সমর্থন করিবারও উপায় নাই। পণ্ডিত যশোয়াল দীঘনিকার হইতে দেখাইয়াছেন—জনৈক রাজা যজ্ঞ করিবার জন্য প্রজাদিগের নিকট অর্থপ্রার্থী হইয়া আবেদন করিয়াছিলেন। (১) ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, রাজা প্রজাদিগের মতের প্রতিকূলে করধার্য্য ও কর-সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। এ-কালের নিয়মে এবং হারে সে-কালে কর সংগ্রহ করা হইত না।

বস্তুতঃ, আপৎকালে রাজা এবং রাজ্য বা প্রজা উভয়েরই একযোগে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া চলা উচিত। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। শিল্প-বাণিজ্যের যাহাতে ক্ষতি হয়, সে-কালে এমন ভাবে যে করধার্য্য হইত না, পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

(১) অর্থশাস্ত্র, ৩০১-৩০৩ পৃষ্ঠা।

(২) শুক্রনীতি, ৪র্থ অঃ, ২২ পৃ ১১-৩২ শ্লোক।

(১) দীঘনিকায় কূটদন্ত সূত্র এবং যশোয়ালের Hindu Polity, p. 99.

জীবন

জীবনের সাথে আছে ভয়
আছে দুঃখ শত পরাজয়,
তবু যেন সবখানি নয়—মিছে নয়,

যে পান্থ গিয়াছে চলি
কাঁটারে চরণে দলি
বন্ধুর সে পথে শুধু
চিহ্ন নাহি থাকে রক্তময়,
যাহা সে পাইল ফিরে
ভালবাসি ধরণীরে
বেদনার অশ্রু বিনিময়ে,

উপেক্ষিয়া ভাঙা-গড়া
অন্তরে সে দিল ধরা
পূর্ণচন্দ্র নিজ করে লয়ে,
অপচয় নাহি তার
নাহি ভয় শূন্যতার
আরো দূরে চলিবার
হলো তাতে পাথেয় সঞ্চয়,

কর্ত্তব্যের সাথে সাথে
অশ্রু মুছি বেদনাতে
অশ্রু তার ঘুচিবে নিশ্চয়।

শ্রীমোহন রায়।



সুতনু

হাত-পা কোমর-ঘাড়-গলা প্রভৃতির গঠন যদি সুকুমার-ছাঁদের হয়, তাহা হইলে গায়ের বর্ণ শ্যাম হইলেও সে-নারীকে আমরা বলি সুন্দরী! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে এই সৌকুমার্য্য রচিয়া তুলিতে এবং তাহা রক্ষা করিতে মেরুদণ্ডই প্রধান সহায়। মেরুদণ্ডের স্বাস্থ্য ও গঠনের উপর দেহের গঠন-ছাঁদ নির্ভর করে। যে নারীর মেরুদণ্ড সিধা বা মজবুত নয়, সে-নারীর অঙ্গে চাঁদ ষোল-কলা জ্যোৎস্না বর্ষণ করিলেও তিনি কোনো দিন রূপসী বলিয়া সার্টিফিকেট পাইবেন না, "সুন্দরে কুৎসিত" বলিয়াই অভিহিতা হইবেন!

ঘর ঝাড়া, বিছানা করা প্রভৃতি কায়িক শ্রমের কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের পক্ষে মেরুদণ্ডকে সিধা রাখা কতক সম্ভব।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আমাদের মেরুদণ্ডে আটাশ-খানি অস্থি আছে; এবং ইহার প্রতি-জোড়া অস্থি উপাস্থি-(কার্টিলেজ্) সূত্রে সংযুক্ত; এবং ঝিল্লী-তন্তু (লিগামেন্টস্) ও পেশী-সমূহে এই মেরুদণ্ডের সমগ্রতা সম্পাদিত হইয়াছে। এ-কারণে মেরুদণ্ড যেমন নমনীয়, তেমনি শক্ত-সমর্থ। ঘাড়ের কাছে মেরুদণ্ড একটু বাঁকিয়াছে—দুই কাঁধের কাছে পিছন-দিকে; পিঠের মাঝামাঝি সামনের দিকে; তার পর কোমরের কাছে আবার পিছন-দিকে। এই বাঁকের (কার্ভস্) জন্য বাহিরের কঠিন আঘাতে আমাদের মাথা বা মস্তিষ্ক সহজে কাবু বা পীড়িত হইতে পারে না।

মেরুদণ্ডকে শক্ত-সমর্থ করিয়া তুলিতে বিধাতা নিজেই সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। খোদার উপর খোদকারি করিতে গিয়া অর্থাৎ যেমন-তেমন ভাবে বসা-দাঁড়ানো চলা-ফেরা করার ফলে বিধি-দত্ত সে সুব্যবস্থায় আমরা প্রচুর ওলট-পালট ঘটাইয়া দিই। Poor posture is abusing nature. চেয়ারে দেহ গুঁজিয়া বসা বা বাঁকিয়া বসা, কোলকুঁজো ভাবে দাঁড়ানোর অভ্যাসে আমাদের মেরুদণ্ড দুমড়িয়া যায়। তার উপর আছে হাই-হীল্ জুতার উৎপাত! তাহাতে দেহের সামঞ্জস্য রাখা যায় না বলিয়া আমাদের মেরুদণ্ডের গঠনে বিকৃতি ঘটে।

আহারের অনিয়ম, পুষ্টির অভাব—তার ফলেও আমাদের নার্ভের গঠনে ও শক্তিতে বৈকল্য সঞ্চারিত হয়। এ কদভ্যাস ছাড়িতে না পারিলে মেরু-দণ্ডের ক্ষয়রোগ, টিউমর এবং পক্ষাঘাত-ব্যাধি ঘটা অনিবার্য্য!

মেরুদণ্ডের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য ঘী-মাখন, ডিম, শাক, তরী-তরকারী (এ-গুলিতে আছে 'এ' ভাইটামিন) এবং দুধ, বীট্, মটরশুঁটি, ছোলা (ইহাতে প্রচুর 'বি' ভাইটামিন আছে) খাওয়া আবশ্যক। স্নান নিত্য প্রয়োজন। শীতল-জলে স্নান সবচেয়ে উপকারী। শীতল জলে স্নান—দেহের স্বাস্থ্য-ব্যাপারে টনিকের মতো।

তার পর চাই বিশ্রাম এবং সুনিদ্রা। বিশ্রামে দেহ সুস্থ থাকে। দেহের অস্বাস্থ্য ঘটিলে মেরুদণ্ডের অস্বাস্থ্য ঘটিবে। সুনিদ্রায় নার্ভস্ ও মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে। দুশ্চিন্তা যথাসম্ভব বর্জ্জন করিতে হইবে। দুশ্চিন্তার মতো বিষ আর নাই! দুশ্চিন্তায় আমাদের দেহ-মন জর্জ্জরিত হয়।

এই সঙ্গে বিশেষ ব্যায়ামের প্রয়োজন।

১। দু'পায়ে সিধা খাড়া দাঁড়ান। দু'পায়ের মধ্যে একটু ফাঁক থাকিবে। হাঁটু সিধা এবং দু'হাত দু'পাশে প্রসারিত থাকিবে। এইবার কোমরের কাছ হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেহের উর্দ্ধভাগ ঝুঁকিয়া নামাইয়া বাঁ হাতের আঙুলগুলি দিয়া মেঝে স্পর্শ করুন। এ সময় ডান হাত

(১নং ছবির মতো) উর্দ্ধে প্রসারিত রাখিবেন। তার পর আবার সিধাভাবে দাঁড়ান। দাঁড়ানোর পর পূর্ব্ব-প্রণালী-অনুযায়ী ডান হাতের আঙুলগুলি দিয়া মেঝে স্পর্শ করিবেন এবং বাঁ হাত উর্দ্ধে প্রসারিত রাখিবেন।

২। এবার সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া মাথা ডান দিকে হেলাইয়া (২নং ছবির মতো) ডান কাঁধে চিবুক স্পর্শ

৩। সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া কনুই হইতে দু'হাত বাঁকাইয়া মাথার পিছন-দিকে হাতে হাত সংলগ্ন করুন। তার পর কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত সামনের দিকে ঈষৎ (৩ নং ছবি) ঝুঁকিবেন। এমন ভাবে ঝুঁকিবেন, মেরুদণ্ডে যেন একটু চাড় বা টান পড়ে! এই ভাবে দু'মিনিট থাকিয়া গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। তার পর আবার সিধা



১। ডান হাত উর্দ্ধে



২। মাথা ডান দিকে

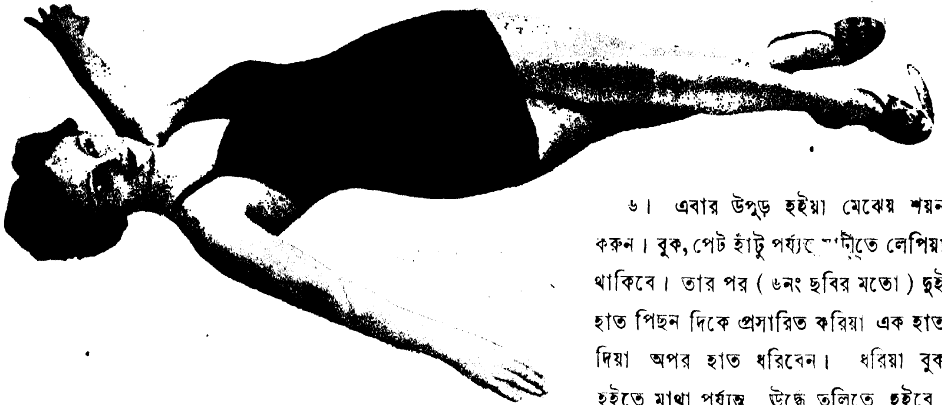


৩। সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া

করিয়া গভীর ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুন—দু'মিনিট। তার পর সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া বাঁ দিকে মাথা হেলান্ এবং বাঁ কাঁধ চিবুকে লাগাইয়া আবার দু'মিনিট কাল গভীর ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুন। এ ব্যায়ামটুকু দশ মিনিট করা চাই। এ ব্যায়ামের সময় দু'পায়ের গোড়ালি তুলিয়া পায়ের পাতার উপরে দেহ-ভার রক্ষা করা চাই।

খাড়া দাঁড়াইবেন। দাঁড়াইয়া গভীর শ্বাস-গ্রহণান্তে আগেকার মতো আবার সামনে ঝুঁকিয়া সুগভীর শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণ-পর্ব্ব! এ ব্যায়ামও দশ মিনিট করা চাই।

৪। এবার মেঝের উপর চিৎ হইয়া শুইতে হইবে—কাঁধ ও পিঠ মেঝেয় সিধা সোজা থাকিবে। শুইবার পর


৪। চিৎ হইয়া শুইয়া

৬। এবার উপুড় হইয়া মেঝেয় শয়ন করুন। বুক, পেট হাঁটু পর্য্যন্ত মাটিতে লেপিয়া থাকিবে। তার পর (৬নং ছবির মতো) দুই হাত পিছন দিকে প্রসারিত করিয়া এক হাত দিয়া অপর হাত ধরিবেন। ধরিয়া বুক হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে তুলিতে হইবে। বুক ও মাথা এ-ভাবে বেশ দ্রুততালে দশ বার তোলা-নামা করা চাই।

নিত্য এ-ব্যায়াম অভ্যাস করিলে দেহের ছাঁদ ও গড়ন হইবে সমঞ্জস, সুশ্রী এবং মেরুদণ্ডের স্বাস্থ্য চিরদিন অটুট থাকিবে।


৬। উপুড় হইয়া

(৪নং ছবির মতো) ডান পায়ের উপরে বাঁ পা রাখিবেন; তার পর বাঁ পায়ের উপরে ডান পা। পা রাখা ব্যাপারটুকু বেশ দ্রুত ভাবে আট-দশ বার করা চাই।

৫। হাঁটু গাড়িয়া বসুন; তার পর (৫নং ছবির ভঙ্গীতে) কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত পিছন দিকে হেলাইয়া দুই হাত দিয়া দুই পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করুন। স্পর্শ করিয়া এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গণিবেন। গণিয়া পা ছাড়িয়া আবার হাঁটু গাড়িয়া সিধা ভাবে থাকিবেন—চকিতের জন্য। তার পর পূর্ব্ব-ভঙ্গীর পুনরাবর্ত্তন। এ ব্যায়াম তাড়াতাড়ি এবং দশ বার করা চাই।


৫। পিছন দিকে হেলিয়া

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য

ক্রীম-রুজ পাউডার মাখিয়া, ভ্রূযুগে কালির তুলি বুলাইয়া যে রূপ-সজ্জা, তাহাতে চারুতার চেয়ে বিকটতাই বেশী ফোটে, এ কথা আমাদের দেশের মেয়েরাও আজ বুঝিতে শিখিয়াছেন। তাঁরা বুঝিয়াছেন, রূপশ্রীর উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা পাউডারে বা ক্রীমে-রুজে নির্ভর করে না—রূপশ্রী নির্ভর করে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যে।

নকল রঙ দিয়া গালে গোলাপের আভা ফুটানো, রঙ মাখিয়া ঠোঁটে প্রবাল রচিয়া তোলা, ঘাড়-গলা বুক-পিঠের সজ্জা-সাধনে বডিস্ প্রভৃতির কঠিন বাঁধন—এ-সবে নারীকে বিশ্রী দেখায়! স্বাস্থ্য ভালো থাকিলে গালে ঠোঁটে গোলাপের রঙ আপনি ফোটে, বুক-পিঠের শোভা-মাধুরীর জন্য বডিস-বন্ধনের প্রয়োজন হয় না,—এ কথা খুব সত্য।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, there can be no beauty without health. অর্থাৎ অস্বাস্থ্যে রূপসীর রূপ মলিন হয়,—নকল রূপ-সজ্জায় বিশ্রী দেখায়।

নারীর রূপ-সজ্জার মূলে আছে পাঁচ জনের চোখে ভালো দেখানোর বাসনা।

রূপ ও শ্রীছাঁদ-সম্পাদনে নিয়মিত ব্যায়াম-অভ্যাসের মতো সহায় আর নাই। ব্যায়ামে অঙ্গে-অঙ্গে যে তরঙ্গ লীলার উদয়, তাহাতে সর্ব্বদেহে রক্ত-চলাচল ভালো হয়। ব্যায়ামের জন্য টোল্-ঢিপি সারিয়া দেহ নিটোল-নিখুঁৎ ছাঁদে ভরিয়া ওঠে।

মেয়েদের রূপ-সাধনার জন্য চাই স্বাস্থ্যের দিকে তীব্র লক্ষ্য, একাগ্র মনোযোগিতা। প্রত্যহ প্রাতে খোলা বাতাসে বিচরণ,—ছাদে বা পার্কে বেড়ানো চাই। তার পর আধ ঘণ্টা ধরিয়া নিয়মিত ব্যায়াম-লীলা। ব্যায়ামে দেহ শুধু শক্ত-সমর্থ থাকিবে, তা নয়, টোল ও খুঁৎ সারিয়া প্রতি-অঙ্গ নিটোল সুসমঞ্জস ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে এবং সে ছাঁদ কোনো দিন নষ্ট হইবে না। জরার সাধ্য থাকিবে না, সে-দেহে আসিয়া আশ্রয় লইবে!

সময় না পান্ বা অন্য কারণে ব্যায়ামে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, বেশ, বেড়ানোর সময়টুকু বাড়াইয়া দিন। হাঁফাইয়া গলদঘর্ম্ম হইবেন, এমন বেড়ানো বেড়াইবার প্রয়োজন নাই! বাজি রাখিয়া কে কত হাঁটিতে পারে, তেমন বেড়ানো দোষের। তাকে বেড়ানো বলে না। মৃদু তালে স্বচ্ছন্দভাবে বেড়াইবেন। নিয়ম করিয়া প্রত্যহ যদি আধ ঘণ্টা বেড়ান, দেখিবেন, ক্লান্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিবেন না; পরিপাকে গোলযোগ ঘটিবে না; সুনিদ্রার অভাব হইবে না; এবং দেহশ্রী সুছাঁদে ভরিয়া উঠিবে।

বিধাতা আমাদের দেহখানি গড়িয়াছেন—সোফায় সে দেহকে শোয়াইয়া হেলাইয়া রাখিব সেজন্য নয়! এ দেহকে নাড়িতে হইবে, খাটাইতে হইবে। ছেলেবেলায় মেয়েরা কত লাফালাফি-দৌড়ঝাঁপ করে। যে-মেয়েরা দৌড়ঝাঁপ করে, লাফালাফি করে, তাদের পাশে বই-মুখে-করা অলস মেয়েদের আনিয়া দাঁড় করান, প্রথম দলের মেয়েদের অঙ্গে যে-দীপ্তি, যে-ছাঁদ দেখিবেন, বই-মুখে-দেওয়া মেয়েদের দেহে তা দেখিবেন না। দেখিবেন, বই মুখী মেয়েদের শীর্ণ মুখ, জীর্ণ হাবভাব—তাঁরা যেন অস্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি! ইঁহাদের পানে চাহিলে শিহরিয়া উঠিবেন! বিবাহ হইলে মেয়েদের দেহ মাংসপিণ্ড, না হয় শুকাইয়া কাঠ হইয়া যায়, তার কারণ সহজ-স্বচ্ছন্দ ব্যায়ামের অভাব।

বয়সের দোষে দেহে বার্দ্ধক্য বা জরা ধরে না! মেয়েদের মধ্যে অনেকে যে কুড়ি বছরে বুড়ী হন, কাহাকেও বা চল্লিশ বৎসর বয়সে সুন্দরী দেখায়, তার কারণ, স্বচ্ছন্দ ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য-বিধি-পালন।

প্রতি অঙ্গের ক্রিয়া-চাঞ্চল্যকে আশ্রয় করিয়াই দেহে সৌন্দর্য্য-মাধুরীর বাস। এই ক্রিয়া-চাঞ্চল্য বা activityর জন্য দেহের গ্লানি ও ক্লেদ ঝরিয়া যায়; নির্বীর্য্য বা ক্ষীণ কোষাণুগুলিকে (cells) নিষ্কাশিত করিয়া তার জায়গায় নব-নব কোষাণুর উদয় হয়।

যে 'চার্ম্ম' বা মাধুর্য্য মেয়ে-জাতকে কমনীয় করিয়া তোলে, সে 'চার্ম্ম' আজ বাঙলা দেশের মেয়েদের দেহ ছাড়িয়া যাইতেছে, তার মর্ম্মভেদী প্রমাণ পথে-ঘাটে নিত্য আমরা দেখিতে পাই। এই 'চার্ম্ম' বা মাধুর্য্যহীনতার কারণ, অস্বাস্থ্যে মেয়েদের দেহ ভরিয়া উঠিতেছে! জীবন-যাত্রার রুটিন বদলাইয়া যাইবার সঙ্গে-সঙ্গে গৃহকোটরে বই-খাতা লইয়া তাঁরা মগ্ন আছেন,—না আছে খোলা বাতাসে বিচরণ, না সেই সে-কালের মতো দেহ নাড়িয়া কাজ-কর্ম্ম করা! দু'দিনের অসুখে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যান,—সন্তান প্রসব করিয়া ছ'মাস শয্যাশায়িনী থাকেন! কারো বা জীবন-দীপ ঐ সন্তান-প্রসবের সঙ্গে-সঙ্গে নিবিয়া যায়! এ-সবের কারণ এই অস্বাস্থ্য। এই অস্বাস্থ্যের জন্যই বাঙলার অন্তঃপুরে রূপশ্রী মলিন,—ইহা অল্প পরিতাপের বিষয় নয়! নকল রঙে বা পাউডারে এ অস্বাস্থ্য কত ঢাকিয়া রাখিবেন? ঢাকিয়া রাখা যায় না! ক্রীম-রুজ-পাউডার ফুঁড়িয়া অস্বাস্থ্যে যে মূর্ত্তিমান কদর্য্যতার আভাস পাই, তাহাতে শিহরিয়া উঠিতে হয়! রূপে ভেলকি খেলা চলে না! এ জন্য আজ নববর্ষে দেহের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে মেয়েদের সচেতন হইতে বলিতেছি। খ্যাতি ও অর্থের সাধনায় মানুষ জীবন-পণ করিতেছে। স্বাস্থ্য কি এমন উপেক্ষার বস্তু যে, সে-দিকে কাহারো হুঁশ হইবে না?



বৈষ্ণবমত-বিবেক



দ্বাদশ অধ্যায়

গৌড়ের সহিত শ্রীজীবের সম্বন্ধ

শ্রীজাহ্নবার ব্রজে আগমন

শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয় প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দদেব শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে যখন বিবাহ করিয়া গৃহস্থ সাজিলেন, তখন তিনি সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা শ্রীবসুধা দেবী ও শ্রীজাহ্নবা দেবী এই দুই সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করেন। বসুধা দেবীর গর্ভে বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র প্রভু নামে একটি পুত্র, এবং গঙ্গা দেবী নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাবের পর তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীল জাহ্নবা দেবী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট যেমন সম্মানার্হা, তেমনই তাঁহার শিক্ষা ও চরিত্রগুণে তিনি চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীল অচ্যুতানন্দ তাঁহাকে জননীর ন্যায় সম্মান করিতেন, শ্রীল নরহরি ঠাকুরপ্রমুখ বৃদ্ধগণের নিকটও তিনি বিশেষভাবে পূজনীয়া ছিলেন। তাঁহার ধীর অথচ অকপট স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে বিশেষরূপে ভক্তি করিতেন।

খেতুরীতে নরোত্তম ঠাকুর পাঁচটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী কাটোয়ার পথে খেতুরীতে আগমন করেন। খেতুরীর মহোৎসবে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া সকল ব্যাপার সুনির্ব্বাহের মূলনেতীরূপে তিনি শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও সন্তোষ রায়কে পরামর্শ দিয়াছেন। শ্রীনিবাস ও নরোত্তম সকল ব্যাপারেই তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীবিগ্রহগণকে উৎসর্গ পূর্ব্বক সমস্ত বৈষ্ণবগণকে সেই প্রসাদে পরিতৃপ্ত করিয়া সর্ব্বশেষে নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

খেতুরীর মহোৎসবে গৌড় বঙ্গ ও উৎকলের তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ প্রায় সকল বৈষ্ণবই উপস্থিত হইয়াছিলেন। উৎসবান্তে শ্রীজাহ্নবা দেবী এখান হইতেই শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন। বহু ভক্ত ও পরিজন তাঁহার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তিনি সপরিবারে মথুরায় উপস্থিত হইলে শ্রীবৃন্দাবনে সংবাদ প্রেরিত হইল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই শ্রীজীব গোস্বামী,—শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামী, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী, বৃদ্ধ শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীল মধু পণ্ডিত, শ্রীল কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিতপ্রমুখ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীঠাকুরাণীকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং সকলে বৃন্দাবনে অগ্রসর হইলেন। শ্রীল জাহ্নবা ঠাকুরাণী পরিজন ও ভক্তবর্গের সহিত মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমনোদ্যতা হইয়াছেন, এমন সময় শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোস্বামিগণ আসিয়া অক্রূরে শ্রীঠাকুরাণীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। শ্রীজাহ্নবা দেবী সকলের সহিত মিলিত হইয়া অক্রূরের গোপীনাথ দর্শন করিলেন। এই স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন—এই জন্য শ্রীচৈতন্যদেব যখন শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন, তখন মথুরায় আসিলেই এই স্থানে অবস্থান করিয়া ভিক্ষা করিতেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীকে এই কথা জানাইলে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিতে বিবশা হইয়া শ্রীল জাহ্নবা ঠাকুরাণী এই তীর্থ দর্শন করিলেন। শ্রীঠাকুরাণী পদব্রজেই শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে চাহিলেন, কিন্তু শ্রীজীব কিছুতেই শুনিলেন না; তিনি শিবিকার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াই শ্রীগোবিন্দদেবের চূড়া দর্শনমাত্রেই তিনি যান হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজেই শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে উপনীত হইলেন। তথায় ধূলিপায়ে দূর হইতে দর্শন করিয়াই শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহাদের জন্য যে নির্জ্জন বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন, তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর স্নান ও বিশ্রাম পুরঃসর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীল মদনমোহন, শ্রীল গোপীনাথ ও শ্রীরাধারমণ এই সকল শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করিয়া দেশ হইতে ইঁহাদের জন্য যে বস্ত্র ও অলঙ্কার আনিয়াছিলেন, তাহা বণ্টন করিয়া দিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট স্বয়ং ভগবান বলিয়া পূজিত। তাঁহার পরেই তাঁহার অভিন্ন কলেবর শ্রীনিত্যানন্দের স্থান। বঙ্গদেশের, উড়িষ্যার ও যুক্তপ্রদেশের বহু স্থানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের যুগল বিগ্রহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীজাহ্নবা দেবী নিত্যানন্দ প্রভুর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমতী, সেইরূপ বিদুষী ও ততোধিক ভক্তিমতী। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবের অবস্থান-স্থানের অতি সন্নিকটেই তাঁহার বাসা ছিল। এই স্থানে থাকিয়া তিনি সুপণ্ডিত শ্রীজীব যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রন্থ শ্রীজীবের মুখে শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। যে নিত্যানন্দ প্রভুর আশীর্ব্বাদ সম্বল করিয়া শ্রীজীব নবদ্বীপ ধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনের পথে বারাণসী ধামে ধাবিত হইয়াছিলেন—সেই সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দেরই অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীকে তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া শুনাইয়া তিনি যেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকেই তাঁহার জীবনব্যাপী শ্রমের ফল নিবেদন করিলেন বলিয়া মনে করিতেছিলেন।

এইরূপ অসীম শক্তিময়ী অথচ অত্যন্ত মৃদুস্বভাব শ্রীজাহ্নবা দেবীকে শ্রীবৃন্দাবনে পাইয়া বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের মধ্যে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। শ্রীগৌড় ও শ্রীবৃন্দাবনের সংযোগসূত্র এই ব্যাপারে আরও সুদৃঢ় হইল। গৌড়মণ্ডলের যে সকল ভক্ত আসিয়াছিলেন—তাঁহারা সদাচারপূত নিষ্কিঞ্চন গোস্বামিগণের প্রেমময় জীবন ও আদর্শ ভজন-পদ্ধতি দেখিয়া, এবং তাঁহাদের অপরিসীম স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। গৌড়মণ্ডলের ভক্তগণের মধ্যে চিরঞ্জীব সেনের পুত্র শ্রীগোবিন্দ দাসের সুমধুর শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অমৃতোপম পদাবলী-কীর্ত্তনে শ্রীবৃন্দাবনধাম প্লাবিত হইল। সকলেই গোবিন্দের অনুপম কবিত্ব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলার নিগূঢ় রসভাবের অপরিসীম শক্তি দর্শনে বিস্মিত ও মুগ্ধ

হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামিপ্রমুখ শ্রীবৃন্দাবনের মর্ম্মী ভক্তগণ গোবিন্দকে "কবিরাজ" উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

শ্রীজাহ্নবা দেবী শ্রীবৃন্দাবনে আসিবামাত্রই শ্রীব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনের আবালবৃদ্ধবনিতা এবং দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে দলে-দলে নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিল। শ্রীল দাস গোস্বামী" বৃদ্ধ ও অতীব শীর্ণকায়,—তাঁহার আসিবার শক্তি নাই বলিয়া তাঁহার অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা জানাইয়া শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজকে প্রেরণ করিলেন। নন্দীশ্বর ও গোবর্দ্ধন হইতে গোপাল ও রাঘব পণ্ডিত আসিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া পরদিন শ্রীঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করিলেন। বহুলা বনের পথেই শ্রীকুণ্ডে গমন করা হইল। শ্রীদাস গোস্বামীর নিকট শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই সংবাদ প্রকাশ করিলে বৃদ্ধ দাস গোস্বামী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে অগ্রসর হইয়া শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন;—ঠাকুরাণী হাত ধরিয়া দাস গোস্বামীকে উঠাইয়া আশ্বস্ত করিলেন। শ্রীঠাকুরাণী ৩।৪ দিন শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান করিয়া স্বহস্তে সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন রন্ধন করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভোগ দিলেন, এবং সেই অমৃতোপম প্রসাদে সমস্ত শ্রীকুণ্ডবাসী ব্রজবাসী-দিগকে ও অন্যান্য ভক্তদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন। এই কয়েক দিন শ্রীকৃষ্ণকথায় পরমানন্দে অতিবাহিত হইল। শ্রীল জাহ্নবা ঠাকুরাণীও পরিচারিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীল গোবর্দ্ধননাথজী ও মানস-গঙ্গাদি দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলেন। যে কয় দিন জাহ্নবা দেবী শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তন্মধ্যে প্রায়ই স্বহস্তে নানারূপ মিষ্টান্ন ও পক্বান্ন প্রস্তুত করিয়া শ্রীল গোবিন্দ, শ্রীল মদনমোহন, শ্রীল গোপীনাথ, শ্রীল রাধারমণ, শ্রীল রাধাবিনোদ ও শ্রীল রাধাদামোদরকে ভোগ দিতেন। এই সময়ে শ্রীজীব গোস্বামী কয়েক দিন ধরিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামিকৃত শ্রীল বৃহদ্-ভাগবতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। এইরূপে কিছু দিন তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া পরে ব্রজমণ্ডলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী দ্বাদশ বন ভ্রমণে বাহির হইলেন।

শ্রীজাহ্নবা দেবীর বন-ভ্রমণকালে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া ভক্তিরত্নাকরের একাদশ তরঙ্গে বর্ণিত আছে। এই বৈষ্ণব দলের সহিত শ্রীজাহ্নবা দেবী রামঘাট দর্শন করিয়া যমুনার তীরবর্ত্তী এক গ্রামে প্রবেশ করিলেন। এই গ্রামে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস করিতেন। ইহাদের যথাসময়ে পুত্র-কন্যা কিছুই হয় নাই—বৃদ্ধকালে তাঁহাদের একটি পরম সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রটির বয়স পাঁচ বৎসর অতীত হইলে সে সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই বালকের মৃত্যুতে তাহার জনক-জননী শোকে বিহ্বল হইলে জাহ্নবা দেবী সেই সময় বৈষ্ণবমণ্ডলী-পরিবেষ্টিতা হইয়া এই গ্রামে প্রবেশ করেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা শোকবিধুরা জননীকে মৃতপুত্র কোলে লইয়া আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিলেন। বালকের পিতাও তখন অত্যন্ত করুণ স্বরে বিলাপ করিতেছিলেন। করুণাময়ী শ্রীজাহ্নবার কোমল হৃদয় শোকার্ত্ত জনক-জননীর বিলাপ শ্রবণে বিচলিত হইল। তিনি করুণার্দ্র চিত্তে মৃত বালকটিকে স্পর্শ করিতে চাহিলেন,—কিন্তু বালকের জননী তাঁহাকে তাহার মৃতদেহ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন। জাহ্নবা দেবী বলিলেন, "তোমরা ব্রজবাসী, আমি তোমার পুত্রকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইবার বাসনা করিয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি মৃত পুত্রের মস্তক কর দ্বারা স্পর্শ করিতেই বালকটি চৈতন্যলাভ করিয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল। মৃতপুত্র এইরূপে জীবনলাভ করিল দেখিয়া পিতা-মাতা আনন্দে অধীর হইলেন। সঙ্গের বৈষ্ণব-মণ্ডলীও পরমানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। গৃহে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল।

এই ব্যাপারে অনেক বৈষ্ণবই বুঝিতে পারিলেন—এই পরমা বৈষ্ণবী ধীর ও মৃদুস্বভাবা রমণীই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপূর্ব্ব শক্তিতে শক্তিময়ী, মহতী শক্তির অধিকারিণী হইয়াও ইনি বৈষ্ণবস্বভাব-সুলভ বিনয়-মাধুর্য্যে মণ্ডিতা।

বনভ্রমণ শেষ করিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী সমভিব্যাহারে শ্রীজাহ্নবা দেবী শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগত হইলে আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। এক দিন শ্রীজাহ্নবা দেবী শ্রীগোপীনাথ-দর্শনে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, শ্রীগোপীনাথের পার্শ্বস্থিতা শ্রীরাধিকা বিগ্রহটির আকার অতি ক্ষুদ্র; শ্রীল গোপীনাথের বামে তাঁহার উপযুক্তা একটি রাধিকা মূর্ত্তি থাকিলে শোভন হইত বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। রাত্রিকালে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীগোপীনাথ ও রাধিকা দুই জনেই যুগল মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন; এবং শ্রীগোপীনাথজী তাঁহাকে বলিতেছেন,—"তুমি যাহা মনে করিয়াছ, তোমাকেই তাহা করিয়া দিতে হইবে; স্বদেশ হইতে ভাস্কর-নির্ম্মিত একটি উপযুক্ত রাধিকা-মূর্ত্তি তোমাকেই পাঠাইতে হইবে। আমি আমার পূজারীকেও সেই শ্রীরাধিকা-মূর্ত্তি আমার বাম পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে যথাসময়ে স্বপ্নাদেশ করিব।" অতঃপর তিনি শ্রীরাধিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইনি অনঙ্গমঞ্জরী, ইনি আমার দক্ষিণে থাকিবেন।"—শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীও হাসিয়া এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

জাহ্নবা দেবী যখন শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পরম ভক্ত ও অনুগত নয়ন ভাস্করও তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। জাহ্নবা দেবী পরদিন প্রাতঃকালে নয়নকে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত এই বিগ্রহ-নির্ম্মাণ প্রসঙ্গের আলোচনার পর শ্রীজীব গোস্বামীকে সংবাদ পাঠাইলেন। শ্রীজীব আসিয়া সকল কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, এই কৌশলে শ্রীল জাহ্নবা দেবীকে গৌড়দেশে প্রেরণ করাই শ্রীগোপীনাথের ইচ্ছা; কারণ, গৌড়দেশের বৈষ্ণবমণ্ডলার মধ্যে শ্রীজাহ্নবা দেবীর বহু কার্য্যই সাধন করিবার ছিল। শ্রীগোপীনাথের অন্যরূপ ইচ্ছা হইলে তিনি জয়পুর ইত্যাদি স্থানের শিল্পী দ্বারাই ঐ বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইবার আদেশ দিতে পারিতেন। শ্রীজীব এই সকল বিষয় বিচার করিয়া বলিলেন,—"শ্রীল গোপীনাথের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আপনাকে পুনরায় খড়দহে ফিরিয়া যাইতে হইবে—আপনি যাইয়া নয়ন ভাস্করের দ্বারা এই বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিবেন; তাহার পরে শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহাদি কার্য্য সমাপনান্তে খড়দহের শ্রীল শ্যামসুন্দরের সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিবেন; তত দিন যদি এ অধম সৌভাগ্যবশে জীবিত থাকে, তবেই তাহার ভাগ্যে আপনার শ্রীচরণের পুনর্দ্দর্শন মিলিবে।"

অচিরেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীজাহ্নবা দেবীর গৌড়দেশে ফিরিয়া যাইবার আয়োজন হইল। তখন শ্রীজীব শ্রীরূপ গোস্বামীর স্বপ্নাদেশে

"শ্রীগোপাল বিরুদাবলী"* নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ও অন্যান্য গ্রন্থ শ্রীনিবাসাদিকে প্রদান করিবার জন্য তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। শ্রীজাহ্নবা ও তাঁহার সঙ্গী বৈষ্ণবমণ্ডলী অতি কষ্টে শ্রীজীব গোস্বামী ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়ে যাত্রা করিলেন।

গৌড়দেশে আসিয়া কিছু দিন পরেই শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীল জাহ্নবা দেবী শ্রীরাধিকার একটি সুন্দর বিগ্রহ নয়ন ভাস্করের দ্বারা নির্ম্মাণ করাইলেন। খড়দহ হইতে নৌকাযোগে বিস্তর বস্ত্র, অলঙ্কার ও অর্থের সহিত এই শ্রীবিগ্রহ শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরী দাসের তত্ত্বাবধানে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করা হইল। শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম, বিষ্ণুপুরের মহারাজা বীর হাম্বীর, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ সকলেই শ্রীবৃন্দাবনে এই বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় আনুকূল্য করিয়াছিলেন। মহা-মহোৎসব সহকারে শ্রীজীবের নেতৃত্বে শ্রীল গোপীনাথের বামে নবনির্ম্মিত রাধিকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইল। শ্রীবৃন্দাবনের সকলেরই নিকট ইনি "জাহ্নবা ঠাকুরাণীর রাধিকা" নামে পরিচিতা।

এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে অনবরত পত্রাদির আদান-প্রদান হইত। বিষ্ণুপুরের ধনবান্ রাজা পরমভক্ত বীর হাম্বীর ও খেতুরীর জমিদার শ্রীসন্তোষ রায়, শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের অন্যান্য ধনবান্ শিষ্যগণ শ্রীবৃন্দাবনে বা গৌড়দেশে বৈষ্ণবজগতের কোনও কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহাতে মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়া ধন্য হইতেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে যে সকল বৈষ্ণবগ্রন্থ আনয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপে তাহা'র বহু প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়া গৌড় বঙ্গ ও উৎকলে প্রচারিত হইতে লাগিল।

শ্রীজীবের নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠ করিয়া পরমপণ্ডিত শ্রীনিবাস আচার্য্য বহু শিষ্যকে সেই সকল শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেম ও ভক্তিরসে সুপ্রবীণ করিয়া তুলিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র গৌড় ও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচার করাইতে লাগিলেন। শ্রীনিবাসের শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যধামগত কাঞ্চনগড়িয়া-নিবাসী শ্রীল হরিদাস আচার্য্য ঠাকুরের দুই পুত্র শ্রীদাস ও শ্রীগোকুলানন্দ সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ হইয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধে পরম প্রামাণিক গ্রন্থ "নরোত্তম বিলাসের" নবম বিলাসে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রসঙ্গে দেখা যায়,—

নিরন্তর ভক্তিশাস্ত্র পড়ান সভারে।
তেন নাহি কারও সাধ্য বাদকল্প করে।
সভামধ্যে গর্জ্জে মহামত্ত সিংহ প্রায়।
শুনিয়া তার্কিক আদি দূরেতে পলায়।
নানাদেশ হইতে লোক পড়িতে আইসে,
ভক্তিগ্রন্থে অধ্যাপক হইয়া যায় দেশে॥
দেবের দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি মহাধন।
শ্রীচৈতন্য ইচ্ছামতে করে বিতরণ॥ †

শ্রীজীবের কৃপায় শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহার সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ শিষ্যগণকে শাস্ত্র অধ্যাপন করিয়া শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র গোস্বামিগণের টীকাসহ এবং অন্যান্য গোস্বামি-গ্রন্থ দেশময় প্রচার করিয়াছিলেন। যথা নরোত্তম-বিলাসে,—

হেন শ্রীআচার্য্যের অভিন্ন কলেবর।
শ্রীঠাকুর নরোত্তম গুণের সাগর।
প্রাণের অধিক প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে।
শ্রীখেতরি গ্রামে বিলসয়ে প্রেমরঙ্গে॥
শ্রীমদ্ভাগবত গোস্বামীর গ্রন্থগণ
নিরন্তর শিষ্যেরে করান অধ্যয়ন॥
ভক্তিগ্রন্থ ব্যাখ্যা শুনি কর্ম্মিজ্ঞানিগণে।
হইয়া বৈষ্ণব সে নিন্দয়ে কর্ম্মজ্ঞানে॥
অন্যদেশী আসি বিপ্র বৈষ্ণব একত্রে।
গোস্বামীর গ্রন্থ পড়ি পড়ান সর্ব্বত্রে॥
ঐছে ভক্তিগ্রন্থ-রত্ন করে বিতরণ।
ভাগ্যবন্ত জনে ইহা করয়ে শ্রবণ॥ *

শ্রীজীবের বিনয়

শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবন হইতে যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরকে প্রথমে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রখানির প্রথমেই লিখিত ছিল,—

"স্বস্তি মদীয় সমস্ত সুখপ্রদ-পাদদ্বন্দ্ব শ্রীনিবাসাচার্য্য চরণেষু—
জীবনামা সোঽয়ং নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়তি।
ভবতাং কুশলং সদা সমীহে—ইত্যাদি।"

"স্বস্তি। আমার সমস্ত সুখপ্রদানকারী পদযুগলসম্পন্ন শ্রীনিবাসাচার্য্যের শ্রীচরণে—জীবনামধেয় ব্যক্তিটি নমস্কার সহকারে বিশেষরূপে জ্ঞাপন করিতেছে। আপনাদিগের কুশল সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, ইত্যাদি।"

শ্রীজীব শ্রীনিবাস আচার্য্যের সমবয়স্ক, বিশেষতঃ, শ্রীনিবাস আচার্য্য বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, এবং পরমভক্ত, এইজন্য বিনয়ীশ্রেষ্ঠ শ্রীজীব শ্রীনিবাস আচার্য্যকে এইরূপ বিশিষ্ট মর্য্যাদাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্য্য যাঁহাকে দীক্ষাগুরুর সমকক্ষ বলিয়া সম্মান করিতেন, যাঁহার শিষ্যত্বলাভ করিয়া তিনি সমগ্র গোস্বামী-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ সম্ভ্রম-পূর্ণ পত্র পাইয়া তিনি যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া এই পত্রের যে উত্তর লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রারম্ভও এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, যথা,—

"স্বস্তি মদীয় সমস্তকুশলপ্রদচরণযুগল পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামিপাদেষু, সোঽহং সেবক শ্রীনিবাসনামা মুহুর্ন্নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়ামি—ইত্যাদি।"

"স্বস্তি। আমার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের নিদানভূত শ্রীচরণযুগলের অধিকারী পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামিপাদসমীপে—আমি শ্রীনিবাস নামক সেবক পুনঃ পুনঃ প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি—ইত্যাদি।"

শ্রীনিবাসের এই প্রকার শিষ্যোচিত বিনয়পূর্ণ ব্যবহারে শ্রীজীব

---

* এই গ্রন্থখানি এত দিন অপ্রকাশিত ছিল; নবদ্বীপ ধাম হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবাজী এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণবজগতের উপকার সাধন করিয়াছেন।

† 'বসুমতী সাহিত্য-মন্দির' হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীর "নরোত্তম-বিলাস" দ্রষ্টব্য।

* 'বসুমতী সাহিত্য-মন্দির' হইতে প্রকাশিত মৎসম্পাদিত বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীর "নরোত্তমবিলাসের" নবম বিলাস দ্রষ্টব্য।

আর পূর্ব্বপ্রকারে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট মর্য্যাদাপূর্ণ "শ্রীচরণে নমস্কার" জানাইয়া পত্রাদি লিখিতে পারিলেন না; কিন্তু তথাপি গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীনিবাসকে পত্রাদি কোনও দিন লিখিতে পারেন নাই। পরপত্রে তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্যকে—"স্বস্তি সমস্তগুণপ্রশস্ত বন্ধুবর শ্রীনিবাসাচার্য্য মহত্তমেষু—" বলিয়া সম্বোধন করিয়া প্রণামের সহিত আলিঙ্গন ও শুভাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়াছেন। অসীম পাণ্ডিত্যবারিধি পরমভক্ত শ্রীজীবের এই আচরণ তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছিল।

ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে তিনি "জীবক" বা অতি ক্ষুদ্রজীব নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীজীবের গ্রন্থে যেখানেই তিনি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য বা শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে কোনও কথা বলিয়াছেন, সেই স্থানেই তিনি বিশেষ মর্য্যাদা সহকারে তাঁহাদের নামের উল্লেখ করিয়াছেন। বিনয়ের অবতার শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ও শ্রীরূপ গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহাদের সমস্ত হৃদ্গত ভাবের উত্তরাধিকারী শ্রীজীব গোস্বামীর এই বিনয়, সর্ব্বভূতে মর্য্যাদাদান ও সকলের প্রতি উদার ব্যবহার সমস্ত বৈষ্ণবজগতের আদর্শস্থানীয়। আজ যাঁহারা জন্মমাত্র গৌরবে প্রভুপাদ, মহাপ্রভুপাদ, মহামহা-প্রভুপাদপ্রমুখ বিশেষণে ও গোস্বামিপাদ ইত্যাদি উপাধিধারণের জন্য ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব কত দূর বর্দ্ধিত করিতেছেন, তাহা কি তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইবেন? শ্রীবৃন্দাবনস্থিত ছয় গোস্বামী ত্যাগীর ও ভক্তের আদর্শ হইলেও তাঁহারা কখনও আপনাদিগকে "গোস্বামী" আখ্যায় অভিহিত করেন নাই। পরন্তু, তাঁহাদের ভক্ত ও অনুগামিগণই তাঁহাদের মান বাড়াইয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু—"শ্রীনিবাস দাস" নামে স্ব-রচিত পদে আত্মনাম প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর স্বীয় গ্রন্থে "নরোত্তম দাস" নামে পরিচয় দিয়া, এবং অন্য নানাপ্রকারে আপনার দৈন্য খ্যাপন করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণের ব্যবহারে যদি এই সর্ব্বোত্তম বিনয়ের ভাব ক্ষুণ্ণ হয়, তবে তাহাতে আমাদের যে মুখ উজ্জ্বল হইবে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমরা এই জন্যই এই স্থলে যিনি পাণ্ডিত্যে ও ভক্তিপ্রভাবে জগদ্‌গুরু হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার অলৌকিক জগৎপাবন বিনয়ের উল্লেখ করিয়া তৎপ্রতি বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের পরিচালক ও নেতৃগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে গমন

জাহ্নবা দেবী শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজবলহাটের সন্নিকটস্থ ঝামটপুরনিবাসী যদুনন্দন আচার্য্যের দুই কন্যা শ্রীমতী ও নারায়ণীর সহিত শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর একমাত্র পুত্র বীরচন্দ্র গোস্বামীর বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করেন। বিবাহের পরেই জাহ্নবা দেবীই এই দুই বধূকে দীক্ষাদান করেন। ইহার কিছু দিন পরে জাহ্নবা দেবী অনুগত শিষ্য ও পরিজনগণ সহকারে পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া আসেন। জাহ্নবা দেবী শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে বীরচন্দ্র প্রভু প্রথমে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, শ্রীখণ্ড ও গৌড়মণ্ডলের অন্যান্য বৈষ্ণব তীর্থে ভ্রমণ করেন।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীল অনন্ত আচার্য্য ঐ সময়ে শ্রীগোবিন্দের সেবার অধিকারী ছিলেন, এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী-গোবিন্দের সেবা-কার্য্যের পরিচালনা করিতেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ঐ সময়ে শ্রীল সনাতনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদন-গোপালের সেবার অধিকারী এবং পণ্ডিত গোস্বামীর অন্যতম শিষ্য শ্রীল গোপাল দাস ঐ সময়ে শ্রীমদন-গোপালের সেবাইত ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের অন্যতম শিষ্য মধু পণ্ডিত শ্রীল গোপীনাথের অধিকারী। পণ্ডিত গোস্বামীর আর এক জন শিষ্য ভক্তানন্দও ঐ সময়ে মধু পণ্ডিতের সহিত এক-যোগে শ্রীল গোপীনাথের সেবা করিতেন। রাধাকুণ্ড হইতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজও ঐ সময়ে রাধাদামোদরে শ্রীজীবের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীজীবের সহিত শ্রীবৃন্দাবন হইতে অগ্রসর হইয়া পরম সমাদর সহকারে শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুকে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া আসিলেন। শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর সুন্দর মূর্ত্তি এবং তাঁহার প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই প্রীতিলাভ করিলেন। কিছু দিন শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া আদর্শ বৈষ্ণব নিত্যানন্দ-নন্দন শ্রীমান্ বীরচন্দ্র প্রভু ব্রজমণ্ডলের বনভ্রমণে বহির্গত হইলেন। শ্রীল যাদবাচার্য্যপ্রমুখ বহু বৈষ্ণবও তাঁহার সহিত মধু, তাল, কুমুদ ও বহুলাদি বন ভ্রমণ করিলেন। অতঃপর ইঁহাদের সহিত তিনি রাধাকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামীও শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঐ সময়ে শ্রীকুণ্ডে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীকুণ্ডে আগমন করিয়া বীরচন্দ্র প্রভু প্রেমে উন্মত্ত হইয়া মহা-সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। প্রভু রাধাকুণ্ডে মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া যাবতীয় বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করিলেন। এই স্থান হইতে তিনি বর্ষাণ, নন্দগ্রাম ও অন্যান্য বনভ্রমণে যাইবেন বলিয়া শ্রীজীব ভূগর্ভাদিকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন।

যাহা হউক, শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভু রাধাকুণ্ড হইতে কাম্যবনে গমন করিলেন ও তথা হইতে শ্রীরাধিকার জন্মস্থান বৃষভানুপুরে বা বর্ষাণে গমন করিলেন। অতঃপর শ্রীজন্মাষ্টমীর সময় বীরচন্দ্র প্রভু নন্দগ্রামে গমন করেন। জন্মাষ্টমীর মহোৎসবে যোগদান-পূর্ব্বক বীরচন্দ্রপ্রভু পাবন সরোবর, খদিরবন, রামঘাট, ভাণ্ডীরবট, নন্দঘাট, চীরঘাট, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, লোহবন ভ্রমণ করিয়া মথুরায় আগমন করিলেন। মথুরায় গোকর্ণেশ্বর শিব দর্শনপূর্ব্বক বিশ্রান্তি-ঘাটে স্নান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পুনরাগমন করিলেন।

কিছু কাল এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভু দেশে প্রত্যাগমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীজীবাদি গোস্বামিগণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরার পথে বহু দূর তাঁহার সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বিদায় দান করিলেন।

গৌড়দেশ হইতে যে সকল বৈষ্ণব শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট শ্রীজীব শ্রীনিবাস আচার্য্যের, নরোত্তম ঠাকুরের ও অন্যান্য বৈষ্ণব মোহান্তগণের সংবাদ বিস্তৃত ভাবে অবগত হইতেন, এবং যখন তাঁহারা দেশে প্রত্যাগমন করিতেন, তখন তাঁহাদিগের নিকট পত্র, নূতন কোনও পুস্তক রচিত হইয়া থাকিলে তাহাও প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব কর্ত্তব্যে অবহিত, উদ্বোধিত ও উৎসাহিত করিতেন। প্রেমবিলাসের সপ্তদশ-বিলাসে দেখিতে পাওয়া যায়, গৌড়দেশ হইতে এক জন বৈষ্ণব শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে শ্রীজীব শ্রীনিবাস আচার্য্য

ও নরোত্তম ঠাকুর কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, কি প্রকারে তাঁহারা গ্রন্থাদি অধ্যাপনা করেন, কি প্রকারে তাঁহারা শ্রীবিগ্রহসেবা করিয়া থাকেন, এবং কি প্রকারে তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়া থাকেন—ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আবার যখন এই বৈষ্ণব শ্রীবৃন্দাবন হইতে দেশে যাইতেছেন, তখন শ্রীজীব পরম স্নেহভরে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন। কখনও দেখিতে পাই যে, শ্রীবৃন্দাবন হইতে তিনি কোনও বৈষ্ণবকে খেতুরীতে ও ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে প্রেরণ করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ও শ্যামানন্দ ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ সেবার রীতি ও বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি পরীক্ষা করিতেছেন। যাহা হউক, এই প্রকারে শ্রীজীবের চেষ্টায় শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে ও গৌড় বঙ্গ ও উৎকলের মধ্যে যে সংযোগসূত্র সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। শ্রীজীবের নির্দ্দেশ অনুসারেই শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ঠাকুর পরিচালিত হইয়া পরমানন্দে ও পরমোৎসাহে পাঠ, কীর্ত্তন ও মহোৎসবাদির দ্বারা সমগ্র গৌড় বঙ্গ ও উৎকলদেশ ভক্তিপ্রবাহে অভিষিক্তিও করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালে যে প্রেমের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল এবং শ্রীল নিত্যানন্দের প্রযত্নে যে প্রবাহ রক্ষা পাইয়াছিল—এবার শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপসনাতনের কৃপাপাত্র শ্রীজীব তাহাতে এক নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়া তাহাকে সুসিদ্ধান্তমূলে চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বঙ্গের ও গৌড়ের সামাজিক জীবনেও এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধন পদ্ধতিতে, তাহিরপুরের মহারাজা কংসনারায়ণের বারেন্দ্র সমাজে বাপগণকে উন্নত করিবার প্রচেষ্টায় এবং পুরন্দর খাঁর দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে—যে উদার ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এই অত্যুদার প্রেমধর্ম্মের দেশব্যাপী প্রচারের ফল। শুনা যায়, দেবীবর ঘটকও বৈষ্ণবধর্ম্মের অতি উদার প্রেমময় ভাবে মুগ্ধ হইয়া শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উত্তর-জীবনে ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণবে পরিণত হন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন এক অলৌকিক প্রেমভাবের বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল—বন্যায় যেমন নদী-নালা-কূপ-তড়াগ সকলই জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ এক অপূর্ব্ব প্রেমবন্যায় তখন গৌড়দেশ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অলৌকিক শক্তিবশে প্রেমদান করিয়া গৌড়দেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভুর এই ভক্তিধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, তাহা পরমকারুণিক শ্রীচৈতন্যদেব বুঝিতে পারিয়া অসীম শক্তিশালী, ত্যাগের আদর্শ ছয় গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের সাধনাপূত জীবনের অনুভূতিলব্ধ শাস্ত্ররাজির দ্বারা অকৈতব বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যান। এই জন্য তিনি গৌড় বঙ্গ ও উৎকলে ভক্তিগ্রন্থ, তত্ত্বসিদ্ধান্ত গ্রন্থাদি প্রেরণ করিয়া কিরূপে তাহার প্রচার হইতেছে, অনবরত তাহার সংবাদ লইবার জন্য অনুগত বৈষ্ণবভক্তগণকে খেতুরীতে, যাজিগ্রামে ও ধারেন্দাবাহাদুরপুরে প্রেরণ করিতেছেন—এ সংবাদ ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। ফলতঃ, এখন হইতে শ্রীবৃন্দাবনই শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলকেন্দ্ররূপে পরিণত হইল। শ্রীজীব যে সংযোগসূত্র স্থাপন করিলেন, শ্রীজীবের শিষ্যস্থানীয় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' নামক মহাগ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা কিরূপে দৃঢ়তর করিলেন, আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

চৈতালি শেষে

শুকতারাটির বিদায় সাথে
চৈতালি রাত্ ফুরিয়ে গেলো
দক্ষিণ হাওয়ার দুয়ার ঠেলে
নূতন দিনের প্রভাত এলো।

ঝরা ফুলের কুঞ্জ আজি
নূতন হোয়ে উঠ্‌লো সাজি
বনে বনে উঠ্‌লো বাজি'
নীরব-হওয়া বাঁশি;

নূতন আলোর পরশ পেয়ে
শতেক-কোকিল উঠলো গেয়ে—
বিদায়-হওয়া ভ্রমর-মেয়ে
গুঞ্জরিল আসি'।

দোয়েল পাখীর বরণ-শীষে
পাতার কুঁড়ি খুললো দোর,
চৈতালি রাত্ ফুরিয়ে গেলো
আজকে এলো নূতন ভোর।

কুমারী শোভনা রায়।

ভারতচন্দ্র

যখন আমাদিগের জ্ঞানোন্মেষ হয়, তখন বাঙ্গালা সাহিত্য বর্ত্তমানের কালের মত সমৃদ্ধ ছিল না। তাহার সমৃদ্ধি যেমন অধিক ছিল না, তাহাতে আবর্জ্জনাও তেমনই অল্প ছিল। শরীরের ক্ষুধার মত মনের ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ যখন অল্প থাকে, তখন সেই স্বল্প উপকরণই লোকের বিশেষ আদর লাভ করে। সেই জন্য তখন কাশীরামের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবিকঙ্কণের চণ্ডী ও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি লোক বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। সন ১২৫৮ সালে মহেন্দ্রনাথ রায় "অস্মদ্দেশীয় প্রকাশ্য পাঠশালা সমূহে বঙ্গভাষার উত্তম পদ্য গ্রন্থ না থাকায়" যে 'কুসুমাবলী' প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রথম খণ্ডে 'অন্নদামঙ্গল' এবং দ্বিতীয় খণ্ডে কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী', কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি রচনা হইতে কতকগুলি অংশ সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে 'অন্নদামঙ্গল' কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত আকারে প্রকাশিত হয়। তখন যে সকল রচনা লোকের কণ্ঠস্থ থাকিত, সে সকলের মধ্যে 'অন্নদামঙ্গল' সর্ব্বপ্রধান। শৈশবে যখন ভারতচন্দ্রের গণেশ-বন্দনা—

"গণেশায় নমো নমঃ আদি ব্রহ্ম নিরুপম
পরমপুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্বস্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরম সুন্দর॥"

সূর্য্য-বন্দনা—

"ভাস্করায় নমঃ হর মোর তমঃ
দয়া কর দিবাকর।
চারি বেদে কয় ব্রহ্মা তেজোময়
তুমি দেব পরাৎপর॥"

প্রভৃতি শুনিতাম, তখনই ভাষার ঐন্দ্রজালিক ভারতচন্দ্রের শব্দ-মন্ত্রের যে প্রভাবে পতিত হইয়াছিলাম, তাহা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিতই হয়। যখন লোককে আবৃত্তি করিতে শুনিতাম—

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥"

তখন উচ্চারিত কবিতার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে মনে আতঙ্কের উদ্ভব হইত।

ঐ সময় শ্রুত অনেক বন্দনা আমাদিগের স্মৃতিগত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর যখন দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে 'পদ্য-পাঠে' "অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা" পাঠ করি, তখন কবির রচনানৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম:—

"ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই॥"

ভাষায় কিরূপ অধিকার ও কিরূপ পাণ্ডিত্য থাকিলে এইরূপ সরল ভাষায় এইরূপ দ্ব্যর্থব্যঞ্জক রচনা সম্ভব হয়, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে আর কোন কবি ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন।

এই কবিতা পাঠ করিতে করিতে পাটনীর জলভরা নৌকায় তাঁহার চরণস্পর্শে স্বর্ণে পরিণত সেঁউতির উপর নিতান্তলাক্ষারসরাগরক্ত চরণ রক্ষা করিয়া উপবিষ্টা অন্নদার যে মূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা এই দীর্ঘ কালেও ম্লান হয় নাই। আর সেই কবিতায় সে কালের অঋণী ও অপ্রবাসী বাঙ্গালীর মনের কামনার পরিচয়

ও মনোভাব—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।" কি এ যখন লক্ষ্য করি, সে কালের সেই ঘটোধ্নী গবী আর নাই—গৃহস্থের গৃহে গো-সেবা নাই, আর আমাদিগের জন্য বিদেশ হইতে চাউল আমদানী হয়—তখন ভারতচন্দ্রের রচনায় বাঙ্গালীর মনের সেই কামনা স্মরণ করিয়া মনে বেদনামাত্র অনুভব করি।

ভারতচন্দ্রের রচনা কিরূপ সমাদৃত ছিল, তাহার প্রমাণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কয় জন লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে "বঙ্গভাষা সমালোচনা সভার" এক অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসু "বাঙ্গালা ভাষা সাহিত্য" বিষয়ক যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—"রায়গুণাকর যে বঙ্গদেশের এক জন অতি শ্রেষ্ঠ কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। মানব-স্বভাব পরিজ্ঞানে যে তিনি কবিকঙ্কণ অপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন, ইহা বলা যাইতে পারে না। ভারতচন্দ্রের রচনায় তিনটি প্রধান লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ, তাঁহার ভাষা এরূপ চাঁচাছোলা মাজাঘসা যে, বঙ্গদেশের অন্য কোন কবির ভাষা সেরূপ মসৃণ ও সুচিক্কণ নহে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সংক্ষেপে এরূপ বর্ণনা করিতে পারেন যে, অন্য কোন কবি সেরূপ পারেন না—

'পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি'
'খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট'

তৃতীয়তঃ, তাঁহার কতকগুলি বাক্য সাধারণ জনগণমধ্যে এত প্রচলিত যে, তাহা গৃহবাক্য হইয়া উঠিয়াছে—

'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'
'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে'
'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।'

(২) যে মহেন্দ্রনাথ রায়ের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তিনি লিখিয়াছেন—"অধুনা অনেকেই পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু শিরীষকুসুমাপেক্ষাও সুকুমার যে ভারতচন্দ্র কবিতা তত্তুল্য রচনা করিতে কে সক্ষম হয়েন। স্বাতী নক্ষত্রের বারিবিন্দু যেমন বস্তুবিশেষোপরি পতিত হইলে তাহাতে এক বিজাতীয় গুণ উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ভগবৎপ্রসাদস্বরূপ কৃপাকণা যে ভাগ্যধর ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাতেই এই অসাধারণ কবিতা রচনার ক্ষমতা জন্মে।"

(৩) রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—"Bharat Chandra's style is always rich, graceful and flowing. Nowhere perhaps in the entire range of Bengali literature do we find the language of poetry so rich, so graceful, so overpowering in artistic beauty as in 'Bidyasundar'. He is a complete master of the art of versification, and his appropriate phrases and rich descriptions have passed into byewords. It would be difficult to overestimate the polish he has given to the Bengali language."

(৪) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—"অবৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে ভারতচন্দ্রের নাম বড় নাম। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ কবি ছিলেন। তাঁহার ভাষা অনুকরণের অতীত, ধীশক্তি প্রখর এবং প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁহার প্রধান কাব্য, তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ ও তাঁহার অমৃতভাণ্ড।"

শাস্ত্রী মহাশয় কেন যে 'অন্নদামঙ্গল' অপেক্ষা তাহার অংশরূপে সন্নিবিষ্ট 'বিদ্যাসুন্দরকে' অধিক গৌরব প্রদান করিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে তিনি প্রমাণ করিতে প্রচেষ্ট হইয়াছিলেন—'বিদ্যাসুন্দরের' আখ্যানবস্তু ভারতচন্দ্রের উদ্ভাবিত নহে। তিনি বলেন—"'বিদ্যাসুন্দর' তাঁহার [ভারতচন্দ্রের] নিজের নহে, ধারকরা জিনিস। ধারও আবার মূল সংস্কৃত হইতে নহে। মূল সংস্কৃত হইতে যদি 'বিদ্যাসুন্দর' ধার-করা হয়, তবে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে অন্য কোন লোক তাহা ধার করিয়াছিল, তিনি ধার-করা জিনিস আবার ধার করিয়াছেন। যথেষ্ট সুদসমেত শোধ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু জিনিসটা ধারের ধার। তিনি কাহার নিকট বিদ্যাসুন্দরের গল্পটি গ্রহণ করিয়াছেন? রামপ্রসাদ সেনের নিকট নহে। কারণ, উভয়েই এককালের লোক, প্রায় এক সময়েই বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, দুই জনেই আর এক জনের নিকট বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছিলেন।" শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে তিনি কবি কৃষ্ণরাম দাস।

ভারতচন্দ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তিনি

যে মূল সংস্কৃত হইতে 'বিদ্যাসুন্দরের' আখ্যানবস্তু গ্রহণ করেন নাই, এমনও বলা যায় না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত বা বাঙ্গালা যে ভাষা হইতেই আখ্যানবস্তু গ্রহণ করিয়া থাকুন না কেন, 'বিদ্যাসুন্দর' বলিলে বাঙ্গালায় ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'ই বুঝায়। কৃষ্ণরামের রচনা আজ বিস্মৃত, রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর'ও আজ কৃত্রিমতাহেতু অনাদৃত। "In literature a thing becomes his at last who says it best." সাহিত্যে যে ভাব যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহারই হয়। সেক্সপীয়রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। আর আমরা 'শ্রীগীতগোবিন্দ' সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীতে তাহা বুঝিতে পারি। কিম্বদন্তী এই যে, যে 'শ্রীগীতগোবিন্দ' রচনাকালে জয়দেবের-রূপে গোবিন্দ আসিয়া অসম্পূর্ণ পদ সম্পূর্ণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছিলেন, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" সেই পুস্তকে জনগণের প্রীতি লক্ষ্য করিয়া উৎকলরাজ স্বয়ং একখানি অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়া রাত্রিতে "শয়নের" সময় নিজ রচনা ও জয়দেবের রচনা রত্নবেদীতে দেবতার চরণতলে রক্ষা করেন। প্রভাতে মন্দিরদ্বার মুক্ত হইলে দেখা যায়—জয়দেবের রচনা রত্নবেদীর উপর জগন্নাথের চরণ চুম্বন করিয়া আছে—রাজার রচনা নিম্নে—হর্ম্ম্যতলে। বাঙ্গালী রসজ্ঞ পাঠক ভারতচন্দ্রের রচনাকেই অমরত্বের গৌরব দিয়াছে। সত্যই তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে যেরূপ সংস্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

এই স্থানে আমরা ভারতচন্দ্রের সম্বন্ধে একাধিক সমালোচকের আর একটি অভিযোগের আলোচনা করিব। মহেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"ভারত প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধ রচনা বিশেষ মাধুর্য্যবিশিষ্ট হইয়া অতিমাত্র জনকমনীয় হইয়াছে, তথাপি উক্ত পুস্তক কোনরূপেই ছাত্রপুঞ্জের পাঠোপযোগী নহে। যেহেতু স্থানে স্থানে বিবিধ অশ্লীল বাক্য ও কদর্য্য ভাষা ব্যবহার হওয়াতে তাহা ভদ্র সমীপে উচ্চার্য্যও নহে।" মহেন্দ্র বাবু যে সময় এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তখন এ দেশে বিদেশীয়রা যে মত ব্যক্ত করিতেন, তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন—রচনা যে স্থান-কাল-সমাজের প্রভাবমুক্ত হয় না, তাহা বিবেচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজ লেখকদিগের কথাই ধরা যাউক—স্পেন্সার হইতে সেক্সপীয়র পর্য্যন্ত কাহারও রচনা এই "অশ্লীলতা"-মুক্ত নহে। তাহার কারণ, তাঁহারা যে সমাজের লোক, সে সমাজে ঐ ভাবের রচনা অনাদৃত ছিল না। যে কৃষ্ণচন্দ্র আপনার সভায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের উভয় স্ত্রীর সহিত ব্যবহার-বর্ণনা উপভোগ করিতেন, তাঁহার সভাকবির রচনা কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই মনে করা যায়। বর্ত্তমান সাহিত্য তাহার তুলনায় অনেক নিম্নস্তরে আবর্জ্জনায় পতিত হইয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী রুচিবিরুদ্ধ; স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। *** কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এই উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের জননী। তাই তাঁহাকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া 'মাতা বসুমতী' বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে মাতৃ-স্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না।

"কবি এখানে অশ্লীল নহেন—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজী রুচি বিশুদ্ধ নহে, দেশী মতই বিশুদ্ধ। আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি এইরূপ বিলাতী রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই।"

সেই জন্য যখন দেখি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় গঙ্গার গতির সহিত বাঙ্গালা কবিতার গতির উপমা দিবার সময় বলিয়াছিলেন—"গঙ্গা যেমন কাশীধামের নিকট প্রবাহিত হইয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার স্তুতিরবে পূর্ণ হইতেছেন, তেমনই বাঙ্গালা কবিতা রামেশ্বর ও রামপ্রসাদের গ্রন্থে শিবদুর্গার স্তুতিরবে পূর্ণ আছে। আবার ঐ গঙ্গা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থল নবদ্বীপের নিকট দিয়া যেরূপ

প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ বাঙ্গালা কবিতা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে।"—তখন মনে হয়, সে কালের এই সকল মনীষীর উদারতা ও রসজ্ঞতা কত অধিক ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগের অনেক প্রাচীন কবির বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী স্থির হইবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আজ যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত (সুশিক্ষিত কি না বলিব না)—যাঁহাদিগের হস্তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানের ভার ও দায়িত্ব প্রদান করা সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মার্জ্জিত রচনা সম্বন্ধে কি, ভাষার না হইলেও ভাবের, অশ্লীলতার অভিযোগ উপস্থাপিত করা অসম্ভব?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন অধ্যাপক একখানি বৈষ্ণব পদাবলী সঙ্কলিত করিয়াছেন। তাঁহারা ছাত্রদিগের বোধের সুবিধা হইবে বলিয়া ঐ সংগ্রহ-পুস্তকে ব্যাখ্যাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং হয়ত এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদিগের নিকট হইতে প্রশংসা ও পুরস্কার বা পারিশ্রমিকও পাইয়াছেন।

যে পদে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন—

"না হ'বে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর।"

সেই পদের টীকায় বলা হইয়াছে—"এ দেশে নাচিবার কৌশল যে অতি অদ্ভুত রূপে আয়ত্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাঁচা সরার উপর অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্পর্শ করাইয়া নর্ত্তকীরা নাচিতে পারিতেন,—মনে হইত যেন তাঁহারা শূন্যের উপর (শূন্যে?) নাচিতেছেন। * * * এখনও এ দেশের নর্ত্তকীরা তাঁহাদের প্রাচীন নৃত্যকলা-কৌশল একেবারে হারান নাই। অতি অল্পদিন হইল লাট সাহেবের অভ্যর্থনা উপলক্ষে ভারতের এক জন মহারাজা তাঁহাকে তাঁহার দেশের (?) নর্ত্তকীদের যে অদ্ভুত নর্ত্তন-কৌশল দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে লাট সাহেব এবং তদীয় অনুচর সাহেবেরা চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন।" ইহার পর সে সম্বন্ধে '[illegible]' সংবাদদাতার কথা উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীরাধার নৃত্যে—আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন-লীলায় যাঁহাদিগের বাইজীদিগের নৃত্যের উপমা মনে হয়, তাঁহাদিগের মনের অবস্থা কিরূপ? রাধাকৃষ্ণলীলা যে অতিপ্রাকৃত, তাহা পাঁচালীকার দাশরথির গানেও সপ্রকাশ—

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস, যদি কর, কমলাপতি!
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হ'বে রাধা সতী।
মুক্তি-কামনা আমারি হ'বে বৃন্দা গোপনারী,
দেহ হ'বে নন্দের পুরী, স্নেহ হ'বে মা যশোমতী।"
ইত্যাদি।

রাধাকৃষ্ণ-লীলা যে নরনারীর কার্য্য নহে, তাহা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ইংরেজরাও বুঝিয়াছেন। হাণ্টার বলিয়াছেন—"The loves of Radha and Krishna, that exquisite woodland pastoral redolent of as etherial beauty as the wild flower aroma which breathes in the legend of Psyche and Cupid." কিন্তু এ কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন অধ্যাপক কি ভাবে সেই লীলা দেখিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে ব্যথিত হইতে হয়।

এই অধ্যাপকদ্বয়ের এক জন কয় মাস পূর্ব্বে একখানি মাসিক পত্রে একটি গল্প ও আর একখানি মাসিক পত্রে একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। গল্পটি বর্ত্তমান কালের হিন্দু সমাজের ঘটনার ভিত্তিতে রচিত। স্বামী পীড়িত—তাঁহার চিকিৎসার জন্য যে ডাক্তারকে ডাকা হইল, স্ত্রী তাঁহার প্রেম-নিবেদনে আকৃষ্ট! আর কবিতাটি কন্যাকুমারী সম্বন্ধীয়। তাহাতে কন্যাকুমারীকে "মাতা" বলিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে:—

"কোথা গিরিরাজ জনক তোমার কোথায় জলধি
অতলস্পর্শ!
কা'র তরে এই চির অভিসার কে জাগালো প্রাণে
বিপুল হর্ষ?"

কবিতাটিতে "অর্ঘ্যথালি"র সহিত "খুলি" যে অপরূপ মিল করা হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিতে ইচ্ছা হয় না; কারণ, মাতার অভিসার-কল্পনা যে সম্ভব, তাহা মনে করিলে লজ্জায় ও ঘৃণায় অধোবদন হইতে হয়।

সুতরাং ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার অভিযোগ কি বর্ত্তমান কালের ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মুখে শোভা পায়?

ভারতচন্দ্র কালের রুচি অনুযায়ী যে রচনাই কেন

করিয়া থাকুন না, আমরা যেন বিস্মৃত না হই, তিনি অপাপবিদ্ধ, ধর্ম্মপরায়ণ, শুদ্ধচিত্ত ছিলেন। তিনি হরি-হরের অভিন্নত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার—

"জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষ ধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্ক শেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশাননাটক বিষাণবাদক
হুতাশ ভালক মহেশ্বর"

প্রভৃতি রচনায় তাঁহার দেবভক্তি সপ্রকাশ।

ভারতচন্দ্রের রচনা বাহুল্যবর্জ্জিত। ইংরেজ কবি টেনিসন লিখিয়াছিলেন—"আমি (সাহিত্য সাধনারম্ভের) অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যদি আমাকে যশ অর্জ্জন করিতে হয়, তবে আমাকে স্বল্প রচনা করিতে হইবে; কারণ, আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা সকলেই বাহুল্য-বিলাসী—সকল বিরাট ব্যাপার তাঁহারা শেষ করিয়া গিয়াছেন।" সমালোচক টেন তাঁহার কথায় বলিয়াছেন, "তাঁহার পূর্ব্বে ক্ষমতাবান কবিরা ঘূর্ণীবাত্যার মত গিয়াছিলেন। * * * মানুষ সেই আতিশয্যের ও চেষ্টার পর বিশ্রামের সন্ধান করিতেছিল। ভারতচন্দ্রও হয়ত সেইরূপ মনে করিয়া রচনা সংযত ও সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, ধর্ম্মমঙ্গল—সবই বাহুল্য-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

তাহার পর ভারতচন্দ্রের রচনা।

টেনিসনের সম্বন্ধে টেন যাহা বলিয়াছেন—তাঁহার সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়—"He completed an age" তখন রাজনীতিক জগতেও নূতন যুগের আরম্ভ হইল—বিদেশী বণিক এ দেশে রাজসিংহাসন অধিকার করিল—মুসলমানের হস্ত হইতে রাজদণ্ড ইংরেজের হস্তগত হইল। যে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে, তাঁহার গুণের আদর করিয়া, "গুণাকর" উপাধি দিয়া সম্মানিত ও সমাদৃত করিয়াছিলেন—এই যুগ-পরিবর্ত্তনে তিনি যথাসম্ভব সাহায্য করিলেন—ভারতচন্দ্র রাজনীতির আবর্ত্ত হইতে দূরে গঙ্গাতীরে যাইয়া পতিতোদ্ধারিণীর কূলে জীবনান্তের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভারতচন্দ্রের মানবচরিত্রজ্ঞান অসাধারণ ছিল। তাহার প্রধান কারণ, তিনি ভাগ্যবিপর্য্যয়ে নানা অবস্থায় নানারূপ লোকের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজ পরিচয়—

"ভুরসিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটী বিখ্যাত দেশে দেশে
ভারত তনয় তাঁর।"

নরেন্দ্র রায় তৎকালে ঐ অঞ্চলে এক জন প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। প্রবলতর জমিদারের সহিত সঙ্ঘর্ষে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হয়েন—ভারতচন্দ্র প্রাচুর্য্য হইতে অভাবে পতিত হইয়া ভাগ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। তিনি বিবাহ করিলেন—তাহা লইয়া তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। তিনি সংসার-ত্যাগী হইয়া ধর্ম্মানুশীলনে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প করিলেন। শেষে যে নরেন্দ্র রায় বহুজনপালক ছিলেন, তাঁহার পুত্র ভারতচন্দ্রকে অন্য জমিদারের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া চন্দন-নগরে ফরাসী সরকারের দাওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তথা হইতে তিনি নবদ্বীপের জমিদার কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় কবি হয়েন। শেষ বয়স ব্যতীত তাঁহার পারিবারিক শান্তিলাভ ঘটে নাই।

এই অবস্থায়ও যে তাঁহার মনে মানুষের ও সমাজের প্রতি বিরক্তি সঞ্জাত হয় নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়—তাহাই তাঁহার প্রকৃতিগত মাধুর্য্যের পরিচায়ক।

ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষাকে ও সাহিত্যকে যে সমৃদ্ধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। আমরা বলিয়াছি, তিনি শব্দমন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক।

"কলকোকিল অলিকুল বকুল-ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে॥
কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে।"

এবং

"ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে।
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীত ধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে॥"

এ সব—এক বার শুনিলে আর ভুলিতে পারা যায় না।

ভারতচন্দ্র স্বয়ং সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ব্যতীত সংস্কৃত ও ফার্শী উভয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মমতের উদারতা শিবের উক্তিতে তিনি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন :—

"মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥
হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে॥
হরিহর দুই মোরা অভেদ-শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সে-ই ভক্ত ধীর॥"

ভারতচন্দ্রের রচনায় সমসাময়িক আচার ব্যবহার প্রভৃতির যে পরিচয় পরিস্ফুট, তাহাতে তাহা সামাজিক ইতিহাসের উপাদানের খনি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বর্ণনা-নৈপুণ্যে সেই সময়ের ধনী ও দরিদ্র উভয় সমাজের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র মানসপটে ফুটিয়া উঠে। কেবল সেই সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাসে অভিজ্ঞতা লাভের জন্যও ভারতচন্দ্রের রচনা বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। এ বিষয়ে কবিকঙ্কণ ব্যতীত আর কেহই ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ বলা যায় না।

ভাব প্রকাশের জন্য ভাষায় কোন শব্দের অভাব অনুভূত হইলে ক্ষমতাবান ও প্রতিভাবান লেখকগণ কিরূপে সে অভাব পূর্ণ করিবার জন্য প্রয়োজনে অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা ভারতচন্দ্রের রচনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবিক ভারতচন্দ্রের রচনার আলোচনা করিলে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি কি ভারতচন্দ্রের রচনার কথা স্মরণ করিয়াছিলেন? তিনি লিখিয়াছিলেন—

"বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে। যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজী, ফার্শি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে। * * তাহার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা অসুন্দর মনুষ্য-চিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে।"

ভারতচন্দ্রের রচনায় এই আদর্শ যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতচন্দ্র কবির রাজা—রাজসভার কবি। তিনি রচনার পারিপাট্য সাধনে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন—তিনি শব্দ সংগ্রহ, সংস্কৃত ও সুসম্বদ্ধ করিয়া তাঁহার রচনা এমন ভাবে গঠিত করিয়াছেন যে, তাহার কোথাও একটি শব্দের স্থানে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করিলেই মনে হয়—রচনার সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হইল।

বহুদিন পূর্ব্বে কোন লেখক ভারতচন্দ্রের রচনাকে কথার তাজমহল বলিয়াছিলেন। তিনি যে ভাবেই ঐ উক্তি করিয়া থাকুন না কেন, আমরা তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি। ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় যাহা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাজমহলের সহিতই উপমেয়। তাহার সৌন্দর্য্য যেমন অতুলনীয়, তাহার গঠন-কৌশল তেমনই অনন্যসাধারণ। যেমন দ্বিতীয় তাজমহল রচিত হইতে পারে না, তেমনই ভারতচন্দ্রের রচনার তুল্য রচনাও হইতে পারে না। তাজমহল রচনায় যেমন নানা দেশ হইতে সংগৃহীত মূল্যবান উপকরণও ব্যবহৃত হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের রচনায় তেমনই নানা ভাষায় ব্যবহৃত মূল্যবান উপকরণ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা ভাষার অসাধারণ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন; বাঙ্গালী-মাত্রকেই অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার রচনাই তাঁহার কালজয়ী কীর্ত্তি—তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবে। কিন্তু সেই স্মৃতিরক্ষার জন্য আমাদিগের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

আজ মধুসূদনের কথা আমরা স্মরণ করিতেছি:—

"মোহিনী-রূপসী বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
অন্নদা। বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী,
অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি
রাজাসন রাজচ্ছত্র দিবেন সমরে
রাজলক্ষ্মী; ধনস্রোতে তব ভাগ্যতরী
ভাসিবে অনেক দিন জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে;
চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল;
তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে?
তব বংশ-যশোঝাঁপি 'অন্নদা মঙ্গল'—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে
রাখে যথা সুধামৃত চন্দ্রের মণ্ডল।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।



নব বৈশাখের এক দিন



(পল্লী-জীবনের কথা)

তরুণ সূর্য্য সবেমাত্র পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়াছে। নব বৈশাখে আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের পথে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছি। বৈশাখে পল্লীগ্রামের প্রাভাতিক দৃশ্য-শোভা অনুপম। বন-বিহঙ্গের সুমধুর কাকলী, নানা জাতীয় প্রস্ফুটিত কুসুমের মিশ্র সৌরভ, প্রভাত-সমীরণের সুশীতল মৃদু হিল্লোল গ্রামবাসীর রোগজীর্ণ ভগ্ন দেহে নব জীবনের সঞ্চার করিতেছে।

আমাদের গ্রামের দক্ষিণ সীমায় গোপ-পল্লী, তাহার পরই হোটেল-পাড়া; তাহা অতিক্রম করিয়া মহকুমার ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত। আদালতের হাতার বাহিরেই আমাদের একটা আম-কাঁটালের বাগান—বিঘা-পাঁচেক নিষ্কর জমিতে অবস্থিত। ভাবিলাম, আম-কাঁটাল পাকিবার সময় নিকটবর্ত্তী, বাগানটার অবস্থা দেখিয়া আসি। পল্লীগ্রামের বাগান, তাহার অদূরে গোপ-পল্লী; গোয়ালাদের দৌরাত্ম্যে বাগানের কিছুই পাওয়া যায় না। তাহারা খোঁয়াড়ের গরু-বাছুরগুলি লইয়া বাগানে প্রবেশ করে, এবং পরদ্রব্য লোষ্ট্র-জ্ঞানে কাঁটালগুলি গাছ হইতে পাড়িয়া গো-সেবায় তাহাদের সদ্ব্যবহার করে। আমগুলি পাড়িয়া বাদিনীদের সাহায্যে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে। প্রতিকারের উপায় নাই; যে রক্ষক সে-ই ভক্ষক। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ বাগানের এই অবস্থা। অনেক বাগানের ফল বিক্রয় করিয়া জমির খাজনা পর্য্যন্ত উঠে না!

কিন্তু বাগান পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। বাড়ীর অদূরবর্ত্তী বহুপ্রাচীন এক সুবিশাল তেঁতুল-গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি; দেখি, আমার প্রথম জীবনের সতীর্থ গ্রামস্থ ইংরেজী স্কুলের গণিত-শিক্ষক বৃদ্ধ রাজেন্দ্র ঘোষ জুতাজামায় মণ্ডিত হইয়া ছত্র-হস্তে গজেন্দ্রগমনে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত সকালে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"

রাজেন্দ্র বলিলেন, "ভালই হ'ল, চল, আমদয়ে যাই। সেখানে খোকা ঠাকুরের শিব উঠেছে। আজ শনিবার, সেখানে মেলা ব'সবে। বারতলায় শুনেছি বিস্তর জন-সমাগম হয়। কি ব্যাপার দেখে আসা যাক। বেশী দূর ত নয়। এক ক্রোশের একটু বেশী; রোদ না পাক্‌তেই ফিরে আসতে পারবো।"

কথাগুলি বলিয়া তিনি আনাভিপ্রলম্বিত শুভ্র দাড়ির ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিলেন। প্রভাতবায়ু হিল্লোলে তাঁহার সুদীর্ঘ শ্মশ্রুজাল শ্বেত-চামরের ন্যায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। রাজেন্দ্র আমার অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তাঁহার বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর; কিন্তু দেহ নিরোগ, যুবকের দেহের ন্যায় সুদৃঢ়! তিন-চারি ক্রোশ তখনও অক্লেশে হাঁটিতে পারিতেন।

দাড়ি লইয়া তাঁহাকে বিব্রত দেখিয়া বলিলাম, "ও-গুলো বিসর্জ্জন ক'রতে আপত্তি কি? মুখে একটু আলো-বাতাস লাগে।"

রাজেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, "ও অনুরোধ ক'রো না ভাই! ঐ দাড়ি এক দিন আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছে। এ বুড়ো বয়সে কৃতঘ্নতা ক'রবো না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?"

রাজেন্দ্র প্রকাণ্ড 'মেছুড়ে' ছিলেন; ছিপ্ দিয়া মৎস্য শিকার করিবার জন্য পদব্রজে পাঁচ ক্রোশ দূরস্থ পুষ্করিণীতে যাইতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। পঁচিশ-ত্রিশ সের রুই এই বয়সেও অনায়াসে খেলাইয়া তুলিতেন। মৎস্যশিকারে 'নোবেল প্রাইজ' থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই তাহা পাইতেন। গ্রামের ক্ষেতা মালোকে তিনি এই বিদ্যায় তাঁহার ওস্তাদ বলিয়া স্বীকার করিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ক্ষেতা তোমার ওস্তাদ হ'ল কি উপলক্ষে?"

রাজেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "সে বড় মজার কথা! বহুদিন পূর্ব্বে আমি দৈনিক এক টাকা দর্শনী দিয়ে মিউনিসিপালিটীর 'রিজার্ভড্ ট্যাঙ্কে' ছিপ্ জমা নিই। পুষ্করিণীতে বড়-বড় রুই-কাতলার অভাব ছিল না; কিন্তু আমরা কুড়ি-পঁচিশ জন শিকারী ছিপ্ ফেলে সকাল থেকে ব'সে আছি, কারও বঁড়সীতে একটা ঠোকাও নেই!"

"সমস্ত দিন পরে একসিলিম তামাক সেজে-নিয়ে হতাশ ভাবে ডাবা হুঁকাটার মুখচুম্বন ক'রছি, হঠাৎ ক্ষেতা মালো এসে আমার পাশে ব'সে বল্লে—'কিছু হ'লো না দাদাবাবু!' ক্ষেত্তর আমার কাকার (মোক্তার গোবিন্দ ঘোষের) মক্কেল; এজন্য আমার প্রতি তার একটু দরদ ছিল। আমি ব'ল্লাম, 'কৈ আর হ'ল? টাকাটাই জলে গেল দেখছি!'—ক্ষেত্তর ব'ললে, 'মাছগুলো ধ্যাঁচড়া হ'য়ে গিয়েছে; একটু তুক-তাক না ক'রলে একটা মাছও বাধাতে পারবো না।'—আমি ব'ললাম, 'তুক-তাক মন্তর-টন্তরের বলে কি মাছে টোপ গিলবে? আমরা 'ইংরেজি-নবিস্ জাণ্টল্ম্যান'—এই কথা আমাকে বিশ্বাস ক'রতে বল?"

"ক্ষেত্তর হেসে ব'ল্লে, 'তুক-তাকে ফল হয় বৈ কি? বিয়ে-বাড়ীতে আমি এক মণ দেড় মণ মাছের বায়না নিয়ে ছিপ্ হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়ি; তার পর কোন ভাল পুকুরে ছিপ্ জমা নিয়ে, সেই ছিপ্ দিয়ে বায়নার মাছ যতগুলো দরকার তা ধ'রে সন্ধ্যের মধ্যে বিয়ে-বাড়ীতে হাজির করি। তুক-তাক করি ব'লেই ত তা পারি।'—আমি ব'ললাম, 'বেশ, আজ তোমার তুক-তাকের গুণ দেখিয়ে দাও, ক্ষেত্তর!'

"ক্ষেত্তর আমার ছিপ্ তুলে-নিয়ে বঁড়সীতে নূতন টোপ্ গাঁথলে; ফাৎনাটা একটু সরিয়ে দিলে। তার পর টোপ-সমেত বঁড়সী মুখের কাছে এনে বিড়্বিড়্ ক'রে কি ব'লে জোরে-জোরে তিনটে ফুঁ দিলে; তার পর টোপ্টা চার লক্ষ্য ক'রে গভীর জলে ফেলে ছিপ্খানা আমার হাতে দিয়ে বল্লে—'ফাৎনার দিকে ভাল ক'রে নজর রেখো দাদাবাবু, দেখ কি হয়।'

"আমি ছিপ্ হাতে-নিয়ে ফাৎনার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে ব'সে আছি। মিনিট-পাঁচেক পরে ক্ষেত্তর আমার পিছনে ব'সে কল্কেতে তামাক সেজে টিকে ধরাচ্ছে। হঠাৎ দেখি, ফাৎনা জলের ভিতর অদৃশ্য হ'য়েছে, সঙ্গে সঙ্গে হুইলের সুতোয় টান, তার পর 'ঘর-ঘর' 'ঘর-ঘর' শব্দে হুইলের সুতো ছুটলো—নক্ষত্র বেগে! চার দিক থেকে দর্শকরা আমার কাছে এসে দাঁড়ালো।—ক্ষেত্তর কল্কেটা তাড়াতাড়ি ফেলে-রেখে বল্লে, 'জবর হেতের বটে! দাদাবাবু, তুমি ঠেকাতে পারবে না, ছিপ্খানা আমার হাতে দাও।'—সে ছিপ্ হাতে নিয়ে কি চমৎকার খেলাতে লাগ্লো! ছিপের মাথা ধনুকের মাথার মত বাঁকা, আর হুইলের সুতোয় কি টান্! পুষ্করিণীর জল তোলপাড় ক'রতে লাগ্লো! দেড় ঘণ্টা খেলিয়ে তুললে লাল টুকটুকে প্রকাণ্ড এক রুই। ওজন ক'রে দেখা গেল—সাড়ে-বাইশ সের! জলের ভেতর কি তার প্রতাপ! সেই দিন থেকে ক্ষেতা আমার ওস্তাদ। আমার নাম হ'ল 'মেছুড়ে মাষ্টার'!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তোমার দাড়ির মাহাত্ম্য এখনও শোনা হয়নি।"

রাজেন্দ্র বলিলেন, "সেই কথাই এখন ব'লবো। ভূমিকাটা আগে সেরে নিলাম।—অল্প দিন আগে তোমার প্রতিবেশী আশু বোসের পুকুরে মাছ ধ'রতে গিয়েছি। সারা দিন চেষ্টা ক'রে বিশেষ কিছু হ'লো না। পুকুরে খুব বড় মাছ ছিল না, কয়েকটা ছোট রুই-কাতলা উঠলো; কিন্তু শিশুহত্যা ক'রতে প্রবৃত্তি না হওয়ায় সেগুলা ছেড়ে দিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এল, অন্ধকারে ফাৎনা আর দেখা যায় না; কাজেই হুইলের সুতো গুটিয়ে ছিপ্ নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ পিছনে নজর প'ড়লো। আশুর পুকুরের পূর্ব্ব পাড়ে বহুদূরব্যাপী অগাধ জঙ্গল; সেই জঙ্গলে দুই-পাঁচটা হাতী লুকিয়ে থাকতে পারে। দেখি, এক বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্য্য সেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পুকুরের পূর্ব্বপাড়ে লাঙ্গুলাসনে উপবিষ্ট! বোধ হয়, সন্ধ্যাকালে তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য পুষ্করিণীতে নামছিল, কিন্তু জলের ধারে আমাকে দেখে সেই স্থানেই আসন গ্রহণ ক'রলে।

"প্রকাণ্ড বাঘ! সমস্ত দেহে উজ্জ্বল পীতবর্ণের চক্র। আমাকে দেখে সে দুই কান খাড়া ক'রে টিকটিকির মত লাঙ্গুল আন্দোলন ক'রতে লাগলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর

গোঁ-গোঁ শব্দ! সন্ধ্যা তখন নিবিড় হ'য়েছে, কোন দিকে জন-প্রাণীর সাড়া-শব্দ নেই; মরদ যদি হঠাৎ ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, আর বুকে-পিঠে দুই একটা থাবা মারে, তাহ'লেই চিত্তির! কথায় বলে 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা!' বড়ই সমস্যায় পড়া গেল; কি করি, ভাবছি! হঠাৎ মাথায় একটা ফন্দী এলো! ব্যাঘ্রবর আমার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রছে দেখে আমি তার চক্ষুতে দৃষ্টিস্থাপন ক'রে আমার এই এহকাত দীর্ঘ পাকা দাড়ি দুই হাতে আন্দোলিত ক'রে 'আও, আও!' শব্দে তাকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রলাম। আমার বিকট মুখভঙ্গি, আর সেই সাদা দাড়ির নিশান উড়তে দেখে বাঘটা আমাকে বোধ করি 'সিংহের মামা ভোম্বলদাস' মনে ক'রে ঘাবড়িয়ে গেল। তার পর ধীরে-ধীরে উঠে পিছনের পগারে লাফিয়ে-প'ড়ে অদৃশ্য হ'ল। আমারও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো!—এমন হিতৈষী দাড়ি কি বিসর্জ্জন দিতে পারি? এ আমার সঙ্গে চিতায় উঠে দেহের সঙ্গে সদ্গতি লাভ ক'রবে।"

তাঁহার এই আশা পূর্ণ হইয়াছে; কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার এই সহাধ্যায়ী সুহৃদকে হারাইয়াছি।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের হিরণ্য-জয়ন্তীর পরবৎসর আমরা একত্র এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়াছিলাম। তাহার পর সুদীর্ঘ ৫৩ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালে পৃথিবীতে কত রাজ্যের উত্থান-পতন হইয়াছে; কত লোক জন্মগ্রহণ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন ও খ্যাতিলাভ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ভারত যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। আমার কলহাস্য-কল্লোলিত, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিপরিবৃত সুখের সংসার আজ শ্মশান; রুদ্ধগৃহে সন্ধ্যার প্রদীপ দেখাইতেও কেহ সেখানে নাই! রাজেন্দ্রনাথ এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু গণিতে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা থাকায় গ্রামের ইংরেজী স্কুলে তিনি গণিতের শিক্ষক-পদে এই সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিয়াছেন। আমাদের উভয়েরই জীবন ব্যর্থ হইয়াছে। রাজেন্দ্র যদি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে রাখালরাজের ন্যায় তিনি সংসারে অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন।

রাখালরাজ আমাদেরই মহকুমাবাসী; তিনি দরিদ্রের সন্তান, ধনবানের আশ্রয়ে থাকিয়া কলেজে এল-এ, পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি কলেজে আমার সতীর্থ ছিলেন। আমাদের গণিতের অধ্যাপক গোবিন্দলাল শেঠ মহাশয় রাখালরাজের প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বলিতেন, "দেখ রাখাল, তোমার অত্যাচারেই আমাকে চাকরী ছেড়ে পালাতে হবে!"

রাখালরাজ ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন; এম-এ, পরীক্ষায় গণিতে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন, এবং যে কলেজের তিনি ছাত্র ছিলেন, সেই কলেজেই অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল শিক্ষাবিভাগের চাকরীতে অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করেন; পরে কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বনায় রাজেন্দ্রনাথকে আজীবন দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

বার্দ্ধক্যে সে দিন আমার আর এক জন সহাধ্যায়ীকেও হারাইয়াছি। ৭২ বৎসর বয়সে আমার বাল্যবন্ধু কানাইলাল পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। কানাই আমার আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার একখানি পা অচল ছিল; সেজন্য স্বাধীন ভাবে চলাফিরা করিতে পারিতেন না। তাঁহার পিতা ব্যবসায় করিতেন; মৃত্যুকালে তিনি কানাইএর জন্য বিশেষ-কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিদ্যালয়ে কানাই যৎসামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ব্যবসায়-বুদ্ধি এরূপ প্রখর ছিল যে, এক স্থানে বসিয়াই তিনি ব্যবসায়ে অসাধারণ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায়-লব্ধ অর্থে অনেক টাকা আয়ের জমিদারী, এবং নানা স্থানে মোকাম স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিয়াছি, প্রবীন বয়সে বহুধনের অধিকারী হইয়াও তিনি আমাদের মহকুমাস্থিত গদীতে বসিয়া সকালে বেলা নয়টা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত দোকানের কাজ-কর্ম্ম লক্ষ্য করিতেন। পরিশ্রমে তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। এক দিন দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক তাঁহার দোকানে বারো আনা আড়াই পয়সা মূল্যে কি একটা পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিল। স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে সাড়ে-বারো আনা দিয়া বাকি আধ পয়সা রেহাই চাহিলে কানাই বলিলেন, "ঐ আধ পয়সাও

দিতে হবে। ঐ আধ পয়সার জন্যেই সারা দিন দোকানে ব'সে খাটছি।" আধ পয়সাও তিনি ছাড়িলেন না ; কিন্তু আর এক দিন দেখিলাম, স্থানীয় মহকুমা-হাকিমের নাজীর আসিয়া কানাইকে জানাইলেন, বিভাগীয় কমিশনার সাহেব মহকুমা পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ভোজের আয়োজন করা হইতেছে, অনেক টাকার দরকার ; মহকুমার হাকিম কানাইএর দশ টাকা চাঁদা ধরিয়াছেন, ঐ টাকা তাঁহাকে দিতে হইবে। কানাই ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন ; তাহার পর তাঁহার মোকামের গদীয়ান নগেন প্রামাণিককে বলিলেন, "নগেন, নাজীর বাবুকে দশ টাকার একখান নোট দিয়ে দাতব্য হিসাবে খরচ লেখ।"

নাজীর টাকা লইয়া প্রস্থান করিলে আমি বলিলাম, "সে দিন তুমি জিনিস বিক্রী ক'রে স্ত্রীলোকটাকে আধ পয়সাও ছেড়ে দিলে না, আর আজ ফস্ ক'রে এক-কথায় দশ টাকা খয়রাৎ! একটু আপত্তি পর্য্যন্ত ক'রলে না ; এর কারণ ?"

কানাই হাসিয়া বলিলেন, "কেতাব লিখে খাও, বালামের খবর রাখ না ত! কমিশনার সায়েব আমাদের কৃতার্থ ক'রতে এই মহকুমায় বুট-রজ দান ক'রবেন ; মহকুমার হাকিম আমার চাঁদা ধার্য্য ক'রেছেন। যদি চাঁদা দিতে আপত্তি ক'রতাম, কি দু'টাকা কম দিতাম, তা হ'লে কি ফল হ'তো জানো ? কথায় বলে—'ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়!' কিন্তু আমি ত ন্যাংটা নই, কিঞ্চিৎ বিষয়-সম্পত্তি আছে ; কোন একটা উপলক্ষে এমন ফ্যাসাদে ফেলে দেবে যে, তখন এক-থোকে এক-শো'টি টাকা বের ক'রেও পার পাব না ; কাজেই হুজুরকে খুশী ক'রবার জন্যে টাকা দশটা জলে ফেল্‌তে হ'ল।"

কানাইয়ের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলাম না। কানাই বলিতে লাগিলেন, "ইংরেজী ইস্কুলে গাড়ীতে চ'ড়ে কিছু-দিন যাতায়াত ক'রেছি বটে, কিন্তু ও-বিদ্যেটা পেটে যায়-নি ; তুমি ত কলেজের মাষ্টার অরবিন্দ ঘোষের মাষ্টারী ক'রে এসেছ ; আমাকে 'ইয়েস্, নো, ভেরিগুড্'-গোছের কিছু ইংরেজী বুলি শিখিয়ে দিতে পারো ? বড্ড উপকার হয়।"

আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "যে জন্যে আমরা ইংরেজী বিদ্যে শিখি, তা ত তুমি ইংরেজী না শিখেই ষোল আনার যায়গায় আঠারো আনা লাভ ক'রেছ। ইংরেজী শিখেই বা এ পর্য্যন্ত কি উপার্জ্জন ক'রতে পেরেছি ? তবে আর বুড়ো বয়সে 'কেঁচে গণ্ডূষ' ক'রতে চাও কেন ?"

কানাই বলিলেন, "দেখ, বিষয়-কর্ম্মের জন্যে মধ্যে মধ্যে আমাকে মহকুমার ডেপুটী, মুন্সেফ, এমন কি, তাঁর এডিশনালটির সঙ্গেও দেখা করতে যেতে হয় ; তা ইংরেজী বিদ্যে আমার পেটে নেই ব'লে তারা আমাকে বস্‌তে পর্য্যন্ত বলে না হে! যেন তাদের কাছে আমি কীট পতঙ্গ! অথচ সরকারের ঐ রকম দু'-পাঁচটা চাকরকে আমি চাকর রাখতে পারি, তা' তুমি জানো। ঐ এডি-শনালটি পর্য্যন্ত আমাকে সে-দিন চেয়ার দিলে না, ভগিনীপতি জজের সুপারিশে সে দু'শো টাকার মুন্সেফ! আমার মকদ্দমা-সেরেস্তার মুহুরী পরমানন্দ বিশ্বাস ঐ এডিশনালটিকে সে-দিন মুখের মতো দিয়ে এসেছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বটে! সে কি প্রকার ?"

কানাই বলিলেন, "আমার একটা বাকি-খাজনার মামলায় সে সাক্ষী ছিল ঐ এডিশনালের কোর্টে। প্রতি-বাদী পক্ষের উকীল জেরায় তাকে বিব্রত করে ; সে-ও 'নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্ত"—তুড়ে জবাব দেওয়ায় হাকিম তাকে তাড়া দেয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'কি ক'রে খাও ?' পরমানন্দের বোধ হয়, বঙ্কিম বাবুর 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়া ছিল ; সে জবাব দিল, 'আজ্ঞে, ডাল-তরকারী দিয়ে ভাত মেখে মুখে পুরি।'

"হাকিম তাড়া দিয়ে বল্লে, 'রসিকতা হচ্ছে ? সেই ডাল-ভাত জোটে কি উপায়ে ?'

"পরমানন্দ বল্‌লে, 'কিঞ্চিৎ চাষ-আবাদ আছে, আর এই চাকরী।'

'লাঙ্গল গরু আছে ?'

'আজ্ঞে, লাঙ্গল আছে একখান।'

'বলদ ?'

'লাঙ্গলা বলদ তিনটে।'

"হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনটে কেন ? একখান লাঙ্গলে তো একজোড়া বলদেরই দরকার।'

"পরমানন্দ ব'ললে, 'আজ্ঞে, ওটা এডিশনাল, হুজুর!

বলদ-জোড়াটার কোনোটা যখন লাঙ্গল টান্‌তে-টান্‌তে এলিয়ে পড়ে, জোয়াল আর ঘাড়ে নিতে চায় না, অথচ ফালের (ফাইলের ?) কাজ অনেক মুলতুবি প'ড়েছে দেখি, তখন সেই মুলতুবি 'ক্লিয়ার' ক'রবার জন্যে ঐ এডিশনালটা জুড়ে দিই' ।'

"এডিশনাল বাবু ধমক দিয়ে পরমানন্দকে সাক্ষীর কাটরা থেকে নামিয়ে দিলে। আমার উকিল হরিপদ ব'লছিল—হাকিমের মন স্থির করতে একটু সময় লাগলো ।"

নব বৈশাখের প্রভাতে এইরূপ নানা পুরাতন প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে দুই বন্ধু আমদহের মাঠে বারতলার মেলা দেখিতে চলিলাম। গোয়াল-পাড়ার পথে 'বলা কাণার' সহিত সাক্ষাৎ। সাধু ভাষায় তাহার নাম বলরাম ঘোষ। এক চক্ষুহীনকেই লোকে 'কাণা' বলে ; কিন্তু বলরাম আজন্ম দুই চক্ষুহীন। তাহার উভয় চক্ষুর পাতাই পরস্পর লিপ্তপ্রায় ছিল ; সে সম্পূর্ণ অন্ধ হইলেও সকলে তাহাকে 'কাণা' বলিত। তখন তাহার যৌবন কাল ; কিন্তু এই অন্ধ কাহারও গলগ্রহ হয় নাই ; সে শৈশব কাল হইতে কাঁসারি-বাড়ী বাসনের কুঁদ টানিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিত, তাহাতেই তাহার ও তাহার বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইত। অন্য কেহ তাহার ন্যায় অশ্রান্ত ভাবে কুঁদ টানিতে পারিত না ; এজন্য সে তাহার সহযোগিবর্গের অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিত।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "বলরাম, এত সকালে যাচ্ছো কোথায় ?"

বলরাম বলিল, "কে, রায় মশায় ? আজ্ঞে, আমদয়ে খোকা ঠাকুরের 'বার' দেখ্‌তে যাচ্ছি। আর আমার সাদা ধাড়ীটা (ছাগী) কুতায় যে গিয়েছে, খুঁজে পাচ্ছি নে, তাই এ-পাড়ায় খোঁজ নিচ্ছি।"

অন্ধ মেলা 'দেখিতে' যাইতেছে ও ছাগল খুঁজিয়া বেড়াইতেছে শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না। সে ডাব-গাছে উঠিয়া ডাব পাড়িত, বেল-গাছে উঠিয়া পাকা বেল সংগ্রহ করিত।

পথের ধারে দাঁড়াইয়া একটি ছেলে বলিল, "বলা দাদা, দেখ দেখি, ঐ বুঝি তোমার সেই হারানো ছাগল।"

অদূরে চিতের বেড়ার ধারে একটি ছাগল চরিতেছিল ; বলরাম হাত বাড়াইয়া খপ্‌ করিয়া তাহার কাণ ধরিল ; তাহার পর তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিল, "দূর বাঁদর, এ আমার ধাড়ী হবে কেন ? এটা যে কালো ধাড়ী !"

ক্যান্ত ধোপানী বলিত, "বলা কাণা একগাদা কাপড়ের মধ্যে থেকে পাড়ের ওপর হাত বুলিয়ে তার লালপেড়ে ধূতি বেছে নিতো।"

অন্ধের স্পর্শশক্তি কি এতই প্রখর ? মস্তিষ্কতত্ত্ববিৎ-গণ তাহা বলিতে পারেন।

আমরা আমদহে যে 'বারের' মেলা দেখিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের গ্রামের খোকা ভট্‌চাযের কীর্ত্তি ! খোকা গ্রামস্থ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কালীনাথ তর্কালঙ্কারের পুত্র ; কিন্তু বাপের টোল থাকিলেও বিদ্যার সে ধার ধারিত না। পৌরোহিত্য ও গ্রহশান্তি করিয়া কোন প্রকারে সংসার চালাইত, এবং পিতার নামে বিকাইবার চেষ্টা করিত। পৌরোহিত্যে বিশেষ-কিছু হয় না দেখিয়া এক দিন রাত্রি-শেষে সে স্বপ্ন দেখিল ; আমদহে তাহাদের যে ব্রহ্মোত্তর জমিটুকু ছিল, তাহার একপ্রান্তে আমবাগানের পাশে এক বেনা-ঝোপের নীচে সমাহিত থাকিয়া শিবঠাকুর তাহাকে স্বপ্ন দিলেন, 'মাটির নীচে বড় কষ্টে আছি, আমাকে তুলিয়া সেখানে স্থাপন কর্‌, পূজা কর্‌, তোর মঙ্গল হইবে।'...খোকা ঠাকুর তাহার স্বপ্নের কথা গ্রামে প্রচার করিল ; তাহার পর ঢাক-ঢোল লইয়া-গিয়া মাটির ভিতর হইতে শিবলিঙ্গ উত্তোলন করিল, এবং একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিল। শনিবারে মহাদেবের আবির্ভাব হওয়ায় প্রতি শনিবারে সেখানে উৎসব আরম্ভ হইল। নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে অনেকে পূজা দিতে আসিতে লাগিল। মহাদেবের মানত করিয়া কাহারও পুত্রের কঠিন রোগ আরোগ্য হইয়াছে, কোন নারীর মৃতবৎসা-দোষ সারিয়াছে, কাহারও গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়াছে—খোকা ঠাকুর এই ভাবে গ্রামে-গ্রামে দেবমহিমা প্রচার করিতে লাগিল। তাহার মৌখিক বিজ্ঞাপন বিফল হইল না। এখন প্রতি শনিবার বারতলায় মেলা বসিতেছে ; দোকানীরা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিতেছে ; মেছুনী

মাছের ঝুড়ি লইয়া মাছ বিক্রয় করিতেছে। দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ, আম-কাঁটাল প্রভৃতি ফল বিক্রয় হইতেছে।

মুখে-মুখে বিজ্ঞাপন-প্রচারের ফল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর হইতেও কত লোক গরুর গাড়ীতে চাপিয়া খোকা ঠাকুরের শিবের পূজা দিতে আসিয়াছে। শিবের চালা ঘরখানির চতুর্দিক ভক্তমণ্ডলীর সমাগমে পূর্ণ। খোকা ঠাকুর টিকিতে একটি চাঁপা ফুল গুঁজিয়া, ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটা দিয়া, এবং রুদ্রাক্ষের মালায় কণ্ঠ ভূষিত করিয়া লোহিত পট্টবস্ত্রে শিবের পূজা আরম্ভ করিয়াছে। ঠাকুরের পৌরোহিত্যের ভিন্ন-ভিন্ন 'ইউনিফর্ম্ম' আছে; প্রয়োজনানুসারে সে তাহা ব্যবহার করে। জন্মাষ্টমীর অপরাহ্ণে সে যখন তাহার যজমান-বাড়ীতে জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা শুনাইতে যায়, তখন তাহার দেহ 'রাধাকৃষ্ণ-মার্কা' নামাবলীতে আবৃত থাকে, এবং কণ্ঠে তিনকণ্ঠী স্থূল তুলসীর মালা শোভা পায়; ললাটে, লোমশ বক্ষে 'হরেকৃষ্ণ'-খচিত ছাপা। শিবের পূজা উপলক্ষে সে শাক্ত সাজিয়াছে। খোকাকে তাহার ভোল পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উৎসাহভরে বলিত, "ভেক্ ভিন্ন ভিখ্ মেলে না রে ভাই! যে পূজার যে মন্ত্র; ওটা ভক্তির বাহ্যরূপ।"

অদূরে একটা বটগাছ; তাহার ছায়ায় ভস্মাবৃত দেহ, কৌপীন-সম্বল কয়েকটা গেঁজেল-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছে। মুহুর্ম্মুহু গাঁজা চলিতেছে; দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়াইবার উপায় নাই! কিছু দূরে দুই-তিন জন মেছুনী ইলিস্ মাছ বিক্রয় করিতেছে; সুদূরবর্ত্তী পদ্মাতীর হইতে তাহারা হাঁটাপথে রাতারাতি এই সকল মাছ আমদানী করিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্মে মাছগুলি পচিয়া বালিশের মত ফুলিয়া উঠিয়া নাড়ি বাহির হইয়া গিয়াছে। বহু দূর পর্য্যন্ত সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে; কিন্তু পচা ইলিসের ক্রেতার অভাব নাই। পল্লী-রমণীগণের ইহা উপাদেয় খাদ্য। কাঁটালের বীচি, শজ্‌নে-খাড়া, ও পটোল-সংযোগে পচা ইলিশের 'ঝুরি' তাহারা অমৃতোপম মনে করে!

গ্রাম্য বাগ্দীরা ঝুড়ি-বোঝাই জাম ও লিচু বিক্রয় করিতেছে। অদূরে সারি-সারি তালগাছ। আমদহের কয়েকটা চাষার ছেলে তালগাছে উঠিয়া কাঁদি-কাঁদি তাল কাটিতেছে, এবং 'দাউলি'-সাহায্যে তাহার শাঁস বাহির করিয়া বিক্রয় করিতেছে। অনেকে গ্রাম্য জোলাদের কাছে রঙ্গ-বেরঙ্গের গামছা ক্রয় করিতেছে। খোকা ঠাকুরের গাড়োয়ান সাধু মণ্ডল প্রত্যেক দোকানীর নিকট তোলা আদায় করিয়া তাহার গাড়ীর ভিতর সঞ্চয় করিতেছে। পূজা শেষ করিয়া খোকা সেই সকল দ্রব্যসহ তাহার গাড়ীতে বাড়ী ফিরিবে। কিছু দূরে একটি পুষ্করিণী, তাহাতে জল অপেক্ষা পাঁকই অধিক। যে সকল যাত্রী গরুর গাড়ীতে কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে পূজা দিতে আসিয়াছে, তাহারা এই পুষ্করিণীর কর্দ্দমাক্ত জলে স্নান করিতেছে। অনেকে বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পদ্মের পাতায় চিঁড়া-দৈএর ফলার করিতেছে।

ধূপ, দীপ ও ঘণ্টাধ্বনির সাহায্যে দীর্ঘকাল পূজা চলিল। দুই-চারি পয়সা প্রণামীর আশায় খোকা তাহার ছিন্ন কুশাসনে বসিয়া 'ওং-আং' শব্দে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। ভক্তগণের চিত্তাকর্ষণের জন্য ঘণ্টাধ্বনিরও বিরাম নাই। আমরা দুই বন্ধু কিছুকাল চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, তাহার পর বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় আমদহের ইজারাদার পিয়ারী বাঁড়ুয্যের পুত্র রামলালের সহিত সাক্ষাৎ। রামলাল রাজেন্দ্র মাষ্টারের স্কুলের ছাত্র। সে তাহার 'মাষ্টার মশায়'কে ধরিয়া তাহার পিতার নিকট লইয়া চলিল। বন্ধুর অনুরোধে আমাকেও তাহাদের সহিত যাইতে হইল।

পিয়ারী বাবু আমাদিগকে তাঁহার গৃহে সে-বেলার জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু আমরা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। পিয়ারী বাবু চতুর লোক, রাজেন্দ্র মাষ্টারের দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহা তিনি জানিতেন; এজন্য তাঁহাকে বলিলেন, "আমার খিড়কীর পুকুরে বড়-বড় রুই-কাতলা আছে। আমি চার ক'রিয়ে রাখছি, আপনারা স্নানাহার শেষ ক'রে আমার হুইল নিয়ে মাছ ধ'রতে বসুন। পাঁচ-সাত সের রুই দু'-চারটি খেলিয়ে তুল্‌তে পারবেন; তার পর শেষ-বেলায় বাড়ী যাবেন। মাছগুলো আমার চাকর আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে।"

রাজেন্দ্র জানিতেন, পিয়ারী বাঁড়ুয্যের পুকুরে বিস্তর বড়-বড় মাছ আছে, কিন্তু কেহই তাহা ধরিবার অনুমতি পায় না; মধ্যে-মধ্যে জাল দিয়া ধরাইয়া তিনি তাহা

বিক্রয় করেন। 'মেছুড়ে-মাষ্টার' মৎস্য-শিকারের এত বড় দুর্লভ সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার এই লোভনীয় প্রস্তাবে সম্মত হইয়া জামাজুতা খুলিয়া ফেলিলেন; কিন্তু আমাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। আমি বলিলাম, "আমিও মাছ ধরি বটে, কিন্তু পরের ছিপে আমার মাছ ধরবার অভ্যাস নেই।" আমার এই কৈফিয়ৎ শুনিয়া তাঁহারা আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। এক যাত্রার পৃথক ফল হইল। আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একাকী গ্রামের দিকে ফিরিলাম। বেলা তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছিল।

আমদহ হইতে আমাদের গ্রামে ফিরিতে ব্রাহ্মণপাড়া নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের ভিতর দিয়া আসিতে হয়। ব্রাহ্মণপাড়ার চাটুয্যেবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখি, তাঁহাদের বহির্ব্বাটীর অদূরে চাঁদোয়া খাটাইয়া অশ্বত্থ-বৃক্ষ-মূলে গ্রামস্থ চাষীরা 'বেহুলার পালা' গায়িতেছে। বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে, তখনও গান শেষ হয় নাই! দলে-দলে লোক গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট চিত্তে গান শুনিতেছে। একঘেয়ে ঢোলকের শব্দ, সেই শব্দের সঙ্গে গলা মিলাইয়া, মুখব্যাদান করিয়া চাষার ছেলেরা নাচিয়া নাচিয়া গায়িতেছে,—

"ও হাটে যেও না বেউলো, বেউলো আমার মা!
চাঁদের বেটা দুষমন লখা দেখ্‌লে ছাড়বে না।"

ইতিমধ্যে সেই সঙ্গীত-সভায় চাঁদ সদাগরের বৈবাহিক সবাহন সদাগর অশ্বারোহণে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার বুকের কাছে সোলার একটি ঘোটক-মুণ্ড, তাহাই তিনি বাম হস্তে ধরিয়া রাখিয়াছেন; দক্ষিণ হস্তে চাবুক; কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রখণ্ডে কণ্ঠ হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত আবৃত। উভয় পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। সদাগর নৃত্য করিতেছেন, সঙ্গে-সঙ্গে ঘুঙুর বাজিতেছে—যেন ঘোড়া তাঁহাকে পিঠে লইয়া ধাবিত হইয়াছে। এই দৃশ্যে দর্শকগণের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইল। সেই গণ্ডগোলে সবাহন সদাগরের বক্তৃতা ডুবিয়া গেল।

আমি নিঃশব্দে একাকী গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলাম। আজও এইভাবে এই দীর্ঘ জীবনের পথে একাকী অগ্রসর হইয়াছি। আমার চতুর্দ্দিকে এক নূতন জগৎ প্রসারিত, তাহার সুখ-দুঃখ, হর্ষ-কল্লোলের সহিত আমার পরিচয় নাই। আমার আত্মীয়, বন্ধু, সমবয়স্ক সঙ্গীরা প্রায় সকলেই একে-একে চলিয়া গিয়াছে। তাই মনে হইতেছে, আমি নিতান্ত অসহায়, একাকী; আজ এই জীবন-সন্ধ্যায় একাকী পথের ধারে দাঁড়াইয়া নিষ্প্রভ নেত্রের ক্ষীণ দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া ভাবিতেছি, কবে—আর কত দিন পরে আমার এই দীর্ঘযাত্রার অবসান হইবে?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কুমারীর ব্যথা

শঙ্কর-তপস্যা-রত ওগো বালা লজ্জারুণ আঁখি,
অনঙ্গ-শায়ক শত লক্ষ্যভ্রষ্ট আজো হয় না কি?
আজো কি বিফলে যায় সপ্তদশ বসন্তের মালা,
ব্যাকুলিত প্রতীক্ষায় বাড়ে বুকে পুঞ্জীভূত জ্বালা?
তোমার বুকের ভাষা কলকণ্ঠে পাখী করে গান।
নবঘন নীলাঞ্জনে প্রদীপ্ত বাসনা কম্পমান।
প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়তলে মর্ম্মরিত বসন্ত-সমীরে,
পাখী-ডাকা, ছায়া-ঢাকা, গ্রামান্তের স্রোতস্বিনী-তীরে,
তব প্রিয় আবাহন বেণু-রবে বাজে রহি রহি,
আকুল আগ্রহভরা বিরহের ব্যথা আনে বহি।

উদ্বেলিত মহাসিন্ধু অপেক্ষিছে ইঙ্গিত কাহার,
নিমেষে প্লাবিয়া দিবে উত্তাল তরঙ্গে চারিধার।
তবুও শাসন দিয়া সংযমেতে বাঁধিয়া আপনা,
আকাশে পিঙ্গলি তুলে তোমার সে আতাম্র বেদনা।
কোথা মেঘ পুষ্প-প্রাণ দয়িত-বল্লভ, বারি-বাহ,
তৃষিতা চাতকী-কর্ণে নবীন আশার বাণী কহ।
সঘনে ভাঙিয়া পড় প্রবল প্রচুর বারিধারে,
অঙ্কুর জাগায়ে তোল ধরণীর গর্ভ-অন্ধকারে।
কণ্টকি' উঠুক বালা থর থর পুলক শিহরে,
নিবেদিয়া প্রেম-অর্ঘ্য অনাগত মানস-প্রিয়েরে।

বেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ)।



ইংলণ্ডে কুরুক্ষেত্র

কথায় বলে, "রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়!"

এ মহাযুদ্ধে বোমার আঁচ আমাদের গায়ে না লাগিলেও আমরা ঐ উলুখড়ের দল,—নানা দিক দিয়া আমাদেরও আজ বিপত্তির সীমা নাই!

কিন্তু কল্পনায় শিহরিয়া সে-বিপত্তির ছবি না আঁকিয়া ইংলণ্ডে আজ কি করিয়া সকলের দিন কাটিতেছে, তাহারি সচিত্র বিবরণ সঙ্কলিত করিতেছি! কল্পিত "থ্রীলার" গল্প পড়িয়া অনেকের রোমাঞ্চ হয়, শুনিয়াছি; কিন্তু ইংলণ্ডে আজিকার নিত্য-দিনের এ বিবরণে যে রোমাঞ্চ, তার সিকি-রোমাঞ্চ নাই ঐ সব "থ্রীলার"-গল্পে!

মরণ সেখানে লোকের ধন ও প্রাণ লইয়া যেন তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছে! মরণের এই প্রলয়-তাণ্ডবের মধ্যে সেখানকার নর-নারীর ধৈর্য্য এখনো এমন অবিচল আছে কি করিয়া—বিস্ময়ের বিষয়!



সঙ্কেত-সাইরেন বাজিবা-মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে সাউথগেটের ৭৫০ ছাত্র-ছাত্রী ইস্কুলের আশ্রয়-নীড়ে চলিয়াছে

গত বৎসর ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডনের ইষ্ট-এণ্ড অঞ্চলে প্রথম অগ্নি-বর্ষণ হয়। সে অগ্নি-চক্রে তিনশো লোকর মৃত্যু এবং ১৪০০ লোক বেশ ভারী-রকম আহত হন। তার পর একটি রাত্রি বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিল। তৃতীয় রাত্রে আবার শত্রুর সেই মেঘনাদী হানা! এবারে মরিল পাঁচশো জন; আহতের সংখ্যা অনেক! চারি দিকে কেমন ভয়-চকিত স্তম্ভিত ভাব! আবার কখন্ আচম্বিতে মরণ আসিয়া আরো উগ্র অতর্কিত আক্রমণ করিবে!

মরণকে কেহ রোধ করিতে পারে না! এ পর্য্যন্ত পারে নাই! তাই বলিয়া রোগে নয়, জলে ডুবিয়া নয়, বিষ-পানে নয়, গুণ্ডার ছুরিতে নয়; রাত্রির অন্ধকারে সহসা অগ্নি-জ্বালার মূর্ত্তিতে মরণ আসিয়া প্রাণ লইবে!



মাটীর বুকে ত্রিশ ফুট নীচে নিরাপদ আশ্রয়-নীড়ে ছেলেমেয়ের জটলা



লণ্ডনে অফিসের ছাদে স্যাণ্ড-ব্যাগ—সেই স্যাণ্ড-ব্যাগে বসিয়া আকাশচারী শত্রুর সন্ধান

পলায়নের জন্য কাহারো চাঞ্চল্য নাই! কোথায় পলাইবে? মৃত্যুর এ আসা-যাওয়ার কোনো লক্ষণ পূর্ব্বে জানা যায় না! রাত্রে শত্রু আসিয়া আবার না অগ্নিবর্ষণ করে,—সকলে সতর্ক হইলেন। কঠিন পাহারার ব্যবস্থা হইল।

শত বিপত্তি সত্ত্বেও লণ্ডন আজ নিজেকে সুরক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে! মরণ আসিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিবে। মাটীর নীচে সুড়ঙ্গ করিয়া সেই সুড়ঙ্গে আশ্রয়-নীড় নির্ম্মাণ করিয়া লণ্ডনের লক্ষ-লক্ষ লোক প্রাণ বাঁচাইবার জন্য রাত্রে সেখানে গিয়া শয়ন করিতেছেন। টিউব-লাইনের প্লাটফর্ম্মেও রাত্রে শয্যা পড়িতেছে। পথে-ঘাটে 'ব্ল্যাক-আউটের' নিবিড় অন্ধকার! রাত্রে লণ্ডন যেন নিঝুম-পুরী! যেন এ মৃত্যুকে রোধ করা যায় না?

সকলে সচেতন হইলেন! যে বিমান-পথে মৃত্যু নিঃশব্দে আসিতেছে, সে পথে রাখো সতর্ক পাহারা!

জনমানব-হীন অন্ধ-গহ্বর! অথচ দিনের বেলায় কাজ-কর্ম্ম অফিস-আদালত যথানিয়মে চলিতেছে নিত্যকার মতো স্বাভাবিক ভাবে।

এ-বৎসর জানুয়ারি মাসে বোমা-বর্ষণে আর এক পশলা যুদ্ধের অভিনয় শুরু হয়। তীব্রনাদে বোমার পর বোমা পড়িতেছে— মিনিটে মিনিটে বোমার অট্টরব সে বোমার আগুনে ঘর-বাড়ী অফিস-আদালত দোকান-গুদাম পুড়িয়া ছারখার! এ-বোমায় লণ্ডনের সমৃদ্ধ-সম্পন্ন অঞ্চলগুলা যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল!

মরণের এই রণ-তাণ্ডবের কথা সম্প্রতি লণ্ডনের এক ভদ্রলোক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—রাত্রির অন্ধকারে বোমার প্রচণ্ড রব! সেই সঙ্গে আগুনের লেলিহান শিখা! আমাদের মনে হইল, বর্ব্বর যুগের দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি না কি? জানুয়ারি মাসের সে-রাত্রে লণ্ডনে কারো চোখে ঘুম নাই! গৃহের নীচে নিরাপদ আশ্রয়-নীড়ে বসিয়া সকলের রাত্রি কাটিল। মনে ভয়-সংশয়,—কি হয়,



সুড়ঙ্গ-আশ্রয়ে দোলায় শিশু



স্যুরে-প্রদেশের গিল্ডফোর্ডে ছেলেমেয়েদের নিরাপদ আশ্রয়



নেভি-টর্পেডোর গায়ে লিখন রচনা

চারি দিক সমুজ্জ্বল! বার্কলে স্কোয়ারে নিত্যদিনের মতো গাড়ি-ঘোড়া চলিয়াছে, লোকজন চলিয়াছে। সকলের মুখে-চোখে উদ্দীপনার ভাব! পথে কুলি-মজুর, পশারী-দলের সেই কোলাহল! দেওয়ালের গায়ে ঐ বিজ্ঞাপন আঁটিতে ছে,—"অষ্ট্রেলিয়া বেড়াইতে যাইবার মস্ত সুযোগ! শস্তা ভাড়া। সর্ব্ব প্রকার আমোদ-প্রমোদের চূড়ান্ত আয়োজন! এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না!"



দোকানে জিনিষ-পত্রের মাপ করিয়া দাম নির্দ্ধারিত করা আছে

আমার হোটেলে দেখি, বেয়ারা-খানসামারা প্রতিদিনের রুটীন মানিয়া কাজে লাগিয়াছে। আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখি, বাহিরে হোটেলের খানসামা তার ধোপদোস্ত উর্দ্দী পরিয়া ডিউটিতে মোতায়েন!

রাত্রে বোমার

কি না হয়! এ ভয়-সংশয়ের জটিল আবর্ত্তে মন যেন চেতনা হারাইল!

পরের দিন সকালবেলায় ভয়ে-ভয়ে জানলার পর্দ্দা সরাইয়া বাহিরের পানে তাকাইলাম। দেখি, রৌদ্রে

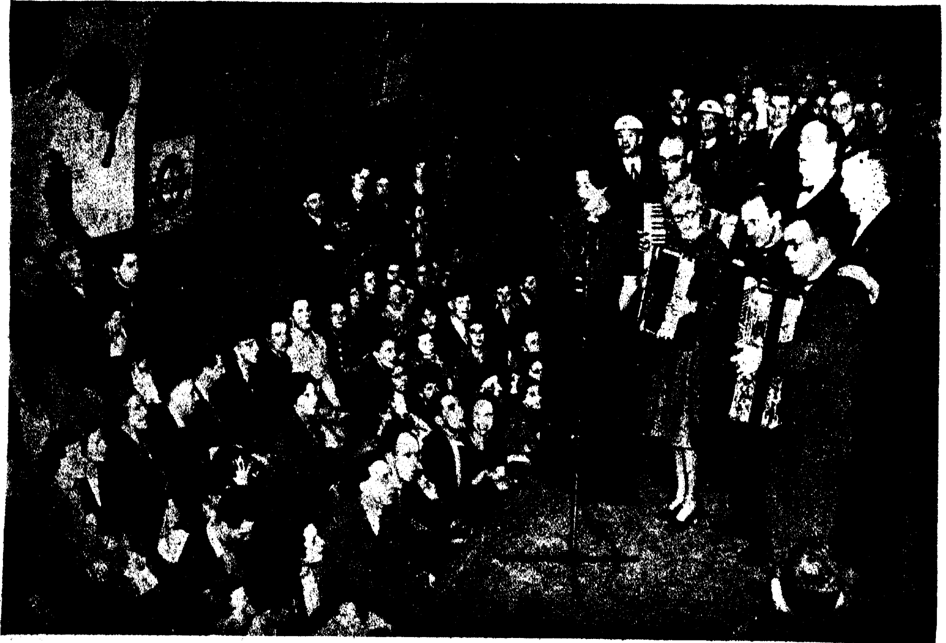
অমন নির্ম্মম রুদ্রলীলা; অথচ দিনের বেলায় চারি দিকে চাহিলে মনে হইবে না, কাল রাত্রে মরণ আসিয়া শিয়রে চোখ রাঙাইয়া ধ্বংস সারিয়া গিয়াছে! টেম্‌সের বুকের উপরে বিশটি পুল; সেই বিশটা পুলের উপরে



রাত্রে সকলে টিউব-ষ্টেশনে শয়ন করেন ; তখন ট্রেণ-চলাচল বন্ধ থাকে। ভোরে বিছানা-তোলার সঙ্গে-সঙ্গে কুলিরা প্ল্যাটফর্ম্ম সাফ করে—দিনের বেলায় আবার ট্রেণ চলিবে



বোমায় ধ্বংস-লীলা ঘটিবার পরক্ষণেই এই দলটি আসিয়া দেখা দেয় ; ইহাদের ডিউটি—যা আছে, তা বাঁচানো



পাতাল-আশ্রয়ে প্রমোদ-উপভোগ


নাপিতের দোকানে নাপিতানী দাড়ি চাঁছে

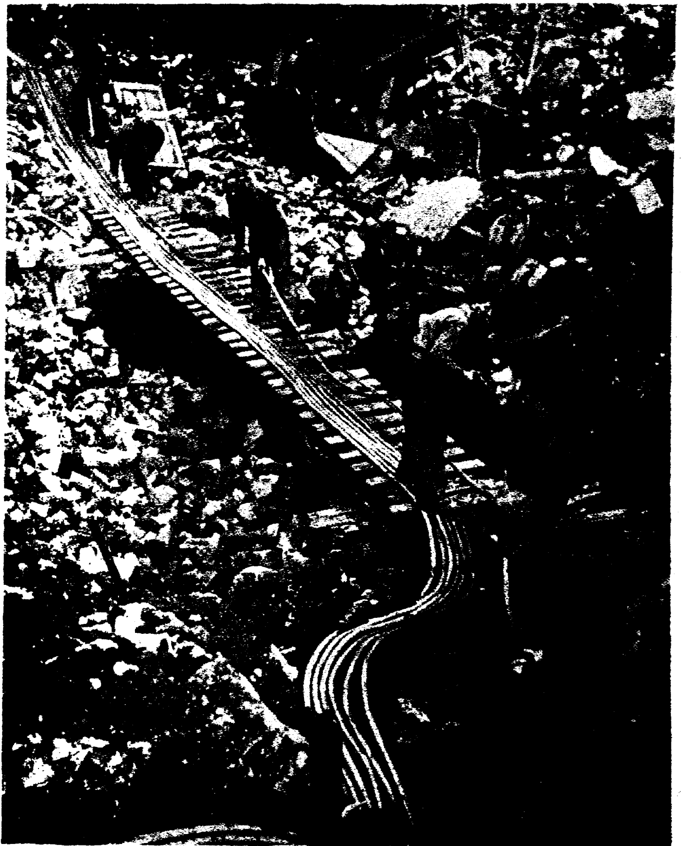


ট্রাকে চড়িয়া অফিস যাওয়া

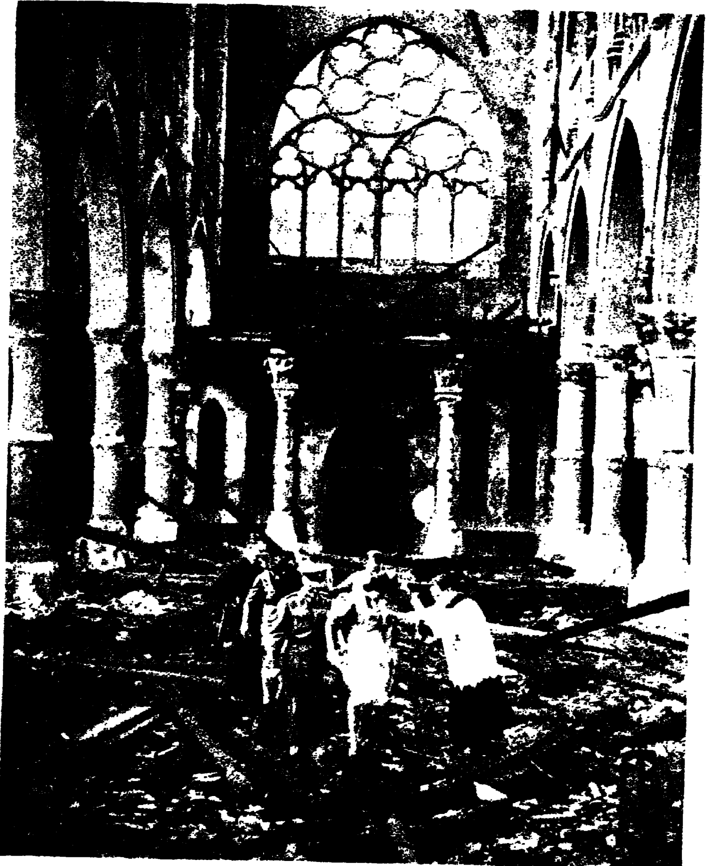

সম্রাট আসিয়াছেন রয়েল অর্ডনান্স ফ্যাক্টরি দেখিতে ; মহিলা-শ্রমিকেরা জয়ধ্বনি তুলিয়া তাঁকে অভিনন্দিত করিতেছেন



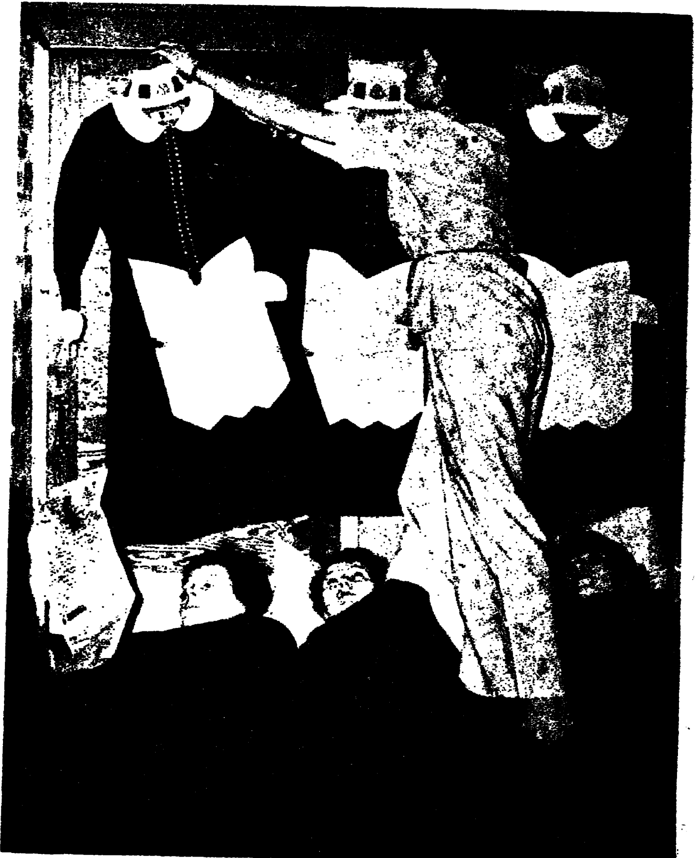
জার্ম্মান-বোমায় লণ্ডনে অগ্নিলীলা



লণ্ডনের বোমা-এলাকায় অস্থায়ী সেতুর উপর দিয়া টেলিফোনের তার পাতা



বোমা-জর্জ্জরিত চার্চ্চে রণহুঙ্কারের মধ্যেও উৎসব-পরিণয়



এঁরা চায়ের দোকানে কাজ করেন। পথের নীচে আশ্রয়-নীড়ে দুশ্চিন্তায় যাঁদের রাত কাটে, ভোরে উঠিয়াই এঁরা তাঁদের চা ও প্রাতরাশ জোগান। বোমা-নিবারক আশ্রয়ে রাত্রে নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন



বিমান-আক্রমণ-রোধ-কল্পে মধ্যবয়সী ভলান্টিয়ারদের অস্ত্র-সাধনা



স্যাণ্ড-ব্যাগের ব্যবধান—তবু দোকানে ঐ পোষাকের বাহারে নারীর মন দোলে



মাটির নীচে সুড়ঙ্গ-রেল-লাইনে আশ্রয়-নীড়। এ নীড়ে প্রতি রাত্রে দেড় লক্ষ লোক বিছানা পাতিয়া শয়ন করিতেছেন



জার্মান-বম্বার গ্রেফ্‌তার

কর্ম্ম-তরঙ্গের তেমনি বিপুল উচ্ছ্বাস! বাস, ট্রাম, মোটর চলিয়াছে—ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাদের এ চলার যেমন ব্যতিক্রম ঘটে নাই, আজো ঠিক তেমনি চলিয়াছে! কালিকার রাত্রির ব্যাপার সকলে যেন দুঃস্বপ্ন বলিয়া ভুলিয়া গিয়াছে! অথচ প্রত্যহ রাত্রি-বেলায় লক্ষ-লক্ষ লোক পথের নীচে সুড়ঙ্গে গিয়া আশ্রয় লয়! দিনে-রাতে মানুষের দু' রকম মূর্ত্তি—মনের উপরে নিঃসংশয়তা এবং আতঙ্কের এই আলো-ছায়ার খেলা,—এমন কখনো কেহ কল্পনা করিতে পারে না! এ দৃশ্য এমন যে, চোখে না দেখিলে লিখিয়া তাহা বুঝানো যাইবে না!

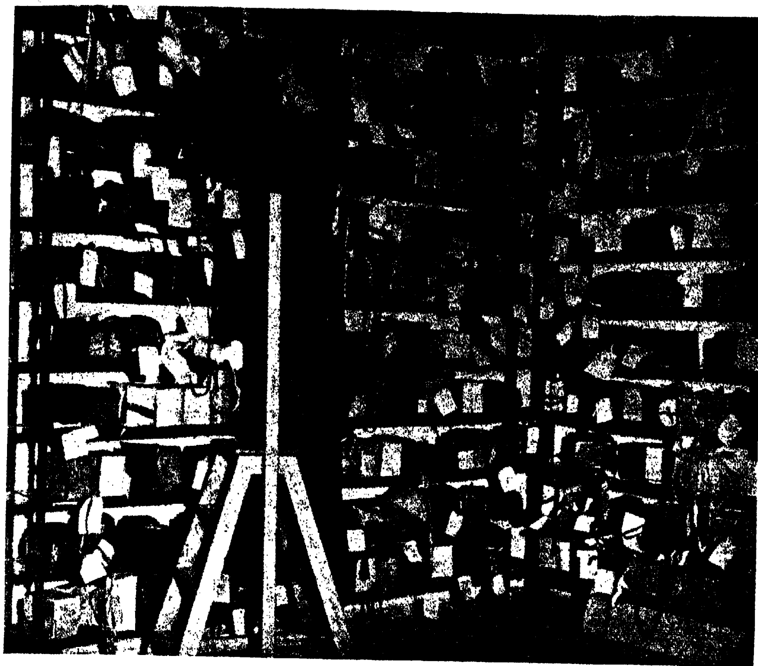
বোমা-বর্ষণের গোড়ার দিকে মানুষের মন আতঙ্কে স্তম্ভিত হইয়াছিল! তখন একবার প্রাণ-ভয়ে নিরাপদ-আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটাছুটির চকিত-উত্তেজনা! সে



মাটীর নীচে সুড়ঙ্গ-নীড়ে পশারিণী



মডেল লইয়া এয়ার-ওয়ার্ডেনদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে



ট্রামে-বাসে-ট্রেণে যাত্রীরা নিত্য প্রায় ৫০০ গ্যাস-মাস্ক ও হেলমেট ফেলিয়া আসে! সেগুলি লণ্ডনের এই লষ্ট-প্রপার্টি অফিসে জমা হয়



ভদ্রঘরের মেয়েরা কুলির কাজ করিতেছেন

উত্তেজনার সুযোগ লইয়া বাস এবং ট্যাক্সিওয়ালারা ভাড়ার হার বাড়াইয়া বেশ মোটা-রকম পয়সা রোজগারে মাতিয়াছিল! কিন্তু পুলিশ চকিতে তাদের সে দুরভিসন্ধির মূলে কুঠার হানিয়া শায়েস্তা করিয়া দেয়! এখন বেশী ভাড়ার কোনো বালাই নাই! চলতি-ভাড়ায় চব্বিশ ঘণ্টা বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি চলিয়াছে—ভয় নাই, দ্বিধা নাই, উত্তেজনাও নাই।

বোমা-বর্ষণাদির জন্য লণ্ডনে গ্যাসের জোগানে মাঝে-মাঝে বাধা ঘটিয়াছে; তা-ও শুধু পাওয়ার-ষ্টেশনে বোমা পড়িবার জন্য এ-ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কিন্তু কর্ম্মচারীরা আশ্চর্য্য তৎপরতায় আধ মিনিটের মধ্যে গ্যাসের প্রবাহ আবার যেমন তেমনি অবাধ করিয়া দেয়। প্রাণের ভয় না করিয়া গ্যাশ-কোম্পানির কর্ম্মচারীরা 'ডিউটি'-পালনে

সর্ব্বদা উন্মুখ! টেলিফোন-ব্যবস্থাতেও এমন বিঘ্ন ঘটিয়াছিল—তা-ও চকিতের জন্য! তবে বহু দূরে টেলিফোন করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে এখন বিধি-নিয়মের ব্যবস্থা হইয়াছে। 'লোকাল' 'কল্'-এ (Call) কোনো অসুবিধা ঘটে নাই। টেলিগ্রাম বা ডাকে চিঠি-পত্র পাঠানো—এ সবেও এতটুকু গোলযোগ বা বিঘ্ন-অসুবিধা নাই।



বিমান-আক্রমণ-প্রতিরোধী সেনাদলের আস্তানা।

যুদ্ধের অবস্থা সঙ্গীন হইলেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আজো চিরদিনের বিধি-নিয়ম মানিয়া কাজ-কর্ম্ম করিতেছে—সে দিকে "business as usual" পলিশির অর্থাৎ চিরাচরিত-রীতির কোনো ব্যতিক্রম নাই! অফিস, আদালত, দোকান, আড়ত-কারখানা নিত্যদিনের মতো সচল আছে। কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের কেনা-বেচা সম্বন্ধে মাত্রার পরিমাণ শুধু নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অর্থাৎ অপচয় না হয়। কোনো কোনো জিনিষ-পত্রের সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইয়াছে, এতটা বেচিতে পারিবে, এর বেশী কিনিতে পারিবে না! পাছে সেগুলির জোগান্ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তাই এ সতর্কতা। ধারে বা হাত-চিঠিতে ও কুপনে জিনিষ কেনাবেচার রীতি ঠিক পূর্ব্বেকার মতো বজায় আছে। কাল যদি বোমা পড়িয়া



বোমায় বাড়ী-ঘর-সার্শি ভাঙ্গিয়া যে জঞ্জালের সৃষ্টি, এ-ফৌজের দল সে জঞ্জাল সাফ করিতেছে



প্রাথমিক-পরিচর্য্যা-সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকেরা জখমী-কর্ম্মচারীদের সেবা করিতেছেন



লণ্ডনের বাসে আজ সব মেয়ে-কণ্ডাক্টর

জার্ম্মানরা বহু কাল ধরিয়া বহু সুখ-সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়া নেপথ্যান্তরালে নিঃশব্দে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—তাদের কষ্ট সহিয়া গিয়াছে! ব্রিটিশ-জাতি এখন মাত্র ত্যাগ-সংযমের অভ্যাস শুরু করিয়াছে। সেজন্য কাহারো অসন্তোষ বা বিরক্তি নাই! ব্রিটিশ পেট্রিয়টিজ্‌মের মায়ায় এই ত্যাগ ও কষ্টকে সকলে হাসিমুখে শিরোধার্য্য করিয়াছে।

খাদ্য-সামগ্রীর মধ্যে মাখন, চিনি, চা এবং মাংস সম্বন্ধেই মাপ কসিয়া বিধি-নিয়মাদির সৃষ্টি হইয়াছে। লেবু, কমলা-লেবু এবং পেঁয়াজ লণ্ডনে ক্রমে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে!

নাইট-ক্লাব, সিনেমা, থিয়েটার—এ-সব আজো চলিয়াছে এবং সেগুলি আজো প্রমোদ-পিয়াসী লোকের ভিড়ে লোকারণ্য হইতেছে!

খরিদদারের সবংশে নিধন ঘটে, এ আশঙ্কা কাহারো মনে নাই!

বিলাস-প্রসাধনের জিনিষ-পত্রের সম্বন্ধেও মাত্রা নির্দ্ধারিত করিয়া বিধি-নিয়ম রচিত হইয়াছে। প্রয়োজনীয় কতকগুলা জিনিষ-পত্রের সম্বন্ধেও এমনি বিধি-নিয়ম।

চাষের কাজে সকলের উৎসাহ বাড়িয়াছে চতুর্গুণ! এক-তিল জমি না খালি থাকে! ইংলণ্ডের ন'-কোটি লোককে যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশের আমদানি খাদ্যের

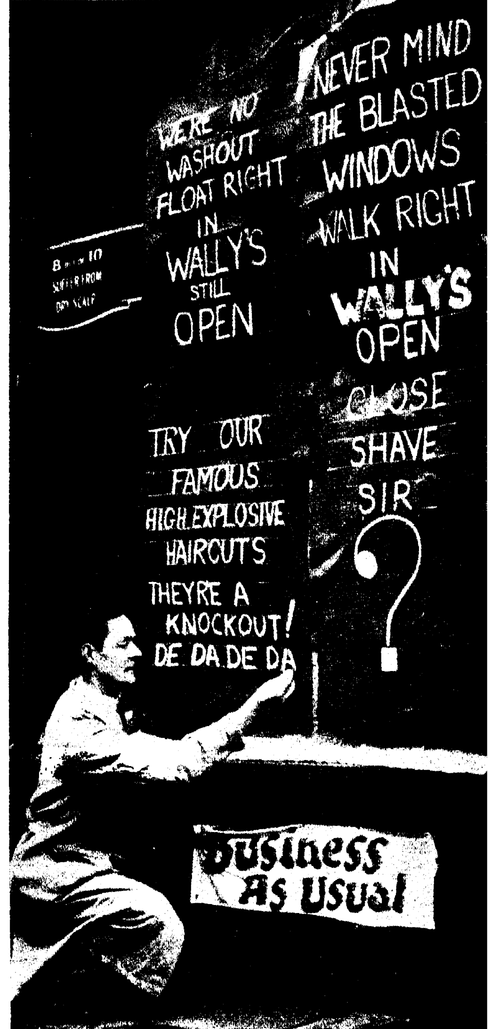


ভোরের আলো ফুটিবার সঙ্গে-সঙ্গে এক দিকে ধ্বংস-স্তূপ—তার পাশে দুধের জোগান্ ঠিক আছে



বোমা-নিগ্রহের পর বিপর্য্যয়-ক্ষেত্রে আসিয়া সম্রাজ্ঞীর শুভ-কামনা

উপর নির্ভর করিতে হইত—নহিলে অনাহার ভিন্ন উপায় ছিল না। এখন গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিয়াছেন, এতটুকু জমি কেহ ফেলিয়া রাখিবে না! ফশল ফলাও!



এত বিপদের মধ্যেও কাজের ধারা অব্যাহত

কপি আর সব্‌জীর চাষে মন দাও! নিজে যদি কেহ জমি না চষে, তাহা হইলে সে-জমি লইয়া গবর্ণমেণ্ট এমন লোককে দিবে, যে সে-জমিতে চাষ করিবে! জমি ফেলিয়া রাখিলে জরিমানার ব্যবস্থা হইয়াছে।



বোমার বিষ-ক্ষয় পর্ব্ব



ছোট ছেলেমেয়েদের এই আশ্রয়ে রাখিয়া মায়েরা কাজে যান। সকাল সাড়ে ৭টা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা এ আশ্রয়ে থাকে

'লণ্ডন টাইম্‌স্‌' পত্রে এই সংবাদটি ছাপা হইয়াছে—

সমারশেটের এ্যাক্‌স্‌ব্রিজ মহল্লার মুরল্যাণ্ড রোড নিবাসী আর্থার রো তার জমিতে চাষ না করিয়া জমি ফেলিয়া রাখিয়াছিল, এই অপরাধে তার জরিমানা-দণ্ড হইয়াছে দশ পাউণ্ড; তার উপর মামলার ব্যয়-বাবদ দিতে হইবে তিন পাউণ্ড তিন শিলিং। সমারশেট ওয়ার-একজিকিউটিভ-এগ্রিকালচারাল-কমিটী ভদ্রলোককে পর-পর নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় ফশলের চাষ না করিয়া রো তার সিকি-একর পরিমিত খালি জমিতে ষ্ট্রবেরির চারা পুঁতিয়াছিল। এ-কাজ কমিটীর অনুমতি না লইয়া করার দরুণ সে অপরাধী হইয়াছে। কমিটী তাকে বলিয়াছিল, সৌখীন গাছের চারা না লাগাইয়া জমিতে প্রয়োজনীয় বাঁধা-কপির চাষ করিতে; আসামী সে কথা গ্রাহ্য করে নাই! জরিমানা দিতে না পারিলে রোকে জেলে যাইতে হইবে। জেলে গিয়া তাকে চাষের কাজ করিতে হইবে—সে-জন্য অবশ্য পারিশ্রমিক পাইবে! এবারের এ-কুরুক্ষেত্র-অভিনয়ে ইহাই হইয়াছে নূতন আইন!

তার উপর ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র যেখানে যত বড় মাঠ বা খোলা জায়গা আছে, সে সব স্থানে পাছে শত্রুর এরোপ্লেন আসিয়া নামে, সে-সম্ভাবনার উচ্ছেদ-কল্পে তাই বড় মাঠ ও খোলা জায়গার উপর কোথাও কাঁটা-তারের জাল লাগানো, কোথাও বা বড় বড় গাছের গুঁড়ি, ভাঙ্গা মোটর-গাড়ী বা কলকব্জাদি ডাঁই করিয়া ফেলিয়া রাখা হইতেছে! তাছাড়া মাঠের বুকে খানা-খোন্দল টিপি-টাপা এবং রাত্রে এই সব জায়গায় চৌকি দিবার জন্য সশস্ত্র বহু প্রহরী রাখা হইয়াছে। প্লেনে চড়িয়া জার্ম্মান-সেনা আসিলে মাঠে নামিবার ঠাঁই পাইবে না—ওড়া-পায়ে ফেরত-পাড়ি অবলম্বন করিতে হইবে।

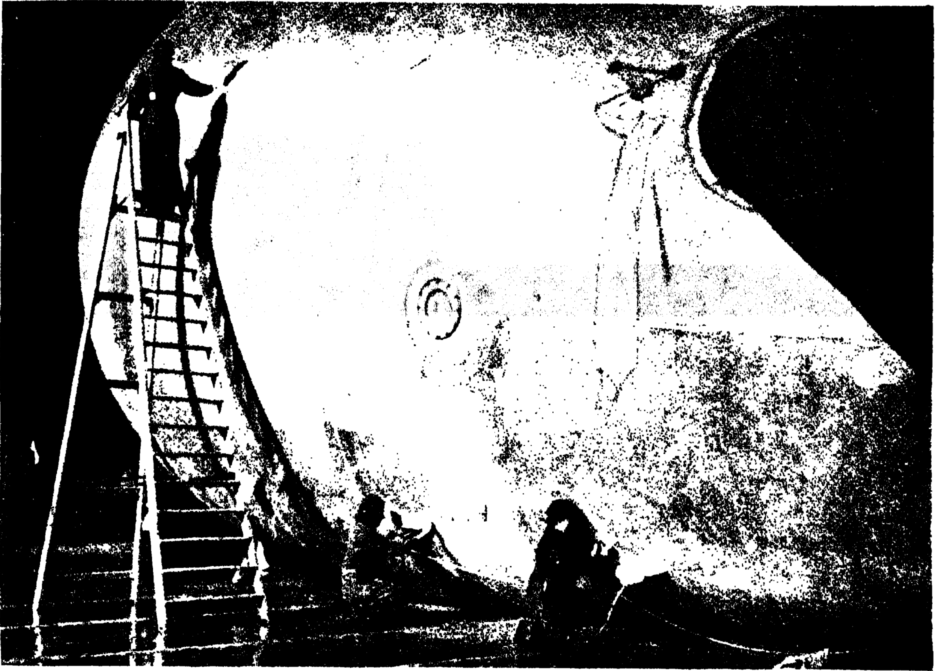


ওয়েষ্ট লণ্ডন ষ্ট্রীটে সেণ্ট পল্‌স্‌ ক্যাথিড্রালের কাছে এই বোমা পড়িয়াছিল—বোমাটির ওজন এক-টন। চার দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে সে বোমাটিকে তুলিয়া জলায় ফেলিয়া দেওয়া হয়—ফেলিয়া দিবার আধ ঘণ্টা পরে এ বোমা ফাটিয়াছিল

পোষাক-পরিচ্ছদের ফ্যাশন সম্বন্ধে যুদ্ধের গোড়ায় রীতিমত সংযম-রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখন সে পাট নাই। ফ্যাশনে আবার নব-নব বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন—মেয়েরা নব-নব বিচিত্র

ফ্যাশনের পোষাক-পরিচ্ছদ পরুন, যুদ্ধের বিভীষিকা ভুলিবেন! রাত্রে দেশশুদ্ধ লোকের সঙ্গে মাটীর নীচে সুড়ঙ্গে শয়ন করিতে হইতেছে বলিয়া মেয়েদের সে সময়ের ব্যবহারের জন্য "আশ্রয়-আবরণ" বা 'shelter clothing' নামে ঢিলা গাত্রাবরণ তৈয়ারী হইতেছে। যাদের পয়সা আছে, তাদের আশ্রয়-আবরণ তৈয়ারী হইতেছে বেশ নরম ও গরম কাপড়ে; যাদের তেমন পয়সা নাই, তাদের এ-আবরণ রচিত হইতেছে মার্কিণ মুখে থাকিলেও ডোভারের স্কুল-কলেজ পূরা দমে চলিতেছে।

চার্চ্চ-সমূহে উপাসনাদির বিরাম নাই। দেশের স্বাস্থ্য ভালো; স্বাস্থ্য-বিধি পালনে অর্থাৎ ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দিকে কাহারো ঔদাস্য নাই। রোগের মধ্যে আছে শুধু 'ফ্লু'! তাছাড়া এ সঙ্কটে কত অনর্থ-পাতের আশঙ্কা থাকে! 'ফ্লু' ছাড়া আর কোনো রোগের এতটুকু উৎপাত-উপদ্রব নাই! মাটীর



মেয়ে-ফৌজ যুদ্ধের বেলুন মেরামত করিতেছে

"ওভার-অলের" প্যাটার্ণে। এ-পোষাক পরিয়া ডেক-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বা টুলে বসিয়া নিদ্রা দেওয়া চলে—শীত-নিবারণেও অসুবিধা ঘটে না। জলের অজস্র বাষ্প ধারাতেও এ-পোষাক ভিজিবে না।

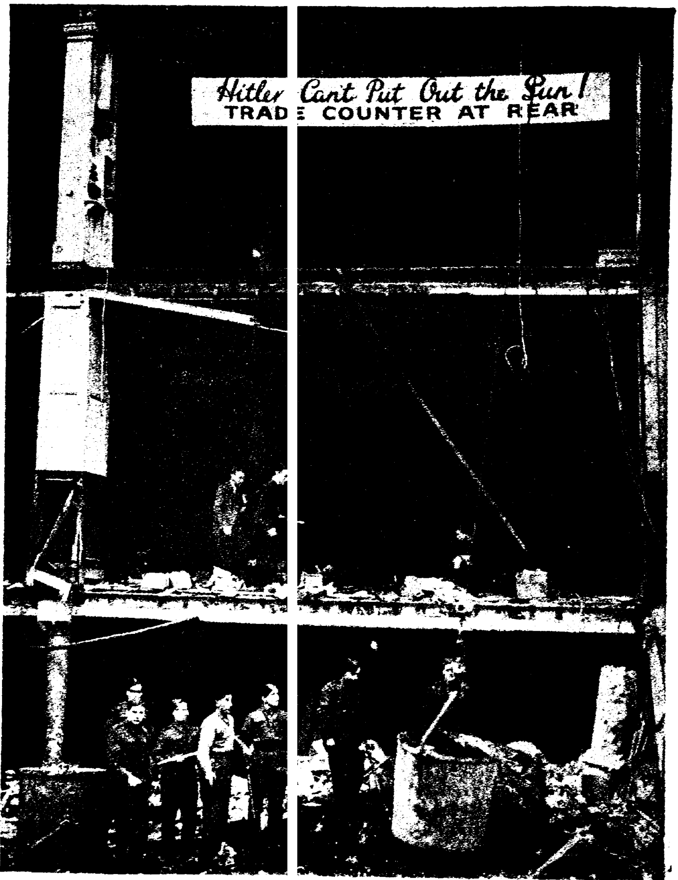
নিরাপদ করিবার জন্য লণ্ডন হইতে ছেলেমেয়েদের সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এজন্য লেখাপড়ার ব্যবস্থায় একটু গোলযোগ ঘটিলেও এখনো লণ্ডনের স্কুল-সমূহে দশ হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছাত্র-ছাত্রী আছে প্রায় এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার! বোমা এবং 'শেলের' (shells) নীচে আশ্রয়-নীড়ে বাসের জন্য কণ্ঠ-নালীতে কয়েকটা ছোট-খাট রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কল্যাণে সে রোগ সারিয়া সকলের কণ্ঠকে মাটীর নীচেকার আবহাওয়া সহিবার উপযোগী করিয়া তোলা হইতেছে।

চুরি-জুয়াচুরির মাত্রা যুদ্ধের এ-কলরবে কমিয়াছে। অনেকে ভাবিয়াছিল, 'ব্ল্যাক-আউটের' জন্য চোরেদের বরাত খুলিবে! কিন্তু তা ঘটে নাই!

কাণের কাছে বোমার গর্জ্জন—মাথার উপরে



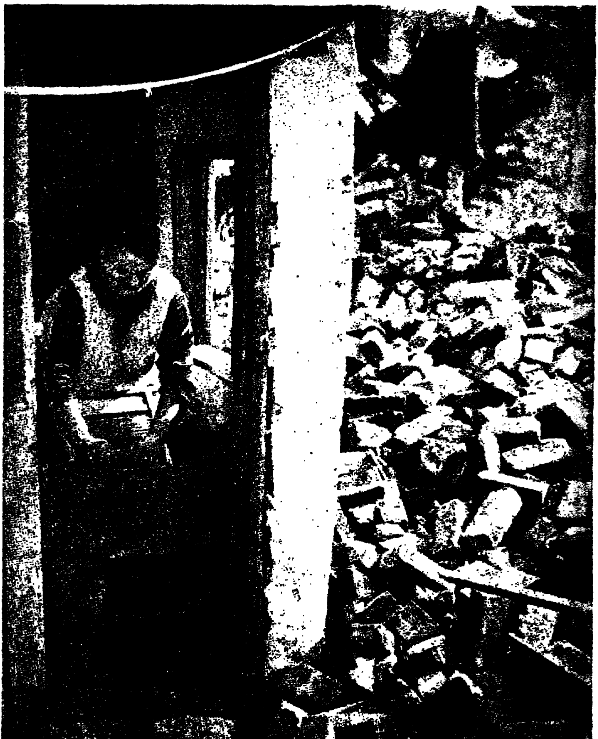
বোমা ছোড়ার কশরতি-শিক্ষা



বোমায় ভাঙ্গ-চূর-আবর্জ্জনা-সাফ



বোমার ধারা-পাতের মধ্যেও ডাক-হরকরা সমানে ডিউটি করিতেছে



বোমার বিক্রম-পর্ব্বের পাশে বস্তীর মেয়ের কাপড়-কাচা



সব-চেয়ে উঁচু বাড়ীর সব-উপর-তলায় দিনে-রাতে কোনো সময়ে টেলিফোন্‌-কিশোরীদের কাজের কামাই নাই



লণ্ডন হইতে ছেলেমেয়েদের সরানো হইতেছে ; মা-বাপদের বিদায়-সম্ভাষণ

অগ্নিবাণ! তবু রোমান্সের মায়ায় নর-নারীর সম্মোহে বিরাম নাই! তার মাত্রা বরং বাড়িয়াছে। রাত্রে ঐ আশ্রয়-নীড়ে নর-নারীর বিপুল মেলা। সেখানে কাহারো ভয়, কাহারো উল্লাস—সেই সঙ্গে সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার নানা জল্পনা-কল্পনা আলোচনা—তার ফলে অতনু-দেবের পশার বাড়িয়াছে! এক জন সরকারী আশ্রয়-কর্ম্মচারী বলিতেছেন,—there is much room in a public shelter for romance.

এ-যুদ্ধে ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাহিরে যত্র-তত্র শয়ন ও ভোজন-রীতির ফলে বৃটিশ-জীবনের আভিজাত্যের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সন্ধ্যার পরে কেহ আর বড় একটা বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হন না। অন্ধকার পথে বিচরণে বহু অসুবিধা! তাছাড়া কখন কোথায় বোমা পড়ে—এ আশঙ্কায় সকলের মন ঘর-মুখী হইয়া আছে! ঘর-সংসার, স্বামি-স্ত্রী, পুত্রকন্যার উপর মায়া-মমতায় মন পূর্ণ হইয়াছে। রাত্রে কাহাকেও গৃহে নিমন্ত্রণ করিলে সে রাত্রির জন্য গৃহে তাঁকে আশ্রয় দিতে হয়—নহিলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পথে বাহির হইলে কি জানি যদি বোমা পড়ে! এ জন্য নিমন্ত্রণাদির পাট প্রায় ঘুচিতে বসিয়াছে।

সন্ধ্যায় যে সব মিলন-আসর বা বৈঠক বসিত, সেগুলি এখন দিনের বেলায় সারিতে হয়। থিয়েটার-সিনেমা সন্ধ্যা সাতটায় বন্ধ হয়। দিনের বেলায় একটা 'শো' বাড়িয়াছে। রেশের নেশা কমিয়াছে। তার কারণ, ফৌজের দল হইতে ফৌজদলে ঘোড়ার প্রয়োজন। তার উপর ঘোড়ার পর্য্যাপ্ত খোরাকীতে টান পড়িতেছে।

স্পোর্টস্ প্রায় বন্ধ। স্পোর্টস্ বলিতে এখন আছে শুধু গ্রেহাউণ্ড-রেশ, ফুটবল এবং রাগবি ম্যাচ! মাঠে ফৌজের কুচ-কাওয়াজ শিক্ষা চলিতেছে; গাছ ও কাঁটা তারের জালে মাঠ বন্ধ! খেলা কোথায় হইবে?



চার্চ্চিল আসিয়াছেন বোমার ধ্বংস-লীলা দেখিতে

বোমা ও অগ্নি-জ্বালার মধ্যেও বৃটিশ জাতি উত্তেজিত হইতে চায় না। ধীর ভাবে, শান্ত ভাবে এ-বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে চায়।

শ্রমিকদের কাজ বাড়িয়াছে। তাদের কাজের যেমন বিরাম নাই, খাটিতেও তেমনি তারা ক্লান্তি জানে না। দশ-বারো ঘণ্টা ধরিয়া সকলে কাজ করিতেছে। মেয়েরা

আসিয়া পুরুষের নানা কাজ হাসিমুখে গ্রহণ করিতেছেন। ধনের গর্ব্ব, বংশের আভিজাত্য, বিলাসের দাম্ভ ভুলিয়া ব্রিটিশ নারী-সমাজ আজ পুরুষের সহকর্ম্মিণী সাজিয়াছেন। মেয়েরা বারুদের কারখানায় কাজ করিতেছেন; ট্রাম-বাস চালাইতেছেন; পথ ঝাঁট দিতেছেন; ক্ষেতে চাষের কাজ করিতেছেন; দম-কলে কাজ করিতেছেন; গেরাজে ক্লীনার-মিস্ত্রীর কাজ করিতেছেন! লণ্ডনের তিন কোটি জোয়ান সিভিল পুরুষের মধ্যে চল্লিশ লক্ষ জন যুদ্ধে নামিয়াছেন, কাজেই তাঁদের কাজ মেয়েরা করিতেছেন। রণ-হুঙ্কার যত বাড়িতেছে, ইংলণ্ড ঠিক সেই পরিমাণে বিপুল কর্ম্মশালায় পরিণত হইতেছে! গৃহীত ইব কেশেষু মরণ—দুঃখ-কষ্ট অসুবিধা কোনো দিকে কাহারো অস্বস্তি নাই। সারা ইংলণ্ডের কোথাও এতটুকু আতঙ্ক বা উত্তেজনা নাই। সমস্ত জাতি দেশ-রক্ষার মহাব্রত গ্রহণ করিয়া তাহারি পালনে যেন জীবন-মন উৎসর্গ করিয়াছে, আজিকার ইংলণ্ডে পদার্পণ করিলে সকলেরই তাহা চোখে পড়িবে!



জার্ম্মানিতে কোথায় কবে ব্রিটেনের বোমা পড়িতেছে, লণ্ডনের মিনিষ্ট্রী অফ ইনফরমেশন নক্সা আঁকিয়া নিত্যদিন সে সংবাদ প্রচার করে

কবিতা কোথায় ডাইনে বামে

বয়স যখন কাঁচা থাকে ভাই,
মনেতে পশে না চিন্তা-রেখা,—
তখন অনেক ছবি ও কবিতা
খাতার পাতেতে যায়-ই তো দেখা!

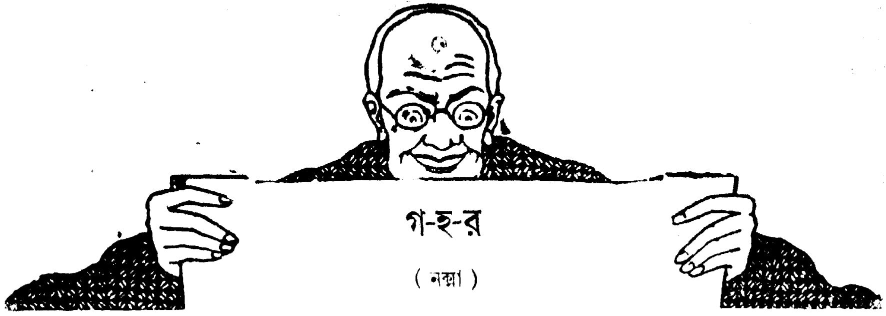
কিন্তু যখন ঘাড়ের উপর
সংসারের-ই সে বোঝাটি নামে,
তখন-ই বিজ্ঞ হাসিয়া শুধায়;
কবিতা কোথায় ডাইনে বামে?

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।



আম্রকানন-অন্তরালে

। শিল্পী—শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গী



গ-হ-র

(নক্সা)

আমি বিখ্যাত নর্ত্তকী গহর জানের ইতিবৃত্ত অথবা অখ্যাত লাঠিয়াল গহর মিঞার জীবনী লিখতে বসিনি। বাঙ্গালা সাহিত্যের ওপর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক সুধী অনেক রকম আলোচনা ও গবেষণা ক'রেছেন, বাঙ্গালা দেশের কোন গ্রামের এক জমিদার-বংশের ওপর কবিবরের কি ভাবে প্রভাব বিস্তৃত হ'য়েছিল, আমি তারই একটা নক্সা আঁকবার চেষ্টা করছি। আশা করি, কবিবরের প্রতি কোন রকম অমর্য্যাদা বা ধৃষ্টতা প্রকাশ করিনি।

মোহনপুরের দত্তরা এক সময় খুব বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার ছিলেন; ইদানীং মামলা-মোকদ্দমা, উকীল, কোর্ট প্রভৃতির সেবায় পৈতৃক সম্পত্তি প্রায় সবই ঘুচিয়ে দিয়েছেন। আমি যে সময়ের কথা ব'লছি, সেই সময় এক সরিক গাবু বসু ক্রমেই নিঃসম্বল হ'য়ে নেমে যাচ্ছেন, আর এক সরিক হাবু দত্ত ক'লকাতায় আদি ও অকৃত্রিম নিমের পিতন চালান দিয়ে নূতন ক'রে ফেঁপে উঠ্ছেন। গাবুর বয়স তখন বছর-পঞ্চাশ হবে; আর হাবুর বয়স বায়ান্ন তো বটেই। তাদের দু'জনের গলায়-গলায় ভাব, উভয়েই পরস্পরকে 'দাদা' সম্বোধন করে। লোকে কথায়-কথায় তাদের তুলনা দিয়ে বলে, সরিকে-সরিকে এমন মনের মিল প্রায়ই দেখা যায় না! ঠিক হ'য়েছিল—গাবু বসুর কন্যা মনটুরাণীর সঙ্গে হাবু দত্তর পুত্র নেপাল বাবাজীবনের শুভ বিবাহ দিয়ে এই মধুর সম্বন্ধটা কায়েমী করা হবে। কিন্তু বিধাতা-পুরুষ অদৃশ্য থেকে হঠাৎ একটা বেমক্কা চা'ল চেলে ব'সলেন!

সেবার মোহনপুরে এক 'সাহিত্য-সম্মেলন' হয়; বহু কবি ও সাহিত্যিক সেখানে পদধূলি দিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করা হ'ল। তার ফলে মোহনপুরে একটি পুস্তকাগার স্থাপিত হয়, এবং রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী ও কবিবরের একখানি সুবৃহৎ তৈল-চিত্র সেই পুস্তকাগারের সম্পদ ও শোভা বর্দ্ধন করে।

মোহনপুরের ঘরে ঘরে আবালবৃদ্ধবনিতাদের মধ্যে সাহিত্যের স্রোত বইতে আরম্ভ ক'রল। গাবু-হাবুও সেই দল থেকে বাদ প'ড়লেন না, গবীন্দ্রনাথ ও হবীন্দ্রনাথ নাম গ্রহণ ক'রে দু'জনেই মহা-উৎসাহে কবিতা লেখা সুরু ক'রলেন; তাতে বিশেষ কোন বিপদ ঘটতো না, কিন্তু যখন তাঁরা দু'জনেই প্রতি-সন্ধ্যায় পুস্তকাগারে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে রবীন্দ্র-কণ্ঠস্বরের অনুকরণে সেই সব কবিতা পাঠ ক'রতে লাগলেন, তখন এই উভয় হঠাৎ-কবির মধ্যে বেশ একটু রেশারেশির আভাস পাওয়া গেল; সাহিত্য-ক্ষেত্রে এটা খুব নিন্দনীয় নয়, অনেক সময় এইরূপ প্রতিযোগিতায় 'কল্চারে'র উন্নতিই লক্ষিত হয়। কিন্তু কার কবিতা ভাল হ'য়েছে,—সমাগত সভ্যদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতেই বিপদ ঘ'টল! কাউকে চটানো উচিত হবে না সিদ্ধান্ত ক'রে—'বোবার শত্রু নেই' এই নীতির অনুসরণে কেউ মৌনাবলম্বন ক'রলেন; কেউ বা "না যাব নগর, না হবে ঝগড়"—এই নিরাপদ পন্থাই শ্রেয়ঃ মনে ক'রে পুস্তকাগারে যাওয়াই বন্ধ ক'রে দিলেন। মোট কথা, পুস্তকাগারের সভ্যসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হ'তে লাগল।

হাবু দত্ত লোকটি চতুর; স্রোতের গতি বুঝে হঠাৎ তিনি কিছু দিনের জন্য ডুব মারলেন। গাবু বসু ভাবলেন, হেবোটা ভয় পেয়ে রণক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রেছে; অতঃপর তিনি নিজের গাঁটের পয়সায় চা ও মিষ্টির লোভ দেখিয়ে কতকগুলি শ্রোতা সংগ্রহ ক'রলেন, এবং দ্বিগুণ উৎসাহে চতুর্গুণ লম্বা কবিতাদি রচনা ক'রে তাদের উপহার দিলেন।

তাঁর সাহিত্য-খ্যাতিটা এই উপলক্ষে বেশ জমাট

বেঁধে এসেছে, এমন সময় পককেশ, একমুখ শুভ্র দাড়ী-গোঁফ, গেরুয়া-সিল্কের সুদীর্ঘ আলখেল্লা ও টুপি-বিভূষিত হাবু দত্ত এসে যখন মঞ্চে আবির্ভূত হ'লেন, গাবু বসু তখন দিশেহারা—নির্ব্বাণোন্মুখ! তার ওপর দত্তর দাঁতন-বিক্রেতা যখন চা ও মিষ্টির সঙ্গে কেক, বিস্কুটাদিও মুক্ত-হস্তে এবং দাড়ি-গোঁফের ব্যূহ ভেদ ক'রে প্রসন্ন হাস্য সহকারে বিতরণ ক'রতে লাগলেন, তখন গাবু বসুর প্রতিভাদীপ একবারে নির্ব্বাপিত হ'য়ে অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে।

গাবু বসু হাবু দত্তর দেখাদেখি দেশী, বিলেতী, হকিমী, কবিরাজী, মায় চৈনিক ঔষধ পর্য্যন্ত ব্যবহার ক'রে গুম্ফশ্মশ্রু ও কেশে হাবুর অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘুচিয়ে দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রতে লাগলেন, ফলও লাভ হ'ল আশাতিরিক্ত; চোখ ছাড়া তাঁর মুখের আর কোনও অংশ যে কোন ব্যক্তির নয়নগোচর হবে—তার উপায় রইল না। কবিতা ছেড়ে হাবু-গাবু দাড়ী-গোঁফ ও কেশের প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হ'লেন; ভ্রূর ওপরেও নানা প্রকার ঔষধের প্রলেপ চ'লতে লাগল; শেষে মুখ-মণ্ডল নিবিড় কেশারণ্যে আচ্ছন্ন হ'য়ে অপরূপ রূপ ধারণ ক'রলে।

গাবু বসুর মেয়ে মন্টুরাণী আধুনিকা। ক'লকাতায় দিদির বাড়ী থেকে কিছু দিন মেয়েদের স্কুলে প'ড়েছে; গলাবাজ খাঁর কাছে সঙ্গীতও শিক্ষা ক'রেছে। সেখানে পাশের বাড়ীর বাসেন্দা রমেশ রায় একাধারে কবি এবং আর্টিষ্ট; মন্টুর ভগিনীপতির সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ, প্রত্যহ বিকেলে চা পান ক'রতে আসায় মন্টুর সঙ্গীত আর রমেশের কবিতার আলোচনা বেশ উৎসাহেই চলতে লাগল। শেষে মন্টুর একখানা পোর্ট্রেট আঁকতে গিয়ে তার প্রথম সিটিঙেই উভয়ে অকস্মাৎ নির্ঘাত ভাবে মন-বিনিময় ক'রে ফেললে।

—পড়শী সেজে বর্শা ভেঁজে গাঁথলে গানের পাখি
আঁকতে ছবি মজলো কবি হেরি সে কাজল-আঁখি।

কবিতা ছেড়ে যখন গবীন্দ্রনাথ ও হবীন্দ্রনাথ দাড়ী-চর্চ্চায় মন দিলেন, তখন মোহনপুরের জনসাধারণকে আরও মুস্কিলে পড়তে হ'ল। কবিতা সম্বন্ধে তবু "হ্যাঁ, বা না" গোছের একটা ভাসা-ভাসা জবাব দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু চেহারার বর্ণনা—ভয়ে কেউ তুলনা দিয়ে কিছু বলতে পারে না, পাছে অন্যে চটে যায়! এ দিকে মৌখিক ভদ্রতার আড়ালে দুই সরিক একেবারে আদা-কাঁচকলায় পরিণত হ'য়েছে। হাবুকে



মন্টুর একখানা পোর্ট্রেট আঁকতে গিয়ে তার প্রথম সিটিঙেই উভয়ে অকস্মাৎ নির্ঘাত ভাবে মন-বিনিময় ক'রে ফেললে

একেবারে 'খ' বানাবার জন্যে গাবু ঠিক ক'রলেন, স্থানীয় পাঠাগারে নিজের একখানি 'অয়েল-পেন্টিং' উপহার দেবেন। মন্টুকে এ কথা জানালে সে তখনই রমেশ রায়কে চিঠি লিখে তাকে আসতে অনুরোধ ক'রলে।

বহুদিন পরে প্রেয়সীর চিঠি পেয়ে রমেশ রায় ব্যাকুল হৃদয়ে মোহনপুরে এসে উপস্থিত! সাইকেল বা রিক্সা-ছাড়া সেখানে অন্য কোন যান-বাহন না থাকায় অগত্যা সে 'দুর্গা দুর্গা' ব'লে রিক্সাতেই চেপে ব'সল;

কিন্তু সেই নর-বাহনের মন্থর গতি তার প্রেমাকুল দুরন্ত অন্তরকে দারুণ পীড়া দিতে লাগল।

ফটকের সামনে সুটকেশ হাতে রিক্সা থেকে নামতেই রমেশের চোখে প'ড়ল টুপী ও আলখেল্লা-পরিহিত সুদীর্ঘ এবং তুষার-শুভ্র গুম্ফ, শ্মশ্রু ও কেশ-শোভিত এক বৃদ্ধের মূর্ত্তি! কুমারী মন্টুরাণী পত্রে লিখেছিল—তার পিতার বদনমণ্ডল কেশ-কাননে আচ্ছাদিত হ'য়েছে! প্রিয়ার পিতাকে সম্মুখে দেখে রমেশ একগাল হেসে ব'ললে, "নমস্কার, গবীন্দ্র বাবু! ভাল আছেন? আমার নাম হ'চ্ছে গিয়ে শ্রীরমেশ রায়।"

অপর পক্ষ দুর্ভেদ্য কেশারণ্যের ভেতর থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বিরক্তি সহকারে ব'ললেন—"হুঁ:। গবীন্দ্র বাবু বলবার মানে?"

রমেশ ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অবাক হ'য়ে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল।

বৃদ্ধ ব'ললেন,—"আমি গাবু নই, বুঝলে?"

ঘাড় নেড়ে আম্তা-আম্তা ক'রে রমেশ ব'ললে, "বড়ই দুঃখিত, আমার ভুল হ'য়েছে।"

বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আমাকে গাবু ব'লে ভ্রম হবার কারণ?"

রমেশ বিনীত ভাবে উত্তর দিলে, "শুনেছিলুম, গবীন্দ্র বাবুর বদনমণ্ডলে অতি ঘন এবং দীর্ঘ গুম্ফ-শ্মশ্রু ও মস্তকে কেশরাজি সমুদ্গত হ'য়ে তাঁর—"

তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল, "এমন কথা তোমায় কে ব'লেছে, শুনি?"

রমেশ ব'ললে, "তাঁর মেয়ে।"

তাচ্ছিল্যভরে অনুকৃত রবীন্দ্রনাথ ব'ললেন, "ফুঃ! মেয়েদের কথার কি কোন দাম আছে? বিশেষতঃ, গাবুর মেয়ে! ও তো পক্ষপাতিত্ব করবেই। পিতৃভক্তি, বংশ-মর্য্যাদা ইত্যাদি। দাড়ী, গোঁফ ও কেশ সম্বন্ধে ঠিক মতামত সংগ্রহ ক'রতে হ'লে ছেলে-মেয়েদের কাছে তা পাবে না, গাবুর দাড়ী-গোঁফ ঘন ও দীর্ঘ—'অ্যাবসার্ড' 'ক্লীন শেভ' নয় বললে বুঝতে পারি; কিন্তু ঘন দীর্ঘ, ছোঃ! একেবারে যাকে ব'লে ননসেন্স!"

ক্রোধভরে তিনি সে স্থান অবিলম্বে ত্যাগ ক'রলেন। রমেশ সুটকেশ হাতে ধীর পদ-বিক্ষেপে বাড়ীর দিকে চ'লল। বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই নয়নের চাঁদ, হৃদয়ের তারা মানস-প্রতিমা মন্টুরাণীর সঙ্গে রমেশের দেখা হ'ল। বেচারার মুখ দিয়ে আর কথা বার হ'ল না। হাঁ ক'রে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে মন্টুরাণী জিজ্ঞেসা ক'রলে, "হাঁ ক'রে কি দেখছ, রামুদা, কখন এলে?"—মনে মনে সে যে খুশীও হ'ল—এ-কথা বলা বাহুল্য।

ধাতস্থ, তটস্থ ও প্রকৃতিস্থ হ'য়ে রমেশ গদগদ কণ্ঠে আধ-আধ ভাবে বললে, "এইতো আসছি, মন্টু—মন্টু-রাণু—মোন্টু ভাল আছ?"

মন্টু বিলোল কটাক্ষসহ মুচকি হেসে উত্তর দিলে, "থ্যাঙ্ক ইউ, সিলি বয়!"

হঠাৎ সেই রবীন্দ্র-প্রোটোটাইপের কথা মনে প'ড়তেই রমেশ জিজ্ঞাসা ক'রলে, "আচ্ছা মন্টু, তুমি ব'লেছিলে, তোমার বাবার খুব ঘন এবং দীর্ঘ গোঁফ-দাড়ী আর চুল; ঠিক সেই রকম 'ডেশক্রপশনের' এক ভদ্রলোককে গবীন্দ্র বাবু ব'লে সম্বোধন ক'রতেই তিনি মার-মুখো হ'য়ে আমায় ব'ললেন, তাঁর নাম গবীন্দ্র বাবু নয়; ব্যাপার কি?"

খুব খানিকটা হেসে মন্টুরাণী উত্তর দিলে, "যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়! এসেই ঠিক সাপের গর্ত্তে পা দিয়েছ!"—ব'লেই আবার সে একচোট হাসির তুব্ড়ি ছোটালে।

হতভম্ব হ'য়ে রমেশ জিজ্ঞাসা ক'রলে, "হাসছ কেন? কি হ'য়েছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে!"

দম নিয়ে মন্টু ব'ললে, "ওঁর নাম হ'ল গিয়ে হাবু দত্ত, ওরফে হবীন্দ্রনাথ।—বাবার গোঁফ-দাড়ীতে ওঁর ভয়ানক হিংসে!"

এমন সময় দাড়ী-গোঁফ-কেশমণ্ডিত, টুপী ও আলখেল্লা-পরিহিত আর এক জন রবীন্দ্রবেশী এসে হাজির! রমেশ কোন কথা কইতে সাহস ক'রলে না, পাছে আবার কি ভুল ক'রে ব'সে! মন্টু পরিচয় করিয়ে দিলে, "বাবা, ইনিই রমেশ রায়, আর্টিষ্ট, জামাই বাবুর ফ্রেণ্ড।"

চেহারা দেখেই আর্টিষ্টের চক্ষু চড়কগাছ! যাঁর চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তার আঁকবে কি? কেবল দাড়ি আর গোঁফ? তবু প্রিয়ার পিতাকে তোয়াজ করবার অভিলাষে এক-গাল হেসে ব'ললে, "নমস্কার!

আপনার দাড়ী গোঁফের সুখ্যাতি আমরা ক'লকাতায় ব'সেই শুনেছি; আজ চাক্ষুষ দেখে কি বিপুল আনন্দই যে পেলুম!"

কেশারণ্যের ব্যূহ ভেদ ক'রে ধ্বনি বহির্গত হ'ল, "বাঙ্গালা দেশে কে না জানে? হুঁ, হেবো এসেছে আমার সঙ্গে টেক্কা দিতে! যত সব বোকারাম ফাজিলের ধাষ্টেমো!"

ঠিক্ সেই সময় 'কার্‌বন-কাপি' এসে হাজির! শ্লেষের হাসি হেসে তিনি ব'ললেন, "কি রে গেবো, দাড়ীটা ছেঁটেছিস্ না কি?"

গরম হ'য়ে গবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "হঠাৎ এ-রকম বাজে কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য কি? মাথার ছিট্?"

হবীন্দ্রনাথ পাল্টা জবাব দিলেন, "মাথায় একটু টাকও যেন দেখা দিয়েছে!"

গবীন্দ্রনাথ চটে উঠলেন; কিন্তু অতিথিকে নিজের বাড়ীতে অপমান করা শিষ্টাচারসঙ্গত নয়, এ কথা হঠাৎ মনে প'ড়ল!

দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে সেই কেশারণ্যের ভেতর থেকে বাঘের মতন জলন্ত অগ্নিময় চক্ষু ঘূর্ণিত ক'রতে লাগলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধটা আর বেশী দূর গড়াবার আগেই কদম্বকেশরবৎ খোঁচা-খোঁচা চুল, বুল-ডগমার্কা মুখধারী এক যুবক ঘটনাস্থলে উপস্থিত! তাকে দেখে কার্‌বন-কাপির দু'জন দু'দিকে ছিট্‌কে প'ড়লেন। মন্টু পরিচয় করিয়ে দিলে,—"ইনি আমাদের আর্টিষ্ট রমেশ রায়, বাবার পোর্ট্রেট আঁকতে এসেছেন; আর ইনি আমার মানে—ভবিষ্যতে হয় ত—বুঝলে কি না—মিষ্টার নেপালচন্দ্‌ডার ডাট্।"

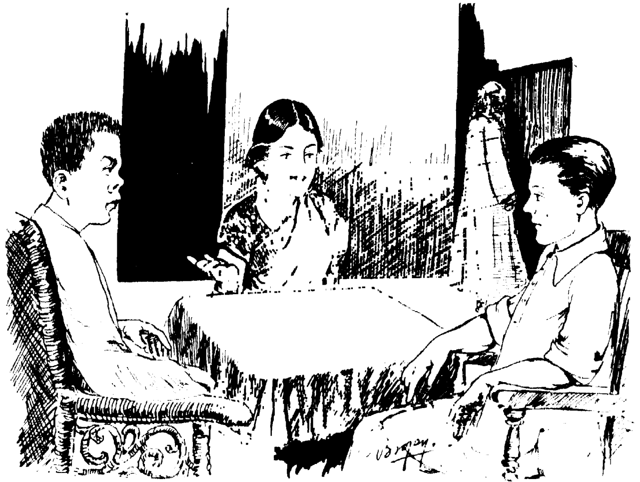
রমেশ কিছু বুঝলে, কিছু বুঝলে না। তার মাথাটা তখন লাটিমের মত বন্-বন্ ক'রে ঘুরছে। চারিদিকে সে অন্ধকার দেখছে। কানে এল, মন্টু ব'লছে, "মাণিক, সায়েবকে ঘরে পৌছে দিয়ে এস।"

মাণিক এগিয়ে-এসে স্যুটকেশ তুলে নিলে, এবং যন্ত্রচালিতবৎ রমেশ তার অনুসরণ ক'রলে।

রমেশ রায় ঘরে এসে হতাশ ভাবে বসে আছে, এমন সময় চায়ের পেয়ালা হাতে মন্টুরাণী স্বয়ং সেখানে প্রবেশ ক'রলে। ঝোড়ো কাকের মত রমেশের অবস্থা দেখে হেসে বললে, "কি রামুদা'! ও-রকম প্যাঁচার মত মুখ ক'রে ব'সে আছ কেন?"

রমেশ চটে উঠে ব'ললে, "আর দরদ দেখিয়ে দরকার নেই, আমি এক্সপ্লানেশন চাই।"

"পাজ্‌লটা কি, জান্‌তে পারি?"



মন্টু পরিচয় করিয়ে দিলে—"ইনি আমাদের আর্টিষ্ট রমেশ রায়, বাবার পোর্ট্রেট আঁকতে এসেছেন; আর ইনি আমার মানে—ভবিষ্যতে হয় ত—বুঝলে কি না—মিষ্টার নেপালচন্দ্‌ডার ডাট্

"তোমার বিয়ে?"

"ওঃ!"

"ওঃ মানে? আমি কত আশা ক'রে এলুম, ভেবেছিলুম, তুমি আমার সেই আগেকার মতই।"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে কি?"

"সেই চির পুরাতন কথা! বাবার ইচ্ছে—আমি এই ক্যাডাভ্যারাস চেহারা-মার্কা নেপালচন্দ্রকে বিয়ে করি; কারণ, আমরা এবসোলিউট ব্রোক।"

"কেন, নেপালচন্দ্রের কি অনেক পয়সা আছে?"

"আছে বই কি। হাবু বাবুর ছেলে। ওরাই তো দত্তর দাঁতন।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রমেশ ব'ললে,—"আই সী!"

কম্পিত কণ্ঠে মন্টুরাণী ব'ললে,—"রামুদা', তুমি কেন বড়লোক হ'লে না? বেশী নয়; যদি মধুপুরে, দার্জ্জিলিয়ে, শিলঙে, আর পুরীতে তোমার একটা ক'রে বাড়ী থাকত, ক'লকাতায় একটা বসতবাড়ী থাকত, দু'খানা মোটর-গাড়ী থাকত, আর আমাদের খরচ চালাবার মত ব্যাঙ্কে লাখ-দুই টাকা থাকত, তবে ঠিক জেনো, আমি বাবার অমতেই—কিন্তু—"

আবার উভয়ে নিঃস্তব্ধ। শুধু থেকে-থেকে এক একটা দীর্ঘশ্বাসে নীরবতা ভঙ্গ হচ্ছিল। মন্টুরাণী ব'ললে, "বাঙ্গালা দেশে ফিল্মে এখনও 'টু-পাইস্' আসে, তুমি যদি এই দিক দিয়ে একটা কিছু—"

রমেশ স্পিং এর পুতুলের মতো তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে-উঠে ব'ললে, "ঠিক ব'লেছ, এ-কথা এতক্ষণ মাথায় আসেনি। কিন্তু—" হঠাৎ সে যেন একেবারে মুষড়ে প'ড়ল।

উৎকণ্ঠিতা মন্টু ব্যগ্র ভাবে প্রশ্ন ক'রলে, "কি হ'ল রামুদা'?"

রমেশ কাতর ভাবে ব'ললো,—"কিন্তু মন্টু, আমি তো ছবি বিশেষ ভাল আঁকতে পারিনে। আমার ষ্টুডিওর ছবিগুলি বেশীর ভাগই অন্য লোকের আঁকা, কিম্বা কপি-করা।"

মন্টু ব'ললে, "তবে কি হ'বে? বাবার ছবি—"

রামু কাঁদ-কাঁদ স্বরে ব'ললে, "পোর্ট্রেট ফটো দেখে-দেখে একটু-আধটু পারি। কিন্তু তোমার বাবার মুখ-মণ্ডল তো একেবারে ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টিং—"

মন্টুর মনে নারীর সহানুভূতি জেগে উঠল; ব'ললে, "সে পরে ভাবা যাবে; এখন চা তো খেয়ে নাও, জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

চা-টা খেয়ে রমেশ গালে হাত দিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে আকাশ-পাতাল ভাবছে। মন্টুকে একটা কবিতা লিখে উপহার দেবার ও কি ক'রে 'টু-পাইস' রোজগার করা যায়—এই দুই চিন্তা একসঙ্গে তার মাথার মধ্যে কিল্-বিল্ করছে। কবিতার দুই লাইন লিখে আর তা এগোচ্ছে না,—

সাহারার মাঝে ওয়েসিস তুমি আঁধারের মাঝে আলো,
চপল চোখের চাউনি তোমার লাগে মোর বড় ভালো।
টাকার অভাবে কেমনে তোমারে লভিব বুঝিতে নারি,
তার পরে আর কি ক'রে মিলাতে পারি?
বিপদ হ'ল যে ভারী!

চমকে উঠে রমেশ দাঁড়িয়ে বললে, "আপনি—মানে—"

জঙ্গলের মধ্যে থেকে আওয়াজ এল, "আমার নাম হবীন্দ্রনাথ দত্ত। নেপালের মুখে শুনলুম, তুমি না কি গবার ছবি আঁকতে এসেছ। তোমারই নাম রমেশ রায় তো?"

রমেশ ঘাড় নেড়ে জানালে যে, তিনি ঠিকই শুনেছেন।

হাবু বাবু ব'ললেন, "আচ্ছা, বল তো, কাকে রবীন্দ্র-নাথের নিয়ারেষ্ট এপ্রোচ' মনে হয়? আমার দাড়ী-গোঁফ আর চুলের কাছে গাবু দাঁড়াতে পারে?"

রমেশ চুপ ক'রে রইল, হ্যাঁ-না কিছুই বলতে সাহস ক'রল না।

চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে রমেশের পাশে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে হাবু দত্ত বল্লেন, "তুমি তো আর্টিষ্ট, আচ্ছা, কত টাকা মাসে রোজগার কর?"

প্রশ্নটা বড্ডই পয়েণ্টেড; অভদ্রোচিতও বলা যেতে পারে। দু'বার ঢোক গিলে মাথা চুলকে রমেশ ব'ললে, "এখনও ঠিক সুবিধা করতে পারছিনে, তবে আশা আছে—"

বাধা দিয়ে 'রবীন্দ্র-কার্বন-কাপি' ব'ললেন,—"আজ-কালকার দিনে ও-সব আশার কোন মূল্য নেই। তুমি যদি এক কাজ কর তো আমি তোমায় কিছু সাহায্য ক'রতে পারি। আচ্ছা, তোমায় গবা ছবি আঁকার জন্যে কত দেবে ব'লেছে?"

রমেশ মনে মনে ভাবলে, টাকার কথা তো এরা কেউ কিছু বলেনি, এমন কি, ট্রেণ-ভাড়া পর্য্যন্ত এরা দেয়নি। মন্টু তার প্রধান আকর্ষণ ব'লে টাকার প্রতি তার একেবারে যে কোন টানই নেই, তা তো নয়। সে মুখখানা রাঙা ক'রে উত্তর দিলে,—"কই, টাকার কথা তো উনি এখন পর্য্যন্ত কিছুই বলেন-নি।"

হা-হা-হা ক'রে উচ্চস্বরে হেসে হবীন্দ্র বাবু ব'ললেন,—

"তা ব'লবে কেন ? আর দেবেই বা কোথেকে ? ওর কি কিছু আছে ? তা যাক্, আমি যা বলছিলুম। তুমি যদি একটা কাজ কর তো আমি তোমায় 'ফাইভ হান্‌ড্রেড রুপীজ' দিতে রাজী আছি।"

রমেশের মাথা ঘুরে গেল ! ফাইভ হান্‌ড্রেড রুপীজ ! তা দিয়ে কি না করা যেতে পারে ? চৌরঙ্গীতে একটা ওয়ান-ম্যান্স শো দেবে, ছবি বিক্রি হবেই; ফাইভ হান্‌ড্রেড পার্শেন্ট নেট-প্রফিট। নট এ ম্যাটার অফ জোক ! তার পরই মন্‌টুকে—আর সে ভাবতে পারলে না। ব'ললে,—"কি কাজ বলুন, নিশ্চয়ই করব, টাকাটা কিন্তু—"

"অ্যাডভান্স দিতে হবে, এই তো ? সে জন্যে আমি প্রস্তুত হ'য়েই এসেছি। চেক নয় একেবারে ক্যাশ। কাজটা হচ্ছে,—তুমি কোন রকমে গাবুর দাড়ী-গোঁফ আর মাথার চুল যদি বেমালুম উড়িয়ে দিতে পার—"

বিস্মিত স্বরে চোখ দুটো ছানাবড়ার মত গোলাকার ক'রে রমেশ ব'ললে,—"শেভ ক'রে দেব ?"

"একজ্যাক্টলি !"—প্রেটোটাইপ ব'ললেন।

একে মন্‌টুর বাবা, তায় রমেশ গাবুর অতিথি ; এ-রকম ক্ষেত্রে একটা আণ্ডার-হ্যাণ্ড কাজ !—মনটা কর্-কর্ ক'রতে লাগল।

"পাঁচশোতে না হয়, আর একশ' বাড়িয়ে দিচ্ছি।"—জঙ্গল থেকে আওয়াজ বেরোল।

বড় বড় মহাপুরুষই কামিনী-কাঞ্চনের লোভে প'ড়েছেন, রমেশ তো কোন্ ছার ! এই টাকাটা তার ভবিষ্যতের বিরাট সম্পত্তির 'নিউকলিয়াস' মাত্র। তার পর বাড়ী, গাড়ী—মন্‌টুকে বিবাহ, গরমে দার্জ্জিলিঙ, শিলং—রমেশ রাজী হ'ল, ব'ললে,—"আপনি যা বলেন।"

অতঃপর এক জনের ছ'শ টাকার নোট আর এক জনের পকেটে স্থান পেল। বৃদ্ধ বাজখাঁই ভাঙ্গা কাঁসা-কণ্ঠে—"মা আমার বড় ভয় হ'য়েছে"—রামপ্রসাদী ভাঁজতে-ভাঁজতে চ'লে গেলেন। মাথায় হাত দিয়ে রমেশ মতলব ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে রামু বাবুর ঘরে মাণিক এসে হাজির। রমেশ চমকে উঠলো ; চিন্তাসূত্র একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল—বিরক্ত স্বরে ব'ললে,—"কি চাও ?"

বিনীত ভাবে মাণিক উত্তর দিলে,—"আপনার কিছু দরকার আছে কি না দিদিমণি জানতে পাঠালেন।"

রামুদার মন আনন্দে ভরে উঠল ! উঃ, দিদিমণি অর্থাৎ মন্‌টু তাকে কি ভালবাসাটাই না বাসে ! মাণিকের দিকে ভাল ভাবে এইবার রামুদা' চাইল—আর্টিষ্টের চোখে। ফাঁকিটি চলবে না, ঠিক ধরে ফেললে যে, মাণিক বুদ্ধিমান লোক ! কণ্ঠস্বর যতখানি সম্ভব মোলায়েম ক'রে রামুদা' ব'ললে, "মাণিক, বাবা, কিছু রোজগার করবি"—বলেই, তার হাতে দু'টো টাকা গুঁজে দিলে।

এক-গাল হেসে মাণিক ব'ললে, "কি করতে হবে বাবু ? টাকা আমার দরকার। আট মাসের মাইনে বাকী পড়েছে, কিন্তু এঁরা দিতে পারছেন না, আমরা গরীব, কি ক'রে চলে বলুন।"

রামুদা' উত্তর দিলেন, "তোদের জমীদার বাবুর দাড়ী-গোঁফ আর চুল কামিয়ে দিতে হবে। যদি কোন উপায়—"

মাণিক একেবারে অবাক হ'য়ে গেল, ভাবলে, রমেশ বাবু পাগল নয় তো, মুখ দিয়ে বার হ'ল, "কামিয়ে দিতে হবে ! বলেন কি ?"

"হ্যাঁ, একেবারে 'ক্লীন শেভ' ক'রে দিতে হবে। তাতে এখনই নগদ টাকা কিছু হবে, আর যদি কামাবার পর চেহারা খুব হাস্যকর হয় তো—ওয়াল্ট ডিজনীর মত কার্টুন পিকচার্স ক'রতে পারলে লাখপতি হ'য়ে যাব। তুমি যদি কি উপায়ে কাজটা হাসিল করা যায়, বাতলে দিতে পার তো তোমাকে ভবিষ্যতে আর চাকরী করতে হবে না, তোমার নামে একটা বাড়ী আর মাসোহারা বন্দোবস্ত করে দেব।"

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় আনন্দের আতিশয্যে মাণিকের কোটরগত চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল ; একটু ভেবে ব'ললে, "দেখুন, একটা উপায় আছে, উনি যখন ঘুমবেন—"

স্প্রিংএর পুতুলের মত তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে রমেশ বললে, "ইউরেকা ! ঠিক হ'য়েছে। আচ্ছা, রাত্রে উনি কোথায় শোন ?"

মাণিক উত্তর দিলে—"গরমের জন্য উনি আর হাবু বাবু দু'জনেই ছাদে শোন।"

রমেশ প্রশ্ন ক'রলে—"শু'তে যাবার আগে জল কি কফি কিছু খান কি ?"

মাণিক প্রশ্নের কারণটা বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থেকে ব'ললে, "তা শু'তে যাবার সময় জল খান বই কি! না খেলেও মাথার কাছে টেবিলে দু' গ্লাস জল রেখে দিতে হয়।"

সুটকেস খুলে একটা শিশি বার ক'রে মাণিকের হাতে দিয়ে রমেশ ব'ললে, "দেখ, এইটে ঘুমবার ওষুধ। আমার রাত্রে ঘুম হয় না ব'লে—খাই; গবীন্দ্র বাবুর গেলাসে খুব-খানিকটা এই ওষুধ মিশিয়ে দেবে, বাড়ীতে ডাকাত প'ড়লেও বারো ঘণ্টার আগে ঘুম ভাঙ্গবে না। সেই সুযোগ, বুঝলে কি না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"—মাণিক ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলে।

"এই নাও"—পাঁচ টাকার একখানা নোট নিয়ে রমেশ মাণিকের দিকে হাত বাড়ালে। নোটখানা পেয়ে মাণিক একগাল হেসে, তার পায়ের ধূলো নিয়ে চ'লে গেল। রমেশ নিশ্চিন্ত মনে আবার কবিতা লেখায় মন দিল।

রাত দু'টো নাগাদ পা টিপে-টিপে রমেশ ছাদে গিয়ে হাজির হ'ল। রাতের ঈষৎ আলোতে দেখলে—টেবিলের ওপর একটা গেলাস শূন্য! বুঝলে—কাজ হাসিল। ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলে এক জন নড়ছে, আর এক জন 'নট্ নড়ন-চড়ন নট্ কিচ্ছু!'—তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ক্ষুর বার ক'রে দ্বিতীয় নিদ্রিত ব্যক্তির গোঁফ-দাড়ী এবং চুল একেবারে সাফ ক'রে দিয়ে বিজয়ী বীরের মত উল্লসিত মনে ধীর পদবিক্ষেপে নিজের ঘরে এসে বিছানার ওপর গা ঢেলে দিলে; কিন্তু ঘুম চোখে এল না। সকালে উঠে যখন গবীন্দ্র বাবু ব্যাপারটা শুনতে পাবেন, তখন যে কি রকম 'সীন' হ'বে, সেই ভেবে সে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ ক'রতে লাগল।

ভোর হোতে না হোতে রমেশ নেমে এল। প্রথমেই তার নজরে প'ড়ল মাণিক।

রমেশ হেসে ব'ললে, "বুঝ্লে মাণিক? কেল্লা ফতে!"

মাণিক অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিল, ব'ললে, "আজ্ঞে সমস্ত—"

রমেশ ব'লে উঠল, "একেবারে পারফেক্ট,—ঠিক প্ল্যান অনুসারে।"

মাণিক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "ঠিক চিনে নিতে পেরেছিলেন তো ?"

রমেশ উত্তর দিলে, "দাড়ী-গোঁফ আর চুলে যা বন-জঙ্গলের সৃষ্টি হ'য়েছে, তাতে দিনের আলোতেই চিনতে পারিনে, তা রাতের অন্ধকারে! তবে এক জন একেবারে নিথর হ'য়ে শুয়েছিল, বুঝলুম, তিনিই আমার ভিক্‌টিম্।"

মাণিক ব'ললে, "কিন্তু তিনি কে? আমি দু'গেলাস জলেই ঘুমোবার ওষুধ মিশিয়ে রেখেছিলুম্। কোন্‌টা কে—"

রমেশ ভীত ভাবে ব'ললে, "অ্যাঁ, তবে কি—"

কথা আর এগোলো না। সামনে যেন ভূত দেখেছে এমন ভাবে রমেশ ও মাণিক উভয়ে চ'মকে উঠল। লাঠি ঘুরোতে-ঘুরোতে দাড়ী-গোঁফ ও বাবরী-ছাঁটা কেশ-রাজিশোভিত আলখেল্লা ও টুপী-পরিহিত 'রবীন্দ্র-কার্বন-কাপি' এসে হাজির! রবীন্দ্র-কণ্ঠস্বর অনুকরণে তিনি বল্লেন, "কি রমেশ বাবু, খুব সকাল-সকাল উঠেছেন দেখছি, আমি রাত তিনটের সময় মর্নিং-ওয়াকে বেরোই, —মাণিক, চায়ের বন্দোবস্ত কর।"

কণ্ঠস্বরে চেনা গেল, তিনি গবীন্দ্রনাথ।

চায়ের টেবিলে মন্টুরাণী এসে যোগ দিল। রমেশের অতলে নিমজ্জিত মন একটু ওপর দিকে যেন ভেসে উঠ্‌লো; গবীন্দ্রনাথ রমেশকে জিজ্ঞেসা ক'রলেন, "তার পর—আমার ছবি ক'বে থেকে আরম্ভ ক'রছেন ?"

আমতা-আমতা ক'রে রমেশ ব'লল, "এই শীগ্‌গিরই আরম্ভ ক'রব। আপনার পার্সন্যালিটি ষ্টাডি ক'রছি, পোর্ট্রেটে ব্যক্তিত্বই হ'ল আসল জিনিষ।"

তাকে সাহায্য ক'রবার জন্য মন্টু ব'ললে, "তোমার যদি একটা ফটো ওঁকে দাও তো উনি অবসর মত ব'সে ষ্টাডি ক'রতে পারেন।"

গবীন্দ্র বাবু ব'ললেন, "বেশ তো, বেশ তো!"

রমেশের কৃতজ্ঞ-দৃষ্টির উত্তরে মন্টু বিলোল কটাক্ষ হান্‌লে।

"এক্ষুনি আস্‌ছি", ব'লে রমেশের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ দৃষ্টি থেকে মন্টু নিজেকে অপসারিত ক'রলে।

এমন সময় দাড়ী-গোঁফ ও চুল হাতে চীৎকার ক'রতে ক'রতে 'ক্লীন্ শেভেন' হবীন্দ্র দত্তের প্রবেশ। পিছনে তাঁর পুত্র নেপালচন্দ্র। হবীন্দ্র হাবুতে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছেন। বরাহের মত মুখ নেড়ে হাবু দত্ত ব'ললেন, "আমি জানতে চাই—এর অর্থ কি ?"

চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বার হ'তে লাগল। নেহাৎ কলিকাল, তাই রক্ষে! নইলে সকলে সেই ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম হ'য়ে যেত।

মুচকি হেসে ধীর কণ্ঠে গবীন্দ্রনাথ ব'ললেন, "অ্যাঁ, দাড়ী-গোঁফ-চুল সব কামিয়ে ফেলেছ, তা ভালই ক'রেছ।



বরাহের মত মুখ নেড়ে হাবু দত্ত ব'ললেন,—"আমি জানতে চাই—এর অর্থ কি ?"

রবীন্দ্রনাথের মতন চেহারা তোমার কোন দিনই হ'ত না, মিছে বোঝা বাড়িয়েছিলে।"

ক্রোধে হাবু বাবুর মুখমণ্ডল লাল হ'য়ে উঠল। বন-বেড়ালের মতন দাঁত খিঁচিয়ে চীৎকার ক'রে ব'ললেন, "গেবো, আমি তোমার অতিথি, তুমি উপযুক্ত ব্যবহারই ক'রেছ! তোমাকে বিশ্বাস করাই আমার অন্যায় হ'য়েছে। জ্ঞাতিশত্রু যে কত ভীষণ হ'তে পারে, তার প্রমাণ আজ হাতে-হাতে পেলুম। আমি চললুম, কিন্তু যাবার আগে তোমায় গুটিকতক কথা বলে যেতে চাই। প্রথম,—তুমি অতি নীচ, ছোটলোক, ইতর, ইত্যাদি। দ্বিতীয়,—তোমার বিরুদ্ধে আমি কোর্টে কেস করব। তৃতীয়,—এই জন্মের মত বিদায়—"

"এক কাপ চা খেয়ে—" গবীন্দ্র বাবু বলতে গেলেন।

"না না, তোমার গৃহে আর আমি জলস্পর্শ ক'রব না। তুমি আমার কাছে হেরে যাচ্ছ দেখে যে আণ্ডারহ্যাণ্ড পলিসি অবলম্বন করেছ—"

গোলমাল শুনে মনটুরাণী ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হ'ল। হাবু বাবুর অবস্থা দেখে প্রায় হেসে ফেলেছিল আর কি! অনেক কষ্টে গম্ভীর মুখে প্রশ্ন ক'রলে,—"জ্যেঠা বাবু, এ কি দশা ?"

হাবু দত্ত গাঁক্-গাঁক্ ক'রে উঠলেন, "আমাকে কেন, তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা কর। চোর, জোচ্চোর, ঠগ, ডাকাত, দাড়িকাট্—"

হেসে গবীন্দ্রনাথ ব'ললেন,—"হেবো মনে ক'রেছে যে, ওর ঐ শেভিঙে আমার হাত ছিল; এই রকম একটা হওয়া উচিত ছিল, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এটা 'অ্যাপ্রুভ' করছি, কিন্তু সত্যিই এর মধ্যে আমার কোন হাত ছিল না। ভোর তিনটের সময় আমি মর্নিং-ওয়াকে গেছি। তখন অবশ্য অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাইনি—"

মনটুরাণী ব'ললে,—"আচ্ছা, ছাগলে দাড়ি খেতে পারে কি ?"—

হাবু দত্ত 'বার্ষ্ট' করলেন—"তোমার বাবাই ছাগল! আমার শেষ কথা এই যে, তোমার মত লোকের মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেব না।"

ক্ষীণকণ্ঠে নেপালচন্দ্র ব'ললে—"কিন্তু বাবা—"

"না, না, তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না" —হাবু বাবু গর্জ্জন করলেন।

এই গণ্ডগোলের মধ্যে রমেশ ঘরের এক কোণে

আশ্রয় নিয়েছিল, হঠাৎ তার দিকে নজর পড়তেই হাবু দত্ত যেন ক্ষেপে উঠলেন; লাফিয়ে কামড়াতে যাওয়ার ভঙ্গিমায় তিনি অগ্রসর হ'লেন। রমেশ ভয়ে তিন-পা পিছিয়ে গেল, হাবু দত্ত চেঁচালেন,—"ইউ ডবল-ক্রসিং ব্যাট, আমার টাকা খেয়ে—"

মন্টু, গবীন্দ্রনাথ অথবা নেপালচন্দ্র—ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলে না।

গবীন্দ্র বাবু প্রশ্ন করলেন,—"টাকা খাওয়া মানে ?"

কথাটা বলা যুক্তিযুক্ত নয় ভেবে হাবু দত্ত চেপে গিয়ে বললেন,—"তাতে তোমার দরকার কি ? তোমরা সবাই ছোটলোক ! ন্যাপাল, চলে এস।"

অতঃপর নেপালচন্দ্র সহ দ্রুতপদে হাবু দত্তের প্রস্থান।

কৌতূহল দমন ক'রতে না পেরে গবীন্দ্র বাবু প্রশ্ন করলেন, "রমেশ বাবু, টাকা খাওয়া কথাটা কি, ঠিক বুঝতে পারলুম না। ব্যাপারটা কি ?"

রমেশ ব'ললে, "আজ্ঞে, ব্যাপার আর কি, উনি আপনার দাড়ি-গোঁফ-চুল কামিয়ে দেবার জন্য আমাকে ছ'শ টাকা দিয়েছিলেন, আমি কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যের সাজা দেবার অভিপ্রায়ে ওঁকেই শেভ ক'রে দিয়েছি।"

গবীন্দ্র বাবু হো-হো ক'রে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন, মন্টু প্রশংসমান দৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাইলে। আঁখির ভাষায় উভয়ে উভয়কে প্রেম-নিবেদন ক'রলে।

হাসি থামবার পর গবীন্দ্র বাবু ব'ললেন, "তুমি অতি বুদ্ধিমান ছোকরা ! আই ক্যান্ট হেল্প প্রেজিং ইউ।"

মনে-মনে রমেশ তখন আকাশে কেল্লা গ'ড়ছে। বাপ যখন প্রসন্ন, মেয়ে যখন ভালবাসে,—বিয়েটা তখন লেগে যাওয়ার চান্স খুব বেশী।

পকেট থেকে একটা চুরুট বার ক'রে গবীন্দ্র বাবু মুখে ধরলেন, পকেট হাতড়ে দেশলাই না পাওয়াতে রমেশকে জিজ্ঞেসা করলেন, "রমেশ বাবু, আপনার কাছে দেশলাই আছে ?"

ভাবী শ্বশুর দেশলাই চাইছে, এর চেয়ে অন্তরঙ্গ ব্যবহার আর কি হ'তে পারে ? রমেশ আনন্দে ডগমগ হয়ে অন্যমনস্ক ভাবে জ্বলন্ত দেশলাই চুরুটের সামনে ধরলে, চুলের বনানী হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলো ! আর যাবে কোথায় ?

"তবে রে, তোমার নিকুচি করেছে, আই উইল কিল ইউ !" হাতের কাছে চায়ের কেৎলী ছিল, রমেশকে ছুড়ে মারলেন তাই। তাড়াতাড়ি মাথাটা নীচু ক'রে রমেশ নিজেকে বাঁচালে, তার পরেই একেবারে দরজা ! সেই-খান থেকে মন্টুকে লক্ষ্য করে চীৎকার ক'রলে, "মন্টু আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার বাবার অর্দ্ধদগ্ধ দাড়ি-গোঁফ ও চুল দেখে আমার মাথায় একটা ফাইন প্ল্যান এসেছে, 'গেবো দি গুণ্ডা' নাম দিয়ে ওঁর কার্টুন ফিল্মে ছাড়তে পারলে এক বছরের মধ্যে লাল হ'য়ে যাব। তার পর তুমি আর আমি,—" কথা আর শেষ করা গেল না, চায়ের ট্রে ছুড়ে গবীন্দ্র বাবু তার মাথায় মারলেন। মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে রমেশ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।



—"তবে রে, তোমার নিকুচি করেছে, আই উইল কিল ইউ !"

শ্রীযামিনীমোহন কর।



(উপন্যাস)

১

কল্লোল রায় কি করিয়া কেনই বা রেঙ্গুনে আসিল, এ-ব্যাপার তার কাছেও যেন দুর্জ্ঞেয় রহস্য! রেঙ্গুনে আসিবার কল্পনা তার মনে কখনো উদয় হয় নাই! অথচ···

কল্লোলের বাড়ী বারাশতে। বারাশত হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া সে কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসে। পড়াশুনায় ভালো ছেলে বলিয়া নাম ছিল; চেহারা ভালো; পৈত্রিক পয়সা-কড়িরও সংস্থান আছে। কাজেই কলিকাতার সমাজে সহজেই প্রবেশাধিকার ঘটিল।

কলেজের মারফৎ এ-দিকে যেমন এম-এ পাশ করিল, ও-দিক দিয়া তেমনি কলিকাতার সৌখীন-সমাজ-অবলম্বনে জন্মগত আচার-রীতি ত্যাগ করিয়া প্রগতিশীল বলিয়াও সে নাম কিনিল। এবং এ-নাম কিনিতে গিয়া জীবনে যে-ঘূর্ণী রচিয়া তুলিল, তার বেগে বাঁধা লাইন ছাড়িয়া ছিট্‌কাইয়া কোথায় আজ আসিয়া পড়িয়াছে···

কিন্তু সে-কথা বলিতে গেলে অনেক বছরের খুঁটীনাটী বৃত্তান্তের আলোচনা করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে পরে সে কথা বলিব।

নিজেকে লইয়া কল্লোলের এখন দুশ্চিন্তার সীমা নাই! বসিয়া বসিয়া সে নিজের কথা ভাবে। বাঙালীর চিরাচরিত প্রথা মানিয়া নিরীহ শান্ত ভাবে বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার, লৌকিকতা-রক্ষা, ছেলেমেয়ের পালন-শাসন, তাশ-পাশা-দাবা, খোশ-গল্প এবং চাকরি—এ সবের উপর কল্লোলের এতটুকু মমতা ছিল না। জীবনে সে চাহিয়াছে, নব-নব বৈচিত্র্য, উত্তেজনা-উন্মাদনা, কৌতুক আর আমোদ। বন্ধুরা তার সঙ্গে খানিকটা দৌড়-ঝাঁপ করিয়া শ্রান্ত দেহ-মন লইয়া নিত্যদিনের ঘর সংসারে গিয়া যখন আশ্রয় লইল, তখন তাদের ডাকিয়া ব্যঙ্গ করিয়া কল্লোল বলিয়াছিল—

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন,
চরণ-তলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন···

অর্থাৎ এই বিশাল মরুর পিপাসায় কল্লোল ব্রাণ্ডি-হুইস্কি ধরিল; এবং এক দিন সুরাপানে-বিভোর কল্লোলের মনে হইল, পৃথিবীতে সে একা! কাহারো সঙ্গে যেমন তার সম্পর্ক নাই, তেমনি কাহারো উপর কোনো কর্ত্তব্য নাই, দায় নাই! প্রাণ তার যা চাহিবে, সে তাই করিবে। কারো কাছে কৈফিয়ৎ নয়···

কল্লোল জানিত, তার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে। কাহারো সঙ্গ সে সহিতে পারিত না। কি তুচ্ছ কথা সকলে কয়···কি তুচ্ছ জিনিষ লইয়া সব মাতিয়া আছে··· সে-সবের না আছে কোনো অর্থ, না কোনো যুক্তি! নিজেকে পৃথিবীর সঙ্গে কোনো মতে সে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। মনে হইত, সে যেন এ-পৃথিবীর নয়! নিজের উপরে বিরক্তি ধরিল। এবং এই বিরক্তির ঘোরে সে হুইস্কি-ব্রাণ্ডির মাত্রা দিল বাড়াইয়া! সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক উপসর্গ! তার পর···

নাটকে যেমন দৃশ্যের পর দৃশ্য রচিয়া নাট্যকার আখ্যান-বস্তুকে ঘোরালো জটিল করিয়া তোলেন, তেমনি করিয়া কল্লোল নিজের জীবনকে জটিল করিয়া তুলিল। জীবনে নানা বিরোধ, নানা সমস্যা গড়িয়া শেষে এক দিন

দেখিল, তার হাতে-পায়ে অসংখ্য শৃঙ্খল…যেন অষ্টো-পাশে তাকে কষিয়া বাঁধিতে চায়!

সবলে তখন শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া সে দিকদিগন্ত-হারা-অসীমের উদ্দেশে পাড়ি দিল।

উনত্রিশ বৎসর বয়সে আজ সকালে রেঙ্গুনের হাস-পাতালে বিছানায় শুইয়া সে ভাবিতেছিল…

এখনো হয়তো নূতন ছাঁদে জীবনটাকে গড়িয়া তোলা যায়!

কিন্তু কেন? গড়িয়া সে-জীবন লইয়া কি হইবে?

এক-একবার মনে হয়, মনের মধ্যে কি যেন ছিল…কত সাধ, কত আশা…পৃথিবীর বুকে একটা অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে! কিন্তু সে সাধ, সে আশা তার ঔদাস্য-অবহেলার তাপ সহিতে না পারিয়া ঝরিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে!

মনে পড়িল, দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। ইউনিভার-সিটির কনভোকেশনে একগাদা মেডেল…বি-এ অনার্সে এত নম্বর পাইয়াছিল যে, লাট-সাহেব করকম্পন করিয়া কল্লোলের খ্যাতিগৌরব কামনা করিয়াছিলেন…

আজ সেই কল্লোল…উনিশ বৎসর বয়সের সে-কল্লোলের জীর্ণ কঙ্কালমাত্র! কোথায় গেল দেহের সে শক্তি, মনের দীপ্তি!

কিন্তু না…

কিসের অনুশোচনা! পাশ করিয়া গলায় মেডেল ঝুলাইলেই জীবনটা সার্থক হয়? অনেকে এমন মেডেল গলায় ঝুলাইয়াছে! তার পর?

না খাইয়া অভাব-অভিযোগের জাঁতায় পিষিয়া কেহ গুঁড়া হইয়া গিয়াছে! কেহ ওকালতি করিয়া, কেহ জজীয়তী করিয়া জীবন কাটাইয়াছে! মক্কেলের নথি পড়িয়া তারা পয়সাই লুটিয়াছে…জজ রায় লিখিয়া দিন কাটাইয়াছে। পৃথিবীতে এই যে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ—তার স্বাদ ক'জন পাইয়াছে!…তবে?

না, কল্লোল ভুল করে নাই! জীবনকে এই উনত্রিশ বৎসর বয়সে সে যেমন দেখিয়াছে, ভোগ করিয়াছে…ভোগ!

জীবন-গ্রন্থের গোড়ার পাতাগুলা খুলিয়া তার উপর সে চোখ বুলাইতে লাগিল। তখন তার বাইশ বৎসর বয়স। পৃথিবীর দিকে দিকে রঙের ফুলঝুরি ঝরিতেছে…তখন আসিয়া তার জীবনের পথে দাঁড়াইয়াছিল শিপ্রা!

স্যর পার্ব্বতীশঙ্করের কন্যা শিপ্রা।…কল্লোল ভালো-বাসিয়াছিল এই শিপ্রাকে। শিপ্রা তাকে ভালোবাসে নাই, তা নয়। তবে কল্লোলের চেয়ে অনেক বেশী-পয়সাওয়ালারা স্যর পার্ব্বতীশঙ্করের দ্বারে গিয়া হত্যা দিত। স্যর পার্ব্বতীশঙ্করের বিষয়-বুদ্ধি প্রখর, কাজেই শিপ্রার পাশে সে দাঁড়াইতে পারিল না! শিপ্রাও ভয়ে একেবারে মৌনমুখী! তার যদি সাহস থাকিত…কল্লোল তাকে ধিক্কার দিয়া সরিয়া আসিল! আসিবার পূর্ব্বে শিপ্রার সেই সজল চোখের নিরুপায় করুণ দৃষ্টি…

সে-দৃষ্টি কল্লোল আজো ভুলিতে পারে নাই!

তার পর পথ-বিপথ বলিয়া কল্লোল কিছু মানে নাই…কোনো বাছ-বিচার করে নাই! সামনে যে-পথ পাইয়াছে, সেই পথে চলিয়াছে…

ঐ মোটর-গাড়ী…লেক…এম্পায়ারের ষ্টেজে নাচ, অভিনয়…কল্লোল হাড়ে-হাড়ে তার মর্ম্ম জানে। জর্জেট-শাড়ী-পরা, ব্লুম-রুজ-পাউডার-মাখা ঐ সব সৌখীন মেয়ে…মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আগাগোড়া নকলে ভরা! ঐ সব মেয়ে…কল্লোলকে কে না কামনা করিয়াছে! কে না কল্লোলের সামনে হাসির ফাঁদ পাতিয়াছে!

কল্লোলের ঘৃণা হয়! উহাদের নামে দারুণ ঘৃণা! ওরা কি মানুষ? কাঁচের পুতুল! প্রাণ নাই…মন নাই! নকল প্রাণ-মন লইয়া উহারা চায় বেসাতি করিতে!

রেঙ্গুনে আসিবার পূর্ব্বে দু'চার জায়গায় আস্তানা পাতিয়াছিল; টিঁকিতে পারে নাই। সে-আস্তানা ভাঙ্গিয়া আবার সে পথকে সম্বল করিয়াছে! যেখানে যায়, দু'দিন কাটে না! একটা-না-একটা বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া ওঠে! চারি-দিককার বাঁধন তার ছোঁয়াচ লাগিবামাত্র কেমন যেন শিথিল হইয়া যায়! কল্লোল শেষে ভাবিয়া-ছিল, ডাঙ্গায় আর বাসা বাঁধিবে না…এক দিন তাই রেঙ্গুন-মেলে চড়িয়া বসিল। ভাবিয়াছিল, রেঙ্গুনে নামিয়া

রেঙ্গুন হইতে ও-দিকে যাইবে···চীন, জাপান, হাওয়াই দ্বীপ···মানে, যত দূর যাওয়া যায়!

রেঙ্গুনে আসিয়া কল্লোল উঠিল গাওয়ার ষ্ট্রীটে এক বর্ম্মীজ হোটেলে। আগে এ-হোটেলের মালিক ছিল গিরিশ চক্রবর্ত্তী। গিরিশ কলিকাতার লোক; ত্রিশ-বৎসর পূর্ব্বে সিভিল-কোর্টের একগাদা ডিক্রীর জ্বালায় সেখান হইতে গা-ঢাকা দিয়া সে আসিয়াছিল রেঙ্গুনে। আসিয়াই বর্ম্মীজ কাঠ-ওয়ালা মঙ্‌ফের গোলায় মিস্ত্রীর কাজ পায়। গিরিশের চেহারা ভালো এবং বুদ্ধি ছিল প্রখর; কাজেই অচিরে কারবারের ম্যানেজারীর পদ অলঙ্কৃত করিতে তার অসুবিধা ঘটে নাই। মঙ্‌ফের ছিল তিন মেয়ে আর এক ছেলে। ম্যানেজার হইবার পর গিরিশের ভাগ্যে মঙ্‌ফে বেশী দিন বাঁচিতে পারিল না। তখন মঙ্‌ফের স্ত্রী মা-পান্, তার চার ছেলে-মেয়ে এবং কাঠের মালিকানী—সব আসিয়া সুচতুর গিরিশের হাতে ঠেকিল। গিরিশ চক্রবর্ত্তী কলিকাতায় হোটেল চালাইয়া খানিকটা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল। মঙ্‌ফের মৃত্যুর পর মা-পানকে বিবাহ করিয়া কাঠের কারবার বেচিয়া সে-অর্থে গাওয়ার ষ্ট্রীটে গিরিশ হোটেল খুলিয়া বসিল। হোটেলের পশার দিনে-দিনে বাড়িতে লাগিল। নানা দেশের যাত্রী আসিয়া গিরিশের হোটেলে আস্তানা লইত। যাত্রী ভুলাইবার কলা-কৌশলে গিরিশের বিশেষ পটুতা ছিল।

এই পশারের আবর্ত্তে দু'জন বাঙালী যাত্রীর সঙ্গে বড় দুই মেয়ে কোথায় এক দিন নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। তাদের আর পাত্তা মিলিল না। ছেলে লা-থুন এক জন সাহেবের পাল্লায় পড়িয়া কলিকাতার কোন্ হোটেলে চাকরি লইয়া বর্ম্মা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মা-পানের কাছে রহিল শুধু তার ছোট মেয়ে মা-শী। মা-শীর বয়স যখন আঠারো বৎসর, তখন ও-পার হইতে গিরিশের ডাক আসিল।

এখন মা-পান হোটেল চালায়; এবং মা-শী তার মস্ত সহায়। মা-শীর রূপে যেমন দীপ্তি, বুদ্ধিও তেমনি প্রখর!

হোটেলে উঠিয়া কল্লোল মা-শীকে দেখিল। দেখিয়া মুগ্ধ হইল। গোলাপী-তুষারের মতো মা-শীর গায়ের রঙ··· মাথার উপর একরাশ কালো চুল···সেই কালো চুলের মস্ত খোঁপা সামনের দিকে···দেখায় যেন হিমগিরির মাথায় শ্রাবণের পুঞ্জিত মেঘ! মা-শীর মুখে-চোখে হাসির জ্যোৎস্না! নিটোল দেহ দেখিলে মনে হয় যেন মোম-বাতি! তারুণ্যের আভায় মা-শীকে দেখায় যেন বসন্তের পুষ্পিত লতা!

মা-শীরও ভালো লাগিল কল্লোলকে। আর-পাঁচ জনের মতো সে নয়! কল্লোলের কথায় সে পায় গানের সুর, হাসিতে সুরার নেশা, চোখের দৃষ্টিতে প্রচণ্ড মোহ! রঙীন ফুল কিনিয়া আনিয়া কল্লোল মা-শীকে উপহার দেয়! কখনো দেয় রঙীন পাথরের মালা, কখনো বা রেশমী লুঙ্গি! তার উপর মা-শীর চেহারার তারিফ! মা-শী এ-সবে গলিয়া যায়! কল্লোলের পরিচর্য্যায় মা-শীর তাই শ্রান্তি নাই! সকালে উঠিয়া মা-শী বাজারে যায়; হোটেলের জিনিষপত্র কিনিয়া আনে। এ তার নিত্য-দিনের কাজ। কল্লোলের আসিবার পর হইতে কাজ বাড়িয়াছে। বাজারের সঙ্গে এখন সে আনে অজস্র ফুল।

হোটেলে ফিরিয়া বাজারের জিনিষ রাখিয়া পরণে ময়ূরকণ্ঠী রঙের লুঙ্গি, গায়ে এইঙ্গি-জামা···মা-শী এক হাতে ট্রেতে করিয়া সেই ফুল, আর-এক হাতে চায়ের পেয়ালা আনিয়া কল্লোলের টেবিলে ধরিয়া দেয়। দিয়া ভাঙ্গা বাঙলায় মা-শী বলে,—নমস্কার, বাবুজী!

হাসিয়া কল্লোল বলে,—নমস্কার, অপ্সরী দেবী!

কল্লোলের হাতে মা-শী ফুল দেয়, দিয়া বলে,—তোমার ফুল নাও···

কল্লোল ফুল লয়: ফুল লইয়া মা-শীর খোঁপায় গুঁজিয়া দিয়া বলে,—আমার দেনা দিনে-দিনে বেড়ে উঠছে মা-শী! এ-দেনা কি করে শুধবো?···দেনার হিসাব দিতে পারো?

হাসিয়া মা-শী বলে,—যে-দিন চলে যাবে, সে-দিন হিসাব দেবো, সাহেব।

কল্লোল জবাব দেয়,—যদি শোধ দিতে না পারি?

মা-শী বলে,—না পারো, তাহ'লে তোমাকে কিনে নেবো! ধার রেখে রাঙ্গুন সহর থেকে চলে যাবে, সে কানুন এখানে নেই!

কল্লোল হাসে, হাসিয়া বলে,—আমায় নিয়ে কোনো লাভ হবে না ! কি-বা আমার দাম !

হাসিয়া মা-শী বলে,—যে-জিনিষের দাম নেই, সে-জিনিষকে মা-শী দামী করে নিতে পারে, বাবুজী !

—নিয়ে আমায় ধরে রাখতে পারবে ?

মা-শী বলে,—হুঁ…

—কি দিয়ে ধরে রাখবে ?

মা-শী বলে,—আমার কাছে যা আছে, তা দিয়ে তোমায় ধরে রাখা যাবে…

—সে কি, মা-শী ?

কথার সঙ্গে সঙ্গে মা-শীর মৃণালের মতো হাত দু'খানা ধরিয়া কল্লোল তাকে একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনে। আনিয়া উচ্ছ্বসিত-আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কল্লোল বলে,—আমি চলে যাবো না মা-শী…যেতে পারবো না ! তোমার হাসি, তোমার চোখের চাহনি, তোমার কথা…তুমি…আমায় তুমি এমন বাঁধনে বেঁধেছো… ভেবেছিলুম, কোথাও ধরা দেবো না…কেউ আমায় ধরে-বেঁধে রাখতে পারবে না…কিন্তু তুমি এমন যে, তোমার হাতে ধরা দেবার জন্য আমি আকুল হয়ে আছি।

এ এক নূতন অনুভূতি !

শেষে মা-শীর সঙ্গ এমন লোভনীয় হইয়া উঠিল যে, কল্লোল তাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না ! মা-শীর সঙ্গে সে যায় ফুলের দোকানে, পোয়ে নাচের আসরে, শোয়ে-ডাগোঁ পাগোডায় …এবং খাওয়া-দাওয়া সারিয়া জ্যোৎস্না রাত্রে সবুজ ঘাসের ফ্রেমে আঁটা ঝিলের ধারে…

মা-পান্ দেখে। দেখিয়া বোঝে। ভাবে, ভালো ! এমন এক জন বাঙালী রেইস্ ভদ্রলোক …তাকে যদি পায়, ইহ-জন্মে মা-শীর আর-কোনো দুঃখ থাকিবে না ! কাজে-কর্ম্মে গল্পে-গানে বেশে-ভূষায় মা-শী যদি এই বাঙালী রেইস্‌কে বাঁধিতে পারে, তাহা হইলে সে মারা গেলে হোটেল উঠিয়া যাইবার ভয় থাকিবে না। সে শুনিয়াছে, বাঙালী বাবুজীরা মেয়ে-লোককে খাতির করে !

এমনি রোমান্স আর জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়া মা-পান নিজেই এক দিন কথা তুলিল,—সাহেব যদি মা-শীকে বিবাহ করে ! মা-শী ডাগর হইয়াছে, তার বিবাহ দিতে হইবে। দু'-তিনটি ভালো পাত্র আসিয়া তাগিদ দিতেছে…লুঙ্ চান্ চীনা, দেহাতী সহর ইন্‌শিনে লুঙ চান্ চীনার সিল্কের মস্ত কারবার ; তার পর লৌউঙ্গি-সদাগর ছি সেয়া…মা-শীর জন্য সে একেবারে পাগল ! এক জন সরকারী ইংরেজ-অফিসার আছে রবিনশন্… মাসে পাঁচশো তঙ্কা তলব পায় ইত্যাদি।

শুনিয়া কল্লোল একবার মনের মধ্যে ডুব দিল। নিজের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের যে-ছবি চোখে পড়িল… কল্লোল বলিল,—আমার টাকাকড়ি আছে মা-পান্…

মা-পান বলিল,—না থাকলেও ক্ষতি নেই, বাবুজী। আমার যা আছে, বহুৎ ! তাছাড়া আমি জানি তো নিজের জীবন দিয়ে…বাঙালী-বাবুজীরা জেনানাকে বহুৎ পেয়ার করে। গিরিশ আমায় যে তোয়াজে রেখেছিল, বর্ম্মীজ খশম্ সে-তোয়াজের কিছু জানে না !

কল্লোল বলিল,—কিন্তু…

মা-পান বলিল,—কিন্তু কি বাবুজী…দেখছো তো, মেয়েটা তোমায় কি-রকম ভালোবাসে ! মা-শী যেন তোমার গোলাম !

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কল্লোল বলিল,—সেই হয়েছে মুস্কিল ! নাহ'লে আমার ইচ্ছা ছিল, বিয়ে করে কোথাও জমি নেবো না…দুনিয়ায় শুধু ঘুরে বেড়াবো।

হাসিয়া মা-পান বলিল,—এমন বেকুবি করো না, বাবুজী ! তোমার এই জোয়ান বয়স, এমন চেহারা, বুদ্ধি আছে !…ঘুরে বেড়ায় কারা ? যাদের কিছু নেই, …না চেহারা, না বুদ্ধি, না পয়সা-কড়ি !

কল্লোল কোনো জবাব দিল না…চুপ করিয়া রহিল। কি ভাবিতেছিল। সে-চিন্তার এক প্রান্তে শিপ্রার মূর্ত্তি… পরিপাটী বেশ-ভূষা…দু'টি চোখ শুকতারার মতো জল্‌জ্বল্ করিতেছে ! কল্লোলের মেঘ-ভরা বুকের উপরে যেন ঢাকা-পড়া চাঁদের ক্ষীণ জ্যোৎস্নাভাস !

এমন সময় সজ্জিত বেশে মা-শীর প্রবেশ। পরণে নীল রঙের সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে গেরুয়া রঙের এইঞ্জি, মাথার উপর নক্সাদার রেশমী রুমাল বাঁধা, হাতে বাহারে ছাতা।

মা-শী বলিল,—এখনো তৈরী হওনি, বাবুজী ? মন্দিরে যেতে হবে না ?

মা-শীর মুখে-চোখে হাসির ঝিলিক! হাসি নয়, যেন অতনুর তীর-হইতে-খশা ফুলের পাপড়ি!

কল্লোল চাহিল মা-শীর দিকে, বলিল,—ও···

আবেগে-বিস্ময়ে কল্লোলের মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

মা-শী কল্লোলের হাত ধরিল; ধরিয়া টানিল, বলিল,—এসো, বাবুজী···

মা-পান বলিল,—তোর সঙ্গে বাবুজীর বিয়ের কথা বলছিলুম। কি বলিস্ তুই, মা-শী?

এ কথায় মা-শী যেন বিগলিত হইয়া পড়িল! বলিল,—সত্যি? বেশ হবে বাবুজী···মন্দিরে আজ ভগবান বুদ্ধদেবের কাছে এই কামনাই জানাবো ঠিক করে-ছিলুম···এই কামনা যে, বাবুজী হবে আমার মঙ্ছ্যি সেয় (প্রিয়তম জীবন-বল্লভ)!

২

বিবাহের পর মা-শীর হাতে কল্লোল নিজেকে একেবারে সঁপিয়া দিল! মা-শী হইল তার জীয়ন-কাঠি! মা-শীর রূপ, মা-শীর যৌবন, মা-শীর সেবা-পরিচর্য্যা, মা-শীর ভালোবাসার উচ্ছ্বাস,—বিচিত্র ছন্দে কল্লোলকে আবার নূতন স্বপ্নে বিহ্বল-বিভোর করিয়া তুলিল। সে বিহ্বলতার মধ্যে কল্লোলের কর্ম্মচেতনা কোথায় উবিয়া গেল!

দেড়-বৎসর এমনি স্বপ্নময়তার মধ্য দিয়া কাটিল। তার পর মা-শী এক দিন কল্লোলকে উপহার দিল একটি কন্যারত্ন! ফুলের মতো মেয়ে!

মা-শী বলিল,—এ-মেয়ের নাম রেখেছি চাঁপা। তোমার দেশের সব-চেয়ে জেল্লাদার ফুল···খর-গন্ধা ফুল! তোমার কাছে শুনেছি, চাঁপা তোমার দেশের সেরা ফুল!

কল্লোল চাহিল মেয়ের পানে, তার পর মা-শীর পানে! অবিচল দৃষ্টি!

তার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বুকে যেন তীর-বেঁধার যাতনা···

মেয়েকে লইয়া মা-পান, মা-শী আনন্দে বিহ্বল, যেন আকাশের চাঁদ পাইয়াছে! কল্লোলের বুকে কিন্তু এত দিন ধরিয়া যে-চাঁদ জ্যোৎস্না-ধারা বর্ষণ করিতেছিল, সে-চাঁদের উপরে মেয়ে কালো মেঘের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তুলিল। কোলাহলের বাহিরে যে-মন নিজেকে লইয়া মত্ত-মাতোয়ারা ছিল, সে-মন ঘিরিয়া রাজ্যের কলরব-কোলাহল!

এবং এ-কোলাহল সহিতে না পারিয়া এক দিন ভোরে হোটেলে সবার ঘুম ভাঙ্গিবার আগে কল্লোল উঠিয়া নিজের ছোট স্যুটকেশটি হাতে করিয়া রেঙ্গুনের পথে বাহির হইয়া পড়িল।

যে-দিকে দু'চোখ যায়···গাওয়ার ষ্ট্রীটের পথে আর সে ফিরিল না।

এবং ঘুরিতে ঘুরিতে দেহ-মন যখন একান্ত শ্রান্ত, তখন এক দিন সন্ধ্যার পর কল্লোল চলিয়াছিল মন্দিরের দিকে। বুদ্ধদেবের উপরে ভক্তি-বশে মন্দিরের পথে চলে নাই; মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিচিত্র জনতার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করিবে, ভাবিয়াছিল!···বিরাট প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চারিদিকে ছোট-বড় বহু মন্দির। সে মন্দিরে ধূপ-দীপের কি সমারোহ! প্রাঙ্গণের এক দিকে পশারীদের ভিড়। সে ভিড়ে আছে ফুলওয়ালী, রঙীন-পাথরওয়ালী, গায়িকা, নর্ত্তকী!

চলিতে চলিতে কল্লোল ভাবিতেছিল, আশ্চর্য্য জায়গা এই রেঙ্গুন! মন্দিরে-মন্দিরে ভক্তি-নিবেদনের ঘটায় এখানকার নর-নারী যেমন ইহ-জগৎ ভুলিয়া যায়, তেমনি মন্দির হইতে বাহির হইবামাত্র হাসি-গল্প আমোদ-প্রমোদের তরল-তরঙ্গে নিজেদের ভাসাইয়া দিতে ত্বর্ সহে না!···

মন্দিরের বাজনা কাণে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ঝিল্লী মায়া-সুর ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল। চোখের সামনে আলোর লহর···কাণের কাছে মস্ত কলরব সব মুছিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

তার পর আবার যখন এ আলো-কলরব জাগিল, তখন চোখ চাহিয়া কল্লোল দেখে, হাসপাতালের বিছানায় সে শুইয়া আছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা···

মনে পড়িল, সন্ধ্যার পর সে মন্দিরে যাইতেছিল ···মন্দিরের স্বর্ণ-চূড়া দেখিয়াছিল আলোয় আলো! তার পর···

তার বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল নার্শ মার্থা। মার্থা ইংরেজ নয়; তার বাপ ছিল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, মা বর্ম্মীজ।

হাসিয়া মার্থা প্রশ্ন করিল,—ভালো বোধ করিতেছ, বন্ধু?

মার্থা কথা কহিল ইংরেজীতে।

প্রশ্ন শুনিয়া কল্লোল মার্থার পানে চাহিল। মার্থার বয়স হইয়াছে। বয়সের ভারে দেহে মেদ জমিয়া মার্থাকে কুৎসিত কদর্য্য করিয়া তুলিয়াছে! তবু সে কুশ্রীতাকে ঢাকিবার জন্য মার্থার কি-সাধনা চলিয়াছে, তা তার মুখে পাউডার-রুজের ছোপ দেখিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না। মাথার কেশে রঙ লাগাইয়া সে-কেশে পরচুল আঁটিয়া কেশের বেশ পরিপাটী করিয়া তুলিয়াছে; তার মুখে-চোখে হাসি ফুটিয়াই আছে…সে-হাসি যেন বয়সের জীর্ণতার উপরে হারানো-দিনের স্মৃতির পালিশ!

মার্থার এই সজ্জা-পটুতা দেখিয়া কল্লোলের মন বিরূপতায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু ইহাদের হাতে নিজেকে এখন সমর্পণ করিয়াছে…এ-বিরূপতা সাজে না! তাই হাসিয়া সে জবাব দিল,—তোমার মিষ্ট হাতের পরিচর্য্যায় কারো খারাপ থাকিবার জো নাই, মিস্!

মার্থা বলিল,—বেড়াইতে যাইতে চাও? এ-ঘর ছাড়িয়া বাহিরের খোলা মাঠে?

কল্লোল বলিল,—ইট উড বী এ গ্রেট প্লেজার! (তাহাতে খুব খুশী হইব)।

মার্থা বলিল,—তুমি ইণ্ডিয়ান…

কল্লোল বলিল,—এবং বাঙালী।

মার্থা বলিল,—তোমাকে দেখিয়া আমি তাহা বুঝিয়াছি।

কল্লোলের বালিশ-বিছানা ঝাড়িয়া ঠিক করিয়া দিতে দিতে মার্থা বলিল,—বাঙালীদের আমি খুব পছন্দ করি। বাঙালীরা ভারী সদালাপী, মিশুক, সমুদার এবং বুদ্ধিমান!

হাসিয়া কল্লোল বলিল,—বুদ্ধিই এই বাঙালীর একমাত্র মূলধন, মিস্…এবং এই বুদ্ধির জোরেই সে পৃথিবীতে টিঁকিয়া আছে। বুদ্ধি ছাড়া তার আর কিছু নাই! না পয়সা-কড়ি, না স্বাস্থ্য…

মার্থা বলিল,—এত বড় সেণ্টিমেণ্টাল জাতিও আর নাই!

কল্লোল বলিল,—বাঙালীর সেণ্টিমেণ্টের পরিচয় বর্ম্মায় বসিয়া তুমি কি করিয়া পাইলে, মিস্? আমায় ক্ষমা করিয়ো …তোমার মুখে বাঙালীর এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথা শুনিয়া এ-প্রশ্ন করিতে আমার দুঃসাহস হইয়াছে!

কল্লোলের মাথার ব্যাণ্ডেজ একটু শিথিল হইয়াছিল …সে-ব্যাণ্ডেজ ঠিক করিয়া দিতে দিতে মার্থা বলিল,—দুঃসাহস নয়, বন্ধু! সারিয়া ওঠো। আলাপ আরো জমুক, তখন বাঙালীর ইতিবৃত্ত-রহস্য তোমায় বলিব। দু'-চার জন ভালো বাঙালী বন্ধুর সৌহার্দ্দ্য-লাভের সৌভাগ্য আমার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

কল্লোল চুপ করিয়া রহিল। তার মনে কৌতুকের উৎস উৎসারিত হইল! কল্লোল বুঝিল, মার্থার বয়স হইলে কি হইবে, তার মন রোমান্সের রাঙা মেঘে ভরিয়া আছে!

ব্যাণ্ডেজ ঠিক করিয়া দিয়া মার্থা বলিল,—আর দু'টি কেস দেখিয়া এখনি আমি ফিরিয়া আসিব, বাঙালী বন্ধু। তার পর নিজে তোমাকে লনে লইয়া যাইব। তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে চাই।…তুমি নিশ্চয় কলিকাতা হইতে আসিয়াছ?

কল্লোল বলিল,—হ্যাঁ…

একটা উদ্যত নিশ্বাস রোধ করিয়া মার্থা বলিল,—কলিকাতা! আমার বিগত-দিনের সহস্র সুখ-স্মৃতি তোমার ঐ কলিকাতার বুকে সমাহিত আছে! কলিকাতা আমার তাজ-মহল!

কল্লোল বুঝিল, এ কথায় কতখানি ব্যথা! বুঝিয়া সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মার্থার পানে চাহিয়া রহিল।

মার্থা তা দেখিল না; আর-একটিও কথা না বলিয়া চলিয়া গেল…

কল্লোল তার পানে চাহিয়া রহিল। ঐ যায় মার্থা… দশ-নম্বর বেডে এক বৃদ্ধ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পড়িয়া আছে। মার্থা গিয়া সন্তর্পণে তাকে ধরিয়া বিছানার উপরে তুলিয়া বসাইয়া দিল। তার পর কি যত্ন…কি মমতা…

সাত দিন পরের কথা।

কল্লোল সারিয়াছে। হাসপাতাল হইতে আজ সে ডিস্‌চার্জ্জ হইবে।

বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। হাসপাতালের বেয়ারারা কল্লোলের জিনিষ-পত্র গুছাইয়া রাখিয়াছে।

মার্থা আসিল; আসিয়া বলিল—ইয়েস্, নাউ মাই ফ্রেণ্ড · (হুঁ···এখন বন্ধু)

হাসিয়া কল্লোল বলিল—কি বলিবে, বলো মিস্···

মার্থা বলিল,—এখানে কোথায় তোমার বাসা ?

কল্লোল কহিল,—বাসা নাই···

মার্থা অবাক ! কহিল,—কোথায় যাইবে ?

কল্লোল বলিল,—আমি মাইগ্রেটরি বার্ড (যাযাবর পাখী)···আকাশে উড়িয়া বেড়াই। যেখানে সন্ধ্যা নামে, সেখানে যে-বৃক্ষশাখা পাই, অবলম্বন করি।

মার্থার মনে যেন তীর বিঁধিল ! মার্থা বলিল,—কিন্তু এই শ্রান্ত শরীর লইয়া আকাশে ওড়ায় বিপদ আছে ! এখন তোমার বৃক্ষশাখায় আশ্রয় লওয়া উচিত হইবে না।

হাসিয়া কল্লোল বলিল,—কিরূপ আশ্রয় উচিত হইবে, শুনি ?

মার্থা বলিল,—একটি cosy nest (আরাম-নীড়)··· সে-নীড়ে স্নেহের আলো-বাতাস এবং নিরাপদ কোমল শয্যায় কিছু-দিন বিশ্রাম !

কল্লোল বলিল,—গৃহ, আলো-বাতাস, নিরাপদ কোমল শয্যা···এ-সবের প্রয়োজন কোনো দিন বুঝি নাই, মিস্।

সাগ্রহ দৃষ্টিতে মার্থা চাহিয়া রহিল কল্লোলের মুখের পানে···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কল্লোল বলিল—হঠাৎ আজ কোথায় গৃহ পাইব ?

মার্থার মনে চিরদিনকার মমতাময়ী নারী জাগিয়া উঠিল···যেন পাষাণ-আবরণ ভাঙ্গিয়া শাপমুক্তা অহল্যার জাগরণ !

মার্থা বলিল, —পাইতেই হইবে, বন্ধু···

কল্লোল নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল খোলা দ্বার-পথ দিয়া সুদূর রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের পানে।

মার্থা বলিল,—এখানকার হাসপাতালে যে-সব রোগী আসে, তুমি তাদের মতো নও। তোমার প্রাণ আছে, মন আছে। তোমার মনও অসুস্থ ! এ ক'দিনের আলাপে তোমার ও-মনের যে-পরিচয় পাইয়াছি, দুঃখ হয়, গৃহের অভাবে, স্নেহের আলো-বাতাসের অভাবে সে-মনকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারিবে না !

কল্লোল ফিরিল, ফিরিয়া মার্থার পানে চাহিল। বলিল, —অর্থাৎ ?

মার্থা বলিল,—যদি অন্যায় অনুরোধ বলিয়া মনে না করো, আমার ফ্ল্যাটে একখানা কামরা লইয়া···ভাড়া বেশী নয়···আমার আশ্রিত হইয়া থাকিতে বলি না। তবে নার্শিংয়ের একটু সুবিধা হইতে পারে। তার পর দেহে-মনে বল পাইলে মাইগ্রেটরি বার্ড আবার আকাশে উড়িয়ো।

শ্রান্ত দেহ-মন লইয়া এমন প্রাণ-ভরা দরদকে চরণে দলিয়া যাইতে কল্লোল যেন পারে না ! তাছাড়া এখানে এই সেবা-পরিচর্য্যা···

কল্লোল বলিল,—নার্শিংয়ের জন্য তোমাকে কি মূল্য দিতে হইবে, মিস্ ?

মার্থার মনের উপরে কল্লোল যেন লাঠি মারিল ! মার্থা বলিল,—পয়সাটাকে খুব-বড় করিয়া আজো আমি দেখিতে শিখি নাই, মিষ্টার রায় !

কথাটা বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় মার্থা চাহিল কল্লোলের পানে।

কল্লোলের বুকের মধ্যে যেন সাগরের উত্তাল তরঙ্গ !

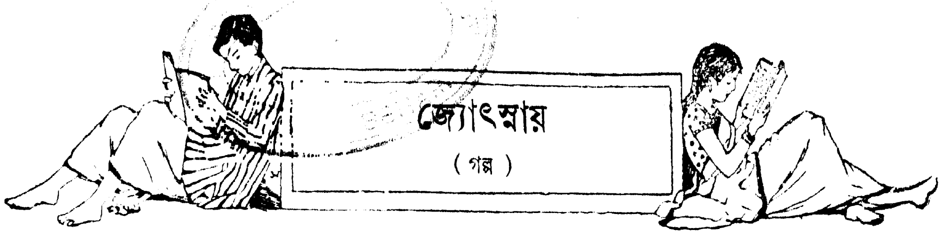
সে-তরঙ্গে রাজ্যের আবর্জ্জনার সঙ্গে সদ্য-ঝরা দু'-চারিটা টাট্‌কা ফুলও ভাসিয়া চলিয়াছে !

কল্লোল বলিল,—এ-জন্মে তোমার সঙ্গে হঠাৎ হাসপাতালে আমার পরিচয়···ক্ষণেকের পরিচয় ! মনে হয় আর-জন্মে···ভালো কথা, আর জন্মে তুমি আমার কে ছিলে, বলিতে পারো, মিস্ ?

ভ্যানিটি-কেশ খুলিয়া ছোট আয়না বাহির করিয়া মাথার বিস্রস্ত কেশগুলাকে সুবিন্যস্ত করিতে করিতে হাসি মুখে মার্থা বলিল,—বন্ধু।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়



জ্যোৎস্নায়

(গল্প)

লোকালয়ের বাহিরে সবুজ শ্যামল বনের প্রান্তে ছোট পাহাড়।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আকাশের চাঁদ এতক্ষণ যেন শুধু এই সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় নিজের জ্যোৎস্নারাশিকে কোনো মতে মণি-মঞ্জুষায় অবরুদ্ধ রাখিয়াছিল; সন্ধ্যা দেখা দিবামাত্র সে-জ্যোৎস্না অজস্র ধারে পৃথিবীর গায়ে ঢালিয়া দিয়াছে!

দূরে কোথায় সাঁওতালী-রাখালের দল গাভী লইয়া গৃহে ফিরিতেছে। গাভীর গলায় বাঁধা ঘণ্টার রুনুঝুনু··· নিরালা বনের প্রান্তে সুরের পাড় বুনিয়া দিতেছে!

একরাশ ফুলন্ত বন-লতার ঝোপ। তারি কোলে পাথরে বসিয়া হিমাদ্রি। হিমাদ্রির কোলে মাথা রাখিয়া কনক। জীবনের পথে তরুণ ছ'টি যাত্রী···নিরালা পাহাড়ের কোলে এই চাঁদের জ্যোৎস্না-ধারায় দু'জনকে দু'জনের হাতে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে!

হিমাদ্রি একটা নিশ্বাস ফেলিল···

সে-নিশ্বাসে কনক ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, বলিল—কষ্ট হচ্ছে···তোমার কোলে মাথা রেখেছি বলে?

মুখ নামাইয়া প্রাণের সমস্ত আবেগটুকু কনকের অধর-পুটে ঢালিয়া হিমাদ্রি বলিল,—নিশ্চয়!

কনক বলিল,—সত্যি, ভারী ভালো লাগছে! তোমার ভালো লাগছে না? আমার মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে যেন আর কেউ কোথাও নেই! তুমি আর আমি ···আর আছে আমাদের অনন্ত অসীম ভালোবাসা···

হিমাদ্রি বলিল,—কবির কথা আমার মনে পড়ছে···

সমাজ-সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কুলরব।
···　　···　　···
দু'জনে মুখোমুখি, গভীর সুখে সুখী···

কনক বলিল,—শুয়ে শুয়ে কি ভাবছিলুম, জানো?

হিমাদ্রি বলিল—কি?

কনক বলিল,—আজ তুমি চলে যাচ্ছিলে··

বাষ্পভারে কনকের কণ্ঠ ভরিয়া রুদ্ধ হইল।

হিমাদ্রি বলিল,—যাইনি তো। মানে, যেতে পারলুম না···

কনক বলিল,—তাই বৈ কি! তুমি তো যাচ্ছিলে··· আমিই যেতে দিলুম না! কান্নাকাটি করলুম···বললুম, বড্ড অসুখ করছে! তাই! জানি গো জানি, এ তো অনুরোধে তোমার ঢেঁকি গেলা!···আমি তোমায় যত ভালোবাসি, তুমি যদি তার সিকির-সিকি বাসতে!

হিমাদ্রি বলিল,—কি করে ভালোবাসার মাপ কষলে, কনক?

কনক বলিল,—কষতে খুব বেশী মেহন্নৎ করতে হয় না···আর তাতে এম-এ-পাশ-করা বুদ্ধিরও দরকার হয় না!

—তার মানে?

—সহজ কথায় কি করে তোমায় মানে বোঝাবো? তুমি বুঝবে না। তুমি বলবে, তোমার নতুন চাকরি, দায়ে পড়ে আমায় ছেড়ে তাই তোমাকে কলকাতায় থাকতে হয়! মানলুম, না হয় তাই···তা বলে শনিবার-শনিবার সন্ধ্যার ট্রেনে আসা যায় না?···যদি আমার মতো তোমার আমাকে দেখবার ইচ্ছা হতো, নিশ্চয় আসতে! এখানে এসে ভোরে পৌঁছুতে, তার পর রবি-বার-সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে সোমবার সকালে কলকাতায় পৌঁছে তোমার চাকরি রাখতে!

কথাটা বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় কনক সাগ্রহ দৃষ্টিতে চাহিল হিমাদ্রির পানে।

হাসিয়া হিমাদ্রি বলিল,—এ হলো নাম্বার ওয়ান্। তার পর নাম্বার টু? বলো···

একটা নিশ্বাস চাপিয়া কনক বলিল,—নাম্বার টু··· হপ্তায় আমি তোমাকে পাঁচখানা চিঠি লিখি, তুমি লেখো মোটে দু'খানি।

হিমাদ্রি বলিল,—দিনের বেলায় আমার অফিস আছে …তার উপর সন্ধ্যায় কোনো দিন বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধবরা এসে জটলা বাধায়—ছাড়ে রাত এগারোটায়…

এবার আর কনক নিশ্বাস চাপিতে পারিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তার পর চিঠি লেখা যায় না, না ?…ঘুম পায় ? বুঝি গো…আমি তো বলছি না, আমার জন্য তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করো, আমোদ-আরাম ত্যাগ করো ! তবে আমি যদি তুমি হতুম…

কথা বাধিয়া গেল। কনক চুপ করিল।

হিমাদ্রি বলিল,—বলো…তুমি যদি কনকলতা না হয়ে হিমাদ্রি হতে, তাহলে কি করতে ?

কনক বলিল,—বন্ধু-বান্ধবরা বিদায় নিলে যত ঘুম পাক্, চোখে জল দিয়ে জেগে থেকে তোমাকে চিঠি লিখতুম…

হিমাদ্রি কোনো কথা বলিল না। তার বুকের মধ্যে অমৃত-সিন্ধু…সে-সিন্ধুর বুকে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ…

কনক বলিল,—আমি চিঠি লিখি সাত-পাতা আট-পাতা করে…আর তুমি লেখো দু'পাতা ! দু'পাতা ছেড়ে কখনো তিন-পাতা লিখতে দেখলুম না ! বলো, দু'-পাতার বেশী চিঠি তুমি কখনো লিখেছো ?

হিমাদ্রি বলিল,—না…

অভিমানের পাহাড় কনকের বুকে মাথা ঠেলিয়া দাঁড়াইল…তার মনের হাসি-খুশীর সামনে বিরাট আড়াল রচিয়া !

কনক বলিল,—কেন লিখবে, বলো ? সত্যি, কি-বা লিখবে ! তোমার আপিস আছে, বন্ধু আছে, বান্ধব আছে, হাসি-খুশী-আমোদ আছে ! আমার মতো তো নও…

হিমাদ্রির বুকে জাগিল পূর্ণিমার রাত্রি…সারা বুক জ্যোৎস্নার আলোয় আলো ! হিমাদ্রি বলিল,—তোমার মতো কি নই, বলো…

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কনক বলিল,—আমার আর কিছু নেই…কেউ নেই…তুমি ছাড়া ! বসে-বসে সব সময় ভাবি, কি তুমি করছো সেখানে ! সকাল হয় …ভাবি, মুখ ধুয়ে খপরের কাগজ পড়ছো…মা চা দিয়ে গেলেন…তার পর বন্ধুর দল আসতে সুরু হলো… মাণিক বাবু, নরেশ বাবু…সুরেশ বাবু…হাসি-গল্প চললো হৈ-হৈ তর্ক চললো !…তার পর ঘড়িতে বেলা ন'টা বাজে…তুমি উঠে চান করতে যাও…তার পর দোতলার বারান্দায় সেই হাঁসের-নক্সা-কাটা পশমী আসনে বসে খাওয়া…মা এসে কাছে বসেন… ছেলেকে যত্ন করে খাওয়ান্…তার পর খাওয়া শেষ হ'লে হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক পরে ট্রামের জন্য তুমি বেরিয়ে যাও…

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কনক চুপ করিল।

জ্যোৎস্নার আলোয় হিমাদ্রি দেখিল, কনকের মুখে বিষাদের শীর্ণ কালিমা-রেখা…

হিমাদ্রি বলিল,—বলো…ট্রামে চড়ে আমি…তার পর ?

আবেগ-কম্পিত স্খলিত মৃদু স্বরে কনক বলিল,—তার পর ভিড়ে তোমায় হারিয়ে ফেলি। পথে শুধু মানুষ আর মানুষ…ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি…দারুণ হট্টগোল ! তার পর কোথায় লালদীঘির ধারে মস্ত তিন-তলা অফিস… সেখানে কত লোক-জন, কত কাজ…সে-ভিড়ে কোথায় মিশিয়ে থাকো, আর তোমাকে দেখতে পাই না !…আমার কান্না পায়। ঠাকুরকে ডেকে বলি, কি অধম অপদার্থ মেয়েমানুষ করে ঘরের কোণে ফেলে রেখেছো ঠাকুর… সব-জায়গায় কেন ওঁর সঙ্গে যেতে পারি না… সব সময় কেন এ-মন ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতে পারে না ?

কনকের দু'চোখে বিগলিত অশ্রুধারা ! কনক আর কোনো কথা বলিতে পারিল না…আকাশের চাঁদের পানে নীরবে চাহিয়া রহিল…

আকাশে দীপ্ত শুভ্র চাঁদ রূপার মতো ঝক্‌ঝক্ করিতেছে…তবুও চাঁদের অমন শুভ্র বুকে কি ঐ ছায়ায় লেখা কালিমার রেখা ! কনকের মনে হইল, তারো সুখ-জ্যোৎস্নার বুকে এই বিচ্ছেদের ব্যথা…অমনি কালিমা-রেখা…

হিমাদ্রি নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল কনকের পানে…

কনক বেশী লেখাপড়া শেখে নাই। ম্যাট্রিক-ক্লাশে পড়িতেছিল, তখন তার বিবাহ হয়। কনকের সঙ্গে

একসঙ্গে পড়িত শিবানী। আই-এ পাশ করিয়া থার্ড-ইয়ারে পড়িতেছিল, তখন শিবানীর বিবাহ হইল তারি বন্ধু সিন্ধুমোহনের সঙ্গে। বিবাহ করিয়া শিবানী পড়া ছাড়ে নাই। সিন্ধুমোহনের ওখানে হিমাদ্রি প্রায় যায়। শিবানী, সিন্ধুমোহন, হিমাদ্রি—এক সঙ্গে বসিয়া চা খায়, গল্প করে। সে-গল্পে কত তর্ক ওঠে।···শিবানী তর্ক করে সমানে। সে-তর্কে সকলকে পরাভূত করিবার জন্য কি তার ঝোঁক! যত বিদ্যাই শিখুক, শিবানী মেয়ে-মানুষ···তার কথায়, তার হাবে-ভাবে অহমিকার ঐ ঝাঁজ হিমাদ্রির বিশ্রী লাগে। মেয়ে-মানুষ যদি এমন হয়···লেখাপড়ার ঝাঁজে তার মনের সব কোমলতা, সব মাধুর্য্য শুকাইয়া ঝরাইয়া স্তায়···মেয়েদের মন যদি অমন পুরুষের মতো সুদৃঢ় বলিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে···

কনককে বিবাহ করিয়া প্রথমে তার মনে আঘাত লাগিয়াছিল। এ-যুগের স্ত্রী যদি বি-এ না পাশ করিল, জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে! এখন মনে-মনে শিবানীর পাশে কনককে দাঁড় করাইয়া সে ভাবে, এই ভালো। কনকের এই দ্বিধা-সংশয়ে-ভরা কোমল ভীরু মন···নির্ভর চাহিয়া তার এই ব্যাকুলতা···বিনয়ে-নম্রতায় এমন কোমল! কনক যেন পল্লবিনী লতা! তার পাশে শিবানী? যেন শুষ্ক কঠিন মহীরুহ!

এই যে কথাগুলা কনক বলিতেছে···শুনিলে শিবানীর দল হয়তো হাসিবে! কিন্তু এ-সব কথায় মন কি আরাম পায়! মনে হয়, কথা নয়, যেন কবিতা! জীবনে শুধু সংগ্রাম চলিয়াছে···পরুষ নির্ম্মম সংগ্রাম···ভাগ্যে কনকের মুখে এমন কথা শুনি! জীবনে একেই বলে কাব্য!

কনক বলিল—কথা কচ্ছো না যে! মনে হচ্ছে, এখানে বসে বসে পাগলামি করছো! তার চেয়ে কলকাতায় থাকলে এতক্ষণে সিনেমা, না হয় বন্ধুদের সঙ্গে কত গল্প, হাসি-খুশী ··

হাসিয়া হিমাদ্রি বলিল,—সিনেমা তোমার ভালো লাগে না?

কনক বলিল,—খারাপ লাগে, এ কথা তো বলিনি। তবে তোমার চেয়ে সিনেমা আমার ভালো লাগে না!

হিমাদ্রি জবাব দিল না।

কনক বলিল—মনে আছে, সেবারে পূজোর সময় যখন তোমাদের ওখানে ছিলুম···ঠাকুরঝিরা এসেছিল··· বাড়ীশুদ্ধ সকলে সিনেমা দেখতে গেলুম। তুমি বাড়ী ছিলে না বলে যাও-নি! সে-রাত্রে আমি সিনেমা এতটুকু দেখিনি! অন্ধকারে পর্দ্দার ওপরে ছবি চলছিল, আর আমার দু'চোখে জল! পর্দ্দার ছবির পানে চেয়ে আমি শুধু কেঁদেছি···আর দেখেছি পর্দ্দার গায়ে ছবি নয়, জ্যাবড়া অস্পষ্ট কতকগুলো আলো-ছায়ার দাগ!

কনক একটা নিশ্বাস ফেলিল।

হিমাদ্রি বলিল,—তার পর?

কনক বলিল—পরের দিন সকালে ঠাকুরঝিরা বসে ছবির আলোচনা করছিল। বড়-ঠাকুরঝি বললে, মীরার পার্ট খুব ভালো হয়েছিল। ছোট্-ঠাকুরঝি বলে উঠলো, কখ্খনো না! মঞ্জরীর পাশে মীরা দাঁড়াতে পারে না। তার পর সে-তর্কের মীমাংসার জন্য দু'জনে আমাকে ধরলে, বললে,—আচ্ছা, তুমি বলো তো ভাই বৌদি, কাকে তোমার ভালো লেগেছে? আমি তখন ভারী বিপদে পড়েছিলুম। কি বলবো? শেষে বললুম, আমি ভাই মোটে ছবি দেখিনি। বসে-বসে খালি ঘুমিয়েছি! এই কথা বলে কোনো মতে রেহাই পাই!

হিমাদ্রি কোনো কথা বলিল না। মনে পড়িতেছিল পদাবলীর সেই গান—যাঁহা যাঁহা অরুণচরণ চলি যায়··· এ-কথার প্রত্যেকটি অক্ষরে তেমনি তার বুকের কুঞ্জে স্তবকে-স্তবকে ফুল ফুটিতেছে, আর সে-ফুল ঘিরিয়া পুঞ্জে পুঞ্জে অলির গুঞ্জন···

সহসা বহু দূরে ডম্বরু-নাদের মতো গুরুগম্ভীর ধ্বনি ···গর্জ্জন-ধ্বনি শুনিয়া হিমাদ্রি চাহিল ঐ দিকে। গাছপালার আড়ালে গতিশীল সরীসৃপের মতো ছায়ার দেহে কি যেন চলিয়া যায়! একটা বাঁশী···তীক্ষ্ণ তীব্র সে বাঁশীর রব!

হিমাদ্রি বলিল,—ট্রেণ চলেছে···ঐ ট্রেণে আমার যাবার কথা ছিল···

কনক বলিল,—বড্ড দুঃখ হচ্ছে? যাও না···যাও··· আমি তোমায় সত্যি ধরে রাখবো না···

হিমাদ্রি বলিল,—তা তো বলবেই।···ট্রেণ চলে

গেছে, এখন ধরে রাখা, না ধরে রাখায় কোনো তফাৎ নেই, কি না!

কনক এ-কথার জবাব দিল না···সজল-চোখে চাহিয়া রহিল দূরে ঐ গতিশীল সরীসৃপের পানে···

গায়ে তার রোমাঞ্চ-রেখা···কনক ভাবিতেছিল, ঐ ট্রেণ যদি আজিকার সঙ্গে-সঙ্গে তার এ-জন্মের আসা-যাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়! বেশ হয়! হিমাদ্রি তাহা হইলে কোনো দিন আর কলিকাতায় ফিরিতে পারিবে না, এইখানে তার কাছেই তাকে থাকিতে হইবে!

হিমাদ্রি ভাবিতেছিল···

•

হিমাদ্রি বলিল,—এর চেয়ে তুমি চলো না কেন আমার সঙ্গে···দু'জনের কাকেও তাহ'লে আর এ বিরহ-বেদনা সইতে হয় না···

কনক বলিল,—যেতে আমার অসাধ?

হিমাদ্রি ভাবিল, ঠিক! সে-ই লইয়া যাইতে চায় না। তার নূতন চাকরি···সামান্য টাকা মাহিনা পায়···একখানা দোতলা-বাড়ীর এক-তলায় তিনখানা কামরা ভাড়া করিয়া থাকে সে, আর থাকেন মা। দু'টি বোন···তাদের বিবাহ হইয়াছে, তারা থাকে শ্বশুর-বাড়ীতে।

মা বলেন,—এ দারিদ্র্যের মধ্যে বৌ আনবো না। একটা বামুন রাখবার ক্ষমতা আগে হোক তোর!

মাকে হিমাদ্রি বলিয়াছিল,—তুমি যখন রাঁধতে পারো, সে তোমার বৌ···সে কেন রাঁধবে না মা?

মা বলিয়াছিলেন,—না রে···ছেলেমানুষ···এর পর ছেলে-মেয়ে হলে সংসার ঘাড়ে পড়লে সবই এক দিন করতে হবে।···এখন নতুন বো-মানুষ! জীবনে দু'টো দিন এই বেলা আমোদ করে নিক, একটু স্বচ্ছন্দে হাসুক, খেলুক!···মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছে, তখন ঘানিগাছ ছাড়া উপায় তো নেই! তা বলে এরি মধ্যে? সেখানে মা-বাপের কাছে আছে · তুই যাবি-আসবি··· দু'দিন একটু আদর-যত্ন ভোগ করুক। আহা! বাপ পয়সাওলা মানুষ···বাড়ীতে বামুন-চাকর আছে···আমার এখানে এসে একেবারে দুঃখ-সাগরে ঝাঁপ দেবে? না, হিমু···বিয়ের পর দু'-তিনটে বছর একটু আরামে থাকুক···

কনককে হিমাদ্রি এ-কথা বলিয়াছিল। শুনিয়া কনক জবাব দিয়াছিল,—আমি রাঁধতে পারবো। কষ্ট হবে না। বিশেষ এ-রান্না রাঁধবো তোমার জন্য···তোমার মার জন্য···

হিমাদ্রি এ-কথায় বিমুগ্ধ হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়াছিল, পাড়ার ফ্ল্যাট-বাড়ীর ভাড়াটিয়া ব্রহ্মানন্দ সেনের কথা। বেচারী ব্রহ্মানন্দ! ব্রহ্মানন্দ সেনের স্ত্রী কাদম্বিনী দেবী এ-কালের বিদুষী···বি-এ পাশ···কালচারাল্ সোসাইটিতে মেশেন···ডাগর মেয়েদের লইয়া নাচের রিহার্শালে যান···সোসাইটী-লেডি বলিয়া তাঁর খ্যাতি আছে। বামুন আসে নাই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ সেনকে এক দিন ষ্টোভ জ্বালিয়া খিচুড়ী রাঁধিয়া দিতে হইয়াছিল। কাদম্বিনী সেনের মিটিং ছিল···রান্নার অবসর নাই···তাছাড়া ও-সব মিনিয়ালের কাজ তাঁর কেমন ভালো লাগে না! ব্রহ্মানন্দর আনাড়ি হাতে খিচুড়ী ধরিয়া গিয়াছিল, তাই কাদম্বিনী দেবীর ব্যবস্থায় পরের ক'দিন টিফিন-ক্যারিয়ার লইয়া বেচারী ব্রহ্মানন্দ সেন দু'বেলা হোটেলে গিয়া সেখান হইতে ভাত-ডাল তরকারী-ব্যঞ্জন কিনিয়া আনিতেন। মনে হইল, এ সব কালচারাল্ বিদুষীর চেয়ে ম্যাট্রিক-পড়া ঘরের-কোণে লজ্জা-ভীরুতার-আড়ালে-থাকা কনক ঢের ভালো!

কনকের এই অস্থিরতা···তাকে পাইবার জন্য কনকের দুর্ব্বার বাসনা···পাইলে ছাড়িতে না চাওয়া···জগতে সব ছাড়িয়া হিমাদ্রিকে এমন করিয়া ভাবা···ইহাতে যে আনন্দ, যে আরাম···সে আনন্দ, সে আরাম হিমাদ্রি কোথায় পাইত, কনক যদি এই-কনক না হইয়া লেখিকা বা বিদুষী শ্রীমতী কনকলতা বি-এ হইত!

হিমাদ্রি যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল! কনকের কথায় স্বপ্ন ভাঙ্গিল।

কনক বলিল—কি ভাবছো?

হিমাদ্রি বলিল—ভাবছি, এই নিরালা বনানী-কুঞ্জ··· এমন জ্যোৎস্না···যদি একটি গান গেয়ে শোনাতে···

হাসিয়া হিমাদ্রির গায়ে তর্জ্জনীর আঘাত দিয়া কনক বলিল,—আহা, দেখো! তুমি শুনতে চাইলে আমি যেন গান গাইবো না, বলেছি!

হিমাদ্রি বলিল—সে-কথা বলোনি···কিন্তু তোমার আসন্ন বিরহ-বেদনার মধ্যে আমি চাইবো আমার নিজের আরাম!

কনক বলিল,—থামো·· কোন্ গান গাইবো, বলো! কোন্‌টা তুমি শুনতে চাও?

হিমাদ্রি বলিল,—সেইটে গাও···সেই···আমায় একটুখানি বস্‌তে দিয়ো কাছে।

কনক বলিল,—বেশ···

কনক গাহিল,—

আমায় একটুখানি বসতে দিয়ো কাছে···শুধু ক্ষণেক তরে।

আকাশ-বাতাস সুরে ভরিয়া উঠিল! গান শুনিতে শুনিতে হিমাদ্রির মনে হইতেছিল···

গান থামিল। কনক কহিল,—শুনলে?

—হ্যাঁ।

কনক কহিল,—ভালো লাগলো?

হিমাদ্রি বলিল,—খুব! কিন্তু এই ভালো লাগার সঙ্গে-সঙ্গে কাঁটার মতো একটা অসহ্য বেদনাও বুকে বিঁধলো, কনক!

—কাঁটার বেদনা!

হিমাদ্রি বলিল,—তাই। ভাবছিলুম, আমাদের এ যৌবন ক'দিন? আমাদের এ-মন ক'দিন এমন সরস থাকবে! এর পর যখন সংসারে সংগ্রাম সুরু হবে! নানা জ্বালা, নানা বিরোধ-দ্বন্দ্ব জাগবে, তখন? তখনো আকাশে উঠবে এই চাঁদ···এ-চাঁদের কিরণে পৃথিবীতে এমনি জ্যোৎস্নার সাগর বইবে! কিন্তু আমরা তখন সে-জ্যোৎস্নার পানে চেয়েও দেখবো না···দেখবার কথা হয়তো মনে জাগবে না!

হাসিয়া কনক বলিল,—তার দেরী আছে মশাই, অনেক দেরী! এখন এ জ্যোৎস্না···বেশ করে একে দেহে-মনে মেখে নাও দিকিনি···

কনকের কথা শেষ হইল না! তার অধরের দ্বারে হিমাদ্রির অধর আসিয়া কথা রুদ্ধ করিয়া দিল!

হঠাৎ একটু দূরে মানুষের কণ্ঠস্বর··

চমকিয়া দু'জনে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখে, এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে এক জন প্রৌঢ়া···এই দিকেই আসিতেছেন।

দেখিয়া কনক চিনিল···বাড়ীর কাছে থাকেন, হরবল্লভ গাঙ্গুলি, প্রৌঢ়া তাঁর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী।

রাজলক্ষ্মী দেবী বলিলেন,—কনক···

লজ্জায় কনক যেন পাথর! কোনো জবাব দিল না।

হরবল্লভ বলিলেন,—জ্যোৎস্না দেখে বরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছো! পোইট্রি! ভালো! ভালো! আমাদের অ্যাখো, বয়স হয়েছে—তবু জ্যোৎস্না দেখলে ঘর ছেড়ে আজো দু'জনে নিরালা বনে এসে বসি···পৃথিবী ভুলে যাই যেন! তোমার দিদিমাকে বলছিলুম, এ জ্যোৎস্নায় তোমার তরুণ-তরুণীরা ঘরে বসে হয়তো তর্ক-বিরোধ করছে, নয় বদ্ধ-ঘরে বসে ভিড়ে বায়োস্কোপ দেখছে, না হয় সংসারের দেনা-পাওনার হিসাব কষছে! আর আমরা এই বয়সেও ঘরে থাকতে পারিনি! তাতে তোমার দিদিমা কি বললেন, জানো? বললেন, এখনো জ্যোৎস্না দেখলে সব ছেড়ে তোমায় নিয়ে বনে যেতে পারি!···এ-বয়সে এমন জ্যোৎস্না, এমন বাতাস ত্যাগ করো না তোমরা! লাইফে পোইট্রি বলে যদি কিছু থাকে তো জেনো, তা আছে এই জ্যোৎস্নায় আর এই নিরালা কোণে!

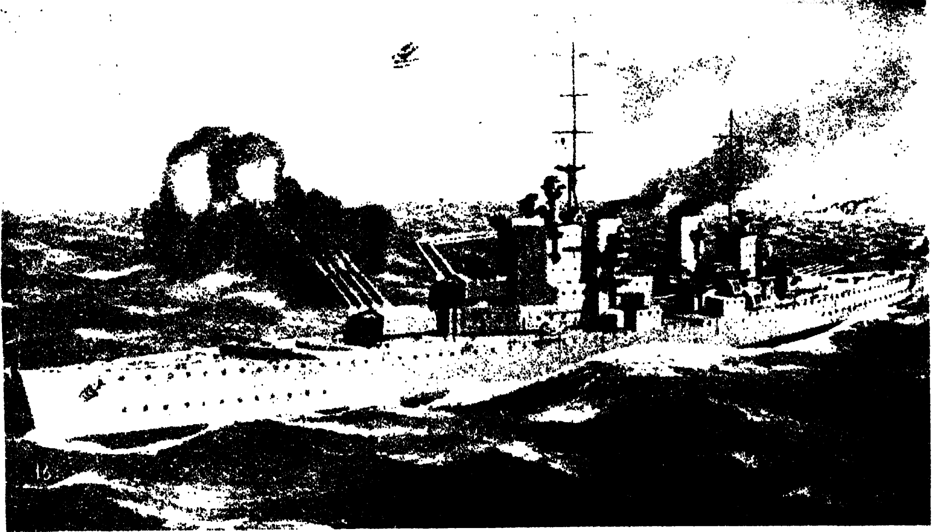
হিমাদ্রি বলিল,—একটু আগে আমরা ভেবেছিলুম, এখানে আর কেউ নেই! এ-জ্যোৎস্নায় শুধু আমরাই আছি! কিন্তু আপনারা এ-বয়সেও

হরবল্লভ বলিলেন,—মাথায় পাকা চুল দেখে ভাবো, জ্যোৎস্না ভুলে গেছি···মন আমাদের পাথর হয়ে গেছে! না তরুণ-বাবুজী...ভুলিনি! তোমাদের ঐ যৌবন-নীরে-ভাসা তরুণদের মধ্যেও তো দেখি, জ্যোৎস্না, আকাশ, বাতাস, ফুল, লতাপাতা...এগুলোকে তাঁরা মন থেকে বিদায় করে দেছেন···তাঁরা জানেন, শুধু পয়সা নিয়ে কারবার! আসল কথা জানো, বয়স এগুলেও মনকে যদি ঠিক রাখতে পারো, কখনো বুড়ো হবে না! মনের যৌবন যায় না রে ভাই, যাবার জিনিষ এ নয়।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

আরও তুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র সুতীক্ষ্ণ নাৎসী নখরাঘাতে বিদীর্ণ হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আজ নাৎসী খড়্গ সমুদ্যত। বৃটিশ জাতিকে আটলান্টিক পারের স্বগোত্রদিগের সাহায্যে বঞ্চিত করিবার জন্য জলে ও অন্তরীক্ষে এখনও নাৎসীর প্রবল তৎপরতা লক্ষিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জেও আকাশ হইতে সমান উৎসাহে তাহাদিগের অনল বৃষ্টি চলিতেছে। যবনিকার অন্তরালে জার্ম্মাণীর কূটনৈতিক তৎপরতার অবসান হয় নাই; এবং ইহার ভয়াবহ ফলের সম্ভাবনা এখনও অল্প নহে। পশ্চিম-এশিয়ার রাজনীতিক গগনে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সঞ্চার হইয়াছে; এদিকে পূর্ব্ব-এশিয়ার গাঢ় মেঘ নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছে।



ভূমধ্যসাগরে বিচরণশীল বিরাট রণপোত

গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়ায় নাৎসী-প্রভাব—

গত ৬ই এপ্রিল গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া যুগপৎ আক্রান্ত হইবার পর তিন সপ্তাহের মধ্যেই বলকানে জার্ম্মাণ-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুগোশ্লোভিয়ায় বৃটেনের সাহায্য পৌঁছিতেই পারে নাই। গ্রীসে যে ৬০ হাজার বৃটিশ সৈন্য গ্রীক্ বীরদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ৪৫ হাজার সৈন্য গুরুভার সমরোপকরণ পশ্চাতে ফেলিয়া কোন প্রকারে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়াছে; এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহেই বৃটিশ সৈন্যের এই কৌশলপূর্ণ পশ্চাদপসরণের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সমগ্র গ্রীসে এখন জার্ম্মাণ-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত; একমাত্র ক্রীট্ দ্বীপে এখনও গ্রীক্‌পতাকা উড্ডীন রহিয়াছে। গত বৎসর অক্টোবর মাসে ইটালী কর্ত্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই বৃটেন এই দ্বীপে ঘাঁটী স্থাপন করিয়াছিল; ক্রীট দ্বীপ এখন পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তির গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীতে পরিণত। স্বাধীন গ্রীসের শেষ চিহ্ন অপেক্ষা বৃটেনের নৌ ও বিমানঘাঁটীরূপেই ক্রীটের গুরুত্বও এখন অধিক। জার্ম্মাণী তাহাদিগের প্রভাবাধীন এক জন গ্রীকের হস্তে গ্রীসের শাসনভার অর্পণ করিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়ার ক্রোট প্রদেশ বহু কাল হইতে স্বায়ত্ত-শাসন লাভে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল; জার্ম্মাণী ক্রোট প্রদেশকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়ার অবশিষ্টাংশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বন্টিত হইয়াছে, এইরূপ জনরবই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

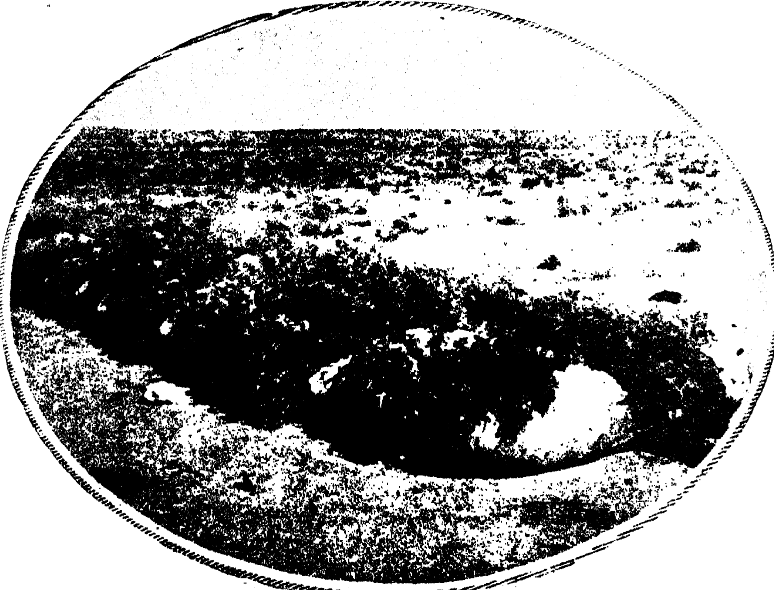
যুগোশ্লাভিয়া যে নাৎসী-আক্রমণ প্রতিরোধে সমর্থ হইবে না, তাহা পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিত বুঝিতে পারা গিয়াছিল। যুগোশ্লভিয়ার সিমোভিচ্ মন্ত্রিসভা আশা করিয়াছিলেন—তাঁহারা হয় ত কিছুকাল পার্ব্বত্য অঞ্চলে জার্ম্মাণ বাহিনীর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবেন; সেই সময়ের মধ্যে যদি ঐ রাজ্য বৃটেনের সাহায্য পায়, তাহা হইলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেও পারে। তাঁহাদিগের এই আশা সফল হয় নাই। জার্ম্মাণী সর্ব্বপ্রথম গ্রীস ও

যুগোশ্লাভিয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া তিন দিক হইতে এরূপ প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করে যে, সপ্তাহকালের মধ্যেই "সব ফরসা!" যুগোশ্লাভিয়ার সিমোভিচ মন্ত্রিসভা অকস্মাৎ ক্ষমতা লাভ করিয়াই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন; যুদ্ধ-পরিচালন সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনার অথবা মিত্রশক্তির সাহায্য-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিবার সুযোগ তাঁহারা পান নাই।

কিন্তু গ্রীসের অবস্থা অন্যরূপ। বৃটেন্ জার্ম্মাণ-বাহিনীকে গ্রীসে সাফল্যজনক ভাবে বাধা দান করিবে—এইরূপই আশা করিয়াছিল। গত ২ই এপ্রিল গ্রীসের যুদ্ধ সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিল বলেন, "We were apprised by our Generals that a sound military plan giving good prospects of success could be made."

অবশ্য সাফল্য লাভ অসম্ভব হইলেও বৃটেন্ গ্রীক্-যুদ্ধে পরোক্ষ-ভাবে উপকৃত হইবার আশা করিয়াছিল। বৃটেনের পক্ষ হইতে পরাজয়ের গ্লানি অপনোদনের উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, গ্রীকরা জার্ম্মাণীকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া বৃটিশ সরকার নৈতিক কর্ত্তব্য মনে করেন। এই উক্তি অতিরঞ্জিত হইলেও সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। বর্ত্তমান যুগে রাজনীতি হইতে নীতিবাদ পরিত্যক্ত হইলেও কূটনীতিক প্রচেষ্টায় সাফল্যের জন্য প্রকাশ্য ক্ষেত্রে নৈতিক মর্য্যাদা অব্যাহত রাখিবার প্রয়োজন হয়। বৃটেন্ যদি গ্রীসের সাহায্যার্থ অগ্রসর না হইত, তাহা হইলে সে সমগ্র বিশ্বে নিন্দিত হইত; ভবিষ্যতে তাহার কূটনীতিক প্রয়াসে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন—বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বৃটেন্ ও ফ্রান্স সম্মিলিত ভাবে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও গ্রীসকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। পোল্যাণ্ড তাহার মুরুব্বিদিগের সাহায্য ব্যতিরেকেই বিধ্বস্ত হইয়াছে; ফ্রান্স পরাভূত হইবার পর রুমানিয়া আপনাকে নিরুপায় মনে করিয়া স্বেচ্ছায় জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। একমাত্র গ্রীসই এত দিন অবশিষ্ট ছিল, এবং তাহার সন্তানগণ অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সমগ্র বিশ্ব মুগ্ধ করিয়াছিল।

নৈতিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি ব্যতীত অন্য কয়েকটি কারণেও হয় ত বৃটেন্ গ্রীসে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিল। প্রথমতঃ, বৃটেন্ হয় ত আশা করিয়াছিল—বল্‌কান্ অঞ্চল যদি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়, তাহা হইলে তথা হইতে জার্ম্মাণী অবাধে তাহার প্রয়োজনীয় পণ্য আহরণে অসমর্থ হইবে। যুগোশ্লাভিয়ায় জার্ম্মাণ-বিরোধী সিমোভিচ মন্ত্রিসভার প্রতিষ্ঠায় যদি বৃটেনের "গোপন হস্ত" কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলেও জার্ম্মাণীতে যুগোশ্লাভ পণ্যের অবাধ প্রবেশ বন্ধ করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাহার পর, যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের বাণিজ্য জাহাজ ও আমেরিকাস্থিত সম্পদে বৃটেন্ উপকৃত হইতেছে। যুগোশ্লাভিয়ায় জার্ম্মাণ-বিরোধী রাষ্ট্রবিপ্লব না হইলে বৃটেন্ অন্ততঃ তাহার বাণিজ্য জাহাজের দ্বারা নিশ্চয়ই উপকৃত হইতে পারিত না। গ্রীস সরকার যদি জার্ম্মাণীর "চাপে" ওলন্দাজ, বেল্‌জিয়ান্ প্রভৃতি সরকারের ন্যায় দেশত্যাগী না হইয়া আত্মসমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে গ্রীক্-জাহাজও বৃটেনের হস্তগত হইত না। এই সকল বিষয়ও হয় ত বৃটিশ সরকার বিবেচনা করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি, বৃটিশ সরকার মনে করিয়াছিলেন—গ্রীসের পার্ব্বত্য অঞ্চলে জার্ম্মাণ-বাহিনীর গতি যদি কিছু কাল প্রতিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উত্তর-আফ্রিকায় তাঁহারা বিরাট সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইবার অধিকতর সুযোগ পাইবেন। একই সময় পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরের উভয় উপকূলে সমান বেগে অভিযান পরিচালিত করা জার্ম্মাণীর পক্ষে কখনও সম্ভব হইতে পারে না। বৃটিশ সরকার মনে করিয়াছিলেন—গ্রীসে জার্ম্মাণ-বাহিনী আটক থাকিলে ঐ সময়ে মার্কিণী সাহায্য মিশরে পৌছিবে, এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকার অভিযান শেষ



কতকগুলি বৃহদাকার বোমা ঝোপের মধ্যে লুকান রহিয়াছে; আফ্রিকায় ইটালীয় সৈন্য পশ্চাদপসরণের সময় শত্রুর ক্ষতি-সাধনের জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল

হওয়ায় ঐ অঞ্চলের বৃটিশ-বাহিনীও উত্তর আফ্রিকায় নিযুক্ত হইতে পারিবে।

জার্ম্মাণীর অভিসন্ধি এবং তুরস্ক ও রুশিয়া—

জার্ম্মাণী এখন নিঃসন্দেহেই ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। বৃটেনের প্রাচ্য সাম্রাজ্যে আঘাত করাও তাহার উদ্দেশ্য। জার্ম্মাণ-বাহিনী যদি দার্দ্দানেলিজ অতিক্রম করিয়া তুরস্কের আনাটোলিয়া প্রদেশপথে অগ্রসর হইত, তাহা হইলে, ভূমধ্যসাগরে জার্ম্মাণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলেও, জার্ম্মাণ-বাহিনী অনায়াসে পশ্চিম-এশিয়ার বৃটিশ স্বার্থ-বিজড়িত অঞ্চলে পৌঁছিতে পারিত। কিন্তু জার্ম্মাণী তাহা করে নাই; সে ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলি অধিকার করিয়া ঐ সাগরস্থিত ইটালীর ডোডেকেনীজ দ্বীপপুঞ্জের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। তথা হইতে ফ্রান্সের রক্ষণাধীন সীরিয়ায় পৌঁছানই হয় ত তাহার ইচ্ছা। গ্রীসের যুদ্ধের সময়েই জার্ম্মাণী দার্দ্দানেলিজের প্রবেশদ্বারে লেম্‌নস্ ও সেমোথ্রেস্ দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল; সম্প্রতি স্মার্ণা উপসাগরের নিকটবর্ত্তী দুইটি দ্বীপ তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

তুরস্কের মধ্য দিয়া জার্ম্মাণী সৈন্য-পরিচালনে বিরত থাকায় স্বতঃই মনে হইবে যে, তুর্কি সরকারের দৃঢ়তা এবং সোভিয়েট রুশিয়ার সম্ভাবিত আপত্তির জন্যই জার্ম্মাণী এই সহজ পন্থা ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে উদ্ভূত অবস্থা লক্ষ্য করিলে এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইবে। জার্ম্মাণী দার্দ্দানেলিজ প্রণালী অতিক্রমণে প্রয়াসী না হইলেও ঐ প্রণালীর প্রবেশদ্বারে সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন সেমোথ্রেস্ অধিকার করিয়া বস্তুতঃ দার্দ্দানেলিজ ও বসফোরাস প্রণালীতে সে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলি জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত হওয়ায় ঐ প্রভাব আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। তুরস্ক প্রত্যক্ষ ভাবে আক্রান্ত না হইলেও তাহাকে এখন ক্রমে জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইতে হইতেছে।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, দার্দ্দানেলিজ—অর্থাৎ কৃষ্ণসাগরের সোভিয়েট বন্দর হইতে নির্গমনপথে জার্ম্মাণ-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সোভিয়েট রুশিয়ার কোন উৎকণ্ঠা নাই। জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হওয়ায় তুরস্কের উৎকণ্ঠা ত দূরের কথা, সে দার্দ্দানেলিজ-পথে জার্ম্মাণ জাহাজগুলিকে ঈজিয়ান সাগরে যাইতে দিয়া ঐ সাগরস্থিত জার্ম্মাণ-অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জে পণ্য সরবরাহের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি—গ্রীস-যুদ্ধের পর, তুরস্কের সহিত জার্ম্মাণীর একটি বাণিজ্য-চুক্তিও হইয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মনে হয়, তুরস্কের দৃঢ়তা অথবা সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তিতে জার্ম্মাণী তুরস্কের পথে সৈন্য-পরিচালনে বিরত থাকে নাই। সে হয় ত তুরস্ককে রণক্ষেত্রে পরিণত করিতে চাহে না। জার্ম্মাণ-বাহিনী আনাটোলিয়ার পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলে অদূর প্রাচ্যের বৃটিশ-বাহিনী স্বভাবতঃ তাহাদিগকে বাধা প্রদানে প্রয়াসী হইবে, এবং তাহার ফলে তুরস্ক রণক্ষেত্রে পরিণত হইবে। তুরস্কে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ঐ রাজ্য হইতে জার্ম্মাণী অন্ততঃ কিছু কাল অর্থনীতিক বিষয়ে উপকৃত হইবে না। এই জন্যই সে হয় ত সযত্নে তুরস্ককে এড়াইয়া চলিতেছে।

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়ার মনোভাব অত্যন্ত রহস্যজনক বোধ হইতেছে। দার্দ্দানেলিজে জার্ম্মাণ-প্রভুত্ব কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রটিকে উদ্বিগ্ন করিবে বলিয়াই মনে হইয়াছিল; ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে সোভিয়েট-জার্ম্মাণ অনাক্রমণাত্মক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর হইতে এত দিন সোভিয়েট রুশিয়া তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ক্ষেত্রে জার্ম্মাণ-প্রভাব সহ্য করে নাই। আজ, দার্দ্দানেলিজ সম্পর্কে তাহার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া মনে হয়—সে হয় ত কোন বৃহত্তর লাভের আশায় প্রতীক্ষা করিতেছে। অনেকে মনে করেন—জার্ম্মাণী তাহাকে পারস্য উপসাগরের উপকূলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আশ্বাস দিয়াছে। এই অনুমান অযৌক্তিক নহে। জার্ম্মাণী ও



যোদ্ধ বেশে সম্রাট হাইলে-সেলাসী, কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে বৃটিশ সেনাপতিদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন

সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে আপন আপন প্রভাবের ক্ষেত্র (Sphere of influence) সম্বন্ধে বন্দোবস্ত থাকাও সম্ভব।

উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধ—

উত্তর-আফ্রিকার জার্ম্মাণ-বাহিনী মিশরের সীমান্তে সল্লামে পৌঁছিয়া কিছু কাল অপেক্ষা করিয়াছিল; তথা হইতে মিশরে কয়েক মাইল অগ্রসর হইয়া তাহারা পুনরায় প্রতীক্ষা করিতেছে। লিবিয়ায় তোব্রুকে এখনও বৃটিশ-বাহিনী একটি দুর্গ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মিশরের জার্ম্মাণ-বাহিনী পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরের সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটী আলেকজেন্দ্রিয়া এবং সুয়েজ খাল লক্ষ্য করিয়া

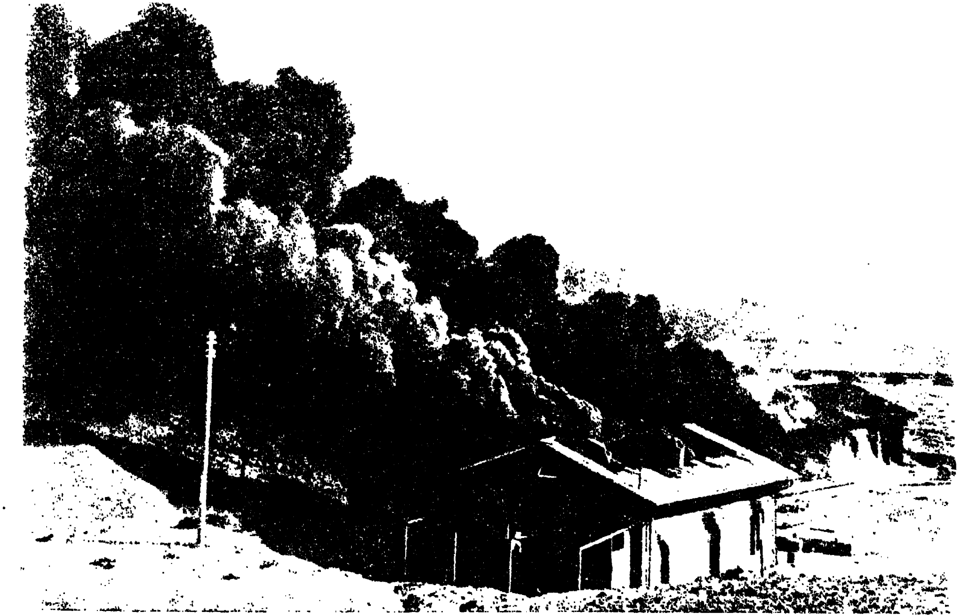
অগ্রসর হইতেছে। বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল্ জার্ম্মাণদিগকে বাধা-দানের জন্য ব্যাপক আয়োজন করিতেছেন; এই অঞ্চলে বৃটেনের পাঁচ লক্ষ সৈন্য এবং বিপুল সমরোপকরণ সংরক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং মিশরের মরু-অঞ্চলে বিরাট সঙ্ঘর্ষ আসন্নপ্রায়; এই সঙ্ঘর্ষের ফলাফলের উপর বৃটেনের অদূর প্রাচীর স্বার্থ, ভারতবর্ষের নিরাপত্তা, এবং ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যপথের অক্ষুন্নতা নির্ভর করিতেছে। বৃটেন্ মিশরে শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার জন্য যথাশক্তি প্রস্তুত হইতেছে; মিঃ চার্চ্চিলের ভাষায়—"We intend to fight with all our strength for the Nile-Valley and command of the Mediterranean."

এই অঞ্চলে যুদ্ধ-পরিচালনে জার্ম্মাণীর বিশেষ অসুবিধা আছে। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত; কাজেই ইটালীর সহিত উত্তর-আফ্রিকার অবাধ সংযোগ রক্ষা-করা সম্ভব নহে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী নৌবহর জার্ম্মাণীর হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—"Such movements of French war-vessels will alter the balance of naval power..."

মিশরে যুদ্ধ-পরিচালনার অসুবিধা কতক পরিমাণে পূরণ করিবার জন্য জার্ম্মাণী ঐ যুদ্ধের সময় সুয়েজ খালের পূর্ব্ব-তীরবর্ত্তী প্যালেষ্টাইন আক্রমণে উদ্যত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই হয় ত সে ঈজিয়ান্ সাগরপথে সীরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সে একই সময় পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক হইতে আক্রমণ চালাইয়া সুয়েজ ও আলেক্‌জেন্দ্রিয়া অধিকারের প্রয়াসী হইতে পারে।

পূর্ব্ব-আফ্রিকা—

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনী আরও সাফল্য লাভ করিয়াছে। তাহারা ডেসী অধিকার করিয়াছে। সম্প্রতি হাবসী-সম্রাট হাইলে-



তোব্রুকের নিকটবর্ত্তী বিশাল বালুকাস্তূপ; বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত সেনাবিভাগের প্রধান কেন্দ্র

মরুপথে সৈন্যদিগের সরবরাহ-ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখাও তাহার পক্ষে দুষ্কর। জার্ম্মাণীর সরবরাহ-সূত্রে আক্রমণ পরিচালনের সময় বৃটিশ বিমানবহর যদি বৃটিশ নৌবাহিনীর সহযোগ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ ক্ষতিসাধনে সমর্থ হইবে।

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য জার্ম্মাণী স্পেন এবং ভিসি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা লাভে প্রয়াসী হইতে পারে—হয় ত যবনিকার অন্তরালে এই প্রয়াসই এখন চলিতেছে। স্পেনের সহযোগিতায় জিব্রল্টর প্রণালী অবরোধের পর ফরাসী নৌবহর ও নৌঘাঁটী ব্যবহার করিয়া নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয় ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহরের সম্মুখীন হইতে পারে। গত ৯ই এপ্রিল মিঃ চার্চ্চিল ফরাসী সেলাসী বিজয়গর্ব্বে স্বীয় রাজ্যের রাজধানী আদ্দিস্-আবাবায় প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় এখনও ইটালীয় সৈন্য যুদ্ধ করিতেছে; তবে, উত্তর-আফ্রিকায় জার্ম্মাণীর বিজয় লাভের ফলে ঐ অঞ্চলে সাহায্য প্রেরণ যদি সম্ভব হয়, একমাত্র তাহা হইলেই ইটালীয় বাহিনীর অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটা সম্ভব। নতুবা, ইটালীর পূর্ব্ব-আফ্রিকার সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপ ধ্বংসই হইল।

ইরাকে যুদ্ধ—

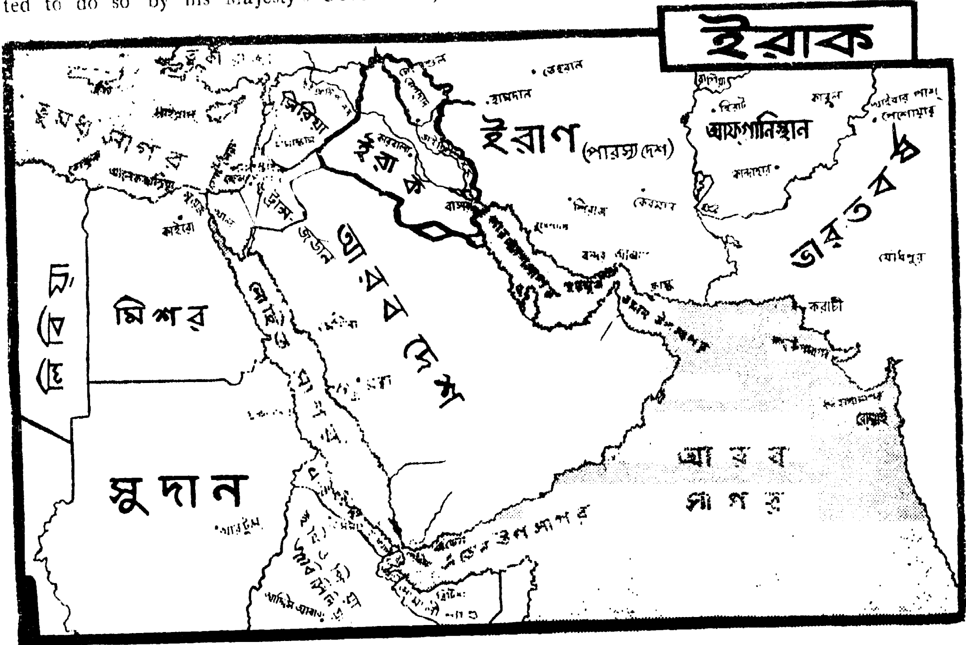
গত মহাযুদ্ধের পর ইরাক (মেসোপটেমিয়া) রাজ্যটি তুরস্কের সহিত বিচ্ছিন্ন সংযোগ হইয়া বৃটেনের রক্ষণাধীন রাষ্ট্রে

(Mandatory State) পরিণত হইয়াছিল। গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইরাক বৃটেনের অভিভাবকত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং জাতি-সঙ্ঘে স্থান লাভ করে। ইরাক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইলেও ইরাকী সৈন্যদিগকে শিক্ষাদানের জন্য তথায় একটি বৃটিশ সামরিক মিশন অবস্থান করে, পুলিস বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কয়েক জন বৃটিশ ইন্স্পেক্টর তথায় কার্য্য করিতে থাকেন; যুদ্ধের সময় প্রয়োজনের সম্ভাবনায় ইরাকে দুইটি বৃটিশ বিমান-ঘাঁটী স্থাপিত হয়, এবং ঐ ঘাঁটিতে কিছু বৃটিশ সৈন্যও অবস্থান করিতে থাকে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-ইরাক চুক্তিতে এই মর্ম্মে এক বিধানও সংযোজিত হয় যে, চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের কেহ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে অন্য পক্ষ তাহার সহিত মিত্ররূপে যোগদান করিবে। ঐ চুক্তির ৭ম ধারায় নিম্নলিখিত ধারাটি সংযুক্ত হয়—

"The King of Iraq agrees to afford, when requested to do so by his Majesty's Government, all possible facilities for the movement of the forces of His Britannic Majesty of all arms in transit across Iraq and for the transport and storage of all Supplies and equipment that may be required by these forces during the passage across Iraq."

বাণিজ্যক্ষেত্রেও ইরাকের সহিত বৃটেনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ইঙ্গ-পারস্য তৈল-কোম্পানীর দ্বারাই খানকিনের তৈলকূপগুলিতে কাজ হয়। "মসুল অয়েল ফিল্ডস্ লিমিটেড" অবিমিশ্র বৃটিশ প্রতিষ্ঠান। "ইরাক পেট্রোলিয়ম্ কোম্পানী" নামক যে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি কারকুকে তৈল উত্তোলন করে, তাহাতেও বৃটেনের স্বার্থ আছে।

বৃটেনের সহিত বিশেষ ভাবে স্বার্থ-বিজড়িত—বস্তুতঃ, বৃটেনের অনুগ্রহাধীন ইরাক এত দিন বৃটেনের মিত্রই ছিল। গত ১লা এপ্রিল রসিদ আলি এল্-গিলানি নামক এক জন ইরাকী সামরিক নেতা ঐ রাজ্যের নিয়মানুগ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করিয়া তথায় সামরিক এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমতা লাভ করিয়া রসিদ আলি ঘোষণা করেন যে, তিনি ইঙ্গ-ইরাক চুক্তি মানিয়া চলিবেন। তদনুসারে ১৮ই এপ্রিল বৃটিশ সরকার ঐ চুক্তির পূর্ব্বোল্লিখিত বিধান অনুসারে ইরাকে কিছু সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐ সকল সৈন্য নির্ব্বিবাদে বাস্রায় পৌঁছিয়াছিল। ইহার পর, বৃটিশ সরকার দ্বিতীয় দল সৈন্য প্রেরণে উদ্যত হইলে রসিদ আলির সরকার তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে, পূর্ব্বে আগত সৈন্য স্থানান্তরে যাইবার পূর্ব্বে নূতন বৃটিশ সৈন্য ইরাকে প্রবেশ করিতে পারিবে না। বৃটিশ সরকার এই আপত্তি উপেক্ষা করিয়া ইরাকে সৈন্য প্রেরণ করিলে ২রা মে ইরাকী সৈন্য হাবানিয়ার বৃটিশ বিমানঘাঁটী



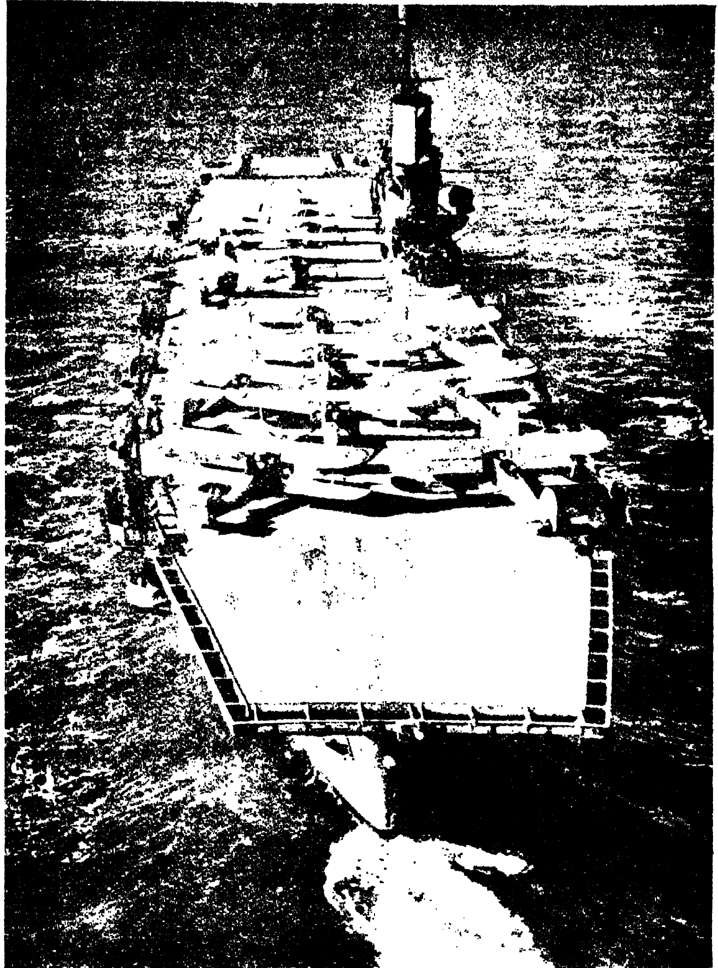
আক্রমণ করে, এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবস্থা বৃটেনের বিশেষ প্রতিকূল নহে; হাবানিয়া ও বাস্রা হইতে ইরাকীরা বিতাড়িত হইয়াছে, পাঁচ শত ইরাকী বন্দী হইয়াছে, এক সহস্র ইরাকী হতাহত হইয়াছে। অবশ্য, তৈলকূপগুলি এখনও ইরাকীদিগের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে।

বৃটেনের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, রসিদ আলি জার্ম্মাণীর চররূপে কার্য্য করিতেছেন। ইরাকের রাজা প্রথম ফৈজলের মৃত্যুর পর গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইরাক না কি জার্ম্মাণীর ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। রসিদ এবং আরও কতকগুলি সামরিক কর্ম্মচারী জার্ম্মাণীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ৭ই মে মিঃ চার্চ্চিল বৃটিশ কমন্স-সভায় বলিয়াছেন যে, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে

যে মাসে বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ হইতে ইরাকে সৈন্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র বৃটিশবাহিনী নাইল নদীর উপত্যকায় প্রেরণের প্রয়োজন হওয়ায় পররাষ্ট্র বিভাগের এই অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। ইরাকে জার্ম্মাণ ষড়যন্ত্রের জন্যই তথায় এই সকল সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল।

জার্ম্মাণীর ইঙ্গিতে ইরাকে যদি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অসাময়িক হইয়াছে। কারণ, ১০ই মে পর্যন্ত ইরাকে জার্ম্মাণীর কোনরূপ সাহায্য পৌছিবার সংবাদ পাওয়া যায় নাই; হয় ত সাহায্য প্রেরণের পথ তখনও সুগম হয় নাই বলিয়াই জার্ম্মাণীর অসুবিধা হইতেছে। ইরাক-বাহিনী গত কয়েক দিন একক বৃটিশ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। অবশ্য, মিঃ চার্চ্চিল সত্বর ইরাকে জার্ম্মাণ-সাহায্য পৌছিবার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন এবং অবস্থা যে তখন জটিল হইবে, সে কথাও বলিয়াছেন।

এই সময় লণ্ডনের 'ডেলী টেলিগ্রাফের' আঙ্কারাস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ইরাণে একটি জার্ম্মাণ-মিশন গমন করিয়াছে; প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে অশান্তি সৃষ্টি না কি তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। ইতঃপূর্ব্বেও ইরাণে জার্ম্মাণ চরদিগের প্রবেশের জনরব প্রচারিত হইয়াছে। 'ডেলী টেলিগ্রাফের' সংবাদদাতার উক্তি সত্য হইলে অবস্থা বিলক্ষণ সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতে পারে। ইরাণ সরকারের প্রকৃত মনোভাব অজ্ঞাত; তবে, প্রবল শত্রুর সম্মুখে পশ্চিম-এসিয়ার এই সকল দুর্ব্বল রাষ্ট্রের মনোভাবের বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। জনৈক বিশিষ্ট সাংবাদিক ইরাণ, আফগানিস্থান প্রভৃতি রাষ্ট্র সম্বন্ধে কিছু দিন পূর্ব্বে মন্তব্য করিয়াছেন—এই সকল দেশের অধিবাসীর বীরত্বের প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়াও বলা যায়, ইহারা ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড ও নরওয়ের ন্যায়ই অসহায়; আফগানিস্থানের পর্ব্বতশ্রেণী আধুনিক যান্ত্রিক বাহিনীর প্রতিরোধে অসমর্থ। রসিদ আলির "অনুগ্রহে" এবং ইরাকে জার্ম্মাণীর ষড়যন্ত্রের ফলে যদি জার্ম্মাণ-বাহিনী পারস্য উপসাগরের তীরে উপনীত হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ বিপন্ন হইতে পারে কি না, তাহা উল্লিখিত সাংবাদিকের উক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। এই সাংবাদিক বলিয়াছেন —"I have travelled in recent years in a car from Meshed in Iran near the Russian border to Zahidan, near our Beluch border in 24 hours on a good road that stands up to heavy lorries continually pounding on it." পারস্য উপসাগরের তীর হইতে জার্ম্মাণী আরব সাগরে এবং পশ্চিম-ভারতে বিমান আক্রমণ-পরিচালনের যথেষ্টই সুবিধা পাইবে। কিন্তু ইরাণ হইতে যন্ত্রসজ্জিত দুর্ব্বার জার্ম্মাণ-বাহিনী ভারতাভিমুখে প্রেরিত হইবার



বৃটেনের বিমানবাহী জাহাজ "বার্ক রয়াল"

সুযোগের তুলনায় এই বিমান আক্রমণের আশঙ্কা যে নিতান্তই তুচ্ছ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় কি ?

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও মার্কিনী সাহায্য—

হিট্‌লার এখন সুদূর বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের কথা বিস্মৃত হন নাই। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের শ্রমশিল্পকেন্দ্র, বন্দর প্রভৃতি স্থানে প্রবল ভাবে বোমা-বর্ষণ চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে বেসামরিক অঞ্চলেও নির্মম ভাবে বোমা বর্ষিত হইতেছে। সমুদ্রবক্ষেও জার্ম্মাণ সাবমেরিণের বোম্বেটেগিরি পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। গত এপ্রিল মাসে বৃটেনের হিসাবে মোট ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টনের ১০৬ খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। জার্ম্মাণী ও ইটালী দাবী করে যে, তাহারা ঐ মাসে মোট ১২ লক্ষ ২৯ হাজার টনের জাহাজ ডুবাইয়াছে। বৃটেনের জাহাজের ক্ষতির পরিমাণ যে উদ্বেগজনক, তাহা মার্কিনী রাষ্ট্রনায়কদিগের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। বৃটেনের জাহাজডুবি নিবারণের ব্যবস্থা না হইলে তাহাকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য দানের আয়োজন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা মার্কিনী রাষ্ট্রনায়কগণ উপলব্ধি করিতেছেন।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে জার্ম্মাণীর আক্রমণ বিফল করিয়া বৃটেনকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য প্রদানের মনোভাব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্ম্মাণী ও ইটালীর আটক জাহাজগুলিতে বৃটেনে সাহায্য প্রেরণ এবং অন্যান্য সম্ভবপর উপায়ে বৃটেনকে সাহায্য-দানের ব্যবস্থা হইতেছে। তাহার পর মার্কিনী সরকার ধীরে ধীরে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, উহা তাঁহাদিগের যুদ্ধে লিপ্ত হইবারই পূর্ব্বাভাস। গত ২৯শে এপ্রিল প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন—অতঃপর পশ্চিম-গোলার্দ্ধ রক্ষার জন্য মার্কিনী নৌবহর "সপ্ত সমুদ্রে" বিচরণ করিবে; প্রয়োজন হইলে জাহাজগুলি যুদ্ধাঞ্চলেও প্রবেশ করিবে। মার্কিনী সরকারের এই ব্যবস্থায় তাঁহাদিগের রণতরীগুলি সমুদ্রবক্ষে প্রহরীর কার্য্য করিয়া বৃটেনগামী জাহাজগুলিকে সাহায্য করিবে। গত ৬ই মে মার্কিনী সমর-সচিব মিঃ ষ্টিম্‌সন এক বেতার-বক্তৃতায় দাবী জানান যে, বৃটেনে অবাধে সাহায্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে সমুদ্রবক্ষ নিরাপদ করিবার জন্য অবিলম্বে মার্কিনী নৌবহর ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি মার্কিনী সরকার গ্রীণল্যাণ্ডে ঘাঁটী স্থাপন করিয়াছেন। বৃটেনে সাহায্য প্রেরণের পথ নিষ্কণ্টক করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। মিঃ ষ্টিম্‌সনের প্রস্তাব অনুযায়ী যদি মার্কিনী নৌবহরের রক্ষণাধীনে বৃটেনে সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জার্ম্মাণীর সঙ্ঘর্ষ অপরিহার্য্য হইবে।

মার্কিনী সরকারের এই আগ্রহ হিট্‌লারের অজ্ঞাত নহে। বৃটেনে মার্কিনী সাহায্য প্রবেশ বন্ধ করা হিট্‌লারের একান্ত প্রয়োজন; মার্কিনী নৌ সচিব কর্ণেল নক্সের ভাষায় "Hitler cannot allow our war supplies and food to reach England. He will be defeated if they do." তাই, হিট্‌লার এই সাহায্য প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য ব্যাপকতর উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। দক্ষিণ-আমেরিকা ও বৃটেনের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সহিত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের যে সংযোগপথ, তাহা বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াস প্রবলতর করিবার উদ্দেশ্যে হিট্‌লার আইবেরিয়ান্ উপদ্বীপ (স্পেন ও পর্ত্তুগাল) এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা অধিকারে সচেষ্ট হইতে পারেন। স্কটল্যাণ্ডের সহিত উত্তর-আমেরিকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আয়ার্ল্যাণ্ড দ্বীপ স্বীয় আয়ত্তে আনিতে সচেষ্ট হওয়াও জার্ম্মাণীর পক্ষে অসম্ভব নহে।

সোভিয়েট-জাপান চুক্তি ও জাপানের মনোভাব—

গত ২২শে এপ্রিল জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুয়োকা য়ুরোপ ভ্রমণ শেষ করিয়া টোকিওতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গত ১৩ই এপ্রিল মস্কৌএ সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত জাপানের নিরপেক্ষতা চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর এক সম্মিলিত ঘোষণায় জাপান মঙ্গোলিয়ার রাজ্যগত অখণ্ডতা স্বীকার করিয়াছে, সোভিয়েট রুশিয়া মাঞ্চুকো সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা মানিয়া লইয়াছে। এই ঘোষণার অর্থ—সুদূর প্রাচীতে বহু কাল প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদীর সহিত সীমান্তরেখা সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের যে বিরোধ চলিতেছিল, তাহার অবসান হইল।

সোভিয়েট-জাপান চুক্তির গুরুত্ব অসাধারণ। সোভিয়েট রুশিয়া এই চুক্তির দ্বারা জাপানকে তাহার সাম্রাজ্যাকাঙ্ক্ষা পূরণে স্বাধীনতা দিয়াছে, দুই মহাদেশব্যাপী বর্ত্তমান যুদ্ধকে প্রকৃত বিশ্ব-সংগ্রামে পরিণত করিয়া কম্যুনিষ্ট আদর্শ প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে; সামরিক ভাবে স্বীয় পূর্ব্ব-সীমান্ত সম্পর্কে নিশ্চিন্তও হইয়াছে। পক্ষান্তরে, জাপান তাহার কম্যুনিষ্ট প্রতিবেশী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর এবং মালয় উপদ্বীপের প্রতি মনোযোগ প্রদানের অখণ্ড অবসর পাইয়াছে।

সোভিয়েট রুশিয়া জাপানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেও সে চীনকে সাহায্য প্রদান বন্ধ করিবে না। ইহা আপাতঃ দৃষ্টিতে সামঞ্জস্যহীন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সোভিয়েট রুশিয়া নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সাধারণ অধিকার-বলেই চীনের সহিত বাণিজ্য পরিচালনা করিয়া থাকে; ইহা বন্ধ হইলে তাহার অর্থনীতিক ক্ষতি হইবে। জাপান তাহার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করিয়া এইরূপ দাবী কখনও উত্থাপন করিতে পারে না।

সোভিয়েট সরকার হয় ত চীনকে সাহায্যদানের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়া প্রকারান্তরে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক্‌কে শিক্ষা দিতে চাহিতেছেন। প্রাচীতে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতীচ্য ধনিক-তন্ত্রগুলি এখন মার্শাল চিয়াংকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতেছেন। এই সকল রাষ্ট্রের প্রভাবে মার্শাল চিয়াংএর কম্যুনিষ্ট-বিরোধী মনোভাব পুনরায় প্রকট হওয়াই সম্ভব। এক্ষণে সোভিয়েট-জাপান চুক্তির ফলে জাপান যদি ঐ সকল প্রতীচ্য শক্তির সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়, তাহা হইলে চিয়াংএর পক্ষে ব্রহ্মদেশের পথে সাহায্য প্রাপ্তি অসম্ভব হইবে। আজ যদি জাপ-বৃটেন সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে জাপান কালই রেঙ্গুণ, লাশিও প্রভৃতি স্থানে বোমা বর্ষণ করিয়া ব্রহ্মদেশের পথে চীনে পণ্য প্রবেশ বন্ধ করিবে। তখন মার্শাল চিয়াং স্বভাবতঃ একমাত্র রুশিয়ার প্রতি নির্ভরশীল হইবেন এবং কম্যুনিষ্টদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষায় বাধ্য হইবেন। সোভিয়েট রুশিয়া চীনকে সাহায্য প্রদান-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়া এক দিকে জাপানের নিকট চীনের আত্মসমর্পণের সম্ভাবনা দূর করিয়াছে, অন্য দিকে চীনে কম্যুনিষ্ট-প্রভাব বৃদ্ধির পথ সুগম করিয়াছে।

জাপান এখন অত্যন্ত সংযত ভাবে কথাবার্ত্তা চালাইতেছে; তাহার যে কোন আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি আছে, তাহা অবিশ্বাসযোগ্য মনে হইতেও পারে। কিন্তু এই সময়ে ইন্দো-চীন ও থাইল্যাণ্ডে জাপানের বিশেষ তৎপরতা লক্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি এডুইন্ হার্টিজ্ ম্যানিলা হইতে লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিকল্' পত্রে জানাইয়াছেন—জাপানীরা উত্তর-ইন্দো-চীনে দ্রুত বিমানঘাঁটী স্থাপন করিতেছে এবং দক্ষিণ অঞ্চলে বিমানঘাঁটীর স্থান-নির্ব্বাচনে ব্যস্ত আছে। উল্লিখিত সংবাদদাতা আরও জানাইয়াছেন—ভিসি কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ইন্দো-চীনের শাসনকর্ত্তা এডমিরাল ডীকো ক্রমে জাপানকে অধিকতর সুবিধা দান করিতেছেন—"Admiral Decoux uses the excuse of Vichy's orders for continued concession of Japan." থাইল্যাণ্ডে বেসামরিক পরিচ্ছদ-পরিহিত বহু জাপানী সৈন্য ও সামরিক কর্ম্মচারীর প্রবেশের কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহারা না কি বনাঞ্চলে নিয়মিত ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। স্থলপথে ও আকাশপথে সিঙ্গাপুর আক্রমণের উদ্দেশ্যেই জাপানের এই সকল আয়োজন; ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের কোন স্থানে বিমান-আক্রমণ পরিচালনের উদ্দেশ্যেই হয় ত ইন্দো-চীনে বিমানঘাঁটী স্থাপনের ব্যাপক আয়োজন চলিতেছে। দক্ষিণ-চীনে সম্প্রতি জাপানের বিশেষ তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে জাপানী রণপোতের জন্য অতিরিক্ত সরবরাহ-ঘাঁটী স্থাপন হয় ত জাপানের উদ্দেশ্য।

জাপানের সংযত ভাষা এবং গোপন সমরায়োজন লক্ষ্য করিলে মনে হয়, জাপান হয় ত একটি বিশেষ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। জাপানের সমর-পরিকল্পনা ইটালী ও জার্ম্মাণীর সহযোগে রচিত হওয়াই সম্ভব। কানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জি কিং সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, একই সময়ে সুয়েজ, জিব্রাল্টর ও সিঙ্গাপুর আক্রান্ত হইতে পারে। এই অনুমান অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীঅতুল দত্ত।

কামনা

সহস্র প্রীতি ও স্নেহবন্ধনের মাঝে,
বিজড়িত হ'য়ে আছি শত মায়া-জালে;
নাহি কোন অনুযোগ, নাহি কিছু ক্ষোভ।
পৃথিবীর মলিনতা অসুন্দর যত,
বিধাতা লেখেনি কিছু তেজদীপ্ত ভালে
দারিদ্র্য-পাপেতে কভু নাহি জাগে লোভ।

যৌবনের দৃপ্তরথে চলেছি বাহিয়া,
সৌভাগ্যের জয়মাল্য অঙ্গে দোলে মোর,
সৌন্দর্য্যের দূত আমি সুন্দর সন্ধানে।
সান্ধ্যছায়া নামে যবে এ ধরার বুকে,
মানব আকুল হেরি অন্ধকার ঘোর;
আমার মানসে হেরি নূতন জীবনে।

রূপ, রস, গন্ধময়ী সুন্দরী ধরণী
সৌন্দর্য্য-পসরা নিত্য ধরিতেছে হাসি;
নব রূপে হ'য়ে থাকি নিত্য নিমগন।
অকস্মাৎ তবু কেন এ প্রশান্ত চিতে
জাগায় বেদনা মোর ক্ষণে ক্ষণে আসি
মিলনের মাঝে এ যে বিদায়-ক্রন্দন।

স্বপ্নময় কুহেলীর ঘন আবরণে
কাহার মূরতি যেন হেরিবারে চাই,
কায়াহীন, ছায়াহীন সুন্দর আমার।
কি কামনা উচ্ছসিয়া জাগে বক্ষতলে
সবি পরিপূর্ণ তবু কিছু যেন নাই!
বেদনার সিন্ধু বক্ষে অকূল অপার।

ব্যর্থ মানি অকস্মাৎ সকল সাধনা
ব্যর্থ হয় গর্ব্বোদ্ধত এ মধু-যৌবন;
ব্যর্থতার পারাবারে হারাই আপনা।
আকুল ক্রন্দনে ভরা এ রুদ্ধ বেদনা
অসৌন্দর্য্যে ভরি দেয় সকল জীবন;
তবু বুঝি নাকো মোর কেন এ কামনা!

অরূপ, অদেহী ওগো হে কৌতুকপ্রিয়!
কি খেলা খেলিছ তুমি ওহে নিরন্তর;
আমারে দিয়েছি ধরা আর কিবা চাও?
রহস্যের অপরূপ সৌন্দর্য্যের জালে
ভরিয়া গিয়াছে ওগো আমার অন্তর;
পারি না সহিতে আর—ছিন্ন করি দাও।

শ্রীগীতা গুপ্ত এম-এ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারত-সচিবের বক্তৃতা

গত ৯ই বৈশাখ মঙ্গলবারে পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যে, আরও এক বৎসর পর্য্যন্ত ভারতের সাতটি প্রদেশে গবর্ণর কর্তৃক শাসন-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা হউক। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহাতে ভারত-শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন দানে বর্ত্তমান বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের যেন অরুচিই প্রকাশ পাইয়াছে। মিঃ আমেরীর সেই একই কথা; অর্থাৎ 'থোড় বড়ি খাড়া'র পুনরাবৃত্তি; তবে কখন শজনে-খাড়া, কখন পলাণ্ডু-দণ্ড—অর্থাৎ কিঞ্চিৎ গন্ধযুক্ত! মর্ম্ম এই যে, সকল দলের মতের ঐক্য ঘটিলেই ভারতের শাসন-যন্ত্রের প্রগতিসাধনে আর কোন বাধা থাকিবে না; অর্থাৎ অসম্ভব সম্ভব হইলেই ভারতের শাসন-যন্ত্র তাহাদের স্বদেশী হইবে। ঐ অসম্ভব সম্ভব হইতেই যে কিছু বিলম্ব! সুতরাং তিনি জানেন, 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ' উহা অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি—বর্ত্তমান শাসনসংস্কার কি সর্ব্বমতাবলম্বী লোকদিগকে একমত করিবার পর বিধিবদ্ধ হইয়াছে? সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নামক বিরোধ-উৎপাদক আপেলটি কি সকল সম্প্রদায়ের মত লইয়া এ দেশে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল? এতদ্ভিন্ন, নির্ব্বাচকমণ্ডলী-গঠনের ব্যবস্থাও কি এ দেশের সকল দলের মত লইয়া করা হইয়াছিল? তাহাও হয় নাই। শাসন-সংস্কার আইনে য়ুরোপীয়দিগকে যে সকল বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে,—তাহাও কি সর্ব্ববাদিসম্মত? তাহা ত নহে। দেশের জনসাধারণের মতভেদ উপেক্ষা করিয়াই ঐ আইনটির আগাগোড়া রচিত হইয়াছে। তবে এখন মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এত পীড়াপীড়ির কারণ কি? এই শিরঃপীড়া কি অহেতুক? মিষ্টার জিন্নার দল যে কোন মতেই কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভার সহিত একমত হইবেন না, এ কথা কাহার অবিদিত? বিশেষতঃ, তিনি ভারতের সকল মুসলমান দলেরও মুখপাত্র নহেন। এ সব কথা বহুবার আলোচিত হইয়াছে।

লর্ড মর্লির ন্যায় খ্যাতনামা রাজনীতিক যে মডারেট দলকে পুনরায় সংগঠিত করিতে বলিয়াছিলেন, সেই মডারেট দলের নেতৃবর্গ এবং স্বাধীন দলের নেতারা তাঁহাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন,—তাহাও যখন তিনি তাঁহার পদের দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া আত্মম্ভরিতা বশতঃ স্বভাবসিদ্ধ চাপল্য সহকারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন,—তখন বুঝিতে হইবে, তাঁহার মত অদূরদর্শী রাজনীতিক যত দিন ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তা থাকিবেন, তত দিন ভারতীয় শাসন-যন্ত্রের প্রগতি-সাধনের কোন আশাই নাই। তাঁহার এই অসঙ্গত উক্তি পাঠ করিয়া গান্ধীজীর ন্যায় ধীর প্রকৃতির লোককেও অত্যন্ত বিচলিত হইতে হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, সমসাময়িক অবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি (মিঃ আমেরী) যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে গ্রেট বৃটেনের কোন উপকারই হইবে না। মিষ্টার আমেরী ভারতে যে শান্তি প্রতিষ্ঠার মামুলি বুলি উদ্গিরণ করিয়াছেন, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজ ভারতের দিকে দিকে দেদীপ্যমান! ঠিক যে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থান, এদিকে আমেদাবাদ এবং বোম্বাই অঞ্চল গুণ্ডার অত্যাচারে প্রপীড়িত, অসংখ্য পল্লীবাসী গৃহহীন, লুণ্ঠিত-সর্ব্বস্ব—সেই সময়ে ভারত-সচিবের এই উক্তি কি একটা বিরাট ধাপ্পা মাত্র নহে? ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিবের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতে যত সাম্প্রদায়িক বিরোধের উদ্ভব হইয়াছে, এবং তৎসম্পর্কে যত নরহত্যা এবং বিত্তনাশ ঘটিয়াছে, মিষ্টার আমেরী তাহার অনতিরঞ্জিত তালিকা প্রকাশ করিয়া তাঁহার এই শান্তি-প্রতিষ্ঠার অসার গর্ব্বের সমর্থন করিতে সাহস করিবেন কি?—গান্ধীজীর মন্তব্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবে স্থানান্তরে আলোচনা করা হইল। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মস্লেম লীগকে কেন যে তিনি এত বাড়াইয়া তুলিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন, তাহা কোন ভারতবাসীর কি এখনও বুঝিতে বাকি আছে? অধ্যাপক সার রাধাকৃষ্ণণ যথার্থই বলিয়াছেন, "ঢাকার হাঙ্গামার মূল কারণ প্রভুত্ব-শক্তির ক্ষীণতাই সূচিত করে, এবং যদি লোকের মনে এই ধারণাই জন্মে যে, সচিবসঙ্ঘের উপর তাহাদের প্রভাব আছে, তাহা হইলে তাহারা দণ্ডাদির ভয় না করিয়া অপরাধের অনুষ্ঠান করিতে পারে, ইহাই মনে করিয়া থাকে।"—সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ভারতের কোন সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকই মিষ্টার আমেরীর এই অসার বাগাড়ম্বরের সমর্থন করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ আছে কি? সম্ভবতঃ মিষ্টার জিন্না উহার সমর্থন করিতে পারেন। সার রাধাকৃষ্ণণ যথার্থই বলিয়াছেন, "মিষ্টার আমেরীর বক্তৃতায় ভারত-শাসনে বৃটিশ জাতির নৈতিক বিফলতাই স্বীকৃত হইয়াছে।"

ভারত এবং বৃটেন

গত ৯ই বৈশাখ মঙ্গলবার রাত্রিকালে বৃটিশ পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরীর বক্তৃতার পর ভারত-প্রসঙ্গে যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়, শ্রমিক সদস্য মিষ্টার আমন সেই আলোচনা আরম্ভ করেন; এবং সভার বহু সদস্যই তাহাতে সাগ্রহে যোগদান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহাদের সেই আলোচনা অল্পাধিক পরিমাণে ভ্রান্তপথেই পরিচালিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এইরূপ বিড়ম্বনা ভারতবাসিগণের ভাগ্যফল। মিষ্টার আমন বলেন, মিষ্টার আমেরীর বক্তৃতা তাঁহার মনে উদ্বেগেরই সঞ্চার করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কমন্স সভায় ভারত সম্বন্ধে আলোচনা হইলে তাহাতে ভারতের যেরূপ অবস্থার কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, মিঃ আমেরীর উক্ত বক্তৃতা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সে অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য কোন প্রকার চেষ্টাই হয় নাই; বরং সেই ত্রুটির কথাই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই শ্রমিক-সদস্য আরও বলেন, ভারতের সমস্যাই বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান সমস্যা। উদারনীতিক দলের সদস্য মিষ্টার ডবলিউ রবার্টস্ বলেন, "ভারতবাসীরা তাহাদের ঘরোয়া বিরোধ নিজেরা মিটাইয়া

না লইলে বৃটিশ সরকার আর কিছুই করিতে পারেন না,—এই কথার উল্লেখই বৃটিশ সরকারের পক্ষে যথেষ্ট নহে।”

এই বিরোধের মূল কোথায়, তাহা না বুঝিলে এবং সেই মূল উৎপাটন করিতে না পারিলে এই বিবাদের নিষ্পত্তি করা কখনই সম্ভব হইবে না। কিন্তু শাসকগণ, অন্ততঃ যাঁহারা ভারতের শাসন নীতির পরিচালক, তাঁহারা তাহা করিতে চাহেন কি? তাহা করিতে হইলে সম্প্রদায়ভেদে অধিকার-ভেদের ব্যবস্থা রহিত করাই সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। লায়নেল কার্টিসের ন্যায় বৃটিশ সরকারের সমর্থক ব্যক্তিও বলিয়াছেন,—“যত দিন স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী থাকিবে, তত দিন ভারত কখনই জাতীয় ভাবে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে না। উহা যত অধিক দিন থাকিবে, ততই উহার উচ্ছেদ দুঃসাধ্য হইবে। অবশেষে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইবে যে, গৃহ-যুদ্ধ ব্যতীত উহার উচ্ছেদসাধন সম্ভব হইবে না।” মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে ঐরূপ কথা আছে। সার জর্জ্জ শুষ্টারও এই বিতর্কে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন ভারতের ‘ব্যুরোক্র্যাট’; সুতরাং ব্যুরোক্রেসীসুলভ মনোভাব তিনি কিরূপে বর্জ্জন করিবেন? এ অবস্থায় তাঁহার উক্তির আলোচনা করা স্থান ও সময়ের অপব্যবহার মাত্র। সার ষ্টান্লী রীডকে ভারত-সমস্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ওয়াকিবহাল বলিয়া মনে হয়। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, “কেবলমাত্র কংগ্রেস এবং মস্লেম লীগকে সমগ্র ভারতের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করা ইংরেজের মারাত্মক ভুল। তবে কংগ্রেস যে ভারতের সার্ব্বজনীন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহাকে অগ্রাহ্য করিলে ভুল করা হইবে।” সার জন রীড আরও বলেন যে, ভারতের মুসলমানগণ সকলেই মস্লেম লীগ কর্ত্তৃক সমর্থিত পরিকল্পনা চাহে না। প্রকৃত পক্ষে, কোন চিন্তাশীল মুসলমানই লীগের সমর্থন করেন বলিয়া মনে হয় না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে খেলাফৎ আন্দোলন রহিত হইলে এই লীগটি লাহোরে পুনর্গঠিত হয়; তদবধি মিঃ মহম্মদ আলী জিন্নাই উহার যথাসর্ব্বস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া ‘একশ্চন্দ্র তমো হন্তি।’ সুতরাং উহার প্রকৃত মূল্য অবধারণ করা কাহারও পক্ষে কঠিন হইতে পারে না; তবে এই সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার ফলেই ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই লীগের নর্ত্তন-কুর্দ্দন বাড়িয়া চলিয়াছে। লীগ অন্য সকল সম্প্রদায়ের মুসলমানদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করিয়া ‘আপনি মোড়ল’ সাজিয়াছে। সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা লুপ্ত হইলে আর লীগের অস্তিত্বও থাকিবে না। সুতরাং লীগ স্বীয় অস্তিত্বরক্ষার জন্য সাম্প্রদায়িকতা ছাড়িবে না, ছাড়িতে পারিবে না, এবং কংগ্রেসে লীগে মিলনও কদাচ সম্ভব হইবে না।

—

মিষ্টার আমেরী ও গান্ধীজী

বৃটিশ পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী ভারত সম্বন্ধে যে অসার বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা পাঠে গান্ধীজী ব্যথিত হইয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার অন্তর্ব্বেদনার গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধীজী সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতেই অত্যন্ত সংযত ভাষাতেই মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহার উক্তির সর্ব্বত্রই বিষাদ এবং ক্ষোভ বিশেষ ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। উহার কোন কোন কথা প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হইয়াছে। আমরা এখানে কেবল কয়েকটি বিশেষ কথারই উল্লেখ করিতেছি।

তিনি বলিয়াছেন, “বিপদ মানুষের হৃদয়কে কতকটা কোমল এবং মনকে প্রকৃত তথ্যের দিকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু বৃটেনের দুঃখ মিষ্টার আমেরীর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই; উহা তাঁহার মনকে সম্পূর্ণ উদাসীনই রাখিয়াছে।” তাঁহার সেই ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়াই গান্ধীজীর মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, “বহুবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে অবিচলিত থাকিতেই হইবে।” ভারত-সচিবের এই প্রকার হৃদয়হীন ঔদাসীন্য দেখিয়া লোকের মনে ধারণা জন্মিয়াছে,—যাহাই হউক না কেন, বৃটিশ সরকার—অন্ততঃ, বর্ত্তমান বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতবাসীর জন্য এখন কোন উল্লেখযোগ্য সুবিধার ব্যবস্থা করিতে সম্মত নহেন। গান্ধীজীকে সেই জন্যই এত অধিক বিচলিত হইতে হইয়াছে। আজ মিষ্টার আমেরীর এই বক্তৃতা পাঠে আসমুদ্রহিমাচল ভারতে যে অসন্তোষের উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গান্ধীজী মুক্তকণ্ঠেই বলিয়াছেন, “ভারতে যে তথ্য স্পষ্টতঃ [illegible], তাহাকে অস্বীকার করিয়া মিঃ আমেরী গ্রেট বৃটেনের কোন উপকারই করেন নাই।” বস্তুতঃ, উপকার ত করেনই নাই, বরং তথ্য অস্বীকার করিয়া গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণের মনে হয় ত ভ্রান্ত বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি জাঁক করিয়া শান্তির কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত দিকে দিকে দেদীপ্যমান! পূর্ব্ব বঙ্গে, বোম্বাইয়ে, আমেদাবাদে, কাণপুরে—সেই শান্তির স্বরূপ পূর্ণমাত্রায় স্বপ্রকাশ! মিষ্টার আমেরী ভারতের যে সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে গান্ধীজী বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে ইহা স্পষ্টই বলিতেছেন যে, “ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী দিনের পর দিন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের উদরে পর্য্যাপ্ত অন্ন নাই, কটিতে বস্ত্র নাই।” তাঁহার এ কথা আদৌ কি মিথ্যা না অতিরঞ্জিত? তিনি আরও বলিয়াছেন, “ভেদনীতিই ভারতীয় শাসকদিগের শাসননীতির মূলমন্ত্র। যত দিন বৃটিশের তরবারি ভারতকে অধীনতা-পাশে বদ্ধ রাখিবে, তত দিন এই ভেদ বর্ত্তমান থাকিবে।” বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের সম্বন্ধে তিনি খুব সংযত ভাবেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “ঐ সচিবমণ্ডলী ভারতে বৃটিশ-প্রদত্ত স্বায়ত্ত-শাসনের স্বরূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন। সচিবগুলি যেখানে অন্যের কর-পরিচালিত ক্রীড়া-পুত্তলিকা, সেখানে এইরূপই ঘটিবে—তা তাঁহারা কংগ্রেসের লোকই হউক, আর লীগের লোকই হউক—বা অন্য কোন দলেরই লোক হউক। যেখানে সত্যের অপলাপ করা হয়, সেখানে সকল কথার জবাব দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।” সেই জন্যই বোধ হয়, গান্ধী মহাশয় অল্প কথায় তাঁহার মন্তব্য শেষ করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যের পর আর কিছুই বলিবার নাই।

—

ধাত্রীবিদ্যা-বিষয়ক সম্মেলন

গত চৈত্র মাসের শেষে ইষ্টারের ছুটী উপলক্ষে কলিকাতায় ডাক্তার এন, এ, পুরানদারের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত ধাত্রীবিদ্যা-বিষয়ক সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে ইহার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়;

কলিকাতার ধাত্রীবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

ডাক্তার শ্রীযুত প্রবোধ দাস এই প্রসঙ্গে বলেন,—

কোন জাতির উন্নতি-সাধন করিতে হইলে সন্তানের জননীর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেরূপ প্রয়োজন, সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতিও সেইরূপ লক্ষ্য রাখিতে হয়, এবং এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্যই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতে চারিটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। নিখিল ভারতে যাঁহারা ধাত্রীবিদ্যা ও প্রসূতির কল্যাণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, এই বার্ষিক সম্মেলনে তাঁহারা মিলিত হইয়া থাকেন। মাতৃত্ব ও শিশুকল্যাণই এই সমিতির প্রধান আলোচ্য বিষয়। সভায় সম্মিলিত হইয়া কেবল বক্তৃতা দ্বারা কর্ত্তব্য শেষ না করিয়া যাহাতে দেশের মধ্যে প্রকৃত কায হয়—তদ্বিষয়ে সমিতির বিশেষ লক্ষ্য আছে।

কলিকাতায় যখন এই সমিতির অধিবেশনের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল, সেই সময় কলিকাতা-কর্পোরেশনের প্রচার-বিভাগ যাহাদের মৃত্যু-সংবাদ প্রেরিত হয়, কেবল তাহাদেরই সংখ্যার হিসাব থাকে, অধিকাংশ প্রসূতি ও শিশুর মৃত্যু-সংবাদ তাঁহারা জানিতে পারেন না; কিন্তু ইহাদের সংখ্যা যে অত্যন্ত অধিক—এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু কিরূপে বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার উন্নতি হইতে পারে? ইহার প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণ করিতে না পারিলে প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। ভারতে গ্রামের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে—সমগ্র ভারতে নগরের সংখ্যা দুই হাজার হইলেও গ্রামের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। কিন্তু পল্লীগ্রামে জীবন-যাপনের ধারা নগরের ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

বড় বড় প্রাদেশিক নগরে স্থানীয় মিউনিসিপালিটীই প্রসূতি-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহা পরিচালিত করেন; এতদ্ভিন্ন, সরকার ও জনসাধারণও এই সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যয়-নির্ব্বাহে সাহায্য করেন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে যে সকল প্রসূতি-আশ্রম



সার কেদারনাথ মাতৃ-হাসপাতাল

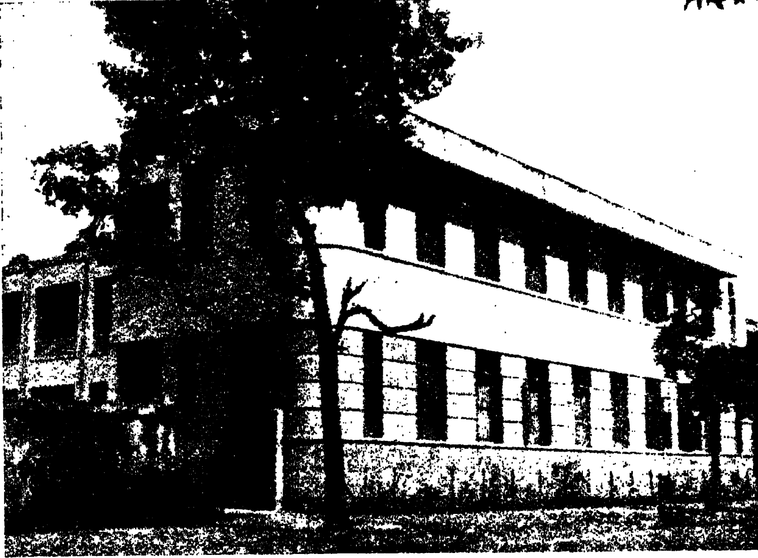
ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মাতৃত্ব ও শিশু-কল্যাণ সম্বন্ধে একটি প্রদর্শনী খুলিবেন। সেই সময় স্থির করা হয়—এই সমিতির অধিবেশন ও উক্ত প্রদর্শনী একই সময়ে আরম্ভ করাই বাঞ্ছনীয়। কর্পোরেশনের প্রচার-বিভাগের প্রধান কর্ম্মীর চেষ্টায় এই ইচ্ছা ফলবতী হয়। বোম্বাই-এর সার মঙ্গলদাস মেটা ইহার উদ্বোধন করেন। সার মঙ্গলদাস বোম্বাই প্রদেশে মাতৃত্ব ও শিশু-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের উৎসাহদাতা কর্ম্মী। এ পর্য্যন্ত তিনি এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

সমগ্র ভারতে প্রসূতি ও নবপ্রসূত শিশুগণের মৃত্যুর যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহা নির্ভরযোগ্য নহে; কারণ, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের কতকগুলি য়ুরোপের নারী-হাসপাতাল সমূহের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলেই দেশের অধিকাংশ লোকের বাস, অথচ পল্লীগ্রামের মাতৃ-আশ্রম সমূহের অবস্থা তুলনায় কি শোচনীয়!

হাসপাতাল দূরের কথা, পল্লীগ্রামে গর্ভিণীর সন্তান-প্রসবের সময় তাহারা প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রায় কিছুই পায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার এবং স্বাস্থ্যকর স্থানের অভাবে পল্লীগ্রামের প্রসূতিগণের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া থাকে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য। দারিদ্র্যনিবন্ধন প্রসূতি প্রাণরক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর দ্রব্য কিছুই খাইতে পায় না। তাহাদের

নব-প্রসূত সন্তানগণও অনেক সময় আহারাভাবেই মারা যায়। এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া ভারতের দূরতম পল্লীরও প্রসূতি ও শিশুগণের প্রকৃত কল্যাণ সাধনই এই সমিতি-সংগঠনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় কি? সরকারী সাহায্য ভিন্ন



শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

দেশের যে কোন অনুষ্ঠান—তাহার উদ্দেশ্য যতই সাধু হউক—বিফল হইবেই।

কলিকাতা-কর্পোরেশন প্রসূতি-কল্যাণ ও শিশুমঙ্গল-সংক্রান্ত যে প্রদর্শনী স্থাপন করিয়াছিলেন, জনসাধারণের হৃদয়ে আগ্রহ ও সহানুভূতির উদ্রেকের জন্য এই প্রকার প্রদর্শনীর উপযোগিতা স্বীকার করিতেই হইবে। ক্রমান্বয়ে জিলায় জিলায় এইরূপ প্রদর্শনী স্থাপনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অল্পশিক্ষিত নর-নারীরা ছবি, মডেল, নক্সা প্রভৃতির সাহায্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। যে সকল ক্ষতি প্রতিকারসাধ্য, তাহার প্রতিকারেরও ব্যবস্থা হইবে।

এতদ্ভিন্ন, ভ্রাম্যমান চিকিৎসাগারের সাহায্যে গ্রামবাসীরা ইহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিবে, তাহাদের অন্ধনয়ন উন্মীলিত হইবে; অথচ এই কার্য্য তেমন অধিক শ্রমসাধ্য নহে। শকটে, মোটরে, বা বোটে যাতায়াতেই ইহা লইয়া যাওয়া হউক, পরীক্ষা করিয়া দেখাইবার সুযোগ থাকা উচিত। এই সঙ্গে এক জন পরীক্ষোত্তীর্ণা মেয়ে-ডাক্তার ও ৪ জন শিক্ষিতা ধাই থাকা আবশ্যক। এই সকল ধাই কেবল যে ডাক্তারকেই সাহায্য করিবে এরূপ নহে, গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া আসন্নপ্রসবা নারীগণের প্রসবেও সাহায্য করিবে। এই ভ্রাম্যমান চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান যে স্থানে নীত হইবে, সেখানে সকালে যথারীতি রোগীর পরীক্ষাদি চলিবে, সায়ংকালে সিনেমার দৃশ্য, লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা স্থানীয় জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করা হইবে।

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কোন কোন বৃহৎ নগর ভিন্ন অধিকাংশ স্থলেই প্রসূতি-কল্যাণসংক্রান্ত সেবা-কার্য্যের পরিমাণ নিতান্তই অল্প। পূর্ণগর্ভা নারীর সাহায্যের জন্য বিশেষ কিছুই করা হয় না। সরকার হইতে কতকগুলি ধাত্রী ও সাধারণ ধাইকে শিক্ষাদান করিয়া তাহাদিগকে গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করিলে জন-সাধারণ তাহাদের উপযোগিতা বুঝিতে পারে, এবং ভবিষ্যতে এই অভাব দূর করিবার জন্য তাহাদের মনে আগ্রহের সঞ্চার হইতে পারে।

সাধারণ ধাইরাই ভারতের সর্ব্বত্র অধিকাংশ 'পোয়াতি খালাস' করে। কিন্তু তাহারা ধাত্রীবিদ্যায় সুশিক্ষিত নহে, এবং এই গুরু দায়িত্বভার বহনোপযোগী সাধারণ শিক্ষাও তাহাদের নাই। এইজন্য তাহাদের কার্য্যের ফল প্রসূতি ও প্রসূত সন্তানের পক্ষে সন্তোষজনক হয় না; বরং উহাদের হাতে পড়িয়া তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্টই হইয়া থাকে। তাহাদের কল্যাণের আশা ত্যাগ করিতে হয়। বস্তুতঃ, এই কার্য্যে ধাইএর সাহায্য যখন অপরিহার্য্য, তখন তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া না লইলে কল্যাণের আশা নাই।

বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি সম্মেলন

গত ২০শে বৈশাখ শনিবার মহাবোধি সোসাইটীর হলে কুমার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহের সভাপতিত্বে বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন-বক্তৃতায় রামানন্দ বাবু বলেন যে, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি একই অর্থবোধক। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্টি শব্দ ইংরেজী culture শব্দেরই বাঙ্গালা প্রতিশব্দরূপে রচিত এবং ব্যবহৃত হইতেছে। সংস্কৃত কৃষ্টি শব্দে পণ্ডিতও বুঝায় এবং কর্ষণও বুঝায়। ফলে উপমার দিক দিয়া উহা তপস্যার দ্বারা মানসিক উন্নতি বুঝায়—অর্থাৎ উহা মনের চাষ। এই হিসাবে উহা culture শব্দের প্রতিশব্দ। কিন্তু 'সংস্কৃতি' শব্দ নানা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সে তর্ক এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত কর্ম্মই সংস্কৃতি (সম্+কৃ+ক্তি ভাব বাচ্যে) সংস্কার ও সংস্কৃতি শব্দের অর্থ হইতে ইহাই উপলব্ধ হয় যে, বিষয়ের বিকাশ-সাধনই সংস্কার। কার্য্য বা অবস্থাই সংস্কৃতি। ভাষার মজ্জাগত

ভাবের পরিবর্তন বা বিনাশসাধন না করিয়া উহার বিকাশ এবং সৌষ্ঠবসাধনই ভাষার সংস্কৃতি। ভাষাকে একেবারে মথি-লিখিত সুসমাচারের ভাষায় পরিণত না করিয়া উহার মৌলিকত্ব বজায় রাখিয়া উহার উৎকর্ষসাধনই ভাষার প্রকৃত সংস্কৃতিসাধন। রামানন্দ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, মনের আবাদই কৃষ্টি বা সংস্কৃতি। উহাই সভ্যতা। বাঙ্গালা ভাষার এবং সাহিত্যের নিজস্ব ঠিক অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার প্রসাধন এবং বিকাশসাধনই বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি সম্মেলনের লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়। ভাবই ভাষার সম্পদ। ভাষাকে ভাবসম্ভারে সমৃদ্ধ করিতে হইবে; অন্য ভাষার বচনভঙ্গীর অক্ষম অনুকরণে ভাষার সম্পদ বর্দ্ধিত হইবার আশা নাই।

বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি কুমার শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহা যথাসময়ে দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অভিভাষণে বিশেষ কোন নূতন কথা না থাকিলেও তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গি প্রশংসনীয়। তিনি প্রথমেই বলেন, "বিবর্ত্তনের ধারা সব সময়েই 'অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবং' —তার অতীতই তার ভবিষ্যৎকে রূপ দিয়েছে। সে কারণে আমাদের ভবিষ্যৎ সমস্যাগুলির আলোচনার সঙ্গে অতীতের আলোচনা অবশ্যম্ভাবী।" বস্তুতঃ, ইহাই তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণের মেরুদণ্ড। এই অভিভাষণে তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—"আমাদের ভাষা আমাদের সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার সুষ্ঠু 'প্রকাশ দেওয়ার কর্ত্তব্যে' (বিকাশসাধনে?) আত্মনিয়োগ করেছে কি না, এবং আমাদের ক্রমিক আত্মবিকাশের পথে যে সহায়বাণী আমরা পেয়েছি, সেই বাণী প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সামর্থ্য তার কতটুকু। প্রথমটিতে আমাদের অতীতের পরিচয়, দ্বিতীয়টিতে আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার আলোচনা।"—আমাদের মনে হয়, সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে 'কেতাবি' ভাষা ব্যবহার করিলে বর্ণনা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও বিষয়োপযোগী হইত। 'আলালী' ভাষা যতই সরল ও সহজবোধ্য হউক, সে ভাষা 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার উপযোগী নহে। ভাবের সহিত ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা সর্ব্বত্রই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আজকাল বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ ভাষার গাম্ভীর্য্য ও রচনার মর্য্যাদা সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন। সাহিত্য হইতে কি সাধুভাষা বর্জ্জিত হইবে?

কিন্তু আমাদের প্রধান কথা এই যে, বাঙ্গালার বাহিরে বিস্তর বাঙ্গালীর বাস; কিন্তু তাঁদের পুত্রকন্যাগণের মাতৃভাষা শিক্ষার পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার বাহিরের অনেক জিলার বিদ্যালয় সমূহে বাঙ্গালায় শিক্ষাদান-ব্যবস্থা বর্জ্জন করা হইতেছে। আসাম, বিহার, ও উড়িষ্যা প্রদেশের সরকার বঙ্গভাষার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার ফল প্রবাসী বাঙ্গালী বালক-বালিকাদের পক্ষে কখন কল্যাণপ্রদ হইবে না। ওদিকে কংগ্রেস হিন্দীকে সমগ্র ভারতের সাধারণ ভাষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, অথচ সমগ্র ভারতের সাধারণ ভাষারূপে গৃহীত হইবার পক্ষে বঙ্গভাষার দাবী যত অধিক—অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষার দাবী তত অধিক নহে। কিন্তু রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালীর ন্যায় বাঙ্গালীর ভাষাকেও কোণ-ঠেসা হইতে হইয়াছে। ইহার প্রতিকারকল্পে বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কেহ এই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিবে না।

দুঃখের বিষয়, উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগ হইতে এ-পর্য্যন্ত আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া যায় নাই; তাহার উপর বাঙ্গালার মুসলমান-প্রধান সচিব-সঙ্ঘ বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তকে অকারণ বঙ্গভাষা-বহির্ভূত শব্দ প্রচলনের সমর্থন করিতেছেন। প্রভাতের পরিবর্ত্তে 'ফজল', 'ডিম্বের' পরিবর্ত্তে 'আণ্ডা' মাংসের পরিবর্ত্তে 'গোস্ত' ব্যবহারের কোন সার্থকতা আছে কি? 'সমাহিত' শব্দের পরিবর্ত্তে কোন কোন খ্যাতনামা লেখক পর্য্যন্ত 'কবরিত' লিখিয়া বঙ্গভাষার বিশুদ্ধিকে 'গোরস্থ' করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। 'গোর' ও 'কবর', সাধু বঙ্গভাষায় অচল। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ভাষার এই ব্যভিচার হইতে বঙ্গভাষাকে রক্ষা করিবার ভার বাঙ্গালীকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

কলিকাতার নূতন মেয়র

আলীপুর আদালতের স্বনামধন্য সুপ্রবীণ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম এবার কলিকাতা করপোরেশনের সর্ব্বদলসম্মতিক্রমে মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এই যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন জন্য আমরা কলিকাতা-করপোরেশনকে এবং ফণীন্দ্র বাবুকে অভিনন্দিত করিতেছি। ফণীন্দ্র বাবু দীর্ঘকাল কাউন্সিলাররূপে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে পৌর-হিত-সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—তাঁহার মত জন-কল্যাণ ব্রতী বর্ত্তমান যুগে বিরল; কিন্তু কলিকাতা-করপোরেশনে যে আবর্জ্জনা-স্তূপ মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর পুঞ্জীভূত হইয়াছে, এক বৎসরের প্রচেষ্টায় তাহার সংস্কার—প্রতিবিধান করা সম্ভবপর নহে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গান্ধীজীর উপদেশ

গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কংগ্রেসকর্ম্মীদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই,—"আমার দুঃখ কিন্তু বিশেষ কারণে। বস্তুতঃ, এই দুঃসময়ে কংগ্রেসের প্রভাব যেন অনুভূত হইতেছে না। সম্পদ লুণ্ঠিত হইয়াছে, গৃহে অগ্নিদান করা হইয়াছে, নিরপরাধ নরনারী, শিশুদিগকেও হত্যা করা হইয়াছে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাণভয়ে ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। এ সকল স্থানে আমরা বর্ব্বর বা কাপুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছি। সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দাঙ্গা বা তজ্জাতীয় ব্যাপারে কংগ্রেসের প্রভাব নগণ্য।

"বিবরণ পাঠে মনে হয়, ঢাকা ও আমেদাবাদে মুসলমান ধর্ম্মোন্মাদ-গণ লুণ্ঠন ও অগ্নিদানে হিন্দুর সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া চরম অপকীর্ত্তি করিয়াছে। হিন্দুগণ শঙ্কার এলাকা হইতে সহস্রে সহস্রে পলায়ন করিয়াছে। যেখানে পলায়ন করে নাই, সেখানে আততায়ীদের মতই বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছে। ইহাদের উপর কংগ্রেসের অহিংসার প্রভাব লক্ষিত হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষ শক্তিহিসাবে কংগ্রেসের অহিংস-নীতির বিশেষ কোন মূল্য নাই বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

"আত্মশক্তিতে ইংরেজ সরকারের অদ্ভুত বিশ্বাস এবং মারণাস্ত্রের প্রয়োগ-কৌশলবলে ভারতকে তাহারা পরাধীন করিয়া রাখিতে

সমর্থ হইয়াছে। কংগ্রেসপন্থীরা অহিংস-নীতি বলিতে কি বুঝে, এইবার তাহার পরীক্ষা হইবে।

স্বাধীনতা ও অহিংস-নীতির সহিত আমার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বলিয়াই এক দিকে নাজীবাদ ও ফাসিষ্টবাদের সহিত ও অন্য দিকে অপরকে পদানতকারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত আমাকে সংগ্রাম করিতে হইবে। সকলেই জানেন, বাস্তব ক্ষমতা হস্তচ্যুত করিবার জন্য ইংরেজের পক্ষ হইতে সামান্য চেষ্টাও কখন হয় নাই। কংগ্রেস, মসলেম লীগ বা হিন্দু-মহাসভা যিনিই সংগ্রাম করুন, হিংস বা অহিংস পন্থায় এ জন্য আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে।

"কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা-পন্থী প্রতিষ্ঠান কখন স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিবে না। কংগ্রেস তাহার দায়িত্ব-পালনের উপযুক্ত না হইলে তাহার এ চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

"আপনার প্রাণ-রক্ষার জন্য অথবা বিপন্নগণের রক্ষার নিমিত্ত কোন পক্ষে যোগদানের প্রস্তাব কংগ্রেসপন্থীকে দৃঢ় ভাবে ও অহিংস ভাবে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। কাপুরুষরা শান্তি আনিবে না, স্বাধীনতাও আনিবে না। সুতরাং কংগ্রেস-পন্থীকে ইহাই জনসাধারণকে বলিতে হইবে যে, বিপদ দেখিয়া পলায়ন করিও না। কংগ্রেসের পন্থায় চলিতে না পার—যেরূপে পার আত্মরক্ষা কর; চাই মাত্র বীরহৃদয়। এই সাহস ও বীরত্ব কেহ দান করিতে পারে না, কখন হরণ করিতেও পারে না। কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অলক্ষ্যে হত্যা করায় বা তাহার সম্পত্তি দগ্ধ করায় বীরত্ব নাই। যাহারা এরূপ করে, তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মকে কলঙ্কিত এবং স্বাধীনতার সকল চেষ্টা পণ্ড করে।

"ইংরেজের নিকট হইতে নির্ব্বিচারে প্রাণ ও সম্পদ বিসর্জ্জনের কৌশল শিক্ষা করিতে হইবে। আমাদের সম্পূর্ণ নিরপরাধ কয়েক জন প্রাণ দান করিয়া ভারতীয় মানবতাকে স্তম্ভিত না করা পর্য্যন্ত পরমত-সহিষ্ণুতা ও পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যশীলতার কৌশল আমরা কখন শিখিতে পারিব না। কোন জনতা কোন সম্প্রদায়ের সম্পত্তিতে অগ্নিদান করিতে, বা কোন মন্দির অথবা মসজেদ কলুষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে জনতার উন্মাদনা নষ্ট করিবার জন্য এক বা একাধিক কংগ্রেস-কর্ম্মীকে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে হইবে। কোন লোক কোন পথচারীকে ছোরা মারিবার চেষ্টা করিলে কংগ্রেসপন্থীকে প্রাণ বিপন্ন করিয়াও আক্রমণকারীর হস্ত হইতে ছোরা কাড়িয়া লইতে হইবে।

"এ সকল উদাহরণ পাঠ করিয়া কংগ্রেসপন্থীরা হয় ত বলিবেন, ইহা অসম্ভব—কিন্তু হিংসা বা অহিংস পন্থায় স্বাধীনতা অর্জ্জন ব্যাপারটি অধিকতর অসম্ভব। কিন্তু যাহাদিগের বিশ্বাস কম, তাহাদের যাহা অসম্ভব মনে হয়, বিশ্বাসীর নিকট তাহা সম্ভবপর হইবে। উপযুক্ত ও পর্য্যাপ্ত আত্মবলি, বীরত্ব ও আত্মশক্তিতে আস্থা ব্যতীত স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য কিছুই সম্ভবপর নহে।"

কিন্তু গান্ধীজী বর্ত্তমান জটিল সমস্যায় যে উপদেশ বিতরণ করিলেন, কয় জন কংগ্রেসকর্ম্মী তাহার অনুসরণ করিতে সমর্থ হইবেন? নীতি উপদেশ প্রদান করা যত সহজ, তাহা কার্য্যে পরিণত করা সেরূপ সহজ হইলে কংগ্রেস এত দিন স্বাধীনতার পথে বহু দূর অগ্রসর হইতে পারিত, এবং গান্ধীজীর উপদেশ অরণ্যে রোদনবং অনর্থক হইত না।

বাঙ্গালায় মৎস্য-বিভাগ

বাঙ্গালা সরকার এত দিন পরে আবার বাঙ্গালায় মৎস্য-বিভাগ খুলিবেন, স্থির করিয়াছেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বাঙ্গালা সরকারের মৎস্য-বিভাগ ছিল। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে সে কথার আলোচনা করিয়াছি। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ব্যয়-সঙ্কোচসমিতির সুপারিস অনুসারেই এই বিভাগটি বাতিল করা হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালার বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলী এই বিভাগ পুনর্ব্বার খুলিবার জন্য কিঞ্চিৎ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ফলে এই বিভাগের উন্নতিকল্পে এবারকার বাজেটে ৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। ইহা প্রতপ্ত মরুবক্ষে কয়েক বিন্দু শিশির-সেকের ন্যায় বিফল হইবে, সন্দেহ নাই। শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, এই বিভাগটি সংগঠনের জন্যই বাঙ্গালা সরকারকে সাড়ে ৫২ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইবে; বাকী ২৭ হাজার টাকা ত বেতনাদি-সংক্রান্ত সরঞ্জামী খরচে ব্যয় করিতেই হইবে। তাহার পর শূন্য ঝুলি ঝাড়িয়া কি লাভ হইবে? মৎস্য-চাষে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নাইডু বলিয়াছেন, পুকুরে তিনি ইলিশ মাছের চাষ না করিয়া ছাড়িবেন না। ইহাতে মৎস্যাশীদিগের কি কোন রকম সুবিধা হইবে? নদীতে ত ইলিশবংশ ধ্বংসোন্মুখ; তাহা রক্ষার কোন ব্যবস্থা হইতেছে কি? শুনিতেছি, সরকার নদীগুলিতে মাছ ধরিবার অধিকার একচেটিয়া করিয়া রাখিবেন। এবার কি তবে মেছো-হাটেও তাঁহাদের কলকণ্ঠ-ধ্বনি শুনিতে পাইব? এত কাল ওটা মেছুনী-দেরই একচেটিয়া ছিল। তাহাদের কণ্ঠ-ঝঙ্কারে ভদ্রলোকের সে-দিকে ঘেঁসিবার উপায় ছিল না; এবার অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে?

ভারতে মোটরগাড়ী-নির্ম্মাণ

ভারতে মোটর-গাড়ী, লরি প্রভৃতির নির্ম্মাণোপকরণের অভাব নাই। এ-দেশে লৌহ এখন যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে,—ইস্পাতও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। শ্রমিকেরও অভাব নাই। উহাদিগকে এই বিদ্যায় শিক্ষাদান করিতে পারিলে, অতঃপর যথাযোগ্য মূলধন সংগৃহীত হইলেই মোটর-গাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করা সুসাধ্য হইতে পারে। উৎকৃষ্ট মোটর-গাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারিলে লাভও অল্প হইবে না। এই সকল কারণে শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ নামক কর্ম্মী বাঙ্গালোরে মোটর-গাড়ী নির্ম্মাণের জন্য একটি কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু এই পরি-কল্পনার কথা প্রচারিত হইবার পর হইতেই বিদেশী মোটর-গাড়ীর কারখানার পক্ষ হইতে লোক আসিয়া প্রচার করিতেছে, 'ভো ভো, সাধু সাবধান! এই কোম্পানী-সংগঠনে কেহ সহজে অর্থদান করিও না। কারণ, এ দেশে মোটর-গাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা লাভজনক হইবে না,—টাকার মালিকগণ, তোমাদের সব টাকাই জলে পড়িবে'—ইত্যাদি। বাঙ্গালায় একটা প্রবচন আছে, 'শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল'! ইহাদের সতর্কতার বাণী শুনিয়া অনেকেরই সে কথা মনে পড়িবে। এ-দেশে যখন টাটার লৌহ-কারখানা স্থাপনের কল্পনা হইয়াছিল, তখনও এই রকম এক-দল লোক বিদেশ হইতে এ-দেশে আসিয়া গায়ে-পড়িয়া এইরূপ

হিতৈষী সাজিয়াছিল; বলিয়াছিল, 'নিশ্চিন্ত মনে ও নিরাপদে কোম্পানীর কাগজের সুদভক্ষণ করিতেছ, সে পথ ছাড়িয়া টাকাগুলা জলে ফেলিও না।'—তাহার পর টাটার ব্যবসায়ের ফল কি হইয়াছে, সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

ভারতে প্রতিবৎসর বহু লক্ষ টাকার মোটর-গাড়ী বিক্রীত হইতেছে। তাহা নির্ম্মাণ করিয়া বিদেশী মোটর-কারখানাওয়ালারা বিপুল অর্থ লাভ করিতেছে। এ-দেশে মোটর-গাড়ীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের পকেট পূর্ণ করিবার সুযোগ নষ্ট হইবে; সুতরাং হঠাৎ এ ভাবে তাহাদের শিরঃপীড়ার আবির্ভাব অকারণ নহে। কিন্তু মার্কিণের ফোর্ড কোম্পানীর বিশেষজ্ঞগণ ইহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন,—শেঠজীর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে তাঁহার চেষ্টা নিশ্চিতই সফল হইবে।—প্রস্তাবিত ব্যবসায়ের মূলধন এখন সওয়া-দুই কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। এখন সতর্ক ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলে কোম্পানীর কার্য্য সফল এবং লাভজনক হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। এই নব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তৃগণ এই সকল 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের' কথায় নিরুৎসাহ হইবেন না—এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।

—

লীগের স্বরূপ

মিষ্টার আমেরী মিষ্টার জিন্নাকে এবং তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার বাহন মস্লেম লীগকে কাঁধে তুলিয়া উৎসাহভরে যতই নৃত্য করুন, উহার স্বরূপ বুঝিতে দেশের কাহারও বাকি নাই। সে দিন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খাঁ সাহেব মস্লেম লীগ সম্বন্ধে মুসলমানদিগের প্রকৃত ধারণার কথা স্বল্প কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"আমাকে যদি কেহ মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও আমি লীগের ন্যায় অকর্ম্মা এবং নাটুকেপণার সহিত চীৎকারে অভ্যস্ত লোকদিগের দলে যোগ দিব না।" লীগের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা খাঁটি কথা কেহ বলিয়াছেন বলিয়া আমাদের স্মরণ হয় না। তিনি আরও বলেন, "পাঠানরা বচন চাহেন না, তাঁহারা চাহেন কাষ, স্বার্থত্যাগ এবং স্বার্থহীন সেবা। মস্লেম লীগের সদস্যগণের মধ্যে তাহা পাওয়া যায় কি?" লীগের একটা গঠনের নিয়ম পর্য্যন্ত নাই। একই ব্যক্তি—মিঃ জিন্নাই মৌরুশী পাট্টা লইয়া উহার সভাপতিত্ব করিয়া আসিতেছেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে লীগের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহা কোন উল্লেখযোগ্য কাষই করিয়া উঠিতে পারে নাই। কখনও ইহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, কখনও তাহা 'খুঁজিয়া দেখিতে গেলে চক্ষে ধরে ঝিনি!' শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ, উত্তর-পশ্চিম এবং সিন্ধুর অধিবাসিগণ, বাঙ্গালার প্রজাদল, মোমিন, অরহর, জমিয়েৎ-উলেমা সম্প্রদায়ের কোটি কোটি মুসলমান এবং কংগ্রেসের মুসলমানগণ মস্লেম লীগকে আমোল দিতে রাজী নহেন। তথাপি ভারত-সচিব, বড় লাট, এবং এক শ্রেণীর ইংরেজ রাজনীতিক লীগের গৌরব ব্যাখ্যান করিতে আলস্য বোধ করেন না। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য ঐ সকল রাজনীতিকের জিদের মূল্য কি, সুস্থ প্রকৃতির কোন লোকেরই তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইতে পারে না।

—

গুণ্ডামী ও দাঙ্গা

ঢাকায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা কত দিনে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইবে, তাহা বলা যায় না। বাঙ্গালার গবর্ণর সার জন হার্বার্ট অনেক চিন্তার পর বোম্বাই লাটের অনুকরণে ঢাকায় গিয়া স্বয়ং অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। এই দাঙ্গায় কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হয় ত তিনি বুঝিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু দাঙ্গার প্রকৃত কারণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কতখানি সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা এখনও প্রকাশ নাই। ও-দিকে পশ্চিম-ভারতের আমেদাবাদেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে বহু লোক হতাহত হইয়াছে। এই দাঙ্গার কারণ অতি তুচ্ছ। জনরব উঠে, শিখরা বাদ্যভাণ্ডসহ এক মিছিল লইয়া স্থানীয় জুম্মা মস্জেদের সম্মুখ দিয়া যাইবে। এই জনরবেই কতকগুলি লোক ক্ষেপিয়া উঠে; এবং এইরূপেই দাঙ্গার উদ্ভব হইয়াছিল। স্থানীয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছিলেন যে, ঐরূপ মিছিল বাহির করিবার জন্য শিখরা অনুমতি চাহে নাই; শিখদিগের সর্দ্দারগণও বলিয়াছেন, তাঁহারা কোন মিছিল বাহির করিবার সঙ্কল্পও করেন নাই। তথাপি গুণ্ডাদের আক্রমণ রহিত হয় নাই। গৃহে গৃহে অগ্নিদান, লুণ্ঠন, হঠাৎ আক্রমণ ও ছুরিকাঘাত, প্রভৃতি গুণ্ডাসুলভ কোন অত্যাচার বাদ যায় নাই। প্রকাশ—৭০ জনের অধিক লোক এই দাঙ্গায় নিহত, এবং ৪ শতেরও অধিক লোক আহত হইয়াছে। এই প্রদেশ এখন প্রত্যক্ষতঃ গবর্ণরেরই শাসনাধীন; সুতরাং কোন অর্ব্বাচীন হয় ত প্রশ্ন করিতে পারে, এইরূপ অকারণ দাঙ্গার উদ্ভব শাসকদিগের পক্ষে কি প্রশংসার কথা? বোম্বাই সহরেও অতি তুচ্ছ কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়া যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, ঐ দাঙ্গায় ১৫ জন হত, এবং তাহার দশ গুণ—দেড় শত লোক আহত হয়। তাহার পর কিছু দিন ধরিয়া খুন ও জখম যেন সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল! হতাহতের সংখ্যা দিন দিনই বর্দ্ধিত হইয়াছে। পশ্চিমের হাওয়া কি পূর্ব্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে? তাই কি বিহার সরিফ হইতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর আসিয়াছে? বোম্বাই অঞ্চলে এখনও ধর-পাকড় চলিতেছে। গুণ্ডার দল আচম্বিতে আসিয়া লোকের বুকে-পিঠে ছোরা চালাইতেছে! সর্ব্বত্রই শান্তিভঙ্গের ভীষণ আতঙ্ক! কলিকাতা সহরেও দাঙ্গা বাধিবার গুজব রটিয়াছিল; কিন্তু পুলিশ কমিশনরের সতর্কতা ফলপ্রদ হইয়াছিল; তাঁহার পক্ষে ইহা প্রশংসার কথা। এ-দেশে এই অবস্থা, আর ও-দিকে ভারত-সচিব মিঃ আমেরী ভারতের শান্তির স্বপ্নে বিভোর হইয়া পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় বক্তৃতার যে ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন, তাহাতে সদস্যমণ্ডলীকে ভিজিয়া ভিজে-বিড়ালের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয় নাই কি?

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



২০শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ [২য় সংখ্যা

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর

(৭)

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, কুমারিল-ভট্ট ও তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত মীমাংসকগণ নিরীশ্বরবাদের প্রচারক ছিলেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রভাকর-গুরুর মত কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

'প্রকরণপঞ্চিকা' নামক প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। সে আলোচনা মূলতঃ কুমারিল-রচিত শ্লোকবার্ত্তিকস্থ আলোচনার অনুরূপ। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, প্রকরণ-পঞ্চিকায় ঈশ্বরের অস্তিত্বনিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিলে ধরা পড়ে যে, সে নিষেধের তাৎপর্য্য অন্যরূপ। শব্দার্থ-সম্বন্ধ নিত্য নহে, কৃতক — নৈয়ায়িকগণের এই সিদ্ধান্তের খণ্ডন-প্রসঙ্গেই প্রৌঢ়িবাদ-রূপে ঈশ্বরের নিষেধ করা হইয়াছে, ঈশ্বরনিষেধের উদ্দেশ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই। প্রকরণপঞ্চিকার 'নির্ম্মলাঞ্জন' নামক সপ্তম প্রকরণের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার শালিকনাথ মিশ্র এ সম্বন্ধে প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"তত্র শব্দার্থসম্বন্ধং পৌরুষেয়ং প্রচক্ষতে।
জগদীশ্বরনির্ম্মাণং বদন্তো বেদবাদিনঃ॥"

(প্রঃ পঃ, ৭ম প্রকরণ)

ইহার ভাবার্থ এই যে—'যে সকল বেদবাদী আচার্য্য জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বলেন—শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ পৌরুষেয় বা কৃত্রিম অর্থাৎ নিত্য নহে'। যদি একবার স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, সমগ্র জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট, তাহা হইলে—শব্দ, অর্থ ও শব্দার্থের সম্বন্ধও যে তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট—তাহা স্বীকার করিতে আর, কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। কিন্তু প্রাভাকর-সম্প্রদায়ভুক্ত মীমাংসকগণ শব্দার্থসম্বন্ধ যে কৃতক—এই সিদ্ধান্তখণ্ডনে বদ্ধপরিকর। আর এই খণ্ডন-প্রক্রিয়ার ভিত্তিস্বরূপে তাঁহারা প্রথমেই ঈশ্বরের জগৎ-স্রষ্টৃত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক-গণের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে শব্দার্থ-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন—অমুক শব্দ হইতে অমুক অর্থের বোধ জন্মিবে; অর্থাৎ এক কথায় ন্যায়-বৈশেষিক-মতে শব্দার্থ-সম্বন্ধ কৃতক। এই সিদ্ধান্তটিকে কুমারিল

শ্লোকবার্তিকের সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার প্রকরণে যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, প্রকরণপঞ্চিকার নির্ম্মলাঞ্জন প্রকরণে শালিকনাথও অনুরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বনে উক্ত সিদ্ধান্তটির খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ঈশ্বর নাই—ইহা প্রতিপাদন করাই প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু পাছে ঈশ্বরকে জগৎ-স্রষ্টা বলিলে জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত শব্দার্থসম্বন্ধও তৎ-কৃত বলিয়া স্বীকৃত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় প্রাভাকর-গণ ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। যদি আমরা মানিয়া লই যে, শব্দার্থ-সম্বন্ধ নিত্য—ঈশ্বরকৃত নহে, তাহা হইলে প্রাভাকরমতেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে অন্য কোনরূপ বাধা জন্মিতে পারে না।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা মহোদয় প্রাভা-কর-সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, এই সম্প্রদায়েও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে ইহাতে সৃষ্ট্যতীত ঈশ্বরের স্থান নাই (১)। আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, ঝা মহো-দয়ের উক্তি কতটা যুক্তিসহ।

যদি প্রাভাকর-সিদ্ধান্তে সত্য সত্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরাকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত সম্প্রদায়কে 'নাস্তিক' বা 'নিরীশ্বর' আখ্যা প্রদান করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু প্রাভাকরমতকে নাস্তিকদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের কয়েকটি বিষয়ের যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধান করা উচিত। ইহা অবশ্যই সত্য যে, অন্যান্য আস্তিক-দর্শন-সম্প্রদায়ে ঈশ্বরসম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়, প্রাভাকর-সম্প্রদায়ে সেরূপ আলোচনা করা হয় নাই। কিন্তু কেবল এই কারণেই সম্প্রদায়টিকে নাস্তিক্যদোষে দুষ্ট বলিয়া প্রচার করাও অনুচিত।

প্রাভাকর-দর্শন যথার্থই নিরীশ্বর কি না—ইহা স্থির করিবার পূর্ব্বে উপনিষৎসম্বন্ধে প্রভাকরের অভিপ্রায় কিরূপ, তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য। কারণ, একমাত্র উপনিষৎ হইতেই ঈশ্বরসম্বন্ধে যাহা কিছু প্রামাণিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রাভাকরমতে সমগ্র উপনিষদ্ভাগই নিছক স্তুতিমূলক অর্থবাদমাত্র, অর্থাৎ উপনিষদের স্বার্থে কোনরূপ প্রামাণ্য নাই; অতএব ঈশ্বর প্রভৃতি যে সকল তত্ত্বের বিবরণ উপনিষদে আছে, সেগুলি সম্পূর্ণ নিরর্থক—অপ্রামাণিক। যদি এই মত সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বেদান্তদর্শনও (অর্থাৎ বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মসূত্র—যাহা সম্পূর্ণরূপে উপনিষদ্বাক্যাবলী অবলম্বনে রচিত—উপনিষদের ন্যায়ানুগত ব্যাখ্যাস্বরূপ) প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের নিকট নিরর্থক হইয়া উঠে। হয় ত কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাহা হইলই বা—বেদান্তদর্শনের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে প্রাভাকর-সিদ্ধান্তের ত কোন হানি হয় না; তবে আর উহাতে আপত্তির কারণ কি থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে বলা চলে যে, বেদান্ত-দর্শনের ন্যায় একটি সর্ব্বজনমান্য সুপ্রসিদ্ধ দর্শনসম্প্রদায়ের অপ্রামাণ্য একেবারে উপেক্ষার যোগ্য নহে; আর ইহাও সুবিদিত যে, প্রভাকর বেদান্তের বহু সিদ্ধান্তের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। যথার্থ কথা বলিতে কি, প্রাভাকরমতে উপনিষৎ কেবল স্তুতিপর অর্থবাদ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, অথবা বেদান্তদর্শনের প্রামাণিকতাও উপেক্ষিত হয় নাই। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য অন্তত: একটি বিষয় সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় ঝা মহোদয় এ প্রসঙ্গে আমাদিগের সহিত একমত—ইহা অনায়াসেই দেখান যাইতে পারে। ঝা মহোদয় বলিয়াছেন—'অপুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে যে সকল শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয়, সেগুলিকে অর্থ-বাদমাত্র বলিয়া গণনা করা সম্ভব নহে' (২)। এখন যদি একবার স্বীকার করা যায় যে—উপনিষদের একটি বিষয়-সম্পর্কিত কতিপয় বাক্য অর্থবাদ নহে, তাহা হইলে আর বলা চলে না যে, উপনিষদের অন্যান্য অংশগুলি অর্থবাদ। একই শ্রেণীভুক্ত কতিপয় ব্যক্তির একরূপ বৈশিষ্ট্য ও অপর কতিপয় ব্যক্তির অন্যরূপ বৈশিষ্ট্য—ইহা বলা অযৌক্তিক; তাহা হইলে বরং উক্ত দুইটি বিভাগকে পৃথক্ দুইটি শ্রেণীর অন্তর্গত করাই প্রশস্ত—উভয়কে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা অনুচিত। অতএব, ঝা মহোদয়ের স্বীকারোক্তি হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রভাকর

(১) "There is no room for an ultra-cosmic God"—Indian Thought, Vol. IV. p. 262.

(২) "The Vedic texts speaking of the 'non-return' to this world cannot be regarded as mere Arthavādas."—Indian Thought, vol. IV. p. 258.

উপনিষদের স্বার্থে প্রামাণ্য একেবারে অস্বীকার করেন নাই। উপনিষদের প্রামাণ্য যদি তিনি একবার স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে নিরীশ্বরও বলা চলে না। কারণ, সমগ্র উপনিষদের পরম-তাৎপর্য্য একমাত্র পরমেশ্বরেই সমন্বিত হইয়াছে (৩)। অর্থাৎ মোটের উপর, ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে কুমারিল ও প্রভাকরের কোনরূপ মতভেদই নাই। সমগ্র জগতের এককালীন উৎপত্তি ও প্রলয়, দেবতার বিগ্রহবত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় ভট্টপাদও যে ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন, গুরুও ঠিক অনুরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বনে সেই সেই বিষয়ের খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে মনে হয় যে, উভয় সম্প্রদায়ের নিগূঢ় উদ্দেশ্যও সম্ভবতঃ একই। ভাট্টমতের উদ্দেশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে সবিস্তরে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। অতএব, পুনরুক্তিভয়ে আর প্রাভাকর-মতের উদ্দেশ্য এস্থলে বিবৃত হইল না। কেবল এই ফলিতার্থ টুকুর পুনরুল্লেখ করা ভাল যে, উভয় মতেরই নিষ্কর্ষ হইতেছে—বেদ ঈশ্বরকৃত নহে—নিত্য; আর কর্ম্মফল অপূর্ব্বদ্বারা লাভ করিতে হয়—ঈশ্বরানুগ্রহ বা অন্য কোন কিছু ফলদানের হেতু নহে।

ভগবৎপূজ্যপাদ-শ্রীশঙ্করাচার্য্য-কৃত 'দশশ্লোকী'র ব্যাখ্যা শ্রীমধুসূদন-সরস্বতী-প্রণীত 'সিদ্ধান্তবিন্দু'র উপর শ্রীব্রহ্মানন্দ সরস্বতী 'ন্যায়রত্নাবলী' নামে যে অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের মনোভাব অতি স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন—'প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থগত উক্তি হইতে জানা যায় যে, যদিও নিষ্প্রপঞ্চস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন, তথাপি কর্ম্মপ্রসঙ্গে উহা বলা উচিত নহে; কারণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'অজ্ঞ কর্ম্মাসক্ত জনগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না' (৪)। অবশ্য ব্রহ্মানন্দ প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের কোন্ গ্রন্থে এই তথ্যটি পাইয়াছেন, তাহা বলেন নাই; কিন্তু তাঁহার ন্যায় এক জন অতি প্রামাণিক ও সাধুচরিত্রের ব্যক্তি যখন বলিতেছেন, ইহা প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের উক্তি, তখন উহাতে অবিশ্বাস করিবার কোনই হেতু নাই। আর ব্রহ্মানন্দের উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে বিনা সন্দেহে বলা চলে যে, প্রাভাকর-মতবাদ নিরীশ্বরতার প্রভাবে প্রভাবিত ছিল না। ব্রহ্মানন্দের কথায় বুঝা যায় যে, প্রাভাকর-সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ কি, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহারা বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন নাই। কারণ, ঐরূপ বিচারে কর্ম্মাসক্ত সাধারণ জনগণের বুদ্ধিভ্রংশ হওয়াই স্বাভাবিক।

ন্যায়রত্নাবলীতে সকল আস্তিকমতের বিবেচনা-প্রসঙ্গে প্রাভাকর ও ভাট্ট-সম্প্রদায়কে আস্তিক-দর্শন-কোটির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে (৫)। ন্যায়রত্নাবলী-কার ব্রহ্মানন্দের মত এক জন বিশিষ্ট আস্তিক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী যে সম্প্রদায়কে বিনা দ্বিধায় আস্তিক-বিভাগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা যে বস্তুতঃ নিরীশ্বর ছিল—ইহা বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। প্রভাকর যথার্থই নিরীশ্বরবাদী হইলে ব্রহ্মানন্দ কখনও প্রভাকর-দর্শনকে আস্তিক-দর্শন-সম্প্রদায়ভুক্ত করিতেন না। কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, ঈশ্বর না মানিলেই যে নাস্তিক হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই—বরং বেদ না মানিলেই পূরাপুরি নাস্তিক নাম কিনিতে হয়। প্রাভাকর-সম্প্রদায় বেদবিশ্বাসী, এ কারণে ঈশ্বর অস্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁহারা আস্তিক। কিন্তু এ যুক্তিও এ স্থলে অচল। কারণ, বৈশেষিকসম্প্রদায় শব্দপ্রামাণ্য অস্বীকার করেন—বেদ তাঁহারা মানেন না, কিন্তু ঈশ্বর মানেন দেখা যায়। ব্রহ্মানন্দ বৈশেষিকমতকে আস্তিক মত বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন (৬)। অতএব ব্রহ্মানন্দ ও মধুসূদনের মতে প্রাভাকর-সম্প্রদায় (ও ভাট্ট-সম্প্রদায়) সেশ্বর আস্তিক—নিরীশ্বর নাস্তিক নহে।

(৩) "তত্তু সমন্বয়াৎ"—ব্রহ্মসূত্র [illegible]।১।৪।

(৪) "আত্মা নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্মৈব, তথাপি কর্ম্মপ্রসঙ্গে ন তথা বাচ্যম্। উক্তং হি শ্রীকৃষ্ণেণ ভগবতা—'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্'—ইতি [illegible]" ।—সিদ্ধান্তবিন্দু, ন্যায়রত্নাবলী-নারায়ণী-সহিত, কাশী-সংস্কৃত-সিরিজ, পৃঃ ১১৩, অবতরণ-গ্রন্থ।

(৫) "নাস্তিকানাং ষড়্দর্শনীমুক্ত্বা আস্তিকানাং তামাহ—কর্ত্তেত্যাদি।..." (মূল সিদ্ধান্তবিন্দু—'কর্ত্তা ভোক্তা জড়ো বিভুরিতি বৈশেষিকতার্কিকপ্রাভাকরাঃ')—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ১১০।

(৬) "বৈশেষিকো হি আস্তিকানামধমঃ, শব্দপ্রামাণ্যানভ্যুপগমেন বেদপ্রামাণ্যানঙ্গীকারাৎ।"—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ১১২। বৈশেষিক বেদপ্রামাণ্য স্বীকার না করায় অধম শ্রেণীর আস্তিক; তথাপি তিনি আস্তিকই—নাস্তিক নহেন।

ব্রহ্মানন্দ আরও বলিয়াছেন, প্রাভাকর ও ভাট্ট-সম্প্রদায়ের বেদান্তদর্শনের সহিত কোন বিরোধ বা বিদ্বেষ নাই (৭)। আর বেদান্তদর্শনের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় পরমব্রহ্ম। ভাট্ট-প্রাভাকর-মত যদি তাহার বিরোধী না হয়, তাহা হইলে আর উহাকে নিরীশ্বর বলা যায় কিরূপে?

এই সকল আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে ভাট্ট ও প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের কোনরূপ মতভেদ নাই। উভয় মতেই ন্যায়-বৈশেষিক-স্বীকৃত পরমাণুকারণবাদের খণ্ডন দেখা যায়, কিন্তু বেদান্ত-সমর্থিত ঈশ্বরকারণবাদের বিরুদ্ধে কোন উক্তি দৃষ্ট হয় না। অতএব, অধ্যাপক কীথ যে বলিয়াছেন—'জৈমিনীয় নিরীশ্বরবাদের পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে প্রভাকর ও কুমারিলের মতবাদে'—তাহার প্রামাণ্য একেবারেই স্বীকার করা যায় না (৮)।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশিষ্ট আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা একান্ত প্রয়োজন। অধ্যাপক কীথ বা মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা মহোদয়ের উক্তি যুক্তিসহায়ে খণ্ডন করা সম্ভব হইলেও 'সিদ্ধান্তবিন্দু'র ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থের উক্তি ত উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে। মধুসূদন সিদ্ধান্তবিন্দুতে বলিয়াছেন যে, মীমাংসক-মতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ—'(মীমাংসকমতে) সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু নাই। কারণ, আম্নায় (বেদ) মাত্র ক্রিয়াপ্রতিপাদক; অতএব (অক্রিয়াস্বরূপ) ব্রহ্ম-বস্তুতে বেদের তাৎপর্য্য থাকিতেই পারে না। কিন্তু যেমন বাক্‌কে ধেনুরূপে রূপিত করা যায়, মনকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করা হয় (বা ঐরূপ অন্যান্য রূপকের সাহায্যে এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে), ঠিক সেইরূপ জগৎকারণভূত পরমাণু, প্রধান, অদৃষ্ট বা জীবকে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবান্ বলিয়া কল্পনাপূর্ব্বক উপাসনা করার বিধি মীমাংসকসিদ্ধান্ত-সম্মত' (৯)। এই অংশটি পাঠ করিলে বোধ হয়, মধুসূদন সরস্বতীর মতে মীমাংসকগণ নিরীশ্বর।

ন্যায়রত্নাবলী-কার সিদ্ধান্তবিন্দুর উক্ত অংশটির পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'শ্রুতিতে যখন বলা হইয়াছে—'যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি, (তিনিই ব্রহ্ম), তখন যে পরমাণু, অদৃষ্ট বা জীব প্রভৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয় সিদ্ধ করা যায়, সেই পরমাণু প্রভৃতি পদার্থের যে কোনটিই সর্ব্বজ্ঞত্ব-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম—ইহা কল্পনাপূর্ব্বক উপাসনা করা কর্ত্তব্য' (১০)। অর্থাৎ পরমাণু, জীব প্রভৃতি যথার্থতঃ ব্রহ্ম না হইলেও ব্রহ্মদৃষ্টিতে উহাদিগের উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

মধুসূদনের উক্তি অবশ্যই শিরোধার্য্য। কিন্তু এ মীমাংসক-মত বলিতে কি বুঝিতে হইবে? ইহা যে ভাট্ট-মত হইতেই পারে না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। কারণ—

(১) কুমারিল ন্যায়-বৈশেষিক-সিদ্ধান্তোক্ত পরমাণু-কারণবাদ খণ্ডন করিয়াছে (১১);

(২) কুমারিল 'অভিহিতান্বয়বাদ' স্বীকার করেন ও সেই কারণে সিদ্ধবস্তুপর শ্রুতিবাক্যেরও (উপনিষদের) প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন (১২);

(৭) "প্রাভাকরভাট্টয়োস্তু বেদান্তদর্শনে বিদ্বেষাভাবঃ"—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ১১৩।

(৮) "The full development of the doctrine (atheism) is, as usual, to be found in Prabhakara and Kumārila."—Keith, Karmamimāmsā, p. 61.

(৯) "নাস্তি সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্যুপেতং ব্রহ্ম; আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থপরত্বেন তত্র তাৎপর্য্যাভাবাৎ। কিন্তু বাগ্‌ধেন্বাদিবৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিদৃষ্ট্যা জগৎকারণং পরমাণ্বাদি জীবো বা উপাস্য ইতি মীমাংসকাঃ"—সিদ্ধান্তবিন্দু, ৪র্থ শ্লোক, পৃঃ ৩১২—৩১৩, কাশী-সংস্কৃত-সিরিজ।

(১০) তথা চ—"যতো বেত্যাদিশ্রুতেঃ যতঃ পরমাণ্বদৃষ্টাদে-জীবাদ্বা জগদুৎপত্ত্যাদিকং তৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিদৃষ্ট্যা উপাসীতেত্যর্থ ইতি ভাবঃ"।—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৩১৩।

(১১) "তস্মান্ন পরমাণ্বাদেরারম্ভঃ স্যাত্তদীচ্ছয়া।" ৮২—সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার, শ্লোকবার্ত্তিক।

(১২) শব্দপ্রামাণ্যবিষয়ে মীমাংসকগণের মধ্যে দুইটি মতবাদ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়—(ক) অন্বিতাভিধানবাদ ও (খ) অভিহিতান্বয়বাদ। প্রথম মতবাদটি প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের ও দ্বিতীয়টি ভাট্ট-সম্প্রদায়ের স্বীকৃত। সংক্ষেপে এই দুইটি মতের পার্থক্য দেখান যাইতেছে। ধরুন, একটি বাক্য আছে—'ঘটমানয়' (ঘট আন)। অভিহিতান্বয়বাদ যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে—'ঘটম্' (দ্বিতীয়ান্ত কর্ম্মপদ) ও 'আনয়' (তিঙ্‌বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদ)—এই দুইটি বিভক্ত্যন্ত পদ হইতে নিজ নিজ অর্থের অনুভব জন্মে। এইরূপ অনুভবের বিষয় হওয়ার নামই পদার্থের 'অভিহিতত্ব' (অর্থাৎ—'ঘট'-পদ উচ্চারণ করিলেই মৃন্ময়

(৩) তাহার ফলে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের অস্তিত্বও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

পাত্রবিশেষরূপ পদার্থের অনুভব হয়; 'ঘট'-পদ হইতে এই যে মৃন্ময় পাত্রবিশেষরূপ পদার্থের বোধ হইয়া থাকে, সেই অনুভবের বিষয় ঐ মৃন্ময় পদার্থরূপ পাত্রটি। আর ঘট-পদার্থটি যে 'ঘট'-পদ হইতে উৎপন্ন অনুভবের বিষয় হইল—ইহাই ঘট-পদার্থের 'অভিহিতত্ব'।) অনন্তর 'ঘটম্' (ঘটপদার্থকে) ও 'আনয়' (আন)—এই দুই পদ হইতে যে দুইটি বিভিন্ন অনুভবের উৎপত্তি হইয়াছে সেই দুইটি অনুভব হইতে (দুইটি পদ হইতে নহে) বিভক্ত্যন্ত পদদ্বয়ের অর্থের পরস্পর সংসর্গের অনুভব হইয়া থাকে। অর্থাৎ—পদদ্বয়-কর্ত্তৃক অভিহিত অর্থদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর অন্বয়ের বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু বিভক্ত্যন্ত পদদ্বয়ের যে দুইটি পৃথক্ অর্থ বর্ত্তমান তাহাদিগের মধ্যে একটি পদার্থের সহিত অন্বিত অপর পদার্থের পদজনিত অনুভব হয় না। পক্ষান্তরে, অন্বিতাভিধানবাদে—বিভক্ত্যন্ত একটি পদের অর্থের সহিত অন্য পদের অর্থের অন্বয়ের অনুভব পদদ্বারাই হইয়া থাকে। অভিহিতান্বয়বাদে যেরূপ বিভক্ত্যন্ত পদ হইতে মাত্র তৎপদের অর্থের অনুভব জন্মিয়া থাকে, অন্বিতাভিধানবাদে সেরূপ হয় না—পদার্থদ্বয়ের অন্বয়বোধও পদ হইতেই জন্মে। এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 'ন্যায়-রত্নাবলী'তে দ্রষ্টব্য (ন্যাঃ রঃ, কাশী সং, পৃঃ ৭৭-৭৮)।

অন্বিতাভিধানবাদে—পদের দুইটি শক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে—(ক) অনুভাবকত্ব—এই শক্তিবলে পদের অর্থবোধ ও উহার স্মরণ হইয়া থাকে; (খ) কুব্জা শক্তি—এই শক্তিদ্বারা বিভিন্ন পদের পূর্ব্বানুভূত বিভিন্ন অর্থের মধ্যে সংসর্গ স্থাপিত হইয়া থাকে। প্রথম শক্তিটি পূর্ব্বে স্বয়ং জ্ঞাত অনুভূত অর্থের স্মরণ করাইয়া দেয়; পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় শক্তিটি স্বয়ং জ্ঞাত না হইলেও পদার্থসমূহের সংসর্গবোধ জন্মাইয়া থাকে।

অভিহিতান্বয়বাদে—পদার্থের অনুভব পদজন্যই বটে; কিন্তু এই অনুভব স্মৃতিদ্বারা জন্মে না—অভিধানদ্বারা জন্মে। 'অভিহিতত্ব' পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইংরাজী পরিভাষায় ইহাই 'denotation'. কিন্তু অন্বিতাভিধানে যেরূপ পদার্থসমূহের সংসর্গানুভব পদশক্তিবলেই হইয়া থাকে, অভিহিতান্বয়ে তাহা হয় না—অনুভূত পদার্থসমূহদ্বারাই পদার্থ-সংসর্গানুভব ঘটে। পদের অর্থবোধ করাইবার শক্তি (অনুভাবকত্ব) অবশ্য পদেই নিহিত আছে, কিন্তু পদার্থসমূহের সংসর্গ-বোধ করাইবার শক্তি পদে নাই—আছে পদার্থসমূহে। অতএব, পদের অনুভাবকত্ব শক্তি—অন্বিতাভিধান ও অভিহিতান্বয়—এই দুই মতবাদেই সমভাবে স্বীকৃত হইয়া থাকে ("অনুভাবকত্বমেব হি অভিহিতান্বয়বাদে অন্বিতাভিধানবাদে চ পদানাং শক্তিঃ"—ন্যায়রত্নাবলী, কাশী সং, পৃঃ ৭৭); কিন্তু পদের কুব্জা শক্তি (পদার্থসংসর্গ-বোধকত্ব) কেবল অন্বিতাভিধানে স্বীকৃত—অভিহিতান্বয়ে নহে।

বেদান্ত-দর্শনের প্রামাণ্যাপ্রামাণ্যবিচার-প্রসঙ্গে এই দুইটি মতবাদের পার্থক্য স্পষ্ট অনুভব করা যায়। অন্বিতাভিধানে কেবল ক্রিয়া-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যেরই স্বার্থে প্রামাণ্য ("আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্, তস্মাদনিত্যমুচ্যতে"—জৈমিনিকৃত পূর্ব্ব-মীমাংসাসূত্র ১।২।১)। অর্থবাদ-বাক্যাবলী ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে বলিয়া উহাদিগের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই। অতএব, অর্থবাদের প্রামাণ্য-সিদ্ধির জন্য অন্বিতাভিধানবাদী প্রাভাকরগণ

(৪) শুধু তাহাই নহে, উপনিষদের একমাত্র প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই যে উপাস্য, ইহাও কুমারিল স্বীকার করিয়াছেন (১৩)।

প্রাভাকর-মত সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই। কারণ, এই মতেও কেবল বিধিপর শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ ('আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ')।

ঈশ্বর উপাসনা-বিধির বিষয়ীভূত। উপাসনা-বিধিও বিধিবিশেষ। অতএব তদ্‌বিষয়ীভূত ঈশ্বরও বিধিসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ।

অর্থবাদবাক্যঘটক পদগুলির সহিত বিধিবাক্য-ঘটক পদগুলির অন্বয় করিয়া উভয়বাক্যের একসঙ্গে অর্থনির্ণয় করিয়া থাকেন। উপনিষদ্‌-বাক্যসমূহও সিদ্ধবস্তু-(ব্রহ্ম)-প্রতিপাদনপর বলিয়া অক্রিয়ার্থক—অতএব অর্থবাদের সমান। অতএব, এই মতে উপনিষৎসমূহের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই। পক্ষান্তরে, অভিহিতান্বয়বাদে সিদ্ধবস্তুপর অর্থবাদবাক্যেরও স্বার্থে প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। এই কারণে অভিহিতান্বয়বাদী কুমারিলের মতে উপনিষদের স্বার্থে অপ্রামাণ্য নাই। তাঁহার মত-বিবরণ-প্রসঙ্গে ন্যায়সুধা-কার বলিয়াছেন—'আচার্য্য কুমারিল অসংসারি-স্বরূপ সগুণ বা নির্গুণ আত্মতত্ত্বের কথা 'সাধুশব্দাধিকরণে' বলিয়াছেন; সগুণ আত্মজ্ঞানে অভ্যুদয়-প্রাপ্তি ও নির্গুণ আত্মজ্ঞানে মোক্ষ। এই সগুণ-নির্গুণ আত্মবস্তু সিদ্ধ বস্তু। কিন্তু সিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদক হইলেও উপাসনাবিধির অঙ্গভূত বলিয়া বিধিবাক্যের দ্বারাই উপনিষদ্‌ভাগের গ্রহণ সম্ভব। আর জৈমিনির বিধিলক্ষণ-নির্ণায়ক সূত্রে বিধিশব্দের যে প্রামাণ্য কথিত হইয়াছে, বিধির অঙ্গভূত বলিয়া উপনিষদংশেরও সেই প্রামাণ্য থাকা সঙ্গত' ("সিদ্ধার্থপ্রতিপাদনপরাণামপ্যুপনিষদামুপাসনাবিধিশেষতয়া চোদনাশব্দেনোপাদানসম্ভবাচ্চোদনাসূত্র-প্রতিজ্ঞাতপ্রামাণ্যসাধনং সঙ্গতম্"—ন্যা সুঃ বারাণসী সং, পৃঃ ২৫)। 'সাধুশব্দাধিকরণে' কুমারিল স্বয়ং বলিয়াছেন—'উপনিষদ্ভাগ কোন ক্রতুবিধি-প্রকরণের অঙ্গভূত নহে; অথবা উপনিষদংশে কেবল যজ্ঞসম্বন্ধীয় কোন দ্রব্যাদির সম্বন্ধ বা বিবরণও নাই। এই কারণে উপনিষদ্‌ভাগকে অঞ্জন-খাদির-স্রুব প্রভৃতি ফলশ্রুতির বিবরণপূর্ণ অর্থ-বাদবাক্যের সমান বলা যায় না ("অপ্রকরণগতত্বেনানৈকান্তিক-ক্রতুসম্বন্ধাসম্বন্ধাচ্চ নাঞ্জন-খাদির-স্রুববাক্যাদি-ফল-শ্রুতিবদর্থবাদত্বম্"—তন্ত্রবার্ত্তিক, আনন্দাশ্রম সং, পৃঃ ২৮৮; জৈঃ সূঃ ১।৩।২৭-২৯)।

উপনিষৎ সিদ্ধবস্তু ব্রহ্মের প্রতিপাদকমাত্র। উহা যদি কুমারিল-মতে অর্থবাদ না হয়, তাহা হইলে উপনিষদের স্বার্থে প্রামাণ্য আছে—ইহাও কুমারিল-স্বীকৃত বলিয়া ধরিতে হইবে। কুমারিল যখন উপনিষদের প্রামাণ্য এই ভাবে স্বীকার করিয়াছেন, তখন তিনি অসংসারী আত্মতত্ত্ব, সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্ম প্রভৃতি উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়াবলীরও প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিতেন—ইহা অসঙ্কোচে বলা চলে। তাহা হইলে আর সিদ্ধান্তবিন্দুর উক্ত দূষণ কুমারিলের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না।

(১৩) এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

সাধুশব্দাধিকরণে কুমারিল স্পষ্টই সেশ্বরবাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মতে কর্ম্ম (বৈদিক যজ্ঞ) ও জ্ঞান (উপাসনা) সমুচ্চিতভাবে মোক্ষজনক। উপাসনা স্বীকার করিলে উপাস্যও আপনা হইতে স্বীকৃত হইয়া পড়ে। এইরূপে উপাস্য ঈশ্বর যখন কুমারিল-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, তখন আর তাঁহাকে নিরীশ্বর বলা যায় কিরূপে? তথাপি তিনি প্রৌঢ়িবাদচ্ছলে নৈয়ায়িক প্রক্রিয়া-সম্মত আনুমানিক ঈশ্বরসিদ্ধির যে খণ্ডন করিয়াছেন, সম্ভবতঃ সিদ্ধান্তবিন্দুর উক্তি সেই প্রৌঢ়িবাদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্বারসিক মত উপনিষদনুসারী বলিয়া কখনও সিদ্ধান্তবিন্দুর আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে না।

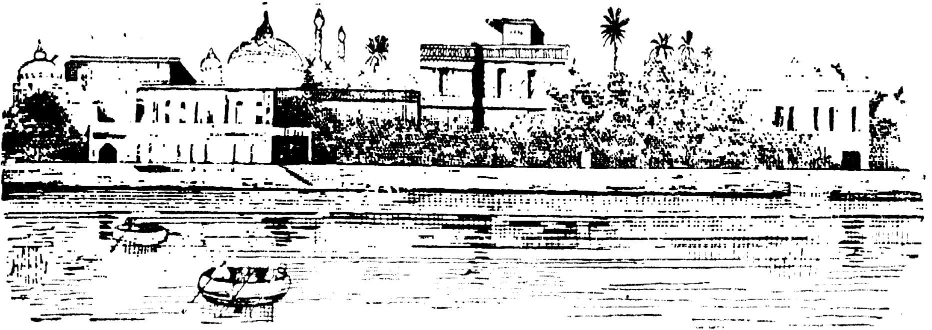
এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

কবির স্বপ্ন

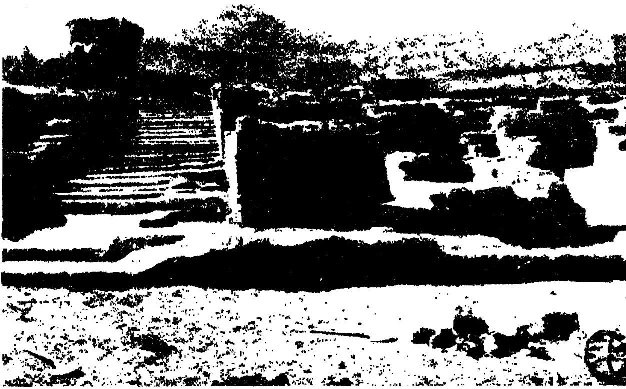
সঙ্গী ছিল না কেউ,
সাম্‌নে দুলিছে নীল-সাগরের ঢেউ
অস্ত-সূর্য্য সোনালি আলোয় উজ্জ্বল ঝল-মল্—
উদ্বেল চঞ্চল।
বালুকা-বেলায় ব'সেছিনু আমি একা,
দূর দিগন্তে দেখা যায় যেন ঘন নীল বন-রেখা।
আমি নহি সেথা একা; আরো কত জনা
সাগর-বেলায় উল্লাস-ভরে করিতেছে আনাগোনা।
যার আশা চেয়ে ব'সেছিনু আমি পাইনি যে তার দেখা,
তাই আমি ছিনু একা।
সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্র-স্নান-শেষে
কবির স্বপ্ন থেকে যেন উঠে এল সাগরিকা-বেশে।
পরিধানে তার সাগর-সমান সুনীল-বরণ শাড়ী,—
আর্দ্র নীলিমা আদরে ঘিরেছে সোনার অঙ্গ তারি।
উচ্ছ্বসিত সে তার যৌবনরাশি—
পূর্ণিমা-রাতে যেন জ্যোৎস্নার হাসি।
ভঙ্গী তাহার নব-নিদাঘের কুসুম-কানন সম
পুষ্পিত মনোরম,
সমীর যাহার সুগন্ধে মন্থর,
ম্লান হয় যার বর্ণ-বিলাসে রৌদ্র প্রখরতর।
ইঙ্গিতে যার সঙ্গীত জাগে বুকের বীণার তারে
ছন্দে তাহারে বন্দনা করিবারে।
ঘন বরষায় সজল-কাজল মেঘমালা তার কেশে,
নিয়ে যায় যারা ঘর-ছাড়াদের দেশে।
সেই কেশ হ'তে অজস্রধারে ঝরিতেছে অবিরল
স্নিগ্ধ শীতল জল,
তৃষ্ণা আতুর মর্ম্মের মরু স্পর্শ পিয়াসে যার
করে শুধু হাহাকার।
শুভ শরতের শিশির-ধৌত স্বর্ণাভা তার মুখে
মিলায়ে রয়েছে সুখে,
অরুণ রাঙিমা তরুণ অধরে খেলা করে কৌতুকে,—
জাগরণে যারা শেখায় স্বপ্ন-দেখা।
যেন শিল্পীর কল্পনা দিয়ে লেখা।
অঙ্গে তাহার শিশিরেতে মাখা হেমন্ত-হিম-কুহেলিতে ঢাকা
সোনার ধানের কনক কান্তি হ'য়েছে আপন হারা,
উন্মাদ ক'রে তোলে যা রক্তধারা।
শুভ্র তাহার হাসি,
সে যেন শীতের ঔদাসীন্যে ভরা, শৈল-শিখরে কঠিন তুহিন-ঝরা,
তীব্র শীতল উত্তর-বায়ে কাননে কাঁপন-ধরা—
শান্ত করে যা আকুল কামনারাশি।
স্মিত-বসন্ত-স্বপ্ন-মদির আবেশ তাহার চোখে,
দখিনের হাওয়া, কোকিলের কুহু, চাহনিতে তার মিলে যেন দু'হু
মধুর মায়ায় সান্ত্বনা দেয় দুঃখ-বেদনা শোকে।
ভেবেছিনু মনে মোর ভালবাসা ছিল তার অগোচরে,
তাই চেয়েছিনু তারই পানে শুধু না-চাওয়ার ছল ক'রে
বিস্মিত অনিমিখে
যেন সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের দিকে।
লতার মতন হাত দু'টি তুলে, পুষ্প-কলির মত সে-আঙুলে
শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ সম কপাল খানিরে ছুঁয়ে
ছন্দ-মধুর নমস্কারেতে নুয়ে
দাঁড়াল সমুখে মোর; নয়নে ঘনাল ঘোর,
হৃদয় হারাল কথা,
মর্ম্ম-মাঝারে উঠিল দুলিয়া বিশ্বের ব্যাকুলতা।
আপন বলিতে যা ছিল আমার, একটি পলকে চরণে তাহার
সবই দিনু নিবেদিয়া।
মোর পানে চেয়ে প্রিয়া
উঠিল হাসিয়া উচ্ছল মনোহরা,
তুলনা যাহার নৃত্য-চপলা ঝর্ণা কলস্বরা।
কহিল মধুর ভাষে,
"মোরে কেন ডেকে লওনি তোমার পাশে?"—
বহু বরষের বিস্মৃতিলীন নিঝুম রাতের স্বপনেতে শোনা বাঁশী
বাজিল যেন রে; স্মৃতির সাগরে সুরের লহরী আবার উঠিল ভাসি'।
আঁখি পানে তার চাহিয়া নির্নিমিখে
কহিনু, "হে দেবি, অন্তর্য্যামিনীকে বাহির হইতে কেমনে লইব ডেকে?
জানি মনে, সাড়া দিবে সে আপনা থেকে!"
আবার মধুরা মধুরে উঠিল হেসে,
কুণ্ঠাবিহীনা, গুণ্ঠনহীনা বসিল পাশেতে এসে।
তনুলতা তার দিল সে এলায়ে বাহুর বাঁধনে মোর,
দোঁহার নয়নে ঝরিল পুলক-লোর।
মুখখানি তার বুকেতে আমায় পড়িল ঢলে
সন্ধ্যা যেমন লুটিয়ে পড়েছে দূর-দিগন্ত কোলে।

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী।



ইজিয়ান সাগরে বারো দ্বীপ

গ্রীস দখল করিয়া ছোট-দ্বীপ ক্রীটের বুকে জার্ম্মাণির এই কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড করিবার কারণ, ইজিয়ান সাগরের উপর প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে হইলে ক্রীট এবং সাইপ্রাস—এ-দু'টিকে করায়ত্ত করা চাই! গ্রীসের দক্ষিণে ক্রীট; গ্রীস হইতে ষাট মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত।



প্রাচীন যুগের প্রাসাদ-অবশেষ—ক্রীট

গ্রীসের পরে জার্ম্মাণি ক্রীটে হানা দিবে, ইংরেজ তাহা অনুমানে বুঝিয়াছিল; তাই গ্রীস হইতে বিপুল এক দল ব্রিটিশ সেনাকে ক্রীটে আঁনিয়া রাখা হইয়াছিল। জার্ম্মাণির জোর তার বিবিধ বিমানপোতে, ব্রিটিশের জোর নৌ-বহরে। ভূমধ্য-সাগরের বুকে ইংরেজের নৌ-বাহিনীর শক্তি আজো অপরাজেয়,—জার্ম্মাণি তাই এদিককার ছোট-ছোট দ্বীপগুলিকে গ্রাস করিয়া পরে সাইপ্রাসে ব্রিটিশ-আধিপত্য খর্ব্ব করিবার জন্য উদ্যোগী। এদিকে জয়ী হইলে প্রাচ্য-নীতিকে জার্ম্মাণি অনেকখানি সফল করিবার প্রয়াস পাইবে।

ক্রীটের আয়তন লম্বে ১৬০ মাইল প্রস্থে ৩৫ মাইল; কোথাও বা এ-পরিসর কমিয়া পঁয়ত্রিশ মাইলের জায়গায় দশ-বারো মাইল মাত্র। চারিদিকে গিরি-পর্ব্বত; মাঝে-মাঝে প্রকাণ্ড উপত্যকা-ভূমি। ছোট ছোট দল বাঁধিয়া জার্ম্মাণরা উপত্যকা-ভূমির যেখানে যেমন ফাঁক পাইয়াছে, প্যারাশুট-যোগে আসিয়া নামিয়াছে। নামিবার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধার জায়গা পাইয়াছে ক্রীটের বিমান-ঘাঁটি সুদান বেতে। ক্রীটের দুর্দ্ধর্ষ পাহাড়ী-জাত প্রাণপণে জার্ম্মাণির এ আক্রমণ-প্রতিরোধে প্রয়াস পাইয়াছিল! কিন্তু এত বড় বিপদে ক্রীটের লোক সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ভুলিতে পারে নাই। জার্ম্মাণি সেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের সুযোগ লইতে কালক্ষেপ করে নাই! তার উপর ক্রীটে পথ-ঘাট ভালো নয়, গাড়ী বা লোক-চলাচলে মহা-অসুবিধা, এজন্য ক্রীট অধিকার করিতে জার্ম্মাণিকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

ক্রীটের ইতিহাসের সঙ্গে গ্রীসের পুরাণ-ইতিহাস বিজড়িত আছে। গ্রীক-পুরাণের যত দেবতা, যত মহা-পুরুষ—এক দিন এই ক্রীটেই জন্ম লইয়াছিলেন। তাঁদের পদরেণুতে ভরিয়া ক্রীট চিরদিন গ্রীকদিগের কাছে

তীর্থস্বরূপ হইয়া আছে। আচারে-রীতিতে ক্রীটের অধিবাসীরা আজো সেই প্রাচীন যুগের গ্রীক রহিয়া গিয়াছে। গ্রীক আচার-রীতির উপর তাদের এত নিষ্ঠা যে, গ্রীসের গ্রীকদিগের মধ্যেও এমন নিষ্ঠা দেখা যায় না।

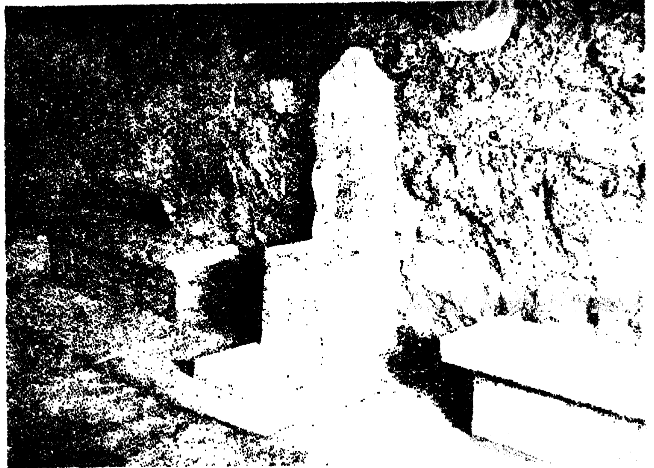
ক্রীটের লোক-সংখ্যা এখন পঁচিশ লক্ষের উপর।

ফিনিসিয়ান্‌দের সঙ্গে এক দিন ক্রীটানদের বিরাট যুদ্ধ-বিরোধ চলিয়াছিল। তার পর সারাশেন, রোমান, ভিনিশিয়ান, তুর্কি প্রভৃতির হাত ঘুরিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্রীট আবার আসিয়াছিল গ্রীসের হাতে।

এই ক্রীট এক দিন য়ুরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি ছিল! এখানকার প্রথম রাজা ছিলেন মিনস্। মিনস্ যেমন প্রজা-বৎসল ছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর শিল্প-কলার উপর অনুরাগ! আজো তাঁর সে শিল্পানুরাগের পরিচয় ক্রীট হইতে নিশ্চিহ্নতায় মিলায় নাই। য়ুরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিরও প্রথম প্রভাত এই ক্রীটের গগনে সমুদিত হইয়াছিল। পৌরাণিক ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাসাদ হর্ম্যাদির ধ্বংসাবশেষ এখনো ক্রীটের বুকে অবলুণ্ঠিত রহিয়াছে। সে ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ক্রীটের পূর্ব্ব-গরিমা সহজে বুঝা যায়। শত্রুর বিদ্বেষানলেই ক্রীটের আজ এ দুর্দ্দশা।

কঠিন রুক্ষ পর্ব্বতময় হইলেও ক্রীটের জমি খুব উর্ব্বর। দ্বীপের বুকে ফল-ফুলের কি বিচিত্র বিপুল সম্ভার! এখানে লেবু, কমলা লেবু, আপেল, পিয়ারা প্রভৃতির অজস্র ফশল ফলে। তামাক আর তুলার ফশলেও ক্রীট রীতিমত সমৃদ্ধ। এখানকার বন-বিভাগের প্রসিদ্ধি আছে। অথচ নদীর মতো নদী ক্রীটে একটিও নাই! আছে দু'-চারিটা গিরি-নির্ঝরিণী—ইয়েরোপোটামো এবং মাইলোপোটামো। পাহাড় অনেক আছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে তুঙ্গ পাহাড় আইডা, ৮০৬০ ফুট উচু; তার পর শ্বেতগিরি (হোয়াইট মাউণ্টেন্স) ৮০০০ ফুট উচু এবং লাশেথি ৩০০০ ফুট উচু! পশুর মধ্যে বুনো-ছাগল এবং নেকড়ের প্রাধান্য এখানে অত্যধিক।

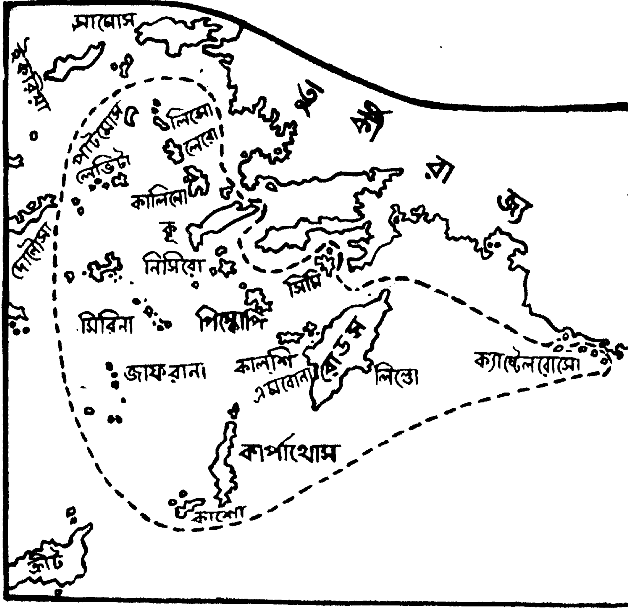
ক্রীট ছাড়া ইজিয়ান সাগরের বুকে আরো ক'টি দ্বীপ আছে। সেগুলির মধ্যে রোড্‌স্, লিপশো (লিশো); কশ্ (কু) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রীক-প্রাধান্যের যুগ হইতে এগুলি "দোদিকানিজ" বা বারো দ্বীপ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইতালীর সহিত তুর্কির যে যুদ্ধ হয়, সে-যুদ্ধের পর এই বারো দ্বীপ ইতালীর অধিকারভুক্ত হইয়াছে।



আদি-রাজা মিনসের রাজ-সিংহাসন—ক্রীট



দক্ষিণ-ইউরোপ



ইজিয়ান্-সাগরের বুকে



প্রাচীন যুগের দুর্গ-প্রাসাদ—রোড্‌স্

ইতালীর অধীন হইলেও এ সব লোকজনের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক গোঁড়া খৃষ্টান। তাদের ভাষা আধুনিক গ্রীক। তার পর মুসলমানের সংখ্যাও এখানে অত্যধিক। কশ এবং রোডসেই বেশী মুসলমানের বাস। এখানকার মুসলমানদের ভাষা আনাতোলিয়ান-তুর্কি। খৃষ্টান ও মুসলমান ছাড়া এখানে ইহুদী এবং ইতালীর অধিকারভুক্ত হওয়ার পর হইতে বহু ইতালীয়ান কৃষিজীবী আসিয়া সপরিবারে আস্তানা পাতিয়াছে। এখানকার ইহুদীদের ভাষা স্প্যানিশ। নানা জাতের নানা ভাষা হইলেও এখানকার সরকারী-ভাষা এখন ইতালীয়ান।

নানা ভাষা এবং নানা ধর্ম্ম-মত প্রচলিত থাকার জন্য সকলের পাল-পার্ব্বণের সমারোহে এখানকার দোকান-অফিসগুলি নিত্য বন্ধ থাকিত। কেহ দোকান-পাট বন্ধ করিত রবিবারে; কেহ বন্ধ করিত শুক্রবারে; কেহ বা বৃহস্পতিবারে। এ জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে পদে-পদে বাধা ঘটিত,—শেষে কর্ত্তৃপক্ষ রফা করিয়া রবিবারটিকেই শুধু ছুটির দিন বলিয়া এখন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

দরিদ্র দ্বীপ বলিয়া এখানকার লোকজন খুব মিতব্যয়ী। গোঁড়া খৃষ্টানের দল সমুদ্র-তীর-অঞ্চলে বাস করে। তাদের কাজ জাহাজ চালানো, মাছ ধরা, শীকার করা; ইহুদীরা করে ব্যবসা-বাণিজ্য; মুসলমান অধিবাসীরা জমির চাষবাস করে। এখানে ভূমধ্যসাগরের গভীরতা সব-চেয়ে বেশী।

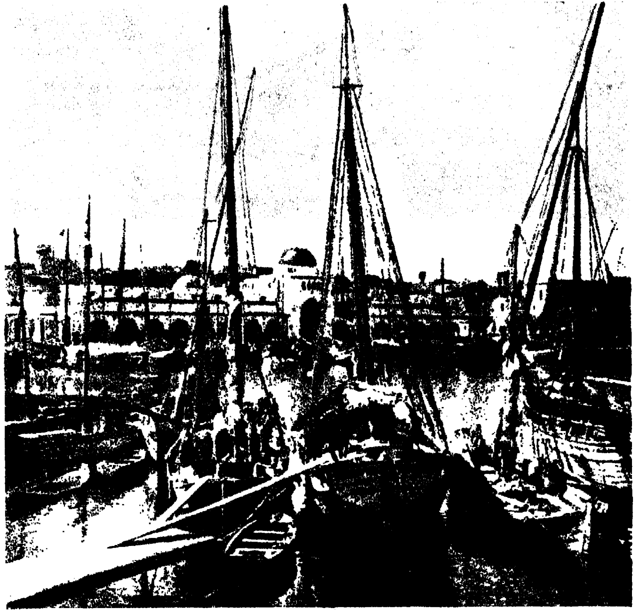
এই বারোটি দ্বীপের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড় রোড্‌স। রোড্‌স আগাগোড়া পার্ব্বত্যময় অথচ এখানে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের বাস।

ছোট দ্বীপে সকলের অন্ন-সমস্যার সমাধান হয় না বলিয়া অর্থ-উপার্জ্জনের চেষ্টায় ইহুদীরা যায়

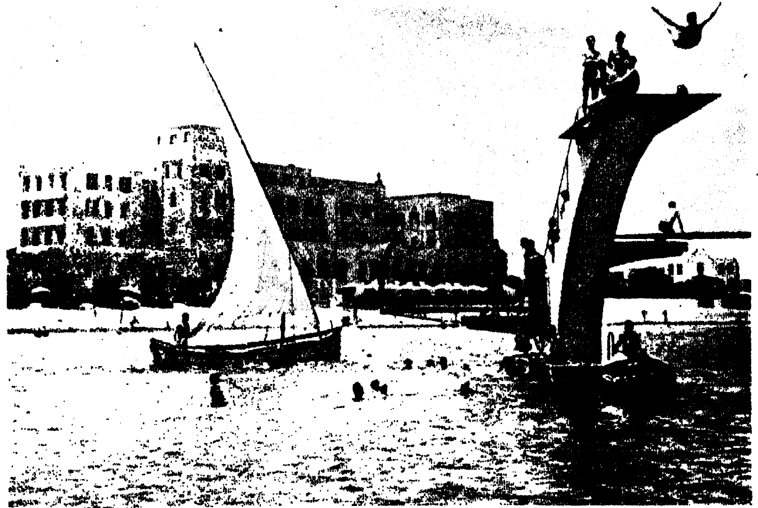
আমেরিকায়; মুসলমানেরা যায় আনাতোলিয়ায়; এবং গোঁড়া গ্রীকের দল যায় আমেরিকায়, মিশরে এবং অষ্ট্রেলিয়ায়।

কাশো দ্বীপটি সর্ব্ব-দক্ষিণে। ব্রিটিশ-অধিকৃত সাইপ্রাশ এবং গ্রীক-অধিকৃত ক্রীটের মাঝামাঝি অবস্থিত বলিয়া এ-পথে ব্রিটিশ নেভি নিত্য যাতায়াত করে। সে-জন্য এখানকার সাড়ে-ছ'হাজার অধিবাসীর মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার লোক মিশরে গিয়া আস্তানা পাতিয়াছে। কাশো দ্বীপটিকে প্রায় জন-হীন বলিয়া মনে হয়।

কিছুকাল পূর্ব্বে এক জন মার্কিণ-মহিলা কুমারী ডরথি হশমার ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—জাহাজে চড়িয়া তিনি প্রথমে আসিয়া নামেন সাই-প্রাশের কাছে কাস্তেলরোশো দ্বীপে। জাহাজ হইতে এ দ্বীপটিকে অর্দ্ধ-চন্দ্রের মতো দেখায়। সমুদ্রের দিকে লাল পাহাড়ের গায়ে-গায়ে অসংখ্য সাদা রঙের বাড়ী—পাহাড়ের গায়ে যেন এক ঝাঁক বক বসিয়া আছে!



রোড্সের বন্দরে



সমুদ্রে তরী-বিহার, ডুবুরী; তীরে হোটেল—রোড্স্

তুর্কির খুব কাছে অবস্থিত বলিয়া-এখানকার মেয়ে-সমাজে আব্রু-রক্ষার প্রথা কড়াকড় ভাবে বিদ্যমান আছে। তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়স হইলেই মেয়েদের আর বাড়ীর বাহির হইতে দেওয়া হয় না। বিবাহ হইলে মেয়েরা একটি দিন মাত্র বাহিরে আসিতে পারে। এক দিনের বেশী দু'দিন নয়! ভূমিকম্পে দেশ



কফির আসরে লেখিকা ও ডেশপোনা—কাস্তেলরোশো



পথে ঝিনুক লইয়া নক্সা কাটে—রোড্স্

জল আনিতে যাইবার রীতি বহু প্রাচীন-কাল হইতে প্রচলিত আছে। মাথায় ঘোমটা টানিয়া মেয়েরা জল আনিতে যায়; সে সময় এই সব অসূর্য্যম্পশ্যাদের দেখিবার জন্য পথে তরুণদলের ভিড় জমে। চোখে ইঁসারা খেলিলেও মেয়েদের কথা কহিবার বিধি নাই! মৌন-মুখে জল লইয়া তারা ঘরে ফিরিয়া আসে।

কাস্তেলরোশোয় একটিও হোটেল নাই। ফরাশীরা বিমান-যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য 'এয়ার ফ্রান্স' নামে একটি হোটেল খুলিয়াছিল। কিন্তু এবারের এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবা-মাত্র সে-হোটেল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লেখিকা লিখিতেছেন, আশ্রয়ের জন্য আমি চিন্তিত হইয়াছিলাম। কিন্তু ডেশপোনা ইকোলুবি নামে এক জন বর্ষীয়সী বিধবার গৃহে এখানকার গ্রীক লর্ড-মেয়র আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বিধবা এখানকার মামুলি আচার-রীতি মানিয়া চলেন। সে-কালের মামুলি রীতি মানিয়া

ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া গেলেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে না! উপাসনার জন্য মেয়েরা যায় চার্চ্চে বা মসজেদে—কিন্তু যাইতে হয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে। মে-মাসে মে-দিবস-উৎসবে মেয়েদের সহরের বাহিরে কুম্ভ লইয়া



ফলের ফশল—কাস্তেলরোশো



ক্ষেতের কাজে—কাস্তেলরোশো


মেয়েদের মন খুশীতে ভরা


পশারীদের কাছে স্পঞ্জ, মাটীর তৈজস, লেশ


ষ্টাম্পেলিয়া দ্বীপ

কাণে তিনটি বিঁধ করিয়া সে-বিঁধে রূপার-চে নে-আঁ টা তিনটা করিয়া ছয়টি প্রাচীন মুদ্রা মাকড়ির মতো ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন।

আতিথ্যে এখানকার লোকের দরদ আছে; তবে পুরাকালের তুর্কি-প্রথায় পালঙ্কে বা খাটে শয়নের রীতি নাই! মেঝেয় বিছানা পাতা এবং সকালে সে বিছানা তুলিয়া গুটাইয়া রাখা হয়। সন্ধ্যার সময় বিধবা নিজে আসিয়া আমার ঘরে তেলের প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া যাইতেন। সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালা বাড়ীর গৃহিণীর কাজ।



ক্যামেরা দেখিয়া লজ্জায় জড়োসড়ো



ঘরকর্ণার কাজে এই পোষাক

বাড়ীর মেয়েরা রান্নাবান্না করেন। ধনী-পরিবারেও এ-রীতির ব্যতিক্রম দেখি নাই। আহারের সময় পাড়ার দু'চার-জন মেয়ে আসিয়া জমিত। বাড়ীর মেয়েরা, পাড়ার মেয়েরা—সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে ভোজন-ব্যাপার সমাধা হইত। শুনিলাম, প্রত্যেক গৃহেই প্রতিদিন পাড়ার দু'-চারিটি মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সঙ্গে খাওয়ার রীতি প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমানে চলিয়া আসিতেছে। তরুণ-বয়সের মেয়েরা লেখিকার কাছে দুঃখ করিয়া বলিত, তোমাদের জন্মই সার্থক! পৃথিবী দেখিতেছ,—আকাশ-বাতাস দেখিতেছ আমরা চিরদিন অন্ধকূপে বন্দী হইয়া আছি!



জীর্ণ মন্দির—পাটমোস্



পাটমোস্-তীর্থ—দূরে স্কালা বন্দর

এখানে বহু গৃহ জন-হীন পড়িয়া আছে দেখিলাম। তার কারণ, এখানকার নিয়ম, কন্যার বিবাহের সময় কন্যার পিতা কন্যাকে একখানি বাড়ী দিবে। এ-জন্য মেয়ে জন্মিবা মাত্র বাপ বাড়ী তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করে। অর্থে যদি টান পড়ে, কিম্বা বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা যদি মারা যায়, তাহা হইলে সে-বাড়ী খালি পড়িয়া থাকে। সে বাড়ীতে বিবাহিতা কন্যা ভিন্ন আর কাহারো বাস করিবার বিধি নাই। এ-জন্য বহু গৃহ খালি পড়িয়া আছে; এবং খালি পড়িয়া থাকার জন্য সে-সব বাড়ীর যত্নও কেহ লয় না; বাড়ীগুলি কালের আক্রমণে ভাঙ্গিয়া জীর্ণাবশেষ স্তূপে পরিণত হয়। রোডস দ্বীপে এমন জীর্ণ গৃহস্তূপের সংখ্যা নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না!

বাড়ীর বাহিরে কি আছে, আলো না অন্ধকার, তা, জানি না!

এ-সব গৃহ জন-হীন পড়িয়া থাকার অন্য কারণও আছে। সে কারণ, ইজিয়ান-সাগরে নিত্য এখন বহু ষ্টীমার যাতায়াত করে।

পূর্ব্বে মিশরের সঙ্গে রোডসের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। এখানকার কাঠ-কয়লা বড় বড় জাহাজে বোঝাই হইয়া পূর্ব্বে আলেকজান্দ্রিয়ায় চালান যাইত। এখন এ-সব বাণিজ্য-ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে। কাস্তেলরোশোর অধিবাসীরা অন্ন-সংস্থানের জন্য এখন দেশ-বিদেশে গিয়া আশ্রয় লইতেছে,—সে-কারণেও এখানকার বহু গৃহ জন-হীন হইয়া জঙ্গলে ও জীর্ণ ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হইতেছে। কাস্তেলরোশোয় পূর্ব্বে প্রায় এগারো হাজার লোকের বাস ছিল: এখন সেখানকার লোক-সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশী হইবে না।

তবে অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য বিদেশে গেলেও এখানকার মাটীতে অন্তিম-শয়ন-লাভের জন্য অনেকেই শেষ-বয়সে বা সাংঘাতিক ব্যাধি হইলে দেশে ফিরিয়া আসে।

বিবাহ-ব্যাপারে রোডসের লোকের আজ পর্য্যন্ত গভীর নিষ্ঠা। তারা বিদেশিনীকে বিবাহ করে না। মা-বাপ ও অভিভাবকের দল দেশে পাত্রী পছন্দ করেন; করিয়া পাত্রকে খবর দেন। কোথায় সেই সুদূর ব্রেজিল বা মিশর-তুর্কি, সেখান হইতে পাত্র তখন বাড়ী আসিয়া মা বাপের পছন্দ-করা সেই দেশী পাত্রীকে খুশী-মনে বিবাহ করে।

বিবাহে কন্যা-পক্ষকে বেশ মোটা রকমের যৌতুক দিতে হয়।

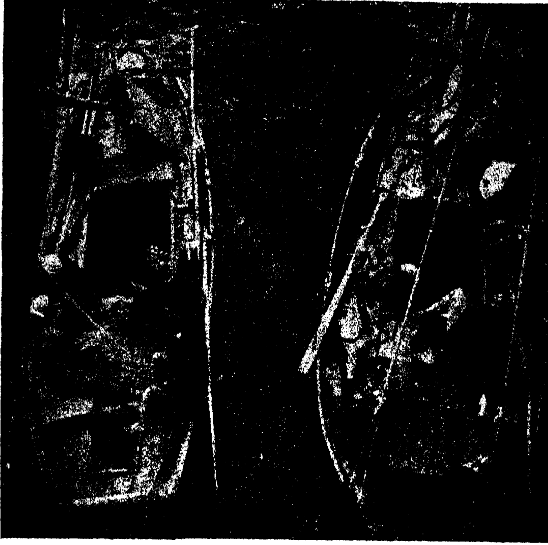
কাস্তেলরোশো আকারে অতি ক্ষুদ্র—লম্বে-প্রস্থে পাঁচ মাইল মাত্র। এখানে লাল পাথরে নির্ম্মিত প্রাচীন যুগের একটি প্রাসাদের ধ্বংস-স্তূপ পড়িয়া আছে। ছাদহীন ক'টি দেওয়াল। বিগত মহাযুদ্ধে প্রাসাদটি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এ প্রাসাদটি প্রাচীন ভিনিশিয়ান আমলের। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জেহাদ্ বা ক্রুশেডের অবসানে সকলে যখন বাইজান্তাইন-সাম্রাজ্য ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লন, তখন ইজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলি পড়ে ভিনিশিয়ান রিপাবলিকের ভাগে। তার পর ভিনিশিয়ানরা আশ-পাশের ছোট ছোট দ্বীপগুলিকে জয় করিয়া স্বাধিকার-ভুক্ত করে।



ভূমিকম্পের পরে (১৯৩৩)—কশ্ দ্বীপ

এখানকার সমস্ত দ্বীপগুলির ভাগ্য-ইতিহাস একই রকমের। ষ্টাম্পেলিয়া-দ্বীপটি একদা শৌর্য্যেবীর্য্যে বেশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন যুগে এখানে যে সব দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, কালের প্রকোপে সেগুলি জরা-জীর্ণ হইলেও আজো সেগুলি সজাগ দুর্গ-প্রহরীর কাজ করিতেছে।



নারীদের নৌকা—পাটমোস্

ষ্টাম্পেলিয়ার মেয়েদের পোষাক যেমন নানা রঙের, তেমনি সে পোষাক নানা বিচিত্র ছাঁদের। পোষাক-পরার বিধিও বিচিত্র। বিবাহ-উৎসবে এক-রকম ছাঁটের পোষাক পরিতে হয়; রবিবারে আর-এক রকমের পোষাক; আবার দিনের কাজ-কর্ম্মে আর এক রকমের পোষাক। তার উপর সামাজিক পদ-মর্য্যাদা হিসাবেও পোষাকের তারতম্য আছে। ধনী ঘরের মেয়েরা যে-ছাঁটের, যে কাপড়ের, যে রঙের পোষাক পরিবে, গৃহস্থ বা গরীবের ঘরের মেয়েদের তেমন পোষাক পরিলে চলিবে না। ঋতু-ভেদেও পোষাক-পরিচ্ছদে তারতম্য দেখা যায়। গ্রীষ্মের দিনে বা সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিবার সময় মেয়েরা পরে পা-জামা ও খাটো স্কার্ট। সন্ধ্যার পর এবং উৎসবে-ব্যসনে সাজসজ্জায় পার্থক্য আছে।

স্কার্পাটো বা কার্পাথোস্ দ্বীপে আজো সেই হাজার বৎসর আগেকার ষ্টাইলের পোষাক-পরিচ্ছদের রীতি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এ দ্বীপটি অলিম্পো পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। পাহাড়ের মাথায় মস্ত গ্রাম। ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড় ভাঙ্গিয়া তবে গ্রামে আসিতে হয়। আসিতে সময় লাগে সাতটি ঘণ্টা! এখানকার বাড়ী-ঘরে আজো হোমারিক্ যুগের কাঠের তালা-চাবির ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে।



জলে স্পঞ্জ ডুবুরীদের নৌকা—সিমি দ্বীপ; ওপারে প্রাচীন ট্রয়

রোড্‌স্ তুর্কির হাতে পড়িলে মেয়েদের সাজ-পোষাকে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটে। মেয়েদের মাথার ও মুখের উপরে তখন পড়ে ঘোমটার আবরণ। আজ তুর্কির হাত হইতে মুক্তি মিলিলেও মুখের উপর হইতে সে ঘোমটা একেবারে সরে নাই; কপালের উপরে উঠিয়াছে মাত্র!

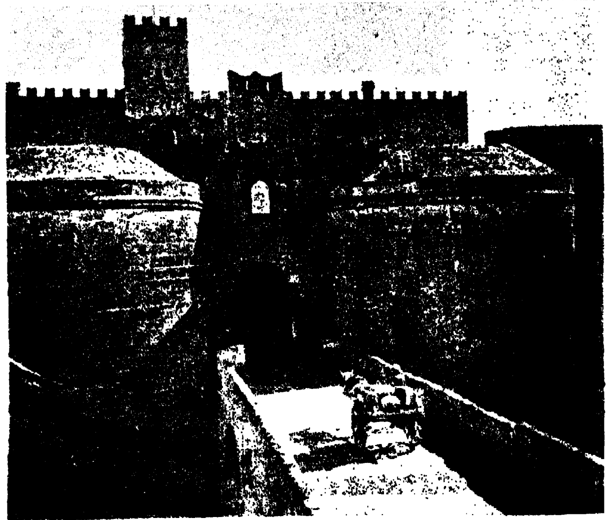
গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবে ক্রীট, রোড্‌স্ প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে মানুষের মনে ধর্ম্ম-ভাব প্রবল। সেজন্য পর্ব্ব উৎসব হয় অসংখ্য। পর্ব্ব-উৎসবে তীর্থ ও মন্দির-দর্শন, আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে কোলাকুলি, প্রীতি-ভালোবাসা-নিবেদন, উপহার-দান—এ-সবে আজো সকলের নিষ্ঠা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

এ দ্বীপগুলিতে বহু ডুবুরীর বাস। পুরুষানুক্রমে তারা ডুবুরীর কাজ করিতেছে। ডুবুরীর সংখ্যা সিমি দ্বীপে সবচেয়ে বেশী। তাদের কাজ—ডুব দিয়া সাগর হইতে স্পঞ্জ তোলা। এ সব ডুবুরী বর্ম্মাচ্ছাদনাদির ধার ধারে না! নগ্নদেহে জলে ডুব দেয়! পাছে ভাসিয়া ওঠে, এজন্য একখানা করিয়া ভারী পাথর সঙ্গে লয়; আর লয় বড় জাল। সকালে ডুব দিয়া সারা দিন জলে থাকে, সন্ধ্যার পর জল ছাড়িয়া তীরে ওঠে। ডুবুরীরা একটু বেশী মাত্রায় তামাক সেবন করে! বলে, তামাকের ধোঁয়ায় শরীরের ভিতর-বাহির এমন গড়িয়া ওঠে যে, জলে ভিজিলেও অসুখ-বিসুখ করিবে না—অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবে না! জানি না, এ কেমন তামাক!

মোটর-বোটে পাটমোস্ ত্যাগ করিয়া আড়াই ঘণ্টা পরে লেখিকা



বিবাহ-সভা



ইতালী কর্তৃক নব-সংস্কৃত দুর্গ—রোড্‌স্



সমুদ্র-তীরে পথ —রোড্‌স্



কর্ণ-ভূষণ

নোরো দ্বীপে পৌঁছিলেন। এখানে পাশপোর্ট পরীক্ষার খুব কড়াক্কড়। নোরো এ-অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান বন্দর। এখানে নৌ-ঘাঁটি আছে, বিমান-ঘাঁটি আছে।

লেখিকা লিখিতেছেন,—ব্রিনডিশি হইতে রোডসে আসিতে এ-পথে পূর্ব্বে জাহাজ হইতে নোরো দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন, রৌদ্র-শুষ্ক অনুর্ব্বর একটা দ্বীপ! এখানে আসিয়া দেখিলাম, উর্ব্বরতা অপরিসীম। চারিদিকে অজস্র ফুল-ফলের গাছ। যব ও বার্লির ফশলে ক্ষেতগুলি ভরিয়া আছে; তার উপর বীন, আঙুর, জলপাই জন্মায় অজস্র। তামাকের সমৃদ্ধ চাষ আছে।

নোরোয় থাকিবার সময় এক দিন রাত্রে বেতারে সংবাদ প্রচারিত হইল, ইংরেজ-বম্বার আসিয়া এখানকার বারুদ-খানায় সন্ধ্যার পর বোমা ফেলিয়া গিয়াছে! লোক-জন সরিয়া পড়ো।

এ সংবাদে লেখিকা কালিনো দ্বীপে আসিলেন। এ দ্বীপটিও বেশ সমৃদ্ধ। এখানেও ফল ও ফুলের কি অজস্রতা! এখানকার স্পঞ্জের কারবার বিশ্ব-বিখ্যাত।

কালিনোতে দু'দিন থাকিয়া লেখিকা আসিলেন কশ্‌ দ্বীপে। আসিয়া শুনিলেন, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সেখানে দারুণ ভূমিকম্প হইয়াছিল; সে ভূমিকম্পের ফলে এখানে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। ভূমি-কম্পে মাটি ফাটিয়া যায়; এবং সে সব ফাটের মধ্য হইতে প্রাচীন যুগের বহু কীর্ত্তি-পরিচয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! কোথাও বাহির হইয়াছে বাইজান্‌তাইন্‌ রোমান ও হেলেনিক যুগের মর্ম্মর প্রাসাদ; সে সব প্রাসাদে অমল জলের ঝর্ণা, সৌখীন স্নানাগার, মহার্ঘ্য রেশমী পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বিচিত্র সুরা। কোথাও বাহির হইয়াছে রোমান্‌ আমলের হাওয়াখানার বিচিত্র বিলাস-শিল্পচাতুর্য্য; কোথাও নানা ছাঁদের নক্সাদার তৈজসপত্রাদি; কোথাও বা বিবিধ প্রসাধন-সরঞ্জাম।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে সিমির এক ডুবুরী সমুদ্রে ডুব দিয়া স্পঞ্জ তুলিতে গিয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে প্রাচীন গ্রীক যুগের বহু মর্ম্মর-মূর্ত্তির সন্ধান পায়। সে মূর্ত্তিগুলি তুলিয়া এখন আথেন্সের ন্যাশনাল মিউজিয়মে সংরক্ষিত করা হইয়াছে।

রোডস্ ও সিমি দ্বীপ দেখিয়া লেখিকা আসেন পিশকপিতে। এ দ্বীপটি অনুর্ব্বর এবং রুক্ষ। এখানে কুষ্ঠ হাসপাতাল খোলা হইয়াছে; সে-জন্য এখানকার লোক-জন সংক্রামতার ভয়ে পিশকপি ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া আস্তানা পাতিয়াছে। এখন এ-জায়গাটি সেনা-বারিকে পরিণত হইয়াছে।

নিশিরো আর একটি ছোট দ্বীপ। এটিকে দ্বীপ না বলিয়া আগ্নেয়গিরি বলা চলে। দ্বীপটি ২২৬৭ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এ-সব দ্বীপের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা বলেন, সমুদ্র এ সব কঠিন পাষাণ-ভার বুকে আর বহিতে পারে না বলিয়া ঠেলিয়া তাদের পৃথিবীর উপরে তুলিতেছে! নিশিরোয় কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সে-সব প্রস্রবণের জলে স্নান করিলে সর্ব্ব-রকমের চর্ম্মরোগ সারিয়া যায়।

লেখিকা লিখিতেছেন—এই বারোটি দ্বীপের মধ্যে ইতিহাসে পাটমোস বা পাটমো দ্বীপটির বৈশিষ্ট্য আছে। এ দ্বীপে সাধু বা সেণ্ট জনের সমাধি আছে। এই সমাধি থাকার জন্য গোঁড়া খৃষ্টানদিগের কাছে পাটমোস মহা-তীর্থস্বরূপ। তীর্থের এ সম্মান-মর্য্যাদা বিজয়ী তুর্কি-জাতি কোন দিন ইঙ্গিতে ক্ষুণ্ণ করে নাই। জনের সমাধি-ফলকে লেখা আছে—"আমি জন...আমি তোমাদের ভাই। তোমাদের দুঃখে আমি তোমাদের বন্ধু ও সহচর। এ-দ্বীপে আমি পরমানন্দে বাস করিয়াছি।"

এখানে বহু ধর্ম্মশালা ও মঠ আছে। সবগুলির দ্বারে প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে, "বিদেশী অতিথিকে সমাদরে গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে ভগবানের কাছে তুমি বিদেশীর মতো অপরিচয়ের তাচ্ছল্য সহিবে না।" বিদেশী কেহ গেলে এ-সব মঠে বা ধর্ম্মশালায় তিন দিন, তিন রাত্রি বিনা-ব্যয়ে আহার ও আশ্রয় পান,—তার বেশী থাকিলে শুধু সামান্য ভোজ্য-ব্যয় দিতে হয়।

পাটমোসে আর একটি দেখিবার জিনিষ—এখানকার গিরিগুহা। ডোমিটিয়ান কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া সেণ্ট জন এইখানে আসিয়া প্রথমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেণ্ট জন আসিয়া গুহায় বাস করিতেছেন শুনিয়া ক্রিষ্টোড্রলোশ্ তখনকার বাইজান্‌তাইন-সম্রাট্ আলেকসিয়াস কম-বেনাসের কাছে গিয়া প্রার্থনা নিবেদন করেন, এই জন-হীন পরিত্যক্ত দ্বীপটিকে আপনি মঠের জন্য দান করুন। সম্রাট্ এ-প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এই মঠের গ্রন্থাগার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই পাটমোসের



ডুবুরী—সিমি দ্বীপ

গিরি-গুহায় সেণ্ট জনের সম্মুখে ভগবান আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে!

এখানকার মঠে এখনো বহু ধর্ম্মাচার্য্য বাস করিতে-ছেন। তাঁদের মানবপ্রেম, ভগবৎপ্রেম, তাঁদের আতিথ্য ও প্রীতি—আজিকার স্বার্থময় যুগে সত্যই পরম উপ-ভোগ্য! তাঁহাদের সংসর্গ-গুণে এখানকার কৃষি-জীবিদের মন অসূয়াশূন্য। লেখিকা লিখিতেছেন, যে-দিন আমি পাটমোস ত্যাগ করি, সে-দিন বিদায়-বেলায়



রোমা—পিশ কপ

ওখানকার এক কৃষক-কন্যা কিশোরী থিয়োলজিয়া আসিয়া আমার হাতে দেবতার নির্মাল্য দিল ; মঠের আচার্য্য আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন,—তোমার পথ 'শিব' হোক—আমাদের শুভাশীর্ব্বাদ তোমার মাতৃভূমির উপর বর্ষিত হোক ! (A good journey and every blessing on your land) !

লেখিকা লিখিতেছেন, ইজিয়ানের বারো দ্বীপ দেখিয়া প্রাচীন যুগের সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধায় আমার মন ভরিয়া আছে। আজ ইতালীর হাতে পড়িয়া চারিদিকে যুদ্ধের দানবী হিংসার বিকাশ দেখা গেলেও সে দানবী হিংসার অন্তরালে যে আলোর আভাস দেখিয়াছি, তার তুলনা নাই ! ইতালী এখানে তার শৌর্য্য-বীর্য্যের নূতন আর কি পরিচয় দিবে ! এ সব দ্বীপের ধূলায় ব্রুটাশ, কাশিয়াস, কেটে', সিসিরোর চরণ-ধূলি মিশিয়া আছে ! রোডসের মোহে মুগ্ধ নীরো রাজ্য-সিংহাসন ত্যাগ করিয়া এখানে বিরাম-কুঞ্জ রচনায় উৎসুক হইয়াছিলেন ! দ্বীপগুলি ইতালী অধিকার করিলেও এ-সব দ্বীপের অধিবাসীদের মনে গ্রীস আজো রাজত্ব করিতেছে। লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছি ; নিশ্বাস ফেলিয়া তারা যে-কথা বলিয়াছে, সে কথার মর্ম্ম,—ইজিয়ান দ্বীপগুলির ভাগ্য এমন বিড়ম্বিত যে, নানা জাতি আসিয়া তার মাটির উপর চিরদিন প্রভুত্ব করিয়াছে, তবে ভগবানের কৃপায় আমাদের মনের অধীশ্বর গ্রীস্ ! আমাদের মন হইতে গ্রীসকে কোনো বিদেশী রাজ-শক্তি কোনো দিন উন্মূলিত করিতে পারিবে না !

রহস্যময়ী !

হে মোর রহস্যময়ী ! বল তব মৌন ইতিহাস,
কি কথা লুকানো তব অন্তরের সুগোপন কোণে,
কি ব্যথা জনম ভরি' কেঁদে কেঁদে পড়েছে ঘুমায়ে,
মুখে কভু ফোটে নাই, যে কাঁটা ফুটিয়া আছে মনে !
কার পথ চাহি ফেরো যুগ-যুগ দুঃখ-অভিসারে,
কোন্ বঁধু ধরা দিয়ে দেয় নাই হৃদয়েতে ধরা ?
কে তোমা ছলনা করি' কত জন্ম খেলে লুকোচুরি,
কার তরে অর্থহীন রূপময়ী এই বসুন্ধরা !

তাই কি সাগর-জলে তরঙ্গের উচ্ছ্বাস-লীলায়,
কূলপ্লাবি অনন্তের দিক্‌হারা প্লাবনের বুকে,
অজানা পথের 'পরে আপনারে দিয়েছো বিলায়ে,
মৃত্যুহীন মরণের শান্তিময়ী ভাষাহীন সুখে !
হে মোর চিত্রিত ছবি ! ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দেবী,
একবার বলো তব হৃদয়ের সুগোপন বাণী ;
তুমি কি আমার সেই কণ্টকিত অভিসার-পথে
জন্ম-জন্ম কেঁদে ফেরো সর্ব্বহারা হৃদয়ের রাণী !

কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার (বি-এল)।



ভারতের লৌহবর্ত্ম

ভারতে বৃটিশ-শাসনের ফলে আমরা যে সকল সুখ ও সুবিধা লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে বাষ্পীয় শকটের প্রচলন প্রধান। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌শনের বুদ্ধি-কৌশলে বিলাতে সর্ব্বপ্রথম বাষ্পীয়-যন্ত্রের (Engine) সাহায্যে চালিত রেল-ট্রেণের প্রচলন হয়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলা রেলওয়ে'-কোম্পানী সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে রেলপথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রথমে বোম্বাই হইতে থানা, এবং পরবর্ত্তী বৎসর হাওড়া হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত রেলপথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে প্রভৃতি অনেকগুলি রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। অধুনা ভারতের নানা স্থানে বহু রেলপথ নির্ম্মিত হইয়া কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে। ভারতে নির্ম্মিত বর্ত্তমান রেলপথের দৈর্ঘ্য মোট ৪৩,১১৮ মাইল।

ভারতের রেলপথে এখনও দ্বৈত-শাসন বিরাজিত। কতকগুলি রেলপথ সরাসরি সরকারের অধীন; কতকগুলি কোম্পানী-পরিচালিত যৌথ-প্রতিষ্ঠান। এই উভয়বিধ শাসনের শিরে 'রেলওয়ে বোর্ড' নামক পরিচালকমণ্ডলী বিরাজিত। তদূর্দ্ধে ভারত সরকারের বর্ত্ম-সচিব (Communications Member) প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় রেলপথগুলি প্রাদেশিক শাসন-পরিধির বহির্ভূত কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্রাধীন।

ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে রেলওয়ে-বোর্ড গত ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক হিসাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ঐ সপ্তাহের শেষভাগে বর্ত্ম-সচিব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে, এবং রেলওয়ে-বোর্ডের অধিনায়ক রেলওয়ে-কমিশনের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসভায় ভারতীয় রেলপথের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ ও সদ্য আরব্ধ সরকারী বৎসরের আয়-ব্যয়ের খসড়া পেশ করিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ দশ বৎসরব্যাপী মন্দা সহ্য করিবার পর রেলপথ সমূহে গত ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে পুনরায় স্বাচ্ছল্যের সূচনা লক্ষিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ দশ বৎসর আয়-সঙ্কোচ ও ব্যয়-সঙ্কোচের সংঘর্ষে বিপর্য্যস্ত এদেশী রেলপথ কেন্দ্রীয় তহবিলে তাহার দেয় অর্থ দিতে পারে নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকারী সাধারণ তহবিল হইতে রেলওয়ে তহবিল পৃথক করা হয়। তদবধি রেলওয়ে তহবিল সরকারী সাধারণ তহবিলে একটি বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করে। গত দশ বৎসরে আয়-ব্যয়ের বিপর্য্যয় বশতঃ অসামর্থহেতু সরকারী সাধারণ তহবিল ও তাহার স্বকীয় মূল্য-হ্রাসভাণ্ডারের (Depreciation Fund) নিকট তাহার ঋণের পরিমাণ হইয়াছিল ৬৫ কোটি টাকা। দেয় অর্থ প্রদানের বাধ্যতা-মূলক দায়িত্ব হইতে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত বিরতি (Moratorium) লাভ করিয়া, উন্নতির সূচনামুখে মাশুল ও ভাড়ার হার অযথা বৃদ্ধি করিয়া রেল-কর্ত্তৃপক্ষ আত্ম-সংরক্ষণের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন, এবং তাহারই ফলে উদ্বৃত্ত অর্থের অধিকারী হইয়াছেন।

১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে সমস্ত ভারতে সর্ব্ববিধ রেলপথে যাত্রী-সংখ্যা পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা এক কোটি হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছিল—৫২'৯৭ কোটিতে, এবং যাত্রী-আয় ২৩ লক্ষ টাকা কমিয়া ৩০'৪৭ কোটিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। যাত্রী-আয়ের এই ক্ষতি প্রচুর পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছিল মাল-বহনের আয়বৃদ্ধি দ্বারা। রেল-বাহিত মালের একুন ওজন পূর্ব্ববৎসরের সংখ্যা, ৮'৮৪ কোটি টন হইতে ৯'২২ কোটি টনে উন্নীত হইয়াছিল। মাল-বহনের আয়ও ৬'৪৫ কোটি টাকা হইতে উঠিয়াছিল ৭'২৫ কোটি টাকার অঙ্কে।

ঐ বৎসরের শেষে, অর্থাৎ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে গঠনমূলক কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৫২ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ৭৫৮ কোটি টাকা ছিল সরকারী রেল-পথের জন্য এবং অবশিষ্ট ৯৪ কোটি টাকা ছিল দেশীয় রাজ্য, কোম্পানী ও জিলা-বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত অংশের নিমিত্ত। সরকারী রেলপথের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থের অধিকাংশ, অর্থাৎ ৭২৯ কোটি টাকা ছিল সরকারপ্রদত্ত; আর বাকী ২৯ কোটি ছিল কোম্পানীর পুঁজি। একুন অঙ্কের ৩৪ কোটি টাকা ছিল যুদ্ধ-প্রয়োজনসাধনার্থ আয়-শূন্য রেলপথের নিমিত্ত।

আলোচ্য বর্ষে সরকারী রেলপথের মোট আয় পূর্ব্ব-বৎসরের ৯৪'৪৮ কোটি টাকা হইতে ৯৭'৬৫ কোটি টাকায় উন্নীত হইয়াছিল। ঋণ-লব্ধ অর্থের সুদ, বেঙ্গল ডুয়ার্শ রেলপথ সরকার পরিচালনাধীনে আনিবার মূল্য, এবং ক্ষতিপূরণ খাতে প্রদত্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, সরকারী রেল-পথের 'নিট' লাভ হইয়াছিল ৪'৩৩ কোটি টাকা। এই সমগ্র অর্থ সরকারী সাধারণ তহবিলে জমা দেওয়া সত্ত্বেও ঐ তহবিলের নিকট বাকী ঋণ ছিল ৩০ লক্ষ টাকা।

গত তিন বৎসরের একটি সংক্ষিপ্ত অঙ্ক-তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

বৎসর	আয় (কোটি)	ব্যয় (কোটি)	উদ্বৃত্ত (কোটি)
১৯৩৯-৪০ (সঠিক)	৯৭'৬৫	৯৩'০২	৪'৩৩
১৯৪০-৪১ (খসড়া)	১০৩'৭৫	৯৫'৪৬	৮'২৯
ঐ (বর্ত্তমান)	১০৯'২৫	৯৪'৬৬	১৪'৫৯
১৯৪১-৪২ (খসড়া)	১০৮'২৫	৯৬'৪২	১১'৮৩

১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দ অতীব স্মরণীয় বৎসর। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পশ্চিম রণাঙ্গণে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং ঐ বৎসরের প্রথম কয়েক মাস যুদ্ধের সূচনা এবং পরবর্ত্তী অংশ সমরারম্ভে সঙ্কট-সঙ্কুল হইয়াছিল। যেমন কতিপয় বৃহৎ শিল্পে, তেমনি রেলপথের উপরেও এই ধ্বংসলীলা অতি দূর-প্রসারিণী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অর্থাগমের দিক হইতে এই প্রভাব অতি সুফল-প্রসূ হইয়াছিল। ব্যয়ের অনুপাতে পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের আয়ের স্বল্পতা দূরীভূত হইয়া, রেলপথের জমা-খরচে, লাভের অংশ অসামান্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই লাভের পশ্চাতে

তাহার নিদানভূত যে ধন-সম্পত্তি ও জীবননাশের রুদ্রলীলা প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা অতীব শোচনীয়। এই ধ্বংস-লীলাপ্রসূত লাভের অঙ্কই রেলপথের একমাত্র অংশ নহে। ইহার নিরাকরণ প্রতিকল্পে ত্যাগের ও উৎসর্গের এবং সাহায্য ও সহায়তার পরিমাণও প্রচুর। বহু রেলকর্ম্মচারী যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছে, এবং তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক লোক আনুষঙ্গিক যুদ্ধ-কার্য্যসাধনে ও যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতে অহোরাত্রি পরিশ্রম করিতেছে। রেল-কর্ম্মশালা ও কারখানাগুলি যুদ্ধে প্রয়োজনীয় বহু মাল মসলা যোগান দিতেছে। এমন কি, এঞ্জিন, পাটি প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য্য রেলপথের সরঞ্জাম পর্য্যন্ত সরবরাহ করিতেছে। এই নিমিত্ত আলোচ্য বর্ষে আঠারটি রেলপথের নয়টি রেলপথ হইতে ৩০৫ মাইল পরিমিত পথের পাটি বিচ্যুত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করা হইয়াছে। ফলে, রেলকারখানাতে বড় বড় বাষ্পীয় যান প্রস্তুতার্থ যে বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা বহু বৎসর হইতেই চলিতেছে, তাহা সুদূর-পরাহত হইয়াছে। কোম্পানী-পরিচালিত বোম্বে-বরোদা ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সহিত রাষ্ট্রপরিচালিত নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্যুলা রেলপথের নিমিত্ত যে পঁচিশখানি বাষ্পীয় যান নির্ম্মাণ করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার নিমিত্তও আবশ্যকীয় মাল মসলা এখনও পাওয়া যায় নাই।

গত বৎসর, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের আয়-ব্যয় খসড়ায় (Budget) বর্ত্ম-সচিব আয়ের অঙ্কপাত করিয়াছিলেন ১০৩ কোটিতে। বস্তুতঃ পক্ষে, আয় তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে সওয়া ১০৯ কোটিতে,—পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা প্রায় সাড়ে ১১ কোটি টাকা অধিক। পূর্ব্ব-বৎসরে আয় বাড়িয়াছিল মালের মাশুলে; গত বৎসর আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল—যাত্রীর ভাড়ায়। যাত্রী-সংখ্যার বৃদ্ধি বর্ত্ম-সচিবের মতে জনসাধারণের সাচ্ছল্যেরই নিদর্শন। তিনি বলেন, বর্দ্ধিত হারের বিরুদ্ধবাদীদের আতঙ্ক নিরর্থক হইয়াছে; কেবলমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে, যথা,—সংবাদপত্র, সংবাদ-পত্র ছাপিবার কাগজ, খাদযুক্ত লৌহ, এবং ময়দা—কোথাও সম্পূর্ণ এবং কোথাও আংশিক রেহাই দিতে হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ব্যয়ের অঙ্ক মাত্র ৭ লক্ষ বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ৬৬'৭১ কোটিতে। এই অঙ্কে দেয়-সুদের টাকা যোগ করিয়া ব্যয়ের সমষ্টি দাঁড়াইয়াছিল ৯৪'৬৬ কোটিতে।

পাথুরিয়া কয়লার উপর নির্দ্ধারিত বর্দ্ধিত হারের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে তাহাদের পণ্য-বহনের নিমিত্ত মালগাড়ীর অভাব অনাটন অনেকটা কম ছিল। এই অভাব প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে অনুভূত হয়। এই বিষম অসুবিধা দূরীকরণার্থ গত বৎসর জানুয়ারী মাসে এক জন বিশেষ পরামর্শদাতা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েদ্বয় কয়লা-বহনার্থ মালগাড়ীর চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে মিটাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

বর্ত্তমান ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দের আয়-ব্যয়ের অগ্রিম খসড়ায় (Budget) আয়ের অঙ্ক, গত বৎসরের একুন অপেক্ষা এক কোটি টাকা কমে, অর্থাৎ ১০৮'২৫ কোটিতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কতক-গুলি বিবিধ আয়ের অঙ্ক উপরোক্ত ১০৮'২৫ কোটির সহিত যোগ করিয়া মোট আয়ের সমষ্টি নিরূপিত হইয়াছে ১০৯'০৩ কোটি।

খরচের অঙ্কে আলোচ্য বর্ষে পরিচালন ব্যয়, প্রধানতঃ যুদ্ধ হেতু অতিরিক্ত খোরাকি বাদে, পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা ১'৮৯ কোটি টাকা অধিক হইয়া, ক্ষতিপূরণ বরাদ্দ (Depreciation)সহ দাঁড়াইবে ৯৭'২০ কোটিতে। সুতরাং, বর্ত্তমান বর্ষের আনুমানিক উদ্‌বৃত্ত হইবে ১১'৪৩ কোটি টাকা। এই সচ্ছলতা এত স্বল্প যে, মাশুল কিংবা ভাড়ার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। যাহা হউক, রেল কর্তৃপক্ষ এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কয়লার উপর প্রযুক্ত অতিরিক্ত শুল্ক শতকরা পাঁচ অংশ কমাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তবে গত এবং বর্ত্তমান বর্ষের উদ্‌বৃত্ত হইতে কেন্দ্রীয় সাধারণ তহবিল, রেলওয়ে তহবিল হইতে মোট ১১'৭৮ কোটি টাকা পাইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধসঙ্কটে এই টাকা ভারতের দুর্ব্বহ ভার-প্রপীড়িত করদাতার কিছু ভার লাঘব করিবে। গত দশ বৎসরের অপ্রতিহত মন্দার পশ্চাতে এই উদ্‌বৃত্ত অর্থ না আসিলে যুদ্ধ-প্রয়োজনের তাগিদে ভারতের করদাতৃগণকেই এই টাকাটাও যোগাইতে হইত।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের অবসানে সংগঠন ও সম্প্রসারণ মূলধনের পরিমাণ ছিল, ৮৫২'৫৯ কোটি টাকা। এই একুনে, রাষ্ট্র-পরিচালিত রেলপথের অংশ ছিল ৭৫৮'৬২ কোটি এবং দেশীয় রাজ্য ও কোম্পানী-পরিচালিত রেলপথের অংশ ছিল ৯৩'৯৭ কোটি। রাষ্ট্র-অধিকারভুক্ত রেলপথে নিবদ্ধ মূলধনের অধিকাংশ সরকারী অর্থ, অর্থাৎ পঁচিশ ভাগের ২৪ ভাগ সরকারী; এবং বাকী এক ভাগ মাত্র কোম্পানীর। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের অবসানে মূলধনের পরিমাণ কম-বেশী ৭৬১ কোটি টাকা।

গত দশ বৎসরের মন্দার ফলে গঠনমূলক কার্য্যে নবনির্ম্মাণের পরিমাণ নগণ্য। আলোচ্য বর্ষত্রয়ের বিশেষত্ব—রেলপথের বিস্তার নহে; রাষ্ট্র-অধিকৃত লৌহবর্ত্মের সম্প্রসারণ। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বহু রাষ্ট্র-অধিকারভুক্ত রেলপথ কোম্পানী-(যৌথ প্রতিষ্ঠান) পরিচালিত ছিল। তখন রেলপথের আয়ও সরকারী সাধারণ তহবিলে জমা হইত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম এক্‌ওয়ার্থের নেতৃত্বাধীনে যে রেলপথ-তদন্ত-সমিতি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার দুইটি প্রধান নির্দ্দেশ ছিল। প্রথম, রাষ্ট্র-অধিকারভুক্ত, অথচ কোম্পানী-পরিচালিত রেলপথগুলিকে ক্রমে ক্রমে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে, সম্পূর্ণরূপে সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন, এবং রেলপথের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাকল্পে সরকারী সাধারণ তহবিল হইতে রেলপথের তহবিল পৃথকীকরণ। শেষোক্ত সংস্কারকে অচিরে প্রবর্ত্তিত করা হয়; কিন্তু প্রথমোক্তটিকে নানা কারণে অবহেলা করা হইয়াছে।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে, এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে রাষ্ট্র-অধিকৃত ও পরিচালিত। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথকে কোম্পানী-পরিচালনা হইতে রাষ্ট্র-শাসনে আনা হয়,এবং রাষ্ট্র-অধিকৃত আউদ্ ও রোহিলখণ্ড রেল-পথকে এই লৌহ-বর্ত্মেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঐ বৎসর গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্যুলা রেলপথকেও রাষ্ট্র-পরিচালনাধীনে আনা হয়। কয়েক বৎসর পরে, বর্ম্মা রেলপথকেও রাষ্ট্র পরিচালনান্তর্গত করা হয়; কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আসাম বেঙ্গল, এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল নাগপুর ও রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেলপথের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে।

কোম্পানী ও রাষ্ট্র-শাসনের আপেক্ষিক সৌকর্য্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধের

অবকাশ আছে নিশ্চিত; কিন্তু, দ্বৈত-শাসনের অনুপযোগিতা এবং কুফল সর্ব্বজনবিদিত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা উপকারী, সন্দেহ নাই; কিন্তু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুমোদনযোগ্য নহে।

রেলপথ ও ডাক ও তার প্রভৃতির স্থায় জনসাধারণের অতি প্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠান। এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান মাত্রই আয়ের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র; কিন্তু ব্যবসায় অপেক্ষা, ব্যবহারই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং, রাষ্ট্র-শাসনই ইহার যুক্তিযুক্ত বিধান। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে সরকার ৪৩,৩৫,০০০৲ টাকা মূল্যে হরিদ্বার-দেরা রেলপথ সরকারী-পরিচালন-তন্ত্রের অধীন করেন। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ১৭৩ লক্ষ টাকা মূল্যে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলপথ অধিকার করেন; এবং ইহাকে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল শাসনতন্ত্রভুক্ত করেন। এই বৎসর সিন্ধু দক্ষিণ তীর (Sind Right Bank Feeder Line) রেলপথ উন্মুক্ত হয়, এবং সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথকে কোচীন-পোতাশ্রয়ের সহিত গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়। পক্ষান্তরে, যুদ্ধের প্রয়োজনে কয়েকটি শাখা-পথকে (৩০৫ মাইল) স্থানচ্যুত ও স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

বর্ত্তমান বর্ষে বোম্বে-বরোদা ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া এবং আসাম বেঙ্গল রেলপথকে রাষ্ট্রশাসনাধীন করা হইবে। প্রথমোক্ত রেলপথের শতকরা ৯৬ অংশ, এবং শেষোক্তের শতকরা ৯২ অংশ মূলধন সরকারী। পূর্ণস্বত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত পরিচালক কোম্পানীদ্বয়কে দিতে হইবে যথাক্রমে ২-৭৫ কোটি ও ২ কোটি টাকা। বোম্বে-বরোদা ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথ বিশেষ লাভজনক, কিন্তু আসাম বেঙ্গল ক্ষতিদায়ক। শেষোক্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতি বৎসর ৬০ হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ পরিচালক কোম্পানীকে দিতে হইতেছে। যখন লোকশানের অঙ্ক সরকারকে বহন করিতে হইতেছে, তখন স্বহস্তে পরিচালন-ভার লওয়াই যুক্তিযুক্ত। রাষ্ট্র-শাসনাধীন হইলে এই রেলপথকে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের সহিত একই শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিলে, শাসন-সৌজন্যের সহিত ব্যয়-লাঘব ও আয়-বৃদ্ধির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। লাভ না হইলেও অন্যের পরিচালনাধীন রাখিয়া ক্ষতির অঙ্ক বহন পূর্ব্বক পরিচালক-কোম্পানীর অংশীদারগণের লভ্যাংশ (Dividend) যোগাইবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই।

আগামী বর্ষের প্রথম দিনেই, অর্থাৎ ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা তারিখে সরকার সুরাট হইতে আমালনার পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাপ্তি-ভ্যালী রেলপথ লইবার সংকল্প করিয়াছেন। এই রেলপথ বোম্বে-বরোদা রেলপথের পরিচালনাধীন; সুতরাং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতেই ইহা রাষ্ট্র-পরিচালনাধীন হইবে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ ও রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেলপথদ্বয়ের চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষে পূর্ব্ব-চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়াছিল; কিন্তু সরকার তখন আত্ম অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের শেষ দিনে মান্দ্রাজ এবং সাউদার্ণ মাহারাট্টা ও সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথদ্বয়ের চুক্তির মেয়াদ ফুরাইবে। এই দুইটি রেলপথ সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীন হইলে, প্রথম শ্রেণীর রেলপথের মধ্যে মাত্র বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ পরিচালক-কোম্পানীর অধীন থাকিবে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের শেষ দিনে এই রেলপথের চুক্তির মেয়াদ ফুরাইবে।

ভারতের জনমতের ঐকান্তিক আগ্রহানুযায়ী, একওয়ার্থ-তদন্ত সমিতির দৃঢ় অনুমোদিত, রাষ্ট্র-অধিকারের ন্যায়-সঙ্গত পৃষ্ঠপোষকরূপে সর্ব্বতোভাবে রাষ্ট্র-পরিচালন নীতির একনিষ্ঠ অনুসরণ অব্যাহত থাকিলে পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে বৃটিশ-ভারতের সমগ্র গরিষ্ঠ লৌহবর্ত্ম সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রশাসনতন্ত্রান্তর্গত হইবে। ইহাই সর্ব্বদেশের রীতি ও নীতি। ভারতের ধনিক, বণিক, শিল্পাশ্রয়ী, সওদাগরি সমিতি ও জনসাধারণের তাহাই অভিমত - ঐকান্তিক কামনা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রিয়া

ওগো প্রিয়া, ওগো প্রিয়া!
অতীত দিনের স্মৃতির স্মরণে
আজো পুলকিত হিয়া!

কোন্ ফাল্গুনে ফুল-সুগন্ধে মর্ম্মর-গীতি শেষে,
আনত-নয়নে এসেছ আলয়ে নবীনা গৃহিণী বেশে,
তখন তোমার অবগুণ্ঠনে, কত মায়া ছিল
লুকানো কে জানে।
কে জানে কি ছিল গন্ধ-মদির নিশীথ-নিবিড় কেশে?
কল্প-লোকের কি মধু-মাধুরী ঝরিত নয়ন দিয়া।
ওগো প্রিয়া, ওগো প্রিয়া!

বরষার দিনে স্নিগ্ধ-আননে জড়ায়ে ধূপের মায়া,
সারা গৃহ মোর পূর্ণ ক'রেছে অম্লান তব কায়া।
বিকচ কদম সমীরণ ভরে, দুলিয়া উঠিত নব শাখা 'পরে,
গৃহ-অঙ্গন করিত পূর্ণ সজল জলদ-ছায়া।
পুলক-শিহরে নীপ তরুশাখা উঠিত মুঞ্জরিয়া।
ওগো প্রিয়া, ওগো প্রিয়া!

শরৎ তোমার অর্ঘ্য র'চেছে ঝরা-শেফালির ফুলে।
শস্য-শীর্ষে শ্যামলা বসুধা উঠিয়াছে দুলে দুলে।
তুমি স্নান করি স্বচ্ছ সলিলে এলায়েছ কেশভার।
আমি কবি তব নিকটে বসিয়া, পুষ্পাভরণ দিতাম রচিয়া;
কোন দূরাগত পূরবী রাগিণী উদাস করিত হিয়া।
ওগো প্রিয়া, ওগো প্রিয়া!

স্বপনের মত দিন কেটে গেছে অবসর তায় ছিল না কিছু।
কপোতীর সম ক'রেছ কূজন, ছায়ার মতন নিয়েছ পিছু।
আজো সেই সুরে প্রিয় নাম ধরে ডাকো
তুমি দেবী সগৌরবে।
সে রস-রভসে, সুমধুর হাসে, চিত্ত-আকাশ ভরিয়া নিয়া,
প্রেম-নীহারিকা রচি পুনরায় বাস্তবে যাই বিস্মরিয়া।

বেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ)।

পতঞ্জলি-বিরচিত ব্যাকরণমহাভাষ্য

(পস্পশাহ্নিক—অনুবাদ ও ব্যাখ্যা)

৬

'স্ব' শব্দের একটি অর্থ ধন ; যাহার ধন নাই (অবিদ্যমানং স্বং যস্য) এই অর্থে 'অস্ব' শব্দ সাধু (শুদ্ধ) ; কিন্তু অশ্ব (ঘোড়া) অর্থে অস্ব শব্দ অশুদ্ধ। অশ্বে যদি 'নির্দ্ধন' এই অর্থ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে 'অস্ব' শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে তাহা শুদ্ধই হইবে ; পশুজাতিবিশেষ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে অশ্বে 'অস্ব' শব্দের প্রয়োগ করা হইলে, সেই স্থলে 'অস্ব' শব্দকে অশুদ্ধ বুঝিতে হইবে। দেশ-বিশেষে 'গো' বুঝাইবার অভিপ্রায়ে 'গোণী' এই অপভ্রংশ শব্দের ব্যবহার করা হইত ; 'গো' অর্থে এই 'গোণী' শব্দ অশুদ্ধ ; কিন্তু পাত্রবিশেষ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে যদি 'গোণী' শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তবে সে স্থলে 'গোণী' শব্দটিকে সংস্কৃত সাধু (শুদ্ধ) শব্দ মনে করিতে হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্র অর্থ-বিশেষের অবলম্বনে শব্দের সাধুত্ব (শুদ্ধতা) এবং অসাধুত্ব (অশুদ্ধতা) ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। *

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, যিনি বিশেষ নিপুণ, তিনিই অর্থবিশেষে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করিতে পারেন, অন্যের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে ; এই প্রয়োগ-নিপুণতা ব্যাকরণের অধ্যয়নের দ্বারাই অর্জ্জন করা যায় ; অন্য প্রকারে এই নিপুণতা অর্জ্জিত হইতে পারে না।

এই শ্লোকে 'বাগ্যোগবিদ্' এই শব্দটি আছে। ইহার মোটামুটি অর্থ—বাক্ = শব্দ, তাহার যোগ = অর্থ-বিশেষের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহার জ্ঞাতা ;—অর্থবিশেষের সহিত শব্দের যে সম্বন্ধ, তাহা যিনি জানেন, তিনি 'বাগ্‌যোগবিদ্'। এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে 'বাগ্‌যোগবিদ্' শব্দ হইতে 'বৈয়াকরণ' এই অর্থ পাওয়া যায়।

এখানে 'যোগ' শব্দের 'চিত্তসমাধান' † রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে 'বাগ্‌যোগবিদ্' শব্দের অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে। সেই অর্থ শাস্ত্রে পরিগৃহীত হয় নাই, এরূপ বলা যায় না ; পরন্তু 'বাগ্‌যোগবিদ্' শব্দের সেই অর্থটিও পরিগৃহীত হইবার যোগ্য,—ইহা শব্দশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়।

বৈয়াকরণগণের সিদ্ধান্তে শব্দের স্থান কেবল ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ আছে, এমন নহে। ব্যবহারিক স্বরূপ ব্যতীত শব্দের আর একটি স্বরূপও বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়াছে।

শব্দের দুইটি স্বরূপ—কার্য্য এবং নিত্য। ইহার মধ্যে শব্দের কার্য্য স্বরূপটি ব্যাবহারিক,—যে সকল শব্দের দ্বারা আমরা লৌকিক ব্যবহারক্ষেত্রে মনের ভাব প্রকাশ করি, সেই সকল শব্দই ব্যবহারিক। ইহা শব্দের পারমার্থিক স্বরূপ নহে,—ইহা শব্দের কল্পিত রূপ। শব্দের যেটি নিত্য স্বরূপ, সেইটিই তাহার পারমার্থিক রূপ। ব্যবহারিক শব্দে আমরা একটা বর্ণের পৌর্ব্বাপর্য্যাত্মক ক্রম দেখিতে পাই ; এই ব্যবহারিক অবস্থায় আমরা শব্দে যে ক্রম লক্ষ্য করি,—বাস্তবপক্ষে সে ক্রম শব্দে নাই,—তাহা শব্দের অভিব্যঞ্জক ধ্বনির ক্রম ; শব্দে সেই ক্রম আরোপিত হইয়া প্রতীত হয়। নিত্য স্ফোটাত্মক শব্দ এই আরোপিত ক্রমের দ্বারা যুক্ত হইয়া ব্যবহারিক অবস্থায় উপনীত হয়।

এই যে শব্দের নিত্যস্বরূপ—ইহাই সকল জগতের নিমিত্ত কারণ এবং সকল জগতের উপাদান। যিনি বাগ্‌যোগবিদ্,—যিনি এই নিত্য চৈতন্যস্বরূপ শব্দব্রহ্মে

* "অস্বগোণ্যাদয়ঃ শব্দাঃ সাধবো বিষয়ান্তরে।
নিমিত্তভেদাৎসর্ব্বত্র সাধুত্বং সমবস্থিকম্॥ বাক্যপদীয় ১।১৫০
"আবপনে গোণীতি স্ববিয়োগাভিধানে চ অস্ব ইতি সাধ্বেব।"
পুণ্যরাজটীকা।
"স এব শব্দঃ ক্বচিদর্থে কেনচিন্নিমিত্তেন প্রযুক্তঃ সাধুরন্যত্র ত্বসাধুঃ। যথাঽশ্বেঽস্বশব্দো ধনাভাবনিমিত্তকঃ সাধুর্জাতিনিমিত্তকোঽসাধুঃ। এবং চ গোণীশব্দঃ সাধর্ম্ম্যাৎ প্রযুক্তঃ সাধুর্জাতিনিমিত্তকোঽসাধুঃ।"
মহাভাষ্যপ্রদীপ ১।১

† "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" পাতঞ্জলযোগসূত্র ১।২

চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে অভিজ্ঞ,—তিনি অজ্ঞানের বন্ধন অতিক্রম করিয়া এই শব্দব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হ'ন।* এই বিষয়ের সমর্থন করিবার উদ্দেশে পুণ্যরাজ বাক্যপদীয়ের (১।১৩২) টীকায় অধুনা অপরিজ্ঞাত কোন গ্রন্থ হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

"প্রাণবৃত্তিমতিক্রান্তে বাচস্তত্ত্বে ব্যবস্থিতঃ।
ক্রমসংহারযোগেন সংহৃত্যাত্মানমাত্মনি ॥
বাচঃ সংস্কারমাধায় বাচং জ্ঞানে নিবেশ্য চ।
বিভজ্য বন্ধনান্যস্যাঃ কৃত্বা তাং ছিন্নবন্ধনাম্ ॥
জ্যোতিরান্তরমাসাদ্য ছিন্নগ্রন্থিপরিগ্রহম্।
পরেণ জ্যোতিষৈকত্বং ছিত্ত্বা গ্রন্থীন্ প্রপদ্যতে ॥"

বাক্ অর্থাৎ শব্দের যথার্থ যে স্বরূপ, তাহা প্রাণবায়ুর ব্যাপারের অতীত ; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণবায়ুর ব্যাপারকে প্রাণায়ামের দ্বারা নিরুদ্ধ করিতে না পারিলে, শব্দব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের অনুসন্ধান করিতে পারা যায় না। যিনি 'বাক্‌তত্ত্বে'র উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে প্রাণায়ামের অভ্যাসের দ্বারা 'কুম্ভকে'র সহায়তায় প্রাণবায়ুর ক্রিয়াকে রোধ করিতে হইবে ; এই অবস্থায় তিনি 'বাক্‌তত্ত্বে' অবস্থিত হইতে পারিবেন অর্থাৎ তাঁহার শব্দব্রহ্মে 'সবিকল্প সমাধি' লাভ হইবে। তাহার পর, যে যোগে অর্থাৎ যে সমাধিতে 'ক্রমে'র অবভাস হয় না, সেই অক্রম অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক সমাধির সহায়তায় আত্মাকে আত্মাতেই সংহৃত করিতে হইবে অর্থাৎ নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এইরূপ সমাধিলাভ ঘটিলে বাক্‌স্বরূপ শব্দব্রহ্মে যে সকল অজ্ঞান-কল্পিত মল সংস্পৃষ্ট হইয়া আছে, তাহা হইতে সেই 'বাক্ তত্ত্বে'র শুদ্ধি সাধিত হয় ; ইহার অভিপ্রায় এই যে, নির্ব্বিকল্পক সমাধির অবস্থায় চিত্তের পূর্ণ স্থৈর্য্য সাধিত হওয়ায় যথার্থ বস্তুর গ্রহণে চিত্তের যে সামর্থ্য অভিব্যক্ত হয়, তাহার প্রভাবে শব্দব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের অভিব্যক্তি ঘটে। এই অবস্থায় 'বাক্‌তত্ত্বে'র সহিত স্বরূপ-চৈতন্যের যে স্বাভাবিক অভেদ বিদ্যমান আছে, তাহা সেই যোগীর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়া থাকে। চৈতন্যময় যে 'বাক্‌তত্ত্ব', ইহার সহিত অজ্ঞান-কল্পিত মলের বিয়োগ ঘটিলে এই 'বাক্‌তত্ত্ব' অজ্ঞান-সম্বন্ধ-রহিত হইয়া যায় ; এই সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞান-কল্পিত বন্ধন হইতে বিমুক্ত যে 'বাক্‌তত্ত্ব', তাহাই স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম। যিনি 'বাগ্‌যোগবিদ্', তিনি এই পরম জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশমান শব্দব্রহ্মের সহিত ঐক্যলাভ করেন অর্থাৎ মোক্ষের অধিকারী হ'ন।

* বাক্যপদীয়-পুণ্যরাজটীকা ১।১৩২

বৈয়াকরণ সম্প্রদায় এই 'বাক্‌তত্ত্ব' এবং উপনিষৎ-প্রতিপাদিত স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্ম,—এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেন নাই। অতএব বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের মতে যিনি 'বাক্‌তত্ত্বে'র সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন।

উপরে আমরা যতটুকু আলোচনা করিলাম, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—'বাগ্‌যোগবিদ্' শব্দের একটি অর্থ ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ এবং অন্য অর্থ আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত সংস্পৃষ্ট। ইহার মধ্যে প্রথম যে অর্থ, সেই অর্থটিই এখানে গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। যিনি শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনিই ব্যবহারকালে অর্থবিশেষে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করিতে সমর্থ ; সুতরাং এখানে পতঞ্জলি 'বাগ্‌যোগবিদ্' শব্দের দ্বারা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।* অতএব দেখা যাইতেছে, 'বাগ্‌যোগবিৎ' এই শব্দটির এখানে 'বৈয়াকরণ' এই অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

মূল।—কঃ ? বাগ্‌যোগবিদেব। কুত এতৎ ? যো হি শব্দাঞ্জানাতি, অপশব্দানপ্যসৌ জানাতি।

* এখানে নাগেশভট্ট—'বাগ্‌যোগবিৎ' শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন :—

"বাচো যোগঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগেনার্থবিশেষপরত্বম্, তদ্বেত্তীতি বাগ্‌যোগবিৎ।" মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।—'বাক্' অর্থাৎ শব্দের যোগ=প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগের দ্বারা অর্থবিশেষের প্রতিপাদন-সামর্থ্য—ইহা যিনি জানেন, তিনি বাগ্‌যোগবিৎ।

শব্দবিশেষের সহিত অর্থবিশেষের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই কোন বিশেষ শব্দের দ্বারা কোন বিশেষ অর্থের প্রতীতি হয়। শব্দের এবং অর্থের এই যে পরস্পর সম্বন্ধ, ইহা প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগের দ্বারা জানিতে পারা যায়। অতএব যিনি 'বাগ্‌যোগবিৎ', অর্থাৎ বৈয়াকরণ, তিনি প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগের দ্বারাই শব্দের অর্থবিশেষ প্রতিপাদনের যে যোগ্যতা, তাহা জানিতে পারেন।

বাক্=শব্দ, যোগ=সম্বন্ধ+বিৎ=জ্ঞাতা ; এই সমস্ত পদটির আক্ষরিক অর্থ হইতেছে শব্দের যে (অর্থের সহিত) সম্বন্ধ, তাহার যিনি জ্ঞাতা অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের পরস্পর যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ যিনি জানেন।

যথৈব হি শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম এবমপশব্দজ্ঞানেঽপ্যধর্ম্মঃ। অথবা ভূয়ানধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি; ভূয়াংসোঽপশব্দাঃ, অল্পীয়াংসঃ শব্দা ইতি। একৈকস্য হি শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ; তদ্‌যথা গৌরিত্যস্য গাবী গোণী গোতা গোপোতলিকেত্যেবমাদয়ো বহবোঽপভ্রংশাঃ। অথ যোঽবাগ্‌যোগবিদ্, অজ্ঞানং তস্য শরণম্।

অনুবাদ।—কে (অপশব্দের=অশুদ্ধ শব্দের দ্বারা দূষিত হন)? (যিনি) বাগ্‌যোগবিদ্ (তিনি)ই। কেন ইহা (হয়)? যিনি (শুদ্ধ) শব্দ জানেন, তিনি অপশব্দও (অশুদ্ধ শব্দও) জানেন। যেমন (শুদ্ধ) শব্দের জ্ঞানে ধর্ম্ম (হয়), এইরূপ অপশব্দের (অশুদ্ধ শব্দের) জ্ঞানেও অধর্ম্ম (হয়); অথবা, (অপশব্দের জ্ঞানে) অধিক অধর্ম্মের প্রাপ্তি ঘটে; যেহেতু, অপশব্দ অধিক এবং (সাধু) শব্দ (তদপেক্ষা) অল্প। কারণ, এক একটি (সাধু) শব্দের বহু অপভ্রংশ; যথা—'গৌঃ' এই (সাধু) শব্দের 'গাবী' 'গোণী' 'গোতা' 'গোপোতলিকা'—এইরূপ বহু অপভ্রংশ। আর যিনি অবাগ্‌যোগবিদ্, অজ্ঞান তাঁহার শরণ।

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্ব প্রদর্শিত "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে" ইত্যাদি শ্লোকের অন্তিমভাগে "দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ" এইরূপ উক্তি আছে। এস্থলে 'দুষ্যতি' এই ক্রিয়াপদের কোন কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যদিও 'বাগ্‌যোগবিৎ' এই পদটি 'দুষ্যতি' এই ক্রিয়াপদের সন্নিধানে উচ্চারিত আছে, তথাপি তাহার সম্বন্ধ 'দুষ্যতি' এই ক্রিয়াপদের সহিত হওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে; এই সংশয়ের নিরাকরণের জন্য মহাভাষ্যকার 'দুষ্যতি' এই ক্রিয়ার কর্ত্তা কে হইতে পারে, সেই বিষয়ে বিচারের অবতারণা করিয়াছেন।

ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বপক্ষে ইহাই বলিতেছেন যে, যিনি বৈয়াকরণ, তিনি যেমন শুদ্ধ শব্দ জানেন, সেইরূপ অশুদ্ধ শব্দও জানেন। শুদ্ধ শব্দের জ্ঞান হইতে যেরূপ তাঁহার ধর্ম্মলাভ হইয়া সেই ধর্ম্মের ফলে ঐহিক এবং পারলৌকিক অভ্যুদয় (কল্যাণ) লাভ হয়, সেইরূপ অশুদ্ধ শব্দের জ্ঞানের ফলে তাঁহার অধর্ম্মের প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। শ্লেষ্মার জনক স্নিগ্ধ বস্তুর আহার করিলে তাহা হইতে শ্লৈষ্মিক ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহার বিপরীত রূক্ষ বস্তুর সেবন করিলে সেই শ্লৈষ্মিক ব্যাধি দূরীভূত হয়। এখানে দেখা যায়, পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব বিভিন্ন বস্তু হইতে যে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়, সেই ফলও পরস্পর বিপরীত স্বভাবের হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে বলিতে হয়, বৈয়াকরণের সাধু শব্দের জ্ঞান হইতে যেমন ধর্ম্মলাভ হয়, সেইরূপ অসাধু শব্দের জ্ঞান হইতে অধর্ম্মের প্রাপ্তি ঘটিবেই; অসাধু শব্দের সাধুশব্দ অপেক্ষা সংখ্যাধিক্য আছে; এই জন্য বৈয়াকরণের অল্পসংখ্যক সাধু শব্দের জ্ঞান হইতে যতটুকু ধর্ম্ম হইবে, অসাধু শব্দের জ্ঞান হইতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অধর্ম্ম হইবে। সাধু শব্দের জ্ঞান করিতে গেলে, অসাধু শব্দের জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। যে বৈয়াকরণ নহে, সে অজ্ঞ; এই অজ্ঞতাই অবৈয়াকরণের অধর্ম্ম হইতে অব্যাহতিলাভের একমাত্র হেতু। যে অজ্ঞ—শাস্ত্রের দৃষ্টিতেও সে ক্ষমার্হ। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি তির্য্যক্ জন্তুর ব্রহ্ম-হত্যাদি নিষিদ্ধ আচরণ হইতে কোন পাপ জন্মে না; এইরূপ মনুষ্যের মধ্যে যাহারা অজ্ঞ, তাহারা পশুর সমান; তাহাদের পক্ষে অশুদ্ধ শব্দের উচ্চারণ দোষ-জনক হইতে পারে না। অতএব, এখানে 'দুষ্যতি' এই ক্রিয়ার কর্ত্তা অন্য কেহ নহে,—যিনি 'বাগ্‌যোগবিদ্' অর্থাৎ বৈয়াকরণ, তিনিই এই 'দুষ্যতি' ক্রিয়ার কর্ত্তা। ইহাই এখানকার পূর্ব্বপক্ষের সারাংশ।

মূল।—বিষম উপন্যাসঃ। নাত্যন্তায়াজ্ঞানং শরণং ভবিতুমর্হতি। যো হ্যজানন্ বৈ ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সুরাং বা পিবেৎ, সোঽপি মন্যে পতিতঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—(এই) উপন্যাস (বাক্য) বিষম। অজ্ঞান অত্যন্ত শরণ হইতে পারে না। যে না জানিয়া ব্রাহ্মণকে বধ করিবে অথবা সুরাকে পান করিবে, সেও পতিত হইবে, ইহা মনে করি।

মন্তব্য।—এখানে 'অত্যন্তায়' এই পদটি অব্যয়; ইহা 'অত্যন্ত' এই শব্দের সমানার্থক, ইহা নাগেশভট্ট মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্দ্যোতে বলিয়াছেন। এস্থলে 'অত্যন্তায়' এই শব্দটিকে চতুর্থীবিভক্তির একবচনান্ত বিশেষণপদরূপে গ্রহণ করিয়া, 'অনর্থায়' এই বিশেষ্যপদের অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করাও হয়,—'অত্যন্ত অনর্থের নিমিত্ত অজ্ঞান শরণ হইতে পারে না।'

ব্যাখ্যা।—বৈয়াকরণের অশুদ্ধ শব্দের জ্ঞান হইতে গুরুতর পাপ জন্মিবে এবং অবৈয়াকরণের অশুদ্ধ শব্দের উচ্চারণের দ্বারাও কোনরূপ পাপের সংস্পর্শ ঘটিবে না,—এখানে পূর্ব্বপক্ষে এইরূপ যে কথা হইয়াছে, ইহা বিষম অর্থাৎ অসমীচীন। যাহারা শাস্ত্রে অধিকারী, তাহাদের শাস্ত্রের অনুশীলন যেমন অবশ্যকর্ত্তব্য, সেইরূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট বিধি ও নিষেধের পরিপালনও অবশ্যকর্ত্তব্য। যে অজ্ঞ সে দুইটি অপরাধে অপরাধী; প্রথমতঃ, শাস্ত্রের অনুশীলন,—যাহা তাহার পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা না করায় তাহার অপরাধ হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্র-জ্ঞান না থাকায় সে শাস্ত্রানুকূল আচরণকে বর্জ্জন এবং নিষিদ্ধ আচারের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছে,—ইহাতেও তাহার অপরাধ জন্মিয়াছে; অজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে তাহার অজ্ঞতার জন্য দ্বিগুণ পাপে পাপী হইলেও, তাহার অজ্ঞতাকেই তাহার পাপ হইতে অব্যাহতিলাভের হেতুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে,—ইহা কোনরূপেই যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে পারা যায় না; সুতরাং ইহা বিষম উপন্যাস। অজ্ঞানবশতঃ পাপ করিলে সে পাপকে শাস্ত্রে লঘুরূপে গণ্য করা হইয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু এই অজ্ঞান কিরূপ, তাহা বিচার করিয়া বুঝা আবশ্যক। শাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, অসত্য ভাষণ প্রভৃতিকে পাপের মধ্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্র-বাক্য না জানিয়াও যদি কেহ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ করে, তাহা হইলে সে স্থলে তাহার এই নিষেধ-শাস্ত্র না জানার জন্য পাপের লঘুতা হইবে, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে; এই সকল শাস্ত্রবাক্যের জ্ঞান থাকুক কি না থাকুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না; যদি কেহ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিয়া তাহাকে বধ করে,—সে ক্ষেত্রে সেই ঘাতক ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যার নিষেধপ্রতিপাদক শাস্ত্র না জানিলেও, তাহার ব্রহ্মহত্যার সম্পূর্ণ পাপই হইবে। তবে যদি কেহ ব্রাহ্মণকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া না জানিয়া তাহাকে বধ করে অথবা সুরাকে 'সুরা' বলিয়া না জানিয়া জলভ্রমে সুরা পান করে, সে ক্ষেত্রে তাহার ব্রহ্মহত্যা কিংবা সুরাপানের সম্পূর্ণ পাপ হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে অজ্ঞান তাহার পাপের অল্পতার কারণ হইবে। এই যুক্তি অপশব্দের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইবে। যদি কেহ নিষেধ-শাস্ত্র না জানিয়া যজ্ঞকর্ম্মাদিতে অপশব্দের প্রয়োগ করে, তবে তাহার এ জন্য যে পাপ হওয়া উচিত, সে পাপ হইবেই। অতএব এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যাকরণ-জ্ঞান-হীন ব্যক্তির অজ্ঞতা তাহার পাপ হইতে অব্যাহতি-লাভের হেতু হইতে পারে না।

মূল। এবং তর্হি—'সোঽমন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র
বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ।'
কঃ? অবাগ্‌যোগবিদেব। অথ যো বাগ্‌যোগবিদ্,
বিজ্ঞানং তস্য শরণম্।

অনুবাদ। তাহা হইলে 'সে বাগ্‌যোগবিদ্ পরলোকে অনন্ত জয় প্রাপ্ত হয় এবং অপশব্দ সমূহের দ্বারা দূষিত হয়'—কে? (উত্তর) অবাগ্‌যোগবিদ্ (=ব্যাকরণজ্ঞান-হীন)। আর যিনি বাগ্‌যোগবিদ্,—বিজ্ঞান তাঁহার শরণ (পাপ হইতে অব্যাহতি-লাভের কারণ)।

ব্যাখ্যা। অপশব্দ অর্থাৎ ব্যাকরণ-প্রতিপাদিত যে শুদ্ধ শব্দ, সেই শুদ্ধ শব্দ ব্যতীত অন্য যে সকল অশুদ্ধ শব্দ, সেই অশুদ্ধ শব্দসমূহের দ্বারা বৈয়াকরণ দূষিত হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শুদ্ধ শব্দের জ্ঞান করিতে গেলে অশুদ্ধ শব্দের জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী—অবর্জ্জনীয়। একটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলে, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল প্রযত্ন হইতে আনুষঙ্গিকভাবে অবর্জ্জনীয়রূপে যদি অন্য কোন কিছু সিদ্ধ হইয়া যায়, তবে সে স্থলে সেই আনুষঙ্গিকরূপে সিদ্ধ বস্তুর পৃথক্ ফল থাকে না।

যেমন কোন বস্তুর দর্শন করিতে হইলে চক্ষুর উন্মীলন করিতেই হয়; চক্ষুর উন্মীলন ব্যতীত দর্শন-ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে দর্শন-ব্যাপারের যাহা ফল, চক্ষুর উন্মীলনেরও ফল তাহাই;—চক্ষুর উন্মীলনের অন্য কোন ফল কল্পনা করা হয় না। আমরা শব্দ-জ্ঞানের বিষয়ে এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব। শব্দ-জ্ঞান করিতে গেলে অপশব্দের জ্ঞানকে বর্জ্জন করিবার কোন উপায় নাই; সেই শব্দ-জ্ঞানের সহিত অপশব্দ-জ্ঞানের অবর্জ্জনীয় সম্পর্ক বিদ্যমান; যিনি সাধু শব্দের জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য কোনরূপ ব্যাপার করিবেন, তাঁহার সেই ব্যাপার হইতেই অপশব্দের জ্ঞানও হইবে। অপশব্দ হইতে পৃথক্ করিয়াই

সাধু শব্দকে জানিতে হয়; এরূপ অবস্থায় অপশব্দ-জ্ঞান না হইলে সাধুশব্দের জ্ঞান হইতেই পারে না। অতএব সাধুশব্দের জ্ঞান-প্রসঙ্গে বৈয়াকরণের যে অসাধুশব্দের জ্ঞান হয়, তাহার পৃথক্ কোন ফল নাই; সাধুশব্দের জ্ঞানই তাঁহাকে পাপ হইতে রক্ষা করিবে। * এই জন্য এখানে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"অথ যো বাগ্‌যোগবিদ্, বিজ্ঞানং তস্য শরণম্"—যিনি বৈয়াকরণ, জ্ঞানই তাঁহার পরিত্রাণের উপায়।

মূল। ক পুনরিদং পঠিতম্? ভ্রাজা নাম শ্লোকাঃ। কিঞ্চ ভোঃ, শ্লোকা অপি প্রমাণম্? কিঞ্চাতঃ? যদি শ্লোকা অপি প্রমাণম্, অয়মপি শ্লোকঃ প্রমাণং ভবিতুমর্হতি—

যদুদুম্বরবর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।
পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েৎ॥

প্রমত্তগীত এষ তত্র ভবতঃ। যস্ত্বপ্রমত্তগীতস্তৎ প্রমাণম্। "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে।"

অনুবাদ। এই (পদ্য) কোথায় পঠিত (আছে)? ভ্রাজা নামক [illegible] (আছে, তাহাদের মধ্যে এই পদ্য পঠিত আছে)। কি হে, শ্লোকগুলিও প্রমাণ? এই প্রশ্ন হইতে কি বিবক্ষিত? যদি শ্লোকগুলিও প্রমাণ (হয়, তাহা হইলে) এই শ্লোকটিও প্রমাণ হইতে পারে—

'তাম্রবর্ণ (সুরা) ঘটের বিপুল মণ্ডল (=সমূহ) পীত হইলেও, (অর্থাৎ পান করিলেও) (তাহা) স্বর্গগমনের হেতু হইতে পারে না, যজ্ঞগত তাহা (অর্থাৎ সুরা) কিরূপে স্বর্গকে প্রাপ্ত করাইতে পারে?'

ইহা পূজ্য (বুদ্ধদেবের) প্রমত্তগীত (বেদ-বিরোধের অবলম্বনে উক্তি)। যাহা অপ্রমত্তগীত (বেদের অবিরোধে অর্থাৎ বেদের অনুকূলভাবে উক্তি) তাহা প্রমাণ।

'যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে' (এই [illegible]তীকের দ্বারা যে প্রমাণবাক্য সূচিত হইয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল)।

ব্যাখ্যা।—'যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে'—এই যে শ্লোক এ স্থলে ভাষ্যকার প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বলিবার উদ্দেশে এখানে প্রশ্ন করা হইয়াছে—"ক পুনরিদং পঠিতম্"—এই পদ্য কোথায় পঠিত আছে? এই প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য, এই শ্লোকের প্রামাণ্যের সমর্থন করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—'ভ্রাজা' * নামক কতকগুলি শ্লোক আছে, তাহাদের রচয়িতা কাত্যায়ন†; সেই শ্লোক-সমূহের মধ্যে এই শ্লোকটি পঠিত আছে। বেদ-বিশ্বাসী আস্তিকগণ শব্দ প্রমাণরূপে শ্রুতিকেই প্রধান আসন দিয়া গিয়াছেন; শ্রুতি ব্যতীত শ্রুতির অনুকূল এবং শ্রুতির অবিরুদ্ধ স্মৃতিবাক্যকেও বেদ-বিশ্বাসী আস্তিক-সম্প্রদায়ে শব্দপ্রমাণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। যে কোন শ্লোককে যদি প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত অব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে; বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বেদবিরোধীরা অনেক বৈদিক অনুষ্ঠানের নিন্দা-সূচক শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্লোকমাত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলে সেই

---

* মহাভাষ্যকার পরে এই পস্পশাহ্নিকেই "জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি চেত্তথাহধর্ম্মঃ,—এই পূর্ব্বপক্ষবার্ত্তিকের সমাধানে পুনরায় এই বিষয়ের বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

* কাত্যায়ন-প্রণীত এই শ্লোকগুলি এখন আর প্রচলিত নাই,—বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখানে মহাভাষ্যকার যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই সেই শ্লোক-সমুদায়ের একমাত্র নিদর্শন। কাত্যায়ন প্রণীত সেই শ্লোক-নিবদ্ধ গ্রন্থের নাম 'ভ্রাজ' কি 'ভ্রাজা' ছিল, তাহাও এখন নিশ্চিতরূপে বলিবার কোন উপায় নাই। ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"ভ্রাজা নাম শ্লোকাঃ"। অকারান্ত পুংলিঙ্গ 'ভ্রাজ' শব্দ অথবা আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ 'ভ্রাজা' শব্দ—ইহার মধ্যে যে কোন একটির গ্রহণ করিলেই ভাষ্যের যোজনা করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তী কালের ব্যাখ্যাকারগণ এই শব্দটির বাস্তবিক আকার কি, সে বিষয়ে সন্দিহান হইয়াই এ বিষয়ের প্রসঙ্গকে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে;—কৈয়ট তাঁহার মহাভাষ্যপ্রদীপে, হরদত্তমিশ্র পদমঞ্জরীতে (১।১), ভট্টোজিদীক্ষিত শব্দকৌস্তুভে এবং বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধিতে 'ভ্রাজাখ্যশ্লোক' বলিয়া কাত্যায়নের এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; নাগেশভট্ট মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে "ভ্রাজা নাম কাত্যায়ন-প্রণীতাঃ শ্লোকা ইত্যাহুঃ" এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। এই সকলের পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, ইহারা কেহই এই গ্রন্থের নাম 'ভ্রাজ' ছিল কি 'ভ্রাজা' ছিল, তাহার নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, এ বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন উক্তি করেন নাই।

† এই শ্লোক যে কাত্যায়ন-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ,—ইহা সমস্ত ব্যাখ্যাকারের উক্তি হইতে বুঝা যায়।

সকল শ্লোকের প্রামাণ্য অস্বীকার করিবার কোন উপায় থাকে না।

সৌত্রামণি-যাগে সুরার দ্বারা হোম করিবার বিধান আছে *; সেই হোমের অবশিষ্ট সুরা পান করার বিধিও আছে। যজ্ঞে হোমাবশিষ্ট এই সুরার পান বেদ-বিহিত বলিয়া উহা ধর্ম্ম,—অধর্ম্ম নহে। ইহার নিন্দার উদ্দেশে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে একটি শ্লোক সে কালে প্রচলিত ছিল :—

"তাম্রবর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।

পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎক্রতুগতং নয়েৎ॥"

এই শ্লোকটি কোন্ গ্রন্থে আছে, তাহা জানা যায় না। ভাষ্যকার ইহার প্রণেতার উদ্দেশ্যে "তত্র ভবতঃ" (পূজ্যস্য) এইরূপ সম্মান-সূচক উক্তি করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে মনে করেন, স্বয়ং বুদ্ধদেব সৌত্রামণিযাগের খণ্ডনের উদ্দেশে এই শ্লোকটি প্রণয়ন করিয়াছেন।

পূর্ব্ব সময়ে তাম্রের ঘটে সুরা রাখার রীতি ছিল। তাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, তাম্রবর্ণ ঘটের 'মহৎ মণ্ডল'কেও (মহাসমুদায়কেও) যদি কেহ পান করে, অর্থাৎ যদি কেহ প্রচুর পরিমাণে সুরাপান করে,—তাহা হইলেও সেই সুরাপান-কর্ত্তা সুরাপানের ফলে স্বর্গলাভ করিতে পারে না; এমন অবস্থায় যজ্ঞে স্বল্পমাত্র সুরাপানের ফলে সেই যজ্ঞকর্ত্তা স্বর্গে গমন করিবেন, ইহা কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে?

এই শ্লোক এবং এতাদৃশ আরও শ্লোক, বেদবিরোধী লেখকগণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্লোকমাত্রকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিলে এই সকল শ্লোকও প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে; তাহার ফলে বেদবিহিত অনেক অনুষ্ঠানের পরিত্যাগের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। অতএব শ্লোকমাত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা বেদবিশ্বাসী আস্তিক-সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, "তাম্রবর্ণানাম্" ইত্যাদি শ্লোক বেদবিশ্বাসী আস্তিকগণের দৃষ্টিতে অপ্রমাণ। এই শ্লোকটিকে যদি অপ্রমাণ বলা হয়, তাহা হইলে কাত্যায়নপ্রণীত পূর্ব্ব উদ্ধৃত শ্লোকটিরও প্রামাণ্য সমর্থন করা যায় না। এরূপ অবস্থায় ভাষ্যকারের এই শ্লোককে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা উচিত হয় নাই।

ইহার উত্তরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই—কোন শ্লোকই স্বয়ং প্রমাণ হইতে পারে না; কিন্তু বেদবিশ্বাসী আস্তিকগণ যে কোন শ্লোককে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে উৎসুক না হইলেও, যে শ্লোক বেদ-মূলক, তাহাকে তাঁহারা প্রমাণরূপে অবশ্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাত্যায়ন-প্রণীত এই শ্লোকের মূলভূত একটি শ্রুতিবাক্য আছে;—

"একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি।" * ইহার অভিপ্রায় এই, একটি শব্দও যদি সম্যগ্রূপে অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি-বিভাগের দ্বারা জ্ঞাত হইয়া, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সাধন-প্রক্রিয়ার স্মরণ-পূর্ব্বক যথাযথরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই শব্দ স্বর্গলোকে কামনার পূর্ণতা সম্পাদন করে।

যথাযথভাবে শুদ্ধ শব্দের প্রয়োগের দ্বারা পারলৌকিক কল্যাণ হয়, ইহা এই শ্রুতিবাক্যে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। এই শ্রুতিবাক্যে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই কাত্যায়ন-প্রণীত পূর্ব্বপ্রদর্শিত শ্লোকে বলা হইয়াছে।

এখন আমরা দেখিতেছি, কাত্যায়নপ্রণীত শ্লোকটি শ্রুতি-মূলক। এই জন্য এই শ্লোকটি প্রমাণ। † সৌত্রামণিযাগে সুরাপানের নিন্দাসূচক শ্লোকটি বেদ-বিহিত অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতিপাদক বলিয়া প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য নহে।

এস্থলে আমরা একটি প্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা

* সৌত্রামণিযাগে সুরার ব্যবহার কলিযুগে নিষিদ্ধ। মাধবাচার্য্যরচিত পরাশরসংহিতাভাষ্য এবং নির্ণয়সিন্ধুর 'কলিবর্জ্জ্য' প্রকরণ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

* এই বাক্যটি কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থের বাক্য। এই শ্রুতিবাক্যটি "একঃপূর্ব্বপরয়োঃ" (৬।১।৮৪) সূত্রের মহাভাষ্যে উদ্ধৃত আছে। যে গ্রন্থ হইতে এই বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে, সে গ্রন্থ ভাষ্যকারের সময়ে প্রচলিত ছিল, এখন প্রচলিত নাই। এই বাক্যটি যে একটি শ্রুতিবাক্য, ইহা কৈয়ট মহাভাষ্যপ্রদীপে, হরদত্তমিশ্র পদমঞ্জরীতে, ভট্টোজিদীক্ষিত শব্দকৌস্তুভে এবং বিশ্বেশ্বরভট্ট ব্যাকরণ-সিদ্ধান্তসুধানিধিতে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নাগেশভট্টের মতেও ইহা একটি শ্রুতিবাক্য। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথকবিরাজও এই বাক্যকে শ্রুতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

† পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে 'স্মৃতিপাদে'র (—তৃতীয় পাদের) প্রথম অধিকরণে এই ভাবেই বেদমূলকরূপে সমস্ত স্মৃতি-গ্রন্থের প্রামাণ্য সমর্থন করা হইয়াছে।

করিতেছি,—সুরাপান অত্যন্ত অনর্থকর; কোন অবস্থাতেই ইহার সমর্থন করা যায় না; সুতরাং বেদে সৌত্রামণি-যাগে যে সুরাপানের বিধান আছে, সেই সুরা যতই অল্প হউক না কেন, তাহার পান কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য নহে।

এই আশঙ্কার উত্তরে ইহা বলা যায়,—যাঁহারা শাস্ত্র-বিশ্বাসী, তাঁহারা মনে করেন, শাস্ত্রই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নির্ণয়ে এক মাত্র প্রদীপ-স্বরূপ; শাস্ত্র ব্যতীত পাপ ও পুণ্যের নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই। এই জন্য শাস্ত্রবিশ্বাসী আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন;—

"ইদং পুণ্যমিদং পাপমিত্যেতস্মিন্ পদদ্বয়ে।
আচণ্ডালমনুষ্যাণাং সমং শাস্ত্রং প্রয়োজনম্॥"

(বাক্যপদীয় ১। ৪০)

এই কর্ম্মটি পুণ্য এবং এই কর্ম্মটি পাপ, এই দুইটি বিষয়ের নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে তুল্যরূপে শাস্ত্রের অপেক্ষা আছে।

যাঁহারা মনে করেন, কেবল যুক্তির দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নির্ণয় করা যাইতে পারে, তাঁহাদের কথায় আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি কোনরূপ আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। ইহা আমাদের সকলেরই মনে রাখিতে হইবে—এই যুক্তিবাদী সম্প্রদায় যে কেবল আধুনিক যুগেই আমাদের চতুর্দ্দিকে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে; সুপ্রাচীন কালেও বেদবিরোধী যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের অপ্রাচুর্য্য ছিল না। এই জন্য আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয়ের ব্রহ্মকাণ্ডে এই যুক্তিবাদী বা অনুমানবাদী * সম্প্রদায়ের যুক্তিজালের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। অনুমানের উপর একান্ত নির্ভর করা যাইতে পারে না, এ বিষয়ে আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তের পরিচয় দিতেছি;—

হস্তাপর্শাদিনাঽন্ধেন বিষমে পথি ধাবতা।
অনুমানপ্রধানেন বিনিপাতো ন দুর্লভঃ॥—

(বাক্যপদীয় ১।৪২)

কোন অন্ধ যদি পর্ব্বতীয় পথের কিয়দংশ হস্তের স্পর্শের দ্বারা অবগত হইয়া, সেই অংশের সমতা অনুভব করিয়া, অপর অংশেরও সমতার অনুমান করে এবং সেই অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়া পর্ব্বতীয় বিষম পথে ধাবিত হয়, তাহা হইলে সেই অন্ধের অত্যন্ত দুর্গতি ঘটে। শাস্ত্রনিরপেক্ষ কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ন্যায় অতীন্দ্রিয় বস্তুর নির্ণয় করিয়া তাহারই অনুসরণ করে, তাহারাও যে কল্যাণের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া সেই অন্ধের ন্যায় দুঃখভাগী হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। *

এই জন্য আমাদের ইহা স্বীকার করিতে হইবে,—শাস্ত্রই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নির্ণয়ের একমাত্র উপায়। সেই শাস্ত্র যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্ম। সৌত্রামণিযাগে হোমের অবশিষ্ট সুরাপানে শাস্ত্র নিষেধ করেন নাই, পরন্তু সে স্থলে শাস্ত্র অনুজ্ঞাই দিয়াছেন, এই জন্য সৌত্রামণিযাগে সুরাপান অধর্ম্ম নহে, উহা ধর্ম্ম। যে স্থলে শাস্ত্র অনুজ্ঞা দেন নাই, কিন্তু নিষেধ করিয়াছেন, তাহা অধর্ম্ম। সৌত্রামণিযাগ ব্যতীত অন্য স্থলে শাস্ত্র সুরাপানের নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং সেরূপ ক্ষেত্রে সুরাপান অধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে এই সৌত্রামণিযাগের সুরাপান একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে,—নারীর সম্পর্ক, মাংসভক্ষণ এবং মদ্যপান—এগুলিতে মানুষের স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ আছে; এই জন্য এই সকল বিষয়ে মানুষের প্রবৃত্তি উৎপাদনের

---

* যুক্তিশ্চার্থাপত্তিরনুমানং বা।—ভামতী ১।১।২

এখানে ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, অর্থাপত্তি প্রমাণ মীমাংসকগণের সম্মত এবং অদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণও অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিক-গণ অর্থাপত্তিপ্রমাণ স্বীকার করেন নাই। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং তাঁহার অনুগামী আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ,—এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং ইঁহাদের মতেও অর্থাপত্তি প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা মনে হয়, 'যুক্তি' শব্দের অর্থ 'ভামতী'তে যে অর্থাপত্তি বলা হইয়াছে, তাহা মীমাংসক ও অদ্বৈত বেদান্তী সম্প্রদায়ের মতের অনুসরণেই বলা হইয়াছে। অন্য সকল দার্শনিকের মতেই 'যুক্তি' শব্দের অর্থ অনুমান।

* যথাঽন্ধো বিষমে গিরিমার্গে চক্ষুষ্মন্তং নেতারমন্তরেণ ত্বরয়া পরিপতন্ কঞ্চিদেব মার্গৈকদেশং হস্তস্পর্শনাবগম্য সমতিক্রান্তস্তং-প্রত্যয়াদপরমপি তথৈব পরিপতন্ যথা পতনং লভতে, তদ্বদাগম-চক্ষুষা বিনা তর্কানুপাতী কেন কেনানুমানেন কচিদাহিতপ্রত্যয়োঽ-দৃষ্টফলেষু কর্ম্মসু পাপমমুং ক্রমং প্রবর্ত্তমানো মহতা প্রত্যবায়েন সংযুজ্যত ইত্যঃ।—বাক্যপদীয়ের পুণ্যরাজটীকা।

উদ্দেশে শাস্ত্রে কোন বিধান থাকিতে পারে না। যে সকল বিষয়ে মানুষের অন্য কোন প্রকারে প্রবৃত্তি জন্মে না, কেবল সেই সকল বিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য বেদাদি শাস্ত্রের বিধি আছে। ঋতুকালে বিবাহিতা পত্নীর সম্পর্ক, যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতির অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ এবং সৌত্রামণি-যাগে হোমের অবশিষ্ট সুরাপান —এই সকল বিষয়ে শাস্ত্রের যে বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই সকল বিষয়ে মানুষের প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশে নহে ; এই সকল বিষয়ে যে বিধি আছে, তাহার উদ্দেশ্য প্রবৃত্তি নহে,—তাহার উদ্দেশ্য নিবৃত্তি। উপরে প্রদর্শিত তিনটি বিষয়ে মানুষের স্বাভাবিক যে প্রবৃত্তি আছে, সেই প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে শাস্ত্রে অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে ; এই অনুজ্ঞার উদ্দেশ্য হইতেছে,—যাহার নারী-সম্পর্ক, মাংস ভক্ষণ এবং সুরাপানের প্রতি আকর্ষণ আছে, সেইরূপ ব্যক্তিকে উপরে প্রদর্শিত তিনটি স্থল ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে এই সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা ; যাহার এই সকল বিষয়ে কোন আকর্ষণ নাই, তাহাকে এই সকল বিষয়ে প্রবৃত্ত করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। অতএব যদি কেহ সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া ত্যাগের পথে যায়, কিংবা যজ্ঞ উপলক্ষেও পশু-হিংসা না করে, অথবা সৌত্রামণি-যাগের অনুষ্ঠান করিয়া সেই যজ্ঞে হোমের অবশিষ্ট সুরাপান না করে, তাহা হইলে শাস্ত্রের দৃষ্টিতে সে অপরাধী হয় না। *

মূল।—'অবিদ্বাংসঃ'

অবিদ্বাংসঃ প্রত্যাভিবাদে নাম্নো যে ন প্লুতিং বিদুঃ।
কামং তেষু তু বিপ্রোষ্য স্ত্রীষ্বিবায়মহং বদেৎ॥

অভিবাদে স্ত্রীবন্মাভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। 'অবিদ্বাংসঃ'

অনুবাদ।—'অবিদ্বাংসঃ' (এই প্রতীকের বাক্য অবয়বের দ্বারা যে শাস্ত্র বাক্য সূচিত করা হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।)

যে সকল অবিদ্বান্ (অবৈয়াকরণ ব্যক্তি) প্রত্যভি-বাদনে নামের প্লুতস্বর করিবার পদ্ধতি জানে না, প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, (সেই সকল ব্যক্তিকে) নিজের ইচ্ছা অনুসারে "অয়ম্ অহম্" (এইরূপ) বলিবে।

(আমরা) অভিবাদনে নারীর ন্যায় (পরিগণিত) না হই, এই জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

'অবিদ্বাংসঃ' (এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্র-বাক্য সূচিত হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইল।)

ব্যাখ্যা।—অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদনের পদ্ধতি ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। 'অভিবাদন' শব্দটি অভি উপসর্গ পূর্ব্বক ণিজন্ত 'বদ্' ধাতুর 'ল্যুট্' (অন) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন ; ইহার উপসর্গ, প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের দ্বারা লভ্য অর্থ হইতেছে, অনুকূল ভাবে যে উক্তি, সেই উক্তি করিবার প্রেরণা। যে স্থলে কেহ কোন গুরুজনকে অভিবাদন করে, সে স্থলে গুরুজন তাহাকে আশীর্ব্বাদ দেন অথবা তাহার কুশল প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। * অভিবাদন না করিলে এইরূপ আশীর্ব্বাদ কিংবা কুশল-প্রশ্ন সাধারণতঃ করা হয় না। অতএব আশীর্ব্বাদ প্রদানে অথবা কুশল-প্রশ্নে গুরুজনের প্রেরণাই অভিবাদনের অভিপ্রায়। অভিবাদনের বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনু লিখিয়াছেন † ;—

অভিবাদাৎ পরং বিপ্রো ‡ জ্যায়াংসমভিবাদয়ন্।
অসৌ নামাহমস্মীতি স্বং নাম পরিকীর্ত্তয়েৎ॥

* লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।১১

বিবাহবিষয় এব ব্যবায়: কার্য্যঃ, যজ্ঞ এবামিষসেবা, সৌত্রামণ্যাং সুরাগ্রহান্ গৃহ্ণাতীতি শ্রুতেস্তত্রৈব মদ্যসেবেতি নিয়মঃ ক্রিয়তে।… আসু ব্যবায়ামিষমদ্যসেবাসু নিবৃত্তিরিষ্টা অয়ং ভাবঃ, নায়ং নিয়মবিধিরপি তু নিত্যপ্রাপ্তত্বাদ্ অতো নিবৃত্তিঃ পরিসংখ্যৈব।—শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

* ইহারই নাম প্রত্যভিবাদ বা প্রত্যভিবাদন—ইহা নাগেশভট্ট মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে (৮।২।৮৩) লিখিয়াছেন ;—"অভিবাদয়িতরি অনুগ্রহদ্যোতকমাশীরূপং কুশলাদিপ্রশ্নরূপং বা বাক্যমাত্রং প্রত্যভিবাদঃ।"

† মনুসংহিতা (মাণ্ডলিক সংস্করণ) ২।১২২

‡ যদিও এখানে মনুর শ্লোকে (বিপ্রঃ) এইরূপ আছে এবং তাহার অর্থ ব্রাহ্মণ, তথাপি এখানে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও বুঝিতে হইবে—ইহা মেধাতিথি, কুল্লুক প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথার উল্লেখ করা বোধ হয় অনুচিত হইবে না। এই অভিবাদনের প্রকরণে মনুসংহিতার সুপ্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন,—পরিণতবয়স্ক শূদ্রও অভিবাদনের যোগ্য, ইহা মনুর সম্মত বলিয়া মনে হয়।—দ্রষ্টব্য—মনুসংহিতার মেধাতিথিপ্রণীত ভাষ্য ২।১২৬

ব্রাহ্মণ গুরুজনকে অভিবাদন করার পরে নিজের নাম কীর্ত্তন করিবে ; যেমন, "অভিবাদয়ে দেবদত্তোঽহম্" —আমি দেবদত্ত (আপনাকে) অভিবাদন করিতেছি। এইরূপ নাম অথবা গোত্র উচ্চারণের দ্বারা অভিবাদন করিলে, যাঁহাকে অভিবাদন করা হয়, সেইরূপ গুরুজনের কর্ত্তব্য এই যে, অভিবাদয়িতাকে তিনি আশীর্ব্বাদ করিবেন। এইরূপ স্থলে আশীর্ব্বাদ-বাক্যের অন্তিমভাগে প্রযুক্ত নাম অথবা গোত্রবাচক শব্দের যে স্বরবর্ণটি সকল স্বরবর্ণ অপেক্ষা পরবর্ত্তী, সেই স্বরবর্ণটিকে উদাত্ত এবং প্লুত উচ্চারণ করিতে হয়,—

আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোঽভিবাদনে।
অকারশ্চাস্য নাম্নোঽন্তে বাচ্যঃ পূর্ব্বাক্ষরঃ প্লুতঃ ॥ *

যিনি গুরুজন, তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, সেই অভিবাদয়িতা ব্রাহ্মণকে তিনি বলিবেন,—"আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য" † (হে প্রিয়দর্শন, তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও) এবং সেই অভিবাদয়িতার নামের অন্তে যে স্বরবর্ণ আছে, তাহা প্লুত উচ্চারণ করিবেন। ‡

এইরূপ স্থলে উদাত্ত এবং প্লুত স্বর করার জন্য পাণিনি সূত্র * প্রণয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মনুর শ্লোকের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি লিখিয়াছেন, প্লুতস্বর করার বিষয়ে মনু অপেক্ষা পাণিনির প্রামাণ্য অধিক ; শব্দের সাধুত্ব প্রতিপাদনের জন্য পাণিনি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ; এই জন্য এ বিষয়ে তাঁহার প্রামাণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এই অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদনের প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন :—

নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে।
তান্ প্রাজ্ঞোঽহমিতি ব্রূয়াৎ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তথৈব চ ॥ †

যে সকল ব্যক্তি প্রত্যভিবাদনবাক্যের অন্তর্গত নামের (অথবা গোত্রের) প্লুত করিতে জানেন না, অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার অভিবাদন-কালে নাম অথবা গোত্র উচ্চারণ করিয়া অভিবাদন করিবে না, কেবল "অহম্" এইরূপ বলিবে অর্থাৎ "অহমহমভিবাদয়ে" (এই আমি অভিবাদন করিতেছি) এইরূপ বলিবে ; সকল নারীকেও (তিনি প্লুত করিতে জানুন বা না জানুন) এই ভাবে অভিবাদন করিবে।

এখন আমরা ভাষ্যকারের অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি। যিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি প্রত্যভিবাদনবাক্যে প্লুত করার রীতি জানেন না ; অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ অনুসারে তাঁহাকে নাম অথবা গোত্র উচ্চারণ করিয়া অভিবাদন করা যায় না। নারীগণকেও ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ অনুসারে নাম অথবা গোত্র উচ্চারণ করিয়া অভিবাদন করা যায় না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি অভিবাদনের বিষয়ে নারীর তুল্য। যাহাতে অভিবাদনে নারীর সহিত তুল্যরূপে পরিগণিত না হইতে হয়, সেই জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

---

* মনুসংহিতা (মাণ্ডলিক সংস্করণ) ২।১২৫

† এখানে মেধাতিথি বলিয়াছেন যে, গুরুজন উপরে প্রদর্শিত 'আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য' কেবল এইরূপই বলিবেন, এমন কোন নিয়ম নাই ; এইরূপ শুভেচ্ছাদ্যোতক অন্য প্রকার বাক্যের প্রয়োগ করিলেও, তাহা অনুচিত হইবে না।

‡ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা বিষয়ে একটু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা মনুসংহিতায় ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনুসরণে উপরে ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। পদমঞ্জরীকার হরদত্তমিশ্র প্রথমে মনুসংহিতার ব্যাখ্যাকারগণের অনুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া অপর একটি ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যাটি যে তাঁহার নিজের মতানুসারে করিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, নাট্যশাস্ত্রে যে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে অভিবাদনের রীতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে একটি স্বতন্ত্র অকার নামের পরে যুক্ত করা হইয়াছে—ইহা দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে নামের স্বরবর্ণের মধ্যে অন্তিম স্বরবর্ণ প্লুত হইবে এবং সেই নামের পরে একটি স্বতন্ত্র অকারের প্রয়োগ করিতে হইবে ; "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য দেবদত্ত '৩' অ", এইরূপ প্রত্যভিবাদনবাক্য হইবে। এখানে 'দেবদত্ত' শব্দের পরে '৩' (তিন) অঙ্কটি অন্তিম স্বরবর্ণের প্লুত হওয়ায় তাহার যে তিন মাত্রা হইয়াছে, তাহা সূচিত করার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। হরদত্ত আরও বলিয়াছেন, প্রত্যভিবাদনবাক্যের অন্তর্গত নামের শেষে 'শর্ম্মন্' 'বর্ম্মন্' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা উচিত নয়।

শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥

এই শ্লোকের দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের অন্তর্গত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নামের শেষে 'শর্ম্মন্' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিবেন, ইহাই বলা হইয়াছে ; কিন্তু এই 'শর্ম্মন্' প্রভৃতি শব্দ নামের অন্তর্গত, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। দ্রষ্টব্য—পদমঞ্জরী ৮।২।৮৩

* প্রত্যভিবাদেঽশূদ্রে (অষ্টাধ্যায়ী ৮।২।৮৩)

প্রত্যভিবাদো নাম যদভিবাদ্যমানো গুরুরাশিষং প্রযুঙ্‌ক্তে, তত্রাশূদ্রবিষয়ে যদ্ বাক্যং বর্ত্ততে, তস্য টেঃ প্লুত উদাত্তো ভবতি।—কাশিকা।

† মনুসংহিতা ২।১২৩

মহাভাষ্যকারের উদ্ধৃত "অবিদ্বাংসঃ" ইত্যাদি শ্লোক যদিও কোন স্মৃতিগ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তথাপি ইহা যে একটি শাস্ত্রবাক্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাষ্যকার এই দ্বিতীয় বারে ব্যাকরণের অধ্যয়নের প্রয়োজন প্রদর্শন করিতে যাইয়া পূর্ব্বে এবং পরে শাস্ত্রবাক্যসমূহই উদ্ধৃত করিয়াছেন; ইহাদের মধ্যবর্ত্তী এই শ্লোকটিও যদি শাস্ত্রবাক্য হয়, তাহা হইলেই ভাষ্যকারের লেখার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। এই শ্লোকে "বদেৎ" এই বিধিপ্রত্যয়ান্ত পদ আছে; অতএব এইটি একটি শাস্ত্রবাক্য হওয়াই সমীচীন।

মূল।—'বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি'

যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি প্রয়াজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্য্যা ইতি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং প্রয়াজাঃ সবিভক্তিকাঃ শক্যাঃ কর্ত্তুম্, 'বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি'।

'বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি' (এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্র-বাক্যের সূচনা করা হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।)

অনুবাদ। যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন, প্রয়াজ-সমূহকে বিভক্তি-যুক্ত করিবে। ব্যাকরণ ব্যতিরেকে প্রয়াজ-সমূহকে বিভক্তি-যুক্ত করিতে পারা যায় না।

'বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি' (এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত হইয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল।)

ব্যাখ্যা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি। ইহাদের বিবাহ হওয়ার পর অগ্নির আধান কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই আধান দুই প্রকার,—শ্রৌত আধান এবং স্মার্ত্ত আধান। আধান একটি অনুষ্ঠান।

বিবাহ-সংস্কারের দ্বারা নারীতে 'ভার্য্যাত্ব' উৎপন্ন হয়। এই বিবাহিতা নারী তাহার পতির ভার্য্যা হয় বলিয়া তাহার সন্তান পবিত্র সন্তানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই ভার্য্যা ধর্ম্ম-কর্ম্মে নিজের পতির সহকারিণী হয়। এই কারণে বিবাহিতা নারীকে তাহার পতির সহধর্ম্মিণী বলা হয়। যে নারী বিবাহ-সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হয় নাই, তাহাতে 'ভার্য্যাত্ব' উৎপন্ন হয় না; সুতরাং তাহার সন্তান শাস্ত্রদৃষ্টিতে পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয় না এবং সে সহধর্ম্মিণী পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই বিবাহ যেরূপ একটি সংস্কার, এইরূপ আধানও একটি সংস্কার; বিবাহ-সংস্কারের দ্বারা নারীতে যেরূপ 'ভার্য্যাত্ব' উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আধান সংস্কারের দ্বারা অগ্নিতে 'আহবনীয়ত্ব' প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রৌত আধানের দ্বারা তিনটি অগ্নির সংস্কার সাধিত হয়। এই তিনটি অগ্নির নাম,—দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য এবং আহবনীয়। দর্শ, পূর্ণমাস, অগ্নিষ্টোম এবং বাজপেয় প্রভৃতি বৈদিক-যাগ, এই শ্রৌত আধানের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিতে করিলেই সিদ্ধ হয়; অসংস্কৃত যে কোন অগ্নিতে এই সকল যাগ করিলে, তাহা অবৈধভাবে সম্পাদিত হওয়ায় সম্পূর্ণ বিফল হয়। শ্রৌত আধান বেদবিহিত। স্মার্ত্ত আধান বেদ-বিহিত নহে, উহা গৃহ্যসূত্রের বিধান অনুসারে সম্পাদিত হয়। গৃহ্যসূত্র শ্রুতি নহে,—স্মৃতি; এই জন্য এই আধানকে স্মার্ত্ত আধান বলা হয়। এই স্মার্ত্ত আধানের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নির নাম 'আবসথ্য' বা গৃহ্য। এই আবসথ্য অগ্নিতে গৃহ্যসূত্র-বিহিত 'পক্ষান্তেষ্টি' প্রভৃতি যাগের অনুষ্ঠান করার বিধান আছে। গৃহ্যসূত্র-বিহিত এই সকল যাগ অসংস্কৃত যে কোন অগ্নিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আবার, বৈদিক যাগও আবসথ্য অগ্নিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; এইরূপ গৃহ্যসূত্র-বিহিত স্মার্ত্তযাগ সমূহও 'আহবনীয়' প্রভৃতি শ্রৌত অগ্নিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

যদি শ্রৌত আধানের পর এক বৎসরের মধ্যে যজমানের গৃহে কোন মহাবিপদ্ ঘটে কিংবা আধানের পর সেই যজমান উদর-ব্যথায় আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সেই অবস্থায় প্রথমে যে অগ্নির আধান করা হইয়াছিল, সেই অগ্নিকে উদ্বাসন (পরিত্যাগ) করিয়া পুনরায় অন্য অগ্নির আধান করিবার বিধান আছে। * আধান করিতে হইলে যেমন 'পাবমানেষ্টি'র (যাগবিশেষের) অনুষ্ঠান করিতে হয়, তেমনই পুনরাধানের সময়ও 'পুনরাধেয়েষ্টি'র অনুষ্ঠান করিতে হয়।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

---

* তৈত্তিরীয়সংহিতা ১।৫

যদি আধানাদনন্তরং যজমান উদরব্যথাবান্ স্যাদ্ যদি বা সংবৎসর মধ্যে তস্য মহতী বিপৎ স্যাত্তদা নৈমিত্তিকীং পুনরাধেয়েষ্টিং বিধায়···
—শব্দকৌস্তভ-পস্পশাহ্নিক। ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধিতেও এইরূপ বলা হইয়াছে।

যস্য যজমানস্য আধানকালাদারভ্য সংবৎসরসমাপ্তেরর্ব্বাক্ কস্যচিৎ পদার্থস্য হানির্ভবতি, মহারোগো বা জায়তে, অন্যানি বা অগ্ন্যনয়গত্যাদীনি নিমিত্তানি ভবন্তি, স পুনরাধানং করোতি।—
শ্রৌতপদার্থনির্ব্বচন—ইষ্টি-প্রকরণ—৪২৫



টিনের গহনা

ইস্কুল-কলেজে এবং বহু সৌখীন-পরিবারে এখন সখের নাট্যাভিনয় হয়। কোনো কোনো অভিনয়ে ছেলেমেয়েদের কলা কুশলতা দেখি সত্যি অপূর্ব্ব! কিন্তু এ-সব অভিনয়ে ভাড়া-করা সাজ-পোষাক আমাদের চোখে ভারী দৃষ্টি-কটু ঠেকে। অথচ একটু চেষ্টা করলেই টিন-প্লেটে মাথার মটুক থেকে গায়ের নানা রকমের গহনা অনায়াসেই তৈরী করা যায়। এ-সব অভিনয়ের জন্য জড়োয়া গহনার নকলে বাড়ীতে জড়োয়া গহনা তৈরী করাও মোটে শক্ত নয়। কি করে এ-সব গহনা তৈরী করা যায়, বলি।

এর জন্য দরকার বিস্কুটের টিনের ঢাকনিতে পাত্‌লা নরম যে-টিন থাকে, সেই টিন; কিম্বা সিগারেটের টিনের ঢাকনির পাৎলা টিন। অর্থাৎ পাৎলা দেখে টিন নিতে হবে। আর চাই নানা রঙের এবং সাইজের পুঁতি; নানা রঙের কতকগুলি ছোট-বড় নকল পাথর। (নকল মুক্তোও নিতে পারেন। বাজারে প্রচুর পাওয়া যায়। এ নকল-মুক্তোর দাম সামান্য)। আর চাই পুটিং বা আঠা।

পাৎলা নরম টিন নিতে হবে এই জন্য যে, দরকার-মতো তা কাটা চলবে এবং যেমন খুশী এ টিনকে বাঁকানো চলবে, নোয়ানো চলবে। কাঁচি দিয়ে পাৎলা টিন কাটা মোটেই শক্ত হবে না।

আমাদের দেশে অনেকে সোনার গহনা এবং তার দিয়ে ফুলের গহনা বাড়ীতে চমৎকার করে তৈরী করেন। সে-গহনা তেমন মজবুত্ হয় না; দু'-চার বার ব্যবহার করলে সে-গহনা অব্যবহার্য্য অপদার্থ হয়ে যায়। তাছাড়া ফুলের গহনা বড়-জোর ঐ একটা দিন বা একটি রাত্রি ব্যবহার করা চলে; তার পর ফুল শুকিয়ে যায়, ফুলের পাপড়ি ঝরে যায়। টিনের পাৎলা পাতে গহনা তৈরী করলে সে-গহনা বহু দিন ব্যবহার করা চলবে।

টিন কাটবার জন্য ধারালো কাঁচির কথা বলেছি। টিনের গায়ে প্রয়োজন-মতো বিঁধ বা ফুটো করার জন্য



মুখনল দিয়ে তাপ দেওয়া

গুণছুঁচ বা অন্য যন্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। টিন কাটা বা টিনে বিঁধ করা—এ-সব করবেন দরকার বুঝে। দরকার কি রকম হবে, তার জন্য আগে থেকে যদি

ডিজাইন ছকে নিতে পারেন, তাহলে কাজ করবার সময় কোনো দিকে অসুবিধা ভোগ করতে হবে না।

টিনের এই গহনা তৈরী করবার যে-প্রণালীর কথা বলছি, সে-প্রণালী ছাড়া আরো বহু প্রণালী অবশ্য আছে; তবে আমাদের এ-প্রণালী অন্য প্রণালীগুলির চেয়ে সহজ এবং সকলের পক্ষে উপযোগী হবে।

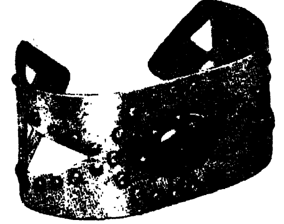
ছবিতে কিশোরীর কাণে ঐ যে দুল, গলায় যে নেকলেশ, আঙুলে যে আংটি, আর মণিবন্ধে যে ব্রেশলেট দেখছেন, এ-সব গহনা এই টিনের পাতে তৈরী। এ-গহনার গায়ে যে-সব মণিমুক্তো দেখছেন, সেগুলি নকল পাথর, নকল মুক্তো। এ-গহনা তৈরী করে পরলে দূর থেকে চট্ করে এ-গুলিকে কেউ টিনের পাতে তৈরী গহনা বলে ধরতে পারে না!

টিনের পাৎলা পাতে শুধু গহনা কেন, ঘর সাজাবার উপযোগী টুকি-টাকি আরো অনেক জিনিষ তৈরী করতে পারেন। যেমন ধরুন, এ্যাশ-ট্রে, বুক-মার্ক, টেবিলের সজ্জা-সামগ্রী, ফুলদানী, ফল রাখবার পাত্র, লণ্ঠন, দোয়াত, ঝুলন-ফুলদানী, চিঠি রাখবার র‍্যাক, ডিশ, প্লেট, পেণ্ডাণ্ট, ছবির ফ্রেম আলপিন রাখবার কুশন, ক্লিপ, ওয়াল-ল্যাম্প প্রভৃতি।

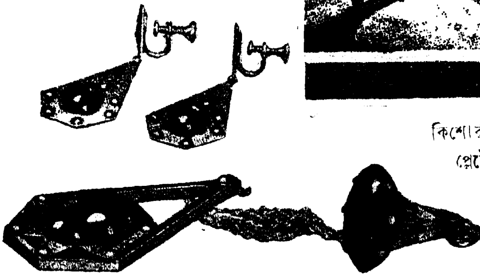
প্রথম প্রথম এ-সব জিনিষ তৈরী করতে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নয়; পরিশ্রমও বেশী হতে পারে; সেজন্য বিরক্ত হয়ে পেছিয়ে যাবেন না। 'আজিকে না হতে পারে, হতে পারে কাল'—এ-নীতি মেনে বার-বার চেষ্টা করুন। একদিন সে চেষ্টা সফল হবেই।

এবারে গহনা-পত্র তৈরী করার কথা বলি।

পাশের ছবিটি দেখুন। টিনের পাতের তৈরী ব্রেশলেট। এই ব্রেশলেটটিতে অনেকখানি কলা-কৌশল আছে। এ ব্রেশলেট তৈরী করবার আগে পরের পৃষ্ঠায় নক্সা দেখুন। এ নক্সাটি হচ্ছে ঐ-ব্রেশলেটের প্যাটার্ণ। যে বিঁধ-গুলি দেখছেন, ও-বিঁধগুলি পিতলের কুচি দিয়ে ভরাট করে নিলে ব্রেশলেটটিতে বেশ বাহার খুলবে। পিতলের কুচি অবশ্য রাঙ-ঝাল দিয়ে আঁটতে হবে; আঁটা শক্ত? বেশ! নিজে আঁটার কাজ করতে না পারেন, যে-কোনো বাসন-মিস্ত্রী ডেকে এ-কাজটুকু করে নেওয়া চলবে!


টিনের প্লেটে তৈরী ব্রেশলেট


কিশোরীর অঙ্গে টিন প্লেটের গহনা


ইয়ারিং ও আংটি

ব্রেশলেটটি তৈরী করবার আগে কাগজে তার প্যাটার্ণ তৈরী করে নিন। সেই প্যাটার্ণ টিন-প্লেটে এঁটে ঐ প্যাটার্ণের ছাঁদে প্লেটে বিঁধ করুন। প্লেটের কাট-ছাঁট করে তার গড়ন ঠিক করে নেবেন। এতে কাজ সহজ হবে; টিনের পাত নিয়ে দিশাহারা হতে হবে না। একটি ব্রেশলেট তৈরী করে অপরটি করবেন

তারি মাপে। সে-মাপ নেওয়া যে খুব সহজ, এ-কথা আশা করি, বলবার প্রয়োজন নেই!

টিন-প্লেটে কাগজের ডিজাইন এঁটে বিঁধ ও ডিজাইনের সঙ্গে মিলিয়ে প্লেটের গায়ে পেন্সিল বুলিয়ে দাগ করে নিলে প্লেট কাটতে কোনো গোলযোগ ঘটবে না।

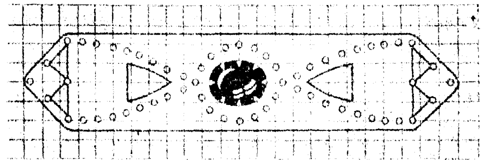
টিনের একটি পাতের সঙ্গে আর-একখানি পাত আঁটবার প্রয়োজন হতে পারে। দু'খানি বা তিনখানি পাত জোড়বার আগে সেগুলির গা একটু চেঁছে নেবেন, তাহলে আঠার জোড় সহজে খুলবে না। প্লেট চাঁছবার আগে সেটি যদি মিউরিয়াটিক এসিডের সলিউশনে (অল্প জলে দশ-বারো ফোঁটা এসিড ঢেলে সলিউশন তৈরী করবেন) ডুবিয়ে নেন, তাহলে চাঁছা পরিষ্কার হবে। তার পর জোড়া। রাঙ-ঝাল দিয়ে জুড়বেন। রাঙ-ঝাল দিয়ে জোড়ার জন্য চাই ষ্টোভ। ষ্টোভ জ্বেলে বা বাতি জ্বেলে একটি মুখনল (blow-pipe) নিয়ে এ-কাজ সহজে করতে পারবেন। জোড়ার কাজেই যা-কিছু হাঙ্গাম। নিজে থেকে সে-সুবিধা না করতে পারেন, বাসন-মিস্ত্রী ডেকে এ কাজটুকু করিয়ে নেবেন।

এই সব গহনায় বা অন্য পাঁচ রকম সামগ্রীতে বাহার খোলাবার জন্য নক্ষত্রের বা পাপড়ির আকারে কিম্বা অন্য ছাঁদের কুচো-টিন যদি আঁটতে পারেন, ভালো হয়। দরকার-মতো নক্ষত্র বা পাপড়ির ছাঁদে টিনপ্লেট আগে থেকে কেটে রাখবেন।

নকল মণিমুক্তো আঁটবার জন্য পুটিং ব্যবহার করবেন। আঁটবার আগে টিনের গায়ে যে বিঁধ করবেন, শুধু দেখে নেবেন, বিঁধ সে-পাথরে যেন ঠিক ফিট্ করে। পাথর আর পুঁতি কেনবার সময় শুধু দেখবেন, তাদের আকার যেন সমান থাকে; অর্থাৎ কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটা চ্যাপটা, কোনটা গোল—এ রকম পুঁতি-পাথর নেবেন না। কেন না, নানা ছাঁদের পুঁতি-পাথরে গহনার গায়ের কাজ জ্যাবড়া-জাঁকমের হবে, তাতে বাহার খুলবে না।

ইয়ারিং করতে হ'লে কাণে সে-ইয়ারিং আঁটবার জন্য ক্লিপ বা পিন চাই। দোকানে ক্লিপ বা পিন কিনতে পাবেন। বাড়ীতে পিন-ক্লিপ তৈরী করতে হ'লে ছোট-খাট যন্ত্র চাই। কষ্ট এবং পয়সা খরচ করে সে-যন্ত্র যাঁরা কিনতে পারবেন, তাঁদের অবশ্য পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে যন্ত্র কেনায় অসুবিধা আছে, সে-ক্ষেত্রে দোকান থেকে পিন-ক্লিপ কেনা ছাড়া উপায় নেই!

আগের পৃষ্ঠায় ছবিতে যে-আংটি দেখছেন, ওতে পাথর বসিয়ে সে-পাথরকে এঁটে রাখতে হলে কতকগুলি আংটার দরকার। টিনপ্লেট কাটবার সময় এ-আংটা-গুলি ঠিক ঐ ছবি দেখে তৈরী করবেন। পাথর-পুঁতি বসিয়ে পাৎলা টিনের কাঁটাখোঁচাটুকু হাতের চাপে



ব্রেশলেটের নক্সা

বাঁকিয়ে পাথর-পুঁতি আটকানো সহজ হবে। হাতে-কলমে কাজ করলেই তা বুঝতে পারবেন। টিন কাটার পর অনেক সময় টিনের গা তেমন মসৃণ থাকে না; তার গায়ে খোঁচা থাকতে পারে; এ-খোঁচা সেরে টিনগুলিকে মসৃণ করে নেবেন।

পাৎলা টিন বেঁকে যেতে পারে। বাঁকা প্লেটকে সোজা-সিধা করবার জন্য ভারী কাঠের উপরে টিন রেখে মোটা হাতুড়ির ঘা দিয়ে প্লেটকে সিধা করে নেবেন। প্লেটের গায়ে বিঁধ করবার জন্য ভোমর হলো উপযোগী যন্ত্র। লোহার বা ইস্পাতের উপর টিন রেখে ভোমরের সাহায্যে প্লেটে বিঁধ করতে হবে।

গহনা বা অন্য সামগ্রীর ডিজাইন সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। সে-ডিজাইন সকলে নিজের-নিজের রুচি বা পছন্দমতো করে নেবেন।



৩

নারী-বিহীন সংসার সুধীশের, চাকর, বামন সবই আছে বটে, কিন্তু সংসারে শৃঙ্খলা নাই। সুধীশ ডাক্তার, আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট নাই, যেদিন কিছু বিলম্ব হয়, সেদিন তাহার খাবার ঢাকিয়া রাখা হয়। সে আসিয়া স্নান করিয়া সেই কড়কড়ে শুক্‌নো ভাত দুই-এক গ্রাস মুখে পুরিয়া পরিপূর্ণ ক্ষুধা লইয়াই উঠিয়া যায়,—কে তার তত্ত্ব লয়? রান্নাও সেই রুটিনবাঁধা, কোন দিন কোন পদের পরিবর্ত্তন হয় না। সেই এক পোনা-মাছের ঝোল ও পোনা-মাছ ভাজা দিবসে, এবং রাত্রে পোনা-মাছের বিস্বাদ কালিয়া গায়ত্রী আসিয়া অবধি খাইতেছে। ঘরে রাশিকৃত ফল, মিষ্টান্ন পচিতে থাকে, কিন্তু সুধীশকে তাহা দেওয়ার কথা তাহাদের মনে পড়ে না। দেখিয়া দেখিয়া গায়ত্রীর অসহ্য হয়। ইচ্ছা হয়, একবার অগোছাল ভাঁড়ারে ঢুকিয়া ব্যবস্থা করিয়া আসে; কিন্তু পরের ঘরে গৃহিণীপণা করিতে তাহার সঙ্কোচ হয়, সে তাহা পারিয়া উঠে না।

শেষ আর থাকিতে না পারিয়া এক দিন রামুকে বলিল,—আমি ত বসেই থাকি, রামু! আনাজগুলো আমায় দিয়ে যেও, কুটে দেব।

রামু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সোৎসাহে ঝুড়ি, চুপড়ী, বঁটী, সব তাহাকে দিয়া অন্তর্দ্ধান করিল। গায়ত্রী গুছাইয়া কুটিয়া দিল। খাইতে বসিয়া সুধীশ ত অবাক! হাসিয়া বলিল,—কি রে, রামু! আজ এত সমারোহ কিসের; অনেক রান্না হ'য়েছে যে! এত ব্যবস্থা তুই জানিস?

রামু লজ্জা পাইয়া বলিল,—আমি দিইনি বাবু! ঐ যে মাঠাকরুণটি এসেছেন, উনিই আজ্ঞে কুটে দিলেন কি না।

সুধীশ বলিল, তাই না কি? বেশ, বেশ, তুই আর ওঁর হাত থেকে ও-ভারটা ফেরত নিস্‌নি; তুই ত একই রান্না রোজ রোজ খাইয়ে পেটে চড়া পাড়িয়ে দিলি। আজ তবু মুখটা বদলালো।—গায়ত্রী সুধীশের খাওয়ার সময় তাহার কাছে আসিয়া বসিত না, বারন্দাতেই দাঁড়াইয়া থাকিত। আজও ছিল, রামু বাহিরে আসিয়া বলিল,—যান না, মাঠান, বাবু খেতে ব'সেছেন।

সুধীশ গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল,—আসুন না, ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

গায়ত্রী কুণ্ঠিত ভাবে ভিতরে আসিয়া বসিল। সুধীশ চেষ্টা করিয়াও কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না; অথচ যাহাকে ডাকিয়া বসাইয়াছে, তাহার সহিত অবান্তর কথাও অন্ততঃ দুই-একটা বলা উচিত। একটু ভাবিয়া বলিল,—বিকেলের দিকে ছবি-মুনুকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসবেন না! আমি ত সন্ধ্যের আগে বেরোই নে।

গায়ত্রী মাথা নীচু করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—কোথায় আর যাব, ভাল লাগে না।—কথাটা সত্য। সুধীশ চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বিতা এই মেয়েটির জন্য করুণায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। খাওয়া হইয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি খেয়েছেন?

গায়ত্রী নতমুখে বলিল,—এখনি যাচ্ছি।

সুধীশ ব্রাকেটে রক্ষিত ঘড়ির দিকে চাহিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল; সে কি? দু'টো বাজে যে! এখনও খাননি? আমার জন্যে অপেক্ষা করেন না কি? না, না, আপনি ব'সে থাকবেন না। আমা[illegible]ার সময়ের ঠিক থাকে না—অনর্থক বেলা দু'টো পর্য্য[illegible]আপনি উপোষ পেড়ে শরীর নষ্ট করবেন না।—সহসা কি ভাবিয়া বলিল,—সকালে কি খান?

গায়ত্রীর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে কথা বলিতে

পারিল না। সুধীশ পুনরায় প্রশ্ন করিতে সঙ্কোচে সে জড়োসড়ো হইয়া নিম্নস্বরে বলিল,—খাই ত। ঠাকুর চা-জলখাবার দিয়ে যায়।

সুধীশের ইচ্ছা হইল বলে—কাল থেকে আমার সঙ্গে খাবেন;—কিন্তু নিরস্ত হইল। এ আলোকপ্রাপ্তা মেয়ে নয়, সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে; হয় ত কি মনে করিবে। কাজ নাই বলিয়া, বরং ঠাকুরকে অধিক যত্ন লইতে বলিলেই চলিবে। গায়ত্রীকে বলিল,—তা হোক, আপনি আমার জন্য অপেক্ষা ক'রবেন না। আপনার ত এত বেলা অবধি না-খেয়ে থাকার অভ্যাস ছিল না, অনিয়মে অসুখ করবে।

গায়ত্রী নীরব রহিল; এ-রকম অসম্ভব কথা পুরুষেই বলিতে পারে বটে! ইহার পর গায়ত্রী অগোছাল সংসারে যেখানে যাহা কিছু বিশৃঙ্খল ছিল, ধীরে ধীরে নিপুণ হাতে তাহা গুছাইয়া শ্রীসম্পন্ন করিতে লাগিল। এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ও শোকের মধ্যেও সে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিল না। আতুর মনটা কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে শান্তি পায়। রামু তাহাকে বিস্তর কাজ জুটাইয়া দেয়; সুধীশের জামার বোতাম-গুলি সেলাই করাইয়া, মোজার ছিদ্র রিপু করাইয়া কাপড়ে ভেলার চিহ্ন দেওয়াইয়া লয়। প্রতি দিন যাহা খরচ করে, তাহার হিসাবগুলা গায়ত্রীকে দিয়াই লিখাইয়া লয়। যদিও সুধীশ কখনও হিসাব দেখে না, তবু রামু একে-তাকে ধরিয়া তাহা লিখাইয়া রাখিত। এখন গায়ত্রীকে দিয়াই লিখায়। গায়ত্রী আয়-ব্যয় এবং তাহার গরমিল দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেও রামুর নির্দ্দেশ মতোই সব লিখিয়া যায়। সে মনে মনে হাসে, পাকা গৃহিণীর মত খাতা লইয়া মোটা মোটা অঙ্কপাত করিয়া হিসাব লিখিতেছে, কিন্তু কয় দিনের জন্য? ছেলেদের খাওয়ার ভাবনা ভাবিতে হয় না, নিজেদের ভাবনাও ভাবিতে হয় না; কিন্তু এই নির্ভাবনা ক'দিনের জন্য? অন্ন জুটুক না জুটুক, তবু মাথা গুঁজিবার স্থানটুকু এখনও আছে, কিন্তু কিছু দিন পরে তাহাও থাকিবে না। সুদে-আসলে বাড়ী বিকাইতে বসিয়াছে, মহাজন কয়েকবার তাগাদাও দিয়াছে; কিন্তু দুই বেলা যাহাদের অন্ন জুটে না, কি দিয়া তাহারা এই ঋণ পরিশোধ করিবে? মসীলিপ্ত ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া গায়ত্রী দিশেহারা হইয়া যায়। সেদিন যখন সুধীশ ছবি ও মৃণাকে লইয়া নিজের ঘরে গেল, সেদিন গায়ত্রী মুস্কিলে পড়িল। মনে করিল, হয় ত একটু বাদে সুধীশ উহাদের ছাড়িয়া দিবে; কিন্তু যখন তাহাদের বাহিরে আসিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না, তখন অগত্যা তাহাকে সুধীশের কক্ষদ্বারে যাইতেই হইল। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল,—ছবি, মিনু কি এখানে আছে?

সুধীশের মোহের স্বর্গ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে চমকিয়া উঠিল, বলিল,—হাঁ, আছে। এস ছবি, এস মিনু। বলিয়া মিনুকে বুকে তুলিয়া, ছবির হাত ধরিয়া সে বাহিরে আসিয়া গায়ত্রীকে বলিল,—ঠাকুরকে বলুন, আমাদের তিন জনকেই খেতে দিতে।

গায়ত্রী ধীরে ধীরে বলিল,—ওরা খেয়েছে।

সুধীশ বলিল,—সে ত সেই সাড়ে ন'টায়? এখন একটা বেজে গেছে, ওরা দু'-এক গেরাস খেতে পারে।

পৃথক থালায় ভাত দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া মৃণার অভিমান হইল; সে সুধীশকে আস্তে আস্তে বলিল,—আমি তোমার সঙ্গে খাব!

সুধীশ তাহার থালাখানা টানিয়া-লইয়া বলিল,—আচ্ছা, এসো, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

গায়ত্রী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল,—না, না, মিনু, অসভ্যতা কোর না। দিন ওকে নামিয়ে, আমি খাইয়ে দিচ্ছি। মিনু, নেমে এসো—

মৃণা নতমুখে চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু কোল ছাড়িয়া নামিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সুধীশ মৃণার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—আহা, থাক, থাক। ওকে ব'কবেন না।

গায়ত্রী ব্যস্ত হইয়া বলিল, ও এখন কতক্ষণে খাবে, আমি দিই না খাইয়ে। আপনার বাড়াভাত প'ড়ে রইল—

সুধীশ হাসিতে লাগিল; স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল,—আপনি আসায় দেখছি খাওয়ার অনেক সুব্যবস্থা হ'য়েছে, না হ'লে এই ভাত চাপা-প'ড়ে থাকত, তা একটাতেই খাই, আর চারটেতেই খাই। গরম কালে কত দিন খেতে-ব'সে দেখেছি, ভাতগুলো এলিয়ে, তরী-তরকারী পচে একশা হয়ে আছে!

গায়ত্রী কৌতূহল দমন করিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল,—তখন কি করেন?

সুধীশ হাসিতে লাগিল, বলিল,—এক গ্লাস জল খেয়ে খানিকটা শুয়ে থাকি; ক্ষিদের জ্বালাটা একটু কম্‌লে যা'হোক একটা কাজ নিয়ে বসি। ইতিমধ্যে রামু কি যদুর যদি দয়া হয়, তাহ'লে হয় ত একটু চা দিয়ে যায়।

গায়ত্রী এই সংবাদে স্তম্ভিত হইল। কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল,—এ ভাবে ওদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন কেন? এক দিন যদি বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাহ'লে কি আর দ্বিতীয় দিন ও-রকম করতে সাহস করে?

সুধীশ মৃণার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—পুরুষ জাতটাই পরনির্ভরশীল, এ সব গৃহস্থালীর কাজ তাদের পোষায় না। আবার মেয়েদের এটা মজ্জাগত,—তাঁরা গাছতলায় থাকলেও সেখানেই খাসা সুবন্দোবস্ত ক'রে বসেন। এই দেখুন না, ক'টা দিনই বা আপনি এখানে এসেছেন, অথচ এরই মধ্যে কেমন সুব্যবস্থা ক'রেছেন—বাড়ীর শ্রীই ফিরে গেছে। আর আমি ত কিছুই পারি নে। এই জন্যেই মেয়েদের গৃহলক্ষ্মী বলে। যে সংসারে মেয়ে নেই, সেখানে শৃঙ্খলা থাকে না, সে বাড়ী হয় ভুতুড়ে—অলক্ষ্মীর আবাস। আমার বাড়ীটাও তাই।

গায়ত্রী হাসি-মুখে চুপ করিয়া রহিল। সুধীশের বাড়ী আসিয়া সে এই প্রথম হাসিল; হাসিলে তার মুখখানি বড়ই সুন্দর দেখায়।

ছবি-মৃণার খাওয়া হইলে শেষে তাহারা খেলা করিতে গেল। গায়ত্রী দেয়ালে ঠেস দিয়া তেমনই বসিয়া রহিল।

সুধীশ বাঁ-হাতখানি কোলে রাখিয়া খাইতেছিল, গায়ত্রী অন্যমনস্ক ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার গায়ে একটা পাতলা গেঞ্জি, তাহার ভিতর হইতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। অনাবৃত বাহু দুইখানি কি সুগঠিত, বলিষ্ঠ অথচ কেমন সুকোমল! পদপল্লব দুইখানি বা কি সুচারু গঠন, আর এতখানি দীর্ঘ, উন্নত দেহের তুলনায় কত ছোট! নখগুলির পর্য্যন্ত সুছাঁদ। হাত-পায়ের গঠন তাহার আভিজাত্যের নিদর্শন। গেঞ্জির ঢিলা গলা হইতে মর্ম্মরবৎ অনতিশুভ্র বুকের উপর পুরুষের বক্ষ-শোভা লোমরাজি বিরাজিত;—প্রশস্ত কবাট-বক্ষে তাহার শোভা নয়ন-বিমোহন! উহাতেই বুঝি তাহার দৃপ্ত পৌরুষ অধিক শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে!

গায়ত্রী নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। কি সুন্দর সমুন্নত সুগঠিত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট যেন জ্ঞান ও প্রতিভার লীলাভূমি! চক্ষু আয়ত; কিন্তু গায়ত্রী কখন তাহার চোখে চোখ মিলাইয়া দেখে নাই—দৃষ্টির মাধুর্য্য কতখানি! অধরোষ্ঠ নারীর মত আরক্ত কোমল ও সুচিক্কণ, ধূমপানেও তাহা বিবর্ণ হয় নাই। আধুনিক প্রথায় মুখমণ্ডল মণ্ডিত নয়,—গুম্ফাবলী মুখের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, কাঁচি দিয়া ছাঁটা সুবিন্যস্ত! সে দেহে বলিষ্ঠতা ও কমনীয়তার অপূর্ব্ব সমন্বয়!

গায়ত্রীর দৃষ্টি তন্ময় হইয়া সুধীশের উপর সন্নিবিষ্ট, বাহ্যজগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন তাহার কাছে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

রৌদ্রঝঞ্ঝা-নিষ্পেষিতা স্বর্ণলতিকা বর্ষার বারিধারা বর্ষণে সহকার-শাখায় সঞ্জীবিতা হইয়া উঠিল কি?

৬

নির্দ্দিষ্ট দিনে হিমানী আসিল; দুর্ব্বল, ক্লান্ত, শোকাচ্ছন্ন।

গায়ত্রী সর্ব্বদা তাহার কাছে থাকে; সে প্রায় উত্থান শক্তিরহিতা। সুধীশ ইচ্ছা করিয়াই তাহার কাছে গেল না, সে ছবি ও মৃণাকে লইয়াই খুব ব্যস্ত রহিল।

তিন-চার দিন পরে এক দিন সুধীশ পড়ার ঘরে আছে দেখিয়া গায়ত্রী সসঙ্কোচে দুয়ারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সুধীশ মাথা হেঁট করিয়া কি লিখিতেছিল, এবং বাঁ হাতের অঙ্গুলিগুলি মস্তকের ঘন কুঞ্চিত কেশদামের উপর আল্‌তো ভাবে বুলাইতেছিল। তাহার অনামিকায় একটা বড় পান্নার অঙ্গুরী আলো লাগিয়া জ্বল-জ্বল করিতেছিল। গায়ত্রী কবি নয়, তবু তার মনে হইল, সবুজ পত্রবেষ্টিত গোলাপের উপর কালো ভোমরা বসিলে তাহা যেমন সুন্দর দেখায়, সুধীশের হাতখানি তেমনই দেখাইতেছে। লিখিতে লিখিতে হঠাৎ একবার মাথা তুলিতেই সুধীশ গায়ত্রীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কিছু বলবেন কি? আসুন না, এখানে আসুন; বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?—সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

গায়ত্রী সলজ্জ ভাবে ভিতরে আসিলে তাহার দিকে একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া সুধীশ বসিল। কিন্তু গায়ত্রী বসিল না, কুণ্ঠিত ভাবে বলিল,—আমরা কবে বাড়ী যাব ?

সুধীশ জিজ্ঞাসা করিল,—আপনাদের কোন কষ্ট হচ্ছে এখানে ?

গায়ত্রী তাহার কৃতজ্ঞতাপ্লুত চক্ষু দু'টি সুধীশের মুখের উপর একবার তুলিয়াই তৎক্ষণাৎ নামাইয়া লইল ; তাহার পর মৃদুকণ্ঠে কহিল,—ও কথা ব'লে আমাদের অপরাধী ক'রবেন না। কিন্তু আর কত দিন আমরা আপনাকে বিরক্ত করব ?

—আচ্ছা, সে তখন ভেবে-চিন্তে দেখব।—বলিয়া পাছে গায়ত্রী দ্বিতীয়বার আর কোন কথা উত্থাপন করে, এই ভয়ে মাথা হেঁট করিয়া খুব মনোযোগ দিয়া পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিল।

গায়ত্রী আর কোন কথা বলিল না, একটু দাঁড়াইয়া-থাকিয়াই নিঃশব্দে চলিয়া গেল ; কিন্তু ভিতরে ভিতরে লোক-নিন্দার নিষ্ঠুর দংশন-জ্বালা সারা দেহ-মনে অনুভব করিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাহাদের বিপদের দিনে কৈ মুখের কথাটি শুধাইবারও লোক ছিল না, কিন্তু আজ তাহাদের গায়ে অজস্র কালি ঢালিবার জন্য লোকাভাব হইবে না !

ইহার দ্বিতীয় দিনে সকালে ছবিকে সামনে পাইয়া সুধীশ প্রশ্ন করিল—কার কাশি হয়েছে, ছবি ! সারারাতই কাশির শব্দ পেয়েছি।

ছবি বলিল,—পিসীমার জ্বর হ'য়েছে। পিসীমাই কাশছিলেন।

—জ্বর হ'য়েছে ? কোথায় তোমার পিসীমা ?—সুধীশ প্রশ্ন করিল।

ছবি বলিল,—কাপড় কাচতে গেছেন, বোধ হয়।

ডিস্পেন্সারীতে যাইবার পূর্ব্বে যে-ঘরে হিমানী ও গায়ত্রী থাকে, সে সেখানে গেল। গায়ত্রী গায়ে র‍্যাপার জড়াইয়া হিমানীর মাথার কাছে বসিয়া ছিল ; সুধীশ ঘরে ঢুকিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হিমানী চোখে হাত চাপা দিল।

সুধীশ জোর করিয়া তাহার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া-লইয়া গায়ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—ছবির মুখে শুনলুম, আপনার জ্বর হ'য়েছে ?

গায়ত্রী কুণ্ঠিত ভাবে বলিল,—না, এমন কিছু নয়।

সুধীশ বলিল,—কিন্তু সারা-রাত্রি আপনি ত ভয়ানক কেশেছেন। দেখি হাতটা।

গায়ত্রী কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিল। কিন্তু সুধীশ নাড়ী ধরিতে না ধরিতেই তাহার প্রবল কাশি আরম্ভ হইল, এবং মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল।

সুধীশ তাহার মুখপানে চাহিয়া ছিল ; কাশি কমিলে বলিল,—আপনি একটু বসুন, আপনার বুক পিঠ পরীক্ষা ক'রতে হবে। বেজায় ঠাণ্ডা লাগিয়েছেন, দেখছি ! গায়ে এক ফর্দ্দ কাপড় রাখুন।

পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়া সে বলিল,—আমার পড়ার ঘরে যদুকে দিয়ে একটা বিছানা করিয়ে আপনি শুয়ে থাকুন। আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জা—একটু ব্রংকাইটিসের ভাব নিয়ে হ'য়েছে। এ-ঘরে আপনার আর এক মিনিটও থাকা উচিত নয়।

গায়ত্রী হিমানীর দিকে চাহিল, সে তখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল, অনেকখানিই পরপ্রত্যাশী। অর্থ বুঝিয়া সুধীশ বলিল,—ওঁর জন্যে ভাববেন না, আমার ওপর নির্ভর করুন। আর আপনার ত জ্বর এসেছে, ওঁর আপনি কি-ই বা করতে পারবেন ? তার চেয়ে যান, মুড়ি-শুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি গিয়েই একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, এক দাগ তখনি খাবেন। আপনি আর এ-ঘরে এক মিনিটও থাকবেন না ; রোগ ছড়ান কি ভাল ?

—অগত্যা গায়ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুধীশ বাহিরে আসিয়া রামুকে ডাকিল, বলিল,—আমার পড়ার ঘরে একটা বিছানা করে দেতো। মিস্ গুপ্তর জ্বর এসেছে।

রামু মাথা চুলকাইয়া বলিল,—বিছানা ত আর নেই, বাবু !

সুধীশ নির্ব্বাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল। যথেষ্ট উপার্জ্জন করে সে, কিন্তু কি ছন্ন-ছাড়া তার সংসার, এক জনের শুইবার মত স্বতন্ত্র একটা বিছানা নাই ! একটু ভাবিয়া বলিল,—থাক, সে যা হয় ব্যবস্থা করছি আমি। তুই এক কাজ কর, একবার রজনীর মায়ের

কাছে যা, আমার নাম ক'রে বলবি, তার আজ থেকেই এখানে আসা চাই, যা মাইনে চায়, দেব ; কিন্তু তার আসাই চাই। আর যা ত, ঝাঁ-ক'রে প্যাডটা নিয়ে আয়, একখানা চিঠি দিচ্ছি, যদুকে বলবি—মিস্ হাজরার কাছে যাবে। যা উত্তর দেন, যেন ডিস্পেন্সারীতে পৌঁছে দেয়।

রামু একটু মৌন থাকিয়া বলিল,—দু'জনেই থাকবে না কি ?

সুধীশ বলিল,—না হ'লে উপায় কি ? দু'জনেরই অসুখ করল, দেখা-শোনা ক'রবে কে ? কিন্তু ফিরে এসে যেন দেখি, তুই রজনীর মাকে এনেছিস।

রামু প্যাড আনিয়া দিলে সে তাড়াতাড়ি একখানা পত্র লিখিয়া তাহার হাতে দিয়া এদিকে ফিরিয়া দেখিল, গায়ত্রী বারান্দায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রামুর সহিত সুধীশের কথাবার্ত্তা সে সব শুনিয়াছে ; মুখে তাহার নিদারুণ ক্ষোভ ও লজ্জার ছায়া।

সুধীশ বলিল,—উত্তুরে-বাতাসটা আর গায়ে লাগাবেন না। আপনি আমার ঘরে গিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ুন। আমি পড়ার ঘরে শোব।

গায়ত্রী নতনেত্রে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুধীশের পড়ার ঘর ও শয়ন-কক্ষ পাশাপাশি, মাঝে দুয়ার আছে। সেইখানে—পাশাপাশি ঘরে—সে ও সুধীশ রাত্রি যাপন করিবে ? সুধীশকে অবিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই ত সে একাকীই এ-বাড়ীতে কয় দিন আছে ; কিন্তু সুধীশ কখনও কোনরূপ ঘনিষ্টতার চেষ্টামাত্র করে নাই। বিনা প্রয়োজনে কথাও বলে না। সবই না হয় সত্য, সুধীশ দেবতা, কিন্তু আর সকলে ত দেবতা নয়, লোকে কি বলিবে ? আর হিমানীই বা কি ভাবিবে ?

সুধীশ বোধ হয়, তাহার মানসিক অবস্থাটা বুঝিয়াছিল, তাই বলিল,—অন্য ঘর থাকলে এ কথা বলতুম না, কিন্তু এখন নিরুপায় হ'য়েই ব'লছি। আপনি সঙ্কোচ করবেন না, রোগী, শিশু আর বৃদ্ধ, এরা সাধারণ আইনের বাইরে।...আর যদি আপনার আপত্তি থাকে, আমি নীচের ঘরে শোব, তাহ'লে ত আপত্তি নেই ? রামু, চাদরটা, বালিশের ওয়াড়গুলো বদলে দে,—বলিয়া সে ঘড়ি দেখিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

ইহার পর আর কোন পথ খোলা রহিল না গায়ত্রী গভীর চিন্তার সহিত ধীরে-ধীরে সুধীশের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। কি জানি, অদৃষ্ট-সূত্র তাহাকে এ কোন্ পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে ! আজ পনের দিন হইল, সে সুধীশের গৃহে আসিয়াছে, অত্যন্ত কাছাকাছি থাকা যে কোন সময় হয় নাই, তাহা নহে ; যখন হিমানী হাসপাতালে ছিল, তখন গাড়ীতে প্রতিদিন সুধীশের পাশে বসিয়া সে হিমানীকে দেখিতে গিয়াছে, কিন্তু সে অন্যরূপ ছিল ; আর আজিকার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গায়ত্রী চিন্তায় দিশেহারা হইয়া উঠিল।

রামু বোধ হয় সুধীশের শেষ আদেশটা শোনে নাই, তার আর টিকি দেখা গেল না। গায়ত্রী ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করিল ;—কিন্তু আর সে-ও পারে না, শীতে সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল ; মনে হইল, জ্বর বুঝি ঘাড় ভাঙ্গিয়া আসিতেছে।

অগত্যা সে উঠিল, এবং একান্ত অনিচ্ছা ও সঙ্কোচের সহিত সুধীশের ব্যবহৃত শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। লেপখানা টানিয়া বালিশটায় মাথা দিতেই, কেমন একটা সুমিষ্ট মৃদু গন্ধ তার নাকে গেল। গায়ত্রী কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য মাথা তুলিতেই নজরে পড়িল, বালিশের গায়ে তোয়ালের ফাঁকে দুইগাছি ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ জড়াইয়া আছে। বালিসে লাগিয়া আছে সুধীশের মাথার গন্ধতৈলের সুমিষ্ট গন্ধ এবং ঐ দুইগাছি শিরোভূষণ কেশ—কেশাধিকারীর সম্পূর্ণ অবয়ব গায়ত্রীর চক্ষুর সম্মুখে ভাস্বর করিয়া তুলিল। পুরুষসংস্পর্শবঞ্চিতা বাইশ বছরের কুমারী কিশোরীর মনের কথা কেমন করিয়া জানিব ? গায়ত্রী বালিশটা বুকে টানিয়া লইয়া তাহাতে মুখ গুঁজিয়া রহিল ; মনে হইল, গায়ের আচ্ছাদনখানা থাকিয়া-থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে !

সুধীশ এবার একান্তে হিমানীর সহিত একটু আলোচনা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল ; কিন্তু গায়ত্রী সর্ব্বক্ষণ তাহার কাছে থাকায় পারিয়া উঠে নাই। আজ গায়ত্রী নাই, সুধীশ এ-সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারে না। এক সময় সে হিমানীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

নার্স মিস্ হাজরা আগাইয়া আসিলে সুধীশ মৃদু কণ্ঠে বলিল,—আপনি এখন একটু বাইরে যেতে পারেন।

নার্স বিনা বাক্যে বাহিরে চলিয়া গেল, এবং স্বেচ্ছাক্রমেই পর্দ্দাটা ভালো করিয়া টানিয়া দিয়া গেল। ব্যাপারটা হয় ত কিছুই নয়; কিন্তু যেন একটা কুৎসিত ইঙ্গিত সুধীশের গায়ে বিঁধিল। এক মুহূর্ত্ত সে অগ্রসর হইতে পারিল না, তাহার পর দৃঢ়-পদক্ষেপে আগাইয়া গেল। হিমানী জাগিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল, পদশব্দে চোখ মেলিয়া চাহিল, এবং সুধীশকে দেখিয়া তার রক্তহীন মুখ আরও ফেকাসে হইয়া গেল। কি যে করিবে, তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না।

সুধীশ চৌকিটা টানিয়া লইয়া কাছে বসিল। হৃদয়ের সমগ্র শক্তি সংহত করিয়া সহজ সুরে বলিল,—এখন কেমন আছ, হিম্…

দশ বৎসর পরে দু'জনে কথা!

সুধীশ সমস্ত দিন ধরিয়া এই সাক্ষাতের জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়াছে; কিন্তু হিমানী একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাই সে প্রশ্নকারীর দিকে চাহিতে পর্য্যন্ত পারিল না, চোখে একটা হাত চাপা দিয়া রহিল!

মিনিট পাঁচ অপেক্ষা করিয়া সুধীশ সজল কণ্ঠে বলিল,—সে ত সব ধুয়ে-মুছে গেছে, হিম্! সে আমিও নেই, সে তুমিও নেই। অতীতকে ভুলে যাও না, মনে কর না,—আমি শুধু ডাক্তার।—কথা ক'টা এক-নিঃশ্বাসে বলিল বটে, কিন্তু তার চোখের ভিতর একরাশি জল টল্-টল্ করিতে লাগিল।

হিমানীর কথা বলিবার সামর্থ্য ছিল না, মনে হইতেছিল, সুধীশ বুঝি তাহার গলা টিপিয়া প্রাণবধ করিতেছে!

আত্মসম্বরণ করিয়া সুধীশ বলিল,—তোমার স্বামীর কথাও শুনেছি। বড্ডই ব্যথা পেয়েছি। আমি ত হতভাগা আছিই, তোমাকে যথেষ্ট আঘাত দিয়েছি; কিন্তু আমার চেয়েও যে, সে তোমায় বেশি দুঃখ দিলে এইটাই আমার বেশী দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে। একটু থামিয়া পুনরায় ব্যথিত কণ্ঠে বলিল,—পৃথিবীকে তুমি শুধু দলিত হ'তেই এসেছিলে! এক দফায় আমি তোমায় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলুম, তবু তোমার পুনরায় জীবন-যাত্রা আরম্ভ করবার পথটুকু ছিল; এবার তাও নেই দেখে কি অনুশোচনায় আমি জলছি, তা শুধু আমার অন্তরাত্মাই জানেন। এ কয়'দিন আমার কি ক'রে কেটেছে জান, হিম্…

এবার হিমানী কথা বলিল, ক্লিষ্ট ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল,—আমায় তুমি ছবির মা ব'লেই ডেকো।

ঘুম ভাঙ্গিয়া সম্মুখে দংশনোদ্যত বিষধর দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া বিব্রত হইয়া উঠে, সুধীশের ঠিক সেই অবস্থাই হইল। ছবির মা!…হাঁ, এই ত তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুরতম ব্যবধান, এই ত সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য প্রাচীর! অনুপ গুপ্তের ঔরসজাত সন্তানের প্রসূতির সহিত সুধীশ রায়ের কোন সম্পর্ক নাই, তাহাই হিমানী ঐ সংক্ষিপ্ত কথাটির ভিতর দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে!… অথচ,…অথচ, নির্ব্বোধ সে, মূঢ় সে—পরের সন্তানের মুখে পিতৃসম্বোধন শুনিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছিল!…

ক্ষণকাল নিঃশব্দে কাটিলে সুধীশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—বেশ, যা বললে তুমি শান্তি পাও, তাই ব'লেই ডাকব। সত্যিই ব'লেছ, হিম্ ত আর নেই, সে যে শুকিয়ে গেছে!—একটু মৌন থাকিয়া বলিল,—আমি তোমার কাছ থেকে জানতে চাইছিলুম, আমি কি তোমার কোন উপকারে লাগিতে পারি? কোন রকম সাহায্য আমায় দিয়ে…

হিমানী ম্লান মুখে বলিল,—অনেক উপকার তোমার কাছে পেয়েছি। অসময়ে তুমি আমার ছেলেমেয়েকে যে ভাবে আশ্রয় দিয়েছ, এর জন্যে আমি যে ঋণী রইলুম, সে ঋণ কত গভীর, তা আমিই জানি।

সুধীশ বলিল,—অতীতের কথা জানতে চাইনি। ভবিষ্যতে কোন উপকারে লাগতে পারি কি না, তাই জানতে চাইছি।

হিমানী নিরুত্তর।

সুধীশ বলিল,—গায়ত্রী জানতে চাইছিলেন,—কবে বাড়ী যাবেন। তাঁকে কোন উত্তর দিইনি; কিন্তু তোমায় জিজ্ঞেস ক'রছি, ঐ অরক্ষিত বাড়ীতে তোমাদের বয়সী দু'টি মেয়ের ঐ দু'টি কচি ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকা কি যুক্তিসঙ্গত?

হিমানী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—কিন্তু উপায় কি?

সুধীশ বলিল,—অত বড় বিপদের দিনেও ত প্রতিবেশীরা কেউ উঁকি মারলে না—

হিমানী বলিল,—তাদের দোষ নেই, যে অবধি পুলিশ-হাঙ্গামা বাড়ীতে ঢুকেছে, সেই থেকে আর কেউ খোঁজ-খবর রাখতে চায় না।

সুধীশ জিজ্ঞাসা করিল,—আমি এখানে আছি, জানতে?

হিমানী বলিল,—নাম শুনে বুঝেছিলুম—তুমিই, কিন্তু তুমি জেনেই ডাকতে আসিনি। ওটা দৈব।

দু'জনেই একটু মৌন থাকিবার পর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া সুধীশ বলিল,—বাড়ীটা না কি বাঁধা প'ড়েছে?

হিমানী চাপা-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—হাঁ! প্রায় ডুবে এসেছে।

সুধীশ জিজ্ঞাসা করিল,—অর্থ-সাহায্য করবার কেউ আছে?

হিমানী শুষ্ক কণ্ঠে বলিল,—না।

সুধীশ ব্যাকুল হইয়া বলিল,—তবে ওখানে কি ক'রে থাকবে?

হিমানী হতাশার সহিত বলিল,—কিন্তু ও-বাড়ী ছাড়া আর আমাদের মাথা গুঁজবার জায়গাই বা কোথায়?

সুধীশ একটুখানি ভাবিল; তাহার পর বলিল,—তবে একটা অনুরোধ রাখ। যত দিন না তোমার স্বামী আসেন, তোমার সংসারের ভার আমায় বইতে দাও।—বাড়ী কত টাকায় 'মর্টগেজ' আছে।

হিমানী বলিল,—চার হাজারে। কিন্তু তুমি আমার সংসারের ভার বইবে কেন? লোকে কি ব'লবে?

সুধীশ কাতর হইয়া বলিল,—আমি লোককে বলবার অবসর দেব না, আমি তোমার বাড়ীর পথেও যাব না,—

হিমানী বলিল,—না গেলেও কেউ এত বোকা নয় যে, শুধু শুধুই তুমি আমাদের সাহায্য ক'রছ, এটা বুঝে নেবে! আর তারা এত উদার নয় যে, তোমার সদাশয়তার সন্ধান পেয়ে বোবা হ'য়ে থাকবে!—তোমার সাহায্য আমি নেব না।

সুধীশ অস্থির হইয়া বলিল,—কিন্তু বাড়ী যে মর্টগেজ? তা ছাড়া ট্যাক্সও বাকি প'ড়েছে শুনেছি—

হিমানী বলিল—যা শুনেছ, সবই সত্যি। যে দিন ডিক্রী করিয়ে নেবে, ছেলেমেয়ের হাত ধরে পথে দাঁড়াব। বয়স আর চেহারা লোকের বাড়ী রাঁধুনীগিরি ক'রেও খেতে দেবে না, ভিক্ষে ক'রে খেলে কেউ আপত্তি করবে না—!

সুধীশ আত্মহারা হইয়া উঠিল, হিমানীর শিথিল বাহু-খানা দুই হাতে জড়াইয়া-ধরিয়া তাহার উপর মুখ রাখিয়া মর্ম্মপীড়ায় কম্পিত স্বরে ব্যাকুল হইয়া বলিল,—উঃ, হিম্, কি ব'লছ? আমি বেঁচে থাকতে তুমি পথে দাঁড়াবে? তুমি ভিক্ষে ক'রবে? না, না, আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না।

হিমানী নির্লিপ্ত স্বরে বলিল,—হাঁ, তুমি থাকতেই ভিক্ষে ক'রব। ক'রতে হবে আমাকে। তুমি আমার কে? এই যে তোমার কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছি, এ ভিক্ষে ছাড়া আর কি?

সুধীশের দুই চোখের জলে হিমানীর বাহু ভিজিয়া গেল; সে অশ্রুরুদ্ধ আর্ত্তকণ্ঠে বলিল,—আমি তোমার জীবন নষ্ট ক'রেছি। কিন্তু তুমি তার এমন নির্ম্মম প্রতিশোধ নিও না।

হিমানীর দুই চোখের জলও গড়াইয়া পড়িল; সে তবু প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়া রহিল। কথঞ্চিৎ সফলকাম হইলে বলিল,—কেন বৃথা অধীর হ'চ্ছ, উপায় যখন নেই, তখন শান্ত হওয়াই ভাল।

সুধীশ মাথা তুলিল না; বলিল—আমি ও-কথা শুনব না। তোমায় উপায় দেখিয়ে দিতেই হবে আমি তোমার সঙ্গে পৈশাচিক ব্যবহার ক'রেছি বলে তুমি তা করতে পাবে না। যা'হোক উপায় করতেই হবে তোমায়।··· আমার দ্বারা কি কোন উপকার হয় না?

হিমানী এক মিনিট চাহিয়া রহিল; তাহার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল,—পারো। উপকার করবার পথ তোমার চোখের সামনেই খোলা আছে, সুধীশ!

বহু—বহু দিনের পরে সেই সম্বোধন! সুধীশ মুখ তুলিল, তখনও চোখের নীচে জলের ধারা শুকায় নাই, অথচ আশ্বস্তির হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রীতি-মধুর স্বরে বলিল,—কি ক'রে হিমানী?

—গায়ত্রীকে বিয়ে করো।

সুধীশ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া গেল, কোন মতে উচ্চারণ করিল,—তুমি ব'লছ এই কথা?

হিমানী কথা বলিল; সংযত পরিষ্কার কণ্ঠস্বর, উত্তেজনার লেশমাত্র তাহাতে নাই। বলিল,—হাঁ, আমিই

ব'লছি, এতে আশ্চর্য্য হচ্ছ, সুধীশ! তুমিও এটুকুও বিশ্বাস আমার ওপর রাখতে পারনি যে, আমি যত দিন বেঁচে থাকব, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষাই করব? একটু নীরব থাকিয়া সংবৃত কণ্ঠে কহিল,—গায়ত্রীকে বিয়ে ক'রে তুমি ঠ'ক্‌বে না।—তোমার অতীতের যা কিছু অপ্রিয় স্মৃতি—সমস্তই সে বুক দিয়ে মুছে নেবে। ও হ'ল লক্ষহীরার জাতের মেয়ে,—স্বামী রাত দুটোয় মাতাল হ'য়ে ফিরলেও যে নিষ্ঠাভরে তার পরিচর্য্যা ক'রে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে ক'রতে পারে।—সুধীশের সচকিত বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া আবার বলিল,—বিয়ে ক'রে দেখ, সুধীশ, তুমি জীবনে আনন্দ—তৃপ্তি—শান্তি—সব পাবে। দরিদ্রের ঘরে গায়ত্রী কোহিনূর; গলায় পরে দেখ—তোমার বুক জুড়িয়ে যাবে। ওর মত খাঁটি জিনিস আমি জীবনে দু'টি দেখিনি।

সুধীশ যেন পাথর হইয়া গিয়াছে!

হিমানী বলিল,—বুঝেছি, আমার মুখে এ কথা শুনে তুমি ঠিক বুঝে-উঠতে পাচ্ছ না, নয়?

হতবুদ্ধি সুধীশ ঘাড় হেলাইয়া স্বীকার করিল, কথাটা ঠিক বটে।

এবার হিমানীর কথা বলিতে কতকটা বিলম্ব হইল; তাহার পর রোগপাণ্ডুর মুখে হাসির আভাস আনিয়া বলিল,—ভুলে যেও না সুধীশ, আমি তিন ছেলের মা। আমাদের জীবনের চরম আর মধুর পরিণতি হ'ল মাতৃত্ব;—তাই যিনি এই দিক দিয়ে আমার জীবনটা সার্থক ক'রে তুলেছেন,—তিনি যাই হোন্—আমার শ্রদ্ধার পাত্র, আমার প্রিয়জন।

সুধীশ নিদ্রোত্থিতের মত সহসা মাথা তুলিল, গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—কিন্তু এ যে একেবারেই অসম্ভব, হিমানী! তুমি ত জান, আমি নিঃস্ব, আমি দেউলে। তুমি গায়ত্রীর এত বড় হিতাকাঙ্ক্ষিণী হ'য়ে তাঁকে শেষে এই দেউলের হাতে তুলে দিতে চাইছ?

হিমানী হাসিল—বক্র হাসি'; বলিল,—দেউলে? এ যে নতুন কথা শুনছি! পুরুষ কখন দেউলে হয়? তোমরা ত প্রজাপতি, ফুলে ফুলে বিচরণ করাই তোমাদের অভ্যাস!…দেউলে? তোমরা কি কাণাকড়ি খরচ করো? তোমরা ত মাড়োয়ারীর মত নাম ভাঁড়িয়ে ব্যবসা করো, দেউলে হবে কোন্ অভাবে? তোমরা এক পাইও খরচ করো না, জমার ঘর ত ভরাই থাকে!

সুধীশ অধোবদনে রহিল।

হিমানী তীক্ষ্ণ-বিদ্রূপভরে বলিল,—হয় ত এ কথা আজ আমার মুখে-আনা পাপ; কিন্তু তবু বলি,—এক সময় আমায় ভালবেসেছিলে,—সত্যি, আর প্রাণভরেই ভালবেসেছিলে; তবু দু'দিনের জন্যে চোখের আড়াল হ'তেই আমাকে ভুলে গিয়ে আর এক জনকে ভালবাসতে বাধেনি,—আর আজ, আজ তেমনি আর এক জনকে ভালবাসতে পারবে না?

অমোঘ যুক্তি!

সুধীশ ক্লিষ্টকণ্ঠে বলিল,—তুমি এ অনুযোগ করতে পারো। কিন্তু মানুষ ত আমি, আমার জীবনে আর কারুকে জড়িয়ে কষ্ট দিতে ইচ্ছে নেই। আমার তা অসাধ্য, বার-বার আর তা পারা যায় না!

হিমানী কঠিন ভাবে হাসিল, বলিল,—বেশ যায়, এবং তুমিও পারবে। একবার যে পেরেছে, তার পক্ষে দ্বিতীয়বার পারা কিছুই কঠিন নয়।

সুধীশ বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—আমায় ক্ষমা করো হিমানী, আমি তা পারব না।

হিমানী বলিল,—তোমার ইচ্ছে। কিন্তু দয়া ক'রে আজই আমাদের বাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থাটা ক'রে দাও। এখানে থাকা আর আমাদের চলে না।

সুধীশ সোদ্বেগে বলিল,—সে কি! তুমি যে এখনও একেবারে অক্ষম, আর গায়ত্রীও অসুস্থ!

হিমানী সতেজ কণ্ঠে বলিল,—হাঁ অসুস্থ, না হয় সে মরবে। নিজের ঘরে মাটী কামড়ে মরে, সেও ভাল, তাতে লজ্জা নেই; কিন্তু তোমার ঘরের পালকের গদিতে শুয়ে মরলে তার কলঙ্ক রাখবারও যে ঠাঁই থাকবে না! মরি তাতে দুঃখ নেই; কিন্তু কলঙ্ক কিনতে চাই নে। যদি তুমি আমার অনুরোধ রাখতে না পার,—দয়া ক'রে আমায় বাড়ী যেতে দাও।

সুধীশ দুই করতলে মুখ ঢাকিল।

হিমানী তাহার দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার ঠোঁটের উপর খেলা করিতে লাগিল—নিষ্ঠুর

হাসি! সুধীশের চিত্তের দৃঢ়তা সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ অনাস্থা। সে ভাবিতেছিল, কতক্ষণের জন্য এ দ্বন্দ্ব, এই ইতস্ততঃ ভাব? গায়ত্রীর সুন্দর মুখ নিশ্চয়ই সুধীশের চপল চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে!

৮

প্রায় মিনিট পনের পরে সুধীশ মুখ তুলিল,—বিষণ্ণ, কাতর, ম্লান মুখ!

হিমানী তাহাকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই প্রশ্ন করিল,—কি স্থির করলে?

সুধীশ গভীর নিঃশ্বাস মোচন করিয়া মর্ম্ম-পীড়িত কণ্ঠে বলিল,—এ ছাড়া তোমায় সাহায্য ক'রবার কি আর কোন—কোন উপায়ই নেই?

হিমানী শক্ত ভাবে ঘাড় নাড়িল।

সুধীশ মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া হতাশার সহিত ভগ্ন-স্বরে বলিল,—তবে তাই হোক। তোমার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গায়ত্রীকেই নেব।

হিমানী বলিল,—ও-কথা ব'ল না, ওতে গায়ত্রীর অপমান হয়। গরীবের ঘরে সে জন্মেছে বটে,—কিন্তু বহু লোকের সে তপস্যার বস্তু। তার মত রত্ন মেলে অনেক সাধনায়। ওকে এত ছোট মনে ক'র না।

সুধীশের অন্যমনস্ক কর্ণে বোধ হয় সে কথা পৌঁছিল না। সে আত্মগত ভাবেই বলিতে লাগিল,—গায়ত্রীকে নেব ত, কিন্তু কি পাবে সে? আমার কি আছে? আমি যে নিঃস্ব, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল!…লুকোব না, কোন কথাই লুকোব না আমি; সবই জানবে, আমি যে কত নিঃস্ব, তা জানবে। সব কথা জানানই আমার উচিত।

হিমানী বলিল,—হাঁ, তোমার বলাই উচিত। তুমি ব'ল, আমি বারণ ক'রতে চাইনে। কিন্তু আমার নামটা জানিও না, আমায় ওর কাছে খেলো ক'রে দিও না।

সুধীশ অর্থহীন দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—তোমার কথাই থাকবে। কিন্তু এখনও আমার দণ্ড কমাও, হিমানী! যে দণ্ড দিচ্ছ, তা বড় কঠোর, অতি দুর্ব্বহ, বইতে গিয়ে যদি মারা পড়ি! ফাঁসীর দড়ি পরিয়ো না আমার গলায়—

হিমানী দরদভরা কোমল কণ্ঠে বলিল,—ছি, সুধীশ, ও-কথা মুখে এনো না। আমি বলছি, গায়ত্রী তোমার দণ্ড নয়, তুমি শান্তি পাবে; ফাঁসীর দড়ি নয়, ও তোমার গলায় ফুলের মালা হবে। ওর গুণের তুলনা নেই। তোমার ছন্নছাড়া জীবন ওর হাতে তুলে দিয়ে দেখ, কি মাধুর্য্যে সে তা ভরে দেয়। আমি একান্ত মনে প্রার্থনা ক'রছি, আজ যে ঘরে, যে বিছানায় তুমি তাকে শোবার অধিকার দিয়েছ, সেই ঘরে, সেই বিছানায় তোমার বুকে মাথা রেখেই ও যেন বাকি জীবনটা কাটাতে পারে। এর চেয়ে আর কি বড় সৌভাগ্য ওর জন্যে আমি প্রার্থনা করতে পারি, ত আমার জানা নেই।

সুধীশ ম্লানমুখে বলিল,—সৌভাগ্য ব'ল না হিমানী, দুর্ভাগ্য বলো। একবার নয়, দু'বার যে পোড় খেয়েছে, তার স্ত্রী হওয়া সুখেরও নয়, গৌরবেরও নয়। আর ঐ রকম স্বামীর কাছ থেকে তার স্ত্রী কতটুকু স্নেহের প্রত্যাশা করে?

হিমানী বয়োজ্যেষ্ঠার মত তাহার বাহুর উপর হাত রাখিয়া মমতার সহিত বলিল,—ষোল আনাই ক'রবে। কেন ভাবছ, তুমি কুবেরের মত ঐশ্বর্য্যশালী, ভাল-বাসার খাঁকতি গায়ত্রী পাবে না। সে সত্যই সুখী হবে। আমি তাকে চিনি।

সুধীশ তর্ক করিল না, উদাস ভাবে জানালার বাহিরে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত করিল।

মনে মনে প্রশ্ন জাগিতেছিল, এ কি সেই হিমানী?… এক দিন যে ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিত; আজ অবলীলাক্রমে তাহাকে অন্যের হাতে তুলিয়া দিতে তাহার এত আগ্রহ! এত ব্যস্ত সে! হিমানী তাহার মুখের পানেই বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল,—অনেকক্ষণ পরে মৃদুস্বরে ডাকিল,—সুধীশ!

সুধীশ তাহার উদাস দৃষ্টি ফিরাইয়া নিরুত্তরে চাহিল।

হিমানী বলিল,—মনে দ্বিধা ক'র না; আমি তোমায় ঠকাব না। তুমি সত্যিই শান্তি পাবে।

সুধীশ শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

খানিকক্ষণ নীরব থাকিবার পর ধীরে ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল; গমনোদ্যত হইয়াও সহসা কি ভাবিয়া চমকিয়া উঠিল। ত্রস্তপদে হিমানীর কাছে সরিয়া আসিয়া

ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল,—একটা যে বড় সর্ব্বনাশ হয়েছে, হিম্!

হিমানী ভীত ভাবে বলিল,—কি?

ছবির মনে যে ধারণা হইয়াছে, এবং তাহার নিকট সুধীশ নিজের যে দুর্ব্বলতাটুকু প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা সে অকপটে বলিয়া ফেলিল।

হিমানী পাংশুমুখে বলিল—কেন এ কাজ ক'রলে?

সুধীশ অনুতপ্ত—কাতর কণ্ঠে বলিল,—নিজে থেকে করিনি। তবে ছবি যখন স্থিরবিশ্বাসের সঙ্গে ব'ললে, আমি জানি, তুমি—তুমিই আমার বাবা,—তখন, তখন হিমানী, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললুম। বয়স হঠাৎ দশটা বছর পিছিয়ে গেল; আমি তার স্থিরবিশ্বাস ভাঙ্গতে পারলুম না, আর তোমার ছেলে আমায় বাবা ব'লে ডাকছে—তা শোনবার লোভটুকুও আমি সামলাতে পারলুম না। তাই, কি যে হ'ল—

হিমানী শুষ্ক হাসির সহিত বলিল,—কারুর ছেলের মুখের বাবা ডাক শুনলেই কি তার বাবা হওয়া যায়? না—তার মাকেই পাওয়া যায়? এ ভুল তোমার কেন হ'ল?—সে একটু থামিয়া বলিল,—তোমার এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় তুমি যা ক'রেছ, তার জন্যে তুমি নিজেই ওদের কাছে লজ্জা পাবে। ওরা এ কথা ভুলবে না—বড় হ'য়েও মনে রাখবে।—তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—তার পর যে দিন দেখবে, ওদের বাবার সঙ্গেই পিসীর বিয়ে হচ্ছে, সে দিন—ওরা যত ছোটই হোক, ওদের মনেও খট্‌কা বাধবে।

এত বেদনার মধ্যেও এই নারীসুলভ রসিকতায় সুধীশ একটু হাসিল; কিন্তু পরক্ষণেই মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; সে অপরাধীর মত মলিন মুখে বলিল,—কি ক'রব তবে?

হিমানীও ভাবিতেছিল; ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাসের সহিত বলিল,—কি ব'লব! যেমন সহজে এটা ওদের মনে গেঁথে দিয়েছ, তেমনি কোন একটা বুদ্ধি বার ক'রে তাদের ঐ ভুল ধারণাটা ভেঙ্গে দাও। ওরা বড় হয়ে আমায় কি ভাববে, ভাব দেখি!

সুধীশ স্তব্ধ ভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল; তাহার পর উঠিয়া-দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিল,—কি জানি, কি ক'রে ওদের কচি-মনের ধারণা ভাঙব।—তাহার পর সে বুকের উপর দুই হাত আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া চিন্তাকুল চিত্তে ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করিল।

সে চলিয়া গেলে তিন ছেলের মা হিমানী মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। সুধীশের কাতর মুখচ্ছবি তাহার অন্তরের কোন একটা কোমল অংশে সপ্রকাশ থাকিয়া তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকের মত অনুক্ষণ তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সেই সুধীশ, সেও সেই, তবু আজ কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! কত সংযত, কত নির্ব্বিকার ভাবে তাহারা কথা বলিয়াছে। অথচ দশ বছর পূর্ব্বে?...

হিমানীর মনে পড়িতে লাগিল—সেই সকল অতীত দিনের সুখ-স্মৃতিগুলি, কত ছেলে-খেলা! আজ বহু দিন পরে সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা—হাহাকার তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। তাহার জীবনের ঊষায় সুধীশ জাগাইয়াছিল—নারীত্ব—আর অনুপ জাগাইয়াছে—মাতৃত্ব!......আজ হিমানী প্রবল ভাবে অনুভব করিল, দুইটাই জীবনের বিভিন্ন দিক, একটা দিয়া অন্যটার ক্ষুধা মেটে না!

[ক্রমশঃ

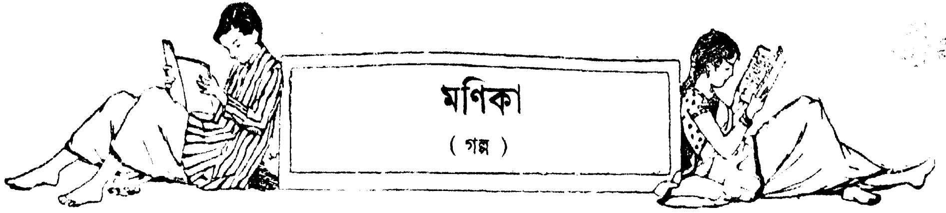
শ্রীমায়াদেবী বসু।

উত্তম ও মধ্যম

মধ্যমেরে সমাদর করি বহু উত্তমের চেয়ে,
যে মধ্যম মধ্যপথে চলে ধীর মধ্যগতি বেয়ে।
যে মধ্যম গৃহদীপ শান্ত শিখা জ্বলে অকম্পিত
ধধূপেরে কে না জানে অবিলম্বে ধূলায় লুণ্ঠিত।

যে মধ্যম উত্তমেরে শ্রদ্ধাভরে করে বহু মান
যে মধ্যম অধমেরে টানে ক্রোড়ে নাহি অভিমান।
সেই সে মধ্যম ভাল নাহি বন্যা—প্লাবন—শুষ্কতা
সুস্থির সরসী সম গুঞ্জে অলি অরবিন্দে যথা।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত।



দুর্য্যোধন মহাভারতের উপনায়ক। তাহার প্রবল লিপ্সার শেষ নাই; যুগে যুগে কালে কালে যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে, তাহার ব্যবধানে তাহার দুর্দ্দম মাৎসর্য্য পরিস্ফুট। সংসারে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন হয় না; দ্বেষ এবং হিংসার গতি অব্যাহত থাকিয়া যায়।

কথাটি মনে পড়িল—নীলাচলে কামাখ্যা-মন্দিরে। তীর্থযাত্রী নহি, শিলং গিয়াছিলাম কুকুর-দংশনের বিষক্ষালনের জন্য—জলাতঙ্ক রোগ হইতে অব্যাহতি লাভের আশায়। ফিরিবার পথে তীর্থদর্শনের পুণ্য-সঞ্চয় হইল। গৃহে তখনও তরুণী ভার্য্যার আবির্ভাব হয় নাই; কাজেই মনে মনে ভয় ছিল। কামরূপ-কামাখ্যার ডাকিনীরা পুরুষকে ভেড়া করিয়া রাখে - এবম্বিধ প্রবাদ শৈশবকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি।

বয়স একটু বেশী হইলে অবশ্য জানিয়াছি, ভেড়া হইবার জন্য কামরূপ গমনের প্রয়োজন নাই। প্রতি গৃহ-কামাখ্যায় সহধর্ম্মিণীরাই ডাকিনীর ঐ শক্তি-প্রয়োগে একান্ত পারদর্শিনী। উচাটন, বশীকরণ না জানিয়াও তাঁহারা পুরুষদের ভেড়া করিয়া রাখিতে পারেন, আর তন্ত্রমন্ত্রজ্ঞানহীনা এই সব যোগিনীর দাসত্ব করিয়াই আমরা পরম পুরুষার্থ লাভ করি। কিন্তু সে জ্ঞান তখন ছিল না, আর তা'-ছাড়া তখন সন্ন্যাসী হইবার সংকল্পও ছিল। স্বার্থের দাসত্ব না করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিব;—তাই ভয়ে ভয়ে কামাখ্যায় গিয়াছিলাম। ডাকিনী-যোগিনীর সাক্ষাৎ হয় নাই, সেটি আমার পুণ্য কিংবা ভাবী প্রিয়তমার তপস্যার বল, সে মীমাংসা দুরূহ, কিন্তু কামাখ্যা আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

ব্রহ্মপুত্রের খরস্রোতের চিত্রটি আজিও যেন নয়নে ভাসিতেছে। পাহাড়ের সোপান বাহিয়া দুঃসাহসিক আমি স্নান করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেই প্রবল স্রোতে নামিতে সাহস করি নাই। তবে সেখান হইতে ব্রহ্মপুত্রের যে ভৈরব রূপ দর্শন করিয়াছিলাম, উদ্দাম তরঙ্গরাশির যে জলদগম্ভীর ভীষণ নিঃস্বন শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা প্রাণে গাঁথিয়া গিয়াছিল।

একান্ত ভাল লাগিয়াছিল—এখানকার পাণ্ডাদের সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার। যে পাণ্ডার বাড়ী উঠিয়াছিলাম, তাহার নাম মনে নাই, কিন্তু সে ছিল বিধি-পাঠক। তাহার দশ-এগার বৎসরের কন্যা মণিকা আমার খাবার আনিত। মেয়েটির কমনীয় শ্রী আমাকে মুগ্ধ করিত। বয়সের চেয়ে তাহার বুদ্ধি অধিক তীক্ষ্ণ ছিল। এক দিন মণিকা আসিয়া আমায় বলিল,—"বাবু, বাবাকে রক্ষা করুন।" তাহার অনুনয়ে হৃদয় গলিল। কিন্তু তাহার নিকট হইতে সমস্ত ইতিহাস শুনিতে পাইলাম না; তবে সন্ধ্যার সময় বিধি-পাঠক আমাকে সমস্ত কথাই বলিল।

তাহার আখ্যানের সারাংশ এইরূপ,—

অতি পুরাকালে কোচ রাজবংশ কামাখ্যায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের পর আহোম রাজারা আসামের রাজা হন। মায়ের যথাবিধি পূজার জন্য আদিশূরের ন্যায় কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন যাগযজ্ঞ-পারদর্শী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই পাঁচ জনের সন্তান-সন্ততি বর্ত্তমানে পাঁচ ভাগে বিভক্ত—তাহাদিগকে যথাক্রমে বুড়া, ডেকা, হোতা, বিধি-পাঠক, এবং ব্রহ্ম বলে। ব্রহ্ম-বংশ ধ্বংস হইয়াছে। আহোম রাজাদের আমলে ইহারা কেবল পুরোহিত এবং পাণ্ডার কাজ করিত। দেবত্র সম্পত্তি পরিচালনের জন্য সেবা-চালক নামক এক জন কর্ম্মচারী রাজারা নিযুক্ত করিতেন। পুরোহিতরা তাহাদের বয়স্ক লোকদের মধ্য হইতে এক জন প্রধান পুরোহিত নির্ব্বাচন করিতেন, তাহাকে দলই লামার মত দলই বলা হইত। মণিকার পিতা বিধি-পাঠক নির্ব্বাচনে প্রথমে দলই নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু পরে প্রতিপত্তিশালী বুড়া এবং ডেকা-বংশ বুড়াবংশীয় আর এক জনকে নির্ব্বাচন করিয়াছে। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি; ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার আসাম জয় করেন, তখন দুই জন

প্রতিদ্বন্দ্বী দলই কলহ আপোস করিয়া লইয়াছিলেন। তখন হইতে দুই জন দলই কার্য্য পরিচালনা করিতেছে।

এই বিধি-পাঠক শান্তশিষ্ট মানুষ। সে আমায় বলিল—এই জ্ঞাতি-বৈরে তাহার ইচ্ছা নাই। যুদ্ধ-সমুদ্যত অর্জ্জুনের মত তাহার মনের অবস্থা। জ্ঞাতি-বৈর করিয়া রাজ্য বা ভোগ তাহার আকাঙ্ক্ষিত নয়। সে বিজয় চায় না, রাজ্য চায় না, সুখ চায় না, সে চায় নিবিড় শান্তি। হরিনাম করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইবে—ইহাই তাহার একান্ত ইচ্ছা।

মুস্কিল বাধাইয়াছে মণিকা এবং তাহার মা। মণিকার মাকে দেখি নাই, কিন্তু মণিকাকে দেখিয়া ঐ তেজস্বিনী নারীর পরিচয় পাইয়াছি। অন্তরালে যে বিতর্ক চলিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তেজস্বিনী বলিয়াছে—"অপর পক্ষ যখন অন্যায়কারী, তখন তোমার পক্ষে এটা ধর্ম্মযুদ্ধ—এটা না করলে অন্যায় হবে"—শাস্ত্রজ্ঞ বিধি-পাঠক তাহা অস্বীকার করিতে পারে নাই। বিধি-পাঠক বলিল, "এটা যদি কেবল ব্যক্তিগত বিরোধ হ'ত, তা হ'লে হয় ত আমার পক্ষে চুপ ক'রে থাকা চ'লত, কিন্তু ওরা ব'লছে—বিধি-পাঠক এবং হোতা কখনই দলই হ'তে পারবে না—এটা মেনে নিলে এই দুই বংশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।"

আমি মণিকার অনুরোধের অর্থ বুঝিলাম। অগ্নিগর্ভা যে নারী আপন স্বামীকে আপন মতে আনয়ন করিতে পারে নাই—তাহার দুর্ব্বলতা দৃঢ় করিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিয়াছে। আমি গীতা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। বিধি-পাঠককে বলিলাম, "ওরা যখন দুর্য্যোধনের মত ব'লছে,—"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী—তখন যুধিষ্ঠিরের মত আপনাকেও ধর্ম্মযুদ্ধ ক'রতে হবে—আপনার প্রাপ্যকে দুর্ব্বলের মত, মূঢ়ের মত ত্যাগ করা ধর্ম্ম নয়—ধর্ম্মযুদ্ধ করুন।"

বিধি-পাঠক আমার তরুণ প্রাণের উৎসাহ-চঞ্চল যুক্তি-জালে ভাসিয়া গেল! সে সম্মত হইল। বিদায়ের পূর্ব্বে পরিপূর্ণ তৃপ্তির আনন্দ লইয়া ফিরিলাম। মণিকার উজ্জ্বল চোখে যে মাধুর্য্য ও আনন্দ দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, কাজ হইয়াছে।

এ-সব কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাহার পর ওকালতি পাশ করিয়া হাইকোর্টে বসিয়াছি; নানা মক্কেলের নানা কাজ করি। এক দিন আমার বসিবার ঘরে আসিল—জ্যোতির্রূপিণী এক তরুণী,—রূপের উজ্জ্বল দ্যুতিতে প্রশস্ত কক্ষ যেন উদ্ভাসিত হইল। সৌন্দর্য্যের সেই জগজ্জয়ী মাধুর্য্য যেন সর্ব্বত্র তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। আমি উঠিয়া-দাঁড়াইয়া বলিলাম—"বসুন।"

তরুণীর সঙ্গে এক জন বৃদ্ধ। তরুণী তাহার বিম্ব-রক্তিম ওষ্ঠাধরে হাস্যের লহর বহাইয়া কহিল, "আমায় চিনতে পারছেন না?"

একটু বিস্মিত হইলাম; এ-কথা লজ্জায় স্বীকার করিব—বিবাহ করিয়াছি এবং বিবাহের পর হইতে গৃহকেই সারাৎসার মনে করিয়া দিন কাটাইতেছি। এই লাবণ্যময়ী তরুণী পরিচয়ের দাবী জানাইয়া সত্যই আমাকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। সুরেখা মাঝে মাঝে আফিস-ঘরের পাশে থাকে; না থাকিলেই বাঁচি! তাহার আদর যেমন অব্যাহত, আবার কণ্ঠও তেমনই শ্লথ।

নম্র কুণ্ঠায় বলিলাম,—"না।"

মণিকার মুখ লজ্জায় লাল হইল না। সে অপ্রতিভ হইল না। বীণানিন্দিত স্বরে বলিল, "আমি মণিকা।"

বিস্ময় বাড়িয়া গেল। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার সহিত এই বরবর্ণিনীর কোনও অংশে মিল নাই। এই রাজরাজেশ্বরী সেই বালিকার মধ্যে ঘুমাইয়াছিল, তাহা বাস্তব; কিন্তু কল্পনাকেও সহসা আঘাত করে। বিকচ পুষ্প, কোরকের মধ্যে ঘুমায়, কিন্তু প্রস্ফুট গোলাপের অপূর্ব্ব শোভা তাহার কুঁড়ি দেখিয়া কয় জনে অনুমান করিতে পারে? তাহার সাজ-সজ্জায় বাহুল্য ছিল না—বৈভব ছিল না—কিন্তু তথাপি যে অসামান্য ঐশ্বর্য্য প্রকৃতি তাহাকে মুক্ত-হস্তে দান করিয়াছে, তাহাতে দেবতারাও মুগ্ধ হইতে পারেন।—আমি অনেকক্ষণ কথা বলিতে পারিলাম না। হতবাক্ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। বিধি-পাঠক বলিল, "বাবু, আমরা বিপন্ন, আমরা নিম্ন-আদালতে মোকদ্দমা হেরেছি, এখন হাইকোর্টে আপিল ক'রতে হবে,—কিন্তু আমাদের যথাসর্ব্বস্ব গেছে—তাই আমরা আজ আপনার দ্বারস্থ—আপনি আমাদের রক্ষা করুন—বড় উকিল দেওয়া ত আমাদের সাধ্য নেই;—মণিকা আপনার নাম মনে

রেখেছিল, তাই অনেক তল্লাস ক'রে আপনার কাছে এসেছি।"

মণিকা আমার নাম মনে রাখিয়াছিল! কেন, কে জানে? হৃদয় আত্মপ্রসাদে ভরিয়া উঠিল। এই রূপসী তরুণী আমাকে সমীহ করে, আমাকে শ্রদ্ধা করে, হয় ত আমাকে ভালবাসে!—এই সুখ-কল্পনা আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। আমার এই ভাব হয় ত বুদ্ধিমতী মণিকার দৃষ্টি এড়াইল না; সে হাসিয়া বলিল, "আপনি আমাদের কাগজ দেখুন—আপনাকেই এই মোকদ্দমা চালাতে হ'বে।"

এত দিন পর্য্যন্ত ছোট-খাট মোকদ্দমা করিয়াছি। এত-বড় একটা মোকদ্দমা আমায় চালাইতে হইবে ভাবিয়া একটু বিহ্বল হইলাম। কিন্তু মণিকা আমায় বিহ্বলতা হইতে রক্ষা করিল; সে তীব্রকণ্ঠে বলিল,—"আপনার ভয়ের কারণ নেই—আমাদের মোকদ্দমা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—আমাদের যা ব'লবার, আমি আপনাকে তা বুঝিয়ে দেব।"

আত্মবিশ্বাসশীলা এই স্পর্দ্ধিতা তরুণীর কথা আমার সুপ্ত পৌরুষ জাগাইয়া তুলিল; বলিলাম, "ভয় নেই, তবে আপনারা 'সিনিয়র' উকিল দিলে বোধ হয় ভাল ক'রতেন।"

মণিকা সহাস্যে বলিল, "না, তার দরকার নেই,—আমি আপনাকে সাহায্য ক'রব,—যে কয়টি বিষয় ব'লবার আছে—তা আমি আপনাকে লিখে দেব—আপনি সেটাকে শুধু আদালতের ভাষায় পরিবর্ত্তিত ক'রে নেবেন……"

সম্মত হইলাম। বিধি-পাঠক বলিল, "বাবু, আমরা আপনার পারিশ্রমিক এখন দিতে পারব না…যদি মা মুখ তুলে চান—তবেই—"

আমি উদারতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "না, না, আপনার কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেব না,—কারণ, এই কাজে আমিই আপনাকে উত্তেজিত ক'রেছিলাম…"

বৃদ্ধ প্রসন্ন হইল; বলিল, "সে কথা আপনার মনে আছে, বাবা!"

আমি ঘাড় নাড়িলাম। বৃদ্ধ বলিল, "যার জন্য এ লড়াই, সে আজ নেই, যথা-সর্ব্বস্বই গেছে; কিন্তু সতীর ইচ্ছা পালন না ক'রলে আমি প্রত্যবায়গ্রস্ত হ'ব! এ ত শুধু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এ আমার বংশের অধিকার, ন্যায্য পাওনা—সর্ব্বস্ব বিনিময়ে আমাকে এই দাবী রাখতে হবে……"

আমি তাহার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া কাগজে মনোনিবেশ করিলাম। পড়া শেষ হইলে মণিকার মুখের দিকে সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, "এ মামলায় আপনাদের হারা অন্যায় হ'য়েছে। নথিতে যে সব প্রমাণ আছে, তার বলেই আপনারা জিতবেন…"

"তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক…বাবা!"

বৃদ্ধ ও মণিকা বিদায় লইলে সুরেখা আসিল।—প্রশ্ন-বাণে জর্জ্জরিত হইলাম।

"কে ওরা?"

আমি বলিলাম,—"মক্কেল।"

"এমন সুন্দরী মক্কেল পেয়ে তুমি সুখী হ'য়েছ নিশ্চয়?"

সন্দেহ ও ঈর্ষ্যা! বলিলাম, "তুমি কি মনে কর?"

"সুখী হয়েছ; তোমার চোখে-মুখে আনন্দ ঠিক্‌রে প'ড়ছে। ফি কত পেয়েছ?"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম…"সুন্দরীর সাক্ষাৎকার…"

এবার সুরেখা বিপদে পড়িল। সে মনে করিয়াছিল, আমি অন্যায় স্বীকার করিয়া বলিব—'তুমিই আমার অগতির গতি, দুস্তর ভবসাগরের একমাত্র কাণ্ডারী, জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা—ইত্যাদি।'—সেই চিরন্তন স্তোত্র না পাইয়া গৃহদেবী রুষ্টা হইয়া কহিলেন,—"তার মানে?"

"মানে কিছু নয়, গরীব ওরা, পারিশ্রমিক দিতে পারবে না…"

"না পারে অন্যত্র যাক।"

"সেটা বলা আমাদের 'এটিকেট্' নয়, দেবি!"

সুরেখা ব্যতিব্যস্ত হইল। চিরন্তন পরিচিত সম্ভাষণ নয়; বিহ্বল হইয়া প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্য্যে বলিল, "বল না—ব্যাপার কি?"

লেবু অধিক রগড়াইলে তিক্ত হয়; কাজেই তরুণী-সংক্রান্ত প্রশ্নে বাগাড়ম্বর প্রশস্ত নয়, তাই সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিলাম।

the steam car is advancing and as the hand-pulled punkah is being replaced by the electric fan."

যখন সেই অনিবার্য্য অবস্থার উদ্ভব হইবে, তখন হয়ত রামপ্রসাদের গানে আর বাঙ্গালীর মনের সুর মিলিবে —যে আধ্যাত্মিকতার উৎস হইতে তাঁহার গান প্রসারিত হইয়াছিল, তাহাও বাঙ্গালীর সমাজে ও জীবনে শুকাইয়া যাইবে। কিন্তু সেই আধ্যাত্মিকতাই আমাদিগের সমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—

"আমাদিগের দেশের ইতর লোকেরা জাহাজি গোরার ন্যায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশু নহে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বাল্যকাল অবধি রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিয়া আইসে। কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, ইউরোপে যে কাজ বাইবেল, সংবাদপত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে কেবল রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা সম্পাদিত হয়।"

রামায়ণ ও মহাভারতও আমাদিগের অধ্যাত্মিকতার উৎস হইতে উৎসারিত। সে সকল সেইজন্য সমাদৃত।

রাজনারায়ণ বাবু "ধর্ম্মসঙ্গীত-রচয়িতা সাধুপুরুষ" রামপ্রসাদের কথায় বলিয়াছেন—

"তাঁহার গীতগুলি অতি সহজ ভাষায় রচিত এবং বঙ্গদেশে সর্ব্বস্থানে পরমার্থসাধক বলিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত গীত হইয়া থাকে। * * * যখন কলিকাতায় রাত্রিতে রাতভিখারীদিগের মুখে তাঁহার রচিত গান শ্রবণ করা যায়, তখন চিত্তের অত্যন্ত ঔদাত্ত্য জন্মে এবং সেই সকল গান মনকে পৃথিবীর এত উপরে লইয়া যায় যে, তাহা বলা যায় না।"

রমেশচন্দ্র দত্তও রাজপথে ভিখারীদিগকে রামপ্রসাদের গান গাহিতে শুনিয়া বলিয়াছেন—রামপ্রসাদ কালীকে জননীরূপে আরাধনা করিয়া যে ভাবে মাতার চরণে পুত্রের নিবেদন জানাইয়াছেন, তাহাতে—গানের মাধুর্য্যে ও সরলতায় অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না—

"In this consists the beauty, the simplicity, the sweetness of Ram Prasad's songs, a sweetness so overpowering that even to the present day the listener is affected by them as the very beggars of our towns sing the strains of Ram Prasad from street to street."

সরলতাই তাঁহার গানের আধ্যাত্মিকতার মত বৈশিষ্ট্য। তাঁহার উপমা বাঙ্গালীর জীবনের পরিবেষ্টন হইতে সংগৃহীত। কৃষিক্ষেত্র, খেয়ানৌকা, হাট, কলুর ঘানী —এই সকলের উপমা দিয়া তিনি জটিল দার্শনিকভাব চিত্তে সুবোধ্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

অথচ তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না। ভারতচন্দ্রের মত তিনিও পৃষ্ঠপোষক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের তৃপ্তিসাধন জন্য 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই রচনা পাণ্ডিত্য-প্রকাশ-চেষ্টায় কৃত্রিমতাদুষ্ট হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

"নহে সখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে।
অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে।
জ্ঞানহারা তারকারা ধারা শত শত।
গোযুগে লক্ষিত ধারা তৃষ্ণানিষ্ঠাগত।
বিগলিত কুন্তল জলদপুঞ্জ ছটা।
নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা।"

তাঁহার সেই রচনায় সমসাময়িক আদৃত আহার্য্যের তালিকাও পাওয়া যায় :—

"ভক্ষ্য দ্রব্য নানা জাতি মণ্ডা মনোহরা।
সরভাজা নিখুঁতি বাতাসা রসকরা।"

সরভাজা যেমন কৃষ্ণনগরের নিখুঁতি তেমনই শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন। রামপ্রসাদের সময়ে শান্তিপুরের সহিত কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক খুল্লপিতামহের মাতা শান্তিপুরে যে "রুদ্রকান্ত" শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই শিব এখনও মনোহর মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। যিনি শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি প্রতিদিন নৌকায় কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া মন্দিরে পূজা করিয়া কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া যাইতেন—ইহাই প্রচলিত কথা। তৎকালে শান্তিপুরে যে শাক্ত-প্রভাব পতিত হইয়াছিল, তাহা আজও গোস্বামীদিগের গৃহে কালী পূজায় সপ্রকাশ। রামপ্রসাদ শাক্ত ছিলেন এবং কালীর সাধনা করিতেন।

কিন্তু সাধনার যে স্তরে ভেদবুদ্ধি অন্তর্হিত হয়, তিনি সেই স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন। নিম্নস্তরে যে সব ভুল-ভ্রান্তি থাকে, সে সকল অসহিষ্ণুতা উৎপন্ন করে। বাঙ্গালার কোন বৈষ্ণব জমিদার জলপথে বৃন্দাবন যাত্রাকালে ভৃত্য-দিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—নৌকা কাশীর নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহারা যেন পর্দ্দাগুলি ফেলিয়া দেয়—পাছে শিবক্ষেত্র তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাঁহাকে সে জন্য অপরাধী হইতে হয়। বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বিল্বপত্রকে "তেফেরিঙ্গার পাতা" ও "কাটাকে" "বানান" বলা—এই সকল হাস্যোদ্দীপক কথাও শুনা যায়। রামপ্রসাদের গান :—

"আমি তাই কালরূপ ভালবাসি।
জগমমোহিনী মা এলোকেশী।
কালর গুণ ভালই জানে
*   *   *
যিনি দেবের দেব মহাদেব
কালরূপ তাঁর হৃদয়বাসী।
কালবরণ ব্রজের জীবন।
ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণ-কালী।
বাঁশী ত্যজে করে অসি।
*   *   *
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে
কালরূপে মেশামিশি
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক
মন ক'র না দ্বেষাদ্বেষী।"

আবার—

"কালীঘাটে কালী তুমি
মা গো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী
গোকুলে গোপিনী গো।
পাতালেতে ছিলে মা গো হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা দিয়ে নরবলি গো।"

ইত্যাদি।

আবার—

"মন ক'র না দ্বেষাদ্বেষী
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।
*   *   *
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম
সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা
কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী
ও মা রামরূপে ধর ধনু
কালীরূপে করে অসি।"

তিনি "ব্রহ্ম নিরূপণের কথা" "দেঁতোর হাসি"—আন্তরিকতাহীন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ; কারণ,

"আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে
পদে গঙ্গা গয়া কাশী।"

যখন ইতিহাসে পাঠ করি, ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসরে ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্মের এক রূপের ভক্তদিগের দ্বারা অন্য রূপের ভক্ত তিন শত নরনারীকে জীবিত অবস্থায় দগ্ধ করিয়া মৃত্যুর মুখগত করা হইয়াছিল ; যখন দেখি, এখনও ভারতবর্ষে শিয়া ও সুন্নী দুই মুসলমান সম্প্রদায়ের পরস্পরকে আক্রমণে বর্ষে বর্ষে রক্তপাত হয়—তখন হিন্দু-ধর্ম্মের এই উদারতা-পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই। রাম-প্রসাদের মত সাধকগণ সেই উদারতার প্রতীক।

রামপ্রসাদকে জীবনে কখন তাঁহার সাধনার পথে বাধা-বিঘ্ন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার প্রথম জীবন সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি কুমারহট্ট (হালিসহর নামে পরিচিত) গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রাম এখন তাঁহার জন্মগ্রাম বলিয়াই প্রসিদ্ধ। দীনবন্ধু তাঁহার 'সুরধুনী' কাব্যে লিখিয়াছেন :—

"বসতি করিত রামপ্রসাদ এখানে,
বিমোহিত হয় মন যাঁ'র মিষ্ট গানে।"

এই গ্রাম তৎকালে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বহু গ্রামের মত সমৃদ্ধি-সমুজ্জ্বল ছিল। এইরূপ গ্রামে বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রও ছিল। সেই জন্য কেহ কেহ মনে করেন, তথায় বহু টোলে শত শত বিদ্যার্থী কুমার বাস করিতেন বলিয়া তাহার নাম "কুমারহট্ট" হইয়াছিল। বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি কলিকাতায় গমন করেন। কলিকাতা তখন বাঙ্গালার রাজধানী নহে ; কিন্তু ইংরেজ বণিকের তথায় ব্যবসা-কেন্দ্র এবং সেই জন্য তথায় অর্থার্জ্জনের কতকগুলি নূতন পথ মুক্ত হইয়াছে ও কয়টি পরিবারে অতর্কিত ভাবে ধনাগম হইয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া তিনি এক পরিবারে মুহুরীর চাকরী পাইয়া কায করিতে থাকেন। সেই অবস্থায় তিনি যখন যে গান রচনা করিতেন, তাহা প্রভুর হিসাবের খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার এই অভ্যাসে বিরক্ত হইয়া আর এক জন কর্ম্মচারী প্রভুকে তাহা জানাইলে প্রভু খাতা আনাইয়া তাহা দেখেন। যে গানটি প্রথমে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেটি এখন লোকপ্রসিদ্ধ :—

"দেও, মা, আমার তবিলদারী।
আমি নিমক-হারাম নই, শঙ্করী।
পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, মা,
এইটি আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে, মা,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা
তবু জিম্মা রাখ তাঁ'র (ই)।

অৰ্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর—তবু শিবের
মাইনা ভারি।
আমি বিনা-মাইনার চাকর কেবল
চরণ-ধূলার অধিকারী।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আধ্যাত্মিকভাব হিন্দুর ধাতুগত। প্রভু গানটি পাঠ করিয়া অভিভূত হইলেন; ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া রামপ্রসাদের সাধনায় সাধ্যমত সাহায্য প্রদান-প্রয়াসী হইলেন। তিনি রামপ্রসাদকে চাকরীর অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি দিয়া তাঁহার মাসহারার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রামপ্রসাদ স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং তথায় অভাবমুক্ত হইয়া সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

তাহার পর তাঁহার গানের খ্যাতি চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং সে খ্যাতি কৃষ্ণনগরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ণগোচর হইলে তিনি রামপ্রসাদের প্রতিভার সমাদর করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত করিলেন এবং তাঁহাকে কিছু ভূমি দান করিলেন।

কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব যেমন শ্রীক্ষেত্রে সাগরের উর্ম্মিমালার উপরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া নীলাম্বুমধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, রামপ্রসাদ তেমনই কালীপূজার বিসর্জ্জনের দিন—গঙ্গাবক্ষে শত শত তরণীতে কালীপ্রতিমা দেখিতে দেখিতে ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন—গঙ্গাবক্ষে কালী প্রতিমার পরিবেষ্টনে তাঁহার সেই মূর্চ্ছাই মৃত্যুমূর্চ্ছা হইয়াছিল।

মা যে সর্ব্বভূতে বিরাজিতা—প্রতিমাই তাঁহার স্বরূপ নহে, সাধক রামপ্রসাদের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি গাহিয়াছিলেন :—

"মন তোমার এই ভ্রম গেল না—
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না।
ও রে ত্রিভুবন সেই মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি তাই জান না!
কোন্ প্রাণে তাঁ'র মাটীর মূর্ত্তি
গড়িয়ে করিস উপাসনা।
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা
দিয়ে কত রত্ন সোনা—
ও রে কোন্ লাজে সাজাতে চাস তাঁ'য়
দিয়ে ছার ডাকের গহনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা
ও রে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস তাঁ'য়
আলোচাল আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পালিছেন যে মা
পশুপক্ষী কীট নানা—
ও রে কি ব'লে চাষ বলি দিতে
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা।"

রামপ্রসাদ মা'র ভক্ত সন্তান—মা'র প্রতি সন্তানের অভিমানের অন্ত নেই। যখনই তাঁহার মনে হইয়াছে, মা তাঁহার প্রতি স্নেহের অভাব দেখাইতেছেন, তখনই তিনি অভিমানস্ফুরিতাধর হইয়াছেন :—

"মা! মা! ব'লে আর ডাকব না।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা
* * * *
ঘরে ঘরে যা'ব ভিক্ষা মেগে খা'ব
মা ব'লে আর কোলে যাব না।
ডাকি বারে বারে মা! মা! বলিয়ে
মা কি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে।
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না।"

আবার সে অভিমান দূর হইয়া গিয়াছে—যেন সূর্য্যোদয়ে অমার অন্ধকার দূর হইয়াছে। তাই তিনি গাহিয়াছেন :—

"এমন দিন কি হ'বে তারা।
যবে তারা! তারা! তারা ব'লে
তারা বয়ে পড়বে ধারা।
হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে মনের আঁধার যা'বে ছুটে
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে
তারা ব'লে হ'ব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ ঘুচে যা'বে মনের খেদ
ও রে শত শত সত্যবেদ—
তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদে রটে মা বিরাজে সর্ব্বঘটে
ও রে আঁখি-অন্ধ দেখ মা'কে—
তিমিরে তিমিরহরা।"

রামপ্রসাদের মত জীবনের সায়াহ্নে অনেকেরই মনে হয়—

"আমি মরলেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে
মিছে মরি বেগার খেটে—
আমি দিনমজুরী নিত্য করি
পঞ্চ ভূতে খায় গো বেঁটে।
* * *
যেমন অন্ধজনে হারাদণ্ড
পুনঃ পেলে ধরে এঁটে।

আমি তেমনি মত ধরতে চাই, মা,
কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে।"

কিন্তু কয় জন ব্রহ্মময়ীকে "কর্ম্মডুরী দে মা, কেটে" বলিয়া প্রার্থনা জানাইতে পারেন ?

"প্রাণ যাবার বেলা এই ক'র, মা,
যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে।"

আর কয় জনই বা মা'র কৃপা স্নেহাধিকারসূত্রে দাবী করিয়া মা'কে বলিতে পারেন :—

"আমি নই, মা আটাশে ছেলে।
ভয় করি না চোখ রাঙ্গালে।"
* * *
আমি ক্লান্ত হ'ব যখন আমায়
শান্ত ক'রে ল'বে কোলে।"

কেবল "কুপুত্র যদিও হয়—কুমাতা কখন নয়"—এই ভরষায় আমরা মা'র চরণে প্রার্থনা ও কামনা নিবেদন করিতে পারি—সন্তানের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তাহার অঙ্গের ধূলি মুছাইয়া দাও—

"সন্ধ্যা হ'ল খেলা গেল
কোলের ছেলে লও, মা, কোলে।"

রামপ্রসাদ জনগণের জন্য গান রচনা করিয়াছিলেন—সে সব অনায়াসে তাঁহার কবিত্বের ও ভক্তির উৎস হইতে উদ্গত হইয়াছে। দীর্ঘ দুই শতাব্দীকাল তাঁহার পরমার্থ-বিষয়ক সঙ্গীত বাঙ্গালীকে আনন্দ দিয়াছে, আধ্যাত্মিকতায় প্রবুদ্ধ করিয়াছে। বাঙ্গালী তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

চাষী

ওরা সারাদিন মাঠে মাঠে কাজ করে
রোগে ভুগে ভুগে পল্লীতে ওরা থাকে,
নিজেদের আয়ু ক্ষীণ ক'রে ক'রে ওরা
সহরের আয়ু বজায় করিয়া রাখে ;
রৌদ্রের তাপে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
মাটীর বুকের ফসল উহারা খোঁজে
দিবসের আলো নিভে আসে যবে সাঁঝে
কাজ শেষ ক'রে ঘরে ফিরে যায় ওরা ;
মাটীর মানুষ মাটীতেই ওরা থাকে
বসুন্ধরার বুকের মানুষ তারা।

প্রচুর ফসলে ভরে দিয়ে যায় ক্ষেত
শ্রমেতে ওদের মাটী হ'য়ে যায় সোনা
সারা বিশ্বের আহার জোগায় তবু,
এই কথা ওরা নিজেরাই জানে না ;
যখন দু'বেলা দু'মুঠো পায় না খেতে,
অনাহারে জেগে ওঠে বিনিদ্র রাতে,
তবুও পারে না অন্যেরে দোষ দিতে
ভাবে মনে মনে কপালের দোষ কোন ;
যেখানে ধানের ঢেউ খেলে যায় ক্ষেতে
সেখানে গৃহেতে খেতে ভাত নেই কেন !

দূরান্তরের হাটে বেচা-কেনা ক'রে
যাহা কিছু পায় তাহাতেই ওরা খুসী
উহারা জানে না মূল্য ওদের শ্রমের
হাত ঘুরে ঘুরে হ'য়ে যায় কত বেশী ;
যদিও ওদের বঞ্চিত সবে করে,
পণ্য ওদের বিকায় জলের দরে
তবুও উহারা বুঝিতে নাহি'ক পারে,
যেহেতু উহারা মূর্খ সরল চাষা,
বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই ওদের নেই
মনে মনে নেই কোনই উচ্চ আশা।

সুজলা সুফলা শ্যামল ক্ষেতের রূপ
উহাদের চোখে যায় না তেমন দেখা,
জানে না'ক ওরা তাদের জীবনী নিয়ে
পুস্তকে কত কাব্য হ'য়েছে লেখা,
পুষ্পিত পথ ছায়া-ঢাকা বন-বীথি
পাখীরা যেথায় গান গায় নিরবধি
আর ব'য়ে যায় শুধু কুলু-কুলু নদী
তীরে তীরে তার জাগে ধূ ধূ বালুচর ;
সাঁঝের আঁধার নেমে আসে ধীরে ধীরে
শ্মশানের শেষ চিতাভস্মের পর।

শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ বি-টি)



প্রেমের দায়ে

১

প্রেমের দায়ে মানুষ চুরি করে, ডাকাতি করে, খুন করে, কাজ করে, কেউ বা কাজ ছাড়ে, সন্ত্রাসবাদীর দলে মেশে, আখ্‌সার সন্ন্যাসীও হয়—কিন্তু সদা সত্য কথা বলে না। আমি কিন্তু ব'লেছিলাম—কারণ, আমার প্রাণে যে প্রেমের শিখা জ্বলে উঠেছিল—তা হোমাগ্নির মত শুদ্ধ।

আমি নীরবে তাকে ভালবাসতাম; সে জানতো না। তার আত্মীয়-স্বজনের মনে এমন কোনো সন্দেহ জাগতে পারেনি যে, আমার মত বামনের অস্থিমজ্জা তার মত চাঁদের উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত!

হাসি আসতো মাঝে মাঝে -যখন ভাবতাম, 'বামন হ'য়ে চাঁদে হাত' দেওয়ার কথা আজীবন শুনেছি; কিন্তু ভালবাসার কুহকস্পর্শ সারা বিশ্বের রঙ্‌ বদ্‌লে দেবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত অবধি বুঝিনি—সে শ্লেষ-ভরা উপমার অর্থ। আমি দিন দু' টাকা উপার্জ্জন ক'রতাম—কোনো দিন তিন টাকা। ছুটীর দিন ঘরে বসে কাজ ক'রে পেতাম—বারো আনা, এক টাকা। পাঁচ টাকা ভাড়া দিয়ে নীচের একখানা ঘরে বাস করতাম—বারান্দায় নিজের হাতে ভাত-ডাল রেঁধে খেতাম। যে দিন অবসাদে দেহ ও মনে জড়তা জমাট বাঁধতো, সে দিন অনশনেই নিশিযাপন করতাম। স্বপ্নের বিভীষিকায় মনের জড়তা হ'ত অবলুপ্ত—উষার ম্লান-রশ্মি আশার ছবি আঁকতো ঘুম-ভাঙ্গা চিত্তে।

কর্ম্মস্থলে আমার সম্মান ছিল—অর্থাৎ আমার মনিব আমায় রূঢ় কথা বলত না। লোকট্রা সুইস্‌। মিষ্ট কথা ব'লে যেখানে অনুগত শ্রমিককে নিঙড়ে কাজ পাওয়া যায়, পাশ্চাত্যের বৈশ্য সেখানে কড়া কথা বলে না। আমি পিছনের একটা কক্ষে বসে ঘড়ি মেরামত করতাম, —কর্ম্মক্ষেত্রে অন্য লোকের সঙ্গে বৃথা বাক্যালাপে সময় নষ্ট করতাম না। সকলে ব'লত—মাধব মিস্ত্রী ভাল মানুষ, কিন্তু কম বক্তা। ঘড়ির দোকানের দু'জন কেরাণী বাবু ব'লত—কারিকরের আবার এত গুমোর কিসের?

এতো গেল বামনের কথা।

চাঁদ অরুণা। অরুণের মত কান্তি। তার হাসিতে বিচ্ছুরিত হয় অরুণের আভা। সে তার বিধবা মা আর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বাস করে—বাড়ীর উপর-তলায়। নীচের বাহিরের একটা ঘরে আমি থাকি। ভিতরের তিনখানা ঘরে বাস করে এক গৃহস্থ-পরিবার।

অরুণার বড় ভাই দিল্লীতে কাজ করে। যে টাকা পাঠায়, তাতে এদের চলে না, তাই বসতবাড়ীর নীচের-তলা ভাড়া দেয়।

অরুণা কলেজে পড়ে। বেণী ঝুলিয়ে নিজের মনে হাস্‌তে-হাস্‌তে গিয়ে কলেজের গাড়ীতে বসে। তখন সে প্রাণ খুলে হাসে। তার সখীরাও হাসে। পথিক তাকিয়ে দেখে।

তার ছোট ভাই মন্টু। সে ম্যাট্রিক-ক্লাশে পড়ে। দিদির কাছে পড়া ব'লে নেয়। কিন্তু তার পুরুষ-সংস্কার প্রাধান্যের জন্য মাঝে-মাঝে তাকে বিদ্রোহী করে।

—ভারি পণ্ডিত! এর মানে তা নয়।

—যা বলি শোন। এমন ক'রলে শিখ্‌তে পারবে না।

—ভুল শিখে ক্লাশের ছেলেদের কাছে হেয় হব? মাষ্টার মশায় অন্য মানে ব'লে দিয়েছেন।

তর্ক যখন খুব বেড়ে যেত, জননী এসে মন্টুকে বকতেন।

২

মানুষ প্রেমে পড়ে মুহূর্ত্তে। আমি তাকে পূর্ণ এক বৎসর দেখেছিলাম। বেশ মেয়েটি, বেশ মা; মজার সাহসী ভাই—তাদের বিষয় এর বেশী ভাববার কোন

প্রয়োজন হ'ত না ; তার মার হাতে যখন মাসে একবার ভাড়া দিতে যেতাম, অরুণা তাকিয়ে দেখতো না—নিজের কাজ ক'রত। কাজও অপরূপ ! গাছ-কোমর বেঁধে আলু, পটোল, পোনা-মাছ কোটা থেকে আরম্ভ ক'রে 'ডিফারেন্সাল ক্যালকুলাস' কষা অবধি।

এক দিন ভাই ভীষণ বিদ্রোহী হ'য়েছিল। সে বীজগণিতের একটা অঙ্ক কষেছিল। ফল পুস্তকে-দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মেলেনি। তার দিদি তাড়াতাড়ি উত্তরটা দেখে বলেছিল—ঠিক্ হ'য়েছে।

—বাঃ! বেশ! ঠিক্ হয়েছে? কেবল ফাঁকি।

অরুণা বল্লে—মন্টু তুমি মূর্খ হও, তত দুঃখের কথা হ'বে না। কিন্তু ভদ্র-ঘরে জন্মে মানুষ অসভ্য হ'লে বংশের ভীষণ অপমান।

মন্টু বল্লে—মেয়েছেলে মিথ্যা বল্লে—আরও ভীষণ সর্ব্বনাশ!

অরুণার মুখ দেখবার উপায় ছিল না—তাদের কথা কাণে আস্‌তো। কি জানি কেন, মন্টুর কাণ মলে-দেবার ইচ্ছা হ'ল। তার মাও কথাটা শুনেছিলেন।—তিনি রুক্ষকণ্ঠে বল্লেন—মন্টু!

মন্টু আজ বিজয়ী। সে বল্লে—দেখ না, মা! অঙ্ক ভুল হ'য়েছে, দেখে দিতে বল্লাম, না দেখে মিছামিছি দিদি বল্লে—ঠিক হ'য়েছে। মিথ্যাবাদী। খানিক পরে মন্টু বল্লে—আবার কান্না হচ্ছে।

সত্যই গালাগালি শুনে অরুণা কেঁদেছিল, কারণ, তার কথা এবং সুর এ-সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য দিল। সে বল্লে—ছিঃ! মা, তোমার ছেলে গালাগালি শিখ্‌লে কোথায়?

মন্টু বল্লে—অঙ্ক ঠিক হ'য়েছে বলাটা মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা। কেঁদে জিতলে হ'বে না। এই দেখ।

দু'মিনিটের নিস্তব্ধতা। কেবল শোনা যাচ্ছিল, আমার ভাত-ফোটার শব্দ—গড়-গড়, গড়-গড়।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দৃঢ়স্বরে অরুণা বল্লে—তোমার উত্তর ঠিক্। বই ভুল।

ব্যঙ্গভরে মন্টু বল্লে,—'ওঃ!'

এবার তার জননী বল্লেন,—মন্টু, দিদির কাছে ক্ষমা চাও।

যুগ-যুগান্তরের পুরুষের সংস্কার। সে বল্লে,—আচ্ছা, আস্‌ছি।

বাড়ীর পাশে এক জন প্রফেসার থাকতেন। বই আর খাতা নিয়ে সে ছুটে যখন আমার ঘরের সমুখ দিয়ে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডাকলাম।

সে আমার ঘড়ি-সারানো দেখতো, নিজেদের ঘড়ি আমার কাছে সারিয়ে নিত, আর নানা প্রকার প্রশ্নের দ্বারা ঘড়ির আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলার কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ক'রত।

আমি যখন তাকে ডাকলাম, সে বল্লে—মিস্ত্রী বাবু, পরে আসব। এখন তর্ক হ'য়েছে, প্রফেসার সেনের কাছে যাচ্ছি।

যুদ্ধের প্রারম্ভে সৈন্যাধ্যক্ষ যেমন কাগজ-পত্র নিয়ে তার উপরের বহুদর্শী নায়কের শরণাপন্ন হয়, তার ভাব-গতিক তখন সেই রকম।

আমি বল্লাম,—এত ব্যস্ত! ব্যাপারখানা কি?

সে বল্লে,—একটা অঙ্ক-কষা নিয়ে তর্ক উঠেছে।

আমি বল্লাম,—কি অঙ্ক, দেখি।

সে অবজ্ঞার হাসি হাসলে। বল্লে,—বীজগণিত, লঘুকরণ। এ অঙ্কগুলা শক্ত।

আমি বল্লাম,—দেখি না, আমি কষে দিচ্ছি।

সে বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালে। চাহনীর অর্থ —'এ ঘড়ির চাকা মেরামত নয়।' সামলে নিয়ে বল্লে—পরে বোঝাব। মহাতর্ক উঠেছে।

আমি বল্লাম,—আমি অ্যাল্‌জ্যাবরা জানি। হিসাব না জানলে কি ঘড়ির সূক্ষ্ম কাজ করা যায়?

'অপ্রতিভ হ'তে চাও ত হও'—এই রকম মুখের ভাব ক'রে সে বইখানা আমার হাতে দিলে।

সোজা আঁক—লঘুকরণ। আমি কাগজ-পেন্সিল নিয়ে ত্বরায় উত্তর স্থির ক'রে বইয়ের পাতা উল্টে মিলালাম; উত্তর মিল্‌লো না।

আমি অপ্রস্তুতের ভাণ ক'রে বল্লাম,—ভুল হ'য়েছে তাড়াতাড়িতে। আচ্ছা, আবার দেখি।

তার চোখ দু'টা বড় হ'ল। মিস্ত্রী অঙ্ক কষে! তার ওপর যে উত্তর স্থির করে, সে উত্তর ছাপানো পুস্তকের দর্প খর্ব্ব করে, এ বড় রহস্যের কথা!

সে নিজের খাতার ফলের সঙ্গে আমার গণনা-ফল মিলিয়ে বল্‌লে,—আমারও ঐ উত্তর হ'য়েছে।

আমি বল্‌লাম,—দু'জনের এক ভুল। মন্দ না, তবে আর একবার দেখি।

সে ধীরে ধীরে বল্‌লে,—তিন জনের এক ভুল। দিদিরও ঐ উত্তর!

আমি বল্‌লাম,—তবে বইয়েরই ভুল ছাপা। ছাপাখানার ভূতের অপকর্ম্ম।

সে বল্‌লে,—তাই হবে। তার পর বল্‌লে,—আপনি আঁকও জানেন?

সে-দিন অরুণা যখন স্কুলে যায়, কে জানে, কোন্ কু-গ্রহের চক্রে প'ড়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। আকস্মিক নিমেষের চাহনি। চারি চক্ষুর মিলন। এক পীপে বারুদে একটা দেশলাইয়ের কাঠির আগুন! প্রকাণ্ড প্রবল একটা চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তির মাঝে একটা সামান্য লোহার তার! শিরায় উপশিরায় মদিরার কুহক-স্পর্শ!

কারণ, আজ সে আমার মুখের দিকে তাকালো। তার চোখে অপূর্ব্ব বিস্ময় এবং কৃতজ্ঞতার বিকাশ। নিমেষে কে যেন সিঁদুরের তুলি দিয়ে তার সমস্ত মুখখানাকে রাঙিয়ে দিলে। সে মাটীর দিকে তাকিয়ে লীলা-সুন্দর গতিতে গাড়ীতে গিয়ে বস্‌ল।

আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। মাধব মিস্ত্রী অতি বোকা প্রেমিক-মাধব হ'ল।

৩

তার পর শিক্ষাদান হ'ল আমার দৈনিক কর্ম্ম।

প্রথম শিক্ষা দিলাম মন্‌টুকে কথার ছলে, পরের পূর্ব্ব-জীবন সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না ক'রতে। মাঝে-মাঝে শুনতাম অরুণার নির্দ্দেশ—মাধব বাবুর কাছে জেনে নিগে যা।

এমন করে ছ' মাস কাট্‌লো।

আমার দু'টা সত্তা হ'ল—এক জন প্রেমিক-মাধব, অন্য জন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বন্ধু বলে,—বোকা মাধব, এ কি পাগলামি?

মাধব বলে,— ব্যর্থ জীবনের পূর্ণ বিফলতা।

বন্ধু বলে,—এই তো মাত্র সাতাশ বছর বয়স। সারা-জীবন এ-আগুনে ঝল্‌সে মর্‌বি?

মাধব বলে,—আগুন যেমন পোড়ায় তেমনি মরণের শৈত্য হ'তে মানুষকে বাঁচায়। আমার সারা জীবন কতটুকু, কে জানে? আজ বিকেলে তো মোটর-চাপা পড়তে পারি। কাল্ তো ফাঁসি যেতেও পারি।

বন্ধু বলে,—হুঁ, তবে মর!

মাধব বলে,—চোখে একটা অণুবীক্ষণ দিয়ে কল-কব্জার মাচকোফের লক্ষ্য করাতেই কি জীবনের সার্থকতা?

এমনি করে ছ'মাস কাট্‌লো। উপরে শব্দ হ'লে বুঝতে পারি, কার পায়ের শব্দ।

এক দিন দিল্লী থেকে তার দাদা এলো।

এরা সম্পন্ন হ'লেও চিরদিনই সম্ভ্রান্ত।

এক দিন কাণে কথা এলো—অরুণার বিবাহের কথা। প্রথমে বুকের ভিতর ভীষণ গণ্ডগোল হ'ল। তার পর হাসি এলো। মিথ্যাবাদী! ভণ্ড! এই তোমার গোপন ভালবাসা? ছিঃ!

তার পর কাণ পেতে শুনি। মন্‌টু কতক কতক ব'লে ফেলে। পাত্র ডেপুটি হ'য়েছে। কিন্তু তার পিতা চায় যৌতুক—পাঁচ হাজার টাকা।

সর্ব্বশরীরে রক্ত চলা-ফেরা করতে লাগলো! অস্পষ্ট সিদ্ধান্ত, সমাজ, বোমা, বর-কর্ত্তা, চাবুক, বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গে বাঙ্গালা দেশের প্লাবন।

সাত দিন পরে শুনলাম, তারা বাড়ী-বন্ধক দেওয়ার পরামর্শ ক'রছে।

এবার অরুণার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আমি কি জঞ্জাল, আমি কি তোমাদের গলগ্রহ?

মা বল্‌লেন,—না মা, দেশাচার।—এমন পাত্র!

সে বল্‌লে,—দেশাচার! চিরদিনের নারী-নিগ্রহ। তাই দেশের এই দুর্দ্দশা—লাঞ্ছিত, পদদলিত, হেয়। এই পাত্র—তার চেয়ে বিষের পাত্র ভাল!

তার অগ্রজ হেমন্ত বল্‌লে,—রাণু, ঠিক্ বলছ। বাবা থাকলে আমিও ঐ কথা বলতাম, ভাই! কিন্তু আজ যদি এই তুচ্ছ বাড়ীর মায়ায় আমার কর্ত্তব্য—

অরুণা বল্‌লে,—দাদা, আমার নিগ্রহ—আমার লাঞ্ছনাকে কেন কর্ত্তব্য ভাবছ, ভাই? আমি কি বুঝিনি, তুমি আধপেটা খেয়ে আমাদের পড়াচ্ছ?

মা বল্‌লে,—তোরা বেঁচে থাক, সব হবে মা! আমাদের দেশের এ একটা প্রথা। পাত্রটি—

বাধা দিয়ে হেমন্ত বল্‌লে,—সত্যি রাণু, ছেলেটি খুব ভালো, বাপ সেকেলে—

অরুণা বল্‌লে,—দাদা, তুমি শিক্ষিত। বি-এ পাশ ক'রেছ। আমি এবার পাশ ক'রব নিশ্চয়। আমি কি নিঃসহায় হ'য়ে একটা দেশের শত্রু, মাতৃ-জাতির শত্রু, শোষকের—উঃ! না মা!

এদের মা একরোখা। বল্‌লেন,—বন্ধক দেবই আমার বাড়ী।

কি যেন যাদু-বলে আমার লেখা সমাপ্ত ক'রে আমি তাদের ঘরে ঢুকলাম।—তারা বিস্মিত হ'ল।

কে জানে, আমার চেহারা কেমন হ'য়েছিল। এরা ভূত দেখ্‌লে না কি?

আমি বল্‌লাম,—মা, ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। দু' বৎসর আপনার চরণে আশ্রয় নিয়েছি। আমিও আপনার ছেলে।

এদের মুখের অপ্রসন্ন ভাব লুপ্ত হ'ল, কিন্তু বিস্ময় জমাট বাঁধলো।

আমি বল্‌লাম,—মা, পাঁচ হাজার টাকায় যদি অরুণা, মানে মিস্ ব্যানার্জ্জির বিবাহ হয় ডেপুটির সঙ্গে, তবে বাড়ী বন্ধক দিতে হবে না। এই কাগজে সহি করুন, দশ হাজার টাকা পাবেন। পরে আমায় শোধ দেবেন।

হেমন্ত বল্‌লে,—কি ব'লছেন?

জননী বল্‌লেন,—বুঝলাম না, বাবা! তুমি খালি-হাতে দশ হাজার টাকা ধার দেবে?

আমি বল্‌লাম,—হ্যাঁ; কিন্তু এই কাগজে সহি দিতে হবে হেমন্ত বাবুকে।

তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালে।

অরুণা বল্‌লে,—ধন্যবাদ। আমি ঘুষ দিয়ে বিবাহ ক'রব না, সুতরাং টাকা ধারের প্রশ্ন উঠ্‌ছে না। কিন্তু আপনার এই অযাচিত বন্ধুত্বের জন্য আমরা আপনার কাছে ঋণী।

স্বপ্নাবিষ্টের মত হেমন্ত বল্‌লে,—দেখি, কি তমসুক!

কাগজ পড়ে সে শিউরে উঠ্‌লো। আমার মুখের দিকে তাকালো। কাগজখানা অরুণা কুড়িয়ে নিয়ে পড়লে। সে একটু সরে গেল। তার ঠোঁট শুকিয়ে গেল। ধীরে ধীরে বল্‌লে,—আপনি—

তাদের জননী বল্‌লেন,—কি সব পড়ছিস? কি কাগজ ওখানা? যেন ভূত দেখেছিস—এমনি কর্‌ছিস যে!

মন্ত্রমুগ্ধের মত অরুণা কাগজখানা তার জননীর হাতে দিল। তিনি চোখে চশমা দিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেন,—

মহামান্য পুলিস কমিশনার মহাশয়,

ফলসামারীর পুলিস সাহেবকে বোমা-মারা আসামী বিনয় চট্টোপাধ্যায় এম্-এস-সি মাধব মিস্ত্রীর মিথ্যানামে আমার বাড়ীতে প্রায় দুই বৎসর বাস করিতেছে। এক জন পুলিস-কর্ম্মচারী পাঠাইলে তাহাকে ধরাইয়া দিব।

তাহার গ্রেপ্তারের জন্য যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা আছে, তাহা দয়া করিয়া আমাকে দিতে আজ্ঞা হয়।

বিনীত—

আমি হেমন্তর হাতে কলম দিতে গেলাম। সে সামলে নিয়েছিল। বল্‌লে,—রাণুর বিয়ে। সহিটা ও করবে।

অরুণা ছুটে কোথায় চলে গেল।

তার জননী বল্‌লেন,—কেন বাবা, এখানে ছিলে —সহরের মধ্যে? উঃ!

আমি বল্‌লাম,—লুকিয়ে থাকবার ভাল জায়গা সহর। সাহেবের দোকানে কাজ করি, কেহ সন্দেহ করে না। গোঁপ ছিল, বাবরী-কাটা চুল ছিল, গালপাট্টা দাড়ি ছিল। যাক্ সে কথা। এ-জীবনে আর দ্বীপান্তরের জেলে কি প্রভেদ মা? এ-টাকায় গৃহস্থের উপকার হবে।

অরুণা এসে দাদার হাতে একটা দিয়াশলাই দিলে।

হেমন্ত মাতার মুখের দিকে তাকালো। তিনি বল্‌লেন,—এখনি। তার পর আমার হাত ধরে বল্‌লেন, —মার গা ছুঁয়ে শপথ কর, এ-কথা জীবনে আর প্রকাশ ক'রবে না।

আমার বিলম্ব দেখে অরুণা বল্‌লে,—বলুন, মাধব—মানে বিনয় দাদা। বলুন, শপথ করুন।

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। সে বোধ হয় বুঝলে; তার মুখ লাল হ'ল—হেমন্তর হাতের পোড়া কাগজের রশ্মিকিরণে, না আমার নিভৃত মনের সন্ধান পেয়ে, তা বুঝলাম না।

সত্যের আদর নাই। এখন মাধব মিস্ত্রীর কি নাম, কোথায় তার ধাম, কি তার কাজ—এ-কথা কেবল আমি জানি।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।



কস্‌-কস্‌ ও গেছো ক্যাঙ্গারু

(প্রাণিতত্ত্ব)

কুইন্সল্যাণ্ড ও নিউ গিনি-সন্নিহিত দ্বীপের গভীর অরণ্যে নানাজাতীয় অদ্ভুত প্রাণী দৃষ্টিগোচর হয়, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ এ-কাল পর্য্যন্ত তাহাদের সম্বন্ধে নিপুণ ভাবে আলোচনা করেন নাই ; এবং আমাদের দেশের লোক তাহাদের সম্বন্ধে প্রায় কোন কথাই জানেন না। কিন্তু তাহাদের বিবরণ কৌতূহলজনক ; তাহাতে বৈচিত্র্যেরও অভাব নাই।

এই সকল প্রাণীর মধ্যে কস্‌-কসের নাম উল্লেখযোগ্য। ভ্রমণকারীরা এই সকল অঞ্চলের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলে কখন কখন বৃহৎ বৃক্ষের উচ্চ শাখায় বিড়ালের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এই প্রাণীগুলিকে দেখিতে পান। ইহাদের কোন জাতির দেহের বর্ণ তুষার-ধবল, কোন জাতির ধূসরাভ শুভ্র। কিন্তু ইহাদের পায়ের থাবা, নাসিকা ও লাঙ্গুলের অগ্রভাগের বর্ণ উজ্জ্বল পীত। পথিকগণকে দেখিতে পাইলে ইহারা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকে। ইহাদের চক্ষু স্বর্ণাভ, এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যে তাহা জ্যোতির্ম্ময় তারকার ন্যায় উজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ করে।



তুষারশুভ্র বর্ণের কস্‌-কস্‌

আধুনিক কালে এই জাতীয় প্রাণী অত্যন্ত বিরল হইয়াছে। বিশেষতঃ, ইহাদিগকে ধরিয়া পোষ মানাইতে পারা যায় না বলিয়া লোকালয়ে, এমন কি, পশুশালা-সমূহেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকে ইহাদের নাম শুনিয়াছে বটে, কিন্তু দেখিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই।

প্রাণি-বিজ্ঞানে কস্‌-কস্‌ 'ফ্যালাঞ্জার ম্যাকুলেটাস্‌' নামে পরিচিত। ইহারা বানর-শ্রেণীর অন্তর্ভূত, এবং প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদিগকে 'বানর-অপোসম্‌' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বানরের সহিত এই প্রাণীর কোন সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য নাই, এবং ইহাদের আচরণও বানরের ন্যায় নহে। ইহাদের উদরে পকেটের মত একটি ঝুলি আছে ; সেই ঝুলির ভিতর ইহারা ক্যাঙ্গারুর মত শাবকগুলিকে বহন করিয়া থাকে।

ইহাদের দেহ বিলক্ষণ আঁট-সাঁট। পূর্ণবয়স্ক কস্‌-কসের দেহ প্রায় ত্রিশ ইঞ্চি (পৌনে দুই হাত) দীর্ঘ, এবং প্রায় পনের সের ভারী। ইহাদের লাঙ্গুল দেহের তুলনায় অতি দীর্ঘ ; কখন কখন তাহা দুই হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। লাঙ্গুলের অগ্রভাগে লোম নাই। লাঙ্গুলাগ্রের ন্যায় ইহাদের হাত-পা ও নাসিকাগ্রও লোম-হীন ; কিন্তু দেহের অন্যান্য অংশের বর্ণ সুপক্ক কমলা লেবুর বর্ণের অনুরূপ, কিন্তু অধিকতর উজ্জ্বল।

ইহাদের দেহের লোমগুলি সুচিক্কণ পশমবৎ, কিন্তু অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট। এই আকারের অন্য কোনও প্রাণীর এরূপ ঘন লোম দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মমণ্ডল ভিন্ন অন্য কোন দেশে কস্‌-কস্‌ বাঁচে না, এবং গ্রীষ্মমণ্ডল-বাসী অন্য কোন প্রাণীর ঐ প্রকার নিবিড় লোম দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রচণ্ড শীতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য

শীতপ্রধান দেশের প্রাণী সমূহেরই দেহ ঐ প্রকার ঘন লোমে আবৃত হইয়া থাকে; কিন্তু কস্-কস্ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। তবে গ্রীষ্মমণ্ডলে বর্ষাকালে কখন কখন অতিবৃষ্টি হইয়া থাকে; সেই বৃষ্টিধারা হইতে দেহ-চর্ম্ম শুষ্ক রাখিবার পক্ষে তাহাদের এই ঘন লোম অপরিহার্য্য বটে।

কস্-কসের দেহের লোমগুলি যেমন সুদৃশ্য, সেইরূপ সুকোমল। য়ুরোপ ও আমেরিকার সৌখীন মহিলাগণের পরিচ্ছদের শোভা ও মর্য্যাদা-বৃদ্ধির জন্য এই লোমের উপযোগিতা যে অত্যন্ত অধিক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কস্-কসের দেহচর্ম্ম হইতে এই লোমরাশি বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ, এইজন্যই কস্-কসের অস্তিত্ব এখন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। উহাদের লোম ঐ ভাবে ব্যবহার করিবার উপায় থাকিলে শিকারীদের বন্দুকের গুলীতে এত দিন কস্-কস্‌বংশ উজাড় হইত।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কস্-কসের দেহের বর্ণ বিভিন্ন। কতকগুলির বর্ণ সম্পূর্ণ ধূসর; কতকগুলির ধূসর বর্ণের মধ্যে শুভ্র চক্ররাশি দেখিতে পাওয়া যায়। তুষার-শুভ্র বর্ণের কস্-কস্ অত্যন্ত বিরল; কেবল নিউ গিনির দুষ্প্রবেশ্য, গভীর অরণ্যেই কদাচিৎ তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। একবার এই জাতীয় একটি কস্-কসকে বহু চেষ্টায় জীবিত অবস্থায় ধরিতে পারা গিয়াছিল, এইজন্যই তাহার চিত্র প্রকাশ করা সম্ভব হইল; নতুবা এই প্রকার তুষার-শুভ্র কস্-কস্ কাল্পনিক প্রাণী বলিয়াই সাধারণের ধারণা হইত। সকল জাতীয় কস্-কসের কর্ণ এরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহা লোম দ্বারা আবৃত থাকায় প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। বস্তুতঃ, ইহাদিগকে বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট দেখিলে ইহাদের কাণ আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না।

ইহাদের চক্ষুর বৈশিষ্ট্যই সর্ব্বাগ্রে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাদের চক্ষু দেহের তুলনায় অত্যন্ত বৃহৎ, সম্পূর্ণ গোল; দেখিয়া মনে হয়, কাঁসার এক জোড়া গোল ডিস্! (Saucer-shaped.) পাকা কমলালেবু অপেক্ষাও উজ্জ্বল পীতবর্ণ। ইহারা দিবারাত্রির কোন সময় একবারও চক্ষু মুদিত করে না, এবং সেই অবস্থাতেই নিদ্রাসুখ উপভোগ করে! জঙ্গলের ভিতর অন্ধকারে ইহাদের চক্ষু অগ্নিগোলকের ন্যায় জ্বল্-জ্বল্ করে। শিকারীরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি-গোলকের ন্যায় চক্ষু দেখিয়াই ইহাদিগকে চিনিতে পারে। ইহাদের চক্ষু ভিন্ন দেহের অন্য কোন অঙ্গ পর্য্যটকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ও বৈজ্ঞানিক-গণ এই অদ্ভুত প্রাণী সন্দর্শনের আশায় দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ও বহু কষ্ট সহ্য করিয়া উত্তর কুইন্সল্যাণ্ড ও নিউ গিনির অরণ্যে প্রবেশ করেন, দুর্গম অরণ্যে তাঁহাদিগকে



বৃক্ষের উচ্চশাখায় উপবিষ্ট কস্-কস্

দীর্ঘকাল ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; কিন্তু অনেককেই নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয়। বহু অনুসন্ধানে কেহ কেহ কদাচিৎ দুই একটি কস্-কস্ দেখিতে পান। যে সকল লোক ঐ অঞ্চলে বাস করে, তাহারাও সম্বৎসর কাল চেষ্টা করিয়া হঠাৎ কোন দিন একটি কস্-কস্ দেখিতে পায়; ইহা এতই দুর্লভদর্শন! তবে রাত্রিকালে কখন কখন ইহাদের উচ্চ একঘেয়ে কণ্ঠস্বর গ্রামবাসিগণের কর্ণগোচর হয়। অতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণী, কিন্তু তাহাদের উচ্চ নাকি-সুর বহু দূর হইতে সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাওয়া যায়।

ইহারা উচ্চ বৃক্ষের দুইটি শাখার জোড়ের উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া শয়ন করিয়া দিবাভাগে নিদ্রা যায়। সারা রাত্রি জাগিয়া কাটায়। দিবাভাগ দীর্ঘ নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া সায়ংকালে ইহারা জাগিয়া উঠে, তাহার পর অরণ্যের বিভিন্ন বৃক্ষে বিচরণ করিতে থাকে, এবং সেই সময় খাদ্য-সংগ্রহের চেষ্টা করে। ইহারা বন্য-ফল, বেরী, নব কিশলয় চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। ইহাদের দন্তশ্রেণী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, কিন্তু ইহারা নিরামিষ-ভোজী, মাংস ভক্ষণ করে না।

কস্-কস্‌গুলি অত্যন্ত ধীরগতি প্রাণী, ইহাদের সুদীর্ঘ লাঙ্গুল এবং থাবায় বাঁকা নখ থাকিলেও বৃক্ষারোহণে



কস্-কসের আক্রমণে শিকারীর মুখ ছিন্নবিচ্ছিন্ন

ইহারা তেমন তৎপর নহে। ইহাদের দেহে চর্ব্বির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। এই জন্য ইহা স্থানীয় জঙ্গলা জাতির অতীব প্রিয় খাদ্য। স্থানীয় আদিম অধিবাসীরা কোন বৃক্ষের শাখায় দিবাভাগে কস্-কস্‌কে নিদ্রামগ্ন দেখিলেই সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বর্শার সাহায্যে খোঁচাইয়া মারে। কস্-কস্‌গুলি স্বভাবতঃ নিতান্ত নিরীহ প্রাণী, এবং সহজেই ভয় পায়; কিন্তু শিকারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ইহারা আত্মরক্ষার জন্য আততায়ীকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে। ইহাদের সুতীক্ষ্ণ এবং সুদৃঢ় নখ-দন্তের আঘাতে অনেক শিকারীকেই সাংঘাতিক ভাবে আহত হইতে দেখা গিয়াছে। কখন কখন ইহারা বৃক্ষারোহী শিকারীর চোখ মুখ প্রখর নখদন্তের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া সেই বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় পলায়ন করে, এবং নিবিড় শাখাপত্রের ভিতর এ-ভাবে লুকাইয়া থাকে যে, শিকারী যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না!

কুইনস্‌ল্যাণ্ড ও নিউ গিনি ভিন্ন অন্য কোন স্থানে কস্-কস্ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু ঐ সকল স্থানেও ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ এরূপ হ্রাস হইতেছে যে, আর কিছুকাল পরে ইহাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কস্-কস্ জীবিত অবস্থায় ধরা পড়িলেও পোষ মানে না। পশু-ব্যবসায়ীরা কস্-কস্ সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান পশুশালায় প্রেরণ করিয়াছে; কিন্তু পশু-শালায় প্রবেশের অব্যবহিত পরে প্রত্যেকটিরই মৃত্যু হইয়াছে। বহু যত্নেও তাহাদিগকে জীবিত রাখা সম্ভব হয় নাই।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ এ-কাল পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টাতেও ইহাদের জীবনেতিহাস সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এইমাত্র জানিতে পারা গিয়াছে—স্ত্রী কস্-কস্ একবারে একটিমাত্র শাবক প্রসব করে। প্রসবকালে শাবকের দেহ এক ইঞ্চি মাত্র দীর্ঘ হয়, এবং তখন তাহার দেহে লোম থাকে না।

শাবক প্রসব করিয়াই তাহার মাতা শাবকটিকে তাহার তলপেটের থলির ভিতর পুরিয়া রাখে। প্রায়

ছয় মাস পর্য্যন্ত মা তাহাকে সেই থলির ভিতর লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; প্রায়ই তাহাকে কাছছাড়া করে না। শাবকের বয়স দুই-তিন মাস হইলে মা তাহাকে অনেক সময় পিঠে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তখন সেই শাবককে বানরীর পিঠে তাহার বাচ্চার মত দেখায়।

ঐ সকল দেশে আর এক জাতীয় কস্ কস্ আছে, তাহা দেখিতে ক্যাঙ্গারুর অনুরূপ, এবং তাহারা গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া তাহাদিগকে 'গেছো ক্যাঙ্গারু' নামে অভিহিত করা হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় সাধারণ ক্যাঙ্গারুর অভাব নাই, কিন্তু এই জাতীয় 'গেছো ক্যাঙ্গারু'র সংখ্যা অত্যন্ত অল্প; এবং দুর্ভেদ্য অরণ্যেই কদাচিৎ তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-কুইনস্-ল্যাণ্ডের অন্তর্দ্দেশের গভীর অরণ্যই ইহাদের একমাত্র বাসস্থান।

দূর হইতে হঠাৎ দেখিলে এই জন্তুগুলিকে ক্ষুদ্র জাতীয় বানর বলিয়াই ধারণা হয়; কারণ, কোন কোন বিষয়ে বানরের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। পূর্ণবয়স্ক কস্-কস্ তিন ফিট হইতে সাড়ে তিন ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় কস্-কসের লোমের বর্ণ লোহিতাভ বাদামী (reddish brown) বা ধূসর বাদামী। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র, কর্ণ সূচ্যগ্র, এবং নাসিকা দীর্ঘ; কিন্তু বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু-দু'টিই সর্ব্বাগ্রে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাদের পশ্চাতের পদদ্বয় সম্মুখের পদদ্বয়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহা ক্যাঙ্গারুর পদের সহিত তুলনীয়। ইহাদের তিন-চারি ফিট দীর্ঘ লাঙ্গুল দেহের তুলনায় বেমানান দীর্ঘ; অনতিদীর্ঘ দেহের পশ্চাতে এই লাঙ্গুলটি দেখিলে 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির' কথা মনে পড়ে!

গেছো-ক্যাঙ্গারু লেজ দ্বারা বৃক্ষশাখা জড়াইয়া ধরিতে পারে না, ইহা তাহাদের দেহের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বৃক্ষে আরোহণ করিবার সময় ইহারা লেজটি পশ্চাতের পদদ্বয়ের মধ্যে গুটাইয়া রাখে।

গেছো-ক্যাঙ্গারু সুদীর্ঘ বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় বাস করে। ইহারা অত্যন্ত দ্রুতবেগে বৃক্ষে আরোহণ করিতে পারে। এ বিষয়ে ইহারা বানরের সমকক্ষ। অত্যন্ত উচ্চ শাখা হইতে মাটীতে লাফাইয়া পড়িলেও ইহারা আহত হয় না। কখন কখন ইহারা পঞ্চাশ-ষাট ফিট উচ্চ শাখা হইতে মাটীতে লাফাইয়া পড়িয়া, মুহূর্ত্তমাত্র না থামিয়াই বিদ্যুদ্বেগে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। এই ভাবে এইরূপ উচ্চ স্থান হইতে মাটীতে লাফাইয়া পড়িলে অন্য যে-কোন জন্তুকে জখম হইতে হয়, এবং তাহার চলৎ-শক্তি রহিত হয়।

গেছো-ক্যাঙ্গারু দিবাভাগে বৃক্ষশাখায় বাস করে। কেহ তাহাকে আক্রমণ না করিলে সে স্বেচ্ছায় সেই আশ্রয় ত্যাগ করে না। বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলে ইহারা মাটীতে লাফাইয়া-পড়িয়া বিদ্যুদ্বেগে নিরাপদ স্থানে পলায়ন করে। ইহারা বৃক্ষশাখায় এবং মাটীতে সমান বেগে দৌড়াইতে পারে। এই গেছো-ক্যাঙ্গারুর দেহে বানর ও ক্যাঙ্গারু উভয়ের ধাবনশক্তি সমভাবে বর্ত্তমান।

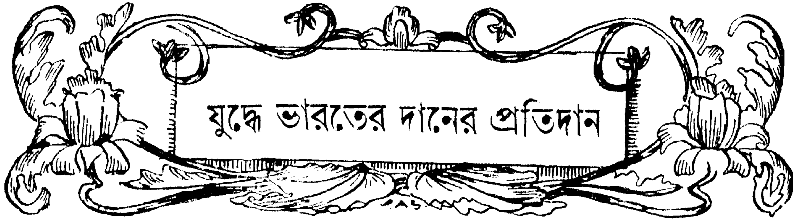
প্রাণিবিজ্ঞানে ইহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রঙ্গ

শুধু নাম সই—তা'-ও যাহাদের করিতে কলম টোটে,
শুধু দু'টো কথা—তা'-ও যাহাদের বুঝিতে ধর্ম্ম ছোটে,
এ হেন জীবেরই হাতে দিলে প্রভু লাখ লাখ কোটি টাকা,
এমনি রঙ্গ! শিক্ষিত যারা তাদের জীবন ফাঁকা!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।



ভাগ্যবিড়ম্বনায় ভারত এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের দরিদ্রতম দেশ হইলেও বর্ত্তমান যুদ্ধে যে অর্থ-সাহায্য করিতেছে—তাহা দেখিয়া এ কথা কাহারও মনে করা কর্ত্তব্য নহে যে, ভারত বৃটেনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে না। সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে মেজর সার জর্জ্জ ডান্‌বার এ-সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভার সভাপতি মেজর জেনারেল সার ফ্রেডরিক সাইকস্ বলিয়াছিলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্য যে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যও সংগঠিত হইতেছে। এই যুদ্ধে ভারতের—অতি দরিদ্র ভারতের দান যে অনন্যসাধারণ, কোন সত্যনিষ্ঠ বিবেচক ব্যক্তিই ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই যুদ্ধে ভারতের ভাগ্য যে কি ভাবে সংগঠিত হইতেছে বা হইবে, তাহা বুঝিবার সাধ্য এ দেশবাসীর আছে বলিয়া মনে হয় কি? বোম্বাই নগরে দীবপন্থী নেতারা মুক্তকণ্ঠে যে দাবী পেশ করিয়াছেন, লর্ড লিন্‌লিথগো বা মিষ্টার আমেরী তৎপ্রতি যে ভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে ভারতবাসীর মনে কিরূপ নিরাশা ও নিরুৎসাহের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং "বিরক্তি ভ্রূকুটিরাশি, হেরি সকরুণার হাসি" দেখিয়া এ দেশের লোকের মনে নৈরাশ্য সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী বৃটিশ পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় যে বক্তৃতা উদ্গিরণ করিয়াছেন, তাহাতে সংযতবাক্, স্থিরধী গান্ধীজীর মনও বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সেই বিরাগ ও বিক্ষোভ তিনি মিঃ আমেরীর বক্তৃতার যে নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার প্রতিছত্রে, এমন কি, প্রতিশব্দে পরিস্ফুট হইয়াছে। সার সর্ব্বপল্লী রাধাকিষণের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী এবং মিতভাষী দার্শনিক পণ্ডিতও বৃটিশ রাজনীতির এই শোচনীয় দৈন্যদর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া বলিয়াছেন—ভারতবাসীর মনে বৃটিশের হিতসাধনের এবং তাহাকে সাহায্যদানের প্রবৃত্তি বিশেষ ভাবেই প্রবল রহিয়াছে; কিন্তু বৃটিশ জাতি নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃই সেই নৈতিক সম্পদ হারাইতে বসিয়াছে! প্রথিতনামা প্রবীণ রাজনীতিক বৃটিশ সরকারের বিশ্বাসভাজন মাননীয় শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও কাকাতুয়ার বুলির ন্যায় মিষ্টার আমেরীর এই একঘেয়ে বুলি শুনিয়া কিরূপ হতাশ হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মন্তব্যেই সুপ্রকাশ।

মিষ্টার আমেরী উচ্ছ্বাসভরে বলিয়াছেন,—"ইংরেজ-শাসন ভারতবর্ষকে শান্তিদান করিয়াছে।" যে সময়ে আমেদাবাদে, বোম্বাই অঞ্চলে, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে, এবং বাঙ্গালার অন্য দুই-একটি স্থানে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক বিরোধ তাহার অনলবর্ষী লেলিহান জিহ্বা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া ভারতের শান্তি ও কল্যাণ ধ্বংস করিতেছে, যে সময়ে দলে দলে হিন্দু পিতৃ-পিতামহের বাস্তভিটা ও অনল-বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী, জমিজমা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে, মাথা বাঁচাইবার জন্য ভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইতেছে; যে সময়ে সংবাদপত্রের কণ্ঠ অকারণে রোধ করিয়া, লোকের মত-প্রকাশে ও সংবাদ প্রকাশে বাধা প্রদান করিতে লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভূত হইতেছে না, সে সময়ে ভারতের শান্তি প্রতিষ্ঠার অহঙ্কার করা যে কিরূপ নগ্ন নির্লজ্জতার নিদর্শন, তাহা অনুমান করা আদৌ কঠিন নহে। দীর্ঘকালব্যাপী বৃটিশ-শাসনের ফলে যদি কয়েক দল গুণ্ডার অনুষ্ঠিত অত্যাচার-উপদ্রব হইতে দেশের শান্তিকামী নিরীহ জনসাধারণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়, তাহা হইলে এই শান্তির স্বরূপ বুঝিতে কি কাহারও বিলম্ব হইতে পারে? সুদীর্ঘ চারি শত বৎসরকাল রোমকদিগের শাসনাধীন থাকিয়া বীর্য্যশালী বৃটেনবাসীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা মিষ্টার আমেরীর নিশ্চিতই অজ্ঞাত নহে। মুষ্টিমেয় স্যাক্সন এবং ইঙ্গেলদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে অসমর্থ হইয়া শেষকালে বীর বৃটেনের বংশধরগণকে ওয়েলসের পর্ব্বতাকীর্ণ অঞ্চলে এবং ফ্রান্সের বৃটেনী উপদ্বীপে পলায়ন করিয়া আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সুতরাং ঐ শান্তি কিরূপ ক্ষতিজনক, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

তাহার পর মিষ্টার আমেরী অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, বৃটিশ শাসনে ভারতের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহার এই সদম্ভ উক্তি যে কিরূপ বিরাট ধাপ্পাবাজী, সে সম্বন্ধে কাহারও কি বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ আছে? দাদাভাই নওরজি, ডিগবী, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি রাজনীতিক ও ঐতিহাসিকগণ সভ্য জগতের সকল লোকের চক্ষুতে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, বৃটিশ-শাসনে ভারতবাসীর বৈষয়িক অবস্থা দিন দিন অবনতিই প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা কি শাসকজাতির পক্ষে প্রশংসার বিষয় হইতে পারে? তাহা নহে বলিয়াই বহু ইংরেজ সে কথা স্বীকার করিতে সম্মত হইতে পারেন নাই। এ কথা সত্য যে, যদি ইংরেজ-শাসনকালে ভারতের শ্রমশিল্প এবং কারুশিল্প হ্রাস পাইয়া থাকে, যদি কৃষিমাত্র ভারতবাসীর সম্বল হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতের দারিদ্র্য দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। ভারতের দারিদ্র্য যে প্রবর্দ্ধমান, ইহা অস্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াও অনেক ইংরেজ প্রকারান্তরে তাহা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। সার ডবলিউ, হোল্ডারনেস কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার রচিত 'Peoples and Problems of India' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, নিখিল ভারতের লোকসংখ্যা ৩৫ কোটি। ইহার প্রত্যেক লোককে গড়ে ২ বিঘা জমির উৎপন্ন ফসলের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। আজ শাসকবর্গই বলিতেছেন, ভারতের লোকসংখ্যা ৪০ কোটি হইয়াছে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্র বাড়ে নাই, ভারতবাসীর শিল্প বাণিজ্যও বিশেষ বিস্তারলাভ করে নাই। সুতরাং ভারতবাসীর দারিদ্র্য যে পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু এই প্রবর্দ্ধমান দারিদ্র্য-ভারে প্রপীড়িত হইয়াও ভারতবাসী তাহাদের কর্ত্তব্য মনে করিয়াই সমর-পরিচালনায় শাসক-জাতিকে কি পরিমাণে সাহায্য করিতেছে, তাহা মেজর সার জর্জ্জ ডানবারের বক্তৃতাতেই সপ্রকাশ। সেই বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সার জর্জ্জ প্রথমে ভারতবাসী শৌর্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের আর্য্য, দ্রাবিড়ি, রাজপুত, মুসলমান, মারাঠা এবং শিখদিগের সম্পাদিত উদ্দীপনাপূর্ণ সাময়িক অবস্থানপরম্পরা লোকের মনে উৎসাহের সঞ্চার করে। দ্বাবিংশতি শতাব্দী পূর্ব্বে মৌর্য্য-সম্রাট্ যখন হিন্দুকুশ পর্ব্বতসীমা পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন, তখন হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেও ভারতীয় সৈন্যগণ উপকূলের বন্দরাভিমুখে ধাবমান রণদুর্ম্মদ বিশাল জার্ম্মাণচমূর প্রচণ্ড গতিতে বাধাদান করিয়াছিল, সেই সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী বিপুল কীর্ত্তিই তাহার পরিচায়ক। এখন ভারতীয় যোদ্ধৃবৃন্দের নিকট কতখানি সামরিক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহা যথাযথভাবে বুঝিতে হইলে বিগত মহাযুদ্ধে ভারতীয় বীরগণ রণক্ষেত্রে কি পরিমাণ সাহায্য করিয়াছিল, তাহা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে।

মেজর সার জর্জ্জ বলিয়াছেন, সিকি শতাব্দী পূর্ব্বে যখন বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ চলিতেছিল, তখন প্রয়োজন হইয়াছিল মানুষের,—যান্ত্রিক সজ্জার তখন তত অধিক প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। পদাতিক সৈন্যই তখন সৈনিকের শীর্ষস্থানীয় ছিল, এবং তাহাদেরই প্রয়োজন সর্ব্বত্র বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়াছিল। সমগ্র সাম্রাজ্যমধ্যে ইংরেজ-বাহিনীর মধ্যস্থিত অরক্ষিত স্থানগুলি রক্ষা করিবার জন্য লাহোর এবং মিরাট ডিভিসন মাত্রই পাওয়া গিয়াছিল। তাহারাই ছিল সুশিক্ষিত। সে সময়ে বৃটিশ-বাহিনীর উপরেই বিশেষ চাপ পড়িতেছিল। তাহার পর হইতে যুদ্ধ-বিরতির সময় পর্য্যন্ত ভারত যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল, তাহার সংখ্যা পঞ্চদশ লক্ষ! বিভিন্ন পদে অবস্থিত দশ লক্ষেরও অধিক ভারতীয় সৈন্য ফ্লাণ্ডার্শে, পূর্ব্ব-আফ্রিকায়, মেসোপোটেমিয়ায়, কামেরুণসে, উত্তর-চীনে, গ্যালিপোলিতে, স্যালোনিকায়, প্যালেষ্টাইনে এবং ট্রান্স-কাম্পিয়াতে যুদ্ধার্থ সজ্জিত ছিল। ইহার মধ্যে প্রায় দুই ডিভিসন সৈন্য—'ইম্পিরিয়াল-সার্ভিস' সৈন্য, দেশীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। ভারতীয় রাজন্যগণ সম্রাটের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য যথাসর্ব্বস্ব প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। নেপাল হইতে যে সকল গুর্খা সৈন্য আসিয়াছিল,—তাহাদের কথাও বিস্মৃত হইবার যোগ্য নহে। সার জর্জ্জ ডানবার ভারতবর্ষের যে দানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে বিগত মহাযুদ্ধে যে বিশেষ উপকার হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। সেই জন্যই তদানীন্তন ভারত-সচিব মণ্টেগু কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া (গলার কাঁটা নামিলে) ভারতকে দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকার দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধের আহ্বানেও ভারত সেইরূপই আগ্রহ সহকারে সাড়া দিয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে দুই-একটি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে উহাদের গুরুত্ব এরূপ ছিল না। প্রাচ্য ভূমণ্ডলে ভারতের স্থান অনন্যসাধারণ। ভারতের অক্ষয় জনবল, অতুল সামর্থ্য ও সম্পদ, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুদূর প্রাচ্যসীমায়—মিশর ও প্যালেষ্টাইনের ব্যবধানে অবস্থান, বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহাকে বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, অর্থের দিক দিয়া ভারত বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটিশের জয়যাত্রার যে সমর্থন করিতেছে, তাহাও অনন্যসাধারণ। অধিকন্তু, সামরিক দিক দিয়াও গ্রেট বৃটেন ভারত দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বিমান যুদ্ধের উন্নতিফলে সামরিক ব্যাপারে অসাধারণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া সুদূর সিঙ্গাপুর হইতে সুয়েজ খাল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে ভারতের সামরিক অবস্থানজনিত সুবিধা বিশেষ ভাবেই অনুভূত হইতেছে। মধ্যস্থলে অবস্থিত ভারত হইতে মিশরে, এডেনে, এবং সিঙ্গাপুরে তাড়াতাড়ি সৈন্য পাঠাইবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহাতে সুফল ফলিতেছে। ভারত হইতে প্রেরিত সৈন্যদল ফ্লাণ্ডার্সে, সোমালিল্যাণ্ডে এবং গালাবটে উল্লেখযোগ্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। গতপূর্ব্ব-সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বিঘোষিত হইবার পর হইতে ভারত সরকার ভারতের সৈন্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শান্তির সময় গোরা সৈন্য ভিন্ন ভারতে যে সকল সৈনিক থাকে, তাহাদের সংখ্যা দেড় লক্ষ মাত্র। ইহার সহিত রাষ্ট্রীয় (Teritorial) এবং সরকারী সৈন্য-সংখ্যা (Auxiliary force) ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ২১ হাজার বৃটিশ, এবং ১৫ হাজার ভারতীয় সৈন্যে পরিণত হইয়াছে। সকল পদস্থ সৈনিকই ঐ সকল সেনাদলে অবস্থিত।—তিনি বলেন, শৌর্য্যগুণে ভারতীয় সৈন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভূমিই ক্ষিপ্রতার সহিত কর্ম্মারম্ভের শিক্ষাক্ষেত্র। এই সকল সৈনিককে সর্ব্ববিধ আধুনিক সমর-কৌশল শিক্ষাদান করা হইতেছে; যান্ত্রিক যুদ্ধ-বিদ্যা, বৈমানিক সমর-কৌশল প্রভৃতি কিছুই বাদ দেওয়া হয় না। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতীয় গোলন্দাজ সৈন্যদল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় স্যাণ্ডহার্ষ্ট কলেজে সেনানায়কের কার্য্যে শিক্ষা দান করা হইতেছে।

এখানে বলা আবশ্যক যে, বৃটিশ সরকার যদি পূর্ব্বে ভারত-বাসীকে বিশ্বাস করিয়া যথাযোগ্য ভাবে সামরিক শিক্ষা দান করিতেন, তাহা হইলে এ সময়ে তাঁহাদিগকে দুর্জ্জয় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধব্যাপারে এত অসুবিধা সহ্য করিতে হইত না। জন কোম্পানীর প্রথম আমলে ভারতবাসীদিগকে বিশ্বাস করিয়া তোপখানার (artillery) কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত; কিন্তু পরে এই প্রথা রহিত হইয়াছিল। বৃটিশ জাতির এ কথা বুঝিতে পারা উচিত যে, এক পক্ষ যদি অন্য পক্ষকে অকপট ভাবে বিশ্বাস করিতে না পারে, তাহা হইলে অন্য পক্ষেরও সেই পক্ষকে প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করা সম্ভব হয় না।—Suspicion always haunts the guilty mind—ইহা ঐ দেশেরই কবিবাক্য।

যাহা হউক, এখন এই ভাবে ভারতীয় সৈনিক ও সামরিক বিভাগের উন্নতি সাধিত হইতেছে। সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বসম্প্রদায়ের এবং সর্ব্ববৃত্তিভোগী লোকদিগের মধ্য হইতেই সৈনিক বিভাগে যোগদানের জন্য লোক সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে বৃটিশ-শাসিত ভারতের জন-সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি, সৈন্যদলে সেই বৃটিশ জাতির কখনই লোকাভাব হইতে পারে না; কিন্তু ত্বরিত গতিতে বিপুল বাহিনী গঠনে কতকগুলি বাধা দেখা যায়। প্রথমতঃ, সৈনিকদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নূতন করিয়া করিতে

হইবে, দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের সাজসজ্জারও আবশ্যক, এবং যথাযোগ্য যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন। এখন সামরিক ব্যাপারে যন্ত্রাদির উপযোগিতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। এই সকলের সুব্যবস্থা ব্যতীত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সুফলের আশা অল্প। বর্ত্তমান সময়ে বৃটিশ-ভারতে ৫ লক্ষ সৈনিক গৃহীত হইবে। ইহাতে সকল প্রকার প্রহরণধারী সৈন্যই থাকিবে। যথাসম্ভব শীঘ্র এই সকল সৈন্যকে সজ্জিত করিতে হইবে। বিগত নবেম্বর মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ৫৩ হাজার নূতন সৈনিককে শিক্ষাদান করিয়া সেনাদলে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন প্রথম এক লক্ষ সৈনিকের উপযোগী সাজ-সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করা হইয়াছে; এবং ঐ সংখ্যক সৈনিকপুরুষও সংগৃহীত হইয়াছে। এখনও প্রতি-মাসে গড়ে প্রায় পনের হাজার করিয়া সৈনিক গ্রহণ করা হইতেছে। পদস্থ সেনানায়ক সংগ্রহের জন্য বৃটিশ এবং ভারতীয় প্রার্থীদিগকেও লওয়া হইতেছে। ৫ শত ভারতবাসীকে ছয় মাস শিক্ষাদানের পর গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাদিগকে সঙ্কটকালীন কমিশন হিসাবে লওয়া হইবে। মেজর ডানবার বলিয়াছেন, এই ভাবে সমর বিভাগে ভারতবাসীদিগকে গ্রহণ করা হইতেছে। আমাদের মনে হয়, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে যদি সরকার এই ভাবে সমর-বিভাগে ভারতবাসীকে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে ছয় মাস মাত্র শিক্ষা দিয়া 'এমার্জ্জেন্সি কমিশনে' লোক লইতে হইত না। এই বিশাল ভারতে অনেক সুশিক্ষিত সেনানায়কই পাওয়া যাইত।

বর্ত্তমান যুগে সামরিক ব্যাপারে বিমান-বিভাগের কার্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন সর্ব্বত্রই বিমান-পথ হইতে জল ও স্থল-ভাগ আক্রান্ত হইতেছে। সম্প্রতি ভারতেও বিমান-বিভাগ খোলা হইয়াছে। সর্ব্বশ্রেণীর লোকই এই বিভাগের কার্য্যে যোগ দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বৈমানিক সৈন্য গ্রহণ করিতে হইলে বিমান চাই, শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা চাই। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে অনেক ভারতবাসী বৈমানিকের কার্য্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। এবারও বহু ভারতবাসী বিমান-বিভাগে যোগদানের জন্য আবেদন করিতেছেন। এখন ভারতে যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য জঙ্গীলাট কলকারখানাওয়ালাদিগকে, দক্ষ শিল্পীদিগকে যত দূর সম্ভব সামরিক যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্য ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে বিমান-বিভাগের যে হিসাব প্রকাশ করা হয়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সময়ে বিমানের কতকগুলি সদর ঘাঁটি, দুই প্রস্ত বিমান, এবং ১৬ জন বৈমানিক পদস্থ কর্ম্মচারী, ১৫২ জন এয়ার রেটিং (air ratings) এবং অন্যান্য পদস্থ ২৪৩ জন কর্ম্মচারী লওয়া হইয়াছিল। এই বিভাগের কতকগুলি বিশেষজ্ঞের পদ ব্যতীত আর সকল পদই ভারতবাসী-দিগকে দেওয়া হইয়াছে। ইনি আরও বলিয়াছেন, ভারতীয় বিমান-চালক ক্লাবগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া এ দেশে অনেক বিমান-চালক বিমান-চালনার কাজ শিখিয়াছে। বিমানচালকের কাজের জন্য এ দেশে লোকের অভাব হইবে না। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই বিমান বিভাগের কার্য্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এক প্রস্ত বিমানের সমস্ত কাজই সমাপ্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রস্ত বিমানের কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। বিমান বিভাগে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিবার জন্য বহু ভারতবাসী আবেদন করিয়াছে। উপকূলরক্ষার জন্য ইহাদিগকে গ্রহণ করা হইতেছে। শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা হইতেছে। আপাততঃ তিন শত বিমানচালক এবং দুই হাজার শিল্পীর শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

সার জর্জ্জ ডানবার বলিয়াছেন, "ভারতবাসীরা খুব ভাল শিল্প-কাজ করিতে পারে। তবে তাহাদের মধ্যে সুদক্ষ শিল্পীর সংখ্যা অতি অল্প।" শাসকদিগের সঙ্কীর্ণ নীতিই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। কারণ, সরকার যদি এ সকল শ্রমশিল্প কার্য্যের প্রসার-সাধনে তৎপর হইতেন, তাহা হইলে সুদক্ষ শিল্পীর অভাব আদৌ লক্ষিত হইত না। যাহা হউক, এখন সরকার সুদক্ষ শিল্পী শিক্ষিত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। বক্তার মতে ভারতে বিমান-প্রস্তুতের উপকরণ সংগ্রহও একটা সমস্যা। ভারতে এ পর্য্যন্ত বিমান প্রস্তুত হয় নাই। সেই জন্য এই কার্য্য-সাধনের উপকরণ পাওয়া যায় কি না, তাহারও সন্ধান হয় নাই। এখন সন্ধান করা হইতেছে। ভারত সরকার 'বৃটিশ সাপ্লাই বোর্ড'কে মার্কিণ হইতে বিমান প্রস্তুতোপযোগী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তবে মার্কিণের হাতে এখন অনেক কাজ, বৃটিশ-জাতির জন্য সামরিক উপকরণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তবে ত ভারতের জন্য বিমান-নির্ম্মাণের যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া দিবেন। সেই জন্য এই কার্য্যে বিলম্ব হইতেছে। অতঃপর মেজর সার জর্জ্জ ডানবার ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। ইদানীং ভারতের নিজস্ব কোন সামরিক নৌবহর ছিল না, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি বলিয়াছেন, প্রায় সাত শত বৎসরের অধিক পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদিগের নৌবল ছিল। তখন হিন্দুরা সাগর পারে অসমসাহসিক কার্য্য করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু আজ অন্ততঃ সাত শত বৎসর তাহা রহিত হইয়াছে। তৎপরে আর কোন হিন্দু নরপতি রণতরী রক্ষার কথা মনেও স্থান দেন নাই। সার জর্জ্জ এ বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই সময় মধ্যে কোন কোন ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান নৃপতি নৌবল রক্ষার্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। হায়দার আলি নৌবাহিনী গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পেশোয়াদিগের রণতরী ছিল। আকবরের বেশ শক্তিশালী এক বহর রণতরী ছিল; জাহাঙ্গীরের আমলেও তাহা লোপ পায় নাই। সুতরাং ইদানীং ভারতে রণতরী বহর যে কোন রাজারই ছিল না, ইহা বলা সঙ্গত নহে। অল্প দিন পূর্ব্বেও ভারতের যে বাণিজ্যবাহী পোত ছিল, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতীয় পোত-নির্ম্মাণ শিল্প বিলুপ্ত হয়। ইহা ডবলিউ এস লিণ্ডসের History of merchants shipping (vol II. ৪৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা) পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, এখন সরকার দায়ে ঠেকিয়াই ভারত-রক্ষার্থ নৌবাহিনী গঠনে বিশেষ ভাবে অবহিত হইয়াছেন। জন কোম্পানীর আমলের সশস্ত্র 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া মেন'গুলিকেই ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে 'রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভী'তে পরিণত করা হয়। তাহার পর গত দুই-তিন বৎসরে রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভী গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে গত বৎসর জুন মাসে 'পাঠান' নামক প্রহরী-জাহাজখানি শত্রুপক্ষের টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হয়। যাহা হউক, এখন ভারতের রণতরী বহর বর্দ্ধনশীল। এখন ভাইস-এডমিরাল ফিজ হার্ব্বার্ট রয়াল ইণ্ডিয়ান নৌবাহিনীর পরিচালক। বোম্বাইয়ের নৌবাহিনী-প্রাঙ্গণে এখন সর্ব্বপ্রকার জাহাজের সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে। এখন মালাবার এবং

চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীরাই তরী-পরিচালন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছে।

রাজন্যবর্গ কর্তৃক বৃটিশ সরকারকে সাহায্যদান প্রসঙ্গে সার জর্জ্জ বলিয়াছেন, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় রাজন্যগণ প্রদত্ত ২৬ হাজার হিন্দু, মুসলমান এবং শিখ সৈন্য বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধে বিদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। পঞ্চসপ্ততি বর্ষীয় সার প্রতাপ সিং এবং তাঁহার (তখন) ষোড়শবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র (যোধপুরের মহারাজা) ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এখন রাজন্যগণ সেই প্রকার রাজভক্তিই প্রদর্শন করিতেছেন। এবার সমর-বিদ্যাবিশারদ বিকানীরের মহারাজাই সম্রাটকে ছয় পল্টন পদাতিক এবং এক প্রস্ত উষ্ট্রবাহিনী প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি এবার যুদ্ধে যাইবেন। রাজপুত বৃদ্ধ হইলেও যুদ্ধে অশক্ত হয় না। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সেনা ছিল ৪৫ হাজার। এখন রাজন্যবর্গের ১৬ ইউনিট সৈন্য ভারতের নানা স্থানে সম্রাটের সৈন্যের সহযোগিতা করিতেছে, এবং প্রয়োজন হইলে আরও অতগুলি সৈন্য সংগৃহীত হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। এখন ভারতীয় রাজন্যবর্গের সৈন্যদিগের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখন তাহারা যুদ্ধে সরকারকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতে পারে, এবং তাহা করিতেছে; দেশীয় রাজ্যগুলির লোক-সংখ্যা ৮ কোটি। হিটলারের জার্ম্মাণী অপেক্ষা তাহারা সংখ্যায় অনেক অধিক। সুতরাং জনবলে ভারত হীন নহে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারত হইতে বৃটিশ সরকার কিরূপ আর্থিক সাহায্য পাইতেছেন, তাহারও একটা হিসাব মেজর সার জর্জ্জ ডানবার দিয়াছেন। War purposes fundএ (সেণ্ট ডানষ্টান্স ফণ্ডসমেত) গত নবেম্বর পর্য্যন্ত ১৫ লক্ষ পাউণ্ড একমাত্র ভারত হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। এখন উহার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভারতের বড় বড় সামন্ত নরপতি হইতে দরিদ্র কৃষকরা পর্য্যন্ত এই ফণ্ডে স্বেচ্ছায় অর্থদান করিয়া আসিতেছেন। ভারতবাসী-প্রদত্ত অর্থে ভারতীয় রেডক্রশ, সেণ্ট জন এম্বুলেন্স এবং লর্ড মেয়রের ধনভাণ্ডার পরিপুষ্ট হইতেছে। নিখিল ভারতীয় রাজ্যরক্ষা ঋণ-ভাণ্ডারে গত নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ এই সংগ্রামের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য গৃহীত হইয়াছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধেও ভারতীয় রাজন্যবর্গ অকাতরে অর্থদান করিয়াছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধে হায়দ্রাবাদ, বিকানীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবর্গের দান সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। পূর্ব্বেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

এ-কালের এই দরিদ্র ও দীর্ঘকাল যাবৎ নানা ভাবে লুণ্ঠিত ভারতের হৃতাবশিষ্ট আর্থিক সম্পদ হইতেও বৃটিশ জাতির কত দূর সুবিধা হইয়াছে, বক্তা তাহাও বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যুদ্ধের ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতির পরিচালনার জন্য তৈলের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। ঘর্ষণের ফলে যন্ত্রপাতি যাহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, সে জন্য তাহা পিচ্ছিল রাখিতে তৈল দিতে হয়। এক দিন জার্ম্মাণীতে উহার অভাব হইবেই; কিন্তু বৃটিশ জাতির সে অভাব ঘটিবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। জার্ম্মাণী যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত হইতে কিছু তৈল-বীজ ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের নিঃসন্দেহই ইহার অভাব ঘটিবে। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে সাড়ে নয় লক্ষ টন তৈল-বীজ রপ্তানী হইয়াছিল। সুতরাং গ্রেট বৃটেনের এই বস্তুর অভাব ঘটিবার কোন আশঙ্কাই নাই। এতদ্ভিন্ন, যুদ্ধের সময় পাট একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। বালির বস্তা নির্ম্মাণের জন্য উহার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণী কিছু পাট কিনিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত গ্রেট বৃটেন ১৪ কোটি গণি থলিয়া, ৫ কোটি ৭০ লক্ষ গজ গণি চট এবং বহু পরিমাণ পাট ক্রয় করেন। বঙ্গদেশ যখন একচেটিয়া ভাবে পাট উৎপাদন করে, তখন বৃটেনকে ইহার অভাবে নিশ্চয়ই অসুবিধা সহ্য করিতে হইবে না। রবার যুদ্ধের জন্য আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু; কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড রবার ও-দেশে চালান গিয়াছিল। এ অবস্থায় জার্ম্মাণীর পক্ষে রবারের অভাব ঘটিবেই, কিন্তু ইংরেজের পক্ষে তাহার অভাব ঘটিতে পারে না। ইহা ভিন্ন কয়লা, কাঠ, চামড়া, লাক্ষা, কাঁটা তার, ম্যাঙ্গেনিস প্রভৃতি সামরিক উপকরণ ভারতে যথেষ্ট আছে। ইংরেজের উহার অভাব সহ্য করিবার আশঙ্কা নাই; অথচ জার্ম্মাণীর ঐ সকল দ্রব্যের অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। তদ্ভিন্ন, ভারতের কলকারখানা হইতেও ইংরেজ নিত্য-প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিতেছেন। ভারতের কাপড়ের খাকি ড্রিল প্রভৃতি বহুবিধ প্রয়োজনীয় কাপড়, অন্য কল হইতে রবারের চক্র-বেষ্টনী (tyre) সাবান, বিস্কুট, টাটার কল হইতে লোহার চৌপল এবং ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া বৃটেনে ও সমরক্ষেত্রে রপ্তানী হইতেছে। অন্যান্য নানাবিধ সমরোপকরণও ভারতে প্রস্তুত হইতেছে।

বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের তুলনায় বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যাপকতা ও ভীষণতা অনেক অধিক এবার রণক্ষেত্র বহু দেশ লইয়া বহু দূরে বিস্তৃত। যুদ্ধের ব্যয়ও এবার বিপুল। গতবার অপেক্ষা এবার বৃটিশ জাতিকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে; ব্যয়েরও সীমা নাই। সুতরাং এবার বৃটিশ জাতিকে অনেক অধিক করভার বহন করিতে হইতেছে। এবার বৃটিশ সরকারের বাজেটে সমর-ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ৪২০ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড বরাদ্দ করা হইয়াছে। তথাপি মার্কিণ হইতে জমা এবং ঋণ হিসাবে যে সকল বস্তু পাওয়া যাইতেছে, তাহার হিসাব এই ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ইহা কেবল নগদ টাকা খরচের হিসাব। ইংরেজ জাতিকেও অত্যন্ত অধিক হারে কর দিতে হইলেও ভারতবাসীর দারিদ্র্য বিশ্ব-বিশ্রুত। পক্ষান্তরে, বৃটিশ জাতি পৃথিবীর ধনাঢ্য জাতিসমূহের মধ্যে উচ্চ স্থানে অবস্থিত। সুতরাং ভারতবাসী এই যুদ্ধে যাহা দিতেছে, —তাহা তাহারা একপ্রকার অভুক্ত থাকিয়াই দিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৃটেনের অধিবাসীদিগকে বর্দ্ধিত-হারে কর দিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইতেছে বটে, কিন্তু ভারতবাসীর কষ্টের তুলনায় তাহাদের কষ্ট অনেক অল্প। কারণ, ভারতবাসীরা নিত্য অনশনক্লিষ্ট, তাহার উপর ভারতে শ্রমশিল্প নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইদানীং দেশে যে দুই-একটি শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা সরকারের আনুকূল্যের অভাবেও দেশের লোকের ঐকান্তিক চেষ্টারই ফল। শ্রমশিল্প ব্যতীত ধনাগমের নিশ্চিত পন্থা দ্বিতীয় নাই। ধন না থাকিলে লোক কর দিতে পারে না, সমরেও অর্থ সাহায্য করিতে পারে না।

বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের শাসকবর্গ এ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর

হৃদয়-ভাব ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টাও করেন নাই—দুই শত বৎসর কাল সাহচর্য্য-ফলেও তাঁহাদের ভ্রম ঘুচে নাই। ধনিকদিগের স্বার্থপরতায় বিভ্রান্ত বৃটিশ জাতি ভারতবাসীকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাই তাঁহারা তাহাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিতেও কার্পণ্য করিতেছেন। সিপাহীবিদ্রোহের ভূত এখনও তাঁহাদের স্কন্ধ হইতে নামে নাই। কিন্তু ভারতবাসীর প্রকৃতি যে য়ুরোপের অধিবাসীদিগের, বিশেষতঃ, পশ্চিম-য়ুরোপের অধিবাসীদিগের প্রকৃতি হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র, ইহা বোধ হয় তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাই আজ তাঁহারা এইরূপ সাজ্ঘাতিক ভুল করিয়া আপনাদের এবং মানব জাতির ক্ষতি করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের দান দর্শনে মিষ্টার আমেরীরও মনে একটা খট্‌কা লাগিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। তাই তিনি বলিয়াছেন, ভারতবাসীরা যে ভাবে বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করিতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান যুদ্ধের পর তাহাদিগকে যথাসম্ভব সত্বর স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিতে হইবে। ইহা তাঁহার ছেঁদো কথা কি না, তাহা বুঝা যাইতেছে না। কারণ, সম্রাটের সরকারের সহিত একমত হইয়া মিষ্টার মণ্টেগু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার মর্য্যাদা যথাযথ ভাবে রক্ষিত হইয়াছিল কি না, তাহা বুঝা কঠিন নহে। মিষ্টার মণ্টেগুর responsible government-এর পথে ভারতকে কিছুমাত্র অগ্রসর করা হইয়াছে—এ কথা কোন ইংরেজ বুক ঠুকিয়া বলিতে পারেন কি? গান্ধীজী দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন,—ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় যাহাতে সম্মিলিত হইতে পারে, তাহাই গ্রেট বৃটেনের পরম্পরাগত অবলম্বিত নীতি (traditional policy); যত দিন বৃটিশ জাতির তরবারি ভারতবাসীকে পদানত রাখিবে, তত দিন ঐ নীতি বলবতী থাকিবে। সার রাধাকৃষ্ণণও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন। আমেরীর এবং বৃটিশ জাতির লীগ-প্রীতি দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এবং সিন্ধুর মুসলমানগণ, বাঙ্গালার প্রজাদল, শিয়াসম্প্রদায়ের মুসলমানগণ, অহর্‌র এবং জমিয়াৎউল উলেমার মুসলমানগণ, অধিকন্তু কংগ্রেসমতাবলম্বী মুসলমানগণ প্রভৃতি জিন্নার দলভুক্ত নহেন। তথাপি আমেরী-প্রমুখ রাজনীতিকগণ মস্লেম লীগের সহিত কংগ্রেসকে মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বলিতেছেন, ইহাতেই আসল ব্যাপার 'শতভাস্কর-সমদ্যুতি' প্রকট হইয়া পড়িতেছে। অধ্যাপক সার সর্ব্বপল্লী বলিয়াছেন, মিষ্টার আমেরীর বক্তৃতা—নৈতিক দৃষ্টিতে বৃটিশ জাতির ভারত-শাসন বিফল হইয়াছে, ইহার স্বীকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার উপর আর কোন মন্তব্যপ্রকাশ বাহুল্যমাত্র!

মিষ্টার আমেরী আভাসে প্রকাশ করিয়াছেন, এই যুদ্ধে ভারতবাসী সমৃদ্ধিলাভ করিতেছে। তিনি কি মনে করেন, অলীক উক্তি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করিলেই তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইবার যোগ্য হইতে পারে? ভারত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অন্য দেশের লোকরা হয় ত তাহা মনে করিতেও পারে, কিন্তু ভারতবাসীর তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে কি? যুদ্ধ বাধিলেই ত আর দেশের শিল্পক্ষেত্রে সমৃদ্ধির তরঙ্গ নামে না। দেশের লোক যদি সমরিক প্রয়োজন মত দ্রব্যসরবরাহের ভার পায়, তাহা হইলে কতকগুলি লোক লাভবান হইতে পারে সত্য; অন্যথা আশমান হইতে সমৃদ্ধি বর্ষিত হয় না। ভারতবাসীর যদি সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে দেশের লোক শতকরা ২০ জন হারে বৃদ্ধি পাইলেও ভারতে দিয়াশলাই, চিনি, কেরোসিন তৈল, বস্ত্র, তুলা প্রভৃতি দরিদ্র ব্যক্তিদিগের নিত্যপ্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক বস্তুর কাটতি কমিতেছে কেন? এই সমৃদ্ধির কথা যে মিথ্যা, তাহা মিষ্টার ঘনশ্যাম দাস বিরলা 'সার্চ্চ-লাইট' পত্রে বিশদ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। এই যুদ্ধের পর ভারতবাসীর ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা যখন বৃটিশ রাজনীতিকগণ এখনও প্রকাশ করিতেছেন না, বোম্বাই-সমিতির অতি সংযত দাবীতেও যখন সাড়া দিতেছেন না, তখন হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিয়াছে। তবে ভারতবাসী তাহাদের কর্ত্তব্যে বিমুখ হইবে না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

স্বপ্ন-বিলাসী

খেয়ালী সে, নাহি মানে কোনো বাধাবন্ধে—
ছুটে চলে নব পথে নিবিড় আনন্দে,
দুঃখের ঝরণায় যেই ফুল ভেসে যায়
তাই লভি' হয় তার তৃপ্তি,—
অরুণ-আলোতে তার বুকে ভাসে দীপ্তি!

কত মরু-প্রান্তর রোধি' দেয় পন্থা
বনানী ও কান্তার হয় আশা-হন্তা;
তবু হেরি খেয়ালীর নাহি নৈরাশ্য,
দুঃখের সিন্ধুতে কোন্ সুধামন্থনে
আস্যেতে ওঠে ফুটি' হাস্য!

অজানা পুলক নিয়ে টলমল নেত্রে
চলে যায় অনাবিষ্কৃত কোন্ ক্ষেত্রে;
মরুভূর অন্তরে বিরাজে মরূদ্যান—
তার পানে আছে দৃঢ় লক্ষ্য!
প্রাণহীনদের সনে হল কিবা সখ্য!

আলেয়া জ্বলিয়া ওঠে মসী-ঘন রাত্রে
বিভীষিকা বিষ দেয় হৃদয়ের পাত্রে;
পাত্রের গৌরব তবু হয় বৃদ্ধি;
আনি টেনে ক্রমে যেথা তৃণের শিশির' পরে
তপন-আলোকে রাজে সিদ্ধি।

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার (বি-এ)।



শ্রীচরণেষু

সে-কালে বিবাহের পাত্রী দেখিতে গিয়া মেয়ের পা-দেখা ছিল পাত্রী-পরীক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। পায়ের পাতা, পায়ের পেশী, পায়ের ডিম, মোটামুটি পায়ের গড়ন—এ সব পছন্দ না হইলে জেল্লাদার রঙ ও 'প্রতিমা'র মতো মুখ লইয়াও বহু পাত্রী বিবাহের বাজারে বাতিল হইতেন! এখন পায়ে জুতা-মোজা আঁটিবার রেওয়াজ বাড়িবার দরুণই হোক, বা পায়ের দিকে চাহিবার প্রয়োজন নাই বুঝিয়াই হোক, পাত্রী-পরীক্ষার 'সিলেবাস্' হইতে পায়ের এ-পর্ব্ব উঠিয়া গিয়াছে। উঠিয়া গেলেও পায়ের গড়নে, পায়ের শ্রী-ছাঁদে এখনো রূপসীর সৌন্দর্য্যের বিচার একেবারে রদ হয় নাই!

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, পায়ের গড়নের উপর, পায়ের শ্রী-ছাঁদের উপর সর্ব্বদেহের ছাঁদ-গঠন ও সৌন্দর্য্য নির্ভর করে অনেকখানি! ইংরেজীতে একটি প্রচলিত কথা আছে—Show me her ankles and I will tell you if she is too fat.

একটু মন দিয়া মেয়েরা যদি কয়েকটি ব্যায়াম-বিধি মানিয়া চলেন, তাহা হইলে পা দু'খানির গড়ন সুন্দর হইতে পারে। পায়ের গড়ন যদি সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন, জানিবেন, দেহের শ্রী-ছাঁদও তাহা হইলে রমণীয়-কমনীয় থাকিবে।

অলস হইয়া বসিয়া বা বিছানায় দেহ-ভার লুটাইয়া থাকিলে পায়ের গড়ন হইবে কুকুরের পায়ের মতো অথবা হাতীর পায়ের মতো! হাতীর গতিভঙ্গী ভালো হইতে পারে, কিন্তু তার পায়ের গড়নের কোনো সুখ্যাতির কথা কোথাও শুনি নাই! নিয়ম করিয়া বেড়ানোর অভ্যাস রাখিলে পায়ের গড়ন কতকটা ভালো রাখা বা ভালো করিয়া তোলা চলে,—কিন্তু সেই সঙ্গে যদি বিশেষ পদ্ধতির কয়েকটি ব্যায়াম-বিধি পালন করেন, তাহা হইলে পায়ের যে শ্রী-ছাঁদ হইবে, সে শ্রীযুক্ত পায়ের পানে মানুষ দু'দণ্ড মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া থাকিবে!

চলিতে পা-ভার বোধ হওয়া—উঠিতে-বসিতে পা পাথর মনে হয়—এ-সবে বুঝিবেন, পায়ের স্বাস্থ্য-হানি ঘটিয়াছে এবং এ-অস্বাস্থ্যের প্রতিকার না করিলে বাতের ব্যথায় পা অচিরে পঙ্গু হইবে এবং সে ব্যথা কোমরে উঠিয়া মানুষকে জড়-পদার্থে পরিণত করিবে, জানিবেন।

পা আমাদের দেহের বাহন। কাজেই পা দু'খানিকে সব সময়ে মজবুত রাখা প্রয়োজন। এবং মজবুত পায়ে যদি মাধুর্য্য না রহিল, তাহা হইলে নারী-জন্ম মিথ্যা হইল!

আমাদের সকলের দেহের মাপ সমান নয়। আকারে কেহ দীর্ঘ, কেহ খর্ব্ব, আবার কাহারো আকার বা মাঝারি-ধরণের। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, যিনি সুন্দরী বলিয়া সার্টিফিকেট প্রত্যাশা করেন, তাঁর দেহ হইবে লম্বে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি; দেহের ওজন হইবে এক মণ বিশ-বাইশ সের; পায়ের ডিমের ঘের হইবে সাড়ে তেরো ইঞ্চি; ডিমের নীচে হইতে পায়ের চেটোর উপর-ভাগ পর্য্যন্ত অংশের ঘের হইবে সাড়ে আট ইঞ্চি।

পাশ্চাত্য প্রদেশে রূপসীদের রূপের প্রতিযোগিতা চলে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সে-প্রতিযোগিতায় কুমারী আমেরিকা বা মার্কিণ-তরুণী কুমারী পাট্রিসিয়া মেরি ডোনেলি ছিলেন মাথায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা; তাঁর দেহের ওজন ছিল এক মণ চৌদ্দ সের, পায়ের ডিমের ঘের তেরো ইঞ্চি এবং ডিমের নীচের দিকবার ঘের সাড়ে আট ইঞ্চি! কুমারী পাট্রিসিয়ার পায়ের গড়ন ছিল অপরূপ।

মেয়েদের মধ্যে কাহারো পায়ের গড়ন আপনা হইতেই সুচারু ছাঁদের হয়। যাঁদের পা দু'খানিকে বিধাতা অযত্নে গড়িয়াছেন, তাঁরা নিজেরা যদি পায়ের যত্ন করেন, তাহা হইলে খোদার উপর খোদ্‌কারি

করিয়া পা দু'খানিকে অনায়াসে সুডৌল সুছাঁদে গড়িয়া তুলিতে পারেন।

যে-সব ঘরে এখন বিলাতী আদর্শে মেয়েদের মধ্যে টেনিশ-ব্যাডমিণ্টন খেলার রেওয়াজ হইয়াছে, সে-খেলায় সে-ঘরের মেয়েদের পায়ের ব্যায়াম সহজে সম্পাদিত হয়; কিন্তু বাঙলা দেশে ক'টা ঘরে মেয়েরা টেনিশ



১। দু'পায়ের গোড়ালি তুলিয়া



২। গোড়ালির উপর ভর দিয়া

ব্যাডমিণ্টন খেলার সুযোগ পান, বলুন? গৃহস্থ গরীব লইয়া বাঙলা দেশ। কাজেই টেনিশ-ব্যাডমিণ্টন খেলার কথা ছাড়িয়া পায়ের বিশেষ ব্যায়াম-বিধির কথা বলি। এ-ব্যায়ামে পায়ের গড়ন সুডৌল, সুছাঁদের হইবে!

ব্যায়াম-বিধির কথা বলিবার পূর্ব্বে একটা সহজ কথা বলিয়া রাখি। মেঝে হইতে জিনিষপত্র কুড়াইবার প্রয়োজন আমাদের নিত্য ঘটে। কুড়াইবার সময় দেহ বাঁকাইতে হয়, নোয়াইতে হয়। বাঁকিয়া নুইবার সময় দু'হাঁটুকে সর্ব্বদা খাড়া রাখিবেন; তাহা হইলে পায়ের নীচের দিককার স্বাস্থ্য যেমন অটুট থাকিবে, তেমনি তার গড়ন হইবে সুছাঁদের। খাটে বিছানা করিবার সময় যদি দু'পায়ের গোড়ালি উঁচু করিয়া শুধু পায়ের আঙুলগুলির উপর ভর দিয়া চলাফেরা করেন, তাহা হইলেও পায়ের গড়ন সুকুমার হইবে। জুতা বড় একটা পায়ে দিবেন না; শুধু-পায়ে যত থাকিতে পারেন, ততই ভালো।

এবার ব্যায়ামের কথা বলি।

প্রথম ব্যায়াম,—দু'হাত সামনে প্রসারিত করিয়া দু'পায়ের গোড়ালি তুলিয়া আঙুলগুলির উপর মাত্র ভর দিয়া (১নং ছবির ভঙ্গীতে) ঘরময় পায়চারি করিয়া

বেড়ান। বেশ দ্রুতভাবে চলিবেন—যেন ছুটিয়া কোথাও যাইতে চান্, এমনি ভঙ্গীতে! এই ভঙ্গীটুকুর সম্বন্ধে কদাচ যেন ঔদাস্য না হয়! এ ব্যায়াম করিবেন ঘড়ি দেখিয়া অন্ততঃ দশ মিনিট।

তার পর দ্বিতীয় পর্ব্বে পায়ের দুই গোড়ালির উপর ভর দিয়া আঙুলগুলিকে মেঝের স্পর্শ বাঁচাইয়া (২নং ছবি দেখুন) দশ মিনিট-কাল এমনি পায়চারি করুন।

তৃতীয় পর্ব্বে ডান্ পা মুড়িয়া (৩নং ছবির ভঙ্গীতে)

চতুর্থ পর্ব্বে দু'পায়ের আঙুলগুলি দিয়া মেঝে স্পর্শ করিয়া দাঁড়ান। দু'পায়ের গোড়ালি রাখুন লুচি বেলিবার একটা বেলুন আনিয়া সেই বেলুনের উপর (৪নং ছবি দেখুন)। দু'হাত থাকিবে ছবির ভঙ্গীতে কোমরের দু'দিকে; অর্থাৎ দু'হাতে দু'দিককার কোমর ধরিবেন। এবার সামনে হেলিবেন। মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত হেলাইতে হইবে; তার পর সিধা-খাড়া দাঁড়ান। তার পর পিছন দিকে দেহ হেলাইবেন। অর্থাৎ দাঁড়াইয়া একবার সামনে



৩। ডান পা মুড়িয়া



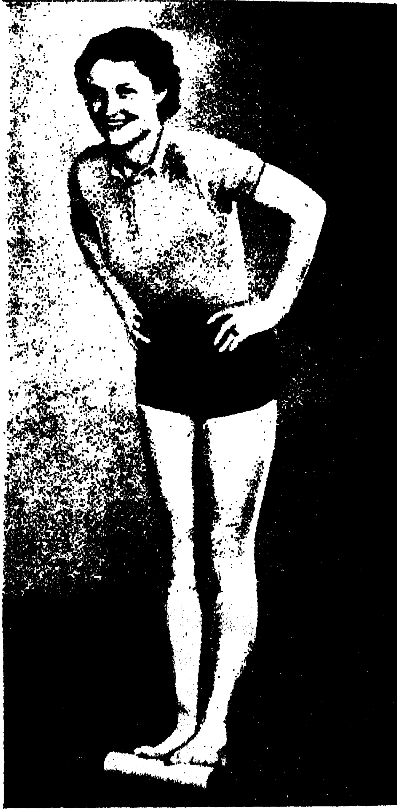
৪। গোড়ালি রাখুন বেলুনের উপর

বাঁ পায়ের আঙুলের উপর মাত্র ভর দিয়া লাফ দিবার ভঙ্গীতে ঘরময় জোরে-জোরে পায়চারি করুন। ছেলেবেলায় যেমন জল-ডিঙ্গাডিঙ্গি খেলা খেলিয়াছেন, তেমনি ভাবে। তার পর বাঁ পা মুড়িয়া ডান পায়ের আঙুলে ভর দিয়া পূর্ব্ব-বিধির পুনরাবর্ত্তন! যতক্ষণ না ক্লান্তি বোধ করেন, ততক্ষণ এ-ব্যায়ামে বিরতি দিবেন না।

হেলা, তার পর সিধা-খাড়া দাঁড়ানো, তার পর পিছন দিকে দেহ হেলানো! এ-ব্যায়াম করিতে হইবে অন্ততঃ-পক্ষে পাঁচ মিনিটকাল।

এর পর পঞ্চম পর্ব্ব! এবার বেলুনের উপর রাখুন দু'-পায়ের আঙুলগুলি; গোড়ালি থাকিবে মেঝে স্পর্শ করিয়া; এই ভাবে চতুর্থ পর্ব্বের মতো আবার সামনে ঝুঁকিবেন;

তার পর সিধা খাড়া দাঁড়াইবেন ; এবং পরক্ষণে পিছনে দেহ হেলান (৫নং ছবি)। এ ব্যায়ামও পাঁচ মিনিটকাল



৫। বেলুনের উপর দু'পায়ের আঙুল

করিতে হইবে। এ ব্যায়ামের সময়েও দু'হাত দিয়া কোমরের দু'দিক (ডান ও বাঁ) ধরিবেন।

এইবার ষষ্ঠ বা শেষ পর্ব্ব। ৬নং ছবি দেখুন। ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া দিন; তার পর দুই পায়ের আঙুলগুলি তুলিয়া শুধু দুই গোড়ালিতে ভর দিয়া, কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত সামনের দিকে ঝুঁকিয়া ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়ান দশ মিনিট।

এ কয়েকটি ব্যায়ামে বিলক্ষণ কৌতুক বোধ করিবেন। অভ্যাস হইলে ব্যায়ামের সময়টুকু বাড়াইয়া দিতে পারেন।

এ ক'টি ব্যায়ামে পা দু'খানি গড়নে এবং শক্তিসামর্থ্যে যেমন অপরূপ হইবে, দেহের বাঁধনও তেমনি স্বচ্ছন্দে ভরিয়া কমনীয় হইয়া উঠিবে। এবং বরাবর



৬। মাথা ঝুঁকিয়া

অভ্যাস রাখিলে এ ব্যায়ামে তারুণ্যের শ্রী, মাধুরী এবং লাবণ্য হারাইবার ভয় কোনো দিন থাকিবে না !

ছেলেমেয়ে মানুষ করা

বাড়ীর জোর যেমন তার বনিয়াদে, মানুষের ছোট-বড় হওয়াও তেমনি নির্ভর করে তার শৈশবের লালন-রীতিতে। এই লালন-রীতি হলো মানুষ-করার বনিয়াদ। ছেলে-মেয়ে দুরন্ত হয়ে যদি দৌরাত্ম্য করে, তাহলে সে দুরন্তপনা বা দৌরাত্ম্য বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সারবার আশা থাকে ; কিন্তু মিথ্যা কথা বলা, চুরি করে খাবার খাওয়া, বা মা-বাপের বাক্স থেকে নিঃশব্দে পয়সা সরানো অথবা

স্বার্থপরতা—এ দোষগুলি অঙ্কুরে যদি বিনষ্ট করা না হয়, তাহলে সে-ছেলের পক্ষে বয়স-কালে মানুষের মতো মানুষ হবার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না !

ছেলেদের মনে প্রথম যে-দোষটি অঙ্কুরে দেখা দেয়, সেটি মিথ্যাচার বা মিথ্যা কথা বলা। ছেলেমেয়ে মিথ্যা কথা বলছে—তা সে যত তুচ্ছ বা যত অকারণ মিথ্যাই হোক—দেখবামাত্র তার এ-দোষ শুধরে দিতে হবে। আদর সোহাগভরে এ মিথ্যা কথাকে 'অমৃতং বাল-ভাষিতং' বলে কদাচ উপেক্ষা করবেন না।

তা বলে মিথ্যা কথা বলার দরুণ ছেলেমেয়েকে তীব্র রকম শাসন-পীড়নও করবেন না। শাসনে-পীড়নে দোষ সারে না ; ছাই-চাপা আগুনের মতো সে-দোষ মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে ; ধূমায়িত থাকে ; এবং সুবিধা পেলে সে-দোষ আগুনের মতো সতেজে আবার এক-দিন আত্মপ্রকাশ করে।

ছেলেমেয়ে মিথ্যা কথা বলছে বোঝবামাত্র, কেন সে মিথ্যা বলছে, সব-আগে তার কারণ নির্ণয় করবেন। দোষ করে শাসনের ভয়ে ছেলেমেয়ে সব-প্রথম মিথ্যা বলা সুরু করে। এজন্য ছেলেমেয়ের শাসন যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। দোষ করলে ভালো কথায় যুক্তি দিয়ে সে দোষ বুঝিয়ে তার পরিণাম-সম্বন্ধে বিভীষিকা জাগাবেন, তবেই দোষ সারবে। ছেলে-মেয়েরা স্বভাবতঃ কথা শোনে, মা-বাপের বাধ্য থেকে তাঁদের আদরটুকু পুরোপুরি ভোগ করতে চায়। মিথ্যা কথা বললে মা-বাপ ভালো বাসবেন না, এ উপলব্ধি যদি জাগাতে পারেন, তাহলে ছেলেমেয়ে কখনো মিথ্যা কথা বলতে শিখবে না।

সঙ্গদোষে ছেলেমেয়েরা মিথ্যা কথা বলতে শেখে। 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।' এজন্য ছোট বয়সে তাদের সংসর্গ সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার থাকবেন।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, অস্বাস্থ্যহেতু মন দুর্ব্বল হয়, ভীরু হয় ; এবং দুর্ব্বল ভীরু মন স্বভাবতঃ মিথ্যা এবং অন্য দোষকে আশ্রয় করে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। সুতরাং ছেলে মেয়ের মানসিক স্বাস্থ্য যাতে ভালো হয়, সে-দিকে লক্ষ্য রাখবেন। ছেলেমেয়ের সঙ্গে দরদ-মমতাভরে মেলা-মেশা করতে হবে ; বন্ধুর মতো তাদের সঙ্গে মিশতে হবে। তাদের সহস্র প্রশ্নে চটলে চলবে না। তাদের সে সব প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিতে হবে! জুজু বা রাক্ষস খোক্কশের ভয় দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের কুতূহলী চিত্তকে কদাচ অবরুদ্ধ করবেন না। ছেলে-মেয়েরা যদি মা-বাপের কাছে মনের সব কথা অকপটে প্রকাশ করবার সুযোগ না পায়, মা-বাপকে যদি ভয়ের বস্তু বলে জানে, তাহলে সে ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ সাহেব মাষ্টার বা শাস্ত্রী-পণ্ডিত রেখেও গড়ে তুলতে পারবেন না !

মিথ্যা কথা বলবার পক্ষে ছেলেদের প্রথম প্ররোচনার কারণ—বহু পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞের মতে,—তাদের মানসিক অস্বাস্থ্য ! অর্থাৎ এই অসুস্থ মন বাস্তবকে সর্ব্বদা ভয় করে। এ ভয়ের জন্য সত্য তাদের মনে মিথ্যা-কল্পনার ভরে আত্মপ্রকাশ করে। চেষ্টা করে বা কশরৎ করে যে তারা মিথ্যা বলে, তা নয়। কাল্পনিক আতঙ্কে সত্য তাদের মনে মিথ্যার রূপ ধরে ; তারি জন্য অকারণ মিথ্যা বলা বা অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জিত বর্ণনায় তারা ওস্তাদ হয়ে ওঠে ! সময়ে এ ত্রুটি সারিয়ে দিতে না পারলে কালে এ-সব ছেলেমেয়ে দারুণ মিথ্যাবাদী এবং সমাজে হাস্যাস্পদ হবে।

মা-বাপের প্রধান কর্ত্তব্য, ছেলেমেয়ের মনে কোনো-রকমে ভয়ের উৎপত্তি না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। মনকে ভয়াতুর করে রাখলে সারা জীবন বিষময় হবে। কেন না, এর পর সারা জীবন ধরে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে প্রতিপদে সংগ্রাম করতে হবে, তখন ভয়াতুরতার জন্য তার আর সে সংগ্রামে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাধ্য থাকবে না এবং জীবন হবে ব্যর্থ।

ছেলের মনে ভয়ের সঞ্চার করাতে চান, বেশ, ছেলে ভয় করুক পথের চলন্ত মোটর গাড়ীকে, ভয় করুক আগুনকে, অপরিচিত লোকের সংসর্গকে। ভূতের ভয়, চোরের ভয়, মৃত্যুকে ভয়,—এ-সব ভয় ছেলেমেয়েদের কখনো দেখাবেন না। অনেকের অভ্যাস আছে, শাসন-ছলে ছেলেমেয়েকে বলে, —দুষ্টুমি করোনা খুকু, তাহলে তোমার মা মরে যাবে, কাকে তখন মা বলে ডাকবে ? ইত্যাদি। এ-সব ভয় দেখানোর ফলে ছেলে-মেয়েদের মনে অস্বাস্থ্যের সঞ্চার হয় এবং সে অস্বাস্থ্যের

ফলে তারা সঠিক ভাবে মনকে গড়তে বা নিজেরা মানুষ হতে পারে না!

ভূমিকম্পে বা ঝড়ে নৌকোয় চড়ে ভয় পায় না, এমন ছেলেমেয়ে আছে! এ-সব ছেলেমেয়েকে 'ডানপিটে' 'দস্যি' বলে' তাচ্ছল্য করবেন না! এদের এই কঠিন সুদৃঢ় মন, জানবেন, কামনার বস্তু!

বিদেশী প্রবাদ—spare the rod and spoil the child বা চাণক্যের বাক্য 'দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ'—এ সব কথা কদাচ শিরোধার্য্য করবেন না! শাসনের ভয়ে যত ছেলে বিগড়েছে, আদরে তত বেগড়ায়নি, মানব-জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে এর বহু প্রমাণ পাবেন।

ছেলেমেয়ে যা চাইবে, তাকে তাই দিতে হবে, এমন কথা মানা চলে না। জীবনে মানুষ অনেক-কিছু চায় এবং যা চায় তার সিকির-সিকিও সে পায় না। জীবনে অনেক নৈরাশ্য সইতে হবে, অনেক ক্ষোভ,—কাজেই ছোট-বয়স থেকে জিনিষ চেয়ে তা না পেয়ে ছেলেমেয়েদের নিরাশ হতে দিন। এ নৈরাশ্যে তার শিক্ষার বনিয়াদ পাকা হবে, মজবুত হবে।

সব বিষয়েই ছেলেদের মনে কৌতূহল উগ্র এবং অপরিসীম। এটা খুব স্বাভাবিক। কারণ, এই কৌতূহল চরিতার্থ করতে-করতে তার শিক্ষা হয় সম্পূর্ণ, সে হয় মানুষ! যে-মনে কৌতূহল অত্যধিক, সব কিছু পাবার জন্য সে মনে বাসনাও তেমনি তীব্র। মানুষের বাসনা-কামনাকে চেপে পিষে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়, এবং সে-প্রয়াস সমীচীন হবে না! কিন্তু এই বাসনা-কামনা যাতে সে সংযত করতে পারে, যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া চলে না, পাওয়া যায় না—এটুকু তাকে ছোট বয়স থেকেই শিক্ষা দিতে হবে। না দিলে সে যদি কাঁদে, কাঁদুক! কেঁদে কোনো ছেলে মারা যায়নি, যাবে না! তার কান্নায় মা-বাপের বিরক্তি হতে পারে। সে বিরক্তি থেকে মুক্তির আশায় ছেলেমেয়ের সব বাসনা যদি চরিতার্থ করেন, তাহলে মা-বাপ হয়তো বিরক্তির দায় থেকে মুক্তি পাবেন! নিজের স্বার্থের জন্য তা করতে গেলে কিন্তু ছেলেমেয়ের মাথা খাওয়া হবে।

যে-ছেলে লাজুক বা মুখচোরা—জানবেন, সে ছেলের মন সুস্থ নয়। লাজুকতার আবরণ ভেঙ্গে তাকে সপ্রতিভ করে তুলতে হবে। না হলে জীবনে সে সবার পিছনে থেকে যাবে, কোনো দিন উন্নতি করতে পারবে না।

রাগী বদমেজাজ মনের অস্বাস্থ্যের লক্ষণ! মানুষের মেজাজ খারাপ হয়, কখন? অপরের চেয়ে নিজেকে ছোট জেনে মনে যখন তার নিষ্ফল আক্রোশ জাগে,—সেই আক্রোশ-বশে কিম্বা ভয়ে-নৈরাশ্যে নিজেকে নিরুপায় ভেবে ছোট-বড় সকল বয়সের মানুষের উপর সে রাগ করে; তীব্র তীক্ষ্ণ মেজাজে নিজের নৈরাশ্য অক্ষমতা নিরুপায়তা জাহির করে—কোনো মতে নিজেকে খাড়া রাখবার চেষ্টায়! যে-লোক নিজেকে নিরুপায় বা অপরের চেয়ে ছোট ভাবে না, রাগে সে কখনো গর্জ্জন তোলে না বা বদমেজাজ নিয়ে হাট বসায় না! সুতরাং যে-ছেলের মেজাজ একটুতে চোটে ওঠে, তার মনের চিকিৎসা প্রয়োজন বুঝে তার পীড়িত মনের যথারীতি পরিচর্য্যা করবেন।

ছেলেদের কুণো-স্বভাব সব-চেয়ে খারাপ। যে ছেলে কারো সঙ্গে মিশতে চায় না, একা-একা সরে-সরে থাকতে চায়, জানবেন, সে বাস্তব পৃথিবীকে ভয় পায়; পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে সে খাপ খাওয়াতে পারছে না! নিরালা কোণে বসে সে মনে-মনে স্বতন্ত্র জগৎ গড়ছে! এই মিথ্যা-জগতের মায়া তার মনে চেপে বসলে বড় হলে এই কঠিন সংসারে তার দুঃখ-দুর্গতি অনন্ত হবে, এটুকু মনে করে, ছেলেমেয়েরা যাতে কুণো-স্বভাব ছেড়ে মিশুক হয়, সে-দিকে মনোযোগ দেবেন।



ছোটদের আসর

নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা

(রূপকথা)

ছয়

আগেকার কথাগুলো তোমাদের মনে আছে ত? সেই যে রাজকন্যা নীলার মিছিল খুব ঘটা ক'রে রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। তার সোনার চতুর্দ্দোলায় সে বসেছিল। আর, তার ঠিক পেছনে চলেছিল সুসজ্জিত হাতী, তার সিংহলী বঁধু নীলাচল সেই হাতীর পিঠে মণিমুক্তা-খচিত হাওদার ভেতরে সদর্পে ব'সে দুলতে দুলতে চলেছিল। তোমরা আগেই শুনেছ, প্রজারা এই নিষ্ঠুর লোকটিকে মোটেই পছন্দ করে না—বিয়ে করে নীলাচল তাদের রাজা হবে, প্রজাদের সকলেরই তাতে ঘোর আপত্তি। তাই রাজকন্যা নীলা আর নীলাচল দু'জনে পরামর্শ ক'রে অবাধ্য প্রজাদের শায়েস্তা করবার ব্যবস্থা করেছিল।

যা'হোক, মিছিল রাজবাড়ীর চার পাশ ঘুরে, এ-রাস্তা-সে-রাস্তা পার হ'য়ে, নগরবাসীদের মহল্লার বড় রাস্তায় এসে প'ড়লো। কিন্তু তোমাদের বোধ হয় মনে আছে, রাস্তাগুলির আগাগোড়া সবই যেন ঘুমন্ত,—কোন দিকে জনপ্রাণীরও সমাগম নেই! তবে যারা রাজ-সরকারের তাঁবেদার—সরকারী সেরেস্তায় চাকরী-বাকরী করে, কেবল তাদেরই দু'চার জন মিছিল দেখতে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল। রাজকন্যাকে লক্ষ্য ক'রে তাদেরই গলা থেকে যে ক্ষীণ জয়ধ্বনি উঠছিল, এত-বড় মিছিলের সঙ্গে তা মোটেই যেন খাপ খাচ্ছিল না। প্রজাদের একটি প্রাণীও মিছিল দেখতে রাস্তায় আসেনি। রাস্তার দু'ধারের দোকানপাটগুলোর দরজাও বন্ধ; এমন কি, রাস্তার দু'পাশের বাড়ীগুলোর বারান্দায় বা কোন ছাদের ওপরেও জনপ্রাণীকে দেখতে পাওয়া গেল না। এতে রাজকন্যা নীলা রাগে-দুঃখে মনে-মনে গজরাতে লাগলো। তখন তার বিদেশী বঁধু নীলাচল তাকে পরামর্শ দিলে—যারা বাড়ীর দরজা বন্ধ ক'রে ভেতরে বসে আছে, চুপি-চুপি তাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দাও; তা'হলেই—ঘর ছেড়ে সকলকে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হবে। তাতে আমাদেরই জিদ বজায় থাকবে।—রাজকন্যা নীলা খুসী হ'য়ে বল্‌লে,—ঠিক কথা; এ খুব ভাল পরামর্শ। তখন নীলাচল তার তাঁবেদার এক জন সরদারকে দিয়ে চৌমাথার দু'খানা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় ঘর দু'খানা দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো; সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর লোকজন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলেই পিল্‌-পিল্‌ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো। সবারই মুখে এক কথা—"আগুন!—আগুন!" এ সকল কথা তোমরা আগেই শুনেছ; নতুন বছরে তবু তোমাদের তা মনে করিয়ে দিলাম।

ঘরে-ঘরে আগুন জ্বলে উঠেছে দেখে নীলা আর তার বঁধু নীলাচলের কি আনন্দ! ঠিক সেই সময় এক তরুণ সাধু ভীড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন—রাজকন্যার সেই চতুর্দ্দোলার সামনে। তাঁর সেই তেজঃ-পূর্ণ আগুনের মতো প্রদীপ্ত মুখের ওপর চোখ প'ড়তেই রাজকন্যা নীলার হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল; সে অপলক দৃষ্টিতে তাঁর সেই মহিমামণ্ডিত মুখের দিকে চেয়ে রইল। উদ্যত-ফণা ভীষণ বিষধর সর্প মন্ত্রমুগ্ধ হ'লে তার যে অবস্থা হয়, রাজকন্যারও তখন ঠিক সেই অবস্থা!

আশ্চর্য্য! তরুণ সাধু সেখানে এসে দাঁড়াতেই বন্যার জলস্রোতের মতো মহাবেগে আর এক দল লোক এক নিমেষে—যেন মাটী-ফুঁড়ে বেরিয়ে-এসে সেই জ্বলন্ত অগ্নিরাশির ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়লো। এতক্ষণ আগুনের

ভয়ে যারা প্রাণপণ চীৎকার ক'রে পথের এদিকে-ওদিকে বৃথা ছুটোছুটি ক'রছিল, সেই সকল ব্যস্তবাগীশকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে এই লোকগুলি কোঁচড় থেকে মেটে রঙের কি এক রকম গুঁড়ো বের ক'রে—তাই ছড়াতে ছড়াতে সেই জ্বলন্ত অগ্নিরাশির দিকে এগিয়ে চ'ললো। আগুনের শত শত লালবর্ণ লোলজিহ্বা আকাশে নৃত্য ক'রছে, কিন্তু সেই গগনস্পর্শী অনল তাদের প্রচণ্ড দাপটে দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিস্তেজ হ'য়ে উঠলো! তাদের কোঁচড়ের সেই মেটে রঙের গুঁড়োগুলোর এমনি অসাধারণ শক্তি যে, জ্বলন্ত আগুনের ওপর সেগুলা পড়তেই আগুন যেন জল হ'য়ে গেল; কিন্তু আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হ'লেও সেই লোকগুলির গায়ে আগুনের একটুও আঁচ লাগলো না! লোকগুলির চেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গে আগুনের শিখা সবই নিবে গেল।

ওদিকে যে-সব লোক বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে আতঙ্কে ছুটোছুটি ক'রছিল, সাধুকে দেখেই তারা চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো—'আর ভয় নেই, আমাদের রক্ষা ক'রতে ঐ দেখ দেবতা এসেছেন।' এই সাধুই নীলাচলের নিষ্ঠুর আদেশে নিপীড়িত মৃতকল্প ছেলে তিনটিকে যেন মন্ত্রবলে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন: এদের অনেকেই সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। সাধুর দেবোপম মূর্ত্তি পটে-আঁকা ছবির মতই তাদের মনে অঙ্কিত হ'য়ে গিয়েছিল। সাধুকে এই দারুণ সঙ্কটে দেখতে পাওয়ায় তারা বুঝতে পারলে—তিনি তাদের রক্ষা ক'রতেই হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হ'য়েছেন। এর পর যে লোকগুলি দেবদূতের মতো এসে যেন তুড়ি দিয়ে আগুন নিবিয়েছিল, তারাই আগুনে যারা কিঞ্চিৎ ঝল্‌সে বা পুড়ে গিয়েছিল, তাদের সকল যন্ত্রণা নিবারণ করলে—তারাও যে এই দয়াময় সাধু মহাত্মার সঙ্গে এসেছে, তা কারুরই বুঝতে আর বাকি রইল না। সকলেই তখন একসঙ্গে উৎসাহ-ভরে জয়ধ্বনি করলে,—'জয় জয়, করুণাময় সাধুজীর জয়!' রাগে, ক্ষোভে নীলাচলের মুখ পাকা করমচার মতো লাল হ'য়ে উঠলো; আর রাজকন্যা নীলার বিস্ফারিত চক্ষুর কালো কালো তারা আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলে উঠ্‌লো। ছেলে তিনটি বেঁচে উঠলে এই সাধুটির অদ্ভুত 'বুজরুকি'র কথা ওরা দু'জনেই যথাসময়ে শুনেছিল। সুতরাং সাধুর ওপর একটা দুরন্ত বিদ্বেষ নীলা আর নীলাচলের মনের ভেতর তুষের আগুনের মতো ধ্বক্‌-ধ্বক্‌ ক'রে জ্বলছিল। এই শোভা-যাত্রাতেও সেই সাধুই সহসা আবির্ভূত হ'য়ে—যেন বাতাসের ভেতর থেকে রাজকন্যার চতুর্দ্দোলার সামনে এসে তার গতিরোধ ক'রলেন, আর তাঁর সাথীরা কলের পুতুলের মতোই নিঃশব্দে জ্বলন্ত বাড়ীর আগুন নিবিয়ে দিলে, যারা আগুনে পুড়েছে—তাদের পরিচর্য্যা ক'রলে। কে এই রাজদ্রোহী বেয়াদপ ভণ্ড সাধু?

কিন্তু সাধুকে লক্ষ্য ক'রে রাজকন্যা নীলার মুখ থেকে এই প্রশ্ন বের হবার আগেই সাধু সুস্পষ্ট স্বরে কৈফিয়ৎ চাইলেন,—এই যে দুর্ঘটনা ঘটলো,—দিনের বেলায় সবারই চোখের সামনে দু'টো বাড়ীতে আগুন লাগলো, রাজকন্যা, কে এর জন্যে দায়ী? হাঁ, তুমি, বলো রাজকন্যা—কে দোষী? আর তার অপরাধের বিচারেরই বা কি ব্যবস্থা হবে?

সাধুর কথাগুলো নীলার আরক্ত মুখখানার ওপর যেন চাবুকের মতন প'ড়ে কাল দাগ ফুটিয়ে তুললো! তার মুখ দিয়ে কোন উত্তর বেরুলো না; একটু গুম্‌ হ'য়ে থেকে, সে মুখ তুলে নীলাচলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলো।

নীলাচলের দেহ-মন রাগে গর-গর ক'রছিল; মুখখানা বেঁকিয়ে সে রুক্ষস্বরে সাধুকে ব'লে উঠলো—দায়ী তুমি, আর তোমার দলের ঐ গুণ্ডাগুলো। আমাদের রাজ্যের ঐ নির্ব্বোধ লোকগুলো তোমার বুজরুকি দেখে যতই বাহোবা দিক, তোমার বিদ্যে আমি ধ'রে ফেলেছি—

এই ধরণের আরো দু'-চারটে অপ্রিয় কথা সাধুকে শোনাবার তার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সাধু এইখানেই তার কথায় বাধা দিয়ে ব'ললেন,—কথা আমার রাজকন্যার—অর্থাৎ ভবিষ্যৎ রাণীর সঙ্গে; আমি তাঁকেই প্রশ্ন ক'রেছি। ওপরপড়া হ'য়ে তুমি কেন কথা ব'লছ, হে বাপু! আমি ত তোমাকে কোন প্রশ্ন ক'রিনি!

রাজকন্যাই এবার মুখখানা শক্ত ক'রে সাধুর কথার উত্তর দিলে। বললে—রাণীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিখিরীর প্রশ্ন শোনেন না, তার জবাবও করেন না। তোমার বুজরুকি উনি ধরে ফেলেছেন, নিজের জালেই তুমি

জড়িয়ে পড়েছ ; এর শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে ;—সে কথা আমাকে আগেই বলতে হলো।

সাধুর মুখের ওপর দিয়ে যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল! চোখের বড় বড় স্বচ্ছ তারা দুটোর ভেতর দিয়ে তার আভা যেন ফুটে বেরুল। তারই আলোয় এই তরুণীর সমস্ত অন্তর যেন সাধুর চোখে ধরা পড়ে গেল। তিনি প্রসন্নমুখেই আবার প্রশ্ন করলেন—মনের অগোচর পাপ নেই। পরের কথা শুনে তুমি মুখে যা বল্‌লে, তোমার মন কি সেটা মেনে নিচ্ছে? রাজ্যের রাজমুকুট তোমার মাথায়, তার আভায় তোমার মনের প্রত্যেক রেখা আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করছি। তুমি জানো—কে দোষী, এই কুকর্ম্মের জন্য কার শাস্তি পাওয়া উচিত?

রাজকন্যার আরক্ত ও উদ্ধত মুখখানা এক মুহূর্ত্তে যেন চূণের মত সাদা হ'য়ে গেল! তার মুখের ওপর এমন শক্ত প্রশ্ন এর আগে বুঝি কেউ কখন করেনি ; কিন্তু এই প্রশ্নের কি উত্তর সে দিতে পারে? সাধু ব'লেছেন, 'মনের অগোচর পাপ নেই?' তবে সে পাপ কোথায়? অত্যাচার কে ক'রেছে, আর তার জন্যে দায়ীই বা কারা—তা কি রাজকন্যার অজ্ঞাত?

এই সঙ্কটে তার বঁধুই আবার তাকে বাঁচিয়ে দিলে। নীলাচল চোখ-দুটো পাকিয়ে এঁদের পানে তাকিয়েছিল। তার চক্ষুতে যেন নরকানল জ্বলে উঠেছিল। সাধুর কথায় রাজকন্যা ভড়কে গেছে, মুখ দিয়ে তার মিথ্যা কথা বেরুচ্ছে না দেখে নীলাচল তাড়াতাড়ি জোর-গলায় বলে উঠলো—দায়ী তুমি,—আর তোমার দলের ঐ লোকগুলো।

কথাগুলো শুনে সাধুর চেলারা তার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগলেন। নীলাচল তাই দেখে চীৎকার ক'রে বলে উঠলো—এখুনি এদের সকলকে বাঁধো ; বাঁধো, জলদী! কোনও বদমাস না যেন পালাতে পারে। এরা সব আসামী—সবাই দোষী। হাতীর পিঠে ব'সে থেকেই আমি দেখেছি—এরাই এসে ঘর-দু'খানায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। হাঁ, ঠিক এরাই!

নীলাচলের মুখের হুকুম বেরুতে না বেরুতেই সরদার তার অনুগত রক্ষিদলসহ সাধু ও তাঁর চেলাগুলিকে ঘিরে-ফেলে হাতিয়ার বাগিয়ে ধরলো। এই ব্যাপারে সমস্ত মিছিলটাতেই চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। মিছিলের সঙ্গে যে সব রাজপুরুষ ছিলেন—তাঁরাও তাড়াতাড়ি রাজকন্যার চতুর্দ্দোলার পাশে এসে দাঁড়ালেন। মিছিলের রক্ষিসৈন্যদলের সেনাপতি সেনাদলকে প্রস্তুত থাকবার জন্য ভেরীধ্বনি ক'রলেন।

মিছিলের পরিচালক—প্রধান মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মার অনুগত মন্ত্রী ইন্দ্রদমন, সেনাপতি সাধুগুপ্ত, ব্যবস্থাপক ভানুদেব প্রভৃতি মাতব্বরের দল নিজেদের রথ থেকে নেমে ভীড় ঠেলে রাজকন্যার চতুর্দ্দোলার কাছে এসে ব্যস্ত হ'য়ে জানতে চাইলেন—কি হ'য়েছে, ব্যাপার কি?

সাধুই হাসিমুখে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন ; কিঞ্চিৎ শ্লেষের সঙ্গে ব'ললেন—'মশায়রা সব এতক্ষণ ছিলেন কোথায়? চেহারা আর পোষাক দেখে মনে হচ্ছে—আপনারা এ রাজ্যের অলঙ্কার। দু'খানা বাড়ীতে আগুন লাগলো, লোকেরা ভয়ে চীৎকার ক'রে ছুটোছুটি ক'রতে লাগ্‌লো—কিছুই কি দেখেননি?—শোনেনওনি? মিছিলশুদ্ধ লোকগুলো তো ঠুঁঠো-জগন্নাথ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কাছেই আমার আশ্রম ;—আগুন দেখে চুপ-ক'রে থাকতে পারিনি, সঙ্গীদের নিয়ে ছুটে আস্‌তে হ'ল আগুন নেবাতে। রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—এই অগ্নিকাণ্ডের জন্যে দায়ী কে? কিন্তু হাতীর পিঠে ব'সে ঐ সিংহলী বীরপুঙ্গব আমাকেই এজন্য দায়ী ক'রেছেন ; যেহেতু—আমার লোকজন ঘর-দু'খানাকে আগুনের মুখ-থেকে বাঁচিয়েছে, আগুন নিবিয়ে দিয়েছে। এই হচ্ছে ব্যাপার! ওঁর রক্ষীরা আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে ; আমরা অপরাধী, সুতরাং বন্দী। এখন আপনারা অপরাধের বিচার করতে পারবেন কি?

মন্ত্রী ইন্দ্রদমন সাধুর কৈফিয়ৎ শুনতে-শুনতে রাজকন্যা ও তার সিংহলী বঁধুর মুখের দিকে ঘন-ঘন তাকিয়ে তাদের মনের ভাব বুঝবার চেষ্টা ক'রছিলেন। এই বুদ্ধিমান মন্ত্রীটির পক্ষে তাদের অভিসন্ধিটুকু বুঝতে বিলম্ব হ'ল না। তাই মাথাটি নেড়ে বিজ্ঞের মতই তিনি রায় দিলেন—বিচার ক'রবেন রাণী ; আমরা তাঁর সচিব, সুপরামর্শই দেব। আর মাননীয় নীলাচল শর্ম্মা যখন অপরাধী ব'লে তোমাদিগকেই সন্দেহ করেছেন, সে তো

নিশ্চয়ই অকারণ নয়। ওঁর বুদ্ধি যেমন ধারালো, দৃষ্টিও তেমনি তীক্ষ্ণ। অন্যায় সন্দেহ উনি কখন করেন না।

মন্ত্রীর কথায় নীলাচলের মুখখানা উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হাওদার আসনে সোজা হ'য়ে ব'সে সে এবার উদ্ধত স্বরে বলে উঠলো—সন্দেহ নয়, সত্য। হাতীর এই হাওদায় বসে আমি লক্ষ্য ক'রেছি—কি একটা নূতন রকমের দাহ্য বস্তুর সাহায্যে ওরা চোখের পলকে বাড়ী-দু'খানা জ্বালিয়ে দিলে! তার পর খানিক হৈ-হৈ করে ছুটে বেড়িয়ে, আর একটা আশ্চর্য্য বস্তু ছড়িয়ে আগুন নিবিয়ে দিলে। আসলে সব ভুয়ো, একটা বুজরুকি! বোকা লোকগুলোকে হাত করবার ফন্দী। সেই জন্যেই এদের বন্দী করবার হুকুম দেওয়া হ'য়েছে।

রাস্তার ওপরে যে সব নিরপেক্ষ প্রজা দাঁড়িয়েছিল, তারা সিংহলবাসী এই সত্যবাদী মহাপুরুষটির উক্তি শুনে আর ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে পারলো না; তারা তীব্র স্বরে প্রতিবাদ ক'রলে—সবই মিথ্যে কথা, এ কথা সত্য হ'তেই পারে না; এঁরা না এলে ঘর-দু'খানা এতক্ষণে পুড়ে ছাই হ'য়ে যেত,—পাশের বাড়ীগুলোতেও আগুন লাগতো ইত্যাদি।

সেনাপতি সাধুগুপ্ত তাঁর দীর্ঘ দেহটা উঁচু ক'রে, খাপ থেকে লম্বা তলোয়ারখানা খুলে মাথার ওপর এক-পাক ঘুরিয়ে হুমকী দিলেন—চুপ রও! ফের একটি কথা কেউ বললেই, রাজ-সরকারের সিপাই তার মুখ গুঁতিয়ে বন্ধ ক'রে দেবে।

ব্যবস্থাপক ভানুদেব তাঁর মোটা গোঁফ-জোড়াটা বিড়ালের ল্যাজের মতন ফুলিয়ে তুলে ব্যবস্থা দিলেন—বেশ বোঝা যাচ্ছে, এর ভেতরে একটা জটিল রহস্য আছে! এই সরদার সাধুর আর ওর চেলাদের চেহারা ও মুখচোখের ভাবভঙ্গীতেই প্রকাশ পাচ্ছে, এরা দুঃসাহসী বিপ্লবী-দল। এই রাজ্যে সংপ্রতি যে অশান্তির ধূমা উঠেছে, এরাই তার সৃষ্টিকর্ত্তা। নীলাচল বাবাজীর দৃষ্টি ভারি তীক্ষ্ণ—তাই এদের চালবাজী শীঘ্রই ধরা প'ড়ে গেছে। এখন আমার মনে হয়, এই দলটিকে পিছমোড়া করে বেঁধে মহামন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত; তিনি এদের শাস্তি সম্বন্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন। এ বিষয়ে কি কারও কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

নীলাচল খুসী হ'য়ে বলে উঠলো—চমৎকার ব্যবস্থাপক! খাসা ব্যবস্থা দিয়েছেন উনি।

কিন্তু রাজকন্যা মুখখানা ভার ক'রে শেষে রায় দিলে—না; এরাই যখন যত নষ্টের গোড়া, তখন এখানে দাদুর কাছে এদের রেখে গেলে আবার একটা অনিষ্টের সৃষ্টি ক'রে নূতন কিছু বেগ দেবে। তার চেয়ে এরা নজরবন্দী হ'য়ে আমাদের মিছিলের সঙ্গেই চলুক। তাতে মিছিলের শোভাও বাড়বে, আর এরাও চোখের ওপর থাকবে।

তিন মাতব্বরই রাজকন্যার যুক্তিতে বাহোবা দিয়ে ব'ললেন—বাঃ, চমৎকার! একেই বলে রাজবুদ্ধি!

রাজকন্যার এই যুক্তি কিন্তু নীলাচলের মনে ধ'রল না; তবে তিন মাতব্বরই একসঙ্গে যুক্তিটা মেনে নিলেন দেখে সে মুখে প্রতিবাদ ক'রতেও সাহস ক'রলে না;—মুখখানা ভার ক'রে গুম হ'য়ে ব'সে রইল।

রাজকন্যা তার ধনুকের মতন বাঁকানো ভুরু-জোড়াটা নাচিয়ে ঠোঁঠের কোণে চাপা হাসির ঈষৎ রেখা টেনে সাধুর দিকে চেয়ে ব'ললে—আমার কথা তো শুনলে, আসামী, তোমার কিছু বলবার আছে?

সাধু মুখখানা শক্ত ক'রে উত্তর দিলেন—না।

রাজকন্যা তখন সেনাপতি সাধুগুপ্তের পানে চেয়ে বললো—আমার চতুর্দ্দোলার আগে-আগে এরা যাবে। এদের বাঁধবার দরকার নেই; আপনার বাহিনীর বাছা-বাছা বারো জন সিপাই এদের পাহারায় থাক।

সেনাপতি ভেরী বাজিয়ে তখনি তাঁর সহকারীকে ডাকলেন।

সাধুর সঙ্গীরা সংখ্যায় ছিল এগারো জন। সাধুকে নিয়ে তাদের সংখ্যা হ'ল বারো। রাজকন্যার হুকুম শুনে, আর সেনাপতিকে ভেরী বাজিয়ে সিপাইদের ডাকতে দেখে, এগারো জন তরুণ সন্ন্যাসীই এক সঙ্গে তাদের দলপতির দিকে নীরবে শুধু চোখ মেলে তাকালে। তাদের সেই দৃষ্টির অর্থ বোধ হয় সাধুই বুঝলেন; তিনি পরক্ষণেই তাদের পানে পাল্টা চেয়ে, চোখের কোণে কি-যেন একটা ইঙ্গিতে ক'রলেন। তার ফলে সেই এগার জন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী পুতুলের মতন নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রাজকন্যার হুকুম মেনে নিলে।

একটু পরেই আগেকার রক্ষীরা তাদের জায়গায়

ফিরে গেলে, আর বারো জন দীর্ঘকায় অস্ত্রধারী সৈনিক সাধু ও তাঁর সাঙ্গীদের ঘিরে দাঁড়ালো।

সঙ্গে-সঙ্গে আবার ভেরী বেজে উঠলো, অতিকায় অজগরের মতন সেই বিরাট মিছিলটি এবার আস্তে-আস্তে সেই পথে অগ্রসর হ'ল।

সাত

রাণীর-গরবে-গরবিণী খেয়ালী রাজকন্যা নীলাকে ছেড়ে এবার আমাদের সেই নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা লীনার খবর নেবার প্রয়োজন হ'য়েছে। সেই দুঃসাহসিকা মেয়েটির দিকে নিশ্চয়ই তোমাদের মন প'ড়ে আছে। আর তার প্রতি তোমাদের আন্তরিক সমবেদনাও অকারণ নয়; কেন না—দুর্গম জয়ন্তীয়া পাহাড়ের সব চেয়ে বিপদসঙ্কুল অঞ্চলের সন্ধিস্থলে, সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে আস্তেই—কালো ঘোড়া বিজলীর পিঠে চেপে তাকে একাকিনী তোমরা প্রবেশ করতে দেখেছো। অনেক বিপদ যে তাকে কাটিয়ে আসতে হ'য়েছে,—সামনের অজানা দুর্গম-পথে আরও অনেক বিপদ লুকিয়ে আছে—তার আভাসও তোমরা পেয়েছো; কাজেই মেয়েটির অদৃষ্টে কি ঘটলো—সেটুকু জানতে তোমাদের আগ্রহ তো হবারই কথা।

লীনা বুঝেছিল—সামনের পাহাড়ে-অঞ্চলটা পার হ'তে না পারলে কিছুতেই সে নিরাপদ হবে না। তাই কোন বাধা না মেনে সে বিজলীকে সেই দুর্গম-পথে তীরের মত বেগেই ছুটিয়েছিল। পাহাড়ের পথে কি ভাবে ছুটতে হয়, বিজলীর তা খুব ভালো জানা ছিল বলেই—পিঠের ওপর সুদক্ষ সওয়ার নিয়ে দুর্গম ও দুস্তর পাহাড়ে-পথে ও-ভাবে এগিয়ে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়নি।

লীনা ভেবেছিল, সন্ধ্যার আগেই এই দুর্গম অঞ্চলটি অতিক্রম ক'রে সমতল অঞ্চলে পৌছুবে; কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমান বেগে বিজলীকে ছুটিয়েও সে যখন পাহাড়ের সেই এলাকা পার হ'তে পারলো না—তার সমুখের পথ ক্রমেই দুর্গম থেকে দুর্গমতর হ'তে লাগলো—দিনের আলো নিঃশেষ হ'য়ে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এলো—তখন সে বুঝলে, পথ এখনো শেষ হয়নি, বরং সন্ধ্যার মুখে আর একটা ঘোরতর বিপজ্জনক পথের সামনে সে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘোড়ার পিঠে বসেই লীনা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে—পাহাড় এখানে উচু হ'য়ে যেন মেঘের সঙ্গে মিশে গেছে, সামনে দু'পাশের উচু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে অতি সঙ্কীর্ণ একটু স্থান সাপের মত এঁকে-বেঁকে চ'লেছে। দুই পাহাড়ের মাঝের ঐ স্থানটিকে উপত্যকা বলে, লীনার তা জানা ছিল। কিন্তু এই স্থানটুকু এতই অপ্রশস্ত যে, তাকে কিছুতেই উপত্যকা বলা চলে না—তার চেয়ে রন্ধ্র বা সুড়ঙ্গ বলেই ধারণা হয়। কোন রকমে ঘোড়ায় চড়ে কষ্টে-সৃষ্টে সে পথে হয় ত যাওয়া চলে, কিন্তু খানিক দুর গিয়ে যদি জানা যায়, পথটি আরও সরু হ'য়ে গেছে, তখন আর এগোবার কোন উপায় থাকবে না,—আর মোড় ফিরিয়ে ঘোড়াকে ফিরয়ে আনাও সম্ভব হবে না—ঘোড়াশুদ্ধ পিছু হঠে ফিরে আসতে হবে। এখন কি করবে, এই অজানা অপরিসর পথে সে এগোবে, কিম্বা আর কোন রাস্তার সন্ধান করবে—ঘোড়ার পিঠে বসে সেই কথাই সে ভাবতে লাগলো।

হঠাৎ লীনার চোখের সামনে ফুটে উঠলো—দুর্গম পাহাড়ে-পথের সুন্দর নক্সাটি—সাধু দাদু যত্ন ক'রে যেটি এঁকে দিয়েছিলেন, আর লীনা তার নখ-দর্পণে তা ছকে নিয়েছিল। অমনি তার চোখ দুটো উৎসাহে জ্বলে উঠলো—সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে—এই সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়েই এগিয়ে চলেছে তার চলার পথ, এই পথ ধরেই তাকে এগুতে হবে; সুড়ঙ্গের পরেই আছে এ-অঞ্চলের সেরা ঝরণা; সেইখানেই তাকে বিশ্রাম ক'রে পথের শ্রান্তি দুর ক'রতে হবে। বিজলীকে ইসারা ক'রতেই সে ঘাড়টি বেঁকিয়ে সন্তর্পণে এই সঙ্কীর্ণ পথটির ভেতরে ঢুকে আস্তে-আস্তে এগিয়ে চললো।

দু'-ধারে পাহাড় খাড়া হ'য়ে উঠে যেন মেঘের সঙ্গে মিশেছে; তার মাঝে এই সরু অজানা পথটি এঁকে-বেঁকে চ'লে গেছে। পথ এত সরু যে, পাশাপাশি দু'টি ঘোড়ার একসঙ্গে এগোবার জো নেই, কিম্বা ও-দিক থেকে আর কেউ যদি ঘোড়ায় চড়ে আসে—তাহ'লেই মুস্কিল! পথেই তাদের পরস্পর ঠোকাঠুকি বাধবে। কিন্তু মনের আর দেহের শক্তির ওপর নির্ভর ক'রে লীনা নিঃশঙ্কচিত্তে এই পথে এগিয়ে চললো।

যেতে-যেতে এক-একবার লীনা মাথার ওপরে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল—দু'ধারের আকাশচুম্বী পাথরের প্রাচীরের ঊর্দ্ধে—নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের সরু ফালিটুকু চাঁদোয়ার মতন এই সঙ্কীর্ণ পথটির ওপর শোভা পাচ্ছে, আর সেখান থেকেই যেন আলোর ক্ষীণ আভাটুকু প'ড়ে পথের আঁধার ক্রমেই সরিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির এই আলোছায়ার খেলায় খুসী হ'য়ে লীনা নিজের মনেই ব'লে উঠলো—আঁধার দেখে অনেকেই ভয়ে পেছিয়ে পড়ে, কিন্তু আঁধারের পরেই যে আলো আছে, কেউ তা ভাবে না। শক্ত হ'য়ে যে আগে চলে, ভগবান তাকে সেই আলো তুলে ধ'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।

সন্ধ্যার সময় লীনা এই দুর্গম পাহাড়ে-পথটির ভিতর ঢুকেছিল, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরেই তার এই যাত্রা চললো, পথের যেন আর শেষ নেই! তবু লীনার মনে উদ্বেগের একটু ছায়া প'ড়লো না—তার মনের উৎসাহ একটুও শিথিল হ'ল না; পথ যখন আছে, তার শেষও আছে—এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় ক'রে সে তখন নিশ্চিন্ত।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর রকমের একটা শব্দ উঠলো,—সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়াটা কাণ দু'টো খাড়া ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো। লীনার মনে হ'ল—মাথার ওপরে অনেক উচুতে আকাশের যে ফালিটুকু চাঁদোয়ার মতন খাটানো রয়েছে, সেটা বুঝি ছিঁড়ে পাহাড় শুদ্ধ হুড়মুড় ক'রে ভেঙে প'ড়ছে! নইলে এই সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে আর কিসের শব্দ এমন ভাবে উঠতে পারে? শব্দটা যেন বিজলীকে পাথরের মত নিশ্চল ক'রে দিলে। দাঁত দিয়ে ঠোঁটখানি চেপে লীনা অনুমান করতে লাগলো—শব্দটা কিসের, কোথা থেকে আসছে?

একটু পরেই তার সমস্ত মুখখানা আনন্দে যেন ঝলমল্ ক'রে উঠলো, চোখের কালো-কালো তারা দু'টিতেও যেন তার ছোঁয়াচ লাগলো। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে বিজলীর ঘাড়টির ওপর হাতখানি বুলিয়ে উল্লাসের স্বরে সে ব'লে উঠলো—ভয় নেই বিজলী, ও হচ্ছে ঝরণার শব্দ; শীগ্গিরই আমরা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পৌছবো, ঝরণার জলে হাত-মুখ ধুয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটাবো—চল্!

বিজলী যেন লীনার কথাগুলো কাণ-পেতে শুনলে, বেশ বুঝে নিলে যে, তাকে এগোতে বলা হচ্ছে, তার ভয়-ভাবনার কোন কারণ নেই। সে আবার ঘাড়টি বেঁকিয়ে নাচতে-নাচতে সেই পথে এগিয়ে চললো।

এই ভাবে আরও প্রায় একটি ঘণ্টা ঘোড়ার পিঠে কাটলো,—যতই সে এগিয়ে চলেছিল, আগেকার সেই শব্দটা ততই গম্ভীর হ'য়ে তার মনে উৎসাহের দোলা দিচ্ছিল। সত্যিই সে এমন একটি জায়গায় এসে পৌছল—যার দু' পাশে আর আকাশচুম্বী সেই পাহাড়ের পাঁচিল নেই,—চার দিক পরিষ্কার! মাথার ওপরে আকাশের সেই ছোট ফালিটুকু এখন লক্ষগুণ বড় হ'য়ে দিগন্তবিহারী নীলাম্বরী শাড়ীর মতন শোভা পাচ্ছে—আর অসংখ্য তারা তার গায়ে বাহার দিয়ে হীরার বুটির মত ঝিক্‌মিক্ ক'রছে। অনেকক্ষণ পরে মুক্ত আকাশের নীচে খোলা যায়গাটির ওপর এসে স্নিগ্ধ বাতাসের মধুর পরশে লীনার দেহ-মন সুস্থ ও প্রফুল্ল হ'ল। তার বাহন বিজলীও সজোরে নাক ঝেড়ে মনের উল্লাস প্রকাশ করলে।

স্থানটিতে পৌছেই লীনা এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচে নেমে দাঁড়ালো; তার পর চোখের দৃষ্টি প্রখর ক'রে সে স্থানটির চার দিক চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলো। প্রথমেই চোখে পড়লো—সামনেই খানিক তফাতে রূপার পাহাড়ের মতন একটা বিরাট মূর্ত্তি যেন তাণ্ডব নৃত্য ক'রছে,—কি তার ভীষণ সুন্দর আকৃতি! কোথাও কালোর রেখাটিও নেই—সারা অঙ্গ সাদা ধব-ধব ক'রছে, জটাগুলো অসংখ্য হ'য়ে দশ দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, আর তার ভেতর দিয়ে হুড়্-হুড়্ শব্দে সমস্ত অঞ্চলটাকে কাঁপিয়ে বন্যার বেগে নেমে আসছে—গলিত রূপার মত এক বিপুল সলিল-তরঙ্গ।

বুদ্ধিমতী লীনার বুঝতে বিলম্ব হ'ল না—রজতগিরির মত ঐ বিরাট মূর্ত্তিটি আর কিছু নয়, সেটি ঐ অঞ্চলেরই বিখ্যাত মাধব ঝরণা। পাথারিয়া নামক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শিখর থেকে এই জলপ্রপাতটি গলিত রূপার মূর্ত্তিতে নেমে আসছে। ডান দিকেই র'য়েছে তার বিচিত্র নিদর্শন—শেষের স্বভাবসুন্দর রূপ। রূপার মত এই স্বচ্ছ জলরাশি বিশাল এক জলাশয়ে পরিণত হ'য়ে সাগরের আকার ধারণ ক'রেছে। ঝরণাটির বাম দিকের দৃশ্য আরও চমৎকার! লীনা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো—সেদিককার বড়-বড় পাথরগুলোকে নিপুণ ভাবে

সাজিয়ে এমন একটা অখণ্ড পাষাণপুরী রচিত হ'য়েছে—যার বুঝি অন্ত নেই, যত দূর দৃষ্টি যায়—মনে হয়, ক্রমশই যেন এগিয়ে চ'লেছে। গভীর রাতে এই ঘুমন্ত পাষাণপুরীটা এমন নিস্তব্ধ-নিঝুম হ'য়ে পড়ে আছে যে, পাশের জলপ্রপাতের শ্রবণভৈরব অবিরাম গর্জ্জনেও তার ঘুমের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হচ্ছে না।

লীনার মনে হঠাৎ একটা সন্দেহ জেগে উঠলো,—ঐ ভীষণ পাষাণপুরীটাই দুর্দ্ধর্ষ পাহাড়ে-জাত লালুংদের আস্তানা নয় তো? সাধু-দাদুর মুখে সে শুনেছিল, ঝরণাটার কাছাকাছি পাহাড়ে-অঞ্চলটাই তাদের এলাকা, আর পাহাড়ের ভেতর আছে এই রাক্ষুসে জাতটার দুর্ভেদ্য কেল্লা; সভ্যরাজ্যের কুমারী মেয়েগুলোকে ধরে এনে বিয়ে করাটাকেই এরা মস্ত বাহাদুরী ব'লে মনে করে। তবে কি সে এই গভীর রাতে লালুংদের কেল্লার পাদ-মূলেই এসে উপস্থিত হ'য়েছে!

কিন্তু লীনা সে ধরণের মেয়েই নয় যে, এই ভাবনায় ভয়ে মুসড়ে পড়বে, বা হাতে-পায়ে তার খিল ধ'রে যাবে! বরং এই দুরন্ত ডাকাতে-জাতটা মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে ব'লে আগে থাকতেই তার মনটি বিরূপ হয়েছিল, এখন তাদের আড্ডার কাছেই এসে পড়েছে জেনে, তার দেহ-মন রাগে উত্তেজনায় কেঁপে উঠলো। দেহে আর মনে যাদের রীতিমত শক্তি থাকে, বিপদের ভয়ে তারা কখনো মুসড়ে পড়ে না; বিপদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যেই তাদের হাত-পা যেন নিস্পিস্ করতে থাকে।

দুর্গম পথে এ পর্য্যন্ত লীনাকে বনের জন্তু-জানোয়ার-দের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে এতটা পথ এগিয়ে আসতে হ'য়েছে। এবার সে বুঝলে—যেখানে এখন এসেছে, যাদের সঙ্গে তাকে আবার কোমর বেঁধে বোঝাপড়া করতে হবে—তাদের চেহারা অবশ্য মানুষেরই মতন, কিন্তু মানুষের চামড়ায় ঢাকা প্রকৃতিগুলো হিংস্র জানোয়ারের চেয়েও ভীষণ।

তাড়াতাড়ি বিজলীর কাঁধের ওপর হাতখানি রেখে লীনা ব'ললে—আয় বিজলী, আমরা কিছু খেয়ে-দেয়ে নিই; এর পর জল মিলবে কি না, জানি না; ঐ ঝরণার জল না কি ভারি মিষ্টি, সমস্ত অবসাদ কাটিয়ে দেয়। এর পর আর তো বিশ্রাম করা হবে না।

লীনার সঙ্গে—ঘোড়ার পিঠে থলের ভেতর খাবার বাঁধা ছিল, সে নিজে খেলে, বিজলীকেও খাওয়ালে; তার পর বিজলীর লাগামটি ধ'রে ঝরণার দিকে এগিয়ে চললো।

লীনা যা ভেবেছিল, তার মনে যে আশঙ্কার ছায়া পড়েছিল, সেটি যেন সময় বুঝে এই সময় সত্য হ'য়ে দেখা দিল! পাহাড়ের স্তূপের পাশ থেকে কালো-কালো কতকগুলো মুখ হঠাৎ উচু হয়ে উঠলো। সে মুখগুলো কি ভয়ঙ্কর! মুখের দু'পাশে কাণগুলো মোটা মোটা পাথুরে-ঝামার মত অনেকটা দেখতে; নাকগুলো চ্যাপ্টা, কিন্তু নাকের তলার গর্ত্তগুলো যেন হাঁ ক'রে আছে। গোঁফ-দাড়িও বেমক্কা! শুধু জায়গায়-জায়গায় পাটকিলে রঙের থোকা-থোকা চুল। চোখগুলো ছোট, কিন্তু চোখের তারাগুলো কটা, আর ভেতরটা পাকা করমচার মত লাল। মুখের মাংস মিস্‌মিসে কালো, মাথার চুলে ঝুঁটি বাঁধা, রুক্ষ চুলের সঙ্গে সাদা-সাদা পালক লাল রঙের দড়ি দিয়ে এমন ক'রে পাকিয়ে বেঁধেছে যে, দেখলেই মনে হয়, মাথায় যেন পালকবসানো পাগড়ী পরেছে! মুখগুলো এমনি কদাকার আর তা' থেকে এমন একটা হিংস্র ভঙ্গী ফুটে বেরুচ্ছে যে, দেখলে অতি বড় সাহসী পুরুষেরও বুক ভয়ে টিপ-টিপ ক'রে কাঁপতে থাকে। এরাই হচ্ছে লালুং নামক সেই দুর্দ্ধর্ষ নিষ্ঠুর জাত।

পাঁচটি লোক এই দলে ছিল, চেহারা সবারই সমান; প্রত্যেকেই জোয়ান, বয়স কারুর পঁচিশের ওপরে নয়। কিন্তু এত রাত্রে এরা এই নির্জ্জন স্থানে কেন—সেই কথাই এখন শোন।

এই যে রাক্ষুসে জাত লালুং, এখন এদের যে রাজা—তার নাম হচ্ছে দুলু। বয়েস তার মোটে বাইশ কি তেইশ বছর, কিন্তু এই বয়সেই সে গায়ের জোরে, দুঃসাহসে, লুঠপাঠে দলের সকলেরই তাক লাগিয়ে দিয়েছে। দুলুর বড় সাধ, সভ্য জাতের কোন বড় ঘরের মেয়েকে ধ'রে এনে তার রাণী ক'রবে। কাজেই লালুংদের অনেকেই এ-রকম একটি মেয়ের সন্ধান দিয়ে রাজাকে খুসি ক'রবার জন্যে খুবই ব্যস্ত ছিল, তার সন্ধানও চলছিল। ঘটনাচক্রে আজ সন্ধ্যায় পাহাড়ের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করবার সময় লীনা এদেরই এক জনের নজরে পড়ে

যায়। সে লোকটি পাহাড়ের ওপর দিয়ে তীরের বেগে আড্ডায় এসে এই সুখবরটি তার রাজাকে জানায়; মেয়েটির রূপের বর্ণনা ক'রে জানায়—এমন রূপ চোখে কখনো দেখিনি, রাজা! যেন স্বর্গের অপ্সরী—এই পাহাড়ে শিকার খেলতে এসেছে। ইনিই আমাদের রাণী হবেন।

এমন খোস-খবরটি পেয়েই রাজা জানালে,—মহামায়ী জয়ন্তীর ইচ্ছাতেই ঐ কন্যাটি আসছে আমার রাণী হ'তে। তোমরা তাকে পথ দেখিয়ে খুব খাতির ক'রে নিয়ে এসো।

রাজার হুকুম পেয়েই এরা রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে; কিন্তু এখানে এসেই দেখতে পায়—অপ্সরী মেয়েটি ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ঝরণার দিকেই এগিয়ে চলেছে। তখনই তারা সকলে মিলে তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা পরামর্শ ক'রে নিলে। তারা স্থির করলে—মেয়ে যেই তার ঘোড়ার পিঠে চেপে বসবে, অমনি তারা তাকে ঘিরে ফেলে ঘোড়া শুদ্ধ রাজার সামনে নিয়ে গিয়ে তাকে অবাক করে দেবে। পাথরের স্তূপের আড়াল থেকে সেই পাঁচটি ভীষণদর্শন পুরুষ পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এল। তাদের দেহগুলো উলঙ্গ বললেই হয়; প্রত্যেকেরই হাতে, বুকে, পিঠে, পাঁজরে বড় বড় উল্কী আঁকা, শুধু কটিদেশটুকু পালক-বসানো রঙ্গিন কাপড়ে ঢাকা; দেহগুলো আড়ে-বহরে খুব বাড়ন্ত হ'লেও উচ্চতায় যথেষ্ট খাটো। প্রত্যেকের হাতে এক-একটি বল্লম, কোমরে ভোজালি। দলপতির ইঙ্গিতে সকলে মাটীতে হঠাৎ শুয়ে-প'ড়ে সাপের মতন বুকের ওপর ভর দিয়ে লীনাকে লক্ষ্য ক'রে এগুতে লাগলো!

[ক্রমশঃ

—গল্প দাদু।

ইরাকী পেট্রোল

আজ গতির যুগে মানুষের মস্ত সহায় পেট্রোল। মোটর-গাড়ী, লাঞ্চ ও এরোপ্লেন—পেট্রোলের যোগান্ না পেলে অচল নিষ্ক্রিয় হবে এবং তাদের গতি থেমে মানুষের দুর্গতির সীমা থাকবে না।

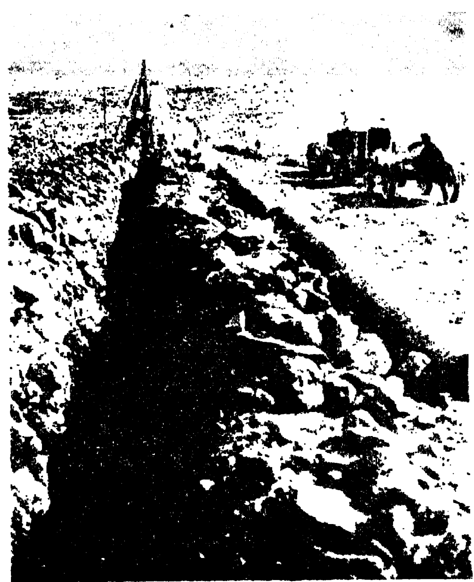
সমস্ত পৃথিবী আজ এই পেট্রোলের পিপাসায় আকুল! অথচ এত পেট্রোল—কোথা থেকে তার যোগান আসছে?

ইরাকে আছে পেট্রোলের বিপুল বিরাট উৎস! বৃটিশ জাত এই ইরাক থেকে তার পেট্রোল সংগ্রহ করছে। কি করে'—সে কাহিনী আরব্য-উপন্যাসের গল্পের চেয়েও রহস্যময়।

মেসোপটামিয়ার বুকের মধ্য দিয়ে শিরার মতো মাটীর নীচে পাইপ বসানো আছে। এ-পাইপ চলেছে ১২০০ মাইল বয়ে—ইরাক থেকে ভূমধ্য সাগরের তীর পর্য্যন্ত।

ইরাক-পারস্যের সীমান্তে কার্কাক। কার্কাক থেকে এ-পাইপের উদ্ভব এবং ইউফ্রেটিশ নদীর পশ্চিমে পাইপের লাইন দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে; একটি লাইন ফরাসী-অধিকৃত ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে উত্তরে ত্রিপোলিতে এসেছে; আর একটি লাইন ট্রান্স-জর্দ্দানিয়া এবং প্যালেষ্টাইন ভেদ করে দক্ষিণে হায়ফা পর্য্যন্ত গেছে। পাইপ আছে মাটীর বুকে দু'-ফুট মাত্র নীচে।

সব জায়গায় এ-পাইপ দু'-ফুট নীচে অবশ্য পাতা হয়নি। স্থান বুঝে এ-গভীরতার তারতম্য আছে। এই পাইপ-লাইন ধরে

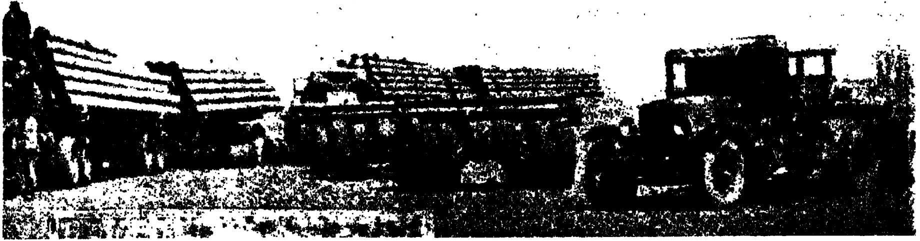


এ জায়গায় আরব বেদুইনের বাস

স্রোতস্বিনী-ধারায় পেট্রোল বয়ে চলেছে! ব্রিটিশ জাতের কাছে এ-পেট্রোল তার শিরার রক্তের মতো! দেহে রক্ত না থাকলে যেমন প্রাণ বাঁচানো যাবে না, এই পেট্রোলের ধারা না পেলে তেমনি বৃটিশ জাতের নানা দিকে অনর্থ ঘটবে।

কার্কাক-খনির পঞ্চাশ মাইল পরে টাইগ্রিশ পার হয়ে পাইপ-লাইন এসেছে ইউফ্রেটিশের তীরে; তার পর ইউফ্রেটিশ পার হয়ে ধূ ধূ মরু-প্রান্তরের বুক ফুঁড়ে এ-লাইন চলে গেছে! মরুর পর বহু নদ-নদীর সঙ্গে দেখা হয়েছে; কোথাও সে সব নদ-নদীর উপরে এ-পাইপ তোলা হয়েছে সেতুর মতো উর্দ্ধে; কোথাও বা নদীর নীচে দিয়ে টানা হয়েছে।

এ সব পাইপের আকার জানো? এক-একটি পাইপ লম্বে



লরি-বোঝাই পেট্রোলের পাইপ চলিয়াছে

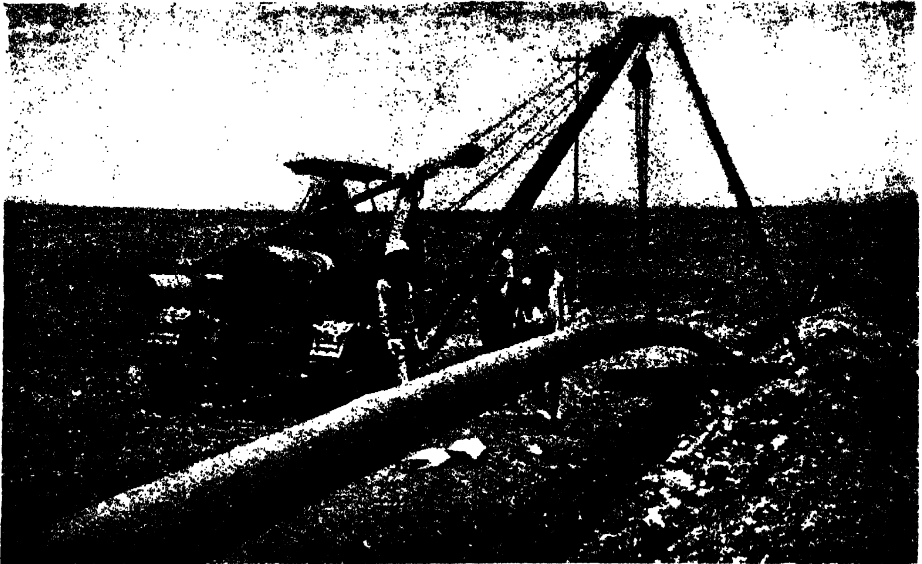
বারো ফুট, ব্যাস বারো ইঞ্চি। এ-সব পাইপে-পাইপে জোড়া হয়েছে বৈদ্যুতিক কৌশলে। এই পাইপে পেট্রোলের ধারা যাতে অব্যাহত থাকে, কোনো দুর্বৃত্ত ফন্দীবাজ পাইপ কোথাও না কেটে দেয়, এজন্য নানা ভাবে লাইন রক্ষা করবার জন্য যে বিপুল আয়োজন করা হয়েছে, সে আয়োজনে এক-একটা বড় সাম্রাজ্য রক্ষা করা চলে। কুলি-মজুর থেকে আরম্ভ করে সিপাহী-শান্ত্রী, ফৌজ, সেনা-নায়ক—এদের আর সংখ্যা নেই বললে অত্যুক্তি হবে না!

তাদের সুবিধার জন্য নতুন পথ-ঘাট তৈরী হয়েছে। ঘর-বাড়ী, ইঁদারা, হাসপাতাল, থানা-পুলিশ, বেতার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ইস্কুল, অফিস—অর্থাৎ রাজ্য-পরিচালনার জন্য যা-যা দরকার—এখানকার পেট্রোলের লালন-পালন করবার জন্য ব্যবস্থা ঠিক তারি অনুরূপ। মরুর বুকে পেট্রোলের সহর খোলা হয়েছে—দু' হাজার কুলি-মজুর আছে; তারা বালি সরাচ্ছে, পাহাড়ের পাথর কাটছে, মাটী খুঁড়ছে, পাইপ চালাচ্ছে, পাইপ সরাচ্ছে—এ-কাজ তাদের নিত্য-দিন চলেছে।

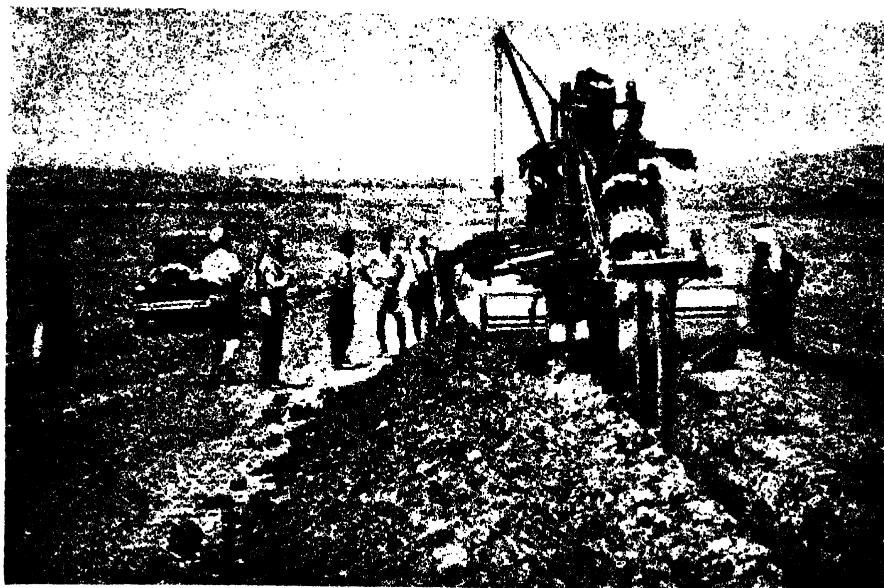
যে-জমি ভেদ করে বারো-শো মাইল পাইপ চালানো হয়েছে, সে ভূভাগের ৮০০ মাইল শুধু যে মরু-প্রান্তর, তা নয়—এই আট-শো মাইল ভূখণ্ডে ব্যাধির কি নিষ্ঠুর অত্যাচার! যখন এখানে পাইপ বসানো হচ্ছিল, লোকজনের মধ্যে তখন শতকরা ৫৭ জন প্রত্যহ ব্যাধির ভারে কাজে কামাই থাকতো।

পেট্রোল-বাহী এই পাইপ বসাবার কাজে বহু জাতির মিলন ঘটেছিল। ব্রিটিশ, আমেরিকান, ফরাশী, জার্ম্মান্, ইতালীয়ান, বেলজিয়ান, ডাচ, রুশ, গ্রীক, যুগোশ্লাভিয়ান, পোলিশ, লাটেভিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান এবং এসিয়াটিক।

কর্ম্মতৎপরতায় সকলের অগ্রণী ছিল ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ফরাশী জাত। এঞ্জিনীয়ারের আমদানি করা হয়েছিল আমেরিকা



কোথাও বা এমনি বাঁকানো পাইপ বহিয়া



মাটী খুঁড়িয়া পাইপ বসানো



দূরে ত্রিপোলির সীমানা



জাহাজে পেট্রোল-বোঝাই—ত্রিপোলি

থেকে,—পাইপ-জোড়ার কাজে আমেরিকান শিল্পীর কৃতিত্বের তুলনা মেলে না। কুলি-মজুরীর কাজে ছিল ইরাকী, আরব, সিরিয়ান্, প্যালেস্তিনিয়ান, লেবানীজ, আমেরিকান, জার্ম্মান্ এবং ইহুদী।

এখন এই পাইপ বয়ে ত্রিপোলি এবং হায়ফার অতিকায় চৌবাচ্ছায় (reservoirs) প্রত্যহ প্রায় ১১,২২০ টন পেট্রোল ভর্ত্তি হচ্ছে। সেখানে পরিশুদ্ধ হয়ে পেট্রোল, প্যারাফিন এবং প্রথম-শ্রেণীর তৈলে রূপান্তরিত হয়ে সেই পেট্রোল দেশ-বিদেশে চালান যাচ্ছে।

পৃথিবীতে নানা প্রদেশে এখন যে-পেট্রোল আমদানি হয়, তার শতকরা ৭২ ভাগ আসে আমেরিকা থেকে; বাকী আমদানী হয় এই ইরাক, হল্যাণ্ড, রাশিয়া, রুমানিয়া এবং ইরাণ থেকে।

এখন ইরাকী-পেট্রোলের প্রসাদে বৃটেনকে আর বিদেশী গবর্ণমেণ্টের কৃপার প্রত্যাশী থাকতে হয় না। তার উপর এই ইরাকী পেট্রোলের কল্যাণে বৃটিশ জাতের পেট্রোল-সমস্যার সমাধান শুধু হয়নি, ইরাকে বৃটিশের লাভের সম্ভাবনা প্রচুর। কারণ, এখানকার মাটীর নীচে পেট্রোলের অফুরন্ত উৎস আছে। মূলধন বাড়িয়ে এখানকার পেট্রোলের উৎস-খননের কাজে তাকে যত বেশী লাগানো যাবে, পেট্রোলের জোগানও ঠিক সেই পরিমাণে বাড়বে। বৃটিশ নেভি, বৃটিশ বিমান, বৃটিশ জন-সাধারণ—কারো ভাগ্যে তাহলে পেট্রোলের অভাব যে কোনো দিন ঘটবে না, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই! ইরাকের পেট্রোল-কোম্পানির নাম 'ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি।' এ-কোম্পানির অস্থি-মজ্জা বৃটিশ শক্তিতে গঠিত বললে অত্যুক্তি হবে না। কোম্পানির চেয়ারম্যান বৃটিশ এবং এ-কোম্পানির রেজিষ্ট্রীকৃত হেড অফিসও লণ্ডনে অবস্থিত। কোম্পানির অংশীদারদের মধ্যে ক'জন আমেরিকান, ফরাশী এবং ডাচ ধনী থাকলেও বৃটিশ শেয়ার-হোল্ডারের সংখ্যা সব-চেয়ে বেশী। যে-পরিমাণ পেট্রোল বছরে উঠবে, তার শতকরা



পেট্রোলের খোলা নদী

৪৭ ভাগ নেবে বৃটিশ জাত, বাকী ৫৩ ভাগ পাবে অন্যান্য জাত।

এই দীর্ঘ বারো-শো মাইলব্যাপী পাইপের উপর শত্রুর আক্রমণ



হায়ফার কাছে কিশাণ-নদীর বুকে সশস্ত্র প্রহরী

খুব সহজ। সেজন্য এই পেট্রোল-লাইনের পাহারার কাজে চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে! বোধ হয় বাদশাহী-আমলে হারেম বা দুর্গ-রক্ষার জন্যও এমন ব্যবস্থা ছিল না!

শত্রুর আক্রমণ শুধু স্থলপথেই সম্ভব, তা নয়! বিমান থেকেও এ-আক্রমণ হতে পারে। বিমান-পথ থেকে পাম্পিং-ষ্টেশনগুলিকে তাগ্ করে বোমা ফেলা বিচিত্র নয়; তা ছাড়া বহু স্থানে পাইপের গা বিমান-পথ থেকে সরু সুতোর মতো দেখা যায়; কাজেই যত্র-তত্র বোমা ফেললেই হলো! পাইপ ফেটে পেট্রোল বেরুলে তাতে অগ্নিসংযোগ হবামাত্র চকিতে মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা আছে! এ পাইপের রক্ষার জন্য ঘাঁটী খুলে বিমান-বোমা প্রতিরোধী কামান এবং প্রতিরোধী বিমানপোতের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থলপথে শত্রুর আক্রমণ—প্রান্তর-পথের জন্য প্রতিরোধ করা কঠিন হবে না। উটের পিঠে চড়ে যাত্রী সেজে শত্রু এসে সকলের অলক্ষ্যে পাছে পাইপ ফাটায়, ফাটিয়ে পেট্রোলে অগ্নিসংযোগ করে, এই জন্যই বেশী ভয়! এ ভয়-নিবারণের জন্য পাহারার যথাযোগ্য ব্যবস্থা হয়েছে।

মরুপ্রান্তরে পাহারাদারদের জন্য অসংখ্য ছাউনি আছে। এ-পথে যাত্রী-চলাচল আছে—অসংখ্য যাত্রী চলে। এ-সব যাত্রীর মধ্যে বেদুইন দস্যুর সংখ্যা অল্প নয়। টাকার লোভে তাদের অসাধ্য কাজ নেই! এরা কোনো রাজ-শক্তির তোয়াক্কা রাখে না; এদের দৌরাত্ম্য রোধ করবে, কোনো রাজ-শক্তির সে সামর্থ্য নেই! মান্ধাতার আমল থেকে তারা এ-পথে চলাচল করছে। পাছে এরা টাকার লোভে শত্রুর পরামর্শে পেট্রোল-পাইপে দুরন্ত হস্তক্ষেপ করে, এ জন্য মরু-পথে আক্রমণ-ট্যাঙ্ক চলেছে—মাথার উপর প্লেনে প্রহরীর আনাগোনা নিত্যক্ষণ; তার উপর কামানের গাড়ী ঠেলে ফৌজের কুচ-কাওয়াজও নিত্য চলেছে!

গোয়েন্দা রাখা হয়েছে। গোয়েন্দারা নানা বেশে বাগদাদ, দামাস্কাস আর জেরুশালেমের হাটে-বাজারে সরাইয়ে-মসজেদে পথে-ঘাটে জন-সাধারণের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে,—কারো মনে কোনো ফন্দী জেগেছে কি না, কথায়-বার্ত্তায় সে-রহস্য আবিষ্কার করা এদের কাজ।

ইরাকের উত্তর-সীমায় আছে ফরাশী শান্ত্রী-পাহারা। পূর্ব্বে এবং দক্ষিণে আছে ইরাকের ফৌজ ও পুলিশ-বাহিনীর সতর্ক পাহারা।

সম্প্রতি প্যালেষ্টাইনে গোলযোগ ঘটার জন্য এই পেট্রোল-উৎস রক্ষা করবার ব্যবস্থা আরো পাকা করা হয়েছে।

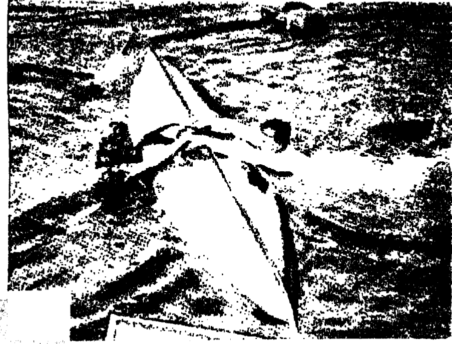
পাম্পিং-ষ্টেশনগুলির ভার ন্যস্ত আছে সুদক্ষ এবং হুঁশিয়ার কর্ম্মচারীদের হাতে। পাহারার সুব্যবস্থায় এই পেট্রোল-লাইনের কোথাও এতটুকু বিঘ্ন-বিপত্তি ঘটলে নিমেষে তারা সে সংবাদ পায়। পাবামাত্র তাদের কৌশলে দু'-তিন মিনিটমাত্র সময়ে পাইপের মধ্য দিয়ে পেট্রোল ধারার প্রবাহ রুদ্ধ—স্তম্ভিত করা হয়।

জলে বিপত্তি

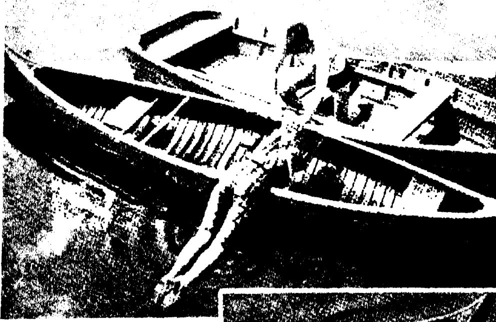
আজকাল "রোয়িং"য়ের রেওয়াজ বাড়িয়াছে; সুলক্ষণ! রোয়িংয়ে স্বাস্থ্য ভালো থাকে, দেহ মজবুত হয়। অথচ 'রোয়িং' করিতে গিয়া বোট উল্টাইয়া জলে ডোবা বিচিত্র নয়!

চলন্ত বোট হইতে যদি জলে পড়িয়া যাও, তাহা হইলে কি করিয়া আবার বোটে উঠিবে? ১নং ছবিখানি ছাখো—এমনি করিয়া বোটে উঠিবে। ধরো, বোট হইতে আর-এক জন লোক জলে পড়িয়া গিয়াছেন—তুমি তাঁকে তুলিতে চাও! ২নং ছবিতে পাশাপাশি হু'খানি বোট দেখিতেছ! খালি বোটখানিকে তোমার বোটের সঙ্গে গায়ে-গায়ে সংলগ্ন করো—তার পর তিনি উঠিবেন খালি বোটে; তুমি শুধু খালি বোটখানি ধরিয়া রাখো। ধরিয়া রাখার জন্য সে-বোট উল্টাইয়া যাইবে না, কাৎ হইবে না!

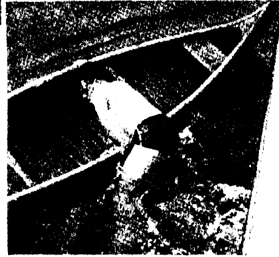
বোট যদি উল্‌টায় এবং বোটে যদি হু'জন লোক থাকেন, তাহা হইলে ৩নং ছবির ভঙ্গীতে হু'জনে ভাসিয়া উল্‌টানো-বোটকে অবলম্বন করিয়া নিরাপদে তীরে পৌছিতে পারিবে।



৩। উল্‌টানো বোটকে অবলম্বন



২। হু'খানি বোট গায়ে-গায়ে



১। এমনি করিয়া বোটে উঠিয়ো



৪। পায়ে খিল ধরা

সাঁতার কাটিবার সময় পায়ে যদি 'ক্র্যাম্প' বা খিল ধরে, তাহা হইলে জোর-নিশ্বাসে ফুশফুশে বেশ এক-ঝলক বাতাস ভরিয়া ডুব দিয়ো; ডুব দিয়া পায়ের যে-জায়গায় ক্র্যাম্প ধরিয়াছে, সেখানটা হু' হাতে বেশ করিয়া চাপিয়া টিপিবে। এই টেপাচাপের জন্য 'ক্র্যাম্প' সারিবে। (৪ ও ৫নং ছবি দেখ)।

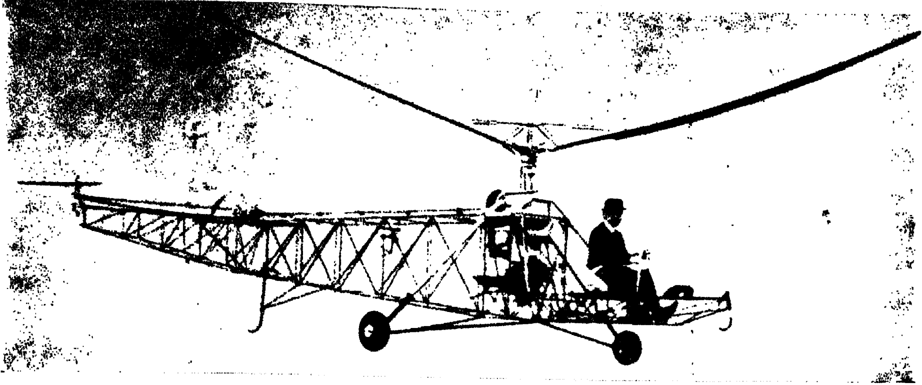
বোট লইয়া জলে রোয়িং করিতেছ—বোটের তলায় কোথায় হয়তো ফুটা বা ফাটা আছে, সেই ফুটা-ফাটা দিয়া জল ঢুকিয়া বোট বুঝি ডোবে! এ-অবস্থায় কি করিবে? নিরাপদে তীরে পৌছিবার চেষ্টা করিবে নিশ্চয়!

বোট যদি কাঠের তৈয়ারী হয় এবং তীর-ভূমি যদি হয় দূরে এবং তুমি হয়তো খুব ভালো সাঁতার জানো না—এ-অবস্থায় ভয়ে কদাচ জলে ঝাঁপ দিয়ো না; বোটেই থাকিয়ো,—তাহা হইলে জলে ডুবিবার আশঙ্কা থাকিবে না! একটা কথা মনে রাখিয়ো, জলে পরিপূর্ণ হইলেও কাঠের বোট ডুবিয়া কদাচ জল-সমাধি লাভ করিবে না! এ-সময়ে বোটে যদি একা থাকো, তাহা হইলে দাঁড় টানিয়া বা হাল বাহিয়া তীর-অভিমুখে সেই বোট বাহিয়ো; নিরাপদে তীরে পৌছিতে পারিবে। এ সময় বোট ছাড়িয়া সাঁতার কাটিয়া তীরে আসিবার চেষ্টা না করিয়া বোটে থাকিয়া সেই বোট বাহিয়া তীরে ফিরিবার প্রয়াস নিরাপদ জানিবে।



৫। খিল সারানো

বোট যদি উল্‌টায় এবং যদি সাঁতার না জানো, তাহা হইলে আতঙ্কে-ভয়ে বোট ছাড়িয়ো না; সেই উল্‌টানো বোট আঁকড়াইয়া কোনো মতে থাকিতে পারিলে জলে ডুবিবে না, ইহা নিশ্চিত। বোট তলাইতেছে, সে অবস্থায় যদি সাঁতার না জানো, কদাচ জলে ঝাঁপ দিয়ো না, তাহাতে মরণ অবধারিত!



হেলিকপ্‌টর প্লেন শূন্যে উঠিয়াছে

হেলিকপ্‌টর প্লেনে সিকোরাস্কি

এ ব্যাগের আকা... আছে। এঞ্জিনে ষ্টার্ট দিলে এ-বিমানপোত মাথায় চাপানো হয়, উপর দিয়া ছুটিয়া তার পর আকাশে না মাথায় চাপাইলে অস্বাচ্ছন্দ্য ...শে ওঠে। শূন্য হইতে পড়িয়া না

যায়, এ জন্ম কোমরের কাছে ষ্ট্র্যাপ বাঁধা থাকে। উপরের ছবিতে দেখুন, সিকোরাস্কি সাহেব নিজে স্বকৃত বিমানপোত চালাইয়া আকাশ-বিচরণে বাহির হইতেছেন। এ বিমান-পোতের নাম হেলিকপ্‌টর।

বম্বার-মারী

বম্বার এবং বিমানপোতের আক্রমণ প্রতিরোধ-কল্পে মার্কিনের ফৌজ-বিভাগ এক-রকম নূতন বম্বার-বৈরী কামান তৈয়ারী করিয়াছেন।



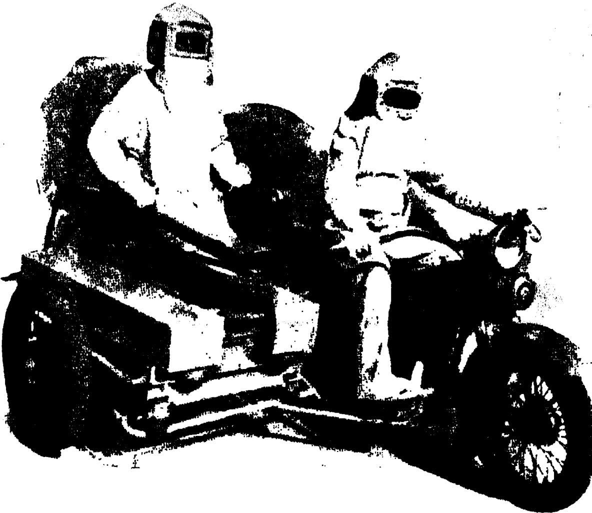
বম্বার-মারী কামান

এ কামানের গাড়ী অতি দ্রুত চলে এবং মিনিটে এ কামান হইতে ১২৫টি করিয়া শেল ছোটে। এ কামান-গাড়ী মাঠ-বাট-জলা সর্ব্বত্র সমভাবে ছুটিতে পারে।

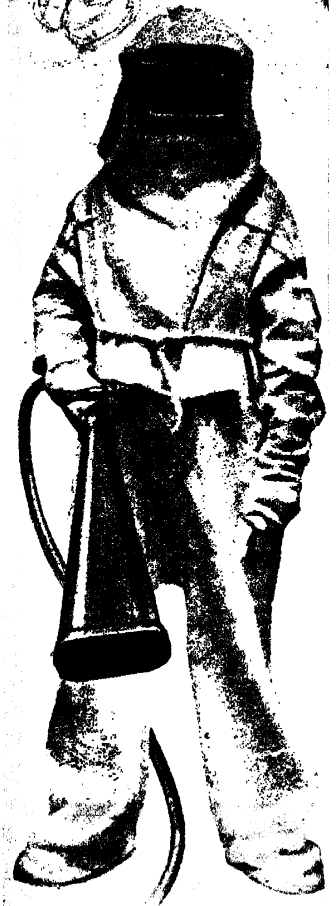
—

অগ্নি-রক্ষক

এরোপ্লেন আজ খুব ঘরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। রেল-ষ্টীমারের মতো যাতায়াতের জন্য মানুষ আজ এরোপ্লেন ব্যবহার করিতেছে নিত্য।



রক্ষা-কল্পে যাত্রা



পাণ্ডার হাতের হোজে তুষার ভরা আছে

আগুন লাগিয়া প্লেনের পতন, পাইলটের অপঘাত-মৃত্যু, এখানে না হোক্, য়ুরোপে আমেরিকায় নিত্য দিনের ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। আগুন লাগিয়া প্লেন ও পাইলটের বিপত্তি-মোচনের জন্য নিউ-ইয়র্কের বিমান-ষ্টেশনগুলিতে অগ্নি-নিবারক যন্ত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। দমকলের পাণ্ডাদের মতো হাতে কলমে শিক্ষা দিয়া এরোপ্লেনের পাণ্ডা তৈয়ারী করা হইয়াছে। পাণ্ডাদের পোষাক এ্যাসবেষ্টসের। তাদের জন্য নূতন-... মোটর-বাইক তৈয়ারী ... ...তে মরণ সঙ্গে স্বতন্ত্র সাই... পুড়িয়া ভূমি...

বিমান-ষ্টেশন হইতে সাইরেনে সঙ্কেত বাজে,—সঙ্কেত বাজিবামাত্র ছ'জন পাণ্ডা তখনি এ্যাস্‌বেষ্টসের পোষাক আঁটিয়া সাইড-কার-সমেত বাইক লইয়া ঘটনা-স্থলে গিয়া উপস্থিত হন! তাঁদের সঙ্গে থাকে ফানেলের ছাঁদে-গড়া ছোজ্‌-স্প্রে! ইহাতে থাকে কার্বন-ডায়ক্সাইড্ স্নো বা তুষার। আসিয়া এই তুষার বর্ষণ করিয়া আগুন নিবানো হয় এবং পাইলটকে উদ্ধার করিয়া পাণ্ডারা সাইড-কারের কেবিনে করিয়া তাঁকে হাসপাতালে চালান দেন! এ ব্যবস্থার পর বহু বিপত্তি মোচন হইতেছে!

তামার পোষাক

এই তরুণীর অঙ্গে যে আবরণ দেখিতেছেন, এটি তামার পাৎলা পাতে তৈয়ারী। এ-পাত কাপড়ের মতো মিহি, নরম এবং হালকা। তামার তৈয়ারী হইলেও এ-আবরণ কাপড়ের আবরণের মতো নমনীয় এবং এ-পোষাকের কান্তি এমন কমনীয় যে, দেহে আঁটিলে লাবণ্য-শ্রীতে দেহ সমুজ্জ্বল দেখাইবে।



তামার ঠাট্

বরফ-টুপি

রোগে মাথায় আইস-ব্যাগ চাপানো—আজ এই বিবিধ রোগের মর্শুমের দিনে কোনো ঘরে বাদ পড়ে না! আইস-ব্যাগ একবার কেনা চলে, কিন্তু তাকে বেশী দিন বাঁচাইয়া রাখা যায় না। ব্যাগের রবার ফাটিয়া যায়, না হয় শুকাইয়া পাতের মতো হইয়া পড়ে; তার উপর আইস-ব্যাগে মস্ত অসুবিধা এই যে, বরফের কুচি বড় শীঘ্র গলিয়া যায় এবং ব্যাগের মধ্য হইতে সর্ব্বক্ষণ জল ফেলিতে হয়। এ জন্য রোগীর মাথায় দীর্ঘকাল অবিরাম সে আইস-ব্যাগ চাপাইয়া রাখা চলে না।

সম্প্রতি রবারের-চাকৃতি বা প্যাক্ কাটিয়া সেই সব চাকৃতি জুড়িয়া টুপির আকারে নূতন ধরণের আইস-ব্যাগ তৈয়ারী হইতেছে। এ ব্যাগের আকার টুপির মতো। টুপির ভিতর-দিক অর্থাৎ যে-দিক মাথায় চাপানো হয়, সে-দিকটা খুব নরম এবং মসৃণ; সে জন্য মাথায় চাপাইলে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিবেন না। এ টুপি-ব্যাগের রবারের চাকৃতিগুলির মধ্যে জল ভরিয়া চাকৃতিতে বা প্যাকে ছিপি আঁটিয়া বরফের মধ্যে অথবা যাঁর গৃহে রেফ্রিজারেটর আছে, সেই রেফ্রিজারেটরে রাখিয়া দিলে ৪৫ মিনিটের মধ্যে প্যাকে-ভরা জল জমাট-বরফে পরিণত হইবে; এবং বরফ-জমা এই

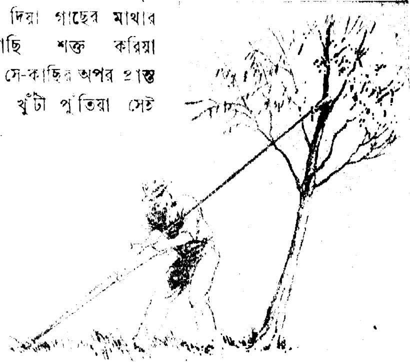


বরফ-টুপি

আইস-ব্যাগ বা আইস-টুপি মাথায় চাপাইলে এক-ঘণ্টাকাল সে-বরফ ঠিক থাকিবে; গলিবে না। এ প্যাকের মধ্যে গরম-জল ভরিয়া তাপ দেওয়ার কাজও সমান ভাবে চলে।

ঝড়ে-হেলা গাছ

মাঝারি-সাইজের গাছ যদি ঝড়ের দোলায় হেলিয়া বা বাঁকিয়া যায়, তাহা হইলে সে-গাছকে অনায়াসে পুনরায় সিধা খাড়া করা যায়। কি করিয়া, বলি। মজবুত কাছি দিয়া গাছের মাথার কাছাকাছি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া সে-কাছির অপর প্রান্ত মাটিতে খুঁটা পুঁতিয়া সেই খুঁটাতে বেশ টাইট করিয়া বাঁধিয়া দিবেন। দশ দিন, বারো দিন, এক মাস এমনি টাইট করিয়া বাঁধিয়া রাখুন; গাছ আবার সিধা হইয়া মাথা খাড়া করিবে। শুধু দেখিতে হইবে, ইতিমধ্যে দড়ির এ-বাঁধন যেন আল্‌গা না হয়! আল্‌গা হইলে আবার টাইট করিয়া বাঁধিবেন।



গাছকে খাড়া করা

মরু-পথে মোটর-গাড়ী

কালিফোর্ণিয়ার মোহাব মরুর বুকে পাড়ি দিবেন বলিয়া কালিফোর্ণিয়া-নিবাসী দুই শিকারী-ভাই লেনা এবং প্রাউলার বহু কৌশলে নূতন মোটর-গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন। এ-গাড়ীর এমন শক্তি যে, বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড়, উঁচু ঢিপি এবং ধূ-ধূ বালুকা-রাশি—কোথাও ইহার গতি রুদ্ধ হইতে জানে না! এ-গাড়ীতে চড়িয়া দুই ভাই শুধু মরু বিচরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—বনে-জঙ্গলে শিকার করিয়া বিজয়-গৌরবে গৃহে ফিরিয়াছেন। এ-মোটরের টায়ার যেন দিগ্বিজয়ী—এমন অনায়াসে পাহাড়ে চড়ে, এবং পাহাড় হইতে নামে যে, দেখিলে তাক্ লাগিয়া যাইবে!

পাথরের ঢিপির উপর মোটর উঠিয়াছে

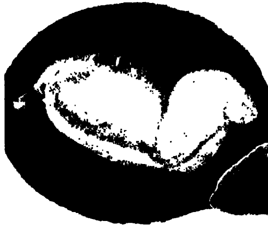


মোটর নীচে নামিতেছে

সর্দ্দিতে নাস লওয়া

টন্‌শিলাইটিশ রোগে অথবা মাথায় ঠাণ্ডা লাগিলে চিকিৎসকেরা নিশ্বাস-গ্রহণে ঔষধি-বাষ্পের ব্যবস্থা করেন। এনামেলের বাটিতে ঔষধ ঢালিয়া ষ্টোভে চাপাইয়া দিলে আগুনের আঁচে ঔষধ হইতে যে বাষ্প উঠিবে, তা করিয়া রোগী সেই বাষ্প নিশ্বাস-বায়ুতে গ্রহণ করিবেন। এক জন

অষ্ট্রিয়ান বৈজ্ঞানিক এক রকম শ্বাস-গ্রহণ-যন্ত্র (ইনহেলার) তৈয়ারী করিয়াছেন। এ-যন্ত্রটিতে বাহুল্য বা জটিলতা নাই। একটি কাচের চওড়া খোল; তার





সর্দ্দির ঔষধ

সঙ্গে ধাতব ছ'টি নল সংযুক্ত আছে। ছ'টি নলের একটি থাকে ঔষধের পাত্রে ডোবানো, আর-একটিকে ইলেকট্রিক ইস্ত্রী-যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন করিতে হয়। ইলেকট্রিক ইস্ত্রী-যন্ত্রটি প্লাগে আঁটিয়া দিন; বৈদ্যুতিক প্রবাহে তাপ সঞ্চারিত হইবে এবং সে আঁচে ঔষধ হইতে বাষ্প উদ্গীর্ণ হইবে। নলযোগে ঔষধের যে বাষ্প উঠিবে, ঐ কাচের খোলটি সামনে রাখিয়া সেই বাষ্প নিশ্বাসে নিন, আরাম পাইবেন; এবং সর্দ্দি ও টনশিলাইটিশ অচিরে সারিয়া যাইবে।

খেয়াল

উপরের ছবিতে কি দেখিতেছেন? সরীসৃপ? না। আলু! মাটির বুকে জন্মিয়াছে। এ ছ'টি আলুর উপর মানুষের হাতের কারিগরি একটুকু নাই। মাটি হইতে যেমন আলু মিলিয়াছে, তারি নিখুঁত ফটোগ্রাফ। বিধাতার মনেও মাঝে-মাঝে খেয়াল জাগে, তাই তিনি আলুকে এমন সঙ সাজাইয়াছেন!



বিধির খেয়ালে আলু

জল-গুল্ম-কাটা করাত

বিলে, পুকুরে বা মজা-নদীতে বড় বড় গুল্ম জন্মিয়া পুকুর ও নদীর জলকে শুধু অব্যবহার্য্য করিয়া তোলে, তা নয়; সে গুল্মের জ্বালায় নদী-বিল-পুকুর হাজিয়া মরিয়া যায়। এই জল-গুল্ম কাটিয়া জলকে সাফ করিতে এবং নদী ও পুকুরকে বাঁচাইবার জন্য এক-রকম করাত তৈয়ারী হইয়াছে। লম্বা পাৎলা করাত—তার দিয়া আঁটিয়া সেই তারের ছই প্রান্ত লোহার ডাণ্ডায় বাঁধিয়া দিন। তার পর নৌকায় চড়িয়া জলের মধ্যে করাত ফেলিয়া নৌকা বাহিয়া চলুন—হাতের



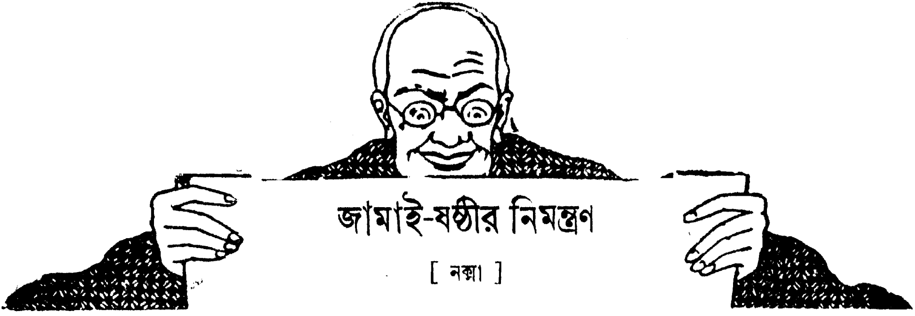
জলের করাত

টানে করাত চলিবে, সেই সঙ্গে জলের বুকে যত গুল্ম জন্মিয়াছে, সব কাটিয়া নির্ম্মূল হইবে। কাটা হইলে সে গুল্ম-জঞ্জাল নৌকায় তুলিয়া কোথাও ফেলিয়া দেওয়া কঠিন হইবে না।

গুণের আদর

গিরির গরিমা কভু নাহি বুঝে পার্ব্বত্য বর্ব্বর,
সমতলবাসী সভ্য তার মাঝে হেরে মহেশ্বর।
পঙ্কবাসী ভেক নাহি বুঝে কভু পঙ্কজ-গৌরব,
দূর হ'তে আসে অলি কৃতাঞ্জলি সে চেনে সৌরভ।

শ্রীকালিদাস রায়।



জামাই-ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ

[নক্সা]

"শ্রীপাঠ মোগলপুর থেকে নিমন্ত্রণ-পত্র এসেছে?"

"না ভাই, এখনও আসেনি, তবে আজ-কালের মধ্যেই আস্‌বে বলে' আশা ক'রছি।"

"তা বটে, কারণ আশাতেই মানুষ বেঁচে থাকে; কিন্তু মোগলপুর স্থানটি কোন্ দিকে?"

বন্ধুর প্রশ্ন শুনিয়া অমিয় হাসিয়া বলিল, "মোগলপুর পাঠানপুরের কাছাকাছি কোথাও হওয়াই সম্ভব! কিন্তু জায়গাটি যে ঠিক কোন দিকে, সে সম্বন্ধে আমার কোনই 'আইডিয়া' নেই। ভুগোল-বৃত্তান্তে মোগলপুরের নাম প'ড়েছি বলেও ত মনে হয় না।"

বন্ধু বিমান বলিল, "তবে সেখানে যাওয়ার উপায়?"

"আমার যাওয়ার ব্যবস্থা তাঁরাই করবেন; নিমন্ত্রণ-পত্র ত আসুক।"

নব-বিবাহিত অমিয়কুমারের সহিত তাহার বন্ধু বিমানচন্দ্রের এই সকল কথা হইতেছিল। দুই জনেই বিদ্যাসাগর কলেজের 'থার্ড ইয়ার' ক্লাসের ছাত্র। অমিয় কলিকাতার লোক, মাণিকতলায় তাহার বাড়ী। বিমান হাওড়া জেলার কোন পল্লীগ্রাম হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাসাগর-কলেজে ভর্ত্তি হয়। সেই সময় হইতেই অমিয়র সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব। সে তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিমান বিদ্যাসাগর-কলেজের বোর্ডিংএ থাকে। বোর্ডিংএ বিমানের বাস-কক্ষে বসিয়াই বন্ধুদ্বয়ের এইরূপ আলাপ চলিতেছিল।

অমিয় ম্যাট্রিক-ক্লাসে পড়িবার সময় পিতৃহীন হয়। তাহার মাতুল শ্রীকান্ত বাবু কলিকাতায় তাহাদেরই বাড়ীতে থাকিয়া দালালি করিতেন। অমিয়র পিতার অপেক্ষা তাঁহার বয়স কিছু বেশী ছিল। শ্রীকান্ত বাবুর বিষয়-বুদ্ধি প্রখর ছিল, এজন্য অমিয়র পিতা সাংসারিক সকল বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। অমিয়র সাংসারিক অবস্থা মন্দ ছিল না; মাণিকতলায় বসতবাড়ী ছাড়া আরও দু'খানা বাড়ী ছিল, তাহাদের ভাড়া,—এবং কোম্পানীর কাগজের সুদ হইতে মাসিক প্রায় আড়াই শত টাকা আয় ছিল। অমিয়র পিতার মৃত্যুর পর শ্রীকান্ত বাবুই তাহাদের অভিভাবক হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই চেষ্টায় অমিয় উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছিল।

অমিয়র সংসারে তাহার বিধবা জননী, একটি কনিষ্ঠ সহোদর, মাতুল শ্রীকান্ত বাবু, এবং তাঁহার পনের বৎসর বয়স্ক পুত্র রজনী—এই কয় জন পোষ্য। অমিয়র জ্যেষ্ঠা ভগিনীটি উত্তরপাড়ায় তাহার শ্বশুরালয়ে থাকে; সে দুই-এক মাস অন্তর মাণিকতলায় তাহার পিত্রালয়ে আসিয়া পাঁচ-সাত দিন মায়ের কাছে বাস করে। রজনী বাড়ীতে থাকিয়া তাহাদের গ্রামের স্কুলেই পড়াশুনা করিত; কিন্তু সেই স্কুলে পড়াশুনা তেমন ভাল হয় না শুনিয়া শ্রীকান্ত অমিয়র অনুরোধে রজনীকে কলিকাতায় আনিয়া 'মেট্রোপলিটানে' ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন।

অমিয়র ইচ্ছা ছিল, সে এম-এ না হউক, বি-এটা পাশ না-করিয়া বিবাহ করিবে না; কিন্তু শ্রীকান্ত বাবু তাহাকে বলেন, বিবাহ করিলে লেখাপড়ায় বিঘ্ন হয়, এ-কথার কোন মূল্য নাই। লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা থাকিলে সকল অবস্থাতেই লেখাপড়া শিখিতে পারা যায়; উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত হয় না। সে-কালে—যখন সমাজে ষোল-সতের বৎসর বয়সের ছেলের সঙ্গে বছর দশ-এগার বয়সের মেয়ের বিবাহ হইত, তখন কি কেহ সুশিক্ষিত হইত না? ভূদেব মুখুয্যে, গুরুদাস বাঁড়ুয্যে, রাসবিহারী ঘোষ, বঙ্কিম চাটুয্যে, গৌরীশঙ্কর দে'র মত দেশের সুসন্তানগণ কি লেখাপড়া শেষ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন?—অমিয়র জননীরও ইচ্ছা, তিনি অবিলম্বেই পুত্রের বিবাহ দিবেন; কিন্তু শ্রীকান্ত বাবু অগ্রে



তাহার বিবাহের প্রস্তাব না করিলে তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা সঙ্গত মনে করেন নাই। শ্রীকান্ত বাবু অমিয়র বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করায় অমিয়র মাতাও পুত্রকে এজন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। তখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও অমিয় মাতা ও মাতুলের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না।

শ্রীকান্ত বাবু পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, চারি-পাঁচটি পাত্রী দেখিবার পর আমপোস্তার আড়তদার পঞ্চানন মুখুয্যের একমাত্র কন্যা বিনোদিনীকে তাঁহার পছন্দ হইল। প্রথমে পাত্রী দেখা, তার পর কৌলীন্য-মর্য্যাদা, অবশেষে কোষ্ঠীবিচার প্রভৃতি কোন বিষয়েই আপত্তি হইল না; সুতরাং বিবাহের প্রস্তাব পাকা হইল। পঞ্চানন বাবু যে-দিন পাত্র আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য অমিয়দের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, সে-দিন ভাবী শ্বশুরের বেশভূষা দেখিয়া অমিয়র মেজাজ চটিয়া গেল। অমিয় আশা করিয়াছিল, ভাবী শ্বশুর মহাশয় পোস্তার আড়তদার হইলেও যখন বহু দিন হইতে কলিকাতায় বাস করিতেছেন, তখন তাঁহার বেশভূষা ভদ্রজনোচিতই হইবে। আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বে, অমিয় পঞ্চানন বাবুর হাফ-আস্তিন খদ্দরের ফতুয়া, খদ্দরের ধুতি-চাদর, এবং চটি জুতা দেখিয়া তাঁহাকে কন্যাপক্ষের পুরোহিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকান্ত বাবু যখন তাঁহাকে "বেয়াই মশায়" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন, তখন অমিয় বুঝিতে পারিল, এই অর্দ্ধসভ্য বাঙ্গাল-ভাবাপন্ন মনুষ্যটি তাহারই ভাবী শ্বশুর! তাহার মন বিরাগে ভরিয়া উঠিল।

অমিয়র আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল, বিবাহের দিন স্থির হইল ২২শে ফাল্গুন। তাহার পর বিবাহটা কোথায় হইবে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইল।

পঞ্চানন বাবু বলিলেন, "আমার ঐ একটিমাত্র কন্যা, দেশের বাড়ী হইতেই বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সেখানে নানা অসুবিধা। ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল পথ পাল্কীতে বা গরুর গাড়ীতে পাড়ি দিতে হয়। বরকে পাল্কীতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, কিন্তু বরযাত্রীদিগের জন্য অতগুলি পাল্কী সংগ্রহ হইবে কি না, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার উপর পাড়া-গাঁয়ে জিনিষপত্র প্রায়ই কিছু পাওয়া যায় না, ঘি-ময়দা হইতে আরম্ভ করিয়া পানের মশলা পর্য্যন্ত সবই কলিকাতা হইতে পাঠাইতে হয়; সেই জন্য বিবাহটা কলিকাতার বাসা-বাড়ী হইতে হইলেই ভাল হয়। এ বিষয়ে আপনাদের মতটিও জানা দরকার।"

শ্রীকান্ত বাবু বলিলেন, "এ বিষয়ে আমাদের মতামতের প্রয়োজন কি? আপনার সুবিধা-অসুবিধা লইয়াই কথা। তবে কলিকাতায় বিবাহ হইলেই ভাল হয়; পল্লীগ্রামে যাইতে বরযাত্রীদিগের কষ্ট ও অসুবিধা হইতে পারে। অনেকে হয় ত আপত্তিও করিবেন।"

পঞ্চানন বাবু বলিলেন, "আমার কুটুম্ব এবং আত্মীয়-স্বজন প্রায় সকলেই হয় এখানে, না হয় হাওড়ায় থাকেন। দেশে গিয়া বিবাহ দিলে এই শুভকার্য্যে তাঁহাদের অনেকেরই সহায়তায় ও সহযোগিতায় বঞ্চিত হইব। সুতরাং বিবাহটা কলিকাতাতেই হউক। আমার দাদা দার্জ্জিলিংএ থাকেন, তিনি আসিতে পারিবেন কি না, এখনও জানিতে পারি নাই; তবে কলিকাতায় বিবাহ হইলে বরং তিনি দুই-এক দিনের জন্যও আসিতে পারেন; কিন্তু দেশের বাড়ীতে যাওয়া তাঁর পক্ষে এখন এক রকম অসম্ভব।"

আহিরীটোলায় পঞ্চানন বাবুর বাড়ীর অদূরে, এক মাসের জন্য আশী টাকা ভাড়ায় একখানা বাড়ী ভাড়া লইয়া সেই বাড়ীতেই ২২শে ফাল্গুন অমিয়র বিবাহ হইয়া গেল। পঞ্চানন বাবুর দাদা অবকাশের অভাবে বিবাহে যোগদান করিতে পারেন নাই; তিনি যৌতুকস্বরূপ কিছু অলঙ্কার পাঠাইয়াছিলেন।

২

বৈশাখ মাসের শেষের দিকে শ্রীকান্ত বাবু পঞ্চানন বাবুর একখানি পত্র পাইলেন। পত্রখানি আসিল পঞ্চানন বাবুর বাসগ্রাম পূর্ব্বোক্ত মোগলপুর হইতে। পঞ্চানন বাবু লিখিয়াছেন,—তাঁহার দাদা পাঁচ মাসের ছুটী লইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই সপরিবারে বাড়ী আসিতেছেন, তারযোগে এই সংবাদ পাইয়া তিনিও সপরিবারে কলিকাতা হইতে দেশে চলিয়া আসিয়াছেন। আসিবার পূর্ব্বে সময়াভাবে বৈবাহিকের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতে পারেন নাই, এই ত্রুটির জন্য বৈবাহিক মহাশয় এবং বেয়ান ঠাকুরাণী যেন তাঁহাকে ক্ষমা করেন—ইত্যাদি।

নববধূর দ্বিরাগমনের প্রসঙ্গে অমিয়র জননী বলিয়াছিলেন, বিবাহের পর এক বৎসরের মধ্যে দ্বিরাগমন হয় না, ইহাই তাঁহাদের কৌলিক প্রথা; সুতরাং পরবৎসর ২২শে ফাল্গুনের পূর্ব্বে তিনি পুত্রবধূকে লইয়া আসিবেন না। অগত্যা পঞ্চানন বাবু কন্যাকে লইয়াই দেশে গিয়াছিলেন। জামাই-ষষ্ঠীর তিন দিন পূর্ব্বে পঞ্চানন বাবু জামাই-ষষ্ঠী উপলক্ষে জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া অমিয়র জননীকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রে লেখা ছিল, ষষ্ঠীর দিন প্রাতে ছয়টার পূর্ব্বেই তাঁহার আড়তের এক জন কর্ম্মচারী অমিয়দের বাড়ীতে গিয়া অমিয়কে সঙ্গে লইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইবে ও তাহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিবে; গ্রামের বাড়ীতে পৌছিবার জন্য ষ্টেশনে পাল্কী থাকিবে।

পঞ্চমীর দিন অপরাহ্লে আড়তের সেই কর্ম্মচারী অমিয়র সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আমি কাল প্রত্যুষে গাড়ী লইয়া আসিব, আপনি মুখ-হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন। প্রথম ট্রেণখানা ধরিতে না পারিলে আপনার সেখানে পৌছিতে বেলা একটা বাজিয়া যাইবে।"

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া অমিয় সন্ধ্যার পর মহা উৎসাহে "প্রস্তুত" হইতে লাগিল। তাহার একটা বড় সুটকেশ ছিল, তাহার ভিতর সে বিশ্ব-সংসারের সামগ্রী পূরিতে বসিল! নিজের পরিধেয় ব্যতীত, কলিকাতাবাসী সৌখীন নব্য-যুবকের বিলাসিতার যত প্রকার উপকরণ থাকিতে পারে—অমিয় তাহার প্রত্যেকটি সেই সুটকেশের মধ্যে সযত্নে গুছাইয়া তুলিল। তাহার পর মনে করিল, কিছু চা সঙ্গে লইয়া যাওয়া ভাল, কি জানি, যদি সেই সুদূর অসভ্য পাড়াগাঁয়ে চা না পাওয়া যায়। সুতরাং আধ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট চা'ও সেই সুটকেশে স্থান পাইল। অমিয়র একটু বাঁশী বাজাইবার সখ ছিল, সেই জন্য সে তাহার "ক্লারিওনেট" বা বিলাতী বাঁশীটিও লইতে ভুলিল না। অশিক্ষিত মূর্খ পল্লীবাসীরা তাহার বাঁশীর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া বাহবা দিবে—এ বিষয়ে অমিয়র এক বিন্দুও সন্দেহ ছিল না। অবশেষে কি ভাবিয়া দুই-একখানা পাঠ্য পুস্তকও গ্রহণ করিল, যদিও সে জানিত, নদীয়া জেলার সেই সুদূর পল্লীগ্রামে সেই সকল পুস্তকের মর্ম্ম গ্রহণ করিবার লোকের একান্তই অভাব।

সুটকেশ গুছাইয়া-রাখিয়া রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় আহারান্তে অমিয় শয়ন করিল। প্রতিদিন সে রাত্রি সাড়ে-দশটার পূর্ব্বে শয়ন না করিলেও, সে দিন ভোর-বেলা উঠিয়া "প্রস্তুত" হইতে হইবে, এজন্য সে রাত্রি দশটার পূর্ব্বেই শয়ন করিল। শয়ন করিয়াই তাহার মনে পড়িল, ইলেকট্রিক টর্চ্চটা ত লওয়া হয় নাই; পল্লীগ্রাম বন-জঙ্গলে পূর্ণ, রাত্রিতে কোথাও যাইতে হইলে অন্ধকারে শেষে কি সাপের ঘাড়ে পা চাপাইবে? ইহা ভাবিয়া সে তৎক্ষণাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া টর্চ্চটা দেরাজ হইতে বাহির করিয়া সুটকেশের মধ্যে রাখিয়া দিল।

রাত্রিতে অন্যান্য দিনের মত তাহার গাঢ় নিদ্রা হইল না। এক সময়, তাহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় সে মনে করিল, বোধ হয় রাত্রি শেষ হইয়াছে! তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া ঘড়ি দেখিল—তখন একটা বাজিয়া সতের মিনিট মাত্র!

অমিয় প্রত্যুষে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতেছিল, সেই সময় মা এক হাতে চায়ের পিয়ালা ও অন্য হাতে কিছু জলখাবার লইয়া আসিয়া বলিলেন, "শ্বশুরবাড়ী পৌছুতে বেলা দশটা-এগারটা হবে রে! পেট ভ'রে জল খেয়ে নে, নইলে পিত্তি প'ড়ে অসুখ ক'রবে।"

এমন সময় শ্রীকান্ত বাবু আসিয়া বলিলেন, "অমি, তোমার শ্বশুরের আড়তের মুহুরি বেণী ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে, তোমার কাপড়-ছাড়া হ'ল?"

অমিয়র মা বলিলেন, "হাঁ, অমি চা খাচ্ছে। তুমি বেণীকে চা দিয়ে এস। সে যদি অমির সঙ্গে মোগলপুরে যায়, তাহ'লে সে-ও একটু জল খেয়ে নিক।"

জলযোগান্তে অমিয় বেণীর সঙ্গে ট্যাক্সিতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাত্রা করিল।

ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া অমিয় বুকিং আফিসের দিকে অগ্রসর হইলে বেণী বলিল, "টিকিট কিনতে হবে না, কাল আমি টাউন-আফিসে টিকিট কিনে এনেছি।"—এই বলিয়া মনিব্যাগের ভিতর হইতে একখানা সেকেণ্ড ক্লাসের রিটার্ণ টিকিট বাহির করিয়া অমিয়র হাতে দিল ও বলিল, "আমি পাশের গাড়ীতে থাকব।"—বেণী দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্নিহিত একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণ করিল। যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

অমিয় হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিয়া দুই-একবার 'পশ্চিমে' গিয়াছিল, কিন্তু শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কখনও কোন দিকে যায় নাই। সে আশা করিয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে কিছু নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইবে, কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না। ই, আই, রেলপথে হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইতে পথের উভয় পার্শ্বে যেরূপ সমতল কৃষিক্ষেত্র, জলাভূমি, আম কাঠালের বাগান ও নিকটে বা দূরে গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, অমিয় এই রেলপথেও ঠিক তাহাই দেখিল ; অভিনব কোন দৃশ্য-শোভা দেখিতে না পাইয়া সে হতাশ এবং একটু বিরক্তই হইল। তাহার কামরায় এক জন ইংরেজ সহযাত্রী ছিলেন, তিনি বোধ হয় 'নেটিভ' সহযাত্রীর সহিত আলাপ-পরিচয় করা মর্য্যাদার হানিকর মনে করিয়া পেচকবৎ গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিলেন। অমিয় তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাইবেন ?"

সাহেব সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—"ক্যান্চ্রাপ্যারা।" আলাপ-পরিচয় এইখানেই শেষ হইল।

ইংরেজটি কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া গেল ; অমিয় সেই কক্ষে একাকী রহিল। একাকী নীরবে বসিয়া থাকা কষ্টকর, তাই অন্যমনস্ক হইবার জন্য অমিয় সুটকেশ হইতে একখানা পুস্তক বাহির করিয়া তাহাতে মনঃ-সংযোগের চেষ্টা করিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরেই ট্রেণ একটা ছোট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে বেণী আসিয়া বলিল, "জামাই বাবু, এসে প'ড়েছি, এইখানেই নামতে হবে, আসুন।"

বেণীর কথা শুনিয়া অমিয় তাড়াতাড়ি পুস্তকখানা সুটকেশে পুরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

৩

ষ্টেশন-মাষ্টার একাধারে একাধিক মূর্ত্তিতে সেই ষ্টেশনে বিরাজ করেন। তিনি ষ্টেশন-মাষ্টার, বুকিং-ক্লার্ক, সিগ্নেলার, টিকিট-কলেক্টর। এতদ্ভিন্ন প্রয়োজন হইলে ইংরেজ আরোহীর কুলীর কাজ করিয়াও 'মাই লার্ড'কে খুসী করেন! বেণী তাঁহার হাতে নিজের এবং অমিয়র টিকিট দুইখানা দিলে তিনি টিকিটের প্রথমার্দ্ধ ছিঁড়িয়া লইয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ বেণীকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইনি কে ?"

বেণী বলিল, "ছোট বাবুর জামাই।"

"ওঃ, এঁর জন্যেই বুঝি পাল্কী এসেছে ?"

পাল্কীর নিকট বেহারা চারি জন বসিয়াছিল, বেণীকে দেখিয়া তাহারা পাল্কী কাঁধে লইয়া দাঁড়াইলে বেণী অমিয়কে বলিল, "আপনি আগে পাল্কীতে উঠিয়া বসুন, আমি সুটকেশটা তুলে দিচ্ছি।"

জামাই বাবুকে লইয়া বেহারারা চির-অভ্যস্ত 'হিঁয়ো জোয়ান ভারী, শালু বড় ভারী' প্রভৃতি অস্ফুট হুঙ্কার ছাড়িতে-ছাড়িতে অগ্রসর হইল।

অমিয় কলিকাতায় পাল্কী অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু কখনও চড়ে নাই। সে সহজে রিক্সাতে চড়িত না, এক জন মানুষ আর এক জন মানুষকে গাড়ীতে বসাইয়া টানিয়া লইয়া যাইবে, ইহা তাহার নিকট অত্যন্ত বিশদৃশই মনে হইত। আজ পাল্কীতে উঠিয়া তাহার মনে হইল, এই ব্যবস্থা মানুষকে গাড়ীতে বসাইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া নয়, এ গাড়ী-শুদ্ধ আরোহীকে একেবারে কাঁধে বহিয়া লইয়া যাওয়া ;—চরম নির্দ্দয়তা ! কিন্তু উপায় নাই, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রে তাহার পক্ষে পাঁচ মাইল হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। অগত্যা সে নীরবে পাল্কীতে বসিয়া রহিল। ষ্টেশনের নিকটেই গ্রাম ; গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র, বোধ হয় পঞ্চাশ-যাট ঘর কৃষকের বাস, সকলেই কুটীরবাসী। গ্রামে সে একখানিও ইষ্টকালয় দেখিতে পাইল না। গ্রাম পার হইয়া পাল্কী আবার মাঠে পড়িল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পাল্কী আর একটা গ্রামে প্রবেশ করিল। এই গ্রামখানি অপেক্ষাকৃত বড় ; তবে কৃষকের গ্রাম। চারি দিকেই মেটে-ঘর, খড়ের চাল, মাঝে-মাঝে দুই-একটা কোঠা-ঘরও দেখা যাইতেছিল।

গ্রাম পার হইয়া বাহকরা এক বাগানে পাল্কী নামাইয়া বিশ্রাম করিতে বসিল। অমিয়ও পাল্কী হইতে বাহির হইয়া যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বাগানটি বেশ বড়, তিন-চারি শত আম-কাঁঠাল-জাম-নারিকেলের গাছ আছে। এক জন বেহারা একটা জামগাছে উঠিয়া ডাল নাড়া দিলে অপর তিন জন বেহারা জাম কুড়াইয়া গামছায় সঞ্চয় করিতে লাগিল। অমিয়রও ইচ্ছা হইল, দুই-চারিটা জামের স্বাদগ্রহণ করে, কিন্তু লজ্জায় সে চাহিতে পারিল না। যে বেহারা গাছে উঠিয়াছিল, সে খানিক পরে এক

কোঁচর জাম সহ গাছ হইতে নামিয়া অমিয়র কাছে গিয়া বলিল, "জামাই বাবু, জাম সেবা হবে ? আমি আপনার জন্যে বেছে-বেছে পাকা জাম তুলে আলাদা ক'রে এনেছি। এ বাগানের জাম ভারি মিষ্টি ; দুটো-চারটে সেবা হবে না ? সে একমুঠা জাম অমিয়র হাতে দিল। অমিয় একটা জাম মুখে দিয়া দেখিল, বাস্তবিকই অতি সুমিষ্ট এবং রসাল। সেরূপ বৃহৎ সুমিষ্ট জাম কলিকাতার বাজারে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বেহারা বলিল, "এই জামগুলো পাল্কীর ভেতরে থাক, বড় মাঠ দিয়ে যাবার সময় আপুনি পাল্কীতে বস্যা মজা কর্যা সেবা ক'রতি ক'রতি যাবা।"

জাম-ভক্ষণ এবং বিশ্রামের পর বাহকরা পাল্কী উঠাইয়া যাত্রা আরম্ভ করিল। বাগান হইতে বাহির হইয়া পাল্কী বড় মাঠে পড়িল। বাঁশ-ঝাড়, কলা-বাগান, সারি-সারি তেঁতুল গাছ, ও বাব্‌লা বন প্রভৃতির ভিতর দিয়া পাল্কী যে মাঠে পড়িল, তাহা সত্যই বড় মাঠ। কোন দিকে লোকালয় দৃষ্টিগোচর হইল না, অমিয়র অনুমান হইল, মাঠটা দুই মাইল হইবে। মাঝে-মাঝে পুষ্করিণী— পদ্মবনে আচ্ছন্ন, দুই-একটাতে শ্বেত বা লাল পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, সেই বড় মাঠে পড়িয়া অমিয় বেহারার প্রদত্ত সেই জামগুলির সদ্ব্যবহার করিতে বিস্মৃত হয় নাই।

বেহারারা একটা বটতলায় পাল্কী নামাইয়া আবার বিশ্রাম করিতে বসিলে অমিয় জিজ্ঞাসা করিল, "আর কত দূর ?"

এক জন বেহারা বলিল, আর পোয়াটাক্ পথ ; ঐ সামনেই মোগলপুর, বাবু !"

প্রায় দশ মিনিট বিশ্রামের পর বাহকেরা পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিল। বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় পাল্কী মোগলপুরে প্রবেশ করিল। অমিয়র শ্বশুরবাড়ী গ্রামের পূর্ব্ব-পাড়ার শেষ প্রান্তে অবস্থিত ; পাল্কী পশ্চিম পাড়া দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং অমিয় পথ হইতে গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল। পশ্চিম পাড়ায় দরিদ্র অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। গ্রামের মধ্যস্থলে হাটতলা ও বাজার। বাজার অর্থে কয়েকখানা মনোহারী দোকান, মিষ্টান্নের দোকান ও কাপড়ের দোকান। সপ্তাহে দুই দিন হাট হয়, হাটের সময় হাটতলা বহু লোকের কোলাহলে মুখরিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বদিন হাট হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য অমিয় হাটতলা নিস্তব্ধ ও জনশূন্য দেখিল। হাটতলা ছাড়িয়া পাল্কী পূর্ব্ব-পাড়ায় প্রবেশ করিলে অমিয় দেখিল, এই পল্লীতে অনেক ইষ্টকালয় রহিয়াছে, অমিয় বুঝিল, পূর্ব্ব-পাড়াতেই ভদ্র এবং সম্পন্ন গৃহস্থের বাস। এক স্থানে একটা অট্টালিকার ফটকে "Mogulpur H. E. School" লেখা দেখিয়া অমিয় বুঝিল, গ্রামে একটা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, সুতরাং সে গ্রামবাসীদিগকে যত নিরক্ষর ও অসভ্য বলিয়া অনুমান করিয়াছিল, তাহারা সেরূপ নহে, গ্রামে দুই-পাঁচ জন উচ্চশিক্ষিত লোকেরও বাস থাকিতে পারে।

অমিয় পাল্কীর ভিতর বসিয়া এক সময় একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিল, সেই সময় বাহকরা কখন্ একটা ফুলবাগানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল, সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। সহসা বাহকদের কণ্ঠ নীরব এবং পাল্কীর গতি রহিত হইলে অমিয় চকিত ভাবে চাহিয়া দেখিল, একটা বাটীর দ্বারদেশে পাল্কী থামিয়াছে, এবং সেই দ্বারের বাহিরে তাহার শ্বশুর পঞ্চানন বাবু দাঁড়াইয়া আছেন। অমিয় পাল্কী হইতে বাহির হইয়া শ্বশুরকে প্রণাম করিলে, পঞ্চানন বাবু পার্শ্বস্থিত এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিই আমার দাদা।"

অমিয় জ্যেষ্ঠশ্বশুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে তিনি অমিয়র হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "এস বাবা, পথে বোধ হয় খুব কষ্ট হ'য়েছে। যে পথ !" —অনন্তর তিনি অমিয়কে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

৪

পঞ্চানন বাবুর অগ্রজ রামেশ্বর বাবু অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া "বৌমা" বলিয়া ডাকিতেই সন্নিহিত একটা কক্ষ হইতে একটি যুবতী বাহির হইয়া আসিল। রামেশ্বর বলিলেন, "অমিয় এসেছেন, এঁকে উপরে নিয়ে যাও, ছোট বৌমা কোথা ?"

যুবতী বলিল, "কাকীমা এইখানেই ছিলেন, বোধ হয়, খোকাকে নিয়ে উপরে গেছেন। এস অমিয়, উপরে এস।"

অমিয় সেই যুবতীর সঙ্গে দ্বিতলের একটা কক্ষে প্রবেশ করিলে যুবতী বলিল, "এই ঘর তোমার। পাশের ঐ দরজা দিয়ে বাথ-রুমে যাওয়া যায়। এইখানে একটু জিরিয়ে নিয়ে স্নানের ঘরে গিয়ে স্নান ক'রো। ঐ আন্‌লাতে তোমার জন্য কাপড়, জামা—সবই গুছানো আছে।"

"বৌমা" অর্থাৎ রামেশ্বর বাবুর পুত্রবধূ নলিনী অমিয় অপেক্ষা বয়সে বড়; তাহার বয়স বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর হইবে। দেখিতে বেশ সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। তাহার আকৃতিতে এমন একটা ভাব আছে যে, দেখিলেই শ্রদ্ধা হয়। অমিয় একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিল, "আপনার ত পরিচয় পেলাম না; আপনাকে কি বলে ডাকব?"

নলিনী হাসিয়া বলিল, "আমার পরিচয়? আমি এই বাড়ীর বৌ, আমার নাম নলিনী। তোমার বৌ বিনোদিনী আমার খুড়তুত ননদ। আমাকে দিদি ব'লে ডাকলেও সাড়া পাবে, বৌদিদি ব'লে ডাকলেও সাড়া দেব।"

পরিচয় পাইয়া অমিয় বলিল, "তা'হলে আপনি ত আমার গুরুজন!"—সে নলিনীকে প্রণাম করিল।

নলিনী বলিল, "তোমার জন্য চা নিয়ে আসি, একটু ব'স।" নলিনী প্রস্থান করিলে অমিয় ভাবিল, 'এ বাড়ীতে তা'হলে চা খাওয়া চলে! আমি চা-গুলো ঘাড়ে ব'য়ে না আনলে ক্ষতি ছিল না।'—ক্ষণকাল পরে নলিনী চা ও কিছু মিষ্টান্ন লইয়া ফিরিয়া আসিল। একটা টেবিলের উপর চা ও মিষ্টান্ন রাখিয়া বলিল, "আমাদের এ পাড়াগাঁয়ে ভাল খাবার পাওয়া যায় না ত—তাই খাবার ঘরেই তৈয়েরী করতে হয়।"

অমিয় চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া বলিল, "চমৎকার সুগন্ধ! কলকাতায় এমন চা কখনও পাইনে। এ চা কি এইখানেই কেনা?"

নলিনী বলিল, "এখানে কি এমন চা পাওয়া যায়? বাবা দার্জ্জিলিং থেকে আসবার সময় এনেছিলেন।"

"জ্যাঠামশাই কি দার্জ্জিলিংএ বেড়াতে গিয়েছিলেন?

নলিনী বলিল, "বাবা দার্জ্জিলিংএ-ই থাকেন..."

নলিনীর কথায় বাধা দিয়া "অমিয় ভায়া এসেছেন না কি?" বলিতে বলিতে প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়স্ক, উন্নতকায়, হৃষ্ট-পুষ্ট সুশ্রী এক যুবা কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নলিনী মাথায় কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বলিল, "এই আসছেন, এখনও আধ ঘণ্টা হয়নি। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? বেলা এগারটা বাজে—স্নান করবে কখন?"

অমিয় বুঝিতে পারিল—এই যুবকই নলিনীর স্বামী—তাহার শ্যালক রণেন্দ্রনাথ। সে শুনিয়াছিল, তাহার জ্যেঠশ্বশুরের বড় ছেলের নাম রণেন্দ্রনাথ। রণেন্দ্র অমিয়কে বলিলেন, "ভায়া, আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, যখন বাড়ীতে থাকি, তখন বেলা বারটার পূর্ব্বে স্নান করি না। তোমরা কলকাতার ছেলে, তোমাদের সব কাজ ঘড়ি-ধ'রে। চা খেয়ে স্নান ক'রে নাও। বাবা আর কাকা স্নান করতে গেছেন, আমিও স্নান ক'রে আসি। তুমি বাড়ীতেই স্নান কর, অমিয়! পুকুরে স্নান করা তোমাদের অভ্যাস নাই। আমি এক ছটাক সর্ষের তেল গায়ে মেখে, এক ঘণ্টা ধ'রে পুকুরের জলে প'ড়ে না থাকলে, স্নান করলাম বলেই মনে হয় না। চল গো, রান্না কত দূর হ'ল, দেখ গিয়ে।"

নলিনী বলিল, "রান্না হয়ে এল, কাকীমা হেঁসেলে আছেন।" অনন্তর সে অমিয়কে বলিল, "বাথ-রুমে তোমার স্নানের জল আছে, স্নান ক'রে এস। ঐ আন্‌লায় কাপড় আছে, স্নান ক'রে প'রো।"

রণেন্দ্রের সহিত নলিনী প্রস্থান করিলে অমিয় স্নানের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেখানে একটা বড় বাথ-টব এবং চারিটা বালতি জলে পূর্ণ রহিয়াছে। একটা কুলুঙ্গিতে সাবান, গন্ধ তৈল, স্পঞ্জ, গামোছা ও তোয়ালে প্রভৃতি, এবং দেয়ালে একখানা আয়না, চিরুণী, ব্রাশ ইত্যাদি রহিয়াছে। সুটকেশ খুলিয়া তাহাকে আর স্নানের উপকরণ বাহির করিতে হইল না।

স্নানান্তে সে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়া দেখিল, নলিনী তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অমিয়কে দেখিয়া নলিনী বলিল, "পাশের ঘরে খাবার জায়গা হ'য়েছে। কাকীমা তোমার হাতে 'বাটা' দিয়ে তবে জল খাবেন। এই বলিয়া সে অমিয়কে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে গমন করিল।"—গমন করিবার সময়, বারান্দা হইতে অমিয় দেখিল, রণেন্দ্রনাথ স্নান করিয়া

গামোছা পরিয়া সিক্ত বস্ত্র-হস্তে উপরে উঠিতেছেন। তিনি অমিয়কে দেখিয়া বলিলেন, "ভায়ার স্নান হয়েছে? আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।" অতঃপর রণেন্দ্র বারান্দার রেলিংএ আপনার সিক্ত বস্ত্র শুকাইতে দিয়া বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

৫

আহারান্তে অমিয় তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলে নলিনী একটা ডিবাপূর্ণ পান আনিয়া অমিয়র হাতে দিয়া বলিল, "যদি এত দিনই বিরহ সহ্য করলে, তবে আরও আধ ঘণ্টা সহ্য ক'রে থাক। ঠাকুরঝি খেতে ব'সেছে, খাওয়া হ'লেই তোমার জিনিস তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে যাব।"—সে হাসিয়া প্রস্থান করিল।

অমিয় বাতায়নের নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিল, সেই কক্ষের নীচেই বাগান। বাগানের মধ্যস্থলে একটা বড় পুষ্করিণী, তাহাতে কয়েকটা লাল ও সাদা পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বাগানে আম, জাম, কাঁটাল, লিচু ও অনেকগুলা নারিকেল-গাছ রহিয়াছে। বাগানের অন্য দিকে গাছের উপর দিয়া বিস্তৃত মাঠ দেখা যাইতেছে। সে প্রায় দশ মিনিট এ-জানালা হইতে ও-জানালা হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া, নিজের শুট্‌কেশের নিকট গমন করিল, এবং তাহার ভিতর হইতে একখানা কলেজ-পাঠ্য পুস্তক বাহির করিল। সে পুস্তকখানা হাতে লইয়া শয্যায় শুইয়া অন্যমনস্ক ভাবে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে নলিনী বিনোদিনীকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এই নাও ভাই, তোমার জিনিস। আর বিরহ-শয়নে শুয়ে বই পড়তে হবে না। ওটা কি বই? ইংরিজী, না বাঙ্গালা?"

নলিনীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অমিয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া-বসিয়া বলিল, "এ একটা ইংরেজী বই।"

"এখন বই রেখে বৌকে কাছে নিয়ে ব'স, আমি আসি।"—সে দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

অমিয় বিনোদিনীকে কাছে বসাইয়া নানা কথার পর বলিল, "জ্যাঠাইমাকে ত দেখতে পেলাম না! তিনি কোথায়?"

বিনোদিনী বলিল, "আমি জন্মাবার পূর্ব্বেই তিনি মারা গিয়েছেন, তাঁকে আমি দেখিনি।"

"বৌদিদি বললে—জ্যাঠামশায় দার্জ্জিলিঙ্গে থাকেন।—উনি সেখানে কি করেন?"

"জ্যাঠামশাই ডাক্তার; দার্জ্জিলিঙ্গের সিভিল সার্জ্জন।"

"সিভিল-সার্জ্জন? উনি কি তবে বিলাত গিয়েছিলেন?"

"জ্যাঠামশাই পাঁচ-ছয় বার গিয়েছেন। আর বড় দাদা মোটে দু' বার।"

"বড় দাদা! বড় দাদাও বিলাত-ফেরৎ?"

"হাঁ, বড়দা প্রথমে সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গিয়ে প্রায় তিন বছর সেখানে ছিলেন। সেখান থেকে পাশ ক'রে দেশে ফিরে বিয়ে করেন। তার পর গেল-বছর এক বছরের ছুটী নিয়ে বৌদি'কে সঙ্গে ক'রে বিলাত যান। ওঁরাও আমার বিয়ের সময় এ দেশে ছিলেন না; গত বোশেখ মাসের গোড়াতে ওঁরা এসেছেন। এই জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত ওঁর ছুটী আছে; তার পর আবার কাজে যোগ দেবেন।"

"কি সর্ব্বনাশ! তুমি যে অবাক করলে! বড় দাদা কি জজ্ না ম্যাজিষ্ট্রেট?"

"ছুটী নেবার আগে উনি দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এবার আর কোথাও বদলী হবেন।"

"বৌদিদিও তাহ'লে ইংরিজী জানেন?"

"হাঁ, বৌদি'র যখন বিয়ে হয়, তখন উনি বি-এ পড়ছিলেন। বিয়ের পর উনি বি-এ, ও এম-এ পাশ করেন।"

"তোমার কথা আমার কেমন হেঁয়ালী ব'লে মনে হচ্ছে। তোমার বড়দা, যাঁর গলায় পৈতের গোছা, যিনি এক ছটাক সর্ষের তেল মেখে পুকুরে স্নান ক'রে গামোছা প'রে বাড়ী আসেন,—তিনি আই-সি-এস-ম্যাজিষ্ট্রেট! আর বৌদি'—লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী প'রে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে যিনি পরিবেষণ করেন, যার পায়ে আলতা, সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে নোয়া,—তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী, নিজেও এম-এ পাশ! এ হেঁয়ালী নয় ত কি? তুমিও বিলাত-ফেরৎ না কি?"

বিনোদিনী হাসিয়া বলিল, "হোতে হোতে ফোস্কে গেছি! বৌদি' বিলাত যাওয়ার সময় আমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবার যে মত হ'ল না! বাবা

বললেন, বিমুর বর যদি ওকে বিলাতে নিয়ে যায় ত যাবে, বিয়ের আগে যাওয়া ঠিক নয়। আমাকে তুমি বিলাতে নিয়ে যাবে? বল না?"

অমিয় বলিল, "দাঁড়াও, আগে হাঁফ নিই। জ্যাঠামশায় বিলাত-ফেরৎ, বড়দা, বৌদি' বিলাত-ফেরৎ, তবে বাবা বিলাতে না গিয়ে পোস্তার আড়তদার হ'লেন কেন?"

বিনোদিনী বলিল, "শুনেছি, বাবাও পূর্ব্বে সরকারী চাকরি করতেন, ভাগলপুর না পাটনা কোন্ কলেজে প্রোফেসারি—"

বাধা দিয়া অমিয় বলিল,—"বাবাও কি এম-এ না কি?"

বিনোদিনী বলিল, "হ্যাঁ, বাবা পি-আর-এস।"

সবিস্ময়ে অমিয় বলিল, "পি-আর-এস—আড়তদার!"

"শুনেছি, অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন।"

অমিয় বলিল, "তোমাকে বিয়ে ক'রে দেখ্‌ছি আমি ভুল ক'রেছি! আর বাবাও অত-বড় এক জন বিদ্বান হ'য়ে একটা আই-এ পাশ ছেলেকে জামাই ক'রলেন কি বলে?"

বিনোদিনী বলিল, "আই-এ পাশ বুঝি বি-এ, এম-এ হ'তে পারে না? তুমি আমায় বিয়ে ক'রে ভুল ক'রেছ কিসে?"

"যে বাড়ীতে শ্বশুর পি-আর-এস, জ্যেঠ-শ্বশুর আই-এম-এস; সম্বন্ধী আই-সি-এস, শ্যালাজ এম-এ,—সে বাড়ীতে আই-এ পাশ জামাই ঢাকের কাছে টেমটেমি! —ভুল নয়?

বিনোদিনী, বলিল, "এ ভুল শোধরানও তোমারই হাত। আই-এ পাশ না ক'রে কেউ ত একেবারে এম-এ হয় না।"

"তা বটে। যেমন ক'রে হ'ক, এ ভুল আমাকে শোধরাতেই হবে; না হ'লে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?"

প্রথম মিলনের পর নব-দম্পতির প্রেমালাপটা নূতন ধরণের নহে কি?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

অস্তরাগ

আজ কেন এলে…? কি কাজ তোমার বল?…
চুপ্ ক'রে কেন…? আঁখি কেন ছল-ছল?
বেনারসী সাড়ী সুকুমার তনু ঘিরে,—
চন্দন-লেখা এঁকেছ ললাট'পরে—
হাতে ওটা কি-ও?—ক'ণের কাজল-লতা?
বলো কি ব'লবে? কইছো না কেন কথা?

ভুলে যাবো আমি যা-কিছু অতীত স্মৃতি?
ভুলবো তোমায়? বলুলে কি ক'রে প্রীতি?
তুমি অন্যের—আজ থেকে মোর নয়!
বোল না ও-কথা, ও-যে কত জ্বালাময়!
"মিলবো আমরা জীবনের পরপারে"—?
কথা আছে আরো? বলো কি বলবে মোরে?
ও-কি দেখি দেখি! পুরাতন চিঠি ও-যে—
ও-তোমারি থাক্—আসবে না মোর কাজে!

মুখখানি কেন ম্লান হ'য়ে আসে অত?
কথাটা কি তবে হয়নি মনের মত?
মুছেই ফেল্‌তে চাও যে আমার স্মৃতি?
জানি, মেয়েদের চির কালই এই রীতি!
বেশ! দাও তবে,—কি করি বলো, এ নিয়ে,—?
এখনি চ'ললে? আজকে তোমার বিয়ে?
বেশ—যাও তবে! আবার প্রণাম কেন?
আশীষ ক'রবো? "চিরসুখী হও যেন!"

শ্রীঅমিতা দেবী।

ইতিহাসের অনুসরণ

কলিকাতার ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত

১

প্রথম হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

কলিকাতার পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে বহু আলোচনা নানা আকারেই প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু সকল আলোচনা বোধ হয় এখনও শেষ হয় নাই। কলিকাতা-অঞ্চল পূর্ব্বে কি ছিল, এবং বর্ত্তমানে উহা ধীরে ধীরে কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের সহিত ভৌগোলিক অবস্থানের সহযোগে আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ, দক্ষিণবঙ্গ যে সাগরগর্ভ হইতে উদ্ভূত, এ বিষয়ে বর্ত্তমান যুগে সন্দেহের কোন কারণ নাই। কোন্ অতীত যুগে বঙ্গসাগরের সুনীল বারি-বিস্তার রাজমহল-গিরির পাদদেশ বিধৌত করিয়া দূর-দিগন্তে প্রসারিত ছিল, আজ তাহার নিশ্চয়তা নাই। গুপ্তরাজবংশের শাসনকালে হুয়েন-সাং পর্য্যটন উপলক্ষে এ দেশে আসিয়া প্রাচীন বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্তি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ যুগে ফরিদপুর-অঞ্চলে স্বাধীন রাজা 'গোপচন্দ্র' রাজত্ব করিতেন; পাহাড়পুরের স্তুপ-খননের ফলে যে মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে—প্রায় দেড় সহস্র বৎসর তাহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে পৌরাণিক যুগ হইতেই উত্তর-বঙ্গের নাম গৌড়, এবং আসামের নাম ছিল প্রাগ্-জ্যোতিষ; সুতরাং বাঙ্গালার অধিকাংশই যে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সংগঠিত হইয়াছিল, ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহেই স্বীকার করিতে পারা যায়। কিন্তু এই গঠনকার্য্য মুখ্যতঃ ঘটিয়াছিল আগ্নেয়গিরির কার্য্যফলে। নদী-বাহিত পলি-মাটি দ্বারা এই ভূভাগ সংগঠিত হয় নাই। উত্তর-বঙ্গের জারিত লৌহ (Vertified iron) তাহার প্রমাণ। "লৌহার্ণব" গ্রন্থে কথিত আছে, বাঙ্গালার অসি অতি তীক্ষ্ণধার ছিল।

কিন্তু কলিকাতা-অঞ্চল সম্বন্ধে ঠিক এই উক্তির উপযোগিতা নাই। পূর্ব্বোক্ত আগ্নেয়গিরির কার্য্যফলে হয় ত এ অঞ্চলেরও খানিকটা অংশ সমুদ্র হইতে মাথা তুলিয়াছিল; কিন্তু তাহা ছিল কতকগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন দ্বীপের ন্যায়। "দহ" শব্দের অর্থ দ্বীপ, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী খড়্গদহ (খড়দা), ডুমুরদহ, চাকদহ, এঁড়িয়াদহ প্রভৃতি "দহ" নামধারী গ্রামগুলিকে ঐ দ্বীপ-সমষ্টির অংশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তখন এই দ্বীপপূর্ণ স্থান নিশ্চিতই বর্ত্তমান সুন্দরবনের ন্যায় নিবিড় অরণ্যরাশি দ্বারা আবৃত ছিল, এবং পরে বহু ধারায় প্রবাহিত নদীস্রোত ক্রমে পলি-মাটি দ্বারা উহাদিগকে সংযুক্ত করিতে করিতে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত করিয়াছে। এই যুক্তির সমর্থনে দুই-একটি প্রমাণও প্রদর্শিত হইতে পারে।

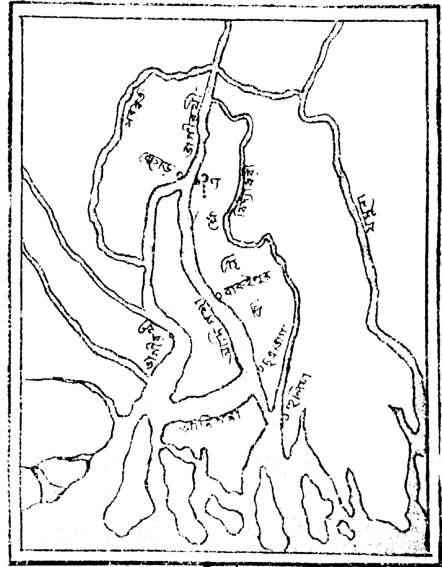
কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতার শিয়ালদহ-অঞ্চলে একটি পুষ্করিণী খননকালে ভূগর্ভ হইতে এক প্রকার কাল মাটির স্তর বাহির হইয়াছিল। অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সেই মাটি ভস্মে পরিণত হইয়াছিল; বিশেষজ্ঞগণের মতে উহা পুরাপুরি না হইলেও আংশিক ভাবে 'পীট' কয়লা। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার গড়ের মাঠেও পুষ্করিণী খননকালে মাটির ভিতর হইতে সুঁদরী-কাঠের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুঁড়ি বাহির হইয়াছিল। আবার অন্য এক স্থলে মাটির তলা হইতে হরিণের একটি সশৃঙ্গ কঙ্কালও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুতরাং সমগ্র কলিকাতা-অঞ্চলটি যে এককালে সুন্দর-বনেরই অংশ ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু কত কাল পূর্ব্বে এই অঞ্চলটি সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহার মীমাংসার ভার ভূতত্ত্ববিদের হস্তে অর্পণ করিয়া, কত দিন পূর্ব্বে এখানে জনবসতি ছিল, তাহাই অনুধাবনের চেষ্টা করিব। কালীঘাট-অঞ্চলে গুপ্ত-যুগের কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেকে মনে করেন, এই অঞ্চলটি সেই সময়েও মনুষ্যের বাসোপযোগী ছিল; কিন্তু মুদ্রাগুলি যে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের বহু পরে এখানে আনীত হয় নাই, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? হরি মিশ্রের কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আদিশূর

কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণকে কালীঘাট-অঞ্চলটি তীর্থবাসের জন্য প্রদান করা হয়; কিন্তু কালীঘাট নামটির আধুনিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই উক্তির প্রামাণিকত্বে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেনের এক দানপত্রে লক্ষিত হয় যে, "কালীক্ষেত্র" এক জন ব্রাহ্মণকে প্রদান করা হইল। এই দানপত্রের মৌলিকতায় সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই; সুতরাং ইহা ধরিয়া লইতে পারি যে, অন্ততঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে "কালীক্ষেত্র" অঞ্চলটি মনুষ্য কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল।

এই সময়ের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়, 'কালীক্ষেত্র' একটি বিস্তৃত ত্রিকোণাকার ভূখণ্ড বা দ্বীপ। এ স্থলে "ত্রিকোণাকার" ও "দ্বীপ" শব্দ দুইটি অর্থহীন নহে; তাৎকালিক ভৌগোলিক অবস্থান উহাদিগের সার্থকতা সম্পূর্ণ ভাবে সপ্রমাণ করিতেও সমর্থ। এই যুগে ভাগীরথী-প্রবাহ বর্তমানের অনুরূপ ছিল না; ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়াই মনে হয় যে, 'আদিগঙ্গাই' তখন ভাগীরথীর প্রধান ধারা ছিল। পরবর্তী কালে (১৫৪০ খৃঃ) রচিত হইলেও কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী' এই প্রবাহ সম্বন্ধে আমাদিগের মনে যে সুস্পষ্ট ধারণা উৎপাদন করে, তাহা এই,—

"ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়,
'চিৎপুর' 'শালিখা' সে এড়াইয়া যায়,
'কলিকাতা' এড়াইল বেণিয়ার বালা,
'বেতোড়ে'তে উত্তরিল অবসান-বেলা।
বেতাই চণ্ডীর পূজা কৈল সাবধানে,
'ধনস্থ গ্রাম' 'থানা' এড়াইল বামে।
ডাইনে এড়াইয়া যায় 'হিজলী'র পথ,
রাজহংস কিনিয়া—লইল পারাবত।
'কালীঘাট' এড়াইল বেণিয়ার বালা,
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান-বেলা।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভাগীরথী তখন বেতোড় বা ব্যাটরায় দুই ধারায় বিভক্ত ছিল; এক ধারা দক্ষিণমুখী হইয়া হিজলীর দিকে, এবং অপর ধারা বামমুখী হইয়া কালীঘাট দিয়া সমুদ্রের দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল। এই বামমুখী ধারার 'মজা' অংশ আজও বারুইপুর প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। হলওয়েল সাহেবও গোবিন্দপুরের দক্ষিণে এই খাতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ধারার শেষের দিকে সমুদ্রের নিকটে 'ছত্রভোগ' বলিয়া তীর্থক্ষেত্র ছিল। "কালীক্ষেত্র-দীপিকা" এবং "চৈতন্য-ভাগবত" উভয় গ্রন্থেই ছত্রভোগের নাম পাওয়া যায়। এই ধারায় অবস্থিত গ্রামগুলির মধ্যে চৌরাঘাট, জয়ঢালিয়া, ধনস্থান, বারুইপুর, হুলিয়া, ছত্রভোগ এবং হাতিয়াগড়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সুতরাং কালীক্ষেত্র ত্রিভুজাকার ভূখণ্ড হইলে উহার দুই ভুজ এক ভাগীরথী দ্বারাই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং তৃতীয় দিক অর্থাৎ পূর্ব্বের পার্শ্বে বিদ্যাধরী নদী অবস্থান করিয়া ত্রিভুজটিতে পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছিল। অবশ্য, মনে রাখিতে হইবে, আলোচ্য-যুগে আদিগঙ্গা, বিদ্যাধরী, এবং উত্তরে ত্রিবেণী হইতে উভয় দিকে সরস্বতী ও যমুনা



? কালীপীঠ

স্কেল - ১" = ২০ মাইল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর কলিকাতা-অঞ্চলের আনুমানিক মানচিত্র

প্রবলকায়া নদী ছিল, এবং এই সকল নদীর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রবাহ মধ্যে-মধ্যে এদিক-ওদিকে প্রবাহিত হইত।

কালীক্ষেত্রের এই ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকিলেও, এই যুগে ঠিক কোন্ স্থানটিতে কালীপীঠ বর্তমান ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ লক্ষিত হয়। এমন কি, শুনিতে পাওয়া যায়, এক মূর্খ ঘেসেড়াকে তাহার নবাগত ইংরেজ মনিব জিজ্ঞাসা করেন—এ স্থানের নাম

কি ? ঘেসেরা ভাবিল, ঘাস কবে কাটা হইয়াছে, তাহাই সাহেব জানিতে চাহেন—তাই সে সাহেবকে বলিয়াছিল, 'কাল কাটা।' সাহেব বুঝিলেন, স্থানটি 'কালকাট্টা।' কিন্তু বর্ত্তমানে অনেকেই স্বীকার করেন, 'কালীক্ষেত্র' হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং তাহাই সম্ভব। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ডিহি কলিকাতাকে সাতগাঁর অধীন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মুকুন্দরাম একই সঙ্গে কলিকাতা ও কালীঘাটকে স্বতন্ত্র স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং কলিকাতা নাম যে "কালীক্ষেত্র-দীপিকা" রচনার পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মিষ্টার ওয়ার্ডের মন্তব্যই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। তাঁহার মতে 'কালিকা-পা' অর্থাৎ কালিকা ছিলেন, এই অর্থ হইতেই কলিকাতা নামের উৎপত্তি। কোথায় 'কালিকা-পা' তাহারও হদিস পাওয়া অসম্ভব নয়। বর্ত্তমান কলিকাতার পাণপোস্তার উত্তর ২০৩ নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট—যেখানে পূর্ব্বে সাগর দত্তের পাটের কল ছিল, সেইখানেই প্রাচীন কালীপীঠের অবস্থান, এরূপ জনশ্রুতি বহু দিন হইতেই প্রচলিত আছে ; সে সময়ে বর্ত্তমান ষ্ট্রাণ্ড রোড গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, এবং নদীতীরে পাকাঘাটের (অর্থাৎ পোস্তার) পাড়ের উপর কালীমন্দির সংস্থাপিত ছিল। বোধ হয়, ইহা হইতে পাথুরিয়াঘাটা নামেরও সৃষ্টি।

এই জনশ্রুতি অবিশ্বাস করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। সম্ভবতঃ, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কালীমন্দির গঙ্গার তীরে পাণপোস্তার নিকটেই অবস্থিত ছিল। ঐ সময়ে বীরাচারী কাপালিকগণের প্রাচুর্ভাব ও আধিপত্য ছিল ; এবং কালীর সেবাধিকারও সম্ভবতঃ তাহাদেরই হাতে ছিল। কাপালিকগণের মহাকালীর উপাসনার পক্ষে জনমানববর্জ্জিত অরণ্যই প্রশস্ত স্থান,—কিন্তু এই যুগে উড়িষ্যা, হিজলীর পথে পর্ত্তুগীজ ও ডাচগণের জাহাজাদি গঙ্গার এই মুখ দিয়াই সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল ; আর্ম্মানিগণের পক্ষেও এই সময়ে কলিকাতার ধারাধারি উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়। মনে হয়, এই সমস্ত অসুবিধার জন্যই কাপালিকগণ লোক-চলাচলের পথে গঙ্গাতীরের এই মন্দিরে পূজা ও নরবলিদান অসুবিধাজনক বুঝিয়া গভীর জঙ্গলমধ্যে নদীর অপর মুখে বর্ত্তমান কালীঘাটের সন্নিহিত কোন স্থানে কালীপীঠকে অপসারিত করিয়াছিল। এই ভাবে স্থানান্তরিত করিবার সুবিধা এই ছিল যে, বাঁটরা হইতে গঙ্গার যে ধারা পূর্ব্ব-পার্শ্ব দিয়া সাগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, উহা বিদেশীদের জাহাজাদি চলাচলের পথে পড়ে নাই। বোধ হয়, এই জন্যই বল্লালের দানপত্রের পর হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কালীমূর্ত্তি বা কালীপীঠের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

২

১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ—১৬৯০ খৃষ্টাব্দ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের প্রামাণিক গ্রন্থ—"কালীক্ষেত্রদীপিকা।" এই গ্রন্থে বর্ত্তমান কালীমূর্ত্তি ও পীঠচিহ্নের আবিষ্কার সম্বন্ধে কয়েকটি কিম্বদন্তীর উল্লেখ আছে। বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের আদিপুরুষ না কি কোন সময়ে এক অলৌকিক আলোকচ্ছটার অনুসরণ করিয়া দেখিতে পান, জনৈক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ নদীতটে দেবীর পূজা করিতেছেন। অপর এক কিম্বদন্তী অনুসারে কোন এক শাঁখারী-ব্রাহ্মণকে দেবী না কি স্বয়ং দর্শন দিয়া, তাহার নিকট শাঁখা পরিয়াছিলেন, এবং পরে কালীকুণ্ডে অন্তর্দ্ধান করিয়া দৈববাণী দ্বারা পীঠ-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল কিম্বদন্তীর মধ্যে ঐতিহাসিক প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু দুইটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। প্রথম, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে যে কোন উপায়েই হউক, কাপালিকদিগের আনীত দেবী-পীঠ পুনরাবিষ্কৃত ও কালীঘাটে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; এবং দ্বিতীয়, এই সময়েই গঙ্গার আদি ধারা মজিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নচেৎ কালীকুণ্ডের অস্তিত্ব ও উহার গভীরতা সম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষত্ব আরোপের কারণ থাকিতে পারিত না।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতা-অঞ্চল দক্ষিণ-বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই সময়ে এ দেশ যে বহু-জনপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবিরাম-রচিত "দিগ্বিজয়-প্রকাশ"

(প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক) কালীঘাটকে প্রতাপাদিত্যের গঙ্গাবাস বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। নৈহাটিতেও এইরূপ আর একটি গঙ্গাবাস-বাটী ছিল; এখনও তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। "দিগ্বিজয়-প্রকাশ" খড়দা, মাহেশ, হরিপাল, সিঙ্গুর, ত্রিবেণী, চাকদা, ডুমুরদা, সপ্তগ্রাম, জগদ্দল, শিবপুর, বালী, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, বাঁশবেড়িয়া, খলসানি, ভাটপাড়া—প্রভৃতি বহু গ্রামেরই উল্লেখ করিয়াছে।

কলিকাতার আশপাশ এই ভাবে গড়িয়া উঠিলেও ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেও গোবিন্দপুর ভবানীপুর বা সুতানটী গ্রামের সৃষ্টি হয় নাই। তবে এই কালে চিৎপুর গ্রামের পত্তন হইয়াছিল। কবিকঙ্কণে চিৎপুর নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু গোবিন্দপুরের উল্লেখ নাই। চিৎপুর সম্বন্ধে জনপ্রবাদ যে, "চিতে" নামক কোন ডাকাত গঙ্গাতীরের এই বনে চিত্তেশ্বরী-কালিকা স্থাপন করিয়াছিল। বর্ত্তমানেও চিৎপুরে (বাগবাজার খাল ছাড়াইয়া উত্তরে) চিত্তেশ্বরী-কালিকা বর্ত্তমান আছেন। চিতে ডাকাত না কি এই দেবীর পূজা করিয়া ডাকাতি করিতে যাইত, এবং দেবীর তুষ্টির জন্য বহু নরবলি দিত। চিৎপুর রাস্তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এই রাস্তাই সেই যুগে গঙ্গাতীর দিয়া কালীঘাট এবং কালীঘাট অতিক্রম করিয়া গঙ্গাসাগর যাইবার পায়ে-হাঁটা পথ ছিল।

কবিকঙ্কণে দেখিতে পাই, বেতোড় ছাড়িয়া আদি-গঙ্গার প্রবেশ-মুখে প্রথম স্থান ধনস্ত গ্রাম। সম্ভবতঃ, উহাই "ধনীদের বাসস্থান" গোবিন্দপুর হইবে। তবে সে সময়ে গোবিন্দপুর নাম তেমন খ্যাতি লাভ করে নাই। গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধেও কয়েকটি জনশ্রুতি আছে; বোধ হয়, বর্ত্তমান হাটখোলার দত্তবংশের আদিপুরুষ গোবিন্দ দত্তের নাম হইতেই ধনস্ত গ্রামের নাম ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন এক সময় গোবিন্দপুর হইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহদেবতা গোবিন্দজীউর নাম হইতে গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি সন্দেহের বিষয়; প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্ত্তী "দিগ্বিজয়প্রকাশে" গোবিন্দপুরের নামোল্লেখ আছে।

এই সময়ে কলিকাতা-অঞ্চল এক দিকে যেরূপ সুরক্ষিত ছিল, অন্য দিকে তেমনি বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের লীলাক্ষেত্রস্বরূপ ঐতিহাসিক স্থানে পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে সরস্বতী-তীরবর্ত্তী সপ্তগ্রাম মোগল ফৌজদারের বাসস্থান এবং এ-অঞ্চলের প্রধান বন্দর। হিজলীর লবণ-কারখানাও সম্ভবতঃ এই যুগেই স্থাপিত হইয়াছিল; উড়িষ্যা-উপকূলে বালেশ্বর তখন বন্দর, তবে তমলুক সমুদ্র হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য এই কালে এ অঞ্চলে অনেকগুলি দুর্গ স্থাপন করেন। জগদ্দল, রায়গড়, মাতলা এবং কলিকাতা-সন্নিহিত বেহালা, শিবপুর (থানা), শালখিয়া, চিৎপুর ও মেটিয়া-বুরুজ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আদিগঙ্গা মজিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়াই উহার তীরে কোন দুর্গের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই।

প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে; তবে কলিকাতা-প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে যে, বাদশাহ-প্রেরিত সেনাপতি আজিম খাঁ এই কলিকাতাতেই রাজা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের জীবনের তাহা একটি উজ্জ্বলতম গৌরবের সময়।

বর্ত্তমান কলিকাতার জন্ম-ইতিহাসের সহিত বড়িশার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের নাম অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। ইঁহারাই প্রতাপাদিত্যের পর কলিকাতার আদি-জমিদার; ইঁহারাই বর্ত্তমান কালিকা দেবীর দেবোত্তর দান করেন, কালিকার পুরোহিতগণ ইঁহাদিগেরই আশ্রিত। মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ইতিহাসে প্রতাপের আত্মীয় কচুরায় এবং সাবর্ণ চৌধুরীদের আদিপুরুষ কামদেব বা জীয়ো গাঙ্গুলী ও কামদেবের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের যথেষ্ট হাত ছিল। 'ঘটক-কারিকা'য় বর্ণিত হইয়াছে,—

"মানসিংহ মহারাজ কাশীতে আছিল
জীয়োর (১) নিকটে তিঁহ উপদিষ্ট হৈল।
মানসিংহ গুরুপুত্র করে অন্বেষণ
কালীঘাটে পায় নাম লক্ষ্মীনারায়ণ (২)।

(১) জীয়ো বা জীয়ো গাঙ্গুলী মানসিংহের গুরু ছিলেন।

(২) লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহারই পুত্র; বর্ত্তমান সাবর্ণ চৌধুরীদের আদিপুরুষ মানসিংহের নিকট হইতে কালীঘাট ও কলিকাতা-অঞ্চলের জমিদারী লাভ করেন, এবং পরে পূর্ব্ববাসস্থান নিমতা গ্রাম ছাড়িয়া বড়িশায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন।

লক্ষ্মীর অতুল বিত্ত রায় চৌধুরী-খ্যাতি
কন্যাদানে কুলনাশে অশেষ দুর্গতি।
কালীঘাট কালী হৈল চৌধুরী-সম্পত্তি
হালদার পূজক তার এই ত বৃত্তি।"

এইরূপে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর কলিকাতা সাবর্ণ চৌধুরীদের জমিদারীভুক্ত হইয়াছিল। কালীঘাটের আদি-সেবাইত ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী (ব্রহ্মচারী) এই জীয়ো-পরিবারের আশ্রিত; কথিত আছে, ভুবনেশ্বর কালীঘাটের ফকিরডাঙ্গা অঞ্চলে বাস করিতেন। ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত ভুবনেশ্বরের কন্যার বিবাহ হয়, সম্ভবতঃ, তাহারই নাম অনুসারে বর্ত্তমান ভবানীপুর পল্লীর নামকরণ হইয়াছিল। কালিকার পূজারী হালদারগণ এই ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র-সন্তান। কালীঘাট তখন ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। উলানিবাসী বিপ্রদাস রচিত 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' (১৭শ শতাব্দী) গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—

"চলিল দক্ষিণ দেশ বালি ছাড়া অবশেষ
উপনীত যথা কালীঘাট;
দেখেন অপূর্ব্ব স্থান পূজা হোম বলিদান
দ্বিজগণে করে চণ্ডীপাঠ।"

প্রতাপাদিত্যের পতন ও সাবর্ণ চৌধুরীদের জমিদারী-লাভ প্রভৃতি ঘটনাকে ছাড়িয়া দিলেও, কয়েকটি বিশেষ ঘটনার জন্যও ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগকেই বর্ত্তমান কলিকাতার প্রারম্ভকাল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সরস্বতী নদী মজিতে আরম্ভ করিলে দক্ষিণ-বাঙ্গালার ব্যবসা-বাণিজ্যে এক নূতন যুগ উপস্থিত হইল। এই সময়ে সপ্তগ্রাম বন্দরের পতন আরম্ভ হইলে ব্যবসায়িগণ বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িতে থাকেন, এবং কলিকাতা অঞ্চল সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, হাটখোলার দত্ত-বংশের আদি-পুরুষের নাম হইতে গোবিন্দপুর নামের উদ্ভব হইয়াছে। এই সময়ে কলিকাতার আদিম অধিবাসী শেঠ ও বসাক-দের আদিপুরুষ মুকুন্দরাম শেঠ ও যাদবচন্দ্র বসাক গোবিন্দ-পুরে আসেন। বর্ত্তমান ঠাকুরবংশের আদিপুরুষ পঞ্চানন ঠাকুরও গোবিন্দপুরের পুরাতন অধিবাসী। কথিত আছে, "বামুন-ঠাকুরের" কাজ করিয়া তাঁহারা [illegible] সময়েই ঠাকুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ভূকৈলাসের জমিদার-বংশের আদিপুরুষ গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, রাজা নবকৃষ্ণের প্রপিতামহ সাবর্ণ চৌধুরীদের নায়েব রুক্মিণী-কান্ত, ইংরেজ বণিকদিগের প্রথম দোভাষী রতন সরকার প্রভৃতি এই গোবিন্দপুরেরই অধিবাসী। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই সময়ে গোবিন্দপুর এবং তৎসংলগ্ন ভবানীপুর গ্রাম বহু ভদ্রলোকের বাসস্থানে পরিণত হইয়াছিল।

গোবিন্দপুর গ্রামের উত্তরে গঙ্গার ধারে কলিকাতা। কলিকাতা নামের উদ্ভব বহু পূর্ব্বে হইলেও, কলিকাতা যে এই কালে কোন এ দেশীয় বিশিষ্ট লোক বা বংশ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল, এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। অবশ্য, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতার লালদীঘি অঞ্চলে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারী-বাড়ী ছিল, ও শ্যামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ে বড়বাজার অঞ্চলের প্রথম অধিবাসী মল্লিকবংশের আদিপুরুষ রাজারাম মল্লিক এবং দেওয়ান কাশীনাথের পিতা কাঠব্যবসায়ী পাঞ্জাবী মুলুকচাঁদ টণ্ডল। সম্ভবতঃ, সুতানটী গ্রামের পত্তনের পর এবং ইংরেজদিগের আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

এ দেশীয় লোকের বাস না থাকিলেও, এ সময়ে কলিকাতায় আর্ম্মানি ও পর্ত্তুগীজদিগের বাস ছিল। আর্ম্মানি-গির্জ্জা খননের ফলে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে একটি কবর বাহির হইয়া পড়ায় এ সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়তর হইয়াছে। যাঁহারা কলিকাতা নগরীকে প্রথম বাসোপযোগী করিয়াছিলেন, আর্ম্মানি সাহেব সুকিয়া (যাঁহার স্ত্রীর কবরে ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখ লিখিত আছে) বোধ হয়, তাঁহাদের অন্যতম। সুকিয়া ষ্ট্রীট ও রাধাবাজার অঞ্চলের সুকিয়া লেন নামের সঙ্গে এই আর্ম্মানি সুকিয়ার সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে।

বর্ত্তমান বড়বাজারের উত্তরে সুতানটী গ্রাম। সম্ভবতঃ, এই স্থলের হাট হইতেই সুতানটী গ্রামের নামের উদ্ভব হইয়াছিল। স্থায়ী বাসস্থান না হইলেও এ হাট যে অতি প্রাচীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। 'চণ্ডীকাব্যে' লিখিত আছে;—

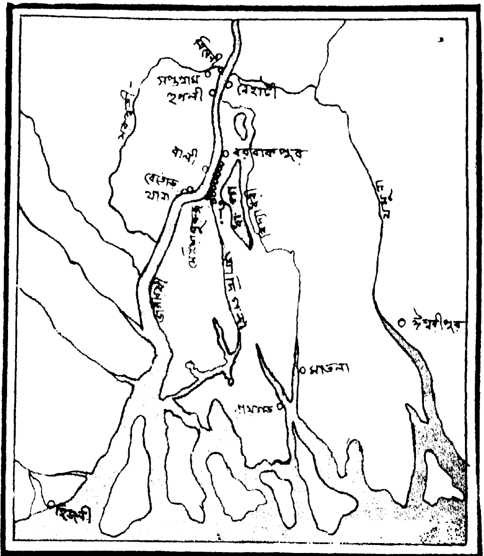
"ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান
দুই কূলে বসাইয়া বাট।
পাষাণে রচিত ঘাট দু'কূলে যাত্রীর নাট
কিঙ্করে বসায় নানা হাট।"

সুতানটীর হাটের পণ্য ছিল সুতা আর নটী। 'নটী' বা রূপজীবিনীর রূপের ব্যবসায়ের কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; নবাবী আমলে আর্মানি ও পর্তুগীজগণ এই নটীর ব্যবসায় করিয়াই প্রতিপত্তিশালী ধনাঢ্যগণের মনোরঞ্জন করিত, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কলিকাতার সন্নিহিত বরানগর প্রভৃতি স্থানেও যে এই ব্যবসায় চলিত, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সাবর্ণ চৌধুরীদের শ্যামরায়ের 'ছত্র' বা ছাতার তলায় হরির 'লুট' অর্থাৎ 'ছত্রলুটী' হইতে সুতানটী নামের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা কষ্টকল্পনা মাত্র। সরল ভাবে হাতেকাটা সুতা ও নটী বা গণিকার ব্যবসায় হইতে সুতানটী নামের উৎপত্তি—এ কথা মানিয়া লইতে কোন বাধা দেখা যায় না।

সুতানটীর উত্তরে বর্ত্তমান বাগবাজার খালের অপর পারে চিৎপুর। চিৎপুর গ্রামও এই সময়ে বাসোপযোগী হইয়াছে; সম্ভবতঃ শ্রীহরি ঘোষের (যাঁহার নাম হইতে হরি ঘোষ ষ্ট্রীট) পূর্ব্বপুরুষ মনোহর ঘোষ এখানকার আদি অধিবাসী ছিলেন। চিৎপুরের উত্তরে পর্ত্তুগীজদের বারনগর বা বরানগর এই সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ডাচ্ পরিব্রাজক সিজর ফ্রেডারিক মকুমা (মাকন্দা) ও বরবাকপুর (বারাকপুর) নামের উল্লেখ করায় আরও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমেই সাবেক কলিকাতা ও তাহার সন্নিহিত অংশগুলি ক্রমশঃ সুন্দর ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই সময়ের কলিকাতার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার উপায় নাই। ইহার প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পরে মিষ্টার জব চার্ণক কলিকাতা আসেন, তখন লবণহ্রদ বা ধাপা কলিকাতার পূর্ব্বে বিস্তৃত ছিল। কয়েকটি খাল নদী হইতে খনিত হইয়া এই ধাপায় পড়িয়াছে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে ধাপার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। বর্ত্তমানের মজা বিদ্যাধরী নদী ধাপার সহিত সংযুক্ত হইলেও, পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাধরী-প্রবাহ ধাপার পাশ দিয়া উত্তর দিকে প্রবাহিত হইত। সম্ভবতঃ, তখন ধাপার জলরাশির উপর বিদ্যাধরীর জোয়ার-ভাটার প্রভাব ছিল। দুই-দশ বৎসরে কোন নদীর পতন হয় না, বিশেষতঃ, জোয়ার-ভাটার অঞ্চলে। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর ধাপার কথা ভাবিলে স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বা তাহারও পূর্ব্বে কালীক্ষেত্রের পূর্ব্বসীমা বিদ্যাধরী মজিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ইংরেজ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে স্কুলপাঠ্য পুস্তকেও বলা হইয়া থাকে, ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কুঠীয়াল জব চার্ণক হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল জনমানবশূন্য কলিকাতা গ্রামে কোম্পানীর নিশান পুতিয়া বর্ত্তমান মহানগরীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন, আর দেখিতে-দেখিতে সহর ধনে-জনে



? দক্ষিণ হইতে — কালীঘাট, ডিহীপুর, গোবিন্দপুর, কলিকাতা-সুতানটী, চিৎপুর, বরানগর।
স্কেল - ১" = ২০ মাইল।

ইংরেজ-আগমনের পূর্ব্বেকার কলিকাতা-অঞ্চলের আনুমানিক মানচিত্র

পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।—কিন্তু সত্যের খাতিরে এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, জব চার্ণক কলিকাতায় আসিবার অন্ততঃ ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে এই নগরীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এবং সেই প্রতিষ্ঠাকার্য্য করিয়াছিলেন প্রধানতঃ আর্ম্মানি ফিরিঙ্গিগণ। অবশ্য আর্ম্মানি ফিরিঙ্গীরাও বনের মধ্যে আসিয়া বাস স্থাপন করেন নাই; তাঁহাদের আগমনকালেও অন্ততঃ—

(১) কালীঘাট ব্রাহ্মণ-প্রধান দেবীস্থান ছিল।

(২) ভবানীপুর ও গোবিন্দপুর সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল।

(৩) মেটিয়াবুরুজে এবং নদীর অপর পারে থানায় (শিবপুর) প্রতাপাদিত্যের আমলের দুর্গের ভগ্নাবশেষ অতীত গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ বিরাজ করিতেছিল।

(৪) কলিকাতার লালদীঘি অঞ্চলে বড়িশা বেহালার জমিদার চৌধুরীদের পাকা কাছারী-বাড়ী ও শ্যামরায় বিগ্রহের মন্দির ছিল।

(৫) গঙ্গার ধারে আর্মানি ও ফিরিঙ্গীটোলার নিকটে দুই-চার জন দেশীয় লোকের বসবাস ছিল।

(৬) সুতানটীর প্রসিদ্ধ হাটে নানা পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হইত।

(৭) সুতানটীর উত্তরে চিৎপুর গ্রামে চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির ও এ-দেশীয় লোকের বাস ছিল।

৩

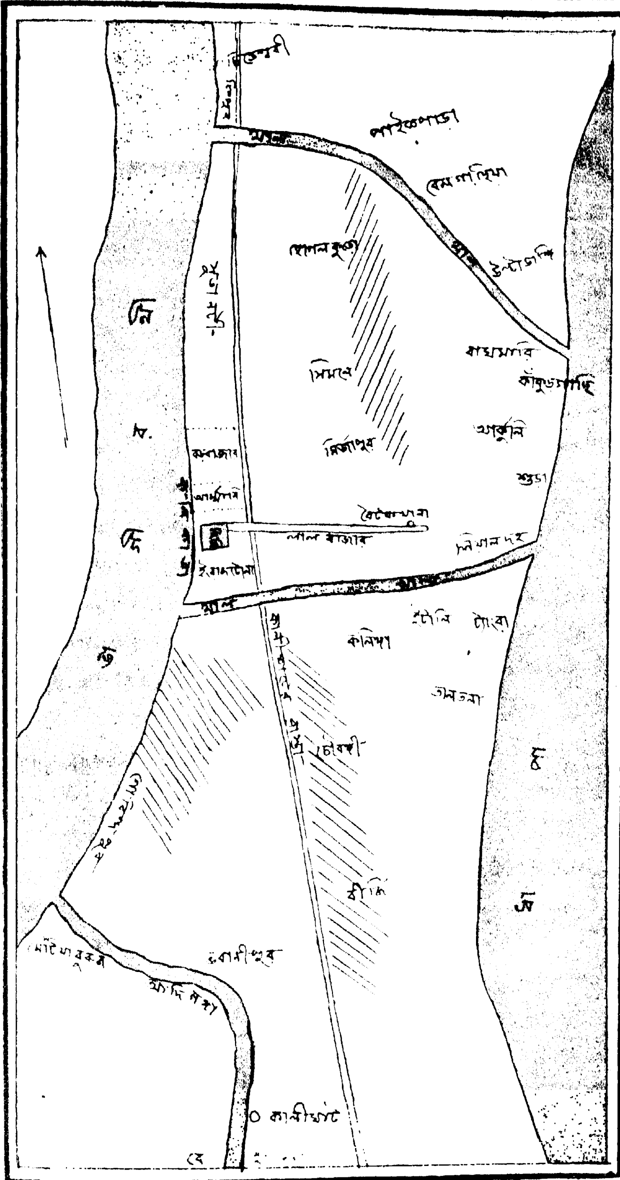
১৬৯০ খৃষ্টাব্দ—১৭১৭ খৃষ্টাব্দ

১৬৯০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের এক বিরস অপরাহ্ণে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, এমন সময়ে ইংরেজ কুঠীয়াল জব চার্ণকের জাহাজগুলি কলিকাতার ঘাটে আসিয়া লাগিল। কেবলমাত্র বাঙ্গালায় নয়, ভারতের ইতিহাসে উহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। জব চার্ণক বহুদিন এ দেশে বাস করিয়া এ দেশের আচার-ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য বুঝিয়া লইয়াছিলেন; বুদ্ধিমান এবং অসমসাহসিক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। কিন্তু এই দিনের এই ঘটনার ফলে উত্তরকালে ইংরেজ জাতির কিরূপ মহোপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় তিনি তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

কলিকাতার সহিত ইংরেজের পরিচয় এই প্রথম নয়। ইহার এগার বৎসর পূর্ব্বে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ-জাহাজ 'ফকন' হুগলীর নদী-পথে গোবিন্দপুরে নঙ্গর করে; ক্যাপ্টেন ষ্ট্যাফোর্ড এই সময়ে গোবিন্দপুরের শেঠদিগের নিকট হইতে ইংরেজের প্রথম দোভাষী রতন সরকারকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তার পর হুগলীতে ইংরেজের কুঠী স্থাপিত হইল; কিন্তু ফৌজদারের কাছারীর এত নিকটে কুঠী স্থাপন করিয়া কোম্পানি লাভবান হইতে পারিলেন না। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত সুবাদার সায়েস্তা খাঁর বিরোধ আরম্ভ হইল; ফলে হুগলীর ফৌজদারের ভয়ে জব চার্ণক মাল-পত্র লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি নিস্তার পাইলেন না; ফৌজদারের সিপাইদের ভয়ে তিনি দক্ষিণে হিজলীতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। হিজলীতে তখন লবণের কারখানা, এবং শাসনকর্ত্তা সেনাপতি মালেক কাশেম। জব চার্ণক বলপ্রকাশে হিজলী অধিকার করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু জ্বরের প্রকোপে তাঁহার অনুচরদের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের ভাগ্য প্রসন্ন হইল; সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মান্দ্রাজ হইতে নূতন অনুচরবর্গ সেখানে উপস্থিত হইল। জব চার্ণক কলিকাতায় আসিয়া নূতন করিয়া কুঠী স্থাপন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বেকার ঘরগুলি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

কিন্তু জব চার্ণক যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাহার সহিত বর্ত্তমান কলিকাতার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। তখন এই অঞ্চল অতি নিকৃষ্ট পল্লীগ্রাম। ইহার চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল, জঙ্গলের মধ্যে শৃগাল, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বাস। মাঝে-মাঝে এক-একটা জলা, তাহার মধ্যে কুমীরও দেখা যাইত; জঙ্গল ও জলার মধ্যে কিছু-কিছু স্থান পরিষ্কৃত, সেগুলি পশুচারণ-ক্ষেত্র, বা শস্যের মাঠ। তাহার নিকটে একটা করিয়া "ডিহি" বা উঁচু জমি, সেইগুলি গ্রাম। গঙ্গার ধারে-ধারে এইরূপ যে-কয়েকটি ডিহি ছিল, তাহাদের মধ্যে কলিকাতা একটি। কিন্তু গঙ্গার তীর হইতে একটু দূরে-দূরেও কতকগুলি ডিহির উল্লেখ ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের দলিলেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বৎসরই কলিকাতাকে নদীয়া জেলার গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

কোম্পানি যখন প্রথম এখানে আসেন, তখন তাঁহারা কুঠীয়াল বণিক মাত্র, তবে একটু জবরদস্ত বণিক বটে। তাঁহাদের প্রথম জমিদারী-স্বত্ব জন্মে—১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান আজিম ওশ্বানের সনন্দ-বলে। ঐ সময়ের



১৭১৭ সালের কলিকাতার আনুমানিক নক্‌সা

[illegible] পরে বড়িশা বেহালা জমিদারের নিকট হইতে পাট্টা লইয়া কোম্পানি কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানটী গ্রামের কর আদায় করিতে থাকেন। বড়িশা বেহালার জমিদারের লালদীঘিস্থ কাছারী-বাড়ীও কোম্পানীর সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে জরিপ হয়; তাহাতে বড়বাজারও একটি স্বতন্ত্র গ্রামরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ জরিপে দেখা যায় যে, বড়বাজারের ৪৪৮ বিঘা জমির মধ্যে ৪০১ বিঘাই বাস্তু এবং একটুও ধানি জমি নাই; কিন্তু গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সুতানটী অঞ্চলে যথেষ্ট পতিত ও ধানি জমি রহিয়াছে। বসত-বাড়ীর পরিমাণ কলিকাতায় ২৪৮ বিঘা, সুতানটীতে ১৩৪ বিঘা এবং গোবিন্দপুরে মাত্র ৫৮ বিঘা! ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ডাক্তার হ্যামিলটন সম্রাট্ ফরকশিয়ারের চিকিৎসা করিয়া কোম্পানির জন্য ৩৮খানি গ্রামের জমিদারী লাভ করেন; ঐ দলিলে পাইকপাড়া, হোগলকুঁড়ে, চিৎপুর, শ্রীরামপুর (ইটালি), উল্টাডিঙ্গি, কাঁকুড়গাছি, শুঁড়া, তিলতলা (তালতলা), কলিঙ্গা, বেলগাছিয়া, সিমলে, আর্কুলী, বাঘমারী, ট্যাংরা, শিয়ালদহ, বির্জ্জি, চৌরঙ্গী, মির্জাপুর প্রভৃতি বর্ত্তমান কলিকাতার বিভিন্ন অংশকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঐ সময়ের অবস্থা এখন ধারণা করিতে হইলে দুইটি খালের কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথম খালটি অধুনা বাগবাজার খাল নামে পরিচিত; গঙ্গা হইতে ইহা বহির্গত হইয়া, কলিকাতার পূর্ব্বপার্শ্বস্থ লবণ-জলার (ধাপা) সহিত মিলিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খালটির অস্তিত্ব বর্ত্তমান সময়ে বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল

"ক্রিক্ রো" নামটি উহার বিস্মৃতপ্রায় অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঐ খাল বর্ত্তমানের চাঁদপাল ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন-স্কোয়ার, ক্রিক্ রো অতিক্রম করিয়া বেলিয়াঘাটায় ধাপায় পড়িয়াছিল। খালটি যে খুব ছোট ছিল, এরূপ বলিবার উপায় নাই; কারণ, ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ তুফানে ঐ খালেই জাহাজডুবি হইয়াছিল। সে-কালের কলিকাতার দক্ষিণ-সীমা ছিল ঐ খাল, এবং উত্তর-সীমা ছিল বড়বাজার। বড়বাজারের উত্তরে সুতানটী অপর খালের সীমা অর্থাৎ বাগবাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই স্থানটুকুর মধ্যে বোধ হয় তেমন বন-জঙ্গল ছিল না; কারণ, ঐ সময়ে বড়বাজার অঞ্চলের প্রায় সব স্থানটুকুই বসত-বাড়ীতে পূর্ণ ছিল। বর্ত্তমান মুর্গীহাটা খোংরাপটি অঞ্চলে পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মানিরা, তার পর মল্লিকবংশের আদিপুরুষ রাজারাম এবং পঞ্জাবী সদাগর মুলুকচাঁদ ট্যাণ্ডন বাস করিতেন। রাজারাম মল্লিকের পুত্র দর্পনারায়ণ ও সন্তোষকুমার ঐ আমলের বিশেষ খ্যাতনামা লোক ছিলেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, কলিকাতা-অঞ্চলে ৪টি বাজার ছিল; যথা—বড়বাজার (নামটি সম্ভবতঃ বুড়ো শিবের বাজার হইতে উদ্ভূত) লালবাজার, মণ্ডীবাজার ও সন্তোষবাজার। সন্তোষবাজার উক্ত সন্তোষকুমার মল্লিকেরই প্রতিষ্ঠিত। মুলুকচাঁদ ট্যাণ্ডন বিখ্যাত কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার পুত্র কাশীনাথ পরবর্ত্তী কালে কোম্পানির দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পোস্তা রাজবংশের আদিপুরুষ নকু ধর বা লক্ষ্মীকান্ত ধর এই কালেরই অধিবাসী। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ এক সময়ে এই নকু ধরেরই মুহুরীগিরি করিতেন। নকু ধরের মুহুরী ভাগ্যবলে হইলেন শোভাবাজারের রাজা! সত্য ঘটনা উপন্যাস অপেক্ষা বিচিত্র নহে কি?

কলিকাতার শেষ-সীমা খালের নিকটবর্ত্তী স্থান সম্ভবতঃ গোচারণ ও কৃষিক্ষেত্র ছিল; গঙ্গার ধারে-ধারে কয়েক ঘর জেলেও বাস করিত। ইহার দক্ষিণে গোবিন্দপুর ডিহির অন্তর্গত বর্ত্তমান ফোর্ট অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত স্থানই নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল; ক্লাইভ নূতন দুর্গ স্থাপনের সময় ঐ সকল জঙ্গল সমূলে অপসারিত করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান হেষ্টিংসের দক্ষিণে গোবিন্দপুরের বসতি অঞ্চল। ঠাকুর-বংশের আদিপুরুষ গোবিন্দপুরবাসী পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম ও রামসন্তোষ কোম্পানির কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের জরিপ জয়রামেরই কীর্ত্তি। কথিত আছে, সুতানটীতে বৈষ্ণবচরণ শেঠের গঙ্গাজলের কারবার ছিল। সম্ভবতঃ বহু দূরদেশে গঙ্গাজল চালান দিয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। গঙ্গাহীন স্থানে গঙ্গাজলের মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল।

ঐ সময়ে পূর্ব্বসীমা ছিল—ধাপা বা লবণাক্ত জলা। কেহ-কেহ উহাকে লবণ-হ্রদ বলেন। কাছাকাছি স্থলে বহু জঙ্গল ও ডিহি ছিল। কতকগুলি ডিহিতে লোকালয় থাকিলেও, ঐ অঞ্চল সম্পূর্ণ অরক্ষিত বলিয়াই মনে হইত। বর্ত্তমান কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের পূর্ব্ব হইতে সমুদয় স্থান দস্যু-তস্করের আড্ডা বলিয়া বহু দিন যাবৎ তাহার অত্যন্ত দুর্নাম ছিল। চৌরঙ্গী ও তাহার দক্ষিণ বর্ত্তমান সেণ্ট পল গীর্জ্জা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদয় স্থল "বীর্জ্জিতলা" গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, চৌরঙ্গী গিরি নামক এক দশনামী সন্ন্যাসী এই অরণ্যে বাস করিতেন, তাঁহারই নামানুসারে উহার নাম চৌরঙ্গী। এই সময়ে একমাত্র পাল বাজার রাস্তা (তখনও বর্ত্তমান বৌবাজার নাম হয় নাই) বৈঠকখানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উইলসন সাহেবের ম্যাপে (১৭৫৩ খৃঃ) এই রাস্তাটি চিহ্নিত আছে। বৈঠকখানা নামটি অন্ততঃ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের পুরাতন।

"Pilgrim's Road" এই সময়ের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাস্তা। এই পথ চিৎপুরের (বাগবাজার খালের উত্তরে অবস্থিত) চিত্তেশ্বরী মন্দির হইতে বর্ত্তমান চিৎপুর, বেলুটী ষ্ট্রীট (কসাইটোলা) ক্রীক (খাল) পার হইয়া চৌরঙ্গীর পাশ দিয়া সোজা কালীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, এই রাস্তার পশ্চিমেই ইংরেজদের বাসভূমি—ইংরেজটোলা। আদিগঙ্গা এই সময়ে সম্পূর্ণরূপে ভরাট হইয়া গিয়াছিল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার সারমন উহার কিয়দংশের পঙ্কোদ্ধার করেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য।



ভাই

—শ্বেতা, এই ছাখ, কে এসেছে!

পিতার কণ্ঠ শুনিয়া রান্নাঘর হইতে মহাশ্বেতা বলিল—কে, বাবা?

যামিনীনাথ বলিলেন—এখানে আয়। তবে তো দেখ্‌বি।

বাহিরে আসিয়া পিতার পাশে অপরিচিতা একটি কিশোরীকে দেখিয়া কুতূহলী দৃষ্টিতে সে যামিনীনাথের দিকে চাহিল।

যামিনীনাথ হাসি-মুখে কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—চিনিস্‌?

মাথা নাড়িয়া মহাশ্বেতা জানাইল—না।

—তোর দিদি ঝঞ্ঝা।

—বুঝেছি! বলিয়া হাসি-মুখে ঝঞ্ঝাকে খপ্‌ করিয়া মহাশ্বেতা একটা প্রণাম করিল।

তাড়াতাড়ি বাধা দিতে গিয়া ঝঞ্ঝা বলিল—ও কি!

পিতাকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া মহাশ্বেতা বলিল—কিছু না! প্রণাম করলুম্‌।

—কেন?

—করবো না? আপনি যে আমার দিদি!

—ইস্‌! যদি এমন ভক্তি দেখাও, তাহলে ছু'দিনও আমি এখানে থাক্‌তে পারবো না।

যামিনী বলিলেন—তোর মা কোথায় রে, শ্বেতা?

—পূজো করছেন।

—খবর দে। তোর দিদি এসেছে!

মহাশ্বেতা জননীকে সংবাদ দিবার পূর্ব্বেই তিনি আসিলেন। স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় মুখখানি পরিপূর্ণ!

যামিনী বলিলেন—ঝঞ্ঝা, তোমার কাকিমা।

—ও—বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঝঞ্ঝা প্রণাম করিল।

সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখিয়া উমা দেবী বলিলেন—থাক্‌ মা! বেঁচে থাকো! দিদি, ছেলেমেয়েরা—সব ভালো?

—হ্যাঁ! আমি কাকা বাবুর সঙ্গে জোর করে পালিয়ে এসেছি, কাকিমা!

—বেশ করেছো, মা! নিজের বাড়ী, আস্‌বে বৈ কি!

—মা আস্‌তে দিচ্ছিল না। দাদা দার্জ্জিলিং গেল, আমাকেও সেইখানে যেতে বল্‌ছিল।

মহাশ্বেতা বলিল—দার্জ্জিলিং শুনেছি, খুব চমৎকার জায়গা!

—হ্যাঁ। তবে সেখানে আমি আর-বারে গিয়েছিলুম। পাড়াগাঁ দেখ্‌বার সাধ আমার অনেক দিন থেকে। মা বলে, পাড়াগাঁ ঐ গল্পে আর ছবিতেই ভালো, সেখানে গেলে ছু'দিন টাঁকা যায় না! আমি সে সব না শুনেই এলুম। দেখি, এখন কি হয়! বলিয়া ঝঞ্ঝা মৃদু হাসিল।

মহাশ্বেতা বলিল—থাক্‌তে যদি না পারা যাবে, তাহলে আমরা রয়েছি কি করে, মা?

—আমিও মাকে সেই কথা বললুম্‌!

কাপড় ছাড়িয়া-আসিয়া যামিনীনাথ বলিলেন—তোমরা এখনও ঝঞ্ঝাকে এইখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছো! ওকে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে-টেতে দাও!

উমা বলিলেন—এই যে যাই। ঝঞ্ঝাকে দেখে এত আহ্লাদ হয়েছে যে, ওর মুখখানিই দেখছি এতক্ষণ।

মহাশ্বেতা বলিল—আসুন দিদি আমার সঙ্গে।

অনুযোগপূর্ণ কণ্ঠে ঝঞ্ঝা বলিল—এ কিন্তু ভারী অন্যায় কাকিমা!

উমা দেবী তার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি অন্যায় মা?

—শ্বেতা আমাকে আপনি বলবে কেন?

—তুমি যে বড় হও!

—ভারী বড়! মার কাছে শুনেছি, শ্বেতা আমার চেয়ে মোটে আট মাসের ছোট। ও সব 'আপনি-টাপনি' বললে চলবে না কিন্তু!

—বেশ। আর বলবো না! এসো দিদি। এবার হলো তো?

২

মোহিনী এবং যামিনী সহোদর। ঝঞ্ঝা মোহিনীর কন্যা। জলপানির টাকা পাইয়া মোহিনী যখন কলিকাতায় আই-এ পড়িতে যাইতে চাহিল, পিতা রাজেশ্বর মৈত্র তখন অমত করিতে পারেন নাই। পিতা-মাতার পায়ের ধূলা এবং ছোট ভাই যামিনীকে আলিঙ্গন দিয়া মোহিনী যখন হর্ষ এবং বিষাদ-ভরা অন্তরে জনবিপুল নগরীর উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়িয়া বসিল, তখন অশ্রুভরা চোখে সে চাহিয়াছিল তাদের গ্রামের সেই মেটে-রাস্তাটির দিকে। প্ল্যাটফর্মের বাহিরে বেনওয়ারীর পাণবিড়ির দোকানে গ্রামোফোন বাজিতেছে; তার পাশে নিতাই ময়রার ছোট দোকানখানিতে জলযোগের জন্য পথিকের ভীড়!

সে আজ বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। আজ কোথায় মোহিনীর পিতা-মাতা, আর কোথায় বা তার দেশের জন্য কিশোর-মনের সে মমতা! মোহিনী আজ অফিসের বড় বাবু। মাসে চারশো টাকা তার আয়। কলিকাতায় নিজের বাড়ী। সহরে ধনীর কন্যা বিবাহ করিয়া দেশের সহিত সব সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়াছে। পিতা-বর্ত্তমানেই দেশে আসা এক প্রকার সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। মৈত্র মহাশয় পুত্রের ব্যবহারে অন্তরে ক্ষুণ্ণ হইলেও বাহিরে তা প্রকাশ করেন নাই। নিজে তিনি দেশের বাহিরে কখনও যান নাই। তাঁর পিতৃপুরুষের বহু জমি—কৃষাণদের সঙ্গে ভাগে ছিল। তাহাতে অন্নের অভাব কোন দিন হয় নাই, তাছাড়া গ্রামে কবিরাজীতে তাঁর সুনাম ছিল। যামিনীও অগ্রজের ন্যায় সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু দেশের উপর জ্যেষ্ঠ পুত্রের আস্থাহীনতা দেখিয়া মৈত্র মহাশয় কনিষ্ঠকে আর কলিকাতায় পাঠাইতে মত করেন নাই। পিতার ইচ্ছা-অনুযায়ী যামিনী ঘরে বসিয়া হোমিও-প্যাথী এবং কবিরাজী শিক্ষায় মন দিয়াছিল।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর মোহিনী আর দেশে আসে নাই। স্ত্রীর কথায় সে তার দেশের বিষয় বিক্রয় করিতে অভিলাষ করিয়া যামিনীকে চিঠি লেখে। যামিনী এ-সংবাদে অন্তরে অত্যন্ত বেদনা পায় এবং অগ্রজকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। যামিনী যখন দেখিল, সে বিষয় না লইলে তার দাদা অপরকে বিক্রয় করিতে দ্বিধা করিবে না, তখন পিতার নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে সে দেশের বিষয় লইল। মোহিনীর স্ত্রী ইহাতে খুশী হইয়াছিল। মৈত্র মহাশয়ের নগদ অর্থের পরিমাণ বড় কম ছিল না। সে টাকায় মোহিনীর মোটর এবং কলিকাতার বাড়ী—দুই হইয়া গিয়াছিল।

৩

কতকগুলি ঔষধপত্র আনিবার জন্য যামিনী কলি-কাতায় গিয়াছিল। কলিকাতায় গেলে সে দাদার বাড়ীতে উঠিত। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কাকাকে পাইলে বড় খুশী হয়—বিশেষ ঝঞ্ঝা। ঝঞ্ঝা তার সদানন্দ কাকাকে একটু বেশী ভালোবাসিত।

দেশের সঙ্গে ভাইয়ের মায়া ত্যাগ করিলেও মোহিনী যখন যামিনীকে দেখিত, তখন তার ভ্রাতৃ-স্নেহ সজাগ হইয়া উঠিত। যামিনী যখন গ্রামের গল্প করিত,—এখন সে গ্রামের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তখন মোহিনীর মনে জন্মভূমি দেখিবার লোভ হইত! কিন্তু পৈতৃক-বিষয় বিক্রয় করার লজ্জায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। যেখানে জন্ম, যেখানকার জল-বাতাসে শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছে, সেই পবিত্র মন্দির বিক্রয় করিয়া আজ সে অনুতপ্ত।

গড়গড়ার নল মুখে দিয়া অতীতের মধুর স্মৃতির চিন্তায় সে যখন বিভোর, তখন কন্যা ঝঞ্ঝা আসিয়া বলিল, —বাবা, আমার তো পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখানে চুপ্-চাপ্ ভালো লাগছে না! কোথাও বেড়াতে গেলে হয়!

কন্যার দিকে চাহিয়া মোহিনী বলিলেন - সোমেন দার্জ্জিলিং গেল—ওর সঙ্গে গেলে পারতিস্।

—সেখানে আমার যাবার ইচ্ছে নেই!

—তবে কোথায় যেতে চাস্?

—যেখানে যেতে চাই, সেখানে তুমি যেতে দেবে, বলো?

একটু হাসিয়া মোহিনী বলিলেন,—তোর কোন ইচ্ছেয় আমি বাধা দিয়েছি যে, এত ভাবনা হচ্ছে?

—তা দাওনি! কিন্তু যে জায়গায় যাবো ভেবেছি, সেখানে যাওয়ায় হয়তো তোমার মত না হ'তে পারে!

—জায়গার নাম বল্‌তো শুনি।

—দেশে।

—আমাদের গাঁয়ে?

—হ্যাঁ, বাবা!

—আমার অমত না হ'লেও তোমার মা কখনই মত দেবেন না।

—মা'র মত হবে না, সে কথা আমি জানি। শুধু মত হওয়া নয়, মা'র সম্পূর্ণ অমত—তবু আমি তোমার মত পেলে যেতে পারি। তুমি বলো বাবা, মানা করবে না? কাকা বাবুর মুখে সেখানকার কথা শুনে অনেক দিন থেকে আমার দেখবার সাধ! এই সব আমটাম আমরা এখানে কিনে খাই, তবু সে কত? কিন্তু কাকা বাবু বলেন, আমাদের বাগানে এত হয়, যা না কি বিক্রি করেও ওঁরা খেয়ে উঠ্‌তে পারেন না··· পাড়ার লোকেদের বিলিয়ে দ্যান!

মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া মোহিনী বলিল,—তা আমি জানি, ঝঞ্ঝা!

—তা তো জানবে! তুমি তো সেখানকারই ছেলে! আচ্ছা বাবা, তোমরা না কি ছেলেবেলায় গরমের ছুটীতে চাকু আর নুন্ নিয়ে দুপুরবেলায় কাঁচামিঠে-আম খাবার লোভে বাগানে যেতে?

—হুঁ।

—আর তোমাদের পুকুরে ছিপ্ দিয়ে নিজেরা মাছ ধরতে?

মোহিনীর বক্ষ ভেদ করিয়া একটা নিশ্বাস বাহির হইল। কি সুখের দিনই ছিল তখন!

ঝঞ্ঝা বলিল,—আমার এত ভালো লাগে বাবা! তুমিও যদি কাকা বাবুর মত দেশে থাক্‌তে! পুকুরের টাট্‌কা মাছ বিনি-পয়সায় কেমন পাওয়া যেত! আর কাকা বাবুর মত আমরাও কত গরু রাখ্‌তুম্!

তার পর সে পিতার জবাবের অপেক্ষা না করিয়া আবেগের সহিত বলিল,—আচ্ছা বাবা, আমরা যদি দেশে গিয়ে মাঝে মাঝে থাকি, তাহ'লে বেশ হয় না?

নিশ্বাস ফেলিয়া মোহিনী বলিলেন—না মা, তা হয় না!

—কেন?

—সে সব কথা তুমি বুঝবে না।

আবদারের সুরে ঝঞ্ঝা বলিল—না বুঝি, বুঝতে চাই না। আমাকে কিন্তু কাকা বাবুর সঙ্গে যেতে দিতে হবে—আমি যাবোই!

৪

উস্কখুস্ক মূর্ত্তি যামিনী বাড়ী ঢুকিয়া বলিলেন—শ্বেতা! শীগ্‌গির তোর মাকে ডাক্। আমাকে এখনি কলকাতায় যেতে হবে।

উমা দেবী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—কেন গা? সেখানকার সব খবর ভালো তো?

—না।

—কোনো চিঠি এসেছে?

—চিঠি আসেনি। চৌধুরী-মশায়ের ছেলে কাল এসেছে, তার মুখে শুনলুম, দাদা না কি সুইসাইড্ করেছে!

—জ্যাঠামশায় আত্মহত্যা করেছেন! বলিয়া মহাশ্বেতা কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে বসিয়া পড়িল!

উমা দেবীর মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না; আতঙ্কে তাঁর দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

যামিনী বলিলেন—শীগ্‌গির আমার জামা আর কিছু টাকা দাও। আর দেরী করলে ট্রেণ পাবো না।

কলিকাতায় আসিয়া মোহিনীর বাড়ীর দ্বারে যামিনী দেখিল, মোহিনীর শ্যালক মোটরে উঠিতেছে। যামিনীকে দেখিয়া সে বলিল—এই যে আপনি এসেছেন! ভালোই হলো। দেখুন দেখি, জামাই

বাবু কি বিভ্রাট বাধিয়েছেন! এখন যদি বেঁচে ওঠেন, তাহলেও কম ফ্যাসাদে পড়তে হবে না!

যামিনী এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! তাহা হইলে দাদা এখনও বাঁচিয়া আছেন! সে বলিল—এখন কেমন আছেন?

—ডাক্তাররা বলছেন, আর ভয় নেই। কিন্তু এদিকে আর এক সর্ব্বনাশ করে বসেছেন!

—আবার কি?

—সে সব কথা পথে দাঁড়িয়ে হয় না। ভিতরে আসুন, বলছি। বলিয়া প্রভাস যামিনীকে লইয়া মোহিনীর বসিবার ঘরে আসিল, বলিল—বসুন!

যামিনী বসিলে সে বলিল—কথাটা আপনাকে বলা প্রয়োজন। দিদি মেয়ে-মানুষ—তাঁকে এ সব কথা বলা যায় না, আর বাইরেও প্রকাশ করা চলে না। আমি মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছি। আপনি আসাতে আমার সাহস হলো। এত পয়সা উপায় করলেও জামাই বাবুর খরচ এত বেশী যে, কুলিয়ে উঠ্‌তে পারতেন না! কিছু দিন থেকে রেস্-খেলা আরম্ভ করেছেন। দু-একবার জিতে ছিলেন, তার পর লোকসান দিয়ে আস্‌ছেন। এর জন্য বাড়ীখানি পর্য্যন্ত বন্ধক পড়েছে। শুনছি, কাবলীর কাছেও আবার না কি ধার নিয়েছেন। সে টাকার তাগিদে অস্থির হয়ে অফিসের ক্যাশ থেকে পাঁচশো টাকা এনে তা শোধ করেন। ভেবেছিলেন, কাল রেসে জিতে টাকাটা রেখে দেবেন, কিন্তু কালও খুব হার হয়েছে! তার ওপর এই সোমবারে ওদের অফিস অডিট্ হবে—এই সব কারণে পাগলের মতো কাল সন্ধ্যার পর বন্দুক দিয়ে এই কাণ্ড করেন! খুব সৌভাগ্য যে, জখম গুরুতর হয়নি।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া যামিনী বলিল—দাদা কোথায়?

—হাসপাতালে।

—আমি যাই। তাঁকে একবার দেখে আসি।

—এখনি যাবেন? আমি বলছিলুম্ কি, এ সম্বন্ধে কি করলে ভালো হয়, সেটা ঠিক্ করলে হোত না? জ্ঞান হওয়ার পর জামাই বাবু আমার হাত দু'খানা ধরে বললেন,—বেঁচে উঠে আমার মরার বাড়া হলো যে ভাই! এখন যদি এ লজ্জা থেকে রক্ষা করতে পারো তবেই মুখ দেখাবো, না হলে আমাকে আবার এই পথ ধরতে হবে! আমি যে কি করবো, কিছু ঠিক করতে পারছিনে যামিনী বাবু!

যামিনী বলিল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! দাদার যাতে মান রক্ষা হয়, প্রাণ দিয়ে আমি তা করবো। আমি বেঁচে থাক্‌তে সামান্য টাকার জন্য এমন করে দাদার জীবন যাবে না!

৫

মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মোহিনী খাটের উপর শুইয়া আছে। মলিন-মুখে ঝঞ্ঝা পিতার পায়ের কাছে এবং তার মা একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন।

যামিনীকে দেখিয়া ঝঞ্ঝার দু'-চোখে অশ্রুর লহর বহিল।

কন্যার দিকে চাহিয়া সুরুচি দেবী বলিলেন—কাঁদছিস্ কেন? ডাক্তার এখনি বলে গেছেন, আর কোন ভয় নেই!

যামিনী বলিল—ঘুমুচ্ছেন?

সুরুচি বলিল—হ্যাঁ।

যামিনী দাদার দিকে চাহিয়া রহিল। এই তার সেই দাদা! শৈশব হইতে কৈশোর · দুই ভাই—একত্র আহার, খেলা এবং একই শয্যায় শয়ন! প্রতিবাসীরা মা'কে বলিত—'তোমার ছেলে দু'টি যেন রাম-লক্ষণ!' মোহিনীর সকল কাজে যামিনী ছিল সাথী। পিতার মৃত্যুর পর তার সেই দাদা যামিনীকে কখনও পত্র দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না! না দিন—তবু যামিনী জানে, তার জন্য দাদার অন্তরে স্নেহের অভাব নাই! আজ যামিনীর একমাত্র কাজ, এই মায়া-নগরীর হাত হইতে তার দাদাকে রক্ষা করা! দেনার দায়ে দাদার সহরের বাড়ীতে টান পড়িয়াছে—দাদা গৃহহীন হইবেন? অসম্ভব! যখন যামিনীর আশ্রয় আছে, তখন দাদার আশ্রয়ের ভাবনা কি!

যামিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে দেখিয়া ঝঞ্ঝা বলিল—বাবা, কাকা বাবু এসেছেন।

সুতানটীর হাটের পণ্য ছিল সুতা আর নটী। 'নটী' বা রূপজীবিণীর রূপের ব্যবসায়ের কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; নবাবী আমলে আর্ম্মানি ও পর্তুগীজগণ এই নটীর ব্যবসায় করিয়াই প্রতিপত্তিশালী ধনাঢ্যগণের মনোরঞ্জন করিত, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কলিকাতার সন্নিহিত বরানগর প্রভৃতি স্থানেও যে এই ব্যবসায় চলিত, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সাবর্ণ চৌধুরীদের শ্যামরায়ের 'ছত্র' বা ছাতার তলায় হরির 'লুট' অর্থাৎ 'ছত্রলুটী' হইতে সুতানটী নামের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা কষ্টকল্পনা মাত্র। সরল ভাবে হাতেকাটা সুতা ও নটী বা গণিকার ব্যবসায় হইতে সুতানটী নামের উৎপত্তি—এ কথা মানিয়া লইতে কোন বাধা দেখা যায় না।

সুতানটীর উত্তরে বর্ত্তমান বাগবাজার খালের অপর পারে চিৎপুর। চিৎপুর গ্রামও এই সময়ে বাসোপযোগী হইয়াছে; সম্ভবতঃ শ্রীহরি ঘোষের (যাঁহার নাম হইতে হরি ঘোষ ষ্ট্রীট) পূর্ব্বপুরুষ মনোহর ঘোষ এখানকার আদি অধিবাসী ছিলেন। চিৎপুরের উত্তরে পর্তুগীজদের বারনগর বা বরানগর এই সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ডাচ্ পরিব্রাজক সিজর ফ্রেডারিক মকুমা (মাকন্দা) ও বরবাকপুর (বারাকপুর) নামের উল্লেখ করায় আরও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমেই সাবেক কলিকাতা ও তাহার সন্নিহিত অংশগুলি ক্রমশঃ সুন্দর ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই সময়ের কলিকাতার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার উপায় নাই। ইহার প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পরে মিষ্টার জব চার্ণক কলিকাতা আসেন, তখন লবণহ্রদ বা ধাপা কলিকাতার পূর্ব্বে বিস্তৃত ছিল। কয়েকটি খাল নদী হইতে খনিত হইয়া এই ধাপায় পড়িয়াছে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে ধাপার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। বর্ত্তমানের মজা বিদ্যাধরী নদী ধাপার সহিত সংযুক্ত হইলেও, পূর্ব্ববর্তী বিদ্যাধরী-প্রবাহ ধাপার পাশ দিয়া উত্তর দিকে প্রবাহিত হইত। সম্ভবতঃ, তখন ধাপার জলরাশির উপর বিদ্যাধরীর জোয়ার-ভাটার প্রভাব ছিল। দুই-দশ বৎসরে কোন নদীর পতন হয় না, বিশেষতঃ, জোয়ার-ভাটার অঞ্চলে। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর ধাপার কথা ভাবিলে স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বা তাহারও পূর্ব্বে কালীক্ষেত্রের পূর্ব্বসীমা বিদ্যাধরী মজিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ইংরেজ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে স্কুলপাঠ্য পুস্তকেও বলা হইয়া থাকে, ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কুঠীয়াল জব চার্ণক হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল জনমানবশূন্য কলিকাতা গ্রামে কোম্পানীর নিশান পুতিয়া বর্ত্তমান মহানগরীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন, আর দেখিতে-দেখিতে সহর ধনে-জনে

P দক্ষিণ হইতে — কালীঘাট, ডিহি...পুর, গোবিন্দপুর, কলিকাতা-সুতানটী, চিৎপুর, বরানগর।
স্কেল - ১" = ২০ মাইল।

ইংরেজ-আগমনের পূর্ব্বেকার কলিকাতা-অঞ্চলের আনুমানিক মানচিত্র

পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।—কিন্তু সত্যের খাতিরে এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, জব চার্ণক কলিকাতায় আসিবার অন্ততঃ ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে এই নগরীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এবং সেই প্রতিষ্ঠাকার্য্য করিয়াছিলেন প্রধানতঃ আর্ম্মানি ফিরিঙ্গিগণ। অবশ্য আর্ম্মানি ফিরিঙ্গীরাও বনের মধ্যে আসিয়া বাস স্থাপন করেন নাই; তাঁহাদের আগমনকালেও অন্ততঃ—

(১) কালীঘাট ব্রাহ্মণ-প্রধান দেবীস্থান ছিল।

(২) ভবানীপুর ও গোবিন্দপুর সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল।

(৩) মেটিয়াবুরুজে এবং নদীর অপর পারে থানায় (শিবপুর) প্রতাপাদিত্যের আমলের দুর্গের ভগ্নাবশেষ অতীত গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ বিরাজ করিতেছিল।

(৪) কলিকাতার লালদীঘি অঞ্চলে বড়িশা বেহালার জমিদার চৌধুরীদের পাকা কাছারী-বাড়ী ও শ্যামরায় বিগ্রহের মন্দির ছিল।

(৫) গঙ্গার ধারে আর্ম্মানি ও ফিরিঙ্গীটোলার নিকটে দুই-চার জন দেশীয় লোকের বসবাস ছিল।

(৬) সুতানটীর প্রসিদ্ধ হাটে নানা পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হইত।

(৭) সুতানটীর উত্তরে চিৎপুর গ্রামে চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির ও এ-দেশীয় লোকের বাস ছিল।

৩

১৬৯০ খৃষ্টাব্দ—১৭১৭ খৃষ্টাব্দ

১৬৯০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের এক বিরস অপরাহ্ণে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, এমন সময়ে ইংরেজ কুঠীয়াল জব চার্ণকের জাহাজগুলি কলিকাতার ঘাটে আসিয়া লাগিল। কেবলমাত্র বাঙ্গালায় নয়, ভারতের ইতিহাসে উহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। জব চার্ণক বহুদিন এ দেশে বাস করিয়া এ দেশের আচার-ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য বুঝিয়া লইয়াছিলেন; বুদ্ধিমান এবং অসমসাহসিক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। কিন্তু এই দিনের এই ঘটনার ফলে উত্তরকালে ইংরেজ জাতির কিরূপ মহোপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় তিনি তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

কলিকাতার সহিত ইংরেজের পরিচয় এই প্রথম নয়। ইহার এগার বৎসর পূর্ব্বে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ-জাহাজ 'ফকন' হুগলীর নদী-পথে গোবিন্দপুরে নঙ্গর করে; ক্যাপ্টেন ষ্ট্যাফোর্ড এই সময়ে গোবিন্দপুরের শেঠদিগের নিকট হইতে ইংরেজের প্রথম দোভাষী রতন সরকারকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তার পর হুগলীতে ইংরেজের কুঠী স্থাপিত হইল; কিন্তু ফৌজদারের কাছারীর এত নিকটে কুঠী স্থাপন করিয়া কোম্পানি লাভবান হইতে পারিলেন না। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত সুবাদার সায়েস্তা খাঁর বিরোধ আরম্ভ হইল; ফলে হুগলীর ফৌজদারের ভয়ে জব চার্ণক মাল-পত্র লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি নিস্তার পাইলেন না; ফৌজদারের সিপাইদের ভয়ে তিনি দক্ষিণে হিজলীতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। হিজলীতে তখন লবণের কারখানা, এবং শাসনকর্ত্তা সেনাপতি মালেক কাশেম। জব চার্ণক বলপ্রকাশে হিজলী অধিকার করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু জ্বরের প্রকোপে তাঁহার অনুচরদের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের ভাগ্য প্রসন্ন হইল; সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মান্দ্রাজ হইতে নূতন অনুচরবর্গ সেখানে উপস্থিত হইল। জব চার্ণক কলিকাতায় আসিয়া নূতন করিয়া কুঠী স্থাপন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বেকার ঘরগুলি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

কিন্তু জব চার্ণক যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাহার সহিত বর্ত্তমান কলিকাতার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। তখন এই অঞ্চল অতি নিকৃষ্ট পল্লীগ্রাম। ইহার চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল, জঙ্গলের মধ্যে শৃগাল, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বাস। মাঝে-মাঝে এক-একটা জলা, তাহার মধ্যে কুমীরও দেখা যাইত; জঙ্গল ও জলার মধ্যে কিছু-কিছু স্থান পরিষ্কৃত, সেগুলি পশুচারণ-ক্ষেত্র, বা শস্যের মাঠ। তাহার নিকটে একটা করিয়া "ডিহি" বা উঁচু জমি, সেইগুলি গ্রাম। গঙ্গার ধারে-ধারে এইরূপ যে কয়েকটি ডিহি ছিল, তাহাদের মধ্যে কলিকাতা একটি। কিন্তু গঙ্গার তীর হইতে একটু দূরে-দূরেও কতকগুলি ডিহির উল্লেখ ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের দলিলেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বৎসরই কলিকাতাকে নদীয়া জেলার গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

কোম্পানি যখন প্রথম এখানে আসেন, তখন তাঁহারা কুঠীয়াল বণিক মাত্র, তবে একটু জবরদস্ত বণিক বটে। তাঁহাদের প্রথম জমিদারী-স্বত্ব জন্মে—১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান আজিম ওশ্মানের সনন্দ-বলে। ঐ সময়ের

জঙ্গল —
স্কেল ১" = ১ মাইল।

১৭১৭ সালের কলিকাতার আনুমানিক নক্সা

কিছু পরে বড়িশা বেহালা জমিদারের নিকট হইতে পাট্টা লইয়া কোম্পানি কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও স্থতানটী গ্রামের কর আদায় করিতে থাকেন। বড়িশা বেহালার জমিদারের লালদীঘিস্থ কাছারী-বাড়ীও কোম্পানীর সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে জরিপ হয়; তাহাতে বড়বাজারও একটি স্বতন্ত্র গ্রামরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ জরিপে দেখা যায় যে, বড়বাজারের ৪৪৮ বিঘা জমির মধ্যে ৪০১ বিঘাই বাস্তু এবং একটুও ধানি জমি নাই; কিন্তু গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও স্থতানটী অঞ্চলে যথেষ্ট পতিত ও ধানি জমি রহিয়াছে। বসত-বাড়ীর পরিমাণ কলিকাতায় ২৪৮ বিঘা, স্থতানটীতে ১৩৪ বিঘা এবং গোবিন্দপুরে মাত্র ৫৮ বিঘা। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ডাক্তার হ্যামিলটন সম্রাট্ ফরকশিয়ারের চিকিৎসা করিয়া কোম্পানির জন্য ৩৮খানি গ্রামের জমিদারী লাভ করেন; ঐ দলিলে পাইকপাড়া, হোগলকুঁড়ে, চিৎপুর, শ্রীরামপুর (ইটালি), উল্টাডিঙ্গি, কাঁকুড়গাছি, শুঁড়া, তিলতলা (তালতলা), কলিঙ্গা, বেলগাছিয়া, সিমলে, আকুলী, বাঘমারী, ট্যাংরা, শিয়ালদহ, বির্জ্জি, চৌরঙ্গী, মির্জাপুর প্রভৃতি বর্ত্তমান কলিকাতার বিভিন্ন অংশকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঐ সময়ের অবস্থা এখন ধারণা করিতে হইলে দুইটি খালের কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথম খালটি অধুনা বাগবাজার খাল নামে পরিচিত; গঙ্গা হইতে ইহা বহির্গত হইয়া, কলিকাতার পূর্ব্বপার্শ্বস্থ লবণ-জলার (ধাপা) সহিত মিলিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খালটির অস্তিত্ব বর্ত্তমান সময়ে বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল

"ক্রিক্ রো" নামটি উহার বিস্মৃতপ্রায় অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঐ খাল বর্ত্তমানের চাঁদপাল ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন-স্কোয়ার, ক্রিক্ রো অতিক্রম করিয়া বেলিয়াঘাটায় ধাপায় পড়িয়াছিল। খালটি যে খুব ছোট ছিল, এরূপ বলিবার উপায় নাই; কারণ, ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ তুফানে ঐ খালেই জাহাজডুবি হইয়াছিল। সে-কালের কলিকাতার দক্ষিণ-সীমা ছিল ঐ খাল, এবং উত্তর-সীমা ছিল বড়বাজার। বড়বাজারের উত্তরে সুতানটী অপর খালের সীমা অর্থাৎ বাগবাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই স্থানটুকুর মধ্যে বোধ হয় তেমন বন-জঙ্গল ছিল না; কারণ, ঐ সময়ে বড়বাজার অঞ্চলের প্রায় সব স্থানটুকুই বসত-বাড়ীতে পূর্ণ ছিল। বর্ত্তমান মুর্গীহাটা খোংরাপটি অঞ্চলে পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মানিরা, তার পর মল্লিকবংশের আদিপুরুষ রাজারাম এবং পঞ্জাবী সদাগর মুলুকচাঁদ ট্যাণ্ডন বাস করিতেন। রাজারাম মল্লিকের পুত্র দর্পনারায়ণ ও সন্তোষকুমার ঐ আমলের বিশেষ খ্যাতনামা লোক ছিলেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, কলিকাতা-অঞ্চলে ৪টি বাজার ছিল ; যথা—বড়বাজার (নামটি সম্ভবতঃ বুড়ো শিবের বাজার হইতে উদ্ভূত) লালবাজার, মণ্ডীবাজার ও সন্তোষবাজার। সন্তোষবাজার উক্ত সন্তোষকুমার মল্লিকেরই প্রতিষ্ঠিত। মুলুকচাঁদ ট্যাণ্ডন বিখ্যাত কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার পুত্র কাশীনাথ পরবর্ত্তী কালে কোম্পানির দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পোস্তা রাজবংশের আদিপুরুষ নকু ধর বা লক্ষ্মীকান্ত ধর এই কালেরই অধিবাসী। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ এক সময়ে এই নকু ধরেরই মুহুরীগিরি করিতেন। নকু ধরের মুহুরী ভাগ্যবলে হইলেন শোভাবাজারের রাজা! সত্য ঘটনা উপন্যাস অপেক্ষা বিচিত্র নহে কি ?

কলিকাতার শেষ-সীমা খালের নিকটবর্ত্তী স্থান সম্ভবতঃ গোচারণ ও কৃষিক্ষেত্র ছিল ; গঙ্গার ধারে-ধারে কয়েক ঘর জেলেও বাস করিত। ইহার দক্ষিণে গোবিন্দপুর ডিহির অন্তর্গত বর্ত্তমান ফোর্ট অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত স্থানই নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল ; ক্লাইভ নূতন দুর্গ স্থাপনের সময় ঐ সকল জঙ্গল সমূলে অপসারিত করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান হেষ্টিংসের দক্ষিণে গোবিন্দপুরের বসতি অঞ্চল। ঠাকুর-বংশের আদিপুরুষ গোবিন্দপুরবাসী পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম ও রামসন্তোষ কোম্পানির কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের জরিপ জয়রামেরই কীর্ত্তি। কথিত আছে, সুতানটীতে বৈষ্ণবচরণ শেঠের গঙ্গাজলের কারবার ছিল। সম্ভবতঃ বহু দূর-দেশে গঙ্গাজল চালান দিয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। গঙ্গাহীন স্থানে গঙ্গাজলের মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল।

ঐ সময়ে পূর্ব্বসীমা ছিল—ধাপা বা লবণাক্ত জলা। কেহ-কেহ উহাকে লবণ-হ্রদ বলেন। কাছাকাছি স্থলে বহু জঙ্গল ও ডিহি ছিল। কতকগুলি ডিহিতে লোকালয় থাকিলেও, ঐ অঞ্চল সম্পূর্ণ অরক্ষিত বলিয়াই মনে হইত। বর্ত্তমান কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের পূর্ব্ব হইতে সমুদয় স্থান দস্যু-তস্করের আড্ডা বলিয়া বহু দিন যাবৎ তাহার অত্যন্ত দুর্নাম ছিল। চৌরঙ্গী ও তাহার দক্ষিণ বর্ত্তমান সেণ্ট পল গীর্জ্জা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদয় স্থল "[illegible]" গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, চৌরঙ্গী গিরি নামক এক দশনামী সন্ন্যাসী এই অরণ্যে বাস করিতেন, তাঁহারই নামানুসারে উহার নাম চৌরঙ্গী। এই সময়ে একমাত্র পাল বাজার রাস্তা (তখনও বর্ত্তমান বৌবাজার নাম হয় নাই) বৈঠকখানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উইলসন সাহেবের ম্যাপে (১৭৫৩ খৃঃ) এই রাস্তাটি চিহ্নিত আছে। বৈঠকখানা নামটি অন্ততঃ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের পুরাতন।

"Pilgrim's Road" এই সময়ের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাস্তা। এই পথ চিৎপুরের (বাগবাজার খালের উত্তরে অবস্থিত) চিত্তেশ্বরী মন্দির হইতে বর্ত্তমান চিৎপুর, বেলটী ষ্ট্রীট (কসাইটোলা) ক্রীক (খাল) পার হইয়া চৌরঙ্গীর পাশ দিয়া সোজা কালীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, এই রাস্তার পশ্চিমেই ইংরেজদের বাসভূমি—ইংরেজটোলা। আদিগঙ্গা এই সময়ে সম্পূর্ণরূপে ভরাট হইয়া গিয়াছিল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার সারমন উহার কিয়দংশের পঙ্কোদ্ধার করেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য।



ভাই

—শ্বেতা, এই ভাখ, কে এসেছে!

পিতার কণ্ঠ শুনিয়া রান্নাঘর হইতে মহাশ্বেতা বলিল—কে, বাবা?

যামিনীনাথ বলিলেন—এখানে আয়। তবে তো দেখ্‌বি।

বাহিরে আসিয়া পিতার পাশে অপরিচিতা একটি কিশোরীকে দেখিয়া কুতূহলী দৃষ্টিতে সে যামিনীনাথের দিকে চাহিল।

যামিনীনাথ হাসি-মুখে কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—চিনিস্?

মাথা নাড়িয়া মহাশ্বেতা জানাইল—না।

—তোর দিদি ঝঞ্ঝা।

—বুঝেছি! বলিয়া হাসি-মুখে ঝঞ্ঝাকে খপ্ করিয়া মহাশ্বেতা একটা প্রণাম করিল।

তাড়াতাড়ি বাধা দিতে গিয়া ঝঞ্ঝা বলিল—ও কি!

পিতাকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া মহাশ্বেতা বলিল—কিছু না! প্রণাম করলুম্।

—কেন?

—করবো না? আপনি যে আমার দিদি!

—ইস্! যদি এমন ভক্তি দেখাও, তাহলে দু'দিনও আমি এখানে থাকতে পারবো না।

যামিনী বলিলেন—তোর মা কোথায় রে, শ্বেতা?

—পূজো করছেন।

—খবর দে। তোর দিদি এসেছে!

মহাশ্বেতা জননীকে সংবাদ দিবার পূর্ব্বেই তিনি আসিলেন। স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় মুখখানি পরিপূর্ণ!

যামিনী বলিলেন—ঝঞ্ঝা, তোমার কাকিমা।

—ও—বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঝঞ্ঝা প্রণাম করিল।

সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখিয়া উমা দেবী বলিলেন—থাক্ মা! বেঁচে থাকো! দিদি, ছেলেমেয়েরা—সব ভালো?

—হ্যাঁ! আমি কাকা বাবুর সঙ্গে জোর করে পালিয়ে এসেছি, কাকিমা!

—বেশ করেছো, মা! নিজের বাড়ী, আস্‌বে বৈ কি!

—মা আস্‌তে দিচ্ছিল না। দাদা দার্জ্জিলিং গেল, আমাকেও সেইখানে যেতে বল্‌ছিল।

মহাশ্বেতা বলিল—দার্জ্জিলিং শুনেছি, খুব চমৎকার জায়গা!

—হ্যাঁ। তবে সেখানে আমি আর-বারে গিয়েছিলুম। পাড়া-গাঁ দেখ্‌বার সাধ আমার অনেক দিন থেকে। মা বলে, পাড়াগাঁ ঐ গল্পে আর ছবিতেই ভালো, সেখানে গেলে দু'দিন টাঁ্যাকা যায় না! আমি সে সব শুনেই এলুম। দেখি, এখন কি হয়! বলিয়া ঝঞ্ঝা মৃদু হাসিল।

মহাশ্বেতা বলিল—থাক্‌তে যদি না পারা যাবে, তাহলে আমরা রয়েছি কি করে, মা?

—আমিও মাকে সেই কথা বললুম্!

কাপড় ছাড়িয়া-আসিয়া যামিনীনাথ বলিলেন—তোমরা এখনও ঝঞ্ঝাকে এইখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছো! ওকে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে-টেতে দাও!

উমা বলিলেন—এই যে যাই। ঝঞ্ঝাকে দেখে এত আহ্লাদ হয়েছে যে, ওর মুখখানিই দেখছি এতক্ষণ।

মহাশ্বেতা বলিল—আসুন দিদি আমার সঙ্গে।

অনুযোগপূর্ণ কণ্ঠে ঝঞ্ঝা বলিল—এ কিন্তু ভারী অন্যায় কাকিমা!

উমা দেবী তার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি অন্যায় মা?

—শ্বেতা আমাকে আপনি বল্‌বে কেন?

—তুমি যে বড় হও!

—ভারী বড়! মার কাছে শুনেছি, শ্বেতা আমার চেয়ে মোটে আট মাসের ছোট। ও সব 'আপনি-টাপনি' বল্‌লে চলবে না কিন্তু!

—বেশ। আর বলবো না! এসো দিদি। এবার হলো তো?

২

মোহিনী এবং যামিনী সহোদর। ঝঞ্ঝা মোহিনীর কন্যা। জলপানির টাকা পাইয়া মোহিনী যখন কলিকাতায় আই-এ পড়িতে যাইতে চাহিল, পিতা রাজেশ্বর মৈত্র তখন অমত করিতে পারেন নাই। পিতা-মাতার পায়ের ধূলা এবং ছোট ভাই যামিনীকে আলিঙ্গন দিয়া মোহিনী যখন হর্ষ এবং বিষাদ-ভরা অন্তরে জনবিপুল নগরীর উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়িয়া বসিল, তখন অশ্রুভরা চোখে সে চাহিয়াছিল তাদের গ্রামের সেই মেটে-রাস্তাটির দিকে। প্ল্যাটফর্মের বাহিরে বেনওয়ারীর পাণবিড়ির দোকানে গ্রামোফোন বাজিতেছে; তার পাশে নিতাই ময়রার ছোট দোকানখানিতে জলযোগের জন্য পথিকের ভীড়!

সে আজ বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। আজ কোথায় মোহিনীর পিতা-মাতা, আর কোথায় বা তার দেশের জন্য কিশোর-মনের সে মমতা! মোহিনী আজ অফিসের বড় বাবু। মাসে চারশো টাকা তার আয়। কলিকাতায় নিজের বাড়ী। সহরে ধনীর কন্যা বিবাহ করিয়া দেশের সহিত সব সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়াছে। পিতা-বর্ত্তমানেই দেশে আসা এক প্রকার সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। মৈত্র মহাশয় পুত্রের ব্যবহারে অন্তরে ক্ষুব্ধ হইলেও বাহিরে তা প্রকাশ করেন নাই। নিজে তিনি দেশের বাহিরে কখনও যান নাই। তাঁর পিতৃপুরুষের বহু জমি—কৃষাণদের সঙ্গে ভাগে ছিল। তাহাতে অন্নের অভাব কোন দিন হয় নাই, তাছাড়া গ্রামে কবিরাজীতে তাঁর সুনাম ছিল। যামিনীও অগ্রজের ন্যায় সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু দেশের উপর জ্যেষ্ঠ পুত্রের আস্থাহীনতা দেখিয়া মৈত্র মহাশয় কনিষ্ঠকে আর কলিকাতায় পাঠাইতে মত করেন নাই। পিতার ইচ্ছা-অনুযায়ী যামিনী ঘরে বসিয়া হোমিও-প্যাথী এবং কবিরাজী শিক্ষায় মন দিয়াছিল।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর মোহিনী আর দেশে আসে নাই। স্ত্রীর কথায় সে তার দেশের বিষয় বিক্রয় করিতে অভিলাষ করিয়া যামিনীকে চিঠি লেখে। যামিনী এ-সংবাদে অন্তরে অত্যন্ত বেদনা পায় এবং অগ্রজকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। যামিনী যখন দেখিল, সে বিষয় না লইলে তার দাদা অপরকে বিক্রয় করিতে দ্বিধা করিবে না, তখন পিতার নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে সে দেশের বিষয় লইল। মোহিনীর স্ত্রী ইহাতে খুশী হইয়াছিল। মৈত্র মহাশয়ের নগদ অর্থের পরিমাণ বড় কম ছিল না। সে টাকায় মোহিনীর মোটর এবং কলিকাতার বাড়ী—দুই হইয়া গিয়াছিল।

৩

কতকগুলি ঔষধপত্র আনিবার জন্য যামিনী কলি-কাতায় গিয়াছিল। কলিকাতায় গেলে সে দাদার বাড়ীতে উঠিত। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কাকাকে পাইলে বড় খুশী হয়—বিশেষ ঝঞ্ঝা। ঝঞ্ঝা তার সদানন্দ কাকাকে একটু বেশী ভালোবাসিত।

দেশের সঙ্গে ভাইয়ের মায়া ত্যাগ করিলেও মোহিনী যখন যামিনীকে দেখিত, তখন তার ভ্রাতৃ-স্নেহ সজাগ হইয়া উঠিত। যামিনী যখন গ্রামের গল্প করিত,—এখন সে গ্রামের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তখন মোহিনীর মনে জন্মভূমি দেখিবার লোভ হইত! কিন্তু পৈতৃক-বিষয় বিক্রয় করার লজ্জায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। যেখানে জন্ম, যেখানকার জল-বাতাসে শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছে, সেই পবিত্র মন্দির বিক্রয় করিয়া আজ সে অনুতপ্ত।

গড়গড়ার নল মুখে দিয়া অতীতের মধুর স্মৃতির চিন্তায় সে যখন বিভোর, তখন কন্যা ঝঞ্ঝা আসিয়া বলিল, —বাবা, আমার তো পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখানে চুপ্-চাপ্ ভালো লাগছে না! কোথাও বেড়াতে গেলে হয়!

কন্যার দিকে চাহিয়া মোহিনী বলিলেন - সোমেন দার্জ্জিলিং গেল—ওর সঙ্গে গেলে পারতিস্।

—সেখানে আমার যাবার ইচ্ছে নেই!

—তবে কোথায় যেতে চাস্?

—যেখানে যেতে চাই, সেখানে তুমি যেতে দেবে, বলো?

একটু হাসিয়া মোহিনী বলিলেন,—তোর কোন ইচ্ছেয় আমি বাধা দিয়েছি যে, এত ভাবনা হচ্ছে?

—তা দাওনি! কিন্তু যে জায়গায় যাবো ভেবেছি, সেখানে যাওয়ায় হয়তো তোমার মত না হ'তে পারে!

—জায়গার নাম বল্‌তো শুনি।

—দেশে।

—আমাদের গাঁয়ে?

—হ্যাঁ, বাবা!

—আমার অমত না হ'লেও তোমার মা কখনই মত দেবেন না।

—মা'র মত হবে না, সে কথা আমি জানি। শুধু মত হওয়া নয়, মা'র সম্পূর্ণ অমত—তবু আমি তোমার মত পেলে যেতে পারি। তুমি বলো বাবা, মানা করবে না? কাকা বাবুর মুখে সেখানকার কথা শুনে অনেক দিন থেকে আমার দেখবার সাধ! এই সব আমটাম আমরা এখানে কিনে খাই, তবু সে কত? কিন্তু কাকা বাবু বলেন, আমাদের বাগানে এত হয়, যা না কি বিক্রি করেও ওঁরা খেয়ে উঠ্‌তে পারেন না··· পাড়ার লোকেদের বিলিয়ে দ্যান!

মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া মোহিনী বলিল,—তা আমি জানি, ঝঞ্ঝা!

—তা তো জানবে! তুমি তো সেখানকারই ছেলে! আচ্ছা বাবা, তোমরা না কি ছেলেবেলায় গরমের ছুটীতে চাকু আর নুন্ নিয়ে দুপুরবেলায় কাঁচামিঠে-আম খাবার লোভে বাগানে যেতে?

—হুঁ।

—আর তোমাদের পুকুরে ছিপ্ দিয়ে নিজেরা মাছ ধরতে?

মোহিনীর বক্ষ ভেদ করিয়া একটা নিশ্বাস বাহির হইল। কি সুখের দিনই ছিল তখন!

ঝঞ্ঝা বলিল,—আমার এত ভালো লাগে বাবা! তুমিও যদি কাকা বাবুর মত দেশে থাক্‌তে! পুকুরের টাট্‌কা মাছ বিনি-পয়সায় কেমন পাওয়া যেত! আর কাকা বাবুর মত আমরাও কত গরু রাখ্‌তুম্!

তার পর সে পিতার জবাবের অপেক্ষা না করিয়া আবেগের সহিত বলিল,—আচ্ছা বাবা, আমরা যদি দেশে গিয়ে মাঝে মাঝে থাকি, তাহ'লে বেশ হয় না?

নিশ্বাস ফেলিয়া মোহিনী বলিলেন—না মা, তা হয় না!

—কেন?

—সে সব কথা তুমি বুঝবে না।

আবদারের সুরে ঝঞ্ঝা বলিল—না বুঝি, বুঝতে চাই না। আমাকে কিন্তু কাকা বাবুর সঙ্গে যেতে দিতে হবে—আমি যাবোই!

৪

উস্কখুস্ক মূর্ত্তি যামিনী বাড়ী ঢুকিয়া বলিলেন—শ্বেতা! শীগ্‌গির তোর মাকে ডাক্। আমাকে এখনি কলকাতায় যেতে হবে।

উমা দেবী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—কেন গা? সেখানকার সব খবর ভালো তো?

—না।

—কোনো চিঠি এসেছে?

—চিঠি আসেনি। চৌধুরী-মশায়ের ছেলে কাল এসেছে, তার মুখে শুনলুম, দাদা না কি সুইসাইড্ করেছে!

—জ্যাঠামশায় আত্মহত্যা করেছেন! বলিয়া মহাশ্বেতা কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে বসিয়া পড়িল!

উমা দেবীর মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না; আতঙ্কে তাঁর দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

যামিনী বলিলেন—শীগ্‌গির আমার জামা আর কিছু টাকা দাও। আর দেরী করলে ট্রেণ পাবো না।

কলিকাতায় আসিয়া মোহিনীর বাড়ীর দ্বারে যামিনী দেখিল, মোহিনীর শ্যালক মোটরে উঠিতেছে। যামিনীকে দেখিয়া সে বলিল—এই যে আপনি এসেছেন! ভালোই হলো। দেখুন দেখি, জামাই

বাবু কি বিভ্রাট বাধিয়েছেন! এখন যদি বেঁচে ওঠেন, তাহলেও কম ফ্যাসাদে পড়তে হবে না!

যামিনী এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! তাহা হইলে দাদা এখনও বাঁচিয়া আছেন! সে বলিল—এখন কেমন আছেন?

—ডাক্তাররা বলছেন, আর ভয় নেই। কিন্তু এদিকে আর এক সর্ব্বনাশ করে বসেছেন!

—আবার কি?

—সে সব কথা পথে দাঁড়িয়ে হয় না। ভিতরে আসুন, বলছি। বলিয়া প্রভাস যামিনীকে লইয়া মোহিনীর বসিবার ঘরে আসিল, বলিল—বসুন!

যামিনী বসিলে সে বলিল—কথাটা আপনাকে বলা প্রয়োজন। দিদি মেয়ে-মানুষ—তাঁকে এ সব কথা বলা যায় না, আর বাইরেও প্রকাশ করা চলে না। আমি মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছি। আপনি আসতে আমার সাহস হলো। এত পয়সা উপায় করলেও জামাই বাবুর খরচ এত বেশী যে, কুলিয়ে উঠ্তে পারতেন না! কিছু দিন থেকে রেস্-খেলা আরম্ভ করেছেন। দু-একবার জিতে ছিলেন, তার পর লোকসান দিয়ে আসছেন। এর জন্য বাড়ীখানি পর্য্যন্ত বন্ধক পড়েছে। শুনছি, কাবলীর কাছেও আবার না কি ধার নিয়েছেন। সে টাকার তাগিদে অস্থির হয়ে অফিসের ক্যাশ থেকে পাঁচশো টাকা এনে তা শোধ করেন। ভেবেছিলেন, কাল রেসে জিতে টাকাটা রেখে দেবেন, কিন্তু কালও খুব হার হয়েছে! তার ওপর এই সোমবারে ওদের অফিস অডিট্ হবে—এই সব কারণে পাগলের মতো কাল সন্ধ্যার পর বন্দুক দিয়ে এই কাণ্ড করেন! খুব সৌভাগ্য যে, জখম গুরুতর হয়নি।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া যামিনী বলিল—দাদা কোথায়?

—হাসপাতালে।

—আমি যাই। তাঁকে একবার দেখে আসি।

—এখনি যাবেন? আমি বলছিলুম্ কি, এ সম্বন্ধে কি করলে ভালো হয়, সেটা ঠিক করলে হোত না? জ্ঞান হওয়ার পর জামাই বাবু আমার হাত দু'খানা ধরে বললেন,—বেঁচে উঠে আমার মরার বাড়া হলো যে ভাই! এখন যদি এ লজ্জা থেকে রক্ষা করতে পারো তবেই মুখ দেখাবো, না হলে আমাকে আবার এই পথ ধরতে হবে! আমি যে কি করবো, কিছু ঠিক করতে পারছিনে যামিনী বাবু!

যামিনী বলিল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! দাদার যাতে মান রক্ষা হয়, প্রাণ দিয়ে আমি তা করবো। আমি বেঁচে থাক্তে সামান্য টাকার জন্য এমন করে দাদার জীবন যাবে না!

৫

মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মোহিনী খাটের উপর শুইয়া আছে। মলিন-মুখে ঝঞ্ঝা পিতার পায়ের কাছে এবং তার মা একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন।

যামিনীকে দেখিয়া ঝঞ্ঝার দু'-চোখে অশ্রুর লহর বহিল।

কন্যার দিকে চাহিয়া সুরুচি দেবী বলিলেন—কাঁদছিস্ কেন? ডাক্তার এখনি বলে গেছেন, আর কোন ভয় নেই!

যামিনী বলিল—ঘুমুচ্ছেন?

সুরুচি বলিল—হ্যাঁ।

যামিনী দাদার দিকে চাহিয়া রহিল। এই তার সেই দাদা! শৈশব হইতে কৈশোর· দুই ভাই—একত্র আহার, খেলা এবং একই শয্যায় শয়ন! প্রতিবাসীরা মা'কে বলিত—'তোমার ছেলে দু'টি যেন রাম-লক্ষ্ণণ!' মোহিনীর সকল কাজে যামিনী ছিল সাথী। পিতার মৃত্যুর পর তার সেই দাদা যামিনীকে কখনও পত্র দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না! না দিন—তবু যামিনী জানে, তার জন্য দাদার অন্তরে স্নেহের অভাব নাই! আজ যামিনীর একমাত্র কাজ, এই মায়া-নগরীর হাত হইতে তার দাদাকে রক্ষা করা! দেনার দায়ে দাদার সহরের বাড়ীতে টান পড়িয়াছে—দাদা গৃহহীন হইবেন? অসম্ভব! যখন যামিনীর আশ্রয় আছে, তখন দাদার আশ্রয়ের ভাবনা কি!

যামিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে দেখিয়া ঝঞ্ঝা বলিল—বাবা, কাকা বাবু এসেছেন।

—যামিনী !

যামিনী নিকটে আসিল, বলিল—হ্যাঁ, দাদা।

মৃদু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মোহিনী বলিল—কারও কাছে মুখ দেখাবার আর উপায় রাখিনি ভাই।

দাদার কাছে বসিয়া যামিনী বলিল—তুমি এ-সব কি বলছো দাদা !

—কার কাছে তুই খপর পেলি ?

—চৌধুরী-মশায়ের ছেলের কাছে।

—ও ! আমি ভাবলুম, এরাই বুঝি খপর দিয়েছে।

সঙ্কুচিত কণ্ঠে ঝঞ্ঝা বলিল—আমি দিতে চেয়েছিলুম, মা বারণ করলে।

সুরুচি বলিল,—শুধু শুধু ওকে আবার ব্যস্ত করে কি হবে, এই ভেবেই বারণ করেছিলুম। বিশেষ এখানে যখন আমাদের লোকের অভাব নেই !

যামিনী বলিল—বৌদি' ঠিক কথা বলেছেন ! তবে দাদার কোন বিপদ শুনলে আমি থাক্‌তে পারি না, তাই ছুটে এলুম।

—তা আমি জানি ! তোর দিক্ থেকে কোন ত্রুটি নেই ভাই ! কিন্তু তোর দাদা অতি হতভাগা !

মোহিনী একটা নিশ্বাস ফেলিল।

সুরুচি বলিল,—বেশী কথা কয়ো না ! এই যে কাণ্ডটি করেছো, এর জন্য লোকের কাছে মুখ দেখাবো কি করে, আমি শুধু তাই ভাবছি ! এখন ভালো হয়ে উঠলে বাঁচি।

গভীর দুঃখে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া মোহিনী বলিলেন—এমন হবে, ভাবিনি ! সত্যি, পরমায়ু থাক্‌তে যাওয়া যায় না ! আমার কি কম লজ্জা হচ্ছে ! এ বাঁচা আমার মরণের বাড়া হয়েছে, যামিনী !

যামিনী বলিল—কেন মিছে দুঃখ করছো, দাদা ! এত বুদ্ধিমান হয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে পারো, এ আমি স্বপ্নে ভাবতে পারিনি !

—তুই তো জানিসনে ভাই, আমার এ জীবনে মৃত্যুই আজ মুক্তি !

৮

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন,—মিষ্টার মৈত্র তো বেশ ভালো আছেন দেখ্‌ছি।

যামিনী বলিল,—কেমন বুঝছেন ? কোন ভয় নেই তো ?

—না, না !

—সম্পূর্ণ ভাল হ'তে কত দিন লাগবে মনে করেন ?

—এই দিন পাঁচ-সাত ! হ্যাঁ, ভালো কথা ! ব্যাপারটা কি, বলুন তো শুনি ? এ রকম accident…পুলিশে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

ডাক্তারের কথায় যামিনী বলিল—দাদা বন্দুকটা পরিষ্কার করতে গিয়েছিলেন। মনে ছিল না যে, তাতে টোটা ভরা ছিল। হঠাৎ সেটা ছুটে যাওয়ায় এই বিভ্রাট !

ডাক্তার বলিলেন—ভগবান রক্ষা করেছেন ! আঘাত সাংঘাতিক হয়নি, খুব অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন !

ডাক্তার চলিয়া গেলে মোহিনী যামিনীর হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া ঝর্-ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যামিনী বলিল—শান্ত হও, দাদা !

মোহিনী বলিলেন—তুই আমাকে কত বড় লজ্জার হাত থেকে বাঁচালি আজ ! কিন্তু ভাই, এর চেয়েও লজ্জার কাজ করেছে তোর দাদা। তা থেকে কি করে বাঁচাবি ?

—তোমার কোন লজ্জা নেই দাদা। সে সব মিটে গেছে।

—মিটে গেছে ?

—হ্যাঁ।

—কি বলছিস্ যামিনী ?

—তুমি অফিসের কথা বলছো তো ?

—হ্যাঁ।

—আমিও তাই বলছি।

—তুই জান্‌লি কি করে ?

—প্রভাস বাবুর কাছে।

—তার দেখা কোথায় পেলি ?

—আমি ট্রেণ থেকে তোমার বাড়ী গিয়েছিলুম। তুমি হাসপাতালে আছো, তাঁর কাছেই শুনলুম। আর ও-সব কথা তিনিই আমাকে বললেন। বেলা তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। তুমি ভালো আছ শুনে আমি

এখানে না এসে সোজা ব্যাঙ্কে গেলুম, আর প্রভাস বাবুকে তোমার accidentএর কথা—যা ডাক্তারকে এখন বললুম, সাহেবকে জানাতে বললুম। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে আমি তোমার সাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছি। এই বিপদের কথা শুনে তিনি খুব দুঃখিত হলেন। আমি তাঁকে বললুম—কাল বাড়ী যাবার সময় দাদা একটা মস্ত ভুল করেছিলেন; আজ জ্ঞান হওয়ার পরই সে কথা তাঁর মনে হওয়ায় আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ব্যাঙ্কে জমা দিতে পাঁচশো টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা হিসাবে লেখা হয়নি। ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ তিনি টাকাটা বাড়ী নিয়ে যান। সেই টাকা দাদা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এ-ত্রুটির জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন—এই কথা বলে সাহেবকে আমি টাকাগুলি গুণে দিলুম।

মোহিনী স্তম্ভিত-বিস্ময়ে ভাইয়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকার পর বলিল—এ টাকা তুই কোথায় পেলি?

যামিনী বলিল—তুমি জানো না বোধ হয়, ওষুধ-পত্র কিনতে প্রায় আমাকে কলকাতায় আসতে হয় বলে আমার যা সামান্য টাকা, তা এখানকার ব্যাঙ্কেই রাখি।

স্নেহ-গদ্গদ কণ্ঠে মোহিনী বলিলেন,—পৃথিবীতে যার ভাই নেই, তার মত দুর্ভাগা আর কেউ নেই!

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।

এ-বাড়ী—ও-বাড়ী

ছোট বাড়ীখানি সাজানো-গুছানো কত দিন হ'তে রাজে,
সমুখে তাহার আর একটি বাড়ী আছে অপরূপ সাজে।
রচি' ব্যবধান সরু ছোট গলি,
দূরে বহু দূরে গিয়াছে সে চলি',—
তবু সে কেমনে ব্যবধানে ছলি বলিতে তা মরি লাজে;
পাশের বাড়ীর অর্গান-স্বর এ-বাড়ীর বুকে বাজে!

ও-পাশে বাড়ীর শাড়ী শুকাইলে ওড়ে তার অঞ্চল,
এ-বাড়ীর অই জানালায় লেগে মন করে চঞ্চল।
ও-বাড়ীর টবে ফোটে কত ফুল,
এখানে সমীর বহে কুলু কুল,
পাশের বাড়ীর হরিণী-নয়ন হেথা বাতায়ন-তলে,
অতি সাবধান ক্ষিপ্র গতিতে উঁকি-ঝুঁকি মেরে চলে!

এ-বাড়ীতে বাজে মোটরের হর্ণ, ও-বাড়ীতে পড়ে সাড়া,
ও বাড়ীর লোক ভুলে এসে দেয় এ-বাড়ীর কড়া নাড়া!
ও-বাড়ীর বুড়ো এ-বাড়ীতে এসে,
সারা দিন বসি দাবা খেলে হেসে,
ও-বাড়ীর ভোজপুরী দারোয়ান এ-বাড়ীতে দেয় হানা;
এ-বাড়ীর রামসিংয়ের সঙ্গে তার খুব চেনা জানা!

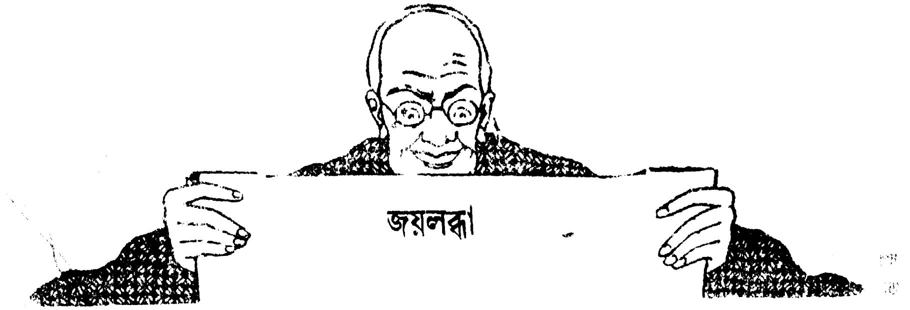
এ-বাড়ীর এই কুকুর ঝিমায়ে ও-বাড়ীতে গিয়ে বসে,
ও-বাড়ীর মেনী বিড়াল এখানে মাছ চুরি করে ক'সে!
ও-বাড়ীর যত মাছের কাঁটায়,
বেছে-বেছে ফোটে এ-বাড়ীর পায়!
এ-বাড়ীর যত আনাজের খোসা ও-বাড়ীতে গিয়ে পড়ে,
ও-বাড়ীর ঐ রান্নাঘরের ধোঁয়াতে এ-বাড়ী ভরে।

ও-বাড়ীর ছাদে শুকাইলে জামা এ-বাড়ীর অঙ্গনে,
না জানি কখন্ উড়াইয়া আনে চঞ্চল সমীরণে!
আবার যখন ঘন কালো চুলে,
ও-বাড়ীর ছাদে ব'সে রয় খুলে,
ফুর্‌-ফুরে হাওয়া করে আসা-যাওয়া মাখি' সেই কেশপাশ,
এ-বাড়ীতে তাই অত মিঠে লাগে ও-বাড়ীর ও-বাতাস।

এমনি করিয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী মেলামেশা পলে পলে,
জানালার ফাঁকে উঁকি-ঝুঁকি আর চাওয়া-চাওয়ি নিতি চলে!
ও-বাড়ীর চিঠি এমনি আসিছে,
এ-বাড়ীর ঘরে বালিশের নীচে,
এ-বাড়ীর মন ওড়ে সারাক্ষণ ও-বাড়ীর মোহ-টানে,
ও-বাড়ীর আঁখি এ-বাড়ীতে সদা খর আঁখিশর হানে!

এইরূপে করে এ-বাড়ী ও-বাড়ী কোন শুভক্ষণ দিয়া,
এক হয়ে দু'টি মিলে মিশে গেছে হিয়ায় সঙ্গে হিয়া!
কিছু ভেদ নাই এখন যে আর,
এক ডোরে বাঁধা এরা অনিবার,
ও-বাড়ীর মেয়ে এ-বাড়ীতে এবে ঘরের লক্ষ্মী বধূ,
ওখানে জামাতা শ্রীমধুসূদন এ-বাড়ীর ছেলে মধু!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ



জয়লব্ধা

হরিহর চাটুয্যে ধনাঢ্য পরিবারের লোক। তিনি নিজের আভিজাত্যটাকে সর্ব্বপ্রকারে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নিজ পরিবারের চতুর্দ্দিকে এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য গণ্ডী টানিয়া রাখিয়াছিলেন,—যাহা উল্লঙ্ঘন করিলে নানা প্রকার বিপৎপাতের আশঙ্কা ছিল, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা ধর্ম্মের বাহাড়ম্বরের ন্যায় তাহা অতীব উৎকট বলিয়াই লোকের মনে হইত। বস্তুতঃ, চাটুয্যে মশায়ের বনিয়াদী সম্ভ্রমবোধটা অপরকে খোঁচাইয়া-মারিবার উপযোগী বর্শা-ফলকের মত সুতীক্ষ্ণ এবং সুকঠিন ছিল।

"আর্ত্তত্রাণ-সমিতির" মোড়ল অন্তক মুখুয্যে এক দিন কোন আইন-কানুন বা আদব-কায়দা না মানিয়া একেবারে চাটুয্যে মশায়ের আভিজাত্যমণ্ডিত বৈঠকখানায় আসিয়া হাজির! সে ফরাসে প্রসারিত জমিদারের নির্দ্দিষ্ট পুরু গালিচাখানার এক কোণায় বসিয়া তাহার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ আত্মসম্ভ্রম-গর্ব্বিত মালিকটিকে হাত তুলিয়া অতি ক্ষুদ্র একটা নমস্কার করিয়া কহিল,—"চাটুয্যে মশায়, এই খাতায় একটা সই ক'রে দিন তো।"

অন্তক খাতাখানা তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিল।

জমাদারী-সংক্রান্ত খানকতক অতি প্রয়োজনীয় খাতা-পত্রে চাটুয্যে মশায় তখন মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। দেওয়ান, গোমস্তা, সরকার প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা তখন চন্দ্রপরিবেষ্টিত নক্ষত্ররাজির মত তাঁহার চারিপার্শ্বে উপবিষ্ট। তাহাদের মধ্যে অকস্মাৎ সমাগত অন্তককে কেন্দ্রচ্যুত একটি নবাগত দীপ্তপুচ্ছ ধূমকেতুর ন্যায় দীপ্যমান ও বিসদৃশ দেখাইল।

দেওয়ান, গোমস্তা অন্তকের সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত! চাটুয্যে মশায় চোখ তুলিয়া অন্তকের পানে চাহিলেন, এবং বিরক্তি-ভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "কে হে তুমি? ভারি বেয়াদপ তো!"

মৃদু হাস্যে অন্তক কহিল,—"সে যা হোক। দলের কেউ আপনার কাছে আসতে চায় না; তাই আমি নিজেই এলুম। অধীনের নাম শ্রীঅন্তক মুখার্জ্জী। আপনার ওই শিবতলার পাশে আমাদের একটা ছোট আখড়া আছে, কিন্তু খরচ চলা ভার; তাই আপনার একটু কৃপার জন্য আরজি।"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই চাটুয্যে মশায় তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন; নীরস স্বরে কহিলেন,—"হাঁ, কৃপা দেখাচ্ছি। রাজ্যের ডোম, বাগদী, গয়লা নিয়ে আখড়া করা হ'য়েছে। বামুনের ঘরের গরু—গায়ত্রীটা অবধি চিবিয়ে খেয়েছিস্!"

এতখানি গালি-গালাজে অন্তকের মুখের কোন ভাবান্তর হইল না; সে কহিল, "কিন্তু বড্ড দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, চাটুয্যে মশায়! ওগুলো আপাততঃ মুলতুবি রেখে—"

চাটুয্যে মশায় এ কথায় জ্বলিয়া উঠিলেন। অন্তকের শান্ত স্বর কঠিন অবজ্ঞার মত তাঁহাকে আঘাত করিল।

রুদ্ধস্বরে চাটুয্যে মশায় হাঁকিলেন,—"রামভুজ, মহাবীর!"

মনিবের আহ্বানে একজোড়া হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ ব্যগ্র ভাবে তাঁহার সম্মুখে আসিল।

চাটুয্যে মশায় কহিলেন, "নিকাল দেও—ওই শূয়ার কো!"

চাটুয্যে মশায়ের উগ্র স্বর ও দীপ্ত বাণীতে তাঁহার পারিষদবর্গের মুখে ভয় দেখা দিল, কিন্তু অন্তকের মুখের নির্ব্বিকার ভাবের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। তাহার অনাবৃত প্রশস্ত বক্ষে শুভ্র উপবীত-গোছা পুষ্পদামের ন্যায় শোভমান! করিশুণ্ডের মত সুগঠিত দীর্ঘ ভুজযুগল কোলের উপর বিন্যস্ত। স্নানের পর সর্ব্বাঙ্গে শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ মুছিয়া গিয়াও আশ্বিনের আকাশ-ভরা ছিন্ন-মেঘস্তরের ন্যায়, সুঠাম অবয়বের স্থানে-স্থানে লাগিয়া আছে। পরিধানে গৈরিক বাস, গলদেশে গেরুয়া উত্তরীয়; মাথায় রুক্ষ চুল; মুখে ব্রহ্মচর্য্যের দীপ্ত চিহ্ন দীপ্যমান।

সেই বলদৃপ্ত মূর্ত্তিখানার পানে চাহিয়া ভোজপুরী পালোয়ান দু'টো উদ্ধত ভাব ত্যাগ করিয়া সসম্ভ্রমে কহিল,—"চলিয়ে বাবুজী!"

বোমা-বিস্ফোরণের ন্যায় চাটুয্যে মশায় এবার যেন ফাটিয়া পড়িলেন; প্রচণ্ড ধমক দিয়া কহিলেন, "হারামজাদা ছাতুখোর! 'চলিয়ে বাবুজী'—ঘাড়-ধ'রে ঐ গুণ্ডা ছোঁড়াটাকে বের ক'রে দে—শুনতে পাসনি আমার হুকুম?"

আদেশ শুনিয়া অন্তক এবার ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল; কহিল, "চাটুয্যে মশায়, চড়কে শিবতলায় মস্ত মেলা হবে—গণেশ পূজোর দিন, পয়লা বোশেখ। সে-দিন আমার খেলোয়াড়ের দল লাঠি ছোরা, কুস্তি—নানা রকম কসরৎ দেখাবে। সে সব পরের কথা, আগে আপনি সইটা করুন তো!"

—"হাঁ সই করছি!—আবদুল,—রহিম!"

ব্যস্ত কণ্ঠে দেওয়ান কহিল, "হুজুর, উনি 'সন্ন্যাস' নিয়েছেন।"

বড় সরকার মিনতির সুরে কহিল, "হুজুর, বাবার নাম ক'রে কিছু পূজো—"

আবদুল ও রহিমকে মুহূর্ত্ত পরেই দরজার নিকট আসিতে দেখা গেল।

চাটুয্যে মশায় তাঁহার কর্ম্মচারীদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ক্রোধ-প্রদীপ্ত মুখে আদেশ করিলেন, "অন্তা গুণ্ডাটাকে টুঁটি টিপে-ধ'রে ঘর থেকে বের ক'রে দে!"

অন্তক অল্প একটু হাস্য করিল।—"চাটুয্যে মশায়, ভেবেছিলুম; বাবার মেলায় কিছু চাঁদা আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাব, কিন্তু তা হ'লো না দেখ্‌ছি! এই অপমানের পুরো খরচাটাই আপনাকে

ভোজন-হস্তে দিতে হবে। সই করুন আপনি এক হাজার টাকা।" অন্তকের কণ্ঠে আদেশের সুর, স্থির এবং অত্যন্ত নির্ভীক।

আপনাকে ভীষণতর অপমানিত মনে করিয়া চাটুয্যে মশায় থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। তেমনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আগে ক'বছর ঠেলি ছাখ,—আবদুল, করিম!"

নিমেষে সেই কক্ষে যেন প্রলয়ের কাণ্ড ঘটিল! অন্তকের সমগ্র দেহখানা চক্ষুর পলকে কঠিন লৌহদণ্ডের ন্যায় ঋজু হইয়া উঠিল। সপারিষদ চাটুয্যে মশায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ডাকাত! ডাকাত!" করিম, মহাবীর প্রভৃতি অনুচর প্রভুর আদেশে বিক্রম প্রকাশ করিতে অন্তকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; কিন্তু যুযুৎসুর প্যাঁচ যে অতর্কিতে সেই বীরপুঙ্গবদের একেবারে ধরাশায়ী করিবে, এবং আত্মরক্ষার মুহূর্ত্তে শত্রু যে গৃহের বাহিরে পদার্পণ করিবে, এ তত্ত্ব সে বেচারাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তাহারা ভীরু নহে; ত্রস্তে মাটী ছাড়িয়া,শত্রুর পশ্চাতে ধাবমান হইয়া সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মত কাছারী-প্রাঙ্গণে অন্তককে ঘিরিয়া ফেলিল, এবং স্ব স্ব হাতিয়ার—লাঠি, কিরীচ, বল্লম, প্রভৃতি লইয়া উচ্চরোল তুলিল। "শালা ডাকুর জান লেও, দুষ্‌মনকো জান লেও—" প্রভৃতি চিৎকারে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল।

কিন্তু নিরামিষভোজী রথীবৃন্দের শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রম অন্তক সুদীর্ঘ বংশদণ্ডের বিদ্যুৎবৎ ঘূর্ণনে বিধ্বস্ত করিয়া চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হইল।

কাছারীময় 'পালিয়ে গেল,'—'চম্পট দিলে!' ইত্যাদি কলরব উঠিল। কিন্তু এই প্রমত্ত লীলা মিনিট-পনেরোর মধ্যে শান্ত হইয়া, জমীদারের পাইক, পেয়াদা, ও অন্যান্য কর্ম্মচারী হইতে স্বয়ং প্রভুর মুখেও অন্য প্রকার ভাব ফুটিয়া উঠিল; তখন দেখা গেল, কেহ নিহত বা বিশেষ-রকম আহত না হইলেও মর্ম্মাহত চাটুয্যে মশায় বৈঠকখানার একটা কোণে জড়-পুত্তলীর মত নির্জীব ভাবে অবস্থান করিতেছেন, এবং পলাতক অন্তকের সহিত তাঁহার সম্মুখস্থিত ক্যাস-বাক্সটাও অন্তর্হিত হইয়াছে!

প্রকাশ্য দিবালোকে এই ভাবে ডাকাতি করিয়া পলায়ন অত্যন্ত অদ্ভুত হইলেও এই অপরাধে প্রায় কেহই নিষ্কৃতি পায় না। সুতরাং বলা বাহুল্য, অন্তক ধরা পড়িল।

বৈশাখী পূর্ণিমা! আর্ত্তত্রাণ-সমিতির বাৎসরিক উৎসবের দিন। কাঙ্গালী-ভোজন করাইয়া অন্তক দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ-কার্য্যে রত ছিল, সেই সময় পুলিশ আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। এত বড় ডাকাত সনাক্ত করিবার জন্য গোয়েন্দাগিরিতে দক্ষতা নিষ্প্রয়োজন।

নানা সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে অন্তক মুখুয্যের ডাকাতির বিবরণ প্রকাশিত হইল। কেমন করিয়া অন্তক সদলে জমীদারের সুরক্ষিত কাছারী-ঘরের লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া চৈত্র-কিস্তির মজুদ খাজানা অপহরণ করিয়াছিল; এবং কিরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছিল,—সমস্তই বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইল।

হরিহর চাটুয্যে স্বয়ং আদালতে আসিয়া অন্তককে সনাক্ত করিলেন; মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিলেন। একটা চোরাকুঠরীতে আত্ম-গোপন করিয়া তাহার ক্ষুদ্র গবাক্ষ-পথে তিনি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাও বিবৃত করিলেন!

সাক্ষী, সাবুদ, পুলিশের রিপোর্টে কোথাও কোন গলদ ছিল না। বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই প্রতিপন্ন হইল—অন্তক মুখুয্যে একটা দস্যুদলের সর্দ্দার। তাহার শিবতলার আখড়া, দুঃস্থ আর্ত্তজনের সেবা প্রভৃতি তাহার দস্যুবৃত্তি-গোপনের কৌশল মাত্র। দেশহিতে তাহার আত্মত্যাগ প্রবঞ্চনা-বিস্তারের একটা উপলক্ষ। তাহার পেশা কেবল পরস্বাপহরণ—

বিচারালয়ে দুর্ব্বৃত্তগণের প্রতি কঠোর দণ্ড প্রদত্ত হইল। অন্তক পাঁচ বছর, এবং তাহার অনুগত অনুচরমণ্ডলীর বাছাই দশ জনের কেহ তিন, কেহ দুই, কেহ এক বৎসর করিয়া অপরাধের তারতম্যানুসারে শাস্তি পাইল।

দিনগুলা হু হু করিয়া কাটিয়া বছর শেষ করিয়া দেয়। শিবতলার মাঠে আবার গাজন-উৎসব হয়। চড়কগাছ পুঁতিয়া যথানিয়মে মেলা বসে। আনন্দ-কোলাহল, গান-বাজনা সমান ভাবেই চলে। দেশ-বিদেশ হইতে যাত্রীরা বাবাকে পূজা দিয়া সন্ন্যাস-মোচন করিতে আসে। সারা মাস-ব্যাপী কৃচ্ছ্র ব্রত-পালনে দেহের ক্লান্তি অপনোদন করিতে তাহারা 'হর হর, ব্যোম ব্যোম, মহাদেব' নিনাদে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিতে থাকে। প্রাণে যেন একটা বৈরাগ্যের বাতাস বহিতে আরম্ভ করে। অন্ত্যজ জাতির অর্থাৎ হরিজনের মধ্যেই সন্ন্যাস-ব্রতের উৎসবের উৎসাহ বেশী। কিন্তু ব্রাহ্মণ-সন্তান অন্তক এই ব্রতের এক জন বিশিষ্ট ভক্ত ছিল; কিন্তু সে কথা কেহ বিশেষ স্মরণ করে না, কিম্বা মনে আসিলেও মুখে প্রকাশ করিতে কাহারও সাহসে কুলায় না। কেবল নববর্ষের পদার্পণে গণেশতলাতে যখন ভীড় জমিয়া উঠে, লোক দলিয়া পিষিয়া মরে, তখন দেশের সেই হাবাতে ছোঁড়াগুলা কেমন করিয়া এই বিরাট মেলাটাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিত, উৎসবে শ্রী-সম্পাদন করিত, শৌর্য্য-বীর্য্য-বিক্রম দেখাইয়া মানুষকে পুলকিত—চমকিত করিয়া তুলিত—সেই সব কথা পুরাতনদের মনে দৈবাৎ হয় ত একবার জাগিয়া উঠে। কিন্তু কিরাতরূপী যিনি সব্যসাচীর দুর্ব্বার আয়ুধ আপন অঙ্গে গ্রহণ করিয়া শৌর্য্য-পরীক্ষায় বরদাতা হইয়াছিলেন, সেই বিরাট্ পুরুষ নির্ব্বাসিত বীর ভক্তবৃন্দের বিক্রম-অর্ঘ্য না পাইয়া উৎসবকে গ্রহণ করেন কি? কিম্বা পরম শৈব-শক্তি উপাসনাহীন দুর্ব্বলের পূজায় স্থাণুবৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকেন।

তবে এখনও প্রবীণের দল মাঝে-মাঝে বলিয়া থাকেন, "হাঁ, গাঁয়ে একটা মানুষ ছিল, সে অন্তক মুখুয্যে! কুড়ি বছরের ছোঁড়া—সাক্ষাৎ যেন ভীমসেন। কি তার বুকের ছাতি! কি লোহার মত শক্ত শরীর! দামোদর সাঁতরিয়ে পার হ'ত। এক শ' লেঠেলকে একা ভাগিয়ে দিতে পার তো! আর হবে নাই বা কেন? প্রহ্লাদ মুখুয্যে চিরকাল বাড়ীতে কুস্তির আখড়া ক'রে, রাজ্যের পালোয়ান পুষতো! বাবা! কি তাদের খোরাক! তাদের জনপ্রতি কি খরচটাই না পড়তো! তাই ক'রেই তো সর্ব্বস্বান্ত হলো। শিবু মুখুয্যের অবিশ্যি অতটা ছিল না! ঠাকুর্দ্দা' মরেই যেন নাতি হ'য়ে জন্মেছিল! ও-কি এক জন্মের শিক্ষা? আর তেমনি গ্রাহ্য ক'রত না এই হরিহর চাটুয্যেকে! সেই হ'লো কাল!"

"আহা, মুখুয্যে-গিন্নী এখনও শিবতলাতে বসে কাঁদে! ঐখানে 'হত্যে' দিয়েই তো অন্তাকে বুড়ো বয়েসে পেয়েছিল। তা বাবা ভোলানাথ দিয়েছিলও তেমনি রাজপুত্তুর, বুকে দয়া-মায়া কত?"

তরুণের দল যদি কহিত, "কিন্তু মরতে ডাকাতি ক'র্‌লে কেন?"

সঙ্ক্ষোভে প্রাচীনরা কহিতেন,—"কে জানে, ভেতরে কি আছে? দেশের ছোটলোকগুলোকে মুঠোর মধ্যে পুরেছিল। হরিহর চাটুয্যের আক্রোশ ত সেই জন্যেই—বুড়োর ও-সব চালবাজি বোঝা তোদের কর্ম্ম নয়;—আসলে ব্যাপারটা—"

কিন্তু ব্যাপারটা জানিবার ঔৎসুক্য শ্রোতাদের কাহারও ছিল না। ডাকাতি করিয়া জেলে গিয়াছে, তাহার অলিখিত জীবন-ইতিহাস গৌরবে উজ্জ্বল, কি কলঙ্কে ম্লান—সেই চিন্তায় মাথা ঘামাইবার স্পৃহা তরুণদলের নাই। অন্তুক বিখ্যাত সিনেমা-ষ্টার নহে, কবি নহে, ঔপন্যাসিক নহে; এমন কি, নামজাদা ফুটবল বা ক্রিকেট-খেলোয়াড়ও নহে বা ভাল বক্তাও নহে। নবীনের মন কিরূপে সে আকর্ষণ করিবে? তার প্রতিভার বিকাশ বা শক্তির স্ফুরণই বা কোন্‌খানে? আর কেমন করিয়াই বা তা স্বীকৃত হইবে?

* * * *

হরিহর চাটুয্যের যোগ্যপুত্র বাসুদেব দীর্ঘ শৈলবাসে পত্নীর নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধার করিয়া অল্প দিনের জন্য দেশে আসিল। পিতৃ-সন্দর্শনে প্রথমেই অন্তুক মুখুয্যের কথা উঠিল,—

বাসুদেব সবিস্ময়ে কহিল, "অন্তুক কাছারী লুঠেছিল? শেষটা এমন দুর্ম্মতি তার হ'লো, বাবা!"

বিরক্তি ভরে চাটুয্যে মশায় কহিলেন, "না হ'লে শুধু-শুধুই কি সে শ্রীঘরে বাস কচ্ছে?"

বাসুদেব থতমত খাইয়া গেল। মৃদু স্বরে কহিল,"কিন্তু তাকে তো ভাল বলেই—"

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। চাটুয্যে মশায় কহিলেন, "তুমি তো থাক কলকাতায়! কালে-ভদ্রে দেশের সঙ্গে সম্পর্ক! তার ভাল-মন্দ কি জানবে? ইদানীং সেটা দুর্দ্দান্ত হ'য়ে উঠেছিল! রাজ্যের ছোটলোকগুলোর সঙ্গে মিশে, তাদের সর্দ্দার হ'য়ে নিজেকে ভাবতো একটা জাঁদরেল আর কি! তা না হ'লে কুড়ি বছরের ছোঁড়া আবদুল, গফুর, রহিম—সকলকে ঘায়েল করলে, লাঠি ঘুরুতে লাগলো ঠিক যেন বিদ্যুতের ঝলক!

কণিকা পিতার পাশে দাঁড়াইয়া এ-সব কথা শুনিতেছিল। সবিস্ময়ে কহিল, "ইস্ দাদু, এত বড় লাঠিয়াল মুখুয্যে? আমাদের সেকেণ্ড মিস্‌ট্রেস্ বলেন, প্রত্যেক ছেলেকে বীর হ'তে হবে! আর প্রত্যেক মেয়েকে হ'তে হবে বীরাঙ্গনা! জান দাদু, আমি ছোরা-খেলায় মেডেল পেয়েছি।"

বিরক্তির স্বরে চাটুয্যে মশায় কহিলেন, "তবে আর কি, মাথা কিনেছিস! যা, এবার দেবী চৌধুরাণীগিরি করগে! যত সব মেয়ে-মদ্দানী!" পুত্রের পানে চাহিয়া কহিলেন, "চাটুয্যে-বংশের নাম, মর্য্যাদা সব নষ্ট হচ্ছে আমাদের মেয়ে-বৌ'র চাল-চলনে—চন্দ্র-সূর্য্য কখন ওদের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে পেত না!"

চাটুয্যে মশায়ের মুখের মত স্বরও গম্ভীর।

বাসুদেব মাথা চুলকাইল। মেয়েটা বে-ফাঁস কথা কহিয়া পিতাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছে। তাঁহাকে শান্ত করিয়া নম্রস্বরে কহিল, "কিন্তু বাবা, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সাহসী মেয়ে, বুকের পাটাওয়ালা জোয়ান ছেলেরই প্রয়োজন!"

চাটুয্যে মশায় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হুঁ, গায়ের জোর, সাহস, জোয়ান-জোয়ান ছোঁড়া নিয়ে দল খুললে, আখড়া বানালে, কিন্তু টিকে থাকতে পারলে? এসেছিল যে অনেক দাপট নিয়ে! আরে বাপু, এ হরিহর চাটুয্যে—জমীদারী বাড়াচ্ছে বই কমাচ্ছে না। তখনি ভাবলুম, এত বড় সুযোগ কখন ছাড়া উচিত নয়! এক ঢিলে দুই পাখী! এইবার জেলের ঘানি টেনে, বাছাধন বুঝছেন, গোঁয়ার-গিরিতে সুখ কত?"

চমকিত স্বরে বাসুদেব কহিল, "তা হ'লে কি ডাকাতি ক'রে আমাদের কাছারী লুঠ ক'রেছিল?"

"আরে রামঃ, কাছারী লুঠ কি? ছোঁড়া এসেছিল, চড়োক পুজোর চাঁদা চাইতে; নিয়ে গেছে, আমার হাত-বাক্সটা। ছিল তাতে হাজার-খানেক টাকা। কিন্তু পুলিস আনিয়ে ভাঙা সিন্দুক দেখিয়ে—রিপোর্ট লিখিয়ে ছোঁড়ার পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা করলুম, আর তার দলের যে যেখানে ছিল, সবগুলোকে পাইকিরী হিসেবে শ্রীঘরে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলুম।"—বলিয়া তিনি সগর্ব্বে হাস্য করিলেন।

বাসুদেবের মুখ দিয়া আর বাক্‌নিষ্পত্তি হইল না। পিতার মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

* * * *

অনেকগুলা বছর পর-পর কাটিয়া গিয়াছে। কালপ্রবাহে নূতন পুরাতনের স্থান অধিকার করিয়াছে। বাসুদেব নিজের জমীদারী হইতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। হিন্দু মহাসভার সে এক জন পাণ্ডা; সম্প্রতি পত্নী-কন্যাসহ স্বগ্রামে পিতৃসান্নিধ্যে বাস করিতেছে।

বাসুদেব শুনিল, প্রহ্লাদ মুখুয্যের বাড়ীটা নীলামে উঠিবে। দীর্ঘ দীঘি সমেত সুবিশাল বাগানবাড়ীটার ভগ্ন অবস্থা হইলেও অতীত ঐশ্বর্য্যের অনেক চিহ্ন তাহার জীর্ণ অবয়বকে আজও জড়াইয়া আছে।

শুভা স্বামীকে ধরিল, "আমরা বাড়ীটা চাই—অমনি একখানা বাড়ীতে আমার বিশেষ প্রয়োজন, তাই।"

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বাসুদেব উত্তর করিল, "বাবা, অন্তুকদের অনেক বিষয়-সম্পত্তি কিনলেও বাড়ীখানা কিনবার কথা কিছুই তো ব'লছেন না!"

—"তা হোক! আমাদের 'স্ত্রী-শিক্ষা-নিকেতন' ওই বাড়ীতে চমৎকার হবে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার সবাইকে ওই বাড়ীটাতে নেমন্তন্ন ক'রে আনতে পারব। এখানে বাবার অসন্তোষের ভয়ে কিছুই করতে পাচ্ছি না; অথচ আমরা যে সব প্ল্যান ঠিক ক'রে এসেছিলুম—"

অগত্যা বাসুদেবকে কথাটা পিতার নিকট পাড়িতে হইল; বলিল, "অন্তুকদের বাড়ীটা—"

কথাটা সম্পূর্ণ না শুনিয়াই হরিহর চাটুয্যে কহিলেন, "বাপ রে! প্রহ্লাদ মুখুয্যের বাস্তুভিটে! ওখানে সে কত যাগ-যজ্ঞ ক'রেছে! প্রহ্লাদের ছেলে শিবু কত ক্রিয়াকর্ম্ম, পাল-পার্ব্বণ ক'রেছে! শিবুর পরিবারও বর্ত্তমান; ও-বাড়ী নেওয়া চলতে পারে না।"

সবিস্ময়ে বাসুদেব কহিল, "দেনার দায়ে বিক্রী হ'য়ে যাবে অত বড় বাগান-বাড়ী—"

—"না, না, বাপু, তুমি বোঝ না। অন্তা এখন জেল হ'তে ফিরেছে, সুতরাং জেলের ভয় আর তার নেই। তার বাস্তুভিটে আমি নিতে চাই না।"

—"কিন্তু সে তো নিরুদ্দেশ !"

—"হোক নিরুদ্দেশ ! তবু বাস্তু নেওয়ার মর্ম্ম তো জান না, আমার ভয়, তোমাদের—"

পিতার উহ্য ইঙ্গিতটা বুঝিয়া পুত্র ঈষৎ হাস্য করিল। কহিল, "যখন তার বিষ দাঁত ছিল ; কিন্তু সে থাকগে, আপনার যখন অনিচ্ছা, তখন—"

চাটুয্যে মশায় কহিলেন, "বাসু, অনেক দিন থেকেই তোমায় একটা কথা বলব মনে করছি। কমলার একটা নাম চঞ্চলা, জান তো; চাটুয্যে-বাড়ীর বধূদের আচরণে তিনি এত দিন এ-সংসারে বন্দী ছিলেন ; কিন্তু এই যে সব কথা কাণে আসে, বৌমা ইস্কুল খুলবেন, ইত্যাদি—এ সব চাল-চলন আমাদের বাড়ীর বৌদের ছিল না কখনো।"

—"কিন্তু বাবা, সে যুগ অনেক পেছনে পড়ে গেছে। আমাদের মা, ঠাকুমা যা ক'রে গেছেন, তাই ধ'রে চিরকাল তো প'ড়ে থাকলে চলে না। তা হ'লে তার অতীত, আরও অতীত কালে আপনি দৃষ্টি-পাত করুন—সে কি সম্ভব, না, সঙ্গত ? যুগ এগিয়ে চলেছে—তার সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলতে না পারলে, মানুষের মত হ'য়ে বেঁচে থাকা সম্ভব ব'লে মনে হয় না।"

শ্লেষ-বিজড়িত কণ্ঠে চাটুয্যে মশায় কহিলেন,—"সবাই যা বল্‌লে, তা হ'লে তাই সত্য—বৌমা একটা স্ত্রী-শিক্ষা-নিকেতন না মেয়ে-কুল খুলছেন ; স্বয়ং সেটাকে তিনি পরিচালনা করবেন। দেশময় চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা হচ্ছে ; এ সব জনরব তবে মিথ্যে নয় ?"

বাসুদেব কহিল,—"না, মিথ্যে নয়। কোন একটা বিরাট্ কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করতে গেলে, এক জনের সাহায্যে তা হয় না ; আর হ'লেও তার স্থায়িত্ব তেমন সুদৃঢ় হ'তে পারে না।"

ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে চাটুয্যে মশায় কহিলেন,—"হুঁ ! শিবতলার আখড়া-বাড়ীটা তাই আমায় জিজ্ঞাসা না ক'রেই দখল করা হ'য়েছে। সেখানেও তো একটা কিম্ভূতকিমাকার 'অবলা ব্যায়াম-সমিতি' না ঐ রকম কি খোলা হয়েছে ?"

বাসুদেব কহিল,—"মেয়েদের উচ্চশিক্ষার যেমন প্রয়োজন, স্বাস্থ্যেরও তেমনই প্রয়োজন। স্বাস্থ্য না থাকলে, স্বাস্থ্যযুক্ত সন্তান পাওয়া যায় না,—এই জ্ঞানটাই স্ত্রীলোকের মধ্যে বিকাশ করবার চেষ্টা হচ্ছে—"

কঠিন কণ্ঠে চাটুয্যে মশায় কহিলেন, "ও: ! আমি বুঝেছি সব। তবে বাপের বিষয়ে তোমায় বঞ্চিত করব না ! কিন্তু একত্র বাস করা আর চল্‌বে না, আজই আমি কাশী যাব স্থির ক'রেছি।"

বাসুদেব নীরব রহিল।

* * * *

একান্ত রুষ্ট হইয়া হরিচর চাটুয্যে কাশী বাস করিতে চলিয়া গেলেন। বাসুদেবকেও কলিকাতায় যাইতে হইল ; পরিষদের অধিবেশন।

সমস্ত জমীদারী দেখাশোনার ভার মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির উপর, পুরাতন দেওয়ান কর্ত্তার সহিত বিদায় গ্রহণ করায়, এক জন পেন্সন-প্রাপ্ত মুন্সেফ্‌কে তিনি ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন।

বৎসর শেষে চৈত্র মাস দেখা দিল। গাজন-পর্ব্ব আরম্ভ হইল। প্রজারা আসিয়া ম্যানেজারকে নিবেদন করিল, চড়কতলা ছাড়িয়া দেওয়া হোক—

ম্যানেজার মাথা চুলকাইয়া কহিলেন,—মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির কঠোর নিষেধ, চড়কতলা ছাড়া হবে না ; তোমরা বাবার স্থানে পূজো দিয়ে সন্ন্যাসব্রত শেষ করতে পার।"

চাষাভূষার দল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল,—"সে কি ! আমরা বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকেই ওটাকে গাজনতলা ব'লে জানি—সারা মাস সন্ন্যাসব্রত করছি—"

—"আচ্ছা, আমি তোমাদের হ'য়ে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জিকে বোঝাবার চেষ্টা করব—"

যথাবিহিত রীতি অনুসারে ম্যানেজার সাহেব কথাটা মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির নিকট পাড়িলেন ; কহিলেন,—"ওটা যখন বরাবর হ'য়ে আসছে—"

কণিকা ফোঁস্ করিয়া উঠিল, "বরাবর হ'য়ে আসছে কথা কোন মানে হয় না ! সে-কালে পিঠে বাণ ফুঁড়ে মানুষ চড়কগাছে পাক খেতো ; এখন কি তা হয় ?"

মা কহিলেন,—"কিন্তু প্রজাদের ক্ষুণ্ণ করো না কণা, বোঝ না, ঠাকুর-দেবতা—"

লতিকা কহিল,—"ঠাকুর দেবতার নিজেরা কিছু বল্‌তে জানেন না ! তাই মানুষ যত ইচ্ছে তাঁদের নামে ভয় দেখিয়ে কথা কয়। আসলে কিন্তু তাঁরা ভয়ত্রাতা, ভয়দাতা নন।"

কণিকা কহিল, "ঠিক বলেছিস্, লতা, ও গাজনমাঠে চড়ক-তলা হ'তে পারে না। ও পুরাতন পদ্ধতির প্রচলন আমরা রাখব না। দাদুকে অবধি হঠতে হলো।"

মিঃ দত্ত তথাপি কহিলেন, "দীর্ঘকাল চলে আস্‌ছে একটা ব্যবস্থা—"

উত্তেজিত কণ্ঠে কণিকা কহিল, "কেউ বন্ধ করেনি বলেই সেটা দীর্ঘকাল চলতে পেরেছিল ! কিন্তু এখন তার অবসান হবে।"

মা কহিলেন, "তিনটা দিন, যখন এত গোলমাল, দে না বাপু মত।"

কন্যারা ভয়ানক বাঁকিয়া বসিল ! বা: ! মা, চড়ক উৎসব ! ও-বঁটি-ঝাঁপ ; কাঁটা-ঝাঁপ ও-সব চলবে না।"

ম্যানেজার সাহেব কহিলেন, "চাষাভূষারা অসন্তুষ্ট হতে পারে, প্রাচীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ—"

"মিঃ দত্ত ! প্রাচীন অনেক কিছু ছিল। নবীন তার উচ্ছেদ করবে - এই তার দৃঢ় পণ ! এই আমাদের জয়যাত্রার নিশানা ; তাতে কল্যাণ বই অকল্যাণ ঘটবে না।"

এ সব তর্কের উত্তর কি ?

* * * *

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী কন্যাদের তীব্র আপত্তিতে শিবতলার মাঠে চড়ক করিবার অনুমতি দিতে পারিলেন না ; কিন্তু এ লইয়া হয় তো একটা হাঙ্গামা ঘটিতে পারে, এমনিতর একটা আশঙ্কা মনোমধ্যে অঙ্কুশের মত বিঁধিয়া রহিল। তাই পূর্ব্বেই প্রস্তুত থাকিতে তিনি তাঁহার মুসলমান প্রজাদের ভিতর হইতে কয়েক জন লাঠিয়ালকে শিবতলার মাঠে পাহারায় রাখিলেন, এবং জমীদার-বাড়ী রক্ষার জন্য ভোজপুরীদের সংখ্যাও কিছু বৃদ্ধি করিলেন।

কণিকা কহিল, "মা, তুমি ওদের ভয় কর ? সারা মাস উপোস করে তো সব উপোসী ছারপোকা—"

"কিন্তু কে বলতে পারে? যদি অন্তক মুখুয্যে—"

কথাটা সমাপ্ত হইতে না দিয়া মেয়েরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। লতিকা কহিল, "সে তো হাওয়া হ'য়ে উড়ে গেছে মা!"

কণিকা কহিল, "দাদুর মত আমরাও তার ব্যবস্থা ক'রতে জানি।"

মা কিন্তু মেয়েদের কথায় তেমন ভরসা পাইলেন না। গাজন-উৎসবের দিন-ক'টা নির্ব্বিঘ্নে কাটাইতেই সংগোপনে তিনি শিব-ঠাকুরের পূজা মানত করিয়া রাখিলেন।

আচম্বিতে অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় অকস্মাৎ দেশের পরিস্থিতি বদলাইয়া গেল। দেবাদিদেবকে লইয়া গাজনের পর্ব্ব করিবার পূর্ব্বাহ্নে বিষাণ বাজিয়া উঠিল। রুদ্র সংহার-মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠ হইতে গরল উদ্গিরণ আরম্ভ হইল।

হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার হিড়িকে অনল হু-হু করিয়া জ্বলিতে লাগিল। দেশময় ত্রা'সের সঞ্চার! পিনাকী তাণ্ডবছন্দে চরণ-ক্ষেপে নৃত্য করিতেছেন! ত্র্যম্বকের তৃতীয় নেত্রের অগ্নি ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

মারামারি, অত্যাচার, অনাচার, লুণ্ঠন, হরণ উত্তাল বেগে বহিতে লাগিল।

বাসুদেব পত্নীকে তার করিল, "সত্বর কন্যাদের লইয়া কলিকাতায় চলিয়া এসো।"

সুভাও বুঝিলেন, থাকাটা সঙ্গত নহে, নিরাপদও নহে।

ষ্টেসন হইতে বাড়ী চারি ক্রোশ। দুহিতাদের লইয়া মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী মোটরে উঠিতে গেলেন।

লতিকা কহিল, "মা, সেখ ড্রাইভ্ করবে?"

কথাটায় মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর মনে খট্‌কা লাগিল। একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ও পাঠান বটে, আচ্ছা থাক। পাল্কীতেই আমরা ষ্টেশনে যাব। মহাবীর, রামভুজ, সন্তোষ সিং সবাই তো সঙ্গে যাচ্ছে?"

শাশুড়ী দিদি-শাশুড়ীদের প্রথায় মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী শিবিকারোহণ করিলেন। পুরাতন দিনের কথা মনে পড়িল। যে দিন এ-বাড়ীতে বধূবেশে প্রথম পদার্পণ করেন, সে-ও এমনি শিবিকা হইতে; এবং কলিকাতার এক জন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবহারাজীবের কন্যা হইয়া পাল্কী করিয়া আসিতে তাহার ক্রোধ ক্ষোভ বিবাহের সমস্ত আনন্দকে হরণ করিয়াছিল।

কিন্তু আজ তিনি স্বেচ্ছায় শিবিকায় আরোহণ করিলেন। বাড়ীর মেয়েরা ভারী মজা ভাবিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

জমীদার-বাড়ীর পাল্কী পাইক-পেয়াদা, বরকন্দাজ পরিবেষ্টিত হইয়া শিবতলার মাঠের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। মন্দিরের সম্মুখে পাল্কী আসিতেই মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী শিবিকা দু'খানা নামাইতে বলিলেন।

বাহকগণ পাল্কী নামাইল। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী কন্যাদের লইয়া দেবতাকে প্রণাম করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

প্রচণ্ড দুপুর রৌদ্রে দেবায়তন যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

মন্দির অভ্যন্তরে গৈরিক বসন-পরিহিতা বৃদ্ধা বসিয়া নিবিষ্ট মনে অক্ষমালা জপ করিতেছিলেন।

সুভা দেবতাকে প্রণাম করিয়া মুখ তুলিলেই বৃদ্ধা কহিলেন, "দেশ ছেড়ে চললে মা!"

হ্যাঁ, "আমরা কলকাতাতেই থাকতুম। মেয়েদের খেয়ালেই বছর-দুই এখানে বাস করছি।"

"ওঃ! তা চড়কের মেলাটা—"

"না! তা দেখে যাবার সুযোগ হবে না। আমার ছোট মেয়ে আবার 'নববর্ষের কুচকাওয়াজে' নাম দিয়েছে কি না!"

তা বটে! কিন্তু পয়লা বোশেখ আমাদের ওই গণেশতলাতে ছেলেরা—যাকগে, দেশের সবই তো গেছে, বাকী রয়েছি কেবল আমরা"—বৃদ্ধা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস দমন করিয়া দেবতার দিকে চাহিলেন।

কণিকা কহিল, "আপনি কি এখানেই থাকেন?"

লতিকা কহিল, "আপনি বুঝি এই মন্দিরের ভৈরবী?"

প্রাচীনা হাস্য করিলেন। সায়াহ্নের ম্লান রবিকরের মত অতি স্নিগ্ধ কোমল সে হাসি। তেমনি কোমল স্বরে কহিলেন, "না, মা, তোমরা একেলে নভেল-নাটকে মন্দিরের যে ভৈরবীর কথা প'ড়েছ, আমি সে রকম কিছু নই। আমার অন্তু যখন পাঁচ বছরেরটি, তার খুব ভারী ব্যামো হ'য়েছিল; বাবার দোর ধরেই তো তাকে পেয়েছিলুম! বাবার স্থানে তাই সন্ন্যাস-ব্রত মানত করেছিলুম, সেই হ'তে এই পঁচিশ বছর ধ'রে সন্ন্যাস-ব্রত ক'রে আসছি। যেখানে যত দূরেই সে থাক, শূলী শূল হাতে তাকে রক্ষে ক'রবেন।"

কণিকা সাগ্রহে কহিল, "তিনি এখন কোথায়?"

"কি ক'রে জানব মা! সে থাকলে কি আজ দেশের এমন দুরবস্থা হ'তে দিত? না তোমাদের দেশ-ছেড়ে যেতে হ'ত।"

সুভা ভূমিষ্ঠ হইয়া বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "কাকীমা, আপনাকে আমি চিনতেই পারিনি!"

"থাক! থাক! বৌমা, সে আমি বুঝেছি। দেবতার স্থানে অন্যকে নমস্কার করতে নেই মা! বাবা মহাদেব তোমার মঙ্গল করুন! রক্ষা করুন।"

* * * *

"মার, মার! শালা জমীদার-বাড়ীর পাল্কী রে! ফাঁকি দেকে জেনানা আদমী ভাগ যাতা হ্যায়, মার, মার।"

হঠাৎ একটা হৈ হৈ শব্দ উঠিল! চক্ষের নিমেষে পঞ্চাশ-ষাট জন ষণ্ডামূর্ত্তি পাল্কীখানা ঘিরিয়া ফেলিল। অতঃপর ভোজপুরীগুলার সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষ বাধিল।

কণিকা, লতিকা দু'খানা পাল্কী হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সাবধান! আমাদের কাছে রিভলভার আছে। আমরা বন্দুক ব্যবহার ক'রব।"

উত্তরে কেবল একটা অশ্রাব্য গালি উত্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পাল্কীখানার উপর হুড়মুড় শব্দে লাঠি চলিল।

কণিকা পিস্তল তুলিতেই সুভা কন্যার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া সভয়ে কহিলেন, "সর্ব্বনাশ! মানুষ খুন করবি না কি?"

"ছাড় মা! নিজেরা মরব না কি?" বলিয়া কণিকা খট্ করিয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিল। একটা দুড়ুম শব্দের সহিত আর্ত্ত রব উঠিল। "খুন! খুন! জান লিয়া! মার, মার!"

লোকগুলা মরিয়া হইয়া দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ চালাইল। পাল্কীখানা বাহকদের স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এইবার তাহার ছাতটা উড়িয়া গেল। হিন্দুস্থানী রক্ষকদল

দুষমনদের সহিত লড়িয়া কেহ ঘায়েল, কেহ হত-চৈতন্ত হইল, কেহ বা "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" নীতির অনুসরণ করিল।

কণিকা, লতিকা মাকে লইয়া ভগ্ন পাল্কী ত্যাগ করিয়া বাহির হইল; সঙ্গে-সঙ্গে সুভা "মা গো" বলিয়া আর্ত্তরবে মূর্চ্ছিতা হইলেন। লাঠির আঘাতে কপাল ফাটিয়া তাজা রক্তের ধারা তাঁহার সুগৌর আনন ও শুভ্র বস্ত্র নিমেষে রাঙাইয়া দিল।

জননীর সঙ্গাহীন রক্তরঞ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া মেয়েরা সভয়ে চীৎকার করিল। লতিকা তাহার ছুরি দ্বারা আততায়ীকে আক্রমণোদ্যত হইল; কিন্তু পলকে একখণ্ড প্রস্তর তাহার বাহুর উপর সজোরে নিক্ষিপ্ত হইল; যন্ত্রণায় সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দুষমনকে লক্ষ্য করিয়া কণিকা গুলী ছুড়িল। পশ্চাৎ হইতে আততায়ীর লাঠির আঘাতে নিমেষে তাহাকে ভূতলশায়ী হইতে হইল।

অপরাহ্নের রাঙা আলো সন্ধ্যার ম্লানিমায় আবৃত হইল।

* * * *

ক্ষুদ্র কুটীরে মলিন-শয্যায় কণিকা চক্ষু মেলিল; ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "জল, মা গো!"

পার্শ্বোপবিষ্ট মানুষটি কণিকার তৃষিত কণ্ঠে শীতল জলধারা ঢালিয়া দিল।

কণিকা তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, "কে আপনি?"

"আমি হিন্দু—"

"সত্যি বলছেন—আপনি মুসলমান নন?"

ঈষৎ হাস্যে যুবক জামার ভিতর হইতে উপবীত বাহির করিয়া দেখাইল।

কণিকা কহিল, "আমার মা, বোন, তাদের সন্ধান জানেন?"

"জানি! তাঁরা কলকাতায় বোধ করি এতক্ষণ পৌঁছেছেন—"

"তবে আমি এখানে কি ক'রে এলুম—"

"আর একটু সুস্থ হ'য়ে সব শুনবেন। আপনার মাথায় এখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—"

ব্যাকুল কণ্ঠে কণিকা কহিল, "তা হোক, বলুন। হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে; চোখে আর কিছু দেখতে পেলুম না; কি হলো, তা জানি না। কিন্তু আমার খুব সাহস ছিল; আমি দু'বার গুলী ছুড়েছিলুম; তবে তারা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল।"

যুবকের বিস্ফারিত নেত্র দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনারও তো লোকজন ছিল?"

"তা ছিল। কিন্তু ছিল না স্বজাতি। বিহারী দরোয়ান, পাঞ্জাবী দরোয়ান, উড়ে বেয়ারারা মারামারি করেছিল, কিন্তু নিজেরা জখম হ'তে আরম্ভ হ'লে, আত্মরক্ষার পথটাই গ্রহণ ক'রলে! উড়ে বেহারারা তো পাল্কী ফেলে আগেই পালিয়েছিল—"

"কিন্তু আপনারা তো জমীদার; লাঠিয়াল নেননি কেন? পুলিশ নেন্‌নি কেন?"

"পুলিশের কথাটা আমাদের মনে হয়নি; ভুল হয়েছিল। আর লাঠিয়াল! তা মাইনে-করা লেঠেল আছে বটে; কিন্তু তাদের আনলে ভাল ফল হতো না বলেই আনিনি। শত্রুর সঙ্গেই তারা যোগ দিত—"

বিস্ময়ে যুবক কহিল, "শত্রুর সঙ্গে যোগ দিত?"

"কেন দেবে না? তারাও যে মুসলমান! সেই জন্তই মোটরে আমরা যাইনি; আমাদের সোফার সেখ। তা না হ'লে জান কবুল ক'রে যদি আমার লোকজন ল'ড়ত—"

"হুঁ" বলিয়া চুপ করিয়া যুবক মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র গবাক্ষ-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগটা সম্বরণ করিয়া লইল। কণিকার দিকে যখন চাহিল, তখন বারিগর্ভ মেঘখণ্ডের ন্যায় তাহার মুখখানা ঈষৎ ম্লান! সে কহিল, "আচ্ছা, আপনি আমায় 'আপনি' বলে কথা বলছেন কেন? দেখছেন, আমি এক জন গরীব দুঃখী!"

"কি জানি! হয় তো এত সম্ভ্রমভরে গরীবের সঙ্গে কথা কওয়া আমার অভ্যাস নয়; কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা কইতে আমার সম্ভ্রম বোধ হচ্ছে। কিন্তু সে কথা যাক, আপনি বলুন, কেমন ক'রে আমি এখানে এলুম?"

যুবক কহিল, "বাবা পঞ্চাননকে পূজো দেবার জন্ত আসছিলুম; আর আমার মত লোককে গ্রামে আসতে হ'লে সন্ধ্যের অন্ধকারেই আশ্রয় নিতে হয়। অবশ্য, দেশ আমাকে ভুলে গেছে। তবু যদি এই চেনা সহচরটিকে হঠাৎ দেখে কেউ চিনে ফেলে, তাই! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যেখান হ'তে এত দুঃখ পেলুম—বন্ত জীবের মত যেখানে মানুষের চোখের আড়ালে জীবন কাটাতে হয়, সেই দেশের মায়া কিছুতেই আমি কাটাতে পারিনি! বছর-বছর সন্ন্যাসের দিন তাকেই মনে পড়ে। শুনেছিলুম, চড়ক-মেলা, গাজন-পর্ব্ব কিছু হবে না, জমীদারের মেয়েদের ঘোর আপত্তি, তাদের কঠোর নিষেধ। সেই বিধি-ব্যবস্থা নিজে দেখতে এসেছিলুম; আর ইচ্ছা ছিল, নিষেধের মুখে শক্তির প্রকাশ—কিন্তু তা আর হলো না।"

সাগ্রহে কণিকা কহিল, "কি হলো?"

শিবের গাজন পর্ব্ব-করা ভক্তটিকে ঠাকুর অন্য একটা কাজে লাগিয়ে দিলেন। এক দল মুসলমান ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে তোমাকে নিয়ে পালাচ্ছিল, পুলিশ এসে-পড়ায় তারা রণে ভঙ্গ দিয়েছিল! কিন্তু তোমায় তারা হাত-ছাড়া করেনি।"

বিছানার মধ্যেই কণিকার দেহটা কণ্টকিত হইয়া উঠিল; পাংশুমুখে কহিল, "তার পর।"

"তার পর ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত; স্বচক্ষেই সব দেখছো।"

সন্দিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া কণিকা কহিল—"আপনি, আপনিই কি অন্তক মুখুয্যে?"

"হ্যাঁ! আমিই ডাকাত অন্তক মুখুয্যে—যে আপনার ঠাকুর্দ্দার কাছারী লুঠে ছিল! তাই জেল খেটেছিলুম—" বলিতে বলিতে মেঘের বুকে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় অন্তকের দুই চক্ষু মুহূর্ত্তে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জলদজাল-সমাবৃত আনন অতিশয় গম্ভীর হইল। ধীরকণ্ঠে সে কহিল, "শত্রু হ'লেও স্বজাতি ব'লে ত্যাগ ক'রতে পারলুম না। 'চির সহচর' লাঠিখানাই তা করতে দিলে না। লাঠি হাতে অন্তক সকলের কালান্তক; সে জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। দলটা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালাল। তুমি তখন অজ্ঞান; কারা নিহত, কারা আহত—তার কিছুমাত্র খোঁজ না নিয়ে, তোমায় তুলে-নিয়ে চলে এলুম আমার এই গুপ্ত কেল্লায়! পুলিশের সাধ্য নেই, এখান থেকে তোমায় খুঁজে বার করে।"

কণিকার ম্লান মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল; শুষ্ক স্বরে সে কহিল, "এত দিন পরে কি আপনি প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ ক'রবেন? প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্তক কণিকার মুখের দিকে চাহিল;—কঠিন কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

কুটীরের বাহির হইতে আহ্বান-ধ্বনি—"অন্তক দা!"

চমকিয়া কণিকা কহিল, "ও কে?"

"আমার সঙ্গে যারা ডাকাতির অপরাধে জেলে গিয়েছিল, তাদেরই এক জন।"

অন্তক উঠিয়া গেল।

* * * *

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে অন্তক আসিয়া কণিকাকে কহিল, "ডুলিতে বিছানা ক'রে দিলে তো তোমার বিশেষ কষ্ট হবে না?"

কণিকা বিমূঢ় নেত্রে অন্তকের পানে চাহিয়া কহিল, "না, কিন্তু কোথায় যাব?"

অন্তকের চক্ষুর দৃষ্টি কণিকার মুখের উপর ন্যস্ত হইল। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তরে কহিল, "ক্রোশখানেক; কিন্তু দিবালোকে হ'তে পারে না। চাই সন্ধ্যের অন্ধকার।"

কণিকার মুখ ভয়ে পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

সে কহিল, "সন্ধ্যের অন্ধকারের দরকার কি? কি হবে?"

"তোমায় নিয়ে দূরে যাওয়া;—ক্রোশ-খানেক পথ—ইষ্টিসন পর্য্যন্ত।"

কণিকা অন্তকের মুখ পানে চাহিল। তাহার দুই চক্ষুতে ব্যাকুলতা; সে কহিল, "কিন্তু কোথায় আমায় নিয়ে যাবেন?"

"তুমি তো নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়েছ। আমি প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করব। হ্যাঁ, প্রতিশোধ গ্রহণ করব। এমন সুযোগ আমি ছাড়ব না! আর আমার কাছে তুমি কঠোর নির্ম্মমতা ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করতে পাব না!" অন্তক হাসিল,—শুষ্ক, নির্ম্মম হাসি!

উচ্ছ্বসিত স্বরে অকস্মাৎ কণিকা বলিয়া উঠিল, "শুধু মানুষ হিসাবেও কি এক বিন্দু করুণা পেতে পারি না?"

সহজ কণ্ঠেই অন্তক কহিল, "তোমার ওপর মানুষ হিসাবেও আমার এক বিন্দু দয়া করা উচিত নয়। নিঃসম্পর্কের উপরেই মানুষ হিসাবে দয়া, মায়া-মমতা চলে; কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে, সেটা শত্রু-সম্পর্ক! শত্রুকে দয়া করার অর্থই নিজের দুর্গতিকে চাগিয়ে তোলা; আর তুমিই বা কোন্ সাহসে মানুষের সততার আশা ক'রছ? তোমার প্রতি আমার দয়া-প্রকাশের কি কারণ থাকতে পারে! তোমার ঠাকুর্দ্দা মিথ্যা মকদ্দমা সাজিয়ে আমায় জেল খাটিয়েছিলেন; তোমার বাবা, মা আমার বাস্তুভিটেটাও নীলামে ডেকে নেওয়ার সঙ্কল্প ক'রেছেন; আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় শিবতলার আখড়া, তোমরা দুই বোনে দখল ক'রেছ! এখন আমার করুণা ভিক্ষা চাইছ? আজ আমি তোমায় ছেড়ে দেব, কাল নিঃসঙ্কোচে তুমি মকদ্দমা করবে। ডাকাতি, নারীহরণ, কিছুই বাধবে না! কেমন, এ কথা সত্য নয় কি?"

কণিকার কণ্ঠে স্বর ফুটিল না। কেবল সেই অপরাহ্ণে অস্তমিত রবির নিষ্প্রভ আলোকচ্ছটায় অন্তকের বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তির দিকে নিষ্পলক নেত্রের শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

* * * *

দুই জন বাহক কণিকার ডুলিখানা তুলিয়া লইয়া জঙ্গল-পথ ভাঙিয়া চলিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষ! আকাশে চন্দ্রোদয় হয় নাই! কেবল নির্ম্মল আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের ক্ষীণ রশ্মি সেই সঙ্কীর্ণ বনপথে একটা স্নিগ্ধ কিরণসম্পাত করিতেছে।

ডুলির পাশে-পাশে দীর্ঘ যষ্টি-হস্তে দেহরক্ষীর মত চলিতেছে অন্তক! কাহারও মুখে কথা নাই! শব্দ নাই! কেবল বৃক্ষশাখাচ্যুত শুষ্ক পত্রের উপর পদক্ষেপজনিত মর্ম্মর-ধ্বনি ও তরুপল্লব-প্রবাহিত বায়ুতরঙ্গ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

অন্তক কহিল,—"ভয় নেই! এখনি চাঁদ উঠবে; বনের অন্ধকার দূরে যাবে।"

"কিন্তু আমার বিপদ দূর হবে কি?"

স্নিগ্ধ স্বরে অন্তক কহিল, "তা হবে। ইষ্টিসনে পৌঁছুতে তো আর বেশী দেরী নেই—"

ব্যগ্রকণ্ঠে কণিকা কহিল, "আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞেসা করব। দয়া ক'রে বলুন, আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?"

অন্তক এ কথায় হাসিয়া উঠিল। কিন্তু স্ত্রীলোকের মত তাহার হাসি কোমল রহস্যময়। কৌতুক-কণ্ঠে সে কহিল, "আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়? তোমায় নিয়ে আমি কি করতে পারি?" অন্তক কণিকার মুখের পানে তাকাইল। ঠিক সেই সময়ে একাদশীর চাঁদ বৃক্ষপল্লব ভেদ করিয়া তাহার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-রাশি অন্তকের মুখের উপর ছড়াইয়া দিল।

কণিকা দেখিল, সে মুখে ভীষণতার চিহ্নমাত্র নাই। ভয় করিবার মত কিছু সে খুঁজিয়া পাইল না। যাহা পাইল, তাহাতে তাহার কুমারী-বুকে একটা দোলা দিল। চিত্ত নিঃসংশয়ে মানিয়া লইল,—বিশ্বাস করিবার, নির্ভর করিবার চিহ্নই যেন ও-মুখে দেদীপ্যমান—

অন্তক কহিল, "কই, কিছুই বললে না—"

কণিকা আস্তে-আস্তে কহিল, "আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না—আপনি—আপনি—"

বলিতে বলিতে সে থামিল দেখিয়া অন্তক কহিল, "আমি কি?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কণিকা কহিল, "আপনি ভদ্রলোক! কোন মন্দ, কোন অন্যায় কাজ আপনি করতে পারেন না।"

অন্তক কহিল, "কথাটা খোসামোদের মত হ'লো। তুমি ক'ঘণ্টা পূর্ব্বে জিজ্ঞেসা ক'রছিলে, আমি প্রতিশোধ নেব কি না।"

কণিকা নিরুত্তর রহিল। সে খোসামোদ করিয়া ও-কথা বলে নাই। বহু বার সে অন্তকের দিকে চাহিয়া ভাবিয়াছে, "নৃশংস দস্যু—না, সাহসী যোদ্ধা বলিয়া একে অভিহিত করা যায়? কিন্তু নিষ্ঠুর হত্যাকারী না বলিয়া মন তত বারই বলিয়াছে—আর্ত্তত্রাতা, প্রাণদাতা।—সেই কথাটাই তখন আবেগের মুখে বাহির হইয়া গিয়াছে।

কণিকাকে নীরব দেখিয়া অন্তক কহিল,—"কথাটা আমার রূঢ় হ'লো,—কিন্তু তুমিও—"

বাধা দিয়া কণিকা কহিল, "আমায় মাপ করুন, আমি অন্যায় বুঝতে পেরেছি।"

"সত্যই কি তুমি মাপ চাইছ?"—অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে অন্তক কণিকার পানে চাহিল।

কণিকা কহিল, "হ্যাঁ।"

"তবে শোন, তোমার বাবা-মাকে 'তার' করা হ'য়েছে; তাঁরা

শুধু নিজেরা এসে তোমায় নিয়ে যাবেন এই সর্ত্তে। তাঁরাও তাতে স্বীকৃত হ'য়েই আসছেন। কিন্তু এইখানেই তোমায় নামতে হবে।"

"কেন?" কণিকার সুরে বিস্ময়।

"ডুলির বাহকরা আর যাবে না! আমি একা তোমায় নিয়ে যাব।"

বাহকরা ডুলি নামাইল।

অন্তক কহিল, "আমার হাতে ভর দিয়ে আস্তে-আস্তে তুমি চলতে পারবে বোধ হয়?"

"পারব"।

অন্তক হাত বাড়াইয়া দিল। "এসো, কোন কষ্ট হবে না। পথ অল্প। কিন্তু আমার বড় অসুবিধা হচ্ছে।"

কণিকা প্রশ্ন করিল, "কি?"

অন্তক কণিকার হাত ধরিয়া তাহাকে সযত্নে শিবিকার ভিতর থেকে বাহির করিতে-করিতে কহিল, "ছোট বেলায় তোমায় যখন দেখতুম, তখন খুকী বলতুম, বড় হ'বার পর আর দেখিনি; তোমার নামও জানি না। কিন্তু মিস্ চাট্যাজ্জি বলেও ডাকতে পাচ্ছি না।"

"বেশ, আমাকে কণিকা বলবেন। আমার নাম কণিকা। চলুন, কোথা যেতে হবে।" কণিকা অন্তকের হাত ধরিল।

"এই যে ডান পাশের রাস্তা, এস, আমার সঙ্গে।"

উভয়ে অগ্রসর হইল।

চলিতে চলিতে অন্তক কহিল, "নতুন বছরে আমার হাত ধ'রে তুমি চলতে আরম্ভ করলে কণিকা।"

* * * *

অনেকখানি বিতর্কের পর হরিহর চাটুয্যে এক প্রকার রাগ করিয়াই কহিলেন, "বাসু, ও-মেয়েকে অন্তক ছাড়া আর কারু হাতে দেওয়া যেতে পারে না! না, পারে না!"

কিন্তু বাবা, সান্ন্যাল ছেলেটি রয়েল একাউণ্টেণ্ট পাশ।"

"থাম! থাম! ও-সব আমি ঢের জানি; আমি চাই বনিয়াদী ঘর। ওরা কস্মিন কালেও বনিয়াদী নয়! এমন কি, তু'পুরুষেও বড়লোক নয়! ওর আবার মর্য্যাদা কি?"

"কিন্তু যে জেল খেটেছে, তারই বা মর্য্যাদা কি? আমাদের কাছারী লুঠ করলে।"

"থামো! কে না জানে, জমীদারে জমীদারে ঝগড়া বাধলে অমন খুন, জখম, ডাকাতি অনেক কিছু ফ্যাসাদ, মামলাও চিরকাল চ'লে আসছে! কত জন সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছে। শিবু মুখুয্যে, প্রহ্লাদ মুখুয্যেদের সঙ্গে ঝগড়া আমাদের চিরকাল; কিন্তু মুখুয্যেদের সেই পূর্ব্ব-প্রতাপ থাকলে আজ তোমাদের গ্রাম ছেড়ে পালাতে হতো না! মেয়েটাকেও মোছলমানে নিয়ে পালাতে পারত না। তার পর আর একটা কথা—"

বাসুদেব পিতার মুখের দিকে চাহিল।

চাটুয্যে মশায় চারি পাশে চাহিয়া গলা খাটো করিয়া কহিলেন, "বুঝছ না? অন্তকের সঙ্গে বিয়ে হ'লে দশের লোক ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারবে না। আর তা না হলে অন্য লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও; একটি মানুষও তোমার বাড়ী পাত পাড়বে না। বলবে—মোছলমান ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ডাকাতের আড্ডাতে ছিল। চিরকালটা বংশে দুর্নাম থেকে যাবে।"

"কিন্তু আমার কলকাতার সমাজ,—যাদের সঙ্গে আমি ওঠা-বসা করি—"

হ্যাঁ, হ্যাঁ! থাকতো মেয়ে মোছলমানের ঘরে! তার পর আসতো নারী-উদ্ধার-সমিতি! কিন্তু তোমার ও সান্ন্যালের দলের সাধ্যও ছিল না, এমন প্রাণপণ করে ওকে উদ্ধার করা; মেয়েমানুষের ইজ্জৎ বাঁচান ছাড়াও অন্তক পাত্র-হিসাবে রূপে-গুণে-বংশমর্য্যাদাতে অতুল্য। হ্যাঁ, বুক ফুলিয়ে নাতনীর বিয়ে দেব। অন্তককে আমার চাই। এক দিন যাকে জেলে দিয়েছিলুম, নাত-জামাই বলে তারই হাত ধরব।"

অন্তরালে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীও শ্বশুরের প্রস্তাবটার পূর্ণ সমর্থন করিয়া কহিলেন, "কণিকার মুখ হ'তে যে বিবরণ আমি সংগ্রহ করেছি, তাতে জেনেছি, অন্তকের চরিত্র গৌরবের, শ্লাঘার; আর তোমার মেয়ের মনও সেই দিকেই—"

বাসুদেব বিরক্ত স্বরে কহিলেন, "রেখে দাও তোমার মন! ও-সব সিনেমা-দেখা মনের আমি মর্য্যাদা দিই না, তবে—"

"তবেটা কি?"

"বাবা যা ব'লছেন, সমাজ—আর দীর্ঘকাল দুটো বংশের মধ্যে যে বিরোধ চলে আসছে, তার অবসান।"

* * * *

বৈশাখী পূর্ণিমা। দেবতার আজ পুষ্প-দোল। বুড়ো শিব সিঙ্গার বেশ করিয়াছেন। রাজ-পরিচ্ছদে রাজা সাজিয়া সিংহাসনে বসিয়া ভক্তবৃন্দকে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন।

শিব-শম্ভুর গাজন উৎসব এবার ভাল করিয়া হয় নাই বলিয়া ফুলদোল পর্ব্বে উৎসবকে বিশেষ জাঁকাল করা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে যাত্রা, থিয়েটার, নাচ-গানে যেন আনন্দের প্রস্রবণ ছুটিতেছে।

মুখুয্যেদের ভাঙ্গা-বাড়ী দ্রুত সংস্কার-কার্য্যে আবার নবশ্রী লাভ করিয়াছে। মলিন অঙ্গ ধুইয়া-মুছিয়া নূতন সজ্জা করিয়াছে! উৎসবের বাতি সেখানেও জ্বলিতেছে। অন্তকের আজ ফুলশয্যা! বৌভাতের ভীড়! আখড়ার ছেলেদের মহোল্লাস। বহু দিন পরে সম্মানে, সম্ভ্রমে, আনন্দের মাঝে সগৌরবে তাহারা 'অন্তকদাকে' ফিরিয়া পাইয়াছে। নদীবক্ষে বন্যার সমারোহের ন্যায় পুলকে তাহারা মাতোয়ারা!

চাটুয্যে মশায় অন্তকের হাতে পৌত্রীকে সঁপিয়া-দিয়া পরিহাস-পূর্ণ কণ্ঠে কহিয়াছিলেন, "যোগ্যে যোগ্য। ডাকাতের গিন্নী ডাকাতনী হয়।"

গভীর রাত্রে পুষ্পাভরণে ভূষিতা পত্নীকে বাহু-পাশে বাঁধিয়া অন্তক কহিল, "আজ বৈশাখী-পূর্ণিমা। তোমাদের কাছারীলুঠের জন্য পুলিশ এই দিনে আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল।—এই দিন আবার তোমায় পেলুম; আমার প্রতিশোধ নেওয়া হলো।"

কণিকা কহিল, "বয়ে গেল, তবু আমি জিতেছি।"

সহাস্যে অন্তক কহিল, "তাই না কি? কিসে?"

তৎক্ষণাৎ কণিকা কহিল, "কেন? নিজের শৌর্য্য, পরাক্রম দেখিয়ে তবে তো আমায় পেলে। সে-কালে রাজাদের মত—"

অন্তক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল, "ঠিক বলেছ, তুমি আমার জয়লব্ধা ভাগ্যলক্ষ্মী!"

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।



অস্বীকার

৩

চায়না স্ট্রীটে সুরাটী-বাজারের কাছে মস্ত চার-তলা ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটের সামনে দু'খানা রিক্‌শ আসিয়া থামিল। রিক্‌শ হইতে নামিল মার্থা এবং কল্লোল।

ফ্ল্যাটের ছাদ সেই আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে! কল্লোলের মনে হইল, যেন কলিকাতার চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ে আসিয়াছে···পথের দু'ধারে তেমনি সব উঁচু ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট নয়, যেন খোপের উপরে খোপ সাজানো··· পায়রার মতো মানুষ-জন ঐ সব খোপে বাস করিবে!

কল্লোল বলিল—এই ফ্ল্যাট?

মার্থা বলিল—ইয়েস।

কল্লোল বলিল—এত সব ঘর, ইহার মধ্যে নিজের ঘর কি করিয়া বাছিয়া লও, বন্ধু? ভুল করিয়া অন্য কাহারো ঘরে ঢুকিয়া পড়ো না?

হাসিয়া মার্থা বলিল—ইউ'আর এ উইট! কাম্‌ উইথ্‌ মী · আই শ্যাল্‌ গেট ইউ সুটেব্‌ল্‌ রুমস্‌ (তুমি বেশ রসিক! আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমাকে তোমার যোগ্য ঘর সংগ্রহ করিয়া দিব)।

কল্লোল চুপ করিয়া রহিল। ভাবিল, ক'দিনের জন্য এ ঘর!

নিঃশব্দে মার্থার সঙ্গে কল্লোল ফ্ল্যাটে প্রবেশ করিল।

সামনে লিফট্‌। যেন মোটা একটা পাইপ! যতখানি জায়গা বাঁচাইয়া, যত সংক্ষেপে সারা চলে, এমনি ভাবে ঘর-দালান তৈরী হইয়াছে!

তিন-তলায় লিফট্‌ হইতে নামিয়া সুদীর্ঘ দালান। মার্থা বলিল—আমার ঘরে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিয়া এখনি আমি কামরা ঠিক করিয়া দিব।

একটি কামরা। আর তার পাশে ল্যাভার ও বাথ। দালানের দু'দিকে পাশাপাশি ঘরের আর সংখ্যা নাই! সে সব ঘরে বিচিত্র কলরব। কল্লোলের মনে হইল, যেন সে মৌচাকের মধ্যে ঢুকিয়াছে!

পঁয়ত্রিশখানা কামরা পার হইয়া ডান দিকে ছত্রিশ-নম্বরে মার্থার ঘর। চাবি ঘুরাইয়া দ্বার ঠেলিতে দ্বার খুলিয়া গেল। দু'জনে ভিতরে ঢুকিল।

বড় কামরা। মাঝখানে জাপানী স্ক্রীন দিয়া একখানিকে দু'খানি কামরা করা হইয়াছে। বাহিরের দিকে ছোট একটি গোল-টেবিল, বেতের চারখানি ছোট চেয়ার, কোণে হ্যাট্‌-র্যাক, বইয়ের ছোট সেল্‌ফ; সেল্‌ফে বই ঠাশা।

মার্থা বলিল—বসো···

কল্লোল বসিল। মার্থা স্ক্রীনের ও-দিকে ভিতরের কামরায় গেল। গিয়া ও-দিককার ছোট খড়খড়ি খুলিয়া দিল। ঘরে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিল।

তার পর মার্থা বাহির হইয়া আসিল। আসিয়া বলিল, —এখনি আসিতেছি। এ্যাণ্ড টু মেক্‌ ইয়োরশেল্‌ফ্‌ মোর কমফর্টেব্‌ল্‌ দেয়ার্স মাই কট্‌ য়্যাট সাইড। ইউ মে রোল অন্‌ বেড···(কিম্বা যদি আরাম চাও, ও-দিকে আমার খাট আছে; বিছানায় গড়াইতে পারো)।

কথার সঙ্গে মার্থার মুখে মৃদু হাসি !

কল্লোল বলিল—থ্যাঙ্ক ইউ। আই হোপ্ টু বী কোয়ায়েট কমফর্টেব্‌ল্ হিয়ার (তোমায় ধন্যবাদ! এই-খানেই আমি আরাম পাইব, আশা করি)।

মার্থা সে কথার জবাব না দিয়া হাসি-মুখে বাহির হইয়া গেল।

পাঁচ-সাত মিনিট কাটিল। কল্লোল উঠিয়া স্ক্রীনের ও-দিকে উঁকি দিয়া দেখিল। ও-দিকটা চমৎকার সাজানো। সিঙ্গল্‌-বেড খাট; খাটে পুরু গদির উপর ফর্শা বিছানা, বিছানায় ঝালরদার বালিশ। আর্শির টেবিল, আলমারি, কৌচ-চেয়ার, ছোট একটি অর্গান, খড়-খড়িতে বর্মীজ-সিল্কের নক্সাদার পর্দা। দেখিয়া কল্লোল চমৎকৃত হইল। বয়স হইয়াছে, অথচ মার্থার এমন সখ! তার পর এ-ঘরে বইয়ের সেল্‌ফের দিকে মনোযোগ দিল। শুধু নভেল। ভালো-মন্দ কত নভেল যে আছে! বেশীর ভাগ শস্তা-দামের বাজে নভেল। সেকণ্ড-হ্যাণ্ড দোকানে গিয়া লাগসৈ-নামের যে নভেল সামনে দেখিয়াছে, কিনিয়া আনিয়াছে। দু'চারখানা বই টানিয়া দেখিল প্রেমের উপন্যাস··ক'খানা থ্রিলারও আছে।

তাচ্ছল্য-ভরে হাসিয়া মনে-মনে কল্লোল বলিল, এমনি করিয়াই রোমান্সের রঙে রাঙাইয়া জীবনটাকে ইহারা কাটাইয়া দিতে চায়! চাহিবার সীমা কি ছোট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ! জীবনকে এরা কি ভাবে? একটু সাজগোজ করিয়া দু'খানা নভেল পড়িয়াই ব্যস্! এত-খানি বুদ্ধি, এত রকমের বাসনা-কামনা লইয়া মনের মধ্যে হাজার দীপের বাতি জ্বালিবার সামর্থ্য মানুষের আছে—সে হাজার বাতির মধ্যে ক'টা জ্বালে? একটা, দুটো, বড়-জোর তিনটা। সেই দু'-তিনটা বাতি জ্বালিয়া পয়সার সন্ধান করে; স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া ভাবে সংসারের সাধ মিটিল! তার উপর দু'-চারিটা সখ থাকিলে খেলাধুলা, না হয় একটু পান-ভোজন!

রাজা-বাদশাদের কথা মনে পড়িল। ইতিহাসে পড়িয়াছে। আরব্য-উপন্যাসে পড়িয়াছে। তাঁদের মতো পয়সা সকলের নাই! না থাকুক, তবু এ পৃথিবীতে আরাম-বিলাস সংগ্রহ করিয়া মনকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দেওয়া কি এমন কঠিন? কঠিন যে নয়, তা সে নিজে এ ক' বৎসরের জীবনে বুঝিয়াছে!

বুঝিয়াছে বলিয়া কোথাও ছোট গণ্ডীরেখা টানিয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকিবার কথা মনে হইলে কল্লোলের নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে! মনে হয়, তার কথা মনে করিয়াই যেন কবি লিখিয়াছেন···বিশ্ব-নিখিল লিখে দিল বিধি দু'-বিধার পরিবর্ত্তে!

মার্থা আসিল। বলিল—নাইস রুম্‌স্। ফেসিং ষ্ট্রীট্‌স্—কাম্ এ্যাণ্ড শী প্লীজ্ (চমৎকার ঘর। পথের দিকে। দেখিবে এসো)।

কল্লোল উঠিল। উঠিবার ইচ্ছা ছিল না। মনে হইতেছিল, কেন দৌড়-ঝাঁপ! সবচেয়ে ভালো হইত যদি এই ঘরের এক-পাশেই···

কিন্তু তা হয় না! নিজের দেশ, নিজের সমাজ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে! ত্যাগ করিয়া যেখানে গিয়াছে, সেইখানেই দেখিয়াছে সেই সমাজ, সেই নিয়ম-কানুনের বাঁধন! মানুষ যত বেশী করিয়া জ্ঞানের আলো পাইতেছে, নিজের গণ্ডীকে ততই সে সঙ্কীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে! দুঃখ তার এইখানে! তার মনে হয় ··

মার্থা বলিল—এসো···

কল্লোল তার সঙ্গে চলিল—যেন মন্ত্র পড়িয়া মার্থা তাকে লইয়া চলিয়াছে!

ঘরখানি ভালো। চার-তলায়। খোলা জানলা দিয়া সারা সহরটা চোখে পড়ে। আকাশ যেন নাগালের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে! খোলা জানলার ধারে দাঁড়াইয়া কল্লোল নীচে পথের পানে চাহিয়া দেখিল। মনে হইল, লোকালয় ছাড়িয়া সে অনেক উঁচুতে···প্রায় আকাশের কাছে উঠিয়া আসিয়াছে! মনে হইল, ছোটখাট বাসনা-কামনা লইয়া ছুটাছুটি করিয়া যারা জীবন কাটাইয়া চলিয়াছে, এখানে তাদের ধোঁয়-ছোঁয়াচ লাগিবে না! এই বেশ!

মার্থা বলিল—ঘর পছন্দ হয়?

কল্লোল বলিল—ভাড়া?

মার্থা বলিল—যত উপর-তলায় উঠিবে, ভাড়া কম হইবে। এ ঘরের জন্য ভাড়া দিতে হইবে মাসে দশ টাকা।

আমি রাজী করাইয়াছি। নহিলে আগে এ-ঘরের ভাড়া ছিল পনেরো টাকা। এ-দেশের লোক উঁচু-তলায় থাকিতে চায় না। কাজের লোক…তারা বলে, ওঠা-নামা করিতেই যদি বিশ মিনিট কাটিয়া যায়, তাহা হইলে কাজ করিব কখন? তোমার চাই বিশ্রাম। এ কামরা উত্তম হইবে। আমি নার্শ। আমি বুঝিতেছি, এই ঘরই ঠিক।

হাসিয়া কল্লোল বলিল,—হোয়েন্ মাই গাইডিং-এঞ্জেল সেশ্ শো, অল রাইট্ (আমার ভাগ্যদেবী যখন এ-কথা বলিতেছে, তখন বেশ, তাই হোক)! বাট ফুড? (কিন্তু খাদ্যাদি)?

মার্থা বলিল—বর্মীজ কুক্। বাট্ উই ক্যান্ এ্যারেঞ্জ (বর্মীজ রান্না। কিন্তু আমরা আলাদা ব্যবস্থা করিতে পারি)…

কল্লোল ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল—বাট ইফ ইউ ওয়াণ্ট মী টু লিভ্…মাই কান্ট্রি ফুড…আই মীন্ রাইস্ এ্যাণ্ড কারি (কিন্তু তুমি যদি সত্যই আমাকে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে আমার দেশী খাদ্য—ভাত আর ঝোল)।

মার্থা কি ভাবিল…নিমেষের জন্য! তার পর বলিল,—তোমার দেশের ও-অঞ্চলের তিন-চারটি পরিবার আছে। বাঙালী। তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইতে পারে। আজ রাত্রে কিন্তু আমার গেষ্ট (অতিথি)…ইউ ডাইন্ উইথ মী (রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে খাইবে)।

কামরা ঠিক হইয়া গেল। নিজের যা জিনিসপত্র ছিল, সেগুলা আনিয়া কল্লোল নিজের কামরা অধিকার করিল।

বৈকালে মার্থা আনিল চা আর টোষ্ট।

কল্লোল বলিল,—আমি তোমার ঘরে যাইব, ইচ্ছা ছিল।

মার্থা বলিল,—শে মার্থা (আমাকে মার্থা বলিয়া ডাকিয়ো)।

কল্লোল বলিল,—আমাকে তুমি কল্লোল বলিয়া ডাকিবে।

হাসিয়া মার্থা বলিল,—ইয়েস, ক্যালল!

কল্লোল বলিল—বেশ, আমি ক্যালল।

মার্থা বলিল,—আমার ঘরে তোমাকে আনিতে পারিতাম, কিন্তু আজ খানিকটা ধকল গিয়াছে। আবার ধকল বাড়িবে, তাই তোমার ঘরে চা আনিয়া দু'জনে একসঙ্গে আসর বসাইলাম। হ্যাঁ, ভালো কথা ক্যালল, বেঙ্গলীকে ডাকিয়াছি। তার নাম হুসি। বেঙ্গলী ব্র্যামিন্। কেমেনডাইনে পেট্রোলের দোকানে কাজ করে। পুয়োর ম্যান্…মাহিনা পায় ত্রিশ টাকা…লার্জ ফ্যামিলি…বেঙ্গলী ওয়াইফ্ এ্যাণ্ড এ হোষ্ট অফ চিলড্রেন…নাইন ইন্ নাম্বার (মস্ত পরিবার, বাঙালী স্ত্রী, আর একগাদা ছেলে-মেয়ে। সংখ্যায় ন'টি)।

শিহরিয়া দুই চোখ কপালে তুলিয়া কল্লোল বলিল,—মাই গড্!

মার্থা বলিল,—সন্ধ্যার পর হুসি বাড়ী ফিরিয়া তোমার ঘরে আসিবে। আমি ঘরের নম্বর দিয়া আসিয়াছি,—চার-তলা, ষোল নম্বর কামরা। বাই-দী-বাই (ভালো কথা), পাশের কামরার প্রতিবেশীরা কেহ আসিয়াছিল?

কল্লোল বলিল—পায়চারি করিয়া আমি সমস্ত দালান ঘুরিয়া আসিয়াছি। পাশাপাশি বাঙালী কেহ নাই। জাপানী, পাঞ্জাবী, শিখ, বর্মীজ!…মনে হইল, এই ফ্ল্যাটটা যেন পৃথিবীর মানচিত্র! এ-ফ্ল্যাটে বাস করিলে কষ্ট করিয়া জিওগ্রাফি পড়িবার প্রয়োজন নাই!

হাসিয়া মার্থা কহিল—এক্জ্যাক্টলি শো (ঠিক তাই)!

চা-পান শেষ হইলে মার্থা বলিল—এবার উঠি। হাসপাতাল আছে।

কল্লোল বলিল—কটা পর্য্যন্ত আজ ডিউটি?

মার্থা বলিল—আজ এ-বেলায় ডিউটি সিক্স টু নাইন্ পি-এম্ (ছ'টা হইতে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত)। হুসি আসিলে কথা কহিয়ো। হুসির স্ত্রীকে আমি সব কথা বলিয়া আসিয়াছি। কিছু টাকা পাইলে উহারা বর্ত্তাইয়া যাইবে। হুসির স্ত্রী বলিল, ভাতের ভাগ দেওয়া শক্ত হইবে না!

কল্লোল হাসিল; কিছু বলিল না।

মার্থা বলিল—হাসিলে যে?

কল্লোল বলিল - একটা কবিতা মনে পড়িল !

মার্থা বলিল—তুমি কবি ? কবি আর কবিতা আমি ভালোবাসি। কবিতার মতো আনন্দের বস্তু জীবনে আর নাই !

কথাটা বলিয়া মার্থা বড় একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কল্লোল লক্ষ্য করিল, বয়স বাড়িয়া মার্থার দেহ এমন হইলে কি হইবে, মার্থার মন এখনো রহিয়াছে কিশোর !

কল্লোল বলিল—তোমার ঘরে কিন্তু কবিতার বই দেখি নাই মার্থা—শুধু নভেল দেখিয়াছি।

মার্থা বলিল—আই লাইক পোইট্রি…অ.ই লভ পোয়েট্স্। দে ফ্যাসিনেট্ মী ! (আমি কবিতা ও কবিদের ভালোবাসি—তারা আমাকে মুগ্ধ করে)। কবিতার বই আছে। সঙ্গে সঙ্গে থাকে ; আমার এই ভ্যানিটি ব্যাগে। পকেট-এডিসন্স (পকেট-সংস্করণ) শেলি আর বায়রণ। আমি সব-সময়ে সে বইগুলি পড়ি।

কল্লোলোর বিস্ময়ের সীমা নাই ! এই প্রৌঢ়া নারী ভিড়ে মিশিয়া থাকিলে ইহার পানে কেহ চাহিয়া দেখিবে না। এ-বয়সেও সে শেলি-বায়রণকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছে ! মানুষ এ-বয়সে গীতা পড়ে। মার্থার গীতা ঐ শেলি-বায়রণ ! মার্থার মনের তাহা হইলে বিচিত্র ইতিহাস আছে।

মার্থা চাহিয়াছিল বাহিরে আকাশের দিকে। দু' চোখের দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ আবেশ ! যেন আকাশের দিকে চাহিয়া সে কোন্ অতীতের স্মৃতি-রেখার খোঁজ করিতেছে !

কল্লোল বলিল—কি ভাবিতেছ মার্থা ? শেলির কবিতা ?

মার্থা কল্লোলের পানে চাহিল। দু' চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিল…ভোরের বাতাস লাগিয়া কিশলয়-পল্লব যেমন কাঁপে, তেমনি !

মার্থা বলিল—না।

কল্লোল বলিল—তবে ?

মার্থা বলিল—তোমার কথা ভাবিতেছিলাম।

—আমার কথা ?

—হ্যাঁ।

কল্লোল কোনো কথা বলিল না।

মার্থা বলিল—তুমি এমন ভালো…তুমি কেন এখানে আসিলে ! এখানে তোমার দেশের আর-যারা আসে, তারা তোমার মতো নয়। বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়া যারা আসে, তারা আসে সে-বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়া এখানকার পয়সা লুটিতে। বাকী যারা আসে, তাদের বুকে দেখিয়াছি কালি, ধূলা, আবর্জ্জনা…না হয় সুগভীর ক্ষত ! তাই তোমাকে দেখিয়া ভাবি…

হাসিয়া কল্লোল বলিল—যদি বলি, আমার বুকেও ঐ সব আছে…কালি, ধূলা, আবর্জ্জনা…সুগভীর ক্ষত ? বিশ্বাস করিবে ?

মার্থা কল্লোলের পানে চাহিয়া রহিল…চোখের দৃষ্টি মমতায় বিগলিত !

নিশ্বাস ফেলিয়া মার্থা বলিল—তা যদি হয়, দুঃখের কথা !

৪

আরো দু'-তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে।

এ ক'দিন কল্লোল নিজের মনের সঙ্গে অনেক বুঝা-পড়া করিয়াছে। মনকে বুঝাইয়াছে, এত দিন পথ-বিপথ না মানিয়া চলিয়া দেখিয়াছিস্…কি পাইলি ? মনকে পিপাসা-ক্ষুধায় আতুর আর্ত্ত রাখিবি না, ভাবিয়াছিলি,—যা পাইয়াছিস্, তাই দিয়া মনের ক্ষুধা-পিপাসা মিটাইতে কার্পণ্য করিস্ নাই ! তবু মনের ক্ষুধা-পিপাসা গেল না তো !

মন বলিল, ক্ষুধা-পিপাসার মতো ভোজ্য-পানীয় পাইলে মিটিত বৈ কি ! দিয়া দ্যাখো…

কল্লোল বলিল—কি ভোজ্য-পানীয়ে তোর ক্ষুধা-পিপাসার নিবৃত্তি হইবে, বল্…

মন এ কথার জবাব দিল না। তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া মন চুপ করিয়া রহিল।

কল্লোল ভাবিল, চুপচাপ আর-পাঁচ জনের মতো জীবনটাকে একবার চালাইয়া দেখিবে ! লাভ কিছু না হোক,…একটা নূতন অনুভূতি ! ক্ষতি কি ?

মার্থার সঙ্গে রোজ দেখা হয়। সকালে দু'জনে এক-সঙ্গে বসিয়া চা খায়।

কল্লোল বলে—আমি যাইব তিন-তলার ছত্রিশ নম্বর কামরায়। আমার এখানে তুমি আসিলে অনেক হাঙ্গামা!

মার্থা বলে—কিসের হাঙ্গামা?

কল্লোল বলে—নিজে এই সব তোড়-জোড় বহিয়া আনা!

হাসিয়া মার্থা বলে—বেশ, তুমি এক-শেট কেনো।

কল্লোল বলে—মাইগ্রেটরি বার্ড যদি এ-শাখায় বাসা বাঁধে, তাহা হইলে কেনার কথা! নহিলে কতকগুলো জিনিষ বাড়াইয়া বোঝা ভারী করিয়া লাভ?

মার্থা বলে—বাসা বাঁধিলে কি ক্ষতি?

কল্লোল বলে—বাসা বাঁধে নাই বলিয়াই রেঙ্গুনে আজ মার্থাকে বন্ধু পাইয়াছে…

হাসিয়া মার্থা জবাব দেয়—মার্থাকে বন্ধু বলিয়া যদি মনে করো, তাহা হইলে নূতন বন্ধুর সন্ধানে এ-শাখা ছাড়িয়া নাই বা উড়িলে!

কল্লোল বলে—মার্থাকে সন্ধান করিতে হয় নাই! মাইগ্রেটরি বার্ডদের জন্য বন্ধু অলক্ষ্যে মজুত থাকে!

মার্থা বলিল—ঈশ্বর মজুত রাখেন, বলিতে চাও?

কল্লোল বলিল—এ সব কথার মধ্যে ঈশ্বরকে টানিয়া আনো কেন?

—তার মানে?

—তার মানে, যদি ঈশ্বরকে মানো, তাহা হইলে বলিব, আমার মতো লোকের জন্য বন্ধু মজুত রাখার দিকে নজর রাখিলে তাঁর চলিবে কেন?

মার্থা বলিল—তাঁর কাছে কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। ছোট-বড় সব কাজ তাঁর কাছে সমান…

কল্লোল বলিল—ও কথা থাক! মাইগ্রেটরি বার্ড এখানে বসন্ত পাইয়াছে। অতএব শীতের আগে সে উড়িবে না।

মার্থা কহিল—কিন্তু এটা বসন্ত-কাল নয়, ক্যালল। দিস ইজ্ সামার (এখন গ্রীষ্ম-কাল)।

হাসিয়া কল্লোল বলিল—পৃথিবীর গ্রীষ্ম হইতে পারে, আমার জীবনে বসন্ত-কাল! আমার জীবনটা স্বতন্ত্র এক পৃথিবী, তা তুমি জানো না! যদি পারি, এক দিন তোমাকে এ-পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব শুনাইব।

ইহার পরে কথা আর অগ্রসর হয় না। দু'জনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তার পর ঘড়িতে আটটা বাজে, মার্থা ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

নীচের তলায় এখানকার এক বুদ্ধিমান এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডিস্পেন্সারি করিয়াছে। সে ডিস্পেন্সারির বারান্দায় পর্দ্দা ফেলিয়া রোগীদের রোগ দেখিবার ছোট-আউটডোর খুলিয়াছে। সে আউটডোরে মার্থা রোগী দেখে। রোগীদের ফী দিতে হয় না। মার্থা রোগ দেখিয়া প্রেসক্রপসন্ লেখে। দাম দিয়া ডিস্পেন্সারি হইতে রোগীরা ঔষধ লয়। ঔষধের দাম হইতে মার্থা কিছু কমিশন পায়, ব্যবস্থা আছে।

ঘড়িতে আটটা বাজিবামাত্র তাই মার্থা সচকিত হইয়া নীচে ছোটে…রোগী দেখিতে হইবে।

কল্লোলের বারান্দা হইতে নীচেকার সে আউট-ডোরের একাংশ দেখা যায়। বারান্দায় দাঁড়াইয়া কল্লোল দেখে, ভিড় করিয়া লোক আসিয়াছে রোগ দেখাইতে! নানা জাতের রোগী…নানা বয়সের রোগী…পুরুষ-রোগী, মেয়ে-রোগী।

সকালে মন যখন প্রভাত-রৌদ্রের স্নিগ্ধ আলোয় ভরিয়া আশায় উচ্ছ্বসিত হইতে চায়, সে-সময়ে পৃথিবীর এই বিকার-দৃশ্য। এ দৃশ্যে মনের সব আলো নিবিয়া যায়! দারুণ অন্ধকারে মন ভরিয়া ওঠে! চোখের সামনে হইতে সব যেন মিলাইয়া যায়! শুধু অন্ধকারের পট-ভূমির উপর মার্থা… যেন জ্যোতি-রেখা!

সে-দিনও সকালে বারান্দায় চেয়ার আনিয়া সেই চেয়ারে বসিয়া কল্লোল চাহিয়াছিল নীচের দিকে।

ঐ মার্থা…প্রৌঢ়া কুৎসিত নারী…তাকে এমন সুন্দর দেখাইতেছে! আশ্চর্য্য! অবিচল নয়নে কল্লোল তার পানে চাহিয়াছিল।

হৃষি আসিয়া ডাকিল—বাবু…

চেহারা দেখিয়া আর কথাবার্ত্তা শুনিয়া হৃষি বুঝিয়া ফেলিয়াছে, কল্লোল যে-সে বাজে লোক নয়; নিশ্চয় কলিকাতার ধনাঢ্য সমাজের অলঙ্কার! তার উপর কল্লোল-নামটা সহজে মুখে আসে না; এবং এক-মাসের খোরাকির জন্য অগ্রিম দিয়াছে নগদ কুড়িটা টাকা।

কাজেই বাবু বলিয়া কল্লোলের পায়ে নিজেকে অবলুণ্ঠিত করিবার গৌরব হৃষি ত্যাগ করিতে পারে নাই!

হৃষির আহ্বানে কল্লোল বলিল—এই যে হৃষি বাবু··· কি খপর?

হৃষি বলিল—আজ আমার পালার-ছুটি। তাই এলুম আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে।

কল্লোল বলিল—বটে!

কথাটা বলিয়া কল্লোল তেমনি চাহিয়া রহিল··· নীচে মার্থা একটা বর্ম্মীজ মেয়ের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতেছে।

হৃষি বলিল—কি দেখছেন?

কল্লোল বলিল—তোমাদের মেম-সাহেবের ডাক্তারী।

হৃষি বলিল—ও! মেম-সাহেব ভারী ভালো। সকলের সঙ্গে ভাব। এ বাড়ীতে কারো অসুখ হলে যত্ন করে গ্যাখেন। কারো কাছ থেকে একটি পয়সা নেন না কখনো···তা কি গরীব, কি বড়মানুষ···কারো কাছ থেকে না।

কল্লোল বলিল—এত দেশ থাকতে তোমাদের মেম-সাহেব এ-দেশে কেন এলেন, তাই আমি ভাবি! এখানে মেম-সাহেবের আপনার জনও তো কেউ নেই!

হৃষি বলিল—না।

—কত দিন উনি এখানে আছেন?

হৃষি বলিল—তা প্রায় বিশ বচ্ছর···

বলিয়াই সে অর্দ্ধ-স্বগতভাবে হিসাব কষিতে লাগিল —এই ধরুন না, আমি এখানে আসি···সামনের কার্ত্তিকে হবে বাইশ বছর। আমি আসবার বছর-খানেক···না, দেড়-বছর পরে···

তার পর কণ্ঠ একটু উচ্চ হইল। হৃষি বলিল—বিশ বছর নয় বাবু, বিশ বছর ছ'মাস···

কল্লোল বলিল—ওঁর তাহলে বয়স হয়েছে?

হৃষি বলিল—হয়নি? নিশ্চয় হয়েছে। তা বয়স হবে কত? চল্লিশ···পঁয়তাল্লিশ? হুঁ, তাই। বড় ভালো লোক। এ যা লক্ষ্মী-ছাড়া দেশ, বাবু···মেম-সাহেবের কিন্তু কোনো-রকম বেচাল কেউ দ্যাখেনি!

কল্লোলের মনের উপর যেন কাঁটার চাবুক পড়িল! সঙ্গে-সঙ্গে হৃষির উপর বিরূপতায় মন ভরিয়া উঠিল। লক্ষ্মীছাড়া দেশই বটে! নহিলে এই হৃষি···বাবু বলিয়া ডাকে, আত্তিশো জানাইয়া বন্ধু সাজিতে আসিয়াছে··· অথচ আসিয়াই মেম-সাহেবের চরিত্র-ব্যাখ্যা···

কল্লোলের ভালো লাগিল না। কল্লোল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, কহিল—আমি এবার উঠছি, হৃষি। একটু কাজ আছে···

হৃষি বলিল—কাজ! আমায় বলুন না বাবু। আমি থাকতে আপনি কাজ করবেন কি?

হাসিয়া কল্লোল কহিল—সে কাজ তোমায় দিয়ে হবে না। বাড়ীতে চিঠি লিখবো।

এ কথায় হৃষি কেমন হক্‌চকিয়া গেল! তার সুদৃঢ় ধারণা এ-কথার আঘাতে যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়!

হৃষি বলিল—বাড়ীতে চিঠি লিখবেন?

কল্লোল বলিল হ্যাঁ···আমার স্ত্রীকে।

হৃষির মুখে আর কথা ফুটিল না।

কল্লোল গিয়া ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া কাগজের প্যাড খুলিয়া বসিল। হৃষি ধীর-পায়ে নীচে নামিয়া গেল।

একটু পরে নীচেকার ঘরে স্বামি-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। স্বামী হৃষি, স্ত্রী নীরদা।

নীরদা বলিল—গৌরী ডাগর হয়েছে···তাকে দিয়ে ওঁর খাবার পাঠাবো!···কি যে তুমি বলো! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!

মাথা যে হৃষির খারাপ হয় নাই, হৃষি তা বেশ ভালো করিয়া জানে! কি জন্য কল্লোলকে এত খাতির করিতে চায়, সে-কথাটা কি করিয়া বুঝাইয়া বলিবে, সেইটাই সমস্যা!

নীরদা বাটনা বাটিতেছিল। বসিয়া-বসিয়া হৃষি ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া কথাটা বুঝাইয়া দিবে!

হঠাৎ হৃষি বলিল—ভদ্দর লোকটির পয়সা-কড়ি বেশ আছে, নীরু। বাড়ীতে ঝগড়া করে বর্ম্মায় চলে এসেছে। মেম-সাহেব বলছিল, শুনিসুনি, এইখানেই পাকা-ভাবে থাকবে?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে নীরদার পানে চাহিল ভাবিয়াছিল, নিশ্চয় কৌতূহল-বশে নীরদা দু'-চারিটা প্রশ্ন করিবে!

কিন্তু নীরদার এতটুকু কৌতূহল দেখা গেল না। শীলে নোড়া ঠুকিয়া নিবিষ্ট-মনে সে হলুদ ছেঁচিতে লাগিল।

হৃষি বিপদে পড়িল। কাল হইতে তার মনে যে-কথা জাগিয়াছে···সংসারের শ্রী ফিরিয়া যাইতে পারে! কিন্তু নীরদা এমন বাঁকিয়া আছে যে, হৃষি ভূমিকা ফাঁদিবা-মাত্র নীরদা চোখ বাঁকাইয়া মুখ বাঁকাইয়া শাসন-ভর্ৎসনা সুরু করিয়া দেয়!

হৃষির রাগ হইল। কথাটা না বলিতে পারিয়া তার বুকে যেন পাহাড় জমিয়া আছে! মস্ত পাহাড়! ও-দিকে অফিস হইতে ফিরিতে রাত্রি হইয়া যায়···ঘরে একপাল ছেলে-মেয়ের চ্যাঁ-ভ্যাঁ নীরদা কাহাকে ধরিয়া পিটিতে থাকে, কাহারো নড়া ধরিয়া টানে, কাহাকেও ভর্ৎসনায় ভরিয়া যমালয়ের পথে যাইতে বলে! তখন তার সে মা-মূর্ত্তি! সকালে নীরদার মেজাজ একটু ভালো থাকে বলিয়াই অফিস হইতে বহু-মিনতিতে আজ ছুটী লইয়া আসিয়াছে! তার নাম, কম্‌সে-কম পাঁচটা টাকা লোকসান! কুপন দিয়া যে-সব খরিদ্দার পাম্প হইতে পেট্রোল লয়, তাদের ড্রাইভারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত, দু'-গ্যালন পেট্রোল দিয়া কাগজে চার গ্যালন লেখানো· ড্রাইভারের সঙ্গে এই দু'-গ্যালনের ভাগ হয় অর্দ্ধা-অর্দ্ধি। নীরদা যদি তার কথা কাণে না তুলিবে, কেন মিথ্যা ছুটি লইয়া সে ঘরে থাকে? ঘরে থাকার মানে তো এই বেল্লার ফৌজদের চ্যাঁচামেচি আর সেই সঙ্গে নীরদার ভর্ৎসনা-ভোগ!

ভাবিতে ভাবিতে হৃষি মরিয়া হইয়া উঠিল। কহিল,—সংসারের সুখ-দুঃখের কথা যা বলি, চুপ করে একটু শোনো দিকিনি···তা না, কথা বলবার আগেই রেগে কাঁই!

ঝঙ্কার দিয়া নীরদা বলিল—বলো, কি বলবে। শীলে নোড়া ঘষে আমি হলুদ ছেঁচছি···কাণ দুটোকে ছেঁচিনি, আর তোমার মুখখানাকেও ছেঁচিনি!

হৃষি বলিল,—একে বলে সংসার? বাপ! যেন মোষের খাটাল! এতগুলো ছেলেমেয়ে···কার বাড়ীতে এমন আছে?

নীরদা ঝাঁজিয়া উঠিল। বলিল,—ছেলেমেয়ে নিয়ে তুমি খুঁড়োনা বলছি, খবর্দ্দার! কতবার তোমায় মানা করেছি, না?

হৃষি বলিল—খুঁড়িনি বাবু। তোমার ছেলেমেয়েদের খুঁড়তে হলে যে শাবলের দরকার, তেমন ধারালো শাবল এখনো কোনো কারখানায় তৈরী হয়নি!

রাগে গুম্‌ হইয়া নীরদা ঘষড়-ঘষড় করিয়া নোড়া ঘষিয়া হলুদ বাটিতে লাগিল; কথার জবাব দিল না।

হৃষি বলিল—মেয়ে ডাগর হয়েছে, তাকে পার করবার চেষ্টা দেখতে হবে তো! বসে-বসে এতগুলোকে কত দিন খাওয়াবো, শুনি?

নীরদা এবারো কথা কহিল না···আপন-মনে বাটনা বাটিতে লাগিল!

নীরদার স্তব্ধতায় হৃষির সাহস আর একটু বাড়িল। হৃষি বলিল—বর্ম্মা-মুল্লুকে কোথায় পাবে শুনি, তোমার ঘর-আলো-করা জামাই? হুঁঃ, অত আশা করো না, বুঝলে! এ তোমার বাঙলা দেশ নয় যে, কুলুজী মিলিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবে! মেয়ে হয়েছে, বেশ! মেয়ে ডাগর হয়েছে, ব্যস্‌!···মন্তর পড়ে বিয়ে করেও কত-ঘরে দেখছি তো···এখন আর ধর্ম্ম-অধর্ম্ম নেই, বুঝলে! শুধু টাকা আর টাকা! টাকা ছাড়া মানুষ আর কিছু মানে না! তাই বলছিলুম, এ ভদ্দরলোক একা·· টাকা-কড়ি আছে। তোমার আচার-নিষ্ঠা···ও-সব দেশে গিয়ে চালিয়ো···বর্ম্মায় নয়!

রাগে নীরদার দু'-চোখে আগুন জ্বলিল! মুখ তুলিয়া সেই আগুন-ভরা দৃষ্টিতে নীরদা চাহিল হৃষির পানে। কহিল—তুমি উঠবে এখান থেকে?

হৃষি একটু সরিয়া বসিল, বসিয়া কহিল—মেয়ের বয়স হয়েছে···এ মুল্লুকে এই সাতশো-রকম লোকের সঙ্গে বাস করে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে তুমি তাকে ঠিক রাখবে, ভেবেছো? হুঁঃ, মেয়ে-বুদ্ধি আর কাকে বলে?··· মানে, এ হলো বর্ম্মা-মুল্লুক···পথে-ঘাটে তোমার-আমার মতো যাদের দ্যাখো, তার অর্দ্ধেক লোক দেশ থেকে নাম কাটিয়ে এখানে এসেছে। ধর্ম্ম করতে আসেনি! অধর্ম্মের ভার দেশে আর বইতে পারলো না বলেই এসেছে।···বুঝলে, এখনো বলছি, আমার কথা শোনো···

অগ্নিমূর্ত্তি নীরদা মুখ তুলিয়া হৃষির পানে চাহিল। সে-দৃষ্টিতে মানুষের বুকের রক্ত জল হইয়া যায়!

হৃষি ছাড়িল না…হয় এস্পার, নয় ওস্পার! হৃষি বলিল—আহা, তা নয়। ভদ্দর লোক বিয়ে করতেও তো পারে! তোমার মেয়ে দেখতে মন্দ নয়…কিছু লেখাপড়া শিখেছে।

হাতের নোড়া সবলে হৃষির দিকে নিক্ষেপ করিয়া নীরদা বলিল—তুমি না মেয়ের বাপ?

নোড়া হৃষির পায়ে না লাগিলেও ছোড়ার ধরণ দেখিয়া সে লাফাইয়া উঠিল। উঠিয়া হৃষি বলিল—মেয়ের বাপ! আমাকে আমার কোন্ বাপ বাঁচাবে, তার ঠিক নেই! বলে, মেয়ের বাপ! হুঁঃ!

এ কথা বলিয়া হৃষি আর সেখানে এক-মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না, পথে বাহির হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বাঙ্‌লার বৌ

বাঙ্‌লার ঘরে বাঙালীর বৌ—প্রাণটুকু গেল ঝরে'
সতেরো বছর বয়সেই এক কন্যা প্রসব করে!
যত দিন দেহে প্রাণ ছিল, কেহ দ্যাখেনি প্রাণের পানে!
মুখ বুজে গেছে করি' গৃহ-কাজ, হাসি-কথা নাহি জানে!

কখন্ সে খেলো, কি-বা খেলো, তার কেমন রহিল দেহ,
চুলেতে চিরুণী পড়িল কি না, তা ভুলেও দ্যাখেনি কেহ!
সংসার আর ফরমাশ খাটা! এসেছিল শুধু দিতে;
এত কর্ণায় মুখের মিষ্টি পারিল না কারো নিতে!
এলো যার লাগি,—পেতে আছে হাত! যত পায়, চায় তত।
দিয়ে-দিয়ে চুর দেহ-মন তার হলো ক্ষত-বিক্ষত!
'আহা' বলিবে যে, পতি-দেবতার ছিল না সে অবসর!
পর-ঘর হতে আসিল বেচারী—এ তার নিজের ঘর!
সে-ঘর বাঁধিতে পারিল না হেথা অত সাধ-আশা নিয়ে!
ভয়ে-সংশয়ে জীবনের দিন কেটে গেল কোথা দিয়ে!
কেহ জানিল না বুকের কথাটি, মনে ছিল কত মৌ!
যতনের ধন নয়, শুধু জানে,—বাঙ্‌লা-ঘরের বৌ!

আজ চলে গেল! বেদনা কখনো ফোটেনি ভাষায় মুখে!
সারা বাড়ীময় কান্নার রোল—কাঁদে সবে কত দুখে!
কিনে আনে ফুল, খাটিয়া সাজায়—তোলে তার দেহখানা;
লাল-পাড় শাড়ী পরায়, সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ টানা!
খাট নিয়ে চলে 'হরিবোল' বলে। ডাক ছেড়ে বলে শ্বাস,
"ঘরের লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে গেল! কি হলো সর্ব্বনাশ!"

দিন আসে, দিন চলে যায়; শেষে অশৌচ গেল কেটে!
শোক ধুয়ে উঠে শাশুড়ী আবার সংসারে মরে খেটে।
পাড়া-পড়শীরে ডেকে বলে,—বোন, খুঁজে দে ডাগর মেয়ে!
ঘরে থাকা দায় হয়েছে আমার ছেলেটার মুখ চেয়ে!
সুন্দরী হবে। গতর থাকিবে। বাপ দেবে টাকা-কড়ি।
সোনা বিশ-ভরি; ছেলের জন্য হীরের আংটি, ঘড়ি!
বৌ গেছে বোন্, সাথে নিয়ে গেছে আমার গতরটাকে!
মরে' শত্রুতা সেধে গেছে দিদি, পড়েছি দুর্বিপাকে!"

এক মাস কাটে। ছেলের মুখেতে হাসি নাই, নাই কথা!
তাস-পাশা খেলে; সিনেমায় যায়। বাড়ী থাকা ঘোর ব্যথা!

শেষে এক দিন হলো ঠিক-ঠাক! অত কান্নার রোলে
যে-দুয়ার হতে বিদায়ের পালা ঘন-ঘন হরিবোলে,—
সে বাড়ীতে শাঁখ বাজে, উলু-রব! বেনারশী শাড়ী পরে'
বাঙালীর বৌ গাঁটছড়া বেঁধে আসে বাঙালীর ঘরে।

রাজা গেলে তার আসন যদি বা দু' দিন শূন্য রয়—
বাঙলার বৌ চলে' গেলে, বৌ আনিতে ত্বরা না সয়!

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা

দ্বিতীয় কৈসর উইল্‌হেল্‌ম্‌

গত ৪ঠা জুন দ্বিতীয় কৈসর ফ্রেডারিক উইলহেলম্‌ ভিক্টর এলবার্ট ৮২ বৎসর বয়সে হল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডুর্ণে দেহত্যাগ করিয়াছেন। উইলহেলমের নিজের ইচ্ছানুযায়ী, তাঁহার জীবনের শেষ ২৩ বৎসর যে ডুর্ণে অতিবাহিত হইয়াছিল, সেইখানেই তাঁহার দেহ সমাহিত হইয়াছে। উইলহেলমের মৃত্যুতে জার্ম্মাণীর শেষ সম্রাট এবং পৃথিবীর এক জন শক্তিশালী শাসকের তিরোধান হইল।

গত ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে তৃতীয় ফ্রেডারিকের ঔরসে ইংলাণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যার গর্ভে উইলহেলমের জন্ম হয়। ক্যাসেল্‌ জীম্‌নাসিয়াম্‌ এবং বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সামরিক-বিভাগে যোগদান করেন। এই সময়ে শাসন-কার্য্য সম্বন্ধেও তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী অগষ্টা ভিক্টোরিয়ার সহিত উইলহেলমের বিবাহ হয় এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম পুত্র উইলহেলম্‌ ভূমিষ্ঠ হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর ঐ বৎসর ১৫ই জুন ২৮ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় উইলহেলম্‌ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিংহাসনে আরূঢ় হইবার পর দ্বিতীয় কৈসরের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান অপকীর্ত্তি চেন্‌সেলার বিস্‌মার্ককে বিতাড়ন। যে বিসমার্ক তাঁহার অসামান্য প্রতিভার দ্বারা সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর কাল ঐকান্তিকভাবে প্রুসিয়ার রাজবংশের সেবা করিয়াছিলেন, রাজদণ্ড লাভের দুই বৎসর পরেই উইলহেলম্‌ তাঁহাকে বিতাড়িত করেন। প্রুশিয়ার শাসনপ্রথা অনুযায়ী কোন মন্ত্রী চেন্‌সেলারের অনুপস্থিতিতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না; উইলহেলম্‌ এই প্রথা রহিত করিতে চাহেন। চেন্‌সেলারকে উপেক্ষা করিয়া সরাসরি শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপের এই প্রয়াসই বিস্‌মার্ক ও দ্বিতীয় উইলহেলমের বিরোধের মূল কারণ। এই বিরোধ সৃষ্ট হইবার পর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে উইলহেলম্‌ বিস্‌মার্কের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া সোস্যালিষ্টদিগের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত একটি আইন পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতে অস্বীকার করেন। এই তুচ্ছ ঘটনা অবলম্বন করিয়াই অসাধারণ প্রতিভাশালী ও প্রুসিয়ার রাজবংশের বিশ্বস্ততম সেবক বিস্‌মার্কের সহিত তাঁহার প্রভুপুত্রের চির-বিচ্ছেদ ঘটে। সোস্যালিজম্‌ অথবা অন্য কোন বৈপ্লবিক মতবাদের প্রতি উইলহেলমের যে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল, তাহা নহে। সোস্যালিষ্টদিগের সম্পর্কে যে বিধান উপলক্ষ করিয়া বিসমার্কের সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটে, উহা কার্য্যতঃ তিনি প্রবর্ত্তন করেন নাই। বস্তুতঃ, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি সোস্যালিষ্টদিগকে স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই।

যৌবনের এই ঔদ্ধত্য ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য পরবর্ত্তী কালে ক্ষমতার শীর্ষস্থানে আরূঢ় অবস্থায় অথবা নির্ব্বাসিত জীবনের চরম দুঃখের দিনে দ্বিতীয় উইলহেলম্‌ কখনও অনুতপ্ত হইয়াছেন কি না, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ হয় ত এই বিষয়ে একমত হইবেন যে, উইল্‌হেলমের এই একটি অপকীর্ত্তির জন্যই তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এবং জার্ম্মাণ জাতি চরম দুঃখ ও লাঞ্ছনা সহিয়াছে; এমন কি, আজ যে নূতন জার্ম্মাণী নূতন বিধ্বংসী শক্তি লইয়া সমগ্র জগতকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়াছে, ইহার মূলেও অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের এই শোচনীয় ঘটনার প্রভাব বিদ্যমান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞ বিসমার্কের সুপরামর্শে যদি জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালিত হইত, তাহা হইলে জার্ম্মাণ জাতির গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস যে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সৃষ্ট হইত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি-বৃদ্ধির জন্য উইলহেলম্‌ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার প্রয়াসের ফলেই জার্ম্মাণীর সেনা ও গুপ্তচর-বিভাগ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। জার্ম্মাণীকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৌশক্তিতে পরিণত করিবার স্বপ্নও তিনি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বপ্ন সম্পূর্ণ সফল হইবার পূর্ব্বেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জার্ম্মাণীর নৌবহরকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যেই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কিয়েল খাল খনন করান।

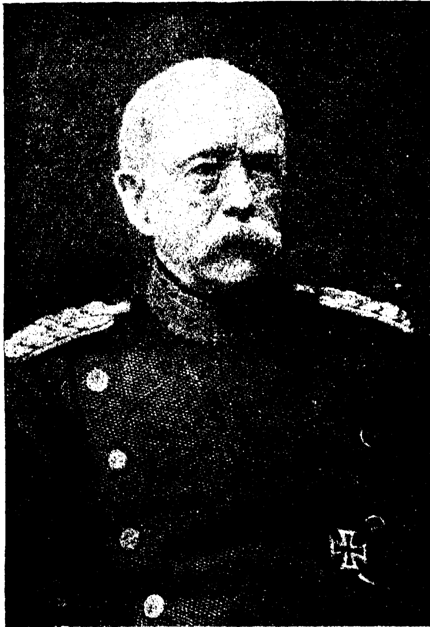


দ্বিতীয় কৈসর উইলহেলম্‌

উইলহেলমের ব্যক্তিগত ক্ষমতাকাঙ্ক্ষাই গত মহা-সমরের কারণ, অথবা তাঁহার পরামর্শদাতৃগণই তাঁহাকে এই নরমেধ-যজ্ঞে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। উইলহেলম্‌ পুনঃ পুনঃ আপনাকে শান্তিকামী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এমন কি, যুদ্ধ-ঘোষণার সময়েও তিনি বলিয়াছিলেন,—I did not want it; my work for peace is undone,—আমি যুদ্ধ চাহি নাই; আমার শান্তি-কামনা নিষ্ফল হইয়াছে। যে কারণেই গত মহাসমর আরম্ভ হউক

না কেন, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে সেরাজেভোতে আর্কডিউক্ ফ্রাঞ্জ ফার্ডিন্যাণ্ড ও তাঁহার স্ত্রীর হত্যাই যে ইহার কারণ নহে, ইহা নিশ্চিত; ঐ হত্যাকাণ্ড যুদ্ধ-ঘোষণার উপলক্ষ মাত্র। জনৈক বিশিষ্ট জার্ম্মাণ ঐ সময়ে এই হত্যাকাণ্ডকে "ভগবানের দান" বলিয়াও অভিহিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, জার্ম্মাণী পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল; সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করিয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই ইহার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উইল্‌হেল্‌ম্ বৃটিশ-প্রাধান্য খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ (Continental alliance) করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে জার্ম্মাণীর সমরকামী রাষ্ট্রনায়কদিগের প্রস্তাবে সম্মত করাইয়া থাকিবে।

যুদ্ধের সময় উইল্‌হেল্‌ম্ নিজে সমর-পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, সেনাপতিদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, সৈন্যদিগের শিবিরে যাইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। সময়ে-সময়ে সেনাপতিদিগের সহিত তাঁহার তীব্র মতবিরোধও ঘটিয়াছে। উইল্‌হেল্‌মের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি অত্যন্ত প্রভুত্বপরায়ণ হইলেও সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে তাঁহাকে সম্মত করান যাইত।



কাউণ্ট ভন্ বিস্‌মার্ক

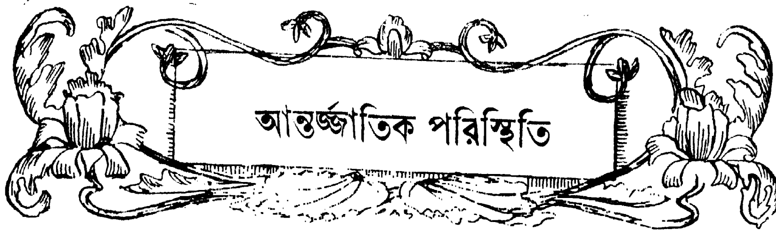
গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যখন যুদ্ধ অচল অবস্থা (stalemate) প্রাপ্ত হয় এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় বৃটিশের অর্থনীতিক অবরোধের ফলে জার্ম্মাণীতে অন্তর্বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠে, তখনও উইল্‌হেল্‌ম্ সেনাবিভাগের নিকট সমর্থন পাইবার আশা করিতেছিলেন। অবশেষে হিণ্ডেনবার্গ যখন তাঁহাকে জানান যে, সেনাবিভাগও রিপাব্‌লিক্যান্ শাসনব্যবস্থার পক্ষপাতী, তখন—যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বদিন তিনি জার্ম্মাণ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হল্যাণ্ডে গমন করেন। জার্ম্মাণ সেনাবাহিনীর অজেয়ত্ব সম্বন্ধে উইল্‌হেল্‌মের অগাধ বিশ্বাস ছিল; জার্ম্মাণী যে পরাজিত হইতে পারে, এ কথা তিনি শেষ দিন পর্য্যন্তও বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই।

উইল্‌হেল্‌মের হল্যাণ্ডে গমনের পর তাঁহাকে মিত্রশক্তির হস্তে অর্পণ করিবার জন্য ওলন্দাজ সরকারের নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছিল; মিত্রশক্তি নির্ব্বাসিত নৃপতিকে আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ওলন্দাজ সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। হল্যাণ্ডে উইল্‌হেল্‌ম্ কিছু কালের জন্য কাউণ্ট বেণ্টিঙ্কের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাহার পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইউট্রেক্টের নিকটবর্ত্তী ডুর্ণে একটি বাসভবন ক্রয় করেন। ডুর্ণে উইল্‌হেল্‌মের জীবনযাত্রার প্রণালী অভিনব ছিল; এখানে কখনও তিনি নিজ হস্তে উদ্যান পরিচর্য্যা করিয়াছেন, কখনও অধ্যয়নে কালাতিপাত করিয়াছেন, কখনও জীবন-স্মৃতি লিখিয়াছেন। নির্ব্বাসিত জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি জার্ম্মাণীর সিংহাসন পুনরাধিকারের জন্য গোপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে, এই প্রয়াস তিনি ত্যাগ করেন। জার্ম্মাণীর নাৎসীবাদের প্রতি উইল্‌হেল্‌মের সহানুভূতি ছিল; কারণ, ইহাতে অবনমিত জার্ম্মাণীর পুনরুত্থানের লক্ষণ তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তবে নাৎসীদিগের ইহুদী-বিরোধী নীতিতে উইল্‌হেল্‌মের সমর্থন ছিল না। নির্ব্বাসিত জীবনের তিন বৎসর অতিবাহিত হইবার পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কৈসরীণ অগষ্টা ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। ইহার এক বৎসর পরে—৬৩ বৎসর বয়সে উইল্‌হেল্‌ম্ হেরমাইন নাম্নী এক যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার স্বদেশবাসী এই বিবাহের সমর্থন করে নাই।

উইল্‌হেল্‌ম্ অত্যন্ত দাম্ভিক এবং খামখেয়ালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, তিনি ভগবানের প্রতিভূ, তাঁহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। অবশ্য, কখনও কখনও পরামর্শদাতৃগণের প্রস্তাবে তিনি যে সম্মত হন নাই, তাহা নহে। উইল্‌হেল্‌ম্ চরম আত্মম্ভরিতার সহিত বলিতেন,—(Considering myself the instrument of Lord I go my way unheeding what others think. —নিজেকে ভগবানের যন্ত্র মনে করিয়া অন্যের মনোভাব উপেক্ষা করিয়াই আমি চলি। উইল্‌হেল্‌মের নিকট ভগবান ছিলেন জার্ম্মাণীর স্বর্গীয় মিত্র (Germany's divine Ally)।

উইল্‌হেল্‌মের প্রভুত্বপরায়ণতা এবং দাম্ভিক প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদ্ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ইনফীরিয়রিটী কমপ্লেক্স" (Inferiority complex) তাঁহার চরিত্রে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জন্মাবধি উইল্‌হেল্‌মের একখানি হাত অপটু ছিল। এই শারীরিক অক্ষমতার জন্য শৈশব হইতে তাঁহার মনে নিজের সম্বন্ধে লঘুত্বের ভাব বদ্ধমূল হয়। এই কারণেই প্রতি ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সহিত নিজের শক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠে। এই আগ্রহই পরে প্রভুত্বপরায়ণতা ও দাম্ভিকতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

শ্রীঅতুল দত্ত।



জার্ম্মাণীর বসন্তকালীন অভিযান পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে; বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের উদ্দেশে তাহার মৃত্যুবাণগুলি এখনও সবেগে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ইতোমধ্যে গ্রীক্ স্বাধীনতার শেষ চিহ্নটি অপসারিত হইয়াছে; অদূর প্রাচীতে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জার্ম্মাণীর আয়োজন প্রবলতর হইয়াছে। জার্ম্মাণীর প্রভাব প্রয়োগের ফলে তাহার পর্য্যুদস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির আরও অবনমিত হইবার লক্ষণ সুস্পষ্ট; এ-দিকে আটলান্টিক পারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির উৎকণ্ঠা ক্রমবর্দ্ধমান।

গ্রীক স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন —

গত বৎসর অক্টোবর মাসে ইটালী কর্ত্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হইবার অল্প কাল পরেই পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরের ক্রীট দ্বীপে বৃটেনের সামরিক



জার্ম্মাণীর "স্টুকা" শ্রেণীর নিম্নগামী বিমান (Dive bomber)

প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ৬ই নভেম্বর বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন—We have already established naval and air bases in Crete which will enable us sensibly to extend the activities and radius of the Navy and Air Force. তাহার পর গত এপ্রিল মাসে জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড আক্রমণে গ্রীস্ যখন পর্য্যুদস্ত হয়, তখন গ্রীক্-নৃপতি ও তাঁহার মন্ত্রিগণ ক্রীট দ্বীপে গমন করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা-ধ্বজা উড্ডীন রাখেন। বৃটেনও এই দ্বীপের সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বতোভাবে ইহা রক্ষার ব্যবস্থা করে। গত ২৫শে এপ্রিল গ্রীক্ সরকার ক্রীটে স্থানান্তরিত হইবার পর এই দ্বীপটি একাধারে গ্রীক্ স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন এবং পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরে বৃটেনের একটি সুরক্ষিত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। গত ২০শে মে জার্ম্মাণীর বিমানবাহিত সৈন্য অকস্মাৎ প্রবল ভাবে ক্রীট আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে, এবং মাত্র ১২ দিনের মধ্যেই এই দ্বীপটি মিত্রশক্তির হস্তচ্যুত হয়।

ক্রীট আক্রমণে জার্ম্মাণী এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর প্যারাস্যুট-বাহিনী শত্রুর সরবরাহ-ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে, এবং শত্রু-দেশের রাস্তাঘাট, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া নানারূপ অসুবিধা ঘটাইয়াছে; জার্ম্মাণীর বিমানবাহিত সেনাবাহিনী স্থলপথে অভিযানকারী সৈন্যের দলপুষ্ট করিয়াছে। কিন্তু একমাত্র প্যারাস্যুট-বাহিনী এবং বিমানবাহিত সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া জার্ম্মাণী ইতঃপূর্ব্বে কোন দেশ আক্রমণ করে নাই। ক্রীটেই সর্ব্বপ্রথম কেবল বিমানবাহিত সেনাদল আক্রমণ চালিত করিয়া সাফল্য লাভ করিল। জলপথে এই দ্বীপে জার্ম্মাণ সৈন্য অবতরণ করাইবার প্রয়াস একরূপ বিফলই হইয়াছে। ক্রীটে আক্রমণ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর বোমাবর্ষী বিমানগুলি ব্যাপক ও প্রচণ্ড ভাবে বোমা-বর্ষণ করে, এবং তাহার পর একই সময় কেনিয়া, মেলেমী, রেতিমো ও হেরাক্লিয়নে বিমানবাহিত সৈন্য অবতরণ করিতে আরম্ভ করে। অন্তরীক্ষে জার্ম্মাণীর আক্রমণ এত প্রবল হয় যে, বৃটিশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে ক্রীটের তিনটি বিমান-ঘাঁটি ত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন। বস্তুতঃ, এই সিদ্ধান্তকেই বৃটিশের পরাজয় স্বীকার বলা যাইতে পারে। ক্রীটের বিমান-ঘাঁটি পরিত্যক্ত হইবার পর উত্তর-আফ্রিকার ঘাঁটি হইতে বৃটিশ বিমানগুলি ক্রীটের স্থলসৈন্যকে এবং উহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রাংশের নৌবাহিনীকে সাহায্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল, কিন্তু বহু দূরবর্ত্তী আফ্রিকা হইতে ক্রীটে যাইয়া ঐ দ্বীপ হইতে মাত্র ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত গ্রীক্ ঘাঁটি হইতে আক্রমণরত জার্ম্মাণ-বিমানের সমকক্ষতা লাভ অসম্ভব। প্রধানতঃ, বিমানবহরের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবেই আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যে ক্রীটে বৃটিশ প্রতিরোধের অবসান হইয়াছে।

ক্রীট আক্রমণে জার্ম্মাণীর রণকৌশল সম্পর্কে তাহার স্টুকা শ্রেণীর নিম্নগামী বোমাবর্ষী-বিমানের (Dive-bomber) কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। এই বিমানগুলি ক্রীটের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রাংশে বৃটিশ নৌবাহিনীর প্রতি প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছিল। এই আক্রমণে বৃটিশ নৌবাহিনীর বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে; বস্তুতঃ, স্টুকা শ্রেণীর বিমান যে বৃটিশ নৌবাহিনীর আশঙ্কার বিষয়, তাহা ক্রীটের যুদ্ধেই সর্ব্বপ্রথম প্রমাণিত হইয়াছে।

ক্রীটের সামরিক গুরুত্ব অসাধারণ। এই দ্বীপে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অল্পকাল পরে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল এই যুদ্ধের

গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন—Undoubtedly a most important battle, which will affect the whole course of the campaign in the Mediterranean. এই দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জার্ম্মাণী তব্রুককে আক্রমণ পরিচালনের সুবিধা লাভ করিয়াছে; তব্রুক এখনও বৃটিশের হাতে থাকায় উত্তর-আফ্রিকায় জার্ম্মাণীর অসুবিধা হইতেছে। ক্রীটে জার্ম্মাণ-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঈজিয়ান্ সাগরে জার্ম্মাণ-আধিপত্য দৃঢ় হইল, এখান হইতে তাহার মিশরে আক্রমণ চালাইবার সুবিধা হইয়াছে; ক্রীটের সুদা বিমান-ঘাঁটি হইতে সিদিবারাণীর দূরত্ব মাত্র ২ শত ৫০ মাইল; হেরাক্লিয়ান হইতে আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্ব ৪ শত মাইল। পর, ক্রীট্ অধিকার করিয়া জার্ম্মাণী যে সামরিক সুবিধা লাভ করিল, তাহার তুলনায় এই যুদ্ধে তাহার ক্ষতির পরিমাণ অধিক কি না, তাহা বলা যায় না। গত বৎসর মে মাসে নরওয়ের যুদ্ধ সম্পর্কে বৃটিশ কমন্স-সভায় আলোচনাকালে তৎকালীন চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভা যখন স্ক্যাগেরাকের জলযুদ্ধে জার্ম্মাণীর ১০ হাজার সৈন্যক্ষয়ের কথা উল্লেখ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তখন সার আর্কিবাল্ড্ সিনক্লায়ার বলেন—A wise general does not throw away the lives of his troops without regard to the object to be achieved…it is not a great sacrifice to pay for a victorious



"স্টুকা" বিমানের আক্রমণে রণতরী বিধ্বস্ত হইবার ভয়াবহ দৃশ্য

জার্ম্মাণী এখন বৃটেনের মাল্টা, আলেকজান্দ্রিয়া ও সাইপ্রাসের পারস্পরিক সংযোগ বিপন্ন করিয়া পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরে বৃটিশ নৌ-বাহিনীর প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইবে। পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরের বৃটিশ নৌবহর উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধে বিশেষ সহযোগিতা করিয়া থাকে; এই নৌবহরের আধিপত্য যদি ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে উত্তর-আফ্রিকায় যুদ্ধ-পরিচালন সম্পর্কে জার্ম্মাণী বিশেষ সুবিধা লাভ করিবে।

ক্রীটে জার্ম্মাণীর অত্যন্ত অধিক ক্ষতি হইয়াছে জানাইয়া বৃটিশের পরাজয়ের গ্লানি অপনোদনের চেষ্টা হইতেছে। প্রথমতঃ, এই যুদ্ধে বৃটিশেরও ক্ষতি অল্প হয় নাই; বৃটিশ সমর-বিভাগের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি "…our losses have been severe". তাহার modern battle, let alone a campaign. ক্রীটের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর ক্ষতি সম্বন্ধে বৃটিশ কমন্স-সভায় কোন সদস্যের এইরূপ মন্তব্য করা হয় ত অসম্ভব নহে।

সিরিয়া ও ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষ—

জার্ম্মাণীর গ্রীক্ অভিযান, ক্রীট্ আক্রমণ, ঈজিয়ান ও আইওনিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জ অধিকার প্রভৃতি তাহার একটি ব্যাপক অভিযানের বিভিন্ন অঙ্গমাত্র। মিশরে আজ বৃটিশ ও জার্ম্মাণী যে সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহার ফলাফলের উপর বৃটেনের অদূর প্রাচীর স্বার্থ, এমন কি, ভারতবর্ষের

ভাগ্যও নির্ভর করিতেছে। গত ৭ই মে মিষ্টার চার্চ্চিল কমন্স-সভায় বলেন যে, এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে বৃটেন্ প্রচণ্ডতম আঘাত প্রাপ্ত হইবে "......would be among the heaviest blows we could sustain." বৃটেনের প্রাচ্য-স্বার্থ রক্ষার জন্য তাহার পক্ষে এই যুদ্ধের গুরুত্ব যেরূপ অসাধারণ, বৃটিশ সাম্রাজ্যে আঘাত করিতে উদ্যত জার্ম্মাণীর পক্ষেও এই যুদ্ধের গুরুত্ব তেমনই অতুলনীয়। ভূমধ্য সাগরে বৃটিশ নৌবহরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায় উত্তর-আফ্রিকার মরু-অঞ্চলে যুদ্ধ-পরিচালনে বৃটেন্ বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। বৃটিশ স্থলবাহিনী ও বিমান-বাহিনীর সহিত বৃটিশ নৌবহরের ঘনিষ্ঠ সহযোগের ফলেই আফ্রিকার যুদ্ধে ইতঃপূর্ব্বে বৃটেন্ দ্রুত সাফল্য লাভ করিয়াছিল। আফ্রিকার যুদ্ধে বৃটিশ নৌবহরের সহযোগ যাহাতে অসম্ভব হয়, তদুদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরের বিভিন্ন দ্বীপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ক্রীটের পর সাইপ্রাসে জার্ম্মাণীর আক্রমণ আরম্ভ হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। অদূর প্রাচীর সমর-প্রচেষ্টায় জার্ম্মাণীর পক্ষে তাহার প্রভাবাধীন ভিসি-সরকারের বিশেষ সহযোগিতা লাভের সম্ভাবনা।



রাইফেলের বাটের উপর রাখিয়া প্রিয়জনকে পত্র লেখা হইতেছে

ফ্রান্সে যে ব্যক্তি বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি বৃটিশবিরোধী বলিয়া কুখ্যাত। মার্শাল পেতাঁ বর্ত্তমান ফ্রান্সের কর্ণধার; কিন্তু বৃটিশ-বিরোধী এডমিরাল্ ডার্লাই এখন কার্য্যতঃ ফ্রান্স ও ফরাসী জাতির ভাগ্যবিধাতা। ইনি গত মে মাসের মধ্যভাগে হিটলারের সহিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন; এই আলোচনার ফলাফল প্রকাশিত না হইলেও সেই সময় হইতে ফ্রান্সের অনুজ্ঞাধীন (Mandatory) রাষ্ট্র সিরিয়ায় জার্ম্মাণীর তৎপরতার কথা ঘোষিত হইতেছে। এমন কথাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, আফ্রিকায় ফরাসি-অধিকৃত অঞ্চলে ডাকার এবং কাসাব্লাঙ্কায় জার্ম্মাণ সৈন্য পৌঁছিয়াছে, ভূমধ্য সাগরের কোন ফরাসী বন্দরেও জার্ম্মাণ সৈন্য মজুত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সিরিয়া সম্পর্কেই চাঞ্চল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গত ২২শে মে এডমিরাল ডার্লা এক বিবৃতি-প্রসঙ্গে বলেন, হিটলার তাঁহার নিকট ফরাসি-উপনিবেশ ও ফরাসি-নৌবাহিনী চাহেন নাই। এই সময় মার্শাল পেতাঁ বলেন—"...opinion that is apprehensive because it is misinformed, no longer measures our chances and risks and judges our action to-day."

বিজয়ী প্রতিবেশীর প্রভাবে ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষের ক্রমিক নতি-স্বীকারের পরিচয় ইতঃপূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে জার্ম্মাণীর জন্য সমরোপকরণ প্রস্তুত হইতেছে, ফরাসি-জাহাজে সমরোপকরণ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা-মাল যাইতেছে, ফরাসি-মরক্কোয় জার্ম্মাণ-বিমান ও বৈমানিক গমনের সংবাদ শুনা গিয়াছে, অনধিকৃত ফ্রান্সের নদীপথে জার্ম্মাণীর সামরিক জলযান ভূমধ্য সাগরে আসিয়াছে, ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশেই ইন্দো-চীনে ক্রমেই জাপানকে অধিকতর সুবিধা দেওয়া হইতেছে। ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষের এই ক্রম-বর্দ্ধমান নাৎসী-অনুরক্তির কথা জানিয়াও বৃটেন্ এত দিন তাঁহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই; কারণ, তাঁহাদিগকে বিব্রত করিলে ফ্রান্সের অবশিষ্ট নৌবহর জার্ম্মাণীর হস্তগত হইবার আশঙ্কা প্রবলতর হইত। বৃটেনের এই সতর্কতা সত্ত্বেও মার্শাল পেতা ও তাঁহার সহকর্ম্মী তাঁহাদিগের "chances and risks" বিবেচনা করিয়া সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, গত শীতকালে ইটালীর পরাজয়ের সময় ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের "chances and risks" সম্বন্ধে হয় ত বিশেষ উদ্বিগ্ন হন নাই; তখন তাঁহারা কূটনীতিক দ্বন্দ্বে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি গ্রীস, লিবিয়া ও ক্রীটে নাৎসী-ফ্যাসিস্ত-বাহিনীর সাফল্যের জন্যই তাঁহারা কূটনীতিক্ষেত্রে আপনাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অসহায় মনে করিতেছেন। বস্তুতঃ, কূটনীতিক তৎপরতা ও সামরিক তৎপরতা পরস্পরের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত; একের সাফল্যে বা বিফলতায় অন্যের সাফল্য বা বিফলতা নির্ভর করে। রণক্ষেত্রের অবস্থা নাৎসী-ফ্যাসিস্ত শক্তিদ্বয়ের অনুকূল হওয়ায় ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষ, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তাহাদিগের নিকট নতি-স্বীকারে বাধ্য হইয়াছেন। ফরাসী রাষ্ট্রনায়কদিগের মধ্যে যাঁহারা জার্ম্মাণীর বিশেষ অনুরক্ত, মিত্রশক্তির উপর্য্যুপরি পরাজয়ে তাঁহাদিগের প্রভাব স্বভাবতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সম্প্রতি সিরিয়ায় জার্ম্মাণীর ব্যাপক তৎপরতার কথা প্রচারিত হইয়াছিল। আঙ্কারা হইতে এই সম্পর্কে যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, এলেপ্পো, পালমীরা এবং দামস্কাসের বিমান-ঘাঁটিতে জার্ম্মাণরা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; জলপথেও না কি ল্যাটাকিয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্য অবতরণ করে। রোড্‌স্ হইতে সেনাবাহী জার্ম্মাণ-বিমান না কি প্রত্যহ সিরিয়ায় গমন করিতে-ছিল। অবশ্য, সিরিয়ার ফরাসি-শাসনকর্ত্তা জেনারল ডেন্‌স্ এবং ভিসি-সরকারের ওয়াশিংটনস্থিত প্রতিনিধি মিঃ হেনরী হে

সিরিয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্য গমনের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। ত্রিবিধ কারণে সিরিয়ার প্রতি জার্ম্মাণীর অবহিত হওয়া সম্ভব। প্রথমতঃ, সাইপ্রাস; গ্রীস্ হইতে জার্ম্মাণী যেমন অনায়াসে ক্রীটের প্রতি বিমান আক্রমণ চালাইতে পারিয়াছিল, তেমনই সিরিয়া হইতে সাইপ্রাসেও সে অনায়াসে আক্রমণ চালাইতে পারিবে। সাইপ্রাসকে সুয়েজের রক্ষক বলা যাইতে পারে। কাজেই, এই দ্বীপে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জার্ম্মাণীর আগ্রহ স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, সিরিয়া হইতে প্যালেষ্টাইনের পথে সুয়েজে আক্রমণ পরিচালনও জার্ম্মাণীর পক্ষে সহজসাধ্য। সিরিয়া হইতে পোর্ট সৈয়দেও সহজে বোমা বর্ষিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, ইরাকের তৈল-কূপগুলি হস্তগত করিবার জন্যও সিরিয়া হইতে জার্ম্মাণীর তৎপরতা আরম্ভ হইতে পারে। ইরাকের বিদ্রোহীদিগকে জার্ম্মাণী যথাকালে সাহায্য করিতে পারে নাই, এবং তাহার ফলে ইরাকে বিদ্রোহের অবসানও হইয়াছে; কিন্তু ইরাক হইতে সমস্ত জার্ম্মাণ বিতাড়িত হইবার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইরাকের তৈল জার্ম্মাণীর হস্তগত হইবার এখনও বিন্দুমাত্র আশা থাকিলে সে তাহা সহজে ত্যাগ করিবে, এরূপ আশা করা যায় না।



যুদ্ধের পর সিরিয়ার মরুভূমি

সিরিয়ায় বৃটিশ সৈন্য—

সে যাহা হউক, গত ৮ই জুন জার্ম্মাণীর এই অভিসন্ধি বিফল করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যিক-বাহিনী এবং স্বাধীন ফরাসি-বাহিনী সিরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। এই সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে—ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষ সিরিয়া ও লেবাননকে জার্ম্মাণীর আয়ত্তাধীন করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের এই আয়োজন ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যেই বৃটিশ সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন।

ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষ বৃটেনের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেও এখনও যথারীতি যুদ্ধ-ঘোষণা করেন নাই। ফরাসী রাষ্ট্রনায়কগণ সর্ব্বতোভাবে সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেও দামস্কাসের মাত্র ১৫ মাইল দূরে পৌছান পর্য্যন্তও বৃটিশ-বাহিনী বাধা পায় নাই। জার্ম্মাণী বলিয়াছে—পুরাতন মিত্রদ্বয়ের এই বিরোধে সে অনাসক্ত দর্শকমাত্র।

সিরিয়া আক্রমণ করিয়া বৃটিশ সরকার স্পষ্টতঃ ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়াছেন। ইহাতে এক দিকে যেমন সিরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় মিশরে বৃটেনের সমরায়োজন ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তেমনই অন্য দিকে অনধিকৃত ফ্রান্স, ফরাসি-উপনিবেশ এবং ফরাসি-নৌবহর সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। এই আশঙ্কার কথা জানিতে পারিয়াও বৃটিশ সরকার ভিসি-সরকারের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার কারণ, তথাকথিত নিরপেক্ষতার সুযোগে ফ্রান্স জার্ম্মাণীকে যে সাহায্য করিতেছে, তাহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক; তাই "নিরপেক্ষ ফ্রান্স" অপেক্ষা "শত্রু ফ্রান্সই" বৃটেনের অধিকতর কাম্য। ফ্রান্স যদি বৃটেনের শত্রুরাজ্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে ঐ রাজ্য ও তাহার উপনিবেশ হইতে জার্ম্মাণীর সাহায্য-প্রাপ্তি বন্ধ করিবার জন্য বৃটেন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনে সমর্থ হইবে। বৃটিশ সরকার হয় ত এই



বর্ত্তমান [illegible] একটি রাজপথ—পাঁচ বৎসরকাল ইটালীর অধিকারভুক্ত থাকিয়া [illegible] য়ুরোপীয় নগরের রূপ ধারণ করিয়াছে

চাহিতেছে যে, ঐ দেশে তাহার তৎপরতা সম্বন্ধে বৃটেন মিথ্যা প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে; কারণ, বৃটেন্ নিজেই সিরিয়া অধিকার করিতে চাহিয়াছিল। সিরিয়ায় জার্ম্মাণী ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে বিরোধ দেখিতে চাহে; এই বিরোধে বৃটেন্ যাহাতে বিব্রত হয়, সেই জন্য ফ্রান্সকে সে সর্ব্বতোভাবে সাহায্যও করিবে; তবে নিজে হয় ত প্রকাশ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় ইটালী ও জার্ম্মাণী যে প্রকার নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল, সিরিয়ায় জার্ম্মাণীর ঐরূপ নিরপেক্ষতাই হয় ত প্রকাশ পাইবে। সিরিয়ায় বৃটেন্‌কে বিব্রত করিয়া মিশরে তাহার সমরায়োজন ক্ষুণ্ণ করিবার সুযোগ জার্ম্মাণী ত্যাগ করিবে বলিয়া মনে হয় না।



সহকর্ম্মিগণসহ আওষ্টার ডিউক

আফ্রিকার যুদ্ধ—

উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে, ক্রীটে যুদ্ধ চলিবার সময় জার্ম্মাণ-বাহিনী একবার প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল। সল্লাম এবং হেলফায়া গিরিবর্ত্ম জার্ম্মাণদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ক্রীট অভিযান শেষ হইবার পর জার্ম্মাণদিগের তৎপরতার কথা আর শ্রুত হয় নাই। সম্ভবতঃ, ক্রীটে

[illegible] নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন যে, ফরাসী উপনিবেশ ও ফরাসী [illegible] জার্ম্মাণীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতই; ভিসি-কর্তৃপক্ষকে [illegible] ঁতিনিবৃত্ত করা সম্ভব ছিল না।

ঁবিয়া সম্পর্কে অনাশক্তির ভাণ করিয়া জার্ম্মাণী বুঝাইতে

যাহাতে মিশর হইতে সৈন্য প্রেরিত হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যেই জার্ম্মাণ-বাহিনী ঐ সময় আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল।

পূর্ব্ব-আফ্রিকার বৃটিশ-বাহিনী আরও সাফল্য লাভ করিয়াছে। তাহারা মে মাসের মধ্যভাগে আবিসিনিয়ার আম্বা-আলাগী নামক

স্থানটি অধিকার করিয়াছে। ইটালীর পূর্ব্ব-আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা আওষ্টার ডিউক আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আবিসিনিয়ার স্বদেশভক্ত হাবসী এবং বৃটিশ-সৈন্যের তৎপরতা এখনও চলিতেছে।

ইরাকে যুদ্ধের অবসান—

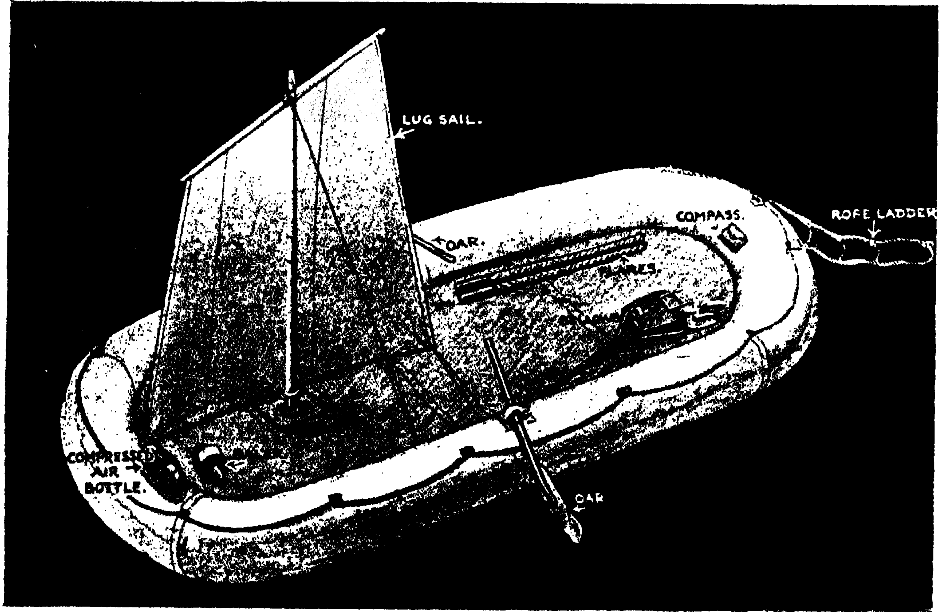
ইরাকে যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। ইরাকী বিদ্রোহের নেতা রসিদ আলি সদলবলে ইরাণে পলায়ন করিয়াছেন। প্রতিনিধি-নৃপ আমীর আবদুল্লা ইলা ইরাকে আগমন করিয়াছেন; তাঁহার নির্দ্দেশে জমিদ মাদ্ফি মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

রসিদ আলি জার্ম্মাণীর নিকট আশানুরূপ সাহায্য পান নাই। ইরাকে এই বিদ্রোহ জার্ম্মাণীর পক্ষে সময়োচিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। জার্ম্মাণীর নির্দ্দেশেই রসিদ আলি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। কিন্তু এই অনুমান হয় ত সত্য নহে; কারণ, যে জার্ম্মাণীর কার্য্যে thoroughness প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার পক্ষে রসিদ আলিকে সাহায্য-দানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিবেচনা না করিয়া, তাঁহাকে বৃটেনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা স্বাভাবিক নহে। সে যাহা হউক, ইরাকে জার্ম্মাণীর হস্তক্ষেপের সময় হয় ত এখনও অতীত হয় নাই। ইরাকের বাৎসরিক ৪০ লক্ষ টন পেট্রলের লোভ পরিত্যাগ করা জার্ম্মাণীর পক্ষে সহজ নহে। আধুনিক যুদ্ধে পেট্রল সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। কাজেই, জার্ম্মাণীর অদূর প্রাচীর বাহিনী যাহাতে ইরাকের পেট্রলে তাহাদের ট্যাঙ্ক ও বিমান পূর্ণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থার জন্য জার্ম্মাণী এখনও প্রয়াসী হইতে পারে।

আট্‌লাণ্টিকে যুদ্ধ—

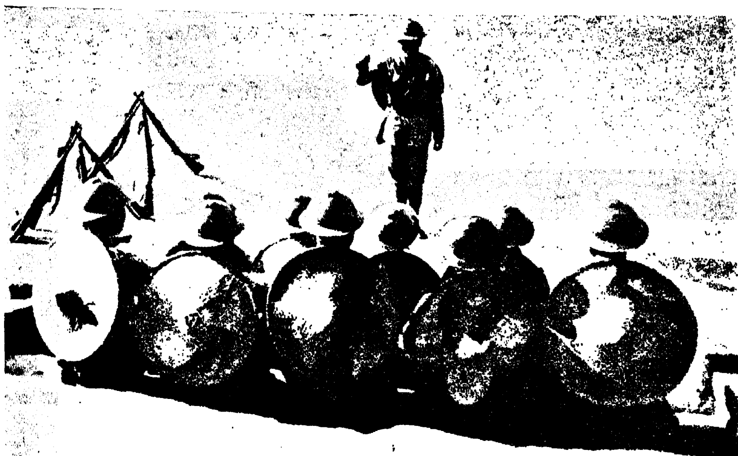
বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রেরিত সাহায্য বৃটেনে প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে জার্ম্মাণীর প্রবল তৎপরতা সমভাবেই চলিতেছে। তবে মে মাসে বৃটেনে বিমান আক্রমণ অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে। আট্‌লাণ্টিকে জার্ম্মাণী যে আক্রমণ চালাইতেছে, ইহাকেই বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধে তাহার প্রত্যক্ষ আক্রমণ বলা যাইতে পারে; বর্ত্তমান যুদ্ধের জয়-পরাজয় প্রধানতঃ এই যুদ্ধের উপরই নির্ভর করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই যুদ্ধ সম্পর্কেই আমাদিগকে এক রূপ অন্ধকারে রাখা হইয়াছে—মাসান্তে একবার জাহাজডুবির যে হিসাব প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে প্রকৃত অবস্থা সব সময় বুঝা যায় না। গত ২৫শে মে যখন অকস্মাৎ ঘোষিত হয়, আট্‌লাণ্টিকের যুদ্ধে বৃটেনের ৪২ হাজার টনের রণপোত (battle-cruiser) "হুড" জলমগ্ন এবং "প্রিন্স অব্ ওয়েলস্" ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তখন বুঝা যায়, এই অঞ্চলে জার্ম্মাণীর কিরূপ প্রবল তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছিল। যাহা হউক, এই ঘটনার পর বৃটিশ নৌবহর আক্রমণকারী ৩৫ হাজার টনের জার্ম্মাণ রণপোত "বিস্‌মার্ক"কে দুই দিন অনুসরণ করিয়া জলমগ্ন করিয়াছে।

"হুড্" ও "বিসমার্ক"-সম্পর্কিত ঘটনার সময় ২৭শে মে মার্কিণ



জার্ম্মাণীর বোমাবর্ষী বিমানগুলি বৃটেনে আক্রমণ পরিচালনের সময় রবারের নৌকা সঙ্গে আনে। বিমান যদি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, তাহা হইলে ঐ নৌকা বাতাসে পূর্ণ করিয়া সমুদ্র অতিক্রম করিবার চেষ্টা হয়

রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে আটলাণ্টিকের যুদ্ধের ভয়াবহ তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জানান যে, সম্প্রতি গ্রীণল্যাণ্ড ও আইস্‌ল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জার্ম্মাণী তাহার সমগ্র নৌ-শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। জার্ম্মাণীর আক্রমণে বৃটেনের জাহাজ-ডুবি সম্বন্ধে তিনি যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে জানা যায় নাই। এই জাহাজ-ডুবির পরিমাণ বৃটেনের জাহাজ উৎপাদনের শক্তির তিন গুণ অপেক্ষাও অধিক এবং বৃটেন্ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত জাহাজ উৎপাদনের শক্তি অপেক্ষা দ্বিগুণ। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ভাষায়—The blunt truth is this—and I reveal this with the full knowledge of the British Government—the present rate of Nazi sinking of merchant ships is more than three times as high as the capacity of British-ship yards to replace them. It is more than twice the combined British and American output of merchant ships to-day. এই তথ্য যে ভয়াবহ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভাবে বৃটিশ জাহাজ আক্রমণে জার্ম্মাণী যদি সফল হয়, তাহা হইলে তাহার বৃটিশ জাতিকে অনাহারে মারিবার ষড়যন্ত্র বিফল না হইতেও পারে।



চীনা-সৈন্য গরিলা-যুদ্ধ সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি—

পশ্চিম-গোলার্দ্ধে জার্ম্মাণীর ক্রমবর্দ্ধমান সাফল্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ক্রমেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নিশ্চিত বুঝিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী যদি বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিরাপদ থাকিবে না—অন্ততঃ অর্থনীতিক্ষেত্রে মার্কিণী প্রভাবের অবসান হইবেই। এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে বৃটেনকে জয়যুক্ত দেখিতে চান। তবে এখনও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এক শ্রেণীর লোক বিশ্বাস করে—বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মাণী জয়ী হইলে তাহাদিগের কোন ক্ষতি নাই; জার্ম্মাণীর সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মার্কিণী ব্যবসায়ীরা পূর্ব্বের ন্যায় ডলারের স্তূপে গড়াগড়ি দিতে পারিবেন। এই শ্রেণীর মার্কিণীদিগের মনোভাব উপেক্ষণীয় নহে; তাই গণতান্ত্রিক মার্কিণী সরকার আইন বাঁচাইয়া অতি সন্তর্পণে বৃটেনকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই জন্যই ২৭শে মে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতায় জার্ম্মাণীর ভয়াবহ বিশ্ব-বিজয় পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ থাকিলেও মার্কিণী সরকারের নাৎসী-বিরোধী ব্যবস্থার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। বৃটেনে মার্কিণী পণ্য পৌছান সম্পর্কে তিনি অবশ্য বলিয়াছেন—The delivery of supplies to Britain is imperative. This can be done, it must be done and it will be done. কিন্তু এই "can be," "must be," "will be," যে কি ভাবে, তাহা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই; কারণ, তিনি জানেন—তাঁহার ঘোষিত নীতির ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সুদূরবর্ত্তী সম্ভাবনাও যদি থাকে, তাহা হইলে বিরোধী দল ঐ ঘোষণাকে কেন্দ্র করিয়া প্রবল প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিবে। বর্ত্তমানে মার্কিণী রণপোতগুলি সমুদ্রে বিচরণ করিতেছে; জার্ম্মাণীর অভিযোগ—ঐ সকল রণপোত জার্ম্মাণ জাহাজের গতিবিধি তাহার শত্রুপক্ষকে জানাইয়া দেয়। যে যাহা হউক, বৃটেনের জাহাজ-ডুবির যে ভয়াবহ তথ্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিবারণের জন্য রণপোত-বিচরণ (patrols) ব্যতীত আর কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, তাহা অপ্রকাশিত রাখিয়া প্রেসিডেণ্ট মাত্র বলিয়াছেন—All additional measures necessary for the delivery of goods will be taken. এই 'additional measures' যে মার্কিণী রণপোতের রক্ষণাধীনে বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজ প্রেরণের ব্যবস্থা (convoying) নহে, তাহা প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ আর্লি বুঝাইয়া দিয়াছেন। মার্কিণী রণপোতের রক্ষণাধীনে বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজ প্রেরণের ব্যবস্থা হইলে মার্কিণী নৌবিভাগ কার্য্যতঃ জার্ম্মাণ টরপেডোর সম্মুখীন হইত, এবং তাহার ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইত। কাজেই, মিঃ আর্লি তাঁহার মুরুব্বির বক্তৃতার টীকা করিয়া বলিয়াছেন—"মা ভৈঃ"!

সুদূর প্রাচীর অবস্থা—

জাপানের মনোভাব দুর্ব্বোধ্য। গত এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুয়োকা যখন য়ুরোপ পরিভ্রমণ শেষ

করিয়া টোকিওতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন আশঙ্কা হইয়াছিল যে, জাপান সত্বর দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান আরম্ভ করিবে। কার্য্যতঃ, সে তাহা করে নাই; পক্ষান্তরে, জাপানী রাষ্ট্রনীতিকদিগের সুর অকস্মাৎ নরম হইয়াছে, এবং জাপান চীনের যুদ্ধেই বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছে।

মে মাসের প্রথমে চীনের চারিটি অঞ্চলে জাপানের ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে সান্সী ও হোনান প্রদেশের অন্তর্গত পীত নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে জাপানের লক্ষাধিক সৈন্য আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়; উহার দক্ষিণে হুপে প্রদেশে হান্ নদীর তীরে তাহার আর একটি বাহিনী যুদ্ধে রত হয়; উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ চেকিয়াং এবং কোয়াঙ্গটাঙ্গ প্রদেশে জাপানের আরও দুইটি বাহিনী প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ আরম্ভ করে। উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার এবং বিমানবহরের সহযোগিতা লাভ সত্ত্বেও জাপানের এই আক্রমণ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। চেকিয়াঙ্গ প্রদেশে চুকি নামক স্থানটি চীনারা পুনরায় অধিকার করিয়াছে। হোনান প্রদেশে পীত নদীর তীরে যুদ্ধ চলিতেছে। ইতোমধ্যে সান্সী প্রদেশে জাপানী সৈন্যের বেগ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে চীনাবাহিনী উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। চীনের রাজধানী চুংকিংএ জাপান প্রবল ভাবে বোমা বর্ষণ করিতেছে; এই আক্রমণ কেবল সামরিক লক্ষ্যস্থলেই নিবদ্ধ নহে। সম্প্রতি জাপানী বিমানের বোমাবর্ষণের ফলে চুংকিংএ ৭ শত নর-নারী ভূগর্ভে শ্বাসরোধে প্রাণ হারাইয়াছে।

জাপানী রাষ্ট্রনায়কদিগের সুরের পরিবর্ত্তন এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের পরিবর্ত্তে চীনেই জাপানের অধিকতর মনোযোগ লক্ষ্য করিয়া এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, মিঃ মাৎসুয়োকা রোম ও বার্লিন্ পরিদর্শনে বিশেষ তৃপ্ত হন নাই; নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের সহিত এক সূত্রে জাপানের ভাগ্য গ্রথিত করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন।

জাপানের মনোভাবে এবং কার্য্যে দৃশ্যতঃ এই পরিবর্ত্তন দুইটি বিকল্পিত কারণে সম্ভব। হয় ত সত্যই জাপানের সহিত ইটালী ও জার্ম্মাণীর সম্বন্ধের অবনতি ঘটিয়াছে এবং প্রধানতঃ সেই জন্যই য়ুরোপ ও আফ্রিকার যুদ্ধের সুযোগে জাপান তাহার সাম্রাজ্য-প্রসারের আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রয়াসী হইতে চাহিতেছে না। সে হয় ত আমেরিকার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া অর্থনীতিক সুবিধা লাভের প্রয়াসী। ফ্যাসিস্ত শক্তিদ্বয়ের নিকট হইতেও সে এই সুবিধা সম্ভোগের আশা করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার ২৭শে মে তারিখের বক্তৃতায় চীনকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দান করিলেও জাপান সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই। ঐ বক্তৃতার পর সাংবাদিকদিগের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, জাপানের তৈল-সরবরাহ বন্ধ করিবার ইচ্ছা আপাততঃ তাঁহার নাই।

পক্ষান্তরে, জাপানের মনোভাবে ও কার্য্যে এই পরিবর্ত্তন কৌশলমাত্র হওয়াও অসম্ভব নহে; বরং ইহাই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়। জাপানের অভিসন্ধি সম্পর্কে অত্যধিক সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ায় তাহার প্রয়োজনীয় আয়োজন পূর্ণ করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই, তাহার পক্ষে এই ভাবে শান্তিপ্রিয়তার অভিনয় করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, সম্প্রতি ইন্দোচীন এবং থাইল্যাণ্ডে জাপানের গোপন তৎপরতার বিষয় শ্রুত হইয়াছে। তাহার পর, সে-দিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতার অব্যবহিত পূর্ব্বে জাপানের নৌবিভাগের মুখপাত্র ক্যাপ্টেন হীডিও হেলাইড্ স্বদেশবাসীকে প্রস্তুত হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়া যে বিবৃতি প্রদান করেন, তাহা হয় ত অর্থশূন্য নহে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া জাপানের সমর-সচিব জেনারল টোজো টোকিওয় সেনাপতি-সম্মিলনে সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন—"জাপান গুরু অবস্থার সম্মুখীন;" তিনি ১৫ জন অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতিকে ঘনিষ্ঠ সহযোগের জন্যও আহ্বান করেন। এই স্মারক এবং অনুরোধ নিশ্চয়ই অর্থপূর্ণ; কারণ, জাপান যদি শান্তিকামী হয়, তাহা হইলে সে যে "গুরু অবস্থার সম্মুখীন"—ইহা মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

স্কট্ল্যাণ্ডে হেস্—

গত ১৪ই মে হিট্লারের ঘনিষ্ঠ সহচর এবং হিট্লার ও গোয়েরিংএর অবর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর ডিক্টেটারী-তক্তের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী



রুডল্ফ হেস্

রুডল্ফ হেস্ অকস্মাৎ স্কটল্যাণ্ডে এক কৃষকের গৃহের নিকট আবির্ভূত হন। এই নাটকীয় ঘটনা সামরিক ভাবে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিলেও, বিশ্বের রাজনীতিক ঘটনা-স্রোতের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। জার্ম্মাণীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, কিছু দিন হইতে হেসের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছিল, সেই জন্য তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা শান্তি স্থাপনের আশায় একাকী বৃটেনে গমন করেন। অন্যান্য দেশে অনুমান করা হইয়াছে যে, নাৎসী নেতৃবৃন্দের সহিত মতদ্বৈধের জন্যই হেস্ জার্ম্মাণী হইতে গোপনে পলায়ন করিয়াছেন।

হেসের জার্ম্মাণী ত্যাগের প্রকৃত কারণ ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ এইটুকু বলা যাইতে পারে, নাৎসী-নেতার এই অন্তর্দ্ধান অত্যন্ত রহস্যজনক; অন্যান্য নাৎসী-নেতা—বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে যাঁহারা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদিগের সহিত হেসের মতদ্বৈধ ঘটাই সম্ভব।

শ্রীঅতুল্ দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সংবাদপত্রের কাগজের অভাব

গত ২৯শে চৈত্র হইতে ভারত সরকার ভারতে সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজের আমদানী সঙ্কুচিত করিবার আদেশ জারি করিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজের উপরেও শতকরা ২৫৲ হারে 'ডিউটী' নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। যে সরকার সুলভ মূল্যের সংবাদপত্রের জন্য কম দামের অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের মূল্যের কাগজ আমদানী করিবার কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া সহায়তা করিতে পারেন নাই, যুদ্ধের ফলে যখন সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের মূল্য, অতিরিক্ত ভাড়া ও যুদ্ধ-ইনসিওর ফি সহ তিন গুণেরও অধিক হইয়াছে—সেই শুভ অবসরে উচ্চ হারে 'ডিউটী' নির্দ্ধারিত করা সেই সরকারের পক্ষেই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। ভারতে কাগজ প্রস্তুতের অনেকগুলি কল আছে; কিন্তু তাহারা সংবাদপত্রের জন্য পর্য্যাপ্ত কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে না—পারিলেও তাহার মূল্য সমধিক। বেশী দামের কাগজ প্রস্তুত জন্য তাহারা ব্যস্ত; সেই জন্য ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিকে বিদেশ হইতে আমদানী কাগজের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। এখন এই কাগজের মূল্য ক্রমশঃ যেরূপ উচ্চ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সংবাদপত্র এবং পুস্তকাদি মুদ্রণের কার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় অনেক সংবাদপত্রকেই মূল্য বৃদ্ধি এবং আকার হ্রাস করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। তাহার উপর ভারত সরকার কাগজের আমদানী কমাইবার জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করিয়াছেন,—বিনা-লাইসেন্সে কাগজ আমদানী করিলে 'পেনালটি' দিতে হইবে। সে 'পেনালটি' কাগজের মূল্যের শতকরা ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে; অর্থাৎ 'ডিউটী' ও 'পেনালটিতে' কাগজের বর্দ্ধিত মূল্যেরও অর্দ্ধাংশ হইবে। এ দিকে যুদ্ধ আজ ১ বৎসর ৯ মাস চলিয়া আসিতেছে,—এখনও কত দিন যে চলিবে, তাহার স্থিরতা নাই। এই দীর্ঘকালের মধ্যেও ভারত সরকার ভারতে ছাপিবার মত কাগজ প্রস্তুত করিবার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিলেন না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ডেরাডুনের জঙ্গল অনুসন্ধান-ইনিষ্টিটিউটের পরীক্ষা-ফলে এ দেশে যে সকল কাগজের উপাদান নির্ণীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে Kydia Calycina নামক উদ্ভিদ হইতে ছাপিবার উপযুক্ত অতি উৎকৃষ্ট মণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার মণ্ড ৭০ ভাগের সহিত যদি বাঁশের মণ্ড ৩০ ভাগ মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে অতি সুন্দর ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই কাগজের মূল্য সুলভ হইবে না, তাহাতে সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী কাগজও প্রস্তুত হইবে না। এই [illegible] উপাদান হইতে কাগজ এখনও প্রস্তুত হয় নাই—তবে বাঁশের মণ্ড হইতে যে মূল্যবান কাগজ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা [illegible] ও স্বচ্ছ। চিমড়ে—চামড়ার মত শক্ত কাগজ নমনীয় নহে, ইহাতে ছাপা ভাল হয় না; এবং স্বচ্ছ কাগজ ছাপার অনুপযুক্ত—ইহাতে এক পৃষ্ঠার ছাপা অপর পৃষ্ঠায় ফুটিয়া বাহির হয়। আর বাঁশের মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুতের ফলে—বাঁশের মূল্য বৃদ্ধিতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর নির্ম্মাণও ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় সরকার বিভিন্ন পার্কে ও অন্যান্য ময়দানে সাবুই ঘাস আবাদের ব্যবস্থা করিয়া এ দেশে সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী সস্তা কাগজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পুরাতন সংবাদ-পত্র প্রভৃতি হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া বাদামী রঙের কম মূল্যের কাগজও প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সরকার ভারতে এ-বার সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ প্রস্তুতের জন্য তাঁহাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠও উত্তোলন করেন নাই। ইহা করা সরকারের অবশ্য-কর্ত্তব্য ছিল। কেবল দৃশ্যতঃ বৈজ্ঞানিক প্রথায় অনুসন্ধান-বোর্ড রাখিলে কর্ত্তব্যের শেষ হয় না; অত্যাবশ্যক পণ্য প্রস্তুতের সুব্যবস্থাও করিতে হয়। নতুবা ঐরূপ বোর্ড রাখা অপব্যয় মাত্র। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় সওয়া-দুই লক্ষ টন কাগজের প্রয়োজন। তন্মধ্যে কিছু কম ৬০ হাজার টন মাত্র কাগজ ভারতের বিভিন্ন কলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং ভারতে কাগজের শিল্প প্রতিষ্ঠার খুব সুযোগ আছে। কেবল এই যুদ্ধের জন্যই ভারতে কাগজের শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই। ভারতে কাগজের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া উহার বিকাশ এবং বিস্তার সাধন করা আবশ্যক। কাগজের তিন গুণ মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ হারে 'ডিউটী' নির্দ্ধারণের ফলে সুলভ মূল্যের বহু দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ হইলে কেবল দেশের ও সংবাদপত্র-সেবিগণেরই ক্ষতি হইবে না, সরকারের বিরাট শাসনযন্ত্রের ব্যয়ভার-নির্ব্বাহ তহবিলেও বহু টাকা ঘাট্‌তি পড়িবে; কারণ, সংবাদ-পত্রকে বহু ভাবেই সরকারকে ট্যাক্স জোগাইতে হয়।

—

পাট নিয়ন্ত্রণ

স্বায়ত্ত-শাসনের স্পর্দ্ধাসম্পন্ন বাঙ্গালা সরকার কোন কাজটা সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদন করিতে পারিতেছেন, তাহার কোন দৃষ্টান্ত কেহ কি এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইয়াছেন? পাট-চাষের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও তাহা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। সরকারের উদ্দেশ্য ভাল। কিন্তু এই কাজ সম্পন্ন করিবার কৌশল না জানায় তাঁহাদিগকে বিফল-মনোরথ হইতে হইতেছে। পাট কেবল বাঙ্গালাতেই জন্মে না; বিহার এবং আসামেও পাটের আবাদ আছে। বিশেষতঃ, আসাম প্রদেশে এখনও এরূপ অনেক উর্ব্বর জমি পতিত আছে, যেখানে পাট উৎপাদন করা যাইতে পারে। সুতরাং অগ্রে আসাম এবং বিহার সরকারের সহিত পরামর্শ না করিয়া বাঙ্গালায় পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। কথাটা নিতান্ত আনাড়ীরাও বুঝিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালা সরকার তাহা না করিয়া বাঙ্গালায় পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন। তাহার পর তাহাতে কোন কাজ হইল না, দেখিয়া তাঁহারা আসাম এবং বিহার সরকারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য শিলংএ এক বৈঠক বসাইয়া-ছিলেন। তাহাও বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালার সচিবগণ আসাম এবং বিহারের মন্ত্রিমণ্ডলীকে স্বমতে আনিতে সমর্থ হন নাই। এ দিকে যদি আসামে এবং বিহার প্রদেশে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে পাট-চাষ চলিতে থাকে, তাহা হইলে

বাঙ্গালায় পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত করিলে কোন ফলই হইবে না। শুনা যাইতেছে যে, বাঙ্গালার সচিববৃন্দ আসাম সরকারকে পাটের জমি জরিপ করিবার জন্য বিনা সুদে অনেক টাকা কর্জ্জ দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার ফলও সুবিধাজনক হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ নাই। কেবল আইন এবং হুকুমজারি দ্বারা কার্য্য করিতে গেলে সে কার্য্য পণ্ড হইবেই। বস্তুতঃ, শিলং সমিতির উদ্দেশ্য পণ্ড হওয়ায় বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

—

লোকগণনায় গোলমাল

আদমসুমারের হিসাবে যে একটা বিষম গোল হইয়া আসিতেছে অথবা ইদানীং ঘটিতেছে, উহার হিসাব দেখিলেই সহজে এরূপ সন্দেহ হয়। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম লোক-গণনা করা হয়। ঐ সময়ে গণনায় ভারতের লোকসংখ্যা ২০ কোটি ৬১ লক্ষের উপর দাঁড়ায়। তাহার পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার আদমসুমার হইয়াছিল। ঐ বৎসর ভারতের লোকসংখ্যা গণনায় দাঁড়াইয়াছিল ২৫ কোটি ৩৮ লক্ষের অনেক উপর। সুতরাং দেখা গেল, ভারতের লোকসংখ্যা দশ বৎসরে শতকরা ২৩ জনেরও অধিক হারে বাড়িয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া সেই সময় খুব একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, জনসংখ্যা এত অধিক হারে বর্দ্ধিত হইলে ভারতে লোক ধরিবে না। শেষে একটা আজা-মৌজা সিদ্ধান্ত করা হইল যে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের গণনায় লোক ঠিক-ঠিক হিসাব দেয় নাই। ট্যাক্সবৃদ্ধির ভয়ে বা অন্য কোন কারণে গৃহস্থরা তাহাদের পরিজন-সংখ্যা কমাইয়াছিল। এইরূপ একটা অনুমান করিয়া লোকে তখন এই অতিরিক্ত লোক-বৃদ্ধির একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছিল। শ্বেতাঙ্গ-মহল এবং পাদরীরা বাল্য-বিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর আদমসুমার হয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। সে-বার নিখিল ভারতের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৮ কোটি ৭৩ লক্ষ। সে-বার শতকরা ১৩ জনেরও অধিক হারে লোক-বৃদ্ধি হইয়াছিল মনে হয়। সে-বারও লোকবৃদ্ধি লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়। এই প্রকারে ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকগণনা শেষ হইয়াছিল।

তাহার পর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে ভারতে প্রথম লোকগণনা হইয়াছিল। সে-বার গণনায় নিখিল ভারতে লোকসংখ্যা হয় ২৯ কোটি ৪৩ লক্ষ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা গেল, দশ বৎসরে শতকরা মাত্র আড়াই জন-হারে লোক-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের স্কন্ধে ইহার অনেকটা দোষ চাপাইয়া কোন রকমে এই ব্যাপারের মীমাংসা করা হইল। তাহার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর হিসাবে প্রকাশ পাইল —ভারতের লোকসংখ্যা ৩১ কোটি ৫১ লক্ষের কিছু উপর; অর্থাৎ দশ বৎসরে শতকরা সাত জনের কিছু অধিক বৃদ্ধি। ইহার পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতের লোকসংখ্যা গণনায় দাঁড়াইল ৩১ কোটি ৯০ লক্ষের কম; সুতরাং দশ বৎসরে শতকরা ১ জনের কিছু অধিক বৃদ্ধি।

ইহার পর নূতন শাসন-সংস্কার আইনের তিত্তিতে বাঙ্গালা এবং পঞ্চনদ প্রদেশকে মুসলমানপ্রধান করা হইয়াছে। তখন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারতের লোকসংখ্যা দাঁড়াইল ৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ। একেবারে দশ বৎসরে শতকরা ১০৬ জন বৃদ্ধি! নিখিল ভারতে এত লোক বৃদ্ধির জন্য অনেকে বিস্মিত হইয়াছিল। ইহার কৈফিয়তে সরকার-পক্ষ হইতে বলা হয়, ঐ দশ বৎসরে ভারতে মহামারী বা দুর্ভিক্ষ আত্ম-প্রকাশ করে নাই; সেই জন্যই লোক-সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় অনেকেই বলিয়াছিলেন, কোন কোন গণক নিজদের জনসংখ্যা অযথা বৃদ্ধি করিয়াছে। আদমসুমারের রিপোর্ট-প্রদত্ত হিসাবে তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতে লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শুনিতেছি প্রায় ৪০ কোটি। শতকরা ২০ জন হিসাবে বৃদ্ধি। ইহা যেন কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে। যাহা হউক, আবার শুনা যাইতেছে, বাঙ্গালা এবং পঞ্জাবের আদমসুমারের হিসাব লইয়া না কি সরকারের মনেই খটকা বাধিয়াছে। কথাটা প্রকাশ করিয়াছেন, যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী নেতা সর্দ্দার নর্ম্মদাপ্রসাদ সিংহ। তিনি বলিতেছেন,—এ-বার গণনায় না কি জানিতে পারা গিয়াছে, বাঙ্গালার মুসলমান-সংখ্যা শতকরা ৩২ জন, এবং পঞ্জাবের মুসলমান-সংখ্যা শতকরা ৩৪ জন মাত্র। পূর্ব্ব-বঙ্গ দেখিলে মনে হয়, বাঙ্গালায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। আবার পশ্চিম-বঙ্গ দেখিলে মনে হয়, বঙ্গদেশে হিন্দুই অধিক। যাহা হউক, এই প্রদেশে যদি হিসাবের পুনঃ-পরীক্ষা হয়, তাহা হইলে কি ভাবে তাহা হইবে, তাহা জানা প্রয়োজন; কিন্তু এ-বার আদমসুমারের হিসাব আবার 'ঢালিয়া সাজা' কি সম্ভব হইবে?

—

নূতন ব্যবস্থা

ভারতবর্ষ বৃটিশ জাতির শাসনাধীনে আসিবার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ভারত সরকার কোন ভারতীয় কারিকর বা শ্রমশিল্পীকে বর্ত্তমান যুগের শ্রমশিল্প-কৌশল শিক্ষাদানের জন্য স্বেচ্ছায় ইংলণ্ডে বা য়ুরোপের অন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্রে লইয়া যান নাই। অথচ ভারতবাসীর অভিযোগ, ভারতে বাণিজ্যজীবী জন কোম্পানীর আমলেই ভারতীয় শ্রমশিল্পের ঘোর অবনতি ঘটিয়াছে। যাহা হউক, এ-বার বৃটিশ সরকার ভারত হইতে ৫০ জন শ্রমশিল্পের কারিকর বা মিস্ত্রীকে সামরিক প্রহরণাদি নির্ম্মাণ-কৌশল শিক্ষাদানের জন্য ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছেন। ইহারা বিলাতে উপস্থিত হইলে বৃটিশ সরকারের শ্রমবিভাগের অধ্যক্ষ মিষ্টার আর্ণেষ্ট বেভিন বন্ধুভাবে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষকে শিল্পপ্রধান করিতেই হইবে, ইহা আমরা জানি। আজ যে আমরা ভারতীয় এবং বৃটিশ শ্রমিকদিগকে একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নূতন ইতিহাস রচনা করিতেছি, ইহা আমি যথার্থই বিশ্বাস করি।" মিষ্টার বেভিনের এ কথা সত্য হইলে ভারতে যে এক নূতন যুগের আবির্ভাব সূচিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তাহার পর ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী সস্ত্রীক তাঁহাদের কামারশালে ঐ সকল শিক্ষানবীশ মিস্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনিও উহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ভারত সরকারের পক্ষ হইতে আমিই তোমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছি। আশা করি, তোমরা এই শিক্ষাকার্য্যে গর্ব্বানুভব এবং আনন্দ লাভ করিবে। তোমরা যাহা শিখিবে, তাহা তোমরা দেশে ফিরিয়া যাইয়া তোমাদের ন্যায়

কর্মীদিগকে শিখাইবে।"—গ্রেট বৃটেন পূর্ব্ব হইতেই ভারতবাসীকে কারিকরের বা মিস্ত্রীর কাজ শিক্ষা দিলে ইংরেজকে বিপন্ন হইয়া মার্কিণের দ্বারস্থ হইতে এবং অস্ত্রাদির জন্য ইজারা দিতে হইত না।

তাহার পর আমেরী বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত ভারত তাহার শ্রমশিল্পের এবং কৃষিকৌশলের বিকাশসাধন করিতে না পারিতেছে, যে পর্য্যন্ত সে সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ হইতে পারিবে না। তোমরা ভারতের সেই ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে।" ভারত-সচিবের মুখে এ কথা নূতন; আমরাই বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যে পর্য্যন্ত ভারতবাসী শ্রমশিল্পে সমৃদ্ধ না হইবে, সে পর্য্যন্ত ভারতের দুরন্ত দারিদ্র্য ঘুচিবে না। কোন দেশ কেবল কৃষিমাত্র সম্বল করিয়া দারিদ্র্যকে কখনই পরিহার করিতে পারে না। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন সাধন অত্যন্ত নৈতিক বলের কাজ। বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার পর ইংরেজের কি তাহা স্মরণ থাকিবে?

—

"পরের ছেলে কথায় ঠেলে রাখবে কত দিন"

ইহা মহাকবি ভারতচন্দ্রের উক্তি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিলাতের শ্রম-বিভাগের মন্ত্রী মিষ্টার আর্ণেষ্ট বেভিন ভারতীয় শিক্ষার্থী শ্রমিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"আমরা জানি যে, ভারতবর্ষকে শ্রমশিল্প-প্রধান করিতেই হইবে।" কিন্তু বক্তৃতায় তিনি যাহাই বলুন, কার্য্যক্ষেত্রে সে দিকে সরকারের যেরূপ চেষ্টা দেখা যাইতেছে,—তাহাতে সত্যই আমাদিগকে হতাশ হইতে হইয়াছে। সে দিন কলিকাতায় ভারতীয় বণিকদিগের প্রথম ত্রৈমাসিক বৈঠকের অধিবেশনে সার শ্রীযুত বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা ভারত সরকারকে ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার এ বিষয়ে যে কিছুমাত্র মনোনিবেশ করিতেছেন, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে না। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় ভারতবাসীকে শ্রমশিল্প-সাধনের পথে অগ্রসর করিবার একটি অনন্যসাধারণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে যে ভাবে শ্রমশিল্পের বিকাশ-সাধনে বৃটিশ সরকার সাহায্য করিতেছেন,—ভারতে ভারতবাসীর জন্য তাঁহারা সেরূপ কিছু করিতেছেন কি? কার্য্য দেখিয়া তাহা মনে হইতেছে না। আমরা কেবল প্রাচ্য-গুপ্ত পরিষদের বৈঠক হইতে বাক্যই শুনিয়া আসিতেছি। কানাডায় নূতন শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠিত এবং পুরাতন কারখানাগুলি প্রশস্ততর করা হইতেছে। এ জন্য গত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত ৩০ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার ব্যয় করা হইয়াছে। বৃটেন এবং কানাডা এই দুই দেশ ঐ ব্যয় প্রায় সমভাগেই বহন করিয়াছে। ইহার ফলে প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ কোটি ডলার মূল্যের অধিক পণ্য তথায় প্রস্তুত হইবে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত বিলাতী সরকার কানাডাকে ১১০ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ডলার মূল্যের সামরিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ভার দিয়াছেন। আর ভারতকে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে গত ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কেবল মাত্র ৮৩ কোটি টাকা মূল্যের সামরিক পণ্য প্রস্তুতের ভার দেওয়া হইয়াছে। কানাডায় ডলারের মূল্য ৪ শিলিঙের উপর; সুতরাং প্রায় ৩ টাকা। সময় সময় কিছু হ্রাসবৃদ্ধি হয়। তাহার পর অষ্ট্রেলিয়ার কথা। অষ্ট্রেলিয়ার অস্থায়ী প্রধান-সচিবের মুখেই প্রকাশ, দিল্লীর পরিষদের পর হইতে অষ্ট্রেলিয়াকে প্রচুর পরিমাণে সমরসম্ভার-নির্ম্মাণের বায়না দেওয়া হইয়াছিল। উহা সরবরাহ করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়াকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছে। সর্ব্বসাকল্যে অষ্ট্রেলিয়া ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য প্রস্তুত করিবার বায়না ত পাইয়াছেই; অধিকন্তু আরও ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য আলোচনা চলিতেছে। আসল কথা, ভারতবাসী শিল্প-সেবায় উন্নতি লাভ করুক—কার্য্যক্ষেত্রে বৃটিশ জাতির সেরূপ কোন অভিপ্রায় দেখা যাইতেছে না।

—

ভারতের জাতীয়তা

সার নর্ম্মাণ এঞ্জেল বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অনন্যসাধারণ। তিনি যথার্থ-ই বলিয়াছেন, বৃটিশ উপনিবেশগুলি সম্বন্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ক্রমশঃ খুব হ্রাস করা হইতেছে, ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের পদ্ধতি অনুসারে ঐ সকল উপনিবেশ প্রায় স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভারত সম্বন্ধে তিনি যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, ইংরেজ ভারতবাসীকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দিতেছেন না, তাহার কারণ, ভারতের অধিবাসীরা সকলে এক 'নেশন' নহে। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির মধ্যে আচার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যেও সেইরূপ পার্থক্য বর্ত্তমান।

তাঁহার কথা কতকটা সত্য। কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠীগত লোক যে সম্মিলিত হইয়া এক 'নেশন' হইতে পারে না, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? একই দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে কতক বিষয়ে এমন সাম্য থাকে,—যাহার জন্য তাহারা এক 'নেশন' হইতে পারে। মার্কিণের অধিবাসীরা এক 'নেশন' নহে,—এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু ঐ দেশে যে কত জাতির বাস, তাহার স্থিরতা নাই। য়ুরোপের এমন কোন জাতি নাই, যাহারা এই বিস্তীর্ণ দেশে যাইয়া বসবাস না করিতেছে। তাহাদের মধ্যে আচারগত, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালীগত পার্থক্য যে নাই, তাহাও নহে। তবে তাহারা এক হইল কি করিয়া? রুশিয়াতেও নানা গোষ্ঠীর লোক বাস করে। কিন্তু তথাপি মোটের উপর য়ুরোপীয় রুশিয়ার অধিবাসীদিগকে সকলেই এক 'নেশন' বলিয়া স্বীকার করে। অথচ তাহাদের মধ্যে শ্লাভ, তাতার, পোল প্রভৃতি জাতির স্বাতন্ত্র্য এখনও লক্ষিত হইয়া থাকে। কশাক এবং শ্লাভ জাতির পার্থক্য বুঝিতে এখনও বিলম্ব হয় না। ইহারা সকলে মিলিয়া এক হইয়া যায় নাই। ইহাদের মধ্যে আচারগত ভিন্নতা এখনও লক্ষিত হয়। সার নর্ম্মাণ স্বয়ং যে জাতির লোক, সে জাতি এক গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির দাবী করিতে পারেন না। তাঁহারাও এংগলো স্যাক্সন, জুট এবং দিনেমার-বংশোদ্ভূত। তদ্ভিন্ন, তাঁহাদের মধ্যে খাঁটি বৃটেন এবং নর্ম্মাণও আছেন। কানাডায় ফরাসী এবং ইংরাজ-বংশের লোক কি মারামারিটাই না করিয়াছে! কিন্তু তবুও ত তাহারা স্বায়ত্ত-শাসন পাইয়াছে।

সার নযাণ ভারতবাসীকে উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন না দিবার পক্ষে গ্রেট বৃটেনের আর একটি ওজরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরেজ শঙ্কা করেন যে, ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন দিলে আজ আয়র্লণ্ড যে ব্যবহার করিতেছে, ভারত তাহা অপেক্ষাও দুর্ব্ব্যবহার করিবে। এ কথা ঠিক নহে। আয়র্লণ্ডকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিতে বিলম্ব করাতে তাহাদের মন অতিশয় তিক্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসী সত্বর স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার পাইলে তাহা করিবে না। ভারতকে এখনও স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিলে তাহারা বৃটিশ জাতির অকৃত্রিম সুহৃদ ও বন্ধু হইয়া থাকিত; কিন্তু ইংরেজ জাতির অতিরিক্ত সন্দেহ তাহাদিগের এই কার্য্য-সাধনের প্রবল অন্তরায় হইয়াছে।

ভারতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা

ভারতের নানা স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা যে ভাবে ব্যাপকতা লাভ করিতেছে, তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে ভয়ে-দুশ্চিন্তায় স্তম্ভিত হইতে হয়। ইদানীং ভারতের কয়েক স্থানে যে ভাবে এই অশান্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, কতকগুলি কুচক্রী লোক দুরভিসন্ধিপ্রযুক্ত দুষ্টপ্রকৃতি অদূরদর্শী লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া এইরূপ বিভ্রাট ঘটাইতেছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদে পুলিশকে অগত্যা উচ্ছৃঙ্খল জনতা লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। যাহারা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া জনসাধারণকে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উত্তেজিত করিতেছে, তাহাদের কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু অনেক সময় ইহাদিগকে ধরিতে পারা যায় না—যেন গভীর জলের মাছ! বাঙ্গালায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও প্রচণ্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লুটপাট হইয়াছে। সহস্র সহস্র নিরস্ত্র নিরীহ প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সামন্ত রাজার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। হিন্দু সভা, কংগ্রেস এবং মস্লেম লীগ ইহারপ্রতিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই অশান্তি নিবারিত না হইলে ইহা ক্রমশঃ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইবে। সরকার কি করেন, তাহা দেখিবার বিষয়। এরূপ দাঙ্গা ঘটিবে, ইহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারা উচিত ছিল। মেঘসঞ্চারের কারণ অনেকেই পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এখন প্রেমালিঙ্গনের জন্য বাহু প্রসারিত করিবার উপদেশ প্রদানে কিরূপ সুফল লাভ হইবে?

তরুণীর শিক্ষা-সাফল্য

কুমারী বাণী ঘোষ নেপাল সরকারের চিকিৎসক এবং নেপাল রাজধানী কাটমুণ্ডের ডাক্তার কাপ্তেন জে, এন, ঘোষের কন্যা। কুমারী বাণী ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল; তখন তাহার বয়স ১০ বৎসর ৭ মাস। সংপ্রতি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সে ১২ বৎসর ৭ মাস বয়সে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এত অল্প বয়সে অন্য কোন বালিকা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। আমরা কুমারী বাণীর ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য কামনা করিতেছি।

সহকারী ভারতসচিবের আশ্বাস

ডিউক অব ডিভনশায়ার এখন ভারত-সচিবের সহকারী। তিনি বৃটেনের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়েরও চান্সেলার। সম্প্রতি তিনি লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ভারত সরকারের শাসন-কার্য্য বৃটিশ সরকারের পরিচালনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভারতের হিতার্থই ভারত কর্ত্তৃক ভারতেই পরিচালিত হইবে,—ইহাই বৃটিশের অভিপ্রেত; এ কথা তিনি বৃটিশ সরকারের সম্পূর্ণ সম্মতি লইয়া প্রকাশ করিতেছেন। ডিউক অব ডিভনসায়ারের এই উক্তি রাজনীতিক কুটিল ভাষারই যেন অভিব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে By India for India এবং in India বলিতে কি বুঝায়? যদি ইহাতে By the Indians for the Indians in India বুঝায়, তাহা হইলে তাহা স্পষ্ট ভাবে বলিলে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যাইত।

ভারতে বিদেশীয়দিগের মূলধনে এবং বিদেশীদিগের পরিচালনাধীনে যে সকল কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ভারতবাসীরা এক কপর্দ্দকও যাহার লভ্যাংশ পায় না,—এ-কালে ইংরেজের নিকট তাহা 'ভারতীয়' বলিয়াই পরিগণিত হয়। সেইরূপ 'ভারত কর্ত্তৃক' বলিতে আমরা কি বুঝিব? খাঁটি ভারতবাসী কর্ত্তৃক, না ভারতপ্রবাসী ভিন্ন দেশের লোক কর্ত্তৃক বুঝিব? সমস্যা এইখানেই দেখা যাইতেছে, কি ভারতের বড়লাট, কি ভারত-সচিব, কেহই ঐ কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহিতেছেন না।—এ অবস্থায় ভারত-সচিবের সহকারীর কথায় এ দেশের লোক কিরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারে? তাহার উপর তাঁহার কথায় বা ভাষায় যদি সরলতার অভাব থাকে, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে এ দেশবাসীর সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের জন্যই (For India) ভারতের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে, এ কথার মর্ম্মও ঠিক বুঝা যাইতেছে না। বৃটেনের স্বার্থের জন্য আর ভারতের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে না,—ইহাও উহার অর্থ হইতে পারে। কিন্তু যে সকল বিদেশী অর্থাৎ মার্কিণ, সুইডিস, বৃটিশ, জাপানী প্রভৃতি জাতি ব্যবসায়-কার্য্যাদি পরিচালিত করিতে ভারতে আসিবেন, এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য কারবার ফাঁদিবেন, কেবল তাহাদিগকেই বুঝাইবে না কি?

এই ভ্রান্ত ধারণা পরিহারের জন্য আমাদের মনে হয়, 'ভারত' এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'ভারতবাসী' এই কথা বলিলেই সঙ্গত হইত। যে দেশে প্রবাসী বিদেশীরা কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া কিছু কাল বাস করিতে আসেন, তাঁহারাও আইন অনুসারে তাঁহাদের আনুপাতিক সংখ্যা ছাড়াইয়া অনেক অধিক সদস্য ব্যবস্থা পরিষদে পাঠাইবার অধিকার পাইয়া থাকেন, সে দেশে লোকের মনে এইরূপ সন্দেহের উদ্ভব কোন মতেই অস্বাভাবিক বলা যায় না। যে দেশে কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের দ্বারা গজাইয়া তোলা সাম্প্রদায়িক বিবাদের অবসান না হইলে দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকার দিব না, এই কথা বলা হইয়া থাকে, সেখানে স্পষ্ট ভাষার কথা না বলিলে লোক ~~হয় ত বক্তার~~ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল বুঝিতে পারে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



২০শ বর্ষ]　　আষাঢ়, ১৩৪৮　　[৩য় সংখ্যা

পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর

৮

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব প্রবন্ধগুলিতে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, ভাট্ট ও প্রাভাকর সম্প্রদায়ের মীমাংসকগণের পক্ষে ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলিতে অন্য কোন আপত্তি থাকিতে পারে না; কেবল পাছে ঈশ্বরকে স্রষ্টৃরূপে স্বীকার করিলে তাঁহাকে বেদকর্ত্তা বলিয়াও মানিয়া লইতে হয়, এই আশঙ্কায় ভাট্ট-প্রাভাকরগণ তাঁহার জগৎকর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। যদি বেদকে নিত্য-অপৌরুষেয়-অকৃতক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ভাট্ট-প্রাভাকরগণও ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব স্বীকারে সম্মত আছেন।

এখন কথা উঠিতে পারে, যদি ভাট্ট-প্রাভাকরগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগৎকারণত্বই স্বীকার করিতে সম্মত, তখন বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, তাঁহারা ঈশ্বরের শরীর (বিগ্রহ)-ও মানিতে রাজি কি না। কারণ, বিগ্রহধারী পুরুষ না হইলে তাঁহার পক্ষে সৃষ্টি করাই সম্ভব নহে। কিন্তু কুমারিল, পরমাণু-কারণবাদ খণ্ডন-প্রসঙ্গে যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ঈশ্বর-শরীরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নহে। ভট্টপাদের এই যুক্তিজাল অধ্যাপক কীথ যে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে। কীথ বলিয়াছেন—'জড়পদার্থ সৃষ্টির পূর্ব্বে স্রষ্টা বা প্রজাপতির অস্তিত্ব (ও তাহার আনুষঙ্গিকরূপে প্রজাপতি-শরীরের অস্তিত্ব) তিনি (কুমারিল) উপহাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন। আবার শরীর না থাকিলে তিনি সৃষ্টির ইচ্ছাই বা পোষণ করিবেন কিরূপে? যদি (সৃষ্টির পূর্ব্বে) তাঁহার শরীর ছিল বলিয়াই ধরা হয়, তাহা হইলে অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার সৃষ্টি-ক্রিয়ারম্ভের পূর্ব্বেও জড়পদার্থের সত্তা ছিল। আর তাহাই যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অন্য শরীরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার পক্ষে কোন যুক্তিই থাকে না (অর্থাৎ তাহা হইলে প্রজাপতির স্রষ্টৃত্বই ব্যাহত হইয়া যায়)' (১)।

সুনিপুণ যুক্তি। কিন্তু এ স্থলেও আমাদিগের ভুলিলে চলিবে না যে, নৈয়ায়িকগণ স্রষ্টার যে নিত্য বিগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন, কুমারিল কেবল তাহারই নিষেধ

(১) "He (Kumārila) ridicules the idea of the existence of Prajāpati before the creation of matter; without a body how could he feel desire? If he possessed a body, then matter must have existed before his creative activity, and there is no reason to deny then the existence of other bodies."—Keith, Karmamīmāmsā, First Ed., p. 62.

করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ অনুমান প্রমাণের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা যতদূর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই দিন না কেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদিগের এই অনুমান-প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, তাহাই মাত্র অনুমানের বিষয় হইতে পারে—অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষাযোগ্য বিষয়ে নির্দ্দোষ অনুমান সম্ভব নহে (২)। মানবের প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানে এ পর্য্যন্ত কোন নিত্য শরীরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই কারণেই কুমারিল বলিয়াছেন, ঈশ্বরের নিত্য বিগ্রহের অস্তিত্ব কেবল অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধ করা অসম্ভব। কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে, বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য, ও সেই বেদে ঈশ্বরের কোনরূপ শরীরের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইলে কুমারিল তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে চাহেন না। অতএব, কেবল অনুমান-বলে ঈশ্বর-শরীর-স্বীকারের বিরোধিতাই তিনি করিয়াছেন, যথার্থপক্ষে ঈশ্বরের সশরীরত্বের নিষেধ করেন নাই। এমন কি, শ্লোকবার্ত্তিকের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে তিনি ত ঈশ্বরের কোন একরূপ শরীরের বর্ণনাই দিয়াছেন (৩)। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রুতিতে ত এরূপ বহু বাক্য আছে, যথা—"সহস্রাক্ষো গোত্রভিদ্ বজ্রবাহুঃ" (সহস্রলোচন পর্ব্বত-বিদারী বজ্রবাহু—ইন্দ্র) ইত্যাদি (৪)। এই সকল বাক্য পড়িলে ত স্পষ্টই মনে হয়, দেবতাদিগের শরীর নিশ্চয়ই আছে। তবে কেন মীমাংসকগণ 'দেবতাধিকরণে'র (৫) ব্যাখ্যায় বলিয়া বসিলেন যে, দেবতাদিগের বাহ্য শরীর নাই?

এ স্থলে ইহা প্রথমেই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে এই অধিকরণের মুখ্য প্রতিপাদ্য কি? দেবতার বিগ্রহ নিরাকরণ করাই কি অধিকরণটির মূল তাৎপর্য্য, না অন্য কিছু? অধিকরণের চতুর্থ সূত্রে মহর্ষি জৈমিনি তাঁহার আশয় স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সূত্রটি এইরূপ—

"অপি বা শব্দপূর্ব্বত্বাদ্ যজ্ঞকর্ম্ম প্রধানং স্যাদ্ গুণত্বে দেবতাশ্রুতিঃ।" (পূঃ মীঃ সূঃ ৯।১।৯)

সূত্রটির সরলার্থ এই—'অথবা শ্রুতিবাক্য হইতে সাক্ষাৎ জ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া যজ্ঞকর্ম্মই প্রধানভূত, আর দেবতাবাচক শ্রুতিবাক্যগুলি গৌণ'। অর্থাৎ শ্রুতির বিধিবাক্য ও তাহার সহিত একবাক্যতাপন্ন ফলপ্রতি-পাদক অর্থবাদ-বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, বৈদিক যজ্ঞক্রিয়া (ইহাই 'ধর্ম্ম' নামে প্রসিদ্ধ) বা তাহার সূক্ষ্মাবস্থা অপূর্ব্বই সাক্ষাৎ ফলপ্রদ। অতএব, শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে বলিতে হইবে, অপূর্ব্বই ফলের মুখ্য প্রয়োজক। আর যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে দ্রব্য ও দেবতা—দুই-ই সম পর্য্যায়ে পড়ে। অতএব, ফলের উৎপত্তির প্রতি যজ্ঞ-সাধন সোমাদি দ্রব্য যেমন গৌণ কারণ, যজ্ঞে সম্প্রদানভূত ইন্দ্রাদি দেবতাও সেইরূপ গৌণ প্রয়োজক মাত্র। শ্রুতি বলিয়াছেন—"স্বর্গকামো যজেত"। এ স্থলে যাগই স্বর্গরূপ ফলের মুখ্য প্রয়োজক—ইহাই মীমাংসকমতে শ্রুতির তাৎপর্য্য। সোমাদি যে সকল দ্রব্য শ্রৌত যজ্ঞের সাধন, সে সকল সাধনদ্রব্য মূল যজ্ঞের অঙ্গমাত্র—অতএব যজ্ঞক্রিয়ার তুলনায় ফলোৎপত্তির প্রতি গৌণ প্রয়োজক মাত্র। ঠিক সেইরূপ যজ্ঞে ইন্দ্র প্রভৃতি যে সকল দেবতার উদ্দেশে

---

(২) পূর্ব্বে কোন পদার্থসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনও না জন্মিলে সেই পদার্থের আনুমানিক জ্ঞানও জন্মিতে পারে না। যে ব্যক্তি জীবনে কখনও অগ্নি দেখেন নাই, অগ্নি কি পদার্থ—প্রত্যক্ষতঃ তাহা জানেন না, সে ব্যক্তির পক্ষে ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান করা অসম্ভব। হেতু-সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান-দ্বারা পূর্ব্বানুভূত সাধ্য-পদার্থেরই অনুমান হইয়া থাকে।

(৩) "বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদীদিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে"॥—শ্লোঃ বাঃ প্রথম শ্লোক। এই মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি ভট্টপাদের স্বরচিত কি না বলা কঠিন। কারণ, শ্রীশ্রী৺সপ্তশতী চণ্ডীর কীলকস্তবের প্রারম্ভেও এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়। পরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

(৪) জৈমিনীয়-ন্যায়মালা (৯।১।৬-১০) দ্রষ্টব্য।

(৫) এই অধিকরণটির যথার্থ নামকরণ মাধবাচার্য্য করিয়াছেন, জৈমিনীয়-ন্যায়মালামধ্যে—"ধর্ম্মাণামদেবতাপ্রযুক্তত্বাধিকরণম্"। ইহাতে বলা হইয়াছে অপূর্ব্ব (বা ধর্ম্মই) ফলদাতা, দেবতা নহেন। বিগ্রহ-প্রতিপাদক মন্ত্র বা অর্থবাদের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই। "বিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রতিপাদকয়োর্মন্ত্রার্থবাদয়োঃ স্বার্থে তাৎপর্য্যাভাবাৎ। ...বিগ্রহাদিমদ্দেবতাবাক্যপি ন বিনা কর্ম্মণা ফলমভ্যুপৈতি।... তথা সত্যগ্ন্যাদিদেবতাভাবেঽপ্যপূর্ব্বপ্রযুক্তধর্ম্মাণামতিদেশাদস্তি তত্রোহস্যাবকাশঃ"—জৈঃ ন্যাঃ মাঃ ৯।১।৬-১০।

দ্রব্যপ্রদানরূপ হোমকর্ম্ম করা যায়, সেই সকল দেবতাও যজ্ঞেরই অঙ্গভূত—অতএব, সাধনদ্রব্যের ন্যায় তাঁহারাও ফলোৎপত্তির প্রতি গৌণ প্রয়োজক মাত্র (৬)।

এই সূত্রটির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে স্পষ্টই মনে হয় যে, দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা মহর্ষির অভিপ্রেত নহে। দেবতাগণ যজ্ঞের অঙ্গভূত—ইহা প্রতিপাদন করাই তাঁহার হৃদ্‌গত অভিপ্রায়। কারণ, তিনি ঐ অধিকরণের কোন একটি সূত্রেও দেবতা-শরীরের প্রতিষেধ করেন নাই। যদি ইহাই মহর্ষির যথার্থ আশয় হয়, তবে পরবর্ত্তী যুগের মীমাংসকগণ উক্ত অধিকরণে কেন দেবতা-শরীরের নিষেধ করিয়া বসিলেন, তাহার নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এই বিবেচনার পূর্ব্বে আনুষঙ্গিক ভাবে উত্তরমীমাংসার দেবতাধিকরণ-গত কয়েকটি সূত্রের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উহার একটি সূত্র এইরূপ—

"বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৭)।

ইহার সরলার্থ—যদি মনে কর, যজ্ঞকর্ম্মে বিরোধ উৎপন্ন হইবে, তাহা ঠিক নহে; কারণ, (শ্রুতি ও স্মৃতিতে) দেখিতে পাওয়া যায় যে, (একই দেবতা) বহু (দেহ) ধারণ করিতে পারেন। সূত্রটির তাৎপর্য্য এই—যদি ইন্দ্রাদিদেবতার শরীর স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যজ্ঞাঙ্গ হিসাবে তাঁহারা সশরীরেই যজ্ঞে সন্নিহিত হন (৭)। কিন্তু তাহা হইলে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ, প্রথমতঃ, যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রাদিদেবতার সন্নিধি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; দ্বিতীয়তঃ, এক সময়ে বহু স্থলে একই ইন্দ্রদেবতাক যাগের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে পরিচ্ছিন্ন-শরীরধারী একই ইন্দ্রদেবতার পক্ষে যুগপৎ ঐ সকল যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিতি নিতান্ত অসম্ভব। ইহাই হইল সূত্রটির পূর্ব্বপক্ষ অংশ। এই অংশে শ্রীশঙ্করাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষীর মতে দেবতার বাহ্য শরীর নাই। কারণ, শরীর স্বীকার করিলে যজ্ঞাঙ্গ বলিয়া দেবতাদিগের শরীরেরও যজ্ঞক্ষেত্রে আবির্ভাব অপরিহার্য্য হইত। দেবতা যজ্ঞের অঙ্গভূত—পূর্ব্বপক্ষের এই ভাবটি অবশ্য মহর্ষি জৈমিনির সূত্র হইতেই গৃহীত; আর এই কারণে হয় ত কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, দেবতাদিগের শরীরের অভাবও মহর্ষির মতানুকূল। বিশেষতঃ, সূত্রটির সিদ্ধান্তাংশে ("অনেকপ্রতিপত্তে-র্দর্শনাৎ") ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে, মহর্ষি বাদরায়ণের মতে দেবতার বিগ্রহ আছে। কারণ, দেবতার বিগ্রহ স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোত্থাপিত আপত্তি দুইটি টিঁকে না। শরীরী দেবতার পক্ষেও যুগপৎ অনেক যজ্ঞে সন্নিধি সম্ভব—এ বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতিতে বহু প্রমাণ আছে। উত্তর-মীমাংসার এই সিদ্ধান্তদর্শনেই সহসা অনুমান করা উচিত নহে যে—ইহা যখন বেদান্ত-মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত, তখন ইহার পূর্ব্বপক্ষটি নিশ্চয়ই মীমাংসা-মতানুসারী। আর সিদ্ধান্তে যখন দেবতার শরীর স্বীকৃত হইয়াছে, তখন উহার বিরোধী পূর্ব্বপক্ষে নিশ্চয়ই দেববিগ্রহ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, মীমাংসা-মতে দেবতার শরীর নাই। কিন্তু এইরূপ অনুমান করা খুবই অযৌক্তিক হইবে। কারণ, বেদান্তদর্শনের উক্ত সূত্রটির পর আর তিনটি সূত্র বাদ দিলেই একটি সূত্র পাওয়া যায়—

"মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩১)

ইহার সরলার্থ—মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে দেবতাদিগের অধিকার-সম্ভাবনা (শ্রুতিতে উক্ত) না হওয়ায় (ব্রহ্মবিদ্যাতেও) তাঁহাদিগের অধিকার নাই—ইহাই মহর্ষি জৈমিনির মত। অর্থাৎ—জৈমিনি-মতে দেবতারা

(৬) "স্বর্গকামো যজেত" ইতি শব্দেন বিধেয়স্য যাগস্য ফল-প্রদত্বাবগমাৎ। দ্রব্যদেবতে তু সিদ্ধত্বেন সিদ্ধানহে। তত্র যথা দ্রব্যস্য বিধেয়ং প্রতি গুণত্বং তথা দেবতায়া অপি"—জৈঃ ন্যাঃ মাঃ।

(৭) যজমান, ঋত্বিক্‌, সাধনদ্রব্যাদি ও সম্প্রদানভূত দেবতা প্রভৃতি সকলেই যজ্ঞের অঙ্গভূত। এ স্থলে একটা কথা—ঋত্বিক্‌ প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্মে সন্নিহিত থাকিলে তবেই তাঁহারা যজ্ঞের অঙ্গরূপে গণ্য হইয়া থাকেন, নতুবা অসন্নিহিত থাকিলে তাঁহাদিগের অঙ্গত্বই সিদ্ধ হয় না। সেইরূপ দেবতাকে যজ্ঞের অঙ্গ বলিয়া প্রমাণ করিতে হইলে যজ্ঞস্থলে দেবতার উপস্থিতি স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথা যজ্ঞে অনুপস্থিত দেবতা সেই যজ্ঞের অঙ্গভূত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় যদি দেবতার শরীর আছে বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যজ্ঞস্থলে সশরীর দেবতারই আবির্ভাব ঘটে। "যদি বিগ্রহ-বত্ত্বাভ্যুপগমেন দেবাদীনাং বিদ্যাস্বধিকারো বর্ণ্যেত বিগ্রহবত্ত্বাৎ ঋত্বিগাদিবদিন্দ্রাদীনামপি স্বরূপসন্নিধানেন কর্ম্মাঙ্গভাবোহভ্যুপগম্যেত, তদা চ বিরোধঃ কর্ম্মণি স্যাৎ"—ইত্যাদি, শাঙ্করভাষ্য, ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৭।

ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকারী কেন, তাহার কারণ দেখাইতে গিয়া বলা হইয়াছে, মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে দেবতাদিগের অধিকার নাই—কেবল এই কারণেই তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাতেও অনধিকারী। শরীর নাই বলিয়া তাঁহারা অনধিকারী—এ কথা জৈমিনি বলেন নাই ; যদি সত্য সত্যই জৈমিনির সিদ্ধান্তে দেবতাদিগের শরীর না থাকিত, তাহা হইলে জৈমিনি-মতানুযায়ী এই পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রটি রচনারই আবশ্যক হইত না। কারণ, শরীর না থাকিলে যে বিদ্যা অভ্যাস করা যায় না—ইহা ত সাধারণ বুদ্ধির কথা। উহা বুঝাইবার জন্য আর মধুবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতির তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন কি? এই কারণে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, দেবতার বিগ্রহ-নিষেধে জৈমিনিসূত্রের তাৎপর্য্য নাই।

আর এক কথা। পার্থসারথি মিশ্র 'শাস্ত্রদীপিকা'য় বলিয়াছেন—'যদি এ কথা স্বীকার করাও যায় যে, দেবতারা বিগ্রহবিশিষ্ট ও তাঁহারা যজ্ঞে প্রদত্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ ও ভোজন করিয়া তৃপ্ত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে, যাগ হইতেই ফল উৎপন্ন হয় ; কারণ, বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতাগণ অনিত্য—অতএব তাঁহারা নিত্য বেদের বিষয় হইতে পারেন না। ইহার উপর যদি প্রশ্ন করা যায় যে, বেদে ত অনেক অনিত্য বিষয়েরও উল্লেখ দৃষ্ট হয় ; সে সকল অনিত্য পদার্থ যদি নিত্য বেদের বিষয় হইতে পারে, তাহা হইলে আর অনিত্য-বিগ্রহ-বিশিষ্ট দেবতার পক্ষে নিত্য বেদের বিষয় হইতে বাধা কি? তাহার উত্তরে বলা চলে, দেবতার বিগ্রহ স্বীকার করিলেও তাঁহাদিগের উদ্দেশে প্রদত্ত হবিঃ প্রভৃতি যজ্ঞভাগ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহা ত প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ; আর তাহা হইলে উক্ত যজ্ঞভাগ দেবতাগণ ভোগ করেন—এরূপ কল্পনা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ বলিয়া আমাদিগের বুদ্ধির অতীত। আর ভোগ না হইলেও যে দেবতাগণ প্রসন্ন হইবেন—ইহাও ত যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব অপূর্ব্ব ফলদাতা, ইহা স্বীকার না করিয়া দেবতার প্রসাদেই ফললাভ হয়, ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মত এইরূপেই নিরস্ত হইল', ইত্যাদি (৮)। এ স্থলে পার্থসারথির অন্য বক্তব্য যাহাই থাকুক, তিনি অন্ততঃ তর্কের খাতিরেও দেবতার শরীর স্বীকার করিয়াছেন। 'জৈমিনীয়ন্যায়মালায়' যেমন দেবতার বিগ্রহ একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, 'শাস্ত্রদীপিকা'য় তাহা করা হয় নাই (৯)। দেবতার শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াও পার্থসারথি অপূর্ব্বের ফলদাতৃত্ব পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, অপূর্ব্বের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যাইয়া মীমাংসকগণ কেহ কেহ একরূপ গায়ের জোরে দেবশরীর অস্বীকার করিলেও উহা তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের স্বারসিক অভিপ্রায় নহে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—আচ্ছা, অপূর্ব্বের প্রাধান্য না হয় সিদ্ধই হইল, তৎসত্ত্বেও ত দেবতার গৌণভাবে অবস্থিতি সম্ভব ; তবে মীমাংসকগণ একেবারে দেবতা ও দেববিগ্রহ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে গিয়াছেন কেন? ইহার মধ্যে কি কোনই গূঢ় উদ্দেশ্য নাই? তাহার উত্তরে বলা চলে—হাঁ, আছে। মীমাংসকগণ অনেকটা দায়ে ঠেকিয়াই নাস্তিক সাজিয়াছেন—নতুবা তাঁহারা অন্তরে অন্তরে যথার্থই আস্তিক। মীমাংসক-সিদ্ধান্তে বেদমন্ত্রের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দ, বর্ণ এমন কি স্বর পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তনীয়। মন্ত্রমধ্যস্থ একটি স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, একটি বর্ণও বাদ পড়িলে বা উল্টাইয়া যাইলে, অথবা একটি শব্দের পরিবর্ত্তে তাহার পর্য্যায় আর

(৮) "যদ্যপি দেবতা বিগ্রহবতী পরিগৃহ্য ভুক্ত্বা তৃপ্যতি প্রসীদতি চ তথাপি যাগাদেব ফলং, বিগ্রহবতী চানিত্যা স্যাৎ তথা চ নিত্যবেদবিষয়ত্বং ন স্যাৎ।"—পার্থসারথিমিশ্র, শাস্ত্রদীপিকা ৯।১।৬-১০ (অধিঃ ৪)। ইহার ব্যাখ্যায় 'ময়ূখমালিকা' বলিতেছেন—"বিগ্রহাদিমত্ত্বেঽপি ন প্রাধান্যমিত্যুক্তম্। [illegible] বজ্রহস্তাদ্যুপলক্ষিতবিগ্রহবিশিষ্টাত্মবিশেষবাচিত্বেঽপি বিগ্রহস্য কৃতকত্বেনানিত্যতয়া তদ্বিশিষ্টদেবতাপ্যনিত্যেতি ন নিত্যবেদবিষয়ঃ স্যাৎ"। অর্থাৎ ময়ূখমালিকার মতে 'ইন্দ্র' দেবতা বলিতে বজ্রহস্ত প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত শরীরবিশিষ্ট আত্মবিশেষ। কিন্তু ইন্দ্রের বিগ্রহ উৎপত্তিশীল বলিয়া ধ্বংসশীল, অতএব অনিত্য। আর অনিত্য সেই শরীরবিশিষ্ট বলিয়া ইন্দ্রও অনিত্য। অনিত্য হউন, ক্ষতি নাই ; কিন্তু ইন্দ্রের শরীর ত ময়ূখমালিকা-কার স্বীকার করিতেছেন—ইহাই এ স্থলে দ্রষ্টব্য। পুনরায়—"সত্যপি বিগ্রহে প্রবৃত্তস্য হবিষো দেবতয়া ভোগঃ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধোঽশক্যোঽভ্যুপগন্তুম্। ন চাভুঞ্জানা প্রসীদতীতি যুক্তম্। অতএবাপ্রতিপন্নাপূর্ব্বত্যাগেন দেবতাপ্রসাদাদেব ফলমিত্যেতদপি নিরস্তম্"।—শাস্ত্রদীপিকা। এ স্থলে শাস্ত্রদীপিকা-কার স্পষ্ট দেবশরীরের সত্তা স্বীকার করিতেছেন।

(৯) পঞ্চম-সংখ্যক ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

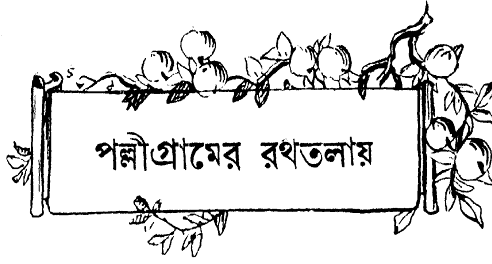
একটি শব্দ ব্যবহৃত হইলে মন্ত্রটি দুষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ উহার আর অভিপ্রেত ফলদানের শক্তি থাকে না (১০)। অতএব, প্রত্যেক মন্ত্রের যথাযথ সুপরিশুদ্ধ উচ্চারণ যজ্ঞে একান্ত প্রয়োজন। যজ্ঞস্থলে দেবতা সশরীরে আসিলেন কি না, যজমান ও ঋত্বিগ্‌গণের তাহা দেখিবার কোনও প্রয়োজন নাই; কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণে তাঁহারা কোনরূপ ভ্রম না করেন, সে বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়ার উপদেশ আছে। দেবতাগণ যে শরীরধারী পুরুষবিশেষ—তাঁহাদিগের এই ব্যক্তিগত দিক্‌টির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাঁহাদিগের নাম-রূপ-গুণাদির অভিধায়ক মন্ত্রগুলির শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি দৃষ্টি রাখাই ঋত্বিগ্‌গণের একান্ত কর্ত্তব্য—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের রহস্য বলিয়া বোধ হয়। আর এই কারণেই সাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, মীমাংসক-মতে দেবতা নামমাত্রেই পর্য্যবসিত। আর এই বিশ্বাস একেবারে অমূলকও নহে। কারণ, কোন কোন মীমাংসা-গ্রন্থেও এরূপ বলা হইয়াছে যে, দেবশরীর মন্ত্রময়—ইন্দ্র ও ইন্দ্র-স্তুতিপর মন্ত্র অভিন্ন। এমন কি, ব্যাপার এতদূরও গড়াইয়াছে যে, কোন কোন মীমাংসক বলিয়াছেন—'ইন্দ্র' শব্দটি ব্যতীত ইন্দ্রের পৃথক্ কোন সত্তাই নাই। এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য নব্য মীমাংসকগণ অবশ্য বহু যুক্তিজাল-প্রয়োগে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, দেবতাবিগ্রহের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অন্যান্য মীমাংসক-সিদ্ধান্তসমূহে কি কি দোষ ঘটিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদিগের এই চেষ্টা সত্ত্বেও বেশ বুঝা যায় যে, দেবতার অস্তিত্ব নিষেধে তাঁহাদিগের ততদূর আগ্রহ নাই, যতদূর আগ্রহ দেবতার নামবিশিষ্ট মন্ত্রের প্রাধান্য স্থাপনে। অর্থাৎ এক কথায়, তাঁহারা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় 'নামী' অপেক্ষা 'নামে'র মাহাত্ম্য খ্যাপনে বিশেষ উন্মুখ। কিন্তু তাহা বলিয়াই যে তাঁহারা বলিতে চাহেন, নাম ব্যতীত নামীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই, এরূপ ধারণা করাও ঠিক নহে। যদি তাঁহাদিগের যথার্থ অভিপ্রায় ইহাই হইত যে, নাম ব্যতীত দেবতার পৃথক্ সত্তা নাই, তাহা হইলে 'স্তোত্র-শস্ত্রাধিকরণে' (১১) তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেই পারিতেন না যে, 'মন্ত্র (স্তোত্র ও শস্ত্র) দেবতার স্বরূপের স্মারক নহে, পরন্তু স্তোতব্য দেবতার সহিত স্তুতির হেতুভূত গুণাবলীর সম্বন্ধের অভিধায়ক'; অর্থাৎ সরল ভাষায় বলিতে গেলে মন্ত্র দেবতাদিগের গুণকীর্ত্তন করে মাত্র। যদি দেবতা নাম-(অর্থাৎ শব্দ)-মাত্রই হন, তাহা হইলে মন্ত্রসমূহে দেবগণের যে সকল গুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সেই সকল গুণ ঐ সকল শব্দমাত্রেই আশ্রিত, ইহা কল্পনা করিতে মীমাংসকগণ অগত্যা বাধ্য হইবেন। ইন্দ্র বজ্রধারী, বৃত্রহন্তা প্রভৃতি বলিলে বুঝিতে হইবে, ঐ সকল গুণ ইন্দ্র-নাম-ধারী পুরুষবিশেষের নহে, 'ইন্দ্র'-শব্দটিতেই ঐ সকল গুণ বর্ত্তমান। কিন্তু শব্দ ত স্বয়ং গুণবিশেষ। উহাতে ত অন্য গুণ থাকিতে পারে না। গুণের আধার হওয়া চাই দ্রব্য। বিশেষতঃ, দেবতার নামটিতেই দেবতার সকল গুণ বর্ত্তমান—ইহা কল্পনা করাও যে সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব।

বোধ হয়, এই সকল কারণে—যাহাতে বেদমন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধার আতিশয্যের উদ্রেক ঘটে ও বেদ-মন্ত্রের পরিশুদ্ধি যাহাতে চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই নিগূঢ় উদ্দেশ্যেই মীমাংসকগণ বলিয়াছেন—মন্ত্র ও দেবশরীর অভিন্ন। কিন্তু, বস্তুতঃ এরূপ অভেদ নাই। মীমাংসক-গণের স্বারসিক সিদ্ধান্তে দেবতাদিগের দেহ আছে। সোমনাথের 'ময়ূখমালিকা'-ও বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথের 'সেশ্বর-মীমাংসাদর্শন' এ বিষয়ে প্রমাণ। এ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(১০) মন্ত্রো হীনঃ (দুষ্টঃ শব্দঃ) স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।—শিক্ষা, ৫২,—মহাভাষ্যে ধৃত ১।১।১

(১১) জৈঃ সূঃ ২।১।১৩-২৯ (অধিঃ ৫)—স্তোত্রাদিপ্রাধান্যাধিকরণ।



(পুরাতন পল্লী-প্রসঙ্গ)

"রথযাত্রা—লোকারণ্য, মহা ধূমধাম,
যাত্রীরা লুটায়ে ভূমে করিছে প্রণাম।
রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি,
মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব—হাসে অন্তর্য্যামী।"

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা পাঠে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর মনে আঘাত লাগিবারই কথা। হিন্দু রথে উপবিষ্ট মূর্ত্তিকেই অন্তর্য্যামী, উপাস্য দেবতা জ্ঞানে পূজা করে; কিন্তু কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, মূর্ত্তিটি পুত্তলিকা মাত্র! তাই তিনি যাত্রীদের অজ্ঞতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া অন্তর্য্যামীকে হাসাইয়াছেন! কিন্তু ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের প্রকৃত মনোভাব কি, যাত্রীদের ভক্তির আতিশয্যে তাহাদিগকে ভ্রমান্ধ বিবেচনা করিয়া তিনি অবজ্ঞার হাসি হাসেন কি না, তাহা বোধ হয়, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন কবিরও বুঝিবার শক্তি নাই; কিন্তু তিনি উপহাসের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই! যাত্রীদেরই দুর্ভাগ্য।

হিন্দু যে মূর্ত্তিতে ঈশ্বরত্বের আরোপ করে, সেই মূর্ত্তিকে সাধারণ পুত্তলিকা বলিয়া অবজ্ঞা করিবার অভ্যাস অনেকেরই আছে, এবং পূর্ব্বেও ছিল। আমি ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি; তখন রবীন্দ্রনাথ একবিংশতি বর্ষীয় যুবক, এ কবিতা তখন তাঁহার লেখনী-মুখে বাহির হয় নাই; আমরা তখন দ্বাদশবর্ষীয় বালক। সে সময় আমাদের গ্রামের উত্তরে শান্তিরাজপুরে, এবং দক্ষিণে বল্লভপুরে খৃষ্টানদিগের 'কলোনী' স্থাপিত হয় নাই। সে সময় নদীয়ার সদর হইতে কোন কোন শ্বেতাঙ্গ মিসনারী বর্ষাকালে নৌকাযোগে আমাদের মহকুমায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিতেন; তাঁহাদের সঙ্গে থাকিত—স্যামুয়েল বিশ্বাস, ডানিয়েল রাহা, যোহন মণ্ডল, এবং পিটার প্রামাণিক প্রভৃতি এদেশী ধর্ম্মপ্রচারকের দল। প্রতি-বৎসর রথের সময় তাহারা আমাদের গ্রামের রথতলায় যিশুর সুসমাচার প্রচার করিতে আসিত; কিন্তু হিন্দুর দেব-দেবীর কুৎসা-প্রচারেই তাহাদের বক্তৃতা শেষ হইত।

আমি যে-বৎসরের কথা বলিতেছি, সেই বৎসর রথের দিন অপরাহ্ণ কালে আমার ছোট কাকার সঙ্গে রথ দেখিতে রথতলায় আসিলাম। আমার ছোট কাকা কৃষ্ণনগরে আমার বাবার বাসায় ছিলেন। রথের দিন সকালে তাঁহার খেয়াল হইল—বাড়ী আসিয়া গ্রামের রথ দেখিবেন। তাঁহার একটি বন্ধু শ্রীশচন্দ্র দত্তও কৃষ্ণনগরে তাঁহার কাকার বাসায় ছিলেন; তাঁহার কাকা কেদারনাথ দত্ত কৃষ্ণনগরে মোক্তারী করিতেন। কৃষ্ণনগর হইতে আমাদের গ্রামের দূরত্ব পনের ক্রোশ। এই দীর্ঘ পথে একাকী চলিতে ইচ্ছা না হওয়ায় কাকা তাঁহার সেই বন্ধুটিকেও সঙ্গে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীশ বাবুরও বাড়ী আসিবার ইচ্ছা ছিল; তিনি কাকার প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হওয়ায় বেলা আটটার সময় স্নান ও কিঞ্চিৎ জলযোগ শেষ করিয়া দুই বন্ধু কাপড় ও জামার এক-একটি বাণ্ডিল কোমরে বাঁধিয়া, ছত্রহস্তে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। আষাঢ় মাস, আকাশে মেঘ ছিল, এবং বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টিপাতও হইতেছিল; এই অবস্থায় তাঁহারা উভয়ে চলিতে আরম্ভ করিয়া, সুদীর্ঘ পনের ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়া যখন বাড়ী আসিলেন, তখন বেলা প্রায় তিনটা। সাত ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহারা এই পনের ক্রোশ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিলেন।

ঠাকুরদাদা তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি মধ্যাহ্নের নিদ্রা শেষ করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া ধূমপান করিতেছিলেন; সেই সময় ছোট কাকাকে হঠাৎ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি কাকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কি রে, চিঠি-পত্র লেখা নেই, হঠাৎ বাড়ী

চলে এলি! বাসার সব ভাল ত?"—আমি তখন বাড়ীতে ঠাকুরদাদার কাছে থাকিয়া গ্রামের স্কুলেই লেখা-পড়া করিতাম। ঠাকুরদাদার কাছে দাঁড়াইয়া রথের পার্ব্বণী আদায়ের চেষ্টা করিতেছিলাম। ছোট কাকাকে বাড়ী আসিতে দেখিয়া খুসী হইলাম; ভাবিলাম, কাকার সঙ্গে যাইলে রথ দেখিবার সুবিধা হইবে।—কাকা আমাকে কোলের কাছে টানিয়া-লইয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ঠাকুরদাদাকে বলিলেন, "হাঁ, বড় দাদা ভালই আছেন। হঠাৎ মনে হ'ল, আজ রথ, বাড়ী এসে রথ দেখবো; তাই দত্তদের শ্রীশকে সঙ্গে নিয়ে সকালে বাসা থেকে বেরিয়ে প'ড়লাম।"

ঠাকুরদাদা বলিলেন, "স্নান ক'রে রওনা হ'য়েছিলি দেখ্‌ছি; তখন বেলা কত?"

কাকা বলিলেন, "হাঁ, স্নান ক'রে জল খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। রাজবাড়ীর পেটা-ঘড়িতে তখন আটটা বাজলো।"

ঠাকুরদাদা বলিলেন, "বেলা আটটার সময় বেরিয়ে বাড়ী আস্‌তে বেলা তিনটে! এত দেরী হ'ল কেন?"

কাকা একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "বাঙ্গালচিতে এসে দেখি, আজ সেখানে শনিবারের হাট ব'সেছে। ভাবলাম, কৃষ্ণনগর থেকে একটানে এতটা হেঁটে এসে ক্ষিদে পেয়েছে, এখানে কিছু খেয়ে-নিলে মন্দ হয় না। তাই হাট থেকে কিছু চিঁড়ে, দই, পাকা আম, ও আকের গুড় কিনে-নিয়ে একটা দোকানে ব'সে ফলার করা গেল। এজন্যে সেখানে কিছু বিলম্ব হ'য়েছিল। তার পর এই আস্তে-আস্তে আসছি।"

ঠাকুরদাদা কাকার মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! কৃষ্ণনগর থেকে বেরিয়ে এই ত এসেছিস্ মোটে পনের ক্রোশ রাস্তা, এই পথটুকু আসতেই পথের মধ্যে ভাঁড়ার! এ-কালের ছেলেগুলো কি একবারেই অপদার্থ? রথ দেখ্‌তে এলি, যা, হাত-মুখ ধুয়ে খানিক জিরিয়ে নে; আর একটু পরেই ত রথের টান আরম্ভ হবে।"

ঠাকুরদাদার মন্তব্য শুনিয়া কাকা একটু লজ্জিত হইলেন; বুঝিলেন, পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়াই মধ্য-পথে থামিয়া ফলার করিতে বসা বৃদ্ধদের দৃষ্টিতে অকর্ম্মণ্যের লক্ষণ! যৌবন-কালে তাঁহার শ্রীচরণযুগল কিরূপ বেগে চলিত, তাহা জানিতে আগ্রহ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, একবার মাঘীপূর্ণিমার দিন প্রভাতে নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিয়া তিন বন্ধু একত্র নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং বেলা একটার মধ্যেই বাড়ী আসিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনে ক্ষুধাশান্তি করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ হইতে আমাদের গ্রামের দূরত্ব প্রায় কুড়ি ক্রোশ!—এ সকল কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে এ-কালের যুবকগণের বোধ হয় প্রবৃত্তি হইবে না।' ট্রাম, রেলের গাড়ী, মোটর-যান তাঁহাদিগকে পঙ্গু করিয়াছে; আধ ক্রোশ হাঁটিতে হইবে শুনিলেও তাঁহাদের হৃৎকম্প হয়!

আমার মা ৭৫ বৎসর বয়সে রাত্রিকালে বিনা-চশমায় মৃৎ-প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে রামায়ণ পাঠ করিতেন। সেই সকল প্রদীপ পল্লী-গৃহস্থের গৃহেও এ-কালে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সেগুলির ভিতরে জল থাকিত, এবং ন্যাকড়ার ছিপি দিয়া তাহার ছিদ্র বন্ধ করা হইত। ন্যাকড়া দিয়া গৃহিণীরা হাঁটুর উপর শল্‌তে পাকাইতেন; শর্ষপ তৈলে ভিজিয়া সেই শল্‌তে প্রদীপে জ্বলিত। এ-কালে হ্যারিকেন লণ্ঠন ঐ সকল কাল রঙ্গের দো-থাকি মৃৎ-প্রদীপকে পল্লীগ্রাম হইতেও নির্ব্বাসিত করিয়াছে। গৃহস্থ-বধূরা বলেন, "বাঁচা গিয়াছে! প্রদীপ জলে ভিজাও, তাতে জল পোর, ছিপি দাও, শল্‌তে পাকাও, নিত্যি প্রদীপে তেল দাও,—কত ঝঞ্চাট!—আর এখন হ্যারিকেনের পল্‌তে ধরালেই আলো।"—কিন্তু গ্রামের বৈকুণ্ঠ কলু ঘানীর শর্ষের তেল দিয়া যে পয়সা লইত, সাগর-পারের 'বক' ও 'শকনী'রা (B. O. C. এবং S. O. C. N. Y.) এখন তাহার পাঁচগুণ পয়সা লইয়া যাইতেছে! —সেই মৃৎ-প্রদীপের মৃদু আলোকে মা ছুঁচে সূতা পরাইয়া রাত্রির অবসরে কাঁথা সিলাই করিতেন; এবং সেই বয়সেও চালভাজা ও ছোলা-মটর-ভাজা অনায়াসে চর্ব্বণ করিয়া হজম করিতেন। দাঁত পড়িলে মানুষ কৃত্রিম দন্ত ব্যবহার করে শুনিয়া তিনি হাসিতেন।

এক দিন আমাদের কোন প্রতিবেশীর বার বৎসর বয়স্ক পুত্র দৃষ্টিক্ষীণতা বশতঃ চোখে চশমা দিয়া আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিলে, তাহার চোখে চশমা দেখিয়া মা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়াছিলেন; তাহার পর হাসিয়া

বলিয়াছিলেন, "এদেরই ছেলেরা বোধ করি, আঁকুশি দিয়ে বেগুন-গাছ থেকে বেগুন পাড়বে!"

প্রসঙ্গক্রমে আলোচ্য বিষয় হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; এখন আমাদের গ্রামের রথতলার কথা বলি।—জমিদার মুখুয্যে-বাড়ীর বাহিরের প্রাঙ্গণে যে বিস্তীর্ণ স্থানটি ফাঁকা পড়িয়া থাকে, সেই স্থানে দোলে, রথে মেলা বসে। মুখুয্যে বাবুদের এখন ভগ্নাবস্থা; তাঁহাদের জমিদারীর অধিকাংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও কুড়ি-পঁচিশ সরিকের মধ্যে বিভক্ত। অর্থাভাবে কোন সরিকই উৎসবে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সমারোহ করিতে পারেন না। অনেক কাল পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রকাণ্ড কাঠের রথ ছিল। একবার অগ্নিকাণ্ডে সেই রথ পুড়িয়া গিয়াছিল; কেবল কাঠের চাকাগুলি ও অশ্বযুগল অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এখন প্রতিবৎসর পাঁচ-তালা বাঁশের রথ প্রস্তুত হয়, এবং চাকাগুলি ও ঘোড়া-দুইটি তাহাতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাকার সঙ্গে রথতলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মুখুয্যে বাবুদের গৃহদেবতা গোপালদেব রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট। নানাপ্রকার পত্র-পুষ্পে এবং ফুলের মালায় রথখানি বিভূষিত। আঙ্গিনার অদূরবর্ত্তী প্রশস্ত রাজপথে রথ আনিয়া রাখা হইয়াছে। রথের প্রত্যেক তালায় এক-এক দল বালক-বালিকা সারি দিয়া বসিয়া টানের প্রতীক্ষা করিতেছে; এবং ষ্টীমারের কাছি অপেক্ষাও স্থূল দড়া দুই-গাছার প্রত্যেকটি বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশ হাত দীর্ঘ,—পঁচিশ-ত্রিশ জন গ্রামবাসী রথে-আবদ্ধ দড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যাঁহার পালি, তিনি গোপালের বৈকালীর আয়োজন শেষ করিয়া বাহিরে আসিবেন; তিনি আদেশ করিলে ঐ সকল লোক রথ টানিয়া লইয়া যাইবে, এবং গ্রাম ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর রথতলায় ফিরিয়া আসিবে। রথ সেখানে প্রত্যাগমন না-করা পর্য্যন্ত রথতলার মেলায় লোকের ভীড় সমানই থাকিবে।

মেলায় নানা প্রকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। তন্মধ্যে সোলা-নির্ম্মিত সুরঞ্জিত নানা বর্ণের পাখী, ডুলি, পাল্কী, নর-নারী, জীবজন্তু; গ্রামের কুমারদের নির্ম্মিত সুচিত্রিত ছোট-ছোট ঘট, ছোবা, ভাঁড়, ফল, নানাপ্রকার পুতুল, দেব-দেবীর মূর্ত্তি; গ্রামস্থ কর্ম্মকাররা স্থানে-স্থানে বসিয়া হাতা, বঁটি, কাস্তে, দা, ছুরি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিতেছে। কোথাও আম, কাঁটাল, পাকা কাঁকুড়ের স্তূপ দেখিলাম। প্রচুর পরিমাণে পাকা কাঁকুড় (ফুটি) বিক্রয় হয় বলিয়া এই উৎসব অনেক স্থানে 'কাঁকুড়ে পরব' নামে অভিহিত। পথের ধারে অদূরবর্ত্তী বটতলায় এক জন শ্বেতাঙ্গ মিসনারী বক্তৃতা শেষে বিশ্রাম করিতেছেন, এবং তাঁহার সহকারী স্যামুয়েল বিশ্বাস এক পয়সা দামের একটি ক্ষুদ্র নাড়ুগোপাল হাতে লইয়া সমাগত দর্শকগণকে তাহা দেখাইয়া বক্তৃতা করিতেছে,—"ইহাকে তোমরা দেবতা মনে কর; কিন্তু আমি ইহা মাটীতে ফেলিয়া দিলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। ঐ রথে এইরূপ যে পুতুলটি বসিয়া আছে, তাহা পাথরের; কিন্তু রথ হইতে নীচে ফেলিয়া দিলে তাহাও ভাঙ্গিবে; ইহা কখন ভগবান হইতে পারে না, যদি ভগবানকে পাইতে চাও, তাহা হইলে সদাপ্রভুর একজাত পুত্র যিশুর ভজনা কর, তিনি অনন্ত নরক হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।"—তাহার পর তাহারা তিন-চারি জন সমস্বরে গান আরম্ভ করিল,—

"বেথলহেমে হইল যিশু-চন্দ্রের উদয়,
গায় সবে ধরাবাসী জয় জয় জয়!"

কিন্তু দর্শকগণ সে গান না শুনিয়া 'মালামোর' আঙ্গিনায় চারি দিকে সমবেত হইল। রথতলার এক পাশে অনেকখানি স্থান বাঁশের বাখারী দিয়া ঘিরিয়া-রাখা হইয়াছিল; সেই স্থানে বিভিন্ন গ্রামের মল্লগণ 'মালামো' (মল্লযুদ্ধ) করিতে আসিয়াছিল। এক-এক জোড়া মাল তাল ঠুকিয়া এবং উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জন্য সেই ঘেরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দর্শকগণ ঘেরের চারি দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মালামো দেখিবার উপায় ছিল না; এজন্য কাকার সঙ্গে অদূরবর্ত্তী দোতালায় উঠিলাম। উহা জমিদারদের বৈঠকখানা। কাকার বন্ধু নীলকান্ত বাবু এই বৈঠকখানার মালিক; সুতরাং তাঁহার দোতালার বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া মল্লযুদ্ধ

দেখিবার অসুবিধা হইল না। তখন রথ-টানা আরম্ভ হইয়াছিল। বহু দর্শক রথের সঙ্গে বাজারের দিকে চলিল। ঢাকীরা পাশাওয়ালা ঢাক বাজাইতে বাজাইতে রথের আগে আগে চলিল, তাহার পরেই মুখুয্যে-পাড়ার সঙ্কীর্ত্তনের দল। দুই জোড়া খোল 'বুজতা-বুজাং বুজাং-বুজাং' শব্দে বাজিতে লাগিল, সঙ্গে-সঙ্গে গায়কের দল মাথা নাড়িয়া টিকি দুলাইয়া নাচিয়া-নাচিয়া গাহিতে লাগিল,—

"গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন দয়া কর হে!"

কিন্তু অধিকাংশ দর্শকই 'মালামো' দেখিবার জন্য রথতলায় রহিয়া গিয়াছে।—ক্রয়-বিক্রয়ও সেখানে সমান উৎসাহে চলিতেছে। ঘেরের মধ্যে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কয়েক জন কুস্তীগীর কুস্তী দেখাইল। দুই জন মল্ল যুদ্ধ করিতে-করিতে এক জন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিবামাত্র চটাপট্ শব্দে করতালি আরম্ভ হইল। এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা মালামো চলিবার পর আমাদের পল্লী-অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মল্লবীর ট্যাংরামারী গ্রামের তুষ্টু সেখ মালকোঁচা আঁটিয়া, বুক ফুলাইয়া ও মাথার বাবরী দুলাইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল, এবং তাল ঠুকিতে-ঠুকিতে বীরদর্পে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দর্শকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কার কত ক্ষ্যামতা—এসো! মনিরদ্দী মির্দ্ধার সাকরেদ তুষ্টু সেখের সঙ্গে কুস্তী লড়ে' তাকে হঠিয়ে দিতে পার ত এসো! কেউ যদি আমাকে হঠাতে পারে ত দু'টাকা বাজি!"—সে পুনঃ পুনঃ ধূলা তুলিয়া-লইয়া তদ্দ্বারা তাহার স্থূল বাহুদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিল।

তাহার এই সগর্ব্ব আহ্বানে কয়েক মিনিট কেহই সাড়া দিল না; তাহার পর বাহির হইতে এক জন জোয়ান রঙ্গভূমিতে লাফাইয়া পড়িল। দেখিয়া চিনিলাম, সে আমাদের গ্রামের অদূরবর্ত্তী যাদবপুরের নুটু বাগ্দী। নুটু, তুষ্টুর ন্যায় দীর্ঘদেহ নহে; কিন্তু সে খর্ব্বকায় হইলেও তাহার দেহ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ। সে তুষ্টুর সহিত প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল, এবং উভয়ে পরস্পরকে আক্রমণের জন্য তাল ঠুকিয়া সেই ঘেরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দর্শকগণ নির্ব্বাক হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে তাহাদের বাহুযুদ্ধ দেখিতে লাগিল। তাহারা উভয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া নানা ভাবে কুস্তির কৌশল দেখাইতে লাগিল। তাহাদের হাতে হাতে, পায়ে পায়ে, বুকে বুকে যুদ্ধ চলিতে লাগিল; কিন্তু দীর্ঘকাল কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিল না। অবশেষে তুষ্টু হঠাৎ মুহূর্ত্তের সুযোগে নুটুর পায়ে পা বাধাইয়া-দিয়া তাহাকে এক ধাক্কায় কাত করিয়া ফেলিল, এবং নুটু সামলাইয়া লইবার পূর্ব্বেই—তাহাকে দুই হাতে ঊর্দ্ধে তুলিয়া দুই হাত দূরে নিক্ষেপ করিল। বহু দর্শক একসঙ্গে করতালি দিয়া বলিল, "বাহা রে তুষ্টু, বলিহারি!" কেহ কেহ দৌড়াইয়া-গিয়া তুষ্টুর স্পন্দিত বক্ষে চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "আজ তুই ট্যাংরামারীর মান বজায় রেখেছিস্ তুষ্টু! যাদবপুরের নুটু সর্দ্দার আসে তোর সঙ্গে কুস্তি লড়তে? চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা!"

নুটু পরাজিত হইয়া বলিয়াছিল, তুষ্টু অন্যায় করিয়া বেকায়দায় তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার এই অভিযোগ সত্য মনে করিয়া, এবং যাদবপুরের দুর্নামে ক্ষুব্ধ হইয়া যাদবপুরের বুনো, বাগ্দী, এবং মুসলমানরা পর্য্যন্ত লাঠী লইয়া 'মার মার' শব্দে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল। তাহারা সকলেই তুষ্টুকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে তুষ্টু তাল ঠুকিয়া বলিল, "আমার ট্যাংরামারীর জোয়ান সব কি কাঠের পুতুল—যে তারা দাঁড়িয়ে গাঁয়ের অপমান দেখ্ছে?" তুষ্টুর কথা শুনিয়া ট্যাংরামারীর সকল লোক হিন্দু-মুসলমান সকলেই "মার যাদবপুরেদের" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া লাঠী লইয়া নুটুর দলকে আক্রমণ করিতে আসিল। এ-কাল হইলে হিন্দুরা নুটুর পক্ষ, এবং মুসলমানরা তুষ্টুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া পরস্পরের মাথায় লাঠী চালাইত; কিন্তু সে-কালে সাম্প্রদায়িকতার প্রাধান্য স্থাপিত হয় নাই, হিন্দু-মুসলমান সকলেই স্ব-স্ব গ্রামের সম্মানরক্ষাই কর্ত্তব্য মনে করিয়া একযোগে প্রতিদ্বন্দ্বীদের আক্রমণ করিল। আমরা বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে তাহাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, উভয় পক্ষেরই বড় বড় বাঁশের লাঠী মাথার উপর উঠিতেছে, ঘুরিতেছে, পড়িতেছে; এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরা অদ্ভুত কৌশলে সেই আঘাত প্রতিহত করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। কুড়ি-পঁচিশখান সুদীর্ঘ লাঠীর এইরূপ সঘন

আবর্ত্তন, উত্থান ও পতন ; সঙ্গে সঙ্গে 'আল্লাহো আক্‌বর' ও 'হর হর মহাদেব' শব্দ ! ক্রমশঃ দুই-তিন জনের মাথা ফাটিল, কাহারও কাহারও হাত ভাঙ্গিল, পিঠ দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া ধরাশায়ী হইল ; কিন্তু কেহই তাহাদের দাঙ্গা নিবারণের চেষ্টা করিল না। পুলিশ সেই লাঠী-বৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ না করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ; কিন্তু যুদ্ধবিরতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে এক জন ভদ্রলোক—হাতকাটা ফতুয়া গায়ে আঁটিয়া মল্লবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ, বলবান্ পুরুষ ; তাঁহার হাতে দীর্ঘ ও স্থূল বাঁশের লাঠী। তাঁহাকে নির্ভীক চিত্তে প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাগণের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমার কাকাকে সভয়ে বলিলাম, "উনি যে ডাক্তার-কাকা !" লাঠীবৃষ্টির মধ্যে তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া গ্রামস্থ সকলেই শঙ্কিত হইলেন।

আমি যাঁহাকে 'ডাক্তার-কাকা' বলিলাম, তিনি বাবার এবং কাকাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুকুন্দচন্দ্র সেন। তিনি স্থানীয় দাতব্য-চিকিৎসালয়ের সরকারী ডাক্তার। তাঁহার দেহে যেমন অসাধারণ বল ছিল, লাঠীচালনাতেও তাঁহার সেইরূপ দক্ষতা ছিল। হাতে একখান দীর্ঘ ও স্থূল লাঠী থাকিলে তিনি দশ-পনের জন দস্যুর মহড়া লইতে পারিতেন। চাষার দল উন্মত্তপ্রায় হইয়া লাঠা-লাঠী করিতেছে, কাহারও অনুরোধে তাহারা দাঙ্গায় বিরত হইতেছে না দেখিয়া ডাক্তার মুকুন্দ বাবু তাহাদের দুই দলকে নিরস্ত করিবার জন্য সেই দাঙ্গার ভিতর প্রবেশ করিলেন ; তিনি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত দুই দলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহার লাঠী চালাইতে লাগিলেন ; কিন্তু চাষার দল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে থামাইবার জন্য তাঁহাকে লাঠী চালাইতে দেখিয়াও তাহারা থামিল না। তিনি অদ্ভুত কৌশলে তাহাদের দুই দলেরই লাঠী নিজের লাঠীতে প্রতিহত করিতে লাগিলেন। কিন্তু একাকী তিনি কতক্ষণ দুই পক্ষের লাঠী ঠেকাইবেন ? একখানি লাঠীর আঘাতে তাঁহার নাক ফাটিয়া রক্তের স্রোত বহিল, আর একখানি লাঠী তাঁহার মাথায় পড়িল ; তাঁহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইল। তিনি তাঁহার হাতের লাঠি উর্দ্ধে তুলিয়া-ধরিয়া 'থাম্, থাম্ !' বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

ডাক্তারকে সেই ভাবে বসিয়া-পড়িতে দেখিয়া যুদ্ধ-নিরত লাঠীয়ালদের পাশ হইতে দুই-এক জন পল্লীবাসী চীৎকার করিয়া বলিল, "আরে, তোরা ডাক্তার বাবুকে মেরে ফেল্‌লি ! থাম্, থাম্।"—তাহাদের এই চীৎকারে লাঠীবৃষ্টি বন্ধ হইল। উভয় পক্ষই সরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা দাঙ্গা বন্ধ করিয়াছে দেখিয়া ডাক্তার বাবু উঠিয়া লাঠীতে ভর দিয়া ধীরে-ধীরে বাহিরে আসিলেন। দাঙ্গার সঙ্গে-সঙ্গে কুস্তিও থামিয়া গেল। দাঙ্গাকারীরা কেহ-কেহ সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এইবার পুলিশ সদলে সেখানে আসিয়া তাহাদের অধিকাংশকেই ঘিরিয়া-ফেলিয়া গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

ডাক্তার বাবুর নাক ও কপাল হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল ; তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ও কিছুই নয়, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। আমি যে উহাদের দাঙ্গা থামাইতে পারিলাম, ইহাই লাভ।—দাঙ্গায় যাহাদের মাথা ফাটিয়াছে, উহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দাও ; আমি হাসপাতালে গিয়া উহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছি।"

আমরা 'ডাক্তার-কাকা'কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাসায় চলিলাম। পুলিশের ধর-পাকড়ের ঘটা দেখিয়া মেলায় সমাগত বহু লোকই পলায়ন করিল। খৃষ্টান মিসনারীরা পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল। দোকানীদের অনেকেই দোকান বন্ধ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দর্শকগণেরও ভীড় কমিয়া গেল। তাহার পর ঝম্-ঝম্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রথ তখন গ্রামের অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছিল ; দূর হইতে ঢাকের বাদ্য তখনও আমাদের কর্ণগোচর হইতেছিল। প্রবলবেগে বর্ষণ আরম্ভ হইলে ঢক্কাধ্বনিও বিরত হইল। গোপালদেব মধ্যপথে রথেই বোধ হয় ভিজিতে লাগিলেন ; তবে তাঁহার সিংহাসনের উপর তালপাতার ছাতা সন্নিবিষ্ট ছিল। এই তালপাতার ছাতার ব্যবহার সে-কালে পল্লী-অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ; নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ গৃহস্থ, রাখাল, কৃষাণ প্রায় সকলেই দুই আনা মূল্যের তাল-পাতার ছাতা ব্যবহার করিত ; এজন্য রথতলায় অনেক

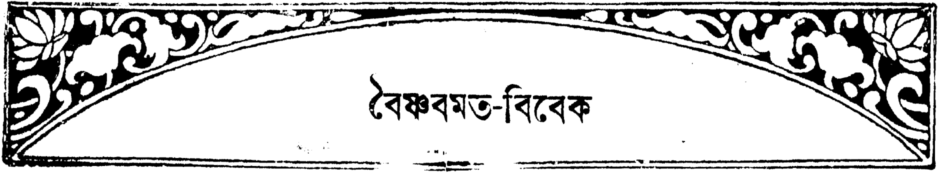
ছাতা বিক্রয় হইতেছিল। অনেকেই তাহা কিনিয়া মাথা বাঁচাইল। এ-কালে তালপাতার ছাতার ব্যবসায় লুপ্তপ্রায়, পল্লী-অঞ্চলে এখন আর উহার ব্যবহার প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের গ্রামে উহার দোকান ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

ডাক্তার মুকুন্দ বাবুর সম্বন্ধে দুই-একটি কথার উল্লেখ আশা করি, এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পূর্ব্ব-বঙ্গের কোন জিলার তিনি অধিবাসী ছিলেন; উক্ত ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমাদের গ্রামের সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তার হইয়া আসেন। বলিয়াছি, তাঁহার দেহে যেমন শক্তি ছিল, তাঁহার লাঠী-চালনার দক্ষতাও সেইরূপ অসাধারণ ছিল; কিন্তু তাঁহার সহৃদয়তার সহিত এ সকলের তুলনা হইতে পারে না। কোন গরীব-দুঃখীর নিকট তিনি 'ভিজিট' লইতেন না, তাহাদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিতেন; এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি সাগু, সুজি, বিস্কুট, বার্লি, বেদানা, মিছরী প্রভৃতি গৃহে সঞ্চিত রাখিতেন। গ্রামস্থ প্রত্যেক ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা থাকায় তাঁহাদের নিকটও দর্শনী গ্রহণ করিতেন না। গরীব-দুঃখীরা তাঁহাকে দেবতা মনে করিত। তিনি যে বেতন পাইতেন, রোগী দেখিয়া ভিজিট না লওয়ায় তাহাতে তাঁহার ব্যয়-সঙ্কুলান হইত না; এজন্য তিনি বাড়ী হইতে রেজিষ্ট্রীডাকে টাকা আনাইয়া লইতেন; কারণ, মণি-অর্ডারের প্রথা তখনও এ-দেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তিনি স্নানান্তে যখন উপাসনা করিতে বসিতেন, সেই সময় কত দিন তাঁহার বাসায় গিয়া দেখিয়াছি—উপাসনা করিতে করিতে অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার দুই গাল ভাসিয়া যাইত। তখন বালক ছিলাম, তাঁহার ভক্তির গভীরতা বুঝিতে পারিতাম না; ভাবিতাম, 'ডাক্তার-কাকা' আসনে বসিয়া হাত জোড় করিয়া, চোখ বুজিয়া কাঁদেন কাহার জন্য?

কিন্তু তাঁহাকে আমাদের গ্রামের ডাক্তারখানা হইতে একটি অস্বাস্থ্যকর মহকুমায় হঠাৎ বদলী হইতে হইল। তাঁহার বদলীর কিছু দিন পূর্ব্বে এক জন ইংরেজ নীলকরের একটি প্রজার অপমৃত্যু হয়। অভিযোগ হয়, তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। তাহার শবব্যবচ্ছেদের সময় নীলকরের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়—শবব্যবচ্ছেদ করিয়া তিনি যেন রিপোর্ট করেন, স্বাভাবিক ভাবেই উহার মৃত্যু হইয়াছে; শুনিয়াছিলাম, এজন্য তাঁহাকে অনেক টাকা 'পুরস্কার' প্রদানের লোভও প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু মুকুন্দ বাবু এই অনুরোধ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া যাহা প্রকৃত অবস্থা, রিপোর্টে তাহাই লিখিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে অভিযুক্ত শ্বেতাঙ্গ নীলকর ইংরেজ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে আইনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিলেও তাহাকে যথেষ্ট অপদস্থ হইতে হইয়াছিল; তাহার অর্থব্যয়ও প্রচুর হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই মুকুন্দ বাবুর বদলীর আদেশ! এই আদেশ শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "এই রকম কিছু হইবে, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম।" তাঁহার বদলীর সংবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া মহকুমার পাঁচ-ছয় শত লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। আমাদের গ্রামের এবং সন্নিহিত বহু গ্রামের ভদ্রলোকরা ও গরীব-দুঃখীরা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কিরূপ ক্ষোভের সহিত তাঁহাকে বিদায়াভিনন্দন দান করিয়াছিল, এই সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর পরেও তাহা ভুলিতে পারি নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।





বৈষ্ণবমত-বিবেক

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীজীবের উদারতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, পরম পণ্ডিত শ্রীজীব তাহা সমস্তই রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার স্থান ছিল না। তিনি ও শ্রীমৎ দাসগোস্বামী বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত শ্রীমৎ বল্লভভট্টের পুত্র শ্রীল বিটঠলনাথকে কিরূপ স্নেহ করিতেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি ভক্ত শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবর্দ্ধননাথ গোপালের সেবার ভারার্পণ হইতেই বিশেষ ভাবে জানিতে পারা গিয়াছে। বস্তুতঃ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভক্তমাত্রেরই তিনি সমাদর করিতেন। শ্রীজীবের সহিত শ্রীরূপের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে লালদাসজী বা কৃষ্ণদাসজীর বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থে যে ঘটনার কথা লিখিত আছে, মীরাবাঈয়ের সহিত শ্রীজীবের সাক্ষাৎ উপলক্ষেই তাহা ঘটিয়াছিল। সেই ঘটনা সম্বন্ধে একটু ঐতিহাসিক বিচারের অবকাশ থাকায় প্রথমেই মীরাবাঈয়ের জীবন-কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইল।

মীরাবাঈ ও শ্রীজীব গোস্বামী

মীরাবাঈ রাজপুতানাস্থিত উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত মেরতা গ্রামের ভূস্বামী রাও দুদাজীর চতুর্থ পুত্র রতনসিংহের কন্যা। তিনি সম্বৎ ১৫৫৫ (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে) অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই মাতৃহীনা হওয়ায় তিনি ভক্তিমান পিতামহ বৃদ্ধ দুদাজীর স্নেহ-যত্নে লালিত-পালিত হইয়া বৈষ্ণবাচারে অভ্যস্তা হইয়াছিলেন। বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়েরই কোনও বৈষ্ণব সাধুর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন; তবে তাঁহার দীক্ষাগুরু কে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র ভোজরাজের সহিত ১৫৭৩ সম্বতে (১৫১৬ খৃষ্টাব্দে) ১৮ বৎসর বয়সে মীরার বিবাহ হয়।* মীরা বিবাহের পূর্ব্বেই গিরিধারী গোপাল বিগ্রহের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

বিবাহের কিছু কাল পরেই মীরা বিধবা হইলে তিনি জগৎপতি গোপালের মধ্যেই পতি-দেবতাকে উপলব্ধি করিয়া একান্ত নিষ্ঠাভরে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। ১৫৮৪ সম্বতে (১৫২৮ খৃষ্টাব্দে) মীরার পিতা রতন সিংহ ও তাঁহার শ্বশুর রাণা সঙ্গ পরলোকে প্রস্থান করেন। মীরার তৃতীয় দেবর রত্নসিংহ ৪।৫ বৎসর মাত্র মেবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যুদ্ধে নিহত হইলে বিক্রমজিৎ রাণা হইয়াছিলেন। ইনিই মীরার প্রতি অমানুষিক দুর্ব্ব্যবহার করেন। এমন কি, ইনি মীরাবাঈজীকে হত্যা করিবার জন্য বিষপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হন নাই। মীরাবাঈয়ের পিতৃব্য বিরামদেব মীরার প্রতি তাঁহার এই দুর্ব্ব্যবহারের সংবাদ পাইয়া মীরাকে মেরতায় লইয়া গিয়া সযত্নে আশ্রয় দান করেন। কিছু দিন পরে যোধপুরের রাজা রাওমল বাহুবলে মেরতা গ্রাম অধিকার করিলে ভক্তিমতী মীরাবাঈ তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করেন, এবং পরে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, শ্রীভগবদ্ভজনের জন্য আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করা সঙ্গত কি না, এ কথা মীরাবাঈ তুলসীদাসজীকে জিজ্ঞাসা করিলে তুলসীদাসজী তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"তাজো প্রহ্লাদ পিতা, বিভীষণ ভ্রাতা, ভরত মাতারি।
বলি গুরু ত্যজো, কান্ত ব্রজ-বনিতা, ভয়ে সব মঙ্গলকারী।"

অর্থাৎ ভগবানের জন্য প্রহ্লাদ পিতাকে, বিভীষণ ভ্রাতাকে, ভরত মাতাকে, বলি গুরুকে, ব্রজগোপীগণ পতিকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের মঙ্গলই হইয়াছিল।

এই প্রবাদ-বাক্য বিশ্বাস করিতে হইলে মীরাবাঈকে তুলসীদাসজীর সমসাময়িক বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। ১৬০০ সম্বতে (১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে) তুলসীদাসজী জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৮০ সম্বতে (১৬২৩ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণ মাসে ইহলীলা সংবরণ করেন।* এই প্রবাদে বিশ্বাস করিতে গেলে মীরাবাঈ অন্ততঃ ১৬২৫—৩০ সম্বৎ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

যাহা হউক, আমরা শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীর (বা মতান্তরে শ্রীল লালদাসজীর) "ভক্তমাল" গ্রন্থে দেখিতে পাই, পরম ভক্তিমতী মীরাবাঈ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী শ্রীমীরাবাঈজীর জীবন-চরিত লেখকগণ সকলেই বলেন, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য চিরকুমার ব্রহ্মচারী শ্রীজীব গোস্বামীর সহিতই মীরাবাঈজীর সাক্ষাৎ হয়; এবং শ্রীজীবকে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকাজীর অন্তঃপুরে পুরুষাভিমানীর স্থান নাই, এ কথা জ্ঞাপন করেন। শ্রীরামরসিকাবলী নামক হিন্দী "ভক্তমালা" গ্রন্থেও দেখা যায়,—

---

* মীরাবাঈয়ের তিরোভাবের প্রায় তিন শত বৎসর পরে সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল টড্, ভাট ও চারণগণের নিকট হইতে মীরাবাঈয়ের যে ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, তাহা অনেকটা কিম্বদন্তীমূলক। ইহার মতে মীরাবাঈ রাণা কুম্ভের পত্নী, এবং স্বামী কর্ত্তৃক নিপীড়িতা; কিন্তু রাণা কুম্ভও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। 'গীতগোবিন্দের' একটি টীকা তাঁহারই সম্পাদিত। পরবর্ত্তীকালে 'মীরাবাঈকা চরিত্র' (মুন্সি দেবপ্রসাদ) ও অন্যান্য ইতিহাসে উক্ত ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। রাণা কুম্ভ ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে মেবারের 'রাণা' হন,—সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব কাল প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে।

* সম্বৎ ষোড়হায় আশী অসি গঙ্গকে তীর।
শ্রাবণ শুক্ল সপ্তমী তুলসী ত্যজো শরীর।

অর্থাৎ ১৬৮০ সম্বতে শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তুলসীদাস দেহত্যাগ করেন।

দোহা—"মীরাজী ব্রজমে গই, তেনিজ ভক্তি লখায়।
সো প্রাণ দিয়ো ছোড়ায় সো মীরা কথা সোহায়।
—শ্রীজীব গোঁসাইকী কথা (৯২০ পৃঃ)

বাঙ্গালা-"ভক্তমাল"কার লিখিতেছেন—মীরাবাই শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রেরণ করেন। ভক্তমালে আছে, শ্রীরূপ ঐ সংবাদ পাইয়া প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে জানান যে, তিনি বনে বাস করেন, কোনও স্ত্রীলোকের সহিত কোনও বিষয়ে আলোচনা তাঁহাদের পক্ষে বিধিসঙ্গত নহে।

মীরাবাঈজী তদুত্তরে তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন,—

"এতদিন শুনি নাই শ্রীমন্ বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে।
পুরুষ কোকিল ভ্রমরাদির অগম্য।
তেঁহো সে আইলা তাতে নাহি বুঝি মর্ম্ম।
প্যারিজীর প্রিয়সখী ললিতা জানিলে।
কেমনে রহিবে তেঁহো অন্তঃপুর-স্থলে।"
শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, (২২শ মালা)

এই কথায় শ্রীরূপ তাঁহার উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইয়া মীরাবাঈজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।* মীরা বাঈজীকে দেখিয়া সাক্ষাৎ ব্রজগোপী বলিয়াই শ্রীরূপের ধারণা হইল। অতঃপর তিনি মীরাবাঈজীর সহিত কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে পরমানন্দ লাভ করেন।

যদি স্বীকার করা যায়, শ্রীরূপ গোস্বামী ঐ সময়েও বর্ত্তমান ছিলেন—তাহা হইলে তখন তিনি নিশ্চিতই অত্যন্ত বৃদ্ধ।

যাহা হউক, শ্রীপাদ শ্রীরূপের সহিত মীরাবাঈজীর সাক্ষাৎ হউক, বা শ্রীপাদ শ্রীজীবের সহিতই সাক্ষাৎ হউক—এই সাক্ষাতের ফলে মীরাবাঈজীর শ্রীচৈতন্যদেবে ভক্তি ও বিশ্বাস এমন সুদৃঢ় হয় যে, তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবপূর্ণ ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়া একটি সুললিত ভজন-গান রচনা করেন। গানটি এই,—

"অব তো হরিনাম লৌ লাগী।
সব জগকো যহ মাখন-চোরা
নাম ধরয়ো বৈরাগী। ১।
কিত ছোড়ী বহ মোহন মুরলী
কহঁ ছোড়ী সব গোপী।
মুঁড় মুঁড়াই ডোরি কটি বাঁধী
মাথে ন মোহন টোপী। ২।
মাত জসোমতি মাখন কারন,
বাঁধে জাকে পাঁব।
শ্যামকিসোর ভয়ো নব গোরা
চৈতন্য জাকো নাঁব। ৩।
পীতাম্বরকো ভাব দিখাবৈ
কটি কোপীন কসৈ।
গৌরকৃষ্ণকী দাসী মীরা
রসনা কৃষ্ণ বসৈ। ৪।"

—শ্রীবিয়োগী হরিজী সংগৃহীত 'ভজন-সংগ্রহ' তৃতীয় ভাগ, ২৭ পৃষ্ঠা।

ভাবানুবাদ—"তুমি এখন ত' হরিনাম লইতে আরম্ভ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বজগতে ননীচোরা বলিয়া বিখ্যাত; এখন তুমি বৈরাগী নাম ধারণ করিয়াছ। তোমার সেই মোহন মুরলীই বা কোথায় রাখিয়া আসিলে এবং গোপীদিগকেই বা কোথায় রাখিয়া আসিলে? এখন তুমি মাথা মুড়াইয়াছ, কটিতে ডোর বাঁধিয়াছ, এবং তোমার মাথায় সে মোহন মুকুট নাই। মাতা যশোমতী মাখনচুরির জন্য যাঁহার পায়ে বন্ধন করিয়াছিলেন, তুমি সেই শ্যামকিশোরই নব গোরার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, এবং এখন তোমার 'চৈতন্য' এই নাম হইয়াছে। তুমি এখন পীতাম্বরের ভাব প্রকাশ করিয়া কটিদেশে কৌপীন আঁটিতেছ; তুমি সেই গৌররূপী কৃষ্ণ, এই মীরা তোমারই দাসী, এবং মীরার রসনা শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত অথবা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দাসী মীরার রসনায় বাস করিতেছেন।"

ভাবভক্তিময়ী শ্রীমতী মীরাবাঈয়ের ভজন শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুরূপ। অবশ্য শ্রীমদাচার্য্য বল্লভ যে পুষ্টিমার্গের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ব্রজগোপীদিগের ন্যায় প্রেমভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা। শ্রীশ্রীগোপীদিগের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজন শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ভজনরীতির বৈশিষ্ট্য। শ্রীমীরাবাঈ যদিও তাঁহার ভজনগানে শ্রীরাধিকা বা অন্য কোনও ব্রজগোপীর নাম করেন নাই, তথাপি তাঁহার পদাবলী শ্রীব্রজগোপীদিগের অনুসৃত দাসীভাবেরই বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।

শ্রীজীব ও শ্রীগদাধর ভট্ট

শ্রীনাভাজীর হিন্দী ভক্তমালে দেখা যায়, শ্রীজীব গোস্বামীর গুণবর্ণনাকালে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

"শ্রীরূপ সনাতন ভক্তিজল শ্রীজীব গুঁসাই সর-গম্ভীর"

শ্রীরূপ সনাতন ভক্তিরূপ জল এবং শ্রীজীব গোস্বামী তাহার আধার স্বরূপ গভীর সরোবর। ফলতঃ, শ্রীরূপ-সনাতনের সমস্ত ভাবই শ্রীজীবরূপ আধারে ধৃত হইয়াছে। শ্রীরূপের উজ্জ্বল নীলমণির রসসিদ্ধান্ত শ্রীজীবের প্রীতিসন্দর্ভে বিরাজমান। বাঙ্গালা ভক্তমালের ত্রয়োবিংশতি মালায় শ্রীজীবের রসশাস্ত্র-সংক্রান্ত বর্ণনা বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এই স্থানে প্রদত্ত উপাখ্যানে দেখা যায় যে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত বহু ভজনগানের লেখক সুপ্রসিদ্ধ গদাধর ভট্ট শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট একটি ভজনগান প্রেরণ করেন। এই ভজনগানটি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীজীব গোস্বামী গদাধর ভট্টজীকে লিখিয়া পাঠান যে, শ্রীবৃন্দাবনই এই সকল লীলা-মাধুর্য্যের পদের আস্বাদনের উপযুক্ত স্থান। গদাধর ভট্ট শ্রীজীবের এই পত্র পাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট

* "উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শ্রীমীরাবাঈয়ের চরিতলেখকগণের সকলেই এই ঘটনা শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র পরমভক্ত শ্রীপাদ শ্রীজীবের প্রতি আরোপ করিয়াছেন। কল্যাণ-কল্পতরুর প্রবন্ধদাতা সুবিজ্ঞ লেখক শ্রীম (নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়) যদিও "মোহন-মালায়" শ্রীপাদ রূপের নামেই এই ঘটনা আরোপিত করিয়াছেন, কিন্তু কল্যাণ-কল্পতরুর প্রবন্ধে উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয় তাঁহার নিজ দায়িত্বে এই ঘটনা শ্রীপাদ শ্রীজীবের প্রতিই আরোপিত করিয়াছেন।
—শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ-কৃত "শ্রীলীলামাধুরী", ৩৪৫ পৃঃ।

আগমন করেন। গদাধর ভট্ট শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট আগমন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দযুগলের মাধুর্য্যতত্ত্ব অবগত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীজীব ভট্টজীকে উপযুক্ত অধিকারী দেখিয়া তাঁহাকে বিস্তৃত ভাবে রসশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করেন। হিন্দী ভক্তমালে রসশাস্ত্র অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা ভক্তমালের গ্রন্থকার গদাধর ভট্টের নিকট শ্রীজীব রসশাস্ত্রতত্ত্ব যে ভাবে বর্ণনা করেন, তাহা অতি বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গদাধর ভট্ট শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা সম্বন্ধে অনেক হিন্দী ভজনগান রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গানগুলি অতি সুন্দর। শ্রীরাধিকার মহিমা বর্ণনা করিয়া তিনি যে সুন্দর পদটি রচনা করিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"জয়তি শ্রীরাধিকে সকল সুখসাধিকে
তরুণীমণি নিত্য নবতন কিশোরী।
কৃষ্ণতনু লীন মন রূপকী চাতকী
কৃষ্ণমুখ হিম কিরিণকী চকোরী।
কৃষ্ণদৃগ ভংস বিশ্রামহিতপদ্মিনী
কৃষ্ণদৃগমৃগজ বন্ধন সুডোরী,
কৃষ্ণ অনুরাগ মকরন্দকী মধুকরী
কৃষ্ণ গুণগান রসসিন্ধু বোরী।
বিমুখ পরচিত্ত তে চিত্ত জাকো সদা
করত নিজ নাহকী চিত্তচোরী,
প্রকৃতি যহ গদাধর কহত কৈসে বনৈ
অমিত মহিমা ইতৈ বুদ্ধি থোরি।"

শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বহু কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত ছিল। দক্ষিণ দেশের প্রেমোন্মত্ত 'আলোয়ার'গণ শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রাচীন আলোয়ার শঠকোপের সহস্রগীতি গ্রন্থে ব্রজলীলার বহু লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল সাধু গোপীদিগের ভজন-পদ্ধতিরও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গোপীদিগকে ইঁহারা ভগবৎ-শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সখীদিগের অনুগত হইয়া শ্রীগোবিন্দের উপাসনা শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ভজনপদ্ধতিরই বৈশিষ্ট্য। শ্রীরূপসনাতন-প্রমুখ শ্রীবৃন্দাবনবাসী ছয় গোস্বামী ইহারই আচার ও প্রচার করিয়াছিলেন। ভক্তমালে বর্ণিত আছে যে, গদাধর ভট্টজী শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিবার পর আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই; তিনি শ্রীবৃন্দাবনেই শ্রীবিগ্রহ-সেবায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার এইরূপ একনিষ্ঠ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের কথা শুনিয়া ধোরেরা গ্রামের কল্যাণ সিংহ নামক এক জন ভূস্বামী কৌতূহলবশে ভট্টজীকে দেখিতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। তিনিও ভট্টজীর ভজনপ্রণালী দেখিয়া আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। ভক্তমালে বর্ণিত আছে, তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করায় তাঁহার পত্নী তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি কোন কারণেই আর বিষয়মালিন্যে কলঙ্কিত হইতে চাহিলেন না। কল্যাণ সিংহের ন্যায় বহু ভক্তই শ্রীল গদাধর ভট্টের অপূর্ব্ব ভজনরীতি ও শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। ফলতঃ, শ্রীজীব গদাধর ভট্টকে আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার দ্বারা ধর্ম্মবিশ্বাসহীন বহু লোকের উদ্ধারসাধন করেন।

তুলসীদাস ও শ্রীজীব গোস্বামী

কথিত আছে, পরম ভক্ত তুলসীদাসজী একবার শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ শ্রীজীব গোস্বামীর দর্শন এবং তাঁহার স্নেহলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। প্রকাশ, তুলসীদাসজী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া এক শারদীয়া পূর্ণিমা-রজনীতে বৃন্দাবনের যমুনা-পুলিনে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের দর্শন-লাভ করিয়া বলেন,—

"কাঁহা কহুঁ ছঁব আজকী ভলে বনেহ নাথ।
তুলসী মস্তক তব নবে যব ধনুস্ বাণ লেও হাত।"

বস্তুতঃ, তুলসীদাসজী তাঁহার অভীষ্টদেব শ্রীরাম-সীতার মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া বড়ই ম্রিয়মাণ হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর পিতৃদেব বল্লভ শ্রীরামের উপাসক ছিলেন—এই জন্যই তিনি সাহস করিয়া শ্রীজীবের নিকট নিজের মনের দুঃখ নিবেদন করিলেন। শ্রীজীব মৃদু হাসিয়া তুলসীদাসজীকে সান্ত্বনা দান করিয়া শ্রীশ্রীসীতারামে ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে অভেদ জ্ঞান করিতে বলিলেন, এবং তৎপরদিন তুলসীদাসজীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে বহির্গত হইলেন। শ্রীজীবের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শন করিতে আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন—ভক্তের আগ্রহপূর্ণ আন্তরিক প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর পরিবর্ত্তে ধনুর্ব্বাণ বাহির করিলেন, এবং শ্রীরাধিকা সীতামায়ীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তুলসীদাসও সঙ্গে-সঙ্গে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া ভক্তি-গদ্গদ কণ্ঠে নিবেদন করিলেন,—

"কিত মুরলী, কিত চন্দ্রিকা, কিত গোপীনকা সাথ।
আপন জনকে কারণে নাথ ভয়ে রঘুনাথ।"

কথিত আছে, ঐ দিন তুলসীদাসজী শ্রীবৃন্দাবনের যে যে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিতে যান, সেই সেই মন্দিরেই শ্রীশ্রীসীতারামজীর মূর্ত্তি দর্শনে উহা শ্রীজীবেরই প্রভাব মনে করিয়া তাঁহাকে গুরুবৎ মান্য করিতে আরম্ভ করেন।

এই ঘটনার স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য তুলসীদাসজীর কোন ভক্ত যমুনাপুলিনের দক্ষিণ দিকে তুলসীদাসের মঠ নামক ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মঠের মন্দিরে শ্রীশ্রীরামসীতার বিগ্রহ ও তৎসম্মুখে তুলসীদাসের পিত্তলনির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মঠটি এরূপ বৃহৎ যে, ইহাতে ৭টি মহাল ও ৫টি কূপ আছে। অধুনা এই মঠের অনেক গৃহ সংস্কারাভাবে বিধ্বস্তপ্রায়। মঠটি এখন রামানন্দী সম্প্রদায়ের আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। হিন্দী ভক্তমালের রচয়িতা শ্রীল নাভাজী ও তাঁহার গুরু কীলহজী ও মগ্রদাসজী এই স্থানে বাস করিতেন। ইঁহারা সকলেই রামানন্দ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

আফগানিস্থানে "চৈতন্যপন্থী" বৈষ্ণব

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জয়পুরের মহারাজা মানসিংহ শ্রীজীবের নির্দ্দেশ-ক্রমে ও তাঁহারই তত্ত্বাবধানে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মানসিংহ ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন; ভক্ত না

হইলে শ্রীগোবিন্দের মন্দিরের ন্যায় এরূপ সুবিশাল মন্দির বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করিতে কখনও তাঁহার আগ্রহ হইত না।

আদর্শ ভক্ত শ্রীজীবের প্রভাবে মানসিংহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজনাদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং জয়পুর রাজ্যে সেই আদর্শ গৃহীত হইয়াছিল। এই ভক্তিপ্রবাহে মানসিংহের ভ্রাতা মাধোসিংহ, তাঁহার রাণী ও ভক্তিমান্ পুত্র প্রেমসিংহ প্লাবিত হইয়াছিলেন। 'ভক্তমালের' উপাখ্যানে জানা যায় যে, মাধোসিংহ ভক্তিময়ী রাণীর আচরণে প্রথমে প্রতিকূল ভাব ব্যক্ত করিলেও রাণীর একনিষ্ঠ সুদৃঢ় ভক্তির মহিমায় এবং তাঁহার ও ভক্ত পুত্রের সাহচর্য্যের ফলে মাধোসিংহ পরম ভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবরের আদেশে যখন মহারাজা মানসিংহ আফগানিস্থান (প্রাচীন "গান্ধার") জয় করেন; তখন মহারাজা অনেক সময় তাঁহার ভ্রাতা মাধোসিংহের হস্তে আফগানিস্থানের শাসনভার ন্যস্ত করিয়া স্বীয় রাজধানীতে আগমন করিতেন। আফগানিস্থানে যে সকল হিন্দু বাস করিতেন, তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহাদের কয়েক জন শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া প্রথমে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাদের মুসলমান কাবুলির ন্যায় আকৃতি দর্শন করিয়া শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের সেবাইত কর্ম্মচারিগণ মুসলমান-সন্দেহে তাঁহাদিগকে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহারা "চৈতন্যপন্থী" বৈষ্ণব বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন, এবং পুস্তভাষায় অনূদিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ প্রদর্শন করিয়া ঐ মহাগ্রন্থকেই আপনাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া জ্ঞাপন করেন। আফগানিস্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আছেন—শ্রীবৃন্দাবনের বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ ইহা জানিতে পারিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হন; কিন্তু অর্থের ও সামর্থ্যের অভাবে ইহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। ভক্তমালের উপাখ্যানের মাধোসিংহ মানসিংহের আফগানিস্থান বিজয়ের পর তৎকর্ত্তৃক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র প্রেমসিংহ তাঁহার সহকারী ছিলেন—এই কথা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গিয়াছে; এবং শ্রীজীবের পরোক্ষ প্রভাবেই যে আফগানিস্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল, এ বিষয়েও নিঃসংশয় হওয়া গিয়াছে।* অবশ্য ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী লাহোর, গুজরাট ও বোম্বাইয়ের অনেক স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা ও তাঁহার প্রদর্শিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ভজনের আদর্শ প্রচার করিয়া কয়েকটি "গাদী" বা মঠ স্থাপন করিয়া যান,—কিন্তু সে সময়ে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ রচিত হয় নাই।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ অধিকারী

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবের যে সকল শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে "ভক্তি-রত্নাকর"-লেখক শ্রীল নরহরি শ্রীরাধাকৃষ্ণ অধিকারী নামক এক ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীজীবের গ্রন্থাবলীর পরিচয়ের সংস্কৃত শ্লোকগুলি ইঁহারই গ্রন্থ হইতে ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইঁহার রচিত এই গ্রন্থের নাম কি ছিল, তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই; কিন্তু এই গ্রন্থখানি পাওয়া গেলে শ্রীবৃন্দাবনের তাৎকালিক ইতিহাসের উপর আরও আলোক-সম্পাত হইত বলিয়া মনে হয়।

শ্যামানন্দ দাস

বাঙ্গালা দেশ হইতে যে সকল বৈষ্ণব শ্রীবৃন্দাবনধামে এই সময়ে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট দীক্ষালাভ না করিলেও শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ইতিহাস এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু চেষ্টা করিলে এখনও দুই-এক জনের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, শ্যামানন্দ দাস নামক এক জন বৈষ্ণব শ্রীজীব গোস্বামীকে দীক্ষাগুরু না হইলেও শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি 'উপাসনাসার-সংগ্রহ' নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন,—তাঁহার হস্তলিখিত তাহার একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় উহা সংরক্ষিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, এই পুঁথিখানি উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ শ্যামানন্দ ঠাকুরের লিখিত; কিন্তু শ্যামানন্দ ঠাকুর যে সকল পদ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে "দুঃখিনী" ভণিতা দেখা যায়। সুতরাং 'শ্যামানন্দ দাস' নাম অবলম্বনে যে পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহা শ্যামানন্দ ঠাকুরের রচিত বলিয়া মনে হয় না। ইনি এই পুস্তকের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

"জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু মোরে।
করহ করুণা প্রভু তবে বাঞ্ছা পূরে॥
আপনার গণমধ্যে গণনা করিবে।
কিঙ্কর করিয়া আপন সঙ্গেতে রাখিবে॥"

কবি আরও বলিয়াছেন,—

"সেই শ্রীজীব গোস্বামি প্রভু যে আমার।
কত দিনে কৃপা করি করিবেন কিঙ্কর॥"

এই সকল কবিতা পাঠে মনে হয়, ইনি শ্রীজীবেরই শিষ্য।

ফলতঃ, সম্প্রদায়-ভেদ না করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেরূপ উদার ভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম—শ্রী, বল্লভ, রামানন্দী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন, শ্রীজীব গোস্বামীও সেই ভাবে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সর্ব্বসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণকেই সমদৃষ্টিতে দর্শন করিতেন। শ্রীমদ্রামানুজের ভাষ্যের বহু সিদ্ধান্ত শ্রীজীব তাঁহার ষট্সন্দর্ভে, শ্রীভাগবতের টীকা ক্রমসন্দর্ভে ও সর্ব্বসম্বাদিনীতে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীজীবের প্রাদুর্ভাব কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন না।—অন্ততঃ, শ্রীজীব আপনাদিগকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন না, ইহার প্রমাণ শ্রীজীবের লিখিত পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের লঘুতোষণী টীকায় শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীভাষ্য ও তাহার দুইটি টীকার, মহাত্মা বেঙ্কটনাথ

* যদি কখনও যথাযোগ্য অনুসন্ধানের ফলে এই ব্যাপারের মূল কারণ বলিয়া প্রকাশ পায়, তখন আমরা আনন্দ সহকারেই এই মত পরিবর্তন করিব। যাহা হউক, এই বিষয়ের যথাযোগ্য অনুসন্ধান হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারের একটি নূতন অধ্যায় সমাজে প্রকাশিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

বেদান্তদেশিকের 'শতদূষণী'র উল্লেখের সঙ্গে তত্ত্ববাদী-সম্প্রদায়ের মধ্বাচার্য্যের বিষ্ণুতত্ত্বপ্রকাশিকা ও ব্যাসাচার্য্যের ন্যায়ামৃতের উল্লেখ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে নিজের শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ও তাহার টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। *

শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র বিট্‌ঠলনাথ যে শ্রীজীবের ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর সম্মতি অনুসারেই শ্রীগোবর্দ্ধননাথ গোপালের সেবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শ্রীল বঙ্কবিহারীর সেবাধিকারী বৈষ্ণবগণও তখন শ্রীজীবকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। উদয়পুরের সন্নিহিত সলিমাবাদ নামক নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মূল গাদীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান গ্রন্থাবলী প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির আকারে সযত্নে রক্ষিত হইয়া তাৎকালিক নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্দ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

শ্রীজীবের প্রাদুর্ভাব কালে মথুরা, আগ্রা, করৌলী, জয়পুর, উদয়পুর ও মেবার প্রভৃতি অঞ্চলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভূতরূপে প্রচার হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রচারশীল সুপণ্ডিত শক্তিশালী আচার্য্যের অভাবে এই সকল স্থানের অধিকাংশ বৈষ্ণব অন্যান্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীই সর্ব্বপ্রথমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ ভজনমার্গের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ স্থাপন করেন।

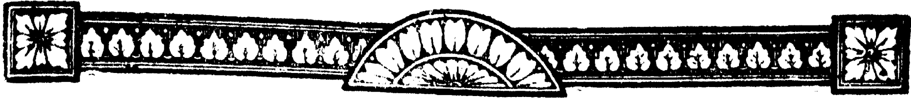
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

* "বস্তু, ঔপাধিক আবিচ্ছিক এব বা জীবেশ্বর বিভাগ ইতি মতং তচ্চ ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যায়াং যথা পরিষ্কৃতং তথৈবাত্র দ্রষ্টব্যং শ্রীবৈষ্ণবানাং শ্রীভাষ্য তদীয় টীকয়োঃ শতদূষণ্যাদিষু চ তত্ত্ববাদিনাং বিষ্ণুতত্ত্বপ্রকাশিকাদৌ ন্যায়ামৃতাদৌ চ তথাস্মাকং তদ্‌দৃষ্টিলেশাবষ্টম্ভি শ্রীভাগবতসন্দর্ভ তট্টীকাদৌ চ বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ।" —"শ্রীজীব গোস্বামিকৃত বৈষ্ণবতোষণ্যাং ১০।৮৭।২। এখানে শ্রীজীব শ্রীভাগবতসন্দর্ভের যে টীকায় বলিতেছেন, তাহাই বোধ হয় সর্ব্বসম্বাদিনী —কারণ ঐ সময়ে ষট্‌সন্দর্ভের অন্য কোনও টীকা রচিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

নারী

তব মহিমার গানে যবে বিশ্ব মানিত বিস্ময়,
গেয়েছিল পুরুষ সে দিন শত-কণ্ঠে তোমার বিজয়।
নয়নেতে ছিল তব তেজোদীপ্ত উজ্জ্বল মহিমা।
অঙ্গে তব যৌবনের লীলায়িত অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা,
এনেছিল প্রাণে তার মধু-স্রাবী প্রেমের প্লাবন।
প্রিয়ারূপে, বধূরূপে তাহারই সে সুদৃঢ় বন্ধন
বন্দিনী করিল তোমা। ছিল প্রেম সে দিন নয়নে,
আকাঙ্ক্ষিত চিত্ত তব তৃপ্ত হল মধু-সম্ভাষণে।
জীবনের সাথীরূপে তোমারে সে নিয়েছিল মানি,
আজি হায় আনিয়াছে দাসীত্বের শৃঙ্খলেতে টানি।
তুমি ছিলে কন্যা, মাতা, কুললক্ষ্মী বিশ্বের অন্তরে
সতীত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল। আজি যুগান্তরে
রূপান্তর হেরি তব। পরাজিত জীবন-আহবে,
অপমানে উৎপীড়িতা, ভয়ে ভীতা, ম্রিয়মাণা ক্ষোভে।
জ্যোতিস্নাত তনুলতা সুষমা হারায়ে প্রভাহীন—
বৃন্তচ্যুত পুষ্প যেন পড়ি পথে ধূলায় মলিন,
কামনার বেদীতলে প্রণয়েরে দিয়া বিসর্জ্জন,
স্বার্থান্ধ পুরুষ করে রূঢ়-হস্তে তব নির্য্যাতন।
জ্ঞানের আলোক হ'তে বহু দূরে আঁধার কারায়,
সশস্ত্র প্রহরা দিয়া বন্দিবেশে রেখেছে তোমায়।
ভীতা হরিণীর মত দৃষ্টি তব গুণ্ঠনেতে ঢাকা,
ব্যথাক্লিষ্ট অন্তরের গ্লানিটুকু আঁখি-কোণে আঁকা।
তোমার অন্তরে তুমি জেগে উঠ হে আদিম নারী!
সাজো বিজয়িনী পুনঃ রণসাজে, লহ তরবারি,
ভেঙ্গে ফেল কারাগার, খুলে দাও বন্ধন-শিকল,
সেই পুণ্য-শ্লোকে পুনঃ মুখরিত কর নভস্তল,
যে গানে ধ্বনিত হ'ত সাম্যের মহিমা চারি ভিতে,
আজি হ'তে চূর্ণ হোক ভেদাভেদ পুরুষে নারীতে।

শ্রীরাণু গঙ্গোপাধ্যায়।



যুদ্ধোদ্যমে বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি

অতীতের বিশ্লেষণ দ্বারা ভবিষ্যতের রহস্য-ভেদ প্রচেষ্টা মানবের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি; যদিও, প্রায় প্রতি পদে তাহার প্রয়াস অনিশ্চিত ও অপ্রত্যক্ষ ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যাহত হয়, তথাপি মানব-জীবনের প্রতি কেন্দ্রে ও প্রতি ক্ষেত্রে এইরূপ অনুসন্ধান ও অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শিল্প-বাণিজ্যে ইহা অপরিহার্য্য। সুখ ও দুঃখ যেমন চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হয়, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি-অবনতিও তেমনি মণ্ডলাকারে বিবর্ত্তিত হয়। ভারতের যুদ্ধারম্ভ বৎসরের ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি পর্য্যালোচনার উদ্দেশ্যেই এই উপক্রমণিকার অবতারণা।

কোন একটি অতিক্রান্ত বৎসরের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের যথাযথ তথ্য ও সংখ্যা-সমষ্টি সংগ্রহ করা দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ। সংগৃহীত উপাদানকে শ্রেণীবিভক্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের সহিত তুলনা-মূলক হ্রাস-বৃদ্ধির পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেও প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। এই নিমিত্ত, কোন শিল্প অথবা বাণিজ্যের বর্ষ-বিবৃতি (Annual Report) তৎপরবর্ত্তী বৎসরের শেষাভিমুখে ব্যতীত প্রকাশ করা সম্ভব নহে। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ভারতের বাণিজ্যবিষয়ক বিবৃতিও সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবৃতি-সঙ্কলিত সংখ্যাসমষ্টির সাহায্য লইয়া আমরা যুদ্ধারম্ভ বৎসরের বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিব।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের শরতে যে মন্দার সূচনা হইয়াছিল, পরবর্ত্তী বৎসরের শেষ ভাগেই তাহার প্রচণ্ডতার সমাপ্তি ঘটিয়াছিল; এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে অধিকাংশ দেশেই ব্যবসায়-বাণিজ্য ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছিল। পশ্চিম গোলার্দ্ধে অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুতের তাড়নাই ইহার প্রধান কারণ ছিল। যুদ্ধারম্ভে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষের প্রথম পাঁচ মাসে ভারতে পণ্যমূল্য কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছিল বটে; কিন্তু ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে সঞ্জাত অজ্ঞাত মন্দার প্রকোপ ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের পূর্ব্বে প্রশমিত হয় নাই। কয়েকটি ব্যতীত, অধিকাংশ পণ্যের মূল্য ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত অধঃপতিত অবস্থায় ছিল। বহু প্রধান পণ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক ছিল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধারম্ভে, বৈধ-প্রচেষ্টার (Speculative activity) ফলে পণ্যমূল্য অকস্মাৎ দ্রুত ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছিল; কিন্তু অস্বাভাবিকতার অবশ্যম্ভাবী ফলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষার্দ্ধ হইতে নিম্নগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের শেষ চতুর্থাংশে কৃষিপণ্যের মূল্যের এরূপ অধোগতি হইয়াছিল যে, তাহাতে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্থাংশে অর্জ্জিত লভ্যাংশের বিনাশ সাধন হইয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বাবস্থার তুলনায় ভারতীয় শিল্পের অবস্থা যথেষ্ট আশাপ্রদ ছিল। যুদ্ধারম্ভে মুদ্রা-বাজার (Money market) কিঞ্চিৎ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল; কিন্তু কঠোর সুদ-শাসনের ফলে শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল; এবং অল্প সুদে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রাপ্তব্য ছিল। মুদ্রা-বিনিময় পরিস্থিতি (Exchange position) উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং বাণিজ্য-জমা-খরচে ভারতের উদ্‌বৃত্ত জমার অঙ্ক (Favourable balance of trade) বর্দ্ধনশীল হইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে ষ্টার্লিং সম্পদ (Sterling resources) সঞ্চিত হইয়াছিল। ষ্টার্লিং-এর সহিত টাকার বিনিময়-হার সংশয়হীন অবস্থায় অবস্থিত ছিল।

বাণিজ্য বলিলে সমুদ্রপথে সওদাগরী অর্থাৎ বে-সরকারী পণ্যের আমদানী-রপ্তানী বুঝায়। সওদাগরী পণ্য ব্যতীত সরকারও নিজ প্রয়োজনে যথেষ্ট দ্রব্যসম্ভার (stores) আমদানী-রপ্তানী করেন। এতদ্ব্যতীত, উভয় পক্ষই ধনরত্ন (treasure) অর্থাৎ সোনা, রূপা এবং কারেন্সি নোট আমদানী-রপ্তানী করেন। সওদাগরী পণ্যই (Private merchandise) সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন। যুদ্ধারম্ভ এবং যুদ্ধ-পূর্ব্বের দুই,—এই তিন বৎসরে, এই ত্রিবিধ বাণিজ্যের একুন মূল্য-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আমদানী	১৯৩৭-৩৮ টাকা (কোর)	১৯৩৮-৩৯ টাকা (কোর)	১৯৩৯-৪০ টাকা (কোর)
সওদাগরী-পণ্য ...	১৭৩·৭৯	১৫২·৩৩	১৬৫·২৭
সরকারী দ্রব্যসম্ভার ...	৩·৪৩	৩·১৮	৩·৬৮
ধনরত্ন (উভয় পক্ষীয়) ...	৪·৭১	৩·২৪	৬·৬৪
মোট আমদানী	১৮১·৯৩	১৫৮·৭৫	১৭৫·৫৯
রপ্তানী			
সওদাগরী পণ্য ...	১৮৯·২১	১৬৯·২১	২১৩·০৮
সরকারী দ্রব্যসম্ভার ...	·৫৬	·৬২	২·০১
ধনরত্ন (উভয় পক্ষীয়) ...	১৯·৭৭	১৫·২০	৪০·৭৯
মোট রপ্তানী	২০৯·৫৪	১৮৫·০৩	২৫৫·৮৮
একুন	৩৯১·৪৭	৩৪৩·৭৮	৪৩১·৪৭

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলোচ্য বর্ষে ভারতের বহির্বাণিজ্য তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। একুন বাণিজ্যের মূল্য এবং ভারতের অনুকূলে উদ্‌বৃত্ত জমার অঙ্ক, উভয়ই এই উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করে। পূর্ব্ব-বৎসরের বে-সরকারী পণ্যের (Private merchandise) একুন মূল্য ৩৩২ কোটি এবং তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ৩৬৩ কোটি টাকার তুলনায়, যুদ্ধারম্ভ বৎসরের (১৯৩৯-৪০) একুন মূল্য ৩৭৮ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল; অর্থাৎ তিন বৎসরের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ হইয়াছিল। যুদ্ধ-প্রয়োজনে বহুবিধ কাঁচা মাল এবং খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা-বৃদ্ধি এই উন্নয়নের মূল। মাল-চালানী জাহাজের অনটন না হইলে, ভারতবর্ষ এই সুযোগের অধিকতর সুবিধা লইয়া লাভবান হইতে পারিত। এই সূত্রে এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, শত্রুপক্ষীয় দেশগুলির সহিত বাণিজ্য-সূত্র ছিন্ন হওয়াতে যে ক্ষতি হইয়াছিল, মিত্রশক্তি ও সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহের বর্দ্ধিত চাহিদার গুণে তাহার পরিপূরণ ঘটিয়াছিল।

পূর্ব্ব-বৎসরের ১৬৩ কোটি এবং তৎপূর্ব্ব বর্ষের ১৮১ কোটির তুলনায়, আলোচ্য বর্ষে বর্ম্মা এবং অন্যান্য দেশে প্রেরিত রপ্তানী-পণ্যের মোট মূল্য হইয়াছিল ২০৩ কোটি টাকা। আমদানী-পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু রপ্তানী-পণ্যের তুলনায় অল্প। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৭৪ কোটি, এবং ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৫২ কোটির তুলনায় আমদানী-পণ্যের একুন মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ১৬৫ কোটি টাকা মাত্র। পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রবল উৎপাদন-প্রচেষ্টা শত্রু-দেশসমূহের সহিত ব্যবসায়-রোধ এবং সমুদ্র-পথে মাল-চালান দিবার বাধা-বিঘ্নই এই স্বল্পোন্নতির হেতু। যদিও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, এই একুন অঙ্কের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছিল, তথাপি স্বল্প হইলেও তদানীন্তন পরিস্থিতি-হেতু যথেষ্ট। ফলতঃ, ভারতের অনুকূলে উদ্বৃত্ত জমার অঙ্ক বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরে এই উদ্বৃত্ত জমার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল—১৭ কোটি (১৯৩৭-৩৮) হইতে ১৬ কোটিতে (১৯৩৮-৩৯)। আলোচ্য বর্ষে, এই অঙ্ক ৪৮ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। অতএব, যুদ্ধ-প্রসূত প্রতিকূল ঘটনাচক্রে ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসর অপেক্ষা সুবিধাজনক ব্যবসায়ের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটি রপ্তানী-পণ্যের মূল্য-তালিকা দেওয়া হইল :—

রপ্তানী	১৯৩৭-৩৮ টাকা (ক্রোর)	১৯৩৮-৩৯ টাকা (ক্রোর)	১৯৩৯-৪০ টাকা (ক্রোর)	হ্রাস-বৃদ্ধি টাকা (ক্রোর)
শস্যদানা, মটর-কলাই ও আটা-ময়দা ...	৯'৪৯	৭'৭৪	৫'৯৭	–২'৬৭
চা ...	২৪'৩৯	২৩'২৯	২৬'০৮	+২'৭৯
কাঁচা চামড়া ...	৫'০৪	৩'৮৫	৪'০৯	+০'·৪
তৈল-বীজ ...	১৪'১৯	১৫'০৯	১১'৯০	–৩'১৯
কাঁচা কার্পাস তুলা ...	২৯'৭৭	২৪'৬৭	৩১'০৪	+৬'৩৭
কাঁচা পাট ...	১৪'৭২	১৩'৪০	১৯'৭৩	+৬'৩৩
পাট-প্রস্তুত দ্রব্যাদি ...	২৯'০৮	২৬'২৬	৪৮'৬৯	+২২'৪৩
অন্যান্য ...	৫৪'২৪	৪৮'৪৯	৫৩'৮৪	+৪'৩৫
একুন	১৮০'৯২	১৬২'৭৯	২০৩'৪৪	+৪০'৬৫

যুদ্ধ-পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় যুদ্ধারম্ভ বৎসরে ভারতের একুন রপ্তানী-পণ্যমূল্য ৪০'৬৫ কোটি টাকা-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে এবং যুদ্ধারম্ভের পর যে আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তাহাই বহুল পরিমাণে এই উৎকর্ষকে সাহায্য করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের কাঁচা পাটের রপ্তানী-মূল্য বাড়িয়াছিল—শতকরা ৫০ অংশ, এবং পাট-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির রপ্তানী-মূল্য শতকরা ৮৫ অংশ অধিকতর হইয়াছিল। এই দুই পণ্য একত্রে রপ্তানী-বাণিজ্যের একুন অঙ্ককে শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি করিয়াছিল। কাঁচা পাট-রপ্তানীর উৎকর্ষ প্রণিধানযোগ্য ; কারণ, ওজনে কাঁচা পাট পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা কম ছিল। যুদ্ধারম্ভে আমাদের দেশের রপ্তানী-পণ্যের মধ্যে কাঁচা পাট এবং পাটোৎপন্ন দ্রব্যাদিই সর্ব্বপ্রথম সুবিধা লাভ করিয়াছিল। অবিচ্ছিন্ন সরকারী প্রয়োজনের তাগিদে এই উভয় পণ্যের মূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; নতুবা আরও অধিকতর মাল বিদেশে রপ্তানী হইতে পারিত। সুবিধাবাদীদের অত্যধিক অসংযত লোভের ফলে এই ক্ষতি ঘটিয়াছিল ! নতুবা, পাটের বাজারের পরবর্ত্তী মন্দা তত তীব্র হইত না। কাঁচা ও নষ্ট কার্পাস তুলার রপ্তানী-বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল—বৎসরের প্রথম পাঁচ মাসে, যখন আমেরিকার রপ্তানী অর্থ-সাহায্যের (American Export subsidy) অনিশ্চিত পরিস্থিতির ফলে আমেরিকা হইতে তুলার চালানে মন্দা পড়িয়াছিল, এবং তাহার অভাব অন্য দেশোৎপন্ন পণ্যের দ্বারা পূরণ করিতে হইয়াছিল। পাট ও তুলার পরে চা-এর রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; এবং আলোচ্য বর্ষের শেষ চারি মাসে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছিল। যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশের চাহিদা-বৃদ্ধির সহিত যুদ্ধারম্ভের পরেই রপ্তানী-হিস্যা (Export quota) শতকরা ৯৫ অংশে উন্নীত হইয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে লণ্ডনে মজুত চা-এর পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল ; এবং খাদ্য-মন্ত্রী তাহার ত্বরিত পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভারতীয় চা-এর রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্তের অধিকাংশই যুক্তরাজ্য ক্রয় করিয়াছিল।

রপ্তানী-পণ্যে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটিয়াছিল—শস্যদানা, মটর-কলাই, আটা-ময়দা এবং তৈলবীজে। প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে মন্দা ঘটিয়াছিল, প্রধানতঃ গম ও চাউলের রপ্তানী হ্রাস হেতু। ক্যানাডা, আমেরিকা এবং আর্জেন্টাইনার প্রচুর গোধূম উৎপাদনের ফলে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে ভারতোৎপন্ন গোধূমের চালান একপ্রকার বন্ধ হইয়াছিল। ফলে, পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় গোধূমের রপ্তানী শতকরা ৩ ভাগে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ধান্য-ফসলের শীর্ণতা হেতু চাউলের রপ্তানী কমিয়াছিল। এই কয়েকটি ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী-মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এইবার আমরা আমদানী-পণ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি পর্য্যালোচনা করিব। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে আমদানী-পণ্যের মূল্য প্রায় ১৩ কোটি টাকা অধিকতর হইয়াছিল। নিম্নে তিন বৎসরের একটি মূল্য-তালিকা প্রকাশিত হইল :—

আমদানী	১৯৩৭-৩৮ টাকা (ক্রোর)	১৯৩৮-৩৯ টাকা (ক্রোর)	১৯৩৯-৪০ টাকা (ক্রোর)	হ্রাস-বৃদ্ধি টাকা (ক্রোর)
খাদ্যদ্রব্য ...	২'৬০	২'৪৮	২'৬৩	+০'১৫
শর্করা ...	০'১৯	০'৪৬	৩'৩২	+২'৮৬
তৈল ...	১৮'৭০	১৫'৬২	১৮'৬২	+৩'০০
কাঁচা ও নষ্ট তুলা ...	১২'১৩	৪'৫১	৮'০৫	–০'৪৬
ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৬'০৬	৫'৬২	৭'৫০	+১'৮৮
লৌহ-পিত্তলাদি নির্ম্মিত ”	৬'৮৪	৫'৮১	৫'৫৭	–০'২৪
রঞ্জন ”	৪'৯৯	৪'৩০	৪'৬৭	+০'৬৪
কলকব্জা	১৭'৯৮	১৯'৭২	১৫'৩৭	–৪'৩৫
লৌহ ও ইস্পাৎ নির্ম্মিত ”	৮'২০	৬'৬৬	৬'০৭	–০'৫৯
অন্যান্য ধাতু ” ”	৫'১৬	৪'১৬	৪'৭৪	+০'৫৮
কাগজ ইত্যাদি	৪'৯৬	৩'৯০	৪'১১	+০'২১
যান	৮'৯২	৬'৬৮	৬'৮৭	+০'১৯
কার্পাস সূতা ও সূতি ”	১৫'৫৫	১৪'১৫	১৪'০৫	–০'১০
অন্যান্য ” ” ” ”	১১'৭৪	৭'০৮	৮'৭৫	+১'৬৭
অন্যান্য ”	৪৯'৭৭	৪৭'৪৫	৫৪'৯৫	+৭'৫০
একুন	১৭৩'৭৯	১৫২'৩৩	১৬৫'২৭	+১২'৯

প্রধান প্রধান আমদানী-পণ্যের মধ্যে কাঁচা তুলা, ছুরি, কাঁচি, লৌহ ও পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, লৌহ ও ইস্পাত, এবং কার্পাস সূতা ও সূতি-দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল কাঁচা তুলার হ্রাস-পরিমাণ ৪৬ লক্ষ টাকা। বৎসরের প্রথম ভাগে বয়ন-শিল্পের অবনতি এবং কাঁচা তুলার উপর আমদানী-শুল্কের বর্দ্ধিত হারই এই হ্রাসের কারণ। যুদ্ধের পূর্ব্বে যুক্তরাজ্যই ছিল ছুরি, কাঁচি, লৌহ-পিত্তলাদি-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতির আমদানীর প্রধান ক্ষেত্র। যুদ্ধারম্ভের পর জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঐ সকল দ্রব্যের যোগান, সমগ্র অভাব দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং, এই সকল দ্রব্যে হ্রাস ঘটিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র হইতে কলকব্জার আমদানী যথেষ্ট বাড়িয়াছিল, কিন্তু অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী প্রচুর পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। ফলে যখন শিল্প-সম্প্রসারণ নিমিত্ত কলকব্জার বহুল পরিমাণে প্রয়োজন বাড়িয়াছিল, তখন ইহার আমদানী-মূল্যের হ্রাস ঘটিয়াছিল ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে। যুক্তরাজ্যে এবং মহাদেশিক য়ুরোপে যুদ্ধহেতু লৌহ ও ইস্পাতের অধিকতর প্রয়োজনবশতঃ এই দুইটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী-মূল্যে হ্রাস ঘটিয়াছিল। সূতি-বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি হেতু আমদানী ব্যাহত হইয়াছিল; কিন্তু প্রধানতঃ, চীন ও জাপান হইতে আনীত কার্পাস সূতার আমদানী যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

যে সকল দ্রব্যের আমদানী বাড়িয়াছিল, তন্মধ্যে শর্করাই প্রধান। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ইক্ষুর ফসল অল্প হওয়ায় এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শিল্প-সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার প্রাবল্য হেতু বিবিধ প্রকার তৈলের আমদানী বাড়িয়াছিল। রাসায়নিক (১ কোটি ৮৮ লক্ষ) এবং রঞ্জন-(৬৪ লক্ষ) দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল—আতঙ্কে। যুদ্ধারম্ভের প্রথমেই সকলে যথার্থই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, অচিরে এই সকল দ্রব্যের অনটন ঘটিবে। সেপ্টেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত অঙ্ক লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ব্লিচিং পাউডারের আমদানী পূর্ব্ব-বৎসরের ১২৩,০০০ হন্দর হইতে ১৪৫,০০০ হন্দরে উন্নীত হইয়াছিল। সোডিয়াম্-কার্ব্বনেট ৫৫১,০০০ হইতে ৯২৭,০০০ হন্দরে বর্দ্ধিত হইয়াছিল; এবং কষ্টিক্ সোডা বর্দ্ধিত হইয়াছিল—৩২৯,০০০ হইতে ৪৫৪,০০০ হন্দরে। আলকাতরা হইতে প্রস্তুত রঞ্জন-দ্রব্যাদির আমদানী জার্ম্মাণী হইতে হইত; সুতরাং, যুদ্ধারম্ভের প্রথম সাত মাসে, এই পণ্যের আমদানী, পূর্ব্ব-বৎসরের ঐ কয় মাসের ৭.৯৯ মিলিয়ন (নিযুত) পাউণ্ড হইতে ৪.৯৭ মিলিয়ন পাউণ্ডে হ্রাস পাইয়াছিল। জার্ম্মাণীর পরিবর্ত্তে যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যাণ্ড, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র এই মাল বহুল পরিমাণে যোগান দিয়াছিল। লৌহ এবং ইস্পাত ব্যতীত, অন্যান্য ধাতুর আমদানী ৫৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছিল। কাগজ, পেষ্টবোর্ড এবং লিখিবার সরঞ্জামের আমদানী বাড়িয়াছিল যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে; কিন্তু যুদ্ধারম্ভে আমদানী কমিয়া গিয়াছিল। অনেকেই জানেন না যে, আমরা বিবিধ প্রয়োজনে বিদেশ হইতে পুরাতন সংবাদপত্র আমদানী করি। কাগজ-বিভাগে এই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কমিয়াছিল। যাত্রিবাহী মোটর-গাড়ী, বিমান, যন্ত্র-চালিত যানের যন্ত্রাংশ, এবং যন্ত্র-চালিত নহে—এমন বিবিধ শকটের অধিকতর আমদানী হেতু যান-বিভাগে মূল্যাধিক্য ঘটিয়াছিল। কার্পাস ব্যতীত অন্যান্য সূতা এবং সূতি-দ্রব্যের মূল্য যে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা পড়িয়াছিল, কাঁচা পশম এবং কৃত্রিম রেশমী সূতা এবং সূতি-বস্ত্রের অধিকতর আমদানীই তাহার কারণ। যুদ্ধারম্ভের পরে কাঁচা পশমের চাহিদা প্রখর হইয়াছিল; এবং জাপান হইতে প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম রেশমী সূতা ও সূতি-বস্ত্রের আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সকল হ্রাস-বৃদ্ধির জমা-খরচের ফলে, মোটের উপর আমদানী-পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল।

যে দেশের রপ্তানী আমদানী অপেক্ষা অধিক, সে দেশ উত্তমর্ণ; কারণ, রপ্তানী-পণ্যের মূল্য হইতে আমদানী-পণ্যের মূল্য বাদ দিলে যে প্রাপ্য থাকে, তাহাই ঐ দেশের বাণিজ্যজমা-খরচের জমার ঘরে উদ্বৃত্ত অর্থ। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-বাজারে তাহার পশার (credit) অধিক। পক্ষান্তরে যে দেশের রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী অধিক, সে দেশ অন্যান্য দেশের নিকট ঋণী; সুতরাং অধমর্ণ। তাহার পশার কম। এই হিসাবে জমার ঘরে ভারতের উদ্বৃত্ত অঙ্ক (Favourable trade-balance) সম্প্রতি ভালই চলিয়াছে। এই উদ্বৃত্ত অঙ্ক কতটা প্রকৃত অথবা অপ্রকৃত, সে আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করিয়াছি। যাহা হউক, যুদ্ধপূর্ব্ব তিন বৎসরের তুলনায় যুদ্ধারম্ভ বৎসরে এই অঙ্ক সর্ব্বোচ্চ ছিল। নিম্নে একটি অঙ্ক-তালিকা দেওয়া হইল:—

বণিজ্ পণ্য	১৯৩৬-৩৭ টাকা (ক্রোর)	১৯৩৭-৩৮ টাকা (ক্রোর)	১৯৩৮-৩৯ টাকা (ক্রোর)	১৯৩৯-৪০ টাকা (ক্রোর)
রপ্তানী …	+১৯২.২৯	+১৮৯.২১	+১৬৯.২১	+২১৩.০৮
আমদানী …	−১৪১.১০	−১৭৩.৩৩	−১৫১.৭৯	−১৬৪.৭৫
উদ্বৃত্ত	+৫১.১৯	+১৫.৮৮	+১৭.৪২	+৪৮.৩৩
ধন-রত্ন				
স্বর্ণ (রপ্তানী) …	+২৭.৮৬	+১৬.৩৪	+১৩.০৬	+৩৪.৬৭
রৌপ্য (আমদানী)	−১৪.৩৯	−২.২৬	−১.৭৫	−৪.৭৪
কারেন্সী নোট (রপ্তানী)	+০.২৪	+০.২৮	+০.৫৮	+০.৩৪
উদ্বৃত্ত	+১৩.৭১	+১৪.৩৬	+১১.৮৯	+৩০.২৭
একুন উদ্বৃত্ত	+৬৪.১০	+৩০.২৪	+২৯.৩১	+৭৮.৬০

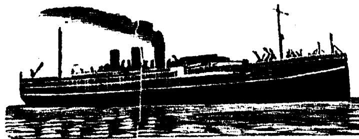
১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৫.৮৮ কোটি এবং ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৭.৪২ কোটি টাকার তুলনায়, আলোচ্য বর্ষে বণিজ্-পণ্যে উদ্বৃত্ত জমার অঙ্ক দাঁড়াইয়াছিল ৪৮.৩৩ কোটি টাকা। ঐ বর্ষে ভারতের স্বর্ণ রপ্তানীর মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ১৩.০৬ কোটি এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ১৬.৩৪ কোটি টাকার তুলনায়, ৩৪.৬৭ কোটি হইয়াছিল। যদিও রৌপ্যের আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তথাপি ধনরত্নে, রপ্তানী-মূল্য হইতে আমদানী-মূল্য বিয়োগ করিয়া, যথেষ্ট উদ্বৃত্ত ঘটিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ১১.৮৯ কোটি এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ১৪.৩৬ কোটির তুলনায়, আলোচ্য বর্ষে ৩০.২৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। ধন-রত্নের এই উদ্বৃত্তের সহিত বণিজ্-পণ্যের উদ্বৃত্ত যোগ দিলে, আলোচ্য বর্ষে ভারতের উদ্বৃত্ত জমার অঙ্ক, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ২৯.৩১ কোটি এবং তৎপূর্ব্ব-বৎসরের ৩০.২৪ কোটি টাকার তুলনায়, ৭৮.৬০ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। এখন, বিভিন্ন দেশের সহিত আমাদের আমদানী-রপ্তানীর হ্রাস-বৃদ্ধি বিচার করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার

করিব। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে যুক্তরাজ্যে প্রেরিত রপ্তানীর মূল্য ১৭ কোটি টাকা বাড়িয়াছিল; কিন্তু ঐ রাজ্য হইতে আমাদের আমদানীর মূল্য ৪ কোটি টাকা কমিয়াছিল। ফলে যুক্তরাজ্যের সহিত বাণিজ্য-জমা-খরচে আমাদের উদ্বৃত্ত জমার অঙ্ক, পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের ১২ কোটির তুলনায় ৩৩ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। বর্ম্মা ব্যতীত অন্যান্য বৃটিশ সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য-ব্যাপারে আমাদের উদ্বৃত্ত জমা অনুকূল ছিল,—পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ৩ কোটির তুলনায়, ১১ কোটি। বর্ম্মার ক্ষেত্রে ভারতের রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী অধিক ছিল; সুতরাং ঋণের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ১৩ কোটির তুলনায়, ১৮ কোটি দাঁড়াইয়াছিল। ভারতের সমগ্র বৈদেশিক আমদানীর তুলনায়, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের শতকরা ৫৮ ভাগ হইতে ৫৬ ভাগে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। যুক্তরাজ্য ব্যতীত অষ্ট্রেলিয়া ও পূর্ব্ব-আফ্রিকা হইতেও আমদানী হ্রাস পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে বর্ম্মা, প্রণালী-উপনিবেশ, সিংহল, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং ক্যানাডা হইতে আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফ্রান্স এবং নেদারল্যাণ্ডস্ (হল্যাণ্ড) হইতে আমাদের আমদানী অপরিবর্ত্তিত ছিল; কিন্তু জার্ম্মাণী, বেলজিয়ম এবং ইটালী হইতে আমদানী কমিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন এবং জাভা হইতে আমাদের আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রপ্তানী-ক্ষেত্রে, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা অধিকতর পরিমাণে ভারতীয় পণ্য গ্রহণ করায়, ভারতের সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্যের তুলনায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের শতকরা ৫৩ ভাগ হইতে ৫৬ ভাগে উন্নীত হইয়াছিল। অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশের মধ্যে ফ্রান্স দেশে ভারতীয় রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু জার্ম্মাণী, বেলজিয়ম, নেদারল্যাণ্ডস্ এবং ইতালী কম পণ্য লইয়াছিল। জাপানও ভারত হইতে গৃহীত পণ্যের মাত্রা কমাইয়াছিল; কিন্তু চীন ও যুক্তরাষ্ট্র অধিকতর পরিমাণে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিয়াছিল।

বিভিন্ন পণ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা, লৌহ ও ইস্পাত, হাওয়া-গাড়ী, কার্পাস বস্ত্রাদি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, এবং পিত্তল ও লৌহ-নির্ম্মিত দ্রব্যজাত যুক্তরাজ্য হইতে কম পরিমাণে আসিয়াছিল। লৌহ ও ইস্পাতে, যুক্তরাজ্য ও জার্ম্মাণী হইতে আমদানীর অংশ পূর্ব্ব-বৎসরের তুলনায় শতকরা ৫৬ ও ১১'৫ ভাগ হইতে ৪৬ ও ৭ ভাগে নিম্নগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, লাক্‌সেমবার্গ, বেলজিয়ম এবং জাপান হইতে ঐ পণ্যের আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কল-কব্জার আমদানী জার্ম্মাণী, বেলজিয়ম, সুইডেন, এবং জাপান হইতে হ্রাস পাইয়াছিল; কিন্তু যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানীর পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের শতকরা ৫৯ ও ১১ ভাগ হইতে ৬১ ও ১৭ ভাগে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। লৌহ ও পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্যাদিতে, জার্ম্মাণী হইতে যে পরিমাণ আমদানী কমিয়াছিল, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান হইতে তাহার পূরণ হইয়াছিল, এবং যুক্তরাজ্যের অংশ শতকরা ৫৮ ভাগে অবিচলিত ছিল। মোটরযানে যুক্তরাজ্যের অংশ শতকরা ৭ ভাগ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডা, তাহাদের অংশ শতকরা ৩৯ ও ১৩ হইতে ৪৮ ও ১৮ ভাগে উন্নীত করিয়াছিল; জার্ম্মাণী ও ইতালী হইতে আমদানী কমিয়াছিল। কার্পাস বস্ত্রাদিতে যুক্তরাজ্য ও জাপানের আধিপত্য অধিক। আলোচ্য বর্ষে স্বভাবতঃই যুক্তরাজ্য হইতে আমদানী কমিয়াছিল, এবং জাপান তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করিয়াছিল। যুক্তরাজ্যের অংশ, শতকরা ৪০ হইতে ৩২ ভাগে অবনমিত হইয়াছিল। রেশমী এবং কৃত্রিম রেশমী দ্রব্যে আমদানী কম হইলেও জাপানে তাহার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কার্পাস ও রেশমী দ্রব্যে চীন তাহার অংশ শতকরা ৫ ও ২৩ ভাগ হইতে ৭ ও ৪১ ভাগে বৃদ্ধি করিয়াছিল।

রপ্তানী-বাণিজ্যে ভারতীয় চা-এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রেতা যুক্তরাজ্য পরিমাণ হ্রাস করিয়াছিল; কিন্তু ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। সিংহলও তাহার অংশ বৃদ্ধি করিয়াছিল। কাঁচা পাটের রপ্তানী যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ২৬, ১১, ও ৫ হইতে ৩৭, ১৫ ও ১০ ভাগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। জার্ম্মাণী, বেলজিয়ম এবং ইতালী কম পরিমাণে কাঁচা পাট লইয়াছিল। পাট-নির্ম্মিত দ্রব্যে, যুক্তরাষ্ট্র তাহার পরিমাণ শতকরা ২৩ ভাগে ও আর্জেণ্টাইনা শতকরা ৬'৫ ভাগে নামিয়া গিয়াছিল। যুক্তরাজ্য এই পণ্যে তাহার অংশ শতকরা ১০ হইতে ২৫ ভাগে বৃদ্ধি করিয়াছিল। জাপান কাঁচা কার্পাস তুলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রেতা, সে পূর্ব্ব বৎসরের শতকরা ৪৭ ভাগের স্থলে ৩৬ ভাগ মাত্র লইয়াছিল। পক্ষান্তরে, চীন পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের শতকরা ৭ ভাগের স্থলে ২২ ভাগ লইয়াছিল। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, এবং যুক্তরাষ্ট্রও তাহাদের গৃহীত অংশ বৃদ্ধি করিয়াছিল; কিন্তু জার্ম্মাণী, বেলজিয়ম্ এবং নেদারল্যাণ্ডস্ কম ক্রয় করিয়াছিল। যুক্তরাজ্য ও বেলজিয়ম্ ব্যতীত প্রধান প্রধান সকল য়ুরোপীয় দেশ তৈলবীজ কম লইয়াছিল; পরন্তু যুক্তরাষ্ট্র তাহার আমদানী বৃদ্ধি করিয়াছিল। অন্যান্য অপ্রধান পণ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির আলোচনা অসম্ভব, এবং নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে আমদানী ও রপ্তানী উভয়বিধ বাণিজ্যের মূল্য ও পরিমাণ দুইই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে এই উভয়ে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহার সংখ্যা-সমষ্টির তুলনামূলক সমালোচনা আগামী বর্ষে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।





কাঁচের পাত্রে নক্সার কাজ

রকমারি-নক্সার কাজ-করা পোর্শিলেনের ফুলদানী দেখে কার না কেনবার সাধ হয়? এ ফুলদানীতে ঘরের বাহার খোলে। মেয়েদের মধ্যে ঘর সাজাবার ঝোঁক যাঁর নেই, তাঁকে থাপছাড়া-ধাতের মানুষ মনে করলে দোষ হবে না!

কিন্তু এ সব খাঁটী-পোর্শিলেনের ফুলদানী বা অন্য আসবাব-পত্রের দাম খুব বেশী। আমাদের মতো গৃহস্থের সখ থাকলেও সাধ্য নেই, দাম দিয়ে সে-সব কিনি!

না কিনতে পারি, দুঃখ নেই। কাঁচের কম-দামী ফুলদানী, জলের-জ্যগ, শিশি-বোতল, ডিকাণ্টার, গ্লাশ প্রভৃতি কিনে তাতে রঙ দিয়ে পোর্শিলেনের দামী আর নক্সাদার আসবাব-পত্রের রূপ দেওয়া মোটেই শক্ত নয়। বর্ষার দিনে ঘরে বসে অনায়াসে আমরা এ-কাজ করতে পারি। কাঁচের সে রঙ-করা ফুলদানী প্রভৃতি দেখলে কারো সাধ্য থাকবে না, কম-দামী বলে তাদের অবজ্ঞা করেন! নকল-পোর্শিলেনের সে-সব ফুলদানী প্রভৃতি দেখতে হবে ঠিক ঐ আসল এট্রুশকান্, আসিরীয়ান, পারসীক বা চীনা ফুলদানীর মতো।

নকল-পোর্শিলেনের এ-ফুলদানী প্রভৃতি তৈরী করতে হলে সব-আগে চাই সখ আর শিল্প-কলায় সূক্ষ্ম রুচি-জ্ঞান। তার পর মাল-মশলা। মাল-মশলার জন্য চাই রকমারি-ছাঁচের কাঁচের গ্লার্শ, বোতল, ফুলদানী, শিশি, প্লেট, পেয়ালা, ডিকাণ্টার প্রভৃতি; রঙীন-কাগজ; বা নানা-রঙে আঁকা ফুল, পাতা, পাখী, হরিণ, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির ছবি; পেইণ্ট-ব্রাশ (কতকগুলি শূয়ার-কুঁচির ব্রাশ ও কতকগুলি উটের-লোমের ব্রাশ—hog's hair and camel's hair brushes); এক-বোতল শিরীষের আঠা বা রবার সিমেণ্ট; এক-বোতল তার্পিন তেল; এক-শিশি তিসির (লিন্‌সীড) তেল; এক-শিশি কোপাল-বার্ণিশ; জমি রঙাবার জন্য নানা-রকম রঙ (টিউবে-ভরা সব-রকম রঙ কিন্‌তে পাওয়া যায়); এক-প্যাকেট স্বর্ণ-চূর্ণ (ছাপাখানায় যে-গুঁড়ো দিয়ে সোনালি হরফে বিয়ের চিঠি ছাপা হয়); দুখানা সরু কাঁচি—একখানি বড়, অপরখানি ছোট সাইজের; আর চাই এক-বোতল গাম্-এ্যারেবিক বা



১। কাঁচের জিনিষে নকল পোর্শিলেনের সাজ

আরবী গঁদের জল। এ জল বাড়ীতে তৈরী করতে পারেন। এক-পাঁইট ফুটন্ত-জলে চার-আউন্স আরবী-গঁদ মেশালেই হবে। মশলার দোকানে আরবী-গঁদ বা গাম্-এ্যারেবিক কিনতে পারেন।

বাজারে সাদা কাঁচের রকমারি-সাইজের ফুলদানী শস্তায় অঢেল কিনতে পারেন। ছোট-বড় যেমন চান। ১নং ছবিতে যে-সব রকমারি প্যাটার্ণের ফুলদানী-ডিকান্টার শিশি-বোতল দেখছেন, ওগুলি সব সাদা কাঁচের। রঙ করে ওদের এমন রূপে সাজিয়ে তোলা হয়েছে যে, দেখলে কে ওদের আদিম ইতিহাস ধরতে পারবে! কিন্তু ও-কথা থাক!



২। জাগের মধ্যে ঢালুন

যে সব মাল-মশলার ফর্দ্দ দেওয়া হলো, সেগুলি সাজিয়ে নিয়ে বসুন। হ্যাঁ, এই সঙ্গে একখানি ফর্শা তোয়ালে নিন; আর নিন নরম ক'টুক্‌রো ছেঁড়া ন্যাকড়া; আর গামলায় ভরে এক-গামলা জল।

প্রথমেই কাঁচের শিশি-বোতল, ফুলদানী বা পাত্র-গুলির ভিতর-বাহির বেশ করে ধুয়ে সাফ করতে হবে। এ্যাল্‌কহল্ দিয়ে সাফ করবেন। তাহলে কাঁচের গায়ে তেলা-রকমের মিহি যে সব লেগে থাকে, তা উঠে যাবে। এই সব লেগে থাকলে সিমেন্ট দিলেও কাঁচের গায়ে রঙ ধরানো যাবে না। রঙ ধরলেও সে-রঙ কায়েমি ভাবে এঁটে থাকবে না, খশে ঝরে যাবে।

কাঁচের পাত্রের ভিতর-বাহির এ্যাল্‌কহল্ দিয়ে সাফ করবার পর পাত্রের ভিতরে এককোট্ করে গাম-এ্যারেবিক বা আরবী-গঁদের জল লাগান। লাগানো হলে পাত্রের গায়ের এ-জলটুকু সম্পূর্ণ ভাবে শুকোতে দিন।

এবার গ্লাসের বা ফুলদানীর গায়ে লাগাবার জন্য রঙ তৈরী করুন। এ রঙ হবে তেল-রঙ (oil-colour)। যে-রকম রঙ করতে চান, তার্পিন-তেলের সঙ্গে সেই রঙ খানিকটা মিশিয়ে সেটা



৩। তেল-রঙে রঙীন্



বেশ করে ঘেঁটে নিন্। তার পর এই তেল-রঙটুকু একটা বোতলে ভরে আপাততঃ রেখে দিন। এটা হলো তেল-রঙ বা প্রলেপ।

এবার আর এক কাজ করুন। কোপাল-বার্ণিশ, তিসির তেল এবং তার্পিন তেল—এই তিনটি জিনিস সম-পরিমাণে মিশিয়ে পরিষ্কার একটি বোতলে ঢেলে পাঁচ-সাত মিনিট ধরে জোরে-জোরে বোতলটি নাড়তে থাকুন। রোগীকে মিকশ্চার-ওষুধ খাওয়াবার সময় মিকশ্চার-ভরা শিশি যে ভাবে নাড়তে হয়, সেই ভাবে বোতলটি নাড়বেন। নাড়ার চোটে এ-তিনটি জিনিষ মিশে একাকার হয়ে যাবে। তখন এই মিকশ্চারের এক-চামচ (বড় চামচের এক-চামচ) নিয়ে একটা

ফ্যা্রুকা পাত্রে ঢালুন। ঢেলে আগে ঐ টার্পিনের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে যে-প্রলেপ তৈরী করে রেখেছেন—ফ্যারুকা-পাত্রের এই মিকশ্চারের সঙ্গে সেই রঙ মিশিয়ে দুটো এক করে নিন। নিয়ে ফ্যানেল দিয়ে ২নং ছবির ভঙ্গীতে কাঁচের যে-বোতল, যে-ফুলদানী বা জ্যাগকে নকল-পোর্শিলেনের ছাঁচে নক্সাদার তৈরী করতে চান, তার মধ্যে ঢালুন। পুরোপুরি ঢালবেন না। যে-পাত্র রঙ করতে চান, তার ছ'আনা ভাগ পূর্ণ হয় এমন মাত্রায় ঢালবেন। ঢেলে বেশ করে সেটাও নেড়ে-চেড়ে দেখবেন, তেল-রঙটুকু যেন পাত্রের ভিতর-গায়ে সমান-ভাবে সব জায়গায় প্রলেপের মতো লেগেছে।



৫। ভিতরে প্রলেপ



৪। এমনি করে' আঙুল দিয়ে টিপে-টিপে

৩নং ছবি দেখুন। এমনিভাবে কাঁচের ভিতর-দিকটা এ-রঙে রঙীন হবে; কোথাও এতটুকু ছিদ্রবৎ ফাঁক না থাকে, দেখবেন। রঙ করা হয়ে গেলে পাত্রের মধ্যে যে তেল-রঙ উদ্বৃত্ত থাকবে, সেটুকু অন্য একটি পাত্রে আবার ঢেলে রেখে দিন। রাখবার পর ঐ তেল-রঙের প্রলেপ-মাখানো ফুলদানী, বোতল বা জ্যাগকে শুকোতে দিন।

শুকিয়ে যাবার পর যে কোপাল-মিকশ্চার আছে—কোপাল-বার্ণিশ, তার্পিন এবং তিসির তেলের যে মিকশ্চার করে রেখেছেন—সেই-মিকশ্চার ঢালুন ফুলদানী, বোতল বা জ্যাগের মধ্যে। এতে পালিশ খুলবে। এটুকু যখন বেশ খট্‌খটে হয়ে শুকিয়ে উঠবে, তখন জানবেন ভিতরের কাজ শেষ হলো।

এবার রকমারি চিত্রবিচিত্র করার পালা। কাগজে আঁকা যে রঙীন ছবি নিতে বলা হয়েছে,—সে-ছবি কলা-সম্মতভাবে অর্থাৎ যে-ছবি যে-পাত্রে মানাবে, বুঝে সিমেণ্ট বা শিরীষের আঠা দিয়ে ঐ বোতল, ফুলদানী বা জ্যাগের গায়ে সাবধানে এঁটে নিন্। আঁটবার সময় খুব হুঁশিয়ার, কাগজ যেন সরে না যায়! তাহলে ঢ্যাল্‌-ঢুল্‌লো হয়ে থাকবে; এবং তা থাকলে দেখতে কদর্য্য হবে। আঙুল দিয়ে খুব সন্তর্পণে টিপে-টিপে ছবি আঁটবেন—৪নং ছবির ভঙ্গীতে। কাগজে কোথাও যেন খাঁজ বা ভাঁজ না পড়ে, দেখবেন। এ কাজটুকু তাড়াতাড়ি করলে চলবে না। বেশ ধীর ভাবে স্থির-মনে করতে হবে। আঁটা হলে তার উপর পাৎলা এককোট্ কোপাল-বার্ণিশের প্রলেপ



৬। নকল পোর্শি-লেনে কারিকুরি

মাখাবেন। বড় মোটা তুলি ধরে বার্ণিশের প্রলেপ দেবেন। তুলি ধরে বার্ণিশের প্রলেপ দেবার সময় কাঁচের গায়ে যেন হাত না লাগে, সাবধান!

কাগজের নীচে আঠা শুকিয়ে গেলে যদি দেখেন, গায়ে আঠা লেগে আছে (থাকা সম্ভব), তাহলে আল্‌তোভাবে ভিজে ন্যাকড়া বুলিয়ে ঘষে দিলেই সে আঠা এবং আঠার দাগ উঠে যাবে। ভিজে-ন্যাকড়া লাগালে শিরীষের আঠা বা রবার-সিমেণ্টের চিহ্ন আর কাগজের গায়ে লেগে থাকবে না। জ্যাগের বা ফুলদানীর হাতল বা বাহিরের কোনো অংশে যদি রঙ দিতে চান, তাহলে তুলি দিয়ে ৫নং ছবির ভঙ্গীতে রঙের প্রলেপ লাগাবেন।



৭। কাঁচের বোতলে ছবি রঙ করা

হাত রপ্ত হলে নানা-ছাঁদে নানা-নক্সার কাজ করা খুব সহজ হবে, দেখবেন। যাঁরা ছবি আঁকতে জানেন, কাগজের কাটা-ছবি না এঁটে রঙ দিয়ে পাত্রের গায়ে তাঁরা রকমারি ছবি এঁকে নিতে পারেন।

আর একটি কথা, বেনের দোকানে কাপড় ছোপাবার জন্য নানা-রঙের যে গুঁড়ো-রঙ কিনতে পাওয়া যায়, সেই রঙ কিছু-কিছু তার্পিণ-তেলে মিশিয়ে পাত্রের মাটীর গায়েও তা দিয়ে চমৎকার নক্সা আঁকতে পারেন।

বিনীত প্রার্থনা

হে ভগবান, তোমার কাছে মোর বিনীত প্রার্থনা—
জীবনে যেন পাই নাকো আর দুঃখ এবং যন্ত্রণা।
নোটের তাড়া, টাকার কাঁড়ি,
তালুকদারী, বাগান, বাড়ী—
সবই প্রভু, ঢালিয়া দিয়ো—শুনো না কারো মন্ত্রণা।
অধম-তারণ, তোমার পায়ে এই বিনীত প্রার্থনা।

বুড়ো হলেও এ দেহে যেন যৌবন রয় ঘিরিয়া।
আমার হৃদি-কুঞ্জ রেখো পত্রে-পুষ্পে ভরিয়া।
দিয়ো গো প্রভু এমন প্রিয়া,
রূপে ও গুণে অতুলনীয়া;
হাসি-কান্নায় মণি-মুক্তা পড়িবে যার ঝরিয়া!
গুঞ্জনে যার কুঞ্জ আমার থাকবে সদা মুঞ্জরিয়া।

দেশের লোকে সবাই যেন মান্য করে আমাকে
তিব্বতীরা করে যেমন তাদের দেশে 'লামা'কে।
বন্ধুগণে লইয়া মোর
কাটাই যেন জীবনভোর
গানে, গল্পে, রঙ্গ-রসে, চা-সিগারেট-তামাকে।
মান্‌তে যেন হয় না আমায় 'হোরে'-'নোরে'-'রামাকে'।

দেশের যত সভা-সঙ্ঘ-দ্বারোদ্‌ঘাটন ব্যাপারে
সভাপতির আসনখানি দেয় গো যেন আমারে।
শীর্ণ দেহ করো স্থূল,
টাকে আমার গজাও চুল,
কালো-বরণ গৌর করো চমক লাগুক সবারে।
দেখে সবাই মুগ্ধ হোয়ে বল্‌বে, "বাঃ! বাঃ! বাহা রে!"

বড়-বড় বাক্য বলা হয় যেন অভ্যাস গো।
সবাই যেন ভাবে আমায় কলির 'বেদব্যাস্' গো।
নামের শেষে জুড়িয়া দিয়ো,
দেশী এবং ই-য়ুরোপীয়
অর্দ্ধ-হস্ত, জবরদস্ত 'টাইটেল্' বা 'ল্যাজ্' গো
যেমন 'পি-আর্', 'বিদ্যা-পাহাড়্', 'এম-আর-সি-ও(গ্ল্যাস্‌গো)।

আর এক কথা জানাই সোজা, কোর্‌বো নাকো ভণিতা
আমার যারা শত্রু—তাদের শিঙা ফোঁকাও হে পিতা!
দয়াল প্রভু, তোমার কাছে
শেষ নিবেদন একটি আছে—
এমনি ধারা ছাই-ভস্ম যা'-ই লিখি না, সবই তা',
কৃপায় তব হয় যেন গো, প্রথম শ্রেণীর কবিতা।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

ইতিহাসের অনুসরণ

কলিকাতার ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

৪

১৭১৭ খৃষ্টাব্দ—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ

ইংরেজ বণিকরা অতি শুভক্ষণেই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন ; কয়েকটি অনুকূল রাজনৈতিক ঘটনার সহায়তায় অতি অল্পকালেই তাঁহাদের মুষ্টিমেয় জমিদারী ধনে, জনে, ঐশ্বর্য্যে ও পরাক্রমে অলকার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন কিছু দিন পূর্ব্বের সেই নগণ্য কলিকাতা একটি বৃহৎ সহরে পরিণত হইয়াছিল ; উহার অধিবাসিসংখ্যা তখন তিন লক্ষেরও অধিক। ইংরেজ জনগণের কলিকাতায় আগমনের অতি অল্পকাল পরেই (১৬৯৬ খৃঃ) পশ্চিমবঙ্গের জমিদার শোভাসিংহের বিদ্রোহ সমগ্র দেশকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। পাঠান-সর্দ্দার রহিম খাঁ ঐ বিদ্রোহে যোগ দিয়া ব্যাপারটা আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফলে, বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিগণ তাহাদের ধন-জন নিরাপদে রক্ষা করিবার আশায় ইংরেজ বণিকগণের আশ্রয় গ্রহণই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিল। তাহারা সেই সুযোগ ত্যাগ করিল না। এ-দিকে এই সুযোগে ইংরেজরাও দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণে কলিকাতার বনিয়াদ সুদৃঢ় করিলেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের বর্গীর হাঙ্গামার জন্যও এ দেশের বহু লোক ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এই সময়ে নবাব আলিবর্দ্দীর অনুমোদনে ইংরেজরা কলিকাতার চারিদিকে একটি খাত খনন করিতে আরম্ভ করেন ; উহাই বিখ্যাত 'মারাঠা ডিচ্।' কিন্তু খাতটি তিন মাইলের অধিক খনন করা হয় নাই—কোম্পানির ইচ্ছা ছিল, উহা সমগ্র সহর পরিবেষ্টন করিয়া বর্ত্তমান হেষ্টিংসের নিকট গঙ্গা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবে। এই খাত বর্ত্তমান সারকুলার রোডের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া বহু দিন যাবৎ বর্ত্তমান ছিল, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে উহা আংশিক ভাবে ভরাট করা হয় ; পরে সারকুলার রোডের উপর দিয়া ধাপা-রেলপথ নির্ম্মাণের সময় ঐ খাতের উপর দিয়াই লাইন স্থাপিত হইয়াছিল।

এই সময়ে কলিকাতার অবস্থা কতকটা "জোর যার মুলুক তার" মত হইয়াছিল। জব চার্ণক যখন কলিকাতায় আসেন, তখন লালদীঘির পাড়ে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারী ও বিগ্রহ শ্যামরায়ের মন্দির ছিল, কিন্তু সেই কাছারীর কর্ত্তৃত্বকে লোকে ভয় করিত বলিয়া মনে হয় না। ঐ কাছারীর আমিন ছিলেন বিখ্যাত কবি এণ্টনি সাহেবের পিতামহ বুড়া এণ্টনি। তিনি সেই সময় জব চার্ণকের চাবুক খাইয়া কাঁচড়াপাড়ায় পলায়ন করেন। জনশ্রুতি আছে, এই শ্যামরায় বিগ্রহের দোল উপলক্ষে এত অধিক আবীর ব্যয় করা হইত যে, তাহার ফলে লালদীঘির জল লালবর্ণ ধারণ করিত ; এবং উহার জলের লালবর্ণ হইতেই না কি লালদীঘি নামের উৎপত্তি। কথাটি স্মরণ রাখিবার যোগ্য। শ্যামরায়ের রাধা-ঠাকুরাণীর নাম হইতেই রাধা-বাজারের উৎপত্তি। এই হোলী উৎসব দেখিতে ইংরেজদিগকে বাধা দেওয়াতেই বুড়া আমিন এণ্টনির ঐরূপ দুর্দ্দশা !

কলিকাতায় তখন ইষ্টকালয় ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের পাট্টার পরে কোম্পানি চৌধুরীদের কাছারী কিনিয়া লইয়া মূল্যবান দলিলাদি রাখিবার জন্য ব্যবহার করিতেন। জব চার্ণক কলিকাতায় আসিবার পর দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় ; এখনও লালবাজারের সেণ্ট জন গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে তাঁহার সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। কোম্পানি কলিকাতার জমিদারী শাসনের জন্য এক-এক জন কালেক্টর নিযুক্ত করিতেন, সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের কালে বিখ্যাত জমিদার হলওয়েল সাহেব এই কালেক্টর ছিলেন। তাঁহার অধীন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে 'ব্ল্যাক জমিদার' বলা হইত। তাঁহারাই

কলিকাতাবাসীদের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। কলিকাতার পুলিশ-শাসন ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই। ঐ বৎসর মিষ্টার ম্যাকিনটস্ কলিকাতাকে অস্বাস্থ্যকর, অপরিচ্ছন্ন, এবং অশাসিত স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

প্রাচীন কলিকাতার বাড়ী-ঘর প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা করিবার পক্ষে তিনখানি মূল্যবান দলিল ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের মিঃ উইল্সনের, ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মিঃ উডের, এবং ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের অপজন সাহেবের ম্যাপ। এইগুলির মধ্যে উইল্সনের ম্যাপটিই পলাশি-যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী। ঐ ম্যাপে কলিকাতার ইংরেজটোলার সঠিক অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

মোটামুটি ভাবে লালদীঘির পশ্চিমে বর্ত্তমান জেনারল পোষ্ট-অফিসের নিকটবর্ত্তী স্থানে ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত গীর্জ্জার উত্তরে গঙ্গার ধারে সোরার গুদাম (বর্ত্তমান এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের বাড়ী); বর্ত্তমান কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে কোর্ট হাউস (১৭২৬ খৃঃ); লালদীঘির উত্তরে সেণ্ট এন গীর্জ্জা (১৭০৯ খৃঃ) অবস্থিত ছিল। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ঝড়ে এই গীর্জ্জাটির চূড়া ভাঙ্গিয়া যায় এবং ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা উহা বিধ্বস্ত করেন। বর্ত্তমান হেয়ার ষ্ট্রীটে কোম্পানির হাসপাতাল ও আস্তাবল, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে কাউন্সিল-গৃহ স্থাপিত ছিল। গঙ্গার ধারে দুর্গের বাঁধাঘাট ও আরও কয়েকটি পাথরের ঘাট শোভা পাইত। বর্ত্তমান ফিনলেমিউয়ের অফিস-ঘরে তখনকার রঙ্গালয় অবস্থিত ছিল। ইংরেজটোলায় দেশী লোকের বাস ছিল না বলিলেই হয়, একমাত্র বিখ্যাত ধনী উমিচাঁদ মহা আড়ম্বরে বর্ত্তমান 'লায়ন্স-রেঞ্জ' নামক স্থানে বাস করিতেন। রামকৃষ্ণ শেঠের বাড়ী বর্ত্তমান মেটকাফ হলের স্থলে অবস্থিত ছিল, উহা পরে মিঃ অমিট্ ভাড়া লইয়াছিলেন। মিশন রো তখনকার

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা ইংরেজ-টোলার আনুমানিক মানচিত্র—(উইলসনের ম্যাপ অবলম্বনে)

বেড়া দেওয়া রাস্তা, উহাকে "রোপ ওয়াক" বলিত। লালবাজার রাস্তাই একমাত্র বড় রাস্তা ছিল; উহার উত্তরে বর্ত্তমান বেন্টিং ষ্ট্রীট—তখনকার কসাইটোলায় কয়েকটি হোটেল বা ট্যাভার্ণ ছিল।

ইংরেজটোলার বাহিরে উল্লেখযোগ্য ইংরেজের ঘর-বাড়ীর মধ্যে বাগবাজারের পেরিন সাহেবের বাগান প্রধান। সম্ভবতঃ, এই বাগান-বাড়ী হইতেই বাগবাজার নামের উৎপত্তি। পরবর্ত্তী কালে এই বাগানের পূর্ব্বে কোম্পানির বারুদখানা স্থাপিত হইয়াছিল (১৭৫২ খৃঃ)।

ইংরেজটোলার উত্তরে আর্ম্মানি ও ফিরিঙ্গীদের বাস। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দেও এখানে আর্ম্মানি গীর্জ্জা স্থাপিত ছিল; ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজদিগের সেণ্ট নাজারথ গীর্জ্জা স্থাপিত হয়। কথিত আছে, উমিচাঁদের শ্যালক হুজরিমল ঐ গীর্জ্জার একটি চূড়া নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী-টোলা ও বড়বাজার অঞ্চলেরও এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বর্ত্তমান চিৎপুর ও মুর্গীহাটার সংযোগস্থলকে ফৌজদারী বালাখানা বলে; হুগলীর ফৌজদারগণ কলিকাতা আসিলে, তাঁহাদের এই স্থানের বাড়ীতেই তাঁহারা বাস করিতেন, এবং ইংরেজ বণিক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকের প্রদত্ত উপহারাদি গ্রহণ করিতেন। বাড়ী-ঘর এখনও সুসংবদ্ধ বা সুনির্ম্মিত না হইলেও বহু বড়লোকের ও বড়বংশের যে উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের দলিলে কলিকাতার তেরেটি-বাজার এবং বাগবাজার, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, জানবাজার, বড়তলা, হাটখোলা প্রভৃতি নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সময়ের বাঙ্গালীদের মধ্যে পোস্তার রাজবংশ (নকুধর) ও পাথুরিয়া-ঘাটার ঠাকুর-বংশ ব্যতীত প্রবল প্রতাপ 'ব্ল্যাক জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্রের (১৭২০—১৭৫৬ খৃঃ) নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইনি কুমারটুলির মিত্রবংশের আদিপুরুষ। কুমারটুলিতে ইনি বিখ্যাত 'নবরত্নের মন্দির স্থাপন করেন; শুনা যায়, ঐ মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়া অক্টারলোনী মনুমেণ্টের অপেক্ষাও অধিক উচ্চ ছিল। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ঝড়ে মন্দিরটি নষ্ট হইয়া যায়। এই সময়ের অপর বিখ্যাত লোকদিগের মধ্যে দুর্লভরাম (ইঁহার পুত্র রাজবল্লভ ক্লাইভের রাঁয়-রাঁয়া ছিলেন), শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ এবং আন্দুল রাজবংশের আদিপুরুষ দেওয়ান রামচরণ সুখময় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ে মারাঠা ডিচের পূর্ব্বে কয়েকখানি বড়-বড় বাগান-বাড়ী ছিল। বর্ত্তমান শেঠের বাগান বৈষ্ণব-চরণ শেঠের, হালসী বাগান উমিচাঁদের এবং সাহেব-বাগান সম্ভবতঃ কোম্পানির রাইটার সাহেবদের বাগান-বাড়ী। সিরাজ কলিকাতা আক্রমণকালে উমিচাঁদের এই বাগান-বাড়ীতেই ছাউনি করিয়া ছিলেন।

এই যুগের ইংরেজ কুঠীয়ালগণ কেমন করিয়া দিন কাটাইতেন, তাহা জানিবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বিদেশী পর্য্যটক এ সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ দিয়াছেন—তাহাও সুখপাঠ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক।

ইংরেজ প্রভুদের বাড়ীর ফটক সাধারণতঃ প্রভাতে সাড়ে সাতটা বা আটটার সময় খোলা হইত। এই সময় দলে-দলে প্রার্থী ও কর্ম্মচারিগণ হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া সাহেবের নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিত। হুজুর জাগরিত হইয়া তাঁহার পাদদ্বয়ের কতক অংশ গাত্রাবরণ হইতে বাহির করিবামাত্র সকলে হেড-বেয়ারার নির্দ্দেশ মত তাঁহার শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইয়া নবাবী কায়দায় তিন বার কুর্নিশ করিত। এই সেলামের পদ্ধতিও ছিল বেশ জাঁকাল; হাতের পিঠের দিক ভূমির সহিত, এবং তলার দিক কপালের সহিত স্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে হইত। সাহেব হয় ত চক্ষু মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিতেন মাত্র। তার পর প্রভুর অঙ্গরাগ আরম্ভ হইত, জামা-কাপড় পরা ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতেন না, পুতুলের ন্যায় [illegible] সেবা গ্রহণ করিতেন। এইবার ভোজন-টেবিলে উপস্থিত হইয়া তিনি এক দিকে আহার্য্য গ্রহণ করিতেন, এবং অপর দিকে নাপিত তাঁহার কেশ-বিন্যাস করিত। প্রার্থিগণ এই সময়ে দুই-একটি আরজি পেশ করিতে পারিত। এ-দিকে হুকা-বরদার গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া নলটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, কখন হুজুর গ্রহণ করিবেন এই প্রতীক্ষায়। হুকা বা গড়গড়া এই সময়ে সাহেবদের খুব প্রিয় ছিল, হুকা-বরদার নামক চাকরকে সব সময়েই তামাক লইয়া হুজুরের পেছন-পেছন ঘুরিয়া বেড়াইতে

হইত। কোথাও বাহির হইতে হইলে সাহেব পালকির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন; তখন বহু বেহারা, বরকন্দাজ, পাইক, চোপদার প্রভৃতি বিভিন্ন পোষাকে কেহ বা অগ্রে থাকিয়া কেহ বা পেছনে থাকিয়া পালকির সঙ্গে সঙ্গে চলিত। দিবা-নিদ্রা, ও বহু রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া আমোদ-প্রমোদ তাঁহাদের নিত্যক্রিয়া ছিল। এক-এক জন সাহেবের সেবার জন্য বহুসংখ্যক চাকর নিযুক্ত থাকিত, এবং সাহেব প্রভু কিছুমাত্র পরিশ্রম না করিয়া পরম সুখে দিন কাটাইতেন। তাঁহার কৃপা-কটাক্ষ লাভের জন্য বহু দেশীয় লোক সর্ব্বদাই অবনত-মস্তকে যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিত; তাঁহার আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য এ দেশীয় বারনারীগণও রাত্রিযোগে প্রভুর শয়ন-মন্দিরে উপস্থিত থাকিত। বস্তুতঃ, ইঁহারা নবাব ছিলেন। বিলাত পর্য্যন্ত ইঁহাদের খ্যাতি প্রচারিত হইত।

৫

(১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ—১৮০০ খৃষ্টাব্দ)

১৬৯০ হইতে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়টিকে কলিকাতার অবাধ উন্নতির যুগ বলা যায়। ইহার পর প্রায় পনর বৎসর নানাবিধ রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতায় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে বাধা উপস্থিত হইলেও এই কয়েক বৎসরেই ইংরেজ বণিকের তুলাদণ্ড তাহাদের সৌভাগ্যক্রমে রাজদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। পিঠে বোঁচকা বাঁধিয়া মাল ফেরি করিতে আসিয়া ইংরেজ বাঙ্গালার ধূলায় রাজমুকুট কুড়াইয়া পাইল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন; তিনি উমিচাঁদের হালসী বাগানস্থ বাগান-বাড়ীতে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময় ইংরেজ-টোলার বহু বাড়ী-ঘর, সেণ্ট এন গীর্জ্জা, দুর্গ প্রভৃতি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। সিরাজ কলিকাতা নাম পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিয়া উহার নাম রাখিলেন—আলিনগর। এই আলিনগর হইতে এই অঞ্চলের প্রধান নগর আলিপুরের উৎপত্তি কি না, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ইতিহাস কি বলে—তাহা গবেষণাসাপেক্ষ। সিরাজের আক্রমণ ব্যতীত ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ভীষণ মহামারী ও ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের প্রলয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষেও কলিকাতার যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা অল্প দিনে পরিপূরণের উপায় ছিল না।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশি-যুদ্ধের পর 'ক্লাইভের গর্দ্দভ' বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সাক্ষীগোপাল নবাব হইলেন; এই সময় ইংরেজেরা ক্ষতিপূরণ বলিয়া ৬০ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। তাহার অংশ এ দেশের লোকদের মধ্যেও বিতরিত হইয়াছিল। মীরজাফরের পর তস্য জামাতা মীরকাশেম নবাব হইলে মীরজাফর নবাবীর আড়ম্বরের লোভ সংবরণ করিয়া মণিবেগমসহ কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন। নবাবীর মৌতাত ত্যাগ করিতে না পারায় ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরজাফর পুনর্ব্বার নবাব হইয়া ইংরেজগণকে নূতন সনন্দ প্রদান করেন; নবাব কি না! সেই সনন্দে যে ২৪টি পরগণার নাম ছিল, তাহা হইতেই বর্ত্তমান ২৪ পরগণা নামের উদ্ভব। ইহার পর ক্লাইভের দেওয়ানী প্রাপ্তি প্রভৃতি বহু রাজনৈতিক ঘটনা কলিকাতার উন্নতি-সাধনের অনুকূল হইয়াছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভের প্রধান কাজ হইল—নূতন করিয়া দুর্গ-নির্ম্মাণ; গোবিন্দপুরের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দুর্গ-নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। এই সময়ে কলিকাতার পুরাতন খালগুলিও ভরাট করা হয়। সেই সময় হইতেই বর্ত্তমান কলিকাতার বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণের সূত্রপাত। ক্লাইভ-প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান দুর্গের নির্ম্মাণকার্য্য ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। ক্লাইভ কলিকাতায় লায়ন্স রেঞ্জের বাড়ীতে, এবং দমদমায় তাঁহার বাগান-বাড়ীতে বাস করিতেন; এই শেষোক্ত বাড়ীটি এখনও অবিকৃত আছে। ক্লাইভের পর হেষ্টিংস কলিকাতায় আসেন; ক্রমে বিচারপতি স্যর ইলাইজা ইম্পে এবং কাউন্সিলের সদস্যগণেরও আগমন।

এই যুগ হইতে কলিকাতার ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাব নাই; বর্ত্তমান ইংরেজ-টোলার অনেক বাড়ীরই পত্তন এই সময়ে।

হেষ্টিংসের কলিকাতার বাড়ী হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ও দপ্তরখানা এস্প্লানেড রোডে বর্ত্তমান স্কট টম্সনের বাড়ীর স্থলে বর্ত্তমান ছিল; আলিপুরের হেষ্টিংস হাউস তাঁহার বাগান-বাড়ী। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট হাউস ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে দুর্গের মধ্যে ছিল; ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ভবনের

নিকট 'বাকিংহাম হাউস' নামে নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হয়, কিন্তু হেষ্টিংস তাহা পছন্দ করেন নাই। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ভবনের সূত্রপাত। বর্ত্তমান টাউন হলের নিকটে সুপ্রীম কোর্ট ছিল, পরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট-বাড়ী নির্ম্মিত হয়। কলিকাতার উন্নতিকল্পে এই সময়ে লটারি কমিটী নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ঐ কমিটীর চেষ্টাতেই ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান টাউন হলের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির প্রথম টাঁকশাল নির্ম্মিত হয়, উহা সেণ্ট জন গীর্জ্জার পশ্চিমস্থ বর্ত্তমান ষ্ট্যাম্প ও ষ্টেসনারী আফিসেরই বাড়ী। পাদরী কীর্ণাণ্ডারের প্রোটেষ্টাণ্ট গীর্জ্জা ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে এবং সেণ্ট জন গীর্জ্জা ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ঘোড়দৌড়ের মাঠের পার্শ্বে সদর দেওয়ানী আদালত, পরে উহা মিলিটারী হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সেণ্ট এন গীর্জ্জার স্থলে মেয়র্স-কোর্ট স্থাপিত ছিল। কসাই-টোলায় মসিয়ে টিরেটা (ফরাসী) ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে টিরেটস্ (টেরিটি)-বাজার স্থাপন করেন। বর্ত্তমান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটের পূর্ব্ব-নাম রাণী মুদীর গলী—এখানে বহু দিন যাবৎ অনেকগুলি ট্যাভার্ণ বা ফিরিঙ্গীদের খানাপিনার আড্ডা ছিল। বর্ত্তমান ফ্যান্সী লেন পূর্ব্বেকার ফাঁসীর স্থান; তখন প্রকাশ্য স্থানে অপরাধিগণের ফাঁসী দেওয়া হইত। রাইটার্স বিল্ডিং অধিকৃত স্থলের পুরাতন সেণ্ট এন গীর্জ্জা ধ্বংস হইলে পর ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে উহা কোম্পানির কেরাণীদের আফিস হয়। পূর্ব্বতন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বর্ত্তমান হঙ্কং ব্যাঙ্কের বাড়ী।

নূতন দুর্গ-নির্ম্মাণের সময় হইতেই চৌরঙ্গী পরিষ্কৃত হইতে থাকে। এখানে সুপ্রীম কোর্টের জজ ইলাইজা ইম্পের বাগান-বাড়ী ছিল। বর্ত্তমান পার্ক ষ্ট্রীট নাম সেই বাড়ী-সংলগ্ন 'ডিয়ার পার্ক' হইতে উদ্ভূত। কর্ণেল কীডের নাম হইতে কীডেরপুর (খিদিরপুর) পল্লীর নামকরণ হইয়াছে। কর্ণেল কীডই ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বোটানিকাল গার্ডেন স্থাপন করেন।

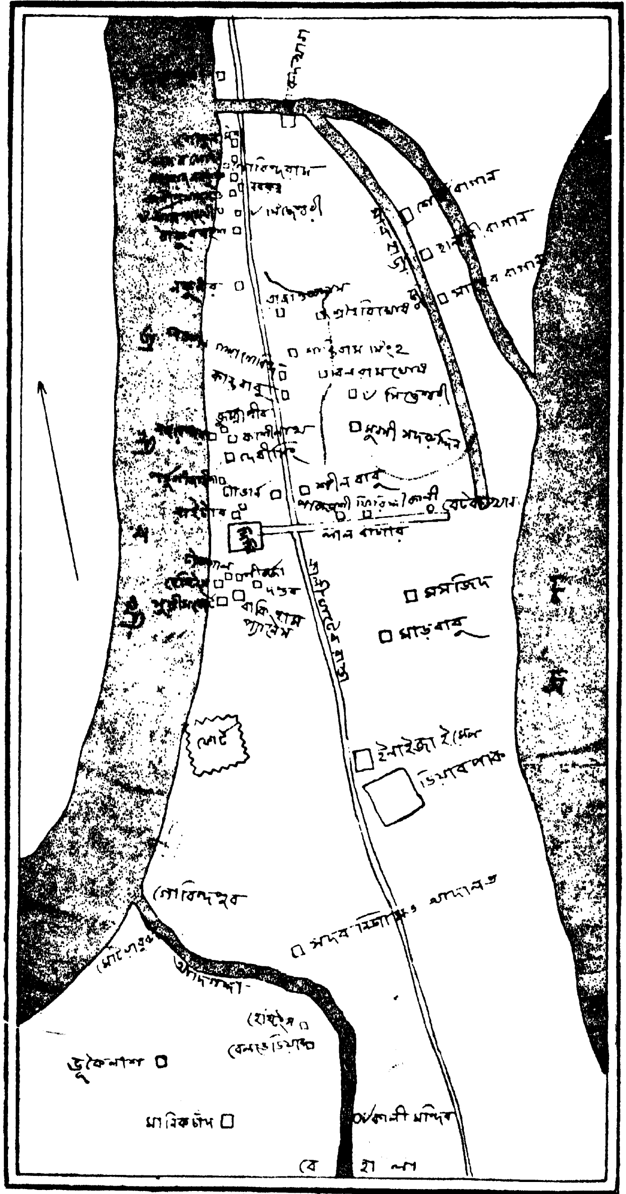
বর্ত্তমান আলিপুরের বাড়ীগুলির মধ্যে বেলভিডিয়ার বাড়ী বহু পুরাতন। কথিত আছে, সুলতান আজিম ওসমান ১৭০০ খৃষ্টাব্দে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরজাফর এই বাড়ীতে বা উহার নিকটে বাস করিয়াছিলেন; ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এখানে হেষ্টিংসের বিলাসকুঞ্জ ছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মেজর টলি এই বাড়ী ক্রয় করেন। কলিকাতার ইতিহাসে মেজর টলির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে মিষ্টার সারমন চেষ্টা করিলেও বর্ত্তমান আদিগঙ্গার সংস্কার মেজর টলির কীর্ত্তি; এই কারণে ঐ খালকে 'টলির নালাও' বলা হইয়া থাকে।

ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের যুগের বাঙ্গালী পল্লীর নাম ব্ল্যাক টাউন। এই সময়ে বহু গণ্যমান্য বংশের আবির্ভাবের ফলে ব্ল্যাক টাউনও সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বাঙ্গালীদের মধ্যে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশ এবং নবরত্ন-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম মিত্রের পর শোভাবাজার রাজবংশ সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। মুন্সী নবকৃষ্ণ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা; সামান্য অবস্থা হইতে তিনি অসাধারণ আর্থিক উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি হলওয়েলের মুন্সী এবং ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন এবং মহারাজা নন্দকুমারের জাল দলিল প্রণয়নের যে অভিযোগে তাঁহার ফাঁসী হয়, সেই মকদ্দমায় সাক্ষ্যদানের ফলে মুন্সী নবকৃষ্ণের ভাগ্যোন্নতি হইয়াছিল। নিজ বাটীতে তিনি 'গোপীনাথজী' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শুনা যায়, এই গোপীনাথজীই বিখ্যাত 'ঘোষঠাকুরের গোপীনাথ।' শ্রীচৈতন্যশিষ্য ঘোষঠাকুর বিগ্রহটিকে অগ্রদ্বীপে লইয়া যান, সেখান হইতে উহা কৃষ্ণনগরের রাজবংশের হাতে আসে এবং পরে নবকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। রাজা নবকৃষ্ণের অপর কীর্ত্তি—কলিকাতা হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান পঞ্চগ্রাম পর্য্যন্ত একটি ৩২ মাইল দীর্ঘ রাস্তা নির্ম্মাণ; রাস্তাটি এখনও "রাজার রাস্তা" নামে খ্যাত। নবকৃষ্ণের সমসাময়িক কোম্পানির অনুগৃহীত এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের মধ্যে দেওয়ান কাশীনাথ, কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্ত বাবু (কৃষ্ণকান্ত নন্দী), দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ (পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) এবং দেওয়ান দেবীসিংহ (নসীপুর রাজবংশের আদিপুরুষ) উল্লেখযোগ্য। নবকৃষ্ণকে লইয়া এই পাঁচ জন ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দেওয়ান কাশীনাথ বড়বাজারে, গঙ্গাগোবিন্দ ও কান্ত বাবু জোড়াসাঁকো এবং দেবীসিংহ ক্লাইভ ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। দেবীসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র

উদমন্ত সিংহের নামেই বর্ত্তমান উডমণ্ট ষ্ট্রীটের নামকরণ হইয়াছে। অন্যান্য খ্যাতনামা লোকের মধ্যে বাগবাজারের গোকুল মিত্র অন্যতম; ইনি কোম্পানির নিমক-মহলে কাজ করিয়া ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রধান কীর্ত্তি বাগবাজারের মদনমোহন ঠাকুর; শুনা যায়, গোকুল মিত্র বিষ্ণুপুরের রাজবংশকে ফাঁকি দিয়া এই বিগ্রহটি হস্তগত করিয়াছিলেন।

'ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরামের বংশের প্রতাপ এখনও অপ্রতিহত। বর্ত্তমান চিত্তেশ্বরী মন্দির এবং চিৎপুর রাস্তার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এই বংশের কীর্ত্তি। পুরাতন বাসিন্দা শেঠ ও বসাকদিগের গৃহ-দেবতা যথাক্রমে বর্ত্তমান কারেন্সীর নিকটবর্ত্তী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজী এবং শ্যাম বাজারের শ্যামরায়।

রাজা নবকৃষ্ণের প্রতিবেশী ধনী চূড়ামণি দত্ত ও তাঁহার পুত্র কালীপ্রসাদ দত্তের নামও উ.:.. । এই দত্ত-বংশ ও শোভাবাজার রাজবংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা ইতিহাসবিখ্যাত। চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধকালে শোভাবাজার রাজবংশ নানারূপ সামাজিক গোলযোগ উপস্থিত করিলে, কালীপ্রসাদ বড়িশা বেহালার জমিদার সন্তোষরায়ের সহায়তা প্রার্থনা করেন। এই সময়ে তিনি সন্তোষ রায়কে যে ২৫০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন, তাহা দ্বারাই বর্ত্তমান কালীঘাটের মন্দির



স্কেল - ১" = ১ মাইল
হেষ্টিংসের সময়ের কলিকাতার আনুমানিক নক্সা।

নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় (১৮০৪)। পাথুরিয়াঘাটার খেলাত ঘোষের পিতামহ রামলোচন লেডী হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। কালেক্টর গ্লাডউইনের দেওয়ান বারাণসী ঘোষ, তাঁহার খুল্লতাত ফরাসী রাজপুরুষ ডুপ্লের দেওয়ান বলরাম ঘোষ, বলরামের পুত্র শ্রীহরি ঘোষ, মেছুয়াবাজারের রাজা পীতাম্বর মিত্র, এবং জোড়াসাঁকোর দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ এই সময়ের বিখ্যাত লোক। শান্তিরাম সিংহের বংশধর কালীপ্রসন্ন সিংহ পরবর্ত্তী কালে যথেষ্ট খ্যাতিলা

করিয়াছিলেন। এই সময়ের কিছু পরবর্ত্তী কালে জন্মিলেও হৌসের মুৎসুদ্দি মতিলাল শীল এবং ভাগ্যবান রামদুলাল সরকার কলিকাতার প্রসিদ্ধ বড়লোক; রামদুলালের পুত্র সাতু বাবু, লাটু বাবুর নামও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বর্ত্তমান নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের আনন্দময়ী দেবী বহু পুরাতন বিগ্রহ। প্রথমে জনৈক মোহান্ত উঁহার সেবা করিতেন, পরে তাঁহার শিষ্য জোড়াবাগানের বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারগণ দেবীর সেবাভার গ্রহণ করেন। ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির শঙ্কর ঘোষ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ১১১০ সালে স্থাপিত হয়

শুনা যায়, বড়বাজারের নঙ্গরেশ্বর কাষ্ঠ-ব্যাবসায়ী মুলুকচাঁদ ট্যাণ্ডনের এবং জুম্মা পীরের গোর তাঁহার পুত্র দেওয়ান কাশীনাথের কীর্ত্তি; কাশীনাথ পীরসাহেবের অনুগৃহীত ছিলেন। জানবাজারের মাড় বাবুরাও এই সময়ের বড়লোক, বর্ত্তমান দক্ষিণেশ্বর মন্দির পরবর্ত্তী কালে এই বংশের রাণী রাসমণির কীর্ত্তি। ভূকৈলাশের রাজা রাজনারায়ণ ঘোষাল গোবিন্দপুরের অধিবাসী, ইঁহার বংশধর মহারাজা জয়নারায়ণ সন্দীপের কাননগো ছিলেন; তিনি বর্ত্তমান প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন (১৭৭৯ খৃঃ)। মহারাজা নন্দকুমার এই যুগের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তিনি কলিকাতায় বাস না করিলেও তাঁহার পুত্র রাঁয়রাঁয়া রাজা গুরুদাস বর্ত্তমান বিডন স্কোয়ারে (চড়কডাঙ্গা) বাস করিতেন।

সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা ত্যাগ কালে মাণিকচাঁদকে কলিকাতায় ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন; বর্ত্তমান ডায়মণ্ডহারবার রোডে এই সময়ে মাণিকচাঁদের একটি বিখ্যাত বাগান-বাড়ী ছিল। হেষ্টিংসের পারসী-শিক্ষক মুন্সী সদরুদ্দিন মেছুয়াবাজারে বাস করিতেন। বর্ত্তমান বৌবাজার ষ্ট্রীট তখন লালবাজার রাস্তার অন্তর্গত ছিল। প্রসিদ্ধি আছে, বৌবাজার নামটি—এই সময়ের কিছু পরে ঐ স্থানের মতিলাল-বংশের বিশ্বনাথ মতিলালের পুত্রবধূর নাম হইতে গৃহীত হইয়াছিল। মতিলাল মহাশয় বর্ত্তমান বাজারটি তাঁহার পুত্রবধূকে দান করিলে উহা বউবাজার নামে পরিচিত হয়, এবং 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'—গ্রে ষ্ট্রীট হইতে বউবাজারে স্থানান্তরিত হইবার পর তাঁহারা এই রাস্তার নাম বহুবাজারে পরিবর্ত্তিত করেন। বহুবাজারের পাকড়াশীদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত, ঐ স্থলে ত্রিলোচনরাম পাকড়াশী একটি নবরত্ন-মন্দিরও স্থাপন করিয়াছিলেন। ফিরিঙ্গী কালী পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা স্থাপিত। ফিরিঙ্গীরা এ দেশে আসিয়া এ দেশের লোকের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বাস করিত এবং অনেক সময় এ-দেশীয় পত্নী পর্য্যন্ত গ্রহণ করিত। তাহাদের ধর্ম্ম-মতেরও বিশেষ স্থিরতা ছিল না; বোধ হয়, হিন্দু স্ত্রীদিগের প্রভাবে পড়িয়াই তাহারা হিন্দু দেবীর পূজা করিতে শিখিয়াছিল।

মুসলমান মসজিদের মধ্যে এই কালের ধর্ম্মতলা মসজিদ প্রসিদ্ধ। মসজিদটি বর্ত্তমান কুক কোম্পানীর আস্তাবলের নিকট স্থাপিত ছিল। বর্ত্তমান ধর্ম্মতলা মসজিদ পরবর্ত্তী কালে টিপু সুলতানের বংশধর টালিগঞ্জনিবাসী প্রিন্স গোলাম মহম্মদ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় (১৮১৮ খৃঃ)।

মেটিয়া-বুরুজে অযোধ্যার নবাব-বংশের আগমন, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বড়লোক হওয়া, রায় বদ্রীদাস বাহাদুরের পরেশনাথ মন্দির স্থাপন প্রভৃতি এবং মিউজিয়ম, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, জু গার্ডেন, ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি সরকারী বাড়ী ও বাগান নির্ম্মাণ এই যুগের অর্থাৎ ক্লাইভ, হেষ্টিংসের পরবর্ত্তী কালের ঘটনা।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য।

বীরতীর্থ সাতারা

বিশাল ভারতে কালে কত রাজ্যের উত্থান-পতন হইয়াছে; কিন্তু এমন রাজধানী বোধ হয় নাই, যেখানে সেই রাজ্যের সুবর্ণযুগের ঐশ্বর্য্যের সকল নিদর্শন এ কালে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী, সমাধি-মন্দির, মঠ, মসজেদ, বিলাস-ভবন প্রভৃতি কত দর্শনীয় বস্তুই সেই সকল ঐতিহাসিক রাজধানীর অতীত গৌরব-স্মৃতির পরিচয় দিয়া নিত্য পর্য্যটকগণের বিস্ময়বর্দ্ধন করিতেছে; কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের সাতারা সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। সাতারা এক কালে এমন এক সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল, যাহা প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে যে কোন সাম্রাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা

করিতে পারিত। কিন্তু আজ সেখানে এমন কোন সুরম্য প্রাসাদ নাই, যাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; এমন কোন স্মৃতিসৌধ দেখা যায় না, যাহার নির্ম্মাণ-কৌশল শিল্প-নৈপুণ্যের আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে-দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, সর্ব্বত্র কেবল দিগন্ত-বিস্তৃত সেনানিবাসের ধ্বংসাবশেষ; সাতারা দুর্গের অসংখ্য অস্ত্রকণ্টকিত বিশাল বপু দর্শকের ক্ষুব্ধ চিত্তে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে। মনে হয়, যেন কুরু-সেনাপতি পিতামহ মহারথ ভীষ্মদেব দশ দিনব্যাপী মহাযুদ্ধের অবসানে বীরজগতকে বিস্ময়াপ্লুত করিয়া ক্লান্ত দেহে অন্তিম শরশয্যায় শায়িত! ইহাই বুঝি সাতারার স্মরণীয় স্মৃতিস্তম্ভ, এবং ইহা ভিন্ন অন্য কোন স্মৃতি-চিহ্ন সাতারার উপযুক্ত নহে। কোন ইংরেজ-সেনানায়ক সাতারা পরিদর্শন করিয়া তাহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "সাতারাই সাতারার স্মৃতি-সৌধ, তথা—মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপন-কর্ত্তার স্মৃতিস্তম্ভ; এক দিগ্বিজয়ী জাতির স্মৃতিচিহ্ন।"

ছত্রপতি শিবাজীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই সাতারা বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত, এবং প্রকৃতি-পরিরক্ষিত কতিপয় প্রধান নগরীর অন্যতম ছিল। কিন্তু সেই রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ সাতারার সামরিক যোগ্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তাঁহাদিগের নির্দ্দেশে ইহা বন্দীনিবাসেই পরিণত হইয়াছিল। দূরদর্শী শিবাজীই সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধান্ত করেন যে, উত্তরাপথের মোগলশক্তি ও দক্ষিণাপথের প্রতিযোগী রাষ্ট্রগুলির সহিত যুগপৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সাতারাই মারাঠা জাতির সামরিক শক্তির কেন্দ্রভূমি হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি সিংহ-বিক্রমে সাতারা আক্রমণ করিয়া, স্বল্প আয়াসেই বিজাপুর রাজ্যের শিথিল শাসনপাশ হইতে ইহাকে বিমুক্ত এবং মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। দেখিতে-দেখিতে তাঁহারই পরিকল্পনা অনুসারে সাতারা নব রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। বিজাপুর রাজ্যের পুরাতন বন্দীনিবাস সুদৃঢ় ও সুবিশাল সেনানিবাসে পরিণত হইল। বিলাসবিমুখ শক্তিসাধক বিজেতার রুচি অনুসারে প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে বিরাট্ অচলায়তনের অভ্যুত্থান হইল, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির রাজধানীর তুলনায় নয়নবিমোহন ও চিত্তাকর্ষক কৃত্রিম শোভা-সম্পদের কোন নিদর্শন তাহাতে না থাকিলেও দূরদর্শী ভাবুকের দৃষ্টিতে এই অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য যেমন অনবদ্য, তেমনই বিস্ময়াবহ। দূর হইতে এই অভিনব মারাঠা-রাজধানী নয়নগোচর হইলেই মনে হয়—যেন চ্যাপ্টা শির-সমন্বিত নিকষ পাষাণের এক সুবিশাল স্তূপ ঊর্দ্ধ গগন-ভাল চুম্বন করিবার জন্যই সরল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই দুর্ভেদ্য পাষাণময় স্তূপের উপরে উঠিবার, বা তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পথ প্রথমে দর্শকগণের দৃষ্টিগোচর হয় না; পরে অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় যে, ফটকের পর ফটকগুলিও তেমন সুগম নহে। কিন্তু সেগুলি অতিক্রম করিলে ঐ বিরাট্ স্তূপের একমাত্র দ্বারের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই দ্বারপথে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। স্তূপের উপরে যে চ্যাপ্টা চূড়াটির কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্যারপাট্যও অপূর্ব্ব। বড়-বড় ইন্দারা, পুষ্করিণী, সুপ্রশস্ত অঙ্গন, মন্দির প্রভৃতির প্রশংসনীয় সমাবেশে তাহা সুশোভিত। বহু শত ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমতল ভূমি, নির্ম্মল বারিপূর্ণ জলাশয়ের সংস্থান—পরিকল্পনাকারী ভাস্করের অপূর্ব্ব কল্পনাবৈচিত্র্য ও রুচিনৈপুণ্যেরই পরিচয় প্রদান করে।

কিন্তু কালের উদ্দাম প্রবাহ এই দুর্ভেদ্য অচলায়তনের উপর পরিবর্ত্তনের কতই অদ্ভুত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। মনে পড়ে, শিবাজীর পৌত্র সাহুজী ও অন্যতম পৌত্রের পত্নী বীরাঙ্গনা তারাবাঈ—এই উভয়ের মধ্যে মারাঠা সাম্রাজ্যের আধিপত্য লইয়া কি প্রচণ্ড প্রতিযোগিতাই চলিয়াছিল! শম্ভুজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সাহুজী যখন বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কবলে বন্দী হন, সাহু তখন বালক। কূটবুদ্ধি বাদশাহ এই মারাঠা বালককে মোগলের বিপুল ঐশ্বর্য্যের আবেষ্টনে রাখিয়া বিলাসী মোগলের পক্ষপাতী করিবার জন্য চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করেন নাই। এ-দিকে শিবাজীর অপর পুত্র রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী - অপূর্ব্ব রূপসী ও অসামান্য তেজস্বিনী তারাবাঈ এই সাতারা হইতেই বিপুল উদ্যমে বাদশাহের বিরুদ্ধে সমর পরিচালন করিতেছিলেন। সাহু তখন বাদশাহের আয়ত্তাধীন থাকিয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া চতুর মোগল

বাদশাহ এই সন্ধিক্ষণে তাঁহার সযত্নরক্ষিত মারাঠা বন্দীকে সহসা মুক্তি দান করিয়া, মারাঠা জাতির মৃত্যুবাণ রূপেই তাঁহাকে সাতারার উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন,—তুমিই শিবাজীর বৈধ উত্তরাধিকারী, বাহুবলে তুমি সাতারার সিংহাসন অধিকার কর ; মনে রাখিও, মোগলের নিকট তুমি ঋণী, উপকৃত। মোগলের সহিত সম্প্রীতি ও বাদশাহের প্রতি আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রাখিলে তুমি বাদশাহের সম্পূর্ণ সাহায্য লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

কিন্তু বাদশাহের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বহুদর্শী এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ বাদশাহের কূটনীতি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিলেন। ইনি পেশোয়া-শ্রেষ্ঠ বালাজী বিশ্বনাথ। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রথম পেশোয়া বলিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর সাহুজী মারাঠা রাজ্যে পদার্পণ করিতেই চারি দিকে ভীষণ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইল। মারাঠারা সাদরে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য দলে-দলে ধাবিত হইল। তারাবাঈএর নারী-হৃদয়েও চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে বাধা দিলেন—প্রধান অমাত্য দামাজী গায়কবাড় ; এই সুবিধাবাদী স্বার্থপর অমাত্যটি নির্দ্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি আশৈশব মোগলের সাহচর্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, স্বাধীনতাপ্রিয় মারাঠা জাতি কখনই তাহাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত বরণ করিতে পারে না ; তাহার সাহচর্য্যে মারাঠাদিগের সর্ব্বনাশ অপরিহার্য্য। এই উপদেশেই তারাবাঈএর সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি দামাজীর নির্দ্দেশই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা তেজস্বী ব্রাহ্মণ বালাজী বিশ্বনাথ দামাজীর যুক্তি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না ; তিনি এই নির্দ্দেশ দান করিলেন যে, "ছত্রপতির বংশধর যেখানেই থাকুন, এবং তাঁহার অতীত জীবন যে ভাবেই অতিযাপিত হউক—তাহা লক্ষ্য করা নিষ্প্রয়োজন। বীর মারাঠা জাতির প্রাণের আকর্ষণে তিনি অগ্নিশুদ্ধ হইয়া মারাঠা জাতির আদর্শ নেতা হইবেন। সিংহ কখনও তাহার স্বভাব ও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে না। সাহুজীকে আমরা অস্বীকার করিলে মারাঠা জাতি দ্বিধা বিভক্ত হইবে ; গৃহযুদ্ধ অপরিহার্য্য হইবে।" কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথের এই যুক্তি দামাজীর হৃদয় স্পর্শ করিল না ; ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া তিনি বালাজীর প্রতি এমন রূঢ় আচরণ করিলেন যে, তাহার ফল বিষময় হইল। বালাজী বিশ্বনাথ সদলে তারাবাঈএর পক্ষ পরিহার করিয়া সাহুজীর পক্ষই সমর্থন করিলেন।

সাহুজীর সৌভাগ্য, মারাঠা জাতির সৌভাগ্য, বালাজী বিশ্বনাথের ন্যায় প্রতিভাশালী, দূরদর্শী মনীষী তাঁহার পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কূটবুদ্ধি চতুর বাদশাহের অভিসন্ধি হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ মোগল আবেষ্টনে বৰ্দ্ধিত চপলচিত্ত সাহুজীর প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন যে, বাদশাহের সকল অভিসন্ধিই ব্যর্থ হইল। প্রকৃত পক্ষে বালাজী বিশ্বনাথই হইলেন সাহুজীর শক্তি-চক্রের পরিচালক। শিবাজীর মত বালাজীও সাতারার গুরুত্ব এবং অবিলম্বে তাহা আয়ত্তাধীন করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। দামাজীও এ বিষয়ে একান্ত সচেতন ছিলেন। সাতারার দুর্গ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিপুল ভাবে উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ করিলেন।

ইতিমধ্যে সাতারার প্রাসাদে নূতন এক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল। রামরাজা তারাবাঈয়ের তরুণ-বয়স্ক পৌত্র ; তিনি পিতামহী ও প্রধান মন্ত্রীর সঙ্কল্পের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত বালাজী বিশ্বনাথের যুক্তিই ঠিক, আমার অন্তর তাঁহারই সঙ্কল্পের অনুমোদন করিতেছে।"

পৌত্রের এই বিরোধী উক্তি শ্রবণে তারাবাঈ ক্রোধে যেন জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রামরাজাকে বন্দী করিয়া সাতারা দুর্গের এক অন্ধকারময় নিভৃত কক্ষে অবরুদ্ধ করিলেন। এ-দিকে বালাজী বিশ্বনাথও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি অবিলম্বে সাতারা দুর্গ অবরোধ করিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে এরূপ কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করিলেন যে, দামাজীকে তাঁহার সেই চালে মাত হইতে হইল। বীরাঙ্গনা তারাবাঈ নিরুপায় হইয়া অবশেষে সাহুজীর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে সাহুজী সাতারা অধিকার করিয়া তথায় মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিলেন, এবং তারাবাঈ তাঁহার পৌত্র রামরাজার অভিভাবিকারূপে কোহলাপুরে শাসনদণ্ড পরি-চালনের অধিকার লাভ করিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় মারাঠা-যুদ্ধের সময় সাতারার

দ্বিতীয় বার ভাগ্যবিপর্য্যয় হয়। তৃতীয় বাজীরাও এই সময় মারাঠা রাজ্যের পেশোয়া। সাহুজীর আমোল হইতেই পুণায় পেশোয়াদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃত পক্ষে পেশোয়াই তখন মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। সাতারায় সাহুজীর বংশধরগণ শুধু রাজ-মর্য্যাদাটুকু লইয়াই নিরুপদ্রবে কালযাপন করিতেছিলেন। ইংরেজ কোম্পানী দেখিলেন, পেশোয়ার প্রভাব খর্ব্ব করিতে হইলে, সাতারার এই সাক্ষীগোপাল রাজবংশটিকে বশীভূত না করিলে চলিবে না। চতুর পেশোয়া তৃতীয় বাজীরাও ইংরেজ বণিকগণের গুপ্ত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া সাতারায় প্রভুত্ব-স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ইংরেজ-সেনাপতি জেনারেল স্মিথ ও জেনারেল পিটজলার দুই দিক হইতে তখন পেশোয়ার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সহ অগ্রসর হইতেছিলেন। পেশোয়া ইঁহাদের আক্রমণ এড়াইবার অভিপ্রায়ে পলায়নের ভান করিয়া সাতারার দিকে পশ্চাদ্বর্ত্তন করিতেছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী ইংরেজ-সেনাপতিদ্বয় সহসা রণ-বাহিনী সম্মিলিত করিয়া পেশোয়ার পূর্ব্বেই সাতারা পরিবেষ্টন করিলেন। সাহুজীর বংশধর প্রতাপজী এই সময় সাতারার সিংহাসনে সাক্ষীগোপালের ন্যায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরেজ-পক্ষ হইতে তাঁহাকে বশীভূত করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি সাদরে ইংরেজদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। সাতারার দুর্গশিরে মারাঠার গৈরিক পতাকার সহিত ইংরেজের ইউনিয়ন জ্যাক সম্মিলিত হইয়া সগৌরবে উড্ডীন হইতে লাগিল। ইংরেজরা প্রতাপজীকেই সাতারার রাজা বলিয়া বিঘোষিত করিলেন। বর্ত্তমানে যে কয়টি পরগণা লইয়া সাতারা জিলা, তিনি তাহারই অধিপতি হইলেন। এই সঙ্গে সন্নিহিত মালসেইরা, সানগোলা ও পাণ্ধারপুর তাঁহার রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত হইল। সুবিখ্যাত ইংরেজ-সেনা-পতি গ্রাণ্ট ডাফের নেতৃত্বে এক দল ইংরেজ-সৈন্য রাজাকে সাহায্য করিবার জন্য সাতারায় ছাউনি স্থাপন করিল।

কিন্তু এই নির্ব্বাচিত রাজা সকল বিষয়েই এমন অযোগ্য ছিলেন যে, তাঁহার দ্বারা রাজ্যশাসন সম্ভবপর হইল না। অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্দ্দেশে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর প্রতাপজীর ভ্রাতা শাহজী সাতারার সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাহজীকে যোগ্যতাসম্পন্ন শাসক বলিয়াই অভি-হিত করিয়াছেন। কোন-কোন ঐতিহাসিকের মতে এই শাহজীর ন্যায় ইংরেজদের হিতৈষী সুহৃদ এই সময় ভারত-বর্ষে আর কেহই ছিলেন না। প্রকারান্তরে সাতারার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবার ফলেই ইংরেজদের পক্ষে মারাঠা-যুদ্ধের যবনিকাপাত সম্ভবপর হইয়াছিল।

সাতারার এই অচলায়তনে ছত্রপতি শিবাজীর ব্যবহৃত বিখ্যাত 'ভবানী' তরবারি, তাঁহার উপাস্য ইষ্টদেবী 'ভবানীদেবীর' প্রতিমূর্ত্তি, ও 'বাঘনখ' এখনও সংরক্ষিত আছে। এই সাংঘাতিক অস্ত্রাঘাতে ছত্রপতি শিবাজী তাঁহার দুর্দ্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভবানী নামক তরবারির নির্ম্মাণ-পারিপাট্যও অতীব প্রশংসনীয়; ইহার ফলাটি বক্র, এবং অতীব সুদৃশ্য।

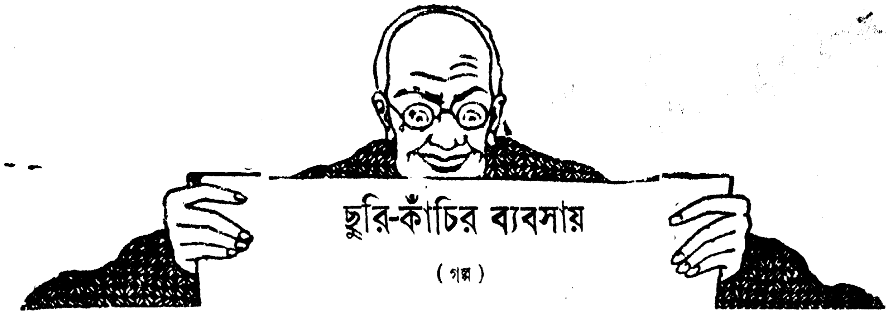
মহাপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত এই সকল অপূর্ব্ব সামগ্রীতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেও, মারাঠা জাতির অতীত গৌরবের কত কথাই মনে উদিত হয়! কেবল এই কথাই পুনঃ পুনঃ মনে হয়, সাতারার বর্ত্তমান নাই, ভবিষ্যৎও নাই; আছে কেবল অতীত, এবং তাহার উজ্জ্বল স্মৃতিই এই বিরাট্ নগরীকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বৈত ও অদ্বৈত

বীজরূপে ছিল 'এক' ধূলিতলে আঁধারে নিহিত,
দুই ভাগে ভেঙ্গে তাহা জীব ধর্ম্মে হ'লো অঙ্কুরিত;
অঙ্কুর বিটপী হ'য়ে ফলে-ফুলে-কিশলয়ে হাসে
নিমগ্ন 'দুই'এর স্মৃতি বর্ণ-গন্ধ-রসের উল্লাসে।

শ্রীকালিদাস রায়।



ছুরি-কাঁচির ব্যবসায়

(গল্প)

বড়ই দুঃখের সহিত আমাকে মালদহ হইতে ফিরিতে হইল; যে উদ্দেশ্যে মালদহে গিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইল না। মালদহের সন্তোষ চৌধুরী সেই অঞ্চলের জমিদার এবং প্রচুর ধনের অধিকারী। আমার এজেণ্ট যথাসময়েই আমাকে সংবাদ দিয়াছিল; কিন্তু সন্তোষ চৌধুরীর জীবন-বীমা করিবার সুযোগ পাইলাম না। দুই-এক হাজার টাকার জন্য এ বীমা হইলেও আমার মনে এত কষ্ট হইত না; আর সে জন্য বর্দ্ধমান হইতে মালদহে ছুটিয়া আসিতাম না। কিন্তু কুড়ি হাজার টাকার বীমা আজকালকার বাজারে সামান্য কথা নয়। মোটা কমিশন তো হাতে আসিতই, তা' ছাড়া 'রিনিউয়াল কমিশনও' কম হইত না। অবশেষে 'ভারতবন্ধু ইনসিওরেন্স' কোম্পানীর এজেণ্ট তারিণী সেনই এ কাজটা বাগাইয়া লইল। মনে-মনে তারিণী সেনের মুণ্ডপাত করিয়া মনের ক্ষোভ কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার চেষ্টা করিলাম।

অনর্থক শুধু হয়রাণ, আর কতকগুলো টাকা বাজে-খরচ! অনাথ ছোকরাটিকে ভাল বলিয়াই জানি। সে আমারই এজেণ্ট। অনাথ আমাকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিল। ট্রেণের সময় হইয়াছে দেখিয়া সে বলিল,—"সার, এবার গাড়ীতে উঠে বসুন। মাল-পত্রের উপর নজর রাখবেন। আর আমের ঝুড়ি-দুটো যেন না হারায়। মালদয়ের এ আমগুলো খুব নামকরা আম।"

জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া তাহাকে বলিলাম, "বুলবুলচণ্ডীর মেজ বাবু এবার যেন হাত-ছাড়া না হয়; কালই তুমি মেজ বাবুর সঙ্গে দেখা করবে। বুঝলে? আর ঠিকঠাক হ'লেই সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে একখানা টেলিগ্রাম করবে। কিন্তু খবর্দ্দার, কাক-পক্ষীতেও এ কথা যেন টের না পায়! আর ঐ তারিণী সেন—বুঝলে, ও সোজা চীজ নয়, ওর সম্বন্ধে খুব হুঁসিয়ার থাকবে। তোমার সঙ্গে ও যেচে আলাপ করতে আসবে; কিন্তু খুব সাবধান! হয় তো তোমাকে চা-জলখাবার খাওয়াবে, আদর-খাতিরেরও ত্রুটি করবে না; তাতে যেন ভুলে যেও না—বুঝলে?"

অনাথ মাথা ঝাঁকাইয়া জানাইল, আমার সব কথাই সে বুঝিয়াছে। একটু ভাবিয়া আমি আবার বলিলাম,—"ওর লাইফ যদি আমাদের কোম্পানীতে 'পুট' করাতে পার, তবে তোমার সম্বন্ধে আমি বিশেষ বিবেচনা ক'রব।"

অনাথ বিনীত ভাবে বলিল,—"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব সার! কালই সেখানে রওনা হ'ব; আর ঠিকঠাক ক'রে সঙ্গে-সঙ্গেই আপনাকে টেলিগ্রাম করব।"

"হাঁ, সব কথা যেন মনে থাকে। কিন্তু ঐ তারিণী সেন, ওর সম্বন্ধে সাবধান—খুব সাবধান। আর দেখছো তো, আজ আমি কলকাতায় যাচ্ছি। সেখানে বেশী দেরী হ'বে না—দিন চার-পাঁচ মাত্র দেরী হ'তে পারে। এরই মধ্যে যদি ব্যবস্থা শেষ ক'রে ফেলতে পার, তবে আফিসের ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠাবে।"

ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল। অনাথ আর একবার নমস্কার করিয়া, আমের ঝুড়ি ও মালপত্র সম্বন্ধে হুঁসিয়ার থাকিবার জন্য উপদেশ দিল। আমি হাত নাড়িয়া, তাহাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া জানালা হইতে মাথা টানিয়া লইলাম।

আমি মধ্যম শ্রেণীর আরোহী। প্রয়োজন বুঝিলে কখন-কখন দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ভ্রমণ করি। ইহার অবশ্য কারণও আছে। বলা বাহুল্য, লাইফ্ অ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর 'অরগানাইজার'দের বড়-বড় রুই-কাতলা 'ক্লায়েণ্ট' বাগাইতে হইলে অনেক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'ট্রাভল্' করিবারই প্রয়োজন হয়।

এতক্ষণ পরে কামরার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। গাড়ীতে আরোহীর ভীড়, কোলাহল বা দুর্গন্ধ নাই। সঙ্গের মালগুলি একে-একে গণিয়া মিলাইয়া, আমের ঝুড়ি দুইটির দিকে সাগ্রহে তাকাইয়া মৃদু হাসিলাম। আমগুলি সত্যই চমৎকার; আর কি তাহাদের মিষ্ট গন্ধ! এই দুই ঝুড়ি আম আমাকে কিনিতে হয় নাই; অনাথই ইহা সাগ্রহে উপহার দিয়াছে। সন্তোষ চৌধুরীর বীমার ব্যাপারটা তখন আর মনে রহিল না। সুপক্ক সুদৃশ্য গোপালভোগ আমগুলির সুমিষ্ট মনোহর গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আমাকে যেন অভিভূত করিল।

জানালার ধারে শয্যা প্রসারিত করিয়া তাহাতে হাত-পা ছড়াইয়া-ব'সিয়া আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িলাম, এবং একটি সিগারেট ধরাইয়া-লইয়া অন্যান্য আরোহিগণকে দেখিতে লাগিলাম। শিকারী বিড়াল গোঁফ দেখিয়াই চিনিতে পারা যায়; কিন্তু আমার শিকার হইবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম না। এত বড় কামরায় আমরা মাত্র চার জন আরোহী। দুই জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তখন নিদ্রাভিভূত। এক কোণে একটি যুবক একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রে মনঃসংযোগ করিয়াছিল। তাহার হাতের কাগজের ফাঁক দিয়া একবার তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। অল্পবয়স্ক যুবক,—ভাবভঙ্গি দেখিয়া অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হইল। তাহার হাতে রিষ্ট-ওয়াচ—বিভিন্ন আঙুলে কয়েকটা অঙ্গুরী। পরিধানে আদ্ধির পাঞ্জাবী—ধোয়া ফিন্‌ফিনে কাপড়—গলায় সোনার বোতাম—চোখে চশমা; মসৃণ চুলগুলি ঢেউ-খেলান। সুপুরুষ বটে!

আমি নিবিষ্ট-চিত্তে সিগারেট টানিতে-টানিতে শ্যেনদৃষ্টিতে যুবকটিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

খানিক পরে যুবকটি হাতের কাগজ নামাইয়া, পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া লইল। আমার আপাদমস্তক সে একবার পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া বলিল,—"আজকের কাগজ দেখেছেন মশায়! দেখবেন কি?"

—"না, ধন্যবাদ,—কাগজ আজ পড়েছি—"

যুবকটি আমার একটু কাছে সরিয়া-আসিয়া আর একটি সিগারেট বাহির করিয়া আমাকে দিয়া বলিল,—"নিন্ মশায়, একটু ধূমপান করুন।"

আমি সিগারেটটা হাসিমুখে লইয়া পুনরায় তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম। এবার মনের মধ্যে চকিতে ফন্দীর উদয় হইল। এই সুবেশধারী যুবকটির চেহারা দেখিয়া তাহাকে ধনাঢ্য বলিয়াই মনে হইল। যুবকটিকে যদি কৌশলে বাগাইয়া হাত করিতে পারি, তবে সন্তোষ চৌধুরীর দাঁও-ফসকাইবার দুঃখটার লাঘব হইতে পারে। তাই তাহার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম; কিন্তু আমার সকল চিন্তা যুবকটির অনর্গল বাক্যস্রোতে ভাসিয়া গেল। কাগজখানি হাতে লইয়া যুবক বলিতে লাগিল, দেখছেন মশায়, জাপানীদের অত্যাচার! কি রকম নিষ্ঠুর বর্ব্বর দেখুন। বে-পরোয়া যেখানে-সেখানে বোমা ফেলছে। হাসপাতাল, স্কুল, সাধারণ লোক কিছুই বাচ-বিচার নেই! আমার তো ভারী দুঃখ হচ্ছে। বলুন দেখি, কি পৈশাচিক অত্যাচার!"

"কিন্তু উপায় কি? আমরাই বা কি ক'রতে পারি বলুন?"

ইহার পর, পাটের দর, অনাবৃষ্টি, ঢাকা-মেলের দুর্ঘটনা, আমাদের দেশের আর্থিক দুরবস্থা, নানা রকম সামাজিক অবিচার প্রভৃতির প্রসঙ্গের একটির পর অন্যটির আলোচনা চলিতে লাগিল যুবকটির বিচারবুদ্ধি, কথা বলিবার ভঙ্গী, এবং নানা বিষয়ের অভিজ্ঞতায় আমি মুগ্ধ হইলাম।

ট্রেণ আমনুরা জংসন-ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। চা-ওয়ালা 'চাই গরম চা' হাঁকিয়া যাইতেই যুবকটি তাহাকে ডাকিল। দুই কাপ চা, খাবারওয়ালার নিকট কিছু খাবার, এবং কতকগুলা পাকা কলা কিনিয়া সে আমাকে কিছু উপহার দিল।

ব্যস্ত ভাবে বলিলাম, "বিলক্ষণ! আপনি ও-সব কিনলেন কেন? আমিই তো কিছু-কিছু—"

"তাতে দোষ কি মশায়! তা এতই যদি আপনার আপত্তি থাকে, তবে না হয় পরে এর শোধ দেবেন; একসঙ্গে কলকাতা পর্য্যন্তই যাচ্ছি তো।"

চায়ে চুমুক দিয়া বলিলাম, "আপনিও কলকাতায় যাচ্ছেন? তবে তো খুব ভালই হোল; এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। কিন্তু আপনি কাটিহার হ'তে আসছেন—বল্লেন না? ওখানে কি কোনও ব্যবসাসূত্রে—অবশ্য যদি বলতে আপনার কোন আপত্তি না থাকে...'' এই পর্য্যন্ত বলিয়া তেঃ তেঃ করিয়া হাসিতে-হাসিতে কলা ছাড়াইয়া মুখে পুরিতে লাগিলাম।

যুবকটি ব্যগ্রভাবে কহিল, "আপত্তি? বিলক্ষণ! আপত্তি কিছুই নেই। আপত্তি হবেই বা কেন? দাদার খেয়াল মশায়! মানে, নর্থ বেঙ্গল হ'তে লোহা, তামাকপাতা, রেশম, গুটীপোকা এই সব বিদেশে চালান দেওয়া যায় কি না, আমাকে তারই খোঁজ-খবর নিতে পাঠিয়েছিলেন। এই এক মাস রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদ'—ঐ দিকে কাটিহার, তার পর জলপাইগুড়ি এই সব ঘুরে দেখে এলাম। আর আমাদের ব্যবসা-কর্ম্ম কিছু-কিছু আছে, তারও একটু ব্যবস্থা ক'রে এলাম।"

"খুবই ভাল করেছেন। কথায় বলে—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।' ব্যবসা-বাণিজ্য এই সবই তো আজকাল আমাদের চাই। বাঙ্গালীর ছেলে 'চাকরী' 'চাকরী' ক'রেই সব নষ্ট করলে! এই দেখুন, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি আমাদের দেশে এসে নানা রকম ব্যবসা ফেঁদে ব'সেছে। এদের আজ অবস্থা দেখুন—আর আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি?"—সবেগে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অবশিষ্ট চা-টুকু গলাধঃকরণ করিলাম। তাহার পর পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া নিজে একটি লইয়া, বাক্সটি যুবকটির দিকে আগাইয়া দিলাম। এক-মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলাম,—"আপনাদের তবে বোধ হয় বেশ বড় রকম ব্যবসাই আছে। কিন্তু কিসের ব্যবসা?"

"আপাততঃ আমাদের কারখানায় ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর এই সবই তৈয়েরী হচ্ছে। সেফ্টী-রেজার ব্লেডও আসছে-মাস থেকে বাজারে বেরুবে। দত্ত ব্রাদার্সের নাম নিশ্চয়ই শুনে থাক্বেন। বাজারে আমাদের ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতির যথেষ্ট আদর; হয় তো দেখেও থাকবেন।"

ইহার পর ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতির ব্যবসায় সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। কথায়-কথায় যুবকটির নামধাম প্রভৃতি সবই জানিয়া লইলাম। মনে আশা হইল, এ শিকার বাগানো কঠিন হইবে না। হয় তো শিয়ালদয়ে নামিয়া ইহাকে সোজা আফিসে লইয়া গিয়া ন্যূনকল্পে দশটি হাজার টাকার বীমা করাইতে পারিব। আশায় উৎফুল্ল হইয়া, পরবর্তী বড় ষ্টেশনে আসিয়া আরও কিছু সিগারেট, চা, খাবার কিনিয়া বলিলাম,—"শশধর বাবু, এবার একটু চা ইচ্ছে করুন।"

শশধর বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"আপনার দেখছি সবুর সচ্ছে না! তা বেশ, দিন।"

আমিও হাসিলাম; মনে মনে বলিলাম, "বাপু হে, বড়-বড় রুই-কাতলাকে ডাঙ্গায় তুলতে হ'লে অনেকক্ষণ ধ'রে খেলাতে হয়। এ সব তো অতি সামান্য।"

রাত্রি প্রায় ন'টা। ট্রেণ লালগোলা-ঘাট ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। শশধর বাবু নিজেই কুলি ডাকিলেন। তাঁর নিজের জিনিষপত্র অতি সামান্য। সঙ্গে মাত্র একটি ছোট স্যুটকেস, আর একখানি সুজনীতে মোড়া ছোট একটি বালিশ। আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই এক মাসকাল, এই সামান্য বিছানাপত্র লইয়া কি ভাবে শশধর বাবু বিদেশে কাটাইয়া দিল? কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না।

শশধর বাবু বলিল,—"দক্ষিণা বাবু, ষ্টীমারে ব'সে আরাম ক'রে চা খাওয়া যাবে। সুন্দর জ্যোৎস্না রাত, কি চমৎকার হাওয়া! জ্যোৎস্না রাত্রে পদ্মার শোভা ভারী সুন্দর। দেখছেন, আজকের রাত্তিরে জ্যোৎস্না যেন ধপ-ধপ করছে। পদ্মার ওপর যখন ষ্টীমার চলে, তখন কবিতা লেখার জন্যে সত্যই প্রাণ আন্-চান্ করে!"

হাসিয়া বলিলাম,—"আপনার বয়স অল্প। কবিতা-টবিতা ও-সব আপনাদের মত বয়সেই সাজে। ইস্কুলে পড়বার সময় আর কলেজ-লাইফে দু'-একটা কবিতা লিখেছিলাম, মনে হচ্ছে। কিন্তু এই বয়সে, বুঝলেন—কবিত্ব-টবিত্ব আর মাথায় আসে না।"

ষ্টীমারে উঠিয়া বসিলাম। দুই জনে দুইখানি চেয়ার

টানিয়া-লইয়া রেলিংএর ধারে গিয়া বসিয়া সিগারেট ধরাইলাম। মাথার উপরে অগণ্য ক্ষীণজ্যোতিঃ নক্ষত্র; চাঁদের আলোকে চারি দিক উদ্ভাসিত। সুমিষ্ট বায়ু-হিল্লোল! চমৎকার! শশধর বাবু দুই পেয়ালা চায়ের আদেশ করিয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিল; বোধ হয়, পদ্মা আর জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া মনে-মনে কবিতার আলোচনা করিতে লাগিল।

চা আসিল। অন্যমনস্ক ভাবে চা খাইতে-খাইতে কত কথাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। কি ভাবে শশধর বাবুর কাছে কথাটা পাড়িব, এবং ধীরে-ধীরে শিকার জালে ফেলিয়া কি ভাবে ডাঙ্গায় তুলিয়া করতলগত করিব—এই চিন্তায় বিভোর হইলাম। শশধর বাবুর কথাবার্ত্তা, চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গিতে তাহাকে বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও বিত্তশালী বলিয়াই আমার সুদৃঢ় ধারণা হইল। এইরূপ শাঁসালো 'ক্লায়েণ্ট' যাহাতে হাতছাড়া না হয়, তাহাই আমার প্রধান চিন্তার বিষয়।

কিছুকাল পরে বলিলাম,—"শশধর বাবু, একটা সিগারেট ধরুন।"

চেয়ার হইতে মাথা তুলিয়া উদাস ভাবে আমার পানে তাকাইয়া শশধর বাবু বলিল—"না, ধন্যবাদ!" আবার সে চেয়ারে মাথা রাখিয়া উদাস নয়নে পদ্মার বিস্তৃত জলরাশির দিকে চাহিয়া ধ্যানমগ্ন হইল। আমি আর তাহাকে বিরক্ত করিলাম না। হয় তো এই জ্যোৎস্না রজনীতে প্রিয়জনের কথা স্মরণ হওয়ায় তাহার বিরহ-ব্যথা প্রবল হইয়া মনকে ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমি শশধর বাবুর এই ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া নীরব রহিলাম।

শশধর বাবু স্তব্ধ হইয়া পদ্মার তরঙ্গ-ভঙ্গ এবং শুভ্র জ্যোৎস্না-রাশি দেখিতেছে। আমি পদ্মার তরঙ্গে ও জ্যোৎস্নার ভিতর কোন রস খুঁজিয়া পাইলাম না। সিগারেটের পর সিগারেট ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ষ্টীমারের একঘেয়ে শব্দ আর লোক-জনের মৃদু কথাবার্ত্তা কাণে আসিতেছে। দুই ধারের জলরাশি বিদীর্ণ করিয়া, দুই পাশে ফেনপুঞ্জ বিকীর্ণ করিতে-করিতে কোন বৃহৎ জলজন্তুর মতই ষ্টীমার সম্মুখে ধাবিত হইয়াছে। আমিও চেয়ারে ঠেস দিয়া অবশেষে দুই চক্ষু মুদিলাম।

আবার কোলাহল জাগিয়া উঠিল। দূরে গোদাগাড়ী-ঘাট দেখা যাইতেছে। যাত্রীরা মালপত্র লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ধীরে-ধীরে ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া লাগিল। শশধর বাবু জাগিয়া উঠিল। কুলি ডাকাইয়া, মালপত্র তাহাদের মাথায় চাপাইয়া দিয়া সে বলিল, "আসুন, দক্ষিণা বাবু!"

সারা ট্রেণ তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া, একখানি ক্ষুদ্র নির্জ্জন কামরা বাছিয়া লইয়া আমরা তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। নিজের হাতে আমার বিছানা বিছাইয়া দিয়া, মালপত্রগুলি অতি যত্নে গুছাইয়া শশধর বাবু বিনীত ভাবে বলিল,—"দক্ষিণা বাবু, আপনি বিছানায় ভাল হ'য়ে বসুন। আমি চট্ ক'রে কিছু খাবার নিয়ে আসি। দেখবেন, আর কেউ যেন এ কামরায় ঢুকে না পড়ে।"

শশধর বাবু এক-রকম ছুটিয়াই নামিয়া গেল। আমি জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া যাত্রীদের দেখিতে লাগিলাম।

চা, জলখাবার, সিগারেট, পান—সবই আসিল। সেই দিকে তাকাইয়া বলিলাম,—"আরে সর্ব্বনাশ! কত খাবার এনেছেন? কিন্তু এ ভারী অন্যায় হচ্ছে!"

—"অন্যায়?"—হো-হো করিয়া হাসিয়া শশধর বাবু বলিল, —"তা হোক না কিছু অন্যায়। এখন লেগে পড়ুন। নইলে, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আরও অন্যায় হবে।"

পানাহারের পর্ব্ব শেষ হইলে শশধর বাবু বলিল,—"আর না, এইবার চুপচাপ শুয়ে পড়ুন। শেয়ালদায় গাড়ী পৌছুবে—সেই সকাল সাতটায়। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুন। আমার আবার ট্রেণে ঘুম হয় না। জানালার ধারে বসে, চারি দিক দেখতে-দেখতে যেতে ভারী কিন্তু আরাম লাগে।"

হাসিয়া বলিলাম,—"আমার আবার উল্টো! ট্রেণের ঝাঁকুনিতে যত রাজ্যের ঘুম যেন চোখে উড়ে এসে জোটে! কিন্তু আমি ঘুমাবো আর আপনি জেগে থাকবেন,—এটা কি ভাল হবে? আপনার তাতে ভারী কষ্ট হবে যে!"

শশধর বাবু হাত নাড়িয়া বলিল, "না দাদা, কিছু নয়, কিছু নয়। ওই যে ব'ললাম, ট্রেণে একবারেই আমার ঘুম হয় না; আর তা ছাড়া দু'-এক রাত জাগলে আমাদের কিছুই ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনার ও-বয়সে রাত জাগলে অসুখ হ'তে পারে। আর দেখুন, কাল কলকাতায় গিয়ে এই গরীবের কুড়েতেই উঠছেন তো? যে ক'দিন থাকবেন, আপনাকে ছাড়ছি নে। আপনার কোন অসুবিধা হবে না এতে। ভাবছি, চিঠিখানা পৌছাল কি না। আমি চিঠিতে সকালেই ষ্টেশনে মোটর পাঠাতে লিখেছি। যদি না আসে তো বুঝব, চিঠি পৌছায়নি। অগত্যা ট্যাক্সি ক'রেই যেতে হবে। কিন্তু আর না—শুয়ে পড়ুন।"

চক্ষু মুদিয়া মনে-মনে ভাবিলাম, "ষ্টেশনে যখন উহার ঘরের মোটর আসিবে, তখন আমার অনুমানই সত্য। আমার সহকর্ম্মীরা প্রায়ই বলিয়া থাকে, 'দক্ষিণা বাবুর চোখ-জোড়া বড়ই সাংঘাতিক। দাদা আমাদের হাজার লোকের মধ্যেও আসল শিকার চিনে ফেল্‌তে ওস্তাদ।'—সহকর্ম্মীদের কথা স্মরণ করিয়া, আর এই শুভযাত্রার এই অভাবনীয় সাফল্যে অত্যন্ত গর্ব্ব ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিলাম; কিন্তু মালদয়ের সন্তোষ চৌধুরী,—সে কথা মনে হওয়ায় তারিণী সেনের মুণ্ডপাতের ইচ্ছা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। ট্রেণ তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। একবার মিট-মিট করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম—শশধর বাবু জানালার কাছে বসিয়া ধূমপান করিতেছে। ট্রেণের আলোকে তার সোণার চসমা, বোতাম, আংটি—সব ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

আমি নির্ভয়ে প্রশান্ত মনে চোখ বুজিলাম।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ট্রেণ সবেগে ছুটিতেছে। পাশে তাকাইলাম, কিন্তু শশধর বাবুকে দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম, হয় তো পায়খানা গিয়াছে; কিন্তু ঘড়ি দেখিবার জন্য হাতের দিকে চাহিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম! হাত খালি, হাতে ঘড়ি নাই। একটা শীতল শিহরণ বিদ্যুতের মত সর্ব্বাঙ্গে খেলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। কোথায় শশধর বাবু? সন্ধান নাই। তাহার সহিত তাহার সুটকেস ও বিছানা উভয়ই অন্তর্হিত হইয়াছে।

বুক-পকেটে নজর পড়িল। পকেট শূন্য, নূতন মূল্যবান্ পার্কার কলমটি নাই! সুটকেসের দিকে সভয়ে তাকাইলাম! মুখ দিয়া আমার অজ্ঞাতসারেই অস্ফুট আর্ত্তনাদ বাহির হইল, 'সর্ব্বনাশ'! দেখি, সুটকেসের ডালায় লম্বালম্বি ভাবে কেহ সুতীক্ষ্ণ ছুরি

চালাইয়াছে! কাগজপত্র, জামা-কাপড় সব চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। রুমালে বাঁধা কতকগুলি টাকা ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

তাড়াতাড়ি মনিব্যাগটির সন্ধানে পাঞ্জাবীর নীচের পকেটে হাত পুরিলাম। পকেটের ভিতর দিয়া আঙ্গুলগুলি বাহির হইয়া পড়িল! কপালে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু জমিয়া উঠিয়াছে। অভ্যাসবশতঃ বুক-পকেটে হাত দিলাম, রুমালের সহিত এক খণ্ড কাগজ উঠিয়া আসিল। কাগজখানি চোখের উপর তুলিয়া-ধরিয়া দেখিলাম, আঁকাবাঁকা অক্ষরে, কে যেন তাড়াতাড়ি কয় ছত্র কি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

পত্রে পাঠ করিলাম,—"প্রিয় দক্ষিণা বাবু, আপনি অকাতরে ঘুমাইতেছেন। আপনাকে না জাগাইয়া বা আপনার নিকট বিদায় না লইয়াই নিজের পথ দেখিলাম। ব্যবসা আমার ছুরি-কাঁচিরই বটে; কিন্তু এখনও তাহা বাজারে বাহির করিতে পারি নাই। আপনি বে-কায়দায় কাত হইয়া ঘুমাইতেছিলেন, তাই কাঁচির কাজটা সারিয়া লইতে হইল। আর সুটকেসটার চাবি বড়ই মজবুত, ছুরি না চালাইয়া উপায় ছিল না। আপনার জামা ও সুটকেস নষ্ট হইল, এ জন্য বড়ই দুঃখিত হইলাম। ভবিষ্যতে এই ভাবে কিছু মূলধন সঞ্চিত হইলে, ছুরি-কাঁচি বেচিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিব। আমগুলি বড়ই সুন্দর, আপনার মুখের জিনিস, তাই তাহা হইতে কয়েকটি মাত্র লইলাম। আশা করি, নিরাপদে শিয়ালদয়ে পৌঁছিতে পারিবেন। নিবেদন ইতি

আপনার পথের বন্ধু—
শশধর বাবু।"

আমি সেই শূন্য কামরায় ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া পত্রখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা।

ছুটি

মর্ম্মর-ধ্বনি জাগে বাতাসে;
বনতলে আলো-ছায়া
জাগালো অরূপ মায়া
চাঁদ সবে ভাসিয়াছে আকাশে।
ঘুমভোলা পাখী ডাকে
ফুল্লমদির শাখে;
নীরব প্রকৃতি সারা উদাসে;
মর্ম্মর-ধ্বনি জাগে বাতাসে।

মনে পড়ে তুমি আমি দু'জনে,
পৃথিবীর সীমা ছাড়ি'
যেন দিয়েছিনু পাড়ি
ওই নীল পথ ধরি গগনে।
সোনার চন্দ্রখানি
আনিয়াছে সুখবাণী
মধুময় করি সেই লগনে;
সাথী ছিনু তুমি আমি দু'জনে।

সে স্বপন টুটিল গো টুটিল।
যে ছিল বুকের পাশে
সে গিয়াছে পরবাসে,
আকুল দখিণ হাওয়া ছুটিল।
তোমার কেশের মত
মদির-স্বপনাহত
কাজল আঁধারে হিয়া লুটিল;
সে স্বপন টুটিল গো টুটিল।

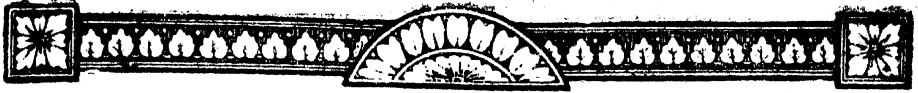
রহিনু চকিত আমি চাহিয়া;
কুসুমের মালা হ'তে
ফুল ঝরিয়াছে পথে
দীনতা উঠেছে সেথা জাগিয়া।
বাতাসে বাতাসে ভেসে
বিস্মৃতি শুধু এসে
প্রতিরাতে গেল তরী বাহিয়া;
রহিনু চকিত আমি চাহিয়া।

* * *

ঘুমভোলা এ কি রাতি এসেছে!
আঁখি-পল্লব 'পরে
স্মৃতির স্বপন সরে,
এ রাতি কি মোরে ভালোবেসেছে!
আলো-ছায়া বনতলে
খেলা করে পলে পলে
সুখ আর দুখ যেন মিশেছে;
ওরাও কি মোরে ভালোবেসেছে?

তাই এসো, ওগো, এসো দু'টিতে;
আমার জীবন 'পরি
গাহ গান মর্ম্মরি
আমিও রয়েছি আজ ছুটিতে।
অশ্রু-হাসির মেলা
খেলুক নতুন খেলা
কোন বাঁধা না রাখিয়া টুটিতে;
আমিও রয়েছি আজ ছুটিতে।

শ্রীসমীর ঘোষ।



অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত

গত ১লা বৈশাখ বৃটিশ পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ভারতসচিব মিষ্টার আমেরী ভারত সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের অবস্থার কথা ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া কিঞ্চিৎ হিতোপদেশ খয়রাৎ করিয়াছেন। কিন্তু সেই দারুণ সঙ্কটকালের কথা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণের অজ্ঞাত নহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। যে ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছিল,—গুরুমশায় সাজিয়া এ দেশের লোককে তাহা নূতন করিয়া শিখাইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু মিষ্টার আমেরী ভারতবাসীকে সতর্ক করিবার জন্য যে ভাবে সেই অরাজকতাপূর্ণ সময়ের কথা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইলে কেবল ঘটনার পারম্পর্য্য স্মরণ করিলেই চলিবে না, সেই সঙ্গে সেই ঘটনাপরম্পরার গূঢ় কারণ সমূহও নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগে বিশ্লেষণ করিয়া, তাহার ফলাফলের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেই সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব উননবতি বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে এই সুবিস্তীর্ণ দেশে শান্তি ছিল না, শৃঙ্খলাও ছিল না। সাম্প্রদায়িক বিরোধে ভারতবর্ষ তখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, এবং শতধা বিভক্ত হইয়াছিল। সম্রাটের ভেদনীতির প্রভাবে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে অশান্তির অনল প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। ভারত তখন এক-তান্ত্রিক শাসনাধীন ছিল, অর্থাৎ এক জন সম্রাট্ই এই বিশাল ভারতের রাজনীতি পরিচালন করিতেন; এবং তাঁহারই খেয়াল অনুসারে রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হইত। সেই এক ব্যক্তি অর্থাৎ সম্রাট্ বুদ্ধিমান্ এবং কার্য্যকুশল হইলে রাজ্য নিরপেক্ষ ভাবে শাসিত হইত, এবং তাহার ফলে প্রজাসাধারণের সুখ শান্তি-সমৃদ্ধি বৰ্দ্ধিত হইত। উদাহরণস্বরূপ সম্রাট্ আকবরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি যে ভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন, অনেক য়ুরোপীয় পর্য্যটক এ দেশে আসিয়া তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছিলেন—বহু শতাব্দীমধ্যে এই সাম্রাজ্যের পতনের আশঙ্কা নাই। কিন্তু আকবরের শান্তি-সংবৰ্দ্ধক নীতি উপেক্ষা করিয়া শাহজাহান যে সময় প্রচ্ছন্ন ভাবে ভেদনীতির অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ে সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্য-সৌধের শিখরদেশে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভেদনীতির বীজ উপ্ত হইয়াছিল, অনেকেই তাহা লক্ষ্য করেন নাই; সকলে তাহা বুঝিতেও পারেন নাই। ধৰ্ম্মান্ধ ঔরঙ্গজেব পক্ষপাতমূলক নীতির প্রভাবে সেই অলক্ষ্যে উপ্ত নীতি-সঞ্জাত ভেদের বটবৃক্ষ এ ভাবে বৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন যে, তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইয়াও উহার ধ্বংসিনী শক্তি প্রতিহত করিতে পারেন নাই। বিবেক-বুদ্ধি তাঁহাকে দংশন করিয়া তাঁহার মনে যে বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহার তীব্রতা মৃত্যুকালে তাঁহার কামবক্সকে লিখিত তাঁহার পত্রের একটি ছত্রেই পরিস্ফুট হইয়াছিল—I have greatly sinned and I know not what torments await me" অর্থাৎ "আমি অনেক পাপ করিয়াছি, সুতরাং আমার জন্য কি যন্ত্রণা সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা আমি জানি না।" মরণকালের এই কথাগুলি বিবেকের দংশন-জ্বালার অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করে নাই কি? অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাস তারস্বরে এই সত্যই ঘোষণা করে যে, ভেদনীতি বা কূটনীতি দ্বারা শাসক এবং প্রজা কোন পক্ষেরই পরিণামে হিতসাধিত হয় না। ভেদ-নীতি যে সকল পক্ষেরই অনিষ্ট সাধন করে, তাহা যে কেবল সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের ইতিহাসই শিক্ষা দেয়, এরূপই নহে; রোমক সাম্রাজ্যের পঞ্চম শতাব্দীর ইতিহাসও তাহা জ্বলন্ত অক্ষরে প্রতিপন্ন করে। ভারতের ভগ্নমন্দির এবং বিধ্বস্ত দেবস্থানই মানুষের মনকে চঞ্চল করে না,—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বিধ্বস্ত কার্থেজের ধ্বংসাবশেষ যাহা আছে—তাহা দেখিয়া মানুষের মন যে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা ভেদনীতির ব্যর্থতা এবং অনিষ্টকারিতা বিশেষ ভাবেই প্রতিপন্ন করে। সুতরাং মিষ্টার আমেরী ভারত-বাসীকে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা স্মরণ করিতে বলিয়াছেন,—তাহা কেবল ভারতবাসীরই স্মরণীয় নহে, ভারতের ভাগ্যবিধাতা বৃটেনবাসী মাত্রেরও তাহা স্মরণ রাখিবার যোগ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীর গর্ভেই অষ্টাদশ শতাব্দীর উৎপত্তি। সন্তানকে যেমন পিতামাতার পাপের ফল ভোগ করিতে হয়, পরবর্ত্তী কালের লোককেও সেইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কালের রাজনীতিকদিগের ভুল-ভ্রান্তির এবং দূষিত নীতি অবলম্বনের ফল ভোগ করিতে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে শাহজাহান যে জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া গোলকোণ্ডা-বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন,—তাঁহার পুত্র ঔরঙ্গজেবও সেই জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়াই বিজাপুর এবং গোলকোণ্ডা বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। বিজাপুর এবং গোলকোণ্ডার সুলতানরা সিয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত মুসলমান ছিলেন; কিন্তু ঔরঙ্গজেব সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সেই জন্য ঔরঙ্গজেব ঐ দুই রাজ্যের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব অতি কুক্ষণে দাক্ষিণাত্য-জয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহার শেষ-যাত্রা। তিনি তাঁহার পিতার আমলে অতি তুচ্ছ কারণে গোলকোণ্ডার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন; কিন্তু সে যাত্রায় গোলকোণ্ডা পরাজিত হইলেও একেবারে বিধ্বস্ত হয় নাই। ঔরঙ্গজেব এইবার একে একে বিজাপুর এবং গোলকোণ্ডার স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে মহারাষ্ট্রীয় শক্তির সহিত ঔরঙ্গজেবের এবং তাঁহার বংশধরের যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিরোধের পরিণামে দিল্লীর সিংহাসন চূর্ণ ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ইহা জিগীষার এবং সাম্রাজ্যলোলুপতারই শোচনীয় পরিণাম। সেই সময়ে যাতায়াতের অসুবিধা এবং সৈন্যপরিচালনের বাধা স্মরণ হইলে দূরবর্ত্তী রাজ্য-রক্ষায় অসুবিধা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। এ কালে সেই সকল অসুবিধা অনেকটা দূর হইয়াছে সত্য,—কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় নাই। সেই সকল রাজ্যজয়ের ফলে দেশের লোক ঔরঙ্গজেবের উপর ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সে অসন্তোষের ফল তাঁহার বংশধরগণকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহাও অষ্টাদশ শতাব্দীর

ভারতের ইতিহাসের একটি শিক্ষণীয় ব্যাপার। সকলেরই তাহা মনে থাকা উচিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল রাজপুরুষ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন, তাঁহাদের ঘোর নৈতিক অবনতি এবং অযোগ্যতাই সেই সময়ের লোকের দারুণ দুর্দ্দশার কারণ। ঔরঙ্গজেবের পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের আমলে যাঁহারা যথেষ্ট নৈপুণ্যের সহিত রাজকার্য্য পরিচালিত করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু এবং সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান কর্ম্মচারী। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া ঔরঙ্গজেব ঐ দুই সম্প্রদায়ের লোককেই রাজ-সরকার হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। তাহার যে ফল অবশ্যম্ভাবী, তাহাই ফলিয়াছিল। ভ্রান্ত নীতির ফলে অযোগ্য, স্বার্থপর, এবং হীন তোষামোদকারীর দল রাজ-সরকারের উচ্চপদগুলি অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সম্রাটরা অন্তঃপুরচারী বিলাসপ্রিয় এবং অকর্ম্মণ্য হওয়ায় তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই ছিল না। যাহারা বাদশাহ-সরকারে প্রতিপত্তি লাভ করিত, তাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের জন্য স্ব স্ব অনুগত লোকদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ইষ্টসাধনের পথ মুক্ত করিত। যত দিন ঔরঙ্গজেব জীবিত ছিলেন, তত দিন তাঁহার ব্যক্তিত্বপ্রভাবে এ দোষ অধিক প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ সময় এবং মৃত্যুর পর এই দোষ বিশেষ প্রবল হইয়া শাসনযন্ত্রকে একেবারে অচল করিয়া তুলিয়াছিল। কু-শাসনপ্রভাবে যোগ্য লোক অধিক পাওয়া যাইত না বটে, তবে উহাদের সম্পূর্ণ অভাবও ঘটে নাই। ওয়াজির সাদুল্লা খাঁ লিখিয়াছেন— "কোন যুগেই ভাল লোকের অভাব হয় না। বুদ্ধিমান্ প্রভুদিগের কর্ত্তব্যই হইতেছে—ভাল লোকদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা; তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করা, এবং স্বার্থপর লোকদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাদিগের দ্বারা সরকারী কার্য্য সম্পাদন করা।"* কিন্তু আমীর, ওমরাহ প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিদিগের কূট-কৌশলে দলাদলির সৃষ্টি হইত। তাহারা ঐ দল এবং দলীয় বিবাদ বজায় রাখিয়া আপনাদের দুরাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন করিত। তাহার ফলে রাষ্ট্রে অমঙ্গলই ঘটিত। কেন্দ্রী-শক্তির দৃঢ়তার অভাবে মোগলরাজ্য কেবল বিবাদের, সংগ্রামের, এবং হীন ষড়যন্ত্রের আগার হইয়া উঠিয়াছিল।

ঐ সকল স্বার্থসাধন-তৎপর রাজপুরুষ অকুণ্ঠিত ভাবে ঘোর বর্ব্বরতাসূচক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীর বাদশাহ ফরকশিয়ারকে অন্ধ করিয়া পরে হত্যা করা হইয়াছিল। আমেদশাহকে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে কি প্রকারে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করা হইয়াছিল, ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলমগীরকে উজির ইমাদ উলমূলক কি প্রকারে হত্যা করিয়াছিল, এবং প্রথম শাহআলমকে কিরূপ অসহায় অবস্থায় পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক এবং দলগত বিদ্বেষের ছিদ্র ধরিয়া যখন শাসনযন্ত্রে যোগ্য লোকের অভাব বশতঃ নানারূপ অনাচার ঘটিতে থাকে, যখন যোগ্য লোক উপেক্ষিত এবং অযোগ্য লোক উচ্চপদে উন্নীত হইতে থাকে, তখনই প্রকৃতির প্রতিশোধরূপে নানা দিক্ হইতে নানাবিধ অনর্থপাত হইয়া অতি বৃহৎ সাম্রাজ্যকেও ধরাশায়ী করে। এ উপদেশ কেবলমাত্র যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাস হইতেই পাওয়া যায় এরূপ নহে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত রোমক সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস হইতেও তাহা পাওয়া যায়; এবং কথিত আছে, ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে।

শাহজাহানের আমল হইতে ভারতের বাহিরের অনেকগুলি অসমসাহসিক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতে প্রবেশ করে। পাঠানশাসন-কালেও এইরূপ বহু সংগ্রামপ্রিয় লোক ভারতে আসিয়া নানা স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। দেশের প্রতি ইহাদের মমতা ছিল না; দেশের উন্নতিসাধনও ইহাদের কাম্য ছিল না। অর্থই ইহাদের কাম্য এবং লাঠিই ইহাদের বল ছিল। ইহারা ভারতের নানা স্থানে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে থাকে। দেশের লোকের প্রতি ইহারা কখন প্রীতি স্থাপন করে নাই,—চেষ্টাও করে নাই। তবে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে যতটুকু সম্ভব, ভারতবাসীর সহিত তাহাদের ততটুকু পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। বাঙ্গালায় এইরূপ বাহির হইতে আগত এক দল আফগানের বাস ছিল,—অযোধ্যার উত্তরাংশেও ঐরূপ এক দল ছিল। ইহারা 'হিন্দুস্থানী দল' নামে অভিহিত হইত। আবার মোগল সাম্রাজ্যের পতনাবস্থা আরম্ভ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই দলে-দলে বিদেশী লোক ইরাণ এবং তুরাণ হইতে ভারতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের নাম হয়—মুঘল বা মোগল দল। এই শেষোক্ত দল দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাহাদের এক দল পারস্য হইতে এবং আর এক দল তুরাণ বা মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছিল। মধ্য-এসিয়া হইতে যাহারা আসে, তাহাদের নাম হয় তুরাণী দল, আর পারস্য হইতে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের নাম ছিল ইরাণী দল। শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য-বিজয়-যাত্রার সময় এইরূপ অনেক অসমসাহসিক বৈদেশিক ভারতে আসিতে থাকে। ইহার মধ্যে ইরাণী-দলভুক্ত মীরজুমলা, আসাদ খাঁ, জুলফিকার খাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা ছিল—সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত। আর মধ্য-এসিয়া হইতে যাহারা আসিয়াছিল, সেই তুরাণী দলভুক্ত মহম্মদ আমিন খাঁ, চিন-কিলিচ খাঁ প্রভৃতি প্রধান। ইহারা ছিল সুন্নি-সম্প্রদায়ের। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পূর্ব্বে এই বিদেশী মুঘল দল সামরিক কার্য্যে অর্থাৎ লুঠতরাজ করিবার সুবিধা পাইবে বলিয়া, অথবা বাণিজ্য-ব্যবসায় করিবে বলিয়া ভারতে আসিতে থাকে বটে, কিন্তু বাদশাহের দরবারে তাহারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। মীরজুমলার ন্যায় ব্যক্তি বিশেষ গোড়ামির ফলে ঔরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু দল পাকাইয়া এই ব্যক্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ঔরঙ্গজেবের সরকারে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। যে সময় ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হইয়াছিল, এবং তাঁহার পুত্রগণ পরস্পর ঘোর বিবাদে রত হইয়াছিলেন, সেই সময় এই সকল স্বার্থসর্ব্বস্ব দলপতিরা সম্রাটদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া স্ব স্ব ইষ্টসাধনে সচেষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে ইরাণী দল, পরে হিন্দুস্থানী দল, শেষে সম্মিলিত

* "No age is wanting in noble men; it is the business of the wise masters to find them out, win them over and get work done by means of them, without listening to the calumnies of selfish men against them."—Irvine—Later Mughals. vol. II, p. 311.

তুরাণী এবং ইরাণী দল প্রাধান্য লাভ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যকে অধঃপাতিত করিয়াছিল। ২৩৫ খৃষ্টাব্দে জার্মাণীর মেয়ান্স নগরীর সান্নিধ্যে যে নিশায় মাতার সহিত রোমক-সম্রাট আলেকজাণ্ডার সেভেরাস ঘাতক সেনাগণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, তাহার পর হইতে পঞ্চম শতাব্দীতে রোমক সাম্রাজ্যের পতন পর্য্যন্ত এরূপ দলাদলি এবং হত্যার ব্যাপার যে কত ঘটিয়াছিল, তাহা রাজনীতিক মাত্রেরই আলোচ্য। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যদি যোগ্য লোকের হাত হইতে রাজকার্য্য পরিচালনার ভার অযোগ্য লোকের হস্তগত হয়, যদি প্রতিভাশালী এবং প্রখরবুদ্ধি রাজনীতিক দেশাত্মবোধ সহকারে রাষ্ট্রীয় মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া দেশের শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে না পারেন, তাহা হইলে সাম্রাজ্য যতই শক্তিশালী হউক, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সে পতন বিধাতার ইচ্ছায় ঘটে, মানুষের তাহাতে হাত নাই। মানুষ যদি কারণগুলি পরিহার করিয়া চলিতে পারে, তাহা হইলেই সেই পতনকে তাহারা এড়াইতে পারে। বুদ্ধিমান্ শাসকের তাহাই কর্ত্তব্য। ঔরঙ্গজেবের বংশধরগণ তাহা করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের তাহা করিবার সামর্থ্যও ছিল না, কাজেই মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসে দেখা যায় যে, সাম্রাজ্যে নানা বিবদমান খণ্ডরাজ্য ও জাতি থাকিলে তাহা সাম্রাজ্যের পক্ষে হিতকর হয় না। শিখ জাতির সামরিক ভাবে অভ্যুত্থান, মারাঠা জাতির লাঙ্গল ছাড়িয়া অসি ধারণ প্রভৃতি ঘটিয়াছিল—ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্মান্ধতা এবং পরপীড়ননিবন্ধন। যে রাজপুতরা আকবরকে মোগল সাম্রাজ্য গঠন করিয়া দিয়াছিল, সেই রাজপুতগণকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করায় তাহারা মোগল সাম্রাজ্যের পোষক না হইয়া নাশক হইয়াছিল। এই শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, রাজ্যমধ্যে পরস্পর বিবাদমান অঞ্চলের সৃষ্টি করিতে নাই। বরং সমতা সহকারে ন্যায়পরতা অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বত্র এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা স্থাপন করাই বিধেয়। আকবর তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাই তিনি বড় জোর চল্লিশ বৎসরের চেষ্টায় যাহা সংগঠিত করিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিতে দেড় শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। যে রোমক সাম্রাজ্য গঠন করিতে প্রায় সহস্র বৎসর লাগিয়াছিল (খৃঃ পূঃ ৭৫৩ অব্দ হইতে ২৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত), সেই রোমক সাম্রাজ্যও শাসকদিগের অদূরদর্শিতার প্রভাবে আড়াই শত বৎসরেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। মিষ্টার আমেরীর বুঝা উচিত, সার তেজ বাহাদুর কেন বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থানে পরিণত করিলে সে কার্য্য অতি ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য হইবে। যুগভেদে একই অনর্থ রূপ-পরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্ন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে যে সকল খণ্ডরাজ্য ছিল, তাহা দিল্লীর কেন্দ্রী সরকারের সৃষ্ট ছিল না। কিন্তু দিল্লীর পক্ষপাতিত্বমূলক নীতির ফলে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতে অশান্তির যে প্রকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পরিণাম-প্রভাবেই ঐ সকল ক্ষুদ্র রাজ্য পরস্পরের সহিত—বিশেষতঃ, দিল্লীর সহিত বিবাদে রত হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের উহাও অন্যতম কারণ। গোলকোণ্ডারাজ আবুল হাসান হিন্দু-মুসলমানগণের সহিত তুল্য ব্যবহার করিতেন বলিয়া ঔরঙ্গজেব তাঁহার উপর কুপিত হইয়াছিলেন। একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলবাসীর মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ গজাইয়া উঠিলে অথবা তুলিলে পরিণামে যখন এত অনিষ্ট হয়,—তখন সেই দেশে ব্যবস্থাপূর্ব্বক বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভাবে প্রভাবিত বিভিন্ন রাজ্য বা প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহার ফল কি হইবে, তাহা মিষ্টার আমেরী-প্রমুখ বৃটিশ রাজনীতিকদিগেরও চিন্তা করিবার এখনও সময় হয় নাই কি?

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অরাজকতা নিবন্ধন দেশের লোকের যে কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, মিষ্টার আমেরী তাহা ভারতবাসীকে স্মরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভারতবাসীর তাহা স্মরণ আছে। ভারতবাসীরা অরাজকতার সমর্থন করে না, তাহা চাহে না। তাই এই দুর্দ্দিনে বৃটিশ জাতির বিজয়ের জন্য সর্ব্বশ্রেণীর ভারতবাসীই তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে; এবং তাহাদের কার্য্যফলেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু কোন ব্যাপারের কেবল একটা দিক্ দেখিয়াই শেষ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীকালে আর একটা দোষ ঘটিয়াছিল যে, এই কালে বণিক্রাই সুবিধা পাইয়া রাজশক্তির পরিচালনা করিত। মীরজুম্লা তাহার দৃষ্টান্ত। এইরূপ অর্থগৃধ্নু বহু বণিক্ ভারতে আসিয়া রাজসরকারের উচ্চপদ লাভ করিয়াছিল—এবং আপনাদের দল পুষ্ট করিয়া ও নামেমাত্র বাদশাহের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাহারাই এ দেশ শাসন করিত; কচিৎ কোন কোন নবাব এবং বহু রাজপুরুষও অর্থের জন্য বেনামিতে গোপনে ব্যবসায়কার্য্য চালাইতেন—ইহাও সকলের সুবিদিত। বণিকের বুদ্ধি সাহায্যে যে রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়, সে রাজ্যের প্রজার ভাগ্যে সুখ নাই। অসন্তোষ এবং দারিদ্র্য দেশের সর্ব্বত্র তুষানলের ন্যায় জ্বলিতে থাকে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার সণ্ডার (Saunder) বিলাতে যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন,—"যখন রাজা বাণিজ্য-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, অথবা কোন বণিক শাসনকার্য্য পরিচালিত করেন, তখন সেই ক্ষমতা—যে লোক কর্ত্তৃকই পরিচালিত হউক না কেন,—সর্ব্বাবস্থাতেই উহার অপব্যবহার অনিবার্য্য; উহা মারাত্মক ভাবে ন্যায়পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেই।" * অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় এবং দাক্ষিণাত্যে এই অনাচার ঘটিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক বিদেশবাসী ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ঐরূপ বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল। ভারতবাসী তাহা ভুলিতে পারে না। বস্তুতঃ, শাসনকার্য্য পরিচালনায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বণিক্-সম্প্রদায়কে কুত্রাপি প্রাধান্য দেওয়া সঙ্গত নহে। বাঙ্গালায় ছিয়াত্তরে মন্বন্তরে (১৭৭০ খৃষ্টাব্দে) এবং যুক্তপ্রদেশের চালিশা মন্বন্তরে (১৮৪০ সংবতের অর্থাৎ ১৭৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে) যে লোকক্ষয় হইয়াছিল, তাহাই বণিজ-শাসনের দোষের সুস্পষ্ট প্রমাণ। ঐ দুইটি দুর্ভিক্ষের সমস্ত কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী দেশীয় শাসকদিগের স্কন্ধে চাপাইলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হয়। উভয় ঘটনাই

*......that when a sovereign exercises trade or a merchant is allowed the use of power, that power is, under all circumstances, and by whomsoever is administered, sure to be abused and perverted to the most pernicious purposes...... Quoted in Dr. Bosu's "Ruin of Indian Trade and Industries." p. 88.

বৃটিশ বণিক্ কোম্পানীর শাসনকালেই সংঘটিত হইয়াছিল; সুতরাং উহাও অষ্টাদশ শতাব্দীর স্মৃতির সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সার উইলিয়ম হাণ্টার এবং ডবলিউ ক্রুক ইহার বিবরণ বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই শোচনীয় কাণ্ডের জন্য কোন্ পক্ষ কতখানি দায়ী, এত দিন পরে তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইলেও উহাতে বৈশ্য-শাসনের দোষ অনেকটা সপ্রমাণ হয়। উহাতে এই শিক্ষা হওয়া উচিত যে, ব্যবসাদার বা বণিক্ সম্প্রদায়কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন ক্ষমতাই দেওয়া উচিত নহে। মিষ্টার সণ্ডার যথার্থ কথাই বলিয়াছিলেন যে, বণিকের হাতে যদি রাজশক্তি পরিচালনা করিবার কোনরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ ঘটিবেই। পলাসীর যুদ্ধের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ইংরেজ কুঠিয়ালদিগের ক্ষমতা অল্প ছিল না। বণিক্দিগের রাজত্বকালে কেবল বাঙ্গালায় ছিয়াত্তরে মন্বন্তর এবং যুক্ত-প্রদেশে চালিশা মন্বন্তর হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; সুতরাং এ সম্বন্ধে তর্ক করা বৃথা। বণিজ-শাসনের অযোগ্যতার জন্যই বৃটিশ জাতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার পার্লামেণ্টের হাতে দিয়াছিলেন।

ভারতীয় জনসাধারণকে অরাজকতার ফলে কিরূপ কষ্ট পাইতে হয়, তাহা দেখাইবার জন্য মিষ্টার আমেরী ঐ সময়ের ভারতীয় ইতিহাসের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়াছেন। সার তেজবাহাদুর সপ্রু তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—ঐ যুগে আমাদিগকে স্মরণ করিবার অনেক ব্যাপার আছে। যদি আবার অরাজকতা হয়, যদি বার্লিন বা মস্কো হইতে শাসনতন্ত্রের অশুভ তরঙ্গ আসিয়া ভারতের প্রান্তে আছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভারতবাসীর দুর্ভাবনা আছে বই কি? দুর্ভাবনা আছে বলিয়াই হীনপ্রাণ ভারতবাসী দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াও বৃটিশ সরকারকে আগ্রহ সহকারে ধন-জন দিয়া যে সাহায্য করিতেছে—অন্য কোন ধনাঢ্য বৃটিশ উপনিবেশ তাহাদের মাতৃভূমির জন্য ঐরূপ করিতেছে কি না, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু আমাদের সরকার আমাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন, সামরিক শিক্ষাদানে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। উহাই আমাদের সামরিক কার্য্যে দক্ষতা-হীনতার কারণ। উৎসাহ পাইলেই দক্ষতা জন্মে। আমরা অর্থহীন। যে শিল্প এবং বাণিজ্যের সেবায় লক্ষ্মীর বাস,—সেই শিল্প এবং বাণিজ্য-সেবায় আমাদিগকে সরকার যে বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন বা পথ দেখাইয়াছেন, সে কথা মিষ্টার আমেরীও বোধ হয় বলিতে পারিবেন না। যুদ্ধের সময় সামরিক পণ্য প্রস্তুত করিবার জন্য দেশের ভিতর অর্থ আসে; কিন্তু ভারত ঐ সকল কার্য্যের বায়না পাইতেছে না। ভারতবাসীর ঐ সকল কার্য্য করিবার মত শিক্ষা, যন্ত্রপাতি এবং কলকারখানা নাই। আজ প্রায় পৌনে দুই বৎসর যুদ্ধ চলিল—কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতে ভাল ভাবে মোটর-যান বা বিমান-নির্ম্মাণের বিশেষ কোন ব্যবস্থাই হইল না। অনেক জিনিষ যাহা প্রস্তুত করিবার উপকরণ ভারতে ভূরি পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা প্রস্তুত করিবার সুযোগ ভারতবাসীকে দেওয়া হয় নাই,—বা ঐরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিলে বরাবর সেই শিল্পরক্ষার ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতিও এই দরিদ্র ভারতবাসী শাসকদিগের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত পায় নাই। সুতরাং ভারতবাসীর ধনাগমের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় শাসকবর্গ ভারতবাসীর নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য আর বেশী পাইবার আশা কি করিয়া করিতে পারেন, তাহা আমরা বুঝি না। আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, আমাদের শাসক জাতির মধ্যে অনেকেই ভারতবাসীর দারিদ্র্য যে কত গভীর—তাহা বুঝেন না; হয় ত বুঝিতে চাহেনও না।

অরাজকতা এবং মাৎস্যন্যায়ের দুঃখ-কষ্টে ভারতবাসী বহু বার ভুগিয়াছে। কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীতেই যে ভারতে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নহে। তৎপূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থান এবং পতনের সময়েও দেশে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের পতনের সময়েও অরাজকতা হইয়াছিল। সুতরাং অরাজকতার এবং মাৎস্যন্যায়ের ধ্বংসিনী-শক্তি ভারতবাসী হাড়ে-হাড়ে বুঝে। ভারতবাসীরা সর্ব্বসময়েই সেই সমস্যার সমাধান করিয়া লইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা, পাশ্চাত্য জাতিদিগের যেরূপ পররাজ্য-পিপাসা, তাহাতে কতকগুলি রাজ্যের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকাই বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্ট নীতি হওয়া উচিত। ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সেই জন্য গ্রেট বৃটেনের সহিত স্থায়ী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্মিলিত হইয়া থাকিতে চাহেন। তাঁহারা সাকল্যবাদ (Totaletarianism) চাহেন না। এই বৈচিত্র্যময় জগতে তাঁহারা প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক মানব-সমাজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন। মানুষ তাহার অদূরদর্শী বুদ্ধিবলে অন্যের সংস্কৃতি—ইতিহাস,—ঐতিহ্য প্রভৃতি বিনষ্ট করিয়া দিয়া একাকার সাধন করে—ভারতবাসী ইহা চাহে না। সেই জন্যই নাৎসীবাদ এবং ফ্যাসিষ্টবাদ ভারতবাসীর শঙ্কাজনক। বৃটিশ জাতি পরমতসহিষ্ণু বলিয়া,—পরের সংস্কৃতির হন্তারক নহে বলিয়া ভারতবাসী চিরদিনের জন্য তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকিতে চায়। এখনও বৃটিশ জাতির উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু বৃটিশ জাতি যদি কতকগুলি দুর্ব্বুদ্ধি এবং স্বার্থপর লোকের প্রভাবে চালিত হইয়া ভারতে ভেদনীতির অনুসরণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর সেই বৃটিশ-প্রীতি যে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। আমরা সেই জন্য মিষ্টার আমেরীকে সম্পূর্ণ উদার নীতি আশ্রয় করিয়া ভারত-শাসন করিতে অনুরোধ করি। এই আশা পূর্ণ হইবে কি না, তাহা ভবিষ্যৎই বলিতে পারে।

কবির জাতি

'বৃথাই শুধাও কবির জাতি কবির জাতি নাই
যার খুশী সে গর্ব্ব কর' আপন জাতি ব'লে।
বিশ্বভরা সকল মানুষ তাহার জাতি ভাই,
সকল ঠাঁই-ই তাহার আপন মা-ধরণীর কোলে।

শ্রীকালিদাস রায়।



তিন ঘণ্টা

—কি হ'ল ?

—আজ্ঞে রমন সাহ বল্‌লে—

—কি বল্‌লে শুনে কোনো লাভ হবে না।—টাকা পেলে ?

বিষ্ণু সরকারের এ অধীর প্রশ্নের উত্তরে নায়েব কানু ঘোষ বল্‌লে—আজ্ঞে না। বনবেহারী মণ্ডল দেব ব'লে দিল না, রমন সাহ ছোট কথা—

—বাস্‌। একবার রামভুখন কেঁইয়ের কাছে যাও। এক টাকা, দেড় টাকা—যা সুদ চায়। বৌ-রাণীর গহনা বন্ধক চায়, তাও দেব। পাঁচ হাজার টাকার জন্যে মতলবপুর পরগণা বিক্রী হ'তে দিচ্ছিনে। ফুঃ! মাত্র পাঁচ হাজার টাকা।

নায়েব কানুর-বাঁশী ঘোষ বিনীত ভাবে নিবেদন করলে যে, মতলবপুর নেবার মতলবে কেঁইয়ে রামভুখন মবলগ পাঁচ হাজার টাকার তোড়া হাতে ক'রে গ্যাঁট হ'য়ে বসে আছে। দুঃস্থ জমিদার সান্ধ্য আইনের মর্য্যাদা রেখে যখন কালেক্টারীতে লাটের কিস্তী জমা দিতে অপারগ হয়, এই মহাজন নিলেমে ডেকে একটার পর একটা মহাল কিনে নেয়। মতলবপুর সম্বন্ধে তার ঐ রকম একটা কু-মতলবের সন্ধান কানু ঘোষ পূর্ব্বেই পেয়েছিল।

বিষ্ণু সরকার বল্‌লে, 'হুঁ'।

তখন বেলা তিনটা। মাত্র তিন ঘণ্টা পরে মতলবপুর ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত ক'রে নেবে। বাকী সব পরগণার জন্য সে বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু মতলবপুর! মতলবপুর! মতলবপুর!

—অনিল কোথায়? শীঘ্র ডেকে দাও।

শ্রীযুক্ত কানুর-বাঁশী ঘোষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে প্রজার কাছে সিংহ; কিন্তু মনিবের কাছে মেষ-শাবক।

শ্রীমান্‌ অনিলকুমার সরকার বি-এ, সুপুরুষ, স্বাস্থ্য-কামী এবং ক্রীড়া-নিপুণ।

তাকে পিতা বোঝালে বিপদের কথা। তাদের পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তির ত্রিশ হাজার টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে। মতলবপুর পরগণা তাঁর স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি। এর পাঁচ হাজার টাকা রেভিনিউ সে-দিন সন্ধ্যার মধ্যে না দিলে লাট নিলামে চড়বে। মাত্র পাঁচ হাজার টাকার জন্যে মতলবপুর হাত-ছাড়া হবে? অসহ্য!

পুত্রের মনে প্রশ্ন উঠ্‌ছিল—সারা বৎসর ব্যয়-সংকোচ এবং সঞ্চয় করলে শেষ দিনে এ ঝঞ্ঝাটের উদ্ভব হ'ত কি? কিন্তু নবীন হ'লেও পিতৃ-ভক্তি-রূপ প্রাচীন সংস্কার ছিল অনিলের মজ্জাগত। সে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলে—এ ক্ষেত্রে তার মত ক্ষুদ্র-শক্তি তরুণের—'কিং কর্ত্তব্যমতঃপরম্‌?'

—তোমার বন্ধু-বান্ধব আছে, একবার দেখ। যেমন ক'রে হ'ক্‌, তিন ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা। যে কোনো সদুপায়ে—তোমার মার গহনা রেখে, তোমার অনাগত দিনের পরিশ্রমের বিনিময়ে—যে কোনো—

—বুঝেছি!—ব'লে পুত্র পিতার চরণ-ধূলা গ্রহণ করলে।

মানুষমাত্রেরই মস্তিষ্ক চিন্তার বিজলী-প্রসূ। সেই চিন্তা-বিজলীর একটা ঝলক অনিলকুমারকে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ধরার বুকে একটা কর্ত্তব্য-পথ দেখিয়ে দিলে। সে ছুটে চল্‌লো।

পিতা ভাবলে—এমন না হ'লে শিক্ষিত ছেলে?

বধূ-রাণী শ্রীমতী গিরিবালা যখন দেখলে কর্ত্তার খাস-কামরা শূন্য,—সে সশরীরে স্বামীকে তিরস্কার ক'রতে এল।

—বেলা তিনটে অবধি জলস্পর্শ করা নেই, রোগ হ'লে ভুগ্‌বো তো আমি। নাওয়া-খাওয়া ক'রে নাও।

—বৌ-রাণী, আজ ২৮এ জুন—লাটের খাজনার দিন।

এই ২৮এ জুন তো আর একাদশী নয়—আর আমিও জল-জীবন্ত বেঁচে আছি। তুমি বিধবা হওনি।

সরকারটি অন্যের কাছে বিষ্ণু হ'লেও শ্রীমতীর কাছে গরুড় পক্ষী। সে পাঁচ হাজার টাকার সমস্যাটা গৃহিণীকে বুঝিয়ে দিলে।

গৃহিণী বল্‌লে—মতলবপুর তো মতবল ক'রে হাত ক'রেছিলে, ওর জন্য আর আক্ষেপ কেন? এ পাঁচ বছরে তো অনেক টাকাই লাভ ক'রে নিয়েছ।

মতলবপুর-অর্জ্জনের ইতিহাস বধূ-রাণী অবগত ছিল। পরগণাটার মালিক ছিল সোয়েলপুরের মোল্লারা। তাদের সংসারে নানান্ ভজকট। জমিদারীর বহু মালিক। সোয়েলপুরের নায়েব রেফাতুল্লা মৃদ্ধাকে কিছু উপরি দিয়ে কালেক্টারীর রেভিনিউ দিতে গাফিলি করিয়ে, 'সেলে' চড়িয়ে বিষ্ণু সরকার মতলবপুর ক্রয় করেছিল। আসল রহস্য অতি অল্প লোকেরই বিদিত ছিল।

এ-হেন মতলবপুরের দুর্দ্দৈবের দিনে নিজের স্ত্রীর মুখে নীতিকথা তার অসহ্য বোধ হ'ল। প্রচণ্ড রৌদ্রের দিনে সন্ধ্যার বৃষ্টির মত, নিরাশ প্রাণের দারুণ মনঃকষ্টের অনুগামী সাহস।

বিষ্ণু বল্‌লে—বিষয় ঐ রকম ক'রেই সঞ্চয় করতে হয়। যে করে—সে নরকে যায়; তার পুত্র-পৌত্র তা ভোগ করে, আর এমন কি, তার পরিবারও—

সে আর বল্‌তে পারলে না। গিরিবালা হাসলে। তার বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতায় এ-রকম ঘটনা ঘটেছে অল্পই।

বাকী কথা পূরণ করবার জন্যে সে বল্‌লে—পরিবার হাঙ্গরমুখো বালা পরে, আর গলায় ঝোলায় কেবল হার।

—এখন খাবে চল।

যে দিন কোনো কাজ সফল হয় না সে দিন ঝগড়াও [illegible]।—অগত্যা স্নান ও পান-ভোজন।

২

বেলা চারটা।—বাকী আর দু'ঘণ্টা!

মতলবপুর! মতলবপুর যায় বুঝি!

পুত্রেরও খোঁজ-খবর নাই। বিষ্ণু বারান্দায় এসে ফটকের দিকে চেয়ে রইল। 'কা কস্য পরিবেদনা!'

তখন একবার সাজানো বৈঠকখানায় গিয়ে পিতার তৈলচিত্রের দিকে তাকালো। না, নিরাশার কারণ নাই। পিতার চিত্রস্থিত মুখ হাস্যোজ্জ্বল। বাপের মুখে পুত্রের মুখের পরিণতির প্রতিচ্ছবি দেখ্‌লে। যে ছেলের মুখ পিতামহের মুখের মত, সে হয় বংশের প্রদীপ। মতলব পূরণ করবে অনিলকুমার। কিন্তু সন্ধ্যা যে আগতপ্রায়! কোথায় প্রদীপ? বিষ্ণুবাবু আবার ছট্‌ফটিয়ে বারান্দায় গিয়ে ফটকের দিকে তাকালে।

দ্বার হ'তে বারান্দা অবধি সোজা কাঁকরের রাস্তা। দুই দিকে দুই সারি দেবদারু তরু।—উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে একটি যুবক বারান্দার দিকে আসছিল।

আগন্তুক অপরিচিত। ভদ্রবংশীয় বটে। সার্টের গলার বোতাম খোলা। চক্ষুতে বিচিত্র চাহনী। উহুঁ! হাতে তো টাকার তোড়া নাই! কি একটা দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা যেন তার রহস্যময় চক্ষুতে, চঞ্চল চরণে প্রতিভাত।

সাতটা সিঁড়ি ব'য়ে বারান্দায় উঠ্‌তে হয়। লম্বা-লম্বা সিঁড়ি। দু'পাশে রেলিঙ্, রেলিঙের গায়ে গামলায় গামলায় ফুলের গাছে ফুল ফুটে আছে। সিঁড়ির নীচে দু'জন বরকন্দাজ। অন্য সময় তারা অপরিচিতকে জিজ্ঞাসা ক'রতো—তার নাম, ধাম, প্রয়োজন। কিন্তু বড়বাবুর চক্ষুতে প্রতীক্ষা, আর আগন্তুকের আগ্রহ-চাঞ্চল্য তাদের বাক্য হরণ ক'রলে।

তরুণ উপরে উঠেই বল্‌লে—নিশ্চয় সার, আপনিই বিষ্ণুবাবু। ভুল হ'তে পারে না। স্বপ্নে-দেখা চেহারা। হ্যাঁ! নিশ্চয়। দাড়ির নীচে একটু কাটা। বাঁ পায়ের ক'ড়ে আঙ্গুলে কড়া। জুতাটা একবার খুলুন না সার! কড়াটা মিলিয়ে দেখি।

শ্রীবিষ্ণু সরকার—যে সর্ব্বদা লোককে কেবল হুকুমই দিয়ে থাকে—সবিস্ময়ে অপরিচিতের আজ্ঞা পালন করলে। যুবকের চক্ষু দু'টি যথাসম্ভব বিস্ফারিত হ'ল। কি আশ্চর্য্য! সরকার মহাশয়ের বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে কাবুলি-ছোলার মত একটি কড়া!

সে বিষ্ণুবাবুর পদধূলি গ্রহণ করলে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত বিষ্ণুবাবু বল্‌লে,—এস বাবা!

তার খাস-কামরায় ব'সে তরুণ বল্‌লে—জেগে উঠে আমিও হেসেছিলাম সার! শুনে আপনিও হাসবেন। কিন্তু আমার নিজের কল্যাণে আমাকে এ ঘটনা বল্‌তেই হবে৷— অনুমতি দেন তো বলি।

ক্রমশঃই সরকার মশায় রজনী এবং রহস্যের অতি নিকটে এসে প'ড়ছিল। রজনী আসবেই,—তার সঙ্গে সান্ধ্য আইনের নির্ম্মম কঠোরতা। স্বপ্ন,—পায়ে কড়া, চিবুক-কাটা! ব্যাপারখানা কি? অন্ততঃ নিভৃত দুশ্চিন্তার তীব্র চেতনা থেকে তো ক্ষণিক মুক্তি পাওয়া যাবে—এর সঙ্গে বাক্যালাপে।

বিষ্ণু বল্‌লে—বল।

—আশ্চর্য্য! আমার এক আত্মীয় অতিশয় পীড়িত। আমি রাত্রে শোবার সময় ভগবানকে ডেকে ব'ল্‌লাম—হে ভগবন্, একটা উপায় দেখিয়ে দিন—পিসীমাকে রক্ষা করবার। ডাক্তাররা অসম্ভব গোলোকধাঁধায় প'ড়েছেন।

সে একবার থামলে। ইত্যবসরে বিষ্ণু সরকার ভাবলে—কাল রাত্রে সে যদি ঐ রকম একটা প্রার্থনা করে নিদ্রা যেত, হয় তো গোলোকধাঁধার রাস্তা আত্মপ্রকাশ ক'র্‌ত স্বপ্নে। তার মানে, তখনও রাবণের চিতার মত গম্‌গম্ শব্দ হচ্ছিল—

মতলবপুর! পাঁচ হাজার! সান্ধ্য-আইন! মতলব!

তরুণ বল্‌লে—মোট কথা; রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লাম। সাধনপুর ষ্টেশনে নেমে পথ ধ'রে চল্‌ছি। পূর্ব্বে সাধনপুরের নামও শুনিনি। আগে চলেছেন এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ! তাঁর অনুগমন ক'রে এক ভাঙ্গা মন্দিরে পৌছুলাম। শিবের মন্দির—

বিষ্ণু বল্‌লে, হ্যাঁ,—নন্দীপুরের মন্দির।

—নাম জানিনি সার! মন্দিরের মধ্যে একটা কুলঙ্গী আছে। তার ভিতর হাত দিয়ে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ একটি শক্ত লাল পদার্থ নিয়ে আমার হাতে দিলেন। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে সেটি হাতে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—এটা কি পিসীমাকে খাইয়ে দেব? তিনি হাসলেন। ওঃ! কি অপূর্ব্ব, ভীষণ, দারুণ সুশ্রী তাঁর সেই হাসি!

তরুণের মুখ উজ্জ্বল হ'ল,—বোধ হয় হাস্যোজ্জ্বল সেই জ্যোতির্ম্ময়ের স্মৃতির পুলকে। বিষ্ণু সরকার ঘড়ি দেখলে, —চারটে বেজে সতেরো মিনিট!

তরুণ সেটা লক্ষ্য করলে, বল্‌লে—চট্‌পট্ সেরে নিই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসকে চাপা দিয়ে জমিদার বল্‌লে, —না, বল।

আগন্তুক বল্‌লে—সার, যদি সূর্য্য ওঠবার আগে ভোরের পূর্ব্ব-আকাশ দেখে থাকেন, তা হ'লে তাঁর সেই হাসির পরিচয় পেয়েছেন। আর কল্যাণী বেজবড়ুয়ার বীণার ঝঙ্কারের মত তাঁর গলার আওয়াজ। তিনি বল্‌লেন—বোকা ছেলে! এ শেয়ালের শিঙ্!

বিষ্ণু সরকার জনশ্রুতিতে শেয়াল-শিঙ্গার কথা শুনেছিল। দৈব পদার্থ। সরকার বল্‌লে—শেয়াল-শিঙ্গা?

—হ্যাঁ সার। তিনি বল্‌লেন—এ শেয়ালের শিঙ্। এ খেলে তোমার পিসীমা মারা যাবেন।—আমার প্রাণটা চম্‌কে উঠ্‌লো! পিসীমা মারা যাবে? বাবা আমাকে মারতে গেলে যে পিসীমা—

পিসীমা'রা কি কি করেন, বিষ্ণু সরকার তা ষোলো, আনা জান্‌তো। সে বাধা দিয়ে বল্‌লে—থাক্, থাক্।—তার পর কি বল।

অপরিচিত সাম্‌লে নিয়ে বললে—হ্যাঁ সার। মোট কথা, তিনি বল্‌লেন,—বিমলথালিতে বিষ্ণু সরকার জমিদার আছেন। তাঁর প্রতাপে রাম-ছাগলে শেয়ালে একসঙ্গে কাঁটালের ভুতুড়ী খায়—

তার কথা শুনে জমিদার ভাবলে—ছোঁড়াটা ফাজিল না কি? 'বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়' লোকে বলে বটে, কিন্তু এ রকম অদ্ভুত উপমা, এ সব কি?

যেন তার মনোভাবের উত্তরে আগন্তুক যুবক বল্‌লে—ঠিক্ যা যা শুনেছি, বলছি সার! মোট কথা, তিনি বল্‌লেন, এই জিনিষটি তাঁর হাতে পৌছে দেবে। ঠিক্ যেন তাঁর হাতে পৌছায়। অন্যের হাতে পৌছুলে তোমার পিসীমা—

বিষ্ণু বাকীটুকু অচিরে শোনবার প্রত্যাশায় বাধা দিয়ে বল্‌লে,—হুঁ; বল।

যুবক বল্‌লে,—আমি বল্‌লাম, প্রভু চিনিয়ে দিন তাঁকে। অমনি সার—বল্‌লে আপনার প্রত্যয় হবে না—সশরীরে আপনি স্বয়ং এলেন মন্দিরের দুয়ারে। জ্যোতির্ম্ময় আপনার কাটা থুত্‌নী আর পায়ের আঙ্গুলের ঐ কড়ার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

সে দম্ নিলে। এবার বিষ্ণু স্মরণ ক'রলে—তার নিজের স্বপ্ন। সত্যই তো, পূর্ব্ব-রাত্রে সে স্বপ্নে নন্দীশ্বর শিবের মন্দিরে গিয়েছিল, কিন্তু এই সুন্দর ছেলেটিকে কিম্বা ততোধিক অতি সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে দেখ্‌তে পায়নি।

যুবক বল্‌লে—মহাপুরুষ বল্‌লেন—শৃগাল-শৃঙ্গটা দাও বিষ্ণু সরকারকে। তোমার পিসীমার কল্যাণ হবে। আমি যেমনি আপনাকে দিতে গেলাম যাদু-শৃঙ্গ, দেখি, আপনি অন্তর্দ্ধান ক'রেছেন! তখন বল্‌লাম—বাবা, কি হবে? —আবার সেই হাসি। বল্‌লেন—চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই।

ঘড়িতে চারটে সাঁইত্রিশ মিনিট। শ্রোতা একটু উদ্বিগ্ন হ'ল।

বক্তা বল্‌লে—মোট কথা সার! সাধু বল্‌লেন,—এটি তাঁর হাতে দেবে, আর বল্‌বে—শিং পাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পশ্চিম-মুখ হ'য়ে মুখ উপর দিকে তুলে কপালের ওপর শিঙ রেখে হাত জোড় ক'রে তিন বার বল্‌তে হবে—দাও মা, দাও মা, দাও মা! তার পর যা চাই, তিন বার বল্‌তে হবে,—হাতী-ঘোড়া-সোনা-দানা-টাকা-পয়সা, যা ইচ্ছা।

বিষ্ণু এবার সন্দিহান হ'ল। ফাজিল ছোঁড়া এ কি আজগুবি কথা বল্‌ছে?—বল্‌লে—শুনলাম, তার পর।

—তার পর সার, আমার দেওয়া—

—দেওয়া?

—হাঁ সার। আমি তিনটের ট্রেণে সাধনপুর এলাম। জ্যোতির্ম্ময় নাই—ঝল্‌সানো রোদ। কিন্তু অজানা পথ যেন চেনা। তার পর মন্দির—কুলঙ্গী— দৈব-শিঙ। তার পর সার, আপনি আর আমি। আমি দিয়ে খালাস। এই নিন্।

অত বড় পরাক্রান্ত ব্যক্তি—বিষয়ী, চক্রী, ধনী—যেন যাদুর মোহে অঞ্জলি পাতলে। আগন্তুক একটা শক্ত লাল সিঁদুর-মাখা শিঙ গৃহস্বামীর হাতে দিলে।

জিনিষটা দেখ্‌তে রাম-ছাগলের সদ্যোদ্গত শৃঙ্গের মত! যেমনি পদার্থটা তার হাতে পড়লো, তার হাতটা ঝিন্‌ঝিনিয়ে উঠলো। নয় দশ ভোল্টের বিজলীর তারে হঠাৎ হাত দিলে যেমন হয়। শিয়াল-শিঙ্গার দিকে নির্নিমেষে সে তাকিয়ে রইল; তার পর বল্‌লে—ক'মিনিটের মধ্যে?

যুবক বললে—পাঁচ মিনিট; তিন মিনিট হ'য়েছে।

ক্ষণ-বিলম্ব না ক'রে বিষ্ণু বাবু ঊর্দ্ধমুখে, কপালের উপর শৃগালশৃঙ্গ রেখে কর-জোড়ে বল্‌লে—দাও মা, দাও মা, দাও মা—পাঁচ হাজার টাকা, পাঁচ হাজার টাকা, পাঁচ হাজার টাকা!

উক্তরূপ প্রক্রিয়ার সময় আগন্তুক যুবক উধাও হ'য়ে চলে গেল।

৩

স্বামীর অবস্থা দেখে সাধ্বী স্ত্রী গিরিবালা প্রাণে বড় বেদনা অনুভব করলে। সে পাশের ঘর থেকে সব শুনেছিল, সব দেখেছিল। বিষ্ণু সরকারের মত একটি সম্পন্ন এবং গুরু-গম্ভীর লোক একটা ছোকরার কথায় কপালে রামছাগলের শিঙ্ রেখে—'দাও মা, দাও মা' করতে পারে, এ ধারণা তার ছিল না। মতলবপুর তার স্বামীকে ক্ষিপ্ত ক'রেছিল। না হ'লে সে এই হীনতা সহ্য করে?

স্বামী তার চক্ষে দরদ দেখে বল্‌লে—বৌ-রাণী গিরিবালা, বোধ হয় বাবা নন্দীশ্বর মুখ তুলে চাইবেন।

গিরিবালা ভাবলে—আহা বেচারা! অবশ্য 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ।' থাক সে অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ! তার পর অদৃষ্টে যা আছে, তা' ঘটবে।

গিরিবালা প্রকাশ্যে বল্‌লে— এখনও তো এক ঘণ্টার ওপর সময় আছে।

—এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট।

পাঁচ মিনিট তারা গল্প ক'রে কাটালে। দোষটা কর্ম্মচারীদের। তারা হিসাব-পত্র রাখে, দেখে যথাসময়ে অর্থাভাবের সমাচার না দিয়ে শেষ দিনের জন্য রাখে এ সব সমাচার। আদায়ও তেমন হয় না; বাকী খাজনার মাত্রা বেড়েই চ'লেছে।

গৃহিণী প্রস্তাব ক'রলে—অমিলের আর আইন পড়বার আবশ্যক নাই; বিবাহ ক'রে ঘরে থাকুক, আর বিষয়সম্পত্তি দেখা-শুনা করুক।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো।

বরকন্দাজ সংবাদ দিলে—এক জন ভদ্রলোক তাঁর সাক্ষাৎ-প্রয়াসী।

মনটা দোদুল-দোলায় দুলে উঠ্‌লো। ভদ্রলোক

যদি প্রকৃত ভদ্রলোক হয়, তা হ'লে পাঁচ হাজারের থলে তার হাতে থাকবেই। আর যদি তা না থাকে তো কস্মিন কালেও সে ভদ্রলোক নয়। মন একবার বল্‌লে, —আগন্তুক ভদ্রলোক; পরক্ষণেই বল্‌লে—উহুঁ!

—নিয়ে এস এখানে।

ইত্যবসরে শ্রীমতী চ'লে গেল পাশের ঘরে সুপারী কাট্‌তে। ব্যায়াম, গৃহস্থালী, ও স্বজনসেবা—এই তিন কর্ম্ম একযোগে সম্পন্ন হয়—জাঁতি দিয়ে শুকনো সুপারী কাটলে। উদ্বাহ-উৎসবে বরের হাতে বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ প্রতীকরূপে জাঁতি রাখে। এইরূপ চিন্তাধারার ফলে শ্রীমতী গিরিবালার বিবাহিত জীবনের দৈনন্দিন কার্য্য ছিল সুপারী-কাটা।

আবার তরুণ! সে নয়, এ অন্য তরুণ। সুন্দর চেহারা, উত্তম পরিচ্ছদ-ভূষিত, আকৃতি ও প্রকৃতি সরল এবং অমায়িক।

আগন্তুক পরিচয় দিলে—সে নরেশ মিত্রের পুত্র শচীন্দ্র মিত্র।

নরেশ মিত্র কৃষ্ণনগরের নামজাদা উকীল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর। সেই সূত্রে বিষ্ণু সরকারের সঙ্গে সহকর্ম্মী হিসাবে পরিচয়।

বিনয়ী শচীন ব'ল্‌লে—বাবা আস্‌তে পারলেন না, পায়ের গাঁটে বাত হ'য়েছে। তিনি এই পত্র পাঠিয়েছেন।

বিষ্ণুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌ছিল। আর পঞ্চান্ন মিনিট বাকী। এ সময় পত্র, সৌজন্য, রহস্য! অথচ ভদ্রতার খ্যাতি সরকার-বংশের এক প্রধান সম্পদ।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিষ্ণু লেফাফা ছিঁড়লে। তার ভিতর থেকে পাঁচখানা হাজার টাকার নোট খ'সে পড়ল টেবিলের উপর।

আশ্চর্য্য হ'য়ে বিষ্ণু উঠে দাঁড়ালো!—এ-কি এ?

শচীন্দ্র নির্ব্বিকার। মুখে আবেগের চিহ্নমাত্র নাই।

টেবিলের উপর সিন্দুর মাখা দৈব-শিঙ পড়েছিল।

বিষ্ণু সরকার একবার সে দিকে তাকালে প্রেরণার জন্য। তার পর বল্‌লে—পাঁচ হাজার টাকা! কেন, কিসের জন্য?

ধীর ভাবে শচীন্দ্র বল্‌লে—আপনার জন্য—আমার বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—তা, আমার জন্য কেন?

—তা তো জানি না।

আরও জেরা চললো; কিন্তু বিষ্ণুর চাঞ্চল্য আর শচীন্দ্রের ধীরতা বিশেষ কোনও তথ্য-সংগ্রহে আনুকূল্য ক'রলে না।

সাজানো বৈঠকখানার গ্রাণ্ড-ফাদার ক্লকে টুং টুং টুং করে সিকি ঘণ্টা বাজলো।

বিষ্ণুর অধীরতা দেখে গিরিবালা আর অবরোধের অন্তরালে থাকতে পারলে না। অনিলের মত একটা খোকা দৈব-স্বপ্নে নির্দ্দিষ্ট সত্যের সাক্ষ্য। স্বামীর বিপদ-মুক্তির মাহেন্দ্র ক্ষণ। অতএব অবরোধ নিরর্থক।

তাকে দেখে তরুণ উঠে দাঁড়ালো। ভক্তিভরে তার পদধূলি গ্রহণ করলে।

সংক্ষেপে স্বামী বল্‌লে—এর পিতা নামকরা উকীল নরেশ মিত্র পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়েছেন। কেন পাঠিয়েছেন, তা ছেলেটি জানে না বল্‌ছে।

কু-লোকে ব'ল্‌তো—গিরিবালা প্রখরা। আসল কথা, সে ঘ্যান্‌ঘ্যানানি, আর ঘুরিয়ে নাক-দেখানোর বিরোধী। সে বল্‌লে—তোমার বাবা কি এই টাকা ধার দিয়েছেন?

—ছিঃ! ছিঃ! এ ধৃষ্টতা তাঁর নাই মা!

—তোমার আইবুড়ো বোন্ আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, শেফালী বড় ভাল মেয়ে। ম্যাট্রিক পাশ ক'রেছে।

গৃহিণীর এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌ছিল। সে ব'ললে—টাকা এখানে কেন? তোমার বোনের বিয়ের যৌতুক ভুল ক'রে—

—না মা। ভুল নয়। মানে, যদি শেফালীকে আপনার চরণ-সেবার জন্য নেন্ তো তাই হবে।

স্বামি-স্ত্রী তার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। এবার স্ত্রী বল্‌লে—কি স্পর্দ্ধা! আমার ছেলের বিয়ে ঠিক্ করবেন তিনি?

যুবক হাত জোড় করে বল্‌লে—কি বলছেন মা! বাবা নিজের মেয়ের বিয়ে ঠিক ক'রেছেন। আপনার ছেলের কথা তো আমি মুখেও আনিনি। কি সর্ব্বনাশ! বাবা এ কথা শুন্‌লে আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন যে!

কি সর্ব্বনেশে উল্টো-বোঝা ছেলে রে বাবা!

এবার সরকার-বংশের গর্ব্ব ফিরে এলো বিষ্ণুর। সে বুঝলে যে, তার বিপদের সময় বদান্যতা দেখিয়ে নরেন মিত্র তার একমাত্র পুত্রের বধূ-নির্ব্বাচনের অধিকার কিনে নিতে চায়!

সে বল্‌লে—বুঝেছি। আমি আমার ছেলের বিয়ে দেব না।

বিনয়ী কম-বোঝা শচীন্দ্র বল্‌লে—সে কথা তো ওঠেনি।

সর্ব্বনাশ! এ কি রসিকতা করছে?

গৃহিণী বল্‌লে—তোমার টাকা ফেরত নিয়ে যাও।

কর্ত্তা বল্‌লে—আমার মতলবপুর জাহান্নমে—

—মতলব। কোনো মতলব নাই সার! দিন, মা, টাকা দিন। যে কথাটা বাবা বলতে বারণ করেছিলেন, তা বলে যাই।

বিপন্ন দাম্ভিক লোক বিবাদের সূত্র পেলে বিপদ ভোলে। বিষ্ণু জানতে চাইল—উকীলের শেষ স্পর্দ্ধার কথাটা।

সে ভ্রূ কুঁচকে বল্‌লে—কথাটা কি—বল।

শ্রীমতী আগন্তুক যুবকের মনোভাব বুঝ্‌বার চেষ্টা করছিল। স্বামীর উক্তির প্রতিধ্বনি ক'রে সে বল্‌লে—কথাটা কি?

শচীন্দ্র বল্‌লে—আমার ঠাকুরদাদা শেফালীর বিয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা রেখে গিয়েছিলেন। কাল রাত্রে বাবা স্বপ্ন দেখলেন, যেন এক জন মহাপুরুষ তাঁকে বল্‌ছেন, —মানে, আপনার নাম ক'রে—তাঁর কাছে শেফালীর টাকাগুলি পৌঁছে দে; কুমারীর কল্যাণ হবে। তার পর বাবার ঘুম ভেঙ্গে গেল শেয়ালের ডাকে।

—কার ডাকে?—স্বামি-স্ত্রী সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

শচীন্দ্রের সেই স্থির ভাব।—সে বল্‌লে—শেয়ালের ডাকে। সারাদিন বাবা ইতস্ততঃ করলেন। মানী লোক, বড় লোক, পাঁচ হাজার টাকা যাঁর হাতের ময়লা—অকস্মাৎ তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠালে তিনি কি বলবেন? কিন্তু না, বলতে লজ্জা—বাবা গুরুজন—তিনি একটু সেকেলে আর কু-সংস্কার—

কর্ত্তা বল্‌লে—থাক।—সে একবার গৃহিণীর মুখের দিকে তাকালে। গিরিবালার মুখ প্রসন্ন।

হলের ঘড়িতে বাজিল টুং টুং টুং! টুং টুং টুং!

বিষ্ণু কানুকে ডেকে বল্‌লে—কালো ঘোড়া নিয়ে ছুটে যাও। বিশ মিনিটে সহরে পৌঁছুবে। চালান লেখা আছে। মতলবপুরের রেভিনিউ জমা দিয়ে এসো। ছোটো, ছোটো!

প্রণাম ক'রে শ্রীযুক্ত কানুর-বাণী ঘোষ উধাও হ'লো।

কর্ত্তা কিছু না বলে কক্ষান্তরে গেল।

যখন শচীন্দ্র উঠ্‌লো, শ্রীমতী তাকে বল্‌লে—তোমার বোনটি দেখতে কেমন?

—আমি আর কি বল্‌ব মা!—সে গিরিবালার হাতে একখানা ছবি দিলে।

গিরিবালা বোধোদয়, পদ্যপাঠ, আর সরল ধারাপাত নিয়ে যখন বিদ্যালয়ে যেত, ছেলেরা তখন এক বোঝা বই নিয়ে কলেজে যেত। এক বোঝা বই হাতে নিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া তার কল্পনায় সুখের লহর তুল্‌তো। তার পর ইদানীং কলিকাতায় মেয়েদের হাতে এক বোঝা বই দেখে তার প্রাণের তারে কে ঘা দিয়ে ব'ল্‌ত—তোর তো মেয়ে নেই। দেখ্ যদি বই-বহা বউ ঘরে আসে। অনিলের সঙ্গে চাকর যেত স্কুলে, কিন্তু বই বইতে হ'ত অনিলকে। যতক্ষণ দেখা যেত—গিরিবালা তাকিয়ে থাক্‌ত পুত্রের দিকে।

শচীন্দ্র শেফালিকার যে আলোক-চিত্র গিরিবালার হাতে দিল—সেখানা বই হাতে-নিয়ে স্কুলে যাওয়ার ছবি। লজ্জা-নম্র মুখ, পাতলা ঠোঁটে হাসির রেখা, টানা-টানা চোখ, মাথায় এক রাশি কেশ, মেয়েটি দেখ্‌তে বেশ।

ঘড়িতে বাজলো পৌনে ছটা।

শচীন্দ্রকে বসিয়ে রেখে গৃহিণী কর্ত্তার সন্ধানে গেল।

যেমনি ঘড়িতে ৬টা বাজলো, তখনি খাস-কামরায় এলো তিন জন—বিষ্ণু, গিরিবালা, এবং অনিল।

অনিল মুখ নীচু ক'রে বললে—বাবা, পেলাম না।

—আরে, শচীন যে! কতক্ষণ?

কর্ত্তা তখনও নিজের চিন্তা-ভারে অবসন্ন। তিন ঘণ্টার মধ্যে তার নিজের এবং পুত্রের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের নাটকে কিসের পর কি ঘটলো, আর ঘটনাগুলা কেনই বা ঘট্‌লো—সে কথা স্পষ্ট গতানুগতিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারছিল না।

গৃহিণী বল্‌লে—বাবা অমু, বিধাতা সব ঠিক করে-ছেন। আমরা টাকা পেয়েছি, কুটুম পেয়েছি, আর একটি রত্ন পেয়েছি ;—এই ছাখ।

কি সর্ব্বনাশ ! ও-যে শেফালীর ছবি !—তার মানস-কাননের পারিজাত, কল্পনার রাণী শেফালিকার আলোক-চিত্র !

সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শচীন্দ্রের দিকে তাকালো। তার পর টেবিলের উপর বিদ্যালয়গামিনীর চিত্র রেখে কক্ষান্তরে গমন ক'রল।

বিষ্ণু সরকার নিঃসন্দেহ হ'ল। না, ষড়যন্ত্র হ'য়ে থাক্‌লেও তার নির্ম্মল চরিত্র পুত্র সে ষড়যন্ত্রে ছিল না।

শ্রীমতীও ঐ রকম সিদ্ধান্তের আবেগে বল্‌লে—বাবা শচীন, তোমার বাবাকে ব'ল, অনিলের সঙ্গে শেফালীর বিয়ের দিনস্থির ক'রতে।

কর্ত্তা বল্‌লে - তোমার বাবাকে ধন্যবাদ দিয়ো। আমি শেফালীর টাকা মায় সুদ বিবাহের রাত্রে ফেরত দেব।

৪

চাঁদের আলোয় পুকুর-পাড়ে ব'সে অনিল বল্‌লে—পুকুরে আমার ডুবে মরতে ইচ্ছা করছে। আমি বন্ধু ভেবে তোর কাছে টাকা ধার করতে গিয়েছিলাম,—বাবার ক্লিষ্ট মুখ দেখে।—বিশ্বাসঘাতক !

শচীন বল্‌লে—বেশ তো। টাকা ধার চেয়েছ, পেয়েছ। তার কমিশনে আমার বোনের বিয়ের ঠিক্ হ'য়ে গেছে। আমি প্রত্যাখ্যান করছি।—মাধব চল্।

অনিল তাদের চাহনী-বিনিময় দেখ্‌লে না।

সে বল্‌লে—না, ও কথা হচ্ছে না। কিন্তু তাই ব'লে স্বপ্ন, ভেড়ার শিঙকে শেয়ালের শিঙ বলা—

মাধব বল্‌লে—তোর মাথায় শিঙ গজান উচিত। তুই কি জানিস্, আমরা স্বপ্ন দেখেছি' কি না ? আর তুই কি শিঙের এক্‌স্‌পার্ট ?

অনিল নিজের স্ব এবং কুচিন্তায় অভিভূত হ'য়েছিল। সে মাত্র বল্‌লে,—ষ্টুপিড, গাধা !

মাধব বল্‌লে,—আচ্ছা, মানলাম, স্বপ্ন নয়। স্বপ্নও তো কল্পনা। সে তো আর সত্য নয়। স্বপ্নে দেখা জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, আর জাগ্রত অবস্থায় কল্পনার মহাপুরুষ উভয়েই অলীক ; আর স্বপ্নের শেয়াল যখন ভেড়া নয়, তখন ভেড়ার শিঙে আর শেয়ালের শিঙে তফাৎটা কি ?

এবার অনিল তার থুতনী লক্ষ্য ক'রে একটা ঘুষি ছুড়লে। সে সরে-গিয়ে বল্‌লে - শচীনের অবস্থাটা একবার ভাব দেখি ! তুই তো স্ত্রী পেলি। আর ওর বাবা স্বপ্নের কথা শুনলে নিশ্চয়ই ওকে নির্ব্বাসনে পাঠাবেন।

অনিল ভাবলে—অসম্ভব ! বিধি-লিপি !—সে হেসে বল্‌লে—রূপে-গুণে সমান জামাইয়ের মুখ দেখলে নরেশ বাবু ওকে ক্ষমা করবেন।

এর প্রত্যুত্তরে দুই অক্ষরের যে কথাটা বলা উচিত, সে শব্দ সুষ্ঠু সমাজে অনুচ্চারণীয় ব'লে শচীন মাত্র পুকুরে একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ ক'রলে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

প্রাণ-পরিচয়

এই ঘটি এই বাটি এই ফুল-ফল,
তারি মাঝে হেরি যেন প্রবাহ অতল।
এই ঘড়ি এই ছবি ছাতি লাঠি এই শুষ্ক কাঠ,
সবারে আবরি যেন রহিয়াছে কোন্ সে বিরাট্ ?
কে যেন রে রহিয়া গোপন,
এই সব বস্তু-বক্ষে জাগে অনুক্ষণ।
কি যেন অসীম মৌন বাণী,
প্রতি পত্রে প্রতি কোণে করে কাণাকাণি।
শুনি যেন সুগম্ভীর সুর,
প্রতি তরু-লতা-গুল্মে ধ্বনিছে মধুর।
হেরি সব ঠাঁই,
অনন্ত অজানা এক আলোড়ি' সদাই।
কি যেন রে গূঢ় কম্প লাগি,
উঠিতেছে জাগি,
আজি এই বস্তুর পাথার
তুলিয়া ঝঙ্কার।
ভেদিয়া জড়ের বক্ষ উঠিতেছে নিখিল স্পন্দন,
কেটে যেন গেছে এবে ছায়াময় মৃত্যুর বন্ধন
বস্তুতে বস্তুতে আজ নিশ্বাস তুফান,
ছুটিতেছে মহা বেগবান।
নাহি মৃত্যু নাহি শঙ্কা নাহি কোন ভয়,
প্রাণহীন বক্ষে পেনু প্রাণ-পরিচয়।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল



রূপ্সী

১

বাঘ-ভালুক নয়, ছোট একটা বিড়াল-ছানা লইয়া মাঝে মাঝে বাড়ীতে যে রকম তুমুল কাণ্ড ঘটিতে লাগিল, তাহাতে অনেকের না হউক, অন্ততঃ একটি বধূর মনের কোমল পর্দ্দায় পুনঃ পুনঃ যে আঘাত লাগিতেছিল, সারা সংসারেই তাহার প্রভাব অনুভূত হইতে লাগিল। হয় তো দুর্ব্বলের প্রতি সবলের নির্য্যাতন-স্পৃহা ভিন্ন ইহার মূলে আর কিছু ছিল না; তবে এই স্পৃহাটিও নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু নয়। এই স্পৃহা হইতেই জীব-জগতে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের সূচনা বলিলেও বোধ করি অসঙ্গত হয় না।

ধবধবে সাদা, ছোট নাদুস-নুদুস বিড়ালছানাটি যখন মিট্-মিট্ করিয়া চাহিতে-চাহিতে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, বড়-বৌ কনক ছেলেটাকে সজোরে চাপ্ড়াইতে চাপ্ড়াইতে মেজ-বৌ মৃণালের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলে, "আহা, যেন আঁটকুড়ের সংসার! বেরালের আদর দেখে আর বাঁচিনে!"

চা-পাননিরতা মৃণাল আনতনেত্রে চা-পানেই রত। সে ভালই জানে, এই কথাগুলার লক্ষ্য সে নিজেই; কারণ, বিড়াল-ছানাটি তাহারই আদরের জিনিস। ছোট দেবর সুজিত নিকটেই বসিয়া ছিল; সে হাসিয়া কহিল, "আহা-হা, অত জোরে বোল না, বড়-বৌদি'! বেরালটি যে তোমার দেওর-পো।"—তাহার কণ্ঠস্বরে স্নেহের আভাস।

মৃণালের মুখে যেন একটা কালো ছায়া ফুটিয়া উঠিল। কণ্ঠে কটু উত্তর ঠেলিয়া আসিলেও তাহা মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে ভাবিল, হায় রে নিষ্ঠুরের দল, একটা অসহায় ক্ষুদ্র প্রাণীকে একটু আশ্রয় দিতেও এদের এত আপত্তি!

যাহাকে লইয়া এইরূপ নানা কঠোর মন্তব্য, সে কিন্তু বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে আরামেই দিন কাটায়। মৃণাল কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে দুই-এক বার ঘরে আসিলেই দেখিতে পায়, তাহার 'রূপ্সী' বিছানার এক কোণে বসিয়া দুষ্টুমি-ভরা চোখে তাহার দিকে চাহিয়া পরম তৃপ্তিভরে নিজের দেহের কোন অংশ লেহন করিতেছে। আর থাকিতে না পারিয়া মৃণাল তাহাকে বুকে তুলিয়া লয়, তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আদর করিয়া বলে, "রূপ্সী, তুই এত দুষ্টু হ'লি কেন, বল্ তো; জানিস্নে, তোর ওপর সকলের কত রাগ?"

সোহাগ পাইয়া আনন্দে রূপ্সীর গলা ঘড়-ঘড় করিতে থাকে। মৃণাল তাহার আদরের বিড়াল-ছানাটির ব্যবহার তাহার সাদর সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর মনে করিয়া ভাবে আত্মহারা হইয়া যায়। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাহার স্বামী অজয় হঠাৎ যদি ঘরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ একবারে রসভঙ্গ! অজয় বিরক্তি-ভরে ধমক দিয়া বলে, "ও হচ্ছে কি বেরাল নিয়ে? তুমি কি বাড়ীতে টিকতে দেবে না ঠিক ক'রেছ? এত বারণ করি বেরাল ঘাঁটতে—তবু তা শুনবে না? জান, বেরালগুলো কেবল মা-ষষ্ঠীর নয়, যক্ষ্মা-রোগেরও বাহন? রাজ্যের থাইসিসের বীজাণু ওর সর্ব্বাঙ্গে কিল্-কিল্ ক'রছে; তার ভয়ে ষষ্ঠী-ঠাকরুণকে পূজোর চাল-কলা ফেলে পালাতে হয়?"

মৃণাল ভর্ৎসনা শুনিয়া ভয়ে, দুঃখে যেন কাঠ হইয়া যায়। তাহার আলিঙ্গনমুক্ত রূপসী এক লম্ফে নামিয়া সরিয়া পড়ে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই রান্নাঘর হইতে মৃণাল চিৎকার শুনিতে পায়—"কাকীমা, তোমার রূপসী বড় জ্বালাতন করছে, আমাদের খেতে দিচ্ছে না।" সঙ্গে-সঙ্গে শাশুড়ী ও বড় বধূর সুকঠোর মন্তব্য উত্তপ্ত লৌহশলাকার মত মৃণালের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। বেচারা তখন ম্লানমুখে নিজের মলিন ছায়ার মত জানালার পাশে গিয়া দাঁড়ায়।

সত্যই মৃণাল বড় দুঃখিনী। ভগবান্ তাহাকে সন্তানে বঞ্চিত করিয়াছেন। সেই কারণেই সে বুঝি একটি বিড়াল-ছানার উপর ক্ষুদিত হৃদয়ের অপত্য-স্নেহ ঢালিয়া দিয়া নিঃসন্তান নারীজীবন সার্থক করিতে চায়। তাহার অন্তরাত্মা প্রতিবাদের সুরে বলিতে চায়—ইহাতে কাহার কি ক্ষতি? সে তো কাহারও বিষয়-সম্পত্তির ভাগ চায় না।

তাহার নাসিকা হইতে একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। আয়নার সমুখে দাঁড়াইয়া অজয় চুল আঁচড়াইতেছে, হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনিয়া সে মৃণালের পানে ফিরিয়া চাহিল। তাহার পর চিরুণি রাখিয়া তাহার কাছে গিয়া, মুহূর্ত্তে তাহাকে নিবিড় ভুজবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া হাসি-মুখে কহিল, "বুঝেছি, রূপসীর জামা তৈয়েরির কথা ভাব্‌ছ!"

স্বামীর আকস্মিক আদরে মৃণালের চোখের জল আর বাধা মানিল না, উৎস-ধারার মত অনর্গল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"মৃণাল, আমার চেয়ে দেখছি রূপসীকেই তুমি বেশী ভালবাস! এ-জন্মে তো আর উপায় নেই, তবে আস্‌ছে জন্মে যদি তোমার রূপসী হ'য়ে আস্‌তে পারি, সে বোধ হয় মন্দ হবে না!"

এ-কথায় তাহার সজলনয়না পত্নীর অধরোষ্ঠে হাসি ফুটিয়া উঠিল। হৃদয়াকাশের ঘনীভূত কালো মেঘখানা যেন এক ফুৎকারেই উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

২

সে-দিন রবিবার। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার অন্য দিনের তুলনায় একটু বিলম্বেই শেষ হইয়াছে; কেবল কনক ও মৃণালেরই তখনও খাইতে বাকি। দুই থালা ভাত বাড়িয়া দালানে আনিয়া মৃণাল দেখিল, কনক খোকাকে ঘুম পাড়াইতে ব্যস্ত। ভাতের থালা সেখানে রাখিয়া-দিয়া সে কহিল, "দিদি, আমার ভাতের দিকে একটু নজর রাখবেন, আমি রান্নাঘর থেকে আসি।"

মিনিট-দুই পরেই কনকের চিৎকারে মৃণাল তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রূপসী কনকের থালা হইতে একখানা মাছ তুলিয়া লইয়া, ঘাড় কাত করিয়া পরম সুখে মুদিত-নেত্রে চর্ব্বণ করিতেছে। কি সর্ব্বনাশ!

একটা আকস্মিক উচ্চ রবে আকৃষ্ট হইয়া বাড়ীর সকলেই ব্যস্ত ভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। গৃহিণী কহিলেন, "এই হতচ্ছাড়া বেরালের জন্যে নিত্যি সংসারের কত লোকসানই না হচ্ছে, তবু এটাকে না তাড়িয়ে আদর দিয়ে যখন মাথায় তোলা হচ্ছে, তখন পাতের মাছ কেড়ে খাবে না তো কি? অমন শত্তুর কি ছেলে-পুলের ঘরে পুষতে আছে? যারা সাত-জন্ম আঁটকুড়ো, তাদেরই ঘরে বেরাল থাকে। মেজ-বৌ বেরাল নিয়ে অত নাচায় বোলেই তো ওর ছেলে হ'লো না—এত বয়েস হ'লেও আঁটকুড়ো হ'য়েই রইল। তা বল্‌লে কি কথা গ্রাহ্যি হয়?"

তাঁর বড় ছেলে অজিত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মুখ বাঁকা করিয়া কহিল, "বিদেয় কোরে দিলেই তো হয়; এটাকে নিয়ে যে মহা-মুশ্‌কিলেই পড়া গেল দেখছি।"

সুজিত বিদ্রূপভরে হাসিয়া কহিল, "উটি যে মেজ-বৌদি'র ছেলের মত! ওকে যে বিদেয় করতে যাবে, মেজ-বৌদি আগে তাকেই বিদেয় করবে না? ও-কথা বল্‌বে কে? বাস্ রে!"

মৃণাল কনকের হাত ধরিয়া সবিনয়ে কহিল, "দিদি, আমার ভাতটা আপনিই খান, আমি ঐ ভাত খাচ্ছি।"

কনক হাত ছাড়াইয়া লইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "না, বেরাল নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করছ, মেজ-বৌ! যা রয়-সয়, তাই-ই করা ভাল। পশুকে নাই দিলেই সে মাথায় চড়ে। এই তো এত খাচ্ছে-দাচ্ছে, তবু দেখ, ছেলে শোয়াতে একটিবার ঘরে গেছি, অমনি কোথায় ওৎ পেতে ছিল, এসেই ভাতের থালায় মুখ দিলে। ওদের ছোঁক-ছোঁকে স্বভাব কি কখনো বদলায়, তা যতই গেলাও, আর আদর-সোহাগ কর।"

রূপসী আহারান্তে তখন এক-পাশে বসিয়া ঠোঁট চাটিতেছিল। অজয় দৌড়াইয়া আসিয়া ক্রোধভরে তাহাকে মাথার উপর তুলিয়া উঠানে সজোরে আছাড় মারিল। একবার কাতর আর্ত্তনাদ করিয়াই রূপসী মাটীতে লুটাইয়া পড়িল!

মৃণাল দৌড়াইয়া-গিয়া ব্যাকুল ভাবে রূপসীকে বুকে তুলিয়া লইয়া দেখিল, তাহার দুই কশ বহিয়া রক্তের ধারা বহিতেছে। এই দৃশ্যে মৃণালের মাথার সমস্ত শিরা গভীর বেদনায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল। সে চিরদিনই বড় সহনশীলা; কিন্তু আজ তাহার ধৈর্য্যের কঠিন বাঁধ বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলের সম্মুখেই উত্তেজনাপূর্ণ বিকৃত কণ্ঠে মৃণাল কহিল, "যত সব নির্দ্দয়ের পুরী! একটা বেরাল নিয়ে কি তুমুল প্রলয় কাণ্ড আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। খুনে আর কাকে বলে?"

তাহার মুখে আর কোন কথা সরিল না। ক্রন্দনের বেগ সম্বরণ করিতে গিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। রূপসীর মুখে জল দিতে সে তৎক্ষণাৎ কলতলায় ছুটিল। গৃহিণী অজয়ের পানে চাহিয়া কহিলেন, "রাগ কোরে মারতে গেলি কেন? বেরাল মারতে নেই।"

অজয়ের মুখে যেন অনুশোচনার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল! সে এবং অন্য সকলে তখন ঘরে ফিরিয়া গেল। শুধু কনক রান্নাঘরের দালানে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মৃণাল যখন বিড়াল লইয়া বিষণ্ণ মুখে ধীরে-ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল, অজয় তখন ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া ছিল; মৃণালকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

একটা কৌটা হইতে কিছু মলম বাহির করিয়া লইয়া মৃণাল গম্ভীর ভাবে বাহিরে চলিয়া গেল, স্বামীকে সে গ্রাহ্যই করিল না। একটু পরে দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া মাথা বাড়াইয়া কনক কহিল, "ও মেজ-বৌ, তোমার থালায় যে ভাত আছে, তাই ভাগ কোরে দু'জনে খেয়ে নিই এস।"

অজয় বলিল, "সে তো ঘরে নেই।"

"ঘরে নেই? তবে কোথায় গেল? দেখ দেখি, একটা বেরাল নিয়ে এই দুপুরবেলায় কি বিভ্রাট্!"

অজয় চুপ করিয়া রহিল। কনক একটু নীরব থাকিয়া কহিল, "আর তোমাকেও বলি, মেজ ঠাকুরপো, রাগের মাথায় অমন কোরে কি আছাড় মারে? আমার তো ভয় হ'য়েছিল, বাচ্চাটা বুঝি মরেই গেল!"

অজয় তথাপি নীরব। উত্তরের প্রত্যাশায় আর একটু অপেক্ষা করিয়া কনক কহিল, "যাই—দেখি, মেজ-বৌ কোথায় গেল।"

৩

সে-দিন ক্লাব হইতে ফিরিতে অজয়ের অনেক রাত হইয়া গেল। বাড়ী তখন নিষুতি। সে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিতেই দেখিল, মেঝেয় মাদুর পাতিয়া মৃণাল অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার কোলে কুণ্ডলী পাকাইয়া রূপসীও নিদ্রিত। কিছুক্ষণ স্তিমিত নয়নে নিদ্রিতা পত্নীর পানে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে গভীর সহানুভূতিতে তাহার মনটা সহসা যেন টন্-টন্ করিয়া উঠিল। হায় বন্ধ্যা নারী, দুধের সাধ সে ঘোলে মিটাইতে চায়! কিন্তু সকলেই তাহার প্রতি বিমুখ। অজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিল, ভগবান্ যাহার প্রতি বিরূপ, জগৎটাও বুঝি তাহার প্রতি নিষ্ঠুর হয়!—জননী হইবার সাধ মৃণালের হৃদয়ে কতটা প্রবল, অজয়ের তাহা অবিদিত নয়; কিন্তু ভগবান্ সে সাধে বাদ সাধিলে উপায় কি?

ধীর-পদে কাছে সরিয়া গিয়া অজয় লক্ষ্য করিল, মৃণালের মুখ শুষ্ক, দেহ ক্লান্ত। বুঝিল, সে আজ এখনও অনাহারেই আছে।—তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া, হাতের ঠেলা দিয়া মৃদু কণ্ঠে সে ডাকিল, "শুনছ, ওগো!"

মৃণাল মাথা তুলিয়া নিদ্রাজড়িত নয়নে ত্রস্ত ভাবে কি খুঁজিতে লাগিল। অজয় হাসিয়া কহিল, "কাকে খুঁজছ? রূপসীকে? ভয় নেই, সে ঠিক ঘুমুচ্ছে।"

তখন স্বীয় গণ্ড মৃণালের গণ্ডে স্থাপন করিয়া অজয় কহিল, "তুমি আজ এখনো খাওনি? সারাদিন উপোস কোরে আছ?"

মৃণাল চুপ করিয়া রহিল।

"ছি ছি! তুমি এত ছেলেমানুষ! একটা সামান্য বেরালের জন্যে—"

বাধা দিয়া মৃণাল কহিল, "বেরাল বোলে কি সেটার জীবন এতই উপেক্ষার বস্তু? আচ্ছা, মানুষ না হোক, সে ভগবানের সৃষ্ট একটা জীব তো বটে!"

অজয় কহিল, "আচ্ছা, স্বীকার করি, আমার খুবই দোষ হ'য়েছে। কিন্তু একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তুমি সারাদিন উপোস কোরে আছ! মা কি মনে ক'রছেন, বল দেখি?"

ঝাঁজভরা কণ্ঠে মৃণাল উত্তর দিল, "কি আবার মনে ক'রছেন? তিনি কি আমায় ভালবাসেন যে, আমি না খেলে তাঁর প্রাণে কষ্ট হবে? তিনি তাঁর বড়-বৌকে নিয়েই থাকুন, আমাকে তাঁর কোনও দরকার নেই। আর আমি মরলে কারই বা কি লোকসান? সে বরং ভালই হবে। তখন অনায়াসে আর একটা সুন্দর বৌ ঘরে আসবে; আর তার কত সুন্দর-সুন্দর ছেলে হবে। আমি বাঁজা, আঁটকুড়ো—আমার মুখের পানে তাকালে অকল্যাণ হয়।"

মৃণালের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, দুই গণ্ডে অশ্রুধারা। অজয় হাসিয়া কহিল, "বাপ্ রে! তুমি যেন একটি তুবড়ি, এতক্ষণ আগুনের ফুল্‌কি উদ্‌গিরণ কোরে এইবার গ্যাস্ ছাড়তে সুরু করলে! ছাখো, গুরুজনের উপর কি অভিমান ক'রতে আছে? ছিঃ! তোমার মৃত্যুকামনা কখনো তাঁরা করতে পারেন? তা ছাড়া ভেবেছ বুঝি, তুমি মরলেই মা আমার জন্যে আর একটি সুন্দরী ক'নে ঠিক কোরে ফেলবেন, আর আমি অমনি সুবোধ গোপালের মত হাসি-মুখে ছাঁদলাতলায় গিয়ে নূতন বৌটির সঙ্গে চার চক্ষুর মিলনের প্রতীক্ষা করব? বাঃ, তোমার অনুমানগুলি তো বেশ কাব্যরস মাখানো! সুমিষ্ট সরভাজা আর কি?"

"তুমি একবারে কলির যুধিষ্ঠির কি না যে—সে কাজ করা তোমার অসাধ্য!"

অজয় হাসিয়া ফেলিল; কহিল, "তা যুধিষ্ঠির কি একটিতেই খুশী ছিলেন? আমাকেও কি সেই রকম ঠাউরিয়েছ? আর যদি তাই হয়, তুমি মরে পেত্নী হ'য়ে তখন আমার ঘাড়ে চেপো। কিন্তু উপস্থিত এত দীর্ঘ উপোসের একটা নিষ্পত্তি করা দরকার।"

"আমি তো খাব না। রূপসী থালায় মুখ দিয়ে তোমাদের ক্ষতি ক'রেছে, আমি না খেয়ে সেই ক্ষতি পূরণ ক'রব।"

"উত্তম কথা। তবে চল, আমার খাবার থেকে অর্দ্ধেক তোমায় দিচ্ছি। এস, দু'জনে ভাগ কোরে খাই-গে।"

"কেন, আমি তোমার খাবার থেকে তার এক ভাগ খাব? মা শুনলেই বা কি বলবেন?"

অজয় বাহুবলে তাহাকে তুলিতে তুলিতে কহিল, "বলবেন—মৃণাল তার অর্দ্ধাঙ্গিনী কি না, তাই অজয় তাকে নিজের খাবারের অর্দ্ধেকটা খাইয়েছে।"

সে মৃণালকে লইয়া থালার পাশে বসাইল। ভাতের একটা গ্রাস তৈয়ার করিয়া কহিল, "নাও, শীগ্‌গির হাঁ কর; আজ আমরা এক-থালায় খাব।"

মৃণাল হাসিয়া ফেলিল। মাথা নীচু করিয়া কহিল, "না, তা খাব না।"

"খাবে না কেন? লজ্জাটা কিসের? বিয়ের সময় এক-থালায় একসঙ্গে খাওনি?"

সে জোর করিয়া মৃণালের মুখে গ্রাসের পর গ্রাস পুরিয়া দিতে লাগিল। এমন সময়ে হাঁই-তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে-ভাঙ্গিতে দেখা দিল রূপসী। তাহাকে কাছে আসিতে দেখিয়া মৃণালের মনে উদ্বেগের সীমা রহিল না। সে ভীত ভাবে অজয়ের পানে তাকাইতেই, অজয় রূপসীকে সোহাগভরে বাম হস্তে কোলে তুলিয়া লইল।

৪

যে সব জিনিসের শেষ নাই, তাহাদের মধ্যে অশান্তি একটি। একবার ইহা মনে উদয় হইলে জীবনে অস্ত যায়—এ কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহার সংক্রামকতাও বড় তুচ্ছ নয়; ছোঁয়াচটা চারি দিকে বেশ সহজেই ছড়াইয়া পড়ে!

মৃণালের মনে যে অশান্তির তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার ঘাত-প্রতিঘাত পরিবারস্থ সকলকেই ক্রমশঃ অনুভব করিতে হইতেছে। এক দিকে সংসার, অপর দিকে মৃণাল, এক দিকে রুসিয়া, অন্য দিকে ভারত—মাঝখানে অজয় যেন 'বাফার' আফগানিস্থান! কিন্তু সে নিশ্চেষ্ট নহে, সংঘর্ষণের উগ্রতা কমাইবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট।

একটা মনোমালিন্যের ফলে সংসারে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে, কারণটা যতই তুচ্ছ হউক, তাহা আর বিচারের অপেক্ষা করে না। উভয় পক্ষ তখন শুধু সম্মুখ-সমরে জয়ী হইবারই চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের সাক্ষীরা যে

তাহাদের আচরণ হইতে হাস্য-বিদ্রূপের উপাদান সংগ্রহ করিয়া বেশ মজা উপভোগ করিতেছে—ইহাও উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য উভয় পক্ষই হারাইয়া ফেলে।

একটা ছোট বিড়ালের উপদ্রব সহ্য করিতে বাড়ীর সকলেই নারাজ, এবং তাহার প্রতি অপরিসীম স্নেহবশতঃই মৃণাল বাড়ীর সকল লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। তাহার বিশ্বাস, কনকই সকলকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার মূল। এই জন্য গৃহিণীর নিকট ভর্ৎসনালাভ, এবং কনকের সহিত খিটি-মিটি নিত্যই চলিতে লাগিল; কিন্তু উপায় কি? বিড়াল অবোধ পশু, তাহাকে এ-সব কথা বোঝানো যায় না। বাঁধিয়া রাখিলে সে ক্রমাগত তীব্র চিৎকার করে, তাহাতেও বাড়ীর লোকের ধৈর্য্য নষ্ট হয়। উপদ্রবের জন্য তাহাকে প্রহার করিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে তাহা ভুলিয়া যায়; সুতরাং পারিবারিক অশান্তি দিন-দিন বাড়িতেই লাগিল।

সংসারের যাহা কিছু শ্রমসাধ্য কাজকর্ম্ম, আজকাল একা মৃণালই তাহা করিতেছে। দুই বেলা রন্ধন, সকলকে পরিবেষণ, শাশুড়ীর পূজার যোগাড়, জলখাবার তৈয়ার, কনকের ছেলে-মেয়েদের স্নান, ভোজন, প্রসাধন —সবই তাহার ঘাড়ে। তাহার কারণ, গৃহিণী বলেন, মেজ-বৌমা ঝাড়া-হাত-পা; 'বাঁজা' মেয়েমানুষ বসিয়া থাকিবে কেন?

মৃণালকে সবই সহ্য করিতে হয়; কিন্তু তাহার রূপসীকে লইয়া বাড়ীর সকল লোকেরই যে এত অশান্তি —সেইটাই তাহার অসহ্য!

সে-দিন হঠাৎ শোনা গেল, কনকের খোকাকে রূপসী আঁচড়াইয়া দিয়াছে। বাড়ীতে আবার একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল! রূপসী না কি দালানের এক কোণে ঘুমাইতেছিল, কনকের খোকা হামা দিয়া তাহার কাছে গিয়া উৎসাহের সহিত তাহার গায়ের পাকা চুল তুলিয়া দিতে সুরু করে। প্রতিবাদে রূপসী তাহার ধারাল নখ বাহির করিয়া খোকার কোমল দেহে দু-তিনটা থাবা মারিতেই তাহার দেহ হইতে রক্তপাত হয়। দুর্ঘটনাটা প্রকাশ হইতেই গৃহিণীর আর্ত্তনাদ, এবং ছেলে লইয়া কনকের ছুটাছুটি আরম্ভ হইল।

ব্যাপার দেখিয়া মৃণাল রান্নাঘরে বসিয়া একেবারে হতভম্ব! তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসও বুঝি রুদ্ধ হইয়া আসে! বাহিরে অজিতের কাছে দ্রুত সংবাদ পৌছিল—এখনই ডাক্তার আনিতে হইবে, খোকা সাংঘাতিক ভাবে জখম!

অবিলম্বে ডাক্তার আসিয়া খোকার ক্ষত পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য করিলেন—মারাত্মক কিছু নয়; সামান্য আঁচড় হইতে দুই-এক বিন্দু রক্তপাত মাত্র।

তিনি ক্ষতস্থানে একটু টিংচার-আয়োডিন্ লাগাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলে মৃণাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংসারের কাজে মন দিল।

কিন্তু এইখানেই এই ব্যাপারের যবনিকা-পতন হইল না। দুপুর বেলা সুজিত আহারে বসিলে, গৃহিণী ও কনক রূপসীর সেই অত্যাচার-কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়া বিবৃত করিলেন; অবশেষে গৃহিণী রায় প্রকাশ করিলেন —ওটাকে এখনি বিদেয় করা হোক; গেরস্তর ঘরে ও-সব কুকুর-বেরাল নিয়ে কাজ চলে না।

কনক গম্ভীর মুখে কহিল, "বেরালটাকে যদি বিদেয় না কর, তা হ'লে ছেলে নিয়ে আমাকেই এ-বাড়ী ছাড়তে হবে।"

সুজিত আসন ছাড়িয়া উঠিতে-উঠিতে কহিল, "সে তোমার যা খুসী ক'রো, বেরাল বিদেয়-টিদেয়ের ব্যাপারে আমি নেই। ও-সব ঝঞ্ঝাট থেকে আমায় রেহাই দাও।"

এ-কথায় কনক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "—তা এখন মেজ-বৌদি'র তরফে ওকালতি করবেই তো। কিন্তু আমিও সোজা ব'লে দিচ্ছি, বেরাল বিদেয় না হ'লে এ-বাড়ীতে আর জলবিন্দুও স্পর্শ করব না।"

৫

কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া মৃণাল তাহার ঘরের পাশে বারান্দায় আসিয়া বসিল। আজ তাহার রূপসী নাই, সে একলা। অজয় ভৃত্য মারফৎ রূপসীকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। শোকে মৃণাল আহারের সময় একটি গ্রাসও গলাধঃকরণ করিতে পারে নাই। তাহার কেবলই মনে হয়, আশ-পাশ হইতে ঐ বুঝি রূপসী মিউ-মিউ করিতে-করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। চকিত ভাবে সে একবার এ-দিক্ ও-দিক্ চায়; তাহার পর যেই মনে পড়ে, রূপসী

নাই, অমনি তাহার গণ্ডদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হয়, মনটা হু-হু করিয়া উঠে।

নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। অসংখ্য নক্ষত্র আকাশপটে ঝিক্-মিক্ করিতেছে। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে চোখে পড়ে—কুকুর সহ কালপুরুষ। মৃণালের মনে হয়, সে যদি অমনি দেবকুল, মানবকুলের বিরুদ্ধে রূপসীকে লইয়া অনন্ত কাল শূন্যমার্গে অবস্থান করিতে পাইত! হায়! ডায়েনার যে শক্তি ছিল, তাহার তো তাহা নাই!

মৃণাল কালপুরুষের পানে অভিভূত ভাবে চাহিয়া আছে। তাহার পর দৃষ্টি ফিরাইতেই চোখে পড়িল—ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল। মনে হইতে লাগিল, অত্রি, দধীচি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাহাকে আশীষ জানাইতেছেন; তাঁহাদের গম্ভীর কণ্ঠের জ্যোতির্ম্ময় ধ্বনি আলোকোদ্ভাসিত দিগন্তব্যাপী ব্যোমমার্গ প্রতিধ্বনিত করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘোষণা করিতেছে—"বৎসে, বিশ্ব-প্রেমিকা হও!"

মৃণাল ভাব-তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। মনে আজ একটা অনুভূতি জাগিতেছে---কি বিরাট্ বিশাল সৃষ্টি! কিন্তু আঘাত লাগিল এক স্থানে, যখন প্রশ্ন জাগিল—এই বিশালত্বে, এই বিরাটত্বে কি বিড়ালের স্থান নাই? হয় তো বা নাই, নতুবা সংসারের সবাই তাহার প্রতি এত বিমুখ কেন?

হঠাৎ মনে হইল, আকাশটা দুলিয়া উঠিতেছে! যেন সেই অনন্ত গাঢ় নীলিমা মথিত করিয়া মহাশূন্যের এ-পার হইতে ও-পার অবধি এক জ্যোতির্ম্ময় বিশাল বিড়াল-মূর্ত্তি! স্তম্ভিত মৃণাল একবার 'মা গো' বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

কাহার মৃদু করস্পর্শে মুখ হইতে হাত সরাইয়া মৃণাল চাহিয়া দেখে, অজয় আসিয়া তাহার নিকটে বসিয়াছে।

"একটা বেরালের জন্য কি নিজেকে নষ্ট করবে, মিনু? চোখের জলে তোমার বুকের কাপড় ভিজে গেছে যে!"

আবেগ-উদ্বেলিত কণ্ঠে মৃণাল কহিল, "আমার নষ্ট হওয়াই তো উচিত। যেখানে আমার স্নেহের পাত্রের স্থান নেই, সেখানে আমারও স্থান নেই।"

অজয় তাহাকে বুকে টানিয়া-লইয়া চোখ মুছাইতে মুছাইতে কহিল, "ছি মিনু, এ তোমার কি রকম বিবেচনা? তুমি মানুষ হ'য়ে একটা পশুর বিরহে এতখানি কাতর হচ্ছ?"

মৃণালের মর্ম্মে যেন দাবানল জ্বলিতেছে। সে ভাবিতেছে, পুরুষ চিরদিনই নিষ্ঠুর; শুধু বাহির লইয়াই তাহার কাজ, অন্তর্জগতের কোন খবরই সে রাখিতে চায় না।—স্বামীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া মৃণাল কহিল, "ভাল-বাসায় বনের পশুও মানুষকে হারিয়ে দিতে পারে। ভালবাসার কাছে জগতের কোন যুক্তি-তর্ক আঁটে না,—তা কি বোঝো? তোমরা পুরুষ, চিরজীবন বাইরের চোখ দুটো মেলেই সংসারের কাজকর্ম্ম কর। অন্তরের চোখ থাকলে দেখতে পেতে, ভেতরে আর একটা জগৎ আছে। সে জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের অনেক সময়ে কোন মিল থাকে না।"

অজয় হাসিল; সে হাসি মৃণাল দেখিতে পাইল না। দেখিতে পাইলে বুঝিত, স্বামীর প্রাণে কতখানি সহানু-ভূতি-কি গভীর সমবেদনা! তাহাকে বাধা দিয়া অজয় কহিল, "দেখ মিনু, স্বীকার করি, পুরুষ নিয়ে তোমাদের নাড়াচাড়া করতেই হয়, এবং কতকগুলো অবাঞ্ছনীয় দুর্ব্বলতা পুরুষের জীবনের সঙ্গী। কিন্তু তা দেখেই তাদের চিনেছ বা বুঝেছ ভাবলে ভুল ক'রবে।"

ইহার পর দু'জনেই অন্যমনস্ক ভাবে অসীম নৈশ অন্ধকারের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

৬

আজকাল বাড়ীতে একটা কাণাকাণি চলিতেছে। মৃণাল না কি সন্তানসম্ভবা! রূপসী বিদায় হইবার পর হইতেই গৃহিণী তাহার সহিত কোমল ব্যবহার করিতে-ছিলেন; এত দিন পরে এই বধূটিরও সন্তান-সম্ভাবনার কথা জানিতে পারায় তাঁর চিত্তপটে প্রসন্নতার যেন একটা বার্ণিশ পড়িল। অবশ্য, মৃণালের কর্ম্মকুশলতা এবং নিঃস্বার্থ সেবা সকলের চিত্ত যে পরিমাণে আকর্ষণ করিত, তাহার ত্রুটিজনিত সাময়িক সংঘর্ষণ সে তুলনায় কিছুই নয়; তবে উপদেশচ্ছলে গৃহিণী তাহার প্রতি যে কঠোরতা প্রকাশ করিতেন, তাহাতেই তাহার বড় অভিমান হইত।

রূপসী চলিয়া যাইবার পর হইতে গৃহিণী লক্ষ্য

করিতেছেন—মৃণালের কেমন একটা উদাস ভাব, প্রসাধনের পানে একবারেই দৃষ্টি নাই, হাসিতে স্ফূর্ত্তির অভাব; শুধু কর্ত্তব্যপালনের খাতিরেই যেন সংসারের কাজগুলো সে করিয়া যায়। কনক কোন কাজ করিতে গেলে মৃণাল বলে, "আমি একটা ঝাড়া-হাত-পা মানুষ সংসারে থাক্‌তে আপনি কেন খাট্‌তে যাবেন ?"

গৃহিণী অনুভব করেন, মৃণালের এরূপ ব্যবহারে কনক যেন ফাঁপরে পড়িয়াছে। মৃণালের প্রতি তাঁর চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠে। তিনি ভাবিয়াছিলেন, রূপ্‌সী দু'-চার দিন পরেই পথ খুঁজিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু সে তো আর ফিরিল না। বাঁচিয়া আছে কি না, তাই বা কে জানে? অধিক বয়সে সন্তানসম্ভবা পুত্র-বধূটিকে গৃহিণী যত্ন করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু মৃণাল যেন সে যত্ন অতি সাবধানে প্রত্যাখ্যান করে।

রূপ্‌সীর অন্তর্ধানে বাড়ীর আর এক জনও বড় ক্ষুণ্ণ। সে সুজিত। যখন তখন সকলকে শুনাইয়া সে বলে, "মেজ-বৌদি, তুমি ভেবো না; রূপসী হঠাৎ এক দিন ঠিক ফিরে আসবে, দেখো।"

মৃণালের চোখ ছল-ছল করিয়া উঠে। সে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে। তাহার মনে হয়, যেন স্থলে, জলে, বাতাসে, আকাশে সর্ব্বত্র তাহার রূপ্‌সী তাহারই উদ্দেশে কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে—"মিউ! মিউ!"

সুজিত বলিতে থাকে, "এরা সব বড় নিষ্ঠুর, এদের ক্ষমাগুণ একটুও নাই। সামান্য একটা বেরাল-ছানার উপদ্রব নিয়ে এরা অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত রচনা করে!"

কথা শেষ করিয়াই দুই হাতে দুইটা তুড়ি দিয়া সে হাসিতে থাকে। সে মৃণালের সমবয়সী, সেই জন্য উভয়ের মধ্যে বনিবনাওটা কিছু বেশী। কিন্তু কনক ইহা সহ্য করিতে পারে না; বলে, "ঠাকুরপো মেজ-বৌএর সঙ্গে পরামর্শ কোরে আমার অপমান করে।"

এ কথা সুজিত একটুও গ্রাহ্য করে না, কিন্তু মৃণাল এ কথায় ব্যথিতা হয়।

নিয়ত চলনশীল যন্ত্রের মত দিন চলিতে থাকে, কিছুতেই থামে না; কোথাও বাধা পায় না। মৃণালেরও দিন চলিতে লাগিল—হউক তাহা সঙ্গিহীন, হউক স্নেহশূন্য, শুষ্ক। আজকাল সে দেবতার চরণে প্রার্থনা জানায়, "দাও প্রভু, আমার রূপ্‌সীকে ফিরিয়ে দাও! আমি আর একা থাকতে পারি-নে।"

তাহার শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, কাজ-কর্ম্মে যেন অশক্ত। পাণ্ডুর মুখে শুধু জলজলে চোখ দুইট ধক্-ধক্ করিতে থাকে। অজয় ভীতনয়নে তাহার পানে চায়, গায়ে হাত বুলাইয়া বলে, "কি হ'ল গা তোমার ?"

মৃণালের চোখ দুটো সহসা যেন কোমল হইয়া আসে। একটা লজ্জা-মেশানো গোপন আকাঙ্ক্ষা ছায়াপাত করিয়া তাহার দৃষ্টি মধুর করিয়া তুলে; আনত নয়নে মৃদুকণ্ঠে মৃণাল উত্তর দেয়, "কই, কিছুই তো হয়নি।"

—"না না, এক জন ডাক্তার এনে দেখাই।"

মৃণাল মাথা ঝাঁকাইয়া বলে, "তোমার পায়ে পড়ি, ও-সব করতে যেও না।"

কিন্তু বাড়ীতে একটা উদ্বেগ ক্রমশঃ সুপরিস্ফুট হইতে লাগিল। অধিক বয়সে প্রথম সন্তান হইতেছে, কি ঘটিবে, কিছুই বলা যায় না।

৭

সে-দিন রাত্রি হইতে মৃণাল বড় অসুস্থ হইয়া পড়িল। ডাক্তার এবং ধাত্রীর আসা-যাওয়া চলিতেছে।

সাত দিন সাত রাত্রির পর মৃণাল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করিল। অজয় ও বাড়ীর অন্য সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে, "প্রসূতির জ্ঞান যে এখনো ফিরে এল না ?"

তিনি হাসিয়া উত্তর দেন, "আশা তো করি, শীঘ্রই ফিরে আসবে।"

তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে মৃণালের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। পাশে চাহিয়াই সে একবারে বিস্মিতা! কোমল শুভ্র এক-রাশ যূথিকার মত এক শিশু অঘোরে ঘুমাইতেছে। হর্ষে পুলকে মৃণালের চক্ষু যেন মুদিয়া আসিতেছিল। ইহারই নাম মাতৃত্ব। হাঁ, এত কাল ইহার আস্বাদনে সে বঞ্চিতা ছিল বটে।

কিন্তু সহসা তাহার নয়নদ্বয় সজল করিয়া স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল এক দুগ্ধধবল বিড়াল-শাবক! ও কে? রূপ্‌সী না? এমনিই তো একরাশ যূথিকার মত তাহার দেহ!

শাশুড়ী ডাকিলেন, "মেজ-বৌমা!"

মৃণাল চোখ মেলিল। তিনি হাসি-মুখে কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "ওমা, তোমার কেমন খুকী হ'য়েছে, দেখেছ? মেয়েই বা কার, ছেলেই বা কার? তা হোক্‌গে মেয়ে, প্রথম সন্তান মেয়ে, তাতে আমার অজুর পরমায়ু বৃদ্ধি হবে।"

তাঁর চোখে-মুখে আনন্দের আভাস দেখিয়া মৃণাল ডাকিল, "মা!"

—"কেন মা?"

—"আচ্ছা, মেয়ে হ'লেও তো আর তাকে আঁটকুড়ী বলে না?"

জিহ্বা দংশন করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ছি মা, বলতে নেই ও-কথা। আশীর্ব্বাদ করি, যা হয়েছে, তাই যেন শত পুত্রের সমান হয়ে বেঁচে থাকে।"

তিনি চলিয়া গেলেন। মৃণাল মুদিত নয়নে যেন তাহার নূতন মাতৃত্বের আস্বাদনটা অনুভব করিতে লাগিল।

সেই সময়ে কে এক জন তাহার ঘরে নিঃশব্দে প্রবেশ করিল, মৃণাল চোখ মেলিতেই অজয়ের সহিত তাহার চোখোচোখি হইল। উভয়েই লজ্জাজড়িত হর্ষে যেন একটু সঙ্কুচিত; মৃদু হাস্যে অজয় কহিল, "খুকীর মাকে একবার দেখতে এলুম।"

—"খুকীকে দেখেছ?"

অজয় কাছে বসিয়া খুকীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে সস্নেহে ধরিয়া রহিল। মৃণাল জিজ্ঞাসা করিল, "কার মত দেখ্‌তে হবে, বল দেখি?"

—"তোমার মতই।"

মৃণাল বাধা দিয়া কহিল, "ইস্, আমার মত তো নয়, তোমার মত।"

—"না গো, না। অত সুন্দর আমি নই।"

—"যাক্‌গে, যার মতই হোক, নাম কি রাখবে বল।"

—"রূপসী।"

বিস্ময়াতিশয্যে মাথাটা তুলিয়া আবেগভরে মৃণাল কহিল, "কি বল্‌লে?—কি বল্‌লে শুনি!"

অজয় তেমনি ভাবেই কহিল, "রূপসী ওর নাম হবে।"

তাহার পর ক্ষণকাল সে অন্যমনস্কের মত নীরব থাকিয়া কহিল, "হ্যাঁ, সেই রূপসীই এবার তোমার দুলালী হয়ে ফিরে এসেছে। এ রূপসীকে কেউ আর তাড়াতে পারবে না। এখন থেকে তুমি সত্যিই রূপসীর মা, আর আমি রূপসীর বাবা।"

মৃণালের চোখ দিয়া দর-দর ধারায় জল পড়িতে লাগিল। অজয়েরও দুই চোখ কানায়-কানায় পূর্ণ। সে মাথা নীচু করিয়া গভীর স্নেহে খুকুরাণীর রক্তগণ্ডে একটা চুম্বন অঙ্কিত করিল।

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়।

অভিনয়

বাতায়নখানা দিনরাত খোলা রেবার নজর-বন্দী
দিন বারটায় খেতে উঠে যাই অমনি ভাঙে যে সন্ধি;
রাগে জলে উঠি খোঁজে সে হাজার জব্দ করার ফন্দি
হরিণ-নয়না চন্দ্রবদনা রেবার নয়ন-বন্দী।
টেবিলেতে দেখে ব'য়ের পাহাড় মায়ের কত না কষ্ট
বলে, "বাছা রাখ, সাঁজ হ'লো ছাখ, দেহটা হ'লো যে নষ্ট—"
বুঝায়ে বলি যে, "পাশের বাড়ীতে রেবার কণ্ঠ পষ্ট
উঠিছে এখনো শুনিতে পাও না, হ'ক না দেহটা নষ্ট!"
"রেবার মতন 'মাষ্টারী' করে জোটাতে হবে না অন্ন"—
মা বলে, "ব্যবসা দেব খুলে দেহটা করো না ক্ষুন্ন,
হতভাগীটার পড়ার জলনে পাড়ার লোকেরা তিক্ত
খাবে চল বাবা—ইহারি মূল্য দেখি না কে দেয় দিক্ তো?"
মা ত বুঝে না'ক রেবার স্বপনে হৃদয় আমার পূর্ণ
ক্ষণিকের লাগি রেবার বিহনে বক্ষ হয় যে চূর্ণ।
খেয়ে এসে পুনঃ বই খুলে বসি দুয়ার করিয়া বন্ধ
রেবার টেবিলে গোলাপের তোড়া নয়ন হয় যে অন্ধ!
উতলা করে যে মনটারে মোর তাহার মিঠেল গন্ধ
কবিতার খাতা খুলিয়া বসি যে দুয়ার করিয়া বন্ধ।
মিস্ রেবা যেই উঠিয়া দাঁড়ায় পুস্তক লয়ে কক্ষে
ভঙ্গিমা বাঁকা জানি না'ক কেন আঁকা যায় মোর চক্ষে।
রেবা রায় আসে আমাদের ঘরে সাঁজ-সকালেতে নিত্য
সাজি ভরে ফুল তুলি দেয় তারে আমাদের ক্ষেতু ভৃত্য।
যদি বা তুলেছি হেনার কিংবা মল্লিরাণীর নৃত্য
আবির মাখানো মুখখানা হয়, জলে ওঠে তার চিত্ত।
এমনি করিয়া দিবানিশি কাটে হাস্যে লাস্যে হর্ষে
সহসা দেখি যে বধূ হয়ে রেবা চলিল নবীন বর্ষে।
বুঝি নাই হায় কিশোরী রেবার সে-দিন দুরভিসন্ধি
মহান গর্ব্বে মিছে বলেছিনু, "রেবার নজর-বন্দী।"

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ (বি-এ)।

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র

রাষ্ট্রতন্ত্র মানব-জীবনের অনেক ব্যাপারেরই সুস্পষ্ট পরিচায়ক; উহা মানব-সভ্যতার মানদণ্ড। রাষ্ট্রতন্ত্র এখানে ইংরেজী politics-এর সঙ্গে কতকটা সামঞ্জস্য রাখিয়া অভিন্ন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন জাতির প্রকৃত ইতিহাস জানিতে হইলে সেই জাতির রাষ্ট্রতন্ত্র প্রথমে কি ভাবে সংগঠিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান লইতে হয়। সে সন্ধান পাওয়া যায় আলোচ্য জাতির প্রাচীন সাহিত্যে। ক্ষোভের বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রসম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কোনও আলোচনা হয় নাই। য়ুরোপীয়রাই এ দেশে আসিয়া প্রথমে নির্ভর-যোগ্য ভাবে ইতিহাসের ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাদের যথাযোগ্য জ্ঞান না থাকায়, অথবা অন্য কোন কারণে কি না ঠিক বলা যায় না, তাঁহাদের সেই ইতিহাসের আলোচনায় অনেক ভুল-ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে—ইহাই এ দেশের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদিগের ধারণা। এখানে 'প্রাচীন ভারত' বলিতে আমরা বৈদিক যুগের ও রামায়ণ-মহাভারতের যুগের ভারতের কথাই ধরিয়া লইতেছি। উহা বৌদ্ধ-যুগের পূর্ববর্তী ভারত। তন্মধ্যে বৈদিক যুগের ভারতের রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন। বেদের ভাষা অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলিয়াই আমাদের এইরূপ ধারণা। এঙ্গলো-স্যাক্সন ভাষার সহিত প্রাচীন ইংরেজী ভাষায় যত দূর পার্থক্য লক্ষিত হয়, বৈদিক ভাষার সহিত রামায়ণী এবং মহাভারতী ভাষার পার্থক্য তাহা অপেক্ষা অধিক ভিন্ন অল্প নহে। রামায়ণ এবং মহাভারত কথকতার জন্য পঠিত এবং ব্যাখ্যাত হইত বলিয়া বুধগণ পরবর্তী কালে উহার ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু বৈদিক ভাষা সম্বন্ধে সেই পন্থা অবলম্বিত হয় নাই। কৃত্তিবাসের ও কাশীরাম দাসের রামায়ণ-মহাভারতের ভাষারও পাঠ শ্রুতি-সুখকর এবং অধিকতর সুললিত করিবার জন্যই ঐরূপ সংস্কার সংসাধিত হইয়াছে। মহাভারতে যে সকল প্রাচীন শব্দ ও কুটিল বাক্যভঙ্গী (phrase) আছে, উহা সাধারণতঃ 'ব্যাসকূট' নামে অভিহিত। লেখক গণদেবকেও উহার অর্থ আয়ত্ত করিতে মাথা ঘামাইতে হইয়াছিল, এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

যাহা হউক, সাধারণ সংস্কৃত ভাষায় অর্থাৎ রামায়ণী-মহাভারতী সংস্কৃত ভাষা দিয়া বেদের ভাষা বুঝিবার উপায় নাই, সেই জন্য অনেক য়ুরোপীয় অদ্ভুত ভুলের সাহায্যে গোঁজামিল দিয়া থাকেন। বেদের শব্দগুলির মৌলিক অর্থ ধরিয়াই বুঝিতে হয়। যাস্কের নিরুক্তে উহার কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শব্দস্ফোট ধরিয়াও বুঝিতে হয়। সেই জন্য বড় ভুল হয়। অবশ্য অতীত সাহিত্যের ছায়া দেখিয়া যাহা বুঝা যায়, তাহাই যে সকল সময় সত্য হয়, তাহাও নহে। নিরপেক্ষ ভাবে ভাবিয়া দেখিলে একটা মোটামুটি সত্য উপলব্ধ হয়—যেমন, অতি প্রাচীন যুগের কোন অধুনাবিলুপ্ত প্রাণীর কঙ্কাল দেখিয়া তাহার দৈহিক গঠন বা রূপের কতকটা অনুমান করা হয়। বেদের সংহিতা-ভাগ রাজনীতিক বা সামাজিক গ্রন্থ নহে। উহা ভক্তির উচ্ছ্বাস বা স্তবের গ্রন্থ। উহাতে মুখ্যতঃ রাজনীতির কথা আলোচিত হয় নাই; তবে স্থানে স্থানে রাজনীতিক চিন্তার যে ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই উহা হইতে বৈদিক যুগের রাজনীতিক অবস্থা এবং ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু অনুমান সত্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না, সেই জন্য এ-দেশী পণ্ডিতরা উহা হইতে রাজনীতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণার পক্ষপাতী নহেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা একটা আজামৌজা সিদ্ধান্ত করেন, সেটা ঠিক হয় না।

য়ুরোপীয়রা বলেন, ভারতে চিরকাল স্বৈর-শাসন প্রচলিত ছিল—ভারতের রাজনীতি কেবলমাত্র স্বেচ্ছাচারী রাজগণের কীর্ত্তি-কাহিনীতে পূর্ণ; তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত সত্য নহে। বৈদিক যুগে ভারতে বিস্তীর্ণ রাজ্যসমূহের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে

হয় না; অধিকাংশ রাজ্যই ক্ষুদ্র ছিল। সেই সকল রাজ্যের রাজারা প্রজা-সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলে ১৭৩ সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি অনুশীলন করিলে মনে হয়, ব্যক্তিবিশেষকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত প্রজাবর্গ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, "বিশস্ত্বা সর্ব্বা বাঞ্ছন্তু" অর্থাৎ সর্ব্বা বিশঃ অর্থাৎ সকল লোকই (প্রজা) আপনাকে চাহিতেছে। ইনিই আমাদের রাজা হউন, এই কামনা করিতেছে। এই মন্ত্রটি পরবর্ত্তী কালে রাজগণের রাজ্যাভিষেক কালে পঠিত হইত। সৎকর্ম্ম করিয়া রাজা দৃঢ়ভাবে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হউন, ইহাই প্রজাদিগের কামনা। ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রেও ঐরূপ কথা আছে। অন্যত্র আছে,—"এই জনপদের অধিবাসীরা আপনাকেই নেতৃপদে অর্থাৎ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার কামনা করিতেছেন।" "পঞ্চগ্রামের সকলে মিলিত হইয়া (পরামর্শ পূর্ব্বক) আপনাকে রাজা নির্ব্বাচনে সম্মত হইয়াছে। আপনি আসিয়া সুনিয়মে অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত নীতি অনুসারে রাজ্যে প্রজাপালন করিতে থাকুন।" —এখানে একটা কথা লক্ষ্য করিবার যোগ্য। যে রাজ্যটির কথা বলা হইয়াছে, সে রাজ্যটিতে পাঁচটি গ্রাম ছিল বুঝিতে হইবে। গ্রাম কাহাকে বলে। 'গম্যতে জান-পদৈরত্র ইতি গ্রামঃ।' অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে লোকরা বা জনপদবাসীরা যেখানে যায়। কতকটা নগরের মত— ব্যবসায় প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল। মাত্র পাঁচখানি গ্রাম বা সহরের সমষ্টিতে যে রাজ্য, তাহা বিস্তীর্ণ দেশ হইতে পারে না; আবার উহা খুব স্বল্পায়তন স্থান না হইতেও পারে। কারণ, তখন সহর ছিল অল্প। সেই জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, রাজ্যগুলি তখন গ্রীকদিগের রাজ্যের ন্যায় ক্ষুদ্র ছিল, আর কেহ কেহ মনে করেন, উহা অত ছোট ছিল না। যাহা হউক, যে স্থানে বিদ্যাস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্যস্থান প্রভৃতি ছিল, সেই স্থানের লোকেরাই পরামর্শ করিয়া রাজাকে নির্ব্বাচন করিতেন। এই রাজ-নির্ব্বাচনের কথা কেবলমাত্র ঋগ্বেদ-সংহিতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ নহে, অথর্ব্ববেদ-সংহিতায় ইহার অনেক বেশী দৃষ্টান্ত আছে। অথর্ব্ববেদ-সংহিতায় ৩ কাণ্ড ৩ সূক্ত ৫ম মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—"আপনাকে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক মিত্রজন আহ্বান করিতেছে। আপনি প্রজা-দিগকে রক্ষা করিতে আসুন।" এখানে রাজা-নির্ব্বাচনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। ঐ সংহিতায় ৩য় কাণ্ডের ৪র্থ সূক্তে ১—২ মন্ত্রে দেখা যায় যে, রাজা রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে বসিয়াছে, সেই জন্য প্রজাবর্গ তাঁহাকে রাজপদ প্রদানের অভিপ্রায়ে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—"আপনার রাজ্য শত্রু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত। আপনি এখানে আসিয়া পুনরায় রাজ্য-ভার গ্রহণ করুন। সকল প্রদেশের সকল লোকই আপনাকে রাজপদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করিতেছে। আপনি উহা গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে পালন করিতে থাকুন। আপনি প্রজাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আপনি সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রুজয়ী হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতে থাকুন।" বৃ ধাতুর অর্থ বরণ করা বা নির্ব্বাচন করা। "ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যায়" আপনাকে প্রজারা রাজ্য দিবার জন্য বরণ বা নির্ব্বাচন করিয়াছে,—ইহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং এখানে রাজা যে প্রজাগণ কর্ত্তৃক বৃত বা নির্ব্বাচিত হইতেন, তাহা বুঝা যাইতেছে।

তাহার পর অথর্ব্ববেদ-সংহিতার তৃতীয় কাণ্ডের চতুর্থ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে প্রজারা রাজাকে নির্ব্বাচিত করিত, এইরূপ জানিতে পারা যায়। এই মন্ত্রে 'ইন্দ্রেন্দ্র' পদ আছে। ইন্দ্র বলিতে অনেক সময় রাজা আবার দেবতার রাজাও বুঝায়। 'ইন্দ্রেন্দ্র' শব্দে রাজা বা সম্রাট্‌ বলা হইতেছে। 'ইন্দ্র' শব্দে কেবল দেবরাজ বুঝাইলে 'ইন্দ্রেন্দ্র' শব্দটির কোন সার্থকতা থাকিত না। ইহাতে যে 'বরুণৈঃ সংবিদানাঃ' কথা আছে, তাহার অর্থ নির্ব্বাচকগণের মতের ঐক্যবশতঃই বুঝিতে হইবে। অথচ 'বরুণ' দেবতা-বিশেষের নাম; কিন্তু এখানে বরুণ শব্দের অর্থ নির্ব্বাচনকারী। ইহার অর্থ 'দেবতা' হইলে উহা বহুবচনান্ত হইত না; কারণ, বরুণ দেব এক—বহু নহেন। 'সংবিদানাঃ' অর্থে ঐকমত্যপ্রাপ্ত। সায়নাচার্য্যও 'সংবিদানাঃ' পদের এই অর্থ করিয়াছেন। একমাত্র বরুণের ঐকমত্য হইতে পারে না, সুতরাং টানিয়া-বুনিয়া অর্থ করিতে হয়। ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রেও প্রজাসাধারণের একমত হইয়া রাজ-নির্ব্বাচনের কথা আছে; এবং

অন্যত্রও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বস্তুতঃ, বৈদিক যুগে হিন্দু রাজারা যে প্রজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন, তাহা নিঃসন্দেহেই বুঝিতে পারা যায়। তবে প্রজামাত্রই রাজা-নির্ব্বাচনে 'ভোট' দিতে পারিত কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ লক্ষিত হয়। প্রজাসাধারণের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়া রাজা-নির্ব্বাচন করিতেন—এরূপ ধারণা অসঙ্গত নহে। কিন্তু প্রত্যেক প্রজাই রাজাকে প্রার্থনা করিতেছেন বা ডাকিতেছেন, এরূপ আভাসও বহু স্থলেই পাওয়া যায়। সে-কালেও প্রজা-সাধারণের সভা ছিল। উহা সাধারণতঃ জ্ঞানবৃদ্ধগণেরই সভা বলিয়া মনে হয়। রাজা সাধারণ অবস্থায় ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে রাজ্যশাসন করিতেন বটে, কিন্তু যুদ্ধাদির ন্যায় সঙ্কটকালে তিনি পরিষদের সহিত মন্ত্রণা করিতে বাধ্য হইতেন। বৈদিক যুগে এই ভাবের গণতন্ত্রও ছিল—এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। বিশেষতঃ, রাজাকে ১০ বৎসরের জন্য (দশমীমুগ্রঃ সুমনাবশেহ) রাজপদ প্রদানের কথা স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। এ অবস্থায় কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রাজা নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইতে মনে হয়—রাজপদ কতকটা 'প্রেসিডেণ্টের' পদের মত নির্ব্বাচন-মূলক ছিল।

ইহাতে বুঝা যায় যে, সুদূর বৈদিক যুগে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে যখন ভারতীয় কৃষ্টির উষাকাল, সেই সময় ভারতে হিন্দুদিগের মধ্যে রাজপদ প্রজাদিগেরই অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল, অর্থাৎ স্বৈর-শাসন প্রচলিত ছিল না। বৈদিক সাহিত্য হইতে তাহার বহু প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, যদিও য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিকৃত ব্যাখ্যার ফলে তাহার দুই-একটি প্রমাণ সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া অসম্ভব না হইলেও সর্ব্ববাদিসম্মত প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। অধিকন্তু ঐ ব্যবস্থা মহাকাব্যের যুগ এবং বৌদ্ধ-যুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল; আর উহার যে বিকাশও সাধিত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সেই জন্য মহাকাব্যের যুগে হিন্দু-ভারতের রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এখানে বিশেষ ভাবে তাহার আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা দেখিতে পাইব, তখনও হিন্দু রাজারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, এবং প্রজাশক্তি তখনও বিলক্ষণ প্রবল ছিল।

মহাকাব্যের যুগে অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারতাদির যুগে (Epic period) ভারতের হিন্দু-রাজ্যগুলি নানা অংশে বিভক্ত ছিল; যথা—কাশী, কোশল, বিদেহ, চেদি, শূরসেন, পাঞ্চাল, মৎস্য, বৃষ্ণি, ভোজ, মালব, ক্ষুদ্রক, মদ্র, কেকয়, গান্ধার, সিন্ধু, সৌবীর, আনর্ত্ত, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। কোন কোন রাজ্যের নাম দেশবাসীর নাম অনুসারে, এবং কোন কোন রাজ্যের নাম আদিরাজা বা রাজবংশের নাম অনুসারে ধার্য্য করা হইয়াছিল। যেমন কাশী রাজ্যের নাম হইয়াছিল কাশী নগরীর নাম হইতে, কিন্তু কুরু এবং শূরসেন নাম হইয়াছিল রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা রাজার অথবা রাজবংশের নাম অনুসারে। সর্ব্বত্র মোটামুটি বর্ণাশ্রমী হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে রাজ্য শাসিত হইলেও স্থানভেদে আচার-ব্যবহারের কিছু কিছু বিভিন্নতা ঘটিত। শাসন-কার্য্যেও কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইত; তবে হিন্দু-রাজ্যগুলি সাধারণতঃ প্রায় একই নিয়মে শাসিত হইত। ইহার মধ্যে ব্রহ্মবর্ষ এবং কুরুবর্ষের আচার-ব্যবহারই সমধিক প্রশংসনীয় ছিল। এখনও পশ্চিম-ভারতে সরযূপারস্থ ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত শুদ্ধাচারী বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন। সভাপর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

"গৃহে গৃহে হি রাজানঃ স্বস্য স্বস্য প্রিয়ঙ্করাঃ।
ন চ সাম্রাজ্যমাপ্তাস্তে সম্রাট্ শব্দো হি কৃচ্ছ্রভাক্॥"

সভা, ১৫।২

"দেখুন, গৃহে গৃহে নিজ নিজ রাজ্যের প্রিয়কারী রাজা রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারেন নাই, কারণ, সম্রাট্ শব্দটি বড়ই কষ্ট করিয়া লাভ করিতে হয়।"

এই শ্লোক হইতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, রাজ্যগুলি গ্রীক রাজ্যের ন্যায় ক্ষুদ্র ছিল; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। 'গৃহ' শব্দে কেবল নিজের বাস-ভবনই বুঝায় না,—অধিকৃত স্থানও বুঝায়; সেই জন্য পণ্ডিতরা এই শ্লোকের অর্থ করিয়া থাকেন,—প্রতি রাজ্যেই স্ব স্ব প্রিয়ঙ্কর রাজারা আছেন। নতুবা 'যত গৃহস্থ তত রাজা' এ কথা ইহার অর্থ নহে। বিশাল ভারতে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠানকামী রাজা যুধিষ্ঠির যেন কতকটা অবজ্ঞাভরেও

বলিতে পারেন, 'রাজা ত এখন ঘরে ঘরে ?' ইহাতে রাজ্যগুলি যে একেবারেই অতি ক্ষুদ্র ছিল, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। হিন্দু রাজারা অন্য রাজার রাজ্য জয় করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিতেন না। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, কোন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিলে সেই পরাজিত রাজাকে তাঁহার সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হন, তাহা হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র অথবা তাঁহার বংশের কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সিংহাসনে স্থাপন করিতে হইবে। মনুসংহিতা এবং বিষ্ণুসংহিতাতেও এ কথার উল্লেখ আছে। * যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় এ কথাও বলা হইয়াছে যে, রাজা পররাজ্য নিজের বশে আনিলে সেই দেশের আচার-ব্যবহার এবং ধর্ম্ম যেরূপ ছিল, ঠিক তাহাই রাখিবেন। সেই জন্যই ঐ সকল রাজ্য একীভূত হয় নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পরেও ঐ সকল রাজ্যের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার পুরুরাজকে জয় করিয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, এ জন্য প্রাচীন কালের গ্রীক-লেখক এবং আধুনিক য়ুরোপীয় লেখকরাও তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন; সে প্রশংসা তাঁহার প্রাপ্য; আলেকজাণ্ডার এ ক্ষেত্রে উদার ভারতীয় রাজনীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন—তিনি পররাজ্যলোলুপ রাজগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন নাই বলিয়াই ঐরূপ প্রশংসার পাত্র। পুরাকালে ভারতের কোন নরপতি শোষণের জন্য, বা আত্মীয়-কুটুম্বগণকে পোষণ করিবার জন্য পররাজ্য গ্রাস করিতেন না। সেই জন্যই বোধ হয়, সুসভ্য য়ুরোপীয়রা সে-কালের ভারতবাসীদিগকে অসভ্য মনে করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন!

যাহা হউক, প্রজার সম্মতি ব্যতিরেকে কেহ যে কোন দেশের রাজসিংহাসনে আসীন হইতে পারিতেন না, তাহার প্রমাণ রামায়ণেও যথেষ্ট পাওয়া যায়। অযোধ্যার রাজা দশরথ সে কালের প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি অসুর-দমনের জন্য অনেক সময় অনুরুদ্ধ হইতেন। তিনিও জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলে অধীনস্থ রাজগণ, নানা পুরবাসী, এবং জনপদবাসীদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদিগের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। * সেই সভায় ব্রাহ্মণগণ, দেশনায়কগণ, পুরবাসিগণ এবং জনপদবাসিগণ একমত হইয়া রাজা দশরথের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। † ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, পুরাকালে ভারতে রাজপদ পাইতে হইলে সর্ব্বসাধারণের অভিমত গ্রহণ করিতে হইত, এবং সকলে পরামর্শ করিয়া একমত হইলে তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। সর্ব্বসাধারণকে একমত হইতে দেখিয়াও রাজা দশরথ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আপনারা সত্য সত্যই মনে-প্রাণে রামকে চাহেন, না আমার অনুরোধে রামকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করিতে চাহিতেছেন?" কেবল তাহাই নহে, রাম যখন নির্ব্বাসিত, ও ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন, তখন পুত্রশোকাতুর দশরথ হৃদ্‌রোধে প্রাণত্যাগ করেন; সে সময়ে অরাজক উপস্থিত হইয়াছিল। আবার পৌরজানপদবর্গ সভারূঢ় হইয়া মন্ত্রণা করিতে বসিয়াছিলেন। 'রাজ্যের রাজপদ এক দিনের জন্যও শূন্য রাখা উচিত নহে',—কর্ত্তৃপক্ষ (রাজকর্ত্তারা) এই কথাই বলিয়াছিলেন। সেই রজনী প্রভাত হইলে রাজকর্ত্তারা ব্রাহ্মণগণের সহিত আসিয়াছিলেন। এই 'রাজকর্ত্তা' শব্দ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, ইঁহারাই রাজাকে নির্ব্বাচিত করিতেন; উহার অর্থ 'রাজকর্ম্মচারী' নহে—যাঁহারা রাজা নির্ব্বাচিত করেন, তাঁহাদিগকেই বুঝায়। আচম্বিতে রাজপদে কাহাকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, পৌরজানপদ ও অধীনস্থ দেশসমূহের রাজাকে আহ্বান করিবার সময়ের অভাবে ইঁহারাই ব্রাহ্মণদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই শূন্য সিংহাসনে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে স্থাপন করিতে পারিতেন। কেহ 'হামবড়া' হইয়া নিজের মর্জ্জিতে রাজ্যলাভ করিতে পারিতেন না। সর্ব্বশ্রেণীর লোক লইয়াই এই পরামর্শ-সভা আহ্বান করা হইত। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, রাজগণের তখন স্বৈর-শাসনের ক্ষমতা ছিল না; তাঁহাদিগকে প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হইত।

* মনু—৭ অ। ২০২-৩। বিষ্ণুসংহিতা ৩ অ। ৩০-৩১

* নানানগরবাস্তব্যান্ পৃথগ্ জানপদানপি। —অযোধ্যা, ১।৪৬

† সমানিনায় মেদিক্তাঃ প্রধানান্ পৃথিবীপতিঃ।

—অযোধ্যাকাণ্ড, ২।১৯

অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে 'Absolute Monarchy' প্রচলিত ছিল না। উহা ছিল 'Constitutional Monarchy' এবং প্রজাদিগের মতানুসারেই উহা নিয়ন্ত্রিত হইত। ইহার অন্যান্য প্রমাণও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রাচীন কালে রাজা কোন কার্য্যই একাকী স্বেচ্ছানুসারে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। মন্ত্রীদিগের সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিয়াই তাঁহাদিগকে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। আবার রাজা যাহাকে ইচ্ছা—তাহাকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিতেন না। "যে সকল ব্যক্তি পৌর এবং জনপদবাসীদিগের ধর্ম্মতঃ বিশ্বাসভাজন, সেই সকল যোদ্ধা, নীতিজ্ঞ, এবং পণ্ডিত ব্যক্তিই মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার (অর্থাৎ মন্ত্রিত্ব করিবার) যোগ্য পাত্র।" * ইহাতে বুঝা যায় যে, পৌর এবং জানপদগণ অর্থাৎ রাজ্যের জনসাধারণ যাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন, সেই ব্যক্তিকেই রাজা মন্ত্রীর পদ প্রদান করিতেন। ঐ সকল ব্যক্তি কি প্রকারে নির্ব্বাচিত হইতেন, তাহা এখন বুঝিবার উপায় নাই। কোন্ কার্য্য করা ন্যায়সঙ্গত, এবং কোন্ কার্য্য করা অসঙ্গত, যে ব্যক্তি রাজার মুখের উপর তাহা বলিতে পারিতেন, তিনিই মন্ত্রী হইতে পারিতেন। † রামায়ণেও কথিত হইয়াছে, যে রাজা দুঃশীল, দুর্ব্বুদ্ধি, কামচারী, (যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করে) এবং পাপী লোকের সহিত মন্ত্রণা করে, সে রাজা আত্মীয়বর্গ ও রাজ্যসহ আপনাকে বিনষ্ট করে। ‡ আরও বলা হইয়াছে যে, পণ্ডিতগণ মন্ত্রণাকেই বিজয়লাভের মূল বলেন। § ইহাতে বুঝা যায়, মন্ত্রীরা কেবল যে রাজারই মনের মত কথা কহিতে পারিতেন, এরূপ নহে; যাঁহারা প্রজার স্বার্থরক্ষা করাও কর্ত্তব্য মনে করিতেন, তাঁহারাই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইতেন।

এ-কালের শাসকদিগের শাসন-পরিষদের ন্যায় সে-কালের রাজাদিগেরও শাসন-পরিষদ ছিল। সেই পরিষদে চারি জন বেদজ্ঞ, প্রগল্ভ ও পূতাচারী ব্রাহ্মণ; আট জন শস্ত্রপাণি (সমরবিদ্যাবিশারদ) এবং বলবান ক্ষত্রিয়; একুশ জন বিত্তশালী বৈশ্য; তিন জন নিত্যকর্ম্মনিরত, পবিত্র-চরিত্র বিনীত শূদ্র, আর এক জন ব্যসন-বর্জ্জিত দূত সদস্য হইতেন; অর্থাৎ এই পরিষদে মোট ৩৭ জন সদস্য থাকিতেন। * শূদ্ররাও মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইতেন, মহাভারতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রাজার অভিষেক-কালে শূদ্র মন্ত্রীরাও রাজাকে অভিষিক্ত করিতেন। সুতরাং উহা ঠিক 'অলিগার্কি' ছিল না। যে রাজ্য অতি ক্ষুদ্র, সেই রাজ্যের রাজা পাঁচ জন মন্ত্রীও রাখিতে পারিতেন। † কিন্তু যদি সে দেশে ঐরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন পাঁচ জন লোক না মিলিত, তাহা হইলে তিন জন ঐরূপ গুণসম্পন্ন লোক লইতেই হইত। ইহাই ছিল নিয়ম। বস্তুতঃ, লোকের গুণ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্রিপদে বরণ করা হইত। সে-কালে শূদ্রগণের মধ্যে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন লোক অতি অল্পই মিলিত। সেই জন্য শূদ্র মন্ত্রীর সংখ্যা অল্প ধার্য্য করিবারই নিয়ম ছিল। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, অল্পশ্রুত মানুষের যদি কুলীন অর্থাৎ উচ্চবংশে জন্ম হয়, এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গও যদি তাহার অধিগত থাকে, তাহা হইলেও সেই ব্যক্তি কোন জটিল সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্য তাঁহাকে অমাত্য-পদে নিযুক্ত করা রাজার উচিত নহে। ইহা ভীষ্ম-বাক্য। আবার এ কথাও বলা হইয়াছে যে, অসদ্বংশজাত লোক যথেষ্ট মত বহুশ্রুত হইলেও অনায়ক অন্ধের ন্যায় সূক্ষ্ম কর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া থাকে; অতএব রাজা তাহাকে অমাত্যপদ প্রদান করিবেন না। ‡ সুতরাং মন্ত্রিনিয়োগকালে পাণ্ডিত্য এবং বংশ উভয়ই দ্রষ্টব্য; কেবল কুলীন হইলেই চলিত না। হিন্দুরা চিরকালই কৌলিক শক্তিতে বিশ্বাসী। সুতরাং যাহা যুক্তিযুক্ত, তাহাই গ্রাহ্য হইত। লোক ধর্ম্মভীরু ছিল বলিয়া সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিত না। ধার্ম্মিক রাজারা যুক্তিযুক্ত পরামর্শই গ্রহণ

* পৌরজানপদা যস্মিন্ বিশ্বাসং ধর্ম্মতো গতাঃ।
যোদ্ধা নয়বিপশ্চিচ্চ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি।—মহা, শান্তি, ৮৩।৪৬

† হ্রীনিষেব্যস্তথা দান্তাঃ সত্যার্জ্জবসমন্বিতাঃ।
শক্তা কথয়িতুং সম্যক্ তে তব স্যুঃ সভাসদঃ। ৮৩।২

‡ তদ্বিধো কামবৃত্তো হি দুঃশীলঃ পাপমন্ত্রিতঃ।
আত্মানং স্বজনং রাষ্ট্রং স রাজা হন্তি দুর্ম্মতিঃ।
—রামা, আর, ৩৭ সর্গ। ৭

§ মন্ত্রমূলঞ্চ বিজয়ং প্রবদন্তি মনস্বিনঃ। রামায়ণ, লঙ্কা, ৬ সর্গ। ৫

* মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৮৩ অধ্যায় ৭—১১ শ্লোক
† ঐ ঐ ঐ ৪৭ শ্লোক
‡ ঐ ঐ ঐ ২৬—১৭ শ্লোক

করিতেন। তবে বুদ্ধদেবের আমলে বড় পরিষদে শলাকার দ্বারা ভোট গণনা করা হইত, ইহার প্রমাণ বৌদ্ধজাতকে আছে। এ ব্যবস্থা কত দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। ঐ যুগে রাজা প্রথমেই মন্ত্রিগণের সহিত একসঙ্গে পরামর্শ করিতেন না। প্রথমে স্বতন্ত্র ভাবে, পরে সম্মিলিত ভাবে সকলে রাজাকে বিচার্য্য বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। এ সম্বন্ধে রামায়ণ এবং মহাভারতে অনেক কথা আছে। বর্ত্তমান সময়ে অনেক ইংরেজ রাজনীতিক উচ্চকণ্ঠে বলেন, ভারতবাসীরা স্বেচ্ছাচারী রাজাই বুঝে। ইহা তাঁহাদের বুঝিবার ভুল, না হয়, ইচ্ছা করিয়া সত্যের অপলাপ।

সময়ে সময়ে কোন কোন বলদৃপ্ত রাজা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইতেন। সকল দেশেই ঐরূপ হইয়া থাকে। দুর্য্যোধন কুমন্ত্রী কর্ত্তৃক চালিত হইয়াই বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন। জরাসন্ধ অত্যন্ত প্রবল হইয়া বহু দেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এ কথা শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বিশদ ভাবে বলিয়াছিলেন। উহা মহাভারতের সভাপর্ব্বে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। জরাসন্ধ বন্দী রাজগণকে বলি দিবার মানসে যে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই নৃশংস ব্যাপার। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনসহ তাঁহার রাজধানীতে উপনীত হইয়া তাঁহার বিনাশ সাধন করেন।

প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে রাজন্যবর্গ তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পারস্যের রাজা প্রথম ডেরায়াসই প্রথমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মিশরীয় এবং আসুরিয় দেশের অধিপতিরা কখন পররাজ্যজয় দ্বারা সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস করেন নাই। ডেরায়াসের দৃষ্টান্ত অনুসারেই চন্দ্রগুপ্ত ভারতে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে; কারণ, প্রথমতঃ ডেরায়াসের পূর্ব্বে সাইরাস (Cyrus) পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। সাইরাস ডেরায়াসের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, দুষ্মন্ত রাজার পুত্র ভরতই প্রথমে ভারত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা প্রাচীনতম ভারতীয় মত। তাঁহারই নামানুসারে এই বিস্তীর্ণ দেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজা যুধিষ্ঠির আসমুদ্র-হিমাচল ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বেণ রাজার পুত্র পৃথুও বিভিন্ন দেশের বহু রাজাকে পরাভূত করিয়া ভূমণ্ডলে একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এ কথা ভারতের পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে; তবে তাঁহাদের সাম্রাজ্য কত দূর বিস্তৃত ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। ভরত, যুধিষ্ঠির এবং পৃথুর রাজ্য প্রায় সমগ্র ভারতে বিস্তীর্ণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং সাইরাস বা ডেরায়াসের দৃষ্টান্তেই যে মগধের অধিপতি প্রথমে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এরূপ ধারণা সঙ্গত নহে। সাম্রাজ্য-গঠনের পথিপ্রদর্শক ভরত ও পৃথু প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক রাজগণ। ইঁহারাই এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধ বিভিন্ন রাজ্য জয় ও রাজগণকে বন্দী করিয়া মগধ রাজ্যের অনেক বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহা যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য হইতেই সুপ্রকাশ। মগধরাজই প্রথমে রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহা আধুনিক য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেন। প্রাচীন কালে মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহে। চন্দ্রগুপ্ত উহা পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। রামায়ণে এবং মহাভারতে পাটলিপুত্রের নাম দেখা যায় না। রাজগৃহের নাম সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, পাটলিপুত্র নগর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই মহাকাব্যদ্বয় বিরচিত হইয়াছিল। রাজা যুধিষ্ঠিরের আমলে সম্রাট্পদ এবং রাজপদ প্রচলিত হইয়াছিল। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বের ৫৯ অধ্যায়ে দেখা যায়, যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "রাজা শব্দ কোথা হইতে আসিল এবং রাজা অন্য লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকারই বা কোথা হইতে পাইলেন? অন্য লোকের ন্যায় রাজার দুই হাত, দুই পা, দুই চক্ষু আছে। অন্য লোক হইতে

রাজার বুদ্ধিও কিছু বেশী নহে ; তবে তিনি অন্তের উপর শাসনদণ্ড চালাইবার অধিকার পাইলেন কোথা হইতে ?” ভীষ্ম তদুত্তরে বলিলেন যে, “সত্য যুগে রাজা ছিল না। লোক স্বাধীন ভাবেই ধর্ম্মকার্য্য করিত। শেষে লোক ক্রোধ, লোভ এবং কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মপথ ছাড়িতে আরম্ভ করিল। মানব-সমাজ পীড়িত হইতে থাকিল। তখন দণ্ডনীতির সৃষ্টি হইল, এবং অনঙ্গ পৃথিবীর প্রথম রাজা হইলেন। তাঁহার পুত্র অতিবল দণ্ডনীতি অনুসারে রাজত্ব করিবার পর অতিবলের পুত্র বেণ অত্যাচারী রাজা হন। ঋষিরা তাঁহাকে নিহত করিলে তাঁহার পুত্র পৃথুই রাজা হন। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে রাজ্য-শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার সময় এই শাসকদিগকে রাজা নামে অভিহিত করা হয়। “রঞ্জিতাশ্চ প্রজাঃ সর্ব্বে তেন রাজেতি শব্দ্যতে।” ফলে, প্রথম আমল হইতে দুই-এক জন রাজা বলদৃপ্ত হইয়া অত্যাচারী হইতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্টও হইতেন। সুতরাং ভারতে স্বেচ্ছাচারী রাজা কোন কালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। য়ুরোপীয়রা বলেন, ভারতে কেবল চিরকালই স্বৈর-শাসন চলিত ছিল, প্রজার কোন অধিকারই ছিল না। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। য়ুরোপীয়গণের এই সিদ্ধান্তের মূলে সত্য নাই ; এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন হেতুও নাই। এরূপ উৎকট ভুল তাঁহারা কেন করেন, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে দণ্ডনীতি প্রচলিত ছিল। উহা এত প্রাচীন যে, কে উহা প্রথমে প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অতি প্রাচীনরাও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেই জন্য ব্রহ্মা উহা প্রণয়ন করেন বলা হইয়া থাকে। ফলতঃ, ভারতে চিরকালই বহু স্থলে নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত রাজশাসন প্রচলিত ছিল। স্বৈর-শাসন কস্মিন্ কালেও স্থায়িত্বলাভ করে নাই।

প্রাচীন ভারতে গণশাসনের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের অনেক স্থলেই গণশাসনের উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব সময়ে ভারতে স্থানে স্থানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে কোথাও কোথাও উহা ক্ষত্রিয়দিগের Olygarchy ছিল। সর্ব্বত্র তাহা ছিল না।

প্রাচীন হিন্দুরা দেশে রাজা রক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক মনে করিতেন। অরাজকতাকে তাঁহারা নানা দোষের আকর মনে করিতেন। অরাজকতার দোষ রামায়ণে এবং মহাভারতে বহু স্থানে বর্ণিত আছে।* তবে রাজা দণ্ডনীতি অনুসারে এবং ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে রাজ্যশাসন করিবেন, তাহা হইলেই প্রজাসকল তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ভক্তি করিবে ; † অন্যথা নহে। আমাদের শাসকগণ মনে করেন, ভারতবাসীরা কেবল স্বৈর-শাসনই বুঝে, অন্য শাসন বুঝে না। বলিয়াছি, ইহা তাঁহাদের অজ্ঞতাজনিত সিদ্ধান্ত। গণশাসনই ভারতবাসীরা ভাল বুঝে। স্বার্থসাধনের উদ্দেশে বা অজ্ঞতার ও কু-সংস্কারের প্রভাবে ভুল সিদ্ধান্ত করিলে তাহা টিকিতে পারে না। ভারতবাসী ন্যায়নিষ্ঠ রাজারই ভক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

* রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৭ সর্গ। মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৪১ অ এবং শান্তিপর্ব্ব, ৫৮ অধ্যায় দেখুন।

† নয়নাভ্যাং প্রসুপ্তো বা জাগর্ত্তি নয়চক্ষুষা।
ব্যক্তক্রোধপ্রসাদশ্চ স রাজা পূজ্যতে জনৈঃ।
রামায়ণ, অরণ্য, ৩৩ সর্গ, ২১ শ্লোক।

পশুমানব

কাব্য-শিল্পধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা-দীক্ষা সমাজ-সংসার—
এ সবের কি বা মূল্য, যত দিন না হয় সংহার
মানুষের ভিতরের পশুটার। নীরবে ঘুমায়
যত দিন হিংস্র পশু তত দিনই সবই শোভা পায়।
যে দিন সে ক্ষেপে উঠে জেগে উঠে বজ্রের হুঙ্কারে
চূর্ণ ক'রে ফেলে সব, ডুবে সবি রক্তের পাথারে।

শ্রীকালিদাস রায়।

বিজ্ঞান-জগৎ

বিমান-বন্ধু

জার্মান-বম্বারের উচ্ছেদ-কল্পে ব্রিটেনে নূতন ও দুর্জ্জয় এক-রকম প্লেন তৈয়ারী হইয়াছে। এ-প্লেনের সামনের কামরায় চারটি 'মেশিন-গ্যন' সংলগ্ন আছে। এ-চারটি গ্যন্ এমন কৌশলে সংলগ্ন যে, যে-দিকে খুশী, সেই দিকেই এগুলিকে সহজে চালনা করা



বম্বারের শত্রু

চলে। শত্রুর বম্বারের কাছে এ-প্লেন লইয়া গিয়া মেশিন-গানের গুলীতে বম্বারকে নিমেষে বিপর্য্যস্ত করা যায়। চারটি মেশিন-গ্যন্ ছাড়া এ-প্লেনের ভাণ্ডারে আছে আরো চৌদ্দটি মেশিন-গ্যন; এবং প্রোপেলারের গায়ে তিনটি কামানও সংযোজিত আছে। এ-প্লেন ঘণ্টায় ৩৫০ মাইল বেগে চলে।

কুঞ্চিত-কেশিনী

কেশেই রূপসীর আসল শোভা! কেশহীনতায় নারীর রূপ বা শ্রী খোলে না; নারীকে দেখায় যেন পুরুষের মতো শুষ্ক কাষ্ঠং! এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া সম্প্রতি মার্কিণ-মুল্লুকের মেয়ে-সমাজ আবার কেশ রাখিয়া সে-কেশকে নানা ভাবে রমণীয় করিয়া নিজেদের মাধুরী-বিকাশে মনোযোগ অর্পণ করিয়াছেন। কেশ কুঞ্চিত করিবার জন্য আমেরিকায় একরূপ বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। যন্ত্রটিকে



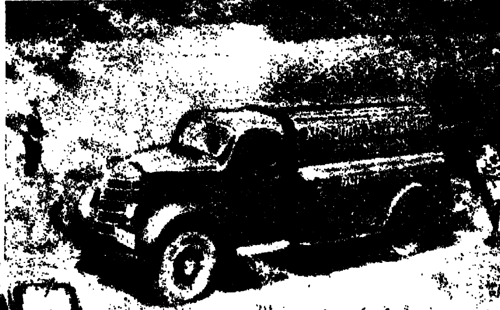
কেশ-কুঞ্চন টুপি

প্রথমে প্লাগের সাহায্যে বৈদ্যুতিক তাপে তপ্ত করিতে হয়; তার পর টুপির মতো মাথায় বসান্। মাথার কেশ আপনা-আপনি সুকুঞ্চিত হইবে; এবং এ-কুঞ্চন দীর্ঘকাল থাকে।

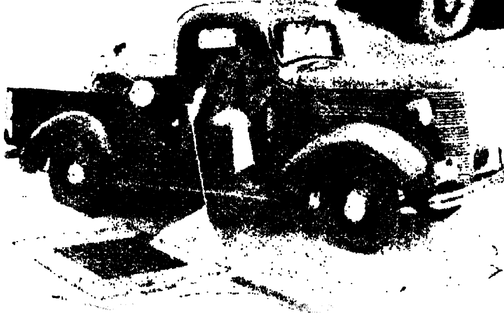
মশা-মারা গাড়ী

মশার কামড়ে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি। এবং এই ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে সোনার বাঙলা-দেশ শ্মশানে পরিণত হইতেছে! এখানে তাই মশা মারিবার জন্য মাঝে মাঝে কামান পাতিবার উদ্যোগ-কল্পে দারুণ কলরব ওঠে! সে-কামানে ম্যালেরিয়া-বাহী মশার কি হয়, মশা-মারী কমিটিই তা জানেন! যাদের মরিবার কথা, ম্যালেরিয়ায় তাদের মৃত্যুর কামাই নাই! নিউ-ইয়র্কে কিন্তু মশা মারিবার জন্য যে-ব্যবস্থা হইয়াছে, সে-ব্যবস্থায় সেখানে বিপুল ভাবে মশা-অক্ষৌহিণীর সংহার চলিয়াছে। মশা মারিবার জন্য তাঁরা কামান পাতেন নাই; বিশেষ ভাবে কতকগুলি মোটর-ট্রাক তৈয়ারী

করিয়াছেন। এই গাড়ীর মধ্যে মশা-মারক আরক ভরিয়া যত বদ্ধ নালা-জলা ও খাল-বিল-পুকুরের কাছে তাঁরা আনেন; আনিয়া সুদীর্ঘ স্প্রের সাহায্যে জলা-বিল-পুকুরে সেই আরক বর্ষণ করেন, ফলে মশক-বংশ সমূলে ধ্বংস পাইতেছে। মশার উৎপাতে ওখানকার লং আইল্যাণ্ড কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্মশান-ভূমি হইয়া ছিল;



মশা-মারা গাড়ী



আরক-বর্ষণ

এখন এ-ব্যবস্থায় মশার উচ্ছেদে লং আইল্যাণ্ডে লোকের বাস বহুল এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় হইয়াছে।

মোমে সুফল

এই আমের সময়—রাশীকৃত পাকা আম কিনিলেও বহু পরিবারে



ফলে মোমের প্রলেপ

ক্ষোভের সীমা থাকে না! কারণ, পাকা আম ক'দিন ঘরে রাখা চলে? চটপট খাইয়া শেষ না করিলে দু'দিনে পচিয়া তাহা অখাদ্যে পরিণত হয়। সকলের হয়তো এমন সঙ্গতি নাই যে, রেফ্রিজেটারে রাখিয়া পাকা ফল বেশী দিন তাজা রাখিবেন। ফল বেচিয়া যারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে, তাদেরও লোকসানের সীমা থাকে না। সম্প্রতি মার্কিণ বৈজ্ঞানিকেরা এই ক্ষোভ ও সমস্যা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়া তাঁরা দেখিয়াছেন, মোমের পাংলা প্রলেপ লাগাইয়া দিলে পাকা ফলকে বহু কাল তাজা রাখা চলে। তাঁরা বলেন, ফল ও শাক-সব্জীর গায়ে বাতাস লাগে; তার উপর ফল এবং শাক-সব্জী নিশ্বাস ত্যাগ করে। বাতাস ও শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ফলে ও শাক-সব্জীতে পচ ধরে। অতএব গাছ হইতে ফল পাড়িয়া বা শাক-সব্জী তুলিয়া তখনি যদি তাদের গায়ে গলিত মোমের পাংলা প্রলেপ মাখাইয়া দেন, তাহা হইলে পচিবার আশঙ্কা থাকে না। এমনি করিয়া মোমের প্রলেপ লাগাইয়া তাঁরা আঙুর, কমলালেবু, পাতি ও কাগজীলেবু, টোমাটো, শসা, আলু, নাশপাতি, আপেল, পীচ, এমন কি ডিম পর্য্যন্ত ছ' মাস কাল বেশ তাজা-টাটকা রাখিতেছেন।

বোতলের বাড়ী

আমেরিকার বায়োলাইট প্রদেশটি গ্রীষ্মের রৌদ্রে যেন ঝাঁজিয়া থাকে! দুপুরে ঘরের মধ্যে বাস করাও তখন প্রাণান্তকর ব্যাপার!



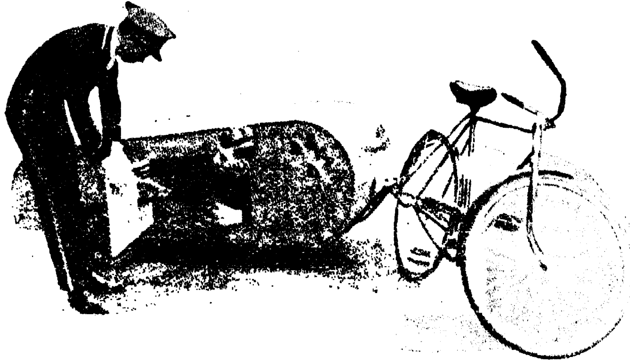
বোতল-দেওয়াল

এই গ্রীষ্মের তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেখানকার এক ভদ্রলোক বোতল দিয়া দেওয়াল রচিয়া বাঙলো-প্যাটার্ণের বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন। চূণ-বালি-সুরকির সঙ্গে গায়ে-গায়ে খালি বোতল বসাইয়া দেওয়ালের সৃষ্টি! বোতলের তলার দিকটা আছে বাহিরের দিকে। এই বোতলের দরুণ দুপুরের রৌদ্ররশ্মি পীতাভ

দীপ্তিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, ঘরের ভিতর-দিক তাহাতে বেশ স্নিগ্ধ ও শীতল থাকে।

দ্বিচক্রযান-বাহীর শয্যা

দ্বিচক্রযানে বা বাইসিক্লে চড়িয়া দীর্ঘ-পথে পাড়ি দিতে হইলে



শয্যা-ট্রেলার

শয়ন ও নিদ্রা-সুখ ভোগ করিবার জন্য ঘর-বাড়ী এবং বিছানা খুঁজিতে হয়! মিশিগানের এক তরুণ দ্বিচক্রবাহী বুদ্ধিকৌশলে শয্যা-ট্রেলার তৈয়ারী করিয়া বাইসিক্লের পিছনে সেটিকে ল্যাংবোটের মতো বাঁধিয়া প্রায় বারোশ' মাইল পথ পরম স্বচ্ছন্দ ভাবে এবং অতি-সুলভে পাড়ি দিয়া আসিয়াছেন।

শিশুর শয্যা

একটা পিপা। এই পিপার একটা-দিক ঐ ছবির মতো কাটিয়া নিন। প্রান্তভাগে শুধু একটু আচ্ছাদন রাখিয়া দিবেন। তার পর কাঠের দাঁড়া-ফ্রেম তৈয়ারী করিয়া সেই ফ্রেমের উপরে এই কাটা পিপা রাখিয়া তার মধ্যে শিশুর শয্যা রচনা করুন। শিশু আরামে ঘুমাইবে। ব্যবহারের পূর্বে পিপাটি মাজিয়া ঘষিয়া রঙ করিয়া লইবেন। পিপার এ শিশু-শয্যায় ঘরের বাহার খুলিবে। তা ছাড়া শিশুর পড়িয়া যাইবার ভয়ও ইহাতে নাই!



পিপার শিশু শয্যা

পকেট-মাইক্রফোন্

নস্যদানীর আকারে অতি-ক্ষুদ্র মাইক্রফোন তৈয়ারী হইতেছে। ওয়েষ্টকোটের ছোট পকেটেও এ-মাইক্রফোন্ অনায়াসে বহন করা চলে। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দান করিবার কিম্বা বড় আসরে গান



নস্যদানী মাইক্রফোন্

গাহিবার সময় এ-যন্ত্রটি হাতে ধরিয়া বুকের কাছে রাখুন, বক্তৃতার ও গানের বাণী উচ্চরোলে মুখরিত হইবে।

অগ্নি-নির্ব্বাণ

আমেরিকার বিজ্ঞান-শিল্পীরা কাঁচের বাল্ব লইয়া এক-রকম আগুন-নেবানো 'বোমা' তৈয়ারী করিতেছেন। কাপড়-চোপড় বা



আগুন নেবানো বোমা

বিছানাপত্রে অর্থাৎ কোথাও সামান্য আগুন লাগিলে সেই আগুনে এই কাঁচের বোমা সবলে যদি নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে আগুনের তাপে ইহার মুখের কাছে ধাতুর যে-আচ্ছাদন আছে, সেটি নিমেষে গলিয়া যায়; এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভিতরের আবক আগুনে

মিশিয়া একরূপ ধূম-বাষ্প উদ্গত করে। সে ধূম-বাষ্পের স্পর্শে আগুন চকিতে নিবিয়া যায়। এ ধূম-বাষ্প সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ অর্থাৎ নির্বিষ।

বর্ষায় পদ-মর্য্যাদা-রক্ষা

বর্ষায় যাঁদের ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে হয়, বর্ষাতি-কোট ও ছাতা থাকিলেও তাঁদের পক্ষে পা বাঁচানো কঠিন হয়। আমেরিকায় এ জন্য মোটরের ইনার-টিউব কাটিয়া এই ছবির মতো পদাবরণ তৈয়ারী হইতেছে। এ পদাবরণ ঘরে তৈয়ারী করা চলে। এমনি ছাঁদে রবারের টিউবে কোমর হইতে পদতল পর্য্যন্ত ঢাকিয়া লইলে ঘনঘোর-বৃষ্টিতে পথে-ঘাটে বাহির হইলেও পদমর্য্যাদা বাঁচাইতে পারিবেন। অথচ পায়ের এ আচ্ছাদনী দেখিতেও 'অভদ্র' নয়!



পা-ঢাকা

পথে তৈল-দান

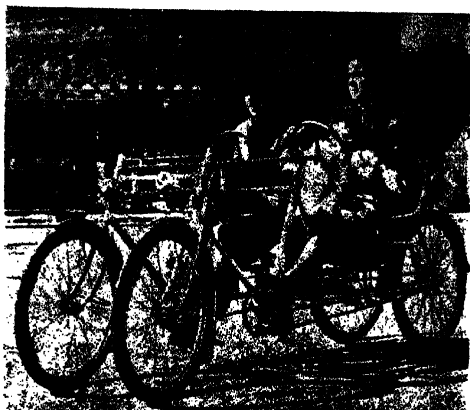
পথের ধূলায় গাড়ী-চড়া এবং পায়ে-চলা—এই দু'রকম পথিকেরই দারুণ কষ্ট হয়। এ জন্য পথে তৈল ঢালিয়া ধূলা মারিবার এবং পথকে মসৃণ ও স্বচ্ছন্দ করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে-উপায়ে পথে তৈল ঢালা হয়, সে উপায়টি বেশ ব্যয়সাধ্য। জার্ম্মাণিতে পথে তৈল দিবার জন্য যে-ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ব্যয় হয় সামান্য অথচ কাজ হয় ভালো। একটি গাড়ীর মধ্যে তৈল ভরিয়া সেই গাড়ীর সঙ্গে হ্যাণ্ড-পাম্প সংযোজিত করা হইয়াছে। তার উপর গাড়ীতে আছে লম্বা হোজ-পাইপ! হোজ-পাইপে পথে যেমন জল দেওয়া হয়, তেমনি করিয়া এ-গাড়ীর হ্যাণ্ড-পাইপ চালাইয়া হোজ-পাইপে অনেকখানি পথে তৈল বর্ষণ করা চলে। ঘুটিং বা রাবিশ দিয়া পথ মেরামত করিয়া সে-পথে এ ভাবে তৈল বর্ষণ করিলে কাজ সহজ হয় এবং সদ্য পথের ধূলা মারিয়া পথকে স্বচ্ছন্দ করা চলে।



পথে তেল ঢালা

পারিবারিক চক্র-যান

'বাইসাইক্‌ল্'—নেহাৎ যেন স্বার্থপর মানুষের গাড়ী! এক জনের বেশী দু'জন সে-গাড়ীতে চড়িতে পারে না! যাঁরা সঙ্গী চান, তাঁরা সঙ্গীকে ঘাড়ে চড়াইয়া দ্বিচক্রযানে সঙ্গিসহ পাড়ি দিলে কি হইবে, সঙ্গী-বেচারার তখনকার অবস্থা মোটেই কাম্য নয়! আমেরিকায় স্ত্রী-পুত্রের উপর যাঁদের মায়া-মমতা আছে, অথচ মোটর-গাড়ী কিনিবার সঙ্গতি নাই, তাঁরা দ্বিচক্রযানে আরো দু'খানি চাকা আঁটিয়া বসিবার আসনে এবং কলকব্জায় একটু যোগাযোগ সাধনে যে-গাড়ী পথে বাহির করিয়াছেন, সে-গাড়ীতে স্বামি-স্ত্রী স্বচ্ছন্দে ছেলেমেয়ে লইয়া ভ্রমণ-সুখ উপভোগ করিতে পারেন।



চক্র-যানের উন্নত সংস্করণ



বাঙ্গালায় খদির-শিল্পের অভাব

খদির (খয়ের) আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য; কিন্তু খয়েরের প্রস্তুত-প্রণালী জানা না থাকায় অনেকেই এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ পাইতেছেন না। আমি বাঙ্গালা সরকারের বন-বিভাগের কর্ম্মচারী বলিয়া আজ প্রায় তিন-চারি বৎসর হইতে সরকারের অনুমোদিত নিয়মানুসারে খয়ের-কোম্পানীর খয়ের গাছের সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় খয়ের-কোম্পানীর লোকের সংস্পর্শে আসিয়া যে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই অনুসন্ধিৎসু ব্যবসায়িগণের গোচরার্থ এখানে প্রকাশ করিলাম।

খয়ের যথেষ্ট লাভের ব্যবসায়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ কাল পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী কোম্পানী কিম্বা কোন বাঙ্গালী ধনাঢ্য ব্যক্তি এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—এ কথা শুনিতে পাই নাই। বস্তুতঃ, খয়ের-ব্যবসায় বঙ্গের বাহিরে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকায় এই ব্যবসায়ের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং প্রস্তুত-প্রণালীর সঙ্কেত কেবল তাহাদেরই সুবিদিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যদি কোন কোন বাঙ্গালী এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ইহার প্রস্তুত-প্রণালী অবগত হইয়া এই ব্যবসায়ে লাভবান হইতে পারিবেন, এবং আংশিক ভাবে দেশের বেকার-সমস্যারও সমাধান করিতে সমর্থ হইবেন। ইহাতে অনেক কুলি-মজুরেরও অন্নের সংস্থান হইবে।

আমাদের দেশের লোক সাধারণতঃ পাপড়ী ও মগাই খয়েরই ব্যবহার করেন; কিন্তু আমি যে খয়েরের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, তাহা 'জনকপুরী খয়ের' নামে পরিচিত। এই খয়ের সাধারণতঃ মাদ্রাজ, গুজরাত, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও নেপাল অঞ্চলে বিক্রয় হয়। এই জনকপুরী খয়ের শুধু খাদ্য-হিসাবেই ব্যবহার হয় না, ইহা মিলের কাপড়ের রং, 'টেনারি'তে চামড়ার রং, এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখন খয়েরের প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। খয়ের গাছের নির্য্যাস হইতে এই খয়ের প্রস্তুত হয়। এই খয়ের গাছগুলি দেখিতে এ দেশের কাটানাগেশ্বর বা বাবুল গাছের অনুরূপ। খয়ের গাছের ইংরেজি নাম "Accacia Catechu" এবং বাবুলের নাম "Accacia Arabica"। এই জাতীয় খয়ের গাছ সাধারণতঃ জলপাইগুড়ি জিলায় সরকারী বন-বিভাগের অন্তর্গত তুরষা, রায়ডক ও শঙ্কোশ নদীর চরের বালুকাময় ভূমিতে এবং সমীপবর্ত্তী জঙ্গলেই প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। খয়ের প্রস্তুতের সফলতা সাধারণতঃ জল, আগুন, প্রচুর পরিমাণে জ্বালানী কাঠ, ভাল মাটিতে গঠিত শক্ত হাঁড়ি, এবং গোরক্ষপুর বা নেপালী পাহাড়ের স্বাস্থ্যবান কুলির প্রাচুর্য্য ও তাহাদিগের কর্ম্মতৎপরতার উপরেই নির্ভর করে। এই ব্যবসায়ে মূলধনের আবশ্যক, এবং যৌথ কারবারই সমর্থনযোগ্য। এই জন্যই যুক্তপ্রদেশের গণ্ডা ও বস্তি জিলার খয়ের-ব্যবসায়ীরা কানপুরের পুঁজিওয়ালাদিগের সঙ্গে যৌথ কারবারে সম্মিলিত হইয়া, উহাদিগের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন-চারি মাসের জন্য নদীর ধারে অস্থায়ী খড়ের ঘর প্রস্তুত করে এবং সেখানে খয়ের তৈয়ারী করিয়া বস্তাবন্দী খয়ের কানপুরের পুঁজি-ওয়ালাদিগের নিকটেই চালান দিয়া থাকে; ঐ সকল পুঁজি-ওয়ালা (ব্যাঙ্কার) খয়েরগুলি গুদামে রাখে; পরে খরচের পড়তা হিসাব করিয়া খয়ের বিক্রয় করে, এবং ব্যাঙ্কারগণ তাহাদের প্রদত্ত টাকা উহা হইতে কাটিয়া লয়। তাহারাই খয়ের-এজেন্সিওয়ালাদিগকে লাভের অবশিষ্ট অংশ দিয়া থাকে। যে স্থানে খয়ের তৈয়ারী করা হয়, তাহা দুই নামে অভিহিত। যে স্থানে অগ্নির উত্তাপে খয়েরের নির্য্যাস বাহির করা হয়, তাহাকে "খয়ের-ঝালা" বলা হয়, এবং পরে খয়েরের খণ্ডগুলি যে স্থানে শুকাইয়া লওয়া হয়, তাহাকে "খরিয়ান" বলে। এই খয়ের-ঝালাতে সরস এঁটেলমাটি দিয়া অতি সতর্কতার সহিত লম্বা চুলা নির্ম্মিত হয়। এই চুলাগুলি এক প্রকার 'বয়লার' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এবং কাজ আরম্ভ হইলে দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টাই পালাক্রমে খয়ের-ঝালার সুপারভাইজারদিগের তত্ত্বাবধানে কুলীরা কাজ করিতে থাকে।

এই কুলিদিগের সকলেই কাজের পালাক্রমে পর-পর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। দিবাভাগে কুলিরা কুঠার লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং সেখানে খয়ের গাছগুলি কাটিয়া কুঠার সাহায্যে উহার উপরের অসার ছাল (Sap wood) ফেলিয়া দিয়া গাছের লাল শক্ত "হাড্ডি" বা "হার্টউড" (Heart wood) বাহির করে, এবং তাহা মহিষের গাড়ীতে তুলিয়া খয়ের-ঝালাতে লইয়া আসে। পরে এই খয়ের হার্টউডগুলি কুলিরাই কুঠার দ্বারা কাটিয়া খয়েরের কুচি বা Khair Chips স্তূপীকৃত করে। এই খয়ের chipsগুলির আকার ৩″×৩″×১/২″। এই খয়ের চিপস্গুলি হাঁড়িতে রাখিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই খয়েরের নির্য্যাস বাহির হইয়া থাকে, এবং এই জলীয় নির্য্যাস চুলার দুই ধারের হাঁড়ি হইতে ঢালিয়া একত্র করিয়া চুলার উপরিস্থিত হাঁড়ি-গুলিতে তাহা ক্রমশঃ ঘনীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বাল দেওয়া হয়; পরে ঐ উত্তপ্ত নির্য্যাস অধিকতর ঘনীভূত হইয়া খয়েরে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত শিমুল গাছের ছোট-ছোট খোদাই ডুঙ্গিতে সপ্তাহাধিক কাল সংরক্ষিত হইয়া থাকে। পরে এই ঘনীভূত খয়ের চটের দ্বারা আবৃত হইয়া ঘরের মধ্যে বেলে-মাটির গর্ত্তে এক পক্ষের অধিক কাল রক্ষিত হইয়া থাকে। এই গর্ত্তের আকার ৫′×৩′×৩′। এই ঘনীভূত খয়ের গর্ত্তের মধ্যে রাখিবার উদ্দেশ্য

এই যে, ঘনীভূত খয়েরের মধ্যে যে জলীয় অংশ থাকে, তাহা গর্ত্তের মধ্যে থাকিবার সময় সেই বেলে-মাটিতে টানিয়া যায়, এবং এই ভাবে উহা প্রকৃত খয়েরের খামিরায় পরিণত হয়। এই শক্ত খামিরা-খয়ের পরে খরিয়ানে নীত হয়, এবং শুকাইলেই ছুরির দ্বারা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হয়। এই প্রকার প্রস্তুত-প্রণালী ইংরেজীতে "crude method" নামে অভিহিত। ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ এই প্রণালীতেই খয়ের প্রস্তুত করিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাসায়নিক প্রণালীতে খয়ের প্রস্তুত করিতে পারিলে ঐ যে জলীয় অংশ মাটির গর্ত্তের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায়, উহাও সংরক্ষিত হইতে পারে, এবং ইংরেজীতে তাহাকে Bye product of the cutch বলা হয়। রাসায়নিক প্রকরণের সাহায্যে প্রস্তুত করিলেই এই Bye product পাওয়া যাইতে পারে, এবং উহা চামড়ার রঞ্জনকার্য্যে (tanning) ও অন্যান্য নানা কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চুলাগুলি বয়লারের ন্যায় লম্বা ভাবে নির্ম্মিত হয়। জ্বালানী কাঠ দেওয়ার জন্য চুলাগুলির দুই ধারে মুখ রাখা হয়, এবং এই সকল চুলার উপরে চুলার আকার অনুসারে বড় বা ছোট আকারের ৩২টি বা ২১টি হাঁড়ি এক সঙ্গে স্থাপন করা হয়। একটি চুলাতে ন্যূনকল্পে ১০ জন কুলি, ২ জন ফায়ারম্যান, ২ জন টেষ্টার, ২ জন জলবাহক কুলির প্রয়োজন হয়, এবং গাছের ভালমন্দ হিসাবে প্রতি-চুলার জন্য এই তিন মাসে অন্যূন ১ শত খয়ের গাছের আবশ্যক। এই তিন মাস কাজ করিবার সময় কুলিরা রোগাক্রান্ত হইয়া বা অন্য কোন কারণে অনুপস্থিত না হইলে প্রত্যেক চুলা হইতে ৭০ মণ হইতে ৮০ মণ খয়ের উৎপন্ন হয়। বাজার-দর হিসাবে প্রতি মণ খয়ের ৪০৲ হইতে ৪২৲ টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। খয়ের-ঝালা হইতে জঙ্গলের দূরত্ব অনুসারে ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসারের অনুমোদনে খয়ের গাছের সরকারী ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। গত বৎসর তিন ফুট ও তদূর্দ্ধের প্রত্যেক খয়ের গাছের সরকারী ট্যাক্স সাড়ে ৪ হইতে ৫৲ টাকা ৫ পাই ধার্য্য হইয়াছিল, এবং মূল্যের হার হিসাবে চুলাপ্রতি খয়ের গাছের মূল্যের বাবদ কোম্পানীর ৫০২॥/৮ পাই ব্যয় হইয়াছিল ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ সমেত কোম্পানীর চুলাপ্রতি ১৫০০৲ হইতে ২০০০৲ পর্য্যন্ত খরচ হইয়াছিল। কোম্পানীর সমস্ত খরচ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব করিলে দেখা যায়, কোম্পানী চুলাপ্রতি ২০০৲ হইতে ২৫০৲ লাভ করিয়া থাকে। ঝালাতে এইরূপ ৮টি চুলার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে খরচ-খরচা বাদে কোম্পানীর ১০০০৲ হইতে ১২০০৲ পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, খয়ের ব্যবসায়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং খয়ের প্রস্তুত-প্রণালীর সঙ্কেত বিহার ও যুক্তপ্রদেশের ব্যবসায়ীদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কোন নূতন কোম্পানী এই ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইলে প্রথম বৎসরে ঐ দেশীয় স্থায়ী খয়েরের ব্যবসায়ের এক জন সুপারভাইজার, টেষ্টার ও অর্দ্ধসংখ্যা কুলির সঙ্গে বঙ্গদেশীয় কুলি ও মিস্ত্রিরা একযোগে কাজ করিয়া খয়ের প্রস্তুতের শিল্প-কৌশল অবগত হইয়া পরের বৎসর হইতে নিজেরাই স্বাবলম্বী হইয়া এই ব্যবসা চালাইতে সমর্থ হইবেন। খয়ের ব্যবসায়ের আয়-ব্যয় ও লাভের গুরুত্ব হিসাবে আমি বলিতেছি, খয়েরের প্রস্তুত-প্রণালী অবগত হইয়া এই ব্যবসায়ে নামিলে প্রভূত লাভের আশা আছে। দেশের মধ্যে এই নূতন ব্যবসায়ের প্রসার বর্দ্ধিত হইলে বেকার-সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ব্যবসায়ের প্রতি এ-পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

শ্রীহেমচন্দ্র রায়।

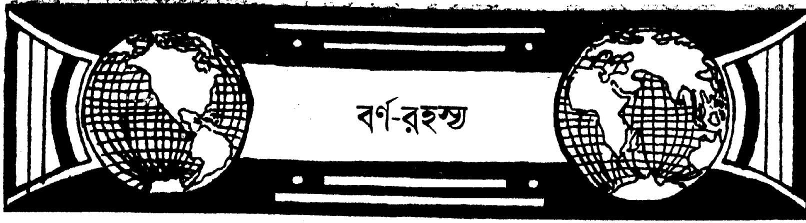
আমাদের জীবন

জীবনটা কি—যদি শুধু ক্লেশ-দুঃখ ?
ছায়া নাই, মায়া নাই, কর্কশ রুক্ষ ?
কোনোখানে নাই তার কোনো রীত-ছন্দ ;
ভোর থেকে রাত-তক্ প্রমত্ত দ্বন্দ্ব !
গো-মেষ—তাদেরো চোখে বিরামের দৃষ্টি !
আমাদেরি চোখ নাই—
এ কি অনাসৃষ্টি !

শ্যামল বনানী রচি রাখিয়াছে কুঞ্জ,
ফুলে-ফলে তরু-শোভা, পাখী-অলি-গুঞ্জ !
কাঠবিড়ালীটা—সেও নাচে তুলি পুচ্ছ !
আমাদেরি কাছে শুধু হাসি-খেলা তুচ্ছ !

ভোরের অরুণে জাগে বর্ণের মাধুরী ;
শ্রাবণের ঘন মেঘে ডাকে কেয়া-দাদুরী ;
নিশীথ-আকাশে তারা, উজ্জ্বল চন্দ্র ;
ঘরে মা-বোনের স্নেহ, স্ত্রীর প্রেম-ছন্দ ;
ছেলেমেয়ে খেলা করে, করে হাসি-গল্প—
স্পর্শ যে নেবো তার—অবসর অল্প !
ভুবন ভরিয়া আছে কলগান-হাস্যে—
না পেলেম কিছু তার ! নিমগন দাস্যে !
দু'মিনিট ঘরে বসে রবো নিশ্চিন্ত—
না পেলেম অবসর তার এক দিন ত !
উদ্বেগ, দুঃখ, সংশয়, দ্বন্দ্ব—
তারি মাঝে সব শেষ—নিশ্বাস বন্ধ !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়



বর্ণ চিরকালই মানবের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণের সমাবেশ মানব-মনে বিভিন্ন ভাবের সঞ্চার করে। পক্ষান্তরে একই বর্ণের বিশাল বিস্তৃতি, কিম্বা বর্ণের অভাব মনুষ্যের পক্ষে বেদনাদায়ক। হিমানী-সমাচ্ছন্ন গিরিশৃঙ্গের বিশাল ধবলতা, অনন্ত আকাশের দিগন্তব্যাপী নীলিমা, অকূল সমুদ্রের অসীম হরিৎ আভা, বিপুল বিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তরের বক্ষঃ-বিরাজিত বালুকারাশির ধূসরতা—এইরূপ বিরাট্ স্থান ব্যাপিয়া বৈচিত্র্য-বিরহিত একই বর্ণের বিকাশ প্রথমতঃ কিছু কালের জন্য চিত্তপ্রসাদন করিতে পারে বটে, কিন্তু অবশেষে উহা ক্লান্তিজনক, এমন কি, পীড়াদায়কও হইয়া থাকে। বর্ণের অভাবে আমরা যে কত দুর অস্বস্তি অনুভব করি, অমানিশার সূচী-ভেদ্য তিমিররাশির দিকে চাহিয়া তাহা সহজেই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

কোন কোন মূল বা মিশ্র বর্ণ আমাদিগের পক্ষে অপ্রীতিকর হইলেও সাধারণ ভাবে ইহা বলিতে পারা যায় যে, বর্ণের বৈচিত্র্য-সন্দর্শনে মানব-চিত্ত সন্তোষই লাভ করে। প্রকৃতি দেবী নিরন্তর চতুর্দ্দিকে যে বর্ণলীলা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া মানব নিজ গৃহ, গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি, এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি দ্বারা নিজ-নিজ অঙ্গে বিবিধ বর্ণের সন্নিবেশে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। রূপের প্রধান উপকরণ এই বর্ণ; বর্ণহীন রূপ সহজে কল্পনা করা যায় না। ফলতঃ, বর্ণের সহিত মানব-জীবনের, এবং বিস্তৃত ভাবে বলিতে গেলে সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ্-জগতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। বর্ণ শোভা ও সৌন্দর্য্যের আধার হইলেও ইহাকে শুধু সেই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলেই যথেষ্ট বলা যায় না। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, জীবনের বিকাশ ও সম্প্রসারণের ব্যাপারেও বর্ণের প্রভাব সামান্য নহে।

সকল বর্ণই সূর্য্যালোকে নিহিত আছে। যে সময় অমরকীর্ত্তি বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ নিউটন প্রতিপন্ন করেন যে, শুভ্র আলোক প্রকৃতপক্ষে মিশ্রালোক, এবং কতকগুলি পদার্থের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইলে উহার বিশ্লেষণ-ফলে উহা অঙ্গীভূত রশ্মিরাজি প্রকাশ করে, সেই সময় হইতে মানব বর্ণের মূল তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছে। ত্রিশির কাচের ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি পরিচালিত করিলে সেই কাচের বিপরীত পার্শ্বে লোহিত, পাটল, পীত, হরিৎ, ঈষৎ ও ঘন নীল এবং বেগুনী,—এই সপ্ত বর্ণের বর্ণচ্ছত্র প্রকাশের পরীক্ষা এখন বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী বালকগণেরও সুপরিচিত। প্রকৃতিও কখন কখন সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ করিয়া তাহার বর্ণবৈচিত্র্য সুস্পষ্টরূপেই প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু ত্রিশির কাচের পরিবর্ত্তে প্রকৃতি কর্ত্তৃক তখন বৃষ্টিকণা সমূহই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেঘনির্ম্মুক্ত বৃষ্টিধারার উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইলে উহা ভাঙ্গিয়া বা বিশ্লিষ্ট হইয়া যে সাতটি বর্ণের সমাবেশ হয়, তাহাই প্রকৃতির সূর্য্যালোক-গঠন সংক্রান্ত ইঙ্গিত, এবং তাহাকেই আমরা রামধনু বলি; কিন্তু উহার 'ইন্দ্র-ধনু' নামই সুসঙ্গত। এই নয়নবিমোহন স্বাভাবিক দৃশ্য আদিম মানবের মনে যে বিপুল বিস্ময়ের সঞ্চার করিত, তাহা আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। নানা দেশে নানা জাতির মধ্যে এই রামধনু সম্বন্ধে বহুবিধ প্রবাদ ও ধারণা বিদ্যমান।

আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া মূলতঃ ইহা বলিতে পারা যায় যে, সাধারণতঃ কোন বস্তু সূর্য্যালোকের অঙ্গীভূত বিভিন্ন প্রকার রশ্মি-সমূহের মধ্যে একটি মাত্র পরিক্ষেপ করে, অন্যগুলি শোষণ করিয়া লয়, এবং যে বর্ণের রশ্মি পরিক্ষেপ করে, বস্তুটি সেই বর্ণেরই দেখায়। যেখানে কোন বর্ণই পরিক্ষিপ্ত হয় না, সকলগুলিই শোষিত হয়, সেখানে বস্তুটি কৃষ্ণ; এবং যেখানে সকল বর্ণ সমান ভাবে পরিক্ষিপ্ত হয়, সেখানে বস্তুটি শুভ্র বলিয়া নয়নে

প্রতিভাত হয়। আমরা চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত যে নানা বর্ণের জৈব ও অজৈব পদার্থাদি দেখিতে পাই, তাহাদের বর্ণ সাত প্রকার বর্ণতরঙ্গের এইরূপ শোষণ ও পরিক্ষেপ-ক্রিয়া হইতে সমুদ্ভূত।

বর্ণের মধ্যে আবার কতকগুলিকে প্রধান বা মূল বলা যায়; লাল, নীল ও পীত এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের সংমিশ্রণে অন্য প্রকার বর্ণের উদ্ভব হইয়া থাকে। লাল ও নীলের মিশ্রণে বেগুণী; লাল ও পীতের মিশ্রণে জরদ বা পাটল, নীল ও পীতের মিশ্রণে সবুজ ইত্যাদি ইহার উদাহরণ-স্থল। এইরূপ মিশ্র-বর্ণের প্রত্যেকটির ২১১টি ক্রম (shade) আছে। মূল বর্ণসমূহ বিভিন্ন প্রকারে মিশ্রণ করিয়া বহুবিধ বর্ণের উদ্ভাবনে মানবের অদম্য বর্ণপিপাসাই এ বিষয়ে তাহাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। এইরূপ প্রচেষ্টার ফলে জগতের একটি প্রাচীনতম শিল্প অর্থাৎ রঞ্জন-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উন্নতির জন্য মানব যুগে-যুগে প্রাণিজ, উদ্ভিজ, খনিজ—সকল প্রকার পদার্থ হইতেই বর্ণের উপাদান সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে রংএর বাজারে রাসায়নিক রংই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আলকাতরা হইতে রং প্রস্তুত জটিল ব্যাপার; তাহা বৃহৎ কারখানা ও বিশেষ বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। জার্ম্মাণী এই শ্রেণীর বর্ণ-উৎপাদনে অগ্রণী হইলেও সকল প্রগতিশীল দেশই রং-প্রস্তুতশিল্প-প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইয়াছে, এবং বর্ণমূলক শিল্প সভ্য জগতের মুখ্য শিল্পাদির মধ্যে সমাদৃত হইয়াছে। এই সমুদয়ের মূলে কিন্তু মানব-মনের সেই আদিম বর্ণ-লিপ্সাই পরিস্ফুট। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কত দিক্ দিয়া কত কার্য্যে যে এই বর্ণপ্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে—কে তাহা নির্ণয় করিবে?

সকল দেশেই মানব-সমাজে বর্ণ সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা বহু কাল হইতেই বদ্ধমূল; যথা, রক্তবর্ণ—বিজয়, প্রতাপ, গৌরব; এবং কতকাংশে রক্তপাতও সূচনা করে; শ্বেতবর্ণ—পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, শান্তি ইত্যাদির প্রতীক; প্রেম, প্রীতি, আনন্দ-উৎসবাদি ব্যাপারে পীতেরই প্রাধান্য। সমরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মানব বর্ণ হইতে কখন কখন কোন কোন স্বভাবজ দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয়েরও চেষ্টা করিয়াছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহার নিদর্শনের অভাব নাই। য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যযুগে চিকিৎসা বিষয়ে 'Doctrine of Signature' নামক একটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। তাহাতে কোন উদ্ভিদের অংশবিশেষের আকৃতি বা বর্ণ দেখিয়া উহা তদ্রূপ আকৃতি বা বর্ণের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত রোগে উপকারী বলিয়া বিবেচিত হইত। Coles-এর 'Art of Simpling' নামক গ্রন্থে এবং অন্যান্য প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থে এই মতবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। Coles বলেন—"The mercy of God which is over all his workes, maketh herbes for the use of man, and hath not onely stamped upon them a distinct forme, but also given them particular signatures, whereby a man may read even in legible characters the use of them." অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপা, যাহা তাঁহার কার্য্যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাহাই মনুষ্যের ব্যবহারের জন্য তৃণগুল্ম সৃষ্টি করিয়াছে এবং শুধুই তাহাদিগের উপর বিশিষ্ট আকৃতির ছাপ দেয় নাই, অধিকন্তু তাহাদিগের উপর হস্তাক্ষর-সদৃশ এরূপ চিহ্ন বা লক্ষণ দিয়াছে, যদ্দ্বারা মানুষ তাহাদিগের ব্যবহার জানিতে পারে। ভারতে প্রাচীন কালে এ প্রকার কোন মতবাদ প্রচলিত ছিল কি না, তাহা আমাদের অবিদিত। কিন্তু এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, টোটকা ঔষধের কতকগুলির প্রথম প্রচলন তাহাদিগের বর্ণ দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল। অন্ত্রের পীড়ায় আঁত-মোড়া, রক্ত আমাশয়ে লালরঙ্গণ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিতও বর্ণের সম্বন্ধ নিতান্ত অল্প নহে। সম্প্রদায়বিশেষে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণের পক্ষপাতী। বৌদ্ধগণের পীতই প্রিয় বর্ণ; শ্রমণগণ পীতবর্ণের পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বি-গণের মধ্যে শ্বেত ও পীত উভয়ই প্রচলিত আছে; রোমান্-ক্যাথলিকগণের গীর্জ্জা-সজ্জায় অন্য বর্ণও দেখা যায়। হিন্দুগণ এত সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন একটি বর্ণ সাধারণ ভাবে প্রচলিত, এরূপ বলা কঠিন। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কার্য্যাদিতে শাক্তগণের মধ্যে রক্তবর্ণ, শৈবগণের মধ্যে শ্বেত, এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে পীতবর্ণ সমাদৃত। গেরুয়া পীতবর্ণেরই

রূপান্তর, কিন্তু ইহা বৈরাগ্যের নিদর্শন। দেবদেবীগণের বর্ণ সম্বন্ধে রুচি তাঁহাদিগের পূজায় ব্যবহৃত ফুলের বর্ণ হইতে উপলব্ধি হয়। রক্তজবা নৃমুণ্ডমালিনী কালী ও সূর্য্য-পূজায় প্রশস্ত, দুর্গাপূজায় পদ্ম, অপরাজিতা প্রভৃতি যন্ত্র-পুষ্প সমাদৃত, ভোলা মহেশ্বর ধুতুরা, কলিকা, আকন্দ প্রভৃতি সহজলভ্য ফুলেই সন্তুষ্ট; প্রেমিকপ্রবর পীতবসন বনমালীর স্বর্ণ-যূথিকা কনকচাঁপা প্রিয়পুষ্প। এই সকল দেবদেবীর উপাসক পূজকগণের অন্তর্নিহিত ভক্তি এই সকল পুষ্পরাগে অনুরঞ্জিত। সাধারণতঃ শক্তি, শিব, ও বিষ্ণু-উপাসকগণের তিলক-ফোঁটার বর্ণেও এই সকল রং প্রতিভাত।

ধর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় উৎসবাদিও বর্ণের সাহায্য ব্যতীত সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। বাঙ্গালায় বিবাহের বস্ত্রাদি সাধারণতঃ গোলাপী রংএর। চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশে অনেকে বিবাহসজ্জায় পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্রাদির পক্ষপাতী। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে নীলাভ বর্ণের পরিচ্ছদ রাজন্য ও সামন্তবর্গের সম্মান রক্ষা করিত। সেই হইতে Imperial purple শব্দের উদ্ভব হইয়াছে; আবার পুরাকালে যে সমস্ত নীলাভ ধূম্রবর্ণ ব্যবহৃত হইত, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও মূল্য-বান ছিল Tyrian purple; এই বর্ণ একজাতীয় শামুক হইতে ফিনিশিয়ানগণ প্রস্তুত করিত। রংএর ব্যবহার অবশ্য প্রতীচ্য হইতে প্রাচ্যেই অধিক। তথাপি বর্ণ-উৎসব (Colour festival) কোন কোন লাতিন জাতির মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। হিন্দুগণই কিন্তু রংএর মহিমা চূড়ান্তরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহাদিগের দোলপর্ব্বে। দোল বসন্তের মদনোৎসব, শীতাবসানে বসন্তাগমনের এই উৎসবে রংএর ব্যবহার সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। বসন্ত-উৎসবে পরস্পরের প্রতি প্রীতিজ্ঞাপনের জন্য তাহারা যে রংএর সাহায্য গ্রহণ করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ, এই সময় প্রকৃতিও নব-কিশলয়ে বর্ণচ্ছটা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; তাহারও প্রভাব যে দোল-উৎসবের উপর একেবারেই নাই, তাহা বলা যায় না।

বর্ণ দ্বারা মানব-মনে বিভিন্ন ভাব উদ্রেক হওয়ার কথা বলা হইল; কিন্তু তদ্ভিন্ন বর্ণের আরও গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য বর্ত্তমান। জীবনরক্ষার জন্যও ইহা অপরি-হার্য্য। এ সম্বন্ধে হরিদ্বর্ণই সর্ব্বপ্রধান স্থানের দাবী করিতে পারে। অনেকেই অবগত আছেন যে, জীবগণ খাদ্যের মূল উপাদানসমূহ—প্রতীদ, শর্করা, শ্বেতসার ইত্যাদি স্বয়ং প্রস্তুত করিতে পারে না। এই কার্য্য করিতে কেবল উদ্ভিদই সমর্থ। উদ্ভিদ-দেহ হইতে এই সমুদয় পদার্থ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে প্রাপ্ত হইলে তবেই প্রাণী প্রাণধারণ করিতে পারে। বস্তুতঃ, শ্যামল উদ্ভিদ না থাকিলে বসুন্ধরা জীবশূন্য হইত। আবার উদ্ভিদ যাহার বলে সমস্ত জীব-জগতের খোরাক যোগাই-তেছে, তাহা পত্রহরিৎ বা chlorophyll। বায়ুমণ্ডলস্থিত কার্ব্বণ ডায়ক্সাইডকে সূর্য্যালোকের সাহায্যে এই পত্র-হরিৎ Photo-Synthesis নামক এক রহস্যজনক প্রক্রিয়ার সহায়তায় প্রতিনিয়ত জীবনের ভিত্তিস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত মূল উপাদানসমূহ প্রস্তুত করিতেছে। উদ্ভিদ-ভোজী প্রাণিসমূহ তৎসমুদয় নিজ শরীরে সঞ্চয় করে; এবং আমিষভোজী প্রাণিবৃন্দ তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া উক্ত উপাদানগুলি লাভ করে, আর তাহাতেই স্ব স্ব দেহ পরিপুষ্ট করিতে পারে। ফলতঃ, জগতে সর্ব্বপ্রকার জীবনবিকাশের মূলেই উদ্ভিদের হরিদ্বর্ণের প্রভাব লক্ষিত হয়।

পত্র-হরিতের সহিত রক্তের লালবর্ণ-উৎপাদক হেমি-নের (Haemin) যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সেই জন্য কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন, ক্রম-বিবর্ত্তনের কোন একটি বিশেষ স্তরে প্রাণি-জগতের প্রয়োজনে উদ্ভিদের রঞ্জক পদার্থের স্থলে রক্তের রঞ্জক পদার্থ দেখা দেয়। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক উইলস্টেটার বলেন, হেমিনের লৌহের সহিত অক্সিজেনের সংযোগ-সাধন যেমন প্রাণি-জীবনের বৈশিষ্ট্য, তেমনই উদ্ভিদের পত্রহরিতের ম্যাগনে-সিয়ম কর্ত্তৃক অক্সিজেনের বিয়োগ-সাধনই উদ্ভিদ-জীবনে রাসায়নিক বৈচিত্র্য। প্রাণী ও উদ্ভিদ-দেহে বর্ণক পদার্থ-গুলি সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষার ফলে জীবনের উপর তাহাদিগের প্রভাব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে, এবং এবম্বিধ পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদি-প্রয়োগে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও খাদ্যতত্ত্বের কোন কোন ক্ষেত্রে কার্য্যতঃ উন্নতিসাধনও সম্ভব হইয়াছে।

জীবনরক্ষার অন্যান্য বিভাগেও বর্ণের বিশেষ উপযোগিতা লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জীবগণের আত্মরক্ষার বিষয় উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষেত্রে রক্ষণশীল বর্ণসমাবেশ বা Protective colouration শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। বন্য জীবজন্তু অনেক সময় যে পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকে, তাহার সহিত নিজের বর্ণ মিলাইয়া লইবার প্রয়াস পায়। শত্রু সেরূপ অবস্থায় তাহাকে সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। তৃণাবৃত ক্ষেত্রে চলিতে চলিতে দেখা যায় যে, অনেক সবুজবর্ণের গঙ্গা-ফড়িং একবার উর্দ্ধে উড়িয়া পরমুহূর্ত্তেই অদৃশ্য হয়। উদ্ভিদ-বিরল মাঠের ফড়িঙের গাত্রবর্ণ প্রায় মৃত্তিকার অনুরূপ; স্থির ভাবে বসিয়া থাকিলে তাহাদের প্রতি আদৌ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। লেবু গাছের পোকার রং উক্ত গাছের পাতার সদৃশ। ব্যাঘ্রের পীতবর্ণ দেহের উপর কৃষ্ণ-রেখা বা বিন্দুসমন্বিত বর্ণ উন্মুক্ত স্থানে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলেও জঙ্গলে দীর্ঘ শুষ্ক ঘাস ও আলোছায়ার অন্তরালে উহা এমনই মানাইয়া যায় যে, সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। আবশ্যক মত কোন কোন প্রাণী বর্ণ-পরিবর্ত্তনও করিতে পারে। সাধারণ টিকটিকির এই ক্ষমতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটু মনোযোগ সহকারে দেখিলেই দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত অন্ধকারাবৃত স্থান হইতে উহারা যখন সূর্য্যালোক বা কৃত্রিম আলোকে উদ্ভাসিত চূণকাম-করা দেওয়ালের উপর প্রথম আসিয়া পড়ে, তখন উহাদিগকে শ্বেত জমির উপর মোটামুটি মেটেরঙ্গের বস্তু বলিয়া প্রতীতি হয়। অল্পক্ষণ পরেই কিন্তু বর্ণ পাতলা হইয়া গিয়া এমন একটা মলিন পীতাভ শ্বেতবর্ণে দাঁড়ায় যে, উহা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। বলা আবশ্যক যে, রক্ষণশীল বর্ণবিন্যাস এক দিকে যেমন শত্রু এড়াইবার উপায়, অন্য দিকে তেমনিই তাহা শীকার্য্য প্রাণীকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণেও সাহায্য করে। রণনীতিতে অধুনা বহু-প্রচলিত Camouflage প্রথাও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। ইহাও বর্ণবিন্যাসের সাহায্যে অরাতির দৃষ্টি অতিক্রম করিবার কিম্বা অজ্ঞাতসারে তাহাকে আক্রমণ করিবার অন্যতম উপায়।

জীব ও উদ্ভিদের কোন কোন অবস্থায় আত্মগোপন না করিয়া আত্মপ্রকাশ আবশ্যক হয়। তদ্রূপ ক্ষেত্রেও বর্ণ তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রাকৃতিক ইতিহাস-অনুশীলনরত ব্যক্তিগণ অবগত আছেন যে, সন্তানোৎপাদনের সময় (Breeding season) অনেক জীব নববেশে সজ্জিত হয়। এইরূপ বেশের বৈশিষ্ট্য - বর্ণের বৈচিত্র্য ও ঔজ্জ্বল্য। নানাবর্ণ-বিভূষিত সরীসৃপের চর্ম্ম, পক্ষীর পালক, পশ্বাদির লোম ইত্যাদি যৌন-মিলনের প্রাক্কালেই দৃষ্টিগোচর হয়। যৌন-নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতার সময় পুং-জীব যে স্ত্রী-বিমোহন রূপ প্রদর্শন করে, তাহার মধ্যে বর্ণের অংশ তুচ্ছ নহে। মনুষ্যসমাজে সৌন্দর্য্য-সাধনের জন্য বর্ণের ব্যবহার জীবজগতের উক্তরূপ সহজাত-প্রবৃত্তির পরিচায়ক মাত্র। বিচিত্র ও সমুজ্জ্বল বর্ণের ফুল সাধারণতঃ সেই সমুদয় উদ্ভিদের মধ্যেই দেখা যায়—যাহারা পরাগনিষেকের জন্য কীট-পতঙ্গ বা পক্ষীর সাহায্যপ্রার্থী। ফুলের বর্ণ এরূপ স্থলে উক্ত জীবাদিকে প্রলুব্ধ করিয়া উদ্ভিদের অভিপ্রেত কার্য্য সংসাধন করে।

বর্ণ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণার মূলে কি পরিমাণ সত্য আছে, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য আধুনিক সময়ে বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণায় রত আছেন। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে বিষয়টি জটিল বলিয়াই মনে হয়; কারণ, খুব অল্প সময়েই আমরা একমাত্র বর্ণের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকি, এবং শুদ্ধ তাহারই প্রভাব অনুভব করি। ঘরে বা বাহিরে যে বর্ণমণ্ডল আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে, তাহাতে একাধিক বর্ণ বিদ্যমান। দেহমনের উপর কোন বিশেষ বর্ণের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে কৃত্রিম উপায়ে তদ্রূপ অবস্থা সৃজন করিতে হয়; যথা—কোন ব্যক্তিকে এক বা দেড় মাস কাল একবর্ণবিশিষ্ট নির্জ্জন কামরায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখা। সেরূপ পরিবেষ্টনীতে যে প্রতিক্রিয়া উৎপাদিত হয়, তাহা নিঃসঙ্গ অবরোধ দ্বারা যে কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবিত হয় না, তাহাও বলা যায় না। যাহা হউক, এই পরীক্ষা দ্বারা বিভিন্ন বর্ণ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য যে, এ সম্বন্ধে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে এখনও বিলম্ব আছে।

বেগুনিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক রং। যদি এক মাস

কাল কাহাকেও এমন কোন স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, যেখানে বেগুণিয়া ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ তাহার নয়ন-পথে পতিত না হয়, তাহা হইলে মাসান্তে তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। ঘোর লাল অনেকটা এই প্রকৃতির রং, কিন্তু এই বর্ণ-জনিত প্রতিক্রিয়া অন্য দিকেও যাইতে দেখা যায়। ইহাতে নরহত্যার, বিশেষতঃ, আপনার জনকে বধ করিবার উত্তেজনা বাড়িয়া উঠে! লাল রংএর দ্রব্যাদি দেখিলে কোন-কোন জীব, যথা—ষাঁড়, বাঘ ইত্যাদি যে ক্ষেপিয়া উঠে, তাহা অনেকেরই সুবিদিত। রক্তবর্ণের সহিত রক্তপাতের ধারণা যে সাধারণের মনে বিজড়িত রহিয়াছে, তাহা নিতান্ত অহেতুক বলিয়া মনে হয় না। ফলতঃ, লোহিতকে উগ্রবর্ণ বলিয়া বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে। ইহার সহিত তাপেরও সম্বন্ধ আছে। প্রখর রৌদ্রের সময় রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ অত্যধিক গরম বলিয়াই মনে হয়। ঠিক সেই কারণেই শীতকালে উহা আরামপ্রদ। শীতের সময় রক্তবর্ণে সজ্জিত কক্ষে শীত কতকটা কম বলিয়াই মনে হয়। ঠাণ্ডা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে লোহিতালোকের প্রভাবও সমরূপ। রক্তবর্ণ মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করিয়া মানুষকে অধিক মাত্রায় সক্রিয় করিয়া তুলে; কিন্তু সেই উত্তেজনা সৎ বা অসৎ উভয় প্রকার কার্য্যেই নিয়োজিত হইতে পারে।

সাধারণ ধারণায় পীতবর্ণের সহিত যে প্রীতি ও হর্ষের ভাব বিজড়িত থাকিতে দেখা যায়—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারাও তাহা সমর্থিত হইয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন দিবসে বা আলোক-বিরল কক্ষে, এমন কি, সবুজবর্ণ পর্য্যন্তও চিত্ত প্রসাদন না করিতে পারে, কিন্তু সেরূপ স্থলেও পীতবর্ণ মনের প্রফুল্লতা আনয়ন করিতে সমর্থ। ইহা কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, দীর্ঘকাল শুদ্ধ পীতবর্ণের মধ্যে অবস্থান, মনের সজীবতা রক্ষার পক্ষে অনুকূল নহে। ইহাতে দেহমন অবশেষে অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং হিষ্টিরিয়া শ্রেণীর স্নায়ুবিকারও কালক্রমে দেখা দিতে পারে।

একবারে নীলবর্ণে রঞ্জিত কক্ষে গ্রীষ্মের সময় ক্লান্তি অপনোদিত হইয়া শরীর সতেজ হইয়াছে মনে হয়, কিন্তু শীতের সময় এরূপ কক্ষ আদৌ সুখকর বলিয়া মনে হয় না। শরীরের উপর নীলবর্ণের ক্রিয়া কতকটা মাদক-দ্রব্যের ন্যায়। প্রথম অবস্থায় ইহা মস্তিষ্কে শক্তি-সঞ্চার করিয়া কল্পনামূলক কার্য্যের সহায়তা করে; কিন্তু অধিক দিন ধরিয়া ইহাকে প্রভাব বিস্তার করিতে দিলে ফল সাংঘাতিক হইয়া উঠে; মস্তিষ্কদৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, এবং অবশেষে লোকে হিতাহিত জ্ঞান-বর্জ্জিত হয়।

হরিৎ বা সবুজবর্ণকে বর্ণের রাজা বলা যাইতে পারে। ধরাপৃষ্ঠে জীবন-বিস্তারে হরিদ্বর্ণের যে কিরূপ প্রভাব, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ভিদ-রাজ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত; সেই জন্য জগতে সবুজ রংএর প্রসারই সমধিক। আকাশের নীলবর্ণও প্রকৃত-পক্ষে হরিতাভ-শ্বেত; দূরত্ব ও নির্ম্মলতার জন্যই উহা আমাদের চক্ষুতে নীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হরিদ্বর্ণের আধিক্যে কোনই ক্ষতি হয় না। ইহার সাধারণ ক্রিয়া—স্নিগ্ধকারক ও দৃষ্টিশক্তির পরিপোষক।

সর্ব্বশেষে বলা দরকার যে, বর্ণ চিনিবার ক্ষমতা সকলের সমান নহে। বর্ণান্ধতা নিতান্ত বিরল-রোগ নহে। অনেকে হয় ত জানেন না যে, তাঁহারা কোন কোন মূল বা মিশ্রবর্ণ সম্বন্ধে অন্ধ। রীতিমত পরীক্ষা-ফলে ইহা ধরা পড়ে। আবার বর্ণরুচিও ব্যক্তিহিসাবে বিভিন্ন। কাহারও কাহারও পক্ষে কোন কোন বর্ণ অসহ্য। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এরূপ বর্ণের সহিত তাঁহার জীবনের কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সম্পর্ক আছে। বস্তুতঃ, দেহ-মনের উপর বর্ণের প্রভাব উপলব্ধি করিয়া আজকাল কোন কোন রোগের চিকিৎসায় ও রোগীর পরিচর্য্যায় বর্ণের সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।



শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দুই বার দারপরিগ্রহ করেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী। মহাপ্রভু প্রেম-প্রচারে যাত্রা করিলে পতিবিরহ-যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় তাঁহার প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবী পরলোকে প্রস্থান করেন।

"প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল॥"

— চৈঃ চঃ, আদি, ১৬ পঃ, ২১ শ্লোঃ।

লক্ষ্মীদেবীর অভাবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। আধুনিক সমালোচকগণ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় বার পত্নী-গ্রহণের সার্থকতা কি, তাহা বুঝিতে পারেন না। বাল্যাবধি সংসারের প্রতি তাঁহার যখন অন্তরের আকর্ষণ ছিল না, গৃহ-ত্যাগ করিয়া নামামৃত বিতরণের জন্ম প্রথম হইতেই যখন তাঁহার একান্ত আগ্রহ ছিল, তখন প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে অন্ত একটি রমণীর পাণিগ্রহণের কি কোন সার্থকতা ছিল? সার্থকতা অবশ্য ছিল, তবে ইহা উগ্র বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইতে পারা যায় না; কিন্তু যাঁহাদের হৃদয় ভক্তিরসাশ্রয়ী, তাঁহাদের সুনির্ম্মল চিন্তাধারায় এই বিবাহের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। মহাপ্রভুর দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ যুক্তিসঙ্গত হইয়াছিল কি না, তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। গয়ায় ঈশ্বরপুরীর দর্শনলাভান্তর গৃহে প্রত্যাগমনের পর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মহাপ্রভুর দেখা-সাক্ষাৎ হইত কি না, এবং তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন কি না, তাহাই বিচার করিয়া দেখিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

কোন অপ্রিয় সত্য আবিষ্কার করিতে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব কোন গোঁড়া বৈষ্ণব অপেক্ষা আমি যে অল্প পরিমাণে উপলব্ধি করি, ইহাও স্বীকার করি না। প্রত্যেক নিষ্ঠাবান হিন্দুসন্তানের ন্যায় আমিও অবতারবাদ পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করি।

মহাপ্রভু যে মায়ামোহ-বিজড়িত, সংসারাবদ্ধ, কুসংস্কারাপন্ন মানব হইতে উন্নত মার্গে অবস্থান করিতেন, এবং তাঁহার অন্তরে কামনা-বহ্নির শিখা কিঞ্চিন্মাত্রও বর্ত্তমান ছিল না—এ কথা আমি অন্যান্য বৈষ্ণবগণের মতই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিয়া থাকি।

গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রভুর মানসিক উত্তেজনা পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হয়। তখন তিনি অহর্নিশিই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। ভক্তির কাঙ্গাল হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণপ্রান্তে আপনার বলিতে যাহা-কিছু—সমস্তই সমর্পণ করিয়া, গার্হস্থ্য জীবনেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ভক্তির প্রাবল্য ও ভক্তের ভাবাবেশ মাত্রাধিক্যে দেখাইতে গিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থ-রচয়িতাগণ যে প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে দারুণ অবিচার করিয়াছেন, বিবেকবুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

গয়া হইতে তাঁহার প্রত্যাগমন এবং সন্ন্যাস-গ্রহণ অবিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে; অর্থাৎ গয়া হইতে ফিরিবার অনেক পরে তিনি কাটোয়ায় গমন করিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেন। এখন প্রশ্ন এই অর্থাৎ গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং কাটোয়ায় গিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ—ইহার মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান কালে তিনি সতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে কোন পারিবারিক সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন কি না? লক্ষ্য রাখিতে হইবে, আমি "পারিবারিক" কথাই লিখিয়াছি, "দাম্পত্য" কথাটি লিখি নাই।

ভক্তচূড়ামণি শ্রীবৃন্দাবন দাসের কি মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, বুঝিতে পারি নাই। 'চৈতন্যভাগবতে' তিনি লিখিয়াছেন, গয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে জননী শচীদেবী যখন বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই-এর সম্মুখে উপস্থিত করাইলেন, তখন নিমাই সে-দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। এমন কি, প্রভু হুঙ্কার শব্দ করিলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে অন্য দিকে চলিয়া যাইতে হইল।

যিনি দ্বারে-দ্বারে প্রেমামৃত বিতরণ করিয়া সর্ব্বত্র প্রেমাবতার নামে পরিকীর্ত্তিত—তাঁহার পক্ষে স্বীয় পত্নীর প্রতি এইরূপ রূঢ় আচরণ করা কত দূর স্বাভাবিক? দাম্পত্য-সম্বন্ধ তিনি না হয় স্বীকার না করিয়া থাকিবেন, কিন্তু পারিবারিক সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার মত প্রবৃত্তি তাঁহার হইয়াছিল কি? বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিয়া তিনি না হয় চক্ষুই ফিরাইয়া লইয়া থাকিবেন, কিন্তু ঘৃণাব্যঞ্জক 'হুঙ্কার-ধ্বনি' করিবারও কি তাঁহার কোন প্রয়োজন হইয়াছিল?

ভক্তিবাদের মাত্রাধিক্য দেখাইতে গিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাস কি মহাপ্রভুকে ছোট করিয়া দেখান নাই? বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবীর সহিতই বাস করিতেন। একই বাড়ীতে বাস করিয়া তিনি স্বামিপ্রেম-বঞ্চিতা হইয়া কালাতিপাত করিতেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ আছে কি? মহাপ্রভুর মাতৃভক্তির কথা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার পত্নীপ্রেমের কথাও সেই ভাবে বর্ণিত হইলে তাঁহার দেবচরিত্রের মহিমা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইত না। মাতার প্রতি যাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি অত দূর প্রখর ছিল, পত্নীর প্রতি তাঁহার ঐ প্রকার

রূঢ় আচরণের কি প্রকারে সমর্থন করা যাইতে পারে? তিনি বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া কি বিশ্ববহির্ভূতা জীব? না, পত্নী বলিয়া বিশ্বপ্রেমিক স্বামীর প্রেমকণা হইতে বঞ্চিত হইবার যোগ্যা?

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের মনে বোধ হয়, এই বিষয় লইয়া সবিশেষ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল; তাই তিনি বুদ্ধিমানের মত ব্যাপারটাকে একেবারেই পরিহার করিয়া এই সঙ্কট এড়াইয়া গিয়াছেন! গয়া হইতে তাঁহার প্রত্যাগমনের পর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে কোনও কথাই নাই। অবশ্য, এই যে কোন কথার উল্লেখ না করা, ইহার অন্তর্নিহিত কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। তাঁহার মনে হয় তো এ সমস্যাই উদিত হয় নাই যে, আলোচিত সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মহাপ্রভুর বাস্তবিক সম্বন্ধ কিরূপ ছিল। ভক্ত তিনি—ভক্তের চক্ষে, ভক্তি লইয়া ভগবানের কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

বাস্তবিক, মহাপ্রভু—যিনি সর্ব্বভূতেই কৃষ্ণ বিরাজমান দেখিতেন, তিনি যে বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, ইহা কোন রকমেই ধারণা করা যায় না; এবং এই ধারণার সমর্থন করিতে গেলে ভক্তিবাদের ভিত্তিকে সঙ্কুচিত করা হয়।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' একখানি অমূল্য গ্রন্থ। জয়ানন্দ ছিলেন গদাধর দাসের শিষ্য, এবং পরম বৈষ্ণব। ১৫১১ হইতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলে ৫৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কোন বৈষ্ণব-বিশেষের বিনানুমোদনে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করায় বৈষ্ণবসমাজ চৈতন্যমঙ্গলকে বিশেষ ভাবে আমল দেন না। তথাপি এই গ্রন্থ-বর্ণিত কতিপয় ঘটনা মহাপ্রভুর জীবনেতিহাস-রচনায় সবিশেষ সাহায্য করে।

মহাপ্রভুর তিরোধান-সম্পর্কে ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্। বোধ হয়, এইরূপ মর্ম্মান্তিক শোচনীয় বিবরণের আলোচনায় তাঁহারা বীতস্পৃহ। কিন্তু যাঁহার অপার্থিব প্রেম-প্রবাহে সমগ্র বঙ্গদেশ পরিপ্লাবিত হইয়াছিল, যাঁহার বিশ্বপ্লাবী প্রেমের অপার মহিমায় বিধর্ম্মীর আক্রমণ হইতে হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা পাইয়াছিল, কি ভাবে তাঁহার তিরোধান ঘটিয়াছিল, সর্ব্বসাধারণের কি ইহা জানিতে ইচ্ছা হয় না? যে সকল বৈষ্ণবের ধারণা, মহাপ্রভুর তিরোধান ঘটে নাই, তাঁহাদের সেই ধারণার উপর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই নির্ভর করিতে পারেন না। কারণ, জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী মহাপ্রভুকে তাঁহার ভক্তবৃন্দ ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিলেও তিনি মানবদেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারও অপ্রাকট্য ঘটিয়াছিল, এবং তাহাই স্বাভাবিক। পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্ত বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ এ বিষয়ে নীরব বলিয়া এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল—এরূপ মনে করিবার কারণ কি?

মহাপ্রভুর তিরোধান ব্যাপারটি কি ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। এই তিরোধান ব্যাপারটি ঠিক স্বামিস্ত্রী-সম্বন্ধের মতই প্রাঞ্জল। গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনধারার মতই সাবলীল। মহাপ্রভুর অপ্রাকট্য বিষয় কোন কোন গ্রন্থে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হয় নাই বলিয়া যেমন বিচারবুদ্ধির দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী তিনি ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, ঠিক তেমনই ভাবে স্থির করিয়া লইতে হইবে যে, একই সংসারে বাস করিয়া গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেও সতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল, এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে যাবতীয় পারিবারিক-বন্ধন তিনি তৎক্ষণাৎই বিচ্ছিন্ন করেন নাই। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে এ বিষয়ে যে দুইটি লাইন আছে, তদ্দারা ইহাই দেখান। যাইতে পারে যে, মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে আদৌ উপেক্ষা করেন নাই, বরং তাঁহার সন্তোষ-সাধন তিনি প্রার্থনীয় বলিয়াই মনে করিতেন,—

"......মহাবৈরাগ্য প্রকাশ।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিয়া চলিলা সন্ন্যাস।"

"প্রবোধিয়া" কথাটি আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। পত্নীর সহিত যদি কোন প্রীতিবন্ধন নাই থাকিবে, তাহা হইলে মহাবৈরাগ্য প্রকাশে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দিয়া যাইবার কোন হেতু ছিল কি?

বৈষ্ণব-সমাজে ভক্ত লোচনদাসের নাম সুপ্রসিদ্ধ। ইনিও চৈতন্যমঙ্গল নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার লোচনদাসের গুরু ছিলেন, এবং তাঁহারই আদেশে লোচনদাস ৩৬৬ বৎসর পূর্ব্বে (১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে) এই মূল্যবান গ্রন্থখানি রচনা করেন। লোচনদাস উচ্চস্তরের কবি ছিলেন। তাহার চৈতন্যমঙ্গল এক দিকে কাব্য, অন্য দিকে ইতিহাস। লোচনদাসের প্রতি অনেকে এই বলিয়া অবিচার করেন যে, চৈতন্যমঙ্গল-বর্ণিত ঘটনাগুলি সমস্তই ঐতিহাসিক সত্য নহে। কল্পনার স্রোতে ভাসিয়া তিনি অনেক অবান্তর কথা লিখিয়া গিয়াছেন। অবশ্য যদি তাঁহারা গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেন, তাহা হইলে কিছুই বলিবার ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের সুবিধামত কোন কোন বিষয় তাঁহারা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন, এবং বিষয়-বিশেষকে অনৈতিহাসিক কাহিনী মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিবেন—এ কিরূপ ব্যবস্থা? আমাদের মতে চৈতন্যমঙ্গল প্রামাণ্য গ্রন্থ। যদি প্রামাণ্য গ্রন্থ না হইত, তাহা হইলে জয়ানন্দের ন্যায় লোচনদাসকেও জনসাধারণের অপরিচিত থাকিতে হইত। কারণ, তদানীন্তন বৈষ্ণব সমাজ এমন কোন গ্রন্থকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণ্য করিতেন না, যাহাতে অনৈতিহাসিক ও ধর্ম্মভাব-বিরুদ্ধ বিষয় স্থান পাইত; এবং সেইরূপ গ্রন্থ পাঠক-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিত না। বিশেষতঃ, যাঁহার আদেশে এই চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়াছিল, সেই নরহরি সরকার পরম বৈষ্ণব ছিলেন। অবৈষ্ণবোচিত কোন গ্রন্থ রচনা করিতে তিনি নিশ্চয়ই আদেশ করিতেন না।

ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলের ১৭৪ পৃষ্ঠায় মহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়া-সংক্রান্ত যে বর্ণনা আছে, তাহা পাঠে কোন সহৃদয় ব্যক্তিই অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন না। লোচনদাস ছিলেন দরদী কবি। দরদ ঢালিয়া তিনি যে বিদায়-দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠে হৃদয় বিগলিত হয়। গ্রন্থের দীর্ঘ সাত পৃষ্ঠা এই বর্ণনায় পূর্ণ। এই বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, পত্নীর সহিত মহাপ্রভুর পূর্ব্ব-সম্বন্ধ কত গভীর ছিল। যে রজনীতে মহাপ্রভু নিদ্রিতা পত্নীকে গৃহে রাখিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবের সন্ধানে কোন অজ্ঞাত

পথে ধাবিত হইলেন, সেই রজনীর হৃদয়স্পর্শী ঘটনাবলীই গ্রন্থের উক্ত পৃষ্ঠাগুলির বর্ণিত বিষয়।

কাণাঘুষা হইতে বিষ্ণুপ্রিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার স্বামী গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। বিদায়-রাত্রির ঘটনা—

"বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গণে প্রভু দিন-অবসানে
ঘরে আইল হরষিতে।
করিয়া ভোজন পানে সুখ-শয্যায় শয়নে
বিষ্ণুপ্রিয়া বড়িলা ত্বরিতে।
চরণ-কমলে পাশে নিশ্বাস ছাড়িয়ে বৈসে
নেহারয়ে কাতর বয়ানে।
হিয়ার উপরে থুঞা বান্ধে ভুজলতা দিয়া
প্রাণ প্রাণনাথের চরণে।"

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গৃহত্যাগের রাত্রি পর্য্যন্ত মহাপ্রভু ও তাঁহার পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া একই কক্ষে রাত্রিযাপন করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিয়া কহিলেন—

"শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দেহ হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোকমুখে শুনি ইহা বিদরিছে মোর হিয়া
আগুনিতে প্রবেশব আমি।
আমা হেন ভাগ্যবতী নাহি কোন যুবতী
তুমি মোর নিজ প্রাণনাথ।
বড় প্রীতি আশা ছিল দেহ প্রাণ সমর্পিল
এ নব যৌবনে দিয়ে হাত।"

মহাপ্রভু দুই কর্ণ বধির করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। পত্নীর এই প্রকার ব্যাকুলতায় তিনি যথেষ্টই বিচলিত হইয়াছিলেন। এই ব্যাকুলতা বর্ণনা করিয়া লোচনদাস মহাপ্রভুর মহত্ত্ব পরিস্ফুটই করিয়া গিয়াছেন। পত্নীর করুণ বিলাপে কর্ণপাত না করিয়া যদি তিনি কঠোর হৃদয়ে বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত 'হুঙ্কার' শব্দের ন্যায় কোন শব্দ উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রেমাবতার নামের সার্থকতা থাকিত কি? তাহাতে তাঁহার বিশ্বপ্রেম কি ব্যাহত হইত না? লোচনদাস লিখিয়াছেন,—

"প্রভু সব কলা জানে পুছে নানা বিধানে
অঙ্গবাসে বদন মুছিলা।
নানা রঙ্গ পরথাব করিয়া বাড়ায় ভাব
যে কথায় পাষাণ মন্থরে।"

সাধারণ দাম্পত্য-জীবনের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায়? ইহার পরে আরও আছে,—

"শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া বাণী কহে গোরা গুণমণি
হাসিয়া তুলিল নিজ কোলে।
বসনে মুছিয়া মুখ করে নানা কৌতুক
মিছা না করিহ দুঃখ বোলে।
ইহা বলি গৌরহরি অশেষ চুম্বন করি
নানা রস কৌতুক বিথারে।
অনন্তর লাবণ্য প্রেমা লীলা লাবণ্যের সীমা
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিয়া শৃঙ্গারে।"

ইহাও নিতান্ত সাধারণ কথা। ইহার পরে যে বর্ণনা, তাহাই করুণ ও হৃদয়-বিদারক। সে বর্ণনা পড়িয়া অতি বড় পাষণ্ডেরও অশ্রু সংবরণ করা কঠিন। বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দিয়া-কান্দিয়া চক্ষু ফুলাইয়া ফেলিলে, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে অবশেষে মহাপ্রভু বলেন,—

"শুনি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তোমারে কহিল ইহা
যখন যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই আছয়ে তোমার ঠাঁই
সত্য সত্য এই কথা দৃঢ়।"

দেখা যাইতেছে, মহাপ্রভু আশ্বাস দিয়া যাইতেছেন যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা তাঁহার অন্তরে সতত জাগরূক থাকিবে। ইহাই প্রকৃত স্বামীর পবিত্রতা। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভুলিলে তাঁহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ হইত না?

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ছিলেন দেবতা। দেবত্বের অপার করুণা হইতে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে বঞ্চিত করেন নাই। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পত্নীর সহিত তাঁহার প্রীতিবন্ধন সুদৃঢ় ছিল।

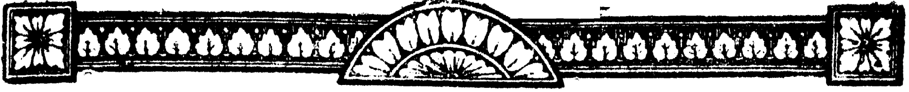
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (এম-এ, বিদ্যারত্ন)

কবির মুক্তি

কবি ভালবাসে এই ধূলিভরা
মাটির ধরণী মায়।
মুক্তির লাগি তাই ত তাহার
কোন আয়োজন নাই।

মানুষের মন চিরদিন তাই
মর্ত্ত্যেই র'য়ে যায়,
দেহ ছাই হয়, মুক্তি মেলে না
স্বর্গে পায় না ঠাঁই।

শ্রীকালিদাস রায়।



পতঞ্জলি-বিরচিত ব্যাকরণ-মহাভাষ্য

(পস্পশাহ্নিক—অনুবাদ ও ব্যাখ্যা)

৭

সমস্ত শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মেই অনুষ্ঠেয় পদার্থগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; সমগ্র অনুষ্ঠেয় বস্তুগুলির মধ্যে কোনটি অঙ্গ এবং কোনটি প্রধান। প্রয়াজ নামক যাগ-গুলি অঙ্গের অন্তর্গত। সমস্ত ইষ্টির প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাস, অন্য সকল ইষ্টিই এই 'দর্শ-পূর্ণমাসে'র বিকৃতি *। যে সকল যাগের দ্রব্য এবং দেবতা শ্রুতিতে বিহিত আছে এবং যে সকল যাগে প্রাণিদ্রব্যের অপেক্ষা নাই, সেই সকল যাগের নাম 'ইষ্টি' †। এই ইষ্টির অঙ্গের মধ্যে প্রয়াজও পরিগণিত আছে।

দর্শপূর্ণমাসে পাঁচটি প্রয়াজ বিহিত। পুনরাধেয়েষ্টি দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি: এই জন্য পুনরাধেয়েষ্টিতেও পাঁচটি প্রয়াজের অনুষ্ঠান করিতে হয় ‡। এই পুনরাধেয়েষ্টির প্রয়াজযাগের যে পাঁচটি মন্ত্র, তাহার বিষয়ে এই বিধি আছে ;—

"প্রয়াজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্য্যাঃ"

ইহার ভাবার্থ এই, 'প্রয়াজ মন্ত্রগুলিতে বিভক্তির যোগ করিয়া দিবে।' এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, কেবল বিভক্তির প্রয়োগ কোন স্থলেই হয় না। অতএব এ স্থলেও বিভক্তির প্রয়োগ করিতে গেলে, তাহার অনুরোধে প্রকৃতির প্রয়োগ অবশ্যই করিতে হইবে। যে কোন প্রকৃতির সহিত বিভক্তির প্রয়োগ করিলে, তাহার অর্থের সহিত প্রয়াজের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। এই জন্য প্রয়াজযাগের যে দেবতা, সেই দেবতার বাচক যে শব্দ, সেই শব্দের সহিত বিভক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে, এখানে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন।

প্রয়াজ নামক যাগগুলি প্রধান যাগের অঙ্গ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই প্রয়াজগুলির অনুষ্ঠান, প্রধান যাগের পূর্ব্বে করিতে হয়। অনুযাজ নামক আরও তিনটি যাগ আছে; এই অনুযাজও দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি 'ইষ্টি'র অঙ্গ। এই অনুযাজগুলির অনুষ্ঠান প্রধান যাগের পরে করিতে হয়।

এই প্রয়াজ এবং অনুযাজের দেবতার বিষয়ে যাস্কের নিরুক্তের অষ্টম অধ্যায়ে বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, প্রয়াজ এবং অনুযাজের দেবতা অগ্নি *। তাহা হইলে এখন ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রয়াজ মন্ত্রে বিভক্তির প্রয়োগ করিতে হইলে অগ্নি শব্দের সহিতই সেই বিভক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে। তৈত্তিরীয়সংহিতায় বলা হইয়াছে †, প্রথম আধানের দ্বারা যে অগ্নির আধান করা হয়, সেই অগ্নি যদি অধিক ভাগের প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া যজমানের সন্তান এবং পশুর প্রতি উপদ্রব করে, তাহা হইলে সেই অগ্নিকে 'উদ্বাসন' (= পরিত্যাগ) করিয়া পুনরায় আধান করিবে; ইহাতে অগ্নিকে অধিক ভাগের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানই অগ্নির শান্তির উপায়।

* দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টীনাং প্রকৃতিঃ।—আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষা-সূত্র ৩।৩১

দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টীনাং স্বেতিকর্ত্তব্যতাং প্রযচ্ছন্তাবুপকুরুতঃ।—আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রের কপর্দ্দিস্বামিকৃত ভাষ্য।

† শ্রুতদ্রব্যদেবতাকা অপ্রাণিদ্রব্যকাঃ ক্রিয়া ইষ্টয় ইত্যভি-ধীয়ন্তে।—আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রের হরদত্তাচার্য্য-প্রণীত ব্যাখ্যা ৩।৩১

‡ কোন বিকৃতি যাগে যদি কোন বিশেষ বিধান থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে পাঁচটির অধিক প্রয়াজের অনুষ্ঠান করিতে হয়। বিশেষ বিধান না থাকিলে পাঁচটি প্রয়াজই অনুষ্ঠেয়।

* অথ কিংদেবতাঃ প্রয়াজানুযাজাঃ? আগ্নেয়া ইত্যেকে। …ছন্দোদেবতা ইত্যপরম্।… ঋতুদেবতা ইত্যপরম্।…পশুদেবতা ইত্যপরম্।…প্রাণদেবতা ইত্যপরম্।…আত্মদেবতা ইত্যপরম্।… আগ্নেয়া ইতি তু স্থিতিঃ। ভক্তিমাত্রমিতরৎ। নিরুক্ত ৮।২১-২২

† ভাগধেয়ং বা অগ্নিরাহিত ইচ্ছমানঃ প্রজাং পশূন্ যজমানস্যোপ-দোদ্রাবোদ্বাস্য পুনরাদধীত, ভাগধেয়েনৈবৈনং সমর্দ্ধয়ত্যথো শান্তি-রেবাস্যৈষা। তৈত্তিরীয়সংহিতা ১।৫।১

প্রথমাধানেনাহিতোঽগ্নিরসাধারণভাগবাঞ্ছয়াঽধিকোপদ্রবং চকার, তচ্ছান্তিরনেন ভবতি। তস্মাদুদ্বাসনেষ্ট্যা পূর্ব্বাগ্নিমুদ্বাস্য পুনরপ্যগ্নি-মাদধ্যাৎ।—সায়ণভাষ্য।

অগ্নিকে 'উদ্বাসন' (=পরিত্যাগ) করিতে হইলে প্রথমে 'উদ্বাসনেষ্টি' নামক 'ইষ্টি'র অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহার পর 'পুনরাধেয়েষ্টি' নামক 'ইষ্টি'র অনুষ্ঠান করিলে পুনরাধান সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই 'পুনরাধেয়েষ্টি'তে প্রয়াজের অনুষ্ঠানে যে প্রয়াজ-মন্ত্র পঠিত হয়, তাহার বিষয়ে তৈত্তিরীয়সংহিতায় বিশেষ বিধান করা হইয়াছে; এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যিনি প্রথমে অগ্নির আধান করিয়া পরে সেই অগ্নিকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার গৃহে 'বাক্' শুদ্ধ অবস্থায় থাকে না, অশুদ্ধ শব্দের সহিত সেই যজমানের গৃহের 'বাক্' সংসৃষ্ট হইয়া যায়। সেই সাঙ্কর্য্য অবস্থা প্রাপ্ত 'বাক্', তাহার উচ্চারণের ফলে যজমানের পরাভব প্রাপ্তির কারণ হয়। যজমানের এই পরাভব যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্য বিভক্তির প্রয়োগ করিবে *।

এই বিভক্তির প্রয়োগ কি ভাবে করিতে হইবে, সে বিষয়ে আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে।

পূর্ব্বে যে পাঁচটি প্রয়াজের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের নাম ও তাহাদের মন্ত্র যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে †;—

নাম	মন্ত্র
১। সমিধ্ (এই নামটি নিত্য বহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হয়।)	'সমিধোঽগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু' (তৈত্তিরীয়শাখায় 'ব্যন্তু' স্থানে 'বিয়ন্তু' এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।)
২। তনূনপাৎ	'তনূনপাদগ্ন আজ্যস্য বেত্তু।'
৩। ইড্ (এই নামটিও নিত্য বহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হয়।)	'ইড়োঽগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু।' (এখানেও তৈত্তিরীয়শাখায় 'ব্যন্তু' স্থলে 'বিয়ন্তু' এইরূপ পাঠ করিতে হয়।)
৪। বর্হিঃ	'বর্হিরগ্ন আজ্যস্য বেত্তু।'
৫। স্বাহা	'স্বাহাঽগ্ন আজ্যস্য বেত্তু।'

এই প্রয়াজ-মন্ত্রের মধ্যে প্রথম চারিটি মন্ত্রে বিভক্তির যোগ করিতে হয়, অন্তিম প্রয়াজ-মন্ত্রে বিভক্তির যোগ হয় না *। এই সকল প্রয়াজমন্ত্রে অগ্নিশব্দের সম্বোধন বিভক্তির রূপের প্রয়োগ আছে। প্রথমোক্ত চারিটি প্রয়াজমন্ত্রে সম্বোধনান্ত অগ্নিশব্দের পূর্ব্বে, যথাক্রমে সম্বোধন, সপ্তমী, তৃতীয়া এবং দ্বিতীয়া বিভক্তিতে অগ্নিশব্দের যে রূপ হয়, তাহার প্রয়োগ করিতে হয় †; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 'পুনরাধেয়েষ্টি'তে প্রথম চারিটি প্রয়াজ-মন্ত্রের পাঠ এইরূপ হইবে ‡;—

১। সমিধোঽগ্নেঽগ্ন আজ্যস্য বিয়ন্তু ('বিয়ন্তু' এই পাঠ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয়শাখার; অন্য শাখায় এই 'বিয়ন্তু' স্থানে 'ব্যন্তু' পাঠ হইবে)।

২। তনূনপাদগ্নাবগ্ন আজ্যস্য বেত্তু।

৩। ইড়োঽগ্নিনাঽগ্ন আজ্যস্য বিয়ন্তু। (এ স্থলেও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয়শাখার পাঠ 'বিয়ন্তু' এবং অন্য শাখার পাঠ 'ব্যন্তু'।)

৪। বর্হিরগ্নিমগ্ন আজ্যস্য বেত্তু।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত মন্ত্রের সহিত এই পরবর্ত্তী মন্ত্রগুলি মিলাইলেই ইহাদের পরস্পরের যেটুকু পার্থক্য, তাহা বুঝা যায়।

নাগেশভট্ট মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্দ্যোতে লিখিয়াছেন, উক্ত স্থলে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ করিতে হয়, ইহা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের পূর্ব্বপরম্পরাক্রমে প্রসিদ্ধ ††। আমরা আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে দেখিতে পাইতেছি, অন্তিম প্রয়াজমন্ত্রে এই বিভক্তির যোগ হয় না, প্রথম চারিটি

* সংবা এতস্য গৃহে বাক্ সৃজ্যতে যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে, স বাচং সংসৃষ্টাং যজমান ঈশ্বরোঽনুপরাভবিতোর্বিভক্তয়ো ভবন্তি বাচো বিধৃত্যৈ যজমানস্যাপরাভবায়।'—তৈত্তিরীয়সংহিতা ১।৫।২

সমিধো যজতি, তনূনপাতং যজতি, ইড়ো যজতি, বর্হির্যজতি, স্বাহাকারং যজতি।—তৈত্তিরীয়সংহিতা ২।৬।১

* নোত্তমে।— আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র ৫।২৮।৭

† 'সমিধো অগ্ন আজ্যস্য বিয়ন্তু' ইত্যাদিষু চতুর্ষু প্রয়াজমন্ত্রেষু সংবুদ্ধ্যন্তাদগ্নিশব্দাৎ পূর্ব্বং সংবুদ্ধিসপ্তমী-তৃতীয়া-দ্বিতীয়-বিভক্ত্যন্তানামগ্নিশব্দানাং ক্রমেণ প্রয়োগং বিধত্তে।···বিভক্তয়ঃ সূত্রে দর্শিতাঃ—অগ্নেঽগ্নেঽগ্নাবগ্নেঽগ্নিনাগ্নেঽগ্নিমগ্নে ইতি চতুর্ষু প্রয়াজেষু চতস্রো বিভক্তীর্দধাতি। তৈত্তিরীয়সংহিতা (২।৫।২।) সায়ণভাষ্য। এ স্থলে সায়ণ যে সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেটি আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রের পঞ্চম প্রশ্নের (২৮।৬) অন্তর্গত।

‡ এই অগ্নিশব্দে বিভক্তি যোগ করিবার অন্য দুই প্রকার প্রণালী আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রের ৫ম প্রশ্নে উল্লিখিত আছে; বাহুল্যভয়ে তাহা এ স্থলে প্রদর্শিত হইল না।

†† বিভক্তয়শ্চ প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-ষষ্ঠী-সপ্তম্য এবেতি শ্রৌতসম্প্রদায়ঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত—পস্পশাহ্নিক।

মন্ত্রেই এইরূপ বিভক্তির যোগ হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নাগেশভট্ট যে পাঁচটি বিভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে তাহাদের সকলের সমাবেশের সম্ভাবনা নাই। আমরা আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে আরও দেখিতেছি যে, সম্বোধন, সপ্তমী, তৃতীয়া এবং দ্বিতীয়া এই চারিটি বিভক্তিরই প্রয়োগ হয়; তৈত্তিরীয়সংহিতার সায়ণভাষ্যে এই চারিটি বিভক্তির প্রয়োগই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, নাগেশভট্ট সম্বোধন বিভক্তির উল্লেখ করেন নাই; আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে উল্লিখিত হয় নাই এরূপ দুইটি বিভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দুইটি হইতেছে প্রথমা এবং ষষ্ঠী। নাগেশভট্টের এইরূপ শ্রৌতসূত্র-বিরুদ্ধ উক্তির প্রতি কিরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায়, তাহা আমাদের পক্ষে ভাবিবার বিষয়।

এখন আমরা এ স্থলে আমাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব।

যিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি প্রয়াজমন্ত্রে বিভক্তির যোগ করিতে পারেন না। যাহার ব্যাকরণ-জ্ঞান নাই, তাহার পক্ষে কোন্ বিভক্তিতে অগ্নিশব্দের কিরূপ 'রূপ' হইবে, তাহা জানার সম্ভব নাই। এই জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন করা উচিত।

মন্তব্য।—এই প্রয়াজমন্ত্রে বিভক্তি যোগ করিবার বিধি আমরা তৈত্তিরীয়সংহিতায় দেখিতে পাই। সে স্থলে বিধিবাক্যের আকার "বিভক্তয়ো ভবন্তি"—এইরূপ। এ সম্বন্ধে মহাভাষ্যকার যে বিধিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার আকার অন্যরূপ,—"প্রয়াজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্য্যাঃ" এইরূপ। মহাভাষ্যকার অন্য কোন শাখা হইতে এই বিধিবাক্য আহরণ করিয়াছেন। মহাভাষ্যকারের সময়ে মৈত্রায়ণীশাখার বহুল প্রচার ছিল। এই বাক্যটি সম্ভবতঃ মৈত্রায়ণীশাখার কোন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ হইতে মহাভাষ্যকার উদ্ধৃত করিয়াছেন, এইরূপ মনে হয়।

মূল—'যো বা ইমাম্'

যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশো বাচং বিদধাতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি।

আর্ত্বিজীনাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। 'যো বা ইমাম্'

অনুবাদ। যিনি বাক্ অর্থাৎ শব্দকে প্রতিপদ, প্রতিস্বর এবং প্রতি-অক্ষর জানেন, তিনিই 'আর্ত্বিজীন' হ'ন। আমরা 'আর্ত্বিজীন' হইতে পারি, এই জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

ব্যাখ্যা।—এখানে 'যো বা ইমাম্' এই স্থলে 'বৈ' এই অব্যয়ের সন্ধি হইয়া 'বা' এই 'রূপ' হইয়াছে; এই 'বৈ' শব্দের অর্থ অবধারণ। যদিও এই 'বৈ' শব্দ 'যঃ' এই শব্দের পরে পঠিত আছে, তথাপি ইহার অন্বয় পরবর্ত্তী 'সঃ' এই শব্দের সঙ্গে হইবে; সুতরাং ইহাকে 'সঃ' শব্দের পরে আনিয়া অন্বয় করিতে হইবে। এইরূপ এক স্থানে পঠিত শব্দকে অন্য স্থানে লইয়া গিয়া যে ক্ষেত্রে অন্বয় করিতে হয়, সেরূপ স্থলে এইরূপ শব্দকে 'ভিন্নক্রম' বলা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে স্থলে শব্দটি পঠিত হওয়া উচিত ছিল, সে স্থলে পঠিত হয় নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, উক্ত বাক্যটিকে অন্বয় করিবার সময় এইরূপ আকারে পড়িতে হইবে—যঃ ইমাং বাচং পদশঃ স্বরশঃ অক্ষরশঃ বিদধাতি সঃ বৈ আর্ত্বিজীনঃ ভবতি।

'পদশঃ' এ স্থলে সংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্ * (৫।৪।৪৩) এই সূত্র অনুসারে একবচনান্ত পদশব্দের উত্তর বীপ্সা অর্থে 'শস্' প্রত্যয় হইয়াছে। পদ শব্দে সুব্ বিভক্তিযুক্ত বা তিঙ্ বিভক্তিযুক্ত শব্দ বুঝিতে হইবে †। 'স্বর' শব্দের এবং 'অক্ষর' শব্দের পরেও এইরূপ তদ্ধিত 'শস্' প্রত্যয় হইয়া যথাক্রমে 'স্বরশঃ' ও 'অক্ষরশঃ' এই দুইটি পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থলে 'স্বর'শব্দের দ্বারা উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এবং একশ্রুতি প্রভৃতি স্বর বুঝিতে হইবে ‡; কেবল অকার, ইকার এবং উকার প্রভৃতি স্বরবর্ণ এখানে 'স্বর'শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত

* সংখ্যাবাচিভ্যঃ প্রাতিপদিকেভ্য একবচনাচ্চ বীপ্সায়াং দ্যোত্যায়াং শস্প্রত্যয়ো ভবতি অন্যতরস্যাম্।—কাশিকা। সংখ্যাবাচক প্রাতিপদিকের উত্তর এবং একবচনান্ত শব্দের উত্তর বীপ্সা অর্থে বিকল্পে শস্ প্রত্যয় হয়। 'পদশঃ' এই স্থলে 'পদং পদম্' এইরূপ বিগ্রহে বীপ্সা অর্থে শস্। এ স্থলে একবচনান্ত শব্দের উত্তর 'শস্' প্রত্যয় হইয়াছে। স্বরশঃ এবং অক্ষরশঃ এই দুই স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই তিন স্থলেই একবচনান্ত শব্দের উত্তর 'শস্' প্রত্যয় হইয়াছে।

† সুপ্তিঙন্তং পদম্ (১। ১৪)। সুপ্ তিঙিতি প্রত্যাহার-গ্রহণম্। সুবন্তং তিঙন্তং চ শব্দরূপং পদসংজ্ঞং ভবতি।—কাশিকা।

‡ স্বর উদাত্তাদিঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপ এবং শব্দকৌস্তুভ।

হয় নাই। পরবর্ত্তী 'অক্ষর' শব্দের দ্বারাই অকার, ইকার প্রভৃতি স্বরবর্ণও প্রতিপাদিত হইয়াছে; কারণ, এখানে অক্ষর শব্দের অর্থ ব্যঞ্জনবর্ণ সহিত স্বরবর্ণ *। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৈয়াকরণ তাঁহার ব্যাকরণে বর্ণ মাত্রের 'অক্ষর' এই সংজ্ঞা বিধান করিয়াছিলেন, ইহা মহাভাষ্যকার প্রত্যাহারাহ্নিকের (১।১।২) শেষভাগে বলিয়াছেন। তদনুসারে এখানে 'অক্ষর' শব্দের দ্বারা সমস্ত বর্ণই পরিগৃহীত হইতে পারে †। এখানে 'অক্ষর' শব্দের এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি ভাল বলিয়া মনে হয়। এই ব্যাখ্যার দ্বারা আমরা সমস্ত বর্ণকেই 'অক্ষর' শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি; সুতরাং এই ব্যাখ্যাটি পূর্ব্বব্যাখ্যা অপেক্ষা ব্যাপক ‡; অতএব এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাই আদরণীয়।

'বিদধাতি' এই ক্রিয়াপদ যদিও 'করোতি' এই ক্রিয়াপদের সমানার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়, তথাপি এই স্থলে ইহা 'জানাতি' এই ক্রিয়াপদের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

'আর্ত্বিজীন' এই পদটি 'ঋত্বিজ্' শব্দের উত্তর 'খঞ্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ হইয়াছে। এই 'খঞ্' প্রত্যয় "যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ" (৫।১।৭১) এই সূত্রের দ্বারা বিহিত হইয়াছে। এই সূত্রে "তদর্হতি" (৫।১।৬৩) এই সূত্রের অনুবৃত্তি হয়। এই অনুবৃত্তি-সহিত পূর্ব্বে প্রদর্শিত সূত্রের অর্থ,—তাহার যোগ্য এই অর্থে 'যজ্ঞ' এবং 'ঋত্বিজ্' শব্দের উত্তর যথাক্রমে 'ঘ' এবং 'খঞ্' প্রত্যয় হয়। 'ঋত্বিজমর্হতি' এইরূপ বিগ্রহ-বাক্যে 'ঋত্বিজ্' শব্দের উত্তর 'খঞ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে; এই খঞ্ প্রত্যয়ের 'ঞ্' ইৎসংজ্ঞক হওয়ায় তাহার লোপ হইয়া 'খ' মাত্র অবশিষ্ট থাকে; সেই 'খ'র স্থানে "আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফঢখছঘাং প্রত্যয়াদীনাম্ (৭।১।২) এই সূত্র অনুসারে 'ঈন' আদেশ হয়; এই 'খঞ্' প্রত্যয়টি 'ঞিৎ' হওয়ায় 'ঋত্বিজ্' শব্দের আদি স্বর 'ঋ'কারের স্থানে 'বৃদ্ধি' * (আর্) হইয়া 'আর্ত্বিজীন' এই পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই 'আর্ত্বিজীন' শব্দের অর্থ যিনি ঋত্বিক্ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য অর্থাৎ যজমান—যাগকর্ত্তা। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শব্দের জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন—যিনি শব্দশাস্ত্রজ্ঞ—বৈয়াকরণ, তিনিই যজমান হইবার যোগ্য অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হইবার যোগ্য।

'আর্ত্বিজীন' শব্দের আরও একটি অর্থ আছে। "যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ" (৫।১।৭) এই সূত্রে একটি বার্ত্তিক আছে

"যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং তৎকর্ম্মার্হতীত্যুপসংখ্যানম্"

যজ্ঞকর্ম্ম এবং ঋত্বিক্‌কর্ম্মের যোগ্য এই অর্থে যজ্ঞ ও ঋত্বিজ্ শব্দের উত্তর যথাক্রমে 'ঘ' এবং 'খঞ্' প্রত্যয় হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যিনি ঋত্বিকের কর্ম্মে যোগ্য, তাঁহাকেও 'আর্ত্বিজীন' শব্দে অভিহিত করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে উদ্ধৃত বাক্যে যে 'আর্ত্বিজীন' শব্দ আছে, তাহার দুইটি অর্থ যজমান এবং ঋত্বিকের কর্ম্মে যোগ্য অর্থাৎ ঋত্বিক্। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যিনি শব্দশাস্ত্রজ্ঞ বৈয়াকরণ তিনিই স্বয়ং যাগের অনুষ্ঠাতা যজমান হইতে পারেন এবং অন্য কর্ত্তৃক যাগের অনুষ্ঠানে তিনিই ঋত্বিক্ হইতে পারেন। মহাভাষ্যে উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত বাক্যের পর্য্যবসিত অর্থ এই হইতেছে, যিনি বিদ্বান্—বেদার্থে অভিজ্ঞ, তিনিই যাগের অনুষ্ঠান করিবেন এবং তিনিই ঋত্বিকের কার্য্যও করিবেন †; যাঁহার বেদার্থে

* অক্ষরং ব্যঞ্জন-সহিতোঽচ্।—মহাভাষ্যপ্রদীপ এবং শব্দকৌস্তুভ।

শৌনক-প্রণীত ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে ব্যঞ্জনসহিত অথবা অনুস্বার-সহিত যে স্বরবর্ণ, তাহাকে 'অক্ষর' বলা হইয়াছে এবং ব্যঞ্জনরহিত ও অনুস্বার-রহিত যে স্বরবর্ণ, তাহাকেও অক্ষর বলা হইয়াছে;—সব্যঞ্জনঃ সানুস্বারঃ শুদ্ধো বাঽপি স্বরোঽক্ষরম্। (১৮।২৮)

ব্যঞ্জনেন যুক্তঃ অনুস্বারেণ সহিতঃ অথবা অনুস্বারব্যঞ্জনাভ্যাং রহিতঃ স্বরঃ অক্ষরসংজ্ঞকো ভবতি।—উব্বট-কৃত প্রাতিশাখ্যভাষ্য।

† "বর্ণং বাহুঃ পূর্ব্বসূত্রে" ইতি ভাষ্যাদ্বর্ণমাত্রমিত্যন্যে।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

‡ যাস্কের নিরুক্তে "অক্ষর' শব্দের বাক্ এবং জল এই দুইটি অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য—নিরুক্ত ২।২৩,২।২৪, ১১।৪১), কিন্তু এখানে এই দুই অর্থের একটি অর্থেরও সঙ্গতি নাই, এই জন্য এই দুই অর্থের মধ্যে একটি অর্থও এখানে পরিগৃহীত হইবার যোগ্য নহে।

* তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ (৭।২।১১৭)।

তদ্ধিতে ঞিতি ণিতি চ প্রত্যয়ে পরতোঽঙ্গস্যাচামাদেরচঃ স্থানে বৃদ্ধির্ভবতি।—কাশিকা।

† 'বিদ্বান্ যজেত' 'বিদ্বান্ যাজয়েদি'তি দ্বয়োরপি বিদুষো-রধিকারাৎ। মহাভাষ্যপ্রদীপ।

সকৃৎপ্রযুক্তস্যার্ত্বিজীনশব্দস্যোভয়পরত্বে যুক্তিমাহ—বিদ্বানিতি

অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহার যজমান হইবার যোগ্যতা নাই এবং ঋত্বিক্ হইবার যোগ্যতাও নাই। বেদার্থে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইলে ব্যাকরণে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব যিনি স্বর্গাদি ফলের কামনায় স্বয়ং যাগের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক এবং যিনি অন্যের অনুষ্ঠিত যাগে দক্ষিণার লিপ্সায় ঋত্বিক্ হইতে ইচ্ছুক, এই উভয়ের পক্ষেই ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

"যো বা ইমাম্" এই বাক্যটিও যে একটি শাস্ত্রবাক্য, এ বিষয়ে যুক্তি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

মূল।—'চত্বারি' *

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ॥

(ঋক্‌সংহিতা ৩,৮।১০, বাজসনেয়িসংহিতা ১৭।৯১, মৈত্রায়ণীসংহিতা ১।৬।২, কাঠকসংহিতা ৭০।৭ ইত্যাদি)

'চত্বারি শৃঙ্গাণি' চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ। 'ত্রয়ো অস্য পাদাঃ' ত্রয়ঃ কালা ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানাঃ 'দ্বে শীর্ষে' দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্য্যশ্চ। 'সপ্ত হস্তাসো অস্য' সপ্ত বিভক্তয়ঃ। 'ত্রিধা বদ্ধঃ' ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধ উরসি কণ্ঠে শিরসীতি। 'বৃষভো' বর্ষণাৎ 'রোরবীতি' শব্দং করোতি।

কুত এতৎ? রৌতিঃ শব্দকর্ম্মা। 'মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশে'তি 'মহান্ দেবঃ শব্দঃ'। 'মর্ত্ত্যা' মরণধর্ম্মাণো মনুষ্যাস্তানাবিবেশ। মহতা দেবেন নঃ সাম্যং যথা স্যাদিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

অনুবাদ।—ইহার (শব্দের) চারিটি শৃঙ্গ, তিনটি পদ, ইহার দুইটি মস্তক, সাতটি হস্ত; (এই) বৃষভ তিন প্রকারে বদ্ধ (হইয়া) রব করিতেছেন; মহান্ দেব মর্ত্ত্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

'চারিটি শৃঙ্গ' চারি প্রকার পদসমূহ—নাম (=সুব্-বিভক্তিযুক্ত শব্দ *), আখ্যাত (=তিঙ্ বিভক্তি-যুক্ত ক্রিয়াপদ †), উপসর্গ এবং নিপাত। 'তিনটি ইহার পদ' তিন কাল - ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান। 'দুইটি মস্তক' শব্দের দুইটি স্বরূপ—নিত্য (উৎপত্তি-বিনাশ-হীন) এবং কার্য্য (উৎপত্তিশালী)। 'সাতটি হস্ত ইহার' সাতটি বিভক্তি।

'তিন প্রকারে বদ্ধ' তিন স্থানে বদ্ধ—বক্ষঃস্থলে, কণ্ঠদেশে এবং মস্তকে। 'রোরবীতি' শব্দ করিতেছেন; কি কারণে ইহা (হইতেছে—এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে)? 'রু' ধাতুর অর্থ শব্দ করা (রব করা—বলা)।

'মহান্ দেব মর্ত্ত্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন' মহান্ দেব শব্দ, (তিনি) মর্ত্ত্য—মরণ-শীল (যে) মনুষ্য, তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

মহান্ দেবের সহিত আমাদের সাম্য যাহাতে হইতে পারে, এই (কারণে) ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

মন্তব্য।—এই উদ্ধৃত ঋক্‌টিতে তিনটি বৈদিক পদ আছে; (১) 'শৃঙ্গা' নপুংসকলিঙ্গ 'শৃঙ্গ' শব্দের প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের বৈদিক রূপ ‡; লৌকিক প্রয়োগে এই স্থলে 'শৃঙ্গাণি' এই রূপ হয়। (২) 'হস্তাসঃ' পুংলিঙ্গ 'হস্ত' শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'হস্তাসঃ' এই বৈদিক রূপ হইয়াছে §; এই স্থলে লৌকিক প্রয়োগে 'হস্তাঃ' এই রূপ হয়।

বেদার্থজ্ঞ ইত্যর্থঃ —মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত। যজনে যাজনে চ বিদুষ এবাধিকার ইতি ভাবঃ।—শব্দকৌস্তুভ।

'ঋত্বিজমর্হতি' ইতি 'ঋত্বিক্‌কর্ম্মার্হতি' ইতি চ ব্যুৎপত্ত্যা আর্ত্বিজীনপদং যাজ্যযাজকোভয়পরম্।—ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি ১।১।১

* বর্ত্তমান কালে লিখিবার সময়ে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিভাগ প্রদর্শনের উদ্দেশে 'প্যারাগ্রাফ' (paragraph)এর ব্যবহার করা হয়; পূর্ব্ব সময়ে এইরূপ 'প্যারাগ্রাফে'র ব্যবহার ছিল না। এই জন্য প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিভাগ প্রদর্শনের উদ্দেশে মহাভাষ্যকার অনেক স্থলে এইরূপ 'প্রতীকে'র দ্বারা সেই প্রতিপাদ্য বিষয়কে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে পূর্ব্বে প্রত্যেক স্থলেই এইরূপ 'প্রতীকে'র অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; তাহার দ্বারাই পাঠকগণ এইরূপ 'প্রতীক' ব্যবহারের উদ্দেশ্য অবগত হইয়াছেন; সুতরাং প্রত্যেক স্থলেই এইরূপ 'প্রতীকে'র ব্যাখ্যা করার আর প্রয়োজন নাই।

* নাম শব্দেন সুবন্তম্, নমত্যাখ্যাতার্থং প্রতি বিশেষণীভবতীতি ব্যুৎপত্তেঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

† আখ্যাতম্ তিঙন্তম্।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

‡ শেশ্ছন্দসি বহুলম্ (৬।১।৭০)।
শি ইত্যেতস্য বহুলং ছন্দসি বিষয়ে লোপো ভবতি।—কাশিকা।
উদাহরণ,—'যা ক্ষেত্রা; এই স্থলে 'যানি ক্ষেত্রাণি'—এইরূপ লৌকিক সংস্কৃতে হয়।

§ আজ্জসেরসুক্ (৭।১।৫০)।

(৩) 'মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ' এই স্থলে 'মর্ত্ত্যাঁ' এই রূপ বৈদিক সংস্কৃতেই হয়; লৌকিক সংস্কৃতে ইহার পরিবর্ত্তে 'মর্ত্ত্যান্' এই প্রকার প্রয়োগ হয়। 'মর্ত্ত্যান্+আবিবেশ' এই অবস্থায় "দীর্ঘাদটি সমানপাদে" * (৮।৩।৯) এই সূত্র অনুসারে 'ন্' স্থানে রু হইয়া উকারের ইৎ সংজ্ঞা এবং লোপ হওয়ার পরে 'র্' মাত্র অবশিষ্ট থাকে। "আতোঽটি নিত্যম্" † (৮।৩।৩) এই সূত্র অনুসারে হকারের পরবর্ত্তী আকার অনুনাসিক হয়। তাহার পরে, ভোভগোঅঘোঅপূর্ব্বস্য যোঽশি" ‡ (৮।৩।১৭) এই সূত্র অনুসারে 'রু'র 'র্' স্থানে 'য্' হয় এবং "লোপঃ শাকল্যস্য" (৮।৩।১৯) এই সূত্র অনুসারে 'য্' লোপ হইয়া 'মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

এই মন্ত্রের "মহো দেবঃ" এই অংশের মহাভাষ্যকার "মহান্ দেবঃ" এই প্রতি শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহান্+দেবঃ এই অবস্থায় বৈদিক ব্যাকরণের দ্বারা "মহো দেবঃ" এই প্রকার প্রয়োগ সিদ্ধ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে একটু কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। এই জন্য শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়িসংহিতার ভাষ্যকার মহীধর অন্য প্রকারে এই প্রয়োগ সিদ্ধ করিয়াছেন; এ স্থলে 'মহ' এই অকারান্ত শব্দের প্রথমা বিভক্তির এক বচনে 'মহঃ' এইরূপ যে প্রয়োগ হয়, তাহার সহিত 'দেবঃ' এই শব্দের সহযোগে সন্ধি হওয়ায় 'মহো দেবঃ' এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে, মহীধর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া 'মহঃ' শব্দকে 'মহান্' শব্দের সমানার্থকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন *।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

অবর্ণান্তাদঙ্গাদুত্তরস্য জসেরসুগাগমো ভবতি ছন্দসি বিষয়ে।—কাশিকা।

উদাহরণ—'ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ'; এখানে লৌকিক সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারে 'ব্রাহ্মণাসঃ' এই স্থলে 'ব্রাহ্মণাঃ' এবং 'সোম্যাসঃ' এই স্থলে 'সোম্যাঃ' এই রূপ প্রাপ্ত ছিল।

* ন ইত্যনুবর্ত্ততে। দীর্ঘাদুত্তরস্য পদান্তস্য নকারস্য রুর্ভবতি অটি পরতঃ, তৌ চেন্নিমিত্তনিমিত্তিনৌ সমানপাদে ভবতঃ। ঋক্ষ্বিতি (৮।৩।৮) প্রকৃতত্বাদ্ ঋক্পাদ ইহ গৃহ্যতে।—কাশিকা।

† অটি পরতো রোঃ পূর্ব্বস্যাকারস্য স্থানে নিত্যমনুনাসিকাদেশো ভবতি।—কাশিকা।

‡ ভোভগোঅঘো ইত্যেবং পূর্ব্বস্য অবর্ণপূর্ব্বস্য চ রো রেফস্য যকারাদেশো ভবতি, অশি পরতঃ। কাশিকা।

* মহতি=পূজয়তি মহ্যতে বা জনৈরিতি মহো মহান্।—বাজসনেয়িসংহিতার মহীধরভাষ্য (১৭।৯১)। এখানে 'মহতি পূজয়তি' এই বিগ্রহে ভ্বাদি মহ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'অচ্' প্রত্যয়ে 'মহ' পদ সিদ্ধ হয়। নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ (৩।১।১৩৪) এই সূত্রে 'পচ্' প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে—ইহা সত্য; কিন্তু এই সূত্রে মহাভাষ্যে একটি বার্ত্তিক পঠিত আছে,—"অজ্ বিধিঃ সর্ব্বধাতুভ্যঃ"; এই বার্ত্তিকের দ্বারা সমস্ত ধাতুর উত্তর 'অচ' প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে; সুতরাং এই স্থলে 'মহ' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয় হওয়াতে কোন বাধা নাই। যখন 'মহতি পূজয়তি' এইরূপ বিগ্রহ করা হয়, সে সময় 'মহ্' ধাতুর 'পূজা করা' এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় না; ধাতুর এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে 'মহ' শব্দের অর্থের সঙ্গতি থাকে না। এই জন্য এই স্থলে 'মহ্' ধাতুর 'পূজিত হওয়া' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে যিনি পূজিত হন, 'মহ' শব্দের দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইতে পারে; সুতরাং 'মহ' শব্দ এবং 'মহান্' শব্দ সমানার্থকরূপে পরিগণিত হইতে পারে। অথবা, যিনি মহান্, তিনি সকলেরই পূজা করেন, কাহারও অনাদর করেন না,=এরূপ অর্থও এখানে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে কোন কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না।

অমরকোষের ভানুজীদীক্ষিতের টীকায় স্বর্গবর্গের অন্তিম শ্লোকের ব্যাখ্যায় এইরূপ 'অচ্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'মহ' শব্দ সিদ্ধ করা হইয়াছে।

'মহ্যতে জনৈঃ' এইরূপ বিগ্রহ করিলে চুরাদি 'মহ' ধাতু হইতে ঘঞ্ প্রত্যয়ের দ্বারা এই 'মহ' শব্দ সিদ্ধ করা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। এই 'মহ' ধাতু অদন্ত হওয়ায় 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিলে মকারের পরবর্ত্তী অকারের স্থানে বৃদ্ধির প্রাপ্তি না থাকায় এই অকারের স্থানে আকার হইবে না। এই স্থলে "অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্" (৩।৩।১৯) এই সূত্র অনুসারে কর্ম্মবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। যদিও এই সূত্রে পাণিনি 'সংজ্ঞায়াম্' এই শব্দটির বিন্যাস করিয়াছেন, তথাপি মহাভাষ্যকার সূত্রের 'সংজ্ঞায়াম্' এই অংশের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।





বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—

"সজনি আজু শমন দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসয় মোয়॥
ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।"

—বিদ্যাপতি।

বর্ষার সমাগমে নব-মেঘমালা যখন অপরূপ সৌন্দর্য্য লইয়া আকাশে সমুদিত হয়, তখন বিরহী-জনের চিত্ত এমনই চঞ্চল হয় বটে। নব-মেঘের মৃদু গর্জ্জন প্রণয়ীর হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া তাহার অনুরাগ অধিকতর বর্দ্ধিত করে। কোন্ সুদূর অতীতে কোন্ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে উজ্জয়িনীর কবি বিরহী-যক্ষের মর্ম্ম-বেদনায় কাতর হইয়া তাহার মর্ম্মবাণী অমর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া বিশ্বের প্রণয়ী-জনের চিত্তে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, আমরা আজিও সেই সুধাপানে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেছি, এবং ঐ বিশিষ্ট দিনটিকে স্মরণ করিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনে আপনারাই ধন্য হইতেছি।

কবির অমর কাব্য মেঘদূতের বহিরঙ্গ আলোচনায় আমাদের বিশেষ কোন লাভ নাই। মেঘদূতের ভৌগোলিক বিবরণ অথবা বিজ্ঞানে মহাকবির পারদর্শিতার বিষয় আলোচনা করিয়া বিবুধমণ্ডলী প্রশংসামুখর হইয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু আসল কাব্যখানির সহিত তাহার সম্বন্ধ কতটুকু? যক্ষকে অবলম্বন করিয়া কবি মানবহৃদয়ের প্রতিতন্ত্রীতে যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় ঝঙ্কার তুলিয়াছেন—তাহার অনুরণন নীরব হইবার নহে। আষাঢ়ের এই প্রথম দিবসে সেই আদর্শ প্রণয়ী শাপগ্রস্ত বিরহী-যক্ষকে প্রথমেই স্মরণ হয়। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা মানুষকে বরণীয় করে সত্য, কিন্তু অনুরাগের আতিশয্যে প্রাণপ্রিয়ার মনস্তুষ্টিবিধানের জন্য যে কর্ত্তব্যকেও তুচ্ছ করিয়া শাস্তিকেই বরণ করিয়া লইল, তাহার মত স্মরণীয় করিয়া তুলে না। সকল বিধি, সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া যে প্রণয়ী অনুরাগকেই শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়া গেল, এই স্মরণীয় দিনে বার-বার তাহাকে প্রণাম করি।

কল্পনাতেও মহাকবির কল্পনার সীমা নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। কি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, কি উন্নত উদার ভাব লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! মেঘদূতের প্রতিপদেই আমরা তাহার পরিচয় পাই। কর্ত্তব্যচ্যুত যক্ষকে অলকাধিপতি এমন এক স্থানে নির্ব্বাসিত করিলেন, যেখানে কালাতিপাত করা তাহার পক্ষে নিদারুণ কষ্টকর। চিত্রকূট পর্ব্বতের সর্ব্বত্রই রাম-সীতার মর্ম্মস্পর্শী স্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। নাগরিক জীবনের সর্ব্ববিধ সুখ-সম্পদে বঞ্চিত হইয়াও প্রণয়ী রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বতে প্রেমাস্পদ সীতার মিলনসুখ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়া যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন—যক্ষের তাহা অবিদিত ছিল না। রামসীতার মধুর মিলনস্মৃতি-বিজড়িত স্থানটিতেই যক্ষের নির্ব্বাসন—এই শাস্তি সত্যই অতি কঠোর। ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদলশোভিত কাননের বিচিত্র শোভা, পল্লববহুল আরণ্য তরুর শাখাসীন বনবিহঙ্গের সুমধুর কাকলী, অরণ্যচর, নয়নাভিরাম কুরঙ্গগণের আতঙ্ক-চঞ্চল অপাঙ্গভঙ্গি, তাহাদের সলীল-নৃত্য বিরহক্লিষ্ট যক্ষের বিষাদেরই কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু সমস্ত বিদ্যমান থাকিয়াও যাহার অভাবে তাহার বাসনার বিপ্রলম্ভে পরিসমাপ্তি ঘটিল, তাহার জন্য যক্ষ উন্মাদ না হইয়া থাকিতে পারিল না। এই নিবিড় অনুরাগ, এই প্রবল আসক্তি, এই বিপুল উন্মাদনা হইতেই মেঘদূত কাব্যের সূচনা।

সমগ্র কাব্যখানিতে যক্ষের গভীর অনুরাগ মূর্ত্ত এবং প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। হায়! হতভাগ্য প্রেমিক তাহার প্রণয়িনীকে প্রাণ ভরিয়াই ভালবাসিত। তাহার বিশ্বাস, তাহার বিরহে তাহার পত্নী হয় ত বাঁচিবে না। যদি কোনরূপে সে আপনার কুশল-সংবাদ প্রিয়ার নিকট পাঠাইতে পারে, তবে হয় ত তাহার প্রাণরক্ষা হইতে পারে। তাই দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী যক্ষ মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইল। নিজে সে অশেষ দুঃখ সহ্য করিতে পারে, কিন্তু প্রিয়ার লেশমাত্র দুঃখও যে তাহার নিকট অসহ্য! তাই সে মেঘকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিল—হে মেঘ, যদি দেখ যে, আমার প্রিয়া সুপ্তিমগ্ন, তবে গর্জ্জন করিও না, প্রহর কাল অপেক্ষা করিও। নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নে সে হয় ত আমাকে লাভ করিয়া তখন আলিঙ্গন করিতেছে, তুমি তাহার সে সুখ ভাঙ্গিয়া দিও না।

"মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্॥"

প্রিয়ার প্রতি তাহার অনুরাগ কত গভীর! প্রিয়া-বিরহে কাতর হওয়ায় সে অবিরত রোদন করিয়াছে, কখনও বা শিলাতলে স্বহস্তে প্রিয়ার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া সে সুখলাভের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু উচ্ছ্বসিত অশ্রু সে-চিত্র মুছিয়া দিয়া তাহাকে সে-সুখেও বঞ্চিত করিয়াছে। অন্তরে-অন্তরে এই যে নিবিড় বন্ধন—ইহা কি আর কোথাও দেখিয়াছি? প্রিয়ার যাহা প্রিয় বস্তু, তাহাও স্মরণ করিয়া সে কত আনন্দই লাভ করে! তাহারও সহিত যে প্রিয়ার সম্বন্ধ বড়ই নিবিড়। তাই ত যক্ষ মেঘকে বলিল—সখে, কনক-কদলীতরুবেষ্টিত ক্রীড়া-শৈলটি আমার গৃহিণীর বড়ই প্রিয়, তাই তাহাকে স্মরণ করি। প্রিয়া এখন কত দূরদেশে অবস্থান করিতেছে, মিলন হওয়া এখন ত সম্ভবপর নয়। তবু যে-বায়ু দাক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়, সেই বায়ু হয় ত তাহার প্রেমাস্পদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে—ইহা ভাবিয়া হতভাগ্য যক্ষ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রিয়ার মিলন-সুখ কতকটা অনুভব করিয়া থাকে। মেঘকে সে তাই বলিয়া দিল—হে মেঘ, তুমি আমার প্রিয়াকে কহিও—

"আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্ব্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।"

প্রিয়া তাহার নিকট কতই সৌন্দর্য্যময়ী! প্রিয়ার প্রতি গভীর অনুরাগই তাহার পত্নীর সৌন্দর্য্যকে তাহার নিকট এত অধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রকৃতির প্রতি-বস্তুর অনন্ত সৌন্দর্য্য সে তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কোনটির মধ্যেই ত সে তাহার পত্নীর পূর্ণ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিল না! প্রকৃতির রূপের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া গেল, তবু দয়িতার সৌন্দর্য্যের সমতা সে কোন বস্তুতেই দেখিতে পাইল না। সুতরাং পত্নীর পূর্ণ সৌন্দর্য্য উপভোগের সাধও তাহার মিটিল না। অগত্যা প্রিয়ঙ্গুলতায় শরীরের, হরিণীর চঞ্চল দৃষ্টিতে প্রিয়ার দর্শনের, ময়ুর-পুচ্ছে তাহার কেশরাশির, এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নদীতরঙ্গে প্রিয়ার ভ্রূভঙ্গীর সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া তাহাকে নিরস্ত হইতে হইল। যক্ষ তাই না বলিয়া পারিল না যে, বিধাতার বহুযত্নকৃত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রথম নিদর্শন—তাহার দয়িতার অনবদ্য দেহ-কান্তি।—

"তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।"

কেবল যক্ষই যে তাহার প্রিয়ার জন্য ব্যাকুল, এরূপ নহে, সে উত্তমরূপেই জানে—তাহার প্রিয়াও তাহার জন্য সমভাবেই ব্যাকুল। সে বলিল,—হে মেঘ, তুমি দেখিবে, আমার বিরহে কাতর হইয়া আমার প্রিয়া অবিরত অশ্রুপাত করিতেছে, তাই তাহার নয়ন-যুগল স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। যক্ষ-পত্নীর মর্ম্মবেদনা বৈষ্ণব কবির কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে,—

"হরি গেও মধুপুরি হাম একাকিনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি দিবস রজনী!
নিঁদ নাহি আওয়ে শয়ন নাহি ভায়
বরিখ অধিক ভেল নিশি না পোহায়।"
—বিদ্যাপতি।

হে মেঘ, আমার প্রিয়া মদ্‌গতচিত্তা। তুমি দেখিবে যে, সে আমার প্রতীক্ষায় হয় ত দিন গণনা করিতেছে, অথবা হয় ত কল্পনায় আমার সঙ্গ-সুখ অনুভব করিতেছে। আমার বিরহ-বেদনায় আমার পত্নী বড়ই কাতরা। তাই তাহার চক্ষে নিদ্রা নাই। বিরহ-শয়নে উষ্ণাশ্রুমোচনে সে দীর্ঘরাত্রি যাপন করিতেছে। তবু সে নিদ্রা-কামনা করে। নিদ্রার অবকাশে স্বপ্নযোগেও যদি আমার মিলন ঘটে!—

"মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোঽপীতি নিদ্রাম্
আকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্।"

পত্নীর প্রতি তাহার অনুরাগ কতই গভীর! আত্মদুঃখ বিস্মৃত হইয়া সে পত্নীকে সান্ত্বনা দিল—প্রিয়ে, তুমি কাতর হইও না। চারি মাস পরে আমরা উভয়ে আবার মিলিত হইব। বিরহকালে আমরা ভাবী মিলন-সুখ যেমন ভাবে কল্পনা করিয়াছিলাম, বিরহাবসানে ঠিক সেই ভাবেই আমরা মিলনসুখ অনুভব করিব। শারদচন্দ্র-করোজ্জ্বল নিশা আমাদের মিলনানন্দকে পূর্ণতা দান করিবে।—প্রিয়ার প্রতি এই গভীর ভালবাসা, প্রিয়ার কল্যাণের জন্য এমন ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, প্রিয়ার সৌন্দর্য্যের জন্য এতখানি গর্ব্ব, এবং প্রিয়ার জন্য এমন করিয়া আত্মবিলোপ—মেঘদূত কাব্যে যেমন উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন ত আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না!

তার পর বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনা। এই কাব্যে মহাকবি অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতি যে জড়পদার্থ মাত্র—ইহা বুঝিবার বিন্দুমাত্র অবসরও কোথাও তিনি প্রদান করেন নাই। কাব্যখানির সর্ব্বত্র প্রকৃতি সজীব, এবং তাহার সর্ব্বত্র মানবের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি উচ্ছ্বসিত। কবি ত প্রথমে বলিয়াই দিলেন যে, "ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ।" কিন্তু বিশেষ ভাবে ইহা বলিয়া দিয়াও এমন নৈপুণ্যের সহিত তিনি মেঘের বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, চেতনাচেতন বোধে স্বভাবতঃ অজ্ঞ, কামার্ত্ত যক্ষই কেবল নয়, আমরাও ভুলিয়া যাই যে, মেঘ যথার্থই চেতন পদার্থ নয়, সে ধূম, জ্যোতি, সলিল ও মরুতেরই সমষ্টি মাত্র। সারা প্রকৃতিই যেন সহানুভূতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া যক্ষের উপকারার্থ আত্মনিয়োগ করিয়াছে। মানব-হৃদয় সকল সময়েই যে প্রকৃতি হইতে আনন্দলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতির সহিত মানবচিত্তের সম্বন্ধ যে নিতান্তই ঘনিষ্ঠ, কবি মেঘদূতে সুষ্ঠুভাবে তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মেঘদূত কাব্যে মহাকবি জড় প্রকৃতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন

যক্ষের বিরহকে উপলক্ষমাত্র করিয়া কবি এই কাব্যে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ের কামনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রণয়িযুগলের পরস্পরের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ এবং সেই অনুরাগের জন্যই পরস্পরের মধ্যে উভয়ের আত্মবিলোপ—ইহার মূল্য যে সামান্য নয়, কবি তাহাই প্রদর্শন করিলেন। বিরহে প্রণয় প্রগাঢ় হয়, এবং তাহা অধিকতর বিশুদ্ধ হইয়া প্রিয়সমাগমকে মধুরতর করিয়া তুলে। কর্ত্তব্যচ্যুতির জন্য যক্ষকে অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু এই কর্ত্তব্যচ্যুতির অন্তরালে তাহার চিত্তে যে সুকুমার বৃত্তিটুকু অবস্থান করিতেছিল, সেই অনুরাগই তাহাকে স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। দুঃসহ গ্রীষ্মাবসানে আজও আষাঢ়ের পুণ্যময় প্রথম দিবসে আকাশে ধূম্রধূসর নব জলধরের সজলকান্তি সন্দর্শন করিয়া আমরা বিরহী-যক্ষকে স্মরণ করি, এবং সেই হতভাগ্যের প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন প্রেমের পূজারী মহাকবি কালিদাসের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (এম্‌-এ)।

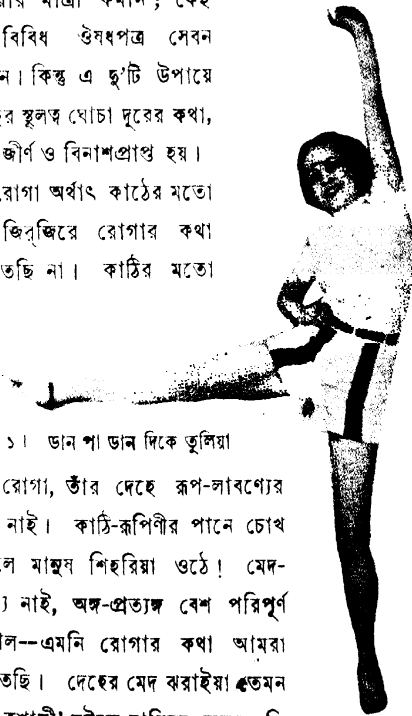


তন্বী শ্যামা

মোটা হওয়া যে শুধু অস্বাস্থ্যের লক্ষণ, তা নয়! মোটা হইলে মানুষের অস্বস্তি-অস্বাচ্ছন্দ্যের সীমা থাকে না। মেয়েরা মোটা হইতে চান্ না ; তার কারণ, মোটার সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সম্পর্ক—সাপ ও বেজির মতো !

মোটাদের মধ্যে অনেকে রোগা হইবার বাসনায় নানা জনের পরামর্শে নানা প্রক্রিয়া সাধন করেন। কেহ খাওয়ার মাত্রা কমান ; কেহ বা বিবিধ ঔষধপত্র সেবন করেন। কিন্তু এ দু'টি উপায়ে দেহের স্থূলত্ব ঘোচা দূরের কথা, দেহ জীর্ণ ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

রোগা অর্থাৎ কাঠের মতো হাড়-জির্‌জিরে রোগার কথা বলিতেছি না। কাঠির মতো



১। ডান পা ডান দিকে তুলিয়া

যিনি রোগা, তাঁর দেহে রূপ-লাবণ্যের স্থান নাই। কাঠি-রূপিণীর পানে চোখ পড়িলে মানুষ শিহরিয়া ওঠে! মেদ-বাহুল্য নাই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশ পরিপূর্ণ নিটোল—এমনি রোগার কথা আমরা বলিতেছি। দেহের মেদ ঝরাইয়া তেমন 'সুশ্রী কৃশাঙ্গী' হইতে চাহিলে কতকগুলি বিশেষ ব্যায়াম-বিধি পালন করিতে হয় ; সেই সঙ্গে আহারে-বিহারে খানিকটা নিয়ম-কানুন মানিয়া চলার প্রয়োজন আছে।

মেয়েদের মধ্যে যাঁদের দেহ ফাঁপিয়া ফুটবলের বপু ধারণ করে, লজ্জায় যেন তাঁরা মরিয়া যান! তেমন বর্ত্তুল-রূপিণীকে দেখিলে মানুষ প্রকাশ্যে না হাসুক, মন কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভরিয়া হাস্য-তরঙ্গে উদ্বেল চঞ্চল হইয়া ওঠে! মেয়ে-সমাজে স্থূলাঙ্গী প্রায় জাতি-চ্যুতার সামিল!

রোগা হইবার জন্য যে বিশেষ ব্যায়ামের প্রয়োজন, পূর্ব্বে সেই ব্যায়াম-প্রণালীর কথা বলি।

১। মেঝেয় শুইয়া পাঁচ-সাত মিনিট কাল অবিরাম গড়াগড়ি দিন। তার পর দু'হাতে দেহের ভর রাখিয়া ঈষৎ ঝুলন্ত ভাবে ঘরময় পাঁচ-সাত মিনিট পরিক্রমণ করুন।

২। সিধা খাড়া ভাবে দাঁড়াইয়া ১ নং ছবির ভঙ্গীতে ডান-পা তুলিয়া ডান-দিকে প্রসারিত করিয়া দিন ; সেই সঙ্গে অমনি বাঁ-হাত উর্দ্ধে তুলুন। তার পর ঠিক এমনি ভাবেই বাঁ-পা তুলিয়া বাঁ-দিকে প্রসারিত করুন, সঙ্গে সঙ্গে ডান-হাত উর্দ্ধে তুলুন। এক-হাত যখন উর্দ্ধে তুলিবেন, তখন অপর হাত থাকিবে কোমরে (১ নং ছবি দেখুন)।



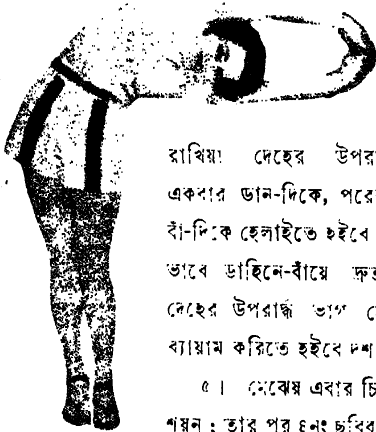
২। কোমর হইতে নুইয়া

এ ব্যায়াম বেশ দ্রুত-তালে দশ-মিনিট কাল করা চাই।

৩। এবার সিধা খাড়া দাঁড়ান। তার পর দু'পা একত্র সংলগ্ন করিয়া কোমর হইতে দেহের উপরার্দ্ধ নোয়াইয়া দুই হাত দিয়া দুই পায়ের হাঁটু, পরে পায়ের আঙুল-গুলি স্পর্শ করুন (২নং ছবি)। তার পর আবার সিধা খাড়া দাঁড়ান। সিধা দাঁড়াইয়া কোমর নোয়ানো, পরক্ষণে আবার সিধা

দাঁড়ানো—এ ব্যায়ামও বেশ দ্রুত-তালে দশ-মিনিট করা চাই।

৪। এবার সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া দু'পা সংলগ্ন করিয়া দু'হাত মাথার উপরে তুলিয়া অঞ্জলিবদ্ধ করুন। এবার দু'পা (৩নং ছবি দেখুন) সংলগ্ন এবং দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ রাখিয়া দেহের উপরার্দ্ধ-ভাগ একবার ডান-দিকে, পরের বার বাঁ-দিকে হেলাইতে হইবে। এই-ভাবে ডাহিনে-বাঁয়ে দ্রুত ছন্দে দেহের উপরার্দ্ধ ভাগ হেলাইয়া ব্যায়াম করিতে হইবে দশ মিনিট।



৩। দু'হাত দু'পা এক করিয়া

৫। মেঝেয় এবার চিৎ হইয়া শয়ন; তার পর ৫নং ছবির ভঙ্গীতে কোমর মুড়িয়া কোমর হইতে দুই পা সমগ্র ভাবে মাথার উপর তুলিতে হইবে। তুলিয়া পরক্ষণে আবার চিৎ হইয়া শয়ান-ভাব। এ ব্যায়ামও দ্রুত-তালে অন্ততঃ-পক্ষে পাঁচ-মিনিট করিতে হইবে।

এ কয়টি ব্যায়াম-সাধনায় স্থূলত্ব ঘুচিয়া সুস্থ নিটোল ছাঁদে ভরিয়া দেহ কমনীয় হইবে।



৫। মেঝেয় বসিয়া দু'হাত দু'পা

এ কয়টি ব্যায়াম ছাড়া আরো ক'টি বিষয়ে অবহিত হইবেন। মেঝেয় তাস ফেলিয়া দিয়া ঝুঁকিয়া একখানি একখানি করিয়া সেই তাস তুলিবেন। মাথার উপর ভারী বই রাখিয়া দেহকে সিধা খাড়া করিয়া সিঁড়িতে দু'-চার বার উঠা-নামা করুন।

এ কয়টি ব্যায়ামের উপর বহু বিশেষজ্ঞ আরো কয়েকটি প্রণালীর কথা বলেন।

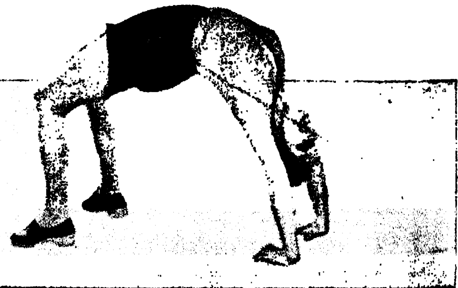
৫নং ছবির ভঙ্গীতে মেঝেয় বসিয়া দু'পা ও দু'হাত সামনে প্রসারিত করিয়া সামনে-পিছনে দেহখানিকে বেশ ঘন-ঘন দুলাইতে হইবে। আট-দশ মিনিট-কাল এ ব্যায়াম করিবেন।



৪। শুইয়া কোমর মুড়িয়া

তার পর ৬নং ছবির ভঙ্গীতে দু'পা এবং দু'হাতের উপর দেহের ভর রাখিয়া ধনুর্ভঙ্গিমা-ধারণ। এ ভাবে দু'-চার মিনিট থাকিবার পর দু'হাত তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। দু'-তিন বার মাত্র এ ব্যায়াম-সাধন করিলেই চলিবে।

এবার সিধা খাড়া দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া ৭নং ছবির ভঙ্গীতে কোমরে দু'হাত রাখিয়া একবার ডান-পা তুলিয়া, পরক্ষণে বাঁ-পা তুলিয়া নৃত্য-দোদুল ভঙ্গীতে দ্রুতভাবে



৬। ধনুকের ভঙ্গী



৭। নৃত্য-দোদুল ভঙ্গী　　৮। "আনি-বানি মানি না"　　৯। ডান হাত দিয়া ডান পা স্পর্শ

ঘরময় পাঁচ-মিনিট পায়চারি করিয়া বেড়ান। তার পর ৮নং ছবির ভঙ্গীতে দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করিয়া বেশ দ্রুত-তালে সেই ছেলেবেলাকার "আনি-বানি মানি না, পরের ছেলে জানি না" খেলার ধরণে পাঁচ-মিনিট চক্রাকারে ঘুরুন।

তার পর ৯নং ছবির ভঙ্গীতে সিধা দাঁড়ান। দাঁড়াই-বার পর কোমর হইতে উপরার্দ্ধ-দেহ নোয়াইয়া ডান-হাত দিয়া ডান-পা স্পর্শ করুন। এ সময় বাঁ-হাতখানি ৯নং ছবির মতো উর্দ্ধে প্রসারিত থাকিবে। তার পর ডান-হাত উর্দ্ধে তুলিয়া বাঁ-হাত দিয়া বাঁ-পা স্পর্শ করিবেন। এ ব্যায়াম পর্য্যায়ক্রমে দশ-মিনিট করা চাই।

এ ব্যায়াম-সাধনায় স্থূলাঙ্গীর মেদ ঝরিবে; তিনি কৃশ-তনুর অধিকারিণী হইবেন।

খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বলেন, চিকিৎ-সকের উপদেশ লইবেন। কারণ, সকলের দেহে মেদ-বৃদ্ধির কারণ এক নয়। বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য চাই বিভিন্ন ব্যবস্থা।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ-ব্যতীত যার-তার কথায় খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিলে বিপদ ঘটিতে পারে, এ কথা মনে রাখিবেন।

—

অনুদ্বিগ্ন মন

মন যদি দুঃখ-দুশ্চিন্তায় ভারী হয়ে থাকে, দেহকে তাহলে সুস্থ রাখা যায় না! কথাটা খুবই পুরোনো; তবু কঠোর সত্য, তাই এ-কথা বার-বার বলতে হয়।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙালী আর এখনকার বাঙালী—এ-দু'য়ের দেহ-মনের তত্ত্ব নিলে স্বীকার করতেই হবে যে, সেকালের বাঙালীর চেয়ে একালের বাঙালী নিজেদের অনেক-বেশী সভ্য এবং শিক্ষিত বলে গর্ব্ব বোধ করলেও একালের বাঙালীর দেহ-মনের স্বাস্থ্য সেকালের চেয়ে দিন-দিন জীর্ণ হচ্ছে। শক্তি-সামর্থ্যেও সেকালের বাঙালীর সঙ্গে একালের বাঙালী টক্কর দিতে পারেন না। মেয়েদের লাবণ্য-শ্রী এবং কোমলতাও ঝরে যাচ্ছে। একালের মেয়েদের স্বাস্থ্য ভঙ্গুর এবং তাঁদের দেহ-মন খানিকটা পুরুষালি-ছাঁদে গড়ে উঠছে।

শ্রীহীন এই পুরুষালি-ছাঁদ মেয়েদের পক্ষে দারুণ

দুর্ভাগ্য বলে মনে করি। এই যে অস্বাস্থ্য এবং শ্রী-হীনতা এ-যুগকে বিপর্য্যস্ত করছে, এর কারণ আমাদের জীবন এখন সমস্যা-জটিল হয়ে উঠছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের উদ্বেগ-দুশ্চিন্তাও অনেকখানি বেড়েছে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, কেন এ দুশ্চিন্তা? দুশ্চিন্তায় কোনো দিন মানুষের দুঃখ-ভার এতটুকু লঘু হয়নি; হতে পারে না। দুঃখ তাতে আরো বাড়ে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, Worry is a luxury we cannot afford.

দুশ্চিন্তা-উদ্বেগে মানুষের মন দুর্ব্বল হয়, তার চিন্তা-শক্তি খর্ব্ব হয়; কাজ করবার শক্তি লোপ পায়। সুতরাং দুঃখ-অভাব যতই পীড়ন করুক, দুশ্চিন্তা আমাদের ত্যাগ করতেই হবে।

এই উদ্বেগ অর্থাৎ worry কথার অর্থ, দুঃখ নিয়ে দুশ্চিন্তায় মনকে অতিমাত্রায় খারাপ করা। মন খারাপ করে বসে থাকলে দুঃখ কোনো দিন ঘুচবে না; মাঝে থেকে কর্ম্মশক্তি খর্ব্ব হলে দুঃখ-মোচনের উপায় নির্দ্ধারণ করতে পারবো না!

ধরুন, মেয়ে ডাগর হয়েছে, তার বিয়ে দিতে হবে; অথচ পাত্রপক্ষ অনেক টাকা চায়; সে টাকা দেবার সামর্থ্য আমার নেই! এ অবস্থায় মন খারাপ করে যদি মুখ-গোঁজ করে বসে থাকি, তাহলে কন্যাদায়-মোচনের জন্য হাতে পয়সা এসে তো পৌঁছুবেই না, অথচ এ পাত্র ছেড়ে নাগাল-পাই-এমন-পাত্র সংগ্রহ করাও সম্ভব হবে না। সুতরাং উদ্বেগে মন খারাপ করে লাভ কি? মন খারাপ করে থাকার দরুণ অশান্তির ভারে বিব্রত হতে হবে।

উদ্বেগ আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষ! মনে উদ্বেগ থাকলে আমরা না পারি খেতে, না পারি ঘুমোতে। সারা পৃথিবী অন্ধকার দেখি। এ অবস্থায় পৃথিবীতে বাস করা চলে না। উদ্বেগে-দুশ্চিন্তায় কেউ কোনো দিন কোনো-কিছু লাভ করতে পারেনি। দুশ্চিন্তায় কার্য্য-হানি সুনিশ্চিত।

ট্রেনে চড়ে পশ্চিমে হাওয়া খেতে যাবো। ছেলে-মেয়ে, লগেজ, তার উপর ষ্টেশনে লোকের ভিড়, এ সব ভেবে দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়ে যদি বলি, ও-ভিড়ে কি করে যাবো? লগেজ-পত্র যদি হারায়? অজানা পশ্চিমে ছেলেমেয়ের যদি অসুখ করে? এ-সব ভাবনায় যদি মন-খারাপ করে উতলা হই, তাহলে পশ্চিমে হাওয় খেতে যাওয়া কোনো দিন হতে পারে না।

সাঁতার শিখতে চাই, সেজন্য ডাঙ্গায় বসে যদি ডুবে যাবার ভাবনায় আকুল হই, তাহলে কেউ সাঁতার শিখতে পারবো না! সব-কাজেই তৎপরতা চাই। মনে দুশ্চিন্তা পুষলে কোনো কাজ করা যাবে না।

তার উপর আজ আবার নূতন দুশ্চিন্তা দেখা দেছে সকালে খবরের কাগজে এই যুদ্ধের খবর আর পলিটিক্সের চালবাজী প্রভৃতি। যুদ্ধ হচ্ছে, জানি; সে-জন্য নানা দিকে নানা অসুবিধা,—কিন্তু ভেবে সে-অসুবিধা দূর করতে পারবো কি? অতএব, কোথায় কবে কি বিপদ ঘটবে বা ঘটতে পারে, তাই ভেবে আজ থেকে যদি দুশ্চিন্তাভরে আহার-নিদ্রা বিসর্জ্জন দি, তাহলে জীবনকে রক্ষা করবো কি করে?

বাঁচার মতো যদি বাঁচতে চান্, কোনো বিপদ-আপদে, অভাবে-দুঃখে, রোগে-শোকে উদ্বিগ্ন কাতর হলে চলবে না। মনকে সচেতন করে এ-উদ্বেগের উর্দ্ধে তুলতে হবে। তাতে দুঃখ না ঘুচুক, দেখবেন, অশান্তি-অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে মন সহজ-স্বচ্ছন্দ থাকবে; এবং মনের এ স্বাচ্ছন্দ্য-হেতু সংসারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারবেন। সুস্থ মনে অভাব-মোচনের উপায় স্থির করে, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়াও সম্ভব হবে।

আমাদের সব রকম অভাব-অভিযোগেই এ কথা খাটে। মাথার উপর আকাশ যদি ভেঙ্গে পড়ে, পড়ুক! সে-জন্য আগে থেকে দুশ্চিন্তায় কাঁটা হয়ে আকাশের পড়া বন্ধ করতে পারবো না! সুস্থ মনে বরং পড়া-আকাশের আঘাত থেকে রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হবে। না হলে ভয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাকা, আর বেঁচে থাকা—এ কি সমান?

জীবন্মৃত বললুম এই কারণে—মনে দুশ্চিন্তার ভার থাকলে দেহের স্বাস্থ্য খারাপ হবে। মাথা-ধরা, জ্বর, অজীর্ণতা—সর্ব্ব-রোগ ঐ দুশ্চিন্তার রন্ধ্রপথে শনির মতো দেহে ঢুকে মানুষকে অমানুষ জড় করে তুলবে, এবং মৃত্যুও আসতে দেরী করবে না।



বৈকালের দিকে সুধীশ গায়ত্রীকে দেখিতে গেল। দ্বিপ্রহরে হিমানীর সহিত আলোচনার ধাক্কা সামলাইয়া সে গায়ত্রীকে দেখিতে যাইতে পারে নাই।

সন্তর্পণে কপাট ঠেলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ছবি গায়ত্রীর মাথার কাছে বসিয়া আছে। সুধীশকে দেখিয়া সে নিঃশব্দে নামিয়া-আসিয়া সুধীশের নিকটে গিয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, পিসিমার বড্ড জ্বর হ'য়েছে বাবা!

আজ এ পিতৃ-সম্বোধন সুধীশকে তৃপ্তির পরিবর্তে যেন কশাঘাত করিল। হিমানীর সকল কথা বিদ্যুৎ-চমকের মত তাহার মনে ঝলকিয়া উঠিল। সে অবরুদ্ধ কণ্ঠোচ্চারিত স্বরে বলিল,—অসুখের কাছে তোমায় আসতে বারণ করেছিলুম না? তুমি বড্ড দুষ্টু হ'য়েছ! যাও, আমি তোমার বাবা নই।—কথাটা এক-নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেও, সুধীশের অন্তর যেন কিছুতেই তাহা উচ্চারণ করিতে পারিল না। ছবির মুখে গোপনে পিতৃ-সম্বোধন শুনিয়া তাহার উপর সুধীশের যেন একটা দাবী জন্মিয়া গিয়াছিল, তাহার সারা-চিত্ত জুড়াইয়া যাইত—এই কাল্পনিক পিতৃত্বের মোহে!

ছবি আর চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না, নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সুধীশ তাহার গমনশীল মূর্তির পানে বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; তাহার পর গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মন্থরগতিতে গায়ত্রীর সমীপবর্তী হইল।

গায়ত্রী প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। চক্ষু দু'টি মুদ্রিত, মুখমণ্ডল আরক্তিম, কপোলের উপর দু'টি শিরা জ্বরের তাড়নায় দপ্-দপ্ করিতেছিল।

সুধীশ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। শিশুর মত পবিত্র সুন্দর মুখ, যেন সারল্যের আধার। হিমানী বলিয়াছে,—গায়ত্রী দরিদ্রের ঘরে কোহিনুর, ইহার গুণের তুলনা নাই! সুধীশের বক্ষে এ কৌস্তুভমণি পরাইয়া দিতে হিমানীর অসীম আগ্রহ!

...কিন্তু গায়ত্রী যদি নারীরত্নই হয়, তবে সুধীশের কি তাহাকে পাইবার অধিকার আছে? একাধিক পুরুষের চিন্তাও যদি নারীর পক্ষে অপরাধ হয়, তবে দুই বার দুই নারীতে পূর্ণ আসক্তি কি তাহাকে গায়ত্রীর পক্ষে অনুপযুক্ত করিয়া তুলে নাই?...

অন্যমনস্ক হইয়া সে কিয়ৎকাল জানালার বাহিরে চাহিয়া থাকিবার পর ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে গায়ত্রীর ললাটে হাত রাখিয়া গাত্রোত্তাপ পরীক্ষা করিল। গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে! সুধীশ থার্ম্মামিটর বাহির করিতেছিল, সহসা প্রবল কাশির শব্দে চমকিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল, গায়ত্রী উঠিয়া বসিয়াছে, সে কাশিতেছে; এমন প্রচণ্ড কাশি যে—দেখিয়া মনে হইতেছে, বুঝি তাহার বুকের শিরাগুলি ছিঁড়িয়া যাইতেছে!

সুধীশ ত্রস্তে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বাঁ হাত দিয়া তাহার ললাট চাপিয়া ধরিয়া ডান হাত তাহার পিঠে বুলাইতে লাগিল। গায়ত্রীর যখন কাশি থামিল, তখন তাহার যেন অর্দ্ধমৃত অবস্থা, সে হুমড়ি-খাইয়া বালিশের উপর পড়িয়া গেল।

সুধীশ সযত্নে তাহাকে তুলিয়া ভাল করিয়া শোয়াইল। গায়ত্রীর জলভারাকুল আরক্ত নয়নের পানে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল,—এই ভাবে সারা-দিনই কাশছেন?

গায়ত্রী দম টানিতে টানিতে কষ্টোচ্চারিত স্বরে বলিল,—মধ্যে মধ্যে এই রকম হচ্ছে।—সে উঠিয়া বসিল।

সুধীশ প্রশ্ন করিল,—আবার উঠলেন কেন?

গায়ত্রী কুণ্ঠার সহিত বলিল,—থুথু ফেলব।

সুধীশ বলিল, সে জন্যে উঠতে হবে না। দুয়ারের নিকট যদুকে দেখিয়া ডাকিয়া বলিল,—হাঁ রে, পিক-দান আছে?

যদু বলিল,—ও মা-ঠাকরুণের ঘরে আছে।

সুধীশ বলিল,—সেটা থাক। আর যদি না থাকে, তা'হ'লে একটা এনামেলের গামলা কি বাটি দিয়ে যা। সকাল থেকে এঁকে কি খেতে দিয়েছিস?

যদু মাথা চুলকাইয়া বলিল,—আপনি ত কিছু বলে যাননি, আর মা-ঠাকরুণও কিছু খেতে চাইলেন না—

সুধীশ বলিল,—তোর বুদ্ধি আর যুক্তি দুইয়েরই তারিফ করতে হয়! যা, এই লেখাটা কম্পাউণ্ডার বাবুকে দিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে আয়। তোকে আর বেশী বুদ্ধি খরচ করতে হবে না, ষ্টোভটা এ ঘরে রেখে যা।

যদু লেখাটা লইয়া চলিয়া গেল, এবং অনতিবিলম্বে একটা এনামেলের গামলা আনিয়া সুধীশের হাতে দিল।

সুধীশ সেটা গায়ত্রীর মুখের কাছে ধরিল। গায়ত্রী হাত বাড়াইয়া লইতে গেলে সুধীশ বলিল,—থাক না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমরা কি কিছুই সেবা করতে পারি না? শুয়ে পড়ুন। সকাল থেকে তো উপোস করেই রইলেন।

গায়ত্রী শুইয়া-পড়িয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল,—না, চা খেয়েছিলুম। আর খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

সুধীশ থার্ম্মামিটরটা তাহার হাতে দিয়া বলিল,—জ্বরটা দেখুন তো।

সুধীশ জ্বর দেখিল, প্রায় ১০৩। তাহার মুখে চিন্তার ছায়া ঘনায়মান হইয়া উঠিল। রামু এই সময় তালের মিছরি ও হরলিক্স দিয়া গেল। সুধীশ স্বয়ং হরলিক্স প্রস্তুত করিয়া গায়ত্রীকে খাইতে দিল। তাহার পর তাহার রুক্ষ আলুথালু চুলগুলি মুখের পাশে সরাইয়া দিয়া বলিল,—একটা ওষুধ এখুনি রামু দিয়ে যাবে, ট্যাবলেট একটা ক'রে মুখে রাখবেন, কাশিটা কম থাকবে।

গায়ত্রী ঘাড় হেলাইয়া স্বীকার করিল।

সুধীশ বলিল,—রজনীর মাকে বলছি, আপনার কাছে বসে থাকবে। আপনি যেন উঠবেন না।

গায়ত্রী সলজ্জ হাসিল, উত্তর দিল না।

সুধীশ জিজ্ঞাসা করিল,—মাথা-ব্যথা কচ্ছে?

গায়ত্রী আরক্ত-মুখে চুপ করিয়া রহিল। অনাত্মীয়, অপরিচিত সুধীশ তাহাদের জন্য কি বিব্রতই হইয়াছে, ভাবিয়া তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। কুণ্ঠিত হাসির সহিত মৃদু-কণ্ঠে বলিল,—কাল যদি যেতে দিতে রাজী হ'তেন, তা'হ'লে আজ আর এ ঝঞ্চাট পোয়াতে হ'ত না।

সুধীশ হাসিতে লাগিল, বলিল,—লাভ হ'ত এই যে, টানাপোড়েন করতে হ'ত। এ নিজের ঘরেই রোগী দেখা চলছে।—সে শয্যার কাছে দাঁড়াইয়া গায়ত্রীর কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

গায়ত্রীর সঙ্কোচ হইতেছিল, তথাপি সরিয়া-গিয়া একটু স্থান করিয়া দিয়া বলিল,—বসুন না।

সুধীশ বসিল।

রাত্রে সে রামুকে বলিল,—কম্পাউণ্ডার বাবু দু'খানা কম্বল আর বালিশ দিয়ে যাবেন, নীচে বসবার ঘরের পাশে আমার একটা বিছানা ক'রে রাখিস। আমি নীচে শোব।—কিন্তু আহারাদির পর গায়ত্রীকে দেখিতে আসিয়া সুধীশ বুঝিল, আজ আর ঘুমাইবার আশা নাই। গায়ত্রীর জ্বর বিন্দুমাত্র কমে নাই, সেই প্রচণ্ড কাশি তাহাকে যেন ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছিল। সুধীশ রজনীর মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—মালিশটা করেছিলে?—সে স্বীকার করিল। সুধীশ বলিল,—আচ্ছা, তুমি যাও, ও-ঘরে থাক; একটু সতর্ক হ'য়ে ঘুমিও, যেন রোগী উঠতে গিয়ে পড়ে-টড়ে না যান।

রাত্রে নার্স থাকিবার ব্যবস্থা করে নাই। মিস্ হাজরা সন্ধ্যাতেই চলিয়া গিয়াছেন। রজনীর মা বলিল,—আমি মিছরীর জল ক'রে দিদিমণিকে খাওয়ার জন্যে অনেক জিদ করেছি, উনি খাননি। ঢাকা দিয়ে রেখেছি।

সুধীশ ড্রেসিং-গাউনের রেশমী দড়িটা কোমরে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল,—আচ্ছা।

রজনীর মা কপাট ভেজাইয়া-দিয়া চলিয়া গেল।

সুধীশ বাটির গায়ে হাত দিয়া দেখিল, উহা গরম আছে, সে সেটা লইয়া গায়ত্রীর কাছে গিয়া বসিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাঁ হাতে তাহার মাথাটা একটু নাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল,—গায়ত্রী!

গায়ত্রী সাড়া দিল না; মনে হইল, জ্বরে সে আচ্ছন্ন

হইয়া আছে। পুনরায় নাড়া দিতে সে আরক্ত নয়ন মেলিল, কিন্তু চাহনি কেমন যেন একটু অর্থহীন। সুধীশ বলিল,—মিছরির জলটা খেয়ে ফেলুন।

গায়ত্রী নির্নিমেষ দৃষ্টি সুধীশের মুখে নিবদ্ধ করিয়া রহিল, সাড়া দিল না।

সুধীশ তাহার মুখপানে চাহিয়া কেমন একটা মমতা-বোধ করিল; সস্নেহ কণ্ঠে বলিল,—লক্ষ্মী মেয়ের মত এটা খেয়ে ফেলুন তো।

গায়ত্রী নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল; সে মুখ খুলিলে মিছরির জল খাওয়াইয়া সুধীশ ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। সে মনে মনে হাসিল; শুভক্ষণেই আজ হিমানী গায়ত্রীর দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত করিতে চাহিল বটে! কোথা দিয়া দায়িত্ব আসিয়া তাহাকে এমন জড়াইয়া ধরিল যে, রাত্রে ঘুম বর্জ্জন করিয়া আজ তাহাকে রোগীর শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছে! আজ তো সত্যই গায়ত্রীকে এই অসুস্থ অবস্থায় দেখিতে কেহ নাই! তাই না অনাত্মীয়া যুবতীর নিরালা শয্যায় বসিয়া সে তাহার সেবা করিতেছে! ইহাকেই বলে নিয়তি!

তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল গায়ত্রীর কাশির শব্দে। কি কষ্টকর অবস্থা! মনে হইল, তাহার ফুস্‌ফুস্‌ বুঝি বা এখনই শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। সুধীশ অস্থির হইয়া তাহার পিঠে-মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আহা, কিছুতে কি কষ্ট একটু কমে না? সে তোয়ালে দিয়া তাহার ঘাম মুছাইতে লাগিল।

কাশি থামিলে হাঁপানির টানের মত দম টানিতে টানিতে শরবিদ্ধ পক্ষিণীর মত সে লুটাইয়া পড়িল সুধীশের জানুর উপর।

করুণায় সুধীশ দ্রবীভূত হইয়া গেল; সে দুই হাতে সযত্নে গায়ত্রীকে তুলিয়া শোয়াইয়া দিল, গায়ে ভাল করিয়া আচ্ছাদন দিল, জিজ্ঞাসা করিল,—শীত কচ্ছে? লেপের ওপর আর কিছু ঢাকা দেব?

গায়ত্রী নতনেত্রে বলিল,—দিন।

সুধীশ নীচে হইতে রামুকে দিয়া কম্বল আনাইল, গায়ত্রীর গায়ে ঢাকা দিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া এক কেতলী জল বসাইয়া দিল, কি একটা ঔষধ তাহার ভিতর ঢালিয়া দিয়া চোঙ্গা-মুখে একটা নল পরাইয়া বাষ্পটা গায়ত্রীর মুখের উপর দিতে লাগিল।

গায়ত্রী আরাম পাইয়া সুস্থ হইয়া বলিল,—আমি এখন ভাল আছি, আপনি আর কষ্ট ক'রবেন না, যান, শুয়ে পড়ুন গে।

সুধীশ একটু হাসিল, উত্তর দিল না বটে, কিন্তু বিরতও হইল না।

গায়ত্রী সসঙ্কোচে বলিল,—আমি এখন বেশ ভাল আছি ডাক্তার বাবু, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমার কষ্ট কমে গেছে।

সুধীশ বলিল,—আর একটু কমলেই শুতে যাব। ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন, একটা রাত না ঘুমুলে মানুষ মরে না। অনেক নাইট-ডিউটি ক'রতে হ'য়েছে। আপনার যা কষ্ট হ'চ্ছে, দেখে কষ্ট হয়।—আর কিছুক্ষণ বাষ্প-প্রয়োগের পর সেটা সরাইয়া রাখিয়া সুধীশ উঠিয়া দাঁড়াইল। এক-হাতে ঔষধ ও এক-হাতে জল লইয়া আসিয়া বলিল,—ঘুম যখন ভেঙ্গেছে, তখন এটা খেয়ে ফেলুন।—গায়ত্রীর হাতে ঔষধ দিয়া সে তাড়াতাড়ি মেঝে হইতে পিকদানীটা তুলিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিল, বলিল,—দুটো কুলকুচো ক'রে ফেলুন, ওষুধটা বড় বিস্বাদ।

গায়ত্রী সঙ্কোচে মরিয়া গেল; লজ্জাজড়িত স্বরে বলিল,—কেন আমায় এমন ক'রে লজ্জা দিচ্ছেন? অসুখ কি কখন কারুর হয় না?

সুধীশ নিরুত্তরে হাসিল।

তাহার পর গায়ত্রী শুইলে সে পায়ের উপর কম্বল-খানা ঢাকা দিয়া ঈজিচেয়ারে গিয়া বসিল, তখন তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে।

গায়ত্রী বিব্রত হইয়া বলিল,—ব'সে রাত কাটাবেন কেন? আপনি শুয়ে পড়ুন। আমার আর কিছু কষ্ট হচ্ছে না, আমি এখুনিই ঘুমিয়ে পড়ব।

সুধীশ বলিল,—আচ্ছা, সেই ভাল, আপনি চট্‌ ক'রে লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমিয়ে পড়ুন তো। আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না।—বলিয়া সে তাহার পদ্মপত্রের মত সুগঠিত আঁখিপল্লব মুদিত করিল; এবং লক্ষ্মী মেয়ে ঘুমাইবার পূর্ব্বে সে নিজেই ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার গভীর সুপ্তিমগ্ন মুখের পানে গায়ত্রী মুগ্ধ—আবিষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

*   *   *   *

গায়ত্রীর কাশির শব্দ পাইয়া উৎকণ্ঠিতা হিমানী দেয়াল ধরিয়া সুধীশের শয়ন-কক্ষের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, সে রঙিন কাচের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কক্ষাভ্যন্তরে চাহিয়া নিস্পন্দ হইয়া দেখিতে লাগিল। ভিতরের কথা অবশ্য কিছু শুনা গেল না, কিন্তু তাহার অভাব পূর্ণ করিল দু'টি চক্ষু।

সুধীশ কি একাগ্র স্নেহে গায়ত্রীর সেবা করিতেছে !...

অথচ এই সুধীশই আজই কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে কত বেদনা জানাইয়াছিল...ফাঁসীর দড়ি...তাই বটে! ফাঁসীর দড়ি হইলে সে এমন করিয়া রাত জাগিয়া তাহার সেবা করিত কি ? যাহার প্রতি এত আসক্তি,—যাহার জন্য এত আকুলতা, তাহাকে বিবাহ করিবার নামে সুধীশ একেবারে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল !

আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য তার ছলনাময় স্বভাব !...সুধীশকে ভালবাসা যায়, বিশ্বাস করা যায় না,—তাহার মুখের কথায় ও মনে সামঞ্জস্য নাই !

—হয় তো এক জন যেমন করিয়া প্রেমের জাল পাতিয়া তাহাকে ধরিয়াছিল, তেমনই করিয়া গায়ত্রীর জন্যও ফাঁদ পাতিতেছে! আবার হয় তো তাহারই মত গায়ত্রীকেও ফাঁকি দিবে !...

কি জানি, গায়ত্রীর মনেও কোন ছাপ পড়িয়াছে কি না !...

ভাবিতে ভাবিতে সে স্থিরদৃষ্টিতে সুধীশের দিকে চাহিল। সুষুপ্ত সুধীশের দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সে মৃদু আত্মগত ভাবেই বলিল,—এত রূপ তোমার, আত্মহারা না হ'য়ে উপায় নেই...তুমি সাপের মণি, আলো দেখে যে এগিয়ে যাবে, সে-ই ঝলসে যাবে। কিন্তু তুমি একটু টলো না—আশ্চর্য্য !

এই সময় হিমানী সবিস্ময়ে দেখিল, গায়ত্রী বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে। তাহার পর সে লেপের উপর হইতে কম্বলখানা তুলিয়া নিঃশব্দ-পদে অগ্রসর হইয়া গেল, এবং অত্যন্ত লঘুহস্তে সেখানা সুধীশের গলা হইতে পা পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া এক মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

হিমানী গায়ত্রীর মুখের পানে এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। তাহার পর জ্বলন্ত শ্বাস ফেলিয়া মন্থর-পদে নিজ কক্ষাভিমুখিনী হইল।

১০

সেই দিন হইতে ছবি অপরাধীর মত দূরে দূরে থাকে, সুধীশের কাছে ঘেঁসিতেও সাহস করে না। সুধীশও গায়ত্রীকে লইয়া ব্যস্ত থাকায় তাহাদের সহিত আলাপের সুযোগ পায় নাই।

আজ গায়ত্রী একটু ভাল আছে ; সুধীশও একটু নিশ্চিন্ত আছে। গায়ত্রীর কাছে দিবসে নার্স থাকে ; রাত্রে সে নিজে থাকে। এ কয় দিন প্রায় সারা-রাত্রিই জাগিতে হইতেছিল, সে জন্য সুধীশের শরীরটাও একটু ক্লান্ত হইয়াছিল।

তাহার ঘরের পাশে একটা ছোট ছাদ আছে ; সেখানে কয়েকটা ফুলগাছ আছে, সুধীশ স্বয়ং তাহার তদারক করে। এ কয় দিনের অযত্নে গাছগুলির কি অবস্থা হইয়াছে দেখিতে আসিয়া সুধীশ দেখিল, ছবি ও মৃণা এ দিকে খেলা করিতেছে। সুধীশকে দেখিয়া ছবি অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

সে-দিনের কথা স্মরণ করিয়া সুধীশ ব্যথিত হইয়া তাহার দিকে আগাইয়া গেল ; ছবিকে বুকে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে মুখ-চুম্বন করিয়া বলিল,—ছবি বাবু, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

অভিমানে ছবির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে অশ্রুসজল মুখখানি সুধীশের স্কন্ধে ঘষিতে লাগিল।

শিশুকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া সুধীশ অন্যমনা হইল। কোমলমতি বালককে সে তাহার জীবন-উষায় মিথ্যার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছে! নিজে সে যেমন আদর্শভ্রষ্ট বিপথগামী, এই শিশুর উপরও তাহারই প্রভাব ছড়াইয়াছে। সুধীশ নিজের অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিল। হিমানী সত্যই বলিয়াছে, এ কথা ছবি-মৃণা ভুলিবে না। বড় হইয়া তাহারা হিমানীকে

কি চোখে দেখিবে ? অকারণেই যে কেহ তাহাদের পিতৃত্বের দাবী করিবার ভরসা করিতে পারে না, তাহা আজ না বুঝিলেও জ্ঞানোন্মেষের সহিত তাহারা বুঝিবে। তাহার পর যদি একটু খুঁটিয়া-খুঁটিয়া খোঁজ লয়, তবে বিগত কালের কাহিনী তাহাদের অজ্ঞাত না-ও থাকিতে পারে।

সুধীশ সারা দেহ-মনে কাঁপিয়া উঠিল। এই সমস্তার দায়টাকে এড়াইবার জন্মই হিমানী গায়ত্রীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছে। আরও আশ্চর্য্য, সেই দিন হইতেই গায়ত্রীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ অবস্থান ঘটিতেছে! পাকচক্রে এমনই দাঁড়াইল যে, পীড়িতা গায়ত্রীর কাছে তাহাকে সর্ব্বদা থাকিতে হইতেছে।

সে গায়ত্রীকে কামনা করে নাই; কিন্তু নিয়তি তাহাকে সুধীশের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে। সুধীশ জানে না, তাহার অসুস্থ দেহ-মনের উপর তাহার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে!

তাহাকে জীবনের সহিত জড়িত করিতে সুধীশের আদৌ বাসনা জাগে নাই; শুধু হিমানীর অনুরোধে সে প্রতিবাদ করিতে পারে নাই। তার জীবনধারা বাঁকা-চোরা নানা পথে, নানা আবর্ত্তের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, নানা খাতে বহিয়াছে, সে পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই,—হিমানীর সহিতও করে নাই, আবার তাহার শিশু দু'টিরও ভবিষ্যৎ জীবন অশান্তিময় করিয়া দিল।...

গায়ত্রীকে বিবাহ করিলে হিমানী যদি সুখী হয়, শান্তি পায়—সুধীশ তাই তাহা অস্বীকার করিতে পারে নাই; সে মৌন ছিল। যদি এইটুকু কার্য্যে সে হিমানীকে সুখী ও নিশ্চিন্ত করিতে পারে, তবে তাহাতে পরাঙ্মুখ হইবে কেন?...

সে মনে মনেই বলিল,—হাঁ, হিমানী ও তার ছেলে-মেয়েকে অনাহারে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচাবার জন্মে আমি গায়ত্রীকে গ্রহণ করবো—এ কাজ আমায় করতেই হবে। এ আমার দশ বছর পূর্ব্বের কৃত অপরাধের দণ্ড—এ-দণ্ড আমাকে বহন করতেই হবে!

কিন্তু তার অবচেতনা বলিতেছিল অন্যরূপ। তাহার এই সঙ্কল্পের মূলে হিমানী না থাকিলে সুধীশ ইহাতে স্বীকৃত হইত না। ইহা তাহার পূর্ব্বকৃত অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত নয়,—ইহা পরোক্ষ ভাবে হিমানীর সঙ্গলিপ্সা!

সুধীশ কিন্তু জোর করিয়া এই চিন্তাটাকে মন হইতে বিসর্জ্জন করিতে চাহিল।

সে-দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুধীশ একটা 'কল' পাইল। মোটরে যাইতে হইবে অনেক দূর, বত্রিশ মাইল,—একটা চা-বাগানে। ঘরে ফিরিতে তাহার রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। সুধীশ অনুভব করিল, রোগক্লিষ্টা গায়ত্রীর জন্য তাহার মন চঞ্চল হইয়াছে। নার্স সন্ধ্যাকালেই চলিয়া গিয়াছে, বেচারী হয় তো ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়া আছে।

গৃহে ফিরিয়া সে দেখিল, হিমানীর কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ, রাত্রি অধিক হইয়াছে, হয় তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিয়মমত আজ আর তাহার সংবাদ লওয়া হইল না। গায়ত্রীও ঘুমাইয়া থাকিবে, এইরূপ অনুমান করিয়া সুধীশ অত্যন্ত সন্তর্পণে গিয়া কপাটটা ঈষৎ খুলিল; দেখিল, গায়ত্রী ঘুমায় নাই, দুয়ারের দিকেই চাহিয়া আছে; দু'জনে চোখোচোখী হইতেই সুধীশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এখনও জেগে আছেন?

গায়ত্রীর পাণ্ডুর মুখে রক্তাভা দেখা দিল; সে ঈষৎ হাসিয়া নয়ন অবনত করিল।

সুধীশ কাছে আসিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া গায়ের তাপ পরীক্ষা করিল; তাহার পর তাহার হাত-খানি ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, এবং বলিল,—যাক্, জ্বরটা ছেড়ে গেছে। এখন কেমন বোধ কোচ্ছেন? কখন খেয়েছেন?

গায়ত্রী মৃদুকণ্ঠে বলিল,—নার্স যাবার সময় হরলিক্স খাইয়ে গেছে। আজ তো ভালই আছি। শুধু মাথাতেই আবার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।

সুধীশ বলিল,—আমি কাপড় ছেড়ে খেয়ে আসি; এসে ওষুধ দিচ্ছি।—সে চলিয়া গেল। আহারান্তে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাছে বসিল। গায়ত্রী ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল,—বারোটা বাজে, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমার এমন কিছু কষ্ট হচ্ছে না, হয় তো এখুনি ঘুমিয়ে পড়ব।

সুধীশ হস্তস্থিত টিউব হইতে মালিশের মত কি একটা পদার্থ বাহির করিয়া গায়ত্রীর কপালে ঘষিয়া দিতে

দিতে বলিল,—আমার এখনও ঘুম পায়নি। আপনি লক্ষ্মী মেয়ের মত চোখ বুজে একটু শুয়ে থাকুন দেখি, না হ'লে চোখে ঝাঁঝ লাগবে।

অগত্যা গায়ত্রী চোখ বুজিল।

পূর্ণযৌবনা গায়ত্রী অনাত্মীয় যুবকের নিকট হইতে এমন ভাবে সেবা লইতে লজ্জায়, কুণ্ঠায় মরিয়া যাইত,—তবুও অস্বীকার করিতে পারিত না, এই অনাত্মীয় যুবার সস্নেহ-স্নিগ্ধ-মৃদু স্পর্শ তাহার একান্ত বাঞ্ছনীয়, একান্ত প্রিয়। অনেক সময় ছেলেমানুষের মত তাহার এমনও মনে হইয়াছে, ভাগ্যে সুধীশের গৃহে সে অসুখে পড়িয়াছে, তাই তো সুধীশের এতখানি যত্ন—পরিচর্য্যা সে পাইতেছে।...

বাল্যকাল হইতে গায়ত্রী ক্রমাগত আঘাত পাইয়াছে। তাহার যৌবন বিকশিত হইতে পায় নাই, ভীরুর মত আত্মগোপন করিয়াছিল। এখন এই পরগৃহবাসের গ্লানির মধ্যেও তাহার যৌবন-পদ্ম রবিকরসম্পাতে হিমাড়ষ্ট শীর্ণ কুঞ্চিত দলগুলি কখন্ যে ধীরে-ধীরে বিকশিত হইয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই।

আজ অকস্মাৎ তাহার মনে হইল,—তাহার বয়স বাইশ বৎসর,—রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে তাহার পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত যৌবন-কুসুম—দেবপূজায় অর্ঘ্য হইবার যোগ্য।

সুধীশ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়াছিল, মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, গায়ত্রী!

এমন একটা অপ্রত্যাশিত মাধুর্য্য এই স্বল্প কথাটুকুর মধ্যে ছিল যে, গায়ত্রী চমকিয়া চাহিল। তাহার নামের ভিতর যে এত মধু আছে, এ কথা গায়ত্রীর অজ্ঞাত ছিল। সুধীশ কি করিয়া কথাটা বলিবে, তাহা সে পূর্ব্বে ভাবিয়া রাখে নাই; তাই অত্যন্ত ক্লান্ত কণ্ঠে কহিল,—আমায় তুমি নেবে গায়ত্রী! আমি বড় অভাগা—আমায় তোমার বুকে তুলে নেবে?

গায়ত্রী যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারিল না, শুব্ধ মূঢ় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সুধীশ আবার তেমনই ক্লান্ত স্বরে বলিল,—আমায় তুমি দয়া ক'রে নেবে কি?...

এবার গায়ত্রী কথা কহিল, মৃদুকণ্ঠে বলিল,—আপনার কথা আমি বুঝতে পাচ্ছি না!

সুধীশ আত্মনিবেদনের সুরে বলিল,—কি ক'রে তা বোঝাব?...এই ছন্নছাড়া হতভাগ্যের ব্যর্থ জীবনের ভার তুমি নিতে পারবে? তোমাকে আমার ভার আমি তুলে দিচ্ছি; তুমি এতই সহিষ্ণু যে, মনে হয়, আমার এ ভাঙ্গা-চোরা জীবনটার ভার তুমিই বয়ে বেড়াতে পারবে।

গায়ত্রীর কপোল বাহিয়া দু'টি অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। দেবতা! যে মুহূর্ত্তে সে তোমার আরতির দীপ জ্বালিয়া, অর্ঘ্যের ডালা সাজাইয়া তোমারই চরণমঞ্জির-ধ্বনি শুনিবার আশায় বসিয়া ছিল, ঠিক সেই শুভলগ্নেই তুমি আসিয়া ভক্তের কাছে আত্মনিবেদন করিলে!...

দু'জনেই একটুখানি নীরব রহিল—গায়ত্রী অসম্ভবের আনন্দে, সুধীশ উত্তরের প্রত্যাশায়।

সুধীশই প্রথমে কথা বলিল,—স্বীকার করতে কি পারবে না? অভাগার বোঝাটা যদি বড় বেশী ভারী বলেই মনে হয়, তবে লুকিও না, বলো—

গায়ত্রী তাড়াতাড়ি দুই হাত লেপের ভিতর হইতে বাহির করিয়া জোড়-করে সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলিল,—ও কথা বলবেন না, আমরা আপনার কাছে বিকিয়ে আছি!

সুধীশ তাহার যুক্তকর খুলিয়া দিতে-দিতে বলিল,—ও কৃতজ্ঞতার ঋণের কথা দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর হয় না গায়ত্রী! স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে উপকৃত আর উপকারক সম্বন্ধ থাকলে মূল সম্পর্কটা বিমিয়ে ওঠে। আমি ওটা বাদ দিয়ে তোমারই কথা ব'লতে অনুরোধ কচ্ছি, আমার সঙ্গে সমান ভাবে কথা ব'লতে পারবে না কি তুমি?

এবার গায়ত্রী সুধীশের চোখের দিকে চাহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার কুমারী-চিত্ত পুরুষের দৃষ্টির নীচে অবনত হইয়া পড়িল। তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; চোখের পাতা দু'খানি বায়ুতাড়িত বেতস-পত্রের ন্যায় থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সুধীশ বলিল,—তোমার মুখ থেকে সম্মতি না পেলে আমার চলবে না, আমি এক তিলও ভরসা পাচ্ছি না। আমি তোমার কাছে উত্তরের প্রতীক্ষা কচ্ছি, একবার চেয়ে দেখ রাণি!

গায়ত্রী চাহিতে গিয়াও পারিল না। চোখের পাতা দু'খানি তাহার কি হঠাৎ ভারী হইয়া গিয়াছে? সুধীশ উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাহার

এ প্রশ্নের সে কি উত্তর দিতে পারে? সে তো জানে, সে সুধীশের সর্ব্বাংশে অনুপযুক্ত; কিন্তু সে কথা বলিতেও লজ্জা করিতেছে, প্রগল্‌ভার মত অত কথা কি বলা যায়? গায়ত্রী সুধীশের দিকে চাহিতে গেল, কিন্তু পারিল না; মিনিট-পাঁচেক নিস্তব্ধ থাকিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া সুধীশের ডান হাতখানি লইয়া মাথায় রাখিল।

মৌখিক সম্মতির অপেক্ষা এ সম্মতি স্পষ্টতর। সুধীশ তাহার মাথাটি ধীরে-ধীরে কোলের কাছে টানিয়া লইল। মনে মনেই ভাবিল, যৌবন কি তাহার চলিয়া গিয়াছে? গায়ত্রীর এই আত্ম-নিবেদনের বিনিময়ে তাহার কিছুই কি করিবার ছিল না?

চিন্তাসূত্রের একটা টানিলে আর একটা আসে; অতীতের স্মৃতি সহসা তাহার অন্তরে উদ্বেল হইয়া উঠিল। মনে পড়িল—সে-দিনের কথা, হিমানী যে-দিন এমনই সরল বিশ্বাসে তাহাকে আত্মনিবেদন করিয়াছিল। আবার সে-দিনের কথাও মনে পড়িল—যে-দিন নেলী তাহাকে স্মরণার্থে একগোছা চুল কাটিয়া দিয়াছিল।

এই তৃতীয় দফায় গায়ত্রী···

সুধীশের মনে হইল, মেয়ে জাতটাই এমনি নির্ব্বোধ··· একটু মৌখিক আদরের বিনিময়ে ইহারা নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করে, একটুও ইতস্ততঃ করে না। পুরুষকে ইহারা অত্যন্ত বিশ্বাস করে, এবং এই বিশ্বাসই ইহাদের জীবনে অশান্তি আনিয়া দেয়।

কতক্ষণ অতীতের স্মৃতির তলায় নিমগ্ন থাকিবার পর সে গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া গায়ত্রীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইল; গায়ত্রী এতক্ষণ বোধ হয় তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, চোখোচোখী হইতেই চক্ষু নত করিল। তাহার সলজ্জ মুখখানিতে কি তৃপ্তির আভাস!

সুধীশ ধীরে-ধীরে তাহার রুক্ষ চুলগুলি পাট করিতে করিতে বলিল,—তুমি ভালো হ'য়ে ওঠো, তার পর তোমাকে অনেক কথা আমার জানাবার আছে। এখন তোমার শরীর ভাল নয়, তোমায় সব কথা বলা ঠিক হবে না—

গায়ত্রী তাহার সরম-জড়িত চক্ষু দুইটি সুধীশের মুখে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; অস্ফুট স্বরে বলিল,—কিন্তু আমারও যে বলবার কথা ছিল—

সুধীশ তাহার হাতখানি মুঠার মধ্যে লইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল,—বলো।

গায়ত্রী আস্তে-আস্তে বলিল,—আপনি আমায় যা মনে কচ্ছেন, আমি তার কিছুই নই। আমি লেখাপড়াও কিছু জানি না—

সুধীশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—তাতে কি হ'য়েছে! লেখাপড়া নিয়ে কি হবে আমার?

গায়ত্রী মৃদু কণ্ঠে বলিল, আপনি কত বিদ্বান, কত জ্ঞানবান—

সুধীশ বলিল,—জ্ঞানের চর্চ্চাটা অন্তঃপুরে নাই বা হ'ল, সে জন্যে তো সারা পৃথিবীটাই আছে; কিন্তু ভালবাসার লোক তো সর্ব্বত্র পাব না, ওটা না হয় আমার বাড়ীর মধ্যেই আটক থাক।—সে গায়ত্রীর হাতটি কোলে তুলিয়া লইল। অলঙ্কারবিহীন প্রকোষ্ঠ, শুধু দুইগাছি করিয়া সবুজ কাচের চুড়ী মণিবন্ধে শোভা পাইতেছে, তাহাতেই হাতখানির শোভা কি মনোরম। সম্পূর্ণ নিরাভরণা শ্রী, অঙ্গের কোথাও সোনা-রূপার লেশমাত্র নাই; তবু তাহাতেই তাহাকে কত সুন্দরী দেখাইতেছে! সুধীশ ধীরে-ধীরে হাতখানির উপর আঙ্গুল বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—এবার ঘুমিয়ে পড়ো, কেমন? রাত অনেক হ'য়েছে।

গায়ত্রী শান্ত ভাবে চক্ষু মুদিল।

সে ঘুমাইলে সুধীশ আলস্য ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গায়ত্রীর গায়ের ঢাকাটা ভাল করিয়া টানিয়া সমান করিয়া দিল, তাহার পর নির্নিমেষ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

কত সহজে, কত অবলীলায় গায়ত্রী আপনাকে সুধীশের হস্তে সমর্পণ করিল! অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ করিল না, দ্বিধা-সংশয়ও করিল না; নিবিড় বিশ্বাসে আপনাকে নিবেদন করিয়া দিল। যদি সে জানিত, সুধীশ কি পাষণ্ড!

সে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া গায়ত্রীর রুক্ষ চুলগুলি মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিল, তাহার পর অনুচ্চ স্বরে বলিল,—সত্যিই তুমি কোহিনুর! তোমার গুণের তুলনা নাই।

···তোমায় আমার জীবনের সঙ্গে জড়ালুম, কিন্তু সুখী ক'রতে পারব কি?···কি আছে আমার, যা দিয়ে তোমায় তৃপ্ত ক'রব!···হয় তো বা আজকের এই মোহটুকুর জন্যে এক দিন তুমি অনুতপ্ত হবে, হয় তো আক্ষেপ করবে, হয় তো আমার অবহেলায় শুকিয়ে যাবে। পবিত্র ফুল তুমি, দেবতার ভোগে লাগলে না,—লাগলে এই লক্ষ্মীছাড়ার সেবায়!···কেন আমায় ভালবাসলে—সুধীশের দীর্ঘায়ত নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু টল-টল করিতে লাগিল।

১১

গায়ত্রী সুস্থ হইয়া উঠিল।

এ কয় দিন সুধীশ আর কোন উচ্চবাচ্য করিল না। গায়ত্রীর সহিত সে এ-বিষয়ে আর কোন আলোচনাও করিল না। গায়ত্রীর প্রতি তার কিছু অন্তরপ্লাবী প্রেম ছিল না, তবু এ কয় দিন সর্ব্বক্ষণ একত্র থাকিয়া এই সহিষ্ণু, শান্ত-প্রকৃতি মেয়েটি তাহার মনে স্নিগ্ধতা আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুধীশ তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল বটে, কিন্তু অন্তর ইহাতে প্রবল প্রেরণা দেয় নাই। যদিও গায়ত্রীর মন সে দর্পণের মত স্বচ্ছ দেখিতে পাইতেছিল, গায়ত্রীর জীবনে ইহা নূতন, কিন্তু সুধীশের পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা আছে। সে মুগ্ধা গায়ত্রীর চোখের ভাষা পাঠ করিয়াছে; যদিও গায়ত্রী অন্তরের ভাব গোপন রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সুধীশের কাছে তাহা অজ্ঞাত নাই। মানুষের শারীরিক দৌর্ব্বল্যের সহিত মানসিক দৌর্ব্বল্য একসূত্রে গ্রথিত, তাই গায়ত্রীর দেহ-বৈকল্যের সময় তাহার মনের সংবাদ সুধীশের অজ্ঞাত রহিল না। সুধীশ কিন্তু তাহাতে ব্যথিতই হইয়াছিল। এই জন্য বিড়ম্বিতা ধৈর্য্যশীলা মেয়েটির প্রতি তাহার মমতা হইত; কিন্তু যে-দিন সে প্রথম অনুভব করিল, তাহার প্রতি গায়ত্রীর প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছে, সে-দিন সে ব্যথিত স্নেহভরে গায়ত্রীর জ্বরারক্ত চক্ষুর স্ফীত পল্লব দু'খানির উপর ধীরে-ধীরে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে মনে মনেই বলিয়াছিল,—তুমিও দুঃখ ডেকে নিলে!

. এ কয় দিন সুধীশ আর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করায় গায়ত্রী বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই যে, সুধীশের সে-দিনের প্রস্তাবের অর্থ কি ছিল; এবং ঐ কারণেই সে হিমানীর কাছেও কোন কথা ব্যক্ত করিতে পারিল না। যতই একপ্রাণ বন্ধুত্ব থাকুক, এ অবহেলার অপমানটা কাহারও নিকট ব্যক্ত করা যায় না। সুধীশের ব্যবহার পূর্ব্বের মতই সম্ভ্রমের ব্যবধানের মধ্যে আছে; প্রভেদের মধ্যে—সে এখন গায়ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকে, এবং তুমি বলে। এইটুকু ব্যতীত তাহার ব্যবহারে আত্মীয়তার নিদর্শন আর কিছুই নাই। গায়ত্রী যেন অন্ধকারে আঁকু-পাঁকু করিতে লাগিল; কৈ, যে এক দিন যাচিয়া-সাধিয়া আপনাকে নিঃশেষে গায়ত্রীর হাতে তুলিয়া দিয়াছিল,—সে এমন নীরব হইয়া গেল কি করিয়া? তবে কি সে ছিল নিস্তব্ধ রাত্রির মোহ,—না তার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের বিকার? কিন্তু গায়ত্রী স্বয়ং যে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিল, তাহা পূর্ণজ্ঞানে, এবং তাহা তাহার সম্পূর্ণ স্মরণ ছিল; তাই গভীর ক্ষোভ ও লজ্জায় সে একেবারে মুস্‌ড়াইয়া পড়িয়াছিল। হিমানীও ভয়ানক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। অবিবাহিত সুধীশের নারী-বর্জ্জিত গৃহে তাহারা দু'জনে আসিয়া পড়িয়াছে; লোকে হয় তো তাহাদের কুৎসায় ইতিমধ্যেই পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে! সুধীশের ব্যবহারও প্রায় পূর্ব্বের মতই নির্লিপ্ত হইয়া গিয়াছে; গায়ত্রীর প্রতি তাহার বাহ্যিক ব্যবহারে অনুরাগের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না, গায়ত্রীর দিক দিয়াও নয়। অথচ সে-রাত্রে হিমানী স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছে, তাহাতে উভয়েরই অনুরাগের নিদর্শন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

হিমানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গায়ত্রীকে লক্ষ্য করে—কিন্তু তাহার কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারে না; সে যেন ভাদ্রের তটিনীর মত অচঞ্চল, স্থির। সুধীশের সান্নিধ্য সে পূর্ব্ববৎ পরিত্যাগ করিয়া চলে। গায়ত্রীর সেই রাত্রের ব্যবহারটুকু হিমানীর যদি জানা না থাকিত, তাহা হইলে হয় তো সে মনে করিত, তাহার মনে কোন দ্বন্দ্বই জাগে নাই।

জ্বর-বিরামের পরদিন হইতেই গায়ত্রী এ ঘরে আসিয়াছে; কাজেই সুধীশের সহিত কথা কহিবার পথও বন্ধ হইয়াছে।—হিমানী চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল।

* * * *

বারান্দায় গা ঘেরিয়া একটা মাধবীলতা আঁকিয়া-বাঁকিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে লতাইয়া উঠিয়াছিল। বৈকালের দিকে গায়ত্রী সেখানে দাঁড়াইয়া কয়েকটা পুষ্প চয়ন করিতেছিল, একটা বড় কুসুমস্তবকের প্রতি তাহার অসম্ভব লোভ; কিন্তু সেটা এত নীচে ছিল যে, সে কিছুতেই সেটাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। এই না পারার জন্যই তাহার মন বালিকার মত চঞ্চল ও উদ্দাম হইয়া উঠিল। সে বারান্দায় পেটের ভর দিয়া যথাসম্ভব নীচে ঝুঁকিয়া পড়িয়া শাখা ধরিয়া সজোরে টানাটানি করিতে লাগিল।

সুধীশ নীচে হইতে আসিতেছিল, সে গায়ত্রীর এই অসম্ভব চেষ্টা দেখিয়া হাসিল। যাহা আয়াসলভ্য, তাহাতে মানুষের কি উৎকট আকাঙ্ক্ষা, আর যাহা সহজপ্রাপ্য, তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপও করে না। গায়ত্রীর হাতের কাছে স্তবকে-স্তবকে ফুলভারে লতাটি নীচে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার দৃক্‌পাতও নাই; অথচ, একই ফুল হইলেও আয়াসলভ্য বলিয়া নিম্নের স্তবকটির প্রতি তার এত লোভ!…

সুধীশ মনে-মনে হিমানী ও নেলীর তুলনা না করিয়া পারিল না।

হিমানী তাহার, একেবারে নিজস্ব তাহার, তাহার বাগ্‌দত্তা; আর নেলী প্রকাণ্ড মরীচিকা; কিন্তু সুধীশ এই গায়ত্রীর মতই সেই আয়াসসাধ্য ফুলটির জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিল,—হাতের কাছের হিমানী অনাদরেই ঝরিয়া গেল!

আর নেলী!…

বন্ধু প্রদীপের নিকট মধ্যে মধ্যে তাহার খবর পায়। নেলীর জীবনটাও হিমানীর মতই অশান্তিপূর্ণ হইয়াছে। অটল সেন প্রকাণ্ড মাতাল, স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে; —নেলী তাই নিশ্চিন্ত গৃহকোণে থাকিয়া শান্তি উপভোগের অবসর পায় নাই,—তাহাকে স্বয়ং উপার্জ্জন করিতে হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম, মানসিক অশান্তি ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলায় নেলীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

এ কথা স্মরণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার মনশ্চক্ষে নেলীর ছবি ফুটিয়া উঠিল। দুধে-আলতা রং, নিটোল গঠন, সুশ্রী মুখখানি কোঁকড়ান চুলের মাঝে সদ্য বিকশিত ফুলটির মত ফুটিয়া আছে!

সে মুখে আজ হয় তো আর তেমন শ্রী নাই,—গণ্ডাস্থি বাহির হইয়া শোভা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, চোখের কোল বসিয়া কালি পড়িয়াছে,—সম্মুখের চুল উঠিয়া ছোট কপাল-খানি হয় তো শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে,—গায়ের রংও হয় তো আর তেমন উজ্জ্বল নাই!…

ভাবিতে ভাবিতে অনেক দিন পরে নেলীর স্মৃতি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। যেমন কোন মৃত প্রিয়জনের চিত্র অনেক দিন পরে চোখে পড়িলে বিস্মৃত অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়া অনাহূত অশ্রুতে দুই চোখ ভরিয়া আসে, সুধীশেরও তেমনই হইল!

সে গায়ত্রীর পাশ দিয়া নিজের ঘরের দিকে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, ঘুরিয়া ছাদে পলাইয়া গেল।

আকাশের উত্তর দিকটা ঘন কালো মেঘে ঢাকিয়া বিদ্যুৎ হানিতেছিল, সুধীশ আলিশায় ভর দিয়া নিস্তব্ধ ব্যথিত দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া-চাহিয়া নিজের অতীত জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে লাগিল। তাহার চারি দিকে সাজান ফুলবন ছিল, কিন্তু নিজের দুর্ব্বুদ্ধির দোষে আগুন দিয়া তাহা ঝল্‌সাইয়া দিয়াছে। আকাঙ্ক্ষিত জীবন দুই হাতে বরণ-মালা লইয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়াছে, আবার কি জানি, কোন ফাঁকে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! একদা তাহার যে জীবন-কুঞ্জ বিহঙ্গ-কূজনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা নিস্তব্ধ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। তাই গায়ত্রীর স্বতঃ উৎসারিত প্রেমও সে মরুভূমির রুক্ষতা মোচন করিয়া তাহা হরিদ্বর্ণ করিতে পারে নাই!…হিমানীকে লইয়া সে ষোল হইতে কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বপ্নজাল বুনিয়াছে—তার পর নেলী—একুশ হইতে ছাব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহার কল্পলোক আলো করিয়াছিল; কিন্তু তার পর এক দিন রূঢ় আঘাতে তাহার সে স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!…

তাহার জীবনে যাহা কিছু রসবস্তু ছিল, এই তরুণী দু'টি তাহা নিংড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে; তাই— তাই আজ পূর্ণ যৌবনে, বত্রিশ বৎসর বয়সে তাহার

কাছে পৃথিবী এমন বিরস, তার হৃদয় এমন নিঃস্ব, তার অনাগত জীবন এমন রিক্ত, এমন অবাঞ্ছনীয় !···

আবার মনে পড়িল, গায়ত্রীর শান্ত দীপ্ত মুখশ্রী !···

গায়ত্রী তাহাকে ভালবাসে, অন্তরে অন্তরে সুধীশ তাহার মৌন প্রেম অনুভব করে।

তাহার প্রেম হিমানী ও নেলীর মত নয়, তাহার প্রেম স্বতন্ত্র প্রকৃতির। হিমানী ও নেলীর ছিল মান-অভিমানে পূর্ণ অত্যুগ্র সান্নিধ্যকামনা, সুধীশের সম্পূর্ণ সত্তাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ-করা প্রেম, আর গায়ত্রীর প্রেম ভীরু, সঙ্কুচিত, প্রকাশের বাসনা নাই। সে তাহার অন্তরের রত্নপেটিকা সুবর্ণে পূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু তাহা গোপনে, নিঃশব্দে,—বাহিরে তাহার কোন চিহ্ন রাখে নাই। সে বিনম্র প্রকৃতি, আর হিমানী ও নেলী ছিল—চঞ্চল, উদ্দাম !···

সুধীশের মনে জাগিল সেই দিনের কথা, যে-দিন সে গায়ত্রীর কাছে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিল। সুধীশের অন্তর স্নেহে দ্রবীভূত হইয়া গেল। কত শান্ত সংযত স্নিগ্ধ প্রকৃতি তার, সে-দিনও সে কত সংযত ভাবেই সুধীশের সহিত কথা বলিয়াছিল !···আট দিন কাটিয়া গিয়াছে, সুধীশ কিন্তু আর সে কথা উত্থাপন করে নাই।···

গায়ত্রীকে কেমন ম্লান, পাণ্ডুর দেখায়—সুধীশের চক্ষুতে তাহা এড়ায় নাই, সবটাই কি তার অসুস্থতার জন্য ? তার মানসিক অশান্তি নিশ্চয়ই অসহ্য হইয়াছে, তাই ধরিত্রীর মত ধৈর্য্যশীলা মেয়েটির মুখেও ম্লান ছায়া পড়িয়াছে। সে সুধীশের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়াই কুমারী-চিত্তের স্বাভাবিক সঙ্কোচ পরিহার করিয়া তাহাকে আত্মনিবেদন করিয়াছে, আত্মসমর্পণে প্রস্তুত হইয়াছে ; আজ সুধীশের এই মৌনতা তাহার হৃদয়ে না জানি কি নিদারুণ হইয়া বাজিবে।

সুধীশ নিজের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইল। মনে পড়িল, আজই ডাক্তার দত্ত রসিকতা করিয়া বলিয়াছে,—তোমার কাণ্ড দেখে আমরা অবাক হ'য়ে যাচ্ছি হে ! বেছে-বেছে সুন্দরী তরুণী দেখে পরোপকার ক'রছ ? কেটি বলছিল, মিস্ হাজরাও বলছিলেন, তারা দু'টিই না কি পরমা সুন্দরী ?···আবার কেটি ব'ললে, এক জন না কি তোমার ঘরে তোমার বিছানাতেই শুয়ে অসুস্থ হ'য়েছেন, এবং তুমি রাত্তিরে তাঁকে নার্স কোচ্ছ !

কঠোর রসিকতা···এই রসিকতা উপলক্ষ করিয়া দুই বন্ধুতে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন সে কথাটা অত্যন্ত তীব্র ভাবে মনে পড়িল। তাহার সহানুভূতি ও সাধারণ দয়া সমাজের চোখে অত্যন্ত বিকৃত ও বীভৎস !

অবশ্য আজ যদি সে গায়ত্রী ও হিমানীকে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে দেয়, তবে তাহাকে আর কেহ এক-বিন্দুও দোষ দিবে না, যা কিছু দণ্ড বহিতে হইবে—ঐ শক্তিহীনা অনাথা নারী দু'টিকে। সুধীশ অধীর হইয়া উঠিল। ভবিষ্যৎ ভাবিতে গিয়াও যেন তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল ; উপকার করিতে গিয়া সে ইহাদের মারাত্মক ক্ষতি করিয়া বসিয়াছে ! দেশ-জোড়া অবিচারের বিরুদ্ধে কি করিতে পারিবে এই অনাথা নারী দু'টি ?

সুধীশ অস্থির হইয়া আলিশা ছাড়িয়া ছাদে বেড়াইতে লাগিল। না, আর সে বিলম্ব করিবে না, প্রথম সুযোগেই গায়ত্রীকে সব কথা জানাইবে, এবং সে যদি স্বীকৃত হয়, তবে অবিলম্বেই তাহাকে বিবাহ করিয়া এ কদর্য্য কাণা-ঘুষার পরিসমাপ্তি করিবে।·· না, আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই, গায়ত্রীর সন্তাপহারী প্রেম হয় তো তাহার উদ্‌ভ্রান্ত জীবনকে আবার সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া হৃদয়ে শান্তিদান করিবে। গায়ত্রীর মধ্যে সে শক্তি নিহিত আছে।

গায়ত্রীর কথা ভাবিতে ভাবিতে হিমানীর জন্য সুধীশ গভীর নিঃশ্বাস ফেলিল। হাঁ, ইহাই তাহাদের অদৃষ্টলিপি ! বিবাহ হইবে একের সহিত, কিন্তু মন পড়িয়া রহিল অন্যের কাছে। হিমানী তাহাকে ভোলে নাই, আজও তাহার বুকে রাবণের চিতা ধূ-ধূ করিয়া জলিতেছে ; গায়ত্রীকে সুধীশ বিবাহ করিলে, সত্যই কি তার প্রাণে শান্তি হইতে পারে ? কখন কি সে আনন্দ পাইতে পারে ? অসম্ভব ! হিমানী আজীবন তাহার স্মৃতি বুকে করিয়া পুড়িয়া মরিবে না ?

ভগ্ন—ব্যথিত হৃদয়ে সে নীচে নামিতে লাগিল, গুণ-গুণ করিয়া গান গায়িতে লাগিল,—'এ আঁখিজল মোছ প্রিয়া, ভোল ভোল আমারে !'

বারান্দায় হিমানী গায়ত্রীর চুল বাঁধিয়া দিতেছিল,

সুধীশ নামিয়া চমকিয়া উঠিল। গায়ত্রী মুখ তুলিল না, নত-নেত্রেই রহিল; কিন্তু তাহার চক্ষুর মিলন হইল হিমানীর বেদনাচ্ছন্ন ম্লান চক্ষু-দু'টির সহিত। এক মিনিট চারি চক্ষু পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ রহিল; তাহার পর সুধীশ ধীরে-ধীরে পাশ কাটাইয়া নিজ কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল। সত্যই ভোলা সহজ নয়, হিমানী ভুলিতে পারিবে না।

১২

গভীর রাত্রে বৃষ্টির শব্দে সুধীশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি জানালা-দরজাগুলা বন্ধ করিতে করিতে চোখে পড়িল, ঈজি-চেয়ারখানা একেবারে বারান্দার গা ঘেঁসিয়া রহিয়াছে। সেটা সরাইবার জন্য বাহিরে আসিতে লক্ষ্য হইল, বারান্দার একেবারে কোণের দিকে সাদা মত কি একটা রহিয়াছে। সুধীশ সেই নিকষ-কৃষ্ণ অন্ধকারে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল,—ওটা কি? এই সময় একবার বিদ্যুৎ বিকাশ হইলে সে বুঝিতে পারিল, উহা নারী-মূর্ত্তি,—হিমানী বা গায়ত্রী - কোন এক জন।

সুধীশের মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, তাহার বৈকালের এক কলি গান কি দু'জনের মনেই ঝড় তুলিতে সমর্থ নয়? গায়ত্রীও তো ভাবিতে পারে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই এ বিস্মরণী-মন্ত্র সুধীশ আবৃত্তি করিয়াছে! আর হিমানীর চোখে যে গভীর বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তো সে দেখিয়াই ছিল!—সুধীশ মৃদুগতি অগ্রসর হইল।

হিমানী নয়, গায়ত্রীই দাঁড়াইয়া ছিল, অল্প-স্বল্প জলের ঝাপ্‌টা লাগিয়া তাহার মুখখানি, সম্মুখের চুলগুলি এবং বক্ষের বসন কিঞ্চিৎ ভিজিয়া গিয়াছিল। সুধীশ কাছে আসিলে সে সসঙ্কোচে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সুধীশ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, জলে ভিজছো কেন গায়ত্রী? রোগা শরীর তোমার, আবার অসুখে পড়বে যে।

গায়ত্রী নিরুত্তর।

সুধীশ বলিল,—আমি তোমায় একবার একান্তে খুঁজছিলুম। তোমাকে সে-দিন অনেক কথা জানাব বলেছিলুম, কিন্তু কিছুই বলা হয়নি। তোমায় সব কথা জানাতে চাই; এখন শুনবে?—এই সময় দু'জনের গায়েই শীতল জলকণার ঝাপ্‌টা লাগিল; সুধীশ বলিল,—উঃ, কি শীত! এখানে দাঁড়িয়ে তো কথা বলা যায় না, চলো, আমার পড়ার ঘরে বসি। যাবে?

গায়ত্রী কুণ্ঠার সহিত বলিল,—কাল বললে হবে না?

সুধীশ আহত হইল; ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল,—আমার সঙ্গে কি যেতে ভরসা পাচ্ছ না? কিন্তু ক'টা রাত্রি তো তুমি আমার কাছে নিশ্চিন্ত হ'য়েই ঘুমিয়েছিলে!

গায়ত্রী অপ্রতিভ হইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল,—আমায় ক্ষমা করুন, আমি অত ভেবে বলিনি। আপনি আমার প্রাণ-দাতা।—বলিয়া সে একটু আগাইয়া আসিল।

সুধীশ তাহার ডান হাতখানি হাতে তুলিয়া লইল, সস্নেহ কণ্ঠে বলিল,—তবে এসো।

গায়ত্রীর হাতখানি সুধীশের হাতের ভিতর থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; সে মৃদু অনিচ্ছার সহিত লজ্জা-কুণ্ঠিত চরণে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইল।

পড়ার ঘরে গেলে আলো জ্বালিয়া গায়ত্রীর দিকে চাহিয়া সুধীশ উদ্বেগের সহিত বলিল,—এ কি? গায়ে একটা গরম জামা পর্য্যন্ত নেই! এখনও আট দিন কাটেনি, কি রকম ভুগেছিলে মনে নেই?—সে নিজের ড্রেসিং-গাউনটা আনিয়া সযত্নে গায়ত্রীর গায়ে জড়াইয়া দিল।

গায়ত্রী লজ্জায় কাঠ হইয়া গেল; তবু এ-যত্ন তাহার মনটিকে সুখাবেশে প্লাবিত করিয়া দিল।

সুধীশ তাহার দিকে একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া নিজে অন্যখানায় বসিয়া বলিল,—ব'স।—গায়ত্রী বসিল না, বলিল,—থাক, আমি তো বেশ দাঁড়িয়ে আছি। সে টেবিলটার উপর হাতের ভর দিল। সুধীশ বলিল,—না, আমার কথা এক মিনিটে শেষ হবে না, তুমি ব'স।—সে গায়ত্রীর ক্ষুদ্র করপল্লবখানি দুই হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে থাকিবার পর বলিল,—সে-দিন আমার ছন্নছাড়া জীবনটার ভার তোমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলাম, তুমিও নিতে অস্বীকার করনি। বলিয়া সুধীশ চুপ করিল; ঘরের অসহ স্তব্ধতাকে ভাঙ্গিয়া সে পুনরায় বলিল,—আমার জীবন কেন এমন ছন্নছাড়া হ'ল, এর ভুলচুক, দোষ-ঘাট সব আমি তোমাকে জানাতে চাই; গায়ত্রী—সব জেনে যদি তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারো, তাহ'লে আমাকে জানিও।

গায়ত্রী কি একটা বলিবার জন্য মুখ খুলিতেছিল, সুধীশ বলিল,—না আমাকে জানাতে দাও, বাধা দিও না। আজ হয় তো একটা প্রেরণার বশে তুমি শুনতে চাইছ না; আর আমার দিক থেকে বলছি,—মানুষের নিজের দোষ স্বীকার করার প্রবৃত্তি খুব কম, হয় তো আর একবার তুমি নিষেধ করলেই আমি চুপ ক'রে যাব। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে যে-দিন তুমি সকল কথা জানতে পারবে, সে-দিন হয় তো তোমার মনস্তাপের শেষ থাকবে না রাণি!

গায়ত্রী মুগ্ধ—আবিষ্ট কণ্ঠে বলিল,—তবে বলুন।

সুধীশ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—আমি যখন ষোল বছরের, তখন একটি বালিকাকে মা আমার বাগ্‌দত্তা বধূ ব'লে স্বীকার করেন।—কথা কয়টা সুধীশ যেন প্রাণান্ত চেষ্টায় উচ্চারণ করিল। গায়ত্রী মুখ তুলিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

একটুখানি আত্মসম্বরণ করিয়া সুধীশ পুনরায় বলিতে লাগিল,—ক্রমে দু'জনেই বড় হলুম। পরস্পরকে ভবিষ্যৎ স্বামি-স্ত্রী জেনে আমরা পরস্পরের কাছে অকুণ্ঠিত ছিলাম। হিমানীর নাম না বলিয়া সে একটা কল্পিত নাম স্থির করিয়া বলিল, সবিতা। তার ছোট হৃদয়খানির সমস্ত ভালবাসা দিয়ে সে আমায় ভালবেসেছিল,—আমিও তাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসতুম গায়ত্রী!—বলিতে বলিতে স্মৃতির বেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলিল,—কলকাতায় ডাক্তারী পড়তে সুরু ক'রলুম। সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সে আমায় মুগ্ধ করলে—তার শিক্ষা দীক্ষা, রুচি, আদব-কায়দা দিয়ে।—সবিতাকে আমি একেবারে ভুলে গেলুম।—এবার সুধীশ টেবিল-স্থিত তাহার মুঠার উপর ললাট স্থাপন করিল। মনে হইল, সে যেন প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে! —ব্যথিতা গায়ত্রী শুধু স্তব্ধ-বিহ্বল দৃষ্টিতে এই অসহনীয় বেদনার মৌন অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সুধীশ মুখ তুলিল, তাহার আঁখিপল্লব ভিজা-ভিজা; সে হাতের উল্টা পিঠে চক্ষু মুছিয়া বলিল,—এক বছর পরে মা মারা গেলেন, যাবার সময় আর এক দফা সবিতাকে বিবাহ করতে আমায় আদেশ ক'রে গেলেন। কি জানি, মায়ের মনে কোন সংশয় হয় তো দেখা দিয়েছিল। এক বছর পরে অশৌচ কাটলে, বাবা যখন আমায় পুনরায় সে কথা বললেন, তখন আমি স্পষ্ট অস্বীকার করলুম; অত্যন্ত রূঢ় ভাবে তাঁকে আপত্তি জানালুম।

নীরব শ্রোত্রী এবার চমকিয়া উঠিল, বলিল,—সবিতার কি হ'ল? সে কিছু বললে না?

সুধীশ ব্যথিত স্বরে বলিল,—কিছু না। আর সে আমার সামনেই এল না। এমন নির্ম্মম ব্যবহারের পরও কি সে আর আমার মুখ দেখতে পারে?...

গায়ত্রী কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না; বলিল, —কিন্তু তাঁর মা-বাপ?

সুধীশ নিজেও বিস্মিত হইল, সত্যই তো, হিমানীর মা-বাবা কি কিছুই প্রতিকার চাহেন নাই? এ কথাটা তো সে এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও চিন্তা করে নাই! তাঁহারা এত সহজে তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন কেন? গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুধীশ বলিল,—না গায়ত্রী, তাঁরা কি ক'রেছিলেন, আমি তার কিছুই জানি না। হয় তো আমার মত পাষণ্ডের হাত থেকে মেয়েটি ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাওয়ায় তাঁরা খুসীই হ'য়েছিলেন; তা যাই তাঁরা করুন, আমার সঙ্গে কোন আলোচনাই করেননি।

দু'জনেই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিবার পর সুধীশ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল,—মিস্ রায়ের সঙ্গেও যে ভালবাসা হ'ল, তাকেও ছোট ক'রে দেখতে পারি নে, পাঁচ বছর ধ'রে দু'জনেই দু'জনকে প্রাণ ভরে ভালবেসেছিলুম।... তার পর সে গেল বিলেতে, আমার নিষেধ শুনলে না। আমার যাওয়া হ'ল না, বাবা তাঁর অস্থির-চিত্ত ছেলেটিকে বিলেত পাঠাতে রাজী হ'লেন না। মনে ক'র না, আমি এতই পিতৃভক্ত হয়ে পড়েছিলুম। তিনি টাকা না দিলে বিলেত যাই কি ক'রে? তাই যাইনি। যাক্, যা বলছিলুম বলি।—বলিয়া সুধীশ একটু ম্লান হাসির সহিত বলিল,—তার পর মিস্ রায় ফিরল, কিন্তু সে তখন আমায় ভুলে গেছে! আমাদেরই এক প্রোফেসর কিছু দিন থেকে বিলেতে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সে তখন প্রেমে পড়েছে।

গায়ত্রী বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ইহাও কি সম্ভব? পাঁচ বৎসর যাহার সহিত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ

ছিল, তাহাকে কি সে এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইতে পারে? কি জানি!

সুধীশ কথার জের টানিয়া বলিল,—তার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে আর কলকাতায় থাকতে ইচ্ছে হ'ল না। সেই থেকে এখানে এসে আছি।—সুধীশ নীরব হইল; ঘরের ভিতরটা যেন ব্যথিত গাম্ভীর্য্যে গম-গম করিতে লাগিল।

তাহারা জানিতে পারিল না, কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল; সহসা ঘড়িতে দুইটা বাজার শব্দে দু'জনেই চমকিয়া উঠিল। সুধীশ ডাকিল,—গায়ত্রী!

গায়ত্রী মৃদুকণ্ঠে সাড়া দিল,—আজ্ঞে!

সুধীশ গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—সব তো শুনেছ? ভেবে দেখেছ?

গায়ত্রী পূর্ব্ববৎ নতমুখেই রহিল, উত্তর দিতে পারিল না।

সুধীশ বলিল,—আমি একেবারে ফাঁপা, একেবারে নিঃস্ব,—বুঝেছ?

গায়ত্রী এবার মুখ তুলিল, তাহার সূক্ষ্ম অধরোষ্ঠ মৃদু-মৃদু কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু সঙ্কোচবশে কণ্ঠের শব্দ ভাষায় প্রকাশিত হইল না।

সুধীশ স্নিগ্ধ স্বরে বলিল,—লজ্জা কি? যা বলবে বলো, সঙ্কোচ ক'রো না। এক মুহূর্ত্তের জন্যে ভুলে যাও,—তুমি বা তোমার কোন আত্মীয় আমার কাছে কোন দিন বিন্দুমাত্র উপকার পেয়েছ। ডাক্তারকে ভুলে, শুধু সুধীশকেই মনে রাখ। সে তোমায় পেতে চায়।

গায়ত্রী সুধীশের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, নতদৃষ্টিতে থাকিয়াই অনেক কষ্টে বলিল,—আমি তো আপনার অতীত জানতে চাইনি। তা জেনেই বা কি ফল?

সুধীশ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল,—তুমি যে আমার অতীত জানতে চাইবে না, তা আমি জানি। তুমি যে আমায় ভালবাস, তাও জানি, আর তাতেই ব্যথাই পেয়েছি। ঈশ্বর অনেক মারাত্মক ক্ষতিকর জিনিষের রূপ দিয়েছেন, বোধ করি, আমায় কিঞ্চিৎ রূপ দিয়ে দিয়েছেন পরের ক্ষতি করবার জন্যে। কিন্তু গুণ দিলেন না—একবিন্দু। এত দুর্ব্বল মন পুরুষের পক্ষে বড়ই লজ্জার—বড়ই গ্লানির বিষয়!

গায়ত্রী মৃদু কণ্ঠে বলিল,—আপনি নির্গুণ?

সুধীশ বলিল,—হাঁ গায়ত্রী, আমি নির্গুণ। যার ওপর আস্থা রাখা যায় না, সেই নির্গুণ। ভালবাসার চোখে দোষ-গুণ বিচার করবার শক্তি থাকে না। পাশ্চাত্য দেশের মতে প্রেমের দেবতা অন্ধ,—সত্যিই তিনি অন্ধ; দোষ-গুণ বিচারের শক্তি থাকে না, সবই ভালো লাগে, তাই তিনি অন্ধ। তুমি আমাকে ভালবেসেছ, তাই আমার পুরোন ইতিহাস তুমি গ্রাহ্যই ক'রলে না; কিন্তু আমার বদলে যদি অন্য কোন লোকের কথা শুনতে—তা হ'লে বলতে—কি পাষণ্ড!—সে ম্লান হাসিল।

গায়ত্রী আস্তে আস্তে বলিল,—আপনার অতীতে আমার কি দরকার? বর্ত্তমানই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে না?

সুধীশ বলিল,—হবে না। এই বর্ত্তমানই যে তোমায় ব্যথা দেবে। সকল জিনিসেরই একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে, বারে-বারে যদি আমি তার থেকে খরচ করি, তবে অবশেষটা যে পাবে, তার ভাগে ঘাঁকতি পড়বেই। আজ তুমি আমায় অন্য চোখে দেখছ, যাকে শুদ্ধ ভাষায় বলে প্রণয়ীর চোখ—কিন্তু বিয়ে হ'লেই এ মনোভাব আর থাকবে না, বদলে যাবেই; তখন আমি হব স্বামী—যার এক তিল অনিচ্ছাকৃত অবহেলাতেই তুমি ভেঙ্গে পড়বে।

একটুখানি নিস্তব্ধ থাকিয়া সুধীশ বলিল,—আমি বলি, তুমি হঠাৎ উত্তর দিও না; একটু ভেবে-চিন্তে উত্তর দাও। দু'দিন সময় নাও।

গায়ত্রী অস্ফুট স্বরে বলিল,—আপনি তো সবই বুঝেছেন, আমার বিচারশক্তি নেই, আপনিই তো বললেন।

সুধীশ বলিল,—তা হ'লে তুমি এই হতভাগাকে নেবে, স্বীকার করলে?

গায়ত্রী এবার মুখ তুলিয়া তাহার মুখপানে চাহিল। দুই চোখে কি অনির্ব্বচনীয় প্রেমের দীপ্তি! সে টেবিলের উপর প্রসারিত সুধীশের বাহুর উপর ললাট স্থাপন করিল।

সুধীশ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে-ধীরে বাঁ-হাতখানা তাহার পিঠে বুলাইতে লাগিল। কি এক অপূর্ব্ব শান্তিতে গায়ত্রী তাহার অন্তর ভরিয়া দিয়াছে।

সহসা ভেজান দুয়ারের দিকে চোখ পড়িল, তাহা

ধীরে-ধীরে উদ্‌ঘাটিত হইতেছিল। এক জোড়া কালো চোখের সহিত সুধীশের চোখোচোখী হইয়া গেল। চারি চক্ষু মুহূর্ত্ত কাল মিলিত হইয়া রহিল, তাহার পর হিমানী অল্প হাসিয়া সরিয়া গেল। সুধীশ ভাবিল, হিমানী হাসিল কেন,—অভিসারিকা ননদিনীকে দেখিয়া অথবা তাহার প্রতি বিতৃষ্ণায় ?

মিনিট পাঁচেক পরে গায়ত্রী মুখ তুলিল, তৃপ্তির জ্যোতিতে তাহার মুখ সমুজ্জ্বল।

সুধীশ তাহার কপালের অসংযত চুলগুলি কাণের পাশে গুঁজিয়া দিতে-দিতে প্রীতিমুগ্ধ কণ্ঠে বলিল,—রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো, যাও, এবার শুয়ে পড়ো রাণি!

গায়ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া ভূমিষ্ঠা হইয়া সুধীশকে প্রণাম করিল। ক্ষণপূর্ব্বদৃষ্ট হিমানীর মুখ গায়ত্রীর প্রতি স্নেহ-প্রকাশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সুধীশকে তাহা যেন পিছনে ঠেলিয়া দিল, তাই এই প্রণয়বিবশা তরুণীর উচ্ছ্বসিত ভক্তির বিনিময়ে তাহার অন্তর মূক হইয়া রহিল; সুধীশ শুধু তাহার কবরীর উপর ডান হাতখানি রাখিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

গায়ত্রী এবার দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইয়াই আবার ফিরিয়া আসিল। সে ড্রেসিং-গাউনটা খুলিতেছে দেখিয়া সুধীশ বলিল,—থাক্ না, ঠাণ্ডা লাগবে যে! এতখানি যেতে হবে, বাইরে ভয়ানক শীত।

গায়ত্রী আরক্ত মুখে বলিল,—কি ক'রে এটা গায়ে দিয়ে ও-ঘরে যাব ?

সুধীশ তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল,— বৌদি জানলেই বা, এত লজ্জা কিসের ? সুধীশ রায়কে জয় করেছ, এটা কি সগর্ব্বে বলতে পারবে না ?

গায়ত্রী লজ্জাবনত মুখে বলিল,—আমি কিছুই বলতে পারব না, যা বলতে হয়, আপনিই বলবেন।

সুধীশ ম্লান হাসিল। দু'জনে পরস্পরকে গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও তাহাদের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান হ্রাস হয় নাই। সে দোষ গায়ত্রীর নয়, সুধীশের; গায়ত্রীর আত্মনিবেদনের পরও সুধীশ তাহার সহিত এমন ব্যবহার করে নাই, যাহাতে তাহার সঙ্কোচের গণ্ডিটুকু মুছিয়া যায়। সুধীশ আপনাকে ধিক্কার দিল। বিগত দিনের স্মৃতি যদি আঁকড়াইয়াই থাকিবে, তবে গায়ত্রীকে জড়াইয়া কি ফল হইল ? তার অধিকারের দাবী তাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে বৈ কি! সে গায়ত্রীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল,—এখনও আমায় তুমি বলতে পারলে না ?

গায়ত্রী নতমুখে উত্তর দিল,—এবার থেকে বলতে চেষ্টা করব।—সে ড্রেসিং-গাউনটা খুলিতে লাগিল।

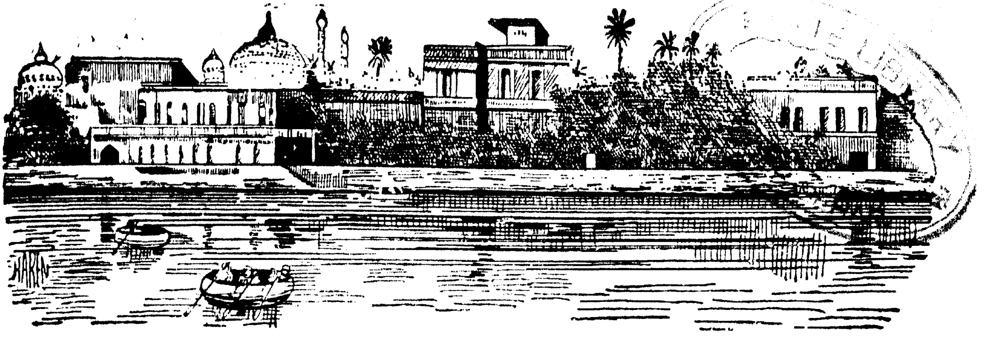
সুধীশ চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মন যেন তাহাকে তাগিদ দিয়া বলিতেছিল—এ ভাবে গায়ত্রীর আজ এখান হইতে যাইবার কথা নয়। সুধীশের নিকট হইতে সে হয় তো কিছু প্রত্যাশা করিতেছে, কিন্তু সুধীশ কিছুই পারিল না, মনকে সে বুঝাইল—গায়ত্রী সবই জানে, এই মাত্র সে নিজের দৈন্যের সংবাদ তাহাকে জানাইয়াছে; গায়ত্রী তাহার কাছে হাত পাতিবার মত নীচ নয়।

গায়ত্রী ড্রেসিং-গাউনটা চেয়ারের পিঠে ঝুলাইয়া রাখিয়া গায়ের কাপড়খানা ভাল করিয়া টানিয়া ধীর-পদে বাহির হইয়া গেল।

সুধীশ স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল,—ভগবান, এ কোন্ পথে চালালে ? আমায় বল দিও, গায়ত্রী যেন সুখী হয়!

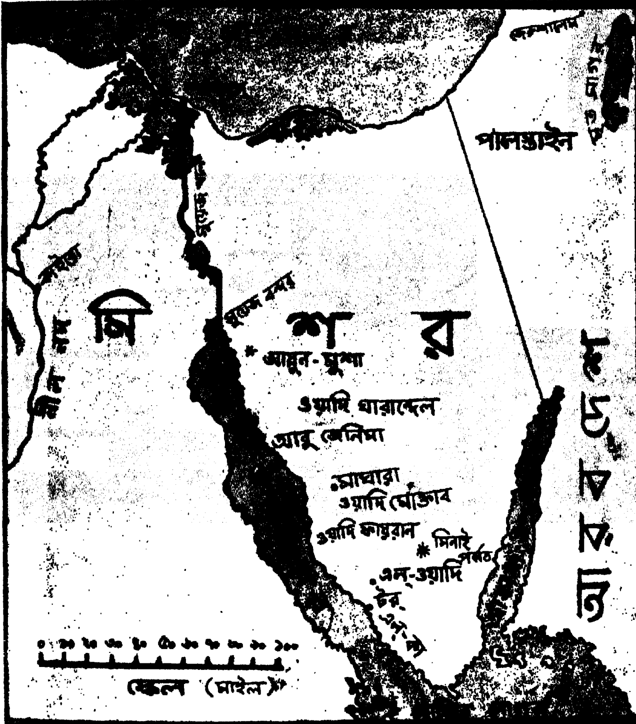
[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।



আরব-ইরাক-ইরাণ-দামাস্কাস্-মিশর

গত বৎসর য়ুরোপে প্রথম যখন এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন আমরা তার দুন্দুভি-নাদ শুনিয়াই চমকিয়া উঠিয়াছিলাম! কিন্তু এখন আর দুন্দুভি-নাদ নয়, কামান-বন্দুকের



সুয়েজ-উপসাগরের তীরে

শব্দ, বম্বারের গর্জ্জন কানে আসিয়া লাগিতেছে! রুদ্র নৃত্যে মাতিয়া মহাকাল বিষাণ হাতে আজ এক দিকে আফ্রিকা, অপর দিকে তুর্কির পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত চমকিত করিয়া তুলিয়াছেন! সিরিয়া, ইরাক্, ইরাণের আকাশ মহাকালের রোষোৎক্ষিপ্ত জটাজালে আজ সমাচ্ছন্ন! খবরের কাগজে পড়িতেছি, মিত্রশক্তিসহ ব্রিটিশ-সেনা আজ সিরিয়া অবরোধ করিয়াছে; কাল ব্রিটিশের হাতে দামাস্কাস আত্ম-সমর্পণ করিতেছে। কোথায় আফ্রিকা, কোথায় বা সিরিয়া, ইরাক, ইরাণ—সে সম্বন্ধে মনে অস্পষ্ট ধারণা লইয়া মহা-যুদ্ধের মহা-সঙ্কটের পরিমাণ নিরূপণ দুরূহ হইবে। এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সে-জন্য আমরা আজিকার এই মহা-কুরুক্ষেত্রের ভৌগোলিক পরিচয় লইবার চেষ্টা করিতেছি।

এ প্রসঙ্গ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই এই দু'খানি মানচিত্র দেখা প্রয়োজন। প্রথম মানচিত্রে সুয়েজ-উপসাগরের উভয়-তীরবর্ত্তী মিশর এবং সিনাই, আরব এবং পালেস্তাইনের কিয়দংশ দেখিতেছি। দ্বিতীয় মানচিত্রে দেখিতেছি, সুদূর পশ্চিমপ্রান্তে কৃষ্ণ-সাগরের ও পারে য়ুরোপের একাংশ; তার পর কৃষ্ণ-সাগরের এ-দিকে আনাতোলিয়া বা এশিয়া মাইনর; সিরিয়া, ইরাক, পালেস্তাইন, সিনাই, ট্রান্স-জর্দানিয়া এবং আরবদেশ। আরবের

নীচে এডেন-উপসাগর, আরব-সাগর ; পূর্ব্বে পারস্য এবং ওমান-উপসাগর।

এই মানচিত্র দু'খানি চোখের সামনে রাখিয়া আমরা সুয়েজ-উপসাগর ও লোহিত-সাগরের পূর্ব্বদিক-ভাগের পরিচয় লইবার প্রয়াস পাইব।

লোহিত-সাগর পার হইয়া সুয়েজ-উপসাগরের প্রবেশ-পথে পূর্ব্ব-তীরে টর-অন্তরীপ। মক্কাযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই এই টরে জাহাজ হইতে নামেন। টরের উত্তরে সিনাই। সিনাইয়ে গ্রীক্ পাণ্ডাদের মস্ত আস্তানা। খৃষ্টান তীর্থ-যাত্রীরা সিনাইয়ে আসিয়া নামিলে পাণ্ডারা তাঁদের পাইয়া বসে! এখান হইতে উটের পিঠে চড়িয়া যাত্রীরা তীর্থ-দর্শনে বাহির হন। এ-পথে উট একমাত্র বাহন। খৃষ্টান এবং মুসলমান তীর্থ-যাত্রীর ভিড় এখানে সব সময়েই লাগিয়া থাকে। টরের গায়ে এল্-কা। এল্-কা মরুময়।

এই এল্-কায় তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি হোটেল আছে। সে হোটেলের সাজ-সজ্জা মিশরীয়; ভোজ্য-পানীয় আসে নানা দেশ হইতে। অর্থাৎ জেনেভা হইতে আসে বোতল-ভরা জল; দার্জ্জিলিং হইতে চা; মোচা হইতে কফি; এবং স্কটল্যাণ্ড হইতে রুটী। মাঠে তাঁবু ফেলিয়া অনেকে সেই তাঁবুতে বাস করেন। এই সব তাঁবুতে পশারীর দল সর্ব্বপ্রকার ভোজ্য-পানীয় বেচিতে আসে।

টরের অদূরে পাহাড়ের গা বহিয়া বিশাল প্রান্তর। এই প্রান্তর ভেদ করিয়া তাল-খেজুরের সুদীর্ঘ বীথি।

এল্-কার উত্তরে এল-ওয়াদি। মরু-প্রান্তরের পর এল-ওয়াদিতেই বসতির চিহ্ন প্রথম চোখে পড়ে। মাটীর ঘর ছাড়া অন্য রকমের গৃহ এখানে আদৌ নাই! ওয়াদির পর পাষাণ-রুক্ষ সিনাই অন্তরীপ। সিনাইয়ে খৃষ্টান ও মুসলমানের বাস। সিনাই পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত ভূ-ভাগ সিনাই-উপত্যকা নামে পরিচিত।

সিনাইয়ের পর ওয়াদি মক্তাব। এখান হইতে শুধু মুসলমানের বসতি সুরু হইয়াছে। এখানকার মুসলমানরা জাতে আরব।

সিনাই পাহাড়ের একাংশের নাম রাশ্-এস্-সাইসাই। এ অংশটি ৬৫৪০ ফুট উঁচু। এই গিরি-বক্ষেই মানব-জাতির পালনীয় কর্ত্তব্য-বিধির (Proclamation of the Law) প্রথম প্রচার হয়। জেবেল্-মুশাই পাহাড় বাইবেল-গ্রন্থে মাউণ্ট অফ্ দি ডেকালগ্ নামে অভিহিত। এই পাহাড়ের নীচে সেণ্ট কাথরিনের মন্দির ও মঠ আছে। মন্দিরে ভার্জ্জিন মেরির মূর্ত্তি আছে। মঠে বহু ধর্ম্মাচার্য্যের বাস। তাছাড়া তীর্থ-যাত্রীদের বাসের জন্যও গৃহাদি আছে। তীর্থ-যাত্রীদের গৃহগুলি পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। মন্দিরের ছাদে শুষ্ক তৃণ-গুল্মের হরফে আশীর্ব্বচন



কৃষ্ণ-সাগরের পূর্ব্বদিকে



যাত্রীর ভিড়—টর



এল্‌-কায় তাঁবু-গৃহ ;   দূরে জেবেল্‌-সার্বাল

লিখিত আছে। ছাদ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে জেব্রোর বিশাল উপত্যকা দেখা যায়। মন্দিরের গ্রন্থাগারে প্রাচীন কালের বহু পুঁথিপত্র সযত্নে রক্ষিত আছে। নানা প্রদেশের বহু সুধী অনুশীলন-গবেষণাদির জন্য এই গ্রন্থাগারে আসেন। এখানে যে-সব ধর্ম্মাচার্য্য আছেন, গ্রন্থাগারের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নাই! গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ থাকেন কাইরোয়। গ্রন্থাগারে পুঁথিপত্র দেখিতে চাহিলে কাইরো হইতে অনুমতি-পত্র আনিতে হয়। এ গ্রন্থাগারে সিরিয়াক্ ভাষায় লিখিত বাইবেলের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। জেবেল-মুশাইয়ের এক দিককার শিখরদেশে মোশেসের মন্দির আছে। মন্দিরটি আজ জীর্ণ স্তূপে পরিণত।

সিনাইয়ের পর দেখিবার মতো জায়গা ওয়াদি ফায়রাণ। ওয়াদি ফায়রাণকে সিনাইয়ের মুক্তা নামে অভিহিত করা হয়। ওয়াদি ফায়রাণে বহু প্রাচীন মন্দির আছে। তন্মধ্যে বাবালেকের ব্যাকাশ-মন্দির উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের গায়ে নানা কারু-কাজ আজো অমলিন আছে। মন্দিরটি পাহাড়ের তুঙ্গ শিখরে অবস্থিত। মন্দিরের চূড়া যেন আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে! এখানেও বহু আরবের বাস।

ওয়াদি মক্কাবের উত্তরে মাঘারা। মাঘারায় এককালে নীলার প্রচুর খনি ছিল। এ সব খনি ছিল ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্বে। এখন আর নীলা পাওয়া যায় না! খনির মুখ অজগরের মতো মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। নীলা পাওয়া না গেলেও এখানকার পাহাড়ে আজো প্রচুর ম্যাঙ্গানীজ্ মেলে। এ-দিকে মোটর চলিবার উপযোগী পথ এখন নির্ম্মিত হইয়াছে।

মাঘারার উত্তরে আবু জেনিমা, ওয়াদি ঘারান্দেল, আয়ুন মুশা (বা মোশেসের ঝর্ণা-ধারা) পার হইয়া সুয়েজ-বন্দর। সুয়েজ-খালের মুখে সুয়েজ-বন্দর অবস্থিত। বাইবেলে ওয়াদি ঘারান্দেলের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। আয়ুন মুশায় রেলোয়ে-লাইনের দর্শন মেলে।



ওয়াদি হেবরান্—রুক্ষ গিরি-বক্ষে উট্-সওয়ার

ছোট লাইন। ছোট গাড়ী। এ লাইন আয়ুন মুশা হইতে জেরুশালেম পর্য্যন্ত গিয়াছে। *

এবার এদিক ছাড়িয়া আমরা তুর্কির কনস্তান্তিনোপলের পথে যাত্রা করিতেছি।

* জায়গাগুলির নাম বুঝিবার জন্য ক'টি কথার অর্থ জানা প্রয়োজন। আয়ুন কথার অর্থ ঝর্ণাধারা; জেবেল—পাহাড়; ওয়াদি—মরা নদী।



মরু-উদ্যান—ওয়াদি ফায়রাণ

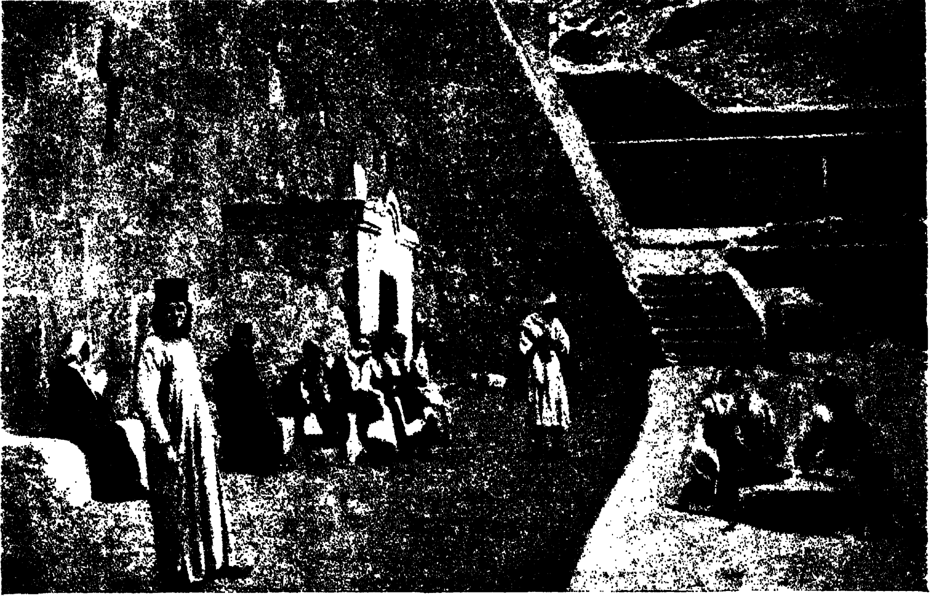


সেণ্ট কাথরিনের মন্দির—জেবেল্ মুশাই

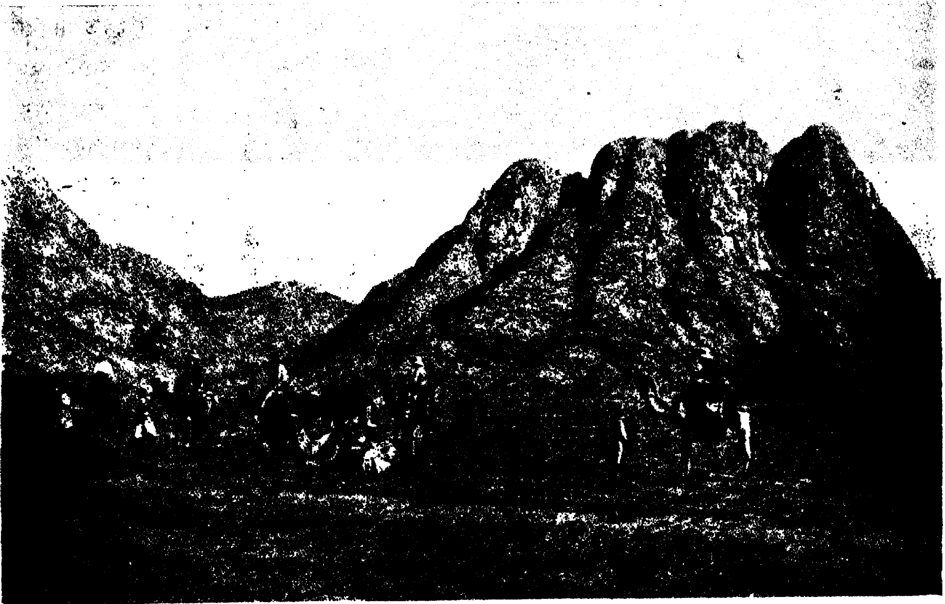
ষ্টীমার হইতে সামস্থনে নামিতে হয়। সামস্থনে বাহন মেলে উট, বলদ ও গর্দ্দভ। সামস্থন পার্ব্বত্যময়। এখানে তামাকের চাষ আছে। এখানকার সিগারেটের খুব খ্যাতি আছে। গ্রীক ও আর্ম্মেনিয়ানরা তামাকের চাষ করে। তামাকের ক্ষেত বেশ সুবিস্তৃত। সামস্থন হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণে এখানকার প্রথম গ্রাম মার্জ্জিবান্। এখান হইতে মার্জ্জিবান্ পর্য্যন্ত পথের হু'ধারে শুধু ক্ষেত আর ক্ষেত। দিগন্তব্যাপী ক্ষেত। আমাদের দেশের মতো গরুর গাড়ীতে করিয়া ক্ষেতে ফশল বহা হয়।

মার্জ্জিবানের পূর্ব্বদিকে আমেশিয়া। আমেশিয়ায় প্রাচীন পারসীক্ ও রোমান সমৃদ্ধি-গরিমায় বহু নিদর্শন এখনো জীর্ণ বেশে বিদ্যমান আছে। সেগুলির মধ্যে পন্টিক নৃপতিদের সমাধি-স্তম্ভ এবং মিথরাডিশের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

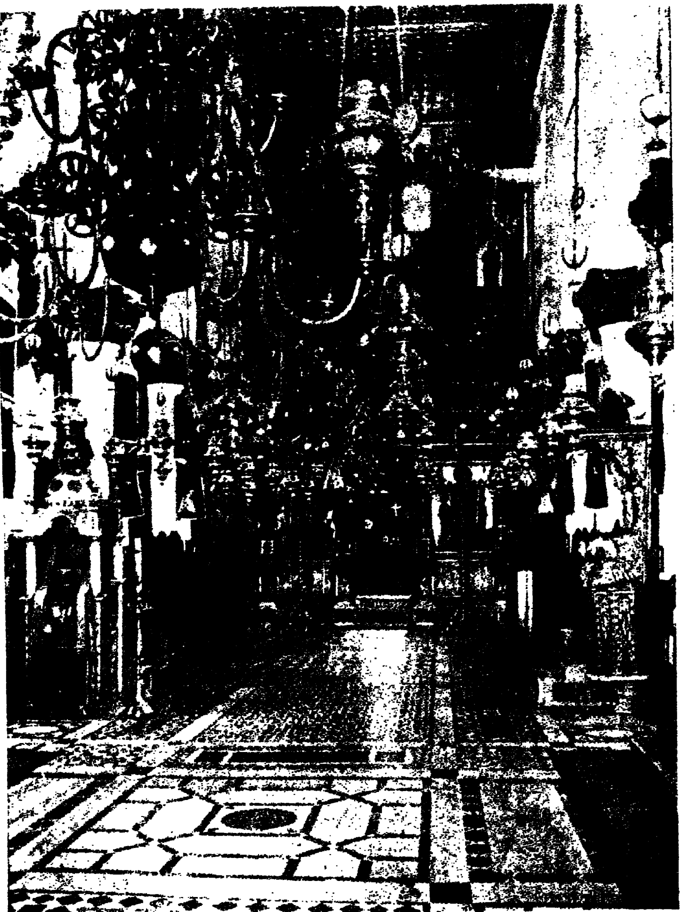
কন্স্তান্তিনোপল্ হইতে ষ্টীমারে চড়িয়া কৃষ্ণ-সাগর পার হইয়া পূর্ব্ব-পারে আনাতোলিয়া বা এশিয়া মাইনর।



গ্রন্থাগার—সেণ্ট কাথরিনের মন্দিরে



এই পাহাড়ে মোশেসের দশ আদেশ প্রথম প্রচারিত হয়



মন্দিরের মধ্যে—সেণ্ট কাথরিনের মঠ



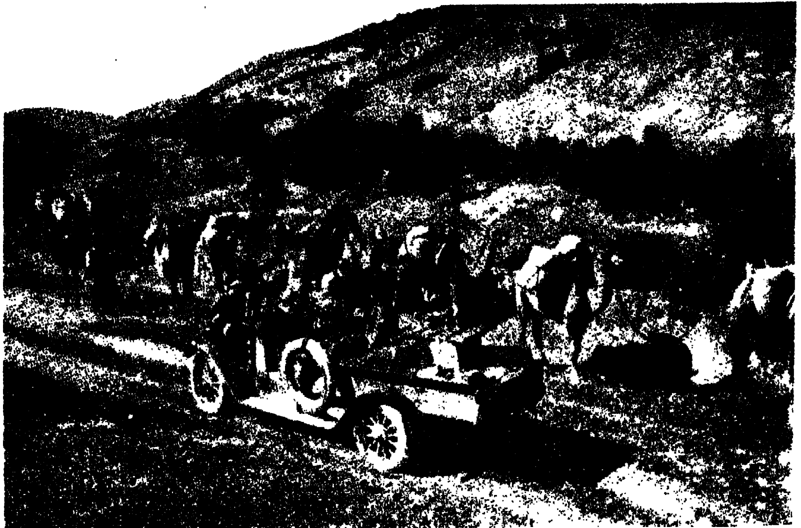
সিনাই-পর্ব্বত ; দশ-আদেশ প্রচারের পূর্ব্বে মোশেস্ এই পাহাড়ে বাস করিতেন

আমেশিয়ার দক্ষিণে শিবাস্। শিবাস্ এক কালে খৃষ্টান ও মুসলমানদের তীর্থ ছিল। এখনো এখানে খৃষ্ট মন্দিরের এবং সেলজুক-আমলের মসজেদের বহু ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। সে-সবে যে রকমারি কারিগরি ও ঐশ্বর্য্য, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়!



জাষ্টিনিয়ানের চার্চ্চ—মোশেস্-পর্ব্বত

৯০০ বৎসর পূর্ব্বে সেলজুক-তুর্কিদের আক্রমণে এ অঞ্চলের আর্ম্মেনিয়ান্ রাজারা তাদের হাতে রাজ্য সমর্পণ করিয়া শিবাসে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সমস্ত আর্ম্মানী সেই সঙ্গে শিবাসে চলিয়া আসে। বহু তুর্কি-কিশোরীও সে সময় ইজ্জৎ-রক্ষার জন্য এখানে



পথে—সামস্থন ও মার্জ্জিবানের মধ্যে

আসিয়া আশ্রয়-নীড় রচনা করে। সে সব আশ্রয়-নীড় এখনো আছে। এ সব নীড়ে তুর্কি-রমণীদের বাস; এ নীড়ে পুরুষ-মানুষের ছায়াও নাই! এ সব রমণী নামে মাত্র বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া আশ্রয়-নীড়গুলিতে বাস করিতেছে। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। এ জন্য এ সব আশ্রয়-নীড়ে

অনাচার-দুর্নীতির বিরাম নাই।

সেলজুক আজ নাই, কিন্তু সেলজুক-সমৃদ্ধির চিহ্ন এখনো বিলুপ্ত হয় নাই। এখানকার রম্য-হর্ম্ম্যাদিতে এবং মসজেদে তাদের কীর্ত্তিরশ্মি এখনো দেদীপ্যমান দেখা যায়। পূর্ত্ত ও স্থাপত্য-কলায় সেলজুকদের প্রতিভা এখনো সুস্পষ্ট রেখায় জ্বল-জ্বল করিতেছে!



বরফে ঢাকা জেরুশালেম

ওমর খৈয়মের রচনায় আমরা যে সুলতান কৈকোবাদের নাম পাই, সে কৈকোবাদ ছিলেন এই সেলজুক-তুর্কিদের সুলতান। তাঁর পুত্রের নাম ছিল কৈখশরু। কৈকোবাদের প্রাসাদটি জরা-জীর্ণ হইলেও ধরণী-বক্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

শিবাস হইতে পাহাড়ের বুক বহিয়া ১২৫ মাইল দূরে কৈসেরাই। এখনো এখানে জন-সাধারণের মধ্যে বৃক্ষ-পূজার প্রচলন আছে। এ-পূজা দেখিয়া অনেকে বলেন, মুশলিম-প্রভাবের পূর্ব্বে এ সব অঞ্চলে গ্রীসের ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। শিবাসে যেমন সেলজুক-প্রভাব দেখা যায়, কৈসেরাইয়ে তেমনি গ্রীক-প্রভাবের পরিপূর্ণতা। পূর্ব্বে এ-অঞ্চলের নাম ছিল কাপাডোশিয়া। এখানকার লোক-জনের মধ্যে অধিকাংশই গ্রীক। কৈসেরাই এদিককার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে পারসীক, ইহুদী এবং সিরিয়ান বণিকের দল বেশ সমৃদ্ধ। এখানকার কম্বল, গালিচা, রাগ এবং দামাস্কাসের



আর্ম্মান্ বয়-স্কাউট্—সিরিয়া

সিল্ক লইয়া এখানকার এ বাণিজ্য-সম্পদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

আচারে গ্রীক হইলেও এখানকার মেয়েদের আবরু খুব কড়া। মেয়েরা পথে-ঘাটে বাহির হয় না। কখনো যদি পথে বাহির হইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে



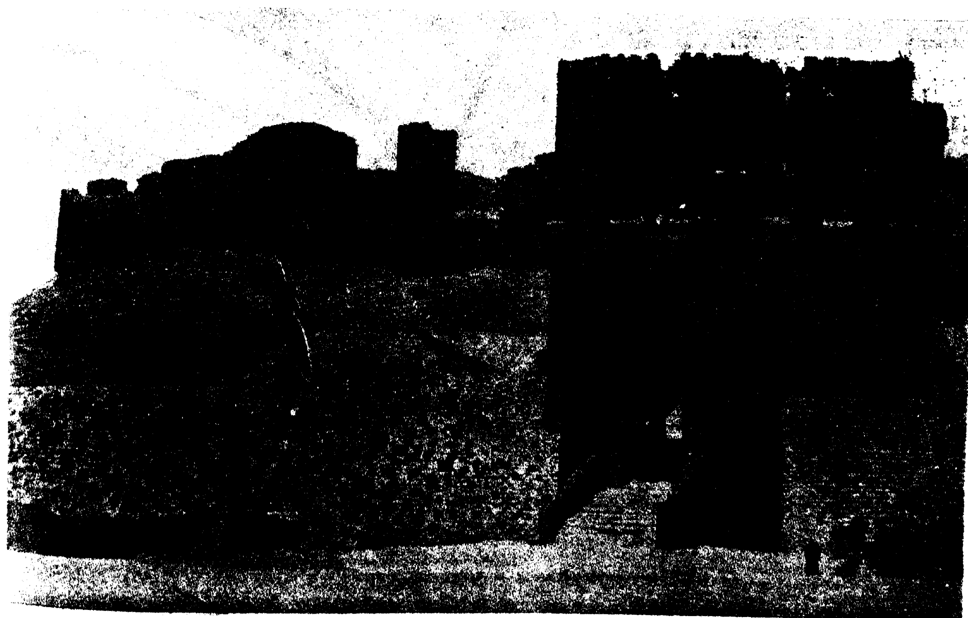
মরু-পথের পথিক



গ্রীক্-এ্যাম্ফি-থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ—আমান্



মরুর বুকে আঁধি



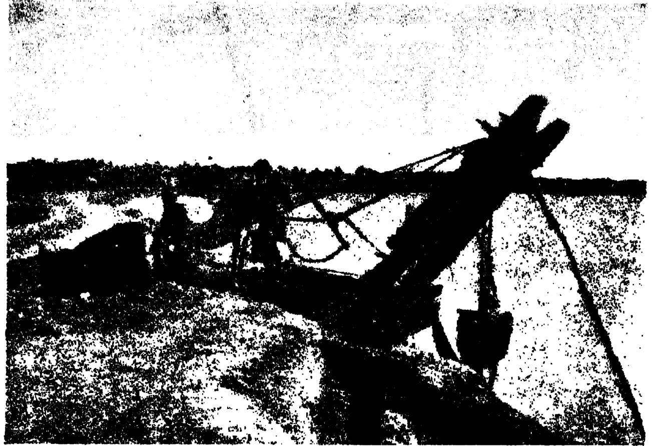
মধ্যযুগের তুর্কি-দুর্গ—এলেপো

বোর্খায় আপাদমস্তক ঢাকিয়া বাহির হয়। হাটে-বাজারে মেয়েদের বাহির হওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। কূয়া বা ঝর্ণাতলা হইতে জল আনিবার অধিকার মাত্র আছে; তাও আপাদ-মস্তক বোর্খায় ঢাকিয়া জল আনিতে হয়।

কাহারো অসুখ-বিসুখ হইলে রোগীর উপর এখানে সময়ে-সময়ে যে-নির্য্যাতন চলে, তাহা অবর্ণনীয়। রোগ হইলে ইহারা বলে, প্রেতের নজর লাগিয়াছে! সে নজর-দোষ কাটাইবার জন্য মন্দিরের বিশ ফুট নীচে অন্ধকার গহ্বরে রোগীকে রাখিয়া আসা হয়। তার জন্য রুটী ও পানীয় জল দেওয়া হয়। উপরে দেবতার মন্দিরে আত্মীয়-বন্ধুরা আলো জ্বালিয়া মন্ত্র পড়িয়া দেবতার কৃপা প্রার্থনা করে। তিন দিন পরে রোগীকে গহ্বর হইতে উপরে আনা হয়। সে সময় ভাগ্যে যদি সে বাঁচিয়া যায়, তবে সকলের আনন্দের সীমা থাকে না! বলে, দেবতার কৃপায় রোগীর রোগ সারিয়াছে! অন্ধকার গহ্বরে রোগী মারা গেলে সকলে কাঁদিয়া বলে, দেবতার কৃপা হইল না, তাই উহাকে লইয়া গিয়াছেন!

এ প্রথা এখানকার গ্রীক-সমাজে আজো কি করিয়া প্রচলিত আছে, এইটাই সব-চেয়ে আশ্চর্য্য কথা!

সেলজুক ও রোমান আধিপত্যের পূর্ব্বেও কৈসেরাই-প্রদেশ সভ্যতায় মণ্ডিত ছিল। খৃষ্ট-জন্মের দু' হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিতি-বংশীয়েরা কৈসেরাইয়ে বা প্রাচীন কাপাডোসিয়ায় বহু-কাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। বোঘাজ কেউই এবং জেরাবলাসের মধ্যে প্রান্তর-বক্ষে এখনও চার-হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার প্রাচীন গৃহ-প্রাচীরাদি এবং মন্দিরের বহু নিদর্শন দেখা যায়। এ সব মন্দিরে গ্রীক-রমণীরা পৌরোহিত্য করিতেন। প্রস্তর-ফলকে প্রাচীন বহু লিপি অস্পষ্ট রেখায় খোদিত আছে। এ সব লেখার কেহ পাঠোদ্ধার করিবে, সে উপায় নাই! তুর্কিদের তাহাতে বিষম বিরাগ। লিপির পাঠোদ্ধারে কেহ প্রয়াস পাইলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এখানকার মাটীর ঢেলা কুলি-মজুরের দল গোপনে আনিয়া দামাস্কাসে, এলেপোয় এবং কনস্তান্তিনোপ্‌লে য়ুরোপীয় ও আমেরিকান



ক্ষেতে জল দেওয়া—বাগ্‌দাদ্‌



টাইগ্রিস্‌-ইউফ্রেটিশে নৌকা

পর্য্যটকদের কাছে তাহা বেচিয়া বেশ দু' পয়সা রোজগার করে। বিক্রয় গোপনে চলে। ধরা পড়িলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই শাস্তি পাইতে হয়।



সেলজুকদের প্রাসাদ-স্মৃতি—কৈসেরাই



দাবা-খেলা

আনাতোলিয়ার দক্ষিণে ট্রান্স-জর্দানিয়া ও সিরিয়া; পূর্ব্ব-দিকে ইরাক ও ইরাণ।

দু'-এক শত বৎসর পূর্ব্বেও ট্রান্স-জর্দানিয়া ছিল বালুকাময় প্রান্তর। এখান হইতে প্রায় পাঁচ শত মাইল দূরবর্ত্তী প্রদেশে যাদের বাস, তারাও ট্রান্স-জর্দানিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান জানিত না! এখন এখানে লোকের বসতি হইয়াছে। ট্রান্স-জর্দানিয়া আজ আরব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আরব-মুসলমানরা এ প্রদেশকে বলে ট্রান্স-জর্দানিয়া এবং কেরাক। জর্দ্দান নদীর পূর্ব্বে জেরুশালেম হইতে কয়েক মাইল মাত্র দূরে ট্রান্স-জর্দানিয়ার অবস্থান। ইহার এক দিকে বৃটিশ-অধিকৃত পালেস্তাইন; অপর দিকে আরব বেদুইনদের বাস। ট্রান্স-জর্দানিয়ার প্রধান নগর ও রাজধানী আমান আগাগোড়া পার্ব্বত্যময়। রোমান এ্যাম্পি-থিয়েটারের জীর্ণাবশেষ এবং চারি দিকে তৃণশ্যামল ক্ষেত্রসমূহ—পাহাড়ের উপর হইতে সে সবের দৃশ্য খুবই নয়ন-মুগ্ধকর! আমানের প্রান্তে সুদীর্ঘ একটি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। এ প্রাচীর তৈমুরলঙ্গ ১৪০২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অভিযানে আসিয়া তিনি নগর আক্রমণ এবং লোক-জনকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেন। নিহত জনগণের অস্থি-কঙ্কালের উপর তিনি এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। দিনের বেলায় আশ-পাশের ক্ষেতে চাষারা চাষ করে, ছাগল চরায়; রাত্রে কিন্তু কেহ এখানে থাকে না। বলে, রাত্রে এখানে সেই নিহত জনগণের প্রেতাত্মারা আসিয়া আক্রোশভরে বিচরণ করে।

এখানকার আরব জাতি এই শত শতাব্দীতেও আচার-ব্যবহারে এতটুকু বদলায় নাই!

দাবা খেলার নেশায় এখানকার আরবেরা রীতিমত মশ্‌গুল। বলে, দাবা খেলার প্রথম প্রবর্ত্তন তারাই করিয়াছে।

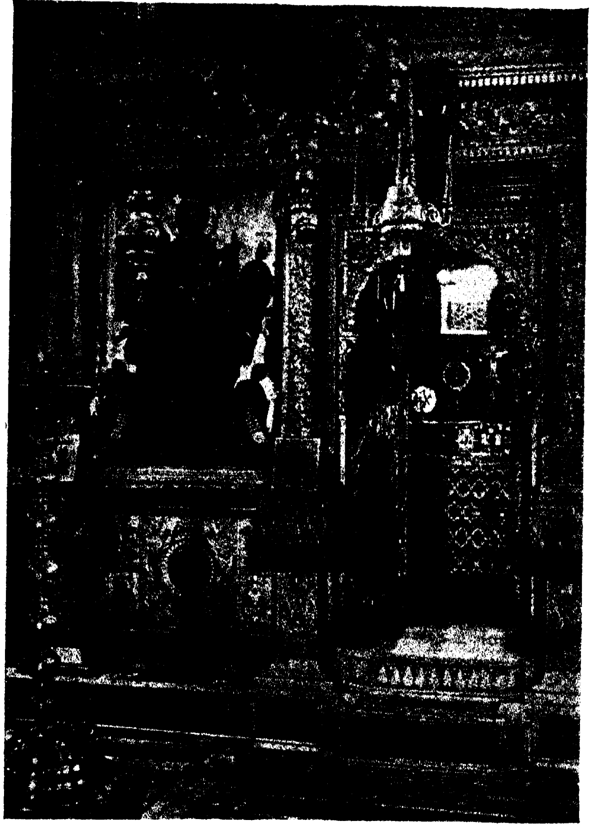
ট্রান্স-জর্দানিয়ায় বেদুইনদের প্রতাপ অমোঘ ও দোর্দ্দণ্ড। তারা পয়সা-কড়ি রোজগার করে না, অথচ অভাব কাহাকে বলে, তাও জানে না! যাহাকে সামনে পায়, তাহার কাছ হইতেই পয়সা-কড়ি কাড়িয়া লয়। ইহারা আইন-কানুন বা রাজনীতির ধার ধারে না। ইহাদিগকে শায়েস্তা করিয়া রাজ্য-গঠন আজ পর্য্যন্ত কাহারো শক্তিতে কুলায় নাই!

ট্রান্স-জর্দানিয়ার রাজার নাম আমীর আবদুল্লা ইব্‌নে হুশেন। তিনি ঐ নামেই রাজা! পূর্ব্ব-পুরুষদের মতো তাঁর সভা বসে মরুভূমির বুকে তাঁবুতে। সেই তাঁবুই তাঁর প্রাসাদ, তাঁর সভা। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত ঋতু-ভেদে এখানে-ওখানে তাঁবু উঠাইয়া রাজসভা বসানো হয়।

জেরুশালেম হইতে আমান পর্য্যন্ত এখন মোটর-চলার পথ হইয়াছে। সে পথে পাঁচ ঘণ্টায় আমানে আসা যায়। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, যাত্রী দেখা যায় না! তার কারণ, আরব বেদুইনদের দুরন্তপনায় যাত্রী-দের পক্ষে এ-পথ আদৌ নিরাপদ নয়।

জেরুশালেম হইতে এই পাকা রাস্তা ডেড-শীর গা বহিয়া জেরিকো মালভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

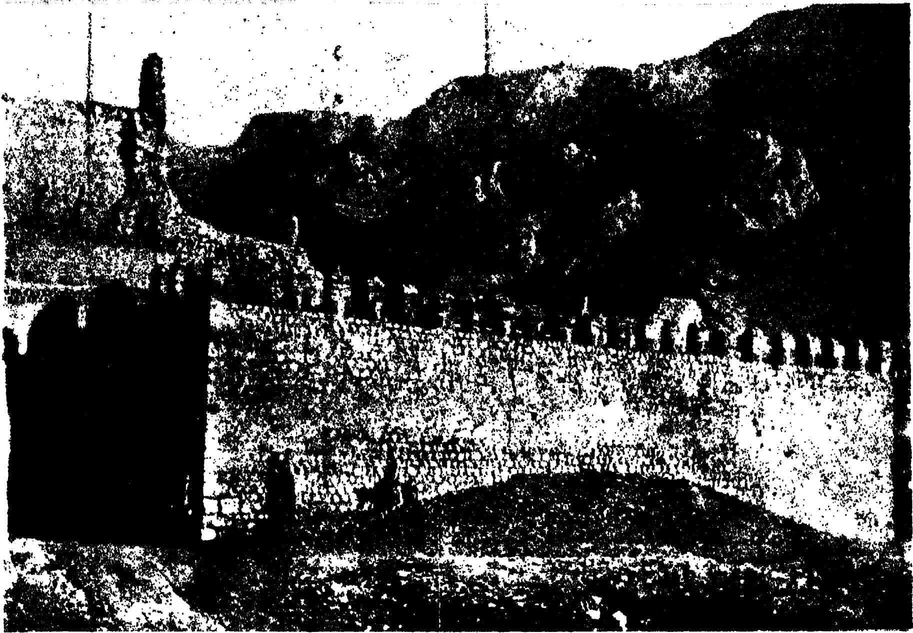
শীতকালে রাজা আবদুল্লা তাঁর তাঁবু-সভা তুলিয়া জর্দ্দান নদীর তীরে আনিয়া সন্নিবেশিত করেন। তখন এ-পথ কতক নিরাপদ থাকে। তখন মোটরে চড়িয়া এ-পথে বহু বিদেশী যাত্রী দেশ দেখিতে আসেন। মোটর গাড়ীর সঙ্গে এ-পথের চিরন্তন বাহন



উপাসনা-বেদী—সেন্ট কাথরিনের মন্দির



আনাতোলিয়ার গরুর গাড়ী



কৈকোবাদের আমলের কেল্লা—আমেশিয়া

উটের পরিচয় থাকিলেও মোটর দেখিলে উটের দল বিগড়াইয়া ছত্রভঙ্গ-পর্ব্ব রচিয়া তোলে।

রাইফেল সঙ্গে না লইয়া এ পথে কেহ চলে না। উষ্ট্র-চালক, কৃষক, এমন কি যে-সব বালক পাহাড়ের বুকে ছাগল চরায়, তাদেরো সকলের হাতে বন্দুক আছে। অর্থাৎ পুলিশ সাজিয়া সকলকে সব সময়ে থাকিতে হয়। নহিলে রক্ষা নাই! এ-অঞ্চলে স্বতন্ত্র পুলিশ-বাহিনী নাই।

হেজাজ-রেলোয়ে গিয়াছে এই আমানকে স্পর্শ করিয়া। দামাস্কাসের যাত্রীরা এ-পথে যাতায়াত করে।



আর্ম্মানী মেয়েরা—শিবাস্

ট্রান্স-জর্দানিয়া আয়তনে ১৬০০ বর্গ-মাইল। এখানকার লোক-সংখ্যা চার লক্ষ। এই চার লক্ষ লোকের মধ্যে আশপাশের বহু প্রদেশ হইতে জেল-পলাতক আসামী আসিয়া মিশিয়াছে প্রায় দেড় লক্ষ।

আমানের পর এখানকার এস-শল্ট সহরের নাম উল্লেখ-যোগ্য। এখানেও অসংখ্য পলাতক-আসামী আসিয়া আস্তানা গাড়িয়াছে। এখানে তাদের আসিবার কারণ, পালেস্তাইনে বা মিশরে যাইবার উপায় নাই। সেখানে



বেদুইন বাঁশীওয়ালা—সিনাই



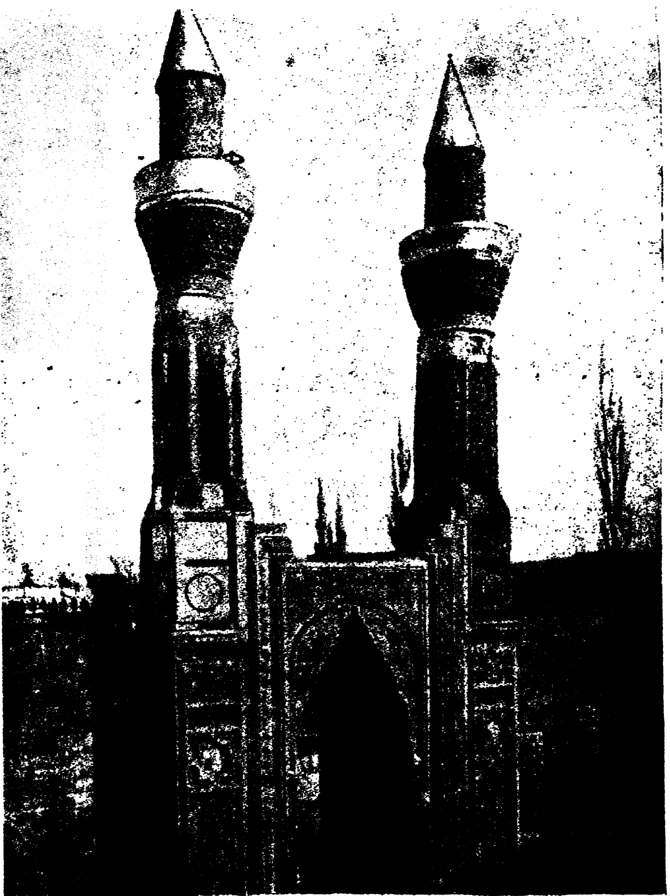
জেবেল্‌-মুশা—সেণ্ট কাথরিনের মন্দির
যাত্রী-নিবাসের সিঁড়ি ; ৩০০০ সিঁড়ি আছে



প্রাচীন আর্মান মাইনর—শিবাস্‌। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে তৈমুরের আক্রমণ রোধ করিতে প্রায় ১৪০০ আর্মান-বীর এই পাহাড়ের নীচে সমাধিলাভ করেন



রোমের পণ্টাশ্-বংশীয় রাজার সমাধি-স্তূপ—আমেশিয়া

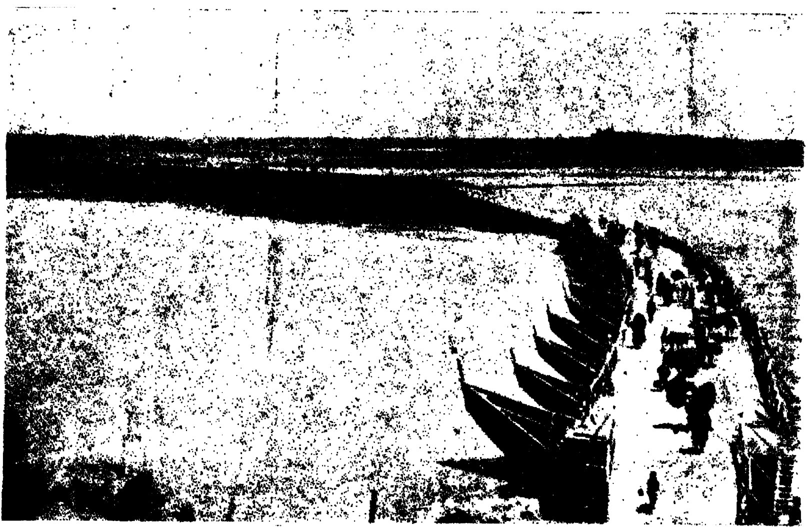


রাজা কৈকোবাদের মসজেদ—শিবাস্

পাশপোর্টের কড়াক্কড় ব্যবস্থা!

ট্রান্স-জর্দানিয়ার ভূমি খুব উর্ব্বর। রাজা আব্দুল্লা বলেন, আমাদের দেশকে আমরা ট্রান্স-জর্দানিয়া বলিতে চাহি না। পালেস্তাইন, হেজাজ, মেশো-পটামিয়ার মতো আমাদের এ দেশ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আজ আমরা গৃহ-প্রাসাদ হারাইয়াছি; ছাউনি আমাদের আশ্রয়। তবু আমরা স্বাধীন জাতি। কাহারো বশ্যতা মানি না। আরবের গৌরবে আমাদের গৌরব। আরবের সুখ-দুঃখে আমাদের সুখ-দুঃখ।

এখানকার রাজ-পতাকা সিরিয়ার পতাকার অনুরূপ।



নৌকা-পুল—মশুল্

দামাস্কাসের উত্তরে এলেপো। তার পর ইউফ্রেটিশ নদীর উভয় তীরে যে-সব গ্রাম, সেই সব গ্রামগুলি মেশোপটামিয়ার অন্তর্গত। এ সব গ্রামের পথে এত ধূলা যে, সে-পথে চলিলে গায়ের লোমকূপ ভেদ করিয়া ধূলা দেহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না! তার উপর মশা-মাছির উৎপাত! এত মশা-মাছি ত্রিভুবনে বুঝি আর কোথাও নাই! দ্বার-পথে গৃহ-প্রবেশ করিতে হইলে মশা-মাছির সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করিতে হয়!



সেলজুক্-মাদ্রাশার পাথরের দেওয়ালে নক্সার কাজ—শিবাস্

এ সব গ্রামে কাঁটা-চামচ ধরিয়া খাইতে বসিলে সকলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জ্জরিত করিয়া বলে,—ঈশ্বর হাত দিয়াছেন, হাতে করিয়া খাও।

এখানকার একটা বিশেষত্ব, বৈকাল হইলে আর কেহ কাজ-কর্ম্ম করিবে না! সকলে বৃক্ষ-ছায়ায় অথবা টাইগ্রিশ বা ইউফ্রেটিশ নদীর তীরে গল্প-গুজব করিতে



দামাস্কাসের বাজার—দূরে অমিয়াদ্ মসজেদ্



এস্-শল্ট—এখানে কিশমিসের প্রচুর ক্ষেত

বসিবে। সে সময় রূপসীরা দলে-দলে জল লইতে আসে। নদীর তীরে তখন যেন রূপের মেলা বসে!

টাইগ্রিশ ও ইউফ্রেটিশ নদীর বুকে যে-সব নৌকা চলে, সেগুলির আকার গোল। জলে যেন বড়-বড় কড়া ভাসিতেছে!

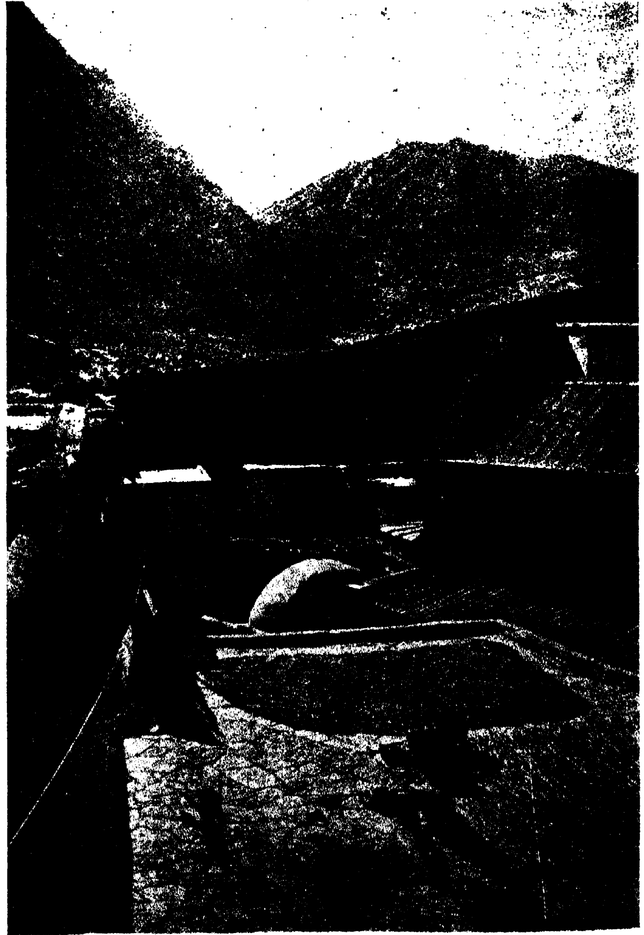
এই মেশোপটামিয়ার পরেই আরবের বিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তর। এখানে সূর্য্যের তাপ চিরদিন অতি-প্রখর।

টাইগ্রিসের তীরে মশুল সহর; দক্ষিণে কুর্দ্দিস্তানের তৈল-খনি।

মশুল হইতে ট্রেণে চড়িয়া বাগদাদে যাওয়া যায়। এই রেলোয়ে-লাইনটি বাগদাদ হইতে বরাবর বার্লিনে গিয়াছে। মেশো-পটামিয়ার তৈল-খনি লইয়া য়ুরো-পীয় জাতিদের সঙ্গে কুর্দ্দিস্তানের কুর্দ্দিদের এক দিন এখানে দারুণ বিরোধ চলিয়াছিল।

মশুল এবং দৈর-এজ্-জরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে যে-সব মরু-বাসীর বাস, তারা কারো বন্ধু নয়, শত্রুও নয়। তারা এ-পথের পথিকদের উপর নিগ্রহ-পীড়ন করে না; শুধু বিদেশী পথিকদের কাছ হইতে চিরদিন ট্যাক্স আদায় করিয়া আসিতেছে। সে ট্যাক্সের পরিমাণ বেশ মোটা; পথিক-পিছু প্রায় পনেরো টাকা করিয়া। ফরাশীরা বলে, এ-ট্যাক্স আদায় করিবার এক্তিয়ার তাদের নাই! এক্তিয়ার না থাকিলেও যাত্রীরা কিন্তু এ ট্যাক্স নির্ব্বিবাদে দিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত রেল-পথ ছাড়া বাগদাদে যাইবার আর একটি পথ আছে। সে পথ এই ইউফ্রেটিসের পশ্চিম-তীরবর্ত্তী দৈর-এজ্-জর এবং আবুল-কমল হইয়া। এ-পথে প্রাচীন বহু কীর্ত্তি—শালাহিয়া, ব্যাবিলন, নিনেভা, পালমিরা, টেশিফান—সে-সবের শত সহস্র স্মৃতি পুঞ্জিত আছে! আবুল-কমলের পর আট মাইল ব্যাপিয়া যে-ভূমি, সে-জায়গার মালিক নাই! (No man's land)। এ-অঞ্চলটি ব্রিটিশ-মেশোপটামিয়া এবং ফরাশী-সিরিয়ার মধ্যে অবস্থিত। এ-অঞ্চলে বেদুইন দস্যুদের বাস। লুঠপাট এবং মানুষ ধরিয়া বন্দী করিয়া রাখাই তাদের কাজ। রীতিমত দাম আদায় করিয়া তবে তারা বন্দী ছাড়ে।



সেণ্ট কাথরিন মঠের ছাদ

ইউফ্রেটিশের বুকে এবং উভয় তীরে কামানের চাকা, শেল্, রাইফেল, বর্ম্মাদি আজো বহুল ভাবে প্রোথিত দেখা যায়।

বাগদাদের অদূরে রামাদিতে ব্রিটিশ-দুর্গ আছে।

এই বাগদাদ এক কালে ছিল হারুণ-অল-রশিদের রাজধানী। আরব্য উপন্যাসের সে-রোমান্সের রঙ বাগদাদের আকাশে-বাতাসে কোথাও আজ নাই! যুদ্ধবিগ্রহে ইউফ্রেটিশ এবং টাইগ্রিশ নদীর তীরভূমি বর্ণবিভবে বঞ্চিত। দিকে-দিকে ধূ-ধূ প্রান্তর পরিত্যক্ত অবহেলিত পড়িয়া আছে। তবু দেখিলে বুঝা যায়, এক দিন এ-সব প্রান্তর শ্যামল তৃণশস্যে সমৃদ্ধ এবং বিভূষিত ছিল। পথের মাঝে-মাঝে জলতোলার বিচিত্র কৌশল আজো স্মৃতিমাত্রে



জেবেল্ মুশা

পর্য্যবসিত আছে। তাছাড়া প্রান্তরের বুকে কোথাও মাটির তৈজসপত্র, কোথাও প্রাচীন আসবাবাদি শ্মশানের বিভীষিকা জাগাইয়া পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির শোকে যেন হাহাকার করিতেছে!

মেশোপটামিয়ায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আরবের বাস। এত দুঃখ, এত অভাব সহিয়াও তারা দেশের মাটী ত্যাগ করে নাই। স্ত্রী-পুত্র, এবং উট-ছাগল লইয়া মনের আনন্দে আছে।

মেশোপটামিয়ায় শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের প্রায় পাঁচ কোটি ডলার ব্যয় হইয়াছিল। এখানে খেজুর এবং যষ্টিমধু হয় প্রচুর, অজস্র। তার উপর মশুল, বাশরা এবং বাগদাদের মধ্যবর্ত্তী আলি পর্ব্বতে এবং পারস্য-সাগরের কূলে আবাদানে প্রচুর তৈল-খনি আছে। সামরিক ঘাঁটি-হিসাবে মেশোপটামিয়ার প্রভাব আজ অসামান্য। এ জায়গাকে ভারতবর্ষের তোরণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মেশোপটামিয়াকে সুরক্ষিত রাখিতে পারিলে পারস্যে এবং ভারতবর্ষে অপর-কোনো য়ুরোপীয় জাতি প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। এখানকার রাজারাও বৃটিশ-রাজশক্তিকে আশ্রয় করিয়া আছে। তবে মেশোপটামিয়াকে রক্ষা এবং পরিতৃপ্ত করিতে বৃটেনকে বেশ মোটা-রকম খরচ দিতে হয়।

এখানকার ওয়াহাবি জাতি খুব সাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ। তাদের শান্ত রাখা আয়াস-সাধ্য ব্যাপার। আরব-মরুর প্রান্তে পারস্য-উপসাগরের কূলে এই ওয়াহাবিদের আস্তানা।

ওয়াহাবিরা ধর্ম্মে খুব খাঁটী মুসলমান। তারা সুরা স্পর্শ করে না। ব্যভিচার, মিথ্যা-ভাষণ, জাল-জালিয়াতী এবং প্রতারণা নিষ্ঠা-ভরে বর্জ্জন করিয়া চলে। তার উপর তাদের বিশ্বাস, উড়নচণ্ডীর উপর ভগবান চিরদিন বিরূপ! এজন্য তারা ধূমপান করে না। অলঙ্কার-ভূষণেও তাদের প্রচণ্ড বিরাগ। ওয়াহাবি-জাতের মেয়েরা অলঙ্কার ব্যবহার করে না। ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের কাছ হইতে ওয়াহাবি-সর্দ্দার মোটা টাকা বার্ষিক সেলামী পায়। সেই সেলামীর জন্য ব্রিটিশ এবং ফরাশী জাতিকে ওয়াহাবিরা মানিয়া চলে; তাদের বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ওয়াহাবিদের সর্দ্দার এই সেলামী-প্রসঙ্গে বলে, এ সেলামী কাফেররা শ্রদ্ধা-স্বরূপ আমাদের নিবেদন করে। (That is a tribute from the infidels.)

মানচিত্রে আরব এবং মিশরের অবস্থান দেখিলে মনে হয়, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে ভিন্ন ভাবে অবস্থিত হইলেও এ দু'টি প্রদেশকে ভগবান এমন ভাবে পৃথিবীর বুকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যেন মাঝখানে ঐ লোহিত-সাগরের ব্যবধান না থাকিলে দু'টি প্রদেশ মিলিয়া এক হইত! প্রাচীন যুগে সারাশেন্ জাতির প্রতাপে মিশর এবং আরব মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়াছিল। এখন নানা উপজাতির আবির্ভাবে এবং সারাশেন্-প্রভাব চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার ফলে আরবে-মিশরে এই প্রভেদ! তবু ভাষা ও জাতিগত অবৈষম্যে আরবের সহিত মিশরের বন্ধন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাষা এবং জাতির উপরে আছে এক-ধর্ম্মের বন্ধন। এ-বন্ধন আরব ও মিশরীকে ভ্রাতৃতুল্য করিয়া রাখিয়াছে! রাজনীতির দিক দিয়া আরবের সহিত মিশরের মিলনের আশা খুবই স্বাভাবিক। তার উপর আরব আজ তার পূর্ব্ব-গৌরব স্মরণ করিয়া এই নৃশংস যুদ্ধলীলায় দারুণ বিরক্ত। যে কুশলী রাজনীতিক মিশর এবং আরবকে আজ মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে পারিবেন, তাঁর পক্ষে মঙ্গল সুনিশ্চিত। ইহা বুঝিয়াই ব্রিটিশ-জাতি যে আজ আরব ও মিশরকে আপন করিতে পারিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, জার্ম্মানির প্রবল হিংসার অবসান বুঝি-বা এই মিশরে এবং পশ্চিম-এসিয়াতেই সংঘটিত হইবে!

বরষা

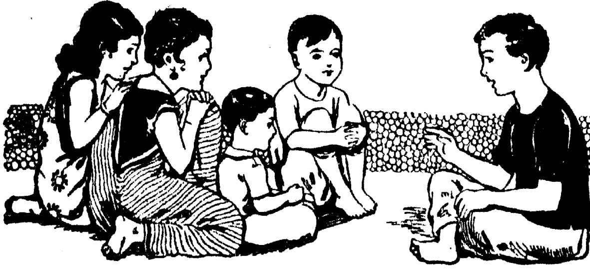
বরষা বরষা সুন্দরি বরষা,
অঞ্জলি ভরে তুমি এনে দিলে ভরসা।
নিষ্ঠুর নিদাঘের নিপীড়নে ধরণী
প্রাণহীন হ'য়েছিল ধূসরিয়া ধরণী।
তব স্নেহ-পরশনে ধরণীর বুকে আজ
জেগে ওঠে শিহরণ, পরি মোহনিয়া সাজ।
উদার আকাশ আজি প্রেম-বারি বরষে,
পিপাসিত পৃথিবীকে শীতলিছে হরষে।

তব মধু-আগমনে হ্রদ, নদী, পল্বল,
যৌবন-ভরা দেহে করিতেছে ঢল-ঢল।
কাঁচলিতে কুবলয়, কহ্লার কর্ণে
খচি তারা সাজিয়াছে মোহনিয়া বর্ণে।
দূরে মেঘ মন্দ্রিছে গুরু-গুরু গম্ভীর,
বুকে তার চলিতেছে প্রেম-খেলা বিজলীর।
চমকে পথিক-বধূ বঁধুয়ারে স্মরিয়া,
হৃদয়ের ব্যথা ঝরে দুই আঁখি ভরিয়া।
পাখা মেলি নাচে শিখী, ডাকিতেছে দাদুরী,
মোহনিয়া ধরা আজ যেন মেয়ে আদুরী!

দেহে তার শিহরণ, নীপ শোভে কর্ণে,
শ্যামলিয়া অঞ্চলে ফুল নানা বর্ণে।
শোভা তার মরি মরি জলদের অলকে,
সীমন্তে রামধনু সিন্দূর ঝলকে!
শিরীষের কুসুমেতে সুশোভিত কুন্তলে
অপরূপ সুশোভনা, আঁকে রেখা মন-তলে।
মালতী যূথীর মালা নিটোল উরসে ধরে,
লোধ্রের রেণু মাখে পেলব কপোল 'পরে।
অপরূপা আজি ধরা! সুন্দরী বরষা,
তব মধু-পরশনে যৌবন-সরসা।

দেহ-ভরা যৌবনে শিঞ্জিনী তুলিয়া
ছোটে নদী দিক্‌হারা আপনারে ভুলিয়া,
মিলিবারে প্রিয়তম সিন্ধুর উরসে
আপনারে উপাধিতে তিতি কোন্ সুরসে।
রোদে-মেঘে লুকোচুরি খেলিতেছে পুলকে,
সাঁঝে শুভ্রা বধূ বেণী রচে অলকে।
তব শুভ আগমনে সুন্দরি বরষা,
উছলিত আজি ধরা সীমাহারা হরষা।

শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস।



নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা

[রূপকথা]

আট

ঝরণার মিষ্ট জলে তৃষ্ণা দূর ক'রে লীনা তার বাহন বিজলীকে জল খাওয়াচ্ছিল। ঝরণার বিপুল জলরাশি হুড়্-হুড়্ শব্দে গড়িয়ে এসে একটু তফাতে একটা নীচু জায়গায় সঞ্চিত হ'য়ে ছোট একটি কুণ্ডের সৃষ্টি ক'রে জলে পূর্ণ হ'য়ে, তার জল চারধারে উপ্‌ছে প'ড়ছিল। বিজলী এই জলপূর্ণ কুণ্ডে মুখ ডুবিয়ে স্থির ভাবে জল পান করছিল। লীনা তার পাশে দাঁড়িয়ে সামনের দিকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে ভাবছিল—কোন্ রাস্তা ধ'রে বিজলীকে এবার সে চালাবে। তার মনে হ'ল, এখানকার পাথর-গুলো ক্রমশঃ যেন উঁচু হ'য়ে উঠেছে! লীনা শুনেছিল, এই ঝরণার কাছেই দুরন্ত লালুং জাতের আস্তানা আছে; আবার জয়ন্তী দেবীর পবিত্র পীঠও আছে। সে সাধু দাদুর কাছে শুনেছিল, এই দেবীর মহিমা অসাধারণ; তাঁর পীঠে গিয়ে কেউ কোন প্রার্থনা ক'রলে, দেবীর প্রসাদে তা' পূর্ণ হয়। কিন্তু লালুংদের ভয়ে কেউ দেবীর পীঠের কাছে যেতে সাহস করে না। লীলার মনে হঠাৎ দেবী-দর্শনের সাধ জেগে উঠলো। সে ভাবলে,—দেবীর পীঠের কাছেই যখন এসেছি, তখন দেবীকে যদি দর্শন না ক'রে যাই ত' ভারী অবিবেচনার কাজ হবে। সামনের পাহাড়ে রাস্তাটির দিকে চেয়ে সে বুঝতে পারলে—ঐ রাস্তা ধ'রে গেলেই জয়ন্তী দেবীর পীঠস্থানে পৌছাতে পারবে। দেবীদর্শনের ইচ্ছাটুকু প্রবল হ'তেই তার মনের আনন্দ যেন ঝরণার জলের মতনই উপ্‌ছে উঠলো; বিজলীকে এই সময় জলকুণ্ড থেকে মুখ তুলতে দেখেই সে সোৎসাহে ব'ল্‌লে, —চল্ বিজলী, একটা নতুন জায়গা দেখ্‌তে যাই।

লীনার কথা বিজলীর কাণে গেল কি না কে জানে, কিন্তু মুখখানি তুলেই হঠাৎ সে অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে পিছনের পা-দুটো পাথরের ওপর ঠুকতে-ঠুকতে এমন একটা বিকট আওয়াজ ক'রলে যে, লীনার মত সাহসী মেয়েও তাতে চমকে উঠলো। সামনের দিকেই এতক্ষণ সে তাকিয়ে এগোবার রাস্তার সন্ধান ক'রছিল; পাশের দিকে তার দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু বিজলীর চীৎকারে বাঁ-দিকে সে ফিরে চাইতেই চোখ দুটো তার কপালে উঠলো; সে দেখ্‌লো—পাশাপাশি পাঁচটি কালো পাথরের চাঁই যেন প্রাণ পেয়ে তার দিকে গড়িয়ে আসছে!

বুদ্ধিমতী লীনার বুঝতে বিলম্ব হ'ল না—পাথরের মতন কালো মিশমিশে ঐ যে পাঁচটি বিকট মূর্ত্তি বুকে ভর দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে, ওরা সেই দুরন্ত রাক্ষুসে লালুংদেরই দলের লোক! তাদের কথা একটু আগেও লীনার মনে প'ড়েছিল।

হঠাৎ কোন বিপদ দেখলে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ে ভয়ে আকাট হ'য়ে যায়, তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পায়; কিন্তু লীনার শিক্ষা-দীক্ষা অন্য রকম, বিপদ দেখলে তার বুদ্ধি যেন আরও খুলে যায়, সঙ্গে-সঙ্গে নানা রকম অদ্ভুত ফন্দী তার মাথায় এসে তাকে মুক্তির উপায় দেখিয়ে দেয়।

লীনা এ বিপদে কি ক'রলে জান?—সে ভয়ে চীৎকার ক'রলে না, এমন কি, সেই কালো বেঁটে ষণ্ডামার্কাগুলোকে দেখ্‌তে পেয়েছে—ভাবভঙ্গিতে তাও প্রকাশ ক'রলে না; বিজলীর মুখের লাগামটি জোর ক'রে ধ'রে, আস্তে-আস্তে তার পিঠ চাপ্‌ড়ে, পাহাড়ী-ভাষায় চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো—তুই ত ভারি বেহায়া বিজলী? জন্তু-জানোয়ারের সাড়া পেয়ে ভয় পেলি না কি? এই মুরোদে তুই হবি জয়ন্তীয়ার রাণীর বাহন? কি লজ্জার কথা!

কথাগুলি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সে যেন হাওয়ায় ভর দিয়ে বিজলীর পিঠে উঠে ব'স্‌ল। মুখের লাগামে পরিচিত ঝাঁকুনি পড়তেই বিজলীও বুঝতে পারলে, তাকে সামনের পাহাড়ে' রাস্তা দিয়ে তীরবেগে ছুটতে হবে। সামনে শত্রু দেখলে কি ক'রে পিছু হঠ্‌তে হয়, আর পিছনে বিপদের সাড়া পেলে কি ভাবে সামনে দৌড়িয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হয়—বিজলী তা ভালোই জান্‌তো। সেই শিক্ষা এখন তার কাজে লাগলো।

সেই পাঁচটি বেমক্কা জোয়ান তাদের বিদ্‌ঘুটে কদাকার মুখগুলো উঁচু ক'রে তুলে দেখল, ঝরণার জলের কল-কল শব্দের সঙ্গে পাথরের ওপর ঘোড়ার পায়ের খটাখট্‌ আওয়াজ মিশিয়ে দিয়ে পরীর মত সেই অপরূপ সুন্দরী তেজস্বিনী মেয়েটি চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে তাদের হাতের বাইরে চলে গেছে!—আর তার নাগাল পাওয়া শক্ত!

ধুড়-মুড় ক'রে সেই পাচ মূর্ত্তিই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালো; সঙ্গে-সঙ্গে তাদের সামনের দুটো জোয়ান হাতের বর্শা বাগিয়ে-ধরে ছুঁড়তে গেলো ঘোড়াটাকে লক্ষ্য ক'রে। কিন্তু তাদের সরদার পিছন থেকে মেঘ-গর্জ্জনের মতো আওয়াজে বল্‌লে,—খবরদার! হাতিয়ার সামাল, ছাড়িসনে ওটা।

লোক-দুটো ভড়কে গিয়ে হাত নামিয়ে তার দিকে ফিরে তাকালো; হাতের বর্শা তাদের হাতেই রয়ে গেল। এক জন বল্‌লে—বলো কি? শিকার যে ভাগলো!

সরদার বললে—আরে, ও ছুক্‌রী কি আমাদের দেখতে পেয়েছে যে পালাবে? ভাগ্যিস্‌ আমরা ওকে রুখিনি, তা হ'লে কি রক্ষা থাক্‌তো?

আর একটা জোয়ান জিজ্ঞাসা করলে—কেন, কি হ'তো?

সরদার মুখের কদর্য্য ভঙ্গি ক'রে উত্তর দিলে—তুই কি কালা হয়েছিলি, শুনলিনি ওর কথা,—ঘোড়ার পিঠে উঠতে গিয়ে ও কি বললে? আমরা আগে জানতে পারলে কি হাত বাড়িয়ে আগুন ধরতে ছুটে আসতাম রে! ও মেয়ে কি কেউ-কেটা? মেয়ে-মুলুকের রাণী, সফরে বেরিয়েছিল। নইলে আর কোনো মুলুকের মেয়ের কি এত সাহস হয়, না, ভরসা করে এখানে আসতে?

সরদারের কথা শুনেই তার অনুচর চারটের মুখ যেন ভয়ে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। তারা লীনার কথাগুলো শুন্‌লেও তলিয়ে তার মানে বোঝেনি। এরা যত বড় দুর্দ্দান্ত আর দুঃসাহসী হোক, মেয়ে-মুলুকের ছায়া মাড়াতেও কেউ কোন দিন সাহস করেনি। পুরুষানুক্রমে এরা শুনে আস্‌ছে, ও-রাজ্যের মেয়েরা ডাকিনী-সিদ্ধ, যাদু-মন্ত্রের ওস্তাদ! পুরুষ-মানুষ ওদের ত্রিসীমায় গেলেই ওরা মন্ত্র আউড়িয়ে তাকে চোখের পলকে জানোয়ার কিম্বা গাছ-পাথর ক'রে ফেলে। ঐ মেয়ে-রাজ্যটিকে ঘিরে যে সব পাহাড়, বন-বাদাড়, গাছ-পাথর আছে, তারা সব আগে মানুষ ছিল, মেয়ে-মুলুকের রাণীর মন্তরে পাহাড়-জঙ্গলের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাই এদের কেউ সেই মুলুকের কাছেও ঘেঁসে না। এ হেন মেয়ে-মুলুকের রাণীকে ধরবার জন্যে তারা কোমর বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছিল, এ কথা মনে হ'তেই তাদের পাথরের মত শক্ত বুকগুলো ভয়ে টিপ্‌-টিপ্‌ ক'রে উঠলো! কি সর্ব্বনাশই হোত! আর একটু হ'লেই ত তারা যাদুকরী মেয়ে-রাণীর মন্তরে গাছ-পাথর হ'য়ে যেতো!

কিন্তু এখন উপায়? রাজাকে কি বলা যাবে? মেয়েটির খবর যে লোকটি রাজাকে দিয়েছিল, সে-ও এই পাঁচ জনের দলে ছিল। কথাটা সেই জিজ্ঞাসা ক'রলে।

সরদার বললে—কেন, সাঁচ্চা কথাটাই রাজাকে বলা যাবে। ঐ মেয়েটিই যে মেয়ে-মুলুকের রাণী, তুই তা জান্‌বি কি ক'রে? জান্‌তে পেরেই ত আমরা শেষে পিছিয়ে এসেছি,—এই কথাই রাজাকে বল্‌তে হবে, সোজা কথা।

সরদারের কথাটি শেষ হ'তেই তার পিঠে পড়ল পিছন থেকে সপাং-সপাং ক'রে তিন ঘা চাবুক!

'বাপ্‌ রে'—ব'লে আর্ত্তনাদ ক'রে সরদার লাফিয়ে উঠ্‌লো, তার সঙ্গীরাও ভয়ে-বিস্ময়ে চক্ষু কপালে তুলে ফিরে চাইলো; কিন্তু যমের মতন যে ভীষণ মূর্ত্তিটা তারা দেখ্‌তে পেল, তাতে তাদের সবারই বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল!

অবাক কাণ্ড! রাজা স্বয়ং পাষাণপুরী থেকে চুপি-চুপি বেরিয়ে এসে তাদের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছে! কথাগুলো নিশ্চয়ই সব সে শুনেছে, তাই ত চাবুক হাঁকিয়েছে—

সরদারটার পিঠে। কিন্তু রাজাকে এরা ভয় করত—যমের মতন, আর ভক্তি করত—দেবতার চেয়েও বেশী। রাজা কেন তাকে চাবুক মারলে, আর তাতে কি প্রচণ্ড জ্বালা—তা ভুলে সরদারই প্রথমে পাথরের ওপর সটান লম্বা হ'য়ে শুয়ে-পড়ে রাজাকে অভিবাদন করলে। তার সঙ্গীরাও তখনি সেইখানে ঐ ভাবে গড়াগড়ি দিয়ে রাজাকে ভক্তি দেখালে।

কিন্তু অনুচরদের এই অতিভক্তিতে রাজার মন নরম হ'ল না। সে তাদের প্রত্যেকেরই পিঠে তিন-তিন ঘা চাবুক কষিয়ে ষাঁড়ের মতো চীৎকার ক'রে বলে উঠলো,—হাতের মুঠোর ভেতর পেয়ে শিকারটা ছেড়ে দিলি, আহাম্মুকের দল ?

গায়ের জ্বালা গায়েই জুড়িয়ে পাঁচ জনেই কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু কি জবাব তারা দেবে? রাজা ত কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সবই দেখেছেন, তাদের সব কথাই শুনেছেন। তবে কি রাজা মেয়ে-মুলুকের রাণীকেই ধরতে চায়? এত সাহস? রাজাটার কি বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পেয়েছে সেই সুন্দরীকে দেখে? —সকলেই এ কথা ভাবলে।

রাজা এবার বললে,—আমি অনেকটা তফাতে ছিলুম, নইলে নিজেই ও-শিকার পাকড়াতাম। অমন সুন্দরী আমি জীবনে দেখিনি। ঐ রকম সুন্দরীকেই রাণী করতে চাই। আমার মন বুঝেই জয়ন্তীয়া মায়ী তাকে এখানে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তোদের বোকামীতেই সে হাতছাড়া হ'ল।

সরদার এবার হাত দু'টি জোড় ক'রে কাঁপতে-কাঁপতে বললে,—কিন্তু মহারাজ, ও ত আর কোন মেয়ে নয়, ও মেয়ে-মুলুকের রাণী কি না!

রাজা গর্জ্জন ক'রে বলে উঠলো,—চুপ ক'রে থাক্ পাজী! তোর ও মিছে কথা। মেয়ে-মুলুকের রাণী কোন দিন তার মুলুকের বাইরে পা বাড়ায় না। কখনো দেখেছিস্, ঐ মুলুকের কোন মেয়েকে তাদের গড়ের বাইরে আসতে? সরদারী করছিস্, আর এই সোজা খবর তোর জানা নেই?

কথাটা শেষ ক'রেই রাজা তার পিঠে আর এক ঘা চাবুক কষিয়ে দিলে। রাজার কথা শুনে পাঁচ জোয়ানের মুণ্ড ঘুরে গেল। সত্যিই ত, মেয়ে-মুলুকের মেয়েদের গল্পই তারা শুনেছে, চোখে ত কোন দিন তাদের কাউকে দেখেনি। আর, তারা যে তাদের মুলুকের বাইরে বেরোয় না, এ কথাও ত মিথ্যে নয়। রাজা ত ঠিক ধরেছে; কিন্তু তারা তখন ভাবলে, মেয়েটি তা হ'লে কে? আর, অমন ক'রে রাণীর কথাই বা সে বললে কেন?

অনুচরগুলার মুখের ভঙ্গি দেখেই রাজা যেন তাদের মনের কথা বুঝতে পারলে। রাজা তার কষ্টি-পাথরের মত কালো মুখখানা বেঁকিয়ে, খড়ির মত সাদা দাঁতগুলি বের ক'রে বল্‌লে,—ও মেয়ে যেমন রূপসী, তেমনি চালাক; তাই একটা আজগবি কথায় তোদের বোকা বানিয়ে সে পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমি তার চেয়েও ঢের বেশী চালাক। তার চুলের মুটি ধরে ঘোড়াশুদ্ধ যদি তাকে ফিরিয়া আনতে না পারি, তা হ'লে আমার নামই মিছে। কদ্দূরই বা সে যাবে? রাজার সঙ্গে চালাকি! এত আস্পর্দ্ধা!

সরদার করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলে,—তা হ'লে এখন আমরা কি করবো রাজা!

রাজা পুনর্ব্বার হুঙ্কার দিয়ে বল্‌লে,—ধরা চাই ঐ সুন্দরীটাকে। মনে থাকে যেন, সে হবে আমার রাণী; তার জন্যে রাতারাতি সমস্ত পাথারিয়া-মুলুক যদি আমাকে ওলট-পালট করতে হয়, তাতেও আমার আপত্তি হবে না। বেশী লোকের দরকার নেই, পঁচিশ জন সওয়ার আর বারোটা শিকারী। বাস্, এতেই কাজ হবে। আর দেরী নয়, জল্‌দী করো।

রাজার কথার সঙ্গে-সঙ্গে সেই পাঁচটা জোয়ান ঝড়ের মতো বেগে পাথরের ভিতরের সুড়ঙ্গ দিয়ে ছুটলো—রাজার জরুরী হুকুম তামিল করতে। আর রাজা তার হাতের চাবুকটা বার-কতক সজোরে আস্ফালন ক'রে সেই পাথুরে জায়গাটায় আহত বাঘের মতন দাপিয়ে বেড়াতে লাগলো।

আগেই তোমরা এই রাজাটির কিছু-কিছু পরিচয় পেয়েছ। এখন তার চেহারা আর স্বভাবটির কথাও শুনে রাখো। একখানা লম্বা, চ্যাওড়া, নিটোল কালো কষ্টি-পাথর কুঁদে বিধাতাপুরুষ নিজের হাতেই যেন এই রাজার মূর্ত্তিটি নির্ম্মাণ করেছিলেন! কোথাও

এতটুকু ভুল-চুক হয়নি, আগা-গোড়াই সমান কদাকার। এ-জাতের লোকগুলা সাধারণতঃ বেঁটে, আর তাদের দেহের যা কিছু বাড়-বৃদ্ধি, তা পাশের দিকেই হ'য়ে থাকে। কিন্তু রাজা ঢুলুর চেহারাটি যেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এ-জাতের ভেতর এমন বেজায় লম্বা চেহারার মানুষ একটাও দেখা যায় না। ঢুলুর বাবার দেহও অনেকটা লম্বা ছিল বটে, কিন্তু ছেলে তার মাথার ওপরেও আধ হাত উঁচু! ঢুলুর বাবা বেছে-বেছে অন্য জাতের তাড়কা রাক্ষসীর মতো একটা লম্বা মেয়ে ধরে এনে তাকেই রাণী ক'রেছিল। সেই রাণীর গর্ভেই ঢুলুর জন্ম। ঢুলুর ছেলে-বেলাতেই তার মা মারা যায়। ঢুলু তার মায়ের মত আকৃতি পেলেও প্রকৃতি তার বাপের মতনই হ'য়েছে। তার দেহে যেমন অসাধারণ বল, তার মনেও সাহস তেমনই অদ্ভুত, আর রাগও তেমনই ভীষণ। কোন বিষয়ে তার তাঁবেদারদের একটু ক্রটি বা ভুলচুক হ'লে আর তাদের নিস্তার ছিল না। অমনি সপাসপ্ চাবুক তাদের পিঠে পড়ে। রক্তমাংসে-গড়া মানুষ ঢুলুরাজার কাছে যেন কীট-পতঙ্গ।

খানিক পরেই পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো পঁচিশ জন সশস্ত্র লালুং জোয়ান। তাদের চেহারা একই রকমের; সর্ব্বাঙ্গে উল্কীর বাহার, কোমরে কৌপীনের মতন লাল রঙ্গের এক এক টুকরো ন্যাকড়া জড়ানো; তাতে নানা রঙ্গের পাখীর পালক ঝুলছে। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো লাল রঙ্গের ফেটি দিয়ে বাঁধা; তার চার ধারে বড় বড় পালক খাড়া হ'য়ে আছে। গা মিস্‌মিসে কালো, কোমরে ভোজালী—এক হাতে বল্লম, আর এক হাতে ঘোড়ার লাগাম। সবার সঙ্গে এক একটি কালো রঙ্গের ঘোড়া। দলের যে লোকটি আগে ছিল—তার সাথে ছিল ছুটো ঘোড়া, একটা তার নিজের জন্যে, আর অপরটি যে ঢুলুরাজার ঘোড়া, তার তেজী চেহারা আর সাজ-সজ্জার বাহার দেখেই বুঝতে পারা যায়। পঁচিশ জন লালুং এগিয়ে এসেই রাজার সামনে মাটীতে সটান লম্বা হয়ে প'ড়ে তাকে অভিবাদন করলে। রাজা কোন কথা না বলে তার ঘোড়ার লাগাম সেই লোকটির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ব'সলো। দলের পঁচিশ জন লালুং তখন এক হাতে বল্লম আর অন্য হাতে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধ'রে রাজার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। রাজা হুকুম না করলে ত তারা রাজার সামনে ঘোড়ায় চড়তে পারে না।

রাজা মুখ ফিরিয়ে তাদের পানে একটি বার তাকিয়ে হাত নেড়ে কি যেন ইসারা করলে; অমনি সেই জোয়ানগুলোর সকলেই কলের পুতুলের মতন একসঙ্গে নিজ-নিজ ঘোড়ায় চড়ে বসল; সঙ্গে-সঙ্গে সকলে সমস্বরে রাজার জয়ধ্বনি করলে। রাজা তখন চাপা গলায় তাদের বললে--গোল করিসনে! চুপি-চুপি আমরা পাহাড়ের পথে এগিয়ে যাব।—তার পর ঘোড়াটাকে এক পাক ঘুরিয়ে এনে রাজা অনুচরগুলোকে একটি একটি ক'রে গুণে ও দেখে নিয়ে বললে,—ঠিক আছে।

পঁচিশটি তেজী ঘোড়া পাহাড়ের পথে ছুটবার জন্যে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। রাজা এবার জিজ্ঞাসা করলে,—শিকারীরা কোথায়?

একটা অনুচর মাথা হেঁট ক'রে বললে,—তাদের ফটক খুলে দেওয়া হ'য়েছে—এখুনি এসে পড়বে। সকলের পিছনে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, সে এই সময় বলে উঠলো,—ঐ যে, তারা আসছে।

তার কথার সঙ্গে-সঙ্গে একটা অদ্ভুত রকমের হিস্-হিস্ শব্দ উঠলো; ঘোড়াগুলো যদিও এ-শব্দের সঙ্গে পরিচিত ছিল, তবু তারা প্রত্যেকে পিছনের পা-ছুটো পাথরের গায়ে ঠুকতে-ঠুকতে পিছু হঠ্‌তে লাগলো। রাজা তখনি হুম্‌কি দিয়ে বলে উঠলো,—হুঁসিয়ার, জোয়ান সব!

পরক্ষণেই তীরের বেগে বেরিয়ে এল রাজার সেই অদ্ভুত শিকারীর দল। তোমরা হয় ত ভেবেছ, রাজার অনুচর ঐ সব লালুংয়ের মতোই এরা আর এক দল দুর্দ্ধর্ষ লোক। কিন্তু তা নয়; যারা ঝড়ের গতিতে হিস্-হিস্ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে এলো, তারা অদ্ভুত রকমের এক দল হিংস্র জানোয়ার! ডালকুত্তা-জাতীয় কুকুরের মতোই এদের আকৃতি, কিন্তু দেহ আরো কিছু স্থূল ও দীর্ঘ; গায়ের রঙ টকটকে লাল,—এত ঘোর লাল যে, দেখলে মনে হয়, তাদের লোমগুলো যেন তাজা রক্ত দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া



রথের মেলা

শিল্পী—শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

হয়েছে! দেহ এদের যতটা লম্বা, ল্যাজগুলো তার দ্বিগুণ লম্বা—'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি' আর কি! পায়ের নখগুলো বাঁকা, আর দারুণ ধারালো; মুখগুলো সরু হ'লেও মুখের হাঁ ভীষণ বড়; দাঁতগুলো করাতের দাঁতের মতন ঘন, আর তেমনই তীক্ষ্ণ। এদের গতি যেমন দ্রুত, তেমনই দুর্ব্বার। কোন বাধা এরা মানে না, কাউকে ভয়ও করে না। সামনে নদী পড়লে সাঁতরে পার হয়, শত্রু যদি কোন গুহায় ঢোকে, এরা সেখানে সেঁধিয়ে তার টুঁটি কামড়ে ধরে তাকে টেনে বার করে। গাছে উঠলেও নিস্তার নেই; কেন না, এই বেপরোয়া জানোয়ারগুলো গাছে উঠতেও পটু। ঘ্রাণ-শক্তিও এদের এত তীক্ষ্ণ যে, শত্রু কোথাও লুকিয়ে এদের চোখে ধূলো দিতে পারে না। এই ভীষণ জানোয়ার-গুলোকেই তারা 'শিকারী' বলে।

ঘোড়ার পিঠে রাজাকে দেখেই কিন্তু এই রক্তবর্ণ ভীষণদর্শন বারোটি শিকারী একসঙ্গে থমকে দাঁড়ালো, তাদের লম্বা-লম্বা ল্যাজগুলো দংশনোদ্যত সাপের ফণার মতন মাথার উপর উঁচু হ'য়ে দুলতে লাগলো। রুদ্ধ গহ্বর থেকে মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে এসে, আর চোখের সামনে প্রভুকে দেখে যেরূপ আহ্লাদে তারা অঙ্গভঙ্গি করতে লাগলো, তাতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এরা রাজার খুব অনুগত, আর শিক্ষিত শিকারী।

ঢুলুরাজা সামনের অশ্বারোহী অনুচরটির পানে চেয়ে ব'ল্‌লে,—খুঁজে দেখ্ সেই মেয়েটির কি নিশানা এখানে আছে,—জল্‌দি।

তুড়ুক ক'রে ঘোড়া থেকে নেমে লোকটি চারি দিক হাতড়াতে লাগলো। হঠাৎ তার নজরে প'ড়লো কতকগুলো ফলের টুকরো, আর গামছার মত এক-টুকরো রঙ্গীন কাপড়। এগুলো লীনা দেবীই সেখানে ফেলে গিয়েছিল। ফলগুলো তারই উচ্ছিষ্ট; কোনটির অর্দ্ধেক, কোনটি বা এক-কামড় খেয়েই সে ফেলে দিয়েছিল। আর ঝরণার জলে হাত-মুখ ধুয়ে ভিজা গামছাখানি একটা পাথরের গায়ে শুকুতে দিয়েছিল; কিন্তু সেই স্থান ত্যাগ করবার সময় তাড়া-তাড়িতে গামছাখানার কথা আর তার মনে পড়েনি। উচ্ছিষ্ট ফলের টুকরো আর গামছাখানি দেখে ঢুলুরাজা বলে উঠলো,—ফলগুলোর আর দরকার নেই, ঐ কাপড়খানাতেই কাজ হবে। শিকারীদের ওর গন্ধটা চিনিয়ে দে।

রাজার সেই অনুচরটা তখনি গামছাখানা নিয়ে দলা পাকিয়ে 'শিকারী'দের সামনে সেটা ফেলে দিয়ে নিজের ঘোড়ায় উঠে বসলো। শিকারীগুলো যেন ঐ জিনিষটির জন্যেই মুখিয়ে ছিল, পড়বামাত্রই বারোটি শিকারী সেটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে একটির পর একটি ক'রে নাক দিয়ে শুঁকতে লাগলো। সবার শোঁকা শেষ হ'লে, সবগুলো একসঙ্গে ল্যাজ উঁচু ক'রে রাজার পানে তাকালো, এখন তাদের মুখে আবার সেই হিস্-হিস্ শব্দ, সবাই মিলে যেন একসঙ্গে শিস দিচ্ছে!

ঢুলুরাজাও তার ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়ে এমন জোরে একটা শিস দিলে—সেটা বাঁশীর শব্দের মতন শুনাতে লাগলো। শিকারীগুলোর তখন কি ভীষণ ছটফটানি! ল্যাজ দুলিয়ে, সামনের পায়ের বড়-বড় বাঁকা ধারালো নখযুক্ত থাবা উর্দ্ধে তুলে তারা যেন তাদের প্রভুর শিষের সঙ্গে তালে-তালে নাচন জুড়ে দিলে! রাজা এবার তার ডান হাতের আঙুলটা গামছাখানির দিকে হেলিয়ে, মুখে এমন একটা বিকট আর দীর্ঘ আওয়াজ করলে যে, সেই পাহাড়ে-জায়গাটা যেন সেই শব্দে কেঁপে উঠলো! সেই আওয়াজ শুনে একটা শিকারী দল থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে গামছাখানি দাঁতে বাধিয়ে মুখে তুলে নিলে, এবং রাজার সামনে এসে দাঁড়ালো; আর অমনি বাকি এগারোটা শিকারী তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার মুখের গামছাখানি একে-একে আবার শুঁকতে লাগলো। রাজা আবার একটা সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত আওয়াজ করলে, মনে হ'ল, রাজার মুখে যেন রণভেরী বেজে উঠলো! এই শব্দ শুনেই যে শিকারীটা গামছাখানা মুখে ধরেছিল, সেই ভাবে তা ধ'রে রেখেই সে সামনের দিকে ঝড়ের মতো বেগে ছুটে চললো; পরক্ষণেই বাকি এগারোটি শিকারী সার বেঁধে হিস্-হিস্ শব্দ করতে করতে তার পিছনে ছুটলো।

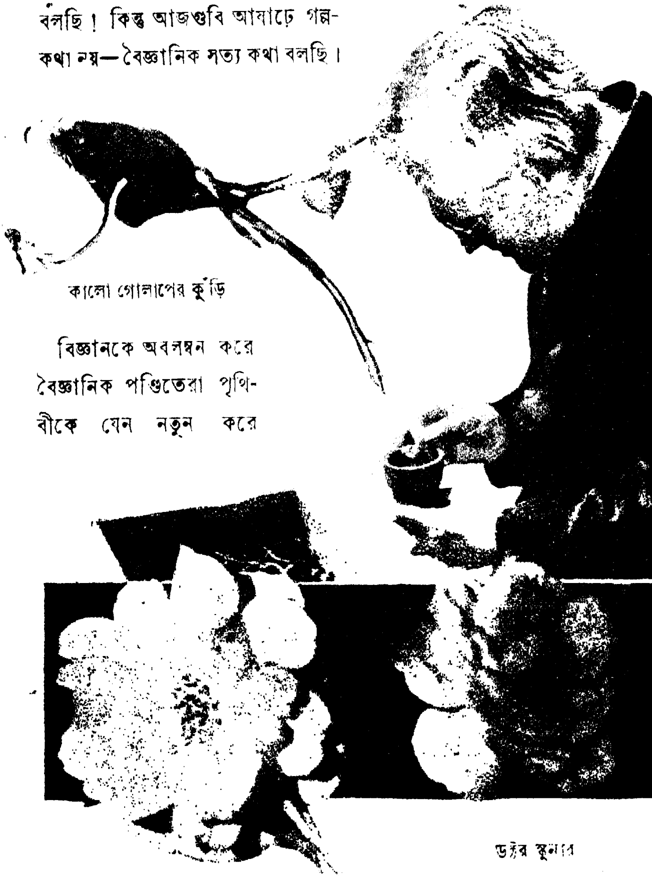
ঢুলুরাজা এবার পিছনের পঁচিশটি সওয়ারের পানে চেয়ে হাতখানা তিনবার দুলিয়ে ভীষণ একটা হুঙ্কার ছেড়ে বল্‌লে—শিকারীদের পিছু নে, শিকার সামনে।

পাহাড়ের বুকের ওপর শিহরণ তুলে ছাব্বিশটি তেজিয়ান ঘোড়া পিঠের ওপর যমের মতন এক-একটা সওয়ার নিয়ে তীরের বেগে ছুটলো—লীনার সন্ধানে। যে দিকে সে গিয়েছিল—সেই দিকে।

—গল্পদাদু।

কালো গোলাপ

নাম শুনে ভাবছো, আষাঢ় মাস বলে কাঁঠালের আমসত্ত্ব কিম্বা কাঁচের পাথর-বাটির মতো আজগুবি কথা বলছি! কিন্তু আজগুবি আষাঢ়ে গল্প-কথা নয়—বৈজ্ঞানিক সত্য কথা বলছি।



কালো গোলাপের কুঁড়ি

ডক্টর স্কুনার

ফুটন্ত কালো গোলাপ

বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে যেন নতুন করে গড়ছেন! এই যে গ্রামোফোন, রেডিয়ো, টকি-ছবি! ক' বছর আগে কে ভেবেছিল, রূপকথার এ-সব স্বপ্ন কোনো দিন আমরা সত্যই প্রত্যক্ষ করবো! অথচ বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের মনের সে-সব স্বপ্নকে সত্য করে তুলেছেন তো!

কালিফোর্ণিয়ার এক জন পাদরী-সাহেব—তাঁর নাম ফাদার জর্জ্জ স্কুনার—উদ্ভিদের রাজ্যে আজ যেন যুগান্তর এনেছেন! ছেলেবেলা থেকে ফাদার স্কুনার ফুল ভালোবাসেন, গাছপালা ভালোবাসেন! শুধু গাছ পুঁতে আর সে-সব গাছে ফল-ফুল ফুটিয়ে এ ভালোবাসা তিনি নিঃশেষ করেননি! ছেলেমেয়েকে ভালো বেসে মা-বাপ যেমন ছেলেমেয়েকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলবার জন্য নিজেদের সব স্বার্থ, সব স্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসে ত্যাগ করেন, ছেলেমেয়েকে ভালো-করে গড়ে তোলবার সাধনায় তন্ময় হন, ফাদার স্কুনার তেমনি এই ফুল আর গাছপালার উপর ভালোবাসায় বিভোর হয়ে তাদের রাজ্যে নব-নব উৎকর্ষ সাধন করছেন!

ফাদার স্কুনারের এখন বয়স হয়েছে। সুদীর্ঘ জীবনে এই উদ্ভিদের সাধনায় তিনি যে-সাফল্য লাভ করেছেন, উদ্ভিদের বিধাতা অন্তরীক্ষ থেকে তা দেখে নিশ্চয় চমৎকৃত হয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই!

ফাদার স্কুনার কালিফোর্ণিয়ার শান্তা-বার্বারা গ্রামে নিজের হাতে ছোট একটি বাগান তৈরী করেছেন। এ বাগানটি দেখলে মনে হবে, উদ্ভিদ-রাজ্যের আইন-কানুনই তিনি একেবারে উল্টে দেছেন!

অর্থাৎ বাগানে তিনি গোলাপের বিচিত্র ফশল ফুটিয়েছেন! এ বাগানে যে সব নতুন নতুন রঙে নানা-জাতের গোলাপ-ফুল ফুটছে, তেমন রঙের গোলাপ পৃথিবীর



ডালিয়া-ফুল ও ফুলের গাছ

...র কোনো জায়গায় ফোটে না! তার উপর এ-সব গোলাপের আকারই বা কত-রকম! কোনো গোলাপ এত বড় যে, মনে হয়, ঐরাবত হাতীর কাণে গুঁজলে তবেই যেন মানাবে! আবার কোনো ফুল ঠিক পায়রা-মটরের মতো এক-রত্তি! তাছাড়া এ-সব গোলাপের গাছ এমন যে, কোনোটি লজ্জাবতী লতার মতো অতি-মিহি অতি-ছোট আকারে মাটীর বুকে যেন মিশে আছে! আবার কোনো গোলাপ-গাছ বা সদর্পে সুদীর্ঘ দেবদারু-গাছের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথায় ত্রিশ-বত্রিশ ফুট উঁচু হয়ে উঠেছে!

কলম-করার প্রণালীতে তিনি এ-সব গাছকে বড় বা ছোট করে তোলেননি। এ-সব গাছ তিনি গোলাপের বীজ থেকে সৃষ্টি করেছেন। এ-কাজে তাঁর সুদীর্ঘ সাধনা আর নিষ্ঠা—পুরাণের ধ্রুব-প্রহ্লাদের তপঃ-সাধনার মতোই কঠিন আর উগ্র।

এই বাগানেই থাকে-থাকে তিনি গোলাপ গাছ সাজিয়েছেন। এক-লাইনের গাছ একেবারে দেবদারুর মতো আকাশে মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে; তার পরের লাইনে আবার যে-গাছ, তা এই এতটুকুন্! তাছাড়া তাঁর গাছে কালো গোলাপও ফুটিয়েছেন। মিশ-কালো! এই কালো গোলাপের কয়েকটি পাপড়ির কোলে একটু করে শুধু লাল রঙের ফুটকি-বিন্দু আছে,—যেন কালো মেয়ের কপালে লাল টিপ!

এ সম্বন্ধে ফাদার স্কুনার বলেন, গোলাপ-গাছের আকারে এই যে পার্থক্য, ফুলের রঙে এই যে নূতনত্ব, এ



গোলাপ-গাছ—দেবদারু-গাছের মতো লম্বা

করতে মায়া বা মন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়নি! বৈজ্ঞানিক সত্যকে উপলব্ধি করে, সেই সত্যকেই তিনি গোলাপে জাগ্রত করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেন, প্রাণি-জগতে

'ব্রীডিংয়ের' (প্রজনন) সম্বন্ধে সচেতন সাধনায় প্রাণীর দেহে-মনে যেমন উৎকর্ষ ঘটে, উদ্ভিদ-জগতের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই নিয়ম।

কালো গোলাপের সারির পর যে গোলাপের সারি, তাতে ফোটে নীল রঙের গোলাপ! নীল গোলাপের পাতা ছিঁড়ে দু'হাতে কষে চটকাও, তার পর সে পাতার গন্ধ শোঁকো, পাতায় গোলাপের গন্ধ পাবে না, গন্ধ পাবে এক রকম স্কচ্‌বন-ফুলের।

ডক্টর স্কুনার বলেন, ফুল তার রঙ আর গন্ধ পায় আমাদের এই পৃথিবীর বুকের মাটী থেকে। এ সম্বন্ধে খুঁটিনাটী সব তত্ত্ব অনুশীলন করে ফাদার স্কুনার মাটীতে গোলাপের বীজ-বপনের সময় সারের সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থ মিশিয়ে জমি তৈরী করে নেন,—সেই মাটীতে যে-গাছ হয়, সার এবং নানা পদার্থের প্রাণকোষে পূর্ণ মাটীর গুণে গাছে ফুলে আর গন্ধে নব-নব বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে। এই প্রথায় সাদা গোলাপে ফাদার স্কুনার যেমন নানা-রকমের আকার দেছেন, তেমনি সে-সব ফুল রকমারি গন্ধে ভরে তুলেছেন।



হল্‌দে গোলাপের কুঁড়ি

তাঁর এ গোলাপ-বাগিচায় যে হল্‌দে গোলাপ ফুটিয়েছেন, সে-গোলাপ আকারে বেশ বড়; এবং সে গোলাপের রঙ গিনি-সোনার মতো টক্‌টকে! তাঁর হাতের লাল-রঙের গোলাপও কালো গোলাপের মতো জগতে অপূর্ব্ব সৃষ্টি! লাল গোলাপে তিনি এমন গন্ধ-সন্নিবেশ করেছেন যে, ভোরের বেলায় দু'মাইল দূর থেকে মানুষ সে-গন্ধ উপভোগ করে বিহ্বল হয়!

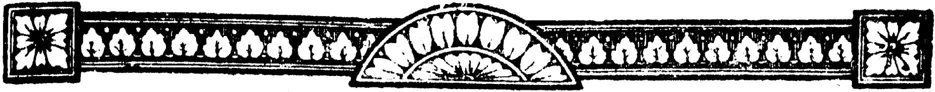
পায়রা-মটরের মতো যে অতি-ক্ষুদ্র গোলাপ তিনি ফুটিয়েছেন, সে গোলাপের বীজ তিনি আনেন জাপান থেকে। তার পর নানা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় জাপানের সে-গোলাপকে তিনি পায়রা-মটরের আকারে তাঁর গাছে ফুটিয়েছেন। এ-ফুল এত ছোট হ'লেও এগুলি যে গোলাপ ফুল, তাদের আকার দেখে চকিতে তা বোঝা যায়। ছোট বলে তাদের আকার ঘাসের ফুলের মতো নয়; গন্ধেও গোলাপ-বংশের মায়া-সুষমা ভরপূর বজায় আছে।

ফুল ফুটিয়েই ফাদার স্কুনারের সাধনা শেষ হয়নি। গোলাপের ডালের কাঁটায় তিনি নব-যুগ সৃষ্টি করেছেন। এমন করেছেন যে, কতকগুলি গাছে কাঁটা আদৌ নেই, অর্থাৎ পৃথিবীকে কণ্টকহীন গোলাপ যেমন তিনি উপহার দেছেন, তেমনি কোনো-কোনো গাছে কাঁটাগুলিকে এমন করেছেন যে, সেগুলি লাল-চুণীর মতো টক্‌টক্ করছে!

গোলাপ-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে ফাদার স্কুনার ফলের রাজ্যেও বিজয়-অভিযান অগ্রসর করে চলেছেন। আপেলের সঙ্গে গোলাপের জোড়-কলম করিয়ে তিনি আপেলের ফলে গোলাপের গন্ধ এনে দেছেন! কমলালেবুকে এমন করেছেন যে, তাঁর গাছের কমলালেবু খেলে মনে হবে, কমলালেবুর সিরাপে যেন রোজ-সিরাপ মিশিয়ে খাচ্ছি!

গোলাপের পর তিনি ডালিয়া ফুলের উপর মনোযোগ অর্পণ করেছিলেন। তাঁর ডালিয়ার আকারে যেমন অসাধারণ বৈচিত্র্য, তেমনি বৈচিত্র্য তাদের গন্ধে-বর্ণে! তাঁর ডালিয়া ফুল এক-মাস দু'মাস দিব্যি টাট্‌কা তাজা থাকে।

অথচ তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে, উদ্ভিদ-জগতে এতখানি অভাবনীয় ইন্দ্রজাল রচনা করলেও ফাদার স্কুনার কখনো কলেজে সায়েন্স পড়েননি। মনে শুধু গাছের সখ—সেই সখ থেকে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান এবং চিন্তা-শক্তির উপর নির্ভর করে উদ্ভিদ-রাজ্যে তিনি এই বিশ্বামিত্রের নূতন জগৎ সৃষ্টি করেছেন!



বিক্রয়কর আইন

গত মার্চ্চ মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে বিক্রয়কর আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, এবং পরে ব্যবস্থাপক-সভায় যাহা গৃহীত হইয়াছিল, গত ১লা জুলাই তারিখে বাঙ্গালার গভর্ণর তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। বঙ্গের সকল অধিবাসীর নিকট হইতেই পরোক্ষ ভাবে এবং ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে এই আইন অনুযায়ী কর ১লা অক্টোবর হইতে আদায় করা হইবে। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই, বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় এই আইন কিরূপ ক্ষতিজনক হইবে, আমরা বিশেষ ভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম। দেশের ব্যবসায়িগণের—বিশেষতঃ, বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ও বাঙ্গালার শিল্প-বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীর ব্যবসায়িগণের প্রবল প্রতিবাদেও এই আইন বিধিবদ্ধ করা স্থগিত হয় নাই; তবে এই আন্দোলনের ফলে প্রস্তাবিত আইনের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই কর কিরূপ ক্ষতিকর হইবে—বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ এই বিলের আলোচনা-কালে তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বাঙ্গালায় য়ুরোপীয় ব্যবসায়িগণের অনেকেই এই বিলের সমর্থন করেন নাই; তথাপি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের য়ুরোপীয় সদস্যগণ কার্য্যকালে সচিবসঙ্ঘের তাঁবেদার মুসলমান দলের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহাদের চিরাবলম্বিত নীতি অনুসারে বিনা দ্বিধায় সচিবমণ্ডলীর সমর্থন করিয়াছেন।

রাজস্ব-সচিব মিঃ সুরাবর্দ্দি কর্ত্তৃক এই বিল ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করিবার সময় সর্ব্বসাধারণের অভিমত সংগ্রহের জন্য এই বিলের প্রচারের ব্যবস্থা আমোলে না আনিয়া উহা সিলেক্ট-কমিটীর হস্তে সমর্পিত হয়। সিলেক্ট-কমিটীর রিপোর্ট দাখিলের পরই বিলটি যত শীঘ্র সম্ভব আইনে পরিণত করা হয়। এতই তাড়াতাড়ি এই বিলটিকে আইনে পরিণত করা হয় যে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, এই বিল আইনে পরিণত করিয়া রাজস্ব-বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করিলে অর্থাভাবে সরকারের কার্য্য অচল হইয়া উঠিত। এই বিল উপস্থিত করিয়া রাজস্ব-সচিব আশা করিয়াছিলেন, ইহার সাহায্যে বাঙ্গালার বার্ষিক রাজস্ব দুই কোটি টাকা বৰ্দ্ধিত হইবে; কিন্তু এই আশা কি পরিমাণে সফল হইবে, তাহা এখন বলা যায় না। রাজস্ব-সচিবের বক্তৃতায় মনে হইয়াছিল, এই টাকা জাতিগঠনের কার্য্যেই ব্যয় করা হইবে,—কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইবে কি? এই কর আদায়ের জন্য কর্ম্মচারিগণের বেতন, ভাতাদি বাবদ রাজস্ব-সচিব যে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, কার্য্য-কালে সেই ব্যয়ের পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক অধিক হইলে কেহই বিস্মিত হইবে না। বিশেষতঃ, গৌরীসেনের অর্থ ব্যয় করিবার সময় মমত্ব বশতঃ টানাটানি করিবার প্রয়োজন হয় কি?

সিলেক্ট-কমিটীর রিপোর্ট—

সিলেক্ট-কমিটীর রিপোর্টে এই বিল সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে; প্রস্তাবিত মূল আইনে এই করের পরিমাণ শতকরা দুই টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু সিলেক্ট-কমিটী এই করের পরিমাণ টাকায় এক পয়সা, বা শতকরা ১'৫৬ টাকা স্থির করিবার পরামর্শ দেন। এতদ্ব্যতীত, প্রস্তাবিত মূল আইনে করধার্য্যযোগ্য বিক্রয়ের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু সিলেক্ট-কমিটী, কোনও বিক্রেতা বঙ্গদেশে কোনও বিক্রয়যোগ্য পণ্য আমদানি করিলে বা বিক্রেতা নিজে কোনও দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে—তাহার স্থলে করধার্য্য-যোগ্য বিক্রয়ের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা স্থির করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তবে সিলেক্ট-কমিটী এই অভিমতও প্রকাশ করেন যে, সরকার কোনও বিশেষ স্থলে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে করধার্য্যযোগ্য বিক্রয়ের পরিমাণ ইচ্ছানুসারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এই বিলটি আলোচনার জন্য ব্যবস্থা-পরিষদে উপনীত করিবার সময়ে রাজস্ব-সচিব বলেন যে, বাজেটে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। সেই ঘাটতি পূরণের জন্য এই কর ধার্য্য না করিলে চলিবে না; তবে সরকার সিলেক্ট-কমিটীর পরামর্শানুসারে প্রস্তাবিত আইনের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে প্রস্তুত।

বিক্রয়-করের মূল নীতিই কোনও ক্রমে সমর্থনযোগ্য নহে। ইহাতে দেশের অতীব দরিদ্র হইতে প্রচুর ধনের অধিকারী পর্য্যন্ত প্রত্যেককেই এই করের অংশ বহন করিতে হইবে। অথচ দেশের জনসাধারণ এই করের জন্য যে অর্থদান করিতেছে—তাহা হয় ত তাহারা বুঝিতেও পারিবে না। যে দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত, সে দেশে এইরূপ পরোক্ষ করের প্রবর্ত্তনই সুবিধাজনক। ভারত-বর্ষে এই জন্যই বৈদেশিক শাসকগণ এই প্রকার করের পক্ষপাতী; কিন্তু দারিদ্র্যদৈন্যশৃঙ্খলাঙ্কিত বাঙ্গালার সৌভাগ্যবান সচিবগণও আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরূপ কর-স্থাপনের পক্ষপাতী!

কর-স্থাপনের প্রতিবাদ—

এই কর-স্থাপনের বিরুদ্ধে কলিকাতার ব্যবসায়িগণ ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে প্রতিবাদ-সভা করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতার সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীই—হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে—দোকান বন্ধ রাখিয়া হরতাল দ্বারা এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি সচিবসঙ্ঘ এই আইন স্থগিত করা দূরে থাকুক—যুদ্ধের পর এই আইন প্রবর্ত্তনের যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে পর্য্যন্ত কর্ণপাত করেন নাই! কংগ্রেস-পক্ষ ব্যবস্থা-পরিষদে এই বিল পুনরায় সিলেক্ট-কমিটীতে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু য়ুরোপীয় দলের পক্ষ হইতে মিঃ ওয়াকার এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পারেন নাই। মিঃ ওয়াকার বলিয়াছিলেন, তিনি শতকরা দেড় টাকা হিসাবে বিক্রয়কর স্থাপনের সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া যে নোটিশ দিয়াছিলেন—অতঃপর সিলেক্ট-কমিটী করের পরিমাণ শতকরা ১'৫৬ টাকা নির্দ্ধারিত করায়, তিনি আর সে প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন না। তাঁহার মতে সিলেক্ট-কমিটীতে

বিলটির বহুল পরিমাণে সংশোধন হওয়ায় উহা অনায়াসে সমর্থন-যোগ্য হইয়াছে।

কংগ্রেস-পক্ষ হইতে রায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী-প্রমুখ সদস্যগণ বলেন, বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের সংগঠনমূলক কোনও পরিকল্পনা নাই। উহা থাকিলে এই নূতন কর-স্থাপনের দাবী উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে সেই পরিকল্পনা উপস্থিত করা উচিত ছিল। ১৯৩৭—৩৮ ও ১৯৩৮—৩৯ খৃষ্টাব্দের সরকারী হিসাব কমিটীর বিবরণে (Reports of the Public Accounts Committee) দেখা যায়, ব্যয়ের কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে জাতি সংগঠনমূলক ব্যয়ের জন্য কৃষি, শিল্প ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগে ব্যয় করিবার জন্য বাজেটে যে টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল, তাহা ব্যয় করিতে পারা যায় নাই। যে সচিবসঙ্ঘ নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে মঞ্জুরীকৃত অর্থ পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে পারেন নাই—সেই সচিবমণ্ডলীর উপর বিনা পরিকল্পনায় এইরূপ অর্থ-সংগ্রহের ভার দেওয়া কোনও ক্রমেই সমীচীন নহে। দেশবাসীর বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থাও যুদ্ধের পর হইতে নানা ভাবে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পাটের দর নামিয়া যাওয়ায় বঙ্গদেশের কৃষকগণের আর্থিক অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধি হওয়ায় দেশের দরিদ্র জনসাধারণ বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতেছে। এই অবস্থায় এই নূতন কর যে প্রবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের পরিপোষক হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলী এখন আয়করের অংশ ও পাটের রপ্তানী-শুল্কের অংশও পাইতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ তাহা পান নাই। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা চাকরী-কর (Employment-tax) নামক একটি নূতন কর স্থাপন করিয়াছেন। মহাজনী আইন বিধিবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহাজনদিগের উপর একটি রেজিষ্ট্রীশনের কর বসিয়াছে। ইহার উপর ভারত সরকারের নিকট বাঙ্গালা সরকারের যে ঋণ ছিল, ভারত সরকার দয়া করিয়া তাহাও সুদে-আসলে মকুব করিয়াছেন। এত অধিক আর্থিক সুবিধা পাইয়াও বাঙ্গালার ভাগ্যবান ও প্রচুর বেতনভোগী সচিবগণ দরিদ্র স্বদেশবাসিগণের উপর আরও একটি নূতন কর স্থাপন করিয়া অনর্থক ব্যয়-বাহুল্যের এবং ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার শক্তির অভাবেরই পরিচয় দিলেন। ইহার পরে এই আইনের নিয়মাবলী প্রস্তুতের যে ভার সরকারের হস্তে ন্যস্ত ছিল—তাহাতে আইনের পরিচালনায় জনসাধারণের ভয় যে আরও বাড়িবে না, তাহা কেহই নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারে না। ব্যবস্থা-পরিষদের এই নিয়মাবলী যাহাতে ব্যবস্থা-পরিষদের ও ব্যবস্থাপক-সভার সম্মতি লইয়া রচিত হয়, তজ্জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু সচিবসঙ্ঘ কোনক্রমেই সেই সঙ্গত প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই।

আইনের স্বরূপ—

এই আইনের স্বরূপ এখন যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এখানে তাহার আলোচনা করিতেছি। এই আইনের ৩ ধারা অনুসারে "ব্যবসায়সংক্রান্ত করের কমিশনার" (Commissioner of Commercial taxes) নামক এক জন কমিশনার নিযুক্ত হইবেন। এই কমিশনারের প্রভাব অপ্রতিহত হইবে। এই আইন অনুসারে কোনও ব্যক্তি বিক্রয়-কর দিতে বাধ্য হইবেন কি না, সেই কমিশনারই তাহা স্থির করিবেন। কোনও দেওয়ানী আদালতে কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে কোনও দরখাস্ত বা আপীল করা চলিবে না, তাহা এই আইনের ১৭ ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর যে সকল দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর স্থাপিত হইবে, তাহার এবং যে সকল দ্রব্য বিক্রয়-কর হইতে অব্যাহতি পাইবে, তাহার স্বতন্ত্র হিসাব প্রত্যেক বিক্রেতাকেই রাখিতে হইবে। এই প্রকার দুইটি স্বতন্ত্র হিসাব রাখিতে হইলে যে বিক্রেতার ব্যয় ও অসুবিধা বর্দ্ধিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই আইনের ১৮ ধারায় আছে, ট্যাক্স ধার্য্য করিবার কোনও নোটিশ পাইবামাত্রই প্রত্যেক বিক্রেতাকে ঐ ট্যাক্স দাখিল করিতে হইবে; এই ট্যাক্স দাখিল করিয়া, ঐ নোটিশ পাইবার এক মাসের মধ্যে ঐ বিক্রেতা সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন; কিন্তু এই আপীলের ব্যাপারে কোনও দেওয়ানী আদালতের সম্বন্ধ থাকিবে না। আয়করের ব্যাপারেও প্রাদেশিক হাইকোর্টে আপীল আছে; কিন্তু এই আইনে এই নূতন করের সম্বন্ধে সেরূপ কোনও বিধান বিধিবদ্ধ হয় নাই। অথচ বিক্রেতা কোনও অপরাধযোগ্য কার্য্য করিলে এই আইনের কমিশনারের অনুমতি লইয়া বিক্রেতার নামে কোন প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিষ্ট্রেটের বা কোনও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মোকদ্দমা রুজু করা চলিবে।

কোনও বিক্রেতা যদি এই আইনের ৭ ধারা অনুসারে রেজিষ্ট্রি-যোগ্য হইয়াও রেজিষ্ট্রেশন-সার্টিফিকেট গ্রহণ না করেন, অথবা এই আইনের ৮ ধারার (১) উপধারা অনুসারে রিটার্ণ দাখিল না করেন, অথবা ১১ ধারা অনুসারে হিসাব রক্ষা না করেন, তাহা হইলে এই আইনের ১৯ ধারা অনুসারে তাঁহার দুই হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে; তৎসত্ত্বেও এই অপরাধ করিয়া যাইতে থাকিলে, দৈনিক ৫০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। ঐরূপ বিধান মূল আইনে ছিল, পরে এই অর্থদণ্ডের পরিমাণ এক হাজার টাকা, এবং দৈনিক দণ্ডের হার ৫০ টাকা করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়-করের কমিশনার যদি দয়া করেন, তবে এক হাজার টাকার অনধিক, বা দেয় করের দ্বিগুণের অনধিক অর্থ গ্রহণ করিয়া এইরূপ মোকদ্দমা মিটাইয়া লইতে পারিবেন। এইরূপ বিধান আইনের ২০ ধারায় বিধিবদ্ধ আছে।

প্রস্তাবিত আইনে মোট ১৫টি দ্রব্যকে বিক্রয়-কর হইতে অব্যাহতি দান করা হইয়াছিল; সিলেক্ট-কমিটীর রিপোর্ট ও ব্যবস্থা-পরিষদের নির্দ্ধারণ অনুসারে এখন ৩১টি দ্রব্যকে বিক্রয়-কর হইতে অব্যাহতি দান করা হইয়াছে। আমরা নিম্নে সেই দ্রব্যগুলির তালিকা প্রদান করিলাম:—

১। সর্ব্বপ্রকার খাদ্য-শস্য; যথা—আতপ ও সিদ্ধ চাউল, ডাল, গম, যব ইত্যাদি। তবে যখন এইগুলি শিলকরা বস্তায় আবদ্ধ থাকিবে, তখন এইগুলির উপর কর ধার্য্য হইতে পারিবে।

২। আটা, ময়দা, সুজি ও ভুষি।

৩। রুটি।

৪। যে সকল মাংস বন্ধন করা হয় নাই, বা বরফ দিয়া দূর হইতে আমদানি করা হয় নাই।

৫। টাট্কা মৎস্য।

৬। কাঁচা বা শুষ্ক তরকারি ও শাক। তবে যখন এইগুলি

কোনও শিলকরা ঝুড়ি বা টিনে আবদ্ধ থাকিবে, তখন উহা কর-ধার্য্যযোগ্য।

৭। কেক বা পিষ্টক, মিষ্টান্ন ও লুচি, কচুরি প্রভৃতি ব্যতীত যাবতীয় পাচিত আহার্য্য দ্রব্য; তবে উহা মোহরাঙ্কিত পাত্রে আবদ্ধ করিয়া বিক্রয় করা হইলে তাহার উপর কর-ধার্য্য করা হইবে।

৮। গুড়, চিনি ও মাতগুড় (ঝোলা গুড়)।

৯। লবণ।

১০। সরিষার তৈল অথবা কোনও বীজজাত তৈল, অথবা তাহার সহিত মিশ্রিত সর্ষপ তৈল।

১১। দুগ্ধ। প্রাথমিক বিলে 'ক্রীম' (cream) ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পদার্থের উপর কর-ধার্য্যের প্রস্তাব ছিল—কিন্তু এখন তাহার স্থানে শুধু "দুগ্ধ" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১২। গৃহপালিত প্রাণী; (হাঁস, মুরগী প্রভৃতিও ইহার অন্তর্গত)।

১৩। কৃষি-কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি।

১৪। জমিতে প্রয়োগযোগ্য সার।

১৫। সূতা।

১৬। তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্র। (যখন বস্ত্রবিক্রেতা অন্য কোনও বস্ত্র বিক্রয় না করিয়া মাত্র তাঁতের কাপড়ই বিক্রয় করিবে)। মিলের কাপড় বিক্রয়ের উপর বিক্রয়-কর দিতে হইবে।

১৭। কেরোসিন তৈল।

১৮। তামাক বা হুঁকা।

১৯। দিয়াশলাই (matches)।

২০। কুইনাইন ও জ্বরনাশক ঔষধ।

২১। প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক এবং যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ—যাহার তালিকা পরে নির্দ্দিষ্ট হইবে—তাহা।

২২। স্বর্ণ বা রৌপ্য বা উহা হইতে প্রস্তুত মুদ্রা।

২৩। স্বর্ণের বাঁট হইতে বা স্বর্ণ-মুদ্রা হইতে নির্ম্মিত অলঙ্কার। (যে স্থলে অলঙ্কার-নির্ম্মাতা স্বর্ণের পরিমাণ স্বতন্ত্ররূপে ও "বাণী" বা নির্ম্মাণের ব্যয় স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া থাকে)।

২৪। কয়লা ও রন্ধনের জন্য পোড়া কয়লা।

২৫। দেশী মদ (তাড়ী ও পচাই ইহার অন্তর্ভুক্ত), সহজে পানযোগ্য বিলাতী মদ্য (ঔষধরূপে ব্যবহৃত মদ্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত), গাঁজা ও আফিং (আফিংজাত দ্রব্য নহে), ভাং ও চরস।

২৬। বোতলে বা মোহরযুক্ত পাত্রে আবদ্ধ বাষ্পমিশ্রিত ও খাতব জল ব্যতীত যাবতীয় জল।

২৭। বৈদ্যুতিক শক্তি।

২৮। কয়লা হইতে জাত গ্যাস। (যখন উহা কোনও গ্যাস-সরবরাহ কোম্পানী কর্ত্তৃক (ক) সরকারের বা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের, (খ) বা কোনও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের (আবাস-গৃহ বা আফিস-গৃহের জন্য ব্যতীত), (গ) বা প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক কোনও স্থান মাত্র সাধারণের জন্য দাতব্য বলিয়া ঘোষিত হইলে—তাহাদের নিকট বিক্রীত হইলে)।

২৯। মোটর স্পিরিট অর্থাৎ কোনও বিশুদ্ধ বা মিশ্রিত তরল পদার্থ, যাহা প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে কোনও মোটর-যানের বা যাহা এক স্থানে স্থিত ইঞ্জিনের পরিচালনের জন্য দাহ্যপদার্থরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং ফারেনহীট্ থার্ম্মোমিটারের ৭৬ ডিগ্রীর নিম্নে যাহার দাহিকাশক্তি অবস্থিত।

৩০। সংবাদপত্র।

৩১। কাঁচা অসংস্কৃত পশুচর্ম্ম বা অন্য কোনও চর্ম্ম।

উল্লিখিত দ্রব্যগুলি বিক্রয়-কর আইনের ৬ ধারা অনুসারে বিক্রয়-কর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। কিন্তু দ্রব্যের তালিকা মধ্যে অনেকগুলি আপত্তিজনক দ্রব্য এবং অনেকগুলি অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এই আইনের মূল বিলে দুগ্ধকে কর হইতে অব্যাহতি দান করা হইয়াছে—কিন্তু দধি, ক্ষীর, রাবড়ী, মাখন ও ঘৃত প্রমুখ দুগ্ধজাত পদার্থগুলিকে বিক্রয়-কর হইতে অব্যাহতি দান করা হয় নাই। ইহাতে গ্রামের ও সহরের গোয়ালাদের ও মিষ্টান্ন-বিক্রেতাদিগের অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিবে। মাংসাদি খাদ্যের উপর কর না বসিলেও পুরী, লুচি, কচুরি এবং সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি মিষ্টান্নের উপর ট্যাক্স ধার্য্য হইলেও দেশের পুষ্টিকর নিরামিষ খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবে, এবং সরবরাহকারিগণের তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হইবে।

হস্ত-পরিচালিত তাঁতের কাপড়কে যে অব্যাহতি দান করা হইয়াছে—তাহা নামে মাত্র অব্যাহতি! কারণ, কোনও বস্ত্র-বিক্রেতার পক্ষে কেবল তাঁতের কাপড় বিক্রয় করিয়াই দোকান চালান অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় গ্রামের তন্তুবায়েরা এই আইনের কোনও সুযোগ পাইবে না—পরন্তু ইহার দ্বারা উৎপীড়িত হইবে। সুতরাং হস্তচালিত তাঁতের কাপড়কে অব্যাহতি দানের সুযোগ একটি বিরাট ধাপ্পায় পর্য্যবসিত হইবে।

জ্ঞানের উপর কর-ধার্য্য করা সমস্ত সভ্যদেশেই নিষিদ্ধ। পুস্তক-ব্যবসায়ের উপর ও কাগজের উপর কর-ধার্য্য করিয়া সচিবসঙ্ঘ সেই সকল সভ্যদেশের অনুসৃত অলিখিত বিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন। সচিবসঙ্ঘ যে সকল পুস্তককে ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া স্থির করিবেন, মাত্র সেইগুলিকেই এই কর হইতে অব্যাহতি দান করা হইবে।—ইহাতে তাঁহাদের ইচ্ছার উপরেই আইনের এই অংশটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই ব্যবস্থা এরূপ অস্পষ্টতার মধ্যে না রাখিয়া আইনেই তাহা স্পষ্ট করিয়া বিধিবদ্ধ করা উচিত ছিল।

একবার কাগজের উপর কর ধার্য্য করা হইবে—আবার সেই কাগজে মুদ্রিত পুস্তক যখন প্রকাশিত হইবে, তখন তাহার উপর পুনরায় কর ধার্য্য করা হইবে! এইরূপে এক মুর্গী কি দুই বার জবাই করা হইবে না? এই প্রকার জবাইএর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে মুসলমানপ্রধান সচিবসঙ্ঘ কি বলেন?

সংবাদপত্রকে করের হস্ত হইতে অব্যাহতি দান করা হইয়াছে, কিন্তু সংবাদপত্রের কাগজের তিন গুণ বর্দ্ধিত মূল্যের উপর শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে পরিবর্দ্ধিত 'ডিউটি' বসিয়াছে, এবং আর এক দফায় কাগজ কিনিবার সময়েই টাকায় এক পয়সা হিসাবে বিক্রয়-কর দিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক, আর্থনীতিক, বা সাহিত্যিক সাময়িকপত্রগুলিকে কেন স্পষ্ট করিয়া অব্যাহতি দানের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইল না?

এই আইন অনুসারে যে নিয়মাবলী রচিত হইবে, তাহা প্রকাশিত হইলে সেই নিয়মাবলী অবলম্বন করিয়া পরে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।



৫

সন্ধ্যার ঠিক আগে সে-দিন ইরাবতীর তীরে কল্লোল বেড়াইতে গিয়াছিল। নদীর বুকে নৌকা, ষ্টীমার। ওখানে একখানা নৌকায় চাল বোঝাই হইতেছে, সেখানে ষ্টীমার হইতে কাঠ নামিতেছে···

আঘাটায় আসিয়া একটা ঝাঁকড়া শিশুগাছের নীচে কল্লোল বসিল। আকাশের গায়ে আবীর মাখাইয়া সূর্য্য জলের ও-পারে হেলিয়া পড়িয়াছে। বসিয়া কল্লোল ভাবিতেছিল···

হঠাৎ কাণে শুনিল বাঙলা গান। পুরুষের কণ্ঠ। জলের বুক বহিয়া গান যেন ভাসিয়া তীরে আসিতেছে!

গায়ক গাহিতেছিল,

সাগরের কূলে বসিয়া বিরলে
গণিব লহর-মালা,
মনোবেদনা কবো সমীরণে,
গগনে জানাবো জ্বালা···

কল্লোল বিস্ময় বোধ করিল। বাঙলা-থিয়েটারের গান! তাও এ-কালের দুর্ব্বোধ-ভাষায় রচা গান নয়! ছেলেবেলায় নিজের গ্রামে থাকিতে লোকের মুখে এ-গান শুনিয়াছে···অনেকবার। তার পর কৈশোরে সহরে আসিল···সহরে আসিয়া এ-গান আর শোনে নাই! সহরে এখন এ-সব গানের রেওয়াজ নাই। সহরের লোক এখন সিনেমার গান গায়···ইতর-ভদ্র সকলেই। পাপিয়া-বকুলের সঙ্গে বন্দিনী রাজকন্যার চূর্ণ-অলক-বাঁধা গান! গানের বাণী শুনিয়া কল্লোলের প্রাণ একেবারে রী-রী করিয়া উঠিত।

গায়ক গাহিতেছিল,

প্রতারণাময় মানব-প্রাণ
আর না হেরিব এ নর-বয়ান···
সমাজ-শ্মশানে রহিব না আর
বহিব না দুখ-ডালা!

কৌতুক-হাস্যে মন ভরিয়া উঠিল! এ বাঙলা দেশ নয়···বর্ম্মা-মুল্লুক! এখানে কার মনে এমন ব্যথা লাগিল যে, সমাজকে শ্মশান বলিয়া মনে হইতেছে · মানুষের মুখ আর কখনো দেখিবে না বলিয়া এমন আর্ত্ত অভিযোগ তুলিয়াছে!

ভাবিল, এ-গান যিনি লিখিয়াছেন, পৃথিবীর জ্বালা-যাতনা কি তিনি এমন গভীর ভাবে কখনো উপলব্ধি করিয়াছিলেন···

নৌকার গান আরো কাছে আসিল। পারানী-নৌকা। কল্লোলের সামনে নৌকা লাগিল। একরাশ লোক নামিল নৌকা হইতে। বর্ম্মীজ, চীনা, বলিনীজ্··· এক জন শুধু বাঙালী।

কল্লোল বুঝিল, এ-গান ঐ বাঙালী যাত্রী গাহিতেছিল···

যাত্রীরা তীরে উঠিল। কল্লোল বাঙালী-যাত্রীর পানে একাগ্র-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল।

মুখ যেন চেনা-চেনা! কল্লোল উঠিয়া দাঁড়াইল। যাত্রীর কাছে আসিল। তখনি চিনিল, অনাদি! অনাদি ছিল কলেজে তার সহপাঠী···দিলখোলা অনাদি···দু' হাতে ক্লাশে সকলকে সিগারেট বিতরণ করিত।

কল্লোল ডাকিল,—অনাদি !

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কল্লোলের পানে চাহিয়া যাত্রী দাঁড়াইল···আধ-মিনিট কল্লোলকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল,—কল্লোল !

মৃদু হাস্যে কল্লোল বলিল,—হ্যাঁ···

অনাদি কহিল,—এখানে।

কল্লোল কহিল,—তুমি যদি আসতে পারো, আমিই বা কেন আসবো না ?

অনাদি বলিল,—হুঁ···কিন্তু আমার পক্ষে আসা সহজ। তুমি এক জন ব্রিলিয়াণ্ট ষ্টুডেণ্ট···হাইকোর্টের বেঞ্চ এক দিন তোমাকে বুকে নেবে বলে উদ্‌গ্রীব···

হাসিয়া কল্লোল কহিল,—আমাকে না পেলেও হাই-কোর্টের বেঞ্চ কোনো দিন খালি থাকবে না, অনাদি। আর জানো তো, ভালো ছেলে হয়ে বেঞ্চে বসবার রুচি আমার কোনো কালে ছিল না।

যাত্রীরা একে-একে চলিয়া গেল···তীরে এখন শুধু অনাদি আর কল্লোল।

অনাদি কহিল,—তামাসা নয় ··রেঙ্গুনে কদ্দিন আছো ?

কল্লোল কহিল,—তা এক-বছরের কিছু বেশী এখানে কাটলো বৈ কি !

—কিছু করছো ?

—ভ্যাগাবণ্ডাইজিং···

অনাদির মনে পড়িল কল্লোলের কলেজ-জীবনের ইতিহাস। লেখাপড়ায় কল্লোল ছিল সবার উপরে··· কল্লোলের গলায় ইউনিভার্সিটি তার মেডেল দুলাইয়াছে চিরদিন ! কিন্তু ঐ ইউনিভার্সিটির গণ্ডীটুকুর মধ্যেই কল্লোলের যা ব্রিলিয়ান্সি ! সে-গণ্ডীর বাহিরে কল্লোল কি যে না করিয়া বেড়াইয়াছে···কি-অবস্থায় কোথা হইতে তাকে আনিয়া এগজামিনের হলে বসানো হইত !···কিন্তু সে-বয়স আজো কাটে নাই ? এখনো কল্লোল···

বিস্মিত স্তম্ভিত দৃষ্টিতে অনাদি কল্লোলের পানে চাহিয়া রহিল !

কল্লোল বলিল,—গান গাইতে গাইতে নৌকো করে এলে, দেখলুম।

হাসিয়া অনাদি বলিল,—গানটা আমার কেমন গলায় এঁটে গেছে ! কারো সঙ্গে যখন কথা না কই, একা থাকি, তখনি গান গাই···আমার রোগ, জানো তো ! কলেজের বারান্দায় এক দিন···মনে নেই ?

কল্লোল বলিল,—মনে আছে বৈ কি। তার পর এখানে সংসার পেতেছো ? কাজ-কর্ম্ম করছো ?

অনাদি বলিল,—খেয়াল হয়েছে···একটু আস্তানা পেতেছি। আস্তানা রক্ষা করতে পয়সা চাই তো··· তোমার মতো ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স নেই, ভাই !

গম্ভীর কণ্ঠে কল্লোল বলিল,—হুঁ···

অনাদি বলিল,—কিন্তু···অফ্ অল্ পার্শন্‌স্ তোমাকে দেখবো বর্ম্মায়···এ একেবারে স্বপ্নের অগোচর !

কল্লোল বলিল,—তোমরা যদি বর্ম্মায় আসতে পারো, আমার পক্ষে বর্ম্মায় আসা অসম্ভব হবে কেন, বুঝতে পারি না। তবে আমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে যে, আস্তানা পাতাই যদি তোমার উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে সে-আস্তানা বাঙলা-দেশে না পেতে বর্ম্মায় পাতবার হেতু ?

মৃদু হাস্যে অনাদি বলিল,—হেতু আছে। কিন্তু তার আগে···ভালো কথা, এখানে আছো কোথায় ?

কল্লোল বলিল,—আছি সুরাটী বাজারে চায়না ষ্ট্রীটে। মস্ত চার-তলা ফ্ল্যাট···তারি চার-তলায় একখানা কামরা নিয়েছি। করবার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া করি, গল্প করি আর বেড়াই।

—একলা আছো ? না···

মৃদু হাসিয়া কল্লোল কহিল,—আপাততঃ একলা আছি।

অনাদি কহিল,—বটে ! তাহলে এসো আমার সঙ্গে আমার আস্তানায়। আমি আস্তানা নিয়েছি চায়না ষ্ট্রীটের আরো ওদিকে···খীবো লেনে। চমৎকার জায়গা ! ইরাবতী ওখানটায় বেঁকে গেছে। সেই বাঁকের মুখে খানিকটা চড়া পড়ে একটা দ্বীপের মতো হয়েছিল···এখন জল শুকিয়ে দ্বীপত্ব ঘুচে সেটা প্রমণ্টরি (অন্তরীপ) হয়ে উঠেছে। বাঁশ আর বেতের ঝাড়···যাকে বলে খাশা ন্যাচারাল বিউটি ! আসবে আমার সঙ্গে ?

আলস্যভরে কল্লোল বলিল,—চলো···

দু'জনে হাঁটিতে সুরু করিল···

চলিতে চলিতে অনাদি বর্ম্মায় আসিয়া তার আস্তানা পাতিবার কাহিনী বলিল।

বলিল···

বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় একটা চাকরি জুটাইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে বিবাহ করিয়া ঘরে বধূ আনিয়াছিল। অর্থাৎ বাসনা ছিল, পাঁচ জনের মতো চিরাচরিত প্রথায় সংসার পাতিবে! পাতিয়াছিলও তাই। কিন্তু সংসার পাতিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহগুলা এমন বাঁকিয়া বসিল অর্থাৎ চার বৎসরে তিনটে ছেলেমেয়ে···সঙ্গে সঙ্গে খরচ-পত্রের বাহুল্য···ডাহিনে আনিতে বাঁয়ে কুলায় না! তার উপর যে-বধূকে প্রাণের প্রেয়সী ভাবিয়া কাব্য-সুখে বিভোর ছিল, সে-প্রেয়সী সহসা এমন রুক্ষ কর্কশ-ভাষিণী হইয়া উঠিল যে, প্রহার করিয়াও তাকে শায়েস্তা করিতে পারে নাই! তার উপর পাওনাদারদের সুতীক্ষ্ণ শরক্ষেপ···দায়িত্বের বাঁধনে প্রাণ একেবারে বাহির হইবার জো! তাই এক দিন ধুত্তোর্ বলিয়া সব দায় হইতে মুক্তি লাভ করিতে বর্ম্মায় চলিয়া আসিয়াছে। পেটটাকে রাখিয়া আসিতে পারে নাই, তাই পেটের দায়ে একটা চাকরি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; এবং সেই সঙ্গে একটু আরাম পাইবে বলিয়া···

অর্থাৎ বিবাহ-করা স্ত্রী নয়। মানে, বিবাহে অনেক দায়। শিকলের মতো সে-দায় এমন আঁটিয়া ধরে যে, সে-শিকল কাটা যায় না! ইহাতে মস্ত সুবিধা এই, কতকগুলা ছেলেমেয়ের ভার অসহ্য মনে হইলে চট্ করিয়া সরিয়া পড়া চলে! ধূমকেতুর পুচ্ছের মতো আগুনের দাহ লইয়া এরা তাড়া করে না! অনাদি রিয়ালিষ্ট! বর্ম্মায় সেণ্টিমেণ্টের বালাই নাই! ছেলে-মেয়ে হইয়াছে, হোক্। শাক-ভাত খাইয়া বাঁচে যদি, বাঁচিবে! তাদের লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে হইবে, আচারে-ব্যবহারে তারা ভদ্র হইবে, তার পর জীবনে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—এ-সব দুশ্চিন্তার এক-তিল কখনো মনে জাগে না! তাদের দেহ শক্ত-সমর্থ হইলে···এত বড় মগের মুল্লুক পড়িয়া আছে···খুঁটিয়া খাইবে ঠিক! বাঙালী-বাবু সাজিয়া দুঃখকে সার করিয়া পড়িয়া থাকার হাঙ্গামা এখানে নাই! কথায় বলে, জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি···এ-কথা বর্ম্মায় যেমন খাটে···

কল্লোল একাগ্র মনে অনাদির কাহিনী শুনিল। মনে হইতেছিল, যে-দুর্দ্দিন সমাগত···ছাপোষা গৃহস্থের পক্ষে আজিকার দিনে এ-ফিলজফি শিরোধার্য্য করা ছাড়া আর অন্য কি উপায়ই বা আছে!

কাহিনী শেষ হইলে অনাদি হুম্ করিয়া প্রশ্ন করিল,—এ মুল্লুকে আস্তানা নেছো এক-বচ্ছর এতদিনে এখানে পেলে কি? এক-বছরেও এখানকার মায়া কাটলো না!

কল্লোল বলিল এ-মুল্লুকে আসিয়া কি করিয়া তার দিন কাটিয়াছে · গাওয়ার ষ্ট্রীটের হোটেল···মা-পান··· মা-পানের মেয়ে মা-শী···নিজের মেয়ে চাঁপা···তার পর মা-শী, চাঁপা—সব ছাড়িয়া এক দিন সরিয়া পড়া···অসুখ ···হাসপাতাল···নার্শ মার্থা···তার অযাচিত করুণা···

শুনিয়া অনাদি বলিল,—নার্শ মার্থা! ডিস্পেন্সার আউট ডোরে যিনি রোগী দেখেন?

কল্লোল বলিল,—হ্যাঁ।

অনাদি বলিল,—মেম-সাহেব খুব ভালো! সেবার যখন আমার ঐ মেয়েটা হয়···তার মাদারের একেবারে যায়-যায় দশা! সে-সময় ঐ নার্শ মার্থা···ঐ তো ঢাকী আর ঢাক—দুটোকেই রক্ষা করলে!

কথায়-কথায় অনেকগুলা পাড়া পার হইয়া দু'জনে আসিল দরিদ্র-পল্লীতে। ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া-দেওয়া ঘর, ঘরের চাল খড়ে-পাতায় ছাওয়া···যত বর্ম্মীজ কারিগর আর দোকানী-পশারীর এ-সব ঘরে বাস। মুখে চুরুট মেয়েরা পথে বসিয়া বেতের টুকরি তৈয়ারী করিতেছে, কাগজের ফুল, গালার মালা, বাঁশের পেঁটারি তৈয়ারী করিতেছে···

দু'-চারিটা মোড়ের পর ইরাবতীর বাঁক। মস্ত চড়া। চড়ার উপর বেত আর বাঁশের ঘন ঝোপ। সেই ঝোপের ফাঁকে-ফাঁকে ক'খানা কুটীর। তারি একটা কুটীরের সামনে আসিয়া অনাদি ডাকিল,—বুনো···

সে-ডাকে আট-বছর বয়সের একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল। কল্লোলের পানে চাহিয়া অনাদি বলিল,—ছেলে···তার পর বুনোর দিকে চাহিয়া বলিল,—দুটো বেতের মোড়া নিয়ে আয় ঐ বেতের ঝোপে। আর তোর মাকে বল্ চায়ের জল চড়াতে···বুঝলি!

বুনো বলিল,—বুঝেছি···

অনাদি বলিল,—তোর মাকে বলবি, আমার এক বন্ধু এসেছেন···কলকাতার বন্ধু···তাঁর খাবারও যেন নিয়ে আসে···

বুনো চলিয়া গেল। অনাদি বলিল,—বাড়ীর মধ্যে তোমাকে আর নিয়ে যাবো না। ভাববে, কি করে এ-গোয়ালে বাস করছি! মোড়া নিয়ে আসুক·· বাইরে বসবো।

এখানকার এই কদর্য্য আবহাওয়ায় কল্লোল কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল! বলিল,—এর মধ্যে বাস করছো অনাদি!

অনাদি বলিল,—জীবনটাকে খুব সিরিয়স্ বলে মনে করি না বলেই পারছি, বোধ হয়!···আসল কথা কি জানো কল্লোল, মনে যখন বিরূপতা জাগে, মনকে তখন এই বলে বুঝোবার চেষ্টা করি···সভ্য-সমাজের আইন-কানুন, নিষেধ-শাসন মেনে বাস করে দেখেছি তো—আষ্টে-পৃষ্ঠে ভীষণ বাঁধন! সকলের মন রেখে, সকলের কাছে মান রেখে বাস করা···ওঃ, হাউ ট্রব্‌লসাম্ (কি কষ্টকর)! তার চেয়ে নেচারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে বাস করায় মস্ত আরাম আছে। এখানকার এ-জীবনে দুঃখ নেই, অতৃপ্তি নেই! এখানে আমাকে কেউ হিংসা করবে না, আমিও পরের শ্রীবৃদ্ধি দেখে মনে-মনে জ্বল্‌বো না! তা ছাড়া কোনো দিকে দায়-দায়িত্ব নেই···কোয়ায়েট্ ফ্রী!

বুনো মোড়া আনিয়া দিল। একটা বেত-ঝাড়ের সামনে মোড়া পাতিয়া দু'জনে বসিল।

তার পর দু'জনে বসিয়া কথা···নানা কথা···

একটু পরে বুনো আবার আসিল; তার হাতে চায়ের পেয়ালা, কেট্‌লি। সঙ্গে বুনোর মা। মার হাতে রুটি, তরকারী আর বর্ম্মীজ মিঠাই।

অনাদি বলিল,—এসো···তার পর কল্লোলের পানে ফিরিয়া কহিল,—ইনি হলেন গিন্নী। নাম দয়াময়ী। নামটি কে রেখেছিল, জানি না···কিন্তু তিনি মানুষ চিনতেন।

তার পর দয়াময়ীর পানে চাহিয়া অনাদি বলিল,—আমার পুরোনো বন্ধু কল্লোল রায়। সহরের সৌখীন মানুষ। আলাপ করো।···গঙ্গা কি করছে? তাকেও ডাকো···

দয়াময়ী চাহিল বুনোর পানে, বলিল,—গিয়ে তোর মাসিকে বল্, ফল ছাড়িয়ে শীগগির করে যেন নিয়ে আসে।···নিজে যেন সে আসে।

কল্লোলের পানে চাহিয়া অনাদি বলিল,—বেচারী গঙ্গা!···সত্যি কল্লোল, তাকে তোমার ভালো লাগবে!··· এক হতভাগার পাল্লায় পড়ে বর্ম্মায় এসেছিল। স্রেফ্ লভ্। কলকাতায় দিব্যি ছিল। একটা থিয়েটারে এ্যাক্ট করতো·· দু'শো টাকা মাইনে পেতো। তার পর জুটলো ঐ হতভাগা। তার পাল্লায় পড়ে এখানে এলো। হত-ভাগা বলেছিল, বিয়ে করবে···দেশে বিয়ে করা যাবে না। তাই বর্ম্মা!···এই লোভ দেখিয়ে ওকে এখানে আনে, এসে কোথায় বিয়ে! হুঁঃ! বেচারীর তিন-চার হাজার টাকার গহনা আর নগদ প্রায় দেড়-হাজার টাকা নিয়ে এক দিন দে লম্বা!·· পথে বসে গঙ্গা কাঁদছিল। দেখে আমার এই গিন্নী-দয়াময়ীর হলো দয়া···নিয়ে এলেন নিজের কাছে।···বোনের মতো গঙ্গাকে এখা পালন করছেন। মেয়েটা সত্যি ভালো, হে!

কল্লোলের মনে আঘাত লাগিল। এত অনাচারেও মনের আদিম-সংস্কার একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই! কল্লোল ভাবিল, এই সব অভাগিনীর নামে সমাজ খড়্গহস্ত! অথচ এদের চেয়ে অধম ঐ সব ভদ্র পুরুষ···এদের সঙ্গে তারা প্রতারণা করে! কল্লোল বলিল,—আমার ভারী দুঃখ হয় অনাদি, যখন ওদের কথা ভাবি···

মৃদু কটাক্ষে কল্লোলের পানে চাহিয়া দয়াময়ী বলিল,—আমাদের কথা ভেবে বাবুদের দয়া হয় তাহলে···

অনাদি বলিল,—চুপ···ও নিয়ে মামুলি ব্যঙ্গ আবার কেন? আমরা মানি গো, তোমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছো,···যাদের পাশে বিয়ে-করা অনেক ভদ্র-ঘরের স্ত্রী দাঁড়াতে পারে না! না ভালোবাসার নিষ্ঠায়, না আত্ম-দানে···

গঙ্গা আসিল। তার হাতে বর্ম্মীজ রেকাবিতে কাটা ফল। মূর্ত্তি শান্ত·· দেহে রূপের বিভা···সে-বিভায় এতটুকু উগ্রতা নাই!

কল্লোল দেখিল। এই কদর্য্য পল্লীতে এমন মূর্ত্তি দেখিবে, কল্পনা করে নাই!

বসিয়া অনেক কথা হইল। গঙ্গাকে উদ্দেশ করিয়া কল্লোল দু'-চারিটা কথা বলিল। ভাবিল, গঙ্গা সে-কথায় যোগ দিবে! কিন্তু গঙ্গা কোনো কথা কহিল না··· নিঃশব্দে নিরুত্তরে রহিল···

কল্লোল ভাবিল, রহস্য? না, দাম বাড়াইতে চায়?

দূরে কোথায় চার্চ্চ, না, মন্দির ছিল···ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া আটটা বাজিয়া গেল। কল্লোলের হুঁশ হইল। কল্লোল বলিল,—রাত হয়ে গেছে। উঠি···

ইহার মধ্যে অনাদি কৎন্ বোতল আনিয়া বোতল খুলিয়া বসিয়াছে। ক'পাত্র নিঃশেষ করিয়াছে···এখন আর-এক পাত্র ভরিয়া কল্লোলকে কহিল,—সত্যি খাবে না? এমন পণ করে মদ ছেড়েছো, বন্ধু?

কল্লোল বলিল,—পণ করিনি। তবে মদ ছেড়েছি। আর কখনো খাবো না, এমন কথা বলছি না। এখন রুচি নেই!

সে-পাত্র নিঃশেষ করিয়া অনাদি বলিল,—কেন মদ খাই, জানো? না খেলে সাদা চোখে এদের সঙ্গে বাস করতে পারতুম না। তোমাদের গান্ধিজী বলেন, বামুন-কায়েৎ-বদ্যি সকলে তোমরা হাড়ি-ডোম-চণ্ডালের সঙ্গে মিশে এক হও! সেই সঙ্গে আবার বলেন, মদ ছাড়ো!···অসম্ভব কথা! মদ ছাড়লে এদের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হওয়া যায় না···আমি তা মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝি।

৬

বাড়ী ফিরিয়া কল্লোল সঙ্কোচ-ভরে আসিয়া মার্থার ঘরের সামনে দাঁড়াইল।

ফুলে-পাতায় সাজানো ঘর। ডিনার-টেবিল সজ্জিত। ঘরে মার্থা···আর আছে হুসির স্ত্রী নীরদা, তার মেয়ে গৌরী এবং দীনবেশ এক জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

কল্লোলকে দেখিয়া মার্থা বলিল,—আমার জন্ম-দিনের উৎসব! তোমাকে অত করিয়া বলিলাম, আর তুমি এ-উৎসবে যোগ দিলে না!

কুণ্ঠিত স্বরে কল্লোল বলিল,—হঠাৎ এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে পথে দেখা হলো। সে তার বাসায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে···তাদের ওখানে দেরী হয়ে গেল। আমায় ক্ষমা করো···

মার্থা বলিল,—এসো···বসো। বসে মুখে কিছু দাও। ···সকালে যে-ফুল উপহার দেছো, মোষ্ট লাভ্লি ফ্লাওয়ার্স ···আমার ধন্যবাদ!

কল্লোলকে দেখিয়া হুসির স্ত্রী নীরদা জড়োসড়ো মূর্ত্তিতে সরিয়া গিয়া চাপা গলায় বলিল,—আমরা আসি···

এ-কথা বলিয়া নীরদা এক-মিনিট দাঁড়াইল না; মেয়ে-গৌরীকে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

আবছা-আভাসে কল্লোল দেখিল গৌরীকে···মেয়েটি দেখিতে বেশ···লজ্জা-সরমও আছে!

মার্থা কহিল,—বসো ক্যাললু। আমার হাতের কেক খাইয়া তবে তুমি যাইতে পাইবে···

তার পর মার্থা চাহিল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের দিকে। বলিল,—তুমি এখন এসো, বিল।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের নাম উইলিয়াম।

কাতর করুণ নয়নে সে চাহিল মার্থার পানে··· ডাকিল,—মার্থা···

—ও নো···যাও। তোমাকে পনেরো টাকা দিয়াছি। আবার টাকার দরকার হইলে কুড়ি দিন পরে আসিয়ো··· কিছু দিব। তার আগে আসিলে এক-পয়সা পাইবে না।

বিল একটা নিশ্বাস ফেলিল।

মার্থা বলিল,—দেরী করো না, যাও। গুড নাইট্। রাত্রে ভয় আছে, তোমার হাতে টাকা···কি তুমি করিবে···

বিল বলিল,—বিশ্বাস করো মার্থা, আমি মদ ছাড়িয়া দিয়াছি।

মার্থা বলিল,—ছাড়িয়া থাকো, তোমারি মঙ্গল। কিন্তু আর নয়, বিল···আধ ঘণ্টা ধরিয়া তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছি, কেন তুমি কথা শুনিতেছ না?

বিল বলিল,—চলিয়া যাইব বলিয়া আমি আসি নাই। আজ তোমার বার্থ-ডে···আমাকে ক্ষমা করো···ভিক্ষা দাও, মার্থা!

মার্থা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। এবং এবার একটু রূঢ় স্বরে বলিল,—নো ননসেন্স প্লীজ···আই ডিটেষ্ট সীন্স্! (নাটকীয় ব্যাপারে আমার ঘৃণা আছে)।

বিল আবার একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া বলিল, —ইউ আর এ্যাজ হার্ড এ্যাজ ষ্টোন্ (পাথরের মতো তুমি কঠিন)। ইউ শী মার্থা···

মার্থা উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিল মার্থার পানে চাহিয়া আরো কি বলিতে যাইতেছিল, মার্থা বলিল,—আর একটি কথা শুনিব না। প্লীজ্, প্লীজ্ বিল্…

বলিয়া খোলা দ্বারের দিকে সে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল।

বিল হাত বাড়াইল…

কল্লোল বুঝিল, এবারে চলিয়া যাইবে! বিদায়-সম্ভাষণের জন্য কর-মর্দ্দন করিতে চায়…

মার্থা কিন্তু বিলের হাত ধরিল না। বলিল,—এক্সকিউজ মী! নো কাশ্ (ক্ষমা করো…কোনো অভিনয় নয়)!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া…যেন গভীর শ্রান্তি-ভরে টলিতে টলিতে বিল চলিয়া গেল।

মার্থা স্তম্ভিত নির্ব্বাক্ দাঁড়াইয়া আছে…তার দু'চোখের দৃষ্টি…যেন জীবন্ত মানুষের চোখের দৃষ্টি নয়! পুতুলের চোখে তুলি দিয়া আনাড়ি-শিল্পী যে-দৃষ্টি আঁকিয়া দেয়, তেমনি প্রাণহীন দৃষ্টি…

রঙ্গমঞ্চে কল্লোল যেন একখানা নাটকের শেষ দৃশ্যটুকু মাত্র চোখে দেখিয়াছে! আগেকার নানা দৃশ্যে এ-নাটকের কি-সব ঘটিয়া গিয়াছে, তার কিছু জানে না…

প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিল।

তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া মার্থা কল্লোলের পানে ফিরিয়া চাহিল; বলিল,—আই এ্যাম সরি, ফ্রেণ্ড (আমি দুঃখিত, বন্ধু), তোমাকে চুপচাপ বসাইয়া রাখিয়াছি! কেক্ আনি…

কল্লোলকে প্রশ্ন-নিক্ষেপের অবকাশমাত্র না দিয়া মার্থা গিয়া ছোট রেফ্রিজারেটর খুলিল। তার'পর কেকের প্লেট বাহির করিয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। নিজের হাতে কল্লোলের সামনে প্লেট রাখিয়া সে-প্লেটে কেক্ পরিবেশন করিল; নিজের জন্যও আলাদা একটা প্লেটে কেক্ রাখিল; রাখিয়া চাহিল কল্লোলের পানে…

কল্লোলের দু'চোখের দৃষ্টিতে কৌতূহল…বন্যায় নদীর জল যেমন টল্‌টল্ করে, কৌতূহল তেমনি টলটল্ করিতেছে…চোখ ছাপাইয়া এখনি যেন এ কৌতূহল…

মার্থা বলিল,—ইউ সীম্ সো ভেরি কিউরিয়স (খুব আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ)!

কল্লোল বলিল,—ইয়েস্! ইট্ ইজ সো ড্রামাটিক (হ্যাঁ, যেন নাটকীয় দৃশ্যের মতো)!

হাসিয়া মার্থা বলিল,—ইয়েস্, ইট ইজ ড্রামা…মাই লাইফস্ ড্রামা…ট্রাজেডি অফ মাই লাইফ…(হাঁ, ইহা নাটক বটে! আমার জীবন-নাটক,—আমার জীবনের ট্রাজেডি)!

মুখে হাসির রেখা থাকিলেও মার্থার স্বর অশ্রুর বাষ্পে ভরিয়া জমাট গাঢ়…

কল্লোলের দেহের রক্ত চকিতে খরস্রোতে গিয়া মাথায় উঠিল। স্থির অবিচল নেত্রে সে মার্থার পানে চাহিয়া রহিল।

মার্থা নিশ্বাস ফেলিল! বেশ বড় নিশ্বাস! নিশ্বাস ফেলিয়া মার্থা বলিল,—বিল্…মাই হাস্‌ব্যাণ্ড (বিল আমার স্বামী)…এ্যাণ্ড ষ্টীল নট্ এ হাস্‌ব্যাণ্ড। ল ওণ্ট রেকগ্‌নাইজ্ হিম…নর্ উড রেকগ্‌নাইজ্ দী ম্যারেজ… (তবু ও আমার স্বামী নয়! আইন উহাকে আমার স্বামী বলিয়া স্বীকার করিবে না। আমাদের বিবাহকেও আইন স্বীকার করিবে না)।

কল্লোল বুঝিল, রহস্য আছে! হয়তো এ-বিবাহে আইনের কোনো গলদ…

মার্থা বলিল,—খাও বন্ধু। চুপ করিয়া বসিয়া কি এত ভাবিতেছ? ও…শুনিবে তবে? বিল্‌কে আমি জানিতাম কলিকাতায় থাকিতে…তখন আমি ইয়ং মেড্…বিল ছিল ফাইন্ ইয়ং ম্যান (চমৎকার যুবক)। দুঃখ করিয়া বলিত, বিলের কেহ নাই…সে চায় বন্ধু, সঙ্গিনী। বলিত, আমাকে ভালোবাসে! ছায়ার মতো আমার পিছনে ফিরিত…আচার-ব্যবহার ছিল চমৎকার! আমার মনে করুণা হইল। সেই করুণা হইতে ভালোবাসা! জীবনে তখন নব-বসন্ত। সব ভালো দেখি। কোনো-কিছুতে ভয় ছিল না, অবিশ্বাস বা সন্দেহ ছিল না! ভাবিতাম, this world is heaven (পৃথিবী যেন স্বর্গ)! বিল বলিত, আমি যদি বিবাহ না করি, তার জীবন মরুভূমি হইয়া যাইবে। আমি বিবাহ করিলাম। তার পর হনিমুনে দু'জনে গেলাম ব্যাঙ্গালোর। এক মাস পরে

ফিরিলাম। যেমন ফিরিয়া আসা, পুলিশের ওয়ারেণ্টে বিল গ্রেফতার হইল। শুনিলাম, তার স্ত্রী বাঁচিয়া আছে। স্ত্রী খোরাকীর নালিশ করিয়াছিল...বিল গা-ঢাকা দিয়া আমার ওখানে পড়িয়া থাকিত। আমার বাবার ছিল টাকা...আমি তাঁর একমাত্র কন্যা...আমার টাকা হাত করাই ছিল বিলের উদ্দেশ্য...

অশ্রুর বাষ্পে মার্থার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কল্লোল চাহিয়া আছে মার্থার পানে। তার মুখে কথা নাই। চেতনাও যেন লোপ পাইয়াছে! মনে হইতেছিল, কবে যেন একখানা বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিল,...স্বপ্নে এখন যেন সে-নাটকের কথা মনে ভাসিয়া আসিতেছে!

চেতনা ফিরিল মার্থার কণ্ঠস্বরে...

মার্থা বলিতেছিল,—টাকাই যদি চাই, আমাকে সে-কথা বলিতে পারিত! আমার সঙ্গে এ-প্রতারণার কি প্রয়োজন ছিল? বিলের কাছে আমি কোনো অপরাধ করি নাই। সমাজে আমাকে এতখানি হেয়, হাস্যাস্পদ সে কেন করিল, বলিতে পারো?

কল্লোলের মনের উপর কারা যেন বিপুল কলরব জুড়িয়া দিয়াছে! ভাষায় তাদের সে-কলরব জাগিয়া কল্লোলের কণ্ঠে ফুটিল। কল্লোল বলিল,—এখনো তুমি বিলকে ভালোবাসো!

—ভালোবাসি! হাউ ষ্ট্রেঞ্জ (কি আশ্চর্য্য)! মেয়ে-জাতটা নির্ব্বোধ, তা বলিয়া এত-বেশী নির্ব্বোধ ভাবো...

কল্লোল বলিল,—যেটুকু বুঝলুম, তাতে মনে হচ্ছে, বিল মাঝে মাঝে আসে...তোমার কাছে টাকা চায়...তুমি তাকে টাকা দাও...

মার্থা বলিল,—ভিখারীকে সকলেই টাকা দেয়! তোমার কাছে টাকা ভিক্ষা চাহিলে তুমি তাকে টাকা দিতে না?

কল্লোল বলিল,—যে-রকম করুণ ভাবে তোমার এখানে থাকতে চাইলো!...তোমাকে ভালোবাসে।...কিন্তু ভালো কথা, ওর সে-স্ত্রী এখনো বেঁচে আছে?

—না। আজ দু'বছর মারা গিয়াছে। বিল আসিয়া বলে, ক্ষমা করিয়া এখন যদি তাকে আমি বিবাহ করি, সে-বিবাহ সত্যকার বিবাহ হইবে।

কল্লোল বলিল,—হয়তো যে-স্ত্রী ছিল, তার জ্বালায় বেচারী...

বাধা দিয়া মার্থা বলিল,—সত্য কথা। আমি শুনিয়াছি, সে-স্ত্রী ছিল দারুণ দুষ্ট! কর্কশ বাক্যবাণে সর্ব্বদা উহাকে বিদ্ধ করিত!...এ-ব্যাপারের পর লজ্জায় আমি কলিকাতা ছাড়িয়া, ইণ্ডিয়া ছাড়িয়া, সকলকে ছাড়িয়া বর্ম্মায় আসিয়াছি।...বিল আজ দেড় বৎসর বর্ম্মায় আসিয়াছে। আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। চাকরি করে। মোটর-মিস্ত্রীর কাজ। মাহিনা অল্প। ঘরে বিধবা মা আছে...বাত-রোগী এক বিধবা বোন আছে। আসিয়া কাঁদে...নড়িতে চায় না। বলে, আমায় সত্য-সত্য ভালোবাসে...বলে, এখন বিবাহ করিলে আইন তাহা মঞ্জুর করিবে।

কল্লোল বলিল,—বিবাহ করতে বাধা আছে?

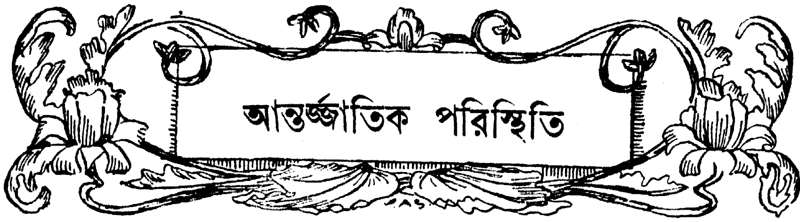
মার্থা বলিল,—মানুষ একবার যদি বিশ্বাস-ভঙ্গ করে, তাকে আর যে-কেহ আবার বিশ্বাস করিতে পারিলেও আমি পারি না! এ-জন্য আমার মনকে দুর্ব্বল বলো বা যে-দোষই দাও...আমি নিরুপায়!

কল্লোল বলিল,—কিন্তু তোমার সমাজে বনিয়াদি-ঘরেও আখ্‌চার্ ডিভোর্স হচ্ছে। আবার ডিভোর্স-করা সেই স্বামি-স্ত্রীকেই তোমার সমাজ সম্মান করছে! ডিভোর্স-করা মহিলাকেও ধনী-বনিয়াদী পুরুষ বিবাহ করে তাকে আবার মাথায় তুলছে!

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া মার্থা বলিল,—রট্...আমি সত্য আশ্চর্য্য হই, বিবাহ সব-চেয়ে সেক্রেড-ট্রাষ্ট...সে-ট্রাষ্ট একবার যে ভাঙ্গে, মনের ব্যাপারে মানুষ কি করিয়া আবার তাকে বিশ্বাস করে?

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।



গত জুন মাসের শেষ ভাগে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ভূমিকম্প হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না! এই বিরাট বিপর্য্যয়ের ফলে আন্তর্জ্জাতিক সজ্বর্ষ সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তাহারা আজ পরস্পরের ঘোর শত্রু! আবার পূর্ব্বের সকল সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূরীভূত হইয়া আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে নূতন ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে। এই আকস্মিক বিপর্য্যয়ে চরম বিপদ হইতে সাময়িক পরিত্রাণ লাভে কেহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, আবার কেহ অকস্মাৎ নিদারুণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। অবশ্য, প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞের দৃষ্টিতে এই "ভূমিকম্প" অপ্রত্যাশিত নহে—ইহা অবশ্যম্ভাবীই ছিল; তবে, প্রত্যাশিত সময়ের পূর্ব্বে এই বিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হওয়ায় সর্ব্বত্র বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সজ্বর্ষ—

গত ২২শে জুন জার্ম্মাণী অকস্মাৎ সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করে। জার্ম্মাণীর আক্রমণ-নীতির এই পরিবর্ত্তন অবশ্য অপ্রত্যাশিত। সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তাহার প্রকৃত মিলন সত্যই অসম্ভব; এক দিন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সহিত নাৎসী রাষ্ট্রের শক্তিপরীক্ষা হইতই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী গত ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাহা সফল হইবার পূর্ব্বেই সে যে চুক্তিপত্র পদদলিত করিবে, ইহা পূর্ব্বে মনে হয় নাই।

জার্ম্মাণীর আক্রমণ-নীতির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে জার্ম্মাণীর আশাতীত প্রতিরোধ-ব্যবস্থা এবং সোভিয়েট রুশিয়ার দৃঢ় মনোভাব হয় ত জার্ম্মাণীকে তাহার পরিকল্পিত সময়ের পূর্ব্বেই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনে বাধ্য করিয়াছে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রত্যক্ষ আক্রমণের সকল আয়োজন ব্যর্থ হওয়ায় জার্ম্মাণী বুঝিল যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ করিতে হইলে বৃটেনের সাম্রাজ্যাভিমুখে আক্রমণ চালিত হওয়া প্রয়োজন। অথচ, যুরোপে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে না পারিলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ প্রদান অসম্ভব। এই জন্য জার্ম্মাণী সোভিয়েট রুশিয়াকে ত্রিশক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু রুশিয়া তাহাতে সম্মত হয় নাই; বরং সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিল যে ত্রিশক্তির চুক্তিতে সে স্বাক্ষর করিবে না। সোভিয়েট রুশিয়ার এই অনমনীয় মনোভাব এবং তাহার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি জার্ম্মাণীর উৎকণ্ঠার কারণ হয়; সুযোগ উপস্থিত হইলেই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র যে নাৎসী-প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ করিতে প্রয়াসী হইবে, ইহাতে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রনায়কদিগের আর সন্দেহ থাকে না। এই জন্যই জার্ম্মাণী প্রতিবেশী-শত্রুর নিপাত সাধনে উদ্যত হইয়াছে; পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জাপান যেমন "উচ্ছৃঙ্খল" চীনাদিগকে তিন মাসের মধ্যে সায়েস্তা করিবে মনে করিয়াছিল, তেমনই পক্ষকালের মধ্যে কম্যুনিষ্টদিগের দর্প চূর্ণ করিবার স্বপ্নে মসগুল হইয়া নাৎসী নেতৃবৃন্দ এই অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন।

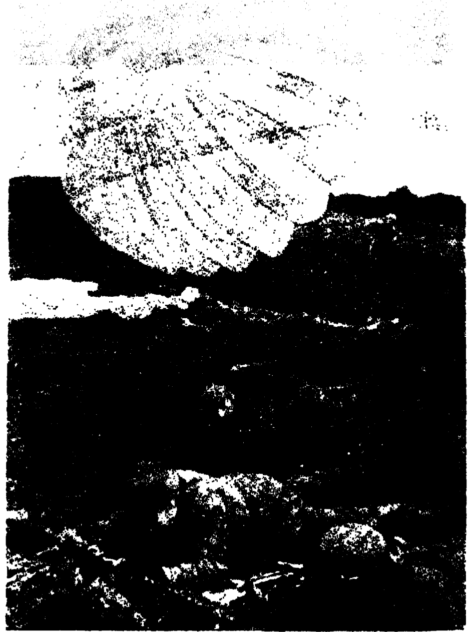
গত এপ্রিল মাসে জার্ম্মাণী যখন ঈজিয়ান সাগরে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বস্তুতঃ দার্দ্দানেলিজ ও বস্‌ফোরাসে আধিপত্য স্থাপন করিতেছিল, তখনই সোভিয়েট-জার্ম্মাণ বন্ধুত্বের চরম পরীক্ষা হয়। তখন প্রকাশ্যে সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তি উত্থিত না হওয়ায় মনে হইয়াছিল যে, জার্ম্মাণী হয় ত অন্যত্র সুবিধা-দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কদিগকে তুষ্ট করিয়াছে। পরবর্ত্তী ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, বন্ধু-বিচ্ছেদের কথা তখন সাধারণ্যে প্রকাশিত না হইলেও ঠিক সেই সময় হইতেই প্রকৃত সোভিয়েট-জার্ম্মাণ বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে। হয় ত সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তির জন্যই ইরাকে জার্ম্মাণ-সাহায্য পৌঁছিতে পারে নাই; কারণ ঈজিয়ান্ সাগরে জার্ম্মাণ-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর

সিরিয়া ও ইরাকেও যদি নাৎসী-প্রভাব স্থাপিত হইত, তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়া ক্রমেই নাৎসী-জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইত।

জার্ম্মাণীর পূর্ব্বাভিমুখী অভিযান আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই আক্রমণের কারণ এবং জার্ম্মাণীর যুধিষ্ঠিরোচিত সত্যনিষ্ঠার কাহিনী-সম্বলিত রিবেনট্রপের এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। জার্ম্মাণী যখনই যাহার সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হয়, তখনই সে তাহার গোপন কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে গোপন সংবাদ-প্রাপ্তির অভিযোগ জাহির করে, তাহার জার্ম্মাণ-বিরোধী কার্য্যের অসংখ্য প্রমাণ সংগ্রহেও নাৎসী রাষ্ট্রনায়কদিগের বিলম্ব হয় না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও জার্ম্মাণী "ফাঁসী দিবার পূর্ব্বে অপবাদ দিবার" নীতি ত্যাগ করে নাই। কাজেই রিবেনট্রপের কৈফিয়তে জার্ম্মাণীর এই নূতন দস্যুবৃত্তির প্রকৃত কারণ সন্ধানের প্রয়াস পণ্ডশ্রম। রুশিয়ার পক্ষ হইতে বলা চলে যে, জার্ম্মাণীর কোনরূপ বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ কখনও তাঁহাদিগের কার্য্য অথবা বাক্যের দ্বারা নাৎসী নেতাদিগের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে দেন নাই; সোভিয়েট-জার্ম্মাণ অর্থনীতিক চুক্তির সর্ত্তগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালিত হইয়াছে; বৃটেনের সহিত ব্যবহারেও সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময় হিট্‌লার এক ঘোষণাবাণীতে বলেন যে, য়ুরোপকে বল্‌শেভিকবাদের ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশেই জার্ম্মাণীর এই অভিযান। বল্‌শেভিক-আতঙ্কের কথা বলিয়া এক সময় হিট্‌লার য়ুরোপের কতকগুলি অদূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন। এবারও তিনি অন্যান্য দেশের ধনিকদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবেন বলিয়া হয় ত আশা করেন। য়ুরোপের জার্ম্মাণ-প্রভাবান্বিত রাষ্ট্রগুলি হিট্‌লারের এই "ধর্ম্মযুদ্ধের" মহিমা উপলব্ধি করিয়াই হউক, অথবা নাৎসী-নেতার নিকট হইতে মোটা বক্‌সিস্ খাইবার লোভেই হউক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জার্ম্মাণীর সহিত এই যুদ্ধে সহযোগিতা করিতেছে।

হিট্‌লার বল্‌শেভিকবাদ উচ্ছেদের ধ্বনি তুলিয়া মার্কিণ ধনিকদিগের মনেও রেখাপাত করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; তিনি হয় ত আশা করেন—বল্‌শেভিক-বিরোধী অভিযানে যদি তাঁহার পক্ষে মার্কিণী ধনিকদিগের সহানুভূতি লাভ সম্ভব হয়, তাহা হইলে উহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বৃটেনের সহিত জার্ম্মাণীর বিরোধের মীমাংসার জন্য মার্কিণী ধনিকগণ আগ্রহান্বিত হইতে পারেন। এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—প্রথমতঃ,



জার্ম্মাণ প্যারাসুট সৈন্য অবতরণের অব্যবহিত পরে

মার্কিণ ধনিকগণ অত্যন্ত বল্‌শেভিক-বিরোধী; তাহার পর, হিট্‌লার হয় ত এখন তাঁহার সুবিধাজনক সর্ত্তে বৃটেনের সহিত মীমাংসা করিতে অনিচ্ছুক নহেন। হিট্‌লার হয় ত বৃটেনেরও একটি শ্রেণীর সহানুভূতি লাভের আশা করিতেছেন; তিনি জানেন যে, বৃটেনের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি সোভিয়েট-বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে—১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে 'ওয়ার্ল্ড রিভিউ' পত্রে ডগ্‌লাস্ রীড্ লিখিয়াছিলেন—"I myself, since that morning

when Hitler marched into Prague, have been in England—long enough to discover that there are many influential people in this country who are inflexibly determined not to have any kind of alliance with Russia, if they can prevent it."

ডগ্‌লাস্ রীডের এই উক্তি ব্যতীত, চেম্বারলেনী তোষণ-নীতির যুগের ইংরেজগণ এখনও বাঁচিয়া আছেন; সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সঙ্ঘর্ষের শুভ সুযোগে বৃটেনের দুইটি শত্রু নিপাত হইবার মধুর স্বপ্নে তাঁহারা বহু কাল বিভোর ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে হয়—চেম্বারলেনী যুগের তোষণনীতির উপাসকদিগকে প্রভাবান্বিত করিবার উদ্দেশ্যেই হয় ত গত মে মাসে হিট্‌লারের "পোষ্যপুত্র" হেস্ বৃটেনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তোষণ-নীতির চির-বিরোধী এবং হিট্‌লারের চরম শত্রু মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ ইডেন্ এখন বৃটেনের কর্ণধার; তাঁহাদিগকে হাত করা নাৎসী নেতার সাধ্যাতীত। তাঁহারা বিভ্রান্ত হিট্‌লারের "পোষ্যপুত্রটিকে" কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নিরাপদ স্থানে রাখিয়াছেন, এবং তাঁহার সম্বন্ধে বৃটিশ জনসাধারণের আগ্রহ ও কৌতূহলে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেন নাই।



প্যারাসুট সৈন্য আত্মগোপন করিতেছে

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ যুদ্ধ যদি বহুকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে হিট্‌লারের বল্‌শেভিক-বিরোধী ধ্বনি ক্রমে বৃটিশ ও মার্কিণী ধনিকদিগের মনে রেখাপাত করিবে কি না এবং তাহার পরোক্ষ প্রভাব ঐ সকল দেশের সরকারের উপর পতিত হইবে কি না, সে কথা স্বতন্ত্র। তবে, এখন বৃটেন্ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, তাহারা কম্যুনিজমের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি-সম্পন্ন না হইলেও, নাৎসী জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনে সোভিয়েট রুশিয়াকে তাহারা সাহায্য করিবে।

জার্ম্মাণী আজ যখন পূর্ব্বাঞ্চলে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত, তখন অন্য দিকে তাহার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনের প্রকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। মিঃ চার্চ্চিল ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার জার্ম্মাণীর তুলনায় বৃটেনের শস্ত্রশক্তির অল্পতার কথা বলিয়াছেন। কাজেই, এই সুযোগেও পশ্চিম-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালন বৃটেনের পক্ষে সম্ভব কি না, তাহা বলা যায় না। অন্ততঃ, আফ্রিকায় আক্রমণ আরম্ভ করিয়া লিবিয়া হইতে নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট-বাহিনী যদি এই সময় বিতাড়িত হয়, তাহা হইলে ভূমধ্য সাগর নিষ্কণ্টক হইতে পারে। বৃটেন কেন এই সুযোগে প্রতি-আক্রমণে প্রবৃত্ত হইতেছে না, তাহা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—গত ৯ই জুন সোভিয়েট রুশিয়ার ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র সচিব মঃ লিট্‌ভিনফ্ (ইঁহার সময়ই সোভিয়েট সরকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত মিলিত হইয়া ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সঙ্ঘ গঠনে প্রয়াস করিয়াছিলেন) বৃটেনকে এই সুযোগে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

বৃটিশ রাষ্ট্রনায়কগণ সোভিয়েট রুশিয়াকে সাহায্য-দানের কথা ঘোষণা করিবার সময় তাঁহাদিগের কম্যুনিজম্-বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। ইহাতে আশঙ্কা হয়, তাঁহারা কি সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সংঘর্ষে কেবল জার্ম্মাণীর শক্তিক্ষয়ের দ্বারাই নিজেরা উপকৃত হইতে চাহেন? কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের ধ্বংস কি তাঁহাদিগের

উদ্বেগের কারণ নহে? তাঁহারা কি এই অপ্রত্যাশিত সুযোগে কেবল বৃটেনের শস্ত্রশক্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিতেছেন, এবং পরে এই বর্দ্ধিত শক্তি লইয়া ক্ষীণবল জার্ম্মাণীর উপর পতিত হইবার কল্পনা করিতেছেন? জার্ম্মাণীর শক্তিক্ষয়ে প্রবৃত্ত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের হিতাহিত সম্বন্ধে ঔদাসীন্যই কি তাঁহাদিগের এই সময় প্রতি-আক্রমণে প্রবৃত্ত না হইবার অন্যতম কারণ? এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে—এবার যুদ্ধে জার্ম্মাণী একই সময়ে একাধিক রণক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইতে চাহে নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে জার্ম্মাণীর শত্রু-রাষ্ট্রগুলি তাহার এই নীতি আজ পর্য্যন্ত ব্যর্থ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে চেম্বারলেনী দলের অদূরদর্শিতার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত চুক্তি করিয়া জার্ম্মাণী পূর্ব্বাঞ্চল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল। পরে, অস্ত্রবলে পশ্চিমাঞ্চল নিষ্কণ্টক করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে সে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। এখন বৃটেনের পক্ষে যদি জার্ম্মাণীকে প্রতি-আক্রমণ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর রণনীতিরই জয়-জয়কার হইবে।

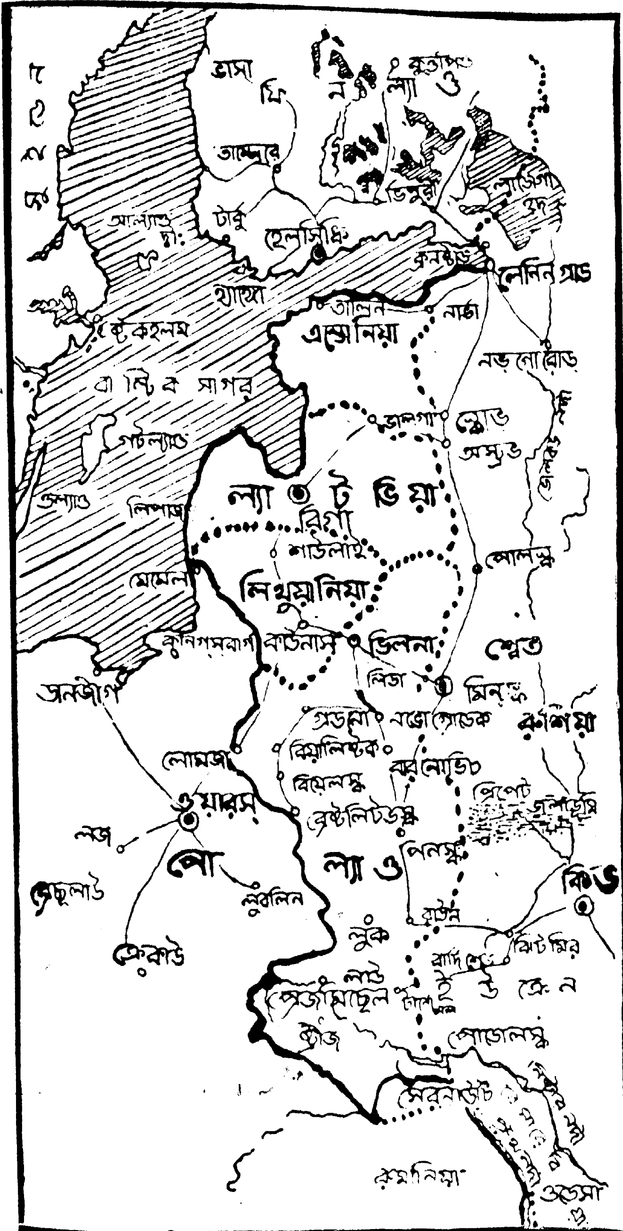
সোভিয়েট বাহিনী জার্ম্মাণদিগের বিরুদ্ধে আশাতীত বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। বিনা যুদ্ধ-ঘোষণায় অতর্কিতে আক্রমণের প্রাথমিক সুবিধা জার্ম্মাণী লাভ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার পর হইতেই জার্ম্মাণদিগের অগ্রগতি প্রহত হইয়াছে। প্রধানতঃ, লেনিনগ্রাড্, মস্কো এবং য়ুক্রেণের রাজধানী কিয়েভ লক্ষ্য করিয়া জার্ম্মাণীর আক্রমণ চালিত হইতেছে; আজ তিন সপ্তাহ পরেও কোন দিকেই জার্ম্মাণীর অগ্রগতি উৎসাহজনক নহে। সোভিয়েট সামরিক-বিভাগের পক্ষ হইতে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে প্রতি-আক্রমণ পরিচালন এবং প্রতি-আক্রমণের ফলে জার্ম্মাণবাহিনীর পশ্চাদপসরণের কথাও বলা হইয়াছে। সোভিয়েট সামরিক-বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে যদি অতিরঞ্জনও থাকে, তাহা হইলেও ইহা নিশ্চিত যে, সোভিয়েট বাহিনীর প্রতিরোধের ফলে পূর্ব্বাঞ্চলে জার্ম্মাণদিগের অগ্রগতি অত্যন্ত মন্দীভূত হইয়াছে। পোল্যাণ্ডের কথা বাদ দিলেও পশ্চিম-য়ুরোপে গত বৎসর ৫ই জুন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং মাত্র ১২ দিন পরে—১৭ই জুন "সব শেষ" হয় আর পূর্ব্বাঞ্চলের যুদ্ধে আজ তিন সপ্তাহ পরেও জার্ম্মাণী কেবল সোভিয়েট রুশিয়ার ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে।

রুশিয়ার বিরুদ্ধে ২ হাজার মাইলব্যাপী স্থানে জার্ম্মাণী যে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা প্রধানতঃ, তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—বাল্‌টিক-অঞ্চল ও ফিন্‌ল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া। বাল্‌টিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে লিথুয়ানিয়া সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত হইয়াছে,



প্যারাসুটের সাহায্যে অবতরণ

ল্যাটভিয়ার মধ্য দিয়া একটি বাহিনী অষ্ট্রভে পৌছিয়াছে, এস্তোনিয়ার রাজধানী ট্যালিন্ জার্ম্মাণরা অধিকার করিয়াছে; ফিন্‌ল্যাণ্ডে জার্ম্মাণ ও ফিন্ সৈন্যের মারমান্স অধিকারের কথা সমর্থিত হয় নাই; ল্যাডোগা হ্রদের দিকে এবং ক্যারেলিয়ান যোজকে যুদ্ধ চলিতেছে। পোল্যাণ্ড হইতে পূর্ব্বগামী জার্ম্মাণবাহিনী হোয়াইট রুশিয়ার রাজধানী মিন্‌স্ক অধিকার করিয়া ব্যারিসভ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, পোলস্ক ও লেপেল অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছে, বিয়ালিটস্ক হইতে জার্ম্মাণ সেনা বব্রুইস্ক পর্য্যন্ত অগ্রসর



ব্যূহশ্রেণীর সম্মুখীন হইয়াছে। এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার সময়—১২ই জুলাই যুদ্ধের তীব্রতা সাময়িক ভাবে হ্রাস পাইয়াছিল, উভয় পক্ষ ব্যাপকতর ও ভীষণতর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সজ্ঘর্ষে সম্মুখ যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে, তাহা নিশ্চিত বলা দুষ্কর; পুনঃ পুনঃ বিজয়-গর্ব্বে স্ফীত জার্ম্মাণদিগকে সোভিয়েট-বাহিনী পরাভূত করিতে পারিবে কি না, তাহাও বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, হিট্‌লার যদি আশা করিয়া থাকেন, শীতকালের পূর্ব্বেই তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের অভিযানের অবসান ঘটাইয়া য়ুক্রেণের গমে এবং ককেসসের তৈলে জার্ম্মাণীর শক্তি-বৃদ্ধি করিয়া পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে য়ুরোপের রাজনীতিক মঞ্চে গলাবাজি করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইবে। কয়েকটি সম্মুখ-যুদ্ধে জয়ী হইয়া জার্ম্মাণী যদি পশ্চিম-রুশিয়ার কতকাংশ অধিকার করে, তাহা হইলেও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না—পূর্ব্ব-য়ুরোপে তখনও সমর-বহ্নি জ্বলিতে থাকিবে। সোভিয়েট-জার্ম্মাণ যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা একটি ধনতান্ত্রিক দেশের বেতনভুক্ সৈন্যের সহিত অন্য একটি ধনতান্ত্রিক দেশের বেতনভুক্ সৈন্যের যুদ্ধ নহে—ইহা বেতনভুক্ ফ্যাসিষ্ট সেনাবাহিনীর সহিত রুশিয়ার প্রত্যেক নর-নারীর যুদ্ধ। মঃ ষ্ট্যালিনের ভাষায়—It is not only a war between two armies but is a great war of the whole

হইয়াছে। দক্ষিণে রুমানিয়ায় জার্ম্মাণবাহিনী বেসারেবিয়া অধিকার করিয়া নীষ্টার নদীর তীরে পৌঁছিয়াছে বলিয়া দাবী করা হইতেছে। মধ্য অঞ্চলে জার্ম্মাণবাহিনী "ষ্টালিন লাইন" নামক ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অসংখ্য

Soviet people against the German Fascist troops. এত দিন জার্ম্মাণ-সেনাবাহিনী ধনতান্ত্রিক দেশের বেতনভুক্ সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু এবার তাঁহারা যে রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়াছে, সেখানে কেবল অর্থনীতিক বৈষম্য বিদূরিত হয় নাই, সে দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাহার রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, এবং সেই অধিকার-রক্ষার জন্য অস্ত্র-ধারণেও সমর্থ। সে দেশে যাহারা হল-চালনা করে, হাতুড়ী পিটে, তাহারাই রাষ্ট্রের কর্ণধার; তাহারাই যুদ্ধ-ঘোষণা করে, তাহারাই রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। কাজেই, সম্মুখ-যুদ্ধে হিংস্র নাৎসী-বাহিনীর দংষ্ট্রাঘাত যদি অপ্রতিরোধ্য হয়, তাহা হইলে বাল্‌টিক হইতে ব্লাডিভোষ্টক পর্য্যন্ত প্রত্যেক কৃষক ও শ্রমিকের গৃহে নাৎসী-বিরোধী যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে। সে অগ্নির লেলিহান জিহ্বা হইতে নাৎসী-জার্ম্মাণী নিস্তার পাইবে না, পাইতে পারে না।

তুর্কি-জার্ম্মাণ চুক্তি—

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে—গত ১৮ই জুন জার্ম্মাণীর সহিত তুরস্কের বন্ধুত্বব্যঞ্জক চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তির সর্ত্ত—চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় পরস্পরের রাজ্যগত অখণ্ডতা ও অলঙ্ঘনীয়তা রক্ষা করিয়া চলিবে; তাহাদিগের মধ্যে কেহ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে অন্তের ক্ষতিকর কার্য্যে লিপ্ত হইবে না…Not to resort to any measures direct or indirect against their treaty-partner. চুক্তির মুখবন্ধে বলা হইয়াছে, পূর্ব্বে তুরস্ক যে সকল প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছিল, সে সকল এই নূতন চুক্তিতে ব্যাহত হইবে না।

বর্ত্তমানে বল্‌কান অঞ্চলে এবং পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে জার্ম্মাণীর সহিত তুরস্কের এই চুক্তি স্বাভাবিক। তুরস্কের মনোভাব দেখিয়া পূর্ব্বেই মনে হইয়াছে যে, এই রাজ্যটি যখন ক্রমে ক্রমে নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতেছিল, তখন তাহার "আক্রান্ত হইলে যুদ্ধ করিব"—এই নীতি হাস্যোদ্দীপক। বুল্‌গেরিয়া, গ্রীস্ ও ঈজিয়ান সাগরে নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জার্ম্মাণীর দাবীতে অসম্মতি জ্ঞাপন তুরস্কের পক্ষে অসম্ভব। বস্তুতঃ, জার্ম্মাণী যখন গত এপ্রিল মাসে যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস্ আক্রমণ করে, তখনই তুরস্কের নিষ্ক্রিয়তায় প্রতিপন্ন হয় যে, অবশিষ্ট বলকান্ রাষ্ট্রগুলিকে নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য বৃটেনের প্রয়াস বিফল হইয়াছে। তুরস্ক যে সত্বর জার্ম্মাণীর নিকট নতি স্বীকারে বাধ্য হইবে, ইহা তখন আর অস্পষ্ট ছিল না।

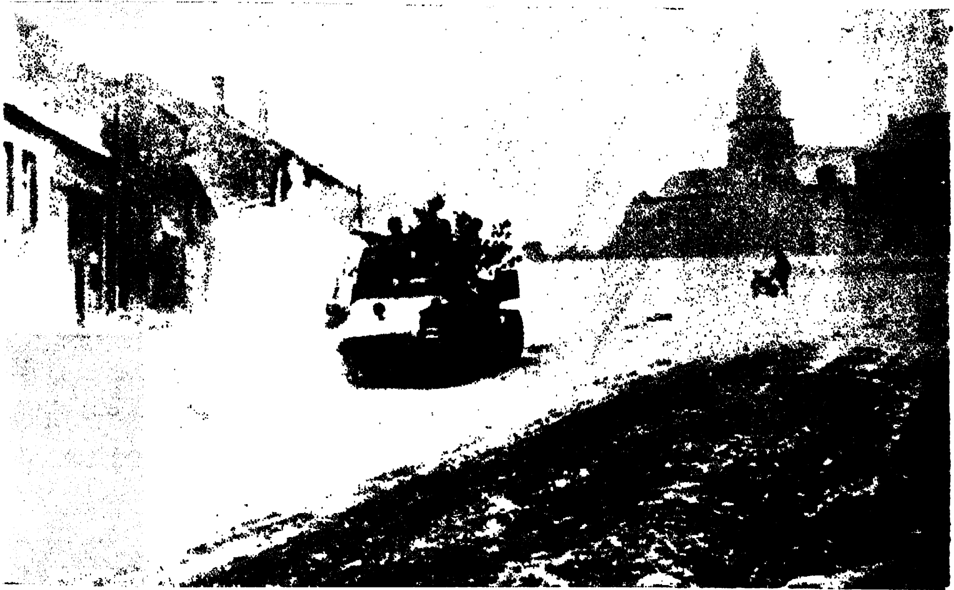
তুর্কি-জার্ম্মাণ চুক্তির মুখবন্ধে তুরস্কের পূর্ব্বকৃত প্রতিশ্রুতি অক্ষুণ্ণ থাকিবার যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া তুর্কি রাষ্ট্রনায়কগণ বলিয়াছেন যে, বৃটেনের সহিত তাঁহাদিগের পূর্ব্বের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ আছে। বৃটেনের নিকট তুরস্কের এই আশ্বাসবাণীর মূল্য মাত্র এইটুকু যে, তুরস্ক আপাততঃ বৃটেনের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না—জার্ম্মাণীর নব-ব্যবস্থায় যোগ দিয়া সম্পূর্ণরূপে নাৎসী-প্রভুত্বাধীন সে হয় নাই। নতুবা যে তুরস্ক পরোক্ষেও জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধাচরণে বিরত থাকিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাহার দ্বারা জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধে রত বৃটেন কতটুকু উপকৃত হইতে পারে?

সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তুরস্কের সহিত চুক্তি করিয়া জার্ম্মাণী বস্‌ফোরাস্ ও দার্দ্দানেলিজ প্রণালী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিল। তুরস্ক বৃটেনের সহিত চুক্তিবদ্ধ, আবার সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তাহার অনাক্রমণ-চুক্তি সম্প্রতি ঝালাইয়া লওয়া হইয়াছে।

অবশ্য, বর্ত্তমান যুগে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি-পত্রের মূল্য অধিক নহে—আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাস্রোতের পরিবর্ত্তনে যে কোন সময়ে চুক্তি-পত্র চোতা কাগজে পরিণত হইতে পারে। জার্ম্মাণী যদি সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণ করিয়া "কর্কট গলাধঃকরণের" অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সুযোগে বৃটেন্ যদি ঈজিয়ান্ ও বলকানে জার্ম্মাণ-প্রভুত্ব হ্রাস করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তুরস্ক অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণ-রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইতে পারে। ইতোমধ্যে বৃটেন সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তুরস্কের সমগ্র দক্ষিণ-সীমান্ত নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট প্রভাব মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

সম্প্রতি তুর্কি-বুল্‌গার সীমান্তে জার্ম্মাণীর ব্যাপক সমরায়োজনের কথা শ্রুতিগোচর হইয়াছে। ইহার কারণ

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ বর্ত্তমানে পশ্চিম-এশিয়ায় নূতন গুরুত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। সম্প্রতি বৃটেন ও রুশিয়ার পারস্পরিক সহযোগিতার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। উত্তর-য়ুরোপে সর্ব্বত্র জার্ম্মাণ-প্রভুত্ব বিস্তৃত ; কাজেই ভৌগোলিক কারণে এখন পশ্চিম-এশিয়াই বৃটেন ও সোভিয়েট রুশিয়ার সংযোগ ও সহযোগের একমাত্র ক্ষেত্র। তুর্কি-বুল্গার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়া জার্ম্মাণী তুরস্কের উপর চাপ দিতেছে। বৃটেনের সহিত রুশিয়ার সংযোগ ও সহযোগে তুরস্ক যাহাতে ব্যবহৃত হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে তুর্কি



জার্ম্মাণীর বিরাটকায় ট্যাঙ্ক অগ্রসর হইতেছে

সরকারকে জার্ম্মাণী ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। ইহা ব্যতীত, জার্ম্মাণ-বাহিনী যখন রুশিয়ায় বিশেষ ভাবে নিযুক্ত থাকিবে, তখন বল্কান অঞ্চলে যাহাতে বৃটিশ ও সোভিয়েট রুশিয়ার সম্মিলিত প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হইতে না পারে, তাহার জন্যও জার্ম্মাণী সাবধানতা অবলম্বন করিতেছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব—

গত জুন মাসের প্রথমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের "রবীনমুর" নামক একখানি জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসাগরে জার্ম্মাণ সাব্‌মেরিণের আক্রমণে জলমগ্ন হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট "রবীনমুর"-ডুবি সম্পর্কে বলেন—Notice has been served on us that no American ship or cargo can consider itself immune from piracy... "রবীনমুর"-ডুবির পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গচ্ছিত জার্ম্মাণীর ও ইটালীর সম্পদ্ আটক রাখা হইয়াছে, এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জার্ম্মাণ-দূতাবাসগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থার প্রতিশোধে ইটালী ও জার্ম্মাণী তাহাদিগের দেশের মার্কিণী সম্পদ আটক করিয়া রাখিয়াছে ; ঐ দুই দেশে মার্কিণী দূতাবাসগুলিও বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

জার্ম্মাণী ইচ্ছা করিয়াই "রবীনমুর" আক্রমণ করিয়াছিল—এইরূপ মনে করা হয় ত অযৌক্তিক নহে। বৃটেনের পৃষ্ঠপোষক মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সুবিধা সম্ভোগে বঞ্চিত হয়, তদুদ্দেশ্যে মার্কিণী সরকারকে যুদ্ধে অবতীর্ণ করাইবার জন্যই জার্ম্মাণী হয় ত এই কূট-নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সঙ্ঘর্ষ

আরম্ভ হওয়ায় এখন "রবীনমুর"-সংক্রান্ত চাঞ্চল্য হ্রাস পাইয়াছে; গত জুন মাসের মধ্যভাগে মনে হইয়াছিল—এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই হয় ত আন্তর্জ্জাতিক ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে।

সে যাহা হউক, মার্কিণী সরকার সম্প্রতি এক উল্লেখ-যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন; ৭ই জুলাই মার্কিণী নৌসেনা আইস্‌ল্যাণ্ডে অবতরণ করিয়াছে। গত ২৭শে মে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—জার্ম্মাণী যদি আইস্‌ল্যাণ্ড ও গ্রীণল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেখান হইতে সে অনায়াসে পশ্চিম-গোলার্দ্ধে উপস্থিত হইতে পারিবে। বর্ত্তমানে আইস্‌ল্যাণ্ডে মার্কিণী নৌসেনা প্রেরণ-সম্পর্কিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়-তার কথাই বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। অবিলম্বে জার্ম্মাণীর পক্ষে আইস্‌ল্যাণ্ডে উপস্থিত হইয়া পশ্চিম-গোলার্দ্ধে লম্ফ-প্রদানের আয়োজন সম্ভব কি না, সে কথা স্বতন্ত্র; তবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যবস্থায় বৃটেন অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছে। গত বৎসর এপ্রিল মাসে ডেন্‌মার্ক জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আইস্‌ল্যাণ্ডের সহিত তাহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ঐ সময় আইস্‌ল্যাণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতিতে বৃটেন্ তথায় সৈন্য প্রেরণ করে, এবং ডেন্‌মার্কের ফারো দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া লয়। ডেন্‌মার্কের একমাত্র উপনিবেশ গ্রীণল্যাণ্ডেও মার্কিণী সৈন্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। জার্ম্মাণী নরওয়ের উপকূল হইতে বৃটেনের উত্তরাঞ্চলের সহিত পশ্চিম-গোলার্দ্ধের সংযোগপথ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য এত দিন যে আক্রমণ চালাইতেছিল, আইস্‌ল্যাণ্ড ও ফারো দ্বীপপুঞ্জ হইতেই বৃটেন্ তাহার প্রতিরোধে প্রয়াসী হইয়াছে। এখন আইস্‌ল্যাণ্ডে মার্কিণী নৌসেনা সন্নিবেশিত হওয়ায় বৃটেনের প্রধান সুবিধা এই হইল যে, অতঃপর সামরিক-প্রয়োজনে মার্কিণী রণপোত আইস্‌ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত আসিবে, এবং ঐ সকল রণপোতের রক্ষণাধীনে বৃটেনে প্রেরিত মার্কিণী সাহায্য নির্ব্বিঘ্নে আইস্‌ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে। ইহাতে কার্য্যতঃ আইসল্যাণ্ড পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের "কনভয়" (convoy) ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত হইল; অথচ কোন আইনগত অসুবিধার সৃষ্টি হইল না। আল্‌ষ্টার-রক্ষার ব্যবস্থাও মার্কিণী সরকার গ্রহণ করিবেন বলিয়া জনরব হইয়াছে। আল্‌ষ্টারে মার্কিণী রক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে কার্য্যতঃ এই "কনভয়"-ব্যবস্থা বৃটেনের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অবশ্য, এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। বৃটেনে মার্কিণী সাহায্যের প্রবেশ বন্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়া জার্ম্মাণী যদি মার্কিণী রণপোত আক্রমণ করে, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ-ঘোষণা করা অপরি-হার্য্য হইয়া উঠিবে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার ২৭শে মে'র বক্তৃতায় পর্ত্তুগালের নিকটবর্ত্তী আজোর্স দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ভার্ডী অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ সকল স্থানে জার্ম্মাণরা প্রতিষ্ঠিত হইলে আট্‌লাণ্টিক ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর নিরাপদ থাকিবে না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে ঐ সকল স্থানেও মার্কিণী-প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া দক্ষিণ-দিকে বৃটেনের সামুদ্রিক-সংযোগ নিরাপদ রাখিবার প্রয়াস হওয়া অসম্ভব নহে। সম্প্রতি নিউইয়র্কস্থিত পর্ত্তুগীজ-প্রতিনিধি ঘোষণা করিয়া-ছেন যে, মার্কিণী সরকার না কি আজোর্স ও ভার্ডী দ্বীপ-পুঞ্জ অধিকার করিবেন না বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। মার্কিণী সরকার এই সকল দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে নিজের অধীনে গ্রহণ না করিলেও ইহাদিগের সম্বন্ধে মার্কিণী সরকারের ঔদাসীন্য সম্ভব নহে। দ্বীপগুলির রক্ষাব্যবস্থার জন্য তাঁহারা পরোক্ষে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবেনই।

সুদূর প্রাচী—

৭ই জুলাই চীন-জাপান যুদ্ধ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করি-য়াছে, চারি বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই দিনে উত্তর চীনের লুকোচিয়াও নামক স্থানে জাপানীদিগের আক্র-মণের ফলে এই সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সুদীর্ঘ চারি বৎসরে চীনারা বহু দুঃখ ও লাঞ্ছনা সহিয়াছে, তাহাদিগের মাতৃ-ভূমি দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, সমুদ্রোপকূল শত্রুর কুক্ষিগত হইয়াছে। তবুও চীনা জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে, শুধু বাঁচিয়া নাই, এখনও তাহারা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেছে। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা এখন চীনাদিগের

অনুকূল ; বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশেষ ভাবেই বুঝিয়াছে যে, জাপানের সাম্রাজ্যাকাঙ্ক্ষা দমন করিতে হইলে চীনাদিগের সংগ্রামশক্তি বর্দ্ধিত করা প্রয়োজন। তাই, ঐ দুইটি রাষ্ট্র চুংকিং সরকারকে প্রচুর সাহায্য করিতেছেন ; সোভিয়েট রুশিয়ার সাহায্যও চীন পূর্ব্ববৎ পাইতেছে। সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সজ্ঘর্ষের ফলে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইল, চীনের প্রতি তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা এখনও সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না।

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সংগ্রামসম্পর্কে জাপানের মনোভাব এখনও রহস্যাবৃত। এই সম্পর্কে জাপানী সাম্রাজ্য-সম্মিলনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর জুলাই মাসের প্রথমে জাপানী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুয়োকা ও প্রধান-মন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম সরল নহে। তাঁহারা উভয়ে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত নূতন অবস্থা সম্পর্কে জাপানের উৎকণ্ঠার কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের উক্তির মূল বিষয়…a really grave state of emergency is developing before our eyes throughout the world and particularly in East Asia with direct concern to our country. কিন্তু জাপান কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবে, তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও তাহার কোন আভাস দেন নাই।

গত ২রা জুলাই জাপানী সাম্রাজ্য-সম্মিলনে যখন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতেছিল, তখন জার্ম্মাণী তাহার অনুচর স্পেন, হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়াকে লইয়া অকস্মাৎ নান্‌কিংস্থিত জাপানের তাঁবেদার-সরকারকে চীনের বৈধ-সরকার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। জার্ম্মাণীর এই চাল লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, সে জাপানকে সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণের জন্য পরোক্ষে আহ্বান জানাইতেছে। গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে যখন নান্‌কিং সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন জার্ম্মাণী ইচ্ছা করিয়াই চুংকিং সরকারের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করে নাই ; কারণ, তখন সে তাহার মধ্যস্থতায় চীন-জাপান বিরোধের মীমাংসা ঘটাইবার আশা পোষণ করিতেছিল। চীন-জাপান যুদ্ধের মীমাংসার পর জাপান যাহাতে দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে অবহিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাতেই তখন জার্ম্মাণীর স্বার্থ ছিল। দক্ষিণ-প্রশান্ত



দুর্গম-পথে জার্ম্মাণ পদাতিক সৈন্যের অগ্রগতি

আরম্ভ হওয়ায় এখন "রবীনমুর"-সংক্রান্ত চাঞ্চল্য হ্রাস পাইয়াছে ; গত জুন মাসের মধ্যভাগে মনে হইয়াছিল—এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই হয় ত আন্তর্জ্জাতিক ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে।

সে যাহা হউক, মার্কিণী সরকার সম্প্রতি এক উল্লেখ-যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ; ৭ই জুলাই মার্কিণী নৌসেনা আইস্‌ল্যাণ্ডে অবতরণ করিয়াছে। গত ২৭শে মে প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—জার্ম্মাণী যদি আইস্‌ল্যাণ্ড ও গ্রীণল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেখান হইতে সে অনায়াসে পশ্চিম-গোলার্দ্ধে উপস্থিত হইতে পারিবে। বর্ত্তমানে আইস্‌ল্যাণ্ডে মার্কিণী নৌসেনা প্রেরণ-সম্পর্কিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়-তার কথাই বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। অবিলম্বে জার্ম্মাণীর পক্ষে আইস্‌ল্যাণ্ডে উপস্থিত হইয়া পশ্চিম-গোলার্দ্ধে লম্ফ-প্রদানের আয়োজন সম্ভব কি না, সে কথা স্বতন্ত্র ; তবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যবস্থায় বৃটেন অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছে। গত বৎসর এপ্রিল মাসে ডেন্‌মার্ক জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আইস্‌ল্যাণ্ডের সহিত তাহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ঐ সময় আইস্‌ল্যাণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতিতে বৃটেন্ তথায় সৈন্য প্রেরণ করে, এবং ডেন্‌মার্কের ফারো দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া লয়। ডেন্‌মার্কের একমাত্র উপনিবেশ গ্রীণল্যাণ্ডেও মার্কিণী সৈন্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। জার্ম্মাণী নরওয়ের উপকূল হইতে বৃটেনের উত্তরাঞ্চলের সহিত পশ্চিম-গোলার্দ্ধের সংযোগপথ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য এত দিন যে আক্রমণ চালাইতেছিল, আইস্‌ল্যাণ্ড ও ফারো দ্বীপপুঞ্জ হইতেই বৃটেন্ তাহার প্রতিরোধে প্রয়াসী হইয়াছে। এখন আইস্‌ল্যাণ্ডে মার্কিণী নৌসেনা সন্নিবেশিত হওয়ায় বৃটেনের প্রধান সুবিধা এই হইল যে, অতঃপর সামরিক-প্রয়োজনে মার্কিণী রণপোত আইস্‌ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত আসিবে, এবং ঐ সকল রণপোতের রক্ষণাধীনে বৃটেনে প্রেরিত মার্কিণী সাহায্য নির্ব্বিঘ্নে আইস্‌ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিবে। ইহাতে কার্য্যতঃ আইসল্যাণ্ড পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের "কনভয়" (convoy) ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত হইল ; অথচ কোন আইনগত অসুবিধার সৃষ্টি হইল না। আলষ্টার-রক্ষার ব্যবস্থাও মার্কিণী সরকার গ্রহণ করিবেন বলিয়া জনরব হইয়াছে। আলষ্টারে মার্কিণী রক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে কার্য্যতঃ এই "কনভয়"-ব্যবস্থা বৃটেনের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অবশ্য, এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। বৃটেনে মার্কিণী সাহায্যের প্রবেশ বন্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়া জার্ম্মাণী যদি মার্কিণী রণপোত আক্রমণ করে, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ-ঘোষণা করা অপরি-হার্য্য হইয়া উঠিবে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট তাঁহার ২৭শে মে'র বক্তৃতায় পর্ত্তুগালের নিকটবর্ত্তী আজোর্স দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ভার্ডী অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ সকল স্থানে জার্ম্মাণরা প্রতিষ্ঠিত হইলে আটলাণ্টিক ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর নিরাপদ থাকিবে না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে ঐ সকল স্থানেও মার্কিণী-প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া দক্ষিণ-দিকে বৃটেনের সামুদ্রিক-সংযোগ নিরাপদ রাখিবার প্রয়াস হওয়া অসম্ভব নহে। সম্প্রতি নিউইয়র্কস্থিত পর্ত্তুগীজ-প্রতিনিধি ঘোষণা করিয়া-ছেন যে, মার্কিণী সরকার না কি আজোর্স ও ভার্ডী দ্বীপ-পুঞ্জ অধিকার করিবেন না বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। মার্কিণী সরকার এই সকল দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে নিজের অধীনে গ্রহণ না করিলেও ইহাদিগের সম্বন্ধে মার্কিণী সরকারের ঔদাসীন্য সম্ভব নহে। দ্বীপগুলির রক্ষাব্যবস্থার জন্য তাঁহারা পরোক্ষে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবেনই।

সুদূর প্রাচী—

৭ই জুলাই চীন-জাপান যুদ্ধ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করি-য়াছে, চারি বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই দিনে উত্তর চীনের লুকোচিয়াও নামক স্থানে জাপানীদিগের আক্র-মণের ফলে এই সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সুদীর্ঘ চারি বৎসরে চীনারা বহু দুঃখ ও লাঞ্ছনা সহিয়াছে, তাহাদিগের মাতৃ-ভূমি দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, সমুদ্রোপকূল শত্রুর কুক্ষিগত হইয়াছে। তবুও চীনা জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে, শুধু বাঁচিয়া নাই, এখনও তাহারা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেছে। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা এখন চীনাদিগের

অনুকূল ; বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশেষ ভাবেই বুঝিয়াছে যে, জাপানের সাম্রাজ্যাকাঙ্ক্ষা দমন করিতে হইলে চীনাদিগের সংগ্রামশক্তি বৰ্দ্ধিত করা প্রয়োজন। তাই, ঐ দুইটি রাষ্ট্র চুংকিং সরকারকে প্রচুর সাহায্য করিতেছেন ; সোভিয়েট রুশিয়ার সাহায্যও চীন পূর্ব্ববৎ পাইতেছে। সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সঙ্ঘর্ষের ফলে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইল, চীনের প্রতি তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা এখনও সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না।

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সংগ্রামসম্পর্কে জাপানের মনোভাব এখনও রহস্যাবৃত। এই সম্পর্কে জাপানী সাম্রাজ্য-সম্মিলনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর জুলাই মাসের প্রথমে জাপানী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুয়োকা ও প্রধান-মন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম সরল নহে। তাঁহারা উভয়ে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত নূতন অবস্থা সম্পর্কে জাপানের উৎকণ্ঠার কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের উক্তির মূল বিষয়···a really grave state of emergency is developing before our eyes throughout the world and particularly in East Asia with direct concern to our country. কিন্তু জাপান কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবে, তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও তাহার কোন আভাস দেন নাই।

গত ২রা জুলাই জাপানী সাম্রাজ্য-সম্মিলনে যখন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতেছিল, তখন জার্ম্মাণী তাহার অনুচর স্পেন, হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়াকে লইয়া অকস্মাৎ নানকিংস্থিত জাপানের তাঁবেদার-সরকারকে চীনের বৈধ-সরকার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। জার্ম্মাণীর এই চাল লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, সে জাপানকে সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণের জন্য পরোক্ষে আহ্বান জানাইতেছে'। গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে যখন নানকিং সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন জার্ম্মাণী ইচ্ছা করিয়াই চুংকিং সরকারের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করে নাই ; কারণ, তখন সে তাহার মধ্যস্থতায় চীন-জাপান বিরোধের মীমাংসা ঘটাইবার আশা পোষণ করিতেছিল। চীন-জাপান যুদ্ধের মীমাংসার পর জাপান যাহাতে দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে অবহিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাতেই তখন জার্ম্মাণীর স্বার্থ ছিল। দক্ষিণ-প্রশান্ত



দুর্গম-পথে জার্ম্মাণ পদাতিক সৈন্যের অগ্রগতি

মহাসাগরে জাপানের মনোযোগের ফলে বৃটেন্ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আংশিক মনোযোগ ঐ অঞ্চলে নিবদ্ধ হইলে জার্ম্মাণী পরোক্ষে উপকৃত হইত।

এখন জার্ম্মাণীর সে প্রয়োজন যেন আর নাই; এখন সে যেন জাপানের উদ্দেশ্যে বলিতেছে—কম্যুনিষ্ট-প্রতিবেশীর ধ্বংসসাধনে জার্ম্মাণীর সহিত সহযোগিতা করিয়া সে নিজে নিরাপদ হউক, এবং চীন হইতে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বিদূরিত করুক। এই জন্যই হয় ত জার্ম্মাণী নিঃসঙ্কোচে চুংকিং সরকারকে ত্যাগ করিল।

জার্ম্মাণীর এই আবেদনে সম্মত হওয়া জাপানের পক্ষে আপাততঃ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, রুশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া জাপান অর্থনীতিক বিষয়ে উপকৃত হইবে না; অথচ দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে তাহার প্রচুর অর্থনীতিক সুবিধা পাইবার সম্ভাবনা আছে। শুধু তাহাই নহে, পূর্ব্বাঞ্চলে সোভিয়েট রুশিয়া ব্যাপক সামরিক আয়োজন করিয়াছে—একই সময়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ হইতেই বিপদের আশঙ্কা করিয়াই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রটি তাহার সমরায়োজন করিয়াছিল। পশ্চিমে আজ জার্ম্মাণী যেরূপ প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছে, পূর্ব্বদিকেও জাপান ঠিক সেইরূপ প্রতিরোধের সম্মুখীন হইবে। একই সময়ে চীন এবং রুশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের উপযুক্ত সামরিক সামর্থ্য জাপানের নাই বলিয়াই মনে হয়। কাজেই সোভিয়েট রুশিয়া যতক্ষণ জার্ম্মাণীর আঘাতে ভাঙ্গিয়া না পড়িতেছে, ততক্ষণ জাপান তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সাহসী হইবে বলিয়াও মনে হয় না। সোভিয়েট রুশিয়া যদি ফ্রান্সের দশা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তখন জাপানও ইটালীর ন্যায় পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহাকে ছুরিকাঘাতের প্রয়াসী হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করিতেছেন—জাপান ব্লাডিভোষ্টক অবরোধ করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ায় মার্কিণী সাহায্য প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু জাপান বিনা স্বার্থে জার্ম্মাণীর এই উপকার করিয়া নিজের শ্রমশিল্প-কেন্দ্রে সোভিয়েট রুশিয়ার বোমাবর্ষী বিমান আহ্বান করিতে পারে কি?

অদূর প্রাচী—

অদূর প্রাচীতে সিরিয়ার ঘটনাই এখন একমাত্র উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় যুদ্ধের একরূপ অবসান হইয়াছে; উত্তর-আফ্রিকায় গত এক মাসে কোন উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

গত ৮ই জুলাই সিরিয়ার হাই-কমিশনার জেনারল দেন্‌ৎস্ মিত্রশক্তির নিকট যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত জানিতে চাহেন; বৃটিশ সরকার ঐ দিনই মার্কিণ সরকারের মারফৎ তাঁহাদিগের সর্ত্ত জানান। সর্ত্তাবলী শ্রবণের পর জেনারল দেন্‌ৎস্ আলোচনায় সম্মত হওয়ায় গত ১২ জুলাই যুদ্ধের বিরতি হইয়াছে।

সরকারীভাবে বৃটেনের প্রদত্ত সর্ত্তাবলী প্রকাশিত হয় নাই; আঙ্কারা হইতে প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়, বৃটেন্ দশটি সর্ত্ত উপস্থাপিত করিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রধান কথা—সিরিয়াকে বৃটেনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে; তবে, সিরিয়ায় ফরাসী-স্বার্থ রক্ষিত হইবে। সিরিয়ায় ষ্টার্লিং মুদ্রা প্রচলিত হইবে; সিরিয়ায় অবস্থিত ভিসি কর্ত্তৃপক্ষের প্রত্যেক সৈন্য ও কর্ম্মচারীকে স্বেচ্ছায় জেনারল দ্য-গলের পক্ষে যোগদানের স্বাধীনতা দিতে হইবে, অথবা তাহাদিগকে সরাইয়া লইতে হইবে; সিরিয়ায় ভিসি কর্ত্তৃপক্ষের যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ও জাহাজ আছে, তাহা সমর্পণ করিতে হইবে।

জার্ম্মাণীকে উপলক্ষ করিয়া সিরিয়ায় বিরোধের সূত্রপাত হইলেও জার্ম্মাণী প্রথম হইতেই এই অঞ্চলের যুদ্ধে কেন ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছিল, ইহার কারণ পরে জানিতে পারা গিয়াছে। সিরিয়ায় যখন বৃটিশ সৈন্য প্রবেশ করে, তখনই জার্ম্মাণী সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। নাৎসী রাষ্ট্রনায়কগণ এখন আর অদূর প্রাচী সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত নহেন; তাঁহাদিগের ধারণা—সোভিয়েট রুশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে যদি জার্ম্মাণীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ঐ অঞ্চল হইতেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা চলিবে।

সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরে বৃটেনের শক্তি কিছু বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু বৃটেন যদি পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরে অথবা বল্‌কানে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সিরিয়া-লাভে আপাততঃ তাহার বিশেষ সামরিক সুবিধা হইবে

না; কারণ, এই অঞ্চলে শত্রুকে প্রতিরোধের প্রশ্ন আর নাই। সোভিয়েট রুশিয়া যদি পরাভূত হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণী ইরাক ও ইরাণের তৈলক্ষেত্রে পৌঁছিবার অধিকতর সহজ পথ পাইবে; ভারতবর্ষের উদ্দেশেও সে তখন খড়্গ উত্তোলন করিতে পারিবে। আর সোভিয়েট রুশিয়াকে পরাভূত করা যদি জার্ম্মাণীর পক্ষে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে রুশ রাজ্য হইতে সে আর সংগ্রামশক্তি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে না। কাজেই, শত্রুর প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অদূর প্রাচীতে বৃটেন যে ব্যাপক সমরায়োজন করিয়াছিল, তাহার প্রয়োজনীয়তা আপাততঃ শেষ হইয়াছে। অবশ্য, জার্ম্মাণ-বাহিনী যদি ভবিষ্যতে ককাসস্ হইতে পশ্চিম-এশিয়ায় আধিপত্য-বিস্তারে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তখন বৃটেনের এই আয়োজন কাজে লাগিবে। কিন্তু সোভিয়েটবাহিনী শত্রুর প্রতিরোধে যেরূপ দক্ষতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণ-বাহিনীর ককাসসে পৌঁছিবার সম্ভাবনা অতি অল্প বলিয়াই মনে হয়।

ইঙ্গ-বৃটিশ সহযোগিতার ফলে পশ্চিম-এশিয়ার যে নূতন গুরুত্ব সৃষ্টি হইয়াছে, সে দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে সিরিয়ায় বৃটিশ-প্রভুত্ব বিস্তৃতির কিছু আশু উপযোগিতা আছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীঅতুল দত্ত।

আষাঢ় গগনে

আষাঢ় গগনে গুরু গরজনে নামিছে বাদল আজি রে;
মিলন-পিয়াসী—আজি লহ সবে সাজি রে।
ঝর-ঝর ঝরে বাদলের ধারা;
ছল-ছল আঁখি পাগলের পারা;
নব তৃণদল শ্যামল ছায়ায় মিলনের বাঁশী বাজি রে;—
গুরু গরজনে ঘন ঘন ডাকে আজি রে।

এপারে আঁধার ওপারে আঁধার নব জলধর গগনে;
ওরে ছুটে চল্! মিলন-মাধুরী লগনে।
কাজল-মেঘের আঁখি ছলছল,
নব কিশলয়-হিয়া চঞ্চল;
মত্ত দাদুরী আকুল হিয়ায় ডাকিছে আজিকে সঘনে;
মিলন-কুম্ভ ভরি লও শুভ লগনে।

খেয়াপারে বসি কেন একা-একা ডাক দে রে খেয়া-মাঝিরে;
ঘন-বরিষণে খেয়া নাহি চলে আজি রে।
আজি কেহ নাই এ-কূলে ও-কূলে;
ঢেউগুলি শুধু চলে দুলে-দুলে,
আকাশ ভাঙ্গিয়া ঝরিছে বাদল চমকে বিজলী আজি রে,
বিরহ-বিধুরা কাঁদে লয়ে ফুল-সাজি রে।

কাজল মেঘের অঞ্চলখানি ধরণীর বুকে ঢাকিয়া;
বিজলী চমকে চলে গুরু-গুরু ডাকিয়া।
নীপ তরু-শাখে—বকুলের বনে;
মালতীর বুকে—মধু-সমীরণে;
বিকচ কেতকী এলায়ে কবরী কুসুম-গন্ধ মাখিয়া;
নীল অঞ্চলে কে চলে রে দেহ ঢাকিয়া?

রিমি-ঝিমি ঝরে বেণুবনে আজি ঘন-ঘন বাজে বাঁশরী;
ছুটে চল্ ত্বরা—মন্দিরে বাজে কাঁসরি।
ধেনু-দল ফেরে রাখালের সনে;
জোনাকীর আলো জ্বলে বনে-বনে;
আষাঢ়-সন্ধ্যা ঘনায়ে যে এল ছুটে চল্ সব পাশরি;
আর বেলা নাই—মন্দিরে বাজে কাঁসরি।

শ্রীনকুলেশ্বর পাল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সাহায্য-গ্রহণে সাম্প্রদায়িকতা

এবার প্রবল ঝড়ে বরিশাল এবং নোয়াখালী জিলায় কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা টাউন-হলে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে বিভিন্ন বক্তার মুখে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় ক্ষোভে-দুঃখে বিচলিত হইয়াছিল। প্রধান-সচিব এবং রাজস্ব-সচিব উভয়েই বিভিন্ন ঘটনাস্থলে গমন করিয়া সেই শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। প্রধান-সচিব মিঃ ফজলুল হক বলিয়াছেন—তিনি চরের উপর বহু নরনারী এবং শিশুর শব পড়িয়া-থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছেন।—রাজস্ব-সচিব বলেন—কেবল ভোলা মহকুমাতেই অন্যূন দশ লক্ষ লোকের অন্নাভাব ঘটিয়াছে।—এরূপ অবস্থায় সরকার এবং জনসাধারণ উভয় পক্ষ হইতেই ঐ সকল দুঃস্থ এবং দুর্গত লোকদিগকে এই বিপদে সাহায্য করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত নরনারীর জন্য কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য-গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন! সংবাদটা এতই অদ্ভুত যে, সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সেইজন্য উহার সত্যাসত্য জানিতে আমাদের আগ্রহ হইয়াছে। কারণ, ইহা সত্য হইলে ইহার ভিতর যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে,—তাহা বুঝিতে অনেকেরই অসুবিধা হইবে না। দুর্গতিগ্রস্ত ও বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য করিবার অধিকার সকলেরই আছে। নৈতিক হিসাবে উহাতে বাধা দিবার অধিকার কাহারও নাই। যখন দেখা যায়, জলপ্লাবনে কোন নগর ভাসিয়া-যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তখন বাঁধ-বাঁধিবার প্রয়োজন হইলে যদি কোন নীতি-বাগীশ বলেন, অমুক অমুক লোক দুশ্চরিত্র বা মাতাল, অতএব তাহারা বাঁধ বাঁধিতে আসিতে পারিবে না। তাঁহার এই প্রস্তাব যেরূপ অসার, উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটটির ঐ প্রস্তাব সত্য হইলে তাহাও সেইরূপ অসার, এবং হাস্যোদ্দীপক নহে কি?

ইহাও শুনা যাইতেছে যে, সাহায্য-দান ব্যাপারেও না কি সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে! ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বরিশালের এবং নোয়াখালীর নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"ছোট জমিদার, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, এবং সামান্য ব্যবসায়ী প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকরা কার্য্যতঃ সরকারের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইতেছে না,—ইহা আমি দেখিয়া আসিয়াছি। এই সম্পর্কে সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সংশোধন করা কর্ত্তব্য। যাহাতে জাতি এবং ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলেই সাহায্য লাভ করিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থাই করা আবশ্যক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সরকারী সাহায্য-বণ্টনে যাহাতে কোনরূপ বৈষম্য না ঘটে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা সরকারী কর্ম্মচারীদিগের একান্তই কর্ত্তব্য।"—ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ বাবুর এ কথা উপেক্ষণীয় নহে, কারণ, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। বিভিন্ন লোকদিগকে সাহায্য-দানকল্পে যদি সত্যই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন করা হয়,—তাহা হইলে সে কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিবার নহে। যাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে, তাঁহারা কোন্ যুক্তিতে এই পথ অবলম্বন করিতে পারেন? ইহা কি অল্প লজ্জার বিষয়? একে ত সরকারী সাহায্যদানের পরিমাণ অতি অল্প; তাহার উপর ঐ সাহায্য-বণ্টনে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব থাকিলে এই দানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে, এবং ইহার ফল যথেষ্ট অনিষ্টকর হইতে বাধ্য।

—

রপ্তানী ও দারিদ্র্য

'গ্রামোদ্‌যোগ পত্রিকায়' শ্রীযুত ভরত্তম্ কুমারাপ্পা একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। সেই সন্দর্ভে তিনি লিখিয়াছেন—ভারত সরকার কর্ত্তৃক রপ্তানীদ্রব্যের যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিলে আমরা কোন্ কোন্ পণ্য বিদেশে রপ্তানী করি, তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়। ঐ তালিকা হইতে যদিচ্ছা কয়েকটি দ্রব্যের কথা বলা যাইতে পারে। যথা—হাড়, রং, এবং চামড়া-পাকাইবার মশলা, পশুর খাদ্য, টাট্‌কা তরকারী, চাউল, গম, ডাল, কাঁচা চামড়া, পাকা চামড়া, পরিষ্কৃত এবং অপরিষ্কৃত ধাতু, তৈল-বীজ, খৈল, মশলা, তুলা, পাট, পশম, কাঠ ও কাঠের চকোর।

তাহার পর তিনি বলিয়াছেন,—অর্দ্ধাশনে শীর্ণ, অনশন ক্লিষ্ট দেশের লোক যদি খাদ্য-শস্য, ডাল, কলাই, তৈল-বীজ, মশলা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী করে বা করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহারা অধিকতর দারিদ্র্য-পঙ্কে মগ্ন হয়। যে দেশের জমি শস্য উৎপন্ন করিয়া প্রায় ঊষর হইয়া পড়িয়াছে, সে দেশ হইতে অস্থি এবং খৈল রপ্তানী করিলে জমিকে সার হইতে বঞ্চিত করা হয়। ইহা কৃষিমাত্র-সম্বল দেশের পক্ষে সর্ব্বনাশকর। পশুর খাদ্য, এবং খৈল রপ্তানী করিলে গো-মহিষাদি পশুরই আবশ্যক খাদ্যাভাব ঘটে; কিন্তু ঐ সকল পশুই কৃষির প্রাণ। উহা দেশের কৃষির ও শিল্পেরই হানিকর। পশুদিগকে পুষ্টিকর খাদ্যে বঞ্চিত করিবার ফলে দেশের লোকের দুগ্ধ, ছানা, মাখন প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটে। শ্রমশিল্পজাত পণ্যের মধ্যে আমাদের দেশ হইতে কিছু বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার পরিমাণ রপ্তানী-কার্পাস এবং পশমের তুলনায় অতি অল্প। আমরা চামড়া-পাকাই-বার মশলা, চামড়া, ধাতু, ধাতুপিণ্ড, এবং কাঠের চকোর প্রভৃতি বিদেশে পাঠাইতেছি; কিন্তু দেশকে শিল্পপ্রধান করিতে হইলে দেশের জন্যই এই সকল দ্রব্যের প্রয়োজন। উহা আমাদের দেশে কি এতই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, আমরা উহা ব্যবহার করিতে পারি না? আমাদের দেশের লোক যে অতিশয় দরিদ্র, তাহার কারণ—তাহারা লাভজনক কাজ পায় না। যদি শিল্প-কার্য্যের মূল উপাদানই এইরূপে হাতছাড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে দেশ দরিদ্র না হইয়া কি হইবে?—শ্রীযুত ভরত্তম্ যাহা বলিয়া-ছেন, তাহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। শিল্পকার্য্যের এই মূল উপাদান-গুলি আমাদের দেশের শিল্প-সেবার জন্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত;

নতুবা দেশের লোকের কাজ জুটিবে কোথা হইতে? আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি—শিল্প-সেবা না করিলে দেশের লোক লাভজনক কাজ পাইবে না; দেশ দিন দিন অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িবে। কুমারাপ্পা মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে এই কথারই সমর্থন করিয়াছেন।

——

বাঙ্গালী পাইলট-অফিসার নিহত

ব্যারিষ্টার ও খ্যাতনামা শিকারী স্বর্গতঃ কুমুদনাথ চৌধুরীর পুত্র কালীপ্রসাদ চৌধুরী বিমান-বাহিনীতে কাজ পাইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তিনি রাজকীয় বিমান-বিভাগের পাইলট-অফিসার হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত জুন মাসের মধ্যভাগে শত্রুকর্ত্তৃক বিমান-আক্রমণে তিনি লণ্ডনে নিহত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হইয়াছিল। ইতোমধ্যেই তিনি প্রশংসনীয় বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে বিমান-বিভাগের এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইতে পারিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনবর্গকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার এই শোচনীয় অকালমৃত্যুতে আমরা একান্তই দুঃখিত।

——

বাঙ্গালায় অকাল

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার অধিকাংশ গৃহস্থ পরিবারে ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ধান এবার বাঙ্গালায় কম জন্মিয়াছে গতবার বাঙ্গালার চাষীরা অধিকাংশ জমিতেই পাট বুনিয়াছিল, তাহার উপর ঋতুর বিপর্য্যয়ও কিছু হইয়াছিল। সেজন্য উহার পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর ধান প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ কম জন্মে। বিশেষতঃ, এবার যুদ্ধের জন্য জাহাজে মাল আমদানী-রপ্তানীর অসুবিধা ঘটিয়াছে বলিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী কম হইতেছে। তাহার উপর ব্রহ্ম সরকার আকিয়াব হইতে জলপথে দেশান্তরে চাউল-রপ্তানী রহিত করিয়াছেন। কাজেই চাউলের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং কেবল মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায়ের নহে, সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই অন্নকষ্ট অপরিহার্য্য হইয়াছে, এবং জনসাধারণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিকারের আশায় দেশের লোক চাউলের মূল্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিল; কিন্তু সরকার তাহার যে জবাব দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়হীনতা, অথবা দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এই স্থানে আমরা বিলাতের খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার উল্লেখ করিতে পারি। খাদ্য-বিভাগের মন্ত্রী লর্ড উল্টন ঘোষণা করিয়াছেন, বিলাতে যাহাতে মৎস্যের মূল্য অযথা বর্দ্ধিত না হয়, সেজন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করা হইবে। বিলাতের মাছ-ধরিবার জাহাজ অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়ায় সেথানে মৎস্য-সরবরাহ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কমিয়া গিয়াছে। সেজন্য মৎস্যের মূল্য অসঙ্গত বর্দ্ধিত হওয়ায় বিলাতের সরকার দেশের সর্ব্বত্র মৎস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; অথচ দেশের সর্ব্বত্রই সমভাবে মৎস্য-সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। আর বাঙ্গালা সরকার চাউলের মূল্য-বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়! চাউলের মূল্যের অতিবৃদ্ধিতে তাঁহারা বলিয়াছেন, (১) এবার ধানের ফলন ভাল হয় নাই (২) ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর পথ সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। (৩) এ সময় মজুদ চাউল ফুরাইয়া আসে বলিয়া সাধারণতঃ চাউলের মূল্য বাড়িয়া যায়।

অতএব চাউলের মূল্যবৃদ্ধি একান্ত স্বাভাবিক মনে করিয়া এ দেশের লোক অন্নকষ্টে নিশ্চিন্ত থাকুক, তাহাদের ব্যাকুল হইয়া ফল নাই—ইহাই বোধ হয় জনসাধারণের দুঃখে বিগলিত-হৃদয় সচিবদিগের অভিপ্রেত। কিন্তু বিলাতের সরকার ঐরূপ ফাঁকা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সে দেশে মৎস্যের মূল্যের অপরিমিত বৃদ্ধির সমর্থন করিতে পারেন নাই, কারণ, জনসাধারণের দুঃখ-কষ্টে তাঁহারা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারেন না।

কিন্তু বাঙ্গালা সরকারের হেতুবাদ যে যুক্তিসহ নহে, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সত্য বটে, আইন করিলে মজুদ চাউলের পরিমাণ বাড়িবে না; কিন্তু এ কথাও সত্য যে, বাঙ্গালায় এবং বাঙ্গালার বাহিরে বহু লোক ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। চাউলের মূল্য অধিক বাড়িলে তাহারা ধান্য বিক্রয়ের সঙ্কল্প করিয়াছে। এবার বর্ষার বিলম্ব ঘটায় তাহাদের সেই আশা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ধানের বা চাউলের মূল্য বাঁধিয়া দিলে তাহাদের সে লাভের আশা থাকিবে না,- সুতরাং তাহারা গোলা হইতে ধান্য, চাউল ছাড়িবে; চাউলের মূল্যও আর বাড়িবে না। চাউলের মূল্য বাঁধিয়া দিতে হইলে এমন ভাবে উহা বাঁধিয়া দিতে হইবে, যেন উহাতে চাউল আমদানী রহিত না হয়।

যাহা হউক, অধিকাংশ কৃষককেই যখন এখন অধিক মূল্যে চাউল কিনিয়া খাইতে হইতেছে, তখন চাউলের এই মূল্য-বৃদ্ধিতে অধিকাংশ কৃষকের লাভ হইতেছে, সরকারী ইস্তাহারের এ কথা একেবারেই ফাঁকা আওয়াজ! আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, অধিকাংশ লোকের সাময়িক কিছু অর্থলাভের অজুহাতে অন্নাভাবে অল্পসংখ্যক লোকের ধ্বংসসাধন কি সভ্য সরকারের কার্য্য, না ঘোর নৃশংস আচরণেরই দৃষ্টান্ত? বাঙ্গালার গভর্ণর এ কথা চিন্তা করিয়াছেন কি?

——

লোক-গণনায় অনাচার

দেশের সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল হইলে নানা দিক্ হইতে কত-রকম অনাচার গজাইয়া উঠে, তাহা সকল সময় বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গালার প্রধান-মন্ত্রী সর্ব্বপ্রথমেই ব্যক্ত করেন, লোক-গণনাকার্য্যে নিযুক্ত হিন্দু-গণনাকারীরা অনেক অন্যায় করিয়াছে, সে বিষয়ের অনেক প্রমাণ তাঁহার পকেটে আছে। কিন্তু অনেক-কিছুর মত তাহা তাঁহার পকেটেই একাল-পর্য্যন্ত রহিয়া গেল—আর বাহির হইল না! পক্ষান্তরে আদালতে যত দূর প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুদের কোন দোষ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি বর্দ্ধমান জিলার এবং যশোহর জিলার লোক-গণনা সম্পর্কে দুইটি মামলা হইয়া গিয়াছে। একটি মামলায় আসামী ছিল নাড়ু শেখ নামক এক জন মুসলমান গণনাকারী। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে সাঁওতালদিগকে গণনা করিতে যাইয়া প্রত্যেকের

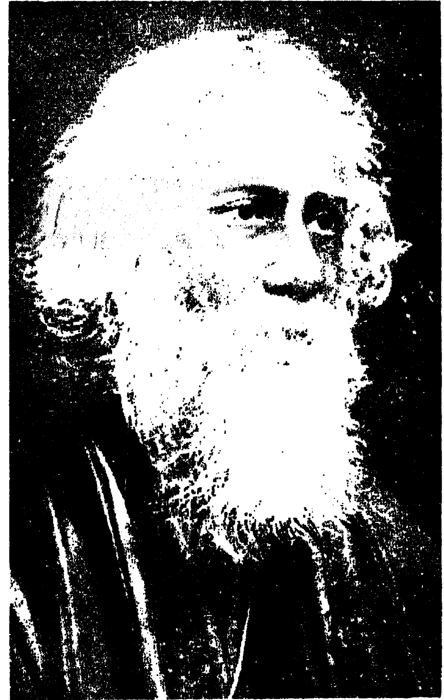
নিকট হইতে এক আনা হিসাবে উৎকোচ গ্রহণ করে। বর্দ্ধমানের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাশে তাহার বিচার হয়। বিচারক নাড়ু শেখের এই অপরাধের জন্ম তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ত্রিশ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন। আর একটি মামলা হইয়াছে যশোহর জিলায়। এখানে হাকিম ছিলেন বনগ্রামের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, রহমান। আসামী এক জন হিন্দু। আসামীর বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত করা হয় যে, লোকটি গণনাকালে তাহার বাড়ীর লোক সংখ্যা অধিক করিয়া লিখাইয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারে এই আসামী নির্দোষ বলিয়া অব্যাহতি পাইয়াছে; অথচ সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, এই মহকুমার এলাকাধীন কোন এক গ্রামে গণনাকারী এক মৃত মুসলমানকে জীবিত বলিয়া লিখিয়াছিল। শেষটা অপরাধ ধরা পড়ে; কিন্তু বনগ্রাম-মহকুমার হাকিম এই অভিযোগের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? সাম্প্রদায়িকতার ফলে সকল দিকেই গোল বাধিতেছে। সার জন আর্থার হার্ব্বার্ট ব্যাপারটা একবার ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়।

—

রবীন্দ্রনাথের হীরক-জয়ন্তী

গত ২৫শে বৈশাখ বাঙ্গালার বরণীয় কবি ও দার্শনিক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়স অশীতিতম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমগ্র বঙ্গদেশে, এবং বাঙ্গালার বাহিরেও ভারতের বহু নগরে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের হীরক-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার, বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির গৌরব। প্রতিভায় তাঁহার সমকক্ষ মনীষী বর্ত্তমান কালে কেবল বাঙ্গালায় কেন, সমগ্র ভারতেও দুর্লভ। সেইজন্ম নিখিল বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই, এমন কি, অতি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত তাঁহার দীর্ঘজীবন এবং অটুট স্বাস্থ্য কামনা করিয়া ঐকান্তিকতার সহিত এই হীরক-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও বিশ্ববরেণ্য কবির এই জয়ন্তী অতি সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে ত্রিপুরার মহারাজা রবীন্দ্রনাথকে "ভারত-ভাস্কর" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। জাপানের কন্সাল-জেনারাল মিষ্টার কে কে ওক-জাকি রবীন্দ্রনাথের এই হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষে তাঁহাকে ভারত-প্রবাসী জাপানীদিগের ঐকান্তিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। চীন হইতে চীন সাম্রাজ্যের জনসাধারণের প্রতিনিধি সেনাপতি চিয়াং কাইশেকও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সহিত সমগ্র চীনাজাতির পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন বাঙ্গালার বাহিরে ভারতের বহু স্থানে, যথা—করাচি, লাহোর, এবং বোম্বাই প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে বহু নরনারী রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে যোগদান করেন।

রবীন্দ্রনাথ গত ১লা বৈশাখ যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সংশোধিত সংস্করণ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজ জাতির মহানুভবতা ও ন্যায়নিষ্ঠায় এক সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীর কিরূপ অগাধ বিশ্বাস এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তাহা সেই অভিভাষণে তিনি অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আজ কি ভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার বেদনাদায়ক বিবরণও কবিবর অতি পরিস্ফুটরূপে তাহাতে বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে কেবল তাঁহার অপূর্ব্ব লিপি-কুশলতাই নহে, সুগভীর মনস্তত্ত্বও অতি বিশদ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্য-শাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে প'ড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। * * * য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী ক'রে হারান গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হ'ল। সভ্য-শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে—সে কেবল অন্নবস্ত্র, শিক্ষা এবং আরোগ্যের ভয়াবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্চে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ—যার কোন তুলনা দেখতে পাইনি



কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের বাহিরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদের সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশঃ উৎকট হ'য়ে উঠেছে, সে যদি ভারত-শাসনযন্ত্রের ঊর্দ্ধস্তরে কোন এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হ'ত, তাহ'লে কখনই ভারত-ইতিহাসের এত-বড় অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না,—যে দুর্গতির তুলনা অন্যত্র কোথাও নাই।" তাহার পর তিনি বলিয়াছেন—"পাশ্চাত্ত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানে শ্রদ্ধা-রাখা অসাধ্য হ'য়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদিগকে দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি।"—শেষে তিনি বলিয়াছেন,

"কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো মহাপাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষে করব।"—তাঁহার উক্তিগুলি যে অত্যুক্তি নহে, এবং কঠোর সত্য, তাহা বহুদর্শী প্রত্যেক বৃদ্ধকেই স্বীকার করিতে হইবে।—'এম্পায়ার থিয়েটারে'ও বালকবালিকারা জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে এক সভায় যোগদান করেন। ডক্টর কালিদাস নাগ সেই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। তিনি এই ৮১ বৎসর বয়সে পুনর্ব্বার অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার স্বদেশবাসীরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন; প্রার্থনা, ভগবান তাঁহাকে অচিরে নিরাময় করুন। দেশের এই দুর্দ্দিনে তাঁহার দীর্ঘতর জীবনের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক।

পূর্ব্ব-ভারত রাষ্ট্রীয় ভাষা-সম্মেলন

গত ৯ই আষাঢ় কলিকাতার মাড়োয়ারী ছাত্র-নিবাসে "পূর্ব্ব-ভারত রাষ্ট্রীয় ভাষা-সম্মেলনের" এক অধিবেশন হইয়াছিল। ডক্টর শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ মূল সভার সভাপতি, এবং সুপণ্ডিত শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। বিহারী রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাবু ও বাঙ্গালী সুনীতি বাবু উভয়েই হিন্দী ভাষাকেই ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা করিবার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেন। গান্ধীজীর অনুগ্রহে ভাগ্যবান্ ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ বিষয়ে অবশ্যই গান্ধীজীর ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিবেন; কিন্তু সুবিজ্ঞ অধ্যাপক এবং মাতৃভাষার সুলেখক বাঙ্গালী সুনীতিকুমার কি ভাবিয়া বঙ্গভাষার দাবী উপেক্ষা করিয়া হিন্দী ভাষার সমর্থন করিলেন, তাহা বুঝিয়া-উঠিবার শক্তি আমাদের নাই; কিন্তু ইহাতে বহু বিজ্ঞ, চিন্তাশীল বাঙ্গালী ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ, এ বিষয়ে তাঁহার অভিমত জানিয়াই তাঁহাকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদে স্থাপন করা হইয়াছিল। ইহা খেলোয়াড়ী চাল বটে। সংবাদপত্রে তাঁহার অভিভাষণ বলিয়া যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "হিন্দী ভাষা অধিক লোকের কথ্যভাষা, অতএব ইহারই রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী অধিক।"—কিন্তু অধ্যাপক সুনীতিকুমার এরূপ ভুল কথা কি করিয়া তাঁহার অভিভাষণে প্রচার করিলেন, তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বুঝিয়া-উঠিতে অসমর্থ।

বর্ত্তমান সময়ে বিহার প্রদেশে যে ভাষায় লোক কথাবার্ত্তা বলে, তাহা প্রধানতঃ তিনটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত, যথা—মৈথিলী, ভোজপুরী, এবং মাগধী। শুনা যায় যে, প্রায় ২ কোটি লোক মৈথিলী ভাষায় কথা বলে। ভোজপুরী ভাষাতেও বহু লোক কথা কহে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ তিনটি ভাষা, এবং তাহার সহিত উর্দ্দু ভাষাকে জড়াইয়া হিন্দী-ভাষাভাষী লোকের সংখ্যাই অধিক—এরূপ ঘোষণা করা কি সঙ্গত? ঐরূপ যুক্তি অনুসারে উড়িয়া ও আসামী ভাষাকেও বাঙ্গালা ভাষা বলা যাইতে পারে; কারণ, উহা বাঙ্গালা-ভাষারই একটু প্রকারভেদ মাত্র। মণিপুরী ভাষাও অনেকটা বাঙ্গালা-ভাষারই অনুরূপ। এই সকল ভাষাভাষী লোকদিগকে ধরিলে বাঙ্গালা-ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা ঐরূপ হিন্দী-ভাষাভাষী লোকসংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক হয়। কলিকাতা, পাটনা, এবং বারাণসী-বিশ্ববিদ্যালয় মৈথিলী ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া তাঁহাদের পাঠ্য-তালিকায় স্থান দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তথাকথিত হিন্দী-ভাষা লিখিতে স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বাঙ্গালা-ভাষাভাষী লোক মাত্রই একই প্রকার লিপি বা অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ অক্ষরই কার্য্যতঃ মণিপুরী, আসামী, এবং মৈথিলী-ভাষাভাষীরা ব্যবহার করে। বাঙ্গালা-ভাষাতেই ভুটান, আসাম, মণিপুর, কাছাড় প্রভৃতি প্রদেশের অনেক প্রাচীন কাহিনী লিখিত আছে। পূর্ব্বে ঐ সকল প্রদেশের রাজারা সরকারের সহিত এবং পরস্পরের মধ্যে পত্র-ব্যবহারে বাঙ্গালা ভাষাই ব্যবহার করিতেন—তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে।

ভারত সরকার 'ইম্পিরিয়াল রেকর্ড' আফিসের যে বাঙ্গালা-পত্রগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফতে ছাপাইতেছেন, তাহাতে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত দুই শত বাঙ্গালা পত্র আছে। উহা কুচবিহার, মণিপুর, আসাম ও ভুটানের রাজ-দরবার হইতে লিখিত। উহার অক্ষর বাঙ্গালা,—ভাষাও বাঙ্গালা। বাঙ্গালা অক্ষর অত্যন্ত প্রাচীন। সেই প্রসঙ্গের আলোচনার স্থান এখানে নাই; তবে বাঙ্গালা-সাহিত্য বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য সমূহের তুলনায় অনেক অধিক সমৃদ্ধ। এ অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষাকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দীকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করিবার অনুকূলে নির্ভরযোগ্য যুক্তি কি থাকিতে পারে? তাহার প্রয়োজনই বা কি? সুনীতি বাবু রোম্যান অক্ষরের বিশেষ পক্ষপাতী। প্রতিভাশালী লোকদিগের এক-একটা খেয়াল (hobby) থাকে। এ ক্ষেত্রে সুনীতি বাবুরও তাহাই; নতুবা কোন সুস্থ প্রকৃতির লোক স্থির চিত্তে বিচার করিয়া রোম্যান অক্ষর-ব্যবহারের অনুকূলে কেন যে মত প্রকাশ করেন, কেহ কি তাহা বলিতে পারেন? এই প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু তাহার আলোচনার স্থান নাই।

ঢাকাই তদন্ত-কমিটী

ঢাকাই দাঙ্গার তদন্ত-কমিটী গঠিত এবং তদ্দ্বারা তদন্ত-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু পুনর্ব্বার দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ায় উহার কার্য্য অনির্দ্দিষ্ট কাল স্থগিত ছিল। কমিটীতে হাইকোর্টের এক জন জজ, এবং এক জন জিলা-জজ আছেন। ঐ দুই জনই ইংরেজ। মনে হয়, দুই জনই হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-জজ হইলেই ভাল হইত। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সিভিলিয়ান অথবা প্রাদেশিক-সরকারের কর্ম্মচারী লইয়া কমিটী গঠিত না হওয়াই উচিত ছিল। যাহা হউক, যাহা হইয়াছে, এখন তাহার প্রতিবাদ করিয়া ফল নাই। কিন্তু তদন্ত আরম্ভ হইবার পর আবার দাঙ্গা বাধায় তদন্ত-কার্য্যের ক্ষতি ও বাধা ঘটিয়াছে। লোক সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে; এই ত্রাসের ফলে কেহ কেহ যে নিরপেক্ষ ভাবে সাক্ষ্য দিতে ভরসা করিবে না, এরূপ আশঙ্কার কারণও যে নাই, তাহা বলা যায় না। এখন এই কমিটীর তদন্ত কিরূপ দাঁড়ায়, তাহাই দ্রষ্টব্য। তদন্ত-কমিটীর সদস্যগণ হাসপাতালে আহতদিগকেও দেখিতে গিয়াছিলেন। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঢাকায় গিয়া দাঙ্গায় বিধ্বস্ত বহু স্থান স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছেন; এ সম্বন্ধে তাঁহার নিরপেক্ষ অভিমত তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেওয়ার যোগ্য নহে।

ঢাকায় দাঙ্গা

গত ১২ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার রথযাত্রার দিন ঢাকার দাঙ্গা নূতন করিয়া বাধিয়া উঠে। দাঙ্গার কারণও অতি তুচ্ছ! আপাততঃ প্রকাশ, নবাবপুর-রোড এবং মদনমোহন বসাক-রোডের মোড়ে রথযাত্রায় এক মেলা বসিয়াছিল। মেলায় এক জন মুসলমান গাঁইট-কাটা এক জন হিন্দুর পকেট মারে। সে হাতেনাতে ধরা পড়ায় কয়েক জন লোক তাহাকে প্রহার করে। ইহাই দ্বিতীয় বার দাঙ্গা আরম্ভের কারণ বলিয়া প্রকাশ। ঐ তারিখেই দাঙ্গা বাধিয়া উঠে; দাঙ্গায় এক জন হিন্দু নিহত এবং তিন জন হিন্দু আহত হইয়াছিল। পর দিন সকালে দশ জন হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছিল। এই প্রকারে দাঙ্গা আবার অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বাড়িয়া যাইতে থাকে। এই দাঙ্গায় কয়েক জন নিরীহ শিক্ষকও নিহত হইয়াছেন। দিন দিনই হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। গত ২১শে আষাঢ় (৫ই জুলাই) শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত মোট চারি জন ছুরিকাঘাতে আহত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে।

অতঃপর ৬ই জুলাইও ঢাকায় ছোরা মারা চলিয়াছিল, এবং সেই দিনই ছয় জন আহত ব্যক্তির মধ্যে দুই জনের মৃত্যু হইয়াছিল। গত ২৬শে জুন হইতে ঐ দিন পর্য্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৩২ জন, আহতের সংখ্যা ৭৯ জন। চকবাজার ও বড়বাজার থানার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়াছে; এবং সাত শতেরও অধিক লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও দোকান বন্ধ রাখা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও টিচার্স ট্রেণিং কলেজের ক্লাসও ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা হয়।

বাঙ্গালার ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ গর্ডন ঢাকায় উপস্থিত হইয়া গত ৬ই জুলাই কেন্দ্রী শান্তি-সমিতির সদস্য ও কয়েক জন নেতাকে লইয়া এক সভা করেন। ঢাকার সাম্প্রদায়িক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, তিনি যখন পূর্ব্বে ঢাকায় ছিলেন, তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। মুসলমানরা জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায়, ও হিন্দুরা মহরমের শোভাযাত্রায় যোগদান করিতেন। ব্যবস্থা-পরিষদে প্রধান-সচিব মিঃ ফজলুল হক বলিয়াছিলেন, মুসলমানের গাত্রে হিন্দুর হোলীখেলায় রং লাগায় যে দাঙ্গা আরম্ভ হয়, তাহাতে রক্তের খেলা চলিয়াছে। মিঃ গর্ডনের ঐ উক্তি শুনিয়া প্রধান-সচিবের কি বলিবার আছে, জানিতে আগ্রহ হয়।

'রিয়াজুন সলাতিন' মুসলমান ঐতিহাসিক রচিত গ্রন্থ। লেখক তাহাতে লিখিয়াছেন, বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওসান ঢাকার শাসনকর্ত্তা হইয়া-আসিয়া হিন্দুদিগের হোলীর উৎসবে যোগদান করিতেন। যাঁহার পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণুতাই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ, সেই বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তাঁহার পৌত্রের হিন্দুর হোলী-উৎসবে যোগদানের সংবাদে বিরক্ত হইয়া কঠোর বিদ্রূপভরে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "তোমার মস্তকে জাফ্রানী-রঙ্গের উষ্ণীষ, তোমার স্কন্ধে লোহিত উত্তরীয়, তোমার সম্মানিত বয়স এখন ছয়-চল্লিশ বৎসরের কাছাকাছি। তোমার (রঙ্গীণ?) দাড়ি-গোঁফের জয় জয়-কার!"—এখন কি ঔরঙ্গজেবের অভিমতই তাঁহার স্বধর্ম্মীগণের নিকট সমাদৃত হইতেছে? আপনাকে যিনি ভগবানের মশালধারী বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত নহেন, সেই প্রধান-সচিবকে মিঃ গর্ডন এ-কথা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর পাইবেন, তাহাও জানিতে আগ্রহ হয়। হিন্দু-মুসলমানের শোভাযাত্রায় পরস্পরের যোগদানের আর আশা না থাকিলেও পরস্পরের শোভাযাত্রায় বাধাপ্রদানে তাহারা বিরত হইবে—ইহাও কি আর আশা করা যায় না? কত দিনে এই দাঙ্গার পরিসমাপ্তি হইবে—কে বলিতে পারে? দাঙ্গায় আরও এক জন লোক নিহত হইবার পর না কি সহরে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। প্রধান-সচিব কলিকাতায় ফিরিয়া এই শান্তি-স্থাপনের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু শান্তি কি স্থায়ী হইবে?

দক্ষিণ-ভারতীয় বিচ্ছেদ-বিরোধী সম্মেলন

গত মাসে মাদ্রাজে যে বিচ্ছেদ-বিরোধী পরিষদের বৈঠক বসিয়াছিল —উহা মুসলমানদিগের সভা। ঐ সভার সভাপতি মিষ্টার মহম্মদ য়ুসফ্ শরিফ তাঁহার বক্তৃতায় পাকিস্থান প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—ভয় এবং সন্দেহই সাম্প্রদায়িকতার কারণ; তাঁহার মতে উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই যে বিরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাঁহারা এই দুই সম্প্রদায়ের নেতৃত্বকামী, তাঁহারাই সেই ভয় ও সন্দেহ পরিস্ফুট করিয়া এই কাণ্ড বাধাইয়া দিয়াছেন! নতুবা ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও ধর্ম্ম লইয়া উভয় সম্প্রদায়ে কোন বিরোধ নাই; হিন্দু-মুসলমানে উহাতে কৃত্রিমতা নাই। বহুকাল ধরিয়া একত্র বাসের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতার উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া এক জাতি হইতে, এবং সর্ব্বসাধারণের উপকার-জনক কাজ করিতে পারেন। এদিকে নিখিল-বঙ্গীয় মুসলমান সমিতির সভাপতি সৈয়দ হবিবর রহমান বলিতেছেন,—পাকিস্থান প্রস্তাবটি মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিরোধী, এবং গণশাসনের পরিপন্থী। এই সকল উক্তির প্রতিবাদে মিঃ জিন্নার কি বলিবার আছে? কিন্তু তাঁহার কিছু বলিবার না থাকিলেও তিনি মুসলমান সমাজের স্বয়ং-সিদ্ধ নেতা; হাম্‌-বড়া হইবার গৌরব তিনি কি ত্যাগ করিতে পারেন? সুতরাং তাঁহাকে জাগিয়া ঘুমাইতেই হইবে, এবং কাণে ছিপি-আঁটিয়া তিনি প্রাণপণে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে থাকিবেন; কাহারো যুক্তিপূর্ণ-প্রতিবাদে তিনি কর্ণপাত করিয়া স্বমহিমা খর্ব্ব করিতে পারেন না।

কৈফিয়তের বাহাদুরী

বাঙ্গালায় লোকগণনা-কার্য্যে নিযুক্ত প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ ডাচ হিসাব-প্রকাশে বিলম্বের যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা বড়ই কৌতুকজনক বটে! তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গালায় লোকসংখ্যা ৫ কোটি হইতে ৬ কোটি হইয়াছে কি না, তাই গত বারের ন্যায় এবার হিসাবটা শীঘ্র বাহির করা সম্ভব হইতেছে না। গতবার শেষ গণনার তারিখের ৯দিন পরে হিসাব বাহির করা হইয়াছিল। ৫ কোটি লোকের হিসাব যদি ৯ দিন বিলম্বে বাহির করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ৬ কোটি লোকের হিসাব বাহির করিতে কত দিন লাগিতে

পারে, এই ত্রৈরাশিকের উত্তর স্থির করিতে মস্তিষ্ক-পরিচালনার জন্য মাথায় হাতী-ঘোড়া জুতিবার প্রয়োজন হয় না। ১২ দিনের স্থানে বড় জোর ১৫ দিন লাগিতে পারে; কিন্তু তাহা না হইয়া এত বিলম্ব হইতেছে কেন? তিনি আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। যে ভদ্রলোক এই লোকগণনা-কার্য্যে তাঁহার সহকারী ছিলেন, তিনি বিশেষ যোগ্য, এবং ঐ কার্য্যে যথেষ্ট পারদর্শী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কিন্তু মাঝামাঝি সময়ে তাঁহাকে সরাইয়া-দিয়া ঐ কার্য্যে বিশেষ অনভিজ্ঞ, শিক্ষা-বিভাগের এক জন অখ্যাত সাব-ইন্স্পেক্টারকে নিযুক্ত করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তিনি নীরব থাকিয়া বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছেন; সেই জন্য অনেকেই বলিতেছে, 'মিষ্টার ডাচ, তুমিও?'—কিন্তু তিনি কি প্রাদেশিক সরকারের কর্ম্মচারী নহেন? আর এ সম্বন্ধে প্রধান-সচিবের সুস্পষ্ট মনোভাব কি তাঁহার অজ্ঞাত?

—

সিন্ধিয়া জাহাজ-নির্ম্মাণ কারখানার প্রতিষ্ঠা

গত ৭ই আষাঢ় শনিবার মাদ্রাজের বিশাখাপত্তন বন্দরে সিন্ধিয়া ষ্টীম-নেভিগেশন কোম্পানীর সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের জাহাজ-নির্ম্মাণের এক কারখানার পত্তন করা হইয়াছে। ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে জাহাজ নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে,—'মাসিক বসুমতী'র পাঠকগণের তাহা সুবিদিত। কিন্তু এ দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাদুর্ভাব-কালে তাঁহাদের স্বার্থপরতাপূর্ণ নীতির প্রভাবে ভারতীয় জাহাজগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার পর সিন্ধিয়া-কোম্পানীর এই উদ্যোগ-আয়োজন। ইহার ফলে ভারতে আধুনিক-ধরণের জাহাজ নির্ম্মিত হইতে পারিবে। গান্ধীজী, ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার পি, সি, রায়, মিষ্টার চুনিলাল মেটা প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ এই উদ্যোগে আশীর্ব্বাদ-বাণী প্রেরণ করিয়া প্রতিষ্ঠাতাগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছেন। এই জাহাজী-কারখানার প্রতিষ্ঠা, ভারতের একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, সরকার এই কার্য্যের জন্য সিন্ধিয়া কোম্পানীকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারেন নাই। উক্ত কোম্পানীর সভাপতি মিষ্টার ওয়ালচাদ হীরাচাদ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, জাহাজের দেহ-গঠনের জন্য যে ইস্পাতের প্রয়োজন, এবং জাহাজের যে ইঞ্জিনের আবশ্যক, ভারত সরকার বিলাত হইতে তাহা আনাইবার কোনই সুবিধা করিয়া দিতেছেন না; কিন্তু উহা এ দেশে প্রস্তুত হয় না।—ইহার উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক। ভারত সরকার স্বদেশীয় বণিক্‌গণের স্বার্থে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন—ইহা এ দেশের লোক প্রত্যাশা করিতে পারেন কি?

—

কুমারী রাথবোনের পত্র

কুমারী ইলেনয়ার রাথবোন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে পার্লামেণ্টের কমন্স সভার সদস্য নির্ব্বাচিতা হইয়াছিলেন। তিনি রক্ষণশীল দলের নহেন, শ্রমিক দলেরও নহেন, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলভুক্তা; অর্থাৎ তাঁহার নিকট কোন দলেরই খাতির নাই। ভারত সম্বন্ধে তিনি মধ্যে মধ্যে দুই-একটা কথা বলেন। অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি ভারতীয় নারীদিগের উদ্দেশ করিয়া একখানা খোলা চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে উদ্দেশ করিয়াই সেই চিঠি লেখা হইয়াছিল। কংগ্রেস যে বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটিশ-সরকারের সহিত অসহযোগ ঘোষণা করিয়াছেন,—আইন অমান্য করিতেছেন,—কুমারী রাথবোন যেন তাহাতে ব্যথিত হইয়াই ঐ খোলা চিঠি লিখিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, ভারতবাসীরা বৃটিশ জাতির নিকট প্রাপ্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া যে আইন ভঙ্গ করিতেছে,—তাহা ভারতবাসীর কৃতঘ্নতারই পরিচায়ক। বৃটেন ভারতবাসীদিগের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া না দিলে তাহারা এখন পর্য্যন্তও অন্ধ থাকিত,—ইত্যাদি। মিস্ রাথবোন একথাও লিখিয়াছেন যে, তাঁহার কথাগুলি হয় ত একদেশদর্শী, উহার বিপরীত কথাও বলিবার আছে। শেষে তিনি সদম্ভে লিখিয়াছেন,—"আপনাদের সাহায্য ব্যতিরেকেও এই যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিব,—যাহাদের চিন্তার ধারা আপনাদের চিন্তাধারা হইতে স্বতন্ত্র, আমরা তাহাদের সাহায্য পাইতেছি"—ইত্যাদি। এখানে বলা আবশ্যক, মিস্ রাথবোন আগাগোড়াই ভুল বুঝিয়াছেন। কংগ্রেস বৃটিশ সমর-কার্য্যে কিছুমাত্র বাধা ঘটাইতেছে না। তাহারা কেবলমাত্র মত-প্রকাশের স্বাধীনতারই দাবী করিয়াছে। বৃটিশ-সরকার সেইটুকু অধিকারও তাহাদিগকে দিতে সম্মত না হওয়ায় তাহারা সত্যাগ্রহ করিয়া দলে-দলে জেলে যাইতেছে। এই যুদ্ধ-কার্য্যে সরকারকে সাহায্য করিতেও তাহারা কাহাকেও নিষেধ করিতেছে না। সুতরাং তাঁহার চিঠিখানির অভিযোগই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অধিকন্তু, বৃটেন ভারতবাসীর জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দেয় নাই,—আজ যে যান্ত্রিকতার বলে অল্প দিনেই নাজী-জার্ম্মাণী প্রায় সমস্ত য়ুরোপ মথিত করিয়া ফেলিল,—ইংরেজ জাতি সেই যন্ত্রবিদ্যায় ভারতবাসী অপেক্ষা অধিক অগ্রসর, ইহাই ভারতবাসীর কথা।

—

রবীন্দ্রনাথের উত্তর

মিস্ রাথবোনের খোলা চিঠি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ রোগশয্যা হইতে তাহার মুখের মত জবাব দিয়াছেন। তিনি 'সভ্যতার সঙ্কট' নামক যে নিবন্ধটি লিখিয়াছেন,—রাথবোনের চিঠির উত্তরে তাহারই মর্ম্ম পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—আজ জওহরলাল কারাগারে অবরুদ্ধ,—তিনি ঐ চিঠির জবাব দিতে পারেন না; তাই রবীন্দ্রনাথকে তাহার জবাব দিতে হইল। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, "এই মহিলাটি অবিবেচনা ও ধৃষ্টতার সহিত আমাদের ভালমন্দ বিচার-বুদ্ধির উপর যে দম্ভপূর্ণ অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার স্বদেশবাসীর কোন ইষ্টসিদ্ধি হয় নাই।" "পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইয়া আমরা বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি সত্য। তবে আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষালাভে উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই শিক্ষাকে ব্যর্থ করিবার জন্য সরকারী সকল চেষ্টাকে এড়াইয়াই সেই উপকার লাভ করিয়াছেন। অন্য য়ুরোপীয় ভাষার সহিত পরিচিত হইয়াও আমরা ঐ শিক্ষালাভ করিতে পারিতাম। ভারতে যে সরকারী

শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে বৃটিশ ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা পাইতেছে না, তাহারা যাহা পাইতেছে, তাহা উহার অপকৃষ্ট অংশ। তাহার ফলে তাহাদের নিজ দেশীয় সংস্কৃতির স্বাস্থ্যকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। দুই শত বৎসরব্যাপী সরকারী শাসনের ফলে ভারতে সমস্ত জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা এক জন মাত্র ইংরেজী ভাষা লিখিতে এবং পড়িতে শিখিয়াছে, আর কেবল মাত্র ১৫ বৎসরের চেষ্টায় রুশিয়ায় শতকরা ৯৮ জন বালকবালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে (ষ্টেটস্‌ম্যান ইয়ার-বুক দেখুন)।" সংস্কৃতি লাভ করা অপেক্ষা জীবনধারণের জন্য আবশ্যক দ্রব্য অগ্রে প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পত্রে বলিয়াছেন, "বৃটিশ জাতি দুই শত বৎসর ধরিয়া আমাদের জীবনোপায়ের উপর কর্তৃত্ব করিবার পর আমরা কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছি? আমাদের পল্লী-অঞ্চলের লোক পানীয় জল পায় না, ভারতে পাঠশালা অপেক্ষা কূপ আরও অধিক বিরল। এক জেলায় অজন্মা হইলে অন্য জেলা হইতে খাদ্য আমদানী হয় না। সেইজন্য মনে হয়, বিলাতের ইংরেজের সহিত এদেশের ইংরেজের পার্থক্য বিদ্যমান। ইংরেজ আমাদিগকে খাইতে-পরিতে দিতে পারিতেছেন না সত্য,—কিন্তু তাঁহারা আমাদের Law and order (আইন ও শৃঙ্খলা) যে রক্ষা করিতেছেন, দেশের চারিদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপকতাই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশের লোক যখন গণ্ডায়-গণ্ডায় গুণ্ডার হাতে মরিতেছে, সম্পত্তি লুঠ হইতেছে, নারী ধর্ষিত হইতেছে, কিন্তু শক্তিমান্ ইংরেজের অস্ত্র সেই সকল গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতেছে না। পরন্তু সাগর-পার হইতে ইংরেজ রাজনীতিক বলিতেছেন, তোমরা তোমাদের ঘর সামলাইতেও সম্পূর্ণ অক্ষম। কিন্তু সশস্ত্র যোদ্ধারাও যে ভয়ে প্রবল শক্তির সম্মুখীন হইতে পরাঙ্মুখ, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধেও দেখা গিয়াছে, বীরশ্রেষ্ঠ ইংরেজ, ফরাসী, এবং গ্রীক সৈনিকগণ প্রবলতর যান্ত্রিক শক্তি দ্বারা সুসজ্জিত শত্রুর সম্মুখীন হইতে না পারিয়া য়ুরোপের রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন আমাদের দেশের দরিদ্র নিরস্ত্র অসহায় কৃষক রোরুদ্যমান সন্তানকে লইয়া বিব্রত হইয়া সশস্ত্র গুণ্ডার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ-লাভের আশায় পলায়ন করে, তখন ইংরেজ রাজপুরুষরা আমাদের কাপুরুষতার প্রমাণ পাইয়া অবজ্ঞাভরে হাস্য করেন। ইংলণ্ডের প্রত্যেক লোক শত্রুর আক্রমণ হইতে গৃহ-সম্পদ্ রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র ধরিয়াছে, কিন্তু ভারতে হুকুমজারি করিয়া লাঠি-খেলা শিক্ষা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। আমাদের দেশের লোকগুলিকে চিরকাল সন্ত্রস্ত এবং সশস্ত্র প্রভুদিগের দয়ায় নির্ভরশীল করিয়া রাখিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই নিরস্ত্র এবং পৌরুষহীন করিয়া রাখা হইয়াছে।"—রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন, "কোন একটা সরকারের ভালমন্দ বিচার করিতে হইলে সেই সরকারের প্রধান পুরুষদিগের মুখের বচন শুনিয়া বিচার করা চলে না, সেই সরকার যথার্থই প্রজার ভাল কিছু করিয়াছে কি না, তাহা দেখিয়াই বিচার করিতে হয়। ইংরেজ বিদেশী বলিয়া আমাদেরও ত অপ্রীতিভাজন নহেন, যত অপ্রীতিভাজন হইয়াছেন তাঁহারা আমাদের অছি বলিয়া মুখে পরিচয় দিয়াও অছির কর্ত্তব্য পালন করেন না—পরন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিলাতী ধনিকদিগের পকেট স্ফীত করিবার জন্য কোটি-কোটি লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হরণ করিয়াছেন বলিয়া। ভদ্র ইংরেজরা এই সকল কথা মনে রাখিয়া এবং আমরা কিছু করিতেছি না বলিয়া যদি কৃতজ্ঞতা সহকারে নীরব থাকিতেন, তাহা হইলেও হইত, কিন্তু তাহার উপর তাঁহারা যে আমাদের ক্ষতি করিয়া অবমাননা করিবেন এবং কাটা-ঘায়ে নূণের ছিটা দিবেন, ইহা সর্ব্বপ্রকার ভদ্রতার বহির্ভূত।"

আমরা রবীন্দ্রনাথের উক্তির মোটামুটি অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। এই চূড়ান্ত উত্তরের পর আর কিছুই বলিবার নাই।

রাথবোনের উত্তর

মিস্ রাথবোন তাঁহার সমালোচকদিগের কথার জবাব দিয়াছেন। ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন, "সার রবীন্দ্রনাথ রোগশয্যায় শায়িত বলিয়া আমার পত্রখানি বোধ হয় ভাল করিয়া পড়েন নাই। নতুবা তিনি চিঠিখানির মূল লক্ষ্য অস্বীকার করিতে পারিতেন না, এবং অন্যান্য সমালোচকের ন্যায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মামুলি অভিযোগ উপস্থিত করিতেন না। আমি বৃটিশ-শাসনের সমর্থন করিতে চাহি না। আমার প্রধান কথা, এই অসহযোগ ভারতের প্রগতিসাধনের সহায়তা করিতেছে কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করা। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে পণ্ডিত নেহরু লিখিয়াছিলেন, 'যদি পৃথিবীতে ফ্যাসিজম বা নাজিবাদ প্রবল হয়, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য যত্ন করা বৃথা।'—এ কথা কি এখন মিথ্যা? বৃটিশের দোষ এবং ত্রুটি যতই থাকুক না কেন, হিট্‌লারের জয় অপেক্ষা বৃটিশ ও তাহার মিত্রগণের জয়লাভ ভাল নহে কি? বৃটিশগণের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। কিন্তু অসহযোগ দ্বারা কার্য্যতঃ যে হিট্‌লারেরই সুবিধা হইবে, এ কথা কি অসহযোগীরা অস্বীকার করিতে পারেন?" —ইত্যাদি।—মিস্ রাথবোন আসল কথাটি ভুলিয়াছেন বা বুঝিতে পারেন নাই। পাছে ভারতবাসীদিগের বৃটিশ জাতিকে সামরিক কার্য্যে সাহায্য-দানে বাধা জন্মে, সেই জন্য গান্ধীজী ব্যাপক ভাবে অসহযোগ আন্দোলন উপস্থিত করেন নাই; ব্যক্তিগত ভাবে এই আন্দোলন করিতে বলিয়াছেন। মার্কিণে কল কারখানায় যেরূপ ধর্ম্মঘট উপস্থিত করা হইতেছে, ভারতে সেরূপ কুত্রাপি হয় নাই। সুতরাং ইহার ফলে হিট্‌লারের বিন্দুমাত্রও সুবিধা হয় নাই। কুমারী রাথবোন ডক্টর রবীন্দ্রনাথের নামের পূর্ব্বে "সার" না দিলেই পারিতেন। কারণ, তিনি ঐ উপাধি জালিয়ানওয়ালাবাগের অনাচারের পরই প্রতিবাদস্বরূপ বর্জ্জন করিয়াছেন। ডক্টর রবীন্দ্রনাথকে 'সার' খেতাব দানে সম্মানিত করা হইয়াছিল, এ সংবাদ মিস্ রাথবোনের জানা থাকিলে, রবীন্দ্রনাথ যে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, ইহাও কি তাঁহার জানা উচিত ছিল না?

বৃটিশ-মহিলাগণের আবেদন

ভারতীয় নারীসমাজের উদ্দেশে বৃটিশ-নারীদিগের পক্ষ হইতে একখানি পত্র প্রচারিত হইয়াছিল। মিস্ রাথবোনের পত্রের পর বৃটিশ-নারীদিগের এই পত্রাঘাত! এবার নারীতে নারীতে আলোচনা; সুতরাং সমানে-সমানে লেখনী-যুদ্ধ! বৃটিশ রাজনীতিকগণ তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে ভারতবাসিগণকে পরিচালিত করিবার চেষ্টায়

অকৃতকার্য্য হইলে বৃটিশ-নারীরা তাঁহাদের পক্ষে হাল ধরিয়াছিলেন। ভারতীয় নারী-সমাজের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করাই তাঁহাদের পত্রাঘাতের উদ্দেশ্য; অর্থাৎ ভারতীয় নারীরা যেন তাহাদের দেশের পুরুষসমাজকে প্রভাবিত করে।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীযুক্তা রামেশ্বরী নেহরু, রাণী লক্ষ্মীবাঈ রাজবাড়ে, রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রভৃতি কয়েক জন সুশিক্ষিতা ও রাজনীতিতে অভিজ্ঞা ভারতমহিলা বৃটিশ-নারীগণের সেই পত্রের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া অন্যান্য কথার মধ্যে লিখিয়াছেন, "বৃটিশের মনে ভারতের স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধে আপনাদের প্রধান মন্ত্রী কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন না। তাঁহার ধারণা, ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ, বৃটিশের ইচ্ছানুসারে উহার নিকট সুবিধা আদায় করা যায়, এবং তাহা করা হইতেছে। ইহার জন্য ভারতের চিন্তাশীল নর-নারীর সহযোগিতার প্রয়োজন নাই—ইহাও তিনি জানেন।...বর্ত্তমান যুদ্ধ—বিশ্বে আধিপত্য স্থাপনের জন্য নাজী ও ফ্যাসিষ্টদিগের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধ; অর্থাৎ য়ুরোপের বাহিরে যে সকল জাতির বাস, তাহাদিগকে শোষণ। আমরা নাজী ও ফ্যাসিষ্ট মতবাদের অনুরাগিণী নহি; কিন্তু সেই জন্যই আমরা বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অনুরক্ত হইব, এরূপ আশা করা অন্যায়।

"ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। বৃটিশ-মহিলাগণ উহার প্রভুকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতবাসীকে অনুরোধ করিয়াছেন; অথচ যাহারা ভারতবর্ষকে পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে—তাহাদিগকে এই কলঙ্ক ক্ষালন করিয়া নৈতিক ন্যায়পরতার পরিচয় দিতে বলেন নাই। আমাদের এই বক্তব্য সম্ভবতঃ আপনাদিগের অপ্রীতিকর হইবে, কিন্তু ইহা আন্তরিকতাপূর্ণ।"

ভারত-মহিলারা বৃটিশ-নারীদিগের আন্তরিকতাপূর্ণ পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে; কিন্তু এই উত্তর পাঠ করিয়া কি তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রখর হইবে? ভারত-মহিলারা তাঁহাদের ক্রটি প্রদর্শন করিয়া ভালই করিয়াছেন। এই পত্র পাঠের পর তাঁহাদের আর কিছু বলিবার আছে বলিয়া মনে হয় না।

সাম্প্রদায়িক সমস্যায় মিঃ কৃপালনী

'শান্তিপূর্ণ আলোচনা ব্যর্থ হইলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য কোন ফলপ্রদ অহিংস উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে কি না?'—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সত্যাগ্রহ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে মিঃ কৃপালনী এই প্রশ্ন করিয়া, তিনি স্বয়ং যে উত্তর দিয়াছেন—তাহা বর্ত্তমান সঙ্কটকালে আমাদের স্বদেশবাসীর আলোচনাযোগ্য।

আচার্য্য কৃপালনী বলেন, "আমরা যদি অহিংসনীতি না মানি, এবং আমাদিগকে যদি সম্পূর্ণরূপে সহিদন্তের উপর নির্ভর করিতে না হয়, তাহা হইলে আমার মতে আমাদিগকে কোন অসহযোগ পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিতে হইবে।...কোন একটি সম্প্রদায়ের হস্তেই যখন রাজনীতিক ক্ষমতা নাই, তখন সহযোগিতা প্রত্যাহারের একমাত্র ক্ষেত্র অর্থনীতিক হইবে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ কাজ নৈতিক ও রাজনীতিক দিক্ দিয়া সমর্থনযোগ্য হইবে। আততায়ীকে অর্থনীতিক সাহায্য প্রদান কোন প্রকারেই কাহারও কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

"যে কোন সম্প্রদায়েরই হউন না কেন, সকল জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক সজ্ঘর্ষে নিপীড়িত সম্প্রদায়ের অনুকূলে তাঁহাদিগের প্রভাব প্রয়োগ করিবেন। উৎপীড়নকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। সকল সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী মনোভাব-সম্পন্ন সকল ভারতীয়ও তাহাতে যোগদান করিবেন। দীর্ঘকাল আগ্রহে ও ধৈর্য্যের সহিত বিবেচনা করিবার পরই কেবল অসহযোগ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। উহা প্রতিশোধমূলক হইবে না, এবং প্রয়োজন সম্পন্ন হইলেই উহা প্রত্যাহার করিতে হইবে। সামাজিক-বর্জ্জনের কোন চেষ্টা করা হইবে না। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কেও অসহযোগ করা চলিবে না। যাহাতে জীবন বিপন্ন হইতে না পারে, এবং কোনরূপ বিদ্বেষ-ভাবের সৃষ্টি না হইতে পারে—সেই ভাবে ইহা পরিচালিত করা যাইবে।

এই অস্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। নেতৃদিগকে একত্র হইয়া এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া একটি সুসম্পূর্ণ কার্য্যপদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে। বাঁচিয়া থাকিবার দাবীই মনস্তত্ত্বসম্মত দাবী। সসম্মানে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহারা কখন কখন প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবে; কিন্তু কোন একটি উদ্দেশ্যসাধনে তাহাদিগকে প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য আহ্বান করা হইলে তাহারা তাহাতে সাড়া দিবে না।"

দেশের নেতৃবর্গ এই প্রস্তাব কি ভাবে গ্রহণ করেন, তাহা জানা আবশ্যক; কিন্তু প্রস্তাবিত অসহযোগ-নীতি দ্বারা ঈপ্সিত ফল লাভ হইবে, এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার নিবৃত্তি হইবে, এরূপ আশা করা যায় কি? হয় ত ইহাতে অবস্থা আরও জটিল হইয়া উঠিবে, এবং রোগ অপেক্ষা ঔষধ সাংঘাতিক হইতে পারে।

কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদের পরমায়ু-বৃদ্ধি

আবার বড় লাট লর্ড লিন্‌লিথগো কেন্দ্রী ব্যবস্থা-পরিষদের স্থিতিকাল এক বৎসর বাড়াইয়া দিলেন। কেন্দ্রী রাষ্ট্রীয়-পরিষদের স্থিতিকালও ঐরূপ বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সুতরাং আগামী বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত কেন্দ্রী ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানগুলি বর্ত্তমান ভাবেই চলিতে থাকিবে। প্রকাশ, যুদ্ধের জন্য বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া এই প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল। এই যুদ্ধের সময় কানাডায় নির্ব্বাচন হইয়া গেল, মার্কিণেও নির্ব্বাচন হইল; তবে ভারতে নির্ব্বাচন হইলেই কি সকল কাজ পণ্ড হইত? আসল কথা, ভারতের লোকমত সম্পূর্ণ উপেক্ষিত এবং অনাদৃত, সুতরাং এইরূপ ব্যাপার অনায়াসেই ঘটিতে পারে। এই যুক্তিবলে প্রাদেশিক সরকারের নির্ব্বাচনও বোধ হয় স্থগিত হইবে। আদর্শ গণতন্ত্র!

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল

বাঙ্গালা সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলখানি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থাপিত করিবার পর হইতে ইহার বিরুদ্ধে জনসাধারণের যেরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে এরূপ আর কোন বিলের প্রতিকূলে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যবস্থা-পরিষদের সকল শ্রেণীর সদস্যরাই ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কংগ্রেসের সদস্যগণ, হিন্দু সভার সদস্যগণ, জাতীয় দলের সদস্যগণ, এবং তফশীলভুক্ত জাতির স্বাধীন মতাবলম্বী সদস্যগণ একবাক্যে ইহার প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেই জন্য সিলেক্ট কমিটী-গঠন-সময়ে এই সকল দলের কোন সদস্যই উহার সদস্য হইতে সম্মত হন নাই। এই কারণে এই বিলখানি পরিত্যাগ করাই সরকারের কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু তাহা না করিয়া সরকার যেন জিদের বশবর্ত্তী হইয়াই বিলখানি অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল করিয়া পাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সিলেক্ট-কমিটীতে বিবেচক দলের কেহ যোগ দিলেন না দেখিয়া সরকারের সিলেক্ট-কমিটী লজ্জিত হওয়া দূরের কথা, নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় সাধারণে যে দোষ দেখাইয়াছে, তাহাই যেন বর্দ্ধিত করিবার জন্য নিতান্ত ধৃষ্টতার সহিত মূল বিলখানির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। যে সম্প্রদায় প্রাদেশিক রাজস্বের শতকরা ৭৫ ভাগ দিয়া থাকেন, সে সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ পদদলিত করিয়া বোর্ডে মুস্লিম, ফিরিঙ্গী, এবং য়ুরোপীয়দিগের জন্য অত্যন্ত অধিক সদস্য নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন! সাধারণের পক্ষ হইতে বিলখানির বিরুদ্ধে প্রধানতঃ এই কয়টি আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল। যথা—(১) বিলখানি সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি লইয়া রচিত; (২) বোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধিকতর সদস্য নির্ব্বাচিত করা উচিত; (৩) শিক্ষা-সম্পর্কিত এবং বিশেষ বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লোক-দিগকে বোর্ডে গ্রহণ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই; (৪) য়ুরোপীয় এবং এংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের সদস্য-সংখ্যা অনাবশ্যক অধিক করা হইয়াছে; এবং (৫) বেসরকারী স্কুলসমূহের পরিচালকদিগের পক্ষ হইতে কোন সদস্য-নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। সিলেক্ট-কমিটী বোর্ডের সদস্য-নির্ব্বাচনের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছেন সত্য,—কিন্তু হিন্দুদিগের পক্ষে কোন সুবিধাই করেন নাই। তাঁহারা হিন্দু-সদস্যের সংখ্যা কমাইয়া এক জন দেশীয় খৃষ্টান এবং আর এক জন অন্য সম্প্রদায়ের সদস্য নিয়োগ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ফলতঃ, সিলেক্ট-কমিটীর সিদ্ধান্ত যৎপরোনাস্তি ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতার পরিচায়ক। সিলেক্ট-কমিটী সাড্লার কমিশনের পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। সিলেক্ট-কমিটী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে হীনপ্রভ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বিলখানির দোষাবহ অংশের দোষ আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে মিষ্টার ওয়ার্ডসওয়ার্থ শিক্ষা বিভাগের সহিত এত দিন সংশ্লিষ্ট, তিনিও বেপরোয়া হইয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন! ইহাতে হিন্দুর ক্ষতি যথেষ্টই হইবে,—কিন্তু হিন্দু মরিবে না। পরন্তু, ইহাতে ইহাই চিরকালের জন্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত থাকিবে যে, গণতন্ত্রকে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে এমন ভাবে দাঁড় করান যায় যে, উহা স্বৈরশাসন অপেক্ষা অধিকতর ভীষণ এবং প্রতিপক্ষের অনিষ্টকর হইতে পারে। ...ক্ষা হরণ

সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকারের প্রধান সচিব মিঃ ফজলুল হক বলিয়াছেন—লোক কি জন্য এই বিলখানির বিরুদ্ধে এত হৈ-চৈ করিতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই! বিলের সমালোচকগণ তাঁহাদের আপত্তির কারণ ঠিক ভাবে বলেন নাই। প্রধান মন্ত্রীর এই মন্তব্যের উত্তরে বঙ্গীয় শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন—এই বিলখানির বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার কারণ কি, তাহা বহু বক্তার বক্তৃতায়, এবং সংবাদ-পত্রাদির মন্তব্যে বিবৃত হইয়াছে। কলিকাতায় গত বৎসর ৬ই এবং ৭ই পৌষ যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে উহা চোখে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে।—উক্ত প্রেস-নোটে বলা হইয়াছে যে, বিলখানিতে দোষ কি হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য একটি কমিটী-নিয়োগ করা হইয়াছে। আচার্য্য রায় বলিয়াছেন—কমিটী-নিয়োগ খুব ভালই হইত, যদি কমিটী ঠিক ভাবে গঠিত হইত। কমিটী ঠিক ভাবে গঠিত হয় নাই। মিষ্টার ফজলুল হক এই বিল-খানির ধর্ম্মপিতা, এবং ডক্টর জেঙ্কিন্স বিলখানির জন্মদাতা; অথচ মিষ্টার হক হইয়াছেন ঐ কমিটীর সদস্য, এবং সভাপতি; আর ডক্টর জেঙ্কিন্স হইয়াছেন—উহার অন্যতম সদস্য। ইহা ভিন্ন ইহার বহু সদস্যই শিক্ষাবিষয়ে সরকারের প্রভুত্বপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। আর আগামী ১২ই শ্রাবণের মধ্যে 'ন দণ্ডে নবান্ন সারার মত' তাড়াতাড়ি এত বড় বিষয় সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্ত করাও সম্ভব নহে। এরূপ কমিটীর নিকট সুফল লাভের আশা করা যায় না।

ভারতে প্রস্তুত বিমান

মান্দ্রাজে বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান-বিমান নির্ম্মাণ কারখানায় প্রথম একখানি বিমান প্রস্তুত করা শেষ হইয়াছে। প্রকাশ, আগামী ৮ই শ্রাবণ তারিখে বিমানখানি ভারত সরকারকে প্রদান করা হইবে। বিমানখানি কিরূপ কার্য্যকরী হয়, তাহা শীঘ্রই পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। ভারতে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে সকল দিকেই সুফল ফলিতে পারে। উহাতে গ্রেট বৃটেনেরও বল বৃদ্ধি হয়; কিন্তু বৃটেন এখন পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতেছেন না!

বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারত-কথা

এক দল বৃটিশ রাজনীতিক ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার প্রতীকার সাধনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু সেই সংবাদ এরূপ সংক্ষিপ্ত ভাবে আমাদের দেশে প্রেরিত হইতেছে যে, সকল কথা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে মনে হয়, বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারত সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইতেছে, তাহার উত্তর প্রদান করিতে ভারতসচিবকে কিছু বিব্রত হইতে হইতেছে। গত ২২শে এপ্রিল পার্লামেণ্টে ভারত সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার অধিক অংশই এদেশে প্রচারিত হয় নাই। ভারতসচিবের প্রাথমিক বক্তৃতার পর অন্যান্য সদস্যের কথা, এমন কি, ভারতসচিবের উত্তর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই; প্রকাশ করা হইয়াছে—সংবাদপত্রের আকার-সঙ্কোচই ইহার কারণ। অথচ ঐ সকল আলোচনার মর্ম্ম জানিবার জন্য এদেশের লোকের আগ্রহ অল্প নহে।

গত ১০ই জুলাই কমন্স সভার সদস্য মিঃ সোরেনসেন প্রশ্ন করেন—বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে কি ভারতসচিব ভারতে রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগকে মুক্তি দান বা ক্ষমা করিলে যে রাজনীতিক সুবিধা হইবে—সে বিষয়ে বিবেচনা করিয়াছেন? ভারতে যে অচল অবস্থার অবসান হইতেছে না—তাহার অবসানের জন্য কোন নূতন কার্য্যপদ্ধতি বিবেচিত হইবে কি?"

এই প্রশ্নের প্রথম অংশের কোন উত্তর পাওয়া গিয়াছে কি না, সে সংবাদ এদেশে জানিতে পারা যায় নাই। শেষ অংশের উত্তরে ভারতসচিব বলিয়াছেন—তিনি মিঃ সোরেনসেনের মত গ্রহণ করিতে পারেন না; অর্থাৎ তাঁহার মতে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের প্রভাব ভারতে অচল অবস্থার উপর পতিত হয় নাই। এই সম্বন্ধে তিনি কবে বিবৃতি প্রদান করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব কেবল 'না' বলিয়াই নীরব হইয়াছিলেন। ভারত সম্বন্ধে ভারতসচিব যেরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে অভ্যস্ত, কমন্স সভার ভারতহিতৈষী সদস্যগণ আর কত দিন তাঁহার সেই ঔদাসীন্য নীরবে সহ্য করিবেন? ভারতসচিব পদত্যাগ না করিলে বা তাঁহার নীতির পরিবর্ত্তন না করিলে ভারতের প্রকৃত কল্যাণের আশা কোথায়? ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার সহানুভূতির পরিচয় কেহ কখন পাইয়াছেন?

—

সতীশচন্দ্র শর্ম্মা

২০শে আষাঢ় স্বনামধন্য কবিরাজ সতীশচন্দ্র শর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়) দাদামহাশয় ৮৯ বৎসর বয়সে বিনারোগভোগে সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন জানিয়া আমরা স্বজনবিয়োগবেদনা অনুভব করিয়াছি। সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনায় তিনি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি-বিধানে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ যত্নে বিশুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। সেই ঔষধের অসম্ভব উচ্চ মূল্য নির্দ্ধারিত করিতেন না—ব্যয়ের অনুপাতে বিতরণ বাদে অবশিষ্ট ঔষধের মূল্য স্থির করিতেন। তাঁহার কয়েকটি পেটেন্ট ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ ও বহুল প্রচারিত; কিন্তু তিনি পেটেন্ট ঔষধ-ব্যবসায়ী-দিগের মত কখনও সেগুলি সুলভ উপাদানে—কর্ম্মচারী বা ভৃত্যের দ্বারা প্রস্তুত করাইতেন না। তিনি আয়ুর্ব্বেদের মূলগ্রন্থ চরক-সংহিতার বিশদ সরল বঙ্গানুবাদ করিয়া বিরাট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বিভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তিনি বহু বৈদ্যসন্তানকে আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ ভাবে ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষাদান করিতেন। কলিকাতার বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ তাঁহার কৃতী ছাত্র। রোগী দেখিয়া, এমন কি, চিকিৎসার জন্য মফঃস্বলে গিয়াও তিনি কখনও দর্শনী লইতেন না—বলিতেন,—চিকিৎসার বিনিময়ে অর্থগ্রহণ ব্রাহ্মণের বৃত্তি নহে—মহর্ষি ভরদ্বাজ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-প্রণেতা, তিনি বৈদ্যসন্তানগণের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য এই বিদ্যা বংশপরম্পরাক্রমে দান করিয়া গিয়াছেন; আমি সেই ভরদ্বাজ ঋষিরই বংশধর; তবে মূল্যবান্ উপাদানে বিশুদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ন্যায্য মূল্য লইয়া থাকি—ইহাই যথেষ্ট।

যামিনীভূষণ-অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁহার যথেষ্ট অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ ছিল। পরে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ কলেজগুলিকে সম্মিলিত করিয়া বৃহৎ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য—সেখানে বিশুদ্ধ কবিরাজী-ঔষধপ্রস্তুত শিক্ষাদান ও আয়ুর্ব্বেদীয় গাছ-গাছড়ার উদ্যান-প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। সামাজিকতায়—আভিজাত্যে—পরকে ভালবাসিয়া আপন করিতে—ভোজনবিলাসে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত পশুপতি শর্ম্মা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ



সতীশচন্দ্র শর্ম্মা

অস্ত্র-চিকিৎসক—অধ্যাপক ও চিকাগোর এলিনোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কেদারনাথ শর্ম্মা সুযোগ্য কবিরাজ—আশা করি, তিনি পিতার যশ ও সাধনা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন। তৃতীয় পুত্র ডাক্তার ছিলেন—সম্প্রতি স্বর্গীয় হইয়াছেন। চতুর্থ পুত্র রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার; পঞ্চম পুত্র বিলাতে পাশ করিয়া চাটার্ড একাউন্টেণ্ট।

—

স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত

গত ১১ই আষাঢ় বুধবার প্রভাতে অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান গুরুসদয় দত্ত ৫৯ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক-গমন করিয়াছেন। গুরুসদয় বাবু সিভিলিয়ান হইলেও দেশের প্রকৃত হিতৈষী সুহৃদ্ ছিলেন, এবং অনেক সদনুষ্ঠান পরিচালিত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইল, এবং সেই ক্ষতি সহজে পরিপূরণের সম্ভাবনা অল্প। তিনি আসামের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশকে মনে-প্রাণে ভাল-বাসিতেন, এবং দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন

বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি মনে-প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন, এবং এরূপ নির্ভীক স্বাধীনচিত্ত ছিলেন যে, কোন অন্যায় দেখিলে পদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারিগণের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সম্ভবতঃ তিনি এই সকল কারণেই বিভাগীয় কমিশনার বা বাঙ্গালা সরকারের চীফ সেক্রেটারীর পদ-লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই; কিন্তু তাঁহার গুণের কথা তাঁহার স্বদেশবাসী দীর্ঘকাল স্মরণ রাখিবেন।



গুরুসদয় দত্ত

গুরুসদয় বাবু ব্রতচারী প্রচেষ্টার ও সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতি দ্বারা এদেশের নারীসমাজের বহু উপকার হইতেছে। তিনি দরিদ্র-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য দরিদ্রের দুঃখ-কষ্টে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। বঙ্গের প্রাচীন স্থাপত্যের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। যৌবন কালে কর্মময় জীবনের মধ্যে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়, এই পত্নীবিয়োগ-দুঃখ তিনি দেশহিতকর কর্মে লিপ্ত থাকিয়া বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতেন। তিনি একমাত্র পুত্র বিরুসদয় (বীরেন্দ্রসদয়)কে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সি, ওয়াই, চিন্তামণি পরলোকে

এলাহাবাদের সুপরিচালিত 'লীডার' পত্রের সম্পাদক সার চিরভুরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি ৬১ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কর্মবহুল জীবনের বিবরণ পাঠ করিলে তাঁহার কর্মশক্তির পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান ছিলেন, কখন কখন তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়াও খাইতে হইত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই; আঠার বৎসর বয়সে ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজার কলেজের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহার জন্মস্থান ভিজাগাপটমে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, সেই সময় হইতেই সংবাদপত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ। তিনি সাধনাবলে ক্রমশঃ এদেশের সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার



সি, ওয়াই, চিন্তামণি

করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ, সুদক্ষ, ও পরিশ্রমী সংবাদ-পত্রসম্পাদক এদেশে একান্ত বিরল।

সার চিন্তামণি বহু দিন যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১ ০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি উদারনৈতিক দলের প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ৯২১ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা ও শিল্প বিষয়ের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু গভর্ণর তাঁহার হস্তে অর্পিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় তিনি প্রচুর বেতনের মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। ইহাই তাঁহার স্বাধীনচিত্ততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি তৃতীয় নিখিল-ভারত সাংবাদিক-সম্মেলনের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদ ও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যথাক্রমে সাহিত্যে ও আইনে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। যদিও সরকার তাঁহাকে 'সার' খেতাবে সম্মানিত করেন; কিন্তু তাঁহার সম্পাদিত 'লীডার' পত্রিকায় তিনি কোন দিন সরকার সম্বন্ধে উচিত কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার পরলোকগমনে দেশের এক জন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের ও সংবাদপত্র-সম্পাদকের অভাব হইল। তিনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



২০শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৪৮ [৫ম সংখ্যা

অদ্বৈতবাদের মূল সন্ধানে

উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত। উপনিষদে যে চিন্তা পরিপূর্ণরূপে দেখা দিয়াছে, ঋগ্‌বেদসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক-সাহিত্যেই তাহার বীজ নিহিত আছে। বৈদিক-সংহিতায় বেদোক্ত দেবতার স্তুতি নিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল স্তুতিবাদের মধ্যে দেবতাবর্গের স্বরূপ, স্বভাব ও কার্য্যাবলী আলোচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে ঐ সকল দেবতার উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞের বিধান বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কর্ম্মযজ্ঞ। সংহিতার এই কর্ম্মযজ্ঞ আরণ্যকে ভাবনা-যজ্ঞে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, যজ্ঞীয় দ্রব্যসংগ্রহের কোন আড়ম্বর নাই। আরণ্যক সাধক মানস উপকরণে তাঁহার জ্ঞানযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন। আরণ্যকের চিন্তা প্রতীক বস্তুতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, প্রতীককে ছাড়িয়া ঐ চিন্তা তখনও উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে নাই। উপনিষদে ঐ চিন্তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। নাম ও রূপের রাজ্য ছাড়িয়া চিন্তার প্রবাহ তখন অরূপের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং নিরাকার, নির্ব্বিকার চিৎসমুদ্রে বিলীন হইয়া নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের কর্ম্মবিজ্ঞান আরণ্যক ও উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞানে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই জন্যই ভারতবর্ষে সংহিতার পর আরণ্যক ও উপনিষদের জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইয়াছিল। বৈদিক ঋষির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথমতঃই বৈদিক দেবতাবর্গের স্বরূপবিচার করা আবশ্যক। বৈদিক দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রধান। ইঁহাদের স্বভাব, স্বরূপ ও কার্য্যাবলীর বর্ণনায় বৈদিক-সংহিতা ভরপূর। ঐ বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রকৃতির রুদ্ররূপের বিভিন্ন অভিব্যক্তিকেই ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া বেদে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঝড়, ঝঞ্ঝা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্যা, দাবানল প্রভৃতি প্রকৃতির রুদ্রলীলাকেই বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার বিগ্রহ বলিয়া বেদে উপদেশ করা হইয়াছে। এই জন্যই কেহ কেহ বৈদিক আর্য্যগণকে জড় প্রকৃতির উপাসক বলিয়া নিন্দাও করিয়াছেন। কিন্তু বৈদিক দেবতাতত্ত্ব বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বৈদিক ঋষি জড় প্রকৃতির উপাসক নহেন। তিনি প্রকৃতি-শরীরে অতি-প্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রকৃতি-শরীরে এই যে বিভিন্ন অভিব্যক্তি সঙ্ঘটিত হইতেছে এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি চলিতেছে, ইহার

মধ্যেও একটি নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে ; ইহার পিছনেও অবশ্যই একজন কর্ত্তা ও শাসক আছেন, যাঁহার অলঙ্ঘ্য নিয়মে এই লীলাময়ী প্রকৃতি তাহার নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রপথে পরিচালিত হইতেছে। ঐ যে আকাশ-পথে চন্দ্র, সূর্য্য আবর্ত্তিত হইতেছে, স্রোতস্বিনী পৃথিবীর বুকে প্রবাহিত হইতেছে, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, এই দিনরাত্রির চক্র ঘুরিতেছে, এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অন্তরালে এক পরম দেবতা অবস্থিত আছেন। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতা ঐ পরম সর্ব্বান্তর্য্যামী অব্যক্ত দেবতারই ব্যক্তরূপ। ঐ দেবতাই জগতের কর্ত্তা, শাসক ও ভাসক। প্রাকৃতিক প্রত্যেক কার্য্যেরই একটি কারণ আছে। জগতের যিনি কর্ত্তা, তিনিই জাগতিক ঘটনাবলীর কারণ। তিনিই উহা সঙ্ঘটিত করান। এইরূপে জাগতিক কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া অলক্ষিত ভাবে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার বোধ পরিস্ফুট হয়। বিশ্বরাজ্যের এই নিয়ম ও শৃঙ্খলাকেই বেদে ঋত (course of things) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাপরম্পরার মধ্যে যেমন একটি অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়ম (Law of Nature) বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ মনোজগৎ ও আন্তর-জগতের মধ্যেও নিয়মের শাসন চলিতেছে। বহির্জ্জগতের কার্য্য-কারণ নিয়মকে যেমন ঋত বলা হয়, সেইরূপ আন্তরজগতের যে নিয়ম তাহাকেও ঋত বা সত্য বলা হয়। এই ঋতই বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির নাভিমূল বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছে(১) ; সুতরাং এই ঋতকে জানিতে পারিলেই অন্তঃ ও বহিঃপ্রকৃতির মূল জানা যায়। ক্রিয়াশীলা এই বহিঃপ্রকৃতির এই 'ঋত' বা মৌলিক তত্ত্ব জানিতে পারিলেই ক্রিয়ার স্বরূপ এবং কর্ম্মনীতি (Law of Karma) বুঝা যায়। আর, অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ম জ্ঞানের ফলে জগদাধার ঋত বা সত্য ব্রহ্মবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্য্য-কারণ-নিয়মের জ্ঞানোদয়ের ফলেই দার্শনিক পরীক্ষার সূচনা আরম্ভ হয় এবং বৈদিক দেবতাবর্গের মূলেও যে ঐরূপ দার্শনিক ভিত্তি বিদ্যমান আছে, ইহা বুঝা যায়। বিরাট্ বিশ্বপ্রকৃতি দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোক এই লোকত্রয়ে বিভক্ত। এই লোকত্রয়ের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতাবর্গকেও সাধারণতঃ দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকের দেবতা বলিয়া তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু এই বিভাগ পূর্ণাঙ্গ নহে, এতদ্ব্যতীত বৈদিক নানা দেবতার কল্পনাও বৈদিক-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি বিভিন্নমুখী উহার বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন দেবতার কল্পনা মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে। ফলে অনন্ত, অসংখ্য বৈদিক দেবতার উদ্ভব হইয়াছে। ঐ সকল বিভিন্ন দেবতাবর্গকে বেদে একই দেবতার মহিমা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের বিভিন্ন দেবতা-বর্গকে বসু, রুদ্র, মরুৎ, আদিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন গণদেবতার (class gods) পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া "বিশ্বে দেবাঃ" বা নিখিল দেবসমূহ বলিয়া এক বিরাট্ দেবতার কল্পনা করা হইয়াছে এবং সমগ্র দেবসমাজকে ঐ বিশ্বে-দেবতার বিশাল কায়ে একীভূত করা হইয়াছে। ইহা হইতে ঋগ্-বেদের নানা দেবতার অন্তরালে যে একত্বের সূত্র বিরাজমান, তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। বৈদিক দেবতাবর্গের স্বভাব ও কার্য্যাবলীর আলোচনার মধ্যে তাঁহাদের যে স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা তাঁহাদিগকে অশরীরী না বুঝিয়া শরীরী দেবতা বলিয়াই বুঝা যায় এবং তাঁহাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বর্ণনাও বৈদিক-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য পরবর্ত্তী কালে পৌরাণিক যুগে মনুষ্যাকৃতি দেবতার যে কল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে, বৈদিক সূক্তে দেবতার আকৃতির বর্ণনা থাকিলেও বৈদিক দেবতা মনুষ্যাকৃতি নহেন বলিয়া মনুষ্যাকৃতি পৌরাণিক দেবতা বা গ্রীসদেশের দেবতা হইতে বৈদিক দেবতার রূপ স্বতন্ত্র। এই দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া যে বৈদিকধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা প্রথমতঃ নানা দেবতাবাদ স্বীকার করিলেও পরিণামে বৈদিক বহু-দেবতাবাদ এক-দেবতাবাদেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। বৈদিক অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি নানা দেবতার মধ্যে যে দেবতা বিরাজ করেন, তিনিই পরমদেবতা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। শ্রুতিও স্পষ্টবাক্যে ঐ দেবতাকে 'তদেকম্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক চৈতন্যময়ী মহাশক্তিই জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে, দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণি-শরীরে,

১। ঋগ্বেদ ১.২.৮, ৪.৪০.৫, ৪.২৩.৮-১০, ১০,৬৫,৭,১০. ১৭৭.২, দ্রষ্টব্য।

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রে, এককথায় সমস্ত চরাচর জগতে নানা ভাবে ক্রিয়াশীলা হইতেছে। শক্তির এই লীলা যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী। তিনি বহুত্বের মধ্যে একত্বের, দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈতের সন্ধান পান। বৈদিক ঋষি এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বরুণ দেবতাকে স্তব করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "হে বরুণ! সমুদ্রজলে বাড়বাগ্নিরূপে তোমার যে তেজঃ ও শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, উহাই অন্তরিক্ষে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। ঐ তেজঃশক্তিই প্রাণি-জঠরে জঠরাগ্নিরূপে, প্রাণি-হৃদয়ে আয়ুঃশক্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছে। উহাই মেঘমণ্ডলে বিদ্যুদগ্নিরূপে বিরাজ করে, রণভূমিতে বীরহৃদয়ে শৌর্য্যাগ্নিরূপে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তোমার শক্তির লীলালহরী নানা ভাবে তাহার স্বীয় রূপের মধুধারা বর্ষণ করিতেছে।"(১)

বৈদিক দেবতাবর্গের মৌলিক শক্তি যে এক, তাহা ঋগ্বেদে তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫শ সূক্তে স্পষ্টতঃ ঘোষণা করা হইয়াছে—মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্।(২) সেখানে আরও বলা হইয়াছে যে, দেবতাবর্গের ঐ এক মৌলিক শক্তিই নানা পদার্থে নানা রূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। আকাশে, পৃথিবীতে, বনমধ্যে ও ওষধির মধ্যে একই শক্তি বিরাজ করিতেছে। আকাশে সূর্য্যরূপে যে শক্তির বিকাশ হয়, সেই শক্তিই আবার পৃথিবীবক্ষে অগ্নিরূপে, বনমধ্যে দাবানলরূপে, ওষধিবর্গের মধ্যে সঞ্জীবনী শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই শক্তিই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। জগদাধার এই মহাশক্তি অসীম ও অনন্ত। দেবতাবর্গ সেই অখণ্ড মহাশক্তির সখণ্ড অভিব্যক্তি। দেবতাবর্গের বাহ্য ও দৃশ্যরূপ স্বতন্ত্র বা নানা হইলেও ঐ বাহ্যরূপের অন্তরালে যে অখণ্ড চৈতন্যরূপ বিরাজ করিতেছে, ঐ রূপের যিনি সন্ধান পান, তাঁহার সমস্ত ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়। তিনি সর্ব্বত্রই ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করেন। এইজন্যই বেদে আমরা দেখিতে পাই যে, কার্য্যবর্গের স্থূল, দৃশ্যরূপে বৈদিক ঋষি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কার্য্যবর্গের অন্তরালবর্ত্তী অখণ্ড জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ঋষির প্রাণে ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি বলিতেছেন—"আমার মন ও বুদ্ধি, অতিদূরে অমৃত-জ্যোতির সন্ধানে চলিয়া যাইতেছে। হৃদয়-গুহায় অবস্থিত সেই অমৃত-জ্যোতির নিকটে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ তাহাদের ঐন্দ্রিয়ক বিজ্ঞান সকল উপহার অর্পণ করিয়া থাকে; অর্থাৎ সেই অমৃত-জ্যোতির সন্ধান পাইলে সমস্ত ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়।(১)

বৈদিক ঋষি ব্যক্ত ও স্থূলের মধ্যে অব্যক্তের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই জন্যই বৈদিকসংহিতায় সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাবর্গের স্থূল ও ব্যক্তরূপ ব্যতীত এক সূক্ষ্ম অব্যক্ত গূঢ় রূপের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। সূর্য্যকে বলা হইয়াছে যে, তাহার দুইটি চক্র (বা রূপ) আছে, একটি স্থূল চক্র, অপরটি সূক্ষ্ম চক্র। ঐ সূক্ষ্ম চক্র সূর্য্যের গূঢ় রূপ। এই রূপ সাধারণে জানিতে পারে না। ঋষিগণ তাঁহাদের ধ্যান-নেত্রে ঐ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।(২) ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে আমরা সূর্য্যের তিন প্রকার রূপের বর্ণনা দেখিতে পাই। একটি তাহার 'উৎ' বা উৎকৃষ্ট রূপ। ঐ রূপে সূর্য্য এই পৃথিবী-বক্ষে তাহার কিরণ বিকীর্ণ করে। দ্বিতীয়টি সূর্য্যের উত্তর বা উৎকৃষ্টতর রূপ। ঐ রূপে সূর্য্য অনন্ত আকাশে ও ঊর্দ্ধতমলোকে তাহার জ্যোতিঃ প্রকাশ করে। সূর্য্যের যাহা তৃতীয় রূপ, তাহা তাহার উত্তম বা উৎকৃষ্টতম রূপ। উহাই সূক্ষ্ম অমৃত-জ্যোতিঃ। ঐ অমৃত-জ্যোতির উদয়ও নাই, অস্তও নাই। ইহা সূর্য্যের নিগূঢ় ব্রহ্মরূপ।(৩) সূর্য্যের এই ব্রহ্মরূপের যিনি পরিচয় পান, তিনিই যথার্থ সূর্য্যতত্ত্ব জানিতে পারেন। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৪শ সূত্রে (জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ)

১। ধামন্তে বিশ্বং ভুবনমধিশ্রিতম্ অন্তঃসমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুষি। অপামনীকে সমিথে য আভৃত স্তমশ্যাম মধুমন্তং ত উর্ম্মিম্। ঋগ্‌বেদ ৪।৫৮।১১।

২। উল্লিখিত মন্ত্রাংশের অসুর শব্দের অর্থ বল, সামর্থ্য, সায়নভাষ্য দেখুন।

১। বি মে কর্ণা পতয়তো বিচক্ষু র্বীদং জ্যোতি হৃদয় আহিতং যৎ। বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ কিং স্বিদ্‌বক্ষ্যামি, কিমুনূ মনুষ্যে? ঋগ্‌বেদ ৬।৯।৬।

২। দ্বে তে চক্রে সূর্য্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ অথৈকং চক্রং যদ্ গুহা তদধ্যাতয় ইদ্‌বিদুঃ। ঋগ্‌বেদ ১০।৮৫।১৬।

৩। উদ্‌বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরম্। দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্। ঋগ্‌বেদ ১।৫০।১০।

সূর্য্য-জ্যোতিঃ যে স্থূল-জ্যোতিঃ নহে, ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'ন নিম্লোচ নোদিয়ায়' অস্তও যায় না, উদয়ও হয় না বলিয়া সূর্য্যের এই অমৃত-জ্যোতির কথাই বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্যের এই অমৃতরূপ দেখিবার জন্যই বৈদিক ঋষি ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে সূর্য্য! তোমার ঐ স্থূল রূপ ও রশ্মিসকল সংযত কর। ঐ স্থূলরশ্মি দ্বারা আবৃত তোমার যে কল্যাণময় রূপ আছে, আমি সেই রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি(১)।" সূর্য্যের এই কল্যাণময় রূপ যে তাঁহার আনন্দময় ব্রহ্মরূপ, ইহাতে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কোনই সন্দেহ নাই। সূর্য্যের অনুরূপ অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণেরও স্থূল ও সূক্ষ্ম এই রূপদ্বয়ের বর্ণনা ঋগ্বেদসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া বেদে বলা হইয়াছে—"হে অগ্নি! তোমার পরম কল্যাণময় নিগূঢ় রূপেই তুমি মৃত জীবকে স্বর্গে লইয়া যাও। তোমার কল্যাণময় রূপেই তুমি দেবতাদিগের নিকট যজ্ঞের হবি বহন করিয়া থাক। এইরূপেই তুমি "জাতবেদাঃ" অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে জানিয়া থাক। হে অগ্নি! তোমার যে নিগূঢ় সূক্ষ্ম রূপ আছে এবং তুমি যে উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছ, তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি।"(২) অগ্নি তাঁহার এই সূক্ষ্ম ব্রহ্মরূপেই যজ্ঞে আহূত হইয়া থাকে। যজ্ঞবিদ্গণ যজ্ঞের রহস্য অবগত হইয়া সেই ব্রহ্মাগ্নির উদ্দেশ্যেই আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (বেদান্তদর্শন ১।১।২৫ সূত্রভাষ্য) ঐতরেয় আরণ্যকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যাহারা ঋগ্বেদী, অর্থাৎ ঋগ্বেদের বিধানানুসারে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকল বিকারের মধ্যে সেই অবিকারী জগৎকারণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন। যাঁহারা যজুর্ব্বেদী, তাঁহারাও যজ্ঞীয় অগ্নির মধ্যে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই ধ্যান করেন। যাঁহারা সামবেদী, তাঁহারাও মহাব্রতে অর্থাৎ যজ্ঞে ব্রহ্মকেই ভজনা করেন।(১)

ইন্দ্রের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে—হে ইন্দ্র! তোমার দুইটি শরীর আছে, তন্মধ্যে একটি স্থূল ও ব্যক্ত, অপরটি সূক্ষ্ম ও নিগূঢ়। তোমার ঐ নিগূঢ় শরীর অতি বৃহৎ। ইহা বহু স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ঐ শরীরের দ্বারা তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ তুমি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহাও উৎপাদন করিয়াছ, তোমার ঐ শরীরটি প্রাচীন জ্যোতিঃ (প্রত্নং জ্যোতিঃ)-স্বরূপ। যজ্ঞকারী ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন (বুবুধানাঃ) তাঁহারাই ইন্দ্রের এই নিগূঢ় পদকে জানিতে পারেন। ইহা তাঁহার অমৃতময় পদ।(২) বায়ুর সূক্ষ্ম রূপকে উদ্দেশ করিয়া ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে বলা হইয়াছে যে, এই বায়ুই বিশ্ব ধারণ করে, বায়ুর ক্রোড়েই দেবতাসকল নিজ নিজ বিবিধ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই বায়ুই সমস্ত পার্থিব বস্তুকে ও আকাশস্থ জ্যোতির্ম্মণ্ডলকে বিস্তৃত করিয়াছে। কেহই এই বায়ুর জন্মকথা জানে না। মরুদ্গণ নিজেরাই কেবল নিজের জন্মকথা জানিতে পারেন এবং যাঁহারা ধীর ও বিদ্বান্, তাঁহারাই ইঁহাদের স্বরূপ বুঝিতে পারেন। রথচক্রের অর বা শলাকাসমূহ যেমন চক্রের নাভিপ্রদেশে সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ মরুদ্গণ নিখিল বিশ্বের যাহা নাভিমূল সেই পরব্রহ্মে সংযুক্ত রহিয়াছে।(৩)

এই রথচক্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বৈদিক দেবতাবর্গ

১। পূষন্নেকর্ষে যমসূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তেপশ্যামি।
বাজসনেয়ী সংহিতা ৪০।১৬। ঈশোপনিষদ্ ১।১৬।

২। যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামুলোকম্।
—ঋগ্বেদ ১০।১৬।৪
ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।
—ঋগ্বেদ ১০।১৬।৯
বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যৎ বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ।
—ঋগ্বেদ ১০।৪৫।২

১। এতং হ্যেব বহ্বৃচা মহত্যুক্থে মীমাংসন্তে, এতমগ্নাধ্বর্য্যবঃ, এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ। —ঐতরেয় আরণ্যক ৩।২।৩।১২

২। দূরে তন্নাম গুহ্যং পরাচৈঃ ঋগ্‌বেদ ১০।৫৫।১
মহত্তনাম গুহ্যং পুরুস্পৃক্ যেনভূতং জনয়ো যেন ভব্যম্।
প্রত্নং জাতং জ্যোতির্যদস্য প্রিয়ম্ ঋগ্‌বেদ ১০।৫৫।২
অবাচচক্ষুং পদমস্য সস্বরুগ্রং নিধাতু রন্বায়মিচ্ছন্।
অপৃচ্ছমন্যা উত তেম আহুঃ ইন্দ্রং নরোবুবুধানা অসেম।
ঋগ্‌বেদ ৫।৩০।২

৩। (ক) যস্যাদেবা উপস্থে ব্রতা বিশ্বাধারয়ন্তে ঋগ্‌বেদ ৮।৯৪।২
(খ) আযেবিশ্বাপার্থিবানি পপ্রথন্ রোচনাদিবঃ।
ঋগ্‌বেদ ৮।৯৪।৯
(গ) রথানাং ন যে অরাঃ সনাভয়ঃ। —ঋগ্‌বেদ ১০।৭৮।৪

যে একই পরমদেবতার আশ্রিত, তাঁহাতেই অবস্থিত, এবং তাঁহার শক্তিদ্বারাই অনুপ্রাণিত, এ কথা ঋগ্‌বেদে একাধিকবার বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বৈদিক যে কোন দেবতাই যে মূলতঃ সর্ব্বান্তর ও সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমদেবতা, ইহাই সূচিত হইয়া থাকে। অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া ঋগ্‌বেদে বলা হইয়াছে যে, "রথচক্রের নেমি যেমন অর বা শলাকাগুলির সহিত সংযুক্ত হইয়াই অবস্থান করে, অর্থাৎ নেমির বন্ধনে যেমন চাকার শলাগুলি নিবদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ হে অগ্নি! তোমার বন্ধনে সমস্ত দেবতা নিবদ্ধ রহিয়াছে। তুমি সকল দেবতায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছ। তোমাতে অবস্থিত থাকিয়া তোমারই সাহায্যে দেবতাগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। (১) তুমি বিভু, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী। তোমার ঐশ্বর্য্যই দেবতাদিগের ঐশ্বর্য্য। তুমিই দেবতাদিগের হৃদয়ে ধ্রুব-জ্যোতিঃরূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছ। সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ তোমাকেই তাহাদের আহৃত শব্দ-স্পর্শাদি বিবিধ বিজ্ঞান উপহার প্রদান করিয়া থাকে।" (২) এইরূপ ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে যে—"রথচক্রের নাভিতে যেমন চাকার শলাগুলি গ্রথিত আছে, ইন্দ্রশরীরেও সেইরূপ এই নিখিল বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। হে ইন্দ্র! তোমারই বল ও প্রজ্ঞার অনুসরণ করিয়া অন্যান্য দেবতাগণ প্রজ্ঞাবান্ ও বলশালী হইয়াছে। সমস্ত দেবতাই তোমাতে অবস্থিত, তোমার ব্রতই তাহাদের ব্রত, তোমার কর্ম্মই তাহাদের কর্ম্ম। তাহাদের যে নিজ নিজ শক্তি আছে তাহার মূলেও তোমার অনন্ত শক্তিই বিদ্যমান, তুমিই তাহাদের মধ্যে শক্তি আধান করিয়াছ।" (৩) বরুণ, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার সম্বন্ধেও বেদে অনুরূপ বর্ণনাই শুনা যায়। "রথচক্রের নাভিতে যেমন শলাকাগুলি গ্রথিত থাকে, বরুণ দেবের মধ্যেও সেইরূপ এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। হে বরুণ! কোন দেবতাই তোমার কর্ম্মের পরিমাপ করিতে পারে না।" (১) এইরূপ সোমদেবতাকে বলা হইয়াছে যে, "হে সোম! তেত্রিশ দেবতা তোমাতেই অবস্থিত আছে।" (২) বৈদিক দেবতাগণের উক্ত প্রকার বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদিক ঋষি যে কোন দেবতাকে অবলম্বন করিয়াই সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্য্যামী পরব্রহ্মকেই স্তব করিয়াছেন। তাঁহার ধ্যানদীপ্তনেত্রে প্রত্যেক দেবতা বিগ্রহেরই অন্তরালবর্ত্তী সেই সর্ব্বদেবময় সর্ব্বাধার ব্রহ্মতত্ত্বই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। নতুবা রথচক্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যে কোন বৈদিক দেবতাকেই যে অন্য সকল দেবতার আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায় না কি? এই সর্ব্বময় দেবতাকে ঋগ্‌বেদে অদিতি বলা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের ভাষায় অদিতিই আকাশ, অদিতিই অন্তরিক্ষ, অদিতিই পিতা, অদিতিই মাতা, অদিতিই পুত্র, যত কিছু দেবতা সমস্তই অদিতি, অদিতিই সমগ্র মানবসমাজ, এবং যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে সমস্তই অদিতি। (৩) এই অদিতিই পরব্রহ্ম।

একই সৎ ব্রহ্ম বস্তুকে ঋগ্‌বেদে নানা নামে নানা ভাবে অভিহিত করা হইয়াছে। এই অভিধানটি এতই স্পষ্ট যে, তাহা পাঠ করিলে বৈদিক দেবতাবর্গ যে সর্ব্ব-ব্যাপী সর্ব্বান্তর পরম ব্রহ্মেরই বাহ্য অভিব্যক্তি, সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। একই সদ্বস্তুকে তত্ত্বদর্শিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা (বায়ু) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন—একংসদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি

১। অগ্নে নেমিররানিব দেবাংস্ত্বং পরিভূরসি।—ঋগ্‌বেদ ৫।১৩।৬
ত্বয়া হি অগ্নে বরুণোধৃতব্রতো মিত্রঃ শাশদ্রেঅর্যমা সুদানবঃ।
যৎসীমনু ক্রতুনাবিশ্বথা বিভুঃ অরান্নেমিঃ পরিভূরজায়থাঃ।
—ঋগ্‌বেদ ১।১৪১।৯
ত্বে অগ্নে বিশ্বে অমৃতাসঃ অদ্রুহঃ, —ঋগ্‌বেদ ২।১।১৪
তব শ্রিয়া সুদৃশো দেব দেবাঃ। —ঋগ্‌বেদ ৫।৩।৪
২। ধ্রুবং জ্যোতির্নিহিতং দৃশয়েকং মনোজবিষ্ঠং পতয়ৎস্বন্তঃ।
বিশ্বেদেবাঃ সমনসঃ সকেতা একং ক্রতুমভিবিয়ন্তি সাধু।
—ঋগ্‌বেদ ৬।৯।৫
৩। অরান্নেমিঃ পরিতা বভূব —ঋগ্‌বেদ ১।৩২।১৫
বিশ্বে ত ইন্দ্র! বীর্য্যং দেবা অনুক্রতুং দদুঃ।—ঋগ্‌বেদ ৮।৬২।৭
যদ্দেবেষু ধারয়থা অসুর্য্যম্। —ঋগ্‌বেদ ৬।৩৬।১

১। যস্মিন্ বিশ্বানি কাব্যা চক্রে নাভিরিব শ্রিতা —ঋগ্‌বেদ ৮।৪১।৬
ন বাং দেবা অমৃতা আমিনন্তি,
ব্রতানি মিত্রাবরুণা ধ্রুবাণি। —ঋগ্‌বেদ ৫।৬৯।৪
২। তব ত্যে সোম পবমান নিণ্যে বিশ্বে দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ।
—ঋগ্‌বেদ ৯।৯২।৪
৩। অদিতি দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতি র্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতি র্জনিত্বম্।
ঋগ্‌বেদ ১।৮৯।১০।

(ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬), একই সদ্বস্তুকে পণ্ডিতেরা বহু রূপে বহু নামে কল্পনা করিয়া থাকেন। একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি (ঋগ্বেদ ১।১১৪।৫), একই অগ্নি বহু রূপে বহু স্থানে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। একই সূর্য্য নিখিল বিশ্বে আলোক বিকীর্ণ করে, একই উষা সকল বস্তুকে বিবিধ রূপে প্রকাশিত করে। একই (সদ্) বস্তু বিবিধ বস্তুর আকার ধারণ করে। (১) ঋগ্বেদোক্ত বিভিন্ন দেবতাবর্গ একই পরমদেবতার ছায়া বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-স্বরূপ।

উল্লিখিত বৈদিক মন্ত্রের বদন্তি, কল্পয়ন্তি প্রভৃতি ক্রিয়াপদের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে নানাত্ব এবং বহুত্ব যে কল্পনামাত্র, তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। যাহা কল্পনা, তাহা বস্তুতঃ সত্য হইতে পারে না, সুতরাং নানাত্ব সত্য নহে, একত্বই সত্য, ইহাই বেদমন্ত্রের তাৎপর্য্য। একের বহু রূপ যে মায়িক অভিব্যক্তি, তাহা ঋগ্বেদে অতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র মায়া দ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে (ঋগ্বেদ ৬।৪৭।১৮), এবং বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া পৃথগ্ভাবে প্রকাশিত হন। এক ইন্দ্রই সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধি। ইন্দ্রই পরমদেবতা, পরমেশ্বর। এই পরম দেবতাকে 'একং সৎ' বলিয়া শ্রুতিতে যে ক্লীবলিঙ্গে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই পরমদেবতা কোন বিশেষণে বিশেষিত হন না, কোন বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হন না, তিনি সর্ব্ববিশেষ-রহিত এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব।

১। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু রথোদিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।
ঋগ্‌বেদ ১।১৬৪।৪৬।
সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।
ঋগ্‌বেদ ১০।১১৪।৫।
যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি
ঋগ্‌বেদ ৮।৫৮।১।
এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধঃ একঃ সূর্য্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষা সর্ব্বমিদং বিভাতি একং বা ইদং বিবভূব সর্ব্বম্।
ঋগ্‌বেদ ৮।৫৮।২।

অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী এম-এ, পি, এইচ্, ডি, পি, আর, এস, কাব্যব্যাকরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

কৈশোর-স্মৃতি

আজি বন্ধু হয়েছ কৃপণ,
কৈশোরের ভালবাসা চির মিতালির আশা
কাঞ্চন-কৌলীন্য-ঘাতে হয়েছে স্বপন।
আজি পথে দেখা হ'লে দুটি ফাঁকা কথা ব'লে
অশ্বগতি যাও চ'লে পঙ্গু অছিলায়,
নিভেছে প্রেমের ধূপ, শুষ্ক আজি রসকূপ,
আজিকে ঝরে না উৎস হৃদয়শিলায়।
আজি হাত দিয়ে হাতে চলিতে পারো না সাথে
ভাব বুঝি লঘু হবে পদের গৌরব,
দেখা যদি বর্ষ পরে তবু তুমি পল তরে
অপচয় কর না'ক সময়-বৈভব।
দিন-ভ'র অবিরল কত কথা অনর্গল,
সে প্রীতি ফুরাবে কভু হয়নি'ক মনে,
ছিঁড়িয়া খাতার পাতা চিঠি লেখা আট পাতা,
আজ সে দিনের কথা আসে কি স্মরণে?
পাঁচ খানা পত্র দিলে জবাব আজ না মিলে
এত পর হ'তে পারে যে ছিল আপন!
হৃদয়ের বদান্যতা আজি দূর—দূরগতা,
যেন জন্মান্তর-কথা,—হয়েছে স্বপন।

বৃন্দাবন আর মধুপুর
কত আর দূর হায় ছাদে উঠে দেখা যায়,
তবু যেন মনে ভায় লক্ষ ক্রোশ দূর।
দেশের দশের মাঝে তব সিংহাসন রাজে,
হইয়াছ মানুষের মতন মানুষ,
আমি হতভাগ্য দীন বৈভব-গৌরব-হীন
আজো সেই উড়াতেছি রাখালী ফানুস।
কেহ বা নশ্বর দেহ হাকিম, খেতাবী কেহ,
কেহ বা বিলাতফের্ত্তা কেতাবী ডাক্তার,
কেহ হাইকোর্টচারী উজ্জ্বল গাউনধারী,
কেহ গবেষণা করি পেলে পুরস্কার।
আজি বন্ধু যাই হও চির দিন তাই নও,
কূজন করেছি মোরা একই তৃণ-নীড়ে,
লজ্জা পাও তাতে ভাই, এড়াইয়া চল তাই
অখ্যাত সে জীবনের এই সাক্ষীটিরে।
কৈশোরের কুঞ্জছায় ফলফুল-কামনায়
যেই প্রীতিবীজ মোরা করিনু বপন,
শুকাল অঙ্কুর তার 'যুগল পলাশ' আর
মেলিল না—সবি বন্ধু হয়েছে স্বপন।

শ্রীকালিদাস রায়।



৭

রাত্রে কল্লোলের ঘুম আর আসে না। মার্থার নিষ্ঠার কথায় বুক হইতে মাথা পর্য্যন্ত ভরিয়া আছে!

কল্লোল ভাবিতেছিল, মানুষকে আমরা যা ভাবি, সবাই তেমন নয়! কি বিচিত্র এই মানুষের মন!··· বিলকে মার্থা বিবাহ করিয়াছিল—নিমেষের মোহ! সেই বিলের জন্য দেশ ছাড়িয়া, আত্মীয়-বন্ধু ছাড়িয়া বর্ম্মায় আসিয়া স্বেচ্ছায় বেচারী এই নির্ব্বাসন-দুঃখ বরণ করিয়াছে! বিলের এমন কীর্ত্তি! এখন আবার সেই বিল আসিয়া অভাব জানায়, মার্থা তাকে টাকা দেয়। কিন্তু বিল যখন বলে, বিবাহকে এবারে পাকা করো, মার্থা তখন সবলে নিষেধ তুলিয়া বলে, না। মার্থা বলিল, যে-মানুষ একবার সেক্রেড-ট্রাষ্ট ভাঙ্গে, মনের ব্যাপারে তাকে আর কখনো বিশ্বাস করা যায় না!

মানুষ! বিশ্বাস!

মনে-মনে সে হাসিল। পৃথিবীকে মার্থা কি ভাবিয়াছে? নীতি-পুস্তক? না, ঠাকুরের মন্দির?

নিজের কথা মনে পড়িল! কি সে না করিয়াছে! তার প্রতি মার্থার মনে খানিকটা স্নেহ আছে, মমতা আছে!···মার্থা যদি কোনো দিন শোনে, কবিরা যাকে হৃদয় বলেন, সেই হৃদয়-বস্তুটা কল্লোলের নাই? নারীকে কল্লোল কি-চোখে দেখিয়া তার সঙ্গে কি ব্যবহার না করিয়াছে? আর সকলের কথা ছাড়িয়া দিলেও···

এই মা-শী! মা-শী কোনো অপরাধ করে নাই! কল্লোল অকারণে তাকে ছাড়িয়া···

এমনি চিন্তায় মন দারুণ অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল··· রগ্-মাথা ঝন্ঝন্ করিতে লাগিল! বিছানা ছাড়িয়া কল্লোল উঠিল; উঠিয়া খোলা জানলার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঘুমন্ত সহর···কোথাও কাহারো সাড়া নাই, শব্দ নাই! অথচ দিনের বেলায়···

কি রকম ভিড়! পাগলের মতো মানুষ ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়! কিসের জন্য ও-ছুটাছুটি? ভাবিল, জীবনে মানুষ কি চায়? অর্থ, খ্যাতি আর নারী! প্রথম-দু'টোর জন্য কল্লোল কোনো দিন লালায়িত হয় নাই! সে শুধু···

কিন্তু কি পাইয়াছে?···

নীচে হ্যবির ঘরের জানলায় চোখ পড়িল। জানলা খোলা। জীর্ণ ময়লা একখানা পর্দ্দা···ভিতরে আলো জ্বলিতেছে!

এত রাত্রে আলো জ্বলে কেন? আলো জ্বালিতে পয়সা খরচ হয়। হ্যবির এমন পয়সা নাই, রাত্রে ঘুমাইবার সময় ঘরে আলো জ্বালিয়া রাখিবে! কারো অসুখ করে নাই তো?

যদি করে, কল্লোলের কি?···

সুইচ্ টিপিয়া কল্লোল আলো জ্বালিল। আলো জ্বালিয়া বই খুলিয়া বসিল···এথেল মেনিনের লেখা একখানা উপন্যাস।

ক'পাতা পড়িয়া বই বন্ধ করিল। ভাবিল, যা-তা

ভাবিয়া রাত্রি জাগিবে, এমন পাগলামি আর যার সাজে সাজুক, তার সাজে না!

আলো নিবাইয়া কল্লোল বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া মার্থার ঘরে আসিল। কোনো উদ্দেশ্য লইয়া নয়, এমনি!

মার্থা নাই। বেয়ারা বলিল, নীচে হৃষি-বাবুর ঘরে অসুখ। মেম-সাহেবকে শেষ-রাত্রে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে···

তাই আলো জ্বলিতেছিল? কল্লোলের অনুমান ভুল নয়!

মিনিট-খানেক দাঁড়াইয়া কল্লোল কি ভাবিল। তার পর নামিয়া হৃষির ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে কাহারো কোনো সাড়া নাই, কোলাহল নাই!

কল্লোল দ্বারে টোকা দিল।

দ্বার খুলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল সতেরো-আঠারো বৎসর-বয়সের কিশোরী···গৌরী।

গৌরী বলিল,—কাকে চান?

কল্লোল বুঝিল, হৃষির মেয়ে! কিন্তু হৃষি তো ঐ মানুষ! তার মেয়ে এমন···কল্লোল ভাবে নাই! মেয়েটি দেখিতে বেশ!

কল্লোল বলিল—কারো অসুখ করেছে?

গৌরী বলিল—মার ছেলে হবে।

এই অসুখ! বিরক্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। তবু গৌরীর সামনে সে-বিরক্তি যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়া কল্লোল বলিল—কোনো ভয় নেই তো?

গৌরী বলিল—মার বরাবর এ-সময়ে খুব কষ্ট হয়।

কল্লোল বলিল,—মেম-সাহেব এসেছেন?

গৌরী বলিল,—হ্যাঁ।

কল্লোল বলিল—আমি এই বাড়ীতেই থাকি। যদি দরকার হয়, আমি···

গৌরী বলিল—দরকার হবে না।

গৌরীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভিতর হইতে হৃষি আসিল, কহিল—কার সঙ্গে কথা কইছিস্ রে?

গৌরীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই হৃষি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কল্লোলকে দেখিল। দেখিয়া সোৎসাহে বলিল,—আপনি! ও···আসুন।

কল্লোল বলিল—অসুখ শুনে খপর নিতে এসেছিলুম।

মৃদু হাস্যে হৃষি বলিল—অসুখ নয়। আমার পরিবার···মানে, লেবর-পেন্···

সে-হাসি দেখিয়া কল্লোল জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিল, হৃষির ঐ মুখে একটি ঘুষি মারিয়া বলে···

হৃষি বলিল—বসবেন?

কল্লোল বলিল,—না।

হৃষি বলিল—এক-পেয়ালা চা···

কল্লোল বলিল,—না। এ-বাড়ীতে এখন চায়ের পেয়ালা দিয়ে অতিথির অভ্যর্থনার সময় নয়। আপনি ভিতরে যান্।

হৃষি বলিল,—না। মানে, ভিতরে আমার যাবার দরকার নেই তো। মেম-সাহেব এসেছেন···দেখ্ছেন-শুন্ছেন। আপনি বসবেন না? ওরে গৌরী···

গৌরী ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে!

কল্লোল বলিল,—আমি বস্তে আসিনি। ভাবলুম, অসুখ···যদি কিছু করবার থাকে আমার!

হৃষি বলিল,—না···কি আর করবেন আপনি? তবে আজ হয়তো খেতে বেলা হতে পারে! মানে, গৌরীই রাঁধে কি না···তা ওকে ওদিকে একটু ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

কল্লোল বলিল,—আমার জন্য ভাবতে হবে না। আমি আজ খাবো না এখানে। আমার নেমন্তন্ন আছে ···সেই কথা বলতে এসেছিলুম।

হৃষি বলিল,—ও···

কল্লোল আর এক-মিনিট দাঁড়াইল না, সোজা চলিয়া গেল উপর-তলায় নিজের ঘরে। এবং বেশভূষা বদল করিয়া তখনি নামিয়া পথে বাহির হইল।

আসিল সোজা একেবারে অনাদির বাড়ী।

সামনেই দয়াময়ীর সঙ্গে দেখা। একগাদা বাসি কাপড়-জামা লইয়া বাহির হইয়াছে। দূরে আছে বস্তীর কল, সেই কলের জলে কাপড় কাচিবে।

দয়াময়ী বলিল,—বন্ধুর কাছে এসেছেন?

কল্লোল বলিল,—হ্যাঁ।

দয়াময়ী বলিল,—বাড়ী নেই।

—এর মধ্যে বেরিয়ে গেছে?

দয়াময়ী বলিল,—ভোরেই বেরুতে হয়। আপিস্ ও-পারে।

মৃদু হাস্যে কল্লোল বলিল,—অনাদি দেখ্‌ছি রীতিমত সংসারী হয়েছে!

দয়াময়ী বলিল,—না হয়ে করে কি! বয়েস হয়েছে ...এমন আরাম আর পাবে কোথায়? তৈরী খাবার, তৈরী বিছানা...

কল্লোল ভাবিল, ঠিক তো, আমাদের জীবনে ইহাই সত্যকার ফিলজফি!

আর মার্থা?

কল্লোল ফিরিবার উদ্যোগ করিল।

দয়াময়ী বলিল,—বন্ধু নেই বলে ফিরছেন।

কল্লোল বুঝিল, দয়াময়ীর ইচ্ছা, কল্লোল একটু বসে! সে কোনো জবাব দিল না।

দয়াময়ী বলিল,—আমাদের মানুষ বলে মনে করেন না, না?

কল্লোল ভাবিল, তুচ্ছ করিবার পাত্রী নয় অনাদির এই দয়াময়ী-গৃহিণীটি! বলিল,—তার মানে?

দয়াময়ী বলিল,—এতখানি পথ এসে ধূলো-পায়ে চলে যাচ্ছেন! আমাদের মানুষ বলে মনে করলে দু'দণ্ড বসতেন হয়তো!

কল্লোল বলিল—আপনাকে গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত দেখছি।

দয়াময়ী বলিল—আমি এখনি ফিরবো। আপনি বসুন গিয়ে। ছেলেদের ডেকে দি, আপনাকে বসাবে।

কল্লোল বলিল,—কিন্তু...

দয়াময়ী বলিল,—কিন্তু নয়। গিয়ে ভালো মানুষটির মতো বসুন। যে লক্ষ্মীছাড়া দেশ...এ তল্লাটে বাঙালী নেই! আপনি এসেছেন, দুটো দেশের কথা কবো, যদি গায়ে একটু বাতাস লাগে! গাধার মতো খেটেই মরছি চিরদিন...সত্যি গাধা নই!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাড়ীর দিকে চাহিয়া দয়াময়ী ডাকিল,—ওরে বুনো...ও কুনো...

ডাক শুনিয়া দুই ছেলে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। বুনো বলিল,—কি মা?

দয়াময়ী বলিল,—ওঁর বন্ধু...কলকাতার ভদ্রলোক। ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা...আর গঙ্গাকে বল্ গিয়ে, বাবুর জন্য চা তৈরী করে দেবে। বাসি-কাচা সেরে আমি এখনি ফিরছি।

কুনো-বুনোর সঙ্গে কল্লোলকে আসিতে হইল। কল্লোল আসিয়া ঘরে বসিল। কুনো-বুনো গেল গঙ্গাকে চায়ের কথা বলিতে।

বসিয়া কল্লোল ঘরের চারিদিকে চাহিল। ছোট ঘর। এক-ধারে বাঁশের তৈরী ছোট-একটা শেলফ্; শেলফে ক'খানা বাঙলা বই। কল্লোল ভাবিল, এই বইগুলিই বেচারীদের এখানে সঙ্গী-সহচর! দয়াময়ী বলিল বাঙালীর মুখ দেখিতে পায় না! মানুষকে পৃথিবীতে এমন করিয়াও বাস করিতে হয়!

মনে হইল, চারিদিকে সভ্যতার জয়-গান চলিয়াছে। সে-সভ্যতার অর্থ, ধনীর গৃহে দাস-দাসী, মোটর, ইলেক্‌ট্রিক, রেডিয়ো-পিয়ানো, পার্টির সমারোহ!...আর ঐ ধনীদের পাশেই ত্রিশ-কোটি ভারতবাসী শেয়াল-কুকুরের মতো কদর্য্য বিবরে বাস করিতেছে! আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য দূরের কথা...মুখে কোনো মতে ভাত-ডাল গুঁজিয়াই পড়িয়া আছে! ইহাদের কথা কে ভাবে?

কেন ভাবিবে? নিজের ভাবনা লইয়াই সকলে ব্যস্ত...

গঙ্গা চা লইয়া আসিল। একটা কাঠের টুলে চায়ের পেয়ালা রাখিয়া টুলখানা কল্লোলের সামনে আগাইয়া একটু-দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

কল্লোল দেখিল, মলিন মুখ। শত দুঃখেও এ-বয়সে মানুষের জীবনে দীপ্তি জাগিয়া থাকে! সে দীপ্তির চিহ্ন গঙ্গার মুখে-চোখে কোথাও নাই! ময়লা চিরকুট একখানা শাড়ী পরিয়া আছে। দু'হাতে দু'গাছা করিয়া চার-গাছা কাচের চুড়ি...অঙ্গের কোথাও আর কোনো আভরণ নাই!...

গঙ্গার পানে চাহিয়া গঙ্গাকে ঘিরিয়া এমনি শত চিন্তা...

গঙ্গা সে-দৃষ্টি লক্ষ্য করিল; লজ্জায় তার সর্ব্বাঙ্গ ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। চলিয়া যাইবে···কিন্তু ভদ্রলোক অতিথি ···শুনিয়াছে, অনাদির বন্ধু···যাইতে পারিল না! কোনো মতে সে বলিল,—চা খান···

এ-স্বরে কল্লোল চমকিয়া উঠিল। মৃদু হাস্যে কহিল, — ও···হ্যাঁ, চা···

চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিল। এক-চুমুক পান করিয়া কল্লোল বলিল,—কাল ভেবেছিলুম, আপনি বুঝি মৌন-ব্রত নিয়েছেন! আজ দেখ্‌ছি, তা নয়···কথা কইতে জানেন!

গঙ্গা এ-কথায় বিচলিত হইল না। সে জানে, পুরুষ-মানুষের এমনি মিষ্ট-মধুর কথার পুঁজির অন্ত নাই! এমনি কথায় নির্ব্বোধ মেয়ে-জাত কত সহজে নিজেকে ভুলিয়া যায়!···গঙ্গা কোনো জবাব দিল না।

কল্লোল বলিল,—কাল অনাদির মুখে আপনার কথা শুনলুম। ভারী করুণ!···আচ্ছা, এখন আপনার ইচ্ছা হয় না থিয়েটারে ফিরে যেতে? একটা কেরিয়ার··· আপনার খুব নাম হয়েছিল, শুনলুম···

গঙ্গা এ-কথারো জবাব দিল না···শুধু মুখ নত করিয়া রহিল।

কল্লোল ভাবিল, আলাপ করিবার ইচ্ছা নাই! তার মন রুখিয়া উঠিল! এ-অবহেলা সে কোনো দিন মানে নাই···এমন অবহেলা কখনো পায় নাই!

কল্লোল বলিল,—আপনার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের অনেকখানি মিল আছে। আপনি যেমন দাগা পেয়েছেন, আমিও তেমনি পেয়েছি···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কল্লোল চুপ করিল, চুপ করিয়া গঙ্গার পানে চাহিল। গঙ্গা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে···তবু উৎকর্ণ হইয়া কল্লোলের কথা শুনিতেছে। গঙ্গার নাকের ডগা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে!

কল্লোল বলিল—আপনি ভাবেন, পুরুষ-মানুষই শুধু কাপট্য জানে! তা নয়। আপনাদের মধ্যেও অনেকে···

গঙ্গা দাঁড়াইল না···তীক্ষ্ণ তীরের মতো একটা চকিত দৃষ্টি কল্লোলের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বাতাসের ঝলকের মতো চলিয়া গেল।

কল্লোল মনে-মনে হাসিল। ভাবিল, থিয়েটার ছাড়িলেও থিয়েটারী-ভাবে তোমার মন এখনো ভরিয়া আছে! দেখা যাক···আমারো পণ, তোমার ঐ মনকে আমার পানে···

চায়ের পেয়ালা পড়িয়া রহিল। কল্লোল ভাবিল, এখন ওঠা যাক···

বাহিরে দয়াময়ীর কণ্ঠস্বর! দয়াময়ী বলিল,—বাবুকে চা দেছে তোর মাসি? হ্যাঁরে ও বুনো···

ও-দিক হইতেই বুনোর স্বর শুনা গেল,—হ্যাঁ।

তার পর দয়াময়ীর কণ্ঠ—এই যে গঙ্গা···ও মা, তুই এখানে! ভদ্রলোককে একা বসিয়ে রেখে এসেছিস্‌! একটু খাতির-যত্ন···

উত্তরে গঙ্গা কি বলিল, শুনা গেল না।

কল্লোল কৌতুক-ভরে উৎকর্ণ বসিয়া রহিল।

দয়াময়ী ঘরে প্রবেশ করিল, কহিল,—খুব শীগ্‌গির আসিনি?···কিন্তু ও কি! চা যেমন, তেমনি রয়েছে! ভালো হয়নি বুঝি?···আচ্ছা, আমি নিজে তৈরী করে দিচ্ছি। এখানকার যা-তা চা কি বাবু-মানুষদের মুখে রোচে!

হাসিয়া কল্লোল বলিল—তা নয়। চা ভালোই তৈরী হয়েছে।

দয়াময়ী বলিল,—তা সত্যি, গঙ্গা চা তৈরী করে ভালোই। সৌখীন হয়েই তো একদিন বাস করেছিল। বলে, হুঁঃ···! তা হ'লে চা খেলেন না কেন?

কল্লোল মিথ্যা কথা বলিল। বলিল,—একবার চা খেয়ে বেরিয়েছি···আবার খাবো!

দয়াময়ী বলিল,—তাহ'লে বেশ, এ-বেলা এখানে দু'টি ভাত খেয়ে তবে যেতে পাবেন!···না খেয়ে গেলে ছাড়বো না। শেষে ও-বেলায় আপনার বন্ধু এসে আমায় বকবে! বলবে, বন্ধুকে খাতির-যত্ন করোনি?···তবে এখানকার ভাত···বুঝছেন তো···আমরা গরীব···যাকে বলে রেঙ্গুনের মোটা-দানা—লাল চালের ভাত! তা হ'লেও খেতে বেশ মিষ্টি। আমাদের আর খারাপ লাগে না! আগে মুখে দিতে পারতুম না···বোকড়া-বোকড়া দানা···

দয়াময়ী ছাড়িল না। কল্লোলের যাওয়া হইল না। দয়াময়ী বলিল,—চান করবার জল ঠিক করে দিক গঙ্গা।

বলেন তো ইরাবতীতেও চান করতে পারেন। যা আপনার খুশী…

কল্লোলের বুকের মধ্যে শয়তান ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল…বহু দিন পরে আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া সে জাগিয়া বসিল। কল্লোল বলিল,—ইরাবতীতেই চান করবো। আমাকে শুধু চান করবার জন্য একখানা কাপড় দেবেন!

দয়াময়ী বলিল—গন্ধ-তেল নেই…কিন্তু সাবান আছে।

কল্লোল বলিল—সাবান কি হবে?

বিস্ময়ে দু'-চোখ কপালে তুলিয়া দয়াময়ী বলিল—ও-মা…কলকাতার সৌখীন বাবু…সাবান মাখবেন না?

হাসিয়া কল্লোল বলিল—না। কলকাতা ছাড়বার সঙ্গে সাবান ছেড়ে দিয়েছি।

দয়াময়ী বলিল—আমারও ঐ দশা!…সাবান-সেণ্ট… ও-সব সখ গেছে। সাবানের মায়া শুধু ঐ গঙ্গা এখনো ছাড়তে পারেনি। বলে, না দিদি, সাবান না মাখলে নেয়ে স্বস্তি পাই না।

৮

আহারাদি শেষ হইল; তবু কল্লোলের যাওয়া হইল না। দয়াময়ী সযত্নে বিছানা বিছাইয়া দিয়া বলিল—খেয়ে উঠলেন্…একটু গড়িয়ে নিন। তার পর না হয় যাবেন! কত কথা কবো, ভেবেছিলুম…

কল্লোল বলিল—কি করে কথা কবেন! খাতির-যত্ন করতেই সারাক্ষণ ব্যস্ত!

দয়াময়ী বলিল—ভারী তো খাতির যত্ন!

কল্লোল বলিল—বিশ্বাস করুন, এর আগে অনেক ধনী-বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ পেয়ে সে-নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছি, কিন্তু এমন আনন্দ কোথাও পাইনি! রান্নাবান্নাও চমৎকার। এখানে এসে অবধি…

দয়াময়ী বলিল—গঙ্গা সব নিজের হাতে রেঁধেছে। ও রাঁধে ভালো। তবে পুঁজি তো ঐ ভাত-ডাল আর কচু-বেগুন তা দিয়ে কি-মেওয়া রাঁধবে, বলুন?

গঙ্গা ছিল বাহিরে দ্বারের অন্তরালে, কল্লোল বুঝিল। তাকে শুনাইয়া কল্লোল বলিল,—বললুম তো রান্না…লোক-বলে, পরিপাটী!…তাছাড়া আয়োজনে-সমারোহে খাওয়ার তৃপ্তি নয়…তৃপ্তি এই মমতা-যত্নে! জানেন তো, আমাদের নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ খেয়ে সবচেয়ে পরিতোষ পেয়েছিলেন বিদুরের ঘরে…বিদুর বেচারা তাঁকে খাইয়েছিলেন চালের অন্ন নয়—খুদ!

সলজ্জ বিনয়ের ভঙ্গীতে দয়াময়ী বলিল—জানি, কথায় বলে, বিদুরের খুদ!…কিন্তু ও-কথা থাক্, এখন আপনার যাওয়া হবে না…আমি এখনি সংসার তুলে আসছি। একটু গল্প করবো…বুঝলেন?

কল্লোলের যাইবার তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি বলিয়া থাকিবে? ভাবিতেছিল…

কল্লোল বলিল—বেশ, আমি বস্‌ছি। আপনি যান, খেয়ে-দেয়ে নিন গে। আপনি খাবেন, আপনার গঙ্গাও খায়নি নিশ্চয়!

দয়াময়ী বলিল—না…

—দু'জনে তাহলে চট্‌পট্‌ খেয়ে নিন…আধ ঘণ্টার মধ্যে। না হলে আমি কোনো খাতির-ভদ্রতা মানবো না…চলে যাবো।

হাসিয়া দয়াময়ী বলিল—সব শেয়ালের এক রা। গোঁ দেখ্‌ছি বন্ধুর মতো। ও-ও অমনি…

বাধা দিয়া হাসিয়া কল্লোল বলিল—আপনার পতি-প্রেমের গল্প পরে শুনবো…এখন আর একটি কথা নয়…খান্‌গে যান্। বেলা বারোটা বেজে গেছে, খেয়াল আছে?

এ-কথার পর দয়াময়ী আর দাঁড়াইল না।

এটি অন্য ঘর। অনাদির শয়ন-ঘর। এ ঘরখানিও ছোট। ঘর জুড়িয়া একখানা তক্তাপোষ। তক্তাপোষের উপর বিছানা। ময়লা চাদরের উপর রঙ্গীন একখানা সুজ্‌নি বিছাইয়া তার মালিন্য যথাসম্ভব ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে…ঢাকিয়া রাখিলেও সুজনির জীর্ণ অঙ্গ ভেদ করিয়া ময়লা চাদর করুণ দীন নয়নে উঁকি দিতেছে।

ঘরের দেওয়ালের গায়ে ক'টা কাঠের বাক্স ঘাড়াঘাড়ি বসানো আছে। সব-উপরকার বাক্সটা যেন হার্ম্মোনিয়মের বাক্স!

কৌতূহল হইল। বাক্সর ডালা টানিতে ডালা খুলিয়া গেল। ভিতরে একটা বক্স-হার্ম্মোনিয়ম। অনাদি গান গায়। গানের সখ এত দুর্দ্দশাতেও তাকে ত্যাগ করে নাই!

কল্লোল হার্ম্মোনিয়ম বাহির করিল। করিয়া রীড টিপিল। হার্ম্মোনিয়ম সাড়া তুলিল···স্পষ্ট মধুর সাড়া।

রীড টিপিতে টিপিতে কল্লোল নিজের অজ্ঞাতে গান ধরিয়া দিল,—

তোমার গোপন কথাটি সখি
রেখো না মনে,
শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে···

গাহিতে গাহিতে কণ্ঠ কখন্ দীর্ঘদিনের জড়তা ভুলিয়া নিজেকে মুক্ত উৎসারিত করিয়া দিয়াছে···

গান শেষ হইলে কল্লোলের চেতনা ফিরিল!

চাহিয়া দেখে, দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে গঙ্গা···গানের সুরে সে যেন আর এ জগতে নাই! সুরের মায়ায় বিভোর-বিহ্বল···

কল্লোল নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল গঙ্গার পানে ···অনেকক্ষণ। গঙ্গা একটা নিশ্বাস ফেলিল···ও-দিক হইতে দয়াময়ী ডাকিল—গঙ্গা···

গঙ্গা বলিল—যাই···

গঙ্গা চলিয়া গেল।

খোলা জানলা দিয়া কল্লোল চাহিয়া রহিল বাহিরের দিকে। কচি বাঁশের একটু ঝোপ। তার পাশে বস্তীর আর-একখানা বাড়ীর খানিকটা দেখা যাইতেছে···একজন বর্ম্মীজ-রমণী কাঠের মস্ত ডাণ্ডা মারিয়া ধান কুটিতেছে।

কল্লোলের মনে হইল, এরাও মানুষ···ইহাদের বুকের মধ্যেও মন আছে! সে-মনের শক্তির সীমা নাই! সে-মনের অস্তিত্ব এরা কোনো দিন অনুভব করিল না! ঐ স্ত্রীলোক···নিত্যদিন বাঁধা-রুটিনে ধান কুটিয়া, ধান সিদ্ধ করিয়া জঠরে সন্তান ধরিয়া জীবন কাটাইতেছে!

আর এই গঙ্গা? গান শুনিয়া ছুটিয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দ্বারের পাশে! গঙ্গার মনে ও-গান কি মায়া রচিয়া তুলিল?···গান যে গাহিতেছে, তার সামনে তবু আসিতে পারিল না!···লজ্জা? ভয়?

কিসের ভয়? কেন এ লজ্জা? মানুষে-মানুষে বিশ্বাসের সম্পর্ক কোনো দিন গড়িয়া উঠিবে না? একজন আর-একজনকে চিরদিন লজ্জা করিয়া, ভয় করিয়া চলিবে? অথচ শিক্ষা আর সংস্কারের নামে আমরা জয়-ধ্বনি করি···সে-শিক্ষা, সে-সংস্কার মানুষের মনকে কোনো দিন এই ভয়-লজ্জার ঊর্দ্ধে তুলিতে পারিবে না?

মনে হইল, মানুষের সঙ্গে···ঐ যে ও-বাড়ীর কোণে ঐ কুকুরটা শুইয়া আছে···কোনো প্রভেদ নাই! একই রুটিন মানিয়া একই ধারায়···মানুষ আর কুকুর জীবনাতিপাত করিতেছে! স্বার্থে আঘাত লাগিলে দু'জনে তোলে একই-রকম চীৎকার···আদর করিয়া গায়ে একটু হাত বুলাইলে দু'জনেই বিগলিত হইয়া পায়ের কাছে শুইয়া পড়ে!

সে নিজে···এতদিন কি করিল? কি পাইল?··· বুকের মধ্যে সেই অতৃপ্তি, সেই ক্ষুধা, সেই পিপাসা সমানে জাগিয়া আছে! এত রকম বৈচিত্র্যেও কোনো দিন এ ক্ষুধা-পিপাসার নিবৃত্তি হইল না! মনকে দু'দিন প্রাচীরের আড়ালে কোনোমতে ধরিয়া রাখে, তার পর···

আজ এ-মন আকুল হইয়াছে এই গঙ্গার জন্য! গঙ্গার দিকে মনের গতি হয়তো এমন হইত না··· নিজেকে গঙ্গা যদি অমন রহস্যের আবরণে এমন করিয়া আবদ্ধ না রাখিত!···

এমনি বিচিত্র চিন্তা-ধারায় মন স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল···

দয়াময়ী আসিয়া বলিল—এ কি, গট্ হয়ে ঠায় বসে আছেন! একটু গড়িয়ে নিলে পারতেন তো!

ঊর্দ্ধ-আকাশ হইতে মন অতর্কিতে মাটীর পৃথিবীতে আসিয়া পড়িল!

কল্লোল চাহিল দয়াময়ীর পানে···

দ্বারের পানে চাহিয়া দয়াময়ী কহিল—আয় না গঙ্গা!···মেয়ের লজ্জা দেখে আর বাঁচি নে!

দয়াময়ীর কথায় কল্লোল দ্বারের দিকে চাহিল। দ্বারের আড়ালে আঁচলের প্রান্ত···

কল্লোলের মনে হইল, গঙ্গা যেন জয়-পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে! কল্লোলের মনে চিরদিন যে-দর্প, যে-অহঙ্কার···তার পরাজয়ে গঙ্গার বিজয়-নিশান!

হাসিয়া কল্লোল কহিল—আমাকে ওঁর ভয় করে। গান শুনছিলেন···তাও দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে! সামনে আসতে পারেননি···অথচ সামনে এলেন-গেলেন, খাওয়ালেন দাওয়ালেন!

ঠোঁট উল্‌টাইয়া দয়াময়ী বলিল—হ্যাঁ! বলে, ভয় করে। তাও বলি, ভয় যদি করে, তাতে ওর দোষ নেই! একদিন এই ভয় করেনি বলেই তো আজ পথে এসে দাঁড়িয়েছে!

কল্লোল বলিল—মানে?

দয়াময়ী বলিল,—তা নয় তো কি! সে-হতভাগাকে যদি বিশ্বাস না করে ভয় করতো, সন্দেহ করতো, তাহলে নিজের সব খুইয়ে আমার এখানে এমন মলিন মুখে আজ ওকে পড়ে থাকতে হতো না।

কল্লোল একবার দ্বারের দিকে চাহিল। তার পর বলিল,—কিন্তু উনি এখানে এলেন কেন?

দয়াময়ী বলিল,—সে বললে, ভালোবাসি, বিয়ে করবো···দেশে বিয়ে হলে কেউ মানবে না···সকলের কাছে ঠ্যালা হয়ে থাকতে হবে!···ও অমনি সে-কথায় ভুলে গেল!···বেচারী! বিয়ের লোভে সংসারের লোভে থিয়েটারের অত টাকা মাইনে, নাম-যশ—সব বিসর্জ্জন দিয়ে এখানে চলে এলো! একবার ভাবলে না! আমি তাই বলি, যে-মেয়ে থিয়েটার করে, তাকে যদি কেউ বলে ভালোবাসি, বিয়ে করবো···তাহলে সে-মেয়ে কি বলে সে-কথা বিশ্বাস করে?

কল্লোল বলিল—কেন? এমন কখনো হয় না? উপায় নেই বলে অনেকে হয়তো থিয়েটারে কিম্বা একালের এই সিনেমায় চাকরি করছে···তার যদি সাধ হয়, বিয়ে-থা করে স্বামীকে ধরে ঘর-সংসার পাতবে?···তেমনি কোনো পুরুষ-মানুষও যদি সেই মেয়েকে বিয়ে করতে চায়···

দয়াময়ী বলিল—আমি হলে? আমার মনে তখনি সন্দেহ হবে যে, সমাজ-সংসারে লক্ষ গণ্ডা মেয়ে থাকতে আমাকে বিয়ে করবার এত ইচ্ছা কেন?

এ-কথায় দয়াময়ীর পরিচয় কল্লোলের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিল। কল্লোল বলিল—কিছু মনে করবেন না ···এই যে অনাদি···আপনাকেও তো পথে কুড়িয়ে পেয়েছে···সমাজ-সংসারের চৌহদ্দি থেকে নিয়ে আসেনি ···তাতে আপনার বা অনাদির কোন্‌খানটায় অসুবিধা হয়েছে, বলতে পারেন?

একটা নিশ্বাস দয়াময়ী রোধ করিতে পারিল না! নিশ্বাস ফেলিয়া দয়াময়ী বলিল—আমি যে কত সহ্য করি ···কি বালির বাঁধ দিয়ে সমুদ্দুরের ধারে বাস করছি··· তা আমিই জানি!···বুঝলেন কল্লোল বাবু, আপনার এই বন্ধু···কিন্তু থাক সে সব কথা···হ্যাঁ, খেতে বসে-ছিলুম···আপনি গান গাইছিলেন, শুনছিলুম। খেতে-খেতে গঙ্গা উঠে এলো···বললে, কি চমৎকার গান দিদি! ···তা এখন দু'-একটা গান গান্ না···

কল্লোলের বিস্ময়ের সীমা নাই! এই দয়াময়ী গান শুনিবে? গান বুঝিবার মতো মন দয়াময়ীর আছে না কি?

কল্লোল বলিল,—আপনি সত্যি গান শুনবেন? গানে এত অনুরাগ?

দয়াময়ী বলিল—আমার নয়। গঙ্গা বলছিল···ও গান ভালোবাসে···নিজেও গাইতে জানে! এক-কালে ওর গানে সহরে সকলে ধন্যি-ধন্যি করেছে কত!··· আপনার বন্ধু বলে, গান ছেড়ে দিচ্ছ কেন, গঙ্গা? চর্চ্চা রাখো···সারা-জীবন পড়ে রয়েছে···এই গান থেকেই আবার সব পাবে তুমি!···গঙ্গা হাসে। হেসে বলে, কে আমার গান শুনতে এই বনে আস্‌বে, দাদা?

কল্লোল ভাবিল, এমন! বলিল,—বনে আমি এসেছি ···আমাকে গান শোনাতে আপত্তি আছে? না, শোনালে দোষ হবে?

দয়াময়ী বলিল,—দোষ আবার কি!···সত্যি, আয় না গঙ্গা···কি মিছে লজ্জা করে জুজু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি! আয়···আমি আছি···আমার সামনে লজ্জা কিসের?

কল্লোল কহিল,—হ্যাঁ, আসুন···বিশ্রামের সময়টুকু গানে-গানে ভরে দেওয়া যাক। তা ছাড়া আমাকে ভয় করবেন না···আমি মানুষ···অনাদির মতো মানুষ। অনাদিকে যদি ভয় না হয়···

দয়াময়ী বলিল,—সত্যি তো। আয় গঙ্গা···

গঙ্গা আসিল···কম্পিত-পায়ে, রাজ্যের লজ্জা গায়ে জড়াইয়া···

দয়াময়ী বলিল—বোস্···

গঙ্গা বসিল দয়াময়ীর কাছে।

দয়াময়ী বলিল—আপনি গান্ কল্লোল বাবু। যে-গান গাইছিলেন, ঐটেই গান্। গঙ্গা বললে, একদিন ও-গান ও গেয়েছে কলকাতায় থাক্‌তে···সুরটা ভালো মনে নেই। আপনি গাইলে শুনে শিখবে!

কল্লোল চাহিল গঙ্গার পানে, বলিল—আপনার গলা না শুন্‌লে ফিরে-ফিরতি ও-গান গাওয়া চলবে না!

দয়াময়ী বলিল,—আপনি তো খুব অহঙ্কারী দেখ্‌ছি!

কল্লোল কহিল—আপনার বোনটিও কম অহঙ্কারী নন্। আপনার এখানে হু'দিন আমার আসা-যাওয়া··· উনি আমাকে চা খাওয়ালেন, যত্ন করলেন···কিন্তু আমাকে এমন বিভীষিকা ভেবে রেখেছেন যে, কথা কবেন না!

দয়াময়ী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। কহিল,—সত্যি গঙ্গা! না···এ তাহলে তোমার অন্যায়···বন্ধু লোক···মানী লোক···ওঁর সঙ্গে কথা কইলে কি তোমার মহা-পাতক হবে?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কল্লোলের পানে চাহিয়া দয়াময়ী বলিল,—ও অমনি, বুঝলেন কল্লোল বাবু···কারো সামনে বেরোয় না···কারো সঙ্গে কথা কইবে না···ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবে!···ওঁর আপিসে কাজ করে মলিন বাবু···হু'তিন দিন তিনি ওঁর কাছে কি কাজে এসেছিলেন··গঙ্গা তাঁকে চা করে দিলে, খাবার করে দিলে···কিন্তু ঐ···যেন কাঠের পুতুল! ভদ্রলোক কথা কয়ে জবাব পাননি বলে আমাদের কাছে বলে গেলেন··· খাশা একটি পুতুল এনে ঘর সাজিয়ে রেখেছেন তো!

এমনি নানা কথার পর জিদ আর রক্ষা পাইল না··· গঙ্গাকে গান গাহিতে হইল। মৃদু কণ্ঠে গঙ্গা গাহিল,—

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা···

ভালো গায়···

গান শেষ হইলে কল্লোল বলিল,—খাশা গলা···বাঃ!

দয়াময়ী বলিল,—কলকাতার থিয়েটারওলারা কি সাধে ওকে হু'-তিনশো টাকা মাইনে দিত! শুধু ঐ গলার জন্তই না···

বেলা প্রায় পাঁচটা···

কল্লোল ভাবিল, আর থাকা ভালো দেখায় না! বলিল,—এবার তাহলে উঠি···

দয়াময়ী বলিল—আর ঘণ্টাখানেক পরেই তো আপনার বন্ধু ফিরবে।

কল্লোল বলিল,—বুঝেছি। কিন্তু ফ্ল্যাটে সকলে ভাববে, কোথাও সরে পড়লুম না কি! এ-বেলা খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে আবার একটু গোলযোগ আছে।

দয়াময়ী বলিল,—গোলযোগ?

কল্লোল বলিল,—হৃষি বাবুর বাড়ী থেকে হু'বেলা খাবার আসে। তাঁর বাড়ীতে দেখে এসেছি গোলযোগ···অর্থাৎ হৃষি বাবুর স্ত্রীর অসুখ···মানে, লেবর-পেন্। নার্শ-মার্থা কাল থেকে সেখানে হাজির। কে জানে, এ-বেলা সেখানে রান্নাবান্না চড়বে কি না···ফিরে যদি তার ব্যবস্থা করতে হয়···,

গঙ্গা একাগ্র মনোযোগে এ-কথা শুনিতেছিল··· কল্লোলের কথা শেষ হইলে দয়াময়ীকে উদ্দেশ করিয়া সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে বলিল,—এ-বেলা এইখানেই যদি উনি···

সে-কথা লুফিয়া লইয়া কল্লোল বলিল—আবার এ-বেলা! অর্থাৎ আপনাদের এ-দিনটা আমার জ্বালাতন-করার কাঁটায় বিঁধে থাকবে···একেবারে আপাদ-মস্তক?

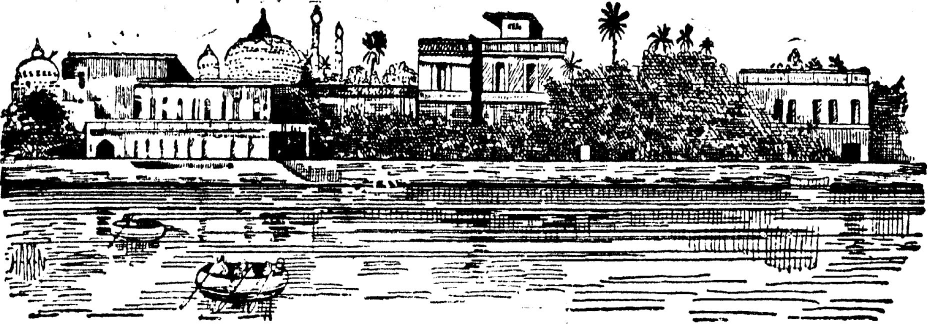
গঙ্গা চাহিল দয়াময়ীর দিকে···ডাকিল—দিদি···

দয়াময়ী বলিল,—মৌনময়ীর মুখে ভাষা ফোটেনি বলে দুঃখ করছিলেন, এখন ভাষা ফুটে সে-ভাষায় যদি নেমন্তন্ন করলে···

খুশী-মনে কল্লোল বলিল,—বেশ···তাহলে এইখানেই আজ আমার নন্-ষ্টপ্ আতিথ্য-সমাদর চলুক!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়



রাশিয়া

রাশিয়ার কাহিনী চিরদিনই রহস্য-বিজড়িত। আয়তনে রাশিয়া প্রায় পৃথিবীর আধখানা জুড়িয়া আছে! তার উপর রাজনীতির দিক দিয়া, কত জাতির রাশিয়ায় কি-পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, তার আর তুলনা নাই!

পূর্ব্বে ছিল য়ুরোপীয়-রাশিয়া আর এসিয়াটিক-রাশিয়া বা সাইবেরিয়া। এখন সোভিয়েট-শাসনে দুই রাশিয়া মিলিয়া এক হইয়াছে। এই সম্মিলিত রাশিয়ার আয়তন ৮১০০,০০০ একাশি লক্ষ বর্গ-মাইল এবং সুপরিচালনা-কল্পে এই রাশিয়াকে ছ'টি স্বতন্ত্র ষ্টেটে ভাগ করা হইয়াছে। ছ'টি ষ্টেটের ভাগ্য-নিয়ন্তা কিন্তু মস্কোর সেন্ট্রাল সোভিয়েট।

রাশিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় পঁচাত্তর জন কৃষিজীবী। পূর্ব্বে জারের আমলে তারা লেখাপড়ার ধার ধারিত না। সাধারণ লোক ছিল অবজ্ঞার পাত্র! লেখাপড়া শিখিলে অভিজাত-বংশীয়দের সহিত তারা পাল্লা দিতে চাহিবে, এ-জন্য তাদের লেখাপড়া ছিল নিষিদ্ধ। এখন সোভিয়েট-শাসনে সে-নিষেধ আর নাই। গরীব শ্রমিক ও কৃষিজীবীর ছেলেমেয়েদের জন্য ষ্টেট



এস্তোনিয়া

হইতে স্কুল খোলা হইয়াছে। ধনী ও অভিজাত-বংশীয়েরা অবশ্য এখনো সে-সব স্কুলে ছেলে-মেয়ে পাঠান না।

শিক্ষা-সভ্যতার প্রবর্ত্তন হইলেও সহরের লোক-জনের জীবন-যাত্রার প্রণালীতে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয় না। পল্লীগ্রামে লোক-জন এখনো সরল-ভাবে বাস করে। তাদের মনে এখনো সেই পুরানো কুসংস্কার; ধর্ম্মে-কর্ম্মে সেই নিষ্ঠা; বয়োজ্যেষ্ঠ জনের উপর সেই ভক্তি-শ্রদ্ধা। তারা কাঠের বাড়ীতে বাস করে। এ-সবে কোনো বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই! যাদের অবস্থা ভালো, তাদের বাড়ী দোতলা।

বাড়ীতে সাধারণতঃ থাকে একখানি করিয়া শুইবার ঘর; আর



পারানি-নৌকা—নিজনি-নভগড



মামুলি কাঠের বাড়ী—রাশিয়া



ক্ষেতের কাজে মেয়েরা—রাশিয়া



পার্ব্ব-উৎসবে এষ্টোনিয়ান মহিলা

রান্না ও ভাঁড়ার-ঘর। আসবাব-পত্র বলিতে সাদা-মাটা টেবিল-চেয়ার। ঘরের জানলা ছোট, নহিলে শীতের দৌরাত্ম্যে ঘরে বাস করা দায়! প্রতি বাড়ীতেই ভেড়া আছে, গো-মহিষ আছে, ছাগল আছে।

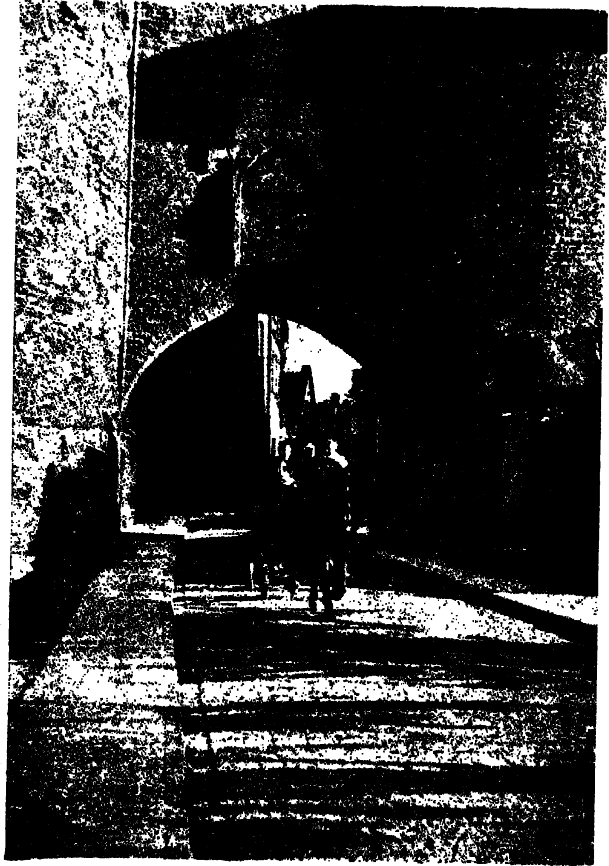
য়ুরোপীয়-রাশিয়ার উত্তরে এবং উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে ককেশাস্ গিরি-শ্রেণী। এখানে তুষারপাতের উপদ্রব এত বেশী যে, শীতকালে নদী-নালা জমাট বরফ-স্তূপে পরিণত হয়। ফিনল্যাণ্ড এবং রাশিয়ার মাঝখানে লেক লাডোগা। য়ুরোপে এত বড় লেক আর কুত্রাপি নাই। লেকটির আয়তন ওয়েল্‌শের সমান। এ লেকটি ছাড়া রাশিয়ায় আরো অসংখ্য লেক্ আছে।

তার পর নদী। নীষ্টার, বাগ এবং নীপার গিয়া পড়িয়াছে কৃষ্ণ-সাগরে; ডন্ গিয়া মিশিয়াছে আজভ সাগরে; এবং কাস্পিয়ানে গিয়া মিশিয়াছে শত বাহু মেলিয়া ভল্‌গা নদী। ভালদাই-পাহাড়ে জন্ম লইয়া ভল্‌গা লেনিনগ্রাড, মস্কো হইয়া প্রায় ২৪০০ মাইল ধরিয়া প্রায় অর্দ্ধ-রাশিয়া জুড়িয়া বহিয়া চলিয়াছে। উত্তর-বাহিনী নদীর মধ্যে পেচোরা ও দ্বৈনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ সব নদীতে স্রোত তেমন প্রখর নয়। নানা খাল-বিলে জল জোগাইতে জোগাইতে নদীগুলির বেগ বহু-ক্ষেত্রে মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। তার উপর শীতের সময় এ সব নদীর অঙ্গ অনেক জায়গায় বরফে ঢাকিয়া থাকে। নেভা-নদী জমাট বরফে ঢাকিয়া থাকে বছরে প্রায় পাঁচ মাস; ভল্‌গার বুকে বরফ জমিয়া থাকে তিন মাস।

এই সব নদীর গায়ে অসংখ্য খাল-বিল; তার উপর য়ুরোপীয়-রাশিয়ায় বেশী পাহাড় নাই বলিয়া জমি সমতল; সে-জন্য এখানকার রেল-পথে বহু বিঘ্ন ঘটে। জমাট বরফ এবং সময়-বিশেষে নদী-নালা ছাপিয়া ওঠে বলিয়া ট্রেণ সাধারণতঃ একটু মন্থর গতিতে চলে। ষ্টেশন হইতে সহরগুলি অনেক দূরে অবস্থিত। পথের দু'ধারে ক্ষেত আর জঙ্গল। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, রাশিয়ার মাটী এত উর্ব্বর যে, সব জমির চাষ হইলে রাশিয়া সমস্ত পৃথিবীর খাদ্য-ভাণ্ডারে পরিণত হইতে পারিত! হয় নাই, তার কারণ, জমির দশ-আনা ভাগ খালি পড়িয়া আছে—চাষ-আবাদ করিবার মতো লোক এবং সঙ্গতি নাই। এখানে গম, ছোলা, বার্লি, সরিষা, ধান, ভুট্টা জন্মায় প্রচুর; তার উপর আছে রেড়ি, তুলা, তিশি, আলু, বীট আর তামাকের আবাদ। ফলও প্রচুর। ককেশাসের ধারে-ধারে তৈলের খনি আছে অজস্র। কয়লা এবং লৌহ আছে প্রচুর; কিন্তু কয়লা ও লৌহ এতকাল কেহ স্পর্শ করে নাই। সাইবেরিয়ায় প্রচুর তামা, সীসা ও লবণ মেলে; প্লাটিনাম রাশিয়ার একান্ত নিজস্ব বলিলে অত্যুক্তি হইবে না!

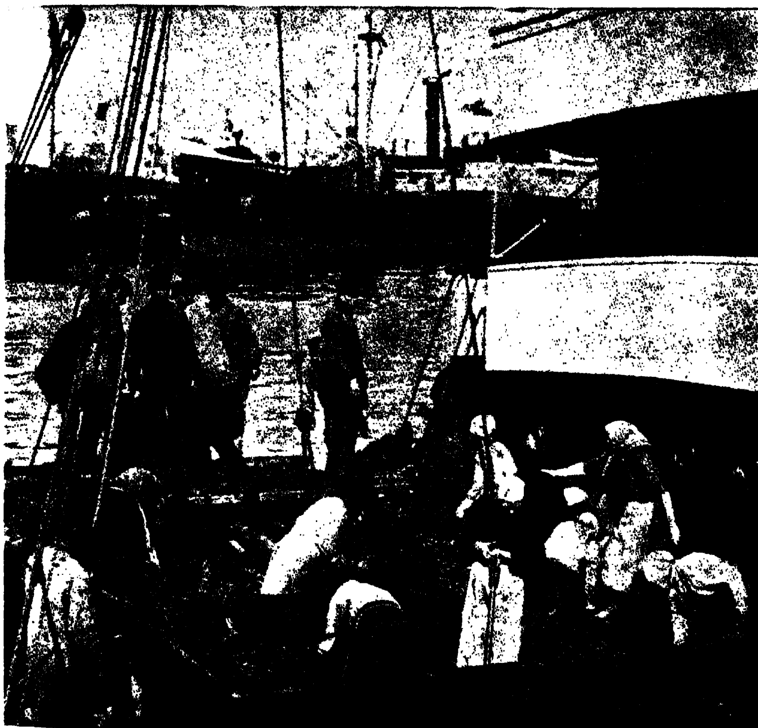
এ সব খনিতে কাজের পত্তন করেন বিদেশী বণিকের দল। আজো এ সব ব্যবসার বেশীর ভাগ বিদেশীর হাতে রহিয়া গিয়াছে। নব-জাগ্রত রাশিয়া এখন শ্রম-শিল্পীদের প্রচুর উৎসাহ দিতেছে। তবু যন্ত্রপাতি এবং বিলাস-সামগ্রীর জন্য রাশিয়া আজও বিদেশের মুখাপেক্ষী। এ-দিক দিয়া জার্ম্মানির প্রভাব সব-চেয়ে বেশী।



চিরদিনের পথ—টালিন্

জারের অমোঘ অপ্রতিহত প্রতাপে চারিদিকে বিরাগ দেখা দিয়াছিল। বিচার-বিভাগ উৎকোচে কলুষিত

ছিল; এবং জন-সাধারণের উপর নিগ্রহের আর অন্ত ছিল না। শেষে এই দারিদ্র্য-অভাব এবং অভিজাত-সম্প্রদায়ের অবহেলা-নির্য্যাতনের মাত্রা অতিরিক্ত বাড়িয়া উঠিলে নিপীড়িত জন-সাধারণ মরিয়া হইয়া বিদ্রোহ তুলিল। সে-বিদ্রোহের ফলে জারের আধিপত্য-নাশ, অভিজাত-সম্প্রদায়ের বিলোপ এবং নব-গণতন্ত্রে রাশিয়ান জাতির নব-জাগরণ ঘটিল।



কয়লার কাজে মেয়েরা

গণতন্ত্র-শাসনে প্রথমেই জাতির ধনসম্পদ-লাভের প্রচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চাষবাস ও শ্রমশিল্পে সংস্কার; শ্রমিকদের সমাদর; শিক্ষা এবং সংস্কৃতি-সাধনা —নবতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল। রসায়নের সাধনায় রাশিয়া আজ পৃথিবীর শিরোভাগে অবস্থিত।

মেয়েদের শিক্ষার দিকে রাশিয়ার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাঁদের স্বাস্থ্য যাহাতে ভালো থাকে, সে-জন্ম আইন-মোতাবেক ব্যায়ামের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। তার উপর গণতন্ত্রের দীক্ষায় রাশিয়া কাজের দাম বুঝিয়াছে। শরীর খাটাইয়া কাজ করায় ভদ্রতা-নাশ হয় না, এ-কথা রাশিয়া একেবারে মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রহণ করিয়াছে; তাই সেখানকার মেয়ে-পুরুষ গতর খাটাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লজ্জা পান না; আলস্যেই তাঁরা লজ্জা পান! এই মনোভাবের ফলে ট্রাম-ড্রাইভারী করিতে, বিমান-পোতে পাইলটগিরি করিতে এবং কলে-কারখানায় খাটিতে মেয়ে কর্ম্মচারিণীর ভিড় জমিয়াছে।

রাশিয়ায় যে কাঁচা মাল এত দিন অযত্নে-অবহেলায় পড়িয়া ছিল, আজ গণতন্ত্রের যত্নে সেই কাঁচা মাল রাশিয়ার ধন-সম্পদ বর্দ্ধন করিতেছে। রাশিয়ায় কারখানার সংখ্যা নিত্য দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্রমিকের মূল্য সুলভ বলিয়া শ্রম-শিল্পে প্রচুর উৎকর্ষ সংসাধিত হইতেছে।

শিক্ষা ও সংস্কারের প্রতি মনোযোগিতার সঙ্গে সেনা-বিভাগের সংস্কারে গণতন্ত্র সবিশেষ উদ্যোগী হইয়াছে। রাশিয়ার কশাক্-শ্রেণীর শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী কাহারো অবিদিত নয়। এখন সেনা-বিভাগ বহুল পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। নব-বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা-দীক্ষায় রাশিয়ান সৈন্য আজ অপরাজেয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রাশিয়ার Red Army বা লাল-ফৌজ ইতিমধ্যে রণ-কুশলতায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

কিন্তু আমরা রাশিয়ার ইতিহাস লিখিতে বসি নাই। আজ রাশিয়ার উপর জার্ম্মানির যে-আক্রমণ চলিয়াছে,

এ-অশান্তি-বিরোধের ফলে সারা পৃথিবী জুড়িয়া যে অশান্তি-আতঙ্ক ও বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইয়াছে, তাহার জন্য আমাদের মন প্রতিক্ষণে শঙ্কা-চিন্তাতুর হইয়া আছে। জার্ম্মানির লক্ষ্য এবং গতি, এবং রাশিয়া কি করিয়া সে গতি প্রতিরুদ্ধ করিতেছে, সে সংবাদের জন্য আমরা আকুল হইয়া আছি! রাশিয়ার ভৌগোলিক ও মানসিক পরিচয় খানিকটা জানা থাকিলে এ-যুদ্ধের গতিবিধি বুঝিবার পক্ষে আমাদের কতক সুবিধা হইবে বলিয়া আজ এ-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি।

আজ প্রায় ছ'মাস যাবৎ জার্ম্মানির অতর্কিত ও দানবী আক্রমণকে রাশিয়া বীরদর্পে প্রতিরোধ



সদর রাস্তা—পেট্রোগ্রাড



কলা-ভবন—টালিন



উপাসনা-মন্দির—মস্কো



প্রাচীন রুশ-মন্দির—টালিন্

করিতেছে। এ-সম্বন্ধে জার্ম্মানির সরকারী-পত্রও রাশিয়ার রণ-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছে, আধুনিক যুদ্ধের যান্ত্রিক কৌশলে রাশিয়া রীতিমত কুশলী। জার্ম্মানির সমর-কৌশল ব্যর্থ করিয়া রাশিয়া প্রমাণিত করিয়াছে, আধুনিক যুদ্ধের জন্য সে প্রস্তুত!

জার্ম্মানির লক্ষ্য মস্কো; এবং সে-লক্ষ্য ভেদ করিতে স্মলেন্স্কে যে কুরুক্ষেত্র-পর্ব্ব চলিয়াছে, তাহা যুদ্ধের ইতিহাসে অমর-অক্ষরে লিখিত থাকিবে। মস্কোয় পৌঁছিতে বাল্টিক হইতে পথ আছে, ইতেবস্ক, প্স্কভ্ পেট্রোস্কাভ্ এবং এস্টোনিয়া দিয়া। ক'টি পথের মধ্যে স্মলেন্স্কের পথ সবচেয়ে সহজ এবং এ-পথ আসিয়াছে লিথুয়ানিয়া হইয়া।

স্মলেন্‌স্ক ছাড়া কীয়েভের পশ্চিমে জিটোমীর এবং স্কভ্ অঞ্চলেও যুদ্ধ চলিয়াছে। ফিন্‌ল্যাণ্ড হইতেও লেনিনগ্রাড-প্রবেশে জার্ম্মানির চেষ্টা চলিয়াছে।

কিন্তু সব দিকেই রাশিয়া বিমান এবং নৌ-ঘাঁটীর সাহায্যে জার্ম্মানির গতি বীরদর্পে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন বাকী আছে এষ্টোনিয়ার পথে জার্ম্মানির মস্কো এবং লেনিনগ্রাডে প্রবেশের প্রয়াস!

এ-পথের পরিচয় জানিতে হইলে এষ্টোনিয়ার পরিচয় লইতে হয়।

আমরা আজ এষ্টোনিয়ার কথা বলিতেছি।



টালিনের বাজার



হাট—কোলে-কাঁখালে শিশু

এ-যুগে শুধু ফৌজ আর মারণাস্ত্র তৈয়ারী করিলেই কোনো জাতি বিপক্ষ-আক্রমণ-প্রতিরোধে সমর্থ হয় না। নৌ-ঘাঁটী এবং বিমান-ঘাঁটী নির্ম্মাণে কুশলতা চাই। এ-যুদ্ধে তার প্রচুর প্রমাণ পাইতেছি। বাল্‌টিক সাগর-পথ—রাশিয়া-আক্রমণের পক্ষে মস্ত সহায়। এ-জন্য বালটিক-পথ রক্ষার জন্য এষ্টোনিয়ায় রাশিয়া যে নৌ-ঘাঁটী ও বিমান-ঘাঁটী প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা দুরতিক্রম্য।

ফিন্‌ল্যাণ্ড-সাগরের দক্ষিণে এবং বাল্‌টিকের পূর্ব্বতীরে এষ্টোনিয়া অবস্থিত। এষ্টোনিয়ার পশ্চিম গা ঘেঁষিয়া



বরফ-ঢাকা পথে বাহন—টালিন



ব্যায়ামের বেশে

এই এষ্টোনিয়ান্ জাতি ফিন্ এবং অন্য আরো কয়টি পার্ব্বত্য জাতির সঙ্গে মিলিয়া ধনাহরণের উদ্দেশ্যে উরাল-পর্ব্বত-প্রদেশ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর বুকে বাহির হইয়াছিল। তখনকার দিনে চাষ-বাস, পশু-পালন, মাছ ধরা এবং মৃগয়া ভিন্ন অন্য কাজ ছিল মানুষের সম্পূর্ণ অজানা।

এষ্টোনিয়ান্‌রা আর্য্য-বংশীয়। তারা যেমন সবল তেমনি স্বাস্থ্যবান্ ছিল। এষ্টোনিয়ান্‌রা ছিল প্রকৃতির উপাসক। পল্লীগ্রামে পুরোহিত ও সর্দ্দারদিগকে মানিয়া তারা বাস করিত। কোনো দুঃখ, কোনো বিরোধ জানিত না।

রাশিয়ার সীমান্তদেশ। ইতিহাসে এষ্টোনিয়ার নাম পাওয়া যায় খৃষ্ট-জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে।

এষ্টোনিয়া এবং এষ্টোনিয়া-অধিবাসীদের কাহিনী খুব কৌতূহলোদ্দীপক। খৃষ্ট-জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে

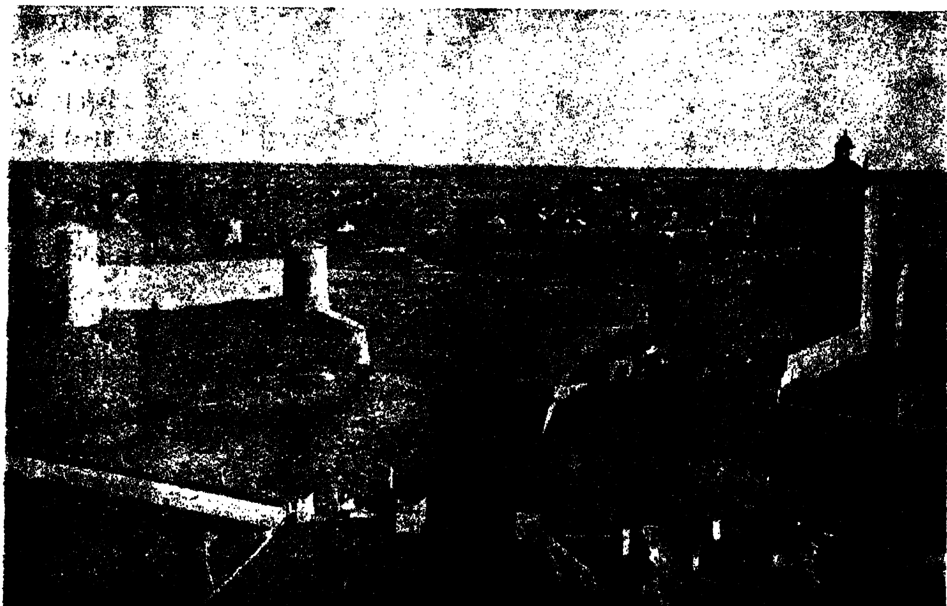
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জার্ম্মানি প্রথম এষ্টোনিয়া আক্রমণ করে। এ-অভিযানে ডেনমার্ক হইয়াছিল জার্ম্মানির সহযোগী। ডেনিশ-রাজ ওয়াল-ডেমার এষ্টোনিয়ায় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বহু ডেনিশ আসিয়া এষ্টোনিয়ায়



বাল্‌টিক রূপসী



পল্লীগ্রাম—এষ্টোনিয়া



নার্ভা-তীরে প্রাচীন রুশ-দুর্গ—দূরে ইভানগরড—এষ্টোনিয়া



কারখানার মেয়ে



ডাইনামো-ফ্যাক্টরির মেয়ে-করিগর



মামুলি বেশ-ভূষায় এস্টোনিয়ান নর-নারী

বসতি স্থাপনা করিল। ডেনিশ ও এষ্টোনিয়ান্‌দের মধ্যে বিবাহ চলিল এবং এ-বিবাহের ফলে যে উত্তর-পুরুষের জন্ম হইল, তারা রেভেল-জাতি নামে অভিহিত।

১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে ডেনিশ-রাজ এষ্টোনিয়াকে বেচিয়া দিল জার্ম্মানির কাছে। তার পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধে এই রেভেল-জাতি রাশিয়া, ডেনমার্ক এবং জার্ম্মানির সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিয়া এষ্টোনিয়াকে স্বাধীন গণতন্ত্রে পরিণত করিয়াছে।



তৈল-খনির রেল

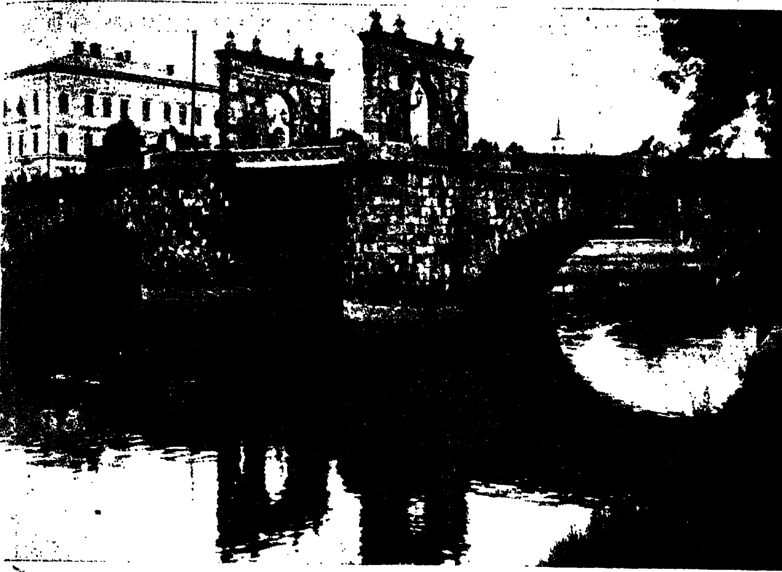
চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে এষ্টোনিয়াকে বহু-বার শত্রু আক্রমণ সহিতে হইয়াছে। রাশিয়ান্, পোল্, সুইডিশ কাহারো হাতে মুক্তি পায় নাই।

এষ্টোনিয়া কিনিয়া জার্ম্মানরা সমস্ত জমির মালিক হইয়া বসিল। এষ্টোনিয়ান্‌রা তাদের শাসন মানিয়া অশেষ নির্য্যাতন সহিয়া কোনো মতে মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিত। জার্ম্মানির এ-নির্য্যাতন শেষে অসহ্য হইলে সুইডেন আসিয়া এষ্টোনিয়াকে জার্ম্মানির হাত হইতে উদ্ধার করিল। কিন্তু রাশিয়া ওৎ পাতিয়া ছিল। কাজেই সুইডেন কোনো দিন এষ্টোনিয়া ভোগ করিতে পারে নাই। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এষ্টোনিয়া পড়িল রাশিয়ার হাতে; তার পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এষ্টোনিয়া ছিল রুশ-রাজ্যের অংশ।



বরফ-ভাঙ্গা জলে কাপড় কাচা

বিদেশীর শাসনাধীনে বাস করিলেও এষ্টোনিয়ান্ জাতি নিজের জাতীয়তা রক্ষার সম্বন্ধে চিরদিন সচেতন ছিল। অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা-লাভ ছিল এষ্টোনিয়ার স্বপ্ন ও সাধনা!



এমা-নদীর বুকে সেতু ;—রাশিয়ান-সাম্রাজ্ঞী কাথরিন এ-সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন



মেয়ে ট্রাম-ড্রাইভার

বলশেভিক-হস্তে রাশিয়ায় গণতন্ত্র-অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এষ্টোনিয়া অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিল। তখনো কিন্তু জার্ম্মানির নাগপাশ শিথিল হয় নাই; সে পাশ-বন্ধন ছিন্ন হইল মহাযুদ্ধের পর—১৯২০ খৃষ্টাব্দে তার্ত্তুর সন্ধি-সর্ত্তে।

তার পর বিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাশিয়ার সহযোগিতায় এষ্টোনিয়া আজ সর্ব্বদিক দিয়া প্রথম শ্রেণীর ষ্টেট বলিয়া পরিগণিত।

এষ্টোনিয়ার প্রধান সহর টালিন্—এ-যুগের বিপণী-অট্টালিকায় পরিশোভিত হইলেও টালিন্ আজো যেন স্বপ্নরাজ্য বলিয়া মনে হয়! আচারে-ব্যবহারে টালিনের অধিবাসীরা এমন যে, দেখিলে মনে হয়, অতীতের স্বপ্ন-মায়ায় আজো তারা বিভোর হইয়া আছে!

এষ্টোনিয়ার রাজধানী ডমবার্গ। ডমবার্গ তার প্রাচীন বেশ ত্যাগ করিয়া আধুনিক সজ্জা-ভূষণে বিভূষিত। সে-কালের প্রাচীন প্রাসাদাদির পাশে এ-কালের বাড়ী-ফ্যাক্টরি চমৎকার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে। এখানকার স্ত্রী-পুরুষের বেশভূষায় যে মনোহারিত্ব, তাহা নয়নাভিরাম। মেয়েরা প্রাচীন বেশভূষা ত্যাগ করে নাই; নূতন বেশভূষা গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বা সঙ্কোচ নাই।

বহু কাল জার্ম্মানির অধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকার জন্ম এখানকার লোকজন রাশিয়ান ও জার্ম্মান ভাষাকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। সাধারণ কথাবার্ত্তা চলে রাশিয়ান এবং জার্ম্মান ভাষায়। আমরা যেমন ইংরেজী ও বাঙলা—দু'টি ভাষাকেই নিজস্ব করিয়া লইয়াছি, এখানকার ভাষার অবস্থা ঠিক তেমনি।

নানা যুদ্ধবিগ্রহের জন্ম পূর্ব্বে চাষবাসে বহু অনর্থ

ঘটিয়াছিল। কিন্তু কো-অপারেটিভ আন্দোলনের চেষ্টায় এখন সে-অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। কো-অপারেটিভ সমিতির আনুকূল্যে চাষবাসে এখন যেমন সমৃদ্ধির উদয় হইয়াছে, তেমনি ডেয়ারী-ফার্ম্ম হইয়াছে, আলু-সমিতি, ডিম-সমিতি, বীট-সমিতি প্রভৃতি সর্ব্ব দ্রব্যের ফলন ও রপ্তানী সম্বন্ধে বিভিন্ন সমিতি সংগঠিত এবং বিভিন্ন সমিতির উদ্যোগে এ-সব ব্যবসায় সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কৃষি-সমবায়ের সংখ্যাও এখন পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বেশী হইয়াছে।

তাছাড়া এখানকার বন-বিভাগ যেমন সুপরিচালিত,



বেদিয়া মেয়ে

তেমনি সমৃদ্ধ। এষ্টোনিয়ায় জমির শতকরা বিশ-ভাগ বড় বড় গাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানকার কাঠে জ্বালানি হয়; তাছাড়া কাঠের নানা আসবাব-পত্রও তৈয়ারী হয়। কাঠের ব্যবসায় এষ্টোনিয়া আজ সমধিক সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানকার এ্যাসপেন-গাছের কাঠ হইতে দেশলাইয়ের কাঠি হয় চমৎকার। এ-কাঠ স্কাণ্ডিনেভিয়ায় অজস্র চালান যায়। এষ্টোনিয়ার তামাক হইতে যে সিগারেট তৈরী হয়, তাহাও য়ুরোপে বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। গ্রেট-বৃটেনে ও জার্ম্মানিতে এষ্টোনিয়ার কাঠ, মাখন, ডিম, শূকর-মাংস চালান যায়। গ্রেটবৃটেন ও জার্ম্মানি হইতে এষ্টোনিয়া লয় যন্ত্রপাতি ও মোটরগাড়ী।

এষ্টোনিয়ায় মেয়ে-পুরুষে সব দিকে সাম্য দেখা যায়। শ্রমিক মেয়ে-পুরুষ এক-সঙ্গে কাজ করে। মেয়ে-পুরুষের পারিশ্রমিকের হারে তারতম্য নাই; এক-রেটে পারিশ্রমিক পায়। কয়লার কারবারে মেয়েদের পশার খুব বেশী। কয়লার বা খনির কাজে পুরুষ-কুলির দেখা



রাশিয়ার পুরোহিত

মেলে না; মেয়ে-কুলিরা এ কাজ একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে।

এমা নদীর তীরে তার্ত্তু-সহর। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন গাষ্টেভাস এডলফাশ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বিজ্ঞানের চর্চ্চা হয়। এটি ছাড়া টালিনে টেক্‌নিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার ন্যাশনাল মিউজিয়ম দেখিবার মতো। এখানে এষ্টোনিয়ান্ শিল্প-কলার সংগ্রহ দেখিলে এ-জাতির কলাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

নার্ভায় পুরানো একটি রুশ দুর্গ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এ-দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এষ্টোনিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজ্য হইলে আসলে এখানকার লোকজন জাতে রাশিয়ান। রাশিয়ার সুখ-দুঃখকে এষ্টোনিয়ান্‌রা আজো নিজেদের সুখ-দুঃখ বলিয়া জানে। রাজশক্তির দিক দিয়া বিভেদ হইলেও রাশিয়ার গৌরবে এষ্টোনিয়ান্‌রা আজো গৌরব করিতে ছাড়ে না।



জাহাজের মেয়ে-এঞ্জিনীয়ার

ইরবোস্কায় কাঁটা-তারের বেড়া দিয়া রাশিয়ার সহিত এষ্টোনিয়ার রাজনীতিক বিভাগ নির্দ্দেশিত আছে। এখানে প্রাচীন যুগের দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ এবং প্রাচীন একটি রুশ মন্দিরের ধ্বংস-স্তূপ পড়িয়া আছে। এইখানেই রুশ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ট্রুভরের সমাধি-মন্দির আছে। নবম শতাব্দীতে তিনি এই রুশ-জাতির ভাগ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এষ্টোনিয়ান্‌রা মনে-প্রাণে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কার গ্রহণ করিলেও প্রাচীন যুগের আদর্শে আজো মা-বাপকে সকল বিষয়ে মানিয়া চলে। বিবাহ-ব্যাপারে এক জন কিশোর তরুণ এষ্টোনিয়ান্ কোর্টশিপ করিয়া বিবাহ করিলে এক জন বন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মা-বাপের অনুমতি লইয়া বিবাহ করিয়াছ?

তরুণ বলিয়াছিলেন, মা-বাপের বিনা-অনুমতিতে আমরা কোন কাজ করি না। বিবাহের পূর্ব্বে প্রিয়ার মনের অনুরাগ ভালো-ভাবে জানিয়া মা-বাপের অনুমতি লইয়াছিলাম বিবাহের জন্য। তাঁরা খুশী-মনে অনুমতি দিলেন, তাই বিবাহ হইয়াছে। নহিলে হা-হুতাশ করিয়া দিন কাটাইতে হইত! তাঁদের অনুমতি না পাইলে কি হইত, জানি না।

এবারের এ জার্ম্মান-যুদ্ধ সূচিত হইবামাত্র এষ্টোনিয়ার নারী-সমাজ Women's National Defence Leagueএর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ লীগে সদস্যার সংখ্যা পনেরো হাজার। ইঁহাদের উদ্দেশ্য, এখানে যুদ্ধ ঘটিলে মেয়ে-পুরুষে দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন; ফৌজের স্বাস্থ্যবিধান এবং তাহাদের সেবা-পরিচর্য্যা করিবেন।

এখানকার মেয়েরা জজীয়তি করিতে বা ক্যাবিনেটে সদস্যা হইয়া না বসিলেও রাজনীতির ব্যাপারে পুরুষের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিতেছেন। এ সহযোগিতা করিতে যে-পরিমাণ বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন, সে বিদ্যা-বুদ্ধির অভাব তাঁদের নাই।

তুমি আজ নাই

বরষা বিদায় নিয়েছে বনের নীপ-মঞ্জরী সাথে
সোনালী-শরতে বনবীথি উন্মন,
তুমি এলেনাকো দরদী বন্ধু আমার দুঃখের রাতে
তাই বুকে মোর জমে ওঠে ক্রন্দন।

তব বিরচিত এ ফুল-কুঞ্জে কুঁড়ি ফুটে ঝরে শুধু
মালার কুসুম বাসি হয়ে ঝরে যায়,
বিরহ-দহনে শুকায়েছে তনু অন্তর-মরু ধূ-ধূ
নিঝুম পরাণ দুঃসহ বেদনায়।

বাহিরে আলোর লেগেছে জোয়ার শুক্লা চতুর্দ্দশী
আমি আন্‌মনে চেয়ে আছি বাতায়নে,
মোর নভে আজ নিবিড় আঁধার, আঁখি ওঠে উচ্ছ্বসি
না পাওয়া কি যেন দুখের আবর্ত্তনে।

কত দিন আর তনু-পশরায় তোমার অর্ঘ্য বয়ে
আশা-পথপানে অপলকে রব চাহি,
কত যুগ প্রিয়, শুধু স্মৃতিখানি বিদীর্ণ বুকে লয়ে
যাপিব যামিনী অশ্রুতে অবগাহি।

শ্রীদীপ্তিরাণী মজুমদার।



১৬

বিবাহ এবং প্রীতিভোজ দুই সুশৃঙ্খলায় শেষ হইল।

অধিক রাত্রিতে হুড়-হাঙ্গামা মিটিলে হিমানী ফুলশয্যা করাইতে বসিল। ক্লান্ত সুধীশ বলিল, "রাত তো আর নেই হিমানী, এবার একটু শুয়ে জিরোও। এখনও ও-সবে কি আসক্তি আছে?"

হিমানী হাসিমুখে বলিল, "কেন থাকবে না শুনি? তুমি না হয় বুড়ো হ'য়ে থাক্‌তে পার, কিন্তু আমার ননদ তো আর বুড়ী হয়নি। নাও, ভাল হ'য়ে বোস, একবার কোলে কর।"

সুধীশ বলিল, "আহাঃ, মাপ কর, ঠাকুমাদের আমলের ও-সব সাবেকী রসিকতা কি চিরকাল চালাবে?"

হিমানী গায়ত্রীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাহাকে সুধীশের কোলে বসাইয়া দিল, তাহার পর বলিল, "ও-সব নিয়ম-লক্ষণ করতে হয়।" তাহার পর দুই জনের মাথায় দু'খানি হাত রাখিয়া এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া রহিল। বোধ হয়, তার প্রিয়জনযুগলের জন্য মঙ্গলময়ের নিকট আশীষ ভিক্ষা করিল। তাহার পর হাসিয়া বলিল, "এইবার দু'জনে বোঝাপড়া কর। আমি বিদায় নিলুম। আজ যেন আলো নিবিও না।"—সে দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সুধীশ একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার মনে হইল, হিমানী হাসিল বটে, কিন্তু ওর হাসির তলায় লুকান আছে বুকজোড়া ব্যথা! সুধীশ ক্লিষ্ট হইল। এই সঙ্গে তাহার লক্ষ্য হইল—এই দুই-আড়াই মাসে হিমানীর স্বাস্থ্যের কতখানি উন্নতি হইয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভাদ্রের পরিপূর্ণ তরঙ্গিণীর মত যৌবনের উদ্দাম তরঙ্গ কানায়-কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার লাবণ্য উথলিয়া উঠিতেছে। কে বলিবে, সে তিন ছেলের মা? যেন কিশোরী সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে, এখনও নূতন জীবনকে চিনিয়া লইতে পারে নাই; চোখে চকিত হরিণীর চঞ্চল দৃষ্টি।

সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়িল নেলীকে। সুধীশ অতীশের মুখে তাহার যে বর্ণনা শুনিয়াছে, তাহা দুই চক্ষুর সম্মুখে জ্বল্‌-জ্বল্ করিয়া উঠিল। হিমানী তার আশ্রয়ে আছে, শান্তি না থাক, নিশ্চিন্ত আছে তো; অন্ন-বস্ত্র ও অভিভাবকত্বের চিন্তা তাহার নাই। এ-দিক দিয়া সে নির্ভয় হইয়াছে। কিন্তু নেলী? ছোট ছোট দু'টি শিশু লইয়া কি উপায়ে সে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে? অতীশ বলিয়াছে—সে পূর্ণগর্ভা। একে ভগ্নস্বাস্থ্য, তাহার উপর ঐ অবস্থা,—আবার দুঃসহ চিন্তা,—এতগুলা একসঙ্গে কেমন করিয়া নেলী সহ্য করিতেছে?

সুধীশ বর্ত্তমান ভুলিয়া অতীতের স্মৃতির অতলে একেবারে নিমগ্ন হইয়া গেল। তাহার নবোঢ়া বনিতা যে তাহার পাশে বসিয়া আছে, তাহার অস্তিত্বও সুধীশের মনেই রহিল না।

গায়ত্রী অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, দেখিল, সেই যে সুধীশ করলগ্ন-কপোল হইয়া বসিয়াছে, তাহার ধ্যান যেন আর ভাঙ্গে না! ও-দিকে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়া ক্রমে চারিটার কাছে আসিয়া পড়িল। গায়ত্রী অনেকক্ষণ সঙ্কোচবশে ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু শেষে বুঝিল, লজ্জা করিয়া সে যদি দূরে সরিয়া থাকে, তবে এই মানুষটি যে অগ্রসর হইয়া তাহার সঙ্কোচের ব্যবধানটুকু ভাঙ্গিয়া দিবে, সে আশা দুরাশা! তাছাড়া, সুধীশ গায়ত্রীর অপরিচিত বর নয়, এবং একান্ত সঙ্কুচিত ভাবে

লাজনতা হইয়া থাকিবার যে বয়স—তাহাও গায়ত্রীর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহার অধিকারবোধ জন্মিয়াছিল, যাহা তাহার সাধারণ সঙ্কোচকে জয় করিল। সে নড়িয়া-চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল, বিছানার ফুলগুলি একপাশে জড়ো করিয়া রাখিল, গায়ের আভরণগুলির কতক কতক খুলিল, শুধু খোঁপার মালা ও গলার মালা খুলিল না। অবশেষে সুধীশের একখানা হাত হাতে লইয়া অত্যন্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "শোবে না? রাত আর নেই যে!"

সুধীশ চমকিয়া উঠিল; এতক্ষণে তাহার অতীত ও কল্পনার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান ও বাস্তব আসিয়া দাঁড়াইল। মনে পড়িল, আজ হিমানী ও নেলীর অপেক্ষাও আর এক জন তাহার নিকটতমা আছে,—যাহার সুখশান্তির দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে সে বাধ্য। সে স্তব্ধ-বেদনা-পরিম্লান দৃষ্টিতে গায়ত্রীর দিকে চাহিতেই গায়ত্রী বহু দিন পূর্ব্বে পরিণীতা পত্নীর মত সস্নেহে সুধীশের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাহার কপালের উপর হইতে চুলগুলি পিছন দিকে তুলিয়া দিতে দিতে মমতা-মাখান সুরে বলিল, "চারটে বাজে—শোবে কখন? এসো, শুয়ে পড়ো, আমি তোমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিই। ঘুম আসবে।"

সুধীশ মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "না, তুমিও এসো, দু'জনেই শুই; আজ যে আমাদের ফুল-শয্যা।—সে গায়ত্রীর হাতখানা হৃদ্‌পিণ্ডের উপর চাপিয়া ধরিল।

গায়ত্রী বলিল, "বেশ তো, তুমি শোও, তোমার গায়ে গা দিয়ে আমিও শোব।"

প্রায় সাতটার কাছাকাছি সুধীশের ঘুম ভাঙ্গিল। সে স্তব্ধ হইয়া গেল; গায়ত্রী তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বুকের কাছে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইতেছে। সুধীশ তাহাকে আহ্বান করে নাই; কিন্তু সে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। সত্যই কি মন্ত্রের ভিতর এতখানি আশ্বাস থাকে? অথচ কয় দিন পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত এই গায়ত্রী সঙ্কোচে তাহার চোখের দিকে চাহিতেও পারে নাই! কিন্তু আজ সে সুধীশের বক্ষলগ্না হইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নাই,—সে সুধীশের সহিত নিজের সত্তা অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তবে কেন সুধীশ তেমনই করিয়া গভীর বিশ্বাসে একান্ত নিষ্ঠার সহিত দাম্পত্য আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না? তাহার একান্ত অনুরাগিণী নবোঢ়া বনিতা তাহার অঙ্ক-শোভা করিয়া থাকা-সত্ত্বেও কেন সে বিগত দিনের স্মৃতির বেদনায় ব্যথিত হইতেছে? সুধীশ দৃষ্টি ফিরাইয়া গায়ত্রীর দিকে চাহিল। কুসুম-স্তবকের মত কোমল অমলিন মুখখানি! ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল, রাজকুমারীর হীরার নাকছাবি ও কানফুল দু'টিতে সেই আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় গায়ত্রীর নাকে-কানে তাহা জ্বল্‌-জ্বল্‌ করিতেছিল। পরিণতবয়স্কা রাজকুমারীর গায়ের গহনা তন্বী গায়ত্রীর হাতে ঢল্‌-ঢল্‌ করিতেছিল, সুধীশ তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিল। এখনও ইহাতে মায়ের গায়ের মলা লাগিয়া আছে! মা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কাহার জন্য,—আর তা ভোগ করিতেছে কে?··· মায়ের মুখখানি তার মনে পড়িয়া গেল। গায়ত্রীর মুখের সঙ্গে কোথায় যেন সে-মুখের সাদৃশ্য আছে বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। এমনই দীপ্তশ্রী ছিল মায়ের, এমনই শান্ত সৌন্দর্য্য!

গায়ত্রীর চন্দনচর্চ্চিত মুখের পানে সে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল, সে-দিনের কথা,—যে-দিন সে প্রথম গায়ত্রীকে দেখিয়াছিল। ভয়-কম্পিতা, চিন্তা-ক্লিষ্টা—দারিদ্র্যের ভারে নিষ্পেষিতা! সে-দিনের গায়ত্রী ও আজিকার গায়ত্রীতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ! আজিকার গায়ত্রীর রূপের শতাংশের একাংশও সে-দিন তাহার ছিল না। হীরায় ঔজ্জ্বল্য আছে সত্য, কিন্তু দক্ষ মণিকার পালিশ করিয়া তাহাকে রূপ দান করে। সুধীশ তাহার হাতখানি নিজের পঞ্জরের উপর স্থাপন করিয়া ধীরে-ধীরে পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। এই সঙ্গেই মনে পড়িল হিমানীকে। হিমানী স্বেচ্ছায় এ শোভন কণ্ঠভূষা আজ তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছে, স্বহস্তে তাহার ফুলশয্যার অনুষ্ঠান শেষ করিয়াছে। হাসিমুখে সে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ও-ঘরে স্বামিহীন শয্যায় সে কি আজ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিয়াছে! নবোঢ়া সপত্নীকে স্বামীর কক্ষে রাত্রিযাপন করিতে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রবীণা প্রথমা যেমন মহত্ত্বের মুখোস পরিয়া চলিয়া যায়, হিমানীও আজ

যেন সেই অভিনয়ই করিয়া গেল। যে কক্ষে, যে শয্যায়, যে বক্ষে হিমানী আশৈশব তাহার অপ্রতিহত অধিকারের কথা জানিত, যে বিশ্বাস তাহার অস্থি-মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল,—আজ এত দিনের সেই ধারণাকে সমূলে উৎপাটন করিতে গিয়া সে কি স্বহস্তে তাহার হৃৎপিণ্ডই উৎপাটন করে নাই?

যদিও হিমানী স্বামীর ঘর করিয়াছে, সন্তানের মা হইয়াছে,—তবু কি সে অনুপকে সুধীশের মত এমন আপন বলিয়া কোন দিন স্বীকার করিতে পারিয়াছিল? কখনই নয়। তাহা হইলে স্বামীর অনুপস্থিতিতে সুধীশের গৃহে আসিয়া, তাহার মুখে এমন প্রসন্ন হাসি দেখা দিত কি?

গায়ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সুধীশ তাহার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া নববধূ লজ্জারক্তিম মুখখানি তাহার বক্ষে লুকাইল।

সুধীশ তাহাকে একটু কাছে আকর্ষণ করিয়া স্নেহ-মধুর কণ্ঠে বলিল, "ঘুম ভেঙ্গে গেল? ভোর বেলায় শুয়েছ, এখন উঠ্‌তে হবে না, আর একটু ঘুমোও।"

গায়ত্রী মুখ তুলিল না।

সুধীশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এখনও তোমার লজ্জা করে গায়ত্রী?"

গায়ত্রী এবার মুখ তুলিল; মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, লজ্জা তো করিনি।"—কিন্তু তাহার দুই গালে রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল।

সুধীশ তাহার দক্ষিণ হস্তটি তুলিয়া-ধরিয়া নিজের অঙ্গুলি হইতে পান্নার অঙ্গুরীয়টি উন্মোচন করিয়া তাহার মধ্যমাঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া বলিল, "আমি তোমার, তারই স্মারক হ'য়ে এই আংটিটা তোমার আঙ্গুলে রহিল।"

গায়ত্রী ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত বলিল, "তাহ'লে আমারও কিছু তোমাকে দেওয়া উচিত; কিন্তু আমার তো কিছু নেই, কি দেব?"

সুধীশ হাসিয়া বলিল, "তোমার তো আমাকে দেবার সম্পর্ক নয়, আমার কাছে নেবারই সম্পর্ক। আর তোমার কাছে আছে আমার যা পাওনা, তা তো তুমি আমায় দিয়েছ,—তোমার ভালবাসা।"—একটু মৌন থাকিয়া অপরাধীর মত সঙ্কুচিত স্বরে বলিল, "কাল বড় দুঃখ পেলে, কেমন, গায়ত্রী? সত্যি, আমার মনটা এত দুর্ব্বল!"

গায়ত্রী আস্তে আস্তে বলিল, "কেন? তুমি তো আমায় আগেই সব জানিয়েছ। স্মৃতির ওপর হাত নেই তো।"

সুধীশ গভীর নিঃশ্বাস ফেলিল, কোন কথা বলিল না।

খানিকটা সময় নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে গায়ত্রীর চোখ পড়িল; সাড়ে-সাতটা বাজিয়া গিয়াছে! সে ধীরে-ধীরে উঠিয়া বসিল; সুধীশের ডান-হাতখানা কপালে ছোঁয়াইয়া শয্যা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। সুধীশ তাহার মুখপানে চাহিয়া ছিল, দেখিল, সে মুখ ক্ষুণ্ণ অভিমানে ভরা। বয়স্থা গায়ত্রী অলঙ্কারের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয় নাই; সে চাহে সুধীশের প্রেম, তাহার আদর, সোহাগ। সে একাদশী বালিকা নয় যে, স্বামীকে দেখিলে ভূত-দেখার মত ভয় পাইবে। এ পূর্ণাঙ্গী তরুণী, স্বামীর কল্পনা ইহার কাছে ভীতিপ্রদ নয়, প্রীতিদায়ক। তাই তো সে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া ঘুমাইয়াছিল; অথচ সুধীশ নির্ব্বিকার চিত্তে অতীত কালের স্মৃতির নেশায় বিভোর! ছি ছি, কি লজ্জা! সে আপনাকে ধিক্কার দিল। গায়ত্রীই কি তাহার অবহেলার যোগ্য? না হয় তাহাকে বিনা আয়াসে পাইয়াছে, কিন্তু সে-ও যে রূপে-গুণে অনবদ্য! সুধীশ হাত বাড়াইয়া গায়ত্রীর ক্ষীণ কটি বেষ্টন করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল; অল্প হাসিয়া বলিল, "উঠে যাচ্ছ যে? ফুলশয্যার বিছানা থেকে বুঝি এমনি শুক্‌নো মুখে উঠে যেতে আছে? নিজের পাওনা বুঝে নিতে হয়,—শোননি? তোমার বিয়ে-হওয়া বন্ধু কি একটিও নেই?"

গায়ত্রীর মুখে-চোখে লোহিতাভা দেখা দিল; সে সলজ্জ মুখখানি সুধীশের স্কন্ধমূলে লুকাইল।

সুধীশ তাহাকে গভীর স্নেহে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিল; তাহার পর তাহার মুখখানি তুলিয়া-ধরিয়া, প্রথম মিলনের অফুরন্ত মধুরিমায় গায়ত্রীর মুখ-চোখ প্লাবিত করিয়া দিতে লাগিল।

গায়ত্রী নিমীলিত নয়নে সেই সোহাগ উপভোগ করিতে লাগিল। অভিমানের মেঘ ফুৎকারে কখন উড়িয়া গিয়াছে!

১৭

মুগ্ধা বধূকে লইয়া সুধীশ একটু রসিকতার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না।

বিবাহের আট-দশ দিন পরে আহারান্তে রাত্রে গায়ত্রী যখন ঘরে আসিল, তখন সুধীশ সামনের টেবিলে এক বোতল সুরা ও একটা গ্লাস লইয়া বসিয়া ছিল।

গায়ত্রী প্রথমে তাহা লক্ষ্য করে নাই; কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সুধীশ বলিল, "আজ বড্ড শীত রাণু, একটু ঢেলে দাও, না খেলে আজ আর চলছে না।"—বলিয়া ওমর-গীতিকা হইতে আবৃত্তি করিল,

"মোর পুরাতন দ্রাক্ষাবঁধু, পাই যদি আজ পরশ তার
হচ্ছে মনে, জীর্ণ দেহে বলটা ফেরে পুনর্ব্বার।"

ততক্ষণে বোতল ও গ্লাসে গায়ত্রীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। সুধীশের কথা শুনিয়া তাহার মুখ মৃতের মুখের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। বাক্‌শক্তি হারাইয়া সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সুধীশ বলিল, "কি হ'ল? ও দিকেই চেয়ে রইলে যে? সোনামণি আমার! দাও একটু; কন্‌কনে শীত! আর কি রকম বৃষ্টি হচ্ছে দেখছ?"

গায়ত্রী এবার কথা কহিল, শুষ্ক ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "তুমি কি খাও—ঐ বিষ?"

তাহার সর্ব্বশরীর থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে, হয় তো পড়িয়া যাইবে ভাবিয়া সুধীশ ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে ধরিয়া-ফেলিয়া কোলের উপর টানিয়া লইল। বলিল, "রোজ খাইনে; এমনি বৃষ্টি-বাদলের দিনে, কি খুব শীত-টিত করলে চালাই একটু।"

গায়ত্রী সংশয়-কুন্ঠিত কণ্ঠে বলিল, "তিনটি মাস তোমার কাছে আছি, কোন দিন টের পাইনি তো!"

সুধীশ হাসিমুখে বলিল, "কি ক'রে টের পাবে? তুমি কি আমার কাছে শুতে? মাত্রা বেশী না হ'লে তো আর মাতলামী করা চলে না। ঢুক করে খেয়েই শুয়ে পড়লুম, এক-ঘুমে রাত কেটে গেল,—এ আর তুমি টের পাবে কি ক'রে?"

এ কথা শুনিয়া গায়ত্রী নিস্পন্দ!

সুধীশ অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া গায়ত্রীর দুই গাল ধরিয়া আব্দারের সুরে বলিল, "দাও না—লক্ষ্মীটি! আমি তো নিজে নিতে চাইছি নি। তুমিই ঢেলে দাও।"

গায়ত্রীর কণ্ঠস্বরে প্রাণের সাড়া ছিল না, যন্ত্রচালিতবৎ বলিল, "কতটা দেব?"

সুধীশ চকিতের মত তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির করিল, তাহার পর বলিল, "কানায় কানায় ভরে দাও। পূর্ণ পাত্র না খেলে তৃপ্তি নেই।"

গায়ত্রী কম্পিত হস্তে ঢালিতে লাগিল, কিন্তু কানা পর্য্যন্ত ভরিল না, একটু বাকি থাকিতে বোতলটা রাখিয়া দিল। সুধীশের মুখপানে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "একটু কম দিলুম, ওটুকু কমের জন্যে তোমার কষ্ট হবে না, অথচ খাওয়া একটু কম ক'রেই হবে।"

সুধীশ বলিল, "তাতে লাভ?"

গায়ত্রী মৃদু কণ্ঠে বলিল, "খাওয়া অভ্যাস আছে, এক দিনে তো আর ছাড়তে পারবে না। আস্তে আস্তে কমিয়ে এনে ক্রমে ছেড়ে দিও।"

সুধীশ তাহার কৃশ হাতখানি হাতে লইয়া বলিল, "খেলুমই বা, দোষ কি?"

গায়ত্রী উদ্গত শ্বাস দমন করিয়া বলিল,—ক্রমে পাঁচ-জনে জানতে পারবে, বৌদি' বাড়ী আছে, সে ও জানতে পারবে।"

"জানতে পারলেই বা তোমার বৌদি', কি হ'য়েছে তাতে?"

গায়ত্রী দ্বিধাজড়িত কাতর স্বরে বলিল, "মাতালকে যে সবাই ঘৃণা করে!"

সুধীশ গ্লাসটা খালি করিয়া টেবিলে রাখিয়া দিয়া বলিল, "তোমার দাদাও তো খেতেন, হিমানী কি তাঁকে ঘৃণা ক'রত?"

গায়ত্রী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ওদের ভেতরের কথা আমি কি ক'রে জানব? তবে এই থেকেই তো তাঁর অধঃপতন হ'ল।"

সুধীশ তাহার একখানা হাত নিজের গলায় জড়াইতে জড়াইতে সকৌতুকে বলিল, "তোমার সামনে বসেই তো মদ খেলুম, তুমিও আমায় ঘৃণা করবে তো?"

গায়ত্রী ব্যথিত দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিল, উত্তর দিল না। তাহার কাঁধের উপর মাথাটা লুটাইয়া দিল।

সুধীশ তাহার চিবুক ধরিয়া মুখখানি একটু উঁচু করিয়া বলিল, "কি মনে হচ্ছে বল তো? এমন একটা পাষণ্ডের হাতে পড়লে, যার কোন গুণে ঘাট নেই—না?"

গায়ত্রী কষ্টোচ্চারিত কণ্ঠে বলিল, "কেন তা মনে ক'রব? ও তো একটা নেশা, কত লোকেই তো খায়—"

সুধীশ বলিল, "আর যদি সুরা-সাথী থাকে? যদি রাত্তির ছুটোর সময় টলতে-টলতে বাড়ীতে ফিরে আসি, কি তবে করো? আর আমার মুখ দেখ না, কেমন?"

গায়ত্রী ম্লান মুখে বলিল, "তুমি ঠাট্টা আরম্ভ ক'রেছ, ওর আর কি উত্তর দেব?"

সুধীশ বলিল,"বিশ্বাস কি? এই তো তোমার চোখের সামনে বসেই মদ খেলুম, এটাও তো তোমায় জানাইনি; তেমনি যদি বার-টান থাকে, তোমায় না জানিয়ে থাকি। তার পর হঠাৎ এক দিন যদি সেটাও জানতে পারো?"

গায়ত্রী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এ আমার বিশ্বাস হয় না। তবু জানতে চাইছ বলেই বলছি। বিয়ের আগে তোমার যে দোষই থাক, এখনও যদি সেটা থাকে, তবে সে জন্যে তোমায় দোষ দেব না—দেব নিজেকে। আমি যদি তোমায় পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারি, তবে তার সন্ধানে তুমি অন্যত্র যাবে কেন?"

—"তবে পরিপূর্ণ তৃপ্তি আমায় দাও।" বলিয়া সুধীশ গ্লাসে সামান্য পরিমাণ সুরা ঢালিয়া গায়ত্রীর মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, "তুমি একটু খাও। মদ একা খেয়ে তৃপ্তি হয় না, সেই জন্যেই বেশীর ভাগ মাতাল অন্যত্র যায়।"

গায়ত্রীর মুখ পলকের মধ্যে পাথরের মত সাদা হইয়া গেল। সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুধীশের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি এ কি বলছ? ঐ জিনিস আমি খাব? তুমি স্বামী হ'য়ে আমাকে—" মুখের কথা সে আর শেষ করিতে পারিল না।

সুধীশ বলিল, "তাতে দোষ কি? আমার সঙ্গে বসেই তো খাচ্ছ, হল্লা ক'রতে তো আর যাচ্ছ না। আমি খেতে পারি, আর তুমি পার না?"

গায়ত্রীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়াছিল, তবুও প্রাণপণ চেষ্টায় সে কথা বলিতে লাগিল,—"তুমি পুরুষ,তুমি পারো, আমি পারি নে। তুমি যা ক'রলে সাজে, আমি তা ক'রলে সাজে না। ভদ্রঘরের মেয়েদের কেউ মদ চোখেই দেখেনি; খাওয়া-ছোঁয়া তো ঢের দূরের কথা।"

সুধীশ বলিল, "ওটা শুধু সংস্কার; বিলেতে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা খায়।"

গায়ত্রী বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই নে, তবে বিলেতের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের এক আসনে বসিয়ো না। ওদের দেশ, ওদের সমাজ আমাদের থেকে ভিন্ন।"

সুধীশ ঈষৎ জড়িত স্বরে বলিল, "মিছে কথা বাড়াচ্ছ কেন? আমি বলছি, অনুরোধে তুমি এটুকু পার না? বেশী তোমায় দিইনি, নেশা হবে না; শুধু আমাকে আনন্দ দেবার মত একটুখানি দিয়েছি, এতে তোমার আপত্তি কিসের? এটুকু খেতেই হবে তোমায়।"—সে গায়ত্রীর মুখে গ্লাসটা ধরিল।

গায়ত্রী তাহার পানে নিরুপায় দৃষ্টিতে চাহিল, তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিল, তাহার গালে দরদর ধারায় অশ্রু গড়াইয়া আসিল। কাঁপিতে কাঁপিতে সে ঢোক গিলিল। সুধীশ টেবিলের উপর গ্লাসটা রাখিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "কি খেলে? ও কি মদ?"

গায়ত্রী অবসন্ন ভাবে টেবিলে মাথা রাখিল। সুধীশ তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতেই প্রশ্ন করিল, "কি খেলে? মদ না কি?"

গায়ত্রী তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "ও তবে কি? খেতে মিষ্টি মিষ্টি?"

সুধীশ হাসি থামাইতে পারে না; শেষে বলিল, "সরবৎ খেয়েও নেশা হ'ল না কি?"

গায়ত্রী অবিশ্বাসের সহিত বলিল,—"মদ নয়! তবে কি? তুমি আমায় ঠাট্টা কোচ্ছ, সত্যি ক'রে বলো না।"

সুধীশ হাসি থামাইয়া বলিল, "সত্যিই বলছি—ও সরবৎ, খেয়ে বুঝতে পারলে না? তবে বোতলটা মদেরই। একটু মজা করবার লোভে এনেছিলুম, ভাবলুম, দেখি তুমি কি করো।"

এবার গায়ত্রী হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; সুধীশের বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুধীশ সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে

বলিল, "কি জন্ম এত কান্না রাণু! যখন মদ জেনে ঢেলে দিলে তখন কাঁদলে না, এখন ওটা সরবৎ জেনে এত কান্না!" তাহার পর গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "সত্যি মদ হ'লে কি আর দিতে পারতুম? নিজে যাই হোক, সকল পুরুষই স্ত্রীকে আদর্শ নারী দেখতে চায়। তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী!"

একটু পরে গায়ত্রী শান্ত হইল; নিজের বোকামীর জন্য লজ্জিত ভাবে হাসিল।

সুধীশ বলিল, "ভেবেছিলুম, তুমি খুব রাগ করবে, চেঁচামেচি, হৈ-চৈ ক'রে একটা কুরুক্ষেত্রের ব্যাপার করে তুলবে; কিন্তু তুমি কিছুই করলে না,—তাই আমার এমন প্ল্যানটা নষ্ট হয়ে যায় দেখে তোমায় খেতে বললুম। কিন্তু সত্যিই আশা করিনি যে—তুমি খাবে; ভেবেছিলুম, টান দিয়ে ছুড়ে ফেলে হয় তো আমাকে জোরে ধমকিয়ে দেবে।" তাহার পর তাহার গলার হারটা নাড়িতে নাড়িতে হাসিয়া বলিল, "তোমার গায়ে একটুও আধুনিকতার বাতাস লাগেনি দেখছি! একেবারে সেই পৌরাণিক যুগের সতী-সাধ্বীই র'য়ে গেছ। অত ভাল মানুষ হয়ো না গো! নিজের মানুষটিকে একটু শাসনে রেখ! জান তো, তোমার স্বামীটি কেমন রত্ন!"

গায়ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি কি জানি, ও-সব তোমার দুষ্টুমী? ভাবলুম, নেশার ঝোঁকে জেদ ধরেছ, এখন যদি না বলি, জেদ বেড়ে উঠ্‌লে শেষে একটা কেলেঙ্কারী ক'রে বসবে। মা দুর্গাকে স্মরণ করে খেলুম, যা করেন মা সতীরাণী! এটুকু বিশ্বাস ছিল, নেশার ঝোঁকে তুমি যাই বলো, স্বাভাবিক জ্ঞানে এ কথা মনে হ'লে তুমি লজ্জা পাবে।" একটু থামিয়া বলিল, "সবই মিথ্যে, কেবল কতকগুলো কি ছাই কথা ব'লে মনটা খারাপ করে দিলে।"

সুধীশ হাসিমুখে বলিল, "কি ছাই কথা বললুম?"

গায়ত্রী অভিমান-ভরা সুরে বলিল, "বললে না? রাত দুটোয় টলতে-টলতে আসা,—হেন-তেন কত কি! ওই কথাগুলো শুনলে বুঝি খুব সুখ হয়?" সে দুই হাতে চোখ মুছিতে লাগিল।

সুধীশ তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "বোকার মত একটু মজা করতে গিয়ে তোমার মনে ব্যথা দিলুম, আমায় মাপ করো।" মিনিট-খানেক নীরব থাকিয়া বলিল, "হাঁ, সবই মিথ্যে কথা। আমি যা, তা সবই তোমায় জানিয়েছি, দোষ-ত্রুটি কিছুই লুকোই নি। আর ঈশ্বর যেন কোন দিন তোমার কাছে লুকোবার প্রবৃত্তিও না দেন।" একটু থামিয়া আবার বলিল, "মনটা আমার বড় দুর্ব্বল, চলবার পথ আমি বেছে নিতে পারি নে,—তুমি আমায় আলো দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো।" পুনরপি বলিতে লাগিল, "যদি কোন দিন দোষ-অপরাধ করে ফেলি, তবে আজকের এই মন নিয়ে আমায় মার্জ্জনা ক'রো রাণি! মনে রেখ, অতীতে যাকেই ভাল-বেসে থাকি, তোমার চেয়ে বেশী অধিকার কেউ পায়নি, —আজ আমি একান্ত তোমারই। তোমার ষোল আনা অধিকারের এক কণা তুমি ছেড়ে দিয়ো না।"

গায়ত্রী উত্তর দিল না, দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া বুকের উপর পড়িয়া রহিল। উঃ, কি ভয় দেখাইয়াছিল সুধীশ, এখনও তার বুকের কাঁপুনি থামে নাই।

সুধীশ সহসা অনুরাগরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "গায়ত্রী!"

গায়ত্রী তদবস্থ থাকিয়াই বলিল, "বলো।"

সুধীশ আগ্রহ-ব্যাকুল স্বরে বলিল, "আমি তোমায় ভালবাসি?"

সুধীশের মুখখানি নিজের মুখের উপর নামাইয়া আনিতে আনিতে গায়ত্রী স্মিত হাসিয়া বলিল, "কেন সন্দেহ হয়? বাসো বৈ কি!"

সুধীশ সংশয়জড়িত স্বরে বলিল, "সত্যি বাসি? তুমি তাতে তৃপ্তি পাও? সত্যি?"

গায়ত্রী তাহার গালে গাল বুলাইতে বুলাইতে উচ্ছ্বসিত কৌতুকের সহিত বলিল, "কেন পাব না শুনি? আগে একবার তো আমার বিয়ে হয়নি, এর আগে স্বামী নিয়ে ঘরও করিনি যে, ওর কমবেশী আমার জানা থাকবে।"

সুধীশ মুগ্ধ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বাঃ! গায়ত্রী তো বেশ কথা বলিতে শিখিয়াছে! গায়ত্রী তাহার চুলের ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে বলিল, "তুমি কি আমায় আজ ভালবেসেছ? বেসেছ সেই আমার অসুখের সময়। সেই যখন রাত জেগে আমার মুখপানে চেয়ে বসে থাকতে। রোগের যাতনার মধ্যেও কত

সান্ত্বনা পেতুম যে এই মুখখানি দেখে, তা আমিই জানি। যখন এই নরম হাত দু'খানি মাথায় বুলিয়ে দিতে, তখন মনে হ'ত, আমি যেন এমনি ভাবে অসুখ ক'রে পড়ে থাকি, আর তোমার সেবা পাই!—সেই সময় থেকেই তুমি আমায় ভালবাসতে আরম্ভ ক'রেছ।"

সুধীশের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, "সত্যি? তুমি তা বুঝতে পারতে?"

গায়ত্রী তাহার বুকে মাথার মৃদু আঘাত করিতে করিতে বলিল, "হাঁ গো ভোলানাথ, পারতুম বৈ কি! ভাল না বাসলে, অত প্রাণ দিয়ে সেবা করতে পারতে কি? সারা দিন এই খাটুনি, আর সারা রাতই আমার মুখ চেয়ে বসে থাকতে; কষ্ট একটু কমাবার জন্যে কি প্রাণপণ আকিঞ্চন করতে, আমি কি দেখতে পেতুম না? কিন্তু ছাড়ো, উঠি, কোলটায় যে ব্যথা ধরে গেল, দু'ঘণ্টা ঠায় বসে আছি। এত আদর ক'রেও মনে সংশয় জাগে,—ভালবাস কি না? আর কি ক'রে ভালবাসবে?"—গায়ত্রী সুধীশের নাসিকা ধরিয়া টানিয়া দিল।

তাহার প্রসন্ন হাসির দীপ্তিতে সুধীশের অন্তর আলোকিত হইয়া উঠিল।

১৮

সুধীশের সহিত গায়ত্রীর বিবাহ হইবার পর ছবি বড়ই মুস্কিলে পড়িল। হিমানী বলে, তোদের পিসেমশায়; গায়ত্রীও বলে, তোদের পিসেমশায়; অথচ সে জানে সুধীশ তার বাবা!

দিন-পনের-কুড়ি সে কোনও মতে এটা সহিয়া লইল, কিন্তু অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া এক দিন হিমানীকে সে তার সঙ্কটের কথা জানাইল।

শিশু না হইলে তাহারা মায়ের মুখের বিবর্ণতা দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিত। হিমানী প্রথমটা কথা বলিতে পারিল না; তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল,—"আমি কি সাধে তোমাদের বোকা বলি? ঠাট্টা ক'রে পিসেমশায় ও-কথা বললেন, আর তুমি তাই বিশ্বাস ক'রে ফেললে! আমার কাছে ব'ললে ব'ললে, আর কারুর সামনে খবরদার এ কথা ব'ল না; শুনলে লোকে তোমাদের হনুমান ব'লবে।"

ছবি অত কথা বুঝিল না, শুধু ক্ষুণ্ণ বেদনার সহিত বলিল, "তবে কি উনি আমাদের বাবা নন?"

হিমানীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল, কোন মতে তাহা সম্বরণ করিয়া বলিল, "না। যেমন বোকা তোমরা! যাও, বরং জিজ্ঞেসা ক'রে এসো।"

ছেলে-মেয়েকে সরাইয়া দিয়া হিমানী অশ্রু-রুদ্ধ দৃষ্টি সুদূর আকাশে প্রসারিত করিয়া মর্ম্মন্তুদ কাতর অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, "কি ক'রলে সুধীশ, ছেলে-মেয়ের কাছে আমার মুখ দেখাবারও উপায় রাখলে না!"

ও-দিকে নব-দম্পতির ঘরে অন্যরূপ অভিনয় চলিতেছিল। গায়ত্রী এ কয় দিন সুধীশের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিয়াছিল, নব-পরিণীত পুরুষের মনে সাধারণতঃ পত্নীর সান্নিধ্য লাভের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা উগ্র হইয়া উঠে, সুধীশের মনে তাহা নাই। সে গায়ত্রীকে ভালবাসে, আদর-সোহাগের ত্রুটি করে না, কিন্তু আগাইয়া আসিবার চেষ্টা তাহার নাই; গায়ত্রী যতক্ষণ তাহার কাছে থাকে, ততক্ষণই সে গায়ত্রীর, কিন্তু সে অন্তরালে গেলেই, ভাবপ্রবণ সুধীশ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। হয় তো তাহার অবচেতনা তাহাকে লজ্জা দেয়, হয় তো অন্তরের কাছে তাহাকে জবাবদিহি করিতে হয়। গায়ত্রী বুঝিয়াছিল, যদি স্বামীর প্রেম সে পরিপূর্ণ ভাবে চাহে, তবে তাহাকে সর্ব্বদা ছায়ার মত স্বামীর পাশে-পাশে থাকিতে হইবে, সর্ব্বদা আদর সোহাগের সুবর্ণ শৃঙ্খলে তাহাকে বাঁধিতে হইবে। এ মদমত্ত করী শুধু রাঙ্গা রাখীতে বাঁধা পড়িবে না।

সুধীশ ঈজিচেয়ারে পড়িয়া কি একখানা জার্নাল পড়িতেছিল। আহারান্তে দু'টি পান লইয়া গায়ত্রী ঘরে ঢুকিল। চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া একটা পান মুখে ফেলিয়া অপরটা সুধীশের মুখের কাছে ধরিল।

সুধীশ বই হইতে মুখ তুলিয়াছিল, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি তো পান খাই না।"

গায়ত্রী বলিল, "নাই বা খেলে, দিচ্ছি খাও। যাচা পানে না বলতে নেই। পান খেলে কি সুন্দর তোমায় দেখায়।" সে পানটা সুধীশের মুখে পূরিয়া দিল।

গায়ত্রী একখানি গাঢ় জাম-রংয়ের চওড়া জরীপাড় সাড়ী পরিয়াছিল, গায়ে একটা আসমানী ভায়েলার জামা, কপালে কালো বড় একটা টিপ, ওষ্ঠাধরে সুলোহিত

তাম্বুলরাগ। সব মিলিয়া তাহাকে অত্যন্ত মনোরম দেখাইতেছিল।

সুধীশ তাহার মুখপানে বদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, এবার তাহার গালে টোকা মারিয়া বলিল, "কোন্ অসুরকে জয় করতে চলেছ তিলোত্তমা? এ যে ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তি!"

গায়ত্রী আরক্তমুখে বলিল, "অমন ক'রে ঠাট্টা করলে এবার থেকে ময়লা কাপড়ই পরে থাকব!"

সুধীশ তাহার মুখখানি মুখের উপর টানিয়া লইতে লইতে বলিল, "তাতেও তোমায় কুশ্রী দেখাবে না রাণু, তুমিই যে সুন্দর, তোমার সবই সুন্দর লাগবে না?"

গায়ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "থাক, আর অত বাড়াবাড়ির দরকার নেই। আমি সুন্দর? তুমি আর আমি! কিসে আর কিসে? তোমার পায়ের কড়ে আঙুলটার সঙ্গেও আমার তুলনা হয় না।"

সুধীশ সহাস্যে বলিল, "তোমার সঙ্গে যে আমার পায়ের আঙুলটার তুলনা হয় না, এ কথা আমিও একশো বার স্বীকার করি। তুমি একটা প্রমাণ মানুষ, আঙুলটার সঙ্গে তার তুলনা হয় কি ক'রে?" তাহার পর তাহার হাতের আঙুল টানিতে টানিতে বলিল, "তুমি আমার কোন খুঁত দেখতে পাও না, কেমন? আমি বুঝি বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি?"

গায়ত্রী কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল, "জানি না, যাও। ওঠো, আর পড়তে হবে না।"

সুধীশ বলিল, "আমি ত দিনে ঘুমুই না।"

গায়ত্রী তাহার হাত ধরিয়া টানিল, বলিল, "সে আমি জানি। ওঠো, ওঠো, আমি যেন তোমায় ঘুমুতেই বলছি! চলো, সোফাটায় একটু বসি।"

অগত্যা সুধীশ বই রাখিয়া উঠিল। সুধীশ বসিলে গায়ত্রী তাহার কোলে মাথা দিয়া শুইল, দুই হাতে তাহাকে দৃঢ়বেষ্টন করিয়া মুখখানি তাহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

সুধীশ স্বীকার করিল, তাহার বিক্ষিপ্ত অনুগত হৃদয়কে আয়ত্তে আনিতে এই গায়ত্রীর মত তীক্ষ্ণধী নারীরই প্রয়োজন ছিল। সে আবেগভরে গায়ত্রীর চোখে-মুখে প্রেমের চিহ্ন আঁকিয়া দিতে লাগিল। গায়ত্রী গভীর পুলকোচ্ছ্বাসে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

তাহার পর কি ভাবিয়া সুধীশ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, রাণু, আমাদের যদি বিয়ে না হ'ত? তোমরা বাড়ী যেতে চাইলে যদি আমি সহজেই যেতে দিতুম? তুমি যে আমায় এত ভালবেসেছিলে,—কি ক'রতে তখন?"

গায়ত্রী আতঙ্কিত হইয়া উঠিল; আর সে ভয় ছিল না বটে, তবু তার মনে হইল, সে বুঝি সুধীশের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে! সে বাহুবেষ্টন দৃঢ়তর করিয়া শঙ্কিত অভিমানের সহিত বলিল, "আমি তাহ'লে কি বাঁচতুম?—ভেবে ভেবেই মরে যেতুম!"

সুধীশ শুষ্ক হাসিল, কত সরল আর্ত্ত উক্তি! মনে করিয়াছে, বিচ্ছেদ অসহ্য হইলে বাঁচা যায় না। তা যদি হইত, তবে হিমানীও মরিত, সুধীশও মরিত!......কিন্তু তাহা তো হয় নাই; হিমানী? জীবিতা আছে, আর সুধীশ তৃতীয় দফায় গায়ত্রীকে বুকে লইয়া প্রেমচর্চ্চা করিতেছে!

মনে আঘাত পাইলে মানুষ মরে না, ব্যথা পায় মাত্র। জীবনপথে চলিতে চলিতে মানুষ পুনঃ পুনঃ আঘাত খায়, কিন্তু তাহাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে না। বেদনায় কুঞ্চিত, ক্লিষ্ট, আতুর হইয়া ওঠে, আবার অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়, তাহার গন্তব্য পথে—থামিবার উপায় নাই, থামিতে পারেও না, ইহারই নাম জীবন-যাত্রা!

দুয়ারের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সহসা বলিল, "সরো, ছবি, মীনু—"

গায়ত্রী হাত সরাইয়া লইল, মাথা নামাইল না, বলিল, "ছবি, মীনুকেও লজ্জা করতে হবে না কি? ওদের লজ্জা করতে আমি পারব না, ওরাই আমার প্রথম সন্তান!"

প্রথম সন্তান! সুধীশের বুকের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিল। গায়ত্রী না জানিয়া কি কথা উচ্চারণ করিল! কষ্টে সে আত্মসম্বরণ করিয়া লইল।

গায়ত্রী ডাকিল, "আয় ছবি, মুনু।"

তাহারা নিকটে আসিল; ছবি সুধীশের দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনি আমাদের বাবা নন?"

সর্ব্বনাশ! গায়ত্রীর সম্মুখে এই প্রশ্ন! সুধীশ চোখে অন্ধকার দেখিল।

তাহাকে উদ্ধার করিল গায়ত্রী; বলিল, "ছি ছি ছি, বোকা ছেলে! উনি যে তোমাদের পিসে ম'শায়, বাবা ব'লতে আছে কি? তুমি এত বোকা ছেলে, আমি কি জানতুম? তোমার বাবাকে তুমি ভুলে গেছ? আর কখন এমন বোকার মত কথা ব'ল না,—ছি ছি ছি!"

ছবি সত্যই বুঝিল, সে অত্যন্ত বোকা। মা এবং পিসিমার পুনঃ পুনঃ বোকা ছেলের উল্লেখে সে বুঝিল, সবটাই তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা। কিন্তু এ হেন স্নেহময় ব্যক্তিকে পিতা নহেন জানিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছিল। গায়ত্রী বসিতে বলিলেও ছবি মৃণা বসিল না, 'মায়ের কাছে যাই' বলিয়া চলিয়া গেল।

গায়ত্রী সুধীশের দিকে চাহিল। সে তখন শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে চাহিয়া ছিল। মনে হইল, সে কোন গভীর চিন্তায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। গায়ত্রী লক্ষ্য করিয়াছে, সুধীশ কথা বলিতে বলিতে এক-এক সময় এমনই অন্যমনস্ক হইয়া যায়। গায়ত্রী বুঝিয়াছে, অত্যধিক ভাবপ্রবণতাই তাহার এই স্বসৃষ্ট অশান্তির হেতু। গত-জীবনে অনেকেরই অনেক ঘটনা থাকে, দুঃসহ পুত্র-শোকও লোকে ভোলে, কিন্তু সুধীশ আজও যে অতীত কালের স্মৃতি এমন করিয়া বুকে আঁকড়াইয়া আছে—তাহার কারণ, তাহার প্রকৃতি অতিশয় ভাবপ্রবণ!

গায়ত্রী তাহার গালে হাত দিয়া মুখ ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "কি ভাবছ?"

সুধীশ ম্লান হাসিয়া বলিল, "কৈ, কিছুই তো নয়।"

গায়ত্রী বুঝিল, যে কোন কারণেই হোক, সুধীশের মনে বেদনার ছায়া পড়িয়াছে। গায়ত্রী তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বলিল, "তবে কোন গল্প বল।"

সুধীশ শুষ্ক হাসির সহিত বলিল, "কি গল্প বলব? আমার গল্পের ষ্টক ফুরিয়ে গেছে।"

গায়ত্রী ছাড়িল না, বলিল, "অন্য গল্প না থাকে, তোমার সবিতার গল্পই বল।"

মনটা তাহার হিমানীর জন্য বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছিল, গায়ত্রী অজ্ঞাতে সেখানেই আঘাত করিল। সুধীশের চোখে অকস্মাৎ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইয়া তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া ভারী-গলায় বলিল, "তার কথা কেন তুলছো রাণি, সে বড় অভাগী!"

সুধীশের চোখে আলো পড়িয়াছিল, তাহা চিক্-চিক্ করিয়া উঠায় গায়ত্রী তাহা দেখিতে পাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং দুই হাতে তাহার মুখ ধরিয়া নিজের দিকে ফিরাইতে ফিরাইতে বলিল, "ও কি? চোখে জল এলো? আমি তো তোমায় ব্যথা দিতে চাইনি—এমনি কথার কথা বলছিলুম!"

সুধীশ হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিয়া ফেলিল, ঈষৎ হাসিয়া অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিল।

গায়ত্রী তাহার মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে লজ্জিত ভাবে বলিল, "তুমি আমায় ব্যথা দিতে চাও না, কিন্তু আমি তোমায় বড় ব্যথা দিই। বুঝতে আমিও পারি, কিন্তু তা চাপবার ক্ষমতা আমার নেই।"—একটু মৌন থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিত স্নেহ-ভরে বলিল, "তুমিও বড় অভাগী গায়ত্রী,—তোমার চোখের সামনে বসেই অন্য নারীর জন্যে তোমার স্বামীর চোখের জল পড়ে।"

গায়ত্রী তাহার একখানা হাত দুই হাতের মধ্যে লইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে বলিল, "প্রেমের জন্যে অমর হ'য়ে আছে কে বল তো?"

সুধীশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সাবিত্রী!"

গায়ত্রী বলিল, "না, ও শুধু হিন্দুর মধ্যে। অমর হয়ে আছে মমতাজ!"

সুধীশ ঘাড় হেলাইয়া স্বীকার করিল, "ঠিক বলেছ।"

গায়ত্রী বলিল, "সাহজাহানের মমতাজ ছাড়া আরও বেগম ছিল তো?"

সুধীশ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়াছিল, ঘাড় হেলাইয়া সায় দিল, "ছিল।"

গায়ত্রী বলিল, "যিনি মমতাজের স্মৃতি পাথরের গায়ে অমর ক'রে রেখে গেছেন, তিনি তো তাহ'লে বহুপত্নীক ছিলেন?"

সুধীশ নিস্তব্ধ ভাবে চাহিয়া রহিল।

গায়ত্রী বলিল, "অন্য বেগমদের যে তিনি ভাল বাসেননি, ঐতিহাসিক তার কোন প্রমাণ দিতে পারেননি তো? তবু মমতাজ ছিল তাঁর ধ্যানের দেবী, তিনি

তাজমহলের পানে চেয়ে চেয়ে জীবনের শেষের দিনগুলি কাটিয়েছেন—কেমন এ কথা সত্য নয় ?"

সুধীশ বিমূঢ় ভাবে চাহিয়া রহিল,—গায়ত্রী এ কিসের ভূমিকা করিতেছে ?

গায়ত্রী বলিতে লাগিল, "তাজ—যে বেগমদের সতীনের প্রতি স্বামীর অফুরন্ত অনুরাগের জ্বলন্ত নিদর্শন, কিন্তু তাজ তৈয়েরী হওয়ার সময় তাঁরা কেউ কোন উৎকট কাণ্ড করেছিলেন ব'লে জানা যায় না। এর থেকে এই বোঝায় যে, মমতাজ যে তাঁদের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে, তা তাঁরা বুঝেছিলেন। এ নিয়ে হিংসা-দ্বেষ ক'রে কোন লাভ ছিল না। আইনতঃ অধিকার সমান হ'লেও, মনের অধিকার নিজের শক্তিতে ক'রে নিতে হয়, যা তাঁরা পারেননি।" ইহার পর গায়ত্রী একটু নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিল,"সবিতা তোমার মমতাজ, ওতে ব্যথা পেয়ে কি ক'রব ? তার স্মৃতি তোমার কাছে চিরদিন অম্লান থাকবে। সাহজাহানের অন্য বেগমরা যেমন ছিলেন, আমিও তোমার তাই !

সুধীশ অবাক্ হইয়া গায়ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল ; গায়ত্রী বলে, সে অশিক্ষিতা—কিন্তু যত সহজে, যত অল্প কথায় বিশদ ভাবে সে সুধীশের মনের ভাব বিশ্লেষণ করিয়া দিল, ইহার অপেক্ষা অল্প কথায় কি কোন এম-এ পাশ মেয়েও পারিত ? ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সুধীশ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,"না, তা নও। মমতাজ সাহজাহানের স্ত্রী ছিলেন,—তার সন্তানদের মা,—! যে অধিকার তুমি পেয়েছ, এর পূর্ব্বে আর কেউ সে অধিকার পায়নি, তাদের ভালবেসেছিলুম সত্যি, কিন্তু কোন অধিকারেই তোমার ওপর তারা উঠতে পারেনি,—সবিতাও নয়। তুমি আমার দেহ, মন, অর্থসম্পদ, যেখানে যা কিছু আমার নিজের বলতে আছে, সব জিনিসেরই মালিক। এ অধিকার সহধর্ম্মিণীর থাকে, তা ছাড়া কোন নারীর থাকতে পারে না। যে আমার সমস্তটার অধিকার পায়নি, সে মমতাজ হবার অধিকার পাবে কোথা থেকে ?"

গায়ত্রী সান্ত্বনা-কোমল স্বরে বলিল, "আমি তো সে কথা বলিনি, আমি মনের অধিকারের কথা বলছিলুম।"

সুধীশ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভুল বলছ গায়ত্রী, মনের অধিকার তোমার কারুর চেয়ে এক তিলও কম নয়। সত্যিই কি আমি এতদিন এ ভাবে তাকে ভেবেছি ? তার স্মৃতি তো নিজে এসেছিল, কিন্তু—"সহসা সুধীশ জিহ্বা সংযত করিল, এ সে কি করিতে চলিয়াছিল ? এখনই আর এক মিনিটের মধ্যেই সে গায়ত্রীর কাছে সবই তো প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল আর কি ? উঃ, বড়ই সে সামলাইয়া লইয়াছে !

গায়ত্রী প্রশ্নহীন চোখে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে বলিল, থাক গায়ত্রী, জানতে চেয়ো না, আমি অসাবধান হয়ে কি একটা ব'লে ফেলছিলুম ; না শুনেছ ভালই, শুন্‌লে শুধু মনে দুঃখ পেতে।" তাহার পর বলিল, "মনে কি দুঃখ পেলে রাণু ! আমি বললুম না শুধু তুমি ব্যথা পাবে ব'লেই।...আমার ওপর অবিশ্বাস আসছে ?"

গায়ত্রী শুধু তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "ছিঃ !"

সুধীশ বলিল, "তাহ'লে আমার ওপর বিরক্ত হওনি তো ?"

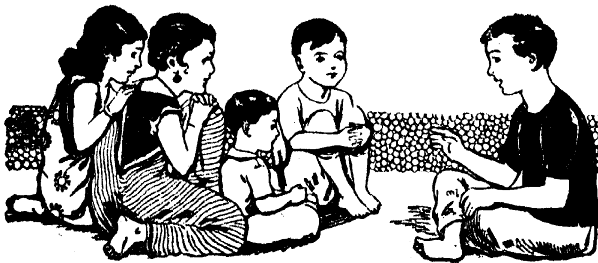
গায়ত্রী বলিল, "এতে রাগের কি আছে ? তুমি লুকো-চুরি কিছুই করোনি, সবই আমায় জানিয়েছ। তা ছাড়া, আমাকেও তো আদর-যত্নের ত্রুটি করোনি। তাকে ভুলতে না পারায় তুমি অশান্তিতে আছ বটে, কিন্তু আমায় তো অশান্তি দিচ্ছ না—"

সুধীশ গায়ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার বুকে মাথা রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল, "তুমি ওতে আমায় ভোলাতে পারবে না। কিন্তু, আমি ওকে ভুলব,—ওকে ভুলব। তোমার এত ভালবাসা, এত মমতা, এর কি কোন দাম নেই ? ..তুমি তাকে আমায় ভুলিয়ে দাও, তুমি তোমার ভেতর আমায় ডুবিয়ে রাখ, আমার সমস্ত সত্তাটাকে তোমার করে নাও—"

গায়ত্রী তাহার কুঞ্চিত চুলের ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে বলিল, "নিয়ে ছিইতো, তুমি তো আমারই !" সে সুধীশের কপোল চুম্বন করিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।



নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা

—(রূপকথা)—

৯

ওদিকে বারোটি তরুণ সাধুকে নজর-বন্দী করে রাণী নীলার মিছিল যেমন লোকের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, অমনই সেই জায়গাটিতে সহরের লোক-জন এসে ভীড় করে মহা হৈ-চৈ আরম্ভ করলে।

সকলেরই মুখে এক কথা—সাধুর এ অপমান আমরা সহ্য করব না, এর প্রতীকার চাই।

মুরুব্বীগোছের এক জন অচেনা লোক এই সময় রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর দেউড়ী-সংলগ্ন উঁচু চাতালটির ওপর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমরা তাহ'লে কি করতে চাও?

জোর গলায় এক-সঙ্গে অনেকেই ব'লে উঠলো—আমরা মহারাণীকে জানাবো, তাঁর প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতীকার চাইব, সকলে সেইখানে জুটে ধরণা দেব।

মুরুব্বী লোকটি বললেন—তাতে কিছুই হবে না। বেশী বিরক্ত করলে হাতী চালিয়ে তোমাদের সকলকে হাঁকিয়ে দেবে, না চলে যাও তো, পিষে মারবে সকলকে।

সকলে উত্তর দিলে—বেশ, আমরা মরতে রাজী আছি।

মুরুব্বী জিজ্ঞাসা করলেন—তাতে কি লাভ হবে তোমাদের? পড়ে-পড়ে মার খায় ছাগল, আর, এ যুক্তি যারা দেয়, তারা—পাগল। তোমরা কি ছাগলের মত মরে কাজ হাসিল করতে চাও?

এই মানুষটির কথা লোকগুলির মনে দোলা দিল। জনকতক মাথাওয়ালা লোক পরামর্শ করে সেই মুরুব্বী-মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করলে—তাহ'লে আপনি কি করতে বলেন? যদিও আমরা আপনাকে চিনি নে, নতুন দেখ্‌ছি; কিন্তু আপনার কথাগুলি আমাদের মনে ধরেছে। আপনিই বলুন ত, আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি? কোন পথে চলব?

মুরুব্বীটি ব'ল্‌লেন,—সেই কথা বলবার জন্যেই ত আমি এখানে এসেছি। যে পথ আমি দেখিয়ে দেব, তাতে সাহস করে এগুতে পারলেই তোমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে। তোমরা তাতে রাজী আছ?

শত-শত কণ্ঠে এক-সঙ্গে উত্তর হ'ল—হ্যাঁ, আমরা রাজী।

মুরুব্বী এবার বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন—তাহ'লে শোন আমার কথা। ঐ সাধু যে দিন প্রথম তোমাদের দেখা দেন, সে দিনটির কথা তোমাদের মনে আছে?

বহু কণ্ঠের উত্তর শোনা গেল—খুব আছে। তিন-তিনটি মরা ছেলেকে সে দিন তিনি বাঁচিয়েছিলেন।

মুরুব্বী আবার প্রশ্ন করলেন—আর সে দিন তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা তোমাদের মনে আছে?

জনতার ভেতর থেকে উত্তর এলো—আছে!—সাধু বলেছিলেন, আমরা সকলে ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছি। ব্যাধি আমাদের সমাজ-দেহ, আমাদের মন আচ্ছন্ন করে ফলেছে। সত্য আর সাহস দিয়ে এই ব্যাধির উচ্ছেদ করতে হবে, তাহ'লেই আমাদের মুক্তি।

মুরুব্বী এবার জিজ্ঞাসা করলেন—সাধুর কথায় তোমাদের আস্থা আছে? তাঁর কথা সকলে বিশ্বাস কর?

বহু কণ্ঠে উত্তর এল—নিশ্চয়ই; তিনিই আমাদের জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

মুরুব্বী বললেন—আজও তোমাদের চরম বিপদে দেবদূতের মতই তিনি এসেছিলেন। তোমাদের গৃহগুলি রক্ষা করে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে রাণীর নজরবন্দী হ'য়ে মিছিলের সাথে-সাথে চলেছেন। তোমরা তাঁর মুক্তির জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বীরদর্প করছ, কিন্তু তাঁর অনুসরণ করতে তোমাদের সাহস হয়নি।

এই কথাগুলো সেই বিপুল জনতার সমস্ত লোককে পলকের মধ্যে স্তব্ধ করে দিল। কিছুকাল কারও মুখে একটিও কথা নেই! কিন্তু অল্পকাল পরেই সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত সেই বিপুল জনসঙ্ঘ গর্জ্জন করে উঠল—আমরাও মিছিল করে বেরুব, এগিয়ে গিয়ে সাধুর সাথী হব।

মুরুব্বী বললেন,—মনে রাখো সাধুর কথা; আমাদের এখন প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা, আর সাহস। সাধু করেছেন সত্যপ্রকাশ। তোমরা তার সাক্ষী, স্বচক্ষে সব দেখেছ। রাজপথ বেয়ে অজগরের মত মন্থর গতিতে চলেছে রাণীর মিছিল, তোমরা বন্যার বেগে ভিন্ন-ভিন্ন পথে এগিয়ে চলো—দেশকে জাগিয়ে তোল, অনাচার এই রাস্তায় হয়েছে। জানিয়ে দাও সকলকে—সপার্ষদ সেই মহাপুরুষ চলেছেন মিছিলের সাথে; দাম্ভিক রাণী আর ঐ নিষ্ঠুর সিংহলী এর প্রতিক্রিয়া দেখে জ্বলে মরুক ঈর্ষায়।

সমুদ্রের স্রোতের মত জনতা তখন ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে। সবারই মুখে এক কথা, এক সুরে সবাই বললে—চলো ভাই সব, চলো, এগিয়ে চলো।

মুরুব্বী মানুষটি তখন তাড়াতাড়ি হাত তুলে তাদের উদ্দেশে বললেন,—ভাই সব, সাধুর মত শান্ত হও, ধৈর্য্য হারিও না। মনে রেখো, আগেই তোমরা স্বীকার করেছ—আমি যে পথ দেখাবো, সেই পথেই তোমরা এগোবে। তবে কেন চঞ্চল হবে?

পুতুলের মত অতগুলি লোক এক-সঙ্গে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো, কারুর মুখে কোন কথা নাই।

তখন মুরুব্বী-লোকটি জনতার ভেতরে ঢুকে মানুষ বাছতে

আর শুরু করলেন। প্রায় হাজার লোকের ভেতর থেকে নব্বই জন লোককে তিনি বেছে নিলেন। ত্রিশটি দলে এই বাছাই করা মানুষগুলিকে ভাগ করা হ'ল। তিনটি করে লোক নিয়ে এক একটি দল তৈয়েরী করে তিনি ব'ললেন—রাণীর মিছিল যে যে রাস্তা দিয়ে চলেছে, সেই সব রাস্তার চার পাশের অঞ্চলে আমাদের কাজ,—প্রচার করতে করতে যেমন আমরা এগোব, নতুন নতুন জায়গা থেকে এই ভাবে আবার নতুন-নতুন দল তৈয়েরী করে আমাদের সংখ্যা বাড়াবো। আর একটা গুপ্ত-কথা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করছি, শোন,—তোমরা শুনেছ, রাণী মিছিল করে দেশ-ভ্রমণে চলেছেন। কিন্তু আসলে তা নয়; এর পেছনে আর একটা রহস্য আছে। রাণী তাঁর মন্ত্রী-বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছেন—রাজ্যের সীমান্তে দেবকোটের প্রাসাদে মিছিল গিয়ে পৌছলেই সেইখানে রাজধানীর লোকের অজ্ঞাতে সিংহলী নীলাচলের সঙ্গে নীলাদেবীর বিবাহ হবে! তার পর রাজারাণী বর-বধূ বেশে মিছিল করে রাজধানীতে ফিরে আসবে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, এ বিবাহ বন্ধ করা, সমস্ত দেশকে মাতিয়ে-তুলে বাধা দেওয়া, ঐ স্বেচ্ছাচারিণী রাজকন্যা আর নীলাচলকে দাবিয়ে রেখে সাধুকে উঁচু করে তোলা।

বেশীর ভাগ যে লোকগুলিকে দলে নেওয়া হ'ল না, তাদের ভেতর থেকে কয়েক-জন এগিয়ে এসে এই সময় জিজ্ঞাসা করল—তাহলে আমাদের কি কাজ? আমরা কি করব?

মুকুন্দী উত্তর দিলেন—তোমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, ঐ সাধুর মতন কোন মহাপুরুষ যেন নীলাদেবীকে বিবাহ করে বাংলার সিংহাসন আলো করে বসেন, তোমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়।—চীৎকার না তুলে মনে মনে তোমরা এই কামনাই কর।

১০

মন্থরগতিতে রাণীর বিরাট মিছিল সীমান্তের পথে অগ্রসর হচ্ছিল।

কিন্তু এমনই রাণীর দুরদৃষ্ট, মিছিল কোন নগরে এসে পৌছলেই নগরবাসীরা সর্ব্বাগ্রে সসম্ভ্রমে রাণীর চতুর্দ্দোলার সামনে রক্ষিদল-পরিবেষ্টিত বন্দী সাধুদেরই জয়ধ্বনি করে। কোন স্থানে এসে মিছিল দাঁড়ালেই নগরের নর-নারীরা রাণী ও তাঁর ভাবী-স্বামীকে উপেক্ষা করে সাধুদেরই সম্বর্দ্ধনা করতে চঞ্চল হ'য়ে উঠে। সোনার চতুর্দ্দোলায় আসীনা জমকালো পোষাক-পরা রাণী কিম্বা তাঁর পিছনের সুসজ্জিত হাতীর পিঠে রাজ-পরিচ্ছদধারী নীলাচলকে দেখবার বা সম্বর্দ্ধনা করবার কোন আগ্রহই তাদের দেখা যায় না।

নীলা প্রথম প্রথম এই রকম উপেক্ষা গ্রাহ্য করেনি, কিন্তু তার সিংহলী বঁধুটি তাকে বুঝিয়ে দিল—এটা অগ্রাহ্য করবার বিষয় নয়, রীতিমত ভাববার ব্যাপার।

নীলা বললে—তুমি জান না, দেশের লোক সাধু বলতে অজ্ঞান হয়, তারা ভাবে সাধু আর দেবতা সমান পূজার পাত্র।

নীলাচল বললে—রাজাও ত দেবতার মত পূজার পাত্র। তাঁর প্রতি অভক্তি কি উপেক্ষার বিষয়?

নীলার মুখখানা এবার গম্ভীর হয়ে উঠল; সে নীলাচলের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তবে কি তোমার বিশ্বাস, এরা ইচ্ছা করেই এ রকম ব্যবহার করছে?

নীলাচল উত্তর দিল—আমি জোর করে বলছি রাণী, এরা তোমাকে অবজ্ঞা করে! আর সে অবজ্ঞা কেবল আমারই জন্য। আমাকেই তারা মনে-প্রাণে ঘৃণা করে রাণী!

নীলা বললে—আচ্ছা, আমি এর ব্যবস্থা করছি। এখন থেকে সাধুদের কাছে জনপ্রাণীও ঘেঁসতে পাবে না।

নীলাচল বললে—এই সাধুর দলটাকে আমাদের পরম শত্রু বলেই জেনে রেখ রাণী। এদের হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি! যেটা ওদের চাঁই, তার এত বড় আস্পর্দ্ধা—সে একটি দিনের জন্যও তোমাকে রাণীর সম্মান দিলে না! শুধু তাই নয়, সে বেটা এমনই বেয়াদপ যে, রাণীকে 'তুমি' বলে কথা কয়! এক একবার আমার ইচ্ছা হয়, ওদের সকলকে আচ্ছা করে চাবুক-পেটা করে গায়ের ঝাল মেটাই!

নীলা বললে—পথে সে কাজটা করা ভাল দেখাবে না, সকলের সামনে ঐ সাধুটার গায়ে হাত তোলা ঠিক হবে না। দেখনি, যমের দোসর যে সব রক্ষী, তারাও ঐ কয়েকটা সাধুর কাছে কেমন যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে! যতই হুকুম দাও, সাধুদের গায়ে ওরা হাত তুলবে না—এ কথা ঠিক জেনো।

নীলাচল মুখখানা বিকৃত করে ব'লে উঠলো—তোমার রক্ষী-দের কথা ছেড়ে দাও, ওরা নিতান্ত অপদার্থ! আমার যে সর্দ্দার আছে, দুনিয়ায় এমন কোন কাজ নেই—আমার হুকুমে যা করতে সে সঙ্কোচ বোধ করবে। দেখতে চাও ত, এখনি হুকুম দিয়ে দেখাতে পারি।

নীলা বললে—এখন থাক, আরও দু'-চার দিন যাক, যেদিন ওদের বেশী রকম বাড়াবাড়ি করতে দেখব—সেদিন তোমাকে প্রতীকার করতে বলব!

এই সাধুর দলটি এখন নীলাচলের যেন চক্ষুশূল হয়েছে। রাণীর চতুর্দ্দোলার সামনে এই সুশ্রী শ্রীমান্ সাধু কয়টির ভয়-সঙ্কোচহীন ভাবভঙ্গী তাকে যেন ক্ষেপিয়ে তুলেছে। বিশেষতঃ, এদের যেটি চাঁই—তার পানে চাইলেই নীলাচলের মনে হয়, এই সাধুর সর্দ্দারটির চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গী, মুখের হাসি, চোখের দৃষ্টি—প্রত্যেকটিই যেন তাকে উপহাস করছে! এর ওপর, নীলা যখন এই সর্দ্দার সাধুটির দিকে তার চাঁপার কলির মতন আঙ্গুলটি বাড়িয়ে ঠোঁটের কোণে হাসির একটু লহর তুলে বলে—'কি চমৎকার চেহারা ওর দেখেছ? কত সহর পার হয়ে ত এলুম এত দূর, কিন্তু এমন সুন্দর চেহারা আর একটিও নজরে পড়লো না!'

নীলার মুখে এ কথা শুনেই নীলাচলের বুকের ভেতরে যেন আগুন জ্বলে ওঠে, জ্বলন্ত লোহার শিক যেন তার কানে প্রবেশ করে! তাই সে মুখখানা বেঁকিয়ে উত্তর দেয়—'রাস্তার ভিখিরীদের দিকে চাওনি ত কোন দিন, সে দিকে চাইলে তাদের ভেতরেও অমন চেহারার ভিখিরী বিস্তর দেখতে পাবে। অনেকের চেহারা আরও ভাল—কার্ত্তিকের মত, কেবল ময়ূরটির অভাব।'

নীলার মুখে সাধুদের দলপতির চেহারার সুখ্যাতি বরং নীলাচলের সহ্য হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে তার সঙ্গে নীলা সেধে কথা কইছে, তা দেখলে তার সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধন টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়ে! সে তখন পাগলের মত ক্ষেপে উঠে, একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড বাধিয়ে বসে! নীলা তখন মুখ টিপে হেসে বলে—এই সাধু এত খবরও রাখে, সমস্ত দেশটি যেন ওর নখ-দর্পণে রয়েছে! তুমিও এক দিন ওর সঙ্গে আলাপ করে দেখো না, সত্যিই ভারী খুসী হবে।

নীলাচল চোখ-দুটো পাকিয়ে মুখখানার বিকট ভঙ্গী করে উত্তর দেয়—রাস্তার ভিখিরীর সঙ্গে আলাপ করবার সখ বা ফুরসৎ আমার নেই রাণী! তোমার এই সখ দেখলে, তোমার রুচি কি রকম বিগড়ে গেছে—তাই ভেবে আমার ভারী দুঃখ হয়! রাণীর দৃষ্টি অত নীচে নামবে কেন?

নীলা বলে—তাতে কি হ'য়েছে? সূর্য্যের কিরণের মত রাণীর দৃষ্টি সব জিনিসে পড়া উচিত। রাজা-রাণীরা পোষা পাখীর সঙ্গেও ত কথা কয়; তাতে তাদের মান নষ্ট হয় না।

রাণীকে উপেক্ষা করে সাধুদের ওপরে লোক-জনের ভক্তির বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে সে দিন নীলাচলের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর নীলা সাধুদের দলপতিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, বলতে পার সন্ন্যাসী ঠাকুর! নতুন কোন জায়গায় আমাদের মিছিল গেলেই লোকে তোমাদের নাম নিয়ে ঐ রকম ধ্বনি করে কেন? চতুর্দ্দোলায় রাজ্যের রাণী ব'সে আছেন, সে-দিকে কারুর লক্ষ্য নেই; অথচ তোমাদের পায়ের ধুলো নেবার জন্যে চারিদিক্ থেকে শত শত মাথা একসঙ্গে নুইয়ে পড়ে—এর মানে কি বলতে পার?

সাধু দিব্য সহজ স্বরেই উত্তর দিলেন—মানে খুব সোজা। ভগবানের দেওয়া দৃষ্টি, বুদ্ধি, আর বিচারশক্তি ওরা ছাড়তে পারেনি। তাই ওদের মতিগতি ঐ রকম।

মুখখানা শক্ত করে নীলা বললে—তোমার কথা যেন হেঁয়ালীর মত ধাঁধালো, তাই তোমার সোজা মানেটা বুঝতে পারলুম না! সাধু-সন্ন্যাসী হ'লেই বুঝি কথা পেঁচিয়ে বলতে হয়?

সাধু বললেন—সাধুরা সিধা রাস্তায় চলে, আর সোজা কথাই বলে; কিন্তু লোকে উলটো বোঝে।

মুখে এবার রাগের ভাব ফুটিয়ে নীলা বললে—বেশ ত, সোজা করে না হয় বুঝিয়েই দিলে।

সাধু একটু হেসে বললেন—ওরা চোখের দৃষ্টি আর মনের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে জেনেছে—চতুর্দ্দোলাটিকে ঘিরে সাধুর দলটি যখন নৌকোর মতন ভঙ্গীতে চলেছে, তখন রাজকন্যা নিশ্চয়ই এদের সাহায্যে ভবসমুদ্র পার হবার জন্যে পথে বেরিয়েছেন। তাই ওদেরও লক্ষ্য হয়েছে এই নৌকা।—বুঝলে?

নীলা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—বুজরুকি তোমার রাখ! লোকের ত আর কোন কাজ নেই—কেবল ভবসমুদ্র পার হবার নৌকোই তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে। নীলাচল যে কথা বলেছিল মিছে নয়। নিজেদের বড় করবার জন্যেই তোমরা এই সব ফন্দী করেছ।

সাধু বললেন—কিন্তু আমরা ত তোমার চতুর্দ্দোলাটির চারদিকে নজরবন্দী! ফন্দী আঁটবার আমাদের ফুরসৎ কোথায়?

নীলা বললে—রহস্য ত ঐখানেই! নিশ্চয় তোমরা যাদুবিদ্যে জান। লোকগুলোকে তারই জোরে এমনি গুণ করে ফেল যে, তাদের চোখের ওপর তোমরা ক'টি সাধু পান্সী নৌকার মতন ভাসতে থাক। আমি চতুর্দ্দোলার ওপর থেকে স্পষ্ট দেখেছি—তারা সকলেই সাধু-সাধু করেই পাগল—যেন ক্ষেপে উঠেছে!

সাধু বললেন—এর কারণ ত তোমাকে আগেই বলেছি রাজকন্যা! এরা দৃষ্টশক্তি, আর বুদ্ধি ও বিচারশক্তি হারায়নি। এরা মানুষ চেনে। এরা জানে—

ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মহী।
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ॥

অর্থাৎ—মা কখনো ছেলেকে শাপ দেয় না, পৃথিবী কখন জীবের দোষ নেয় না, দেবতা কখন সৃষ্টিনাশ করে না, সাধুরা কখন পর-হিংসা করে না।

নীলা তার চোখ দু'টো পাকিয়ে সাধুর প্রশান্ত মুখখানির পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—সবার কথাই ত বল্লে সন্ন্যাসী ঠাকুর, রাজাদের কথাটা বাদ দিলে কেন? রাজারা কি করেন, সেটাও বলো।

সাধু ঈষৎ হেসে বললেন—রাজাদের স্বভাব হচ্ছে বেতস বৃক্ষের মতন। সময় সময় নত হন, আবার সময় বুঝে মাথা তুলে দাঁড়ান। কথাটা আমার নয়, শাস্ত্রের—ভজন্তি বৈতসীং বৃত্তিং রাজানঃ কালবেদিনঃ।

মুখখানা লাল করে নীলা আবার জিজ্ঞাসা করলে—আর মাথা তুলে দাঁড়িয়েই অমনি পরহিংসায় প্রবৃত্ত হন, এইটে ত তোমার কথা?

সাধু এবার গলার স্বরে জোর দিয়ে বললেন—না। সত্যই যিনি রাজা, তিনি কখন হিংসা করেন না। রাজার ধর্ম্ম হচ্ছে প্রজা-পালন। শাস্ত্র তাই বলেছে—নৃপতি প্রকৃতিরঞ্জনাৎ। দুষ্টকে শাস্তি দিতে, অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে রাজাকে অস্ত্র ধরতে হয়। তাকে হিংসা বলে না।

নীলার চোখ দু'টো যেন এবার আগুনের মত জ্বলে উঠলো। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি সাধুর মুখের ওপর রেখে তীক্ষ্ণ স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে—তাহ'লে হিংসা কাকে বলে?

সাধু এবার গম্ভীর হ'য়ে বললেন—নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর, উত্তর পাবে। পিছনে চেয়ে দেখ,—তোমার বন্ধু ঐ নীলাচল লোকটা অগ্নিবর্ষণ করছে আমার দিকে চেয়ে। হিংসার আভা ফুটে বেরুচ্ছে ঐ চক্ষুর ভেতর থেকে।

মিছিল এই সময় একটি নদীর কিনারায় ছায়া-শীতল উদ্যানে থেমেছিল। সারি-সারি সুদৃশ্য শিবিরে পদমর্য্যাদা অনুসারে মিছিলের লোক-জন বিশ্রাম করছিল। আলাদা একটা শিবিরে এই সব লোকের পানভোজনের আয়োজন চোলেছে। সব চেয়ে ভাল আর উঁচু জায়গাটিতে রাণীর শিবির পড়েছে। শিবিরের ভেতরেই চতুর্দ্দোলাটি সিংহাসনের মতন স্থাপিত হ'য়েছে। রাজকন্যা তার ওপর বসে প্রধান সাধুটির সঙ্গে কথা কইছিল। পিছনেই নীলাচলের শিবির, মাঝে একটা পরদার ব্যবধান। নীলাচল সেই পরদা সরিয়ে রাণীর সঙ্গে সাধুর তর্ক-বিতর্ক শুনছিল। হিংসার কথাটা উঠতেই সে আগুন হ'য়ে জ্বলে উঠলো। সাধুর কথা শেষ হ'তেই বাঘের মত কুঁদে বেরিয়ে এসে সে সাধুর সামনে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠল—এই লোকটাই হচ্ছে তোমার রাজ্যের মহাশত্রু রাণী! ব্যবস্থাপক প্রথম দিনেই একে দেখে যা বলেছিলেন, এখন বুঝতে পারছ এর কথায়—তাঁর অনুমান সত্য। যে সব কথা এইমাত্র এ বললে—কোন রাজাই সে সব কথা সহ্য করতে পারে না। কথাগুলো বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ! এখুনি একে শাস্তি দেওয়া উচিত।

রাগে নীলার মুখখানাও রাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে। নীলাচলের কথাগুলো তাকে আরও তাতিয়ে দিল। সে ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠল—লোকটাকে আমি সু-নজরেই দেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, দেবকোটে গিয়ে এদের মুক্তি দেবো, ভাল ভাবে থাকবার একটা ব্যবস্থাও করে দেবো। কিন্তু এখন দেখছি, এর মুখে গরল!

সাধুর মুখে কিন্তু ভয়ের একটি রেখাও দেখা গেল না। নীলার কথায় তাঁর মুখখানি হাসিতে ভরে উঠলো। হাসতে হাসতেই তিনি বললেন—সাধুদের স্বভাবই এই রকম। তারা বুকে বিষ রেখে মুখে মধু ছড়ায় না। সত্য অপ্রিয় হ'লেও তারা ব্যক্ত করতে ভয় পায় না।

নীলাচল হুঙ্কার দিলে—তুমি ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, রাজদ্রোহী!

সাধুর মুখের হাসি তখনই মিলিয়ে গেল; চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত ভাঁটার মত উজ্জ্বল হলো। নীলাচলের মুখের ওপর সেই জ্বলন্ত চোখ দু'টি রেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আর তুমি?

নীলা অমনি তার ডান হাতের দ্বিতীয় আঙ্গুলটি সাধুর চোখের সামনে তুলে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব'লে উঠল—খবরদার! মনে রেখো—ইনি তোমার প্রভু, তোমার ভবিষ্যৎ রাজা; কারণ, উনি আমার স্বামী হবেন।

সাধুর মুখে এবার এক অদ্ভুত রকমের হাসি ফুটে উঠল। মনে হ'ল, তাঁর চোখ-মুখ দিয়ে বিদ্যুতের ঝলক বেরুচ্ছে। তিনি সেই তীক্ষ্ণ হাসির সঙ্গে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন—আমার প্রভু তিনি, আমার চেয়েও যিনি শক্তিমান, সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। প্রভু হতে হ'লে শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষার প্রয়োজন আগে। আর—তোমার স্বামী হ'লেই যে রাজ্যের রাজা বলেও একে মানতে হবে, তার কোন মানে নেই। যেহেতু—এখনও রাজ্যের সিংহাসনে তোমার অভিষেক হয়নি। তুমি রাজকন্যা, এই জন্যই রাণীর সম্মান পেয়ে আসছ।

নীলাচল নীলার দিকে চেয়ে গর্জ্জন করে উঠল—শুনছ রাণী, শুনেছ এই ইতর ভণ্ডটার কথা! শাস্তি দাও রাণী, শাস্তি; চিরদিনের মত মুখখানা এর বন্ধ করে দাও।

নীলা তখন তার মুক্তার মত সাদা দাঁতগুলি দিয়ে নীচের ঠোঁট-খানি চেপে ধ'রে রাগে ফুলছিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে মুখের ওপর এমন কথা কেউ যে বলতে পারে, এ ধারণা তার ছিল না। সে যে কি করবে, তা যেন ঠিক করতে পারছিল না। এই সময় নীলাচলের কথাগুলো তাকে যেন কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিলে। সবেগে উঠে চতুর্দ্দোলার মখমলের গদীটির ওপর দাঁড়িয়ে সে নীলাচলকে বললে—সর্দারকে ডাকো, তার চামড়ার চাবুক নিয়ে আসুক। তার আস্বাদন পেয়ে এই ভণ্ড সাধু বুঝুক—রাজ্যের সিংহাসনে আমি পাকা হ'য়ে বসতে পেরেছি কি না।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নীলাচল সরদারকে ডাকবার জন্য যেমন তাঁবুর পরদাটি তুলতে যাবে, অমনি সিংহের মত বিক্রমে এক লাফে সাধু তার হাতখানা চেপে ধ'রে বাধা দিয়ে বললেন—থামো। তোমায় আমায় পরীক্ষা হয়ে যাক আগে। ইনি পাকা রাণী কি কাঁচা রাণী—সেটা না হয় তোমার সরদার চাবুক হাঁকরে জানিয়ে দেবে। কিন্তু তুমি আমার প্রভু হবার যোগ্য কি না, সেটা পরীক্ষা হোক আমাদের শক্তি দিয়ে—এই স্পর্দ্ধিতা মেয়েটিরই সামনে। হিংসা অহিংসার বোঝাপড়া হয়ে যাক এইখানেই।

কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে শেষ করেই সাধু স্তম্ভিত নীলাচলকে পরদার দিক থেকে সরিয়ে নিজেই পরদার গায়ে পিঠ দিয়ে পথটি আটক করে দাঁড়ালেন।

—ক্রমশঃ।

পাখীর সার্কাস

পথের ধারে মাঝে মাঝে দেখি, ছোট-খাট সামান্য উপাদান লইয়া অতি-সাধারণ লোক আশ্চর্য্য-রকমের খেলা দেখাইতেছে! এরা লেখাপড়া জানে না; শিক্ষিত ভদ্র-সমাজে ইহাদের মধ্যে অনেকের স্থান নাই; অথচ এ-সব খেলায় ইহাদের কৌশল দেখিয়া তাক্ লাগে! মনে হয়, এ-সব লোককে যদি আমাদের শিক্ষিত-সমাজ একটু স্নেহভরে ডাকিয়া সমাদর করেন, তাহা হইলে তাদের বুদ্ধি-কৌশল আরো কতখানি উৎকর্ষ লাভ করে!

এই সব খেলার মধ্যে একটি খেলা আমাদের খুব বেশী চমৎকৃত করে। সে-খেলা—দু'টি টিয়া-পাখী লইয়া তাদের দিয়া রকমারি ক্রীড়াকৌশল দেখানো। টিয়া-পাখী কামান ছুড়িতেছে—টিয়া-পাখী মোটর চালাইতেছে—টিয়া-পাখী সার্কাসী-রিঙের খেলা দেখাইতেছে প্রভৃতি। কাশীতে এমন ওস্তাদ দেখিয়াছি, যাঁর শিক্ষায় টিয়া-পাখী ঠোঁট আর পা দিয়া মুক্তার ছোট-খাট হার গাঁথিতেছে।

এই পাখীর খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রসিদ্ধ মার্কিণ-খেলোয়াড় মিষ্টার হাওয়ার্ড ফগ্ চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সে প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, পাখীদের মধ্যে ক্রীড়া-কুশলতায় কেনারির প্রতিভার নাকি তুলনা নাই! নানা-জাতের পাখী লইয়া তিনি খেলা শিখাইবার বহু কশরৎ করিয়াছেন; করিয়া তিনি দেখিয়াছেন, কেনারির সঙ্গে আর কোনো পাখী পাল্লা দিতে পারে না। কেনারির বুদ্ধি সব-চেয়ে বেশী—তারা শেখে খুব শীঘ্র; এবং একবার কোনো খেলা শিখিলে সে-খেলা জীবনে ভোলে না। তবে তিনি এ-কথাও বলিয়াছেন, যে-কেনারি গায় ভালো, তাকে এ-সব সার্কাসী-খেলা শেখানো উচিত নয়—শিখাইলে সে সুর ভুলিয়া যাইবে।

টিয়া-পাখীর চেয়ে কেনারিকে শিক্ষা-দানে সুবিধা আছে। সে-সুবিধা, শেখায় বিরক্তি ধরিলে দুষ্টু ছেলের মতো টিয়া-পাখী ঠোঁটের ঠোক্করে শিক্ষককে রক্তাক্ত করিবে—কেনারি-পাখীর স্বভাব শান্ত, তার অমন ধারালো ঠোঁট নাই, বিরক্ত হইলে বা রাগিলে সে চঞ্চু-আঘাত করিবে না। তোমাদের মধ্যে যাদের গৃহে

কেনারি আছে, বাড়ীর কেনারিকে তারা সার্কাসের খেলা শিখাইতে পারো।

শেখানো কঠিন নয়। ফগ্ সাহেব বলিতেছেন, শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে কেনারির মনকে বশ করিতে হইবে, অর্থাৎ তোমার উপর যেন তার বিশ্বাস হয়—প্রগাঢ় রকম,—তোমাকে যেন সে ভয় না করে! কেনারি যেমন শান্ত, তেমনি তার প্রকৃতি বড় ভীরু।

তার এই ভয় ভাঙ্গাইবার জন্য প্রথমে সার্শি-দরজা-বন্ধ-ঘরের মধ্যে তাকে পিঞ্জর-মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দাও; তার পর হাতে খাবার লইয়া সস্নেহে তাকে খাওয়ানোর অভ্যাস রপ্ত করো। কেনারিকে হাতে করিয়া বা আঙুলের মুঠিতে করিয়া কখনো ধরিয়ো না। 'সুখী'-জাত—কেনারি তাহাতে প্রাণে মরিতে পারে। ছোট ছড়ির উপর বসাইয়া কেনারিকে নাড়াচাড়া করিবে। এ-ছড়ি আধ-হাত এক-হাতের বেশী লম্বা হইবে না।



নল-পথে কেনারি

খাবারের লোভে তোমার হাতের সঙ্গে কেনারির প্রথমে পরিচয় হোক। এ-পরিচয় বেশ নিবিড় হওয়া চাই। কেনারি-সীড কেনারির খাবার। তোমার হাত হইতে এই খাবার লইতে-লইতে তার ভয় ভাঙ্গিবে; তোমার উপর তার বিশ্বাস জন্মিবে। তার পর এই খাবার রাখো তোমার কাঁধে, পিঠে, ঠোঁটের উপর, কেনারি নির্ভয়ে সে-সব জায়গা হইতে খাবার লইয়া খাইবে। এমনি ভাবে এক-মাসে, দু'-মাসে যখন দেখিবে, ছায়ার মতো কেনারি তোমার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরিতেছে, তখন তাকে খেলা শিখাও।

প্রথমে ধরো, কেনারিকে তুমি দম-দেওয়া খেলার মোটর-গাড়ীতে অর্থাৎ চলন্ত গাড়ীতে চড়াইতে চাও। প্রথমেই তাকে চলন্ত গাড়ীতে চড়াইয়ো না; কেনারি ভয় পাইবে। প্রথমে তাকে খেলার-গাড়ীর শীটে বসানো অভ্যাস করাও; দু'-চার দিন এ শীটে তার বসিবার পর তবে সে-গাড়ীতে দম দিয়ো। গাড়ী চলিলে কেনারি ভয় পাইয়া উড়িবে, নিশ্চয়। এভাবে ন-দশ,



কেনারি গাড়ী চড়ে

বিশ-পঁচিশ বার হয়তো উড়িয়া পলাইবে—তবু গাড়ী থামাইয়া খাবারের লোভ দেখাইয়া বার-বার তাকে গাড়ীর শীটে আনাইয়া বসাইতে হইবে। দু'-দশ বারে না হোক, চল্লিশ-পঞ্চাশ বারে তার ভয় ভাঙ্গিবে, দম-দেওয়া চলন্ত গাড়ীতে সে তখন নির্ভয়ে বসিয়া গাড়ী-চড়ায় পোক্ত হইবে। এমনি করিয়া তাকে চলন্ত যে-কোনো ছোট গাড়ীতে, চলন্ত দোলনায় বা ঘুরন্ত চক্রাসনে বসাইতে কোনো অসুবিধা ঘটিবে না।

ফগ্ সাহেব বলেন, কেনারিকে সমারসল্ট বা ডিগ্‌বাজী খাওয়াইতে তাঁকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছে; তবু তিনি হাল ছাড়েন নাই। এ-খেলায় কেনারিকে পাকা করিতে তাঁর সময় লাগিয়াছিল চার মাস।

কেনারিকে খেলা শিখাইতে হইলে একসঙ্গে একটির বেশী খেলা শিখাইবার চেষ্টা কদাচ করিবে না। এ-কালের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে কেনারির পরিচয় নাই যে, একসঙ্গে ইংলিশ সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া

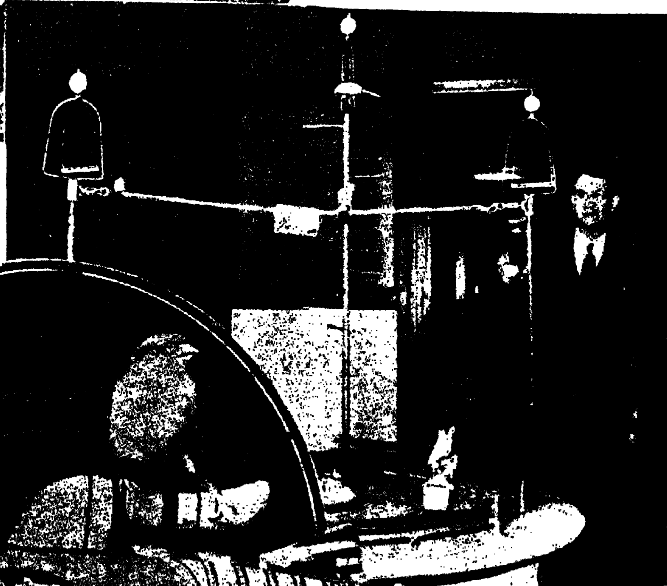
একটি খেলা ভালো করিয়া শিখিলে তবে অন্য খেলা শিখাইয়ো।

তার উপর একটা কথা মনে রাখিয়ো, তোমাদের যেমন মেজাজ আছে, মতি আছে, পাখী হইলেও কেনারির তেমনি মেজাজ আছে, মতি আছে। শিখিতে ইচ্ছা বা রুচি নাই, তবু বিদ্যা শিখাইবে—এমন জবরদস্তি ছেলেদের সঙ্গে চলে না, পাখীর সঙ্গেও চলিবে না। শিখিবার জন্য ধৈর্য্য এবং শান্ত প্রকৃতি—কেনারির এ দু'টিই আছে।

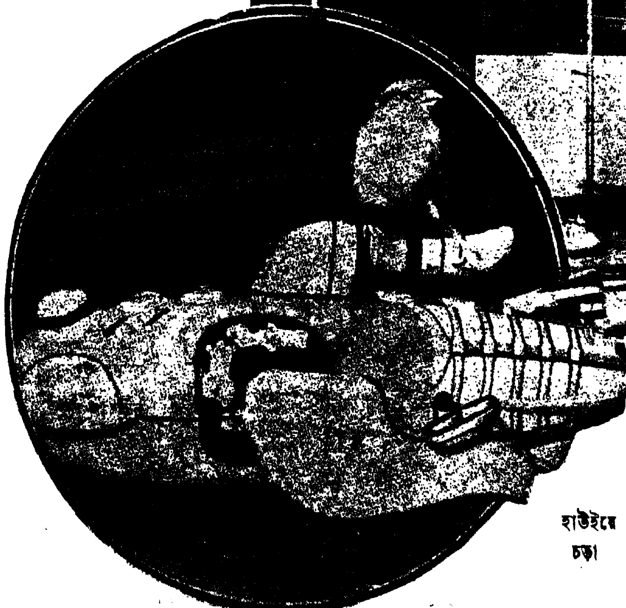
কেনারিকে সর্ব্ববিধ খেলা শেখানো যায়—অবশ্য তার সামর্থ্য বুঝিয়া। নহিলে তাকে দিয়া উচু-বাঁশবাজি করানো চলে কি?



খেলনা নিয়ে খেলা



সার্কাসের খেলা



হাউইয়ে চড়া

তার পর সুর। কেনারিকে শিষ দিতে শিখাইলে সে চমৎকার শিষ দিবে। ফগ্ সাহেব বলেন, গ্রামোফোনের রেকর্ড লইয়া কেনারিকে নানা গৎ শিখানো চলে। সুর শিখাইবার সময় কেনারিকে ঘরে রাখিয়া সে-ঘর একেবারে অন্ধকার

জিওমেট্রি, এ্যালজেব্রা, হাইজিন, জিওগ্রাফি, হিষ্ট্রী, ড্রয়িং—সব একসঙ্গে জাবনা মাখিয়া সে গলাধঃকরণ করিবে।

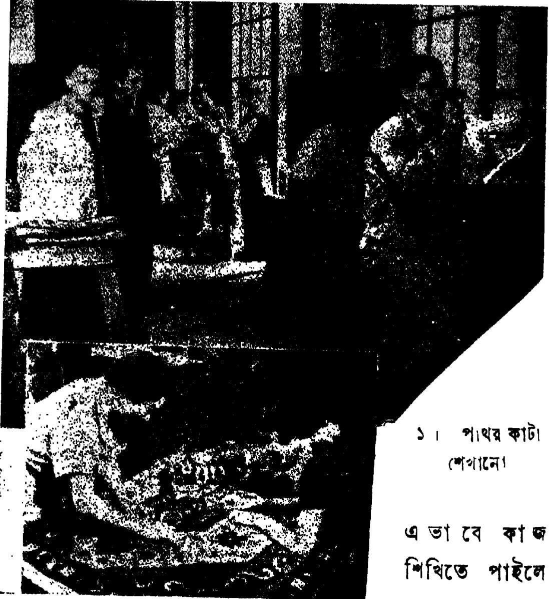
করিয়া দিবে। এতটুকু আলো যেন ছিদ্র-পথে সে-ঘরে প্রবেশ না করে। তার পর সেই অন্ধকারে বাজনায় কিম্বা রেকর্ডে যে-সুর বাজাইবে, দু'-চার বার শুনিবার পরই দেখিবে, কেনারি সে-সুর নির্ভুল ভাবে কণ্ঠে তুলিয়া নিঃসারিত করিতেছে! গানও তিনি কেনারিকে শিখাইয়াছেন। বহু গানের বাণী তাঁর পোষা কেনারির কণ্ঠ-নিঃসৃত হইতেছে দেখিয়া অনেকে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন! কেনারির শিক্ষার জন্য এখন কয়েকটি গ্রামোফোন-কোম্পানি বিশেষ-রকমের রেকর্ডও বাজারে বাহির করিয়াছে।

আমাদের দেশে বুলবুল্ আর তিতির পাখীর লড়াইয়ের খুব প্রসিদ্ধি আছে। ময়না-সালিকও বেশ পোষ মানে। এই সালিক, ময়না, বুলবুল্, তিতির পাখীকেও কেনারির আদর্শে এমনি খেলা শিখাইয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারো।

কাজ শেখার স্কুল

স্কুল মানে আমরা বুঝি, যেখানে শুধু হিষ্ট্রী-জিওগ্রাফি, ম্যাথামেটিক্স্, ইংলিশ-সংস্কৃত প্রভৃতি পড়ানো হয়,—সাড়ে দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত ক্লাশ বসে,—টীচারা রুটিন বাঁধিয়া পড়ান, পরীক্ষা লন এবং বার্ষিক-পরীক্ষায় পাশ-নম্বর পাইলে উপরের ক্লাশে তুলিয়া দেন! অর্থাৎ স্কুল মানে, লেখাপড়ার কারখানা।

আমেরিকায় কিন্তু নানা রকমের স্কুল আছে। সে-সব স্কুলের কোনোটায় লেখাপড়া শেখানো হয় না—কাজ শেখানো হয়। আমাদের এখানে ঘোড়ায় চড়া, মোটর চালানো শিখাইবার জন্য যেমন ব্যবস্থা আছে,—সে-ব্যবস্থা অবশ্য খুব সামান্য রকমের—আমেরিকায় তেমনি জুতা সেলাই হইতে ঘড়ি-মেরামতী, ফটো তোলা, কম্পোজিটরী, দাড়ি কামানো প্রভৃতি সব কাজ শিখিবার জন্য রীতিমত স্কুল আছে। এ-সব স্কুলে ছাত্র-সংখ্যা অপরিসীম; এবং কাজ শেখানোর প্রণালীতে যেমন রুটিন মানিয়া চলা হয়, শিক্ষা-দানে গুরুদের অধ্যবসায়-যত্নের তেমনি সীমা-পরিসীমা নাই। প্রত্যহ তিন ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা আছে। স্কুলের পড়াশুনা চালাইয়া এ-সব স্কুলে যাহাতে কাজ শেখা চলে, সে-দিকে অসুবিধা ঘটিবে না বুঝিয়া এ-সব স্কুলের ক্লাশ তেমনি সময় ধরিয়া সুনির্দ্দিষ্ট আছে। এক-দিকে লেখাপড়া শেখার স্কুলে লেখাপড়া শেখা; সেই সঙ্গে এ-সব স্কুলে কাজ শেখা—ইহার ফলে লেখাপড়ার স্কুল ছাড়িয়া কাহাকেও আনাড়ির মত বসিয়া থাকিতে হয় না; লেখাপড়া ছাড়িবার পর যে-কাজে যার রুচি, সঙ্গে-সঙ্গে সে-কাজ শিখিয়া তাঁহারি সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন সুরু করিয়া দিতে পারে। হাতে-কলমে



১। পাথর কাটা শেখানো

২। র‍্যগ বোনা

এ ভাবে কাজ শিখিতে পাইলে সত্য কার-মানুষ হইবার পক্ষে বাধা থাকে না। এই সঙ্গে ক'খানি ছবি ছাপা হইল। এ-সব ছবি দেখিলে বুঝিবে, নিউ-ইয়র্কে কত রকমের কাজ শিখাইবার জন্য কত রকমের স্কুল আছে।

১ নং ছবিতে দেখিবে, পাথর-কাটা শেখানো হইতেছে। কাটিতে গিয়া পাথর ফাটিয়া যায়, পাথরের গায়ে হয়তো বা খোন্দল হইয়া যায়—কি করিয়া সে-কাট,

সে-খোন্দল ভরাট করা যায়, পাথর-কাটার সঙ্গে সে-সবও শেখানো হয়।

২নং ছবিতে ব্যাগ তৈয়ারী করা শিখানো হইতেছে।



৩। কামারের কাজ শেখা

তার পর এই মোটর-গাড়ীর যুগে মোটর-গাড়ী চড়িবার সখ আমাদের অনেকের আছে! অথচ গাড়ীর কোথাও কোনো বৈকল্য ঘটিলে কোথায় তা ঘটিয়াছে, বুঝিতে পারি না; সামান্য খুঁটিনাটি-ত্রুটিতে মিস্ত্রী ডাকিতে হয়! নিউ-ইয়র্কের মোটর-স্কুলে মোটর-মিস্ত্রীগিরি শিখাইবার চমৎকার ব্যবস্থা আছে। এ স্কুলে



৪। মোটর মেরামতী

মিস্ত্রীগিরি-শিক্ষার্থীরাই শুধু কাজ শিখিতেছে না—মোটর-সখওয়ালা ধনী ভদ্রলোকও এ সব স্কুলে আসিয়া মোটরের নাড়ী-নক্ষত্রের তত্ত্ব শিক্ষা করেন।

আমাদের দেশে দেখি, বহু লোক অর্থ-উপার্জ্জনের অন্য উপায় না পাইয়া কেটলি-উনুন লইয়া চায়ের দোকান খুলিয়া বসে। চা তৈরী করা—ভাবে, শুধু



৫। উপরের ছবিতে কেক তৈরী শেখা
৬। নীচের ছবিতে চুল ছাঁটার ক্লাশ

গরম জলে চায়ের পাতা ফেলিয়া দেওয়া! অর্থাৎ চা তৈরীর কাজে জ্ঞান না থাকিলে এ-কাজে অগ্রসর হইতে ইহাদিগকে পরাঙ্মুখ দেখি না। তাদের হাতের সে-চা যা হয়, যে মুখে দিয়াছে, সে-ই জানে!

আমেরিকায় চা তৈরী করার বিদ্যা শিখাইবার জন্যও স্কুলের অভাব নাই। যে-নাপিত চুল ছাঁটিয়া ভালো রকম পয়সা রোজগার করিতে চায়, কাঁচি ধরিবার পূর্ব্বে ভালো-রকম কাজ শিখিবে বলিয়া সে-নাপিতের জন্যও স্কুল আছে। তার পর ছাপাখানার কাজ, ফটোগ্রাফির কাজ, অর্থাৎ আজ ব্যবসার যুগে যে-কাজই করিতে চাও, করিবার পূর্ব্বে সে-কাজ শেখা প্রয়োজন। না

শিখিয়া কোনো কাজে লাগিলে সাফল্য-লাভের আশা সুদূর-পরাহত। এ-কথা ব্যবসায়ী-মার্কিন-জাত ভালো করিয়া জানে বলিয়া 'না-পড়িয়া-পণ্ডিতী'র তারা ধার ধারে না! কাজ শিখিয়া কাজে নামিতেছে, তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া মার্কিন-জাত আজ পৃথিবীর অন্য সব জাতকে টেক্কা দিয়াছে!

আমাদের দেশে অনেককে দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ সারিয়া যেমন-খুশী ব্যবসা খুলিয়া বসেন। তাঁরা ভাবেন না, কোনো কাজে নামিবার পূর্ব্বে সে-কাজ শিখিবার প্রয়োজন আছে। সে কথা মানেন না বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে আমাদের মধ্যে বেশীর-ভাগ লোক সাফল্য-লাভের পরিবর্ত্তে ফতুর হইতেছে!

মার্কিন-জাত ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় হইতেছে কেন, তাহারি একটু ইঙ্গিত দিবার জন্য আজ সেখানকার এই কাজ-শেখানো স্কুলের কথা বলিলাম।



১। পুতুলের আদরা গড়া



পুতুলের জন্ম-কথা

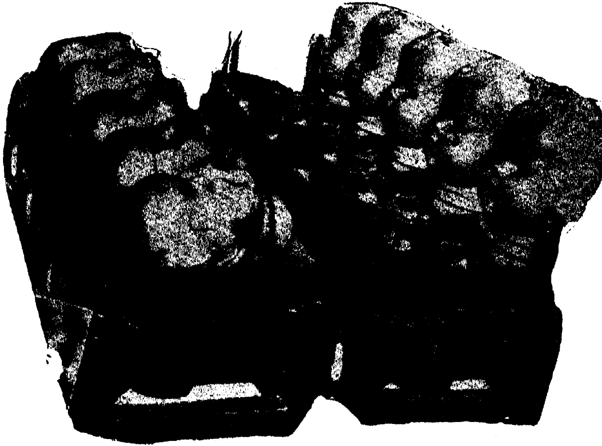
মেয়েদের মধ্যে যারা পুতুল-খেলা করে, পুতুল ভালোবাসে, তাদের বলছি। আমাদের এ-দেশের মাটীর গুড়িয়া পুতুল বা কাঠের পুতুলের আদর তোমাদের কাছে নেই, তোমরা চাও কাচের পুতুল, সেলুলয়েডের পুতুল। শুধু খেলা নয়, রকমারি পুতুলে ঘর-সাজালে ঘরের বাহারও খোলে!

এই সব কাচের আর সেলুলয়েডের পুতুল বিদেশ থেকে চালান আসে। সেলুলয়েডের পুতুল শুনছি, এ-দেশে অল্পমাত্রায় তৈরী সুরু হয়েছে। আশা করি, এ-কাজে আমরা অচিরে সাফল্য লাভ করতে পারবো।

কিন্তু ও-কথা যাক্। এই সব পুতুলের জন্ম-কাহিনী বলছি। এ-সব পুতুল তৈরী করবার জন্য জার্ম্মানিতে আর আমেরিকায় বড় বড় কারখানা আছে। এক-এক কারখানায় খদ্দেরের সংখ্যা বছরে প্রায় এক-কোটি, দেড় কোটি। পৃথিবীর সব দেশে এ-পুতুল চালান যায়; কাজেই খদ্দেরের সংখ্যা দেখে বিস্মিত হবার কারণ নেই! আমেরিকার একটি বড় পুতুলের কারখানার কথা বলছি। এ কারখানাটি আছে নিউ-ইয়র্কের ব্রুক্লিন সহরে। কি রকম পুতুল তৈরী হবে, প্রথমে প্রধান-শিল্পী তার ডিজাইন বা কাঠামো গড়ে দেন। কি রকম পুতুল লোকের মনকে চমক্ দেবে, তা বুঝে তিনি ডিজাইন গড়েন। ডিজাইনটি গড়া হয় শুধু পুতুলের মুখের। মুখে-চোখে ভঙ্গী ফুটিয়ে তোলার কুশলতার উপর শিল্পীর সমাদর।

কাদা দিয়ে শিল্পী মুখের কাঠামো গড়ে দেন। গড়ে

তার উপর প্লাষ্টার-অফ-প্যারিসের খোল করে আবরণের মতো কাদার মুখটিকে ঢেকে সে-মুখের ছাঁচ তুলে নেন। এই ছাঁচ শুকিয়ে শক্ত হলে কাদার মুখ থেকে ছাঁচ খুলে নিয়ে ভিতরের ফাঁকে গালা আর গ্রীজ মাখিয়ে এই মুখখানিকে মাঝামাঝি কেটে ডিপের মতো দু'-টুক্রো করে রাখা হয়। এই মুখটি হলো এ-জাতের পুতুলের মডেল। তার পর কারখানায় কাঠের আর ব্রোঞ্জের গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে এসিডে ফেলে জ্বাল দিয়ে যন্ত্র-সাহায্যে তাকে তরল করা হয়; তার পর এই তরল বিগলিত উপাদানকে আগেকার তৈরী প্ল্যাষ্টার-অফ-প্যারিসের মডেলের খোলের মধ্যে ঢেলে তাতে আগুনের তাপ দেওয়া হয়। আগুনের তাপে গলিত তরল উপাদান জমে শক্ত নিটোল হয়ে ওঠে; এবং মডেলের ছাঁচের মুখে হুবহু মুখ গড়ে ওঠে। শুকিয়ে গেলে এই মুখখানিকে মডেলের খোল থেকে বার করলেই পুতুলের মুখ হলো।



২। মুখের মডেল

মুখ আর মাথার মতো হাত এবং পা তৈরী করা হয়। তৈরী হলে কারখানায় বিভিন্ন র‍্যাকে সেগুলি রাখা হয়। তার পর আছে নানা বিভাগে নানা-রকম শিল্পী। কোনো শিল্পী পুতুলের চোখ আঁকেন, কোনো শিল্পী পুতুলের মাথায় কেশ চিত্রিত করেন বা পর-চুল বা ক্রেপের চুল এঁটে দেন। কোনো কোনো পুতুলের চোখ তৈরী হয় চোখের জায়গায় বিঁধ করে' সেই বিঁধে কাচের বা পুঁতির চোখ বসিয়ে; কোনো পুতুলের চোখ আবার চিত্র করে' আঁকা হয়। তার পর আর-এক শিল্পী আঁকেন পুতুলের ভুরু আর ঠোঁট।

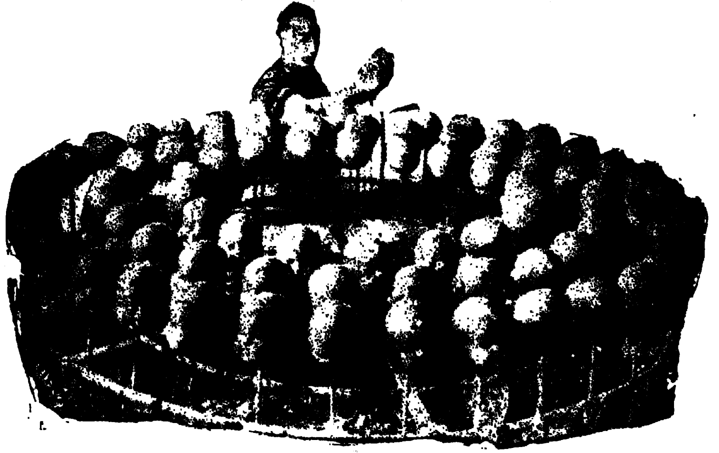
পুতুলের গা তৈরী করা হয় আর এক বিভাগে। সেখানে গা, হাত-পা, মুখ গড়া হলে গোটা-পুতুল যায় বেশ-শিল্পীর কাছে। বেশ-কার শিল্পী পুতুলের অঙ্গভূষা সম্পাদন করেন; অর্থাৎ নানা পুতুলকে নানা বেশে সাজিয়ে তোলেন। এখনকার ফ্যাশন-অনুযায়ী কত ছাঁটের কত ছাঁদের পোষাক যে পুতুলকে পরানো হয়, তা এখানকার বড় কোনো পুতুলের দোকানে গিয়ে নানা সাজে



৩। বেশ-শিল্পীর পোষাক-পরানো

সাজানো পুতুল দেখলে বুঝতে পারবে।

পুতুলের মুখ তৈরী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিশেষ এক রকম পালিশ-আরকে সেগুলি ডুবিয়ে ঘুরন্ত র‍্যাকে রাখা হয়। এ-র‍্যাকটি সারাক্ষণ ঘুরছে। এ-র‍্যাকে মুখ রাখার ফলে তাতে যে-আরক লেগে থাকে, ঘুরণে সে-আরক ঝরে যায় এবং পালিশ হয় ঝক্‌ঝকে।



৪। ঘূর্ণীচক্রে মুণ্ড-মালা

কত হাত ঘুরে তবে এক-একটি পুতুল চারু-মূর্ত্তি নিয়ে গড়ে ওঠে, সে-কথা মনে করলে আশ্চর্য্য হতে হয়! তোমরা ভাবছো, এত কাণ্ড করে' একটি পুতুলের সৃষ্টি—না জানি একটি পুতুল তৈরী করতে কত মাস সময় লাগে! কিন্তু তা নয়! কারণ, যন্ত্রপাতির দৌলতে এক-এক দিনে নানা-বিভাগ থেকে পুতুলের মুখ তৈরী হচ্ছে অমন দু'-হাজার, পাঁচ-হাজার, দশ-হাজার; হাত, পা, গা-ও ঠিক এমনি তৈরী হচ্ছে এবং গায়ে পোষাক পরিয়ে প্রতিদিন এ-কারখানা থেকে দিনে অমন দু'-হাজার পাঁচ-হাজার দশ-হাজার পুতুল গড়ে উঠে দোকানের শো-কেশ ভরে তুলছে।



৫। নাক-চোখ-ভ্রূ চিত্র করা

আমাদের দেশে কৃষ্ণনগরের পুতুলের খুব নাম আছে; এবং এ-নাম অকারণে হয়নি। সে পুতুল তৈরী করতে কি রকম মডেল লাগে, সে-কথা আমাদের জানবার উপায় নেই! না-জানার জন্য কৃষ্ণনগরের পুতুল-শিল্পীর সংখ্যা দিন-দিন কমছে! দু'-চার জনের হাতে পুতুলের উৎকর্ষ ঘটায় ব্যবসার দিক দিয়ে সেটা লাভের কথা নয়। আমরা চাই—এখানকার এ-শিল্পের কথা কেউ প্রচার করুন!

অস্তরবি

ডুবে যায় দিনমণি ভারতের আঁধার গগনে;
বিশ্ব জুড়ে হাহাকার ওঠে তাই বিদায়ের ক্ষণে।
'তুমি নাই'—এ-কথা যে ভাবিতেও পারিনাকো হায়;
যুগ যুগ বেঁচে থাক চিরজীবী হ'য়ে—প্রাণ চায়।

হে অমর বিশ্বকবি! মৃত্যুরে ক'রেছ তুমি জয়;
কালের প্রবাহ-বুকে কীর্ত্তি তব রবে জ্যোতির্ম্ময়।
বাংলার নহ শুধু—তুমি ছিলে এশিয়ার রবি;
বুকভরা বেদনার অশ্রু আজি অর্ঘ্য লও কবি!

শ্রীনকুলেশ্বর পাল (বি-এল্)।



বর্ষা-বিদায়

ভাদ্র মাসের শেষ। ঋতু-গণনায় এ-সময়টা শরৎকাল হইলেও বর্ষা সম্পূর্ণ ভাবে বিদায় লয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গে বর্ষার জল অনেক সরিয়া গিয়াছে। হালটে এখন নৌকা সকল জায়গা দিয়া চলিতে পারে না। তার উপর সকলেই নিজের সীমা-সংলগ্ন জায়গায় মাছ ধরিবার জন্ম বাঁশের শলায় তৈয়েরী 'পারং' পাতিয়াছে। সে জন্ম নৌকা চালাইবার আরও অসুবিধা। এই সময়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। চারি দিকে আঁসটে দুর্গন্ধ, পচা পাতার গন্ধ, জল নামিয়া যাওয়ায় দাম-শ্যাওলার গন্ধ, দূর মাঠে পাট-পচার গন্ধ। ঘরে-ঘরে জ্বর দেখা দিয়াছে। জ্বর লইয়া দিন-মজুররা ভাল করিয়া কাজ করিতে পারে না। তাদের বৌরা ছেলে-মেয়ে লইয়া ভিক্ষায় আসে। এখন পথে-ঘাটে বেশী যায়গায় ডুব-জল নাই, কোমর-জল, হাঁটু-জলই বেশী। গরীবেরা সেই জল ভাঙ্গিয়া ভিক্ষায় আসে।

নফ্‌রার মা সেই জল ভাঙ্গিয়া বাবুদের বাড়ীর কাছে আসিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে সেই বৌটিকে বলিল, "বৌঠেরেন্ গো! সকাল কইরা বাত্ ছান, সাঁজ তো আস্‌লো। ঘরে যামু।"—বৌটি গামলায় করিয়া ভাত সাজাইয়া আনিয়া বলিল, "আজকাল আমাদের বাড়ী নিত্যকার চেয়ে আট-দশ সের চাল বেশী রান্না হয়, তবু কুলোয় না। এত ভিখারী আসে! জ্বরে সব কাঁপ্‌ছে, তবু তারা ভাত খাবে।"

নফ্‌রার মা ভাতের গামলাটায় গামছা-ঢাকা দিয়া ভাতগুলি লইয়া রওনা হইল। প্রায় সকল সময়েই তাহাকে জলের মধ্যে দিয়া হাঁটিতে হইতেছিল। মস্ত বড় একটা জলা-মাঠ—তাহার ধার দিয়া হাঁটিতে-হাঁটিতে তার গা-টা ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল। সে ভয়ে-ভয়ে অগ্রসর হইল। পচা ডোবায় জলে দপ্ করিয়া আলেয়া জ্বলিয়া উঠিল। তখন সে প্রাণভয়ে দৌড়াইতে-দৌড়াইতে নিজের বাড়ী পৌছাইল।

ঘরের বারান্দায় বসিয়া গোপাল তামাক খাইতেছিল; তাহাকে দেখিয়া নফ্‌রার মার দেহে যেন প্রাণ আসিল। ঘরের মধ্যে আসিয়া ভাঙ্গা কাচের মধ্যে অজস্র কাগজের পটি লাগান লণ্ঠনটি জ্বালাইল। নফ্‌রা বলিল, "মাগো! বড়ই ক্ষুধা পাইছে, তুই বাবুগো বাড়ী থনে কি আন্‌ছস্ দে!" বলিয়া নফ্‌রা জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই ভাতের রাশ গিলিতে বসিয়া গেল। তার ছোট ছোট ভাই-বোনরাও ভাতগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল।

বাদুড়-বাগানের সেই বৌটি একবার আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল!—নাঃ; আকাশ বেশ পরিষ্কার।" জলভরা মেঘগুলি নীল গগনের কোণে রূপার মত চক্-চক্ করিতেছে, সেই রকম কালো আর নেই।—সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বর্ষার ছাতাধরা আমের আচার, বড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের দামী দামী কাপড়-জামাগুলি পর্য্যন্ত বাহির করিয়া রৌদ্রে দিল। মনে মনে বলিল, "বর্ষা বিদায় নিল, না—আমার হাড় জুড়ুল।" নীচে হইতে শাশুড়ী ডাকিয়া বলিলেন, "ও বৌমা! এই ভাদুরে রোদে বেশীক্ষণ থেক না মা, অসুখ করবে।"

সাদার্ণ এভিনিউর বাড়ীতে গাড়ী-বারান্দার ছাদে দাঁড়াইয়া ছন্দার বৌদিদি নীলাকাশের তলে শুভ্র নবনী-সুকুমার মেঘের শোভা দেখিতেছিল। মেঘের শুভ্র আভা লেকের জলে পড়িয়া স্বচ্ছ মুকুরের ন্যায় প্রতীয়মান।

বৌটি পুলকিত নয়নে দেখিতে দেখিতে রবি বাবুর বর্ষা-বিদায়ের একটা গান গুন্-গুন্ স্বরে গায়িতেছিল। এমন সময়ে সেই রৌপ্যাধার তুল্য মেঘ হইতে ঝির্-ঝিরে রূপালী ধারা নামিয়া আসিল। বৌটি নড়িল না, ইচ্ছা করিয়াই ভিজিতে লাগিল। যেন এই নবধারা তার রঙ্গ-খেলার সঙ্গী। দিব্য উজ্জ্বল রৌদ্রের মাঝে বৃষ্টি—যেন প্রকৃতির এক নূতন অভিযান!

এমন সময়ে যেমন গাড়ী আসিয়া নীচে গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইল, তখনই বৌটি কৌতূহলী হইয়া হর্ষে, আনন্দে, দৌড়াইয়া গেল। পরক্ষণেই ছন্দার সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা।

ছন্দা বলিল, "বৌদি! আজ আমার বাড়ীতে বর্ষা-বিদায় উৎসব হবে, এই তোমাদের নিমন্ত্রণ-কার্ড! তা কার্ড থাক্, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে চল। নইলে একা সব ম্যানেজ ক'রে উঠ্‌তে পারবো না।"—বলিতে বলিতে দুই জনে উপরে আসিয়া ড্রয়িংরুমের একটা কৌচে বসিল।

এমন সময় নীচে আর একখানা গাড়ী আসিল। উহা কোন নামজাদা সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের। গুটি-কয়েক মেয়ে নামিয়া আসিয়া বৌটিকে বলিল, "আমাদের স্কুলে একটা চ্যারিটি-শো হবে, অভিনয় হবে—রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-বিদায়। আপনাকে কিন্তু টিকিট কিন্‌তে হবে।" তাহারা বৌটির ও ছন্দার কাছে পঁচিশ টাকা দামের এক একখানি টিকিট বিক্রয় করিল। তার পর আসিল আর এক গাড়ী—বাসন্তী-বীথিকা নামক মহিলা-ক্লাবের গাড়ী। ছন্দা, বৌদি এই ক্লাবের মেম্বর। তাঁরা ক্লাবে বর্ষা-বিদায় অভিনয় করিবেন, চাঁদা চাই। বৌটি একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট দিল। তাঁহারা আবার ওদের দু'জনকে অনুরোধ করিলেন, "আপনারা তো খুব ভাল নাচতে পারেন, এই উৎসবের নাচে আপনাদের যোগ দিতে হবে।"—ছন্দা ও তার বৌদি প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি আসিয়াছে। শরতের জ্যোৎস্না-শুভ্র রাতে রূপালি চাঁদের আলোর মধ্যে ঝির্-ঝিরে বৃষ্টি-ধারা নফ্‌রার

মায়ের ঘরের চাল ভেদ করিয়া ভিতরে পড়িতে লাগিল। নফ্‌রার মায়ের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি পড়িল। সে ঘুমঘোরে একবার চক্ষু মেলিয়া উপরের পানে এক নিমেষ চাহিয়া, একটু সরিয়া কোলের শিশুটিকে বুকে জড়াইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল; সেই মলিন, শতছিন্ন, দুর্গন্ধময় বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিরুপদ্রবে শান্তিতে ঘুমাইতে লাগিল।

তার ফুটা চালের ভিতর দিয়া শরতের হীরকোজ্জ্বল জলভরা মেঘের ঝারি, তার নববারিধারা বৃথাই পাঠাইল। নফ্‌রার মা দেখিল না বর্ষার বিদায়, শুনিল না শরতের আবাহন-সঙ্গীত। যদি তাহাকে কেহ এই উৎসবানন্দের সংবাদ শুনাইত, তবে সে নিশ্চয়ই অবজ্ঞার হাসি হাসিত! সে জানে বাবুদের বাড়ীর কাজ; আর জানে বাবুদের বাড়ী হইতে ভাত আনিয়া বুভুক্ষু স্বামী ও পুত্রকন্যাদের খাওয়াইতে। এই তার জীবনের ব্রত, ইহাতেই তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ। ইহার অপেক্ষা বেশী, কিংবা ইহার মত আরও আনন্দ, আরও সুখ পৃথিবীতে আছে, তাহা সে জানে না, জানিতেও চাহে না। নিজে না খাইয়া, জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া, বাবুদের বাড়ী সারাদিনের কাজ সমাপনান্তে ভাত আনিয়া, তার ক্ষুধার্ত্ত স্বামী ও সন্তানদের সম্মুখে রাখিয়া ভাবে, আমার জন্ম সার্থক। সার্থকতার আনন্দে তাহার হৃদয় কাণায় কাণায় পূর্ণ। সে এখন তার আগত সুখের আশার রঙ্গীন স্বপন দেখে।

এই মহাকাল বর্ষা গত হইয়াছে। হেমন্তের বঙ্গজননীর সোণার ক্ষেতের আলো তাহার কল্পনা-নেত্রে ঝলমল্ করে। স্বামী যাইবে ধান কাটিতে, সে যাইবে ক্ষেতের উদ্‌বৃত্ত ধান কুড়াইতে। আর নফ্‌রা রসিককে দেবে বাবুদের বাড়ীর গরুর রাখাল করিয়া। এই সোণার দিন তার কবে আসিবে? তাই সে দিন গণিতেছে। সকলেরই তখন পেট ভরিয়া এক বেলা আহার জুটিবে। এই আনন্দ সে আর তার ছোট্ট বুকটির মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না!

পূর্ব্ববঙ্গের সেই বৌটি এই সন্ধ্যারাতে তাহার ঘরে প্রদীপের আলোর সম্মুখে পা-ছড়াইয়া বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিল। টিনের চালে হাল্‌কা বৃষ্টির ঝিন্-ঝিন্ শব্দ। সে মাথা উঁচু করিয়া জানালা দিয়া দেখে, চাঁদের আলোর ও বৃষ্টির একই সঙ্গে ধরার বুকে সোনালি-রূপালি হাসি। কি যেন একটা স্বপ্নের আবেশ চক্ষে আনিয়া দেয়। সে সূচটি ঠোঁটের উপর শক্ত করিয়া ধরিয়া কি মনে করে। বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসে আধ-ফোটা শেফালির মৃদুগন্ধ, দোলন-চাঁপা, হাসুনাহানার প্রাণমাতান গন্ধ! দূর মাঠে দেখা যায় কাশের ফুলের দোলা—যেন তারা কিসের নেশায় মাতোয়ারা।

মনে পড়িল, ছোটবেলায় এমনি দিনে ভোরে উঠিয়া শিউলি ফুল কুড়ান ও কাশের গুচ্ছ বাড়ীতে আনার কথা।

হঠাৎ শব্দ উঠে, কুকুরের চীৎকার, দ্রুতপদে কি চলিয়া যাওয়ার শব্দ। কিন্তু আজ সে আর চম্‌কাইয়া উঠিল না। ছেলেরা জিজ্ঞাসা ক'রে, "মা, ও কি গেল?" মা হাত দিয়া সূতা ছিঁড়িতে-ছিঁড়িতে বলে, "ও শেয়াল।"

ছেলে বলে, "মা, রান্না-ঘরে সব ঢাকা আছে তো?" মা বলিল, "আর বাবা, এই দু'মাস শেয়ালের উৎপাতে হয়রাণ হ'য়ে গেছি, যা খুসী করুক গে। আর ক'দিন জ্বালাবে? জল তো শুকিয়ে এল।" বলিয়া আবার সে নিবিষ্ট মনে কাঁথা-সেলাই করিতে লাগিল।

বাদুড়-বাগানে সেই বৌটি ঠিক্ এমনি সময়ে তার শ্বশুরের জন্য রুটি লইয়া উঠান দিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ আকাশ হইতে পড়িল রজত-ধারার মত ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টির শুভ্র কণা। সে বির্‌ক্তিভরে উপরের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া উঠিল। কি জন্য হাসিল, তা সেই জানে!

তার পর সযত্নে থালার জল মুছিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "বাবা, খেতে আসুন।"

ঠিক সেই সময়ে থিয়েটার রোডে ছন্দার বাড়ীতে বর্ষা-বিদায় উৎসবে সকলে মাতিয়া উঠিয়াছে।

দর্শকপূর্ণ হলটি উৎসবের আনন্দে উচ্ছ্বসিত।

শ্রীমতী উৎপলাসনা দেবী।

দাঁড়াও বারেক কবি

দাঁড়াও বারেক কবি; যেও নাকো চলে
উদিবে না পুনঃ 'রবি' গেলে অস্তাচলে।
ঢেকে দিল চারি দিক কালো ঘন-মেঘে,
নিভিল দেউলে দীপ ঝটিকার বেগে।
শোকাচ্ছন্ন মুহ্যমান্ সমগ্র নগরী
তোমার প্রয়াণে কাঁদে দিবস-শর্ব্বরী!
শোক-যাত্রা করি সবে মহাযাত্রা পথে—
আগাইয়া দিল তোমা তুলি স্বর্ণরথে।
ফিরে এলো ধীরে-ধীরে লক্ষ নরনারী
অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদে, তোমারে না হেরি!
তব কথা ব্যাপ্ত আজি দেশ-দেশান্তরে,
জানায় প্রণতি ভক্ত ভক্তিনত শিরে।
সর্ব্বদেশ-পূজ্য ওগো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি!
চিরদিন রবে বিশ্বে তব প্রতিচ্ছবি।
তোমার তুলনা তুমি, তব পরিচয়—
"তরুণ প্রভাতে রাঙা 'রবির' উদয়!"
রূপে-রসে-গন্ধে-প্রেমে জগত-সভায়
ভরিয়া রেখেছো কবি কানায় কানায়,
বেদনার অশ্রু ঝরে শ্রাবণের ধারা,
(আজ) কবিরে হারায়ে দেশ হলো সর্ব্বহারা!

ডাঃ শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়।



মুখোশ ও পুতুল

বাজারে যে-মুখোশ কিনতে পাওয়া যায়, সে-মুখোশ বাড়ীতে তৈরী করা শক্ত নয়। দেশী-মুখোশ তার সেই মামুলি-গড়ন আর কোনো দিনই ছাড়লো না! কাজেই রকমারি বিদেশী-মুখোশ কেনবার জন্য আমরা লালায়িত হই। বিদেশী মুখোশের বৈচিত্র্য দেখলে মুগ্ধ হতে হয়! অথচ এই বিদেশী-মুখোশ অল্প-আয়াসে এবং অল্প খরচে ঘরে বসে আমরা তৈরী করতে পারি। সেই মুখোশ আর রকমারি পুতুল তৈরী করার কথা আজ বলছি।



মুখোশ.

এই মুখোশ আর পুতুলের মুখ তৈরী করবার জন্য চাই 'পেপিয়ার-মেশ' বা কাগজের মণ্ড।

ছবিতে যে-সব মুখোশ দেখছেন, ওগুলি এই কাগজের মণ্ডে বা পেপিয়ার-মেশে তৈরী। এই পেপিয়ার-মেশ ঘরে তৈরী করা চলে। কতকগুলো খবরের কাগজ জলে ভিজিয়ে নিন্। এবারে চাই তার সঙ্গে পেষ্ট বা কাই মেশানো। এখন কি করে এই কাগজের মণ্ড তৈরী করতে হবে, বলি।

এক-এক-শীট খবরের কাগজ নিয়ে গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন। সন্ধ্যার সময় ভিজুতে দিন; সারা রাত কাগজ এ-জলে ভিজুনো থাকবে; তার পর সকালে উঠে এই ভিজুনো কাগজ নিংড়ে জল ঝরিয়ে সেই কাগজ ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে একখানা কাঠের পিঁড়ির উপরে রেখে ঘষে নিন। ঘষলে এ-কাগজ একেবারে ময়দার মতো মিহি গুঁড়ো হয়ে যাবে। এবার এই গুঁড়ো মিশুতে হবে কাইয়ের সঙ্গে।

কাই মানে, বিশেষ কোনো পদার্থ নয়। জলে ময়দা গুলে একটা পাত্রে করে উনুনের জ্বালে চড়িয়ে মামুলি প্রথায় যে-কাই আমরা নিত্য তৈরী করি সেই কাই। তবে এ-কাই খুব থকথকে জমাট-ঘন করতে হবে। প্রায় হালুয়ার মতো ঘন করা চাই।

এবার কাগজের ঐ মিহি গুঁড়ো আর এই কাই—এ দুটো বেশ করে চটকে মিশিয়ে নিন। মিশুবার মাপ আছে; এক-ভাগ কাইয়ের সঙ্গে দু'-ভাগ কাগজের গুঁড়ো মিশুতে হবে। দু'টো বেশ ভালো রকম মিশ খেলে একখানা গামছার মধ্যে সেটা পুরে সেই গামছা চেপে-চেপে তার জল ঝরিয়ে ফেলুন। জল ঝরে গেলে যে-মণ্ড পেলেন, সে-মণ্ড হবে কাদার তালের মতো নরম। যদি দেখেন, এ-তাল চট্‌চটে হয়ে হাতে এঁটে থাকছে, তাহলে বুঝবেন, তালে দোষ রয়েছে; এবং এ-দোষ থাকলে মোটা গামছায় জোরে-জোরে আবার বেশ করে টিপে তার জল ঝরান। হাতে যখন আঠার মতো এ-তাল এঁটে থাকবে না, তখন বুঝবেন, সেটা কাজের উপযোগী হয়েছে।

কাজ করার আগে এই মিকশ্চার-তাল পুতুল প্রভৃতি গড়বার উপযোগী হয়েছে কি না, ভালো রকম পরখ করা চাই।

পরখের বিধি হলো—

১। যদি ছাখেন, এ-তাল ভিজে সপ্সপ্ করছে, তাহলে হাত দিয়ে চেপে-চেপে জল ঝরিয়ে নিতে হবে।

২। যদি ছাখেন, এ-তাল ফেটে যাচ্ছে, তাহলে বুঝবেন, বড্ড শুকিয়ে গেছে; তাতে আরো খানিকটা আঠা বা পেষ্ট মিশিয়ে নিন।



মাথায় টুপি ও চুল

৩। এ-তালে যদি বীচির মতো ড্যালা-ডুলো (lumps) থাকে, তাহলে সেগুলি বেছে ফেলে দেবেন।

৪। তাল ঘাঁটাঘাঁটি করতে আঠার মতো যতক্ষণ তা হাতে লেগে থাকবে, ততক্ষণ সে-তাল কাজের উপযোগী হয়নি, জানবেন।

৫। এক-কথায় তালটুকু হবে ছানার মতো—আঠার মতো হাতে লাগবে না—অথচ শুকিয়ে যাবে না। সেই তালই হলো মুখোশ, পুতুল প্রভৃতি গড়বার উপযোগী।

কাদার তাল ঠিক-মতো তৈরী হলে তা নিয়ে মস্ত একটা গোলা (বল্) তৈরী করুন। তার পর এ দিয়ে যা কিছু গড়তে চান, আঙুলের টিপে চেপে-চেপে গড়ে নেবেন। কাদার তাল নিয়ে যেমন করে শিবলিঙ্গ তৈরী করেন, তেমনি ভাবে কাগজের তাল টিপে-টিপে মুখোশ-পুতুল প্রভৃতি গড়বেন। মানুষ-পুতুল গড়ুন, বেরাল-কুকুর-হাতী গড়ুন, পাহাড়-পর্ব্বত নদী-নালা গড়ুন, ম্যাপ তৈরী করুন। নিজের খুশী-মাফিক কাদার তালের মতো এই কাগজের তাল দিয়েই সব জিনিষ গড়তে পারবেন।

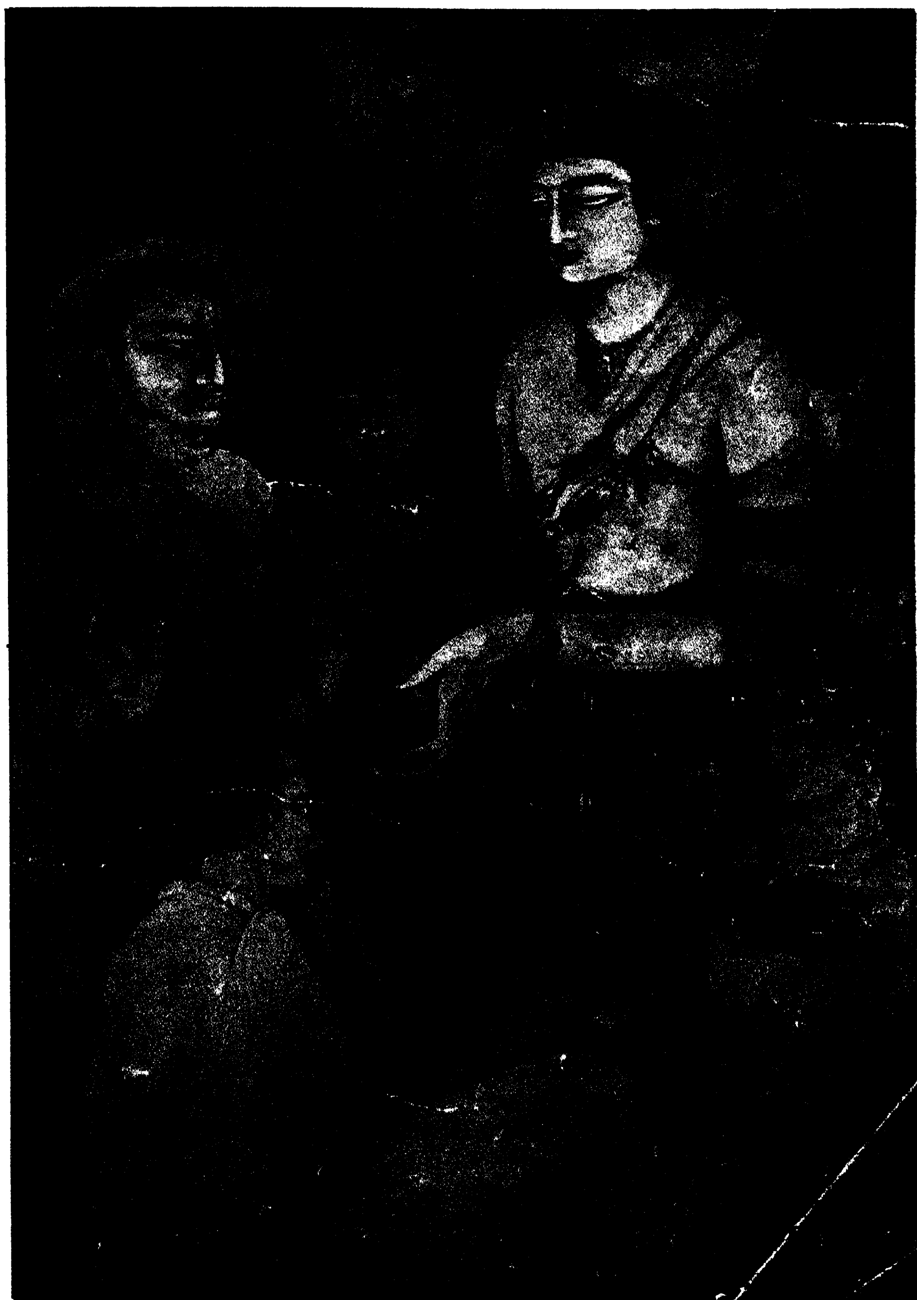
গড়বার আগে একখানা কাগজে যদি একটা আদ্‌রা বা ডিজাইন ছকে রাখেন, তাহলে সেই আদ্‌রা দেখে গড়বার কাজে অনেকখানি সাহায্য পাবেন।



ম্যাকবেথ-পুতুল

কাগজ যত বেশীক্ষণ ভিজিয়ে রাখবেন, কাজের পক্ষে ততই সুবিধা হবে—সে কাগজ তত-বেশী নরম হবে।

গোটা-পুতুল তৈরী করতে হলে তার মাথা, গা, হাত-পা—এ-সবের মাপে যেন অসামঞ্জস্য না থাকে, দেখবেন। অসামঞ্জস্য থাকলে পুতুল কিম্ভুত-কিমাকার হয়ে উঠবে! সামঞ্জস্য রাখবার নিয়ম—গোটা-পুতুল যে-মাপের হবে, সে-মাপের চেয়ে তার মাথা ও মুখের মাপ হবে লঘে ৭ ভাগ। অর্থাৎ গোটা-পুতুলের মাপ যদি হয় সাত ইঞ্চি, তাহলে তার মাথা ও মুখ হবে এক-ইঞ্চি! ইঞ্চি ধরে এ-মাপটুকু ঠিক করে নেবেন। এ হলো মাপের সাধারণ নিয়ম। তার পর আপনি যদি চান, মস্ত ভারী মাথার সঙ্গে বাঁটুল দেহ জুড়ে সঙ-পুতুল তৈরী



সিংহলে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা

চিত্রাধিকারী—শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সৌজন্যে]

[শিল্পী—শ্রীসুধাংশু বসু রায়চৌধুরী

ভাসের নাটকচক্র

মহাকবি ভাসের যশোরাশি একদিন এই ভারতীয় বিদ্বৎ-সমাজে যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল—তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহা না হইলে কালিদাস, দণ্ডী, বাণভট্ট, জয়দেব (প্রসন্নরাঘব রচয়িতা) রাজশেখর, অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি মহাকবিগণও অসঙ্কোচে ভাসের গুণকীর্ত্তন করিতেন না। পরবর্ত্তী কালে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি নব্য মহাকবিগণের রচিত নব নব নাটকের ভাব, ভাষা ও রসের অভিনব বিকাশ-মাধুরী আস্বাদন করিয়া বিদ্বৎসমাজ হয় ত' পুরাতন ভাসকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এজন্য ভাসের গ্রন্থগুলি ক্রমে গুপ্ত বা বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কালের আবর্ত্তনে অমর ভাষার মহাকবি ভাস পুনরায় সকলের স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছেন।

গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী কয়েকখানি নাটক আবিষ্কার করেন, তাহাতে রচয়িতার নাম উল্লিখিত ছিল না, তিনি সেইগুলি ভাস-বিরচিত বলিয়া প্রমাণিত করিতে যত্নবান্ হ'ন। সাধারণতঃ সংস্কৃত নাটকে এরূপ নিয়ম দেখা যায় যে, প্রস্তাবনামধ্যেই কবির নামের উল্লেখ থাকে, এই নাটকগুলিতে তাহা নাই; অথবা পুষ্পিকা (colophone) মধ্যে গ্রন্থকারের নাম লিপিবদ্ধ থাকে, কিন্তু উক্ত নাটকগুলিতে কোথায়ও রচয়িতার নাম-গন্ধ পাওয়া যায় নাই। কাজেই নিতান্ত অনুমানের আশ্রয় ব্যতীত প্রমাণের অন্য কোন উপায় নাই। ৺গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় কতকগুলি প্রমাণ উপন্যস্ত করিয়া ভূমিকামধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সে প্রমাণগুলি কতদূর বিচারসহ—তাহা বিবেচনার জন্য উক্ত নাটকগুলিকে তিনি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষানুশীলনকারী ব্যক্তিমাত্রই তাহা পাঠ করিয়া সেই প্রমাণের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন অথবা তুচ্ছতা বোধ করিয়া উপেক্ষাও করিতে পারেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের বহু পণ্ডিত এই নাটকগুলি ভাস-রচিত কি না—তদ্বিষয়ে তুমুল গবেষণা করিয়াছেন। ফল হইয়াছে—বিপরীতমুখা—দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এক সম্প্রদায় উক্ত নাটকগুলিকে ভাসরচিত বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, অন্য সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, তাহা কখনই হইতে পারে না। আবার একটি তৃতীয় মতও আছে—তাহা এইরূপ—'এক অর্থে এই নাটকগুলি ভাসরচিত বলা যায়, অন্য অর্থে ভাসের রচিত না'ও বলা যায়।' এইরূপ বহুবিধ মতবাদ সত্ত্বেও ভাস-কবির নাম-পতাকা মস্তকে ধারণ করিয়া উক্ত নাটকগুলি একাধিক সংস্করণ অতিক্রম করিয়া জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইয়াছে। দুই-চারখানি নহে—তেরখানি সেইরূপ নাটক আবিষ্কৃত হইয়াছে—১—স্বপ্নবাসবদত্ত, ২—প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ, ৩—অবিমারক, ৪—চারুদত্ত, ৫—প্রতিমা, ৬—অভিষেক, ৭—পঞ্চরাত্র, ৮—মধ্যমব্যায়োগ, ৯—দূতবাক্য, ১০—দূতঘটোৎকচ, ১১—কর্ণভার, ১২—উরুভঙ্গ, ১৩—বালচরিত।

পুণার ওরিএন্ট্যাল সিরিজ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে 'ভাসনাটকচক্র' নামে উক্ত নাটকগুলির একটি নূতন সংস্করণ হইয়াছে, তাহাতে উক্তক্রমানুসারে ১৩খানি নাটকই মুদ্রিত আছে। ভাসনাটকচক্র এই নামটি আধুনিক নহে, পরন্তু কবি রাজশেখর-কৃত একটি শ্লোক হইতে সংগৃহীত,—শ্লোকটি এই—

> "ভাসনাটকচক্রেঽপি চ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
> স্বপ্নবাসবদত্তস্য পাবকোঽভূন্ন পাবকঃ॥"

('দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ' এইরূপ পাঠান্তর আছে)

বিবুধগণ কর্ত্তৃক 'ভাসনাটকচক্র' পরীক্ষার্থ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে স্বপ্নবাসবদত্ত নামক নাটকখানিকে অগ্নিদেব (দগ্ধ করিয়া) পবিত্র করিতে পারেন নাই। কবির তাৎপর্য্য এই যে, খাদমিশ্রিত সুবর্ণই অগ্নিদগ্ধ হইলে উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ হয়, খাদ বা দোষ না থাকিলে অগ্নি কিরূপে পবিত্র করিবেন? স্বপ্নবাসবদত্ত নির্দ্দোষ নাটক—একখণ্ড বিশুদ্ধ কাঞ্চনসদৃশ, ইহাই ব্যঞ্জনা।

রাজশেখর খৃষ্টীয় নবম শতকের লোক বলিয়া অনুমিত হয়, তাঁহার সময়েও যে ভাসের বহু নাটক বর্ত্তমান ছিল এরূপ বুঝা যায়, তাহার পূর্ব্বেও খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে—প্রসিদ্ধ মহাকবি বাণভট্টের একটি শ্লোক হইতে ভাসের বহু সংখ্যক নাটকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্লোকটি এইরূপ—

সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব।

বহু দেবমন্দির (প্রতিষ্ঠা) দ্বারা মানব যেমন যশোভাগী হয়, তদ্রূপ ভাসও বহু নাটক (রচনা) দ্বারা যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। শ্লিষ্ট বিশেষণ দ্বারা নাটক ও দেবমন্দিরের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—সূত্রধার যাহার আরম্ভ করে (দেবমন্দির নির্ম্মাণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই শিল্পী সূত্র দ্বারা পরিমাণ করিয়া লয়, নাটকের পূর্ব্বেও সূত্রধার আসিয়া নাটক সূচনা করে) যাহা বহুভূমিক, দেবমন্দিরে বহু ভূমিকা (দ্বিতল, ত্রিতল, পঞ্চতল) থাকে, নাটকে বহু পাত্র থাকে, এবং যাহা সপতাক—দেবমন্দিরে পতাকা থাকে, নাটকে প্রাসঙ্গিক বিশিষ্ট ঘটনার সমাবেশ থাকে, এইরূপে নাটক ও দেবমন্দিরের সাদৃশ্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং বাণভট্টের সময়েও ভাসের বহু নাটক বেশ খ্যাতিলাভ করিয়া প্রচলিত ছিল, ইহা বুঝা যায়। তৎপূর্ব্বকালে কালিদাসের সময়ে ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্র প্রভৃতি কবিগণ যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের প্রস্তাবনামধ্যে কালিদাস উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কালিদাস নিজ কাব্যকে নব্য বলিয়া এবং ভাস-নাটককে পুরাণ বলিয়া ভাসের প্রাচীনত্বও প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।

'প্রসন্ন রাঘব' নামক নাটক-রচয়িতা জয়দেব (ইনি নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র নামেও প্রসিদ্ধ) ভাসকে সরস্বতীর হাস্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—'ভাসো হাসঃ'।

দণ্ডী বলিয়াছেন,—

সুবিভক্তমুখাদ্যঙ্গৈর্ব্যক্ত-লক্ষণ-বৃত্তিভিঃ।
পরেতোঽপি স্থিতো ভাসঃ শরীরৈরিব নাটকৈঃ॥

ভাস পরলোকে গমন করিলেও তাঁহার নাটকগুলি যেন বহু শরীররূপে বিদ্যমান। শরীর ও নাটকের সাদৃশ্য শ্লিষ্ট শব্দের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে, শরীরে যেমন মুখাদি অঙ্গ সুবিভক্ত থাকে, সেরূপ নাটকেও মুখাদি পঞ্চাঙ্গ বর্ত্তমান থাকে, শরীরে পুরুষের বা ভাগ্যবত্তার লক্ষণ ও বৃত্তি (চেষ্টা) পরিস্ফুট থাকে, নাটকেও অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ, বৃত্তি অর্থাৎ রীতি ও ছন্দ পরিস্ফুট থাকে। এখানেও বহু নাটকের অস্তিত্ব এবং ভাস কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ লক্ষণাদি সমন্বিত অবিনশ্বর নাটক রচনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাস সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কবি জয়ানককৃত পৃথ্বীরাজবিজয় মহাকাব্যে উল্লিখিত আছে যে, ভাসের কাব্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করা হইলেও তাহা উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে,—খলদিগের চিত্তই ভীষণ অগ্নি। ইহার টীকায় জোনরাজ বলিয়াছেন যে, ভাস ও ব্যাস উভয়ের কাব্য কোন সময়ে পরীক্ষার্থ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসের কাব্যকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে নাই। এইরূপ আরও কিম্বদন্তী আছে যে, ধাবক কবিই ভাস নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি জাতিতে রজক ছিলেন। রাজশেখরকৃত এই শ্লোকটিও প্রচলিত আছে,—

কারণং তু কবিত্বস্য ন সম্পন্ন কুলীনতা।
ধাবকোঽপি হি যদ্ ভাসঃ কবীনামগ্রিমোঽভবৎ॥

এ সমস্ত কিম্বদন্তীর মূল হইতেছে ভাসের প্রাচীনতা। বস্তুতঃ এক্ষণে ভাসের জীবনবৃত্তান্ত শুনিবার কোন উপায়ই নাই। * তবে, এক্ষণে যে প্রশ্ন সুধীসমাজের সমক্ষে

"নবং শরাবং সলিলস্য পূর্ণং * * *
* * * যো ভর্তৃপিণ্ডস্য কৃতে ন যুধ্যেৎ।
ইতি মন্ত্রিপুরোহিতাভ্যামুৎসাহয়েদ্ যোধান্।"

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে (অধিকরণ ১০ অধ্যায় ৩) এই শ্লোকটি পাওয়া যায়. ইহা ভাসকৃত প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণে চতুর্থাঙ্কের শ্লোক। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ভাসকবি কৌটিল্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। বিশেষতঃ, ভাসের নাটকগুলির সমস্ত বিষয়বস্তু (plot) বৃহৎ কথা, রামায়ণ ও মহাভারত হইতে গৃহীত। স্বপ্নবাসবদত্তের নায়ক বৎসরাজ উদয়ন সম্বন্ধে প্রাচীন প্রেমকাহিনী পুরাতন ভারতে প্রচলিত ছিল। তাই মেঘদূতে কালিদাস লিখিয়াছেন—

'উদয়নকথাকোবিদান্ গ্রামবৃদ্ধান্'

এই উদয়নকথা প্রাচীন বৃহৎ কথা হইতে তৎকালের লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা অনেকের মত। প্রসিদ্ধ কবি-গণের মধ্যে রামায়ণ মহাভারতাদি হইতে বিষয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া নাটক রচনার প্রথম পথিপ্রদর্শক ভাস কবি—ইহা অনেকের অনুমান।

উপস্থিত হইয়াছিল—পূর্ব্বোক্ত ১৩খানি নাটক ভাস কবি-বিরচিত কি না, তদ্বিষয়ে যে দুইটি বিশিষ্ট মত আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি।

৺গণপতি শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ ১৩খানি নাটকই ভাসরচিত, কারণ,—(১) নাটকের প্রথমেই লেখা আছে—"নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ" কিন্তু পরবর্ত্তী কালের নাটকের প্রথমে এরূপ লেখা থাকে না, তাহাতে লেখা থাকে,—"নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ।"

এই উভয়ের পার্থক্য এই যে, সূত্রধার যে শ্লোকটি প্রথমে পাঠ করে, উহাই নান্দী, ইহা আধুনিক নাটকে প্রচলিত। ভাসের নাটকে নান্দী নেপথ্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইলে সূত্রধার আসিয়া নাটক আরম্ভ করে। প্রথম শ্লোকটি নাটকেরই অঙ্গ, নান্দীর অঙ্গ নহে, প্রথম শ্লোকটি না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই এজন্য 'চারুদত্ত' নাটকের প্রথমে কোন শ্লোক নাই। এই বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিয়াই বাণভট্ট লিখিয়াছিলেন— "সূত্রধারকৃতারম্ভৈঃ"।

(২) কালিদাসকৃত নাটকাদির প্রথমে 'প্রস্তাবনা'র নাম দেখা যায়, কিন্তু ভাসের নাটকের প্রথমাংশের নাম 'স্থাপনা'। প্রস্তাবনা নামটি পরবর্ত্তী কালের।

(৩) প্রস্তাবনার মধ্যে কবির নাম ও নাটকের নাম উল্লেখ থাকে—ইহাই প্রচলিত নিয়ম; ভাসের প্রাচীনতার ইহাও একটি প্রমাণ যে, তখন স্থাপনার মধ্যে ওরূপ নিয়ম ছিল না, সেজন্য ভাস কোন নাটকের স্থাপনামধ্যেই নিজ নাম বা প্রযুজ্যমান নাটকের নাম উল্লেখ করেন নাই।

(৪) সমস্ত নাটকের শেষেই—ভরতবাক্যে—একরূপ রচনা আছে—"রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ" "পাতু নো নরপতিঃ" এই ভাবের প্রার্থনা।

(৫) এই তেরখানি নাটকই একরূপ ভাষায় ও একরূপ নিয়মে নিবদ্ধ। এক 'চারুদত্ত' ব্যতীত প্রথম শ্লোকেই নাটকের ভাবার্থসূচনা সর্ব্বত্র পরিস্ফুট।

(৬) রাজশেখর ত স্বপ্নবাসবদত্ত ভাসপ্রণীত বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—স্বপ্নবাসবদত্তের সহিত সাদৃশ্য অবশিষ্ট ১২খানি নাটকেও বেশ পরিস্ফুট।

(৭) বহু আলঙ্কারিক ভাসের বিভিন্ন নাটক হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বামন স্বপ্নবাসবদত্ত, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ এবং চারুদত্ত হইতে উদাহরণ দেখাইয়াছেন। ভামহ প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। দণ্ডী যে "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি" শ্লোকটির আলোচনা করিয়াছেন,—তাহা চারুদত্ত এবং বালচরিত উভয় গ্রন্থেই বর্ত্তমান। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ এই শ্লোকের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন।

(৮) আরও বক্তব্য এই যে, এই নাটকসমূহে বহুতর প্রয়োগ এইরূপ আছে, যাহা পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করা যায়। বহু স্থলেই পাণিনির নিয়ম ও ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসন অতিক্রম করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা নাটকগুলি যে অতি প্রাচীন, তাহা বুঝা যায়। ভাসের প্রাচীনতাও সুপ্রসিদ্ধ, এই সকল কারণে এই নাটকগুলির রচয়িতা ভাস ভিন্ন অপর কেহ নহেন, ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়।

ইহার উত্তরে অন্য সম্প্রদায় * বলেন,—(১) (২) (৩) প্রস্তাবনা বা স্থাপনায় যে নাম উল্লিখিত হয় নাই, তাহার কারণ—এগুলি যে কাহার এবং কোন্ সময়ের লেখা, তাহার কোনরূপ নিশ্চয়তা না থাকায় গ্রন্থকার নিজ নাম প্রদান করিবেন কিরূপে? কারণ, এগুলি কেরল দেশের প্রচলিত যাত্রাদলের অভিনীত নাট্য-বিশেষের অনুবাদ মাত্র। প্রস্তাবনা ও ভরতবাক্য পরে কোন লেখক কর্ত্তৃক যোজিত হইয়াছে। কেরল দেশে যে এরূপ ছোট ছোট যাত্রা অভিনীত হয়, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। আর সে দেশের বৈচিত্র্য এই যে, কোন নাটকই সম্পূর্ণ নহে, নির্ব্বাচিত কয়েকটি অঙ্ক অভিনীত হয়। এজন্য ভাসের নাটকগুলিরও আকার ক্ষুদ্র এবং অসম্পূর্ণ মত।

সূত্রধার-কৃতারম্ভ,—ইহা ত সকল নাটকেই আছে—সকল নাটকেই সূত্রধার প্রথমে আরম্ভ করে—সুতরাং এই উক্তি দ্বারা কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না।

(৪) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—পূর্ব্ব ও শেষের অংশ এক সম্প্রদায়ের লোকের লেখা, তাহারা তদ্দেশে প্রচলিত

* Mr. C. R. Devadhar M. A., Prof. Winternitz এবং Dr. Sylvain Levi ইহারা প্রায় একরূপ মত পোষণ করেন।

যাত্রার অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া স্থাপনা ও ভরতবাক্য জুড়িয়া দিয়াছে,—সুতরাং একরূপ ত হইবেই।

(৫) ভাষা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, অপপ্রয়োগগুলি দেখিয়া প্রাচীনতা নির্ণয় বিষয়ে তেমন জোর দেওয়া যায় না। অপপ্রয়োগ আধুনিকও হইতে পারে। যাহারা সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছে,—তাহারা পাণিনীয় ব্যাকরণে তেমন ব্যুৎপন্ন না থাকায় এইরূপ অপপ্রয়োগের বাহুল্য ঘটিতে পারে। প্রাকৃত ভাষার বৈচিত্র্য দ্বারাও প্রাচীনতা প্রমাণিত হয় না, কেন না, প্রাদেশিক প্রভাবেও অনেক সময়ে প্রাকৃতের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে দেশের পুথী হইতে এই নাটকগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেই দেশের পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা পুথীর মধ্যে লিপিকার্য্যের সময়ে প্রবিষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। বস্তুতঃ ভাসের লিখিত প্রাকৃত ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

(৬, ৭) রাজশেখর যে ভাসপ্রণীত স্বপ্নবাসবদত্তের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই প্রসিদ্ধ স্বপ্নবাসবদত্ত ইহাই কি না—কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ দেখা যায় যে, অলঙ্কারশাস্ত্রে স্বপ্নবাসবদত্ত হইতে উদ্ধৃত 'সঞ্চিতপক্ষকপাটম্' (ধ্বন্যালোক) ও 'পাদাক্রান্তানি পুষ্পাণি' (নাট্যদর্পণ) এই দুইটি শ্লোকই বর্ত্তমান স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকে পাওয়া যায় না। 'লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি' এই শ্লোকটি মৃচ্ছকটিক হইতেও গৃহীত হইতে পারে।

(৮) ইহার প্রথমাংশের উত্তর (৫)এ প্রদত্ত হইয়াছে, শেষাংশের উত্তর এই যে, দাক্ষিণাত্যের নাটকগুলিতে যেরূপ দৃশ্য-সৃষ্টি সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, এই সকল নাটকেও তদ্রূপ নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। ভরত মুনির নিয়মানুসারে নাটকে বধ বা মৃত্যুর দৃশ্য দেখাইতে নাই, এই নাটকগুলিতে মৃত্যুর দৃশ্য দেখান হইয়াছে। ইহা (স্থানীয় নাট্যকারের) প্রভাব মাত্র, প্রাচীনতার পরিচায়ক নহে।

এই সকল আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উক্ত ১৩খানি নাটক এক ব্যক্তির প্রণীতও নহে—ভাসের ত' নহেই।

এইরূপে বিরুদ্ধ তর্কযুক্তির অবতারণার ফলে পূর্ব্বোক্ত নাটক কয়খানি ভাসপ্রণীত কি না, এ বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ এখনও বর্ত্তমান। সুধীসমাজে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন এখনও আছে—এজন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বস্তুতঃ এ বিষয়ে আরও দুই-চারিটি তর্ক উত্থাপিত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, দেখা যাইতেছে যে, স্থাপনা বা প্রস্তাবনা মাত্রেই যে কবির নাম থাকিবে, এমন কোন নিয়ম প্রাচীন কাল হইতে অনুসৃত হয় নাই। অনুসৃত হইলে অবশ্যই উক্ত ১৩খানি নাটকে নাম না থাকায় একটা গুরুতর সন্দেহ দাঁড়াইত, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ভগবদজ্জুকীয়, ত্রৈবিক্রম, নলাভ্যুদয় প্রভৃতি নাটকের প্রস্তাবনায় রচয়িতার নাম উল্লিখিত নাই। সুতরাং নাম না থাকিলেই যে প্রকৃত রচয়িতার সহিত সম্বন্ধনির্ণয়ে বাধা ঘটিবে—এমন কোন নিশ্চয় করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত অপপ্রয়োগ উক্ত নাটকগুলিতে স্থান পাইয়াছে—তাহার অধিকাংশই রামায়ণ বা মহাভারতে বহুল ভাবে ব্যবহৃত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শিত হইতেছে :—

(১) "স্বরাম্যবন্ত্যাধিপতেঃ সুতায়াঃ" (স্বপ্নবাসবদত্ত) "অবন্ত্যাঃ অধিপতেঃ" বিসর্গ লোপের পর সন্ধি হওয়া উচিত নহে, এইরূপ প্রয়োগ মহাভারতে প্রচুর, যথা, দেবাপি নূনমনৃতং বদন্তি (কর্ণপর্ব্ব ৬৮ অঃ ১৫ শ্লোক), এখানে 'দেবাঃ অপি' সন্ধি হওয়া উচিত নহে, 'যোপকর্ত্তৃংশ্চ হর্ত্তৃংশ্চ' যঃ উপকর্ত্তৃংশ্চ এখানেও সন্ধি হওয়া উচিত নহে (বনপর্ব্ব ২৪ অঃ ৬০ শ্লোক)।

(২) 'কোঽয়ং বিনিষ্পততি গর্ভগৃহং বিগাহ্য উল্কাং প্রগৃহ্য' (বালচরিত) এখানে 'বিগাহ্য উল্কাম্' সন্ধি হওয়া উচিত ছিল।

(৩) দ্রুপদরাজসুতাং রুদন্তীম্' (দূতবাক্য) রুদতীম্ হওয়া উচিত।

তথা তু তারা করুণং রুদন্তী
ভর্ত্তুঃ সমীপং সহ বানরীভিঃ।
ব্যবস্থত প্রাপ্যমনিন্দ্যবর্ণা
উপোপবেষ্টুং ভুবি যত্র বালী॥
(রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৮ অঃ)

এখানে 'বর্ণা ও উপোপবেষ্টুং' সন্ধি হওয়া উচিত ছিল এবং রুদন্তী স্থলে রুদতী পদ পাণিনিসিদ্ধ।

কথা বলছি। যাঁরা তেল-মাখার নামে শিউরে ওঠেন, তাঁরা এ-প্রণালী মানলে দেখবেন, গা হবে ননীর মতো নরম; এবং গায়ে আঁচিল-তিল-জড়ুল প্রভৃতি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না!

গা-দলাইয়ের কাজে কোনো রকম যন্ত্রপাতির দরকার নেই; দরকার শুধু আমাদের আঙুলগুলির ব্যবহার। তবে মর্দ্দনের আগে যে-অঙ্গ দলবেন, সে-অঙ্গে আগে বেশ করে পাউডার বা ক্রীম ঘষে নেবেন। নাহলে গা ছড়ে যাবে,—গায়ের চামড়ায় কালশিরা পড়বে! গা-দলাইয়ে দেহের মেদ ঝরে যায়, রক্ত-চলাচল-ক্রিয়া অব্যাহত হয়। যাঁরা খুব রোগা, তাঁদের দেহ মাসে ভরে নিটোল হবে; আর যাঁরা মোটা, তাঁদের দেহের চর্ব্বি ঝরে দেহখানি নিটোল সুঠাম হয়ে উঠবে।

দেহের যে-জায়গা মেদ-ভারে থলথলে, সে-জায়গা দলাই করবেন একটু বেশী করে।

অনেকের ঘাড়ে মেদ জমে ঘাড়ের শ্রী নষ্ট হয়—ঘাড়ের দলনে সে কুশ্রীতা অচিরে দূরীভূত হবে। ঘাড়ের দলন করতে হবে তিনটি আঙুল দিয়ে জোরে জোরে ঘর্ষণে—ঘাড় থেকে খুব জোরে সামনের দিকে কণ্ঠার দুই ঝিঁকের উপর পর্য্যন্ত আঙুল চালানো চাই।

উরু বা জঘন-দেশ দলনের সময় দলাই করতে করতে সে-সব জায়গায় মাঝে মাঝে চিমটি-কাটার ভঙ্গীতে খামচে খামচে দেবেন। কোনো দিকে কোনো অঙ্গ পীড়িত না হয়, ব্যথা না লাগে, এমনি ভাবে অর্থাৎ অস্বাচ্ছন্দ্য না হয়, এমন ভাবে গা-দলা চাই।

পায়ের দলন তো করবেনই, তার উপর মাঝে মাঝে যদি ফুট-বাথ স্নান, তাহলে পায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। পা সুস্থ থাকলে জানবেন, চোখের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবে না, চলাফেরায় কখনো অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না। চলার অস্বাচ্ছন্দ্যে অনেক সময় আমাদের চোখ খারাপ হয়। কেন? সে জটিল প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। কথাটা শুধু জেনে রাখুন। এবং এই আশঙ্কার জন্যই বলছি, মাঝে মাঝে ফুট-বাথ নেওয়া প্রয়োজন। কি করে ফুট-বাথ নেবেন, বলি।

দু'খানি এনামেলের বড় বৌউল (bowls) নেবেন। একটা বৌলে থাকবে গরম জল, আর একটায় ঠাণ্ডা জল। দু'টি পাত্রের জলেই খানিকটা নুন ছিটিয়ে দেবেন। তার পর দু'খানি পা গরম জলের বৌলে ডুবিয়ে দিন। পায়ে সয়, এমন গরম জল নেবেন। দু'-মিনিট গরম জলে দু'পা ডুবিয়ে রাখবার পর ঠাণ্ডা জলের বৌলে পা ডোবাবেন। ঠাণ্ডা জলেও ঐ দু'-মিনিট পা ডোবান। এমনি ভাবে দশ-মিনিট ফুট-বাথ নিতে হবে। মাঝে মাঝে—ধরুন, হপ্তায় দু'দিন করে—ফুট-বাথ নিলে সর্দ্দি-কাসির ভয় থাকবে না—কোনো কালে নয়! তাছাড়া পরিপাক-ক্রিয়া অব্যাহত হবে।

দেহ-বন্ধ

রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

হেলাফেলা সারা বেলা এ কি খেলা আপন-মনে!

এ-কথার ব্যাপক-অর্থ,—যত দুঃখ-বেদনাই আমরা পাই না কেন, জীবনকে গম্ভীর করিয়া তুলিলে আমাদের স্বাস্থ্যে গ্রহণ লাগে,—দেহ ভাঙ্গিয়া জীর্ণ হইয়া যায় এজন্য হেলাফেলায় খেলার ভাব আমাদের ত্যাগ করা উচিত নয়। হাসিখেলা আমাদের স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখে; এবং স্বাস্থ্য ভালো থাকিলে অনেক ব্যথা-বেদনা অনায়াসে তুচ্ছ করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়।

দেহকে অটুট রাখিতে হইলে দেহের ব্যায়াম-সাধনা যে অত্যাবশ্যক, সে কথা আমরা বুঝি। অনেকে হয়তো বলিবেন, প্রত্যহ একা এক-কোণে গিয়া ব্যায়াম-সাধনা ভালো লাগে না! এক জন সঙ্গিনী থাকে, তাহা হইলে কৌতুক-ভরে ব্যায়াম-সাধনাকে অনেকখানি স্বচ্ছন্দ করিয়া তোলা যায়! এ যাবৎ মেয়েদের ব্যায়াম-সাধনার যে সব প্রণালীর কথা আমরা বলিয়াছি, সে সব ব্যায়াম-সাধনায় বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গিনী করা কঠিন নয়। সকলেরই তো ব্যায়াম-সাধনা চাই!

ব্যায়াম-সাধনার সঙ্গে আনন্দ-কৌতুক পাওয়া যায়, আজ এমনি ব্যায়াম-সাধনার কথা বলিতেছি। এ ব্যায়াম-সাধনায় দেহ বেশ নিটোল ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে—বুক, মুখ, পিঠ, হাত-পা, কোমর—সকল অঙ্গের অশোভনতা নিঃসন্দেহে ঘুচিবে। তার উপর এ ব্যায়াম-কৌতুকে হাসিখুশীর ঝর্ণা-ধারায় মনের প্রফুল্লতা অনিবার্য্য।

এ ব্যায়ামে প্রৌঢ়ত্বের আশঙ্কা নাই! এ-ব্যায়ামকে

যৌবনের রাজটীকা বলা চলে ; এ ব্যায়ামে দেহ-মন তারুণ্যে নিটোল থাকিবে চিরদিন। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর বয়সেও দেহ-মন থাকিবে বিশ-বাইশ বৎসরের তরুণীর মতো। বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, এ ব্যায়ামে carefree ageless থাকিতে পারিবেন।

এ ব্যায়াম যাঁরা করিবেন, দয়া করিয়া তাঁরা পেটেণ্ট ঔষধ ত্যাগ করিবেন। মাথা ধরিলে পেটেণ্ট ঔষধ



১। মাথার উপর তুলুন

খাইবেন না। টিনে-ভরা ফল বা কেমিক্যাল ফুড যথা-সম্ভব বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। এ ব্যায়ামের যিনি প্রবর্ত্তক, তিনি বলেন, মাথা যদি ধরে, তাহা হইলে মাথা কেন ধরিল, কারণ খুঁজিয়া সে-কারণটুকুর উচ্ছেদ করিতে হইবে। মাথা যদি ধরে, তাহা হইলে রগ মেশাজ্ (মর্দ্দন) করিয়া সে মাথা-ধরা ছাড়ান। নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে ঔষধ ব্যবহার করিবেন না।

আমাদের লাঙ্‌স্ (lungs) যদি সুস্থ থাকে, পরিপাক-ক্রিয়ায় যদি কোনো বৈকল্য না ঘটে, তাহা হইলে কোনো রোগের সাধ্য নাই আমাদের আক্রমণ করিবে! যদি পারেন, প্রত্যহ প্রাতে এক পেয়ালা লেবুর রস পান করিবেন,—কমলালেবুর রস হইলে আরো ভালো ; আর ডিমে যাঁদের রুচি আছে, তাঁরা প্রত্যহ এক-চামচ মধুতে একটি কাঁচা-ডিমের হরিদ্রাংশটুকু মিশাইয়া খান। এমন পুষ্টি আর কোনো খাদ্যে পাইবেন না। মাছ-মাংস কম খাইয়া তরী-তরকারী ও ফলের মাত্রা বাড়াইয়া দিন ; শরীরের স্বাস্থ্য কোনো দিন টুটিবে না, যৌবনশ্রী ক্ষয় পাইবে না।

এবার ব্যায়ামের কথা বলি। এ ব্যায়ামে দেহ-মন ভাঙ্গিয়া নব-শক্তিতে ও নব-যৌবনের ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে।



২। ধনুকের মতো

দু'জনে মিলিয়া এ ব্যায়াম করিতে হইবে। এ ব্যায়ামের জন্য চাই মোটা একগাছি বেতের লাঠি।

১। দু'জনে লাঠিটি ধরিয়া মাথার উপর তুলুন। কি ভাবে দু'জনে লাঠি ধরিবেন, ১নং ছবিতে দেখুন। ধরিবার পর এক জন লাঠি নামাইবার চেষ্টা করিবেন, আর এক জনকে তাঁর সে প্রয়াস বাধা দিয়া ব্যর্থ করিতে হইবে। দু' মিনিট এ ব্যায়াম চালান ; তার পর যিনি লাঠি নামাইবার প্রয়াসকে বাধায় ব্যর্থ করিতেছিলেন, তিনি লাঠি নামাইবার প্রয়াস পাইবেন এবং প্রথম ব্যক্তি বাধা দিয়া সে প্রয়াস ব্যর্থ করিবেন। এ ব্যায়ামও চলিবে দু' মিনিট। এ ব্যায়ামে হাতের, বগলের, কাঁধের ও বুকের পেশী মজবুত ও সুগঠিত হইবে।

২। দ্বিতীয় পর্ব্ব :—এ ব্যায়ামের নাম যৌবন-বন্ধ। ২নং ছবি দেখিয়া দেহকে ধনুকের মতো বাঁকাইয়া

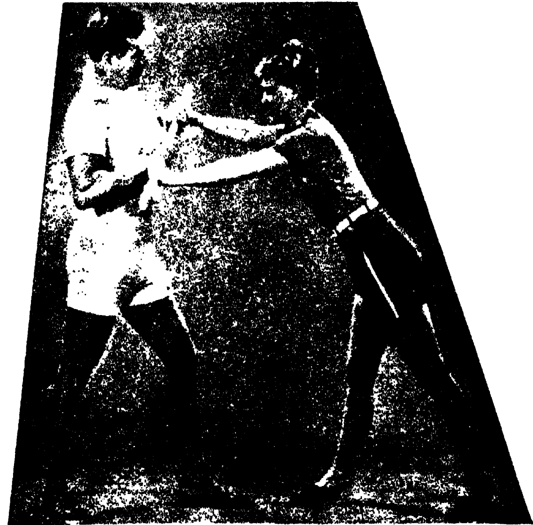

৩। সামনের দিকে ঝুঁকুন


৪। দু'জনে পাশাপাশি

এ ব্যায়াম করুন। এ ব্যায়ামে পিঠ ও জঘনদেশ সুঠামে গড়িয়া উঠিবে; হাত পা এবং তল-পেটের পেশী হইবে নিটোল ও সুছাঁদের।

৩। তৃতীয় পর্ব্বের এ ব্যায়ামটি দ্বিতীয় পর্ব্বের ব্যায়ামের উল্টা প্যাচ। দ্বিতীয় পর্ব্বে দেহকে ধনুকের মতো চাড় দিয়া নোয়াইতে হয়; তৃতীয় পর্ব্বের ব্যায়ামে দেহকে ঝোঁক দিয়া নোয়াইতে হয় সামনের দিকে। এক জন দেহকে নোয়াইবেন, অপর জন তাঁকে বাধা দিবেন, প্রথম জন যেন পড়িয়া না যান। এ ব্যায়ামে সারা অঙ্গ মেদহীন এবং নিটোল ছাঁদে আঁটিয়া-বাঁধিয়া টাইট হইয়া ওঠে।

৪। দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়ান—৪নং ছবির ভঙ্গীতে দু'জনে লাঠি ধরুন। কি ভাবে লাঠি ধরিতে হইবে, ছবিতে ভালো করিয়া দেখুন। তার পর এক জন এ লাঠি টানিবেন একবার ডান-দিকে, তার পর বাঁ দিকে, অপর ব্যক্তি উল্টা-টানে বাধা দিয়া তাঁর সে প্রয়াস ব্যর্থ করিবার প্রয়াস পাইবেন। এ ব্যায়ামে হাতে, কাঁধে ও পায়ে বেশ জোর লাগে। এ ব্যায়ামে হাতে, পায়ে বা দেহের কোথাও কখনো মেদ জমিয়া হাত-পা ও দেহকে থলথলে হইবার অবকাশ দিবে না।

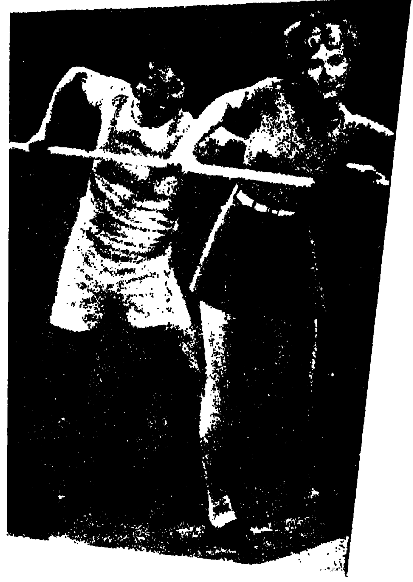

৫। দু'জনে সাম্না-সাম্নি

৫। দু'জনে সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া একবার সামনের দিকে, পরের বার পিছন দিকে ঠেলা দিন। এক জন

দিবেন ঠেলা—অপর জন সে ঠেলা রোধ করিয়া সমান সিধা ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবেন। পাল্টা-পাল্টি ভাবে দু'জনকে এ ব্যায়াম করিতে হইবে। এ ব্যায়ামে সর্ব্বদেহ সবল ও সুঠাম হইবে।

৬। লাঠি ধরিয়া দু'জনে ঈষৎ সামনে-পিছনে দাঁড়ান (৬নং ছবি দেখুন)। তার পর লাঠিগাছটিকে ধরিয়া সামনে-পিছনে কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেহের উর্দ্ধ ভাগ দোলাইবেন—পা যেন না নড়ে। দাঁড়াইবার সময় পা কিরূপ থাকিবে, ৬নং ছবি দেখুন। এই ভাবে দেহের উর্দ্ধ ভাগ বেশ ঘন-ঘন দুলাইতে হইবে অন্ততঃ-পক্ষে পাঁচ মিনিট! এ ব্যায়ামে দেহের রক্ত-চলাচলক্রিয়া স্বচ্ছন্দ অব্যাহত হইবে এবং দেহ বেশ শক্ত-সমর্থ হইবে!

এ ক'টি ব্যায়াম-বিধি যদি প্রত্যহ পালন করেন, তাহা হইলে যৌবনের রাজটীকা-লাভে ধন্য হইবেন—জরা বা বার্দ্ধক্য কোনো দিন দেহের কোণে আশ্রয় লইতে পারিবে না!



৬। সামনে-পিছনে

শেষ-প্রণাম

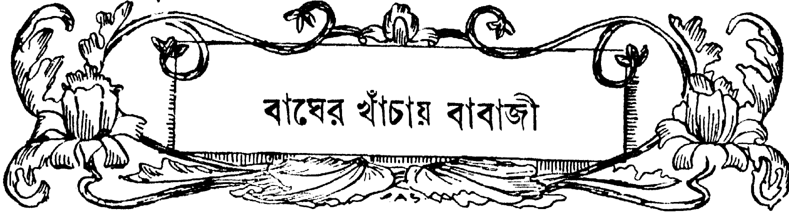
আজ্‌কে বুঝি সুরু হ'ল 'খেলা ভাঙার খেলা,'
চলে গেলে নূতন পথে তাই?
বাণীর বীণা সুর হারাল,—গান হারাল মূর্চ্ছনা—
বিশ্ব কাঁদে—নাই গো, পথিক নাই!

নিখিল হিয়া কাঁদিয়ে দিয়ে, কেড়ে নিয়ে সবার প্রাণ,
চল্‌লে তুমি ; ওগো মহান্‌ গুণী!
চির নীরব কণ্ঠ এবার—জাগ্‌বে না আর ছন্দ গান
ভূলুণ্ঠিতা,—কাঁদেন বীণাপাণি!
বিশ্বজোড়া খ্যাতি তোমায় রাখতে বেঁধে পারল কৈ?
চলে গেলে তোমার খেলা-শেষে,
ধরার খেলা শেষ হয়েছে, নূতন খেলা খেল্‌তে তাই
চল্‌লে বুঝি চির নূতন দেশে?
'দিনের শেষের শেষ খেয়াতে', ডাক দিল কোন্‌ কাণ্ডারী?
ভারত-গগন কুহেলিকায় ঢাকি,—
কোন্‌ অমরার কবির আসন অলঙ্কৃত করতে গো,—
বিশ্বপিতা নিলেন তোমায় ডাকি?

আজ্‌কে মোদের দুখের নিশা অশ্রুজলেই শেষ হবে—
মোদের গগন আঁধার—সূর্য্যহারা—
ত্রিদিবে আজ নবীন আশার রঙীন ঊষা জাগবে গো,
নূতন আলোয় জাগ্‌বে গ্রহ-তারা!
কালিদাসের, চণ্ডীদাসের পাশে তোমার আসন রহে,
সুরপুরীর কাব্যলোকের মাঝে,—
লক্ষ কোটি গ্রহের মাঝে, সূর্য্য যেমন বিরাজমান্‌,
তেমনি তোমার আসন সেথায় রাজে!
তাই তো ভাবি, যাত্রা তোমার অশ্রু-পিছল্‌ করবো না,
মান্‌ছে না যে অবোধ নয়ন দু'টি,
চির বিদায় দেবার আগে, হে মরমী বন্ধু গো!
ব্যথার ভারে হৃদয় যাবে টুটি।

তবু বিদায় দিতেই হবে,—রাখ্‌তে তোমায় পারল কৈ
নিখিল হিয়ার আর্ত্ত হাহাকার!
বিদায়-বেলার শেষ প্রণতি দিলেম পায়ে চিত্ত-রাজ,
নয়ন-জলের অর্ঘ্য উপচার!

শ্রীঅমিতা দেবী।



বাঘের খাঁচায় বাবাজী

(সেকালের পল্লীকথা)

মুন্নু অধিকারীদের বাসার পশ্চিম ধারে জামগাছ তলার পাশ দিয়া যে সঙ্কীর্ণ গলিপথটি নদী পর্য্যন্ত প্রসারিত, সেই পথটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের মত সেই পল্লীর সেকালের বৃদ্ধ অধিবাসীদের কত কথাই মনে পড়ে, সেই ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বের কথা ! সেই মেটে পথ দিয়া গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীর যে সকল ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া যাইত, সেই সকল ঘাটের নাম চালতলার ঘাট, বাদামতলার ঘাট, দরবেশের ঘাট, মেয়ের ঘাট। চালতলার ঘাটে আমাদের জন্মের বহু পূর্ব্বে বিবিধ মোকাম হইতে নৌকা-যোগে চাউল আমদানী হইত। নদী মজিয়া যাওয়ায় এখন তাহা বন্ধ। দরবেশের ঘাটটি প্রসিদ্ধ বলরামী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলরামের আখড়ার নিম্নস্থ স্নানের ঘাট; বলরামী সম্প্রদায় সাধারণতঃ 'দরবেশ' নামে পরিচিত। মেয়ের ঘাটে কেবল পল্লী-রমণীরাই স্নান করিতেন; পুরুষরা সেই ঘাটে স্নান করিতে যাইত না। আমরা তখন বালক মাত্র। মুন্নুদের সেই অর্দ্ধশায়িত জামগাছে উঠিয়া আমরা বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণে পাকা জাম খাইতে খাইতে দেখিতাম— পল্লীবধূরা দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া পিতলের ঠিলি বা কলসী কক্ষে লইয়া নদীর ঘাটে গা ধুইতে যাইত; তাহাদের কাঁধে রঙ্গীন বা ডুরে লালপেড়ে গামছা, রিংএর মধ্যবর্ত্তী চাবির গোছাটি আঁচলের মুড়ায় আবদ্ধ হইয়া পিঠে ঝুলিতেছে, চাবির সহিত চাবির সংঘর্ষণে ঠুং-ঠাং শব্দ হইতেছে। কাহারও পায়ে চারিগাছা মল, কোন নব-যুবতীর পায়ে তোড়া; তাহারা সমতালে পা ফেলিয়া চলিতেছে, আর তাহাদের পাদভূষণের রিনি-ঝিনি শব্দে বনপথ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যেন তাহা জননী বসুমতীর বক্ষের স্পন্দন ধ্বনি।—তারা

"পরস্পরে মধুর স্বরে মনের কথা কয়,
ঘোমটা থেকে মাঝে মাঝে হাসির ধ্বনি হয়।"

সেই শান্ত-শীতল অপরাহ্ণে তাহাদিগকে দল বাঁধিয়া চঞ্চল-চরণে চলিতে দেখিয়া সত্যই যেন—

"মা বলিতে প্রাণ করে আনচান,
চোখে আসে জল ভ'রে।"

বলিয়াছি, তখন আমরা আট-দশ বৎসরের বালক মাত্র।

এই নিঃসঙ্গ বার্দ্ধক্যে শৈশবের মধুর স্মৃতির রোমন্থন করিতে করিতে এখনও তাহাদের কথা মনে পড়ে; তাহাদের সেই অবগুণ্ঠন কোমলহৃদয়া পল্লীবধূর কি মধুর লজ্জা ও শালীনতার নিদর্শন ছিল,—যেন শ্যামল পল্লবদলের অন্তরালবর্ত্তী নব-প্রস্ফুটিত শতদলের ঢল-ঢল কান্তি স্নিগ্ধ শোভায় মণ্ডিত করিয়া রাখিত। আজ অবগুণ্ঠনহীনা, পুরুষভাবাপন্না বঙ্গ-বধূর সেই রূপ-মাধুরী কোন্ সভ্যতা-দানবের উষ্ণ শ্বাসস্পর্শে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে ? আজ কে তাহাদের নবীনা পৌত্রী দৌহিত্রীগণকে হাই-হীল জুতা, সরলদণ্ড খাটো ছাতা, ও চক্ষুযুগল রীমলেশ চশমায় শোভিত করিয়া নগরবাসিগণের বিস্ময়াকুল নয়নসমক্ষে দীপ্যমান করিয়া তুলিয়াছে ? তাই ক্ষুব্ধচিত্তে এই জীবন-সন্ধ্যায় ভাবিতেছি—আজ কোথায় দত্তদের সেই মেজ বৌ, সরকারদের ছোট গিন্নি, চাটুয্যেদের পঞ্চার মা ? কোথায় সেই সরোজিনী, মনোমোহিনী, কুমুদিনী, গরবিণী, নয়নতারা ? তাহাদের অনেকেই অকালে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছে; কত জন স্বামী, পুত্রকন্যা ও অন্যান্য প্রিয়জনে বঞ্চিত হইয়া এখনও জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন করিতেছে ! সেকালের সেই সকল রূপবতী যুবতীদের কেহ কেহ জীবিত আছে; কিন্তু বার্দ্ধক্যভারে তাহারা কুব্জ, পক্ককেশ, লোলচর্ম্ম, স্খলিত-দন্ত; কোন প্রকারে নিরাশা ও দুঃখময় জীবন-সন্ধ্যায় শেষ-খেয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে !

মুন্নুদের সেই বাসা আর নাই, সে সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সেখানে মেয়ে-ইস্কুলের ইমারত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া

আছে। আমরা যেখানে শৈশবসুলভ খেলায় মত্ত হইয়া বালক-কণ্ঠের কলহাস্যে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিতাম, এখন সেখানে বালিকা-কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতেছে, —"পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল!"

মুনুদের বাসা—আমাদের বাল্যক্রীড়ার সেই লীলাভূমি, শৈশবের আনন্দ-নিকেতন, বহু দিন পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইলেও শৈশবের সেই সকল দৃশ্য এখনও যেন মনশ্চক্ষে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি। মুনুর এক দিনের নষ্টামির কথা এখনও বেশ মনে পড়িতেছে। আজ সে কথা আমাদের একালের বন্ধুগণকে শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। কারণ, এই স্মৃতি-চর্চ্চাই অসহায় বার্দ্ধক্যের অবলম্বন।

স্কুলের ছুটীর পর আমরা সকলে মুনুদের বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প করিতেছি। তখন শীতকাল, পৌষ মাস। বড়দিনের উৎসবের আর অধিক বিলম্ব ছিল না। মুনু প্রস্তাব করিল, গ্রামের প্রান্তবাহিনী নদীর অপর পারে যাদবপুরে তাহার বাবার এক মক্কেলের বাগানে আমাদের পোষলার আয়োজন করিতে হইবে।

রজনী একটু তোৎলা ছিল; গত বার সে কথা বলিতে ভুলিয়াছিলাম। এত কাল পরে সব কথা গুছাইয়া বলাও কঠিন। যাহা হউক, প্রস্তাবটা শুনিয়া রজনী সোৎসাহে বলিল, "তু-তু-তুমি খা-খা-খাসা কথা ব'লেছ ভাই! কি-কি-কিন্তু খুব ব-ব-বড়ো রু-রুই মাছের যো-যো-যোগাড় কোরতে হ-হ-হবে।"

মুনুর প্রতিবেশী আমাদের দলের কালী বিশ্বাস কানে কিছু কম শুনিত। সে রজনীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "কি বল্‌লি? আরে তোৎলা, কি বল্‌লি, একটু চেঁচিয়ে বল। জানিস্ ত, আমার কানে খাটো কথা—" সে নিজের কান স্পর্শ করিয়া বাঁ-হাতের বুড়া আঙ্গুল নাড়িল।

রজনী তো-তো করিয়া অতি কষ্টে কথাটা বলিয়াছিল, আবার সেই কথা বলিতে হইবে বুঝিয়া সে ভয়ানক চটিয়া উঠিল; বলিল, "ফে-ফে-ফেল্লে দেখছি কা-কা-কালা আবার চা-চার দণ্ডের ফ্যারে!"

তাহার কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল; কিন্তু রজনীর রুই মাছের প্রস্তাব ভোটে টিকিল না। অন্য সকলেই বলিল, "পোষলাতে আলবৎ মাংস চাই; যেমন 'বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা,' তেমনি বিনা-মাংসে না যায় অন্ন গেলা। মাংস ছাড়া পোষলা জমে না!"

রাজকৃষ্ণ বৌবাজারের সঙ্কীর্ত্তন-দলের তরুণ গায়ক। সে সুর করিয়া বলিল,—

"মাংস বিনে কি ধন আছে সংসারে,
বল্ মুনু মধুর স্বরে;
মাংস-গুণে গহন বনে
ব্যাঘ্র ভীষণ বল ধরে,
আবার শিবে মাতাল, হ'য়ে দাঁতাল,
কোথায় মাংস—হাঁক ছাড়ে!"

পরম বৈষ্ণবের বংশে মুনুর জন্ম, গুরুগিরি ব্যবসায়ের খাতিরে তাহারা অধিকারী হইয়াছিল, তাহাদের বাড়ীতে বা বাসায় পাঁঠার প্রবেশ নিষেধ; কিন্তু মুনু স্বকৃতভঙ্গ, সে লুকাইয়া পরের বাড়ী পাঁঠার মাংস সেবা করিত; সুতরাং সে স্থির করিল, পোষলায় পাঁঠা চাই। মুনু বলিল, "মাংস, পোলাও, কালিয়া এ সব ত অল্প পয়সায় হবে না; আমরা দলে আছি দশ জন, সকলকে এক টাকা ক'রে চাঁদা দিতে হবে।"

রজনী তো তো করিয়া বলিল, "তোমরা বড়-মানুষের ছেলে, পাঁচ টাকা ক'রেও চাঁদা দিতে পার; আমরা চার আনার বেশী দিতে পারব না।"—এবার সকলেই রজনীর উক্তির সমর্থন করিল।

মুনু রাগ করিয়া বলিল, "কুচ পরোয়া নেই, পোষলার খরচের দশ টাকা আমিই পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আদায় করবো; কিন্তু সে কাজে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে।"

কিরূপ সাহায্য, মুনু তাহা বলিতে সম্মত হইল না।

মুনুদের গ্রাম ঝাউবেড়ের চারি দিকে গভীর অরণ্য। সে বার শীতকালে সেই বনে ব্যাঘ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। বাঘটা ঝাউবেড়ের কয়েক জন গৃহস্থের গরু-বাছুর মারিয়াছিল; অনেকের ছাগল-ভেড়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। এ জন্য ঝাউবেড়ের লোক গ্রামের বাহিরে বনের ধারে একটা খাঁচা পাতিয়াছিল। বাঘ খাঁচায় পড়িলে অনেক সময় থাবা মারিয়া খাঁচার দ্বারের তক্তা উপরে ঠেলিয়া

তুলিয়া পলায়ন করে। এই জন্য খাঁচাটার দ্বারের নীচে একটা গোঁজ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; খাঁচার নীচের বাতায় সেই গোঁজ আঁটিয়া বসিত; খাঁচার ভিতর হইতে দ্বারটা টানিয়া তুলিবার উপায় ছিল না। খাঁচার পাশের কুঠুরীতে ছাগল থাকে, এ জন্য বাঘ খাঁচায় পড়িয়া তাহাকে ধরিতে পারে না! যাঁহারা বাঘের খাঁচা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের এ সকল কথা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

মুনু এক রবিবার সকালে বাড়ী গিয়া খাঁচাটি পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। গ্রামের যে সকল লোক উদ্যোগী হইয়া সেই খাঁচা পাতিয়াছিল, তাহারাই ঝাউবেড়ের বাগ্দীপাড়া হইতে একটি হৃষ্ট-পুষ্ট নধর পাঁঠা কিনিয়া খাঁচার পার্শ্বস্থ কুঠুরীতে পুরিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু দুই-তিন দিনের মধ্যেও খাঁচায় বাঘ পড়িল না। পাঁঠাটার আর্ত্তনাদে বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রবিবার বৈকালে মুনুর কয়েক জন সঙ্গী তাহাদের বাড়ীতে বসিয়া তাস খেলিতে লাগিল। মুনু তাহাদিগকে বলিয়াছিল, পোনলার জন্য কিছু চাঁদা আদায় করিবে—এ জন্য তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গেল, চাঁদা আদায়ের কোন চেষ্টাই সে-দিন দেখা গেল না!

* * * *

আমাদের গ্রামের উত্তর প্রান্তে থানার পাড়ায় গৌরদাস বাবাজীর আখড়া। আখড়াটি বেশ বড়; যুবক গৌর-দাসের অনেকগুলি চেলা, তন্মধ্যে কানাই দাসই প্রধান। বাবাজীর কামিনী-কাঞ্চনে অনুরাগ ছিল না, এ জন্য তাহার আশ্রিতা চারি-পাঁচটি সেবা-দাসী, এবং আখড়ার এক প্রান্তে চারিটি গোলা; কোন গোলায় ছোলা, কোন গোলায় মশিনা, একটিতে ধান, অন্যটিতে গোধুম। সে চাষীদের টাকা ধার দিয়া ক্ষেত হইতে সুলভ মূল্যে এই সকল শস্য সংগ্রহ করিত, এবং পরে অধিক মূল্যে সেগুলি মহাজনদের নিকট বিক্রয় করিত। এতদ্ভিন্ন, সে সুদী কারবারও করিত।

কিন্তু বাবাজী যেমন লোভী, সেইরূপ কৃপণ ছিল। তাহার অর্থের অভাব ছিল না, তথাপি দুই-চারি পয়সা লাভের আশা থাকিলে কোন কার্য্যেই তাহার অরুচি ছিল না। তাহার এই গুণের কথা মুনুর অজ্ঞাত ছিল না। মুনুর সঙ্গে তাহার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল; মুনুর বাবাই তাহার উকিল ছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে যে রবিবারের কথা বলিয়াছি—সেই রবিবারে মুনু তাহার চাদরখানি বগলে গুঁজিয়া বর্ত্তুল উদরটি উদ্ঘাটিত করিয়া, জিহ্বা হইতে লালা বর্ষণ করিতে করিতে আমাকে সঙ্গে লইয়া গৌরদাসের আখড়ায় উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে একটা মোড়ায় বসিয়া ঢেরায় পাট কাটিতে দেখিয়া বলিল, "বাবাজি, তোমার সঙ্গে মফঃস্বলে আমার একটা জরুরি কথা আছে, একটু আড়ালে চল।"

মুনুকে হঠাৎ তাহার আখড়ায় আসিতে দেখিয়া গৌর-দাস মহা সমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিল, এবং আর একটা মোড়ায় তাহাকে পাশে বসাইয়া বলিল, "খবর কি, অদিকিরি? মফঃস্বলে এমন কি কথা? তা, এখানেই বল না, এখানে এখন কেউ আসছে না।"

মুনু ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, "তুমি বাবাজী মানুষ, জীবহত্যের কথা তুমি শুন্‌তে পার না, কাটা বললে সে জিনিস তোমার সেবায় লাগে না, এ জন্যে 'বানানো' বল্‌তে হয়; আমারও সেই অবস্থা, গুরুগিরি ব্যবসা ক'রে আমার পূর্ব্বপুরুষরা মুখুয্যে খেতাব ছেড়ে অধিকিরী হ'য়েছেন, জীবহত্যের কথা শুন্‌লে আমরাও কানে আঙ্গুল দিই; কিন্তু আমাদের গাঁয়ের হতচ্ছাড়া অকালকুষ্মাণ্ডগুলো যে কাণ্ড ক'রে বসেছে—তাতে আমাদের গাঁ ছেড়ে পালাতে হবে; এখন তুমি রক্ষা না করলে এ সঙ্কট থেকে নিস্তার পাবার আর কোন উপায় দেখ্‌চিনে বাবাজি!"—মুনুর চক্ষু দু'টি ছল-ছল করিতে লাগিল। সে গৌরদাসের দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া লালার পরিবর্ত্তে অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ করিল!

আমি একখান কাঠের ছোট জলচৌকীর উপর বসিয়া মুনুর ভণ্ডামি দেখিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলাম।

গৌরদাস মুনুর কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "আমি তোমার কথা বুঝতে পাল্লাম না; সব কথা খুলে বল শুনি।"

মুনু বলিল, "আমাদের ঝাউবেড়েতে বাঘের বড়ই দৌরাত্মি হ'য়েছে। এই জন্যে গাঁয়ের পাঁচ জনে মিলে

বাঘের খাঁচা পেতে তার মধ্যে একটা পাঁঠা রেখেছে। রাত্তিরে বাঘ খাঁচায় ঢুকে যদি সেই পাঁঠাটাকে সেবা করে, তবে জীবহত্যে হবে না? এখন তুমি যদি এই জীবহত্যে বন্ধ না কর, তাহ'লে আমি নিরুপায়! তোমাকে আজ সন্ধ্যাবেলা সেই খাঁচার কাছে গিয়ে কেষ্টোর জীবটিকে উদ্ধার করতে হবে। তাই নিরুপায় হ'য়ে তোমার কাছে এসেছি। আমরা দু'জনেই পরম বৈষ্ণব; এই বিপদে তোমার আশ্রয় না নিয়ে আর কার সাহায্য চাইতে যাব বল।"

গৌরদাস বলিল, "পৃথিবীতে তো নিত্যি কত জীব-হত্যে হচ্ছে; তা বন্ধ করা কি আমার সাধ্যি? আমি ভাই, কোন উপায় করতে পারবো না। তুমি আমাকে ও-জন্যে অনুরোধ করো না, আমি ও-ফ্যাসাদের মধ্যে যাব না।"

মুনু বলিল, "এ জীবহত্যে তোমাকে বন্ধ ক'রতেই হবে। এ কাজ তোমার অসাধ্য নয়। আর তোমাকে ব্যাগার দিতেও বলছিনে। তুমি আর আমি সন্ধ্যার ঝুলিতে সেখানে যাব। কেষ্টোর জীবটাকে তুমি বাইরে এনে আমার হাতে দেবে; আমি দড়ি ধরে তাকে একবারে আমার বাসায় নিয়ে যাব। তার পর সেখ-পাড়ায় গিয়ে জোনাবালি নিকিরীতে ডেকে তার কাছে বিক্রী ক'রে ফেলব। সে পাঁঠা-খাসী কলকাতায় চালান দেয়। তার ছাগলের ঝাঁকে মিশে গেলে আর কে সে পাঁঠার খোঁজ পাবে? পাঁঠাটা দু'টাকায় বিক্রী হবেই; সেই দুই টাকা তখনই আমি তোমার হাতে দেব। ও-টাকা তুমি মচ্ছবে খরচ করো। আমার এতে কোন স্বার্থ নেই, কেবল কেষ্টোর জীবটার প্রাণরক্ষা করা। তুমি আর দেরী করো না, এখনই এ কাজ করা চাই; আজ না করলে হবে না, আজ রাত্তিরেই হয় ত খাঁচায় বাঘ পড়বে।"

বাঘ খাঁচায় প্রবেশ করিয়া পাঁঠার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে না, গৌরদাস বাবাজীর তাহা জানা ছিল না। সে মুনুর প্রস্তাবে রাজি হইত বলিয়াও মনে হয় না; কিন্তু পাঁঠাটি বিক্রয় করিয়া যে টাকা-কয়টি পাওয়া যাইবে, মুনু তাহা তাহাকেই দিতে সম্মত হওয়ায় বাবাজীর মন নরম হইল; দুই-তিন টাকা লাভের আশায় বাবাজী কোন গর্হিত কার্য্যেই পরাঙ্মুখ হইত না।

গৌরদাসের মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে কি করিবে—ভাবিয়া তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না! চতুর মুনু তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "কিচ্ছু ভাবনা নেই, বাবাজী! এ কাজে এক দিকে একটা কেষ্টোর জীবের প্রাণরক্ষে হবে, অথচ ফাঁকতালে দু'-তিন টাকা তোমার হাতে আসবে!—এমন দাঁও ছাড়ে? কিন্তু আর দেরী করলে চলবে না; আজ সন্ধ্যের আগেই যদি পাঁঠাটাকে খাঁচা থেকে সরিয়ে ফেলা না যায়—তাহ'লে রাত্তিরে বাঘটা খাঁচায় ঢুকে নিজ্জস তাকে সেবায় লাগাবে। তুমি তোমার হাতের ঢ্যারা রেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়; আর তো বেশী সময় নেই।"

গৌরদাস বাবাজী বলিল, "তা যেন হোল, সে টাকার ভাগ্যে যা হয় হবে, পাঁঠা-ব্যাচা টাকা মচ্ছবে লাগালেই সে পাপ খণ্ডে যাবে। কিন্তু আর কেউ ভাই সঙ্গে থাকলে আমি সেখানে যাচ্ছিনে। আর এই অবেলায় কি রকম ওছিলে ক'রেই বা আখড়া থেকে বেরিয়ে যাব? ওরা সব জানতে চাবে না কোথায় যাচ্ছি?"

মুনু অনেক চেষ্টায় লালা সংবরণ করিয়া বলিল, "আমি একা তাঁতিপাড়ার তেমাথা রাস্তায় তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবো। তুমি ফোঁটা-তিলক কেটে, গলার তিন-কণ্ঠী মালায় তোমার হরিনামের ঝুলিটি ঝুলিয়ে, নামাবলীখানা মাথায় জড়িয়ে 'গোবিন্দ গোবিন্দ' ব'লে বেরিয়ে পড়; তোমাদের চেলাদের বলো—ঝাউবেড়ের একটা শাঁসাল মেয়ে ভেক নেবে, মচ্ছব দিতে কত খরচ—তাই সে জানতে চেয়েছে; তার সঙ্গে পরামর্শ করতে যাচ্ছ।"

তার পর মুনু আমাকে বলিল, "তুমি ভাই বাড়ী যাও, বাবাজীর ইচ্ছে নয় যে, আর কেউ আমাদের সঙ্গে থাকে।"

আমাকে মুনুর প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। মুনু বাবাজীকে আর একবার তাগিদ দিয়া তাহার আখড়া ত্যাগ করিল, এবং তাঁতিপাড়ার তেমাথার মোড়ে আসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে গৌরদাস বাবাজী ফোঁটা-তিলক কাটিয়া, তাহার ইউনিফর্ম্মে সজ্জিত হইয়া ঝাউবেড়ে গ্রামে বনের ধারে উপস্থিত হইল; গ্রামের লোক সেই স্থানে বাঘের খাঁচাটি পাতিয়া রাখিয়াছিল। কোন দিকে

জন-মানবের সাড়া-শব্দ ছিল না। পাঁঠাটা খাঁচার পার্শ্বস্থ ছোট খোপের ভিতর দাঁড়াইয়া কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। তাহার 'ব্যা-ব্যা' শব্দে সেই নিবিড় অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

গৌরদাস বাবাজী বাঘের খাঁচা পূর্ব্বে কখন দেখে নাই; বাঘ খাঁচায় পড়িলে পাশের কুঠরীর দুয়ার খুলিয়া পাঁঠাটাকে বাহির করিয়া আনিতে পারা যায়—বাবাজী তাহা জানিত না। তাহার ধারণা ছিল, বাঘ খাঁচায় প্রবেশ করিয়া পাঁঠার প্রাণসংহার করে; কিন্তু বাঘ খাঁচায় প্রবেশ করিলেই খাঁচার দরজা সশব্দে নামিয়া পড়ে, এবং বাঘকে বন্দী হইতে হয়।

বাবাজী খাঁচার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল, খাঁচার দরজার কপাটখানা উচু হইয়া আছে; খাঁচার দ্বার খোলা।

মুন্নু বলিল, "রাধারাণী কি জয় ব'লে খাঁচায় ঢুকে পড় বাবাজি! তার পর ঐ দিকে সরে গিয়ে পাঁঠাটাকে টেনে বের ক'রে আমার হাতে দাও।"

বাবাজী চারি দিকে সভয়ে চাহিয়া বলিল, "তুমিই খাঁচায় ঢুকে ওটাকে বের ক'রে আনো না। আমি এই বাইরে দাঁড়িয়ে ধরে নিচ্ছি।"

মুন্নু মাথা নাড়িয়া বলিল, "তবেই হ'য়েছে! তুমি পাঁঠাটার গলার দড়ি ধ'রে দু'-পা এগিয়ে যাও, আর যদি সেই সময় গাঁয়ের কোন লোক তোমাকে দেখতে পায়—তখন হাতে-হাতে ধরা প'ড়ে কি জবাব দিবা বল তো শুনি? বলবে—কেষ্টোর জীবের ওপর তোমার লোভ হ'য়েছিল, তাই ওটাকে খাঁচা থেকে বের ক'রে নিয়ে যাচ্ছ—সেবায় লাগাবে বলে? সে হয় না। তুমি ওটাকে বের ক'রে আমার হাতে দাও; তার পর ফস্ করে স'রে-পড়ে গা-ঢাকা দেবে। পথে কেউ আমার কাছে পাঁঠা দেখে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে—আমি তার জবাব দেব। তার পর আমি ওটাকে নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'রে টাকা তোমাকেই দেব; তোমাকে কেউ ধরতে-ছুঁতে পারবে না। এক কথা আর তোমাকে কত বার বল্তে হবে?"

বাবাজী কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "তবে ওটাকে বের ক'রে এনে তোমার হাতেই দিই,—কি বল? কোন ফ্যাসাদে পড়বো না তো?"

মুন্নু বলিল, "কি যে বলো! নাও, আর দেরী কোর না; 'গোবিন্দর ইচ্ছে' বলে ঢুকে পড়। সন্ধ্যা হ'য়ে এলো; সাঁজের ঘুলিতে ওটাকে নিয়ে স'রে পড়তে হবে। দেরী হ'লে এই জঙ্গলে হঠাৎ বাঘের হাতে প'ড়তে না হয়!"

বাবাজী একবার চারি দিকে চাহিয়া, 'জয় শ্রীরাধে গোবিন্দ' বলিয়া, উর্দ্ধে উত্তোলিত কপাটের তলা দিয়া গুড়ি মারিয়া খাঁচার ভিতর প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কপাটখানা 'ঝপাং' শব্দে পড়িয়া নীচের বাতার ভিতর বসিয়া গেল, এবং গোঁজটাও সেই বাতায় আঁটিয়া বসিল।

বাবাজী পাঁঠাটা স্পর্শ করিতে গেল; কিন্তু ভয়ে সেটা সরিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে ধরিয়া সে দিক হইতে বাহির করিবার উপায় ছিল না; সে দিকে বাঁশের বাখারীর শক্ত বেড়া!

বাবাজী সভয়ে বলিল, "অদিকিরি, এ কি হ'ল? হাত বাড়িয়ে ওটাকে যে নাগাল পাচ্ছিনে! এ-দিক দিয়ে বের করবারও যে পথ নেই! ভালো ফ্যাসাদ! কাজ নেই আমার টাকায়; তুমি ভাই খাঁচার দুয়োর খুলে দাও, আমি বাইরে যাই।"

মুন্নু হাসিয়া লালা বর্ষণ করিয়া বলিল, "তা কি হয়? তুমি খাঁচার মধ্যে ব'সে মালা জপ কর। আমি গাঁয়ের পাঁচ জনকে খবর দিই; তারা এসে দেখুক—খাঁচায় বাঘ পড়েছে; যেমন তেমন বাঘ নয়, বোরেগী বাঘ!"

মুন্নুর কথা শুনিয়া বাবাজীর মুখ শুকাইল; সে ভয়ে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "তুমি তো ভারী বিশ্বাসঘাতক অদিকিরি! আমি কি ক'রে লোকজনদের মুখ দেখাবো? শীগ্‌গির খাঁচার দরজা খুলে দাও, আমি বেরুই।"

"বেরিও, দাঁড়াও আগে আমি সকলকে ডাকি।"—মুন্নু দ্রুতবেগে সেই স্থান ত্যাগ করিল। বাবাজী ডাকিল, "ও মুন্নু, আমাকে দুয়োর খুলে দাও। আমাকে বিপদে ফেলে তুমি চল্লে কোথায়? ও অদিকিরি!"

কিন্তু মুন্নু তখন সরিয়া পড়িয়াছে। কেহ বাবাজীর চীৎকার শুনিতে পাইবে ভাবিয়া সে মুন্নুকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেও সাহস করিল না, ভয়ে ঘামিতে ঘামিতে খাঁচার দ্বার খুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু ভিতর হইতে দ্বার খুলিবার উপায় ছিল না। আতঙ্কে,

দুশ্চিন্তায় সে দশ দিক অন্ধকার দেখিল। তখনও সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব ছিল।

* * * *

বলিয়াছি, মুনুর বন্ধুরা তাহার বাড়ীতে বসিয়া তাস খেলিতেছিল। মুনু হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মজা দেখ্‌বি তো শীগ্‌গির আমার সঙ্গে আয়!"—সে তাহার সঙ্গীদের পীড়াপীড়িতেও কোন কথা ভাঙ্গিল না। তাহারা সকলেই দ্রুতবেগে তাহার সঙ্গে বাঘের খাঁচার নিকট উপস্থিত হইল।

তাহারা খাঁচার ভিতর বাবাজীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। মুনু সরলপ্রকৃতি অর্থগৃধ্নু বাবাজীকে লইয়া কি খেলা খেলিবে, মুনুর নিকট তাহারা তাহার একটু আভাস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু মুনু যে এত সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, ইহা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বাবাজীকে খাঁচার এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া ক্ষোভে, দুঃখে ও ভয়ে ঘামিতে দেখিয়া তাহারা আনন্দে ও উৎসাহে লাফালাফি করিতে লাগিল। দুই-এক জন নাচিতে নাচিতে হাততালি দিয়া সুর করিয়া বলিল, "বোষ্টম টম্ টম্, ঝুলির ভেতর মালা রেখে, পাঁঠা খাবার যম!"

এই ভাবে ধরা পড়িয়া গৌরদাস বাবাজী তাহার নামাবলী দিয়া মাথা-মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া বলিল, "মুনু ভাই, আমার লোভের খুব শাস্তি হ'য়েছে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমার প্রাণরক্ষা কর। এর পর যদি এ গাঁয়ের লোকগুলো এখানে এসে আমাকে দেখতে পায়, তা হ'লে লজ্জায় আমাকে আত্মহত্যে হ'তে হবে।"

মুনু বলিল, "গাঁয়ের লোকদের ডেকে এনে, এখনই তোমার কীর্ত্তি তাদের দেখাবো। তারা খাঁচা সমেত তোমাকে গরুর গাড়ীতে তুলে, গাঁয়ের পথে পথে ঘুরিয়ে শেষে মহকুমার ম্যাজিষ্টর সাহেবের কুটীতে নিয়ে-গিয়ে মানুষ-বাঘের কীর্ত্তি দেখিয়ে আন্‌বে! তবে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি—এক সর্ত্তে। আস্‌চে রবিবার আমরা যাদবপুরের বাগানে পোষলা করবো। সে জন্যে দশ-বার টাকা খরচ হবে। যদি তুমি আমাদের দশটা টাকা দাও—তাহ'লে গাঁয়ের লোক-জন জান্‌তে পারবার আগেই তোমাকে খাঁচা থেকে বের ক'রে দিতে পারি।"

বলা বাহুল্য, গৌরদাস বাবাজী তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে রাজি হইল।

তাহার কথা শুনিয়া মুনু মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু; তুমি কি রকম বখিল তা আমাদের জানা আছে; দু'টি টাকার লোভে তুমি বাঘের খাঁচায় ঢুকে পাঁঠা চুরি করতে এসেছ! তুমি একবার পালাতে পারলে—আমাদের টাকা দেবে? তুমি ঘোড়ার ডিম দেবে। এখনই যদি দিতে পার তো খাঁচার দুয়োর খুলে দিতে রাজি আছি।"

বাবাজী বলিল, "আমি তো টাকা-কড়ি কিছু সঙ্গে আনিনি, তবে এখনই কি ক'রে দেবো? আমার সঙ্গে আমার আখড়ায় চল—সেখানে গিয়ে দিয়ে দিচ্ছি।"

মুনু বলিল, "তুমি কাঁচকলা দেবে! ও-একটা কথাই নয়।"

নিরুপায় হইয়া বাবাজী বলিল, "তবে আমার আঙ্গুলের এই সোনার আংটিটা খুলে দিচ্ছি; টাকা পেলে এটা ফেরত দিও। এটার দাম পঁচিশ টাকার কম নয়।"

মুনু বলিল, "তার পর তুমি থানায় গিয়ে দারোগা তিলোক মুস্তফিকে খবর দেবে—আমরা তোমাকে ধরে আংটি লুঠ্ করেছি! আমাদের ততো বোকা ভেবো না।"

তাহার পর পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইল—আমাদের দলের দেবেন অধিকারী গৌরদাস বাবাজীর আখড়ায় গিয়া বাবাজীর প্রধান চেলা কানাইদাসকে সংবাদ দিবে—বাবাজী ঝাউবেড়েতে এক শিষ্যাকে ভজাইতে গিয়া ভয়ানক ফ্যাসাদে পড়িয়াছে, বাবাজী বলিয়াছে, দশটা টাকা লইয়া এখনই সেখানে চল, বিলম্ব হইলে তাহার হাতে দড়ি পড়িবে।

কানাইদাস জানিত—বাবাজী ঝাউবেড়েতে ধর্ম্ম-কর্ম্মে গিয়াছে; এবং লোভের বশীভূত হইয়া তাহার ফ্যাসাদে পড়া এই নূতন নহে। সুতরাং কথাটা সে অবিশ্বাস করিতে পারিল না, দশ টাকার নোট লইয়া সে বাবাজীর সঙ্গে দেখা করিলে নোটখানি মুনুর হস্তগত হইল। মুনু বাবাজীকে খাঁচা হইতে বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "খুব সস্তায় পার পেলে, এখন শীগ্‌গির পালাও।"

সেই দশ টাকায় পরের রবিবারে আমাদের পোষলায় মাংস-পোলাওএর অভাব হইল না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মোহেঞ্জো-দোড়োয় সভ্যতা

য়ুরোপীয়রা এ দেশে আসিয়া এ দেশের পুরাবৃত্ত ঘাঁটিতে আরম্ভ করেন। তাহার পূর্ব্বে এ দেশের পণ্ডিতরা পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে বিশেষ আগ্রহবান্ ছিলেন না। কাজেই এই বিষয়ে য়ুরোপীয় অনুসন্ধিৎসুরা দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎদিগের নিকট বিশেষ কোন সাহায্য লাভ করেন নাই। য়ুরোপীয়রা তাঁহাদের পূর্ব্ব-গঠিত কতকগুলি সংস্কার লইয়াই ঐ অনুসন্ধান-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা ভ্রম-প্রমাদের বশবর্ত্তী হইলে তাহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কোন কারণ নাই। ভারতের ইতিহাস অনুসন্ধান-ফলে তাঁহাদিগকে অনেক মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইতে দেখা যায়। আমরা বাল্যকালে যখন ইংরেজের অনুসন্ধানলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করি, তখন এই শিক্ষালাভ করি যে, প্রাচীন কালে অর্থাৎ খৃষ্ট-জন্মের দেড় হাজার কি দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতে প্রবেশ করেন; সেই সময় তাঁহারা সবে মাত্র সভ্যতার প্রথম ধাপে পদার্পণ করিয়াছেন। ভারতে তখন অনার্য্য জাতির বাস ছিল। উহারা আর্য্যগণ অপেক্ষা সভ্যতায় হীন ছিল। নাগা, গারো, কুকীরাই তাহাদের দৃষ্টান্ত। ভীল এবং সাঁওতালরা তাহাদের মধ্যে উন্নত অবস্থা-প্রাপ্ত। ইহারাই অসুর নামে অভিহিত হইত। সভ্যতায় পশ্চাৎপদ ছিল বলিয়া আগন্তুক আর্য্যরা উহাদিগকে অতি সহজে পরাজিত করেন, এবং পাহাড়ে জঙ্গলে বিতাড়িত করিয়া উহাদের দেশ অধিকার করেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই তথ্য সত্য বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা যায় যে, আর্য্যাভিযানের পূর্ব্বে কোন অজ্ঞাত কাল হইতে দ্রাবিড়ী জাতিই ভারতের অধিবাসী ছিল। তাহারা একেবারে গারো কুকীদিগের ন্যায় ঘোর অসভ্য ছিল না, তাহারা সভ্য ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেক জাতিরই শিল্প ছিল, সাহিত্য ছিল, কলাবিদ্যা ছিল এবং যোদ্ধাও অনেক ছিল। আর্য্যগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দক্ষিণাপথ অভিমুখে বিতাড়িত করেন। তাহারা বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া দক্ষিণাপথে প্রবেশ করে। কিন্তু কতকগুলি আর্য্যজাতি মধ্য-এসিয়া হইতে আসিয়া এই সুসভ্য দ্রাবিড়ী জাতিকে কি উপায়ে পরাজিত করিল, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। আর্য্য জাতিরা যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এতই অজ্ঞ ছিলেন যে, অগ্নি রাখিতে জানিতেন না, অরণি মন্থন করিয়া অর্থাৎ কাঠে কাঠে ঘসিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। পক্ষান্তরে দ্রাবিড়ীরা তাম্র-অস্ত্র ব্যবহার করিত, জাহাজে আরোহণ করিয়া বিদেশেও যাইত। এরূপ সভ্য দ্রাবিড়ী জাতিকে আবিন্ধ্য-হিমাচল আর্য্যাবর্ত্ত হইতে অপেক্ষাকৃত অসভ্য আর্য্যরা কি প্রকারে বিতাড়িত করিয়াছিল, তাহাই একটা সমস্যা বলিয়া মনে হইয়াছিল। সে সমস্যার সমাধান হয় নাই।

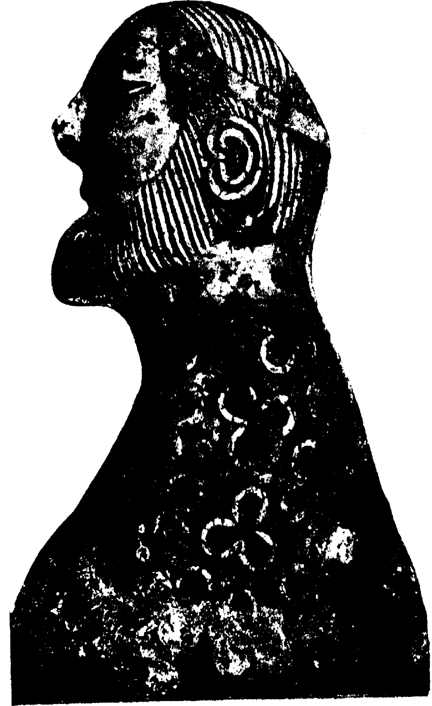
শেষটা সিন্ধুনদের তীরভূত ভূমিতে মহেঞ্জো-দোড়োয় এবং হরপ্পা নামক দুইটি ভূপ্রোথিত নগর আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্যাটা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এই নগরী দুইটি ভূ-স্তরের যে স্থানে অবস্থিত, তাহা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা স্থির করিয়াছেন—উহা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪ হইতে ৫ হাজার বৎসরের পুরাতন নগর। সুতরাং উহা প্রাচীনপন্থীদিগের মতে দ্বাপর যুগের সহর। তথায় অনেক নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, ঐ সকল কঙ্কালের দৈর্ঘ্য এই কলির মানুষের মত সাড়ে তিন হাত। উহাতে তামার অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের কুমারী কন্যারা যেরূপ 'পুণ্যি-পুকুর' ব্রত করে, সেরূপ ব্রতের সমস্ত বস্তু পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার কুম্ভকারগণ যেরূপ মাটীর পুতুল প্রস্তুত করে, ঠিক সেইরূপ পুতুল পাওয়া গিয়াছে। অনেকগুলি শিলমোহর, কাচের জিনিষ, স্বর্ণালঙ্কার, হাতের অলঙ্কার, মেখলা, চিরুণী, দর্পণ (ধাতুনির্ম্মিত), কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে; আর পাওয়া গিয়াছে, কতকগুলি শিবমূর্ত্তি ও শক্তিমূর্ত্তি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন, উহা সুমেরীয়

জাতির উপনিবিষ্ট সহর। এখন জিজ্ঞাস্য, এই সুমেরীয়রা কাহারা? ইঁহারা আর্য্য জাতি। অধ্যাপক এল, এ, ওয়াডেলের (L. A. Waddel) মতে ইঁহারাই প্রথমে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইঁহার মতে এই প্রাচীন আর্য্য জাতিই ভারতের কুরুপাঞ্চাল অঞ্চলে এবং সিরিয়া ও ফিনিসিয়ায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ওয়াডেল সুমেরীয় ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি বলেন, প্রাচীন পালি ভাষায় যে খত্তি পদ ক্ষত্রিয় শব্দ-বাচক, তাহারই সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ক্ষত্রিয় শব্দ গঠিত হইয়াছে। এসিয়া মাইনরে এবং সিরিয়া ফিনিসিয়ায় স্মরণাতীত কাল হইতে ঐ জাতীয় লোকই আপনাদিগকে খত্তি বা হট্টিট বলিতেন। উঁহারা আপনাদিগকে আরি বা আর্য্য এবং বারত এই পৈতৃক নামে অভিহিত করিতেন। ওয়াডেল বলেন, ভারতীয়রা ব বর্ণটি সম্পূর্ণ ভ রূপে উচ্চারণ করিয়া ভারত করিয়াছেন। উঁহাদের সভ্যতা আর্য্য-সভ্যতাই ছিল। (১) সুতরাং বুঝা গেল যে, এই সুমেরীয়রা আর্য্য জাতি ছিলেন এবং তাঁহাদের সভ্যতা আর্য্যসভ্যতাই ছিল। ফিনিসিয়ার আর্য্যরা আপনাদিগকে বারত বা ভারতীয় এই কথাটা পৈতৃক নামসূচক পরিচয়ে ব্যবহার করিতেন। (২) ইহাতে অনুমিত হয় যে, ভারতই তাঁহাদের পিতৃভূমি ছিল এবং ঐ সিরিয়া, মেশোপোটে-মিয়া এবং ফিনিসিয়ায় সুমের জাতি আপনাদিগের বারত বা ভারত (ভারতীয়) বলিয়া পৈতৃক নামে পরিচয় দিতেন।

(১) I further observed that these ancient Khatti (or Hittities) also called themselves Ari or Arri with the meaning of noble ones which was thus literally identical in name and meaning with Ariya of the Pali and Arya of Sanscrit from which our modern term Aryan is derived. And the civilization of this Arri or Aryan race of Khatti was essentially of the Aryan type.

(২) I observed that these Khatti and Phœnicians called themselves at imes by the patronymic 'Barat' just as did the "Bharat" Aryans of early India who has aspirated the "B". And I then found that the Khatti language was essentially Aryan in its roots and structure a fact which has since to some extent been remarked by Hronzy and others. —Sumerians in India, by L. A. Waddel. I. H. Quaterly, vol. I, No. 1.

আর্য্যগণ ভারত হইতে যে মেশোপোটেমিয়া, সিরিয়া এবং ফিনিসিয়ায় গিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম প্রমাণ ভারতের পুরাণে এবং মহাভারতে রাজগণের তালিকা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মিষ্টার ওয়াডেল বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন, "পুরাণে এবং



মোহেঞ্জো-দোড়োতে প্রাপ্ত ভারতীয় সুমেরীয় যুগের প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বদৃশ্য

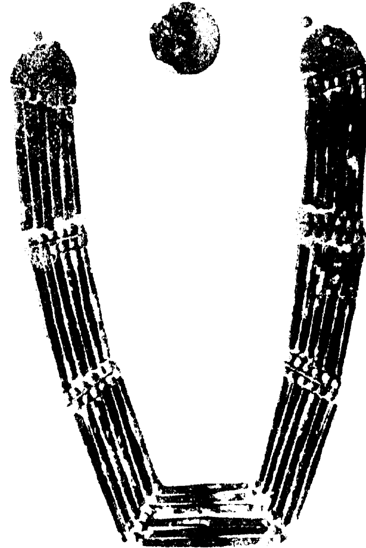
মহাভারতে যে পুরুষপরম্পরাগত কিম্বদন্তীমূলক রাজগণের তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতে আমি দেখিয়াছি যে, উহাতে অনেক রাজার নাম ঠিক এশিয়া মাইনর এবং সিরিয়া ফিনিসিয়ায় খত্তি রাজগণের যে সকল স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে এবং প্রাচীন পারস্য এবং আসুরীয় দলিলাদিতে যাঁহাদের যে নাম আজিও রক্ষিত আছে, তাঁহাদের নামের সহিত এক ও অভিন্ন।" তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, "ঐ সকল রাজবংশের

বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া আমি দেখিয়াছি, রামায়ণ এবং মহাভারতে যাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া আছে, তাঁহাদের নাম এবং কীর্ত্তিমালার যে বিবরণ আছে, তাহা ঠিক ঐরূপ ধারা অনুসারে মেশোপোটেমিয়ায় অনেক প্রধান রাজগণের নামের সহিত মিলিয়া যায়। এখনও মেশোপোটেমিয়ায় তথাকথিত সুমার এবং অক্কদ রাজগণের কীর্ত্তিস্তম্ভে বিক্ষিপ্ত এবং খণ্ডিত



মোহেঞ্জো-দোড়োয় আবিষ্কৃত ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মূর্ত্তি

ভাবে তাহা সংরক্ষিত আছে। উহাদের অস্তিত্ব কাল খৃষ্টপূর্ব্ব চারি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রসৃত।" ইনি আরও বলিয়াছেন, "এই বিষয়ে আরও অধিক অনুসন্ধানফলে সুমেররাজগণের যে পূর্ণ তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের সময়ানুক্রমিক নামের তালিকা ভারতীয় মহাকাব্যে প্রদত্ত নামের তালিকার সহিত মিলিয়া গিয়াছে।"(৩) পারস্য উপসাগরের উপান্তে শিরলাপুর (শ্রীলপুর) এবং লগোশ নামে যে প্রাচীন বন্দর খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে প্রথম পাঞ্চালবংশের রাজগণের নাম ঠিক পর-পর পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, ঐ সকল দেশ ভারতীয় রাজগণের শাসনে ছিল। মিঃ ওয়াডেল পাঞ্চালদিগকে ফিনিসিয় মনে করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা



প্রবাল-কাঠি নির্ম্মিত ছয়নর

নির্ভরযোগ্য নহে। পাঞ্চাল অধুনা যুক্তপ্রদেশস্থ ফরাকাবাদ অঞ্চলকেই বুঝাইত। কোশলের পশ্চিমে পাঞ্চাল। উহা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, উত্তর পাঞ্চাল এবং দক্ষিণ পাঞ্চাল। দ্রৌপদী পাঞ্চাল রাজার কন্যা। তবে ফিনিসিয়েরা পাঞ্চাল হইতে সম্ভবতঃ ভূমধ্য-সাগরের পূর্ব্ব-উপকূলে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে, মহেঞ্জোদোড়ো এবং হরপ্পা হিন্দুর নগরী ছিল। মেশোপোটেমিয়ার, সিরিয়ার এবং ফিনিসিয়ার অধিবাসিগণ হিন্দু ছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কার্থেজ নগর রোমকদিগের দ্বারা পরাজিত হইলে যে ভাবে তথাকার

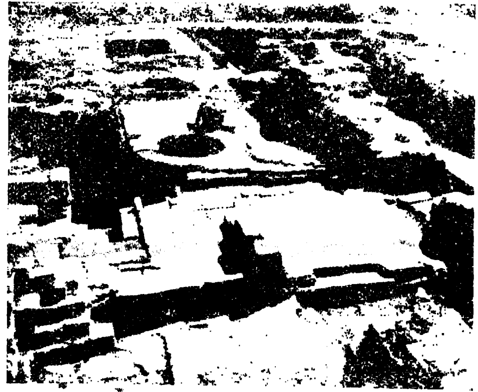
(৩) Further examinations fully confirmed this discovery and disclosed complete lists of Sumerian dynasties of kings bearing substantially the same names and same relative order as in Indian Epic king lists.—Ibid.

নরনারীরা জলদগ্নিমধ্যে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন, যে ভাবে অস্‌ক্রুবল (Astrubal) রাজার মহিষী নিজের দুই সন্তান সহ প্রজ্বলিত হুতাশনের মধ্যে অকুতোভয়ে লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার তুলনা ভারতে ভিন্ন আর কোথাও নাই। রোমক-সেনাপতি সিপিও যখন জলন্ত অনলকুণ্ডে নারীদিগকে আত্মাহুতি দিতে দেখিয়াছিলেন, তখন তিনি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া সবিষাদে বলিয়াছিলেন,—'রোমেরও এমন দিন আসিবে।' এ দৃষ্টান্ত ভারতীয় নারীরাই দেখাইয়াছে। তাই মনে হয়, কি সুমেরীয় কি ফিনিসীয়—ইহারা হিন্দুর সহিত এক জাতি। ভিন্ন জাতি নহে।

মোহেঞ্জো-দোড়াতে বহু শিবমূর্ত্তি এবং শক্তি-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। শক্তিমূর্ত্তি অবশ্য নারীমূর্ত্তি। মোহেঞ্জো-দোড়াতে এবং হরপ্পায় ঐরূপ নারীমূর্ত্তি অনেক মিলিয়াছে। মেশোপোটেমিয়া, সিরিয়া, ফিনিসিয়া, পারস্য এবং ঈজিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী দেশগুলিতে ঐরূপ অনেক মৃন্ময়ী নারীমূর্ত্তি ভূ-মধ্য হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা কঠিন পোড়া-মাটীর নির্ম্মিত। এই নারী-মূর্ত্তির কোমরে কটিবন্ধ আছে; কণ্ঠে বৃহৎ ঝুমকা প্রভৃতি অলঙ্কার বিদ্যমান। উহা প্রকৃতির মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। অনেকেই মনে করিয়াছেন যে, উহাই শক্তিদেবীর আদিমূর্ত্তি। শিবের মূর্ত্তি অনেক পাওয়া গিয়াছে; উহা যোগিমূর্ত্তি। শিবই দেবতার মধ্যে যোগী। উঁহার অনেকগুলি মূর্ত্তিতে তিনটি বদন আছে; পাঁচটি বদন নাই। সে জন্য কেহ কেহ তর্ক তুলিতেছেন যে, ইহা হিন্দুর শিব নহেন। কারণ, হিন্দুর শিব পঞ্চানন। ইহা অত্যন্ত অজ্ঞতাসূচক কথা। শিবের বদন যে পাঁচটাই হইবে, এমন কোন কথা নাই। শাস্ত্রে সর্ব্বত্র তাঁহার পঞ্চ বদনের উল্লেখ নাই। পঞ্চানন, পঞ্চাস্য, বা পঞ্চবক্ত্র হইলেই যে পাঁচটা মুখ থাকিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। সিংহের অপর নাম পঞ্চানন, পঞ্চাস্য, পঞ্চবক্ত্র ইত্যাদি। তাই বলিয়া সিংহের পাঁচটা মুখ নাই। সিংহের করাল বদন বলিয়া সে পঞ্চানন নামে কথিত। রুদ্রদেব বা কাল সমস্ত বিশ্ব-সংসারই গ্রাস করিতেছেন, তাই তিনি পঞ্চানন। পাঁচটা মুখ সেই ভাবেরই প্রতীক। কূর্ম্মপুরাণে যেখানে শিব ব্রহ্মার প্রতি কৃপা করিয়া সৃষ্টির আদিতে তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মা দূর হইতে শিবকে দেখিয়া নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেন :—

ক এষ পুরুষো নীলঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ।
তেজোরাশিরমেয়াত্মা সমায়াতি জনার্দ্দন॥

এখানে ব্রহ্মা দেবদেবকে নীলবর্ণ, শূলপাণি, ত্রিলোচন, তেজোপূর্ণ-কলেবর অমেয়াত্মাই দেখিলেন, পঞ্চানন দেখিলেন না। বিষ্ণু ইঁহার পরিচয় দিবার সময় ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, ইনিই দেবদেব, মহাদেব, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, সনাতন, অনাদিনিধন, অচিন্ত্য, ঈশ্বর, শঙ্কর, শম্ভু, ঈশান, সর্ব্বাত্মা, পরমেশ্বর, ভূতগণের অধিপতি, যোগী, মহেশ, বিমল, শিব, ধাতা, বিধাতা, এবং প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর। ইঁহার যে পাঁচটি মুখ, তাহা ব্রহ্মাও দেখিলেন



মোহেঞ্জো-দোড়োতে কূপসমন্বিত স্নানাগার



তাম্রনির্ম্মিত করাত ও অন্যান্য পাত্র—মোহেঞ্জো-দোড়ো

না, বিষ্ণুও বলিলেন না। সামবেদী ব্রাহ্মণদিগের সন্ধ্যায় যে রুদ্রোপস্থাপন আছে, তাহা তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মন্ত্র। সুতরাং বৈদিক মন্ত্র। তাহাতে রুদ্রের কথা বলা হইয়াছে :—

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ॥

এখানে রুদ্র শব্দ একবচনান্ত। ইহাতে পঞ্চবক্ত্রের কথা নাই। তিন বহুরই প্রতীক। সংস্কৃত ভাষায় তিনটি হইলেই বহুবচনান্ত হয়। আদি-দেবের বহু বদন, সেই জন্য তাঁহাকে তিন বদনও বলা যায়, পঞ্চ বদনও বলা যায়। বেদের বিখ্যাত পুরুষসূক্তে সেই জন্য আদিদেবকে সহস্রশীর্ষা পুরুষ বলা হইয়াছে। সায়ণ, হলায়ুধ প্রভৃতি টীকাকারগণ বলিয়াছেন, সহস্র শব্দ উপলক্ষণত্ব হেতু অনন্ত বা অসংখ্যাত শির বুঝায়। গীতায় সেই জন্য বিরাট্ পুরুষকে "অনন্তবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্" বলা হইয়াছে। পুরাণেও বলা হইয়াছে :—

সহস্রপাদাক্ষিশিরোভিযুক্তং
সহস্ররূপং তমসঃ পরস্তাৎ।
তং ব্রহ্মপারং প্রণমামি শম্ভুং
হিরণ্যগর্ভাদিপতিং ত্রিনেত্রম্॥

এখানেও শম্ভু বা মহাদেবকে সহস্র শিরযুক্ত বলা হইয়াছে। সেই জন্য তাঁহার সেই অনন্ত বা বহু আনন প্রকাশের নিম্নতম সংখ্যা তিন বা পাঁচ বদন তাঁহার মূর্ত্তিতে দেওয়া হইয়াছে। মহেঞ্জো-দোড়োর হিন্দুরা তখন তিন বদন শিব-মূর্ত্তিরই পূজা করিত, ইহাই বুঝা যায়। রুদ্রোপস্থাপন মন্ত্রে রুদ্রকে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণ-পিঙ্গল বর্ণ। মহাদেবের ধ্যানে শিবকে 'রজতগিরিনিভ শুভ্র' বলা হইয়াছে। উপরে কূর্ম্মপুরাণ হইতে যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে নীল বর্ণ বলা হইয়াছে। মহাদেবের আর একটা নাম নীললোহিত; অর্থাৎ নীল ও লোহিত বর্ণের মিশ্র বর্ণ। কারণ, তিনি প্রকৃতি এবং পুরুষের সমবায়; প্রকৃতি শ্যাম বা নীল বর্ণ, আর পুরুষ তেজরূপী লোহিত বর্ণ। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, রুদ্র কৃষ্ণ-পিঙ্গল বলিয়া রজতগিরিনিভ শিব হইতে পারেন না, তাঁহারা ভ্রান্ত। রুদ্র ঊর্দ্ধলিঙ্গ। কেহ কেহ বলেন, শিব বা মহাদেব ঊর্দ্ধলিঙ্গ নহেন। সুতরাং রুদ্র মহাদেব হইতে পারেন না। ইহাও বিষম ভুল। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত সুধা বণ্টন সময়ে মোহিনী-মূর্ত্তি দেখিয়া শিব যে কাণ্ড করিয়াছিলেন, সে কথা না বলিয়াও ঊর্দ্ধলিঙ্গ অর্থে যিনি জগতের কারণীভূত জ্ঞান-গোচরের ঊর্দ্ধে বা অতীত, তাঁহাকেই বুঝায়। শিবের ধ্যানে বিশ্বাদ্য ও বিশ্ববীজ শব্দে তাহাই বুঝায়। অর্থাৎ যিনি ঊর্দ্ধং বা আত্মরূপেণ লিঙ্গম বা ব্যাপ্তম বা আত্মরূপ বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তিনিই ঊর্দ্ধলিঙ্গ অর্থাৎ তিনি বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ শব্দটা রুদ্রোপস্থাপনের মন্ত্রে আছে। সুতরাং রুদ্রই শিব।



স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত বলয় ও কর্ণাভরণ—মহেঞ্জো-দোড়ো

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাই বলেন, শিব হিন্দুর দেবতা নহেন। তিনি অনার্য্যদিগের দেবতা। কিন্তু কোন অনার্য্য দেশে শিবের এইরূপ যোগিমূর্ত্তি মিলিয়াছে কি? তবে কিসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা উহা বলেন, তাহা বুঝা যায় না। তাঁহারা কোন নিশ্চিত প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া কেবল গায়ের জোরে ঐ কথা বলেন। হিন্দুর সকল দেবতার ঐশ্বর্য্য আছে, মহাদেবের তাহা নাই। তিনি বিভূতিভূষণ—ছাই মাখেন। বিভূতি

অণিমা, লঘিমা ব্যাপ্তি অষ্টগুণ—ছাই নহে। শিব পরব্রহ্ম সুতরাং হিন্দুর মতে তিনি নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় এবং নির্লিপ্ত। সেই জন্য শিবের ঐশ্বর্য্য নাই। তিনি শ্মশানবাসী। যেখানে শ্ম বা শব থাকে, সেই শ্মশান। শিবেই—পরব্রহ্মে পরিণামে সব জীব লীন হয়, তাই তিনি শ্মশান বা শ্মশান-বাসী। য়ুরোপীয়রা হিন্দুর দেবতত্ত্ব কিছুই বুঝেন না, তাই তাঁহারা ঐরূপ ভুল করেন। শিব, রুদ্র এবং ত্রিমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি ইহা ভুলিলে চলিবে না।

কিছু দিন পূর্ব্বে ক্রীট দ্বীপে ব্যাঘ্রবদনা দুর্গামূর্ত্তি পাওয়া যায়। ঐ অঞ্চলে স্থানে স্থানে প্রাচীন হিন্দু দেব-



নালের সমাধিক্ষেত্রে প্রাপ্ত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত আধার

মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরে জানা গিয়াছে যে, সুমেরীয় জাতির অনেক দেবতা হিন্দুর দেবতা হইতে অভিন্ন। ইন্দ্র সুমেরীয় ভাষায় 'ইন্দর' নামে অভিহিত। ফিনিসিয়ায় ইন্দ্রের নাম ইন্দুর। আমাদের ইন্দ্রের অপর নাম বৃত্রঘ্ন। সুমেরীয়দিগের ইন্দ্রেরও দ্বিতীয় নাম বেরেথগ্ন। বৃত্র—বেরেথ। আমাদের দেশেও অনেকে চলিত ভাষায় ইন্দ্রকে ইন্দির বলেন। মিত্র-বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবগণও সুমেরীয়দিগের দ্বারা পূজিত হইতেন। সুমেরীয়-দিগের ভাষা অনেকটা ভারতীয় আর্য্য-ভাষায় অনুরূপ ছিল—তাহা অধ্যাপক ওয়াডেল, হ্রোনজী প্রভৃতি সুমেরীয়-ভাষাবিদ্‌রা বলেন। ওয়াডেল The Phœnician origin of Britons, Scots and Anglo-Saxons নামক গ্রন্থে সে কথা বলিয়াছেন। তিনি Sumerians in India নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"পঞ্চদশ বৎসরের অধিক কাল আমি একান্ত ভাবে সুমেরীয়দিগের ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে, সুমেরীয় ভাষা মূলতঃ সংস্কৃত ভাষারই অনুরূপ। ঐ ভাষার মূল এবং শব্দের গঠনপ্রণালী ও ধরণ সমস্তই সংস্কৃত এবং অন্যান্য আর্য্য-ভাষার সহিত অভিন্ন। সুমেরীয়গণ জাতিতে এবং ভাষায় আর্য্য ছিলেন, উঁহারাই বিস্মৃত প্রাচীন আর্য্যজাতি, এবং উঁহারাই কুরুপাঞ্চাল ভারতীয় ক্ষত্রিয়, যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে ভারতকে সভ্য করিয়া-ছিলেন, ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভারতকে আর্য্যভাবাপন্ন করিয়াছিলেন। ঐরূপ সুমেরীয়-দিগের আর একটি শাখা প্রতীচ্য বরতকট্টি। উহারা



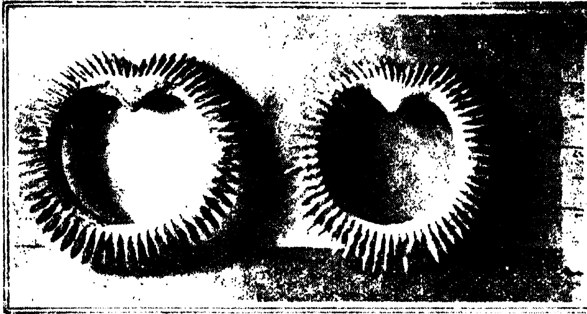
নাল—তাম্রনির্ম্মিত যন্ত্রসমূহ

প্রথমে তাহাদের পৈতৃক নাম বুরত-আনা বা বৃটেন দিয়াছিল এবং বৃটেনে রোমক-অধিকারের পূর্ব্বে তাহাদের খত্তিবংশের নাম মুদ্রায় মুদ্রিত করিয়াছিল এবং বৃটেনের প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভে উৎকীর্ণ করিয়াছিল।" (৪)

অধ্যাপক ওয়াডেল যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য

(৪) After over fifteen years devotion to the study of the Sumerian language and its script, I found that the Sumerian language was radically Aryan in its roots and structure with identical word forms and meanings as in Sanscrit and other members of the Aryan family of languages and the Sumerians were in race and speech Aryans, and were the long-lost early Aryans and that the Kurupancala Bharat Khattiya who first civilized, colonised and aryanised India were a leading branch of Sumerians, just as were the Western Barat Catti who first civilized and colonized Britain and gave it their patronymic of 'Burat-ana' or Britain and stamped their Khatti clan tittle on the coins of the pre-Roman period and carved it on the prehistoric monuments of Britain —Ibid.

বলিয়া মনে হয়। যে বংশসম্ভূত জাতিকে আমরা এখন আর্য্যজাতি বলিয়া থাকি, সেই জাতির প্রধান শাখা প্রথমে ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ ভারতে আর্য্য-অভিযানের যে সময় নির্দ্দেশ করেন, তাহা অত্যন্ত ভ্রমসঙ্কুল। তাঁহারা বলেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যজাতির অভিযান ঘটিয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় সওয়া ৬ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,



কাচের গুঁড়ার বালা—হরপ্পায় আবিষ্কৃত

তাহার কিছু-কম হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন। ইহা কিন্তু কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না! গৌতমবুদ্ধের সমকালীন সংস্কৃত ভাষা আর বৈদিক ভাষায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ! বাহির হইতে যদি অন্য কোন প্রবল ভাষার প্রভাব আসিয়া কোন দেশের ভাষার উপর না পড়ে, তাহা হইলে সে দেশের ভাষার অত দ্রুত পরিবর্তন সংঘটিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। কালান্তরের ইহা অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং আর্য্য-অভিযান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমিত সময়ের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। মহাত্মা বাল-গঙ্গাধর তিলক বেদের জ্যোতিষ-বচনের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদমন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল। মকর-সংক্রান্তি এবং কর্কট-সংক্রান্তিপাতের সময় যে নক্ষত্র থাকিত, তাহা দেখিয়া তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এ প্রমাণে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে যদি এই সাত-আট হাজার বৎসরে গ্রহ-নক্ষত্রের গতির বিষম বিপর্য্যয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ হিসাবে ভুল হইতে পারে।

শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা না থাকিলেও এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত বিজ্ঞানই বিশ্বের নিয়ম অপরি-বর্ত্তনীয়, প্রকৃতি একই নিয়মে চলেন, এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই জ্যোতিষের গণনায় ভুল হইতেই পারে না। বালগঙ্গাধর তিলকের কথার উপর টীকা করিয়া মিষ্টার ভি, এইচ, ভেডার 'ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়াটার্লি'তে একটি সন্দর্ভ প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধে তিনি জ্যোতিষের দিক্ দিয়া বেদের অনেক সূক্তের আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, "উপসংহারে আমি এই কথাই নিবেদন করিতে চাহি যে, বৈদিক কালের সতেজ কার্য্যের সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বা তাহার আরও পূর্ব্বে লইয়া যাইতে পারা যায়। (৫) কিন্তু আমাদের দেশের লোক য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্তে এতই মুগ্ধ যে, তাঁহারা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪ হাজার বৎসরের পূর্ব্বে আর যাইতে চাহেন না। কারণ, বাইবেল হইতে ধারণা হইয়াছে যে, নোয়ার আমলের জলপ্লাবন খৃষ্টপূর্ব্ব ৪



নালে প্রাপ্ত আধুনিক আকারের মৃন্ময় পাত্র

হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এখন তাঁহারা আর লজ্জায় তারিখ দেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদের

(৫) In conclusion. I beg to submit that the most active portion of the Vedic period may be carried back even beyond 15,000 B. C. or the Scorpio period and that there are grounds for carrying it back even still further.—Further Researches on the antiquities of Vedas. By B. H. Veder.

মনের ভিতর উহা হইতে এমন একটা সংস্কার বাসা বাঁধিয়াছে যে, চারি-পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক পূর্ব্বে ধরাতলে সভ্য মানুষ ছিল, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না বা চাহেন না। ইহা ভুল হইলেও তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণের যে জন্মকুণ্ডলী আছে, তাহা হইতে উজ্জয়িনীর বিখ্যাত জ্যোতিষী দীননাথ গত শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতারিখ ও বৎসর ঠিক করিয়া দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩ হাজার ১ শত ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে বুধবারে রাত্রি দ্বিপ্রহরে বৃষলগ্নে শ্রীকৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তাহা মানিলেন না। তাঁহারা গণনায় ভুল দেখাইতে পারিলেন না, কেবল বলিলেন, ঐ কোষ্ঠী জাল! এইরূপ গোঁড়ামীর জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেক অপসিদ্ধান্ত স্থান পাইতেছে। য়ুরোপীয়রা পুরাণগুলিকে বরাবরই গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ইদানীং কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, পুরাণগুলির মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। অধ্যাপক ওয়াডেল মেশোপোটেমিয়া, সিরিয়া এবং ফিনিসিয়ার পুরাবস্তু ও মুদ্রাদি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, কুরুপাঞ্চালের রাজগণের নাম ও পরিচয় যথাযথ ভাবে ঐ সকল দেশের পুরাবস্তুতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিঃ ওয়াডেল সুমেরীয় ভাষায় বিশেষজ্ঞ। তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নহে।



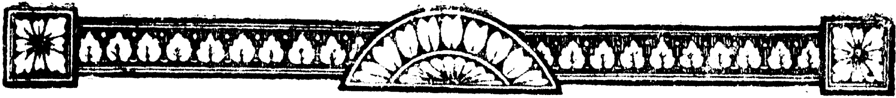


নালের সমাধিক্ষেত্রে আবিষ্কৃত কারুকার্য্যখচিত মৃন্ময় আধার

আসল কথা, ভারতে আর্য্য-অভিযান যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা ঐ দুই ভূপ্রোথিত নগরী প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল। ঠিক কোন সময়ে হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। অথচ কতকগুলি বৈদিক মন্ত্রের আভাসমাত্র দেখিয়া ঐরূপ অভিযান হইয়াছিল, ইহা অনুমিত হয়। কিন্তু সে অনুমানকে নিঃসন্দিগ্ধতার আসন কোন মতেই দেওয়া যাইতে পারে না। যাহা হউক, যদি ভারতে আর্য্য-অভিযান হইয়াই থাকে, তাহা হইলে উহা যে বহু পূর্ব্বকালে হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিষ্ণুপুরাণ পাঠে জানা যায় যে, সগর রাজা তাঁহার পিতৃবৈরী হৈহয় এবং তালজঙ্ঘ ক্ষত্রিয়দিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারাই সম্ভবতঃ যবন নাম গ্রহণ করিয়া পারস্য, মেসোপোটেমিয়া, সিরিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশে বাস করেন। ইঁহারাই যবন, শক, পারদ এবং পহ্লব জাতি। যযাতির পুত্রগণের কেহ কেহ পিতৃকোপে পতিত হইয়া ভারতের বাহিরে গমন করেন। সুতরাং ভারত হইতে অনেক ক্ষত্রিয় পশ্চিম-এসিয়া ও ভূমধ্যসাগরের তীরভূমি পর্য্যন্ত গমন করিয়া ঐ সকল স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ বহু পুরাণে আছে। মিঃ ওয়াডেল বলিয়াছেন, ঐ সকল ক্ষত্রিয় রাজগণের নাম পরম্পরা-ক্রমে ঐ সকল দেশের মুদ্রায় ও লিপিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। ইঁহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, এ কথা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় যে, ঐ সকল নির্ব্বাসিত ক্ষত্রিয় "নিজ ধর্ম্মপরিত্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ।" তবে তাহারা কতকগুলি পৈতৃক দেবতার পূজা করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন মাটি খুঁড়িয়া ঐ সকল প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ বাহির করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার কাহিনী এখন বিস্মৃতির তিমির-জালে সমাচ্ছন্ন।

কাল যাহা কঠোর হস্তে মুছিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার আর উদ্ধারের আশা নাই। ভ্রান্ত সংস্কার ও স্বার্থপূর্ণ মনোবৃত্তি মানুষকে চিরদিনই ভুলপথে চালাইয়া আসিতেছে। অনুমান কখনই প্রবল প্রমাণ হইতে পারে না। তবে মনে হয়, ঐ দুই নগরী প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্ব হইতে যে ভারতে আর্য্যগণের বসতি ছিল, ইহা কালে সপ্রমাণ হইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।



ভারতের বিষধর সর্প

বিচিত্র গতিভঙ্গী, অদ্ভুত আকার, বর্ণচ্ছটা সুদৃশ্য ও সাংঘাতিক তীব্র বিষের জন্য বিষধর সর্প প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর সকল দেশেরই জনসাধারণের মনে ভয় ও বিস্ময়-সঞ্জাত বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া জীবজগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড়দের মধ্যে সর্পের পূজা-পদ্ধতি ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পৃথিবীর নানা দেশেই ধর্ম, সংস্কৃতি এবং শিল্পকলায় বিভিন্ন প্রকার প্রতীকরূপে সর্পদেহের প্রাধান্য বর্তমান। আধুনিক ফ্রয়েডিয়ান মনস্তত্ত্ববিৎগণকেও মানব-মনে সর্প-প্রতীকের প্রভাব স্বীকার করিতে দেখা যায়। এই অদ্ভুত জাতীয় সরীসৃপ-সংক্রান্ত বহু রহস্যই দীর্ঘকাল যাবৎ অনাবিষ্কৃত ও মানব জাতির অজ্ঞাত ছিল; এ জন্য সর্প সম্বন্ধে নানাবিধ কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়া দেশে দেশে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। সর্পতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক-গণের রচিত বিবিধ গ্রন্থ * হইতে সর্প সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, পাঠক-পাঠিকাগণের মনো-রঞ্জনের জন্য তাহা বর্তমান প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল।

সাধারণ বর্ণনা

মেরুপ্রদেশ ও নিউজিল্যাণ্ড ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেরই জলে, স্থলে, ভূগর্ভে, বৃক্ষে, পর্বতে বা গিরি-কন্দরে প্রায় ১৭০০ বিভিন্ন জাতীয় সর্পের বাস।

সর্প মেরুদণ্ডধারী সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের দেহের রক্ত শীতল; অর্থাৎ ইহাদের দেহ আবহাওয়ার প্রভাবে উত্তপ্ত বা শীতল হইয়া থাকে। সাধারণ পশু-পক্ষীর ন্যায় ইহাদের শরীরের তাপ অপরিবর্তনীয় নহে। ইহাদের শরীর—মস্তক, দেহাংশ (ধড়) ও লেজ—এই তিন অংশে বিভক্ত হইতে পারে। সর্পের পশ্চাদ্দেশের নিম্নভাগই উহার লাঙ্গুল।

সর্পদেহ বহুসংখ্যক শল্কে বা আঁইসে আবৃত। এই সকল শল্কের সংখ্যা ও অবস্থান লক্ষ্য করিলেই বিষধর সর্প নির্ভুল ভাবে চিনিতে পারা যায়; পরে আমরা এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। সর্প দুই-তিন মাস অন্তর নির্মোক (খোলস) বর্জন করে। ইহাদের পরিত্যক্ত খোলস অনেকেই দেখিয়াছেন। খোলস ত্যাগের সময় ইহারা দুর্বল, অসহায়, এবং অন্ধবৎ হইয়া জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকে।

সাপের চোখের পাতা নাই; উহা স্বচ্ছ চর্মে আবৃত। চোয়ালের গঠন-বৈচিত্র্যের জন্য সর্প তাহার মুখবিবর ইচ্ছামত আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে পারে। ইহাদের দীর্ঘ দ্বিধাবিভক্ত লকলকে জিহ্বা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

ভেক, ইঁদুর, এবং নানা প্রকার পোকা-মাকড় সর্পের খাদ্য। ইহারা এই সকল প্রাণী দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া তাহাদের সংখ্যা হ্রাস করায় মানব জাতির কথঞ্চিৎ উপকার করিয়া থাকে। কয়েক জাতীয় সর্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্প আহার করিয়া জীবনধারণ করে। সর্পের আস্বাদ-বোধ আছে কি না, তাহা জানিতে পারা যায় নাই; সম্ভবতঃ তাহা নাই। আহার্য ও পানীয় ব্যতীত ইহারা যে বহু দিন জীবনধারণে সমর্থ, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ক্রুদ্ধ গোখুরা ও চন্দ্রবোড়ার 'ফোঁস-ফোঁস' গর্জন মানবের পক্ষে ভীতিপ্রদ। ইহারা প্রচুর পরিমাণে বায়ু গ্রহণ করিয়া, পরে নাসিকার সাহায্যে তাহা সজোরে ত্যাগ করে, এই জন্যই তাহাদের ফোঁস-ফোঁস ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। প্রয়োজন হইলে সর্প শ্বাস না লইয়া জলমধ্যে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত ডুবিয়া থাকিতে পারে।

সর্প সম্পূর্ণ মসৃণ স্থান দিয়া চলিয়া যাইতে পারে না; কিন্তু খসখসে ভূমির উপর দিয়া দ্রুতবেগে চলিতে পারে।

* 1. The Poisonous Terrestrial Snakes of Our British Indian Dominions, By Col. F. Wall. I. M. S.
2. The Snakes of India, By Lt. Col. K. G. Gharpurey, I. M. S.
3. Hand Book of Snake-bite. By P. Banerjee.
4. The Poisonous Snakes of India—Wall Chant by Lt. Col. R. Knowles I. M. S.
5. Tropical Medicine by Rogers & Megaw.

দৈবাৎ জলে পড়িলে সকল জাতীয় সর্পই সাঁতার দিতে সুদক্ষ।

সর্পী চার মাস গর্ভধারণ করে, এবং বৎসরে ২০ হইতে ১০০টি পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। সূর্য্যের উত্তাপ পাইলে প্রায় তিন মাস পরে ডিম্ব ফাটিয়া ডেঁপা (শাবক) বাহির হয়। চারি বৎসর বয়সে সর্প যৌবন-প্রাপ্ত হয়। কোন কোন জাতীয় সর্পকে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

লতাগুল্মাদিপূর্ণ স্থান, জঙ্গল, অন্ধকারাবৃত গর্ত্ত, পুরাতন প্রাচীরের ফাটল, পরিত্যক্ত বা পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ীর মেঝের তলস্থ বিবর, এবং অন্যান্য নিভৃত স্থানে সর্পের বাস। সাধারণতঃ, তাড়া করিলে ইহারা পলায়নের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু পলায়নের সুযোগ না পাইলে, বা ইহাদের দেহে কি লেজে পা পড়িলে ইহারা দংশন না করিয়া ছাড়ে না। কথায় বলে, বিষধর সর্প 'তেড়ে, ফুড়ে ও প'ড়ে' অর্থাৎ তাড়াইয়া গিয়া, বা মাটী ফুড়িয়া গর্ত্ত হইতে উঠিয়া, অথবা কোন উচ্চ স্থান হইতে নীচে পড়িয়া দংশন করিলে, সেই দংশন সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

কাণ বা কাণের ফুটা না থাকিলেও সর্পের শ্রবণশক্তি আছে। প্রসিদ্ধ সর্পতত্ত্ববিদ্ কর্ণেল ওয়াল বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, বায়ুবাহিত শব্দ সাপ শুনিতে পায় না। ভূমির উপর যষ্টির আঘাতে বা মৃত্তিকায় পদক্ষেপে যে শব্দ হয়, কেবল তাহাই ইহাদের শ্রবণগোচর হয়।

ঐ বিশেষজ্ঞ আরও বলেন যে, সাপুড়ের বংশীধ্বনির পরিবর্ত্তে তাহার বাঁশী, হাত বা জানুর আন্দোলনই কেবল গোখুরা সর্পের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং সেই আন্দোলনের সহিত তাল রাখিয়া ইহারা ইতস্ততঃ ফণা সঞ্চালন করে। সর্পজাতির প্রকৃতি ও গতিবিধি উত্তমরূপে জানা থাকায়, সাপুড়েরা সুকৌশলে বিষধর সাপ ধরিয়া দক্ষতার সহিত খেলাইতে পারে; অভিজ্ঞতা, অভ্যাস, এবং প্রধানতঃ ক্ষিপ্রতার সহিত হস্তের পরিচালন-কৌশলে সর্প তাহাদিগকে দংশন করিতে পারে না।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন—সাপ যখন ফণা বিস্তার করিয়া সোজা হইয়া ওঠে, তখন কৌশলক্রমে মাথার পিছন দিক শক্ত করিয়া ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিলেই একেবারে অসাড় হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সাপকে সম্পূর্ণ মৃতের মত পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীর অধিকাংশ সাপই বিষহীন। ভারতবর্ষ ৩৩০ জাতীয় সর্পের আবাসভূমি; কিন্তু ইহার এক-পঞ্চমাংশই কেবল বিষধর। সুতরাং শতকরা ৮০টি সর্পই বিষধর নহে মনে করিয়া আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

বিষধর সর্প

গোখুরা (Cobra), প্রবাল সাপ (Coral snake), করাইত (Krait), বোড়া (Viper), এবং সামুদ্রিক সর্পকে (Sea-snake) লইয়া এ দেশের বিষধর সাপের গোষ্ঠী। নিম্ন প্রকাশিত আকার-প্রকার ও লক্ষণ লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়, কোন্গুলি বিষধর ও কোন্গুলি বিষহীন সর্প।

সকল প্রকার গোখুরা সর্পের একটি সাধারণ চিহ্ন লক্ষ্য করিবার বিষয়। সকল ক্ষেত্রেই ইহাদের ওষ্ঠপ্রান্তের তৃতীয় শল্কটি নাসাশল্ক ও চক্ষুকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ, গোখুরা সর্পের দেহ ২½ হইতে ৪½ ফিট দীর্ঘ হয়। ইহাদের ফণার উপর গোক্ষুর ক্ষুরের মত দুইটি চক্রাকৃতি চিহ্ন থাকায় ইহারা গো-ক্ষুর বা গোখুরা নামে অভিহিত। বাদামী, কালো, বা ধূসর রঙের গোখুরা সাপ ভারতের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজগোখুরা বা শঙ্খচূড় (King cobra) সর্প ১০ হইতে ১৫ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়; গোখুরাজাতীয় সর্পের মধ্যে ইহারাই আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাদের রঙ পীতাভ, সবুজ বা কালো, এবং ফণার উপর গোক্ষুর-চিহ্ন বর্ত্তমান। বাঙ্গালা, আসাম ও ব্রহ্মদেশের বনে-জঙ্গলে রাজগোখুরা সাপ বাস করে।

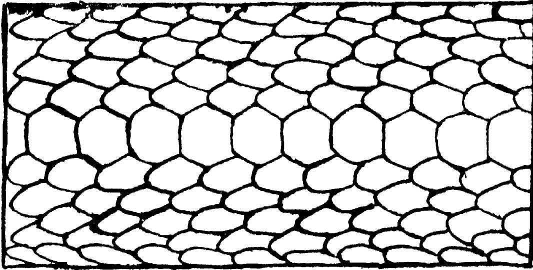
বাঙ্গালাদেশে এক জাতীয় কালো গোখুরাই কেউটে সাপ (Monocellate or Black cobra) নামে অভিহিত; কিন্তু পার্থক্য এই যে, ইহাদের ফণার উপর একটি চক্রাকৃতি চিহ্ন থাকে, কখন কখন কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা অতি ভীষণ প্রকৃতি ও ক্রুর।

গোখুরার মত প্রবাল সাপেরও ওষ্ঠপ্রান্তস্থ তৃতীয় শল্কটি নাসা-শল্ক ও চক্ষুকে স্পর্শ করে। ইহাদের দেহের নিম্নাংশ ও উদর প্রবালের মত রক্তাভ বলিয়া ইহারা প্রবাল সাপ নামে পরিচিত। ইহাদের দেহ ১ ফুট হইতে ৩ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ। প্রবাল সাপ ৭টি উপজাতিতে বিভক্ত, এবং প্রধানতঃ দক্ষিণভারতেই ইহাদিগের বাস।

করাইত জাতীয় সকল সাপের পিঠের মধ্যসারির শল্কগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং ষড়্‌ভুজাকৃতি। ইহারা ১০টি উপজাতিতে বিভক্ত, তাহাদের মধ্যে সাধারণ করাইত (Common krait) ও রঞ্জিত করাইত (Banded krait) সচরাচর দেখা যায়।

সাধারণ করাইতের রঙ নীলাভ কালো, কেবল মধ্যে মধ্যে সাদা ডোরা থাকে। ইহাদের দেহ ২½ হইতে ৪½ ফিট দীর্ঘ। ভারতের সর্ব্বত্রই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

রঞ্জিত করাইতের বর্ণ-বৈচিত্র্য অতি সুন্দর। ইহাদের সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া পর-পর একটি কালো

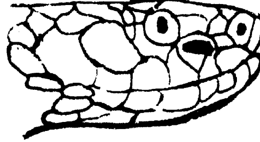


করাইতের পিঠ

ও একটি হলুদে ডোরা থাকে। দৈর্ঘ্য ৩½ হইতে ৫½ ফিট পর্য্যন্ত। দক্ষিণভারত, বিহার, বাঙ্গালা, আসাম এবং ব্রহ্মদেশে এই সাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

বোড়াজাতীয় সকল সাপের মাথা ত্রিভুজাকার, ঘাড় সরু এবং লেজ ছোট। অধিকাংশ বোড়ার মাথা ছোট-ছোট শল্কে আবৃত। বোড়া সর্পীর প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহারা ডিম না পাড়িয়া একেবারে জীবিত শাবক প্রসব করে। কোন কোন বোড়ার মাথায় চোখ ও নাকের মধ্যস্থলে একটি ফুটা থাকায় উহাদিগকে ছিদ্রযুক্ত বোড়া (Pit viper) বলা হয়। অপর শ্রেণীর মাথায় ঐরূপ কোন ছিদ্র নাই বলিয়া উহারা ছিদ্রহীন বোড়া (Pitless viper) নামে অভিহিত।

ছিদ্রহীন বোড়া ৭টি উপজাতিতে বিভক্ত, কিন্তু তন্মধ্যে চন্দ্রবোড়া (Russell's viper) ও ফুর্শা (Saw-scaled viper) প্রায়ই দেখা যায় বলিয়া সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।



সছিদ্র বোড়ার মাথা

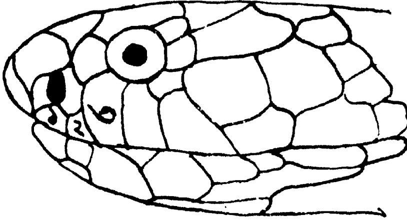
চন্দ্রবোড়ার রঙ বাদামী, সবুজাভ কিম্বা ধূসর; ইহাদের পিঠে কালো বুটীর তিনটি সারি আছে, এবং মাথায় ইংরেজি 'v'-এর মত চিহ্ন দেখা যায়। এই সাপ ২½ ফিট হইতে ৫ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালা ও ব্রহ্মদেশে চন্দ্রবোড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ বাদামী, ধূসর অথবা সবুজ রঙের ফুর্শা দেখা যায়। ইহাদের মাথায় পাখীর পদচিহ্নের মত দাগ থাকে, এবং পিঠের দুই পাশ দিয়া দুইটি সাদা রেখা লেজ পর্য্যন্ত প্রসারিত; ইহা ব্যতীত মাঝখান দিয়া বরফির মত সাদা দাগের আরও একটি সারি গিয়াছে। তাড়া দিলে ফুর্শা ৪-এর মত কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে, এবং শল্কে শল্কে ঘর্ষণ করিয়া করাতের মত শব্দ করে। এই সাপ পার্ব্বত্য প্রদেশে বা বালুকাময় মরুভূমিতে বাস করে। ইহাদিগকে সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, এবং রত্নগিরি জেলাতে প্রায়ই দেখা যায়। বিষধর হইলেও ফুর্শার দেহ ১৮ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হয় না।

এই শ্রেণীর অন্যান্য সর্পের মত ছিদ্রযুক্ত বোড়ারও ত্রিভুজাকার মাথা, সরু ঘাড়, ছোট লেজ এবং মোটাসোটা শরীর; কিন্তু বলা হইয়াছে যে, ইহাদের নাক ও চোখের মাঝখানে একটি ছোট ছিদ্র আছে, তাহা অন্য কোন সাপের মাথায় দেখা যায় না। ইহারা ১১টি উপজাতিতে বিভক্ত, এবং সাধারণতঃ এই জাতীয় অধিকাংশ সাপের

মস্তক ছোট-ছোট শল্কে আবৃত, কেবল চারি জাতির মাথায় বড়-বড় শল্ক দেখা যায়। সছিদ্র বোড়া বাদামী, সবুজ, কালো ও ধূসর রঙের হইয়া থাকে। ইহাদের দৈর্ঘ্য এক ফুট হইতে ৪ ফুট। হিমালয়, পশ্চিম ঘাট, আসাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলে সছিদ্র বোড়া বাস করে।

সামুদ্রিক সর্পের লেজ দাঁড়ের মত চেপ্টা হওয়ায় উহারা অনায়াসে সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটিতে পারে। ভারত-মহাসাগরে এবং সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থানে প্রায় ২৯ প্রকার সামুদ্রিক সর্প এ-পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। এই



গোখুরার মাথা

সকল জলজ সাপের পিঠে সুস্পষ্ট সবুজ কিম্বা নীল রঙের ডোরা থাকে, ইহাদের দৈর্ঘ্য ৪ হইতে ৫ ফিট।

বিষদাঁত ও বিষ

বিষাক্ত সাপের উপরের চোয়ালে দুই পাশে দুইটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দাঁত আছে, উহাই বিষদাঁত। সর্পের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের অস্ত্র এই বিষদাঁত। উহা ইঞ্জেকশন দিবার সূচের মত ফাঁপা হয়, কিম্বা উহাতে সরু নালি কাটা থাকে, এজন্য সহজেই বিষ গড়াইয়া আসে। কার্য্যকরী বিষদাঁতের পশ্চাতে আরও কয়েকটি দাঁত সঞ্চিত থাকে, কোন কারণে বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে এই অতিরিক্ত দাঁত প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে বিষদাঁতে পরিণত হয়। এই জন্য সাপুড়েরা কিছু দিন অন্তর তাহাদের সর্পের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া থাকে। বিষধর সর্পের চক্ষুর পশ্চাতে একটি করিয়া বিষগ্রন্থি অবস্থিত, এবং উহা হইতে একটি সরু নলী আসিয়া বিষদাঁতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। দংশন করিবার সময় উক্ত বিষগ্রন্থি হইতে বিষ বাহির হইয়া ঐ নলী ও বিষদাঁতের মধ্য দিয়া দষ্ট স্থানে প্রবেশ করে।

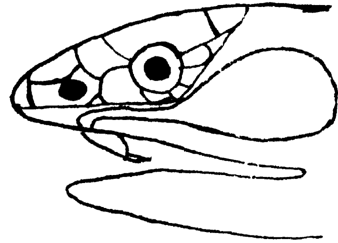
এই বিষ পাচক রসের মত সর্পের আহার্য্য বস্তু পরিপাকে সহায়তা করে। সন্ত-সংগৃহীত সর্প-বিষ দেখিতে অনেকটা সরিষার তৈলের মত; শুষ্ক করিলে গঁদের মত হইয়া যায়, কিন্তু উহার তীব্রতা অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। পোটাসিয়াম পার্ম্মাঙ্গানেট, গোল্ড ক্লোরাইড, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি ঔষধের সংস্পর্শে আসিলে বিষের অনিষ্টকারিতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

বিষ-ক্রিয়া

সাপের বিষ ভক্ষণ করিলে কোনরূপ ক্ষতি না হইবারই সম্ভাবনা; কারণ, পিত্তের সহিত মিশ্রিত হইলে উহার তীব্রতার হ্রাস হয়। কিন্তু কোনক্রমে ঐ বিষ রক্তস্রোতের সহিত দেহে সঞ্চালিত হইলে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়।

বিষাক্ত সর্প দংশন করিলে দষ্ট-স্থানে সাধারণতঃ বিষদাঁতের দুইটি ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ক্ষতস্থানে অনেকগুলি ফুটা থাকিলে বুঝিতে হইবে, উহা নির্ব্বিষ সাপের দংশন।

সাধারণ গোখুরায় দংশন করিলে প্রায় দেড় রতি পরিমাণ বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইহার একদশমাংশ মাত্রা বিষই মানুষের পক্ষে সাংঘাতিক। দংশনের প্রায় ২০ মিনিট পরে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। প্রথমে দষ্ট-স্থানে অত্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে, ও ফুলিয়া

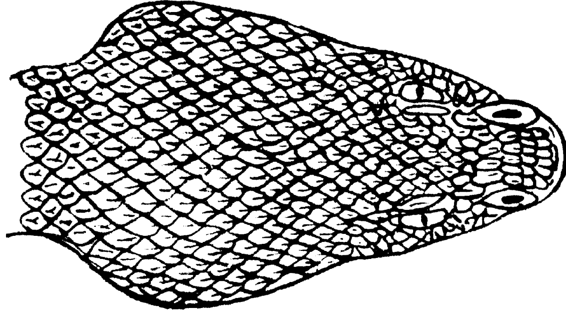

বিষদাঁত ও বিষগ্রন্থি

উঠে; কিন্তু ক্রমশঃ ঐ স্থান অসাড় হইয়া যায়। ধীরে ধীরে হাত, পা, সমস্ত শরীর পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া যাওয়ায় সর্পদষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত অবসন্ন ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। গলা ও মুখের মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত হওয়ায় আর কথা কহিবার শক্তি থাকে না, এবং বিবমিষার জন্য প্রায়ই বমন হয়। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, অবশেষে উহা থামিয়া যাওয়ায় প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে।

প্রবাল সাপের মুখ খুব ছোট বলিয়া উহারা মানুষের আঙ্গুলে ছাড়া আর কোথাও দংশন করিতে পারে না। সে জন্য প্রবাল সাপের দংশনে প্রায়ই মৃত্যু-সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না।

সাধারণ করাইতের বিষ গোখুরা-বিষ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ অধিক তীব্র; কিন্তু রঞ্জিত করাইতের বিষ ইহা অপেক্ষাও পাঁচ গুণ অধিক শক্তিশালী। করাইতের বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে গোখুরা-দংশনের মত উল্লিখিত পক্ষাঘাতের সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়; ইহা ভিন্ন দষ্ট-ব্যক্তির উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

চন্দ্রবোড়া বা ফুর্ণা দংশন করিলে, ক্ষতস্থানে প্রথমে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ স্থান ফুলিয়া উঠে। দষ্ট-স্থানে, চর্ম্মের নীচে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি হইতে অনবরত রক্তপাত হইতে



চন্দ্রবোড়ার মাথা

থাকে; ক্ষতস্থান ক্রমশঃ পচিয়া উঠিয়া বিষাইয়া যায়। যদি দংশনের সহিত বেশী পরিমাণ বিষ শরীরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং অবশেষে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মৃত্যু হয়।

সছিদ্র বোড়ার দংশন কদাচিৎ সাংঘাতিক হয়; কেবল দষ্ট-স্থান ফুলিয়া উঠে ও উহাতে কিঞ্চিৎ যাতনা হয়। কিন্তু কিছু দিন চিকিৎসা করিলে ঐ ক্ষত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে পারে।

সমস্ত সামুদ্রিক সর্পই বিষধর; বিষগ্রন্থি ও বিষদাঁত ছোট ও অপূর্ণ হওয়ায় ইহাদের দংশনে সাধারণতঃ প্রাণহানি হয় না। যদি কোন রকমে যথেষ্ট মাত্রা বিষ শরীরে প্রবেশ করে, তবে গোখুরার মত বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়।

আজকাল চিকিৎসাকার্য্যে সর্পবিষের অল্প-স্বল্প ব্যবহার দেখা যায়। সর্পাঘাতের প্রামাণ্য প্রতিষেধক ঔষধ এন্টিভেনিন বিষ হইতেই প্রকারান্তরে প্রস্তুত হয়। দুরারোগ্য কর্কটরোগে (Cancer) গোখুরার বিষ সামান্য মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। যে সকল ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রক্তপাত বন্ধ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, সেই সকল স্থলে অল্প পরিমাণ চন্দ্রবোড়ার বিষ বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ছাড়া মৃগী এবং কোন কোন স্নায়ুরোগের (Chorea) চিকিৎসায় সাপের বিষ ব্যবহৃত হয়।

সর্পাঘাতের চিকিৎসা

বিষধর সর্প দংশন করিলে ১০ মিনিটের মধ্যেই বিষ হৃৎপিণ্ডের প্রতি-স্পন্দনে রক্তের সহিত মিশিয়া, সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয় এবং বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়।

সুতরাং হাত বা পা দংশিত হইলে অবিলম্বে ক্ষতস্থানের কয়েক ইঞ্চি উপরে কাপড়ের পাড়, দড়ি, কিম্বা রুমাল দিয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে ঐ স্থানে রক্ত-চলাচল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বিষ আর উপরে উঠিতে পারে না। ইহা ভিন্ন দংশন অনুযায়ী কনুই বা হাঁটুর কিছু উপরে আরও একটি অতিরিক্ত দৃঢ় বন্ধনী দেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়।

দৃঢ়-বন্ধনী (Tourniquet) দিবার উপায় এইরূপ—প্রথমে কাপড়ের পাড় বা দড়ি ঢিলাভাবে বাঁধিয়া আধা-গাঁট দিবেন, পরে উহার উপরে একটি মজবুত কাঠি রাখিয়া পুরা-গাঁট বাঁধিবেন। এইবার কাঠিটি হাত দিয়া ক্রমাগত ঘুরাইলে ঐ বাঁধা দড়ির পাকে পাকে বন্ধন আরও দৃঢ় হইবে।

উল্লিখিত প্রণালীতে বন্ধন করিবার পর ছুরি দিয়া ক্ষতস্থান লম্বালম্বি ভাবে চিরিয়া দেওয়া উচিত; তাহা হইলে রক্তস্রাবের সহিত বিষের কিয়দংশ বাহির হইয়া যাইবে। ইহার পর পোটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট (Potassium

permanganate) জলে গুলিয়া দষ্ট-স্থান ধৌত করিলে অবশিষ্ট বিষ বিনষ্ট হইবে ; কিন্তু যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও যে অল্প পরিমাণ বিষ ইতিপূর্ব্বেই শরীরে সঞ্চালিত হইয়াছে, তাহার ক্রিয়া প্রতিরোধ করিবার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক ঔষধ এন্টিভেনিনের (Anti-venene) ইঞ্জেকসন দেওয়া প্রয়োজন। এ জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রাথমিক চিকিৎসার পর শীঘ্রই নিকটবর্ত্তী অভিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

সর্প-ভয় নিবারণ

ভারতবর্ষে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০০ জন লোক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করে, সে জন্য মানুষের পরম শত্রু অহিকুল ধ্বংস করিয়া উহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার সকল উপায় অবলম্বন করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

এই হিংস্র সরীসৃপ যাহাতে বাসগৃহে প্রবেশ করিয়া কোনক্রমে আশ্রয়লাভ করিতে না পারে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। বাড়ীর উঠানে কিম্বা হাতায় ঘন ঘাস বা আগাছার জঙ্গল হইলে তাহা কাটিয়া নির্ম্মূল করা প্রয়োজন, এবং সর্পের বাসযোগ্য কোন গর্ত্ত থাকিলে মাটি দিয়া তাহা বুজাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বাড়ীর চারি দিকে কাঁকরের একটা সরু রাস্তা করিতে পারিলে বাসস্থান অনেকটা সুরক্ষিত হয় ; কারণ, ধারাল কাঁকরের টুকরার উপর দিয়া চলিতে সর্পের বিশেষ অসুবিধা হয়।

কার্বলিক এসিডের (Carbolic acid) মৃদু গন্ধও সাপের অসহ্য। এই ঔষধ জলে গুলিয়া প্রয়োজনমত ইতস্ততঃ ছড়াইলে, সেই গন্ধে আর সাপ নিকটে আসিতে পারে না।

অহি-নকুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চিরপ্রসিদ্ধ। প্রতিযোগিতায় নকুলই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ করে ; এ জন্য সর্পবহুল স্থানে বেজি পুষিলে নাগবংশের সংখ্যা হ্রাস হইবার সম্ভাবনা।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সর্পের অধিক প্রাদুর্ভাব হয়, সে জন্য এই সময় রাত্রিকালে কোথাও যাইতে হইলে সঙ্গে একটি ছড়ি ও আলো লওয়া উচিত। চলিবার সময় লাঠি দিয়া মধ্যে মধ্যে মাটিতে আঘাত করিয়া শব্দ করিলে ঐ শব্দে ভয় পাইয়া সাপ পলাইয়া যায়।

প্রয়োজন হইলে যাহাতে সত্বর প্রাথমিক চিকিৎসা আরম্ভ করা যায়, সে জন্য সর্পসঙ্কুল স্থানে প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট পোটাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেট থাকা উচিত, ইহা সকল ঔষধের দোকানেই স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস।

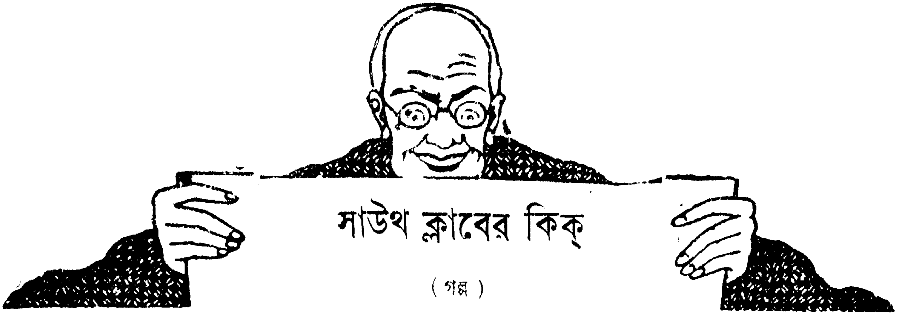
প্রাণগুরু-প্রয়াণে

শ্রাবণ-মধ্যাহ্ন বেলা অকস্মাৎ পশিল শ্রবণে
বজ্রবেগে বজ্রবাণী অস্তমিত "ভারত-ভাস্কর" ;
নির্দ্দয় আঘাতপাতে অবাঞ্ছিত দস্যুতার ক্ষণে
আর্ত্তনাদে হা-হা করি' উঠিল যে এ মোর অন্তর।

স্বীকার করিতে হ'বে নাহি-নাহি, প্রিয় মোর নাহি!
মোর রবি, মোর কবি, মোর ছবি, মোর সবি' শেষ!
বিশ্বাস করিতে হ'বে সেই সাথে চিত্তপানে চাহি'
ত্যজিতে পারে না সে যে, নাহি তা'র মরণের লেশ।
মুখেতে বলিতে হ'বে অর্থহীন বাস্তবের বুলি,
বক্তৃতায় দিতে হ'বে রিক্ততার ভাষা জ্বালাময়ী,
বুকেতে বুঝিতে হ'বে স্বপ্নস্মৃতি জাগাইয়া তুলি'
কবি আছে, সবি' আছে, রবি আছে সর্ব্বক্ষয়জয়ী।
জীবন-সাধনা মাঝে স্রষ্টা শিল্পী লীলা-রূপকার,
জীবনে-জীবনে গড়ি' যে জীবন গেলে রূপ দিয়া
মৃত্যু আসি' রুক্ষ হাতে নিদারুণ বিষস্পর্শে তা'র
ভবিষ্য-প্রতীকরূপে রাখি' গেল অমর করিয়া।

গুমরিতা প্রকৃতির দুপুরের বুকের ক্রন্দন
মনোভঙ্গ-মাঝে শেষ অর্ঘ দিল তোমার চরণে,
রাতের অশ্রুর ধারা অবিরল স্মৃতি-তরপণ
অন্ধকারে-চিতালোকে নিবেদিল অকুণ্ঠিত মনে।
প্রথমে লাগেনি দোলা, জাগেনিক সাড়া এত দিন
বিশ্বের চোখেতে জল মায়াময় যাদু ছোঁয়াখানি
মৌন মর্ম্মে প্রথমেতে বাজাইল চেতনার বীণ,
সঞ্চারিল স্বপ্নস্রোত অমৃতের শিহরণ আনি'।
একান্ত করিয়া যেই মৃত্যুহীন প্রাণ গেছ রাখি'
পৃথিবীর প্রিয়তম! প্রাণগুরু! রবীন্দ্র আমার!
ফুটায়ে তুলিতে তাহা অপূর্ণিত প্রাণ মোর বাকি—
প্রেরণার প্রান্তে লহ সে প্রাণের নম্র নমস্কার।

—রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়।



সাউথ ক্লাবের কিক্

(গল্প)

রায় বাহাদুর মুখ বাঁকাইয়া বসিলেন; কাঞ্চন রাগ করিয়া অন্য ঘরে উঠিয়া গেল।

স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এই মনোমালিন্যের কারণটা হইল—কন্যার জন্য পাত্র পছন্দ লইয়া।

রায় বাহাদুর এইমাত্র রাণাঘাটে যে ছেলেটিকে দেখিয়া আসিলেন, তাহাকেই তাঁহার খুব পছন্দ হইয়াছে, কিন্তু গৃহিণী কাঞ্চনমালা মুখখানাকে অসম্ভব রকম বিকৃত করিয়া বলিল—"রাম রাম! এই ছেলেই তোমার পছন্দ হোল! তোমার পছন্দকে বলিহারি যাই!"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"পছন্দের অপরাধটা কি হোল শুনি?"

"অপরাধ? না, অপরাধ আর কি? হীরের টুকরো ছেলে!"

তার পরই কথা কাটাকাটি, তর্ক, বিরক্তি, রাগ এবং স্থানত্যাগ।

সন্ধ্যার পর একটু যেন আপোসের হাওয়া বহিল। কাঞ্চন কহিল—"আমার অমন মেয়ে—রূপে গুণে! তেম্‌নি পাত্রের হাতে দিতে হবে ত?"

রায় বাহাদুর একটা মোটা বর্ম্মা চুরুট দাঁতে চাপিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। মুখ হইতে সেটা হাতে লইয়া কহিলেন—"বীডন্ ষ্ট্রীটের খবরটা তা'হোলে কাল একবার নিয়ে আসা যা'ক; কি বল? এ ছেলে বোধ হয় তোমার পছন্দ হবে।"

"ছেলেটি এম, এ, পাশ না?"

"হ্যাঁ; বাংলায় এম, এ।"

"বাং—লা! ও মা, ইংরিজী জানে না বুঝি?

"আহা-হা, তা কি হ'তে পারে? সে তুমি ঠিক বুঝবে না। বাংলাও জানে, ইংরিজীও জানে; তবে বাংলাটা খুবই ভাল জানে,—এই আর কি।"

"তা, বেশ, কাল একবার দেখেই এস।"

রায় বাহাদুর অপুত্রক। ঐ একটি মাত্রই কন্যা। কন্যার জন্মকালে রায় বাহাদুরের বৃদ্ধা জননী জীবিতা ছিলেন। সেকেলে রুচি এবং সংস্কারবশতঃ তিনি আদর করিয়া নাতনীর নাম রাখিয়াছিলেন—জগদম্বা। জগদম্বা এবার বি, এ, পাশ করিয়াছে। কিন্তু কথাটা এক দিক দিয়া ঠিক বলা হইল না, একটু বেঠিক হইয়া গেল। জগদম্বাই ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু আই, এ, ও বি, এ, পাশ করিয়াছে—কুমারী মানসী। কথাটা একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক, নচেৎ বুঝিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতে পারে।

যেমন—যিনিই শিব, তিনিই মহেশ্বর; যিনি ননী-চোরা, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ; তেমনি—যে জগদম্বা সে-ই মানসী। ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত স্কুলের খাতায় জগদম্বা নামই ছিল। তাহার পর কাঞ্চন এক দিন খুব বিরক্ত হইয়া রায় বাহাদুরকে বলিল—"কি সেকেলে, পচা যাচ্ছেতাই নাম! আজ-কাল ঐ নাম কেউ রাখে? তার চেয়ে এক কাজ কর; ওর নাম রাখ কালী করালবদনী!"

সঙ্গে-সঙ্গেই রায় বাহাদুরের মনের মধ্যে তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর মুখখানা ফুটিয়া উঠিল। রায় বাহাদুর কি বলিতে যাইতেছিলেন, তৎপূর্ব্বেই কাঞ্চন আবার কহিল—"এক জন রায় বাহাদুর, তাঁর মেয়ের ঐ জঘন্য নাম! আমাদের ঐ ঝিয়ের মেয়েরও নাম—গায়িত্রী!"

মোট কথা, সেই হইতেই অনেক কিছু ব্যাপার করিয়া তাহার নাম-বদল করা হইল। কলেজের খাতায় তাহার নাম-পত্তন হইল—'কুমারী মানসী'। কিন্তু পুরাণো বুড়ো ঝি—হাবুর মা—যে মানসীকে মানুষ করিয়াছিল, সে জগো বলিয়াই ডাকিতে লাগিল। কাঞ্চন রাগ করিয়া কয়েক বার তাহাকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিল। কিন্তু

বৃথা সতর্কীকরণ; হাবুর মা 'জগো' বলা ছাড়িতে পারিল না। তখন অগত্যা এক দিন খুব বকিয়া-ঝকিয়া কাঞ্চন তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। হাবুর মা তখন জগদম্বাকে জড়াইয়া ধরিয়া, কোলে বসাইয়া চুমো খাইয়া, অনেক কান্নাকাটি করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাতেই চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। সে রায় বাহাদুরের জননীর আমলের দাসী। এই সময় জননীর স্মৃতি রায় বাহাদুরের অন্তরে আর একবার ফুটিয়া উঠিল।

পরদিন সকালেই রায় বাহাদুর বীডন ষ্ট্রীটের সেই পাত্রটিকে দেখিতে যাইবার উদ্দেশে জামা-কাপড় পরিতেছেন, এমন সময় শনি ঘটক আসিয়া বাগবাজারের একটি নূতন পাত্রের সংবাদ দিল এবং সেইখানেই তাঁহাকে লইয়া গেল। ঘটক মশায়ের আসল নাম যাহাই হউক, শনি ঘটকই তাঁহার সার্থক নাম। পাত্রটি কিন্তু রায় বাহাদুরের পছন্দ হইল না। আর সব দিক দিয়া পাত্র ভালই; দেশে জমিদারী আছে, প্রতাপ-প্রতিপত্তি আছে, এখানকার বাড়ীও নিজেদের, বেশ বড় বাড়ী; ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে ঔষধ-বিক্রীর বড় দোকান; এই দোকানেরই আয় মাসে হাজার-খানেক টাকা। তা ছাড়া, বাপের নগদ টাকাও যথেষ্ট। বাপের দুইটি মাত্র ছেলে; এইটিই বড়। সুতরাং এ-দিক দিয়া রায় বাহাদুরের অপছন্দের কিছু নাই। কিন্তু ছেলেটি লেখাপড়া জানে না; ম্যাট্রিক পাশটাও করে নাই। বাপের সঙ্গে ওষুধের দোকান দেখাশুনা করে ও সমস্ত সকালটা পূজা-আহ্নিকেই কাটায়। রায় বাহাদুরের অপছন্দ এইখানেই। রায় বাহাদুর ভাবিলেন, চাকরীর চেয়ে অবশ্য ব্যবসায় মন্দ নয়, এবং যখন মাসে হাজার টাকা সে-ব্যবসায় থেকে আসে। তা'ছাড়া—জমিদারও ত বটে। কিন্তু অত জপ-তপ, পূজা-আহ্নিক ত মোটেই ভাল নয়। ২৫ বছর বয়সে যদি এখন ঐ পূজা-আহ্নিকে তিন ঘণ্টা কাটায়, ৩৫ বছর বয়সে কাটাবে পাঁচ ঘণ্টা; তার পর আর একটু বয়স বাড়লে, ওইতেই একেবারে মজে থাকবে। তখন জমিদারীও যাবে, ব্যবসায়ও যাবে; থাকবে খালি—ঠাকুর, কোষা-কুষি, পূজো, আর তার সঙ্গে অভাব-অনটন, দারিদ্র্য এবং অশান্তি। সুতরাং......

সুতরাং পাত্রটি রায় বাহাদুরের পছন্দ হইল না।

কাঞ্চন কহিল—"তুমি বীডন ষ্ট্রীটের ছেলেটিকেই ও-বেলা দেখে এস।"

বৈকালেই রায় বাহাদুর বীডন ষ্ট্রীটের ছেলেটিকে দেখিয়া আসিলেন। ছেলেটি তাঁহার বেশ পছন্দ হইল। গৃহিণীকে কহিলেন—"নসী'র উপযুক্ত পাত্র বটে।"

মানসীকে ইঁহারা আদর করিয়া 'মা' টুকু বাদ দিয়াই ডাকেন।

কাঞ্চন কহিল—"তোমার পছন্দ হোয়েছে ত?"

"তা নেহাৎ মন্দ হ'বে না। অনেক জায়গায়ই ত দেখা হোল; এইটিই যেন সব-চেয়ে ভাল বলে মনে হ'চ্চে। আর খুঁজতেও পারা যায় না।"

কাঞ্চন বিস্ময়পূর্ণ চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল—"সে কি কথা গো! খোঁজা-খুঁজি না কোরে, যার-তার হাতে মেয়েটাকে সঁপে দেবে? পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, ঐ একটা মেয়ে,--একটু দেখে-শুনে দিতে হবে বৈ কি।"

অতঃপর ছেলেটির সম্বন্ধে কাঞ্চন নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং রায় বাহাদুর একটি একটি করিয়া তাহার জবাব দিতে লাগিলেন।

একটা প্রশ্নের জবাব কাঞ্চনের ভাল লাগিল না; জিজ্ঞাসা করিল—"বড্ড রোগা? আচ্ছা, কার মত? আমাদের গৌরীর দাদা রমেশের......

"রমেশ? হ্যাঁ—তা—রমেশের চেয়েও একটু রোগা হ'বে।"

মনে মনে বিষম বিরক্ত হইয়া কাঞ্চন কহিল—"আচ্ছা, তোমার কি 'বাহাত্তুরে' ধরেছে?"

"এখনো যদিও ধরেনি, তবে আর বছর ষোল পরে ধরবে, এখন ত আমার ৫৬।"—বলিয়া রায় বাহাদুর দিয়াশলাই-য়ের কাঠি জ্বালাইয়া মুখের বর্ম্মা চুরুটটা ধরাইলেন।

তাঁহার মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া কাঞ্চন কহিল—"রমেশের চেয়েও যদি রোগা হয়, তাহ'লে সে হোল—'হাড়েশ'; সেই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দোবো নসীর! তাহ'লে ছেলেটির টি, বি,-ও আছে বোধ হয়?"

রায় বাহাদুর ভিতর-ভিতর একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু কোন কথা না বলিয়া, বাহিরের মুক্ত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিলেন।

* * * *

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে সংরক্ষিত একখানি বেঞ্চে বসিয়া রায় বাহাদুর ও শনি ঘটক ডাউন্ কাটোয়া ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। নিকটবর্ত্তী কেওটা গ্রামে তাঁহারা একটি পাত্র দেখিতে গিয়াছিলেন।

শনি কহিল—"ছেলেটি দেখলেন ত? রত্নবিশেষ! সত্য কি না, বলুন।"

রায় বাহাদুর প্ল্যাটফরমের ও-পারের প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটার দিকে চাহিয়াছিলেন; সেই দিকে চাহিয়াই কহিলেন—"হুঁ।"

"ছেলেটির চেহারা দেখলেন ত?—যেন কার্ত্তিক!"

"হুঁ।"

"বিদ্যেতেও চমৎকার! গ্রাজুয়েট।"

"হুঁ।"

"তা' ছাড়া, বংশটাও খুব বড়; বনেদী বংশ!"

"হুঁ।"

"তবে নগদ পাঁচ হাজারের যা দাবী করচে, ও আমি হাজার তিনেকে নামাবো। কেমন, আপনার পছন্দ কি না, বলুন।"

কোনও উত্তর না দিয়া, রায় বাহাদুর পকেট হইতে বর্ম্মা চুরুট বাহির করিয়া মুখে গুঁজিলেন।

শনি ঠাকুর কহিল—"তা হোলে, পাকা-পাকি একটা প্রস্তাব······

"থাক্—দরকার নেই।"

"নগদের বিষয়ে আপনি ভাববেন না; ও আমি পাঁচ থেকে তিনে নামাবোই। তিন হোলে ত আর আপনার কোন আপত্তি নেই?"

"তা নেই; কিন্তু অন্য 'তিন'-য়ে আমার আপত্তি আছে। এখানে বে দোবো না।"

বিস্ময়সূচক দৃষ্টিতে শনি ঘটক রায় বাহাদুরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। রায় বাহাদুর চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন—"তিনটে জিনিষ দেখে আমার অভক্তি জন্মে গেল; এ ছেলে চলবে না।"

"কি তিনটে জিনিষ?"

"এক হোল—লুঙ্গী, দুই হোল—বাব্‌রি চুল, তিন হোল—ফ্লাই গোঁফ। এ তিনটেতেই আমি ভয়ানক নারাজ।"

রায় বাহাদুরের মন্তব্য শুনিয়া শনি ঘটক মুস্‌ড়াইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতেই কাঞ্চন আসিয়া কহিল—"কেওটার ছেলেটি কেমন দেখে এলে? সে সব শুনবো এখন পরে। উপস্থিত কালীর মা খুব ভাল একটি ছেলের সন্ধান এনেচে। ছেলেটি মায়ের এক ছেলে। বাপ ছিল হাকিম; মারা গেছে। এখন ঐ মা-টি আর ছেলেটি। মায়ের হাতে বেশ টাকা-কড়ি আছে। কোলকাতায় না কি তিন-চারখানা বাড়ী। ছেলেটি তিনটে পাশ।"

"এদের বাড়ী কোথায়?"

"এই কালীঘাটে। কালীর মার দূর-সম্পর্কে আত্মীয় হয়।"

পরদিন দুপুর বেলা কালীর মা এ-বাড়ীতে আসিল। নীচের ঘরে পানের বাটা ও কালীর মাকে লইয়া কাঞ্চন পা ছড়াইয়া বসিল। কালীঘাটের পাত্রটির সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে নানারূপ আলাপ-আলোচনা চলিল। কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, তোমাদের সঙ্গে ওদের কি রকম সম্পর্ক?"

কালীর মা সম্মুখের রোয়াকের নীচে পানের পিক্ ফেলিয়া আসিয়া কহিল,—"একটু দূর-সম্পর্ক, দিদি! আমার ননদের নন্দাই হোল, ছেলেটির মেসোমশাইয়ের ভায়রাভাই।"

কাঞ্চন খুব খানিক হাসিয়া কহিল,—"খুব নিকট-সম্বন্ধ তা' হোলে! এ সেই 'সইয়ের বউয়ের বকুলফুলের বোন-ঝি-জামাই'কেও যে হার মানিয়ে দিলি লো, কালীর মা!"

"হ্যাঁ দিদি, বলেছি তো সম্পর্কটা একটু দূর। তবে কালী দর্শনে গেলেই আমি ওদের ওখানে যাই। এস না, এক কাজ করা যা'ক। চল, এক দিন দু'বোনে কালীদর্শনে যাই। রথ-দেখা, কলা-বেচা দুই-ই হ'বেখন।"

"তা বেশ ত, কালই চল যাই।"

"তাই চল। কি চমৎকার বাড়ী-ঘর-দোর তা'ও দেখে আসবে, ছেলেটিকেও দেখে আসবে। ছেলের মার কাছে কথাটা পেড়ে, ভাবটাও বুঝে আসতে পারবে। ছেলের মা একেবারে মাটির মানুষ। সে তোমার গিয়ে·········"

"খাঁই-টাঁই বেশী কিছু হবে না ত ?"

"এক পয়সাও খাঁই নেই। নিজেরা যে টাকার কুমীর! আর ঐ ত সবেধন নীলমণি; খালি বৌটি চায় ভাল। তা' আমাদের নমুকে দেখলেই পছন্দ হবে। যেমন ছেলে, তেমনি মেয়ে!"

"তা, হ্যাঁ লা, ছেলেটি রোগা-পট্‌কা, হাড় জির-জিরে নয় ত? সে দিন কর্ত্তা বীডন ষ্ট্রীটের........

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কালীর মা কহিল,—"রাম! রাম!—এ ছেলে হোল বলিষ্টি ছেলে! আর গায়ের রংই বা কি! চল একবার কাল.........

আর একবার পানের পিক্ ফেলিতে কালীর মা উঠিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে বেহারী চাকরকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে কালীঘাটে আসিয়া হাজির হইল। ছেলেটি বাড়ীতেই ছিল। তাহাকে দেখিয়াই কাঞ্চনের মনের ভিতরকার চক্ষু, মনের ভিতরকার কপালে ঠেলিয়া উঠিল। চুপি-চুপি কালীর মাকে কহিল—"হ্যাঁ লা, তোর এত চোখ খারাপ হোয়েচে, তা চশমা নিস্‌নি কেন?"

কিছু বুঝিতে অপারগ হইয়া কালীর মা কহিল—"কেন দিদি?"

কাঞ্চন কহিল—"তুই বল্‌লি, বলবান্ ছেলে;—এ কি লো! এ ত দেখচি, একটা মণ পাঁচ-সাত মাংসের কাঁড়ির ওপর একটা মানুষের মুণ্ডু বসানো!"

"তা, আমি যে.........

"তুই থাম্; খুব হোয়েচে। চ, কালীদর্শন কোরে সোরে পড়ি। খুব 'বলিষ্টি' ছেলের সন্ধানটা দিয়িছিলি যা'হোক্!"

অনেক বেলায় কালীঘাট হইতে বাড়ী ফিরিয়া কাঞ্চন দেখিল, বৈঠকখানা ঘরে শনি ঘটক বসিয়া রহিয়াছে। উপরে গিয়া দেখিল, রায় বাহাদুর বাহিরে যাইবার জন্য জামা-কাপড় পরিতেছেন। কাঞ্চনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন দেখে এলে?"

কাঞ্চন ও-ঘরের দিকে যাইতে যাইতে কহিল—"চমৎকার!"

রায় বাহাদুর কহিলেন—"আমি খড়দ'য় যাচ্চি, ফিরতে বোধ হয় সন্ধ্যা হ'বে।"

* * * *

খড়দহ হইতে ফিরিবার পথে, ট্রেণে বসিয়া রায় বাহাদুর চুরুট ধরাইয়া নীরবে শুধু ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিলেন, একটি কথাও কহিলেন না। লক্ষণ দেখিয়া শনি ঘটক অনুমান করিল, পাত্র নিশ্চয়ই পছন্দ হয় নাই। কোন্‌খানে অপছন্দ, কেন অপছন্দ, তাহা এখন জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহসে কুলাইল না। শুধু শিয়ালদ'র ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বরাবর বাড়ীই যাবেন ত?"

রায় বাহাদুর তাহার হাতে তাহার 'ফী' পাঁচটি টাকা দিয়া, একটু গম্ভীর, একটু বিকৃত মুখে কহিলেন—"নাঃ। এখনো বেলা আছে; একবার বরানগরে একটি ছেলে দেখে আসবো; আপনি আসুন।"

বরানগরের ছেলেটি রায় বাহাদুরের নেহাৎ অপছন্দ হইল না। এ সম্বন্ধটি ঘটক রবি ঘোষাল আনিয়াছিল। কিন্তু কাঞ্চন কহিল—"না, আমি আমার মেয়েকে ও-ছেলের হাতে কিছুতেই দোবো না। বাপের যখন হাঁপানী রোগ, তখন ভবিষ্যতে ছেলেরও হোতে পারে। কেন না, ওটা বংশ-গত রোগ কি না।"

পরদিন মঙ্গলা ঘটকীর সঙ্গে রায় বাহাদুর আন্দুল-মৌড়ী গ্রামে গিয়া একটি পাত্র দেখিয়া আসিলেন। অন্য সব বিষয়ে এই পাত্রটি তাঁহার খুবই পছন্দ হইল; কিন্তু গোলমাল বাধাইল—ছেলেটির খদ্দরের জামা-কাপড়। ফিরতি ট্রেণে বসিয়া তিনি নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি যেমনটি চান, এ 'সম্বন্ধ'টি সেইরূপ; সব দিক দিয়াই ভাল। কিন্তু সকল ভালকে সজোরে ঠেলা দিয়া 'একপেশে' করিয়া দিল—ছেলেটির পরিহিত ঐ খদ্দর।

কাঞ্চন কহিল—"তা হোলই বা—খদ্দর। আজকাল অনেকেই ত খদ্দর পরে।"

"তা ত পরে। কিন্তু এদেশে ওর বিপদও কম নয়। দরকার নেই।"

সে দিন ছিল আষাঢ়ী শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা। আকাশের কোনখানে কিন্তু মেঘের লেশও ছিল না। 'ব্ল্যাক-আউট'-গ্রস্ত কলিকাতা নগরী স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। বিয়ের দিন। সামনের পথ দিয়া আলোক-বাদ্য-কোলাহলের সঙ্গে কোথাকার এক

'বর' বিয়ে করিতে যাইতেছিল। কাঞ্চন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"নসীর বে আর হবে না! এত জায়গায় দেখা-শুনো হ'চ্ছে, কিন্তু………"

"কিন্তু কোথাও না কোথাও হ'বেই। শ্রাবণের মধ্যেই আমি ভাল জায়গায় নসুর বিয়ে দোবোই জানবে।—আচ্ছা, রবি ঘটকের সেই শ্রীরামপুরের ছেলেটি তোমার অপছন্দ হোল কেন?"

"শ্রীরামপুরের?" কাঞ্চন লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—"ওরে বাবা! দজ্জাল শাশুড়ী! নসী আমার উঠ্‌তে-বসতে খোঁটা বরদাস্ত কোরতে পারতো? ঐ শাশুড়ীর সঙ্গে কি…!"

ইহার পর আরও দুই সপ্তাহ ধরিয়া রায় বাহাদুর এখানে-সেখানে বহু স্থানে ঘোরা-ঘুরি করিলেন—যথা, উলুবেড়ে, শান্তিপুর, গোবরডাঙ্গা, নবদ্বীপ, জলপাইগুড়ি, মেহেরপুর, বহরমপুর, বনগাঁ প্রভৃতি। কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। সকলেরই একটা-না-একটা খুঁত বাহির হইয়া পড়ে। যেটি রায় বাহাদুরের পছন্দ হয়, সেটি কাঞ্চনের হয় না; আবার কাঞ্চনের যেটি হয়, সেটি রায় বাহাদুরের হয় না। কোনটি বা উভয়েরই পছন্দের বাহিরে গিয়া পড়ে। সুতরাং এত কষ্ট করিয়া এত ঘোরাঘুরি সকলই বিফল হইল। উপরন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। বনগাঁ হইতে ফিরিবার পথে, 'ব'স্' হইতে নামিবার সময় পড়িয়া গিয়া রায় বাহাদুর ডান পা ও কাঁধে দারুণ আঘাত পাইলেন। সেই ব্যথা পরদিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে শয্যাগত করিয়া ফেলিল। তাঁহাকে ডাক্তার, ওষধ, সেঁক তাপ, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতির দুর্ভেদ্য ব্যূহে পরিবেষ্টিত হইতে হইল। হাড় ভাঙ্গে নাই বটে, তবে জখম্ হইয়াছে। বুড়া বয়সের হাড়, একটুতেই কাবু হইয়া পড়ে; সারিতে সময় লাগে। ডাক্তার বলিলেন, মাস-খানেকের মত বেশী চলা-ফেরা করা মোটেই চলবে না।

কাঞ্চন কহিল—"বনগাঁর সম্বন্ধটা কি অপয়া গো! এক-বার দেখে আসতেই এই—"

রায় বাহাদুর কাঁধের ব্যথাটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—"কিন্তু সন্দেশ যা খাইয়েছিল,—ফার্ষ্ট ক্লাস! ছেলেটির চোখদুটি ট্যারা না হোলে, সন্দেশ খাবার লোভে আমি ঠিক ঐখানেই নসুর বিয়ে দিয়ে ফেল্‌তুম। অমন আধা-ছানার সন্দেশ কিন্তু তোমার কোলকাতায় ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মোড়েও মিলবে না।"

কয় দিন কাটিয়া গেল, তথাপি রায় বাহাদুরের পায়ের ব্যথা সারিল না; বরঞ্চ তাহা যেন ক্রমেই জমি গাড়িয়া বসিতে লাগিল। রায় বাহাদুর বিষম চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শ্রাবণের ভিতর নসুর বিয়ে দিতেই হইবে। নবদ্বীপের ছেলেটি মন্দ ছিল না, কিন্তু বাপটার বড্ড দেমাক! অহঙ্কারে যেন মাটীতে পা পড়ে না। আচ্ছা, 'টেরা'র চিকিৎসা নেই? ওষুধে টেরা সারানো যায় না? বনগাঁটা আর সব দিক্ দিয়েই ভাল; খালি ঐ একটু…। নসু যে রকম খুঁত-খুঁতে মেয়ে তাতে……"

সেই দিনই রায় বাহাদুর উপায়ান্তর না দেখিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। ইহাতে শনি ঘটক ভিতর-ভিতর তাঁহার উপর খুব চটিয়া গেল।

সপ্তা-খানেকের মধ্যেই বিভিন্ন স্থান হইতে খান-পনর চিঠি আসিল। রায় বাহাদুর শয্যায় শুইয়া বহু বার পত্র-গুলি পাঠ করিলেন ও কাঞ্চনকে শুনাইলেন। এক-একটি পাত্র সম্বন্ধে উভয়ে মিলিয়া বহু আলোচনা এবং গবেষণা চলিল। কয় দিন ধরিয়া বিচার-বিতর্ক এবং নির্ব্বাচনের ফলে, পত্রোক্ত পাত্রগুলির মধ্য হইতে চারি জনকে বাছিয়া লওয়া হইল,—একটি বেহালা, একটি বৈষ্ণবাটী, একটি শ্যামবাজার, একটি শিবপুর।

কাঞ্চন কহিল—"মামাকে খবর দেওয়া যা'ক। ছেলে চারিটির বিষয়ে ত ভাল করে খবর-পাতি নেওয়া দরকার। এ কাজ শিবু মামা ছাড়া আর কারো দ্বারা হবে না।"

শিব বাবু রায় বাহাদুরের অপেক্ষা বয়সে ছোট রায় বাহাদুর কহিলেন—"আমিও সেই কথা ভাবছিলুম শিবুকে একখানা চিঠি দিই। সে এখন দিন-কতক এখানে এসে থাকুক।"

দিন চারি-পাঁচের মধ্যেই বর্দ্ধমান হইতে শিব বাবু আসিয়া পড়িলেন। তখন তিন জনে মিলিয়া মানসীর পাত্রনির্ব্বাচন কার্য্যে শলা-পরামর্শ এবং ব্যবস্থা বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল।

* * * *

বেহালা ও শিবপুর বাতিল হইল। উভয় স্থলেই অপ্সরাতুল্য রাজকন্যার সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্বের খাঁই! রায়

বাহাদুর কহিলেন,—"আমি হলুম—রায় বাহাদুর; রাজা বাহাদুর হ'লে না হয় আধখানা রাজত্বই দিতুম। তা' ছাড়া, পৃথিবীর লোক আমি, অপ্সরাই বা জোটাই কোত্থেকে!"

শিব বাবু কহিলেন,—"ছাড়ান্ দাও, ছাড়ান্ দাও। বদ্দিবাটী আর শ্যামবাজারটা দেখে আসা যা'ক।"

অতঃপর দুইটিই দেখিয়া আসা হইল এবং এই দুই স্থানের পাত্রই প্রথমে শিব বাবুর এবং পরে শিব বাবুর মুখে শুনিয়া, রায় বাহাদুর ও কাঞ্চনের পছন্দ হইল। বৈদ্যবাটীর পাত্রটি এম, এ; দেখিতে রূপবান্, বেশী খাঁই নাই; বংশও বনিয়াদী; বাপ আছে—মা নাই। শ্যামবাজারেরটি বি-এস্-সি; রংটা শ্যামবর্ণ হইলেও স্বাস্থ্য অতি সুন্দর; বাপ-মা নাই; মামা অভিভাবক; মামার সন্তানাদি নাই; তাঁর অবর্ত্তমানে ভাগিনাই তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। ইঁহাদেরও খাঁই সম্ভবমত।

উভয় পাত্রপক্ষই কন্যা দেখিয়া খুসী হইলেন। পাত্রী-পক্ষও বৈদ্যবাটী ও শ্যামবাজারের ভদ্র এবং অমায়িক ব্যবহারে সবিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। বৈদ্যবাটীর বেয়াই কহিলেন,—"এমন কন্যাকে ঘরে নিয়ে যেতে পারলে সংসারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে।" শ্যামবাজার কহিলেন,—"গভর্ণমেণ্ট যাঁকে খাতির কোরে মান দিয়েছেন, আমাদের তিনি মাথার মণি; তাঁকে কুটুম হিসেবে পেলে আমাদের সৌভাগ্য।"

এই দুই পাত্রের মধ্যে একটিকে নির্ব্বাচন করা একটা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িল।

রায় বাহাদুর কহিলেন,—"শ্যামবাজারের ছেলেটিকেই দেোয়া যা'ক। 'বি-এস্-সি' আছে, যে-কোন লাইনে গিয়ে উন্নতি করতে পারবে। কিন্তু বদ্যিবাটীর ছেলেটিও খাসা ছেলে। তবে কি না…… .."

কাঞ্চন কহিল,—"বদ্যিবাটির সঙ্গেই কথা পাকা কর। বনেদী বংশের ছেলে। তবে কি না, নমু আমার শাশুড়ীর যত্ন-আদর কিছু পাবে না।"

রায় বাহাদুর কহিলেন,—"সে কথা ঠিক; সে-হিসেবে শ্যামবাজারে তোমার না পাবে শ্বশুর, না পাবে শাশুড়ী।"

রায় বাহাদুর একটা পয়সা লইয়া 'টস্' ফেলিলেন। উঠিল—বৈদ্যবাটী। কাঞ্চনও ঐরূপ ফেলাতে, পড়িল—শ্যামবাজার।

মহা সমস্যা!

শিব বাবু কহিলেন,—"বদ্যিবাটীতেই দাও। পাড়াগাঁর ছেলে, অত বাবু বা বিলাসী হবে না। নমু সুখে থাকবে। আজকাল কোলকাতায় থাকার বিপদ দেখচ ত? বদ্যিবাটী তোমার সহরকে সহর, পাড়াগাঁকে পাড়াগাঁ।"

সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে শ্যামবাজারের মামা হঠাৎ এ বাটীতে আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে এবং সবিনয়ে রায় বাহাদুরকে নমস্কার জানাইয়া কহিলেন,—"ব্ল্যাক আউট্, তবু না এসে পারলুম না। আপনি মহাশয় লোক; আপনার সঙ্গে যখন কথা কয়িছি, তখন আপনার অনুমতি না নিয়ে অন্যত্র কথা দিতে পারি নে। ভাগনেটির কোন্নগর থেকে একটি সম্বন্ধ এসেচে। একটু লোভের সম্বন্ধও বটে। কিন্তু লোভের চেয়ে কথাটাই আগে। কথা যখন প্রথমেই আপনার সঙ্গে কয়িচি, তখন…। তা' ছাড়া কন্যাটি আপনার সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী। সুতরাং………"

সুতরাং কি করা যায়, রায় বাহাদুর মুস্কিলে পড়িলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ে কথাবার্ত্তা হইবার পর, রায় বাহাদুর কহিলেন,—"দেখুন, যা' হয় ঠিক কোরে কাল প্রাতেই আপনাকে খবর পাঠাবো।"

"তাই পাঠাবেন। আমি তা' হলে বিকেলের দিকে কোন্নগরে খবর পাঠাতে পারবো। সে যা হোক, আপনার পায়ের ব্যথাটা কি রকম বলুন। আমার কাছে বছর ৭০রের পুরোনো ঘি আছে। কাল যিনি যাবেন, তাঁর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দোবো। বেশ ভাল কোরে ঐ ব্যথার জায়গায়……"

অতঃপর নমস্কারান্তে শ্যামবাজারের মামা শ্যামবাজার চলিয়া গেলেন।

রাত্রে উপরের ঘরে রায় বাহাদুর, কাঞ্চন ও শিব বাবু—এই তিন মাথার পরামর্শ-বৈঠক বসিল এবং সর্ব্ববাদি-মতে স্থির হইল যে, শ্যামবাজারের ছেলেটির সঙ্গেই বিবাহ দেওয়া হইবে। পরদিন প্রাতঃকালেই রায় বাহাদুর এই সংবাদের সহিত শিব বাবুকে শ্যামবাজারে পাঠাইয়া এত দিন পরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন ও শয্যায় কাত্ হইয়া শুইয়া মুখের চুরুটটা ধরাইলেন।

শিব বাবুকে দিয়া বলিয়া দিলেন যে, আগামী পরশুই পাকা দেখা হইবে।

বৈকালের দিকে বাতাস সহসা ঘুরিয়া গেল। কাঞ্চন মুখখানা ভার করিয়া রায় বাহাদুরের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল—"দেখ, আমি অনেক ভেবে দেখলুম। এখানে নমুর বিয়ে দোবো না।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে কাঞ্চনের দিকে চাহিয়া রায় বাহাদুর কহিলেন—"কেন বল ত?"

"বদ্দিবাটির ছেলেটির মা না থাকলেও বাপ ছিল; কিন্তু এর মাও নেই, বাপও নেই। মামার ভাগনে। সংসারে গিন্নী হোল মামীশাশুড়ী। নমুর আমার আদর-যত্ন ত হবেই না, বরং উল্টোটাই হবে।"

"আমিও ঠিক সমস্ত দিন ধরে ঐ কথাটাই ভাবছিলুম, কাঞ্চন! দরকার নেই এখানে বে দিয়ে। শিবু এখনি গিয়ে খবর দিয়ে আসুক।"

সুতরাং তখনি শিব বাবুকে আবার শ্যামবাজারে ছুটিতে হইল। যাইবার সময় রায় বাহাদুর তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন ও শ্যামবাজারের পুরাণো ঘিয়ের শিশিটা ফেরত পাঠাইলেন।

* * * *

ভবিতব্যের কথা কেহই বলিতে পারে না। কাহার বিয়ের ফুল কোথায় যে ফোটে, কাহার হাঁড়িতে কে যে চা'ল দিয়া রাখে, তাহা পূর্ব্বে কাহারো জানিবার সাধ্য নাই।

মানসীর সত্যকারের বিয়ের ফুল এত দিন পরে ফুটিয়া উঠিল—ভবানীপুরে। রবি, মঙ্গল প্রভৃতিকে জোর ধাক্কায় ঠেলিয়া দিয়া, শনি অপূর্ব্ব দক্ষতায় এবং গৌরবে এই ফুল ফোটাইয়া তুলিলে এত দিনের এত ঘোরাঘুরি, পয়সা নষ্ট, সময় নষ্ট, পা-ভাঙ্গা,—সব এইবার সার্থক হইল। কত জায়গায় যে এ-পর্য্যন্ত যাওয়া হইয়াছে, তাহার আর হিসাব নাই! আজ আহারান্তে রায় বাহাদুর সেই সব কথাই ভাবিতেছিলেন। রাণাঘাট, বাগবাজার, বীডন ষ্ট্রীট, সালখিয়া, বেহালা, হুগলী, কেওটা, কালীঘাট, খড়দ', বরানগর, আঁদুল-মৌড়ী··· উঃ! কত জায়গায় যে ঘুরতে হোয়েচে! তার পর শ্রীরামপুর, চুঁচ্ড়ো, উলুবেড়ে, শান্তিপুর, মেহেরপুর, নবদ্বীপ, গোবরডাঙ্গা, বহরমপুর, জলপাইগুড়ি···বাপ্ রে বাপ্! কোথাও আর বাকী নেই! বন-গাঁর কথা ত চিরকাল মনের মধ্যে আর পায়ের সঙ্গে গাঁথা হোয়েই থাকবে! সন্দেশও খেয়ে এলুম বটে, কিন্তু তার বদলে পা-টি চিরদিনের জন্যেই হয় ত বা গেল। উঃ! কি হাড়ভাঙ্গা ভোগান্তি! কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও ফ্যাসাদ কি কম! দিনকতক বাড়ী যেন বেকার আই-বুড়োদের নাম রেজিষ্টার আফিস হোয়ে উঠলো! কত জায়গার কত চিঠি আর কত ফটো!··যাক্, এত দিনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।—মনে মনে শনি ঘটককে তিনি অজস্র ধন্যবাদ দিলেন।

কাঞ্চন রায় বাহাদুরের পায়ে ওষুধ মালিস করিতে করিতে কহিল—"যাক্ বাবা—বাঁচা গেল! যেমনটি আমার সাধ ছিল, তেমনটিই ভগবান জুটিয়ে দিলেন!" কাঞ্চনের মুখে আজ তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল।

শিব বাবু কহিলেন—"জামাই বোলে গর্ব্ব করবার জিনিস বটে!" মানসীকে তিনি আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন—"এত দিন তুই আমায় আশা দিয়ে রেখে, নাতনী,—শেষে এই তোর বিচার হোল! আমার ভরা বুক খালি কোরে দিয়ে তুই কি না শেষে···!"

"যা--ন্, আপনি ভা—রী—" বলিয়া মানসী চকিতে পলাইয়া গেল।

ছেলেটি এম-এস্-সি। মা-বাপ নাই। খুড়া রজনী বাবু তাহাকে পুত্রাপেক্ষা ভালবাসেন। নাম—কার্ত্তিক; রূপও কার্ত্তিকের মত।

শিব বাবু কাল কোন' অছিলায় ছেলেটিকে গোপনে এ-বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর তাহাকে দেখিয়া দু'-একটি কথা কহিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ছেলেটি চলিয়া গেলে, কাঞ্চনকে তিনি কহিলেন,—"ভগবান কোথা দিয়ে, কখন মনের বাসনা যে পূর্ণ করেন, তা আগে থেকে কা'রো জানবার উপায় নেই! এবার তোমার পছন্দ কি না বল?"

পরিতৃপ্তির আনন্দে কাঞ্চন নীরবে মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল।

কাঞ্চন কহিল,—"সব চেয়ে কি সুবিধে জান? নমুকে ছেড়ে আমায় থাকতে হবে না। ছেলের যে বাপ-মা

নেই, ভালই হোয়েচে। এইখানেই কার্তিক থাকবে। কার্ত্তিক না-কি মামার কাছে এ-সম্বন্ধে একটু আঁচও দিয়েছে। আমার যেমন ছেলে নেই, তেমনি……।"

রায় বাহাদুর উৎফুল্ল অন্তরে কহিলেন,—"সে ত' ভালই হয়। এ-দিকেও এম্-এস্ সি আছে। আমি ওকে 'জন রোল্যাণ্ডে'র আফিসে একটা মোটা মাইনেতে বসিয়ে দিতে পারবো।"

দু'-এক দিনের মধ্যেই পাকা দেখা হইয়া গেল। আগামী ১৭ই বিবাহ।

বিবাহ উপলক্ষে রায় বাহাদুরের দু'-দশ জন আত্মীয়-স্বজন আসিয়া শুভকর্ম্মে আনন্দ বাড়াইয়া তুলিলেন। রায় বাহাদুরের পা সম্পূর্ণ না সারিলেও তিনি লাঠি ধরিয়া এ-ঘর-ও-ঘর করিতে পারেন। তিনি তাহাই করিতেছেন। কাঞ্চন ও শিব বাবুর খাটুনির অন্ত নাই। আত্মীয়-স্বজন যাঁরা আসিয়াছেন, সকলেই কর্ম্মব্যস্ত। শুধু সোনারপুরের নিভার মা, এক কোণের একটি ঘরে চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। কাল এ-বাড়ীতে আসিয়াই তাহার জ্বর হইয়াছে।

নিভার-মা কাঞ্চনের দূর-সম্পর্কীয়া বোন হয়। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তাহার খবর লইতে কাঞ্চনের ভুল হইল না। কাঞ্চন তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"জ্বরটা কমেছে দিদি?"

নিভার-মা কহিল—"এখন একটু কম; বেলায় বোধ হয় বেশী কোরে আসবে এখন। ম্যালোয়ারী কি না; শ্রাবণ-ভাদ্রর এই সময়টাতে একেবারে চেপে ধরে। নিভাও ত' আমার সেখানে জ্বরে পোড়ে। তাই তাকে আর আনতে পারলুম না।"

"কোথায় তার বে দিলে দিদি?"

"ঐ আমাদেরই ওই দিকে,—জগদ্দলে। বিয়ের কথা আর বোলো না। পয়সা-কড়ির ত জোর নেই, তাই কোন রকমে…

"ছেলেটি কি করে?"

"টো-টো কোম্পানী। লেখা-পড়া কিছুই জানে না, একেবারে গণ্ড-মুখ্যু, তা কাজ হবে কোত্থেকে? যেমন নিভার অদেষ্ট!"

কাঞ্চন সমবেদনার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

বিয়ের দিন উৎসব ও আনন্দের কোলাহলে সারাবাড়ী মুখর হইয়া উঠিল। কোণের ঘরের শয্যায় পড়িয়া নিভার-মা অসুস্থ দেহ-মন লইয়া ভাবিতে লাগিল—'লক্ষ্মীমন্ত আর লক্ষ্মীছাড়াতে এতই তফাৎ। এ-ও বে, আর আমার নিভারও বে হোল! এ-ও জামাই, আর আমারও জামাই! একেই বলে—ভাগ্য! উঃ!'—ধীরে-ধীরে একটা বেদনার নিঃশ্বাস নিভার-মার বক্ষ ভেদ করিয়া ঘরের বদ্ধ বাতাসের সঙ্গে মিলাইয়া গেল।

লগ্ন ছিল—দশটা সাঁইত্রিশ মিনিটে। শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। সকলেরই মুখে উৎসাহ ও আনন্দ। রং-বেরংয়ের প্রীতি-উপহারের কাগজ সকলেরই হাতে। তন্মধ্যে শিব বাবুর দেওয়া উপহারের কাগজখানিই বিশেষরূপে সকলের মনযোগ আকৃষ্ট করিল। তাহা এই :—

ঠাকুর্দ্দার ব্যথা

(ফার্সী বয়েৎ)

রমাআ সীনমা নীরা রয়েদঙ্গ
। রঘ রমাআ য়াড়িছা
রেমাআ লজ্জিত্য রেপ নদি তএ
। রব নতুনো লরিব'

বেশীর ভাগ অভ্যাগতই এই ফার্সী বয়েৎ-এর মানে বুঝিতে পারিল না। তন্মধ্যে যাহারা চতুর, তাহারা বলিলেন—"ফারসী কবিতা কি-না, উল্টো দিক থেকে পড়তে হবে।"

গর্ব্বিত-বক্ষে শনি ঘটক চারি দিকে তদারক করিতে লাগিল। তবে দুঃখের বিষয়, আজ তাহার শরীর কথঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং সকাল-সকাল কিছু সন্দেশ-পান্তুয়া-লেডিকেনি-দরবেশ-রাবড়ী উদরসাৎ করিয়া এবং ঘটক-বিদায়ের তিন শত টাকা লইয়া বাসায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

মধ্যরাত্রে দ্বিতলের দক্ষিণ দিকের বড় ঘরখানার মধ্যে 'বাসর' বসিল। নব-জামাতাকে লইয়া মেয়েরা আমোদ-আহ্লাদে মাতিয়া গেল। কাঞ্চনও আশ-পাশে আড়ালে



থাকিয়া এ আনন্দের স্বাদ উপভোগ করিতে ছাড়িল না। ইহারই ভিতর সে একবার নিভার-মার কাছে আসিল। নিভার-মার তখন জ্বর ছাড়িয়া আসিতেছিল। কাঞ্চন কহিল—"দিদি, একবার আস্তে আস্তে উঠে জামাই দেখে আস্‌বে না? জামাইকে আমার একটু আশীর্ব্বাদ করবে চল দিদি!"

টলিতে টলিতে নিভার-মা 'বাসরে' ঢুকিল। ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো, এ যে কার্ত্তিক!"

"কার্ত্তিকই ত। তুমি অমন ক'চ্ছ কেন?"

"আমার জামাই যে গো! আমার নিভার·········!"

সহসা যেন সকলে আকাশ হইতে পড়িল। অত আনন্দ-কোলাহল মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল। হাজার-বাতির ঝাড় যেন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় নিমেষে নিবিয়া গেল!

* * * *

"তাহ'লে রজনী বাবু তোমার আপনার খুড়ো নয়?"

"না।"

"তোমার দেশ কোথা?"

"জগদ্দল।"

"ওঁর ওখানে কত দিন আছ?"

"প্রায় বছর-খানেক হ'বে।"

ভোর রাত্রে, একটি নির্জ্জন ঘরের মধ্যে বসিয়া রায় বাহাদুর ও নূতন জামাতা কার্ত্তিকচন্দ্রের মধ্যে কথা হইতেছিল। রায় বাহাদুরের মুখে রাগ, দুঃখ, হতাশা একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; হাতে তাঁহার ধরানো চুরুটটা ক্রমেই নিবিয়া আসিতেছিল। জামাতার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন—"তা'হলে তোমার 'এম-এস্‌-সি'টাও ভূয়ো নিশ্চয়?"

ঘাড় হেঁট করিয়া কার্ত্তিক কহিল—"না, ওটা ঠিকই।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"তবে, ইউনিভার-সিটির ডিগ্রী ওটা নয়।"

"তবে?"

"আমরা ভবানীপুর 'সাউথ ক্লাবে'র মেম্বার কি না, তাই।"

রায় বাহাদুর কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া আবার থপ্ করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

রবি-প্রয়াণ

বাণীর আশিসে সোনার তুলিকা হাতে,
তুমি এঁকেছিলে শারদার মুখছবি;
মন-ভোলা গান গেয়েছিলে বীণা লয়ে,
মরমের কোণে সুখ-দুখ দিয়ে কবি!
তোমার 'সাধনা' দেবীর চরণতলে,
সার্থক শুধু তোমার পুণ্যবলে।
গভীর আঁধার মোদের ভুবন ঘিরে
ছল্-ছল্ আঁখি, ভাসিছে অশ্রুনীরে
তোমার পূজারী, দীনতার বেশে
চয়ন করিয়া ব্যর্থ মুকুতামালা;
দেউলের দ্বারে নিরাশ প্রাণের
স্মৃতি-মূর্চ্ছনা নিয়ে, রেখেছে সাজায়ে ডালা।
তুমি এনেছিলে মর্ত্ত্যভূমিতে স্বরগের সুধাধারা
আমাদের লাগি', কল্যাণ মাগি' স্নেহটুকু দিয়ে ঘেরা
তোমার পরশ, কবিতার মাঝে দিয়েছ,
আমাদের তুমি আপনার ক'রে নিয়েছ।

গ্রাম্য 'বধূ'র সকরুণ আঁখি দু'টি,
দিনের শেষে যে উঠিয়াছে আজ ফুটি';
গোধূলির ছায়া হ'য়ে এল ঐ ম্লান,
কবিজীবনের আজি এই অবসান;
সেই পুরাতন সুরে কারা ডাকে "জল্‌কে চল্?"
নয়নের কোণে ঝর্-ঝর্ ঝ'রে অশ্রুদল।
তোমার 'স্বপ্ন' স্মৃতি দিয়ে আজ ঘেরা
দিবসের শেষে মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে
সিপ্রানদীর কলতান ভেসে আসে
প্রিয়ার আনত মুখখানি পড়ে মনে।
তাজমহলের মর্ম্মরতলে একটি জোছ্‌না-রাতে
প্রদীপের মালা দিয়েছিলে তুমি সাজায়ে আপন হাতে,
তুমি দিয়ে গেছ 'শা-জাহানে' সেই চির-অমরতা বর,
চিরদিন ভবে কীর্ত্তি তোমার রবে অবিনশ্বর।
আশা নিরাশায়, পথে ও বিপথে ধ্রুবজ্যোতি সম তুমি,
তোমার পরশে আমরা ধন্য, ধন্য জনমভূমি।

শোকাকুল হ'য়ে আজি সারা দেশ মিলেছে আনত শিরে,
"এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।



স্বামি-স্ত্রীর কলহ। হাতাহাতি হইবার সম্ভাবনা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিলে পুত্রকন্যাগণ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া আতঙ্ক-বিস্ফারিতনেত্রে সেই রণপয়োধির লহরী লীলা নিরীক্ষণ করিতেছিল।

বেচারাদের ওষ্ঠে ভাষা নাই; আননে শুধু আতঙ্কের ছায়া।

এই খণ্ড-প্রলয়ের হেতু—স্বামী পরাশর আফিস হইতে প্রাপ্ত একশো টাকা বেতনের পাঁচটা টাকা গাফ্ করিয়াছেন! পূর্ব্ব-মাসেও এইরূপ তিন টাকা কম পড়িয়াছিল! কিন্তু পত্নী নীহারের সুতীক্ষ্ণ জেরায় পরাশরের জবাবগুলা অসংলগ্ন হইয়া কাঁসিয়া যাইতেছিল! একবার বলেন,—'আফিসের ধার শোধ করেছি; আবার বলেন, 'পকেট হ'তে নোট ক'খানা পড়ে গেছে'—ইত্যাদি—তখন এক টাকার নোট চলিতেছিল, উহা সহজেই হারায়।

নীহার উগ্র-স্বরে কহিল,—'ঘোচাচ্ছি তোমার আবোল তাবোল বুলি,—দেখাচ্ছি মজা!' বলিয়াই সে দৌড়াইয়া আল্‌নার নিকট গেল, এবং পরাশরের আফিসের পোষাক—কোট, প্যাণ্ট, সার্ট, বেড়াইতে যাইবার গরদের পঞ্জাবী, কোঁচান ধুতি প্রভৃতি পরিচ্ছদ-গুলি টানিয়া আনিয়া এক বাল্‌তি জলে ডুবাইয়া দিল।

ক্রোধের আতিশয্যে মানুষ পাগলের ন্যায় আচরণ করে; কিন্তু নীহারের এই অদ্ভুত অশিষ্ট আচরণটা নৃশংস অত্যাচার বলিয়াই পরাশরের মনে হইল। ধোপদস্ত ইস্ত্রি-করা পরিচ্ছদগুলার এমন দুঃসহ দুর্গতি তাঁহার বুকে যেন শেলাঘাত করিল! নিমেষে পরাশর ক্ষেপিয়া উঠিলেন; এবং হাতের কাছে যা-কিছু পাইলেন, সমস্তই ছুড়িয়া ভাঙিয়া তচ্‌-নচ্ করিয়া একটা লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড করিয়া বসিলেন।

কাচের গ্লাস, চায়ের কাপ প্রভৃতি ভঙ্গুর পাত্রগুলার দুর্দ্দশা দর্শনে পুত্র-কন্যারা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

নীহার কিন্তু এতটুকু ভীত বা পশ্চাদ্‌পদ হইল না। মহিষমর্দ্দিনী যেন সংগ্রামে নাচিতেছেন! গর্জ্জিয়া কহিল,—'ভাঙচো, ভাঙো! তুমি রাখলেও, আমি রাখবুম্ না! আজ ঘরে আগুন দেব—কেরাসিন ঢেলে তা'তে আগুন লাগিয়ে সব পোড়াব, তার পর—'

পরাশর চমকিয়া উঠিলেন। অগ্নি-ভয়টা তাঁহার বড্ড বেশী; বাল্যকালে দেশের বাড়ীতে তিনি একবার বৈশ্বানরের রুদ্রলীলা দর্শন করিয়াছিলেন। অগ্নির সেই সর্ব্বগ্রাসী দৃশ্য মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল; রুদ্ধ-স্বরে কহিলেন, 'আগুন? আগুন লাগিয়ে—'

'হ্যাঁ দেব! হ'শো বার দেব! কে আমাকে আট্‌কাবে? রাত্তিরে যখন সকলে ঘুমিয়ে থাকবে, সেই সময় সব পুড়িয়ে মারব! তার পর মা গঙ্গা আছে—তার কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে'—এই পর্য্যন্ত বলিয়া উত্তেজনায় সে হাঁপাইতে লাগিল।

পরাশরের ক্রোধের মাত্রা কয়েক ডিগ্রী নামিয়া আসিল। তিনি কহিলেন—'কি রকম? পাঁচ টাকা কম হ'লে কি সংসার চলে না?'—কণ্ঠে তাঁহার আপোষের সুর।

দৃপ্ত স্বরে উত্তর হইল, 'না, চলে না! আমি কত কষ্টে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে চালাই—তা যিনি দিন রাত্তির কর্ত্তা—তিনিই দেখছেন; তিনিই বিচার করবেন! আমার এত কষ্টের টাকাগুলা আমোদে উড়িয়ে দেওয়া!'

একে অগ্নিভয়, তাহার উপর অভিসম্পাতের হুঙ্কার! ক্রোধে, ক্ষোভে পরাশরের মনে গৃহের প্রতি, পুত্র-কলত্রের প্রতি ধিক্কার জন্মিল!

চীৎকার করিয়া তিনি কহিলেন—'আমোদ ক'রেছি? বেশ, নিজের উপার্জ্জনের টাকায় আমোদ করেছি,—আমার ভারী অপরাধ! মাইনের পাঁচটি টাকাতেও আমার কোন দাবী নেই? মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে তবে উপার্জ্জন হয়, সে জন্য এত লাঞ্ছনা! ছি! ছি! এর চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়া ঢের ভাল! এর নাম,—

সংসার সুখের আগার,—
দারা-সুত সবে স্নেহ-পারাবার—

যৌবনে পরাশর কবিতা লিখিতেন। ছাত্রজীবনে লুকাইয়া কিছু দিন বেলুড় মঠেও আনাগোনা করিয়াছিলেন, মহাপুরুষ-সঙ্গও হইয়াছিল;—তার পর শতকরা পঁচানব্বই জনের ভাগ্যে যাহা হয়,—চাকরী, বিবাহ, এবং 'বিয়ে কল্লেই পুত্র-কন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা!'

চড়া-সুরেই তাঁহার ভার্য্যা কহিল,—'তাই যাও না! আমি কি একটা দিনও তোমায় থাকতে বলেছি? তুমি বিবাগী হও, সন্ন্যাসী হও, উদাসী হও, যা খুসী হও;—না যাও তো দিব্যি রইল।'

উঃ! কুকুর-বিড়ালের মত নির্দ্দয়, মমতাহীন বিতাড়ন! পরাশর আর সহ্য করিতে পারিলেন না। দেয়ালের কোণে সংরক্ষিত ছাতাটা লইয়া, জুতার মস্-মস্ শব্দ তুলিয়া 'সংসার সুখের আগার' ছাড়িয়া বিবাগী হইবার উদ্দেশ্যে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ঘড়িতে ঠং করিয়া রাত্রি একটা বাজিয়া গেল,—তখনও পরাশরের দেখা নাই! ঢাকা দেওয়া খাবারগুলা পড়িয়া আছে। নীহার একবার শুইতেছে, একবার বসিতেছে,—মন তাহার অস্থির, উদ্বিগ্ন!

নীহার আসিয়া জানালায় দাঁড়াইল। সুপ্তিমগ্ন পাড়া আলোক-নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্লান, যেন জড়তাপূর্ণ বিষাদে চারি দিক আচ্ছন্ন হইয়াছে। সম্মুখের বাড়ীখানা হরি বাবুর; তাঁহার রুদ্ধ সদর দরজায় একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেই নীহার চমকিয়া উঠিল। কে লোকটা?—এমন বর্ষার রাত্রিতে রুদ্ধ গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া কড়া নাড়িতেছে!—উৎসুকনেত্রে নীহার সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

কড়া-নাড়ার শব্দের সহিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—'ও-বৌদি? ও-মন্টু, মাধব, গোপাল—'

বিকৃত-স্বর হইলেও নীহার বুঝিল,—স্বয়ং গৃহস্বামীই ঐ ভাবে ডাকাডাকি করিতেছেন।

সঘন কড়া-নাড়ার সহিত কণ্ঠস্বর এবার উদারা, মুদারা ছাড়িয়া তারায় উঠিল,—"ও-বিভা; ও-মাধব, মণ্টুর মা, তোরা সব মরেছিস্ না কি? কারও সাড়া নেই—এই সন্ধ্যের সময়?"

উত্তর শোনা গেল,—'কেউ মরেনি, তুমি ছাড়া—'

গলার আওয়াজ শুনিয়া নীহার বুঝিল, মণ্টুর-মার কণ্ঠস্বর!

হরি বাবুর স্ত্রী মালতী পাড়ায় 'মণ্টুর মা' নামে পরিচিতা।

খিল খুলিবার শব্দ শুনিয়া নীহার বুঝিল,—মালতী স্বামীকে দুয়ার খুলিয়া দিল। সে ভয়ানক বিস্মিত হইল। মালতী সপ্তাহ কাল ধরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে—আজই সকালে বিভা আসিয়া তাহার নিকট হইতে দুইটা টাকা ধার লইয়া গিয়াছে।—সেই মণ্টুর-মাকে এই জল-ঝড়ের রাত্রিতে উচ্ছৃঙ্খল মাতাল স্বামীর জন্য দুর্ব্বল দেহে বিছানা হইতে উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিতে হইল! উঃ! কি দুর্ভোগ—কি অসহ্য জীবনযাত্রা! নীহার আর সে স্থানে দাঁড়াইল না; সরিয়া-আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। একের অভাবে সমস্ত দিনটা যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে! বালিসে মাথা রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া নীহার নিজের দাম্পত্য-জীবন, ঘর-কন্নার কথা ভাবিতে লাগিল। আজ সারাদিন সে ক্রোধে রাঙা হইয়া এই সকল কথাই ভাবিয়াছে,—মন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া তাহাকে একান্ত অভাগিনী বলিয়াই অভিহিত করিয়াছে। এখন সহসা তাহার মনে হইল, সংসারের অনেক নারীর চেয়ে তাহার সুখ-সৌভাগ্য হয় তো বেশী।

হঠাৎ একটা নিদারুণ আর্ত্তনাদে ও সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনের রোলে নীহার চমকিয়া উঠিল! ত্রস্ত ভাবে সে সেই দিকের জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, মনে-মনে বলিল, ও কি! কান্নাটা যে হরি বাবুর বাড়ী হইতেই আসিতেছে,—এরই মধ্যে সেখানে কি হইল,—তবে কি মালতী—আহা, সে বুঝি মুক্তি পাইয়াছে! নির্ম্মম, অত্যাচারী, উচ্ছৃঙ্খল স্বামী তাহার! জীবনে মালতীর শান্তি ছিল না; আজ সে সত্যই জুড়াইল! কিন্তু আহা, মণ্টু যে এক-বছরের অসহায় শিশু—

নীহারের বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল। এ-কি! ছেলে-মেয়েরা অমন করিয়া 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া কাঁদিতেছে কেন? হরি বাবু তো একটু আগেই টলিতে টলিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন!

মেঝের বিছানায় শায়িতা নিদ্রিতা কন্যাকে ঠেলিয়া নীহার কহিল,—'মানসী, হরি বাবুর বাড়ীতে কে মারা গেল রে?'

মেয়ে অঘোরে ঘুমাইতেছিল, মায়ের ঠেলাঠেলিতে চক্ষু মেলিয়া কহিল, 'কি?'

—'ও-বাড়ীতে কে মারা গেল, বলতে পারিস্?' বাহিরে ঝম্-ঝম্ বৃষ্টির শব্দ, তাহার মাঝে কান্নার রোল!—একটু কান পাতিয়া থাকিয়া 'আমি জানিনে', বলিয়া মানসী পাশ-ফিরিয়া শুইল। এবং মুহূর্ত্তমধ্যে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

"বাবা কি ঘুম!" বলিয়া বিরক্তিভরে নীহার ছেলে-মেয়েদের বিছানার এক পাশে শুইয়া প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই নীহার সংবাদ লইয়া জানিল,—স্বয়ং হরি বাবুই ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় এই শোচনীয় ফল!

হঠাৎ নীহারের মনে হইল,—মদ্যপ হোক, দুশ্চরিত্র হোক, তবু তো স্বামী,—আহা, আজ মালতীর চক্ষুতে জগৎ-সংসার অন্ধকার! উঃ! কি নিদারুণ দুর্দ্দিন! কি দুঃসহ অবস্থা তাহার!

নীহার থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—পুত্র-কন্যাকে তুলিয়া কহিল,—'তোরা মামার বাড়ী যা, পুলিশে যা, রেডিওতে খবর দে, ও কাল রাত্রে বাড়ী আসেনি! বাবা কি পাষাণ ছেলেমেয়ে—নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে?'

হর্ষ কহিল,—'বাঃ, তুমি ঝগড়া করলে কেন?'

'ঘাট হয়েছে বাবা! এই নাক মলচি, কান মলচি! আর যদি কিছু বলি কক্ষণ—' নীহার কাঁদিয়া ফেলিল।

ছেলে-মেয়ে অবাক্! মা পাগল হইল না কি!

যে ভার্য্যা পাঁচটা টাকার জন্য স্বামীকে পোড়াইয়া মারিবে, গৃহে আগুন দিবে বলিতে পারে, অমন দুর্মুখা, দুঃশীলা, উগ্রস্বভাবা নারীর মুখ জীবনে কখন দেখিবেন না—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরাশর হন্-হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিতেছিলেন, এবং বারবার মনে মনে বলিতেছিলেন,—যদি তিনি পুরুষ-বাচ্চা হন্, এ-সঙ্কল্পের নড়-চড় হইবে না। পরাশর দেখাইবেন, "মরদের বাত, হাতীর দাঁত!" মাহিনার একশোটি টাকাই তিনি দয়া করিয়া পত্নীর হাতে তুলিয়া দেন, তাই সে কর্ত্রী!—আসলে সে নারী—দাসী মাত্র!

বাস্! এমনি তর্কের মালা মনের মধ্যে গাঁথিতে গাঁথিতে পরাশর অগ্রসর হইতেছিলেন; সেই সময় হঠাৎ সম্মুখে পড়িল, আফিসের নরেশ! হাতে তাহার একজোড়া গঙ্গার ইলিশ;—সে অন্য হাত তুলিয়া পরাশরকে নমস্কার করিয়া কহিল,—'আরে ভাই, গঙ্গার ইলিশ আজ ভারী সস্তা!—আপিসের ছুটী, তোফা চলবে, তুমিও যাচ্ছ না কি—'

'হাঁ—দেখি' বলিয়া পরাশর মাছ-দুটোর প্রতি লুব্ধ কটাক্ষ-পাত করিয়া ভাবিলেন, তোফা মাছ! লোভটা সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হইল; কিন্তু মুহূর্ত্তে তাহা সম্বরণ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। ক্রোধ, লোভ, মোহ, প্রভৃতি বৈরাগ্যের পথে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে, এবং পথ বিঘ্নসঙ্কুল করে।

কিছু দূর চলিবার পর হঠাৎ এক সাহেব-বেশধারী বাঙ্গালী তাহার মোটরের গতিরোধ করিয়া ডাকিল, 'হ্যালো, পরাশর যে!'

পরাশর চাহিয়া দেখিলেন—মোটরচালক তাঁহারই জ্যেষ্ঠ শ্যালক সন্দীপ! হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া পরাশর কহিলেন, 'সব ভাল তো?'

'হ্যাঁ, সব ভাল! আমি যাচ্ছি তোমারই ওখানে,—মানে বুড়ীকে ক'খানা সিনেমার টিকিট দেব। তা তুমি এদিকে কোথা যাচ্ছ? আফিস্ তো আজ বন্ধ। উঠে এসো আমার গাড়ীতে—'

সন্দীপ স্বয়ং মোটর 'ড্রাইভ' করিতেছিল; হাত বাড়াইয়া সে

দরজা খুলিতে যাইতেই পরাশর কহিলেন,—'আমার একটু জরুরী কাজ আছে –'

'কোন্ দিকে যাবে—'

'যাচ্ছি হ্যারিসন রোডের ওদিকে।'

'বেশ বেশ, উঠে পড়! আমিও ঐদিকে যাব—এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।'

স্ত্রীর সহিত বিরোধ করিয়া, তাহার সহোদরের গাড়ীতে আরোহণ, আবার শ্যালকটি তাহার সেই কটুভাষিণী ভগিনীর কাছেই যাইতেছে! এ অবস্থায়—

কাসিয়া পরাশর কহিলেন, 'আমাকে একবার কালীঘাট যেতে হবে।'

সন্দীপ হাসিয়া ফেলিল! 'একেবারে কালীঘাট?—এমন উস্কো-খুস্কো মূর্ত্তিতে—যাচ্ছ সেই মুকুয্যে জ্যোতিষীর ওখানে বুঝি? আজ-কাল তো আফিসের অনেক লোক সেখানে যেতে আরম্ভ করেছে—'

পরাশর প্রমাদ গণিলেন। মুকুয্যে জ্যোতিষীর অস্তিত্ব সন্দীপের বিদিত! ব্যগ্র-স্বরে কহিলেন,'কালীঘাট মানে—দক্ষিণেশ্বর' বলিয়াই সম্মুখের আগত ট্রামখানায় উঠিয়া পড়িলেন। ব্যস্ততা-বশতঃ বিদায়সূচক নমস্কার অবধি করা হইল না!

ভগিনীপতির আচরণে সন্দীপ বিস্মিত হইল। বুঝিল, পরাশর কোন-কিছু গোপন করিবার চেষ্টায় বিব্রত হইয়া এমন অসংলগ্ন কথা কহিয়াছেন, মনে-মনে হাসিয়া সে মোটর হাঁকাইতে লাগিল। আন্তরিক অভিসন্ধিটা কিছু পরাশরকে গাড়ীতে বসাইয়া জানাইবে ভাবিয়াছিল; কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন মনে মনে সাব্যস্ত করিল, তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে এতটুকুও আভাস দিবে না।

শ্যালকের কবল হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় পরাশর যে ট্রামখানাতে চড়িয়া বসিলেন, চাহিয়া দেখেন নাই—সেখানা হাইকোর্টগামী গাড়ী! কণ্ডাক্টার টিকিট দিতে আসিলে তাঁহার খেয়াল হইল—হাইকোর্টে যাইবার তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং নামিয়া যাইবেন কি না ভাবিতেছেন, হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল, 'পরাশর-দা যে! খবর কি?'

'কে তারক? তা সব ভাল তো?'

সহাস্যে তারক কহিল, 'নিশ্চয়ই ভাল, ভাল না হ'লে এই বিপুল বপু নিয়ে কোর্টে যাতায়াত কচ্ছি? বৌদি' তো ভাল আছেন? মানসীর বিয়ের কিছু ঠিক করতে পারলে?'

'মানসীর বিয়ে? কোথায় আর ঠিক করতে পারলুম? ঘর-বর দুটো এক সঙ্গে মেলে না; আর মিললে যা' দর হাঁকে, শুনে উভয় চক্ষু কপালে ওঠে!—তোমার বাড়ীর সব ভাল?'

তারক মাথা নাড়িল, 'উঁহু। সে দিকের খবর বিশেষ সুবিধের নয়। লীলার-মার হাঁপানী বড় বেড়ে উঠেছে। পুরী পাঠিয়েছি। দাদা, স্ত্রী-পোষা নয়, হাতী-পোষা!—তার উপর আবার বড়লোকের মেয়ে, কথায়-কথায় রাগ, গোঁসা! যা রোজকার, সবই ওই মহা-দেবীর শ্রীচরণপদ্মে সমর্পণ!'—তারক হাসিতে লাগিল।

সকলেরই সমান জ্বালা! গরীব বড়লোকে প্রভেদ নাই। সুতরাং এ প্রসঙ্গ চাপিয়া পরাশর কহিলেন,—'তোমার গাড়ী বিগড়েছে না কি?'

'মোটর বিগড়েছে কি না জিজ্ঞাসা ক'রছো? সুস্থ দেহেই তিনি বহন-কার্য্য নির্ব্বাহ করছেন! তবে যাঁর প্রেস্টিজের জন্যে মোটর, টেলিফোন, রেডিও, তিনি এখন সিন্ধু উপকূলে—কাজেই রথও তাঁর অনুসরণ করেছে।'

পরাশর সবিস্ময়ে কহিলেন, 'কেন? ট্যাক্সির তো ওখানে অভাব নেই।'

'পরাশর দা, তুমি এখনও তেমনি ভোলা মহেশ্বরই আছ দেখ্‌ছি; বল্লুম না, প্রেস্টিজ! কলকাতাতেই কি ট্যাক্সির অভাব,—তবে আমি ট্রামে বিচরণ করছি কেন?—মানে, আমার আত্মীয়-কুটুম্ব কারই বা গাড়ী আছে? তাঁর সকলকারই গাড়ী, মোটর, মায় হবু-জামাইটিরও, কাজেই ওটার অভাব হ'লে তাঁর সম্ভ্রমে বাধে—'

"হবু-জামাই? লীলার কি কোথাও বিয়ের ঠিক ক'রেছ না কি?'

'ওই যে বল্লুম,—ও-সকলের কর্ত্তা আমি নই। লীলার-মা এ সব বোঝেন ভাল। বালিগঞ্জে দত্ত সাহেব আছে না? মস্ত বিল্‌ডিং-কন্‌ট্রাক্‌টর! তাঁর ছেলে সম্প্রতি বিলেত থেকে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ফিরে এসেছে।'

সন্তর্পণে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পরাশর শুষ্ক হাস্যে কহিলেন, 'তোমরা সুখেই আছ তারক!'

তারক হাসিল; কহিল, 'বিলক্ষণ! সুখে থাকবার জন্যেই রূপ, কুল, পর্য্যা—কিছু না বেছে কাল-বৌ ঘরে নিয়ে এলুম! আমি জানতুম, ও তোমাদের ঠিকুজ্জি-কুষ্ঠীর মিল, কুল-টুল সবই টাকার তোড়ার ভেতর।—তা, তুমি এদিকে যাচ্ছ কোথায়?'

পরাশর মাথা চুলকাইয়া বিব্রত স্বরে কহিলেন, 'এই—ইয়ে—'

'গন্তব্য স্থল বলতে আমাদের মত তোমাকেও মাথা চুলকোতে হয়, পরাশর দা?'

পরাশর আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিলেন, 'মাথা চুলকোচ্ছি, মানে—এই দিকেই শুনেছি, একটা ঘটকের আপিস।—মানে মেয়েটা—'

বিস্ফারিত নেত্রে তারক কহিল, 'হাইকোর্টের ধারে ঘটকের আপিস! মানে আজকাল গুলী-টুলীর আড্ডায়—'

বাধা দিয়া পরাশর তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'না, না, ওটা আমারই বলবার ভুল হয়েছে; অর্থাৎ এদিকে আমার এক বন্ধু থাকেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাব কালীঘাটে, সেখানে ঘটকের আপিস, কাগজে দেখলুম।'

'কালীঘাট! হ্যাঁ, ভাল কথা; একটা জ্যোতিষী না সিদ্ধবাবা কে ওই দিকে এসেছে, তুমি খবর জান?'

পরাশর কাসিয়া কহিলেন, 'কই, আমি তো কিছু জানি না।'

'তুমি জান না? আশ্চর্য্য! আমার ধারণা, রাজ্যের সাধু, ফকির, সিদ্ধবাবা, সন্ন্যাসী, উদাসী, দণ্ডীবাবা নিয়ে তোমাদের কার-বার! তাদের পদার্পণের সংবাদ সব আগে তোমরাই পাও! কার কতখানি অলৌকিক মাহাত্ম্য—তোমরা তার নাড়ী-নক্ষত্র সব জান, —আমার স্ত্রীটিও অবশ্য বাদ যান না। তাই তো তোমায় বলছি।'

'তোমার স্ত্রী?' মহা বিস্ময়ে পরাশর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হাসিয়া তারক কহিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার স্ত্রী! সে জজের মেয়ে হ'লে কি হবে? বাইরে যতই সাহেবী চাল-চলন হোক, ভেতরে ঝাড়-ফুঁক, মাদুলী, ফুলের সন্ধান! কে দেড়শো বছর জীবিত আছেন! কে তিরস্করণী বিদ্যা-প্রভাবে শূন্য-মার্গে বিচরণ করেন,

সমস্ত খুঁটিনাটি খবর তিনি রাখেন! আমি ও-সব বিশ্বাস করি না, মানিও না! জানি—সবই বুজরুকী; ভণ্ড বেটাদের জুচ্চুরী!'

'না, না, তারক! অমন করে বললে অপরাধ হয়! সত্য কিছু আছে বই কি—'

বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া তারক কহিল,—'কলা আছে, অষ্টরম্ভা! এত সুখ যদি তোর কপালে, তবে কেন কাঁথা বগলে?—আমার কপালের লেখা ও-ব্যাটাদের ঝাড় ফুঁকে অদল-বদল হয়ে য'বে?'

পরাশর কহিলেন,—'তুমিও যে দেখছি মানসীর-মার দলে! কিন্তু তারক, আমি বলছি, অনেক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন—'

'থাম দাদা, থাম! বৌদি ঠিক মানুষ চেনেন;—ভালো, বৌদিকে বলো, এক দিন গিয়ে তাঁর হাতের রান্না মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে আসব।'

রহস্তের স্বরে পরাশর কহিলেন,—'তোমার বৌদি'র হাতের রান্না মাংস খাবার সাধ একটু অদ্ভুত নয়?'

'তা বলতে পার; খানসামার হাতের 'ডিনার' তো নিত্যি চলছে! তবে কি জান ভাই, গেরস্ত-ঘরে জন্মেছিলুম; মাঝে-মাঝে পুরানো ইচ্ছেগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—। মনে হয় সামনে বসে 'খাও, খাও' বোলে কেউ খাওয়াক! জেদ, জবরদস্তি, রাগারাগি করুক! বেশ, তুমি কালীঘাটে যাচ্ছ, মহাপ্রসাদ কিনে নিয়ে এসো। বাড়ীতে আমি একা আছি! রাত্রিতে গিয়ে উঠব তোমার ওখানে। —খালি মাংসের ঝোল, ভাত, আর লেবু—'

'তারক! তারক! এর চেয়ে আহ্লাদের বিষয় আর কি হ'তে পারে ভাই! আজই কিনে নিয়ে যেতুম, কিন্তু আজ দুপুর হতে তোমার বৌদির অম্বলের ব্যথাটা চেগে উঠেছে,—মুখে জল-গণ্ডুষ অবধি দেয়নি কিনা—'

'মেনি থ্যাঙ্কস্! যে দিন সুবিধা হয় বোলো! বৌদির অসুখ—বলতে হয়! তাই তোমার অমন শুষ্ক, রুক্ষ মূর্তি! আমি মনে করছি, দাম্পত্য কলহ! আহা, তুমি বুঝি অম্বলের মাদুলীর সন্ধানেই কালীঘাট যাচ্ছ! শুনিছি—পাঁচসিকে পূজোর জন্যে দিয়ে সবাই ঐ দুর্লভ পদার্থটি নিয়ে আসে।'

ট্রাম আসিয়া থামিল। 'নমস্কার' বলিয়া তারক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং 'আজ আসি,' বলিয়া নামিয়া গেল।

* * * *

ট্রাম চলিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে পরাশরের মানসে অতীতের সহস্র বিস্মৃত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তারক নিজে গৌরবর্ণ পুরুষ—তবু মাসিমা কালো বউ ঘরে আনিলেন। জজের মেয়ে সে—হোক কালো, হোক মোটা—তবু—ইত্যাদি।

পরাশর কালো,—তবু নীহারের মত লক্ষ্মী-প্রতিমা বধূ আনিয়া মা কহিলেন, 'কাজ নেই আমার কুটুমের ধনে, বউ এনেছি দশে দেখবে—দশমুখে প্রশংসা ক'রবে।'

সুখ্যাতিও সকলে করিল! বড় মামীমা তো দশবার বলিলেন, 'বড়দি কাজের মত কাজ করেছে। কুল, পর্য্যা, ঠিকুজি—সব মিল ক'রে কি লক্ষ্মী-প্রতিমাই এনেছে!—ছি! ছি! তারকের গলায় একটা পাথর ঝুলিয়ে দিলে ছোড়দি, অমন রাজপুত্রের মত রূপ—'

মাসিমা রাগিয়া কহিলেন, 'বৌমার বাবা এখন হাইকোর্টের মাথা! যে দিন-কাল, পিছনে চাড়া না দিলে কেউ দাঁড়াতে পারে? বউ তো ঘরেই থাকবে; একটু কালো, তাতে কি এসে যায়?'

মাসীমা যথার্থ কহিয়াছিলেন,—যৌবন-উৎফুল্ল-চিত্তে সোনালী-বধূর পানে চাহিয়া পরাশরের বুকে যতই আনন্দের জোয়ার বহুক, তারক সে দিন যতই বিমর্ষ, ম্লান থাকুক, আজ তারক সর্ব্ববিষয়েই পরাশরের অপেক্ষা অনেকখানি শ্রেষ্ঠ! শ্বশুরের চাড়া পাইয়া জীবনটা সার্থক করিতে পারিয়াছে। বালিগঞ্জে প্রাসাদোপম অট্টালিকা! মোটর, টেলিফোন, রেডিও সমস্ত সরঞ্জামেই আধুনিক জীবন-যাত্রার গতিটা সুখময় করিয়া রাখিয়াছে। গত বৎসর স-পরিবারে প্লেনে চড়িয়া বোম্বে বেড়াইতে গিয়াছিল! আর নীহার কত করিয়া পুরীতে রথ দেখিতে যাইবার জন্য তাহার কাছে কিছু টাকা চাহিয়াছিল; তাহাও পরাশর দিতে পারেন নাই। তারকের মেয়ে লীলাকে রূপের দিক দিয়া মানসীর অপেক্ষা অনেকখানি নীচু ধাপে দাঁড়াইতে হয়। তথাপি তাহার প্রার্থিত স্বামী নির্দ্ধারিত হইতে বিলম্ব হইল না। আর পরাশর নীহারের কিশোরী প্রতিকৃতি মানসীকে একটা সামান্য কেরাণী-পাত্রের হাতেও সম্প্রদান করিতে পারিলেন না!

সাপের মত ফোঁস করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পরাশর ভাবিলেন, দুনিয়াতে টাকাই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য মিলাইয়া দেয়, এমন কি পরমার্থ অবধি।

কাটা অঙ্গ হঠাৎ ঘর্ষণে যেমন জ্বলিয়া উঠে,—পরাশরের আহত চিত্ত তেমনি রি-রি করিয়া উঠিল! মাত্র পাঁচটা টাকা, তাহারই জন্য আজ কি না বিশ্রী কাণ্ড!

কালীঘাটের ট্রাম ধরিয়া পরাশর যখন মায়ের মন্দিরের রাস্তায় নামিলেন, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে,—সঙ্গে ছাতা, বর্ষাতি অবধি আনা হয় নাই! চাদরে দেহ আবৃত করিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

হালদারের দল আসিয়া ধরিল; 'না, না, এখন দান, দর্শন নয়,' বলিয়া পরাশর চারি পাশে চাহিলেন,—কোথাও চেনা লোক আছে কি না—না, একখানিও পরিচিত মুখ নজরে পড়িল না।—পরাশর গন্তব্য স্থলে অগ্রসর হইলেন।

পরাশর বড় রাস্তা শেষ করিয়া একটা গলি-রাস্তার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কয়েক পা হাটিয়া একখানি জীর্ণ বাড়ীর দরজায় আসিয়া রুদ্ধদ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া মিহি সুরে ডাকিলেন, 'সাধু বাবা!'

একটি গৈরিকবস্ত্র-পরিহিতা, অক্ষমালাধারিণী মুক্তকেশী রমণী দ্বার খুলিয়া দিল। পরাশরকে দেখিয়া কহিল,—'ওঃ, আপনি? আসুন, ভিতরে আসুন! বাবা কিন্তু এখন পূজোয় বসেছেন।'

রমণীর পশ্চাতে পরাশর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; বিনীত ভাবে কহিলেন, 'একবার কি দর্শন পেতে পারি না? আমি অনেক দূর থেকে আসছি।'

মুক্তকেশী যেন ভীষণ সমস্যায় পড়িয়াছে—এই ভাবে কহিল, 'তাই তো! আজ মঙ্গলবার, চতুর্দ্দশী!—আচ্ছা দেখি, আপনি বসুন,' বলিয়া সতরঞ্চি-বিছান একটা ছোট কুঠুরী পরাশরকে দেখাইয়া দিল। বাবার দর্শনের জন্য অপেক্ষাকারীরা এই কক্ষটিতে অপেক্ষা করিত।

রমণী চলিয়া গেল। পরাশর সতরঞ্চিতে বসিয়া ঝির-ঝিরে

বৃষ্টিতে সিক্ত উঠানের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বর্ষার ঝুপঝাপ বর্ষণ, আকাশে ঘন-ঘটা, কালো মেঘের কোলে বিজলি ছটা, সঘন বজ্রনাদ, কর্দ্দমাক্ত পথঘাট, এমন দিনে গৃহ-কোণে মুখোমুখী দু'জনে—

ছি! ছি! পরাশর মনকে চোখ রাঙাইলেন, খবরদার, ও-চিন্তা নয়,—যাহা ছাড়িয়া আসিয়াছ, তাহার জন্ম মমতা কেন? কে তোমার প্রত্যাশায় পথপানে চাহিয়া আছে?

হোমের গন্ধ! ধূপধুনার মৃদু সৌরভ পরাশরের নাকে প্রবেশ করিতে লাগিল। 'আঃ, কি পরম পবিত্র রমণীয় স্থান!'—বলিয়া পরাশর উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সকল গন্ধ ডুবাইয়া পাশের বাড়ীর ইলিস মাছ-ভাজার ক্ষুধাবৃদ্ধিকর সৌরভ নাসিকায় প্রবেশ করিতেই অকস্মাৎ তৃতীয় রিপু প্রবল হইয়া উঠিল। নিমেষে মানসে ভাসিয়া উঠিল,—নরেশের হাতের সেই টাট্‌কা, প্রশান্তদেহ গঙ্গার ইলিসের রজতশুভ্র কান্তি! আঃ! নীহারের হাতের রান্না কি চমৎকার মিষ্টি—তার উপর এই রাক্ষুসে ক্ষুধা! ধ্যান ভাঙিয়া গেল। গৈরিকবসনা রমণী আসিয়া পরাশরকে কহিল,—'আসুন—বাবার অনুমতি হয়েছে!'

'চলুন' বলিয়া পরাশর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

* * * *

শ্রাবণের স্বল্পালোকিত মেঘাচ্ছন্ন বেলা। প্রকোষ্ঠের দীপপ্রভা মৃদু, দণ্ডীবাবা পূজার আসনে উপবিষ্ট। উভয় পার্শ্বে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহার স্নিগ্ধ মৃদু রশ্মি সাধু-বাবার রক্তচন্দনের ত্রিবলীশোভিত ললাটে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অর্কের মত সিঁদূরের টিপে পড়িয়া উজ্জ্বল দেখাইতেছে। জবাকুসুম সদৃশ রক্তরাগে, লোহিত উত্তরীয়ে, গলদেশের অক্ষমালাতে, ভস্মলেপিত গৌর অঙ্গে পড়িয়া অগ্নির ন্যায় দীপ্তিময় বোধ হইতেছে! পিঙ্গল নেত্রে বুদ্ধির প্রখরতা, শ্মশ্রুগুম্ফহীন আননে চিত্তের দৃঢ়তার চিহ্ন পরিস্ফুট। সম্মুখে থরে-বিথরে রক্ষিত বহুবিধ পূজা-উপচার; হোম শেষ হইয়াছে; কিন্তু সেই স্নিগ্ধ সৌরভময় ধূমে কক্ষটি পরিপূর্ণ!

পরাশর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে ডাকিলেন,—'বাবা!' স্বরে আকুলতা উচ্ছ্বসিত।

'কি রে ব্যাটা! কি চাইছিস্?'

কণ্ঠস্বরে বুঝা গেল, বাবা বাঙ্গালী! কিন্তু অত্যন্ত দাম্ভিক বাণী, সংযম বর্জ্জিত!

শুনা যায়, দুর্ব্বাসা মুনির বাণীও এইরূপ কঠোর ছিল; হয় ত ইহাও শক্তির পরিচয়! কিম্বা ভীত সন্তপ্ত মানবকে আয়ত্তে রাখিবার একটা কূট-কৌশল!

পরাশর কাতর কণ্ঠে কহিলেন, 'বাবা, বড় অশান্তি! মন আমার অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ত।'

বাবা তাচ্ছিল্য সহকারে কহিলেন,—'ওতো হবেই,—অশান্তির কারণ তো তোমার স্ত্রী?'

পরাশর নির্ব্বাক্! শেষে সবিস্ময়ে কহিলেন, 'বাবা, আপনি অন্তর্য্যামী!'

বাবা ঈষৎ হাস্য করিলেন; কহিলেন,—'এখন কলিকাল, স্ত্রী তো সহধর্ম্মিণী হন না, তাই গৃহে লক্ষ্মীও থাকে না। এরা সব অবিদ্যারূপিণী! শাস্ত্রে আছে—

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে
মলিনা কৃশা
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া
পতিব্রতা।'

আকুল স্বরে পরাশর কহিলেন, 'বাবা, এখন উপায়?'

উদাত্ত স্বরে 'তারা তারা' শব্দ করিয়া সাধু-বাবা কয়েক মুহূর্ত্ত নীমিলিত নেত্রে বসিয়া রহিলেন; তার পর কহিলেন,—'সেই যে কবচটার কথা বলেছিলুম—'

মাথা চুলকাইয়া পরাশর কহিলেন, 'আফিসের মাইনের আমার পাঁচটা টাকা কম হয়েছে ব'লে, কি তুমুল কাণ্ড—!'—কথা শেষ না করিয়া পরাশর থামিলেন।

'হুঁ' বলিয়া সাধু-বাবা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন। তার পর কহিলেন, 'তোমায় তো বলেছি, পরাশর! ক্রিয়া করতে গেলেই অর্থের প্রয়োজন। তোমরা এ-সব বিশ্বাস কর না, তাই ফলও পাও না। তা না হ'লে 'দণ্ডী স্বামী প্রণবানন্দ আশ্রম'- থাক সে কথা, তারা, তারা! ওই অবাধ্য স্ত্রী মুঠার মধ্যে, আফিসের বড় সাহেব, —হ্যাঁ, মেয়ের বিয়ে, মা সব ঠিক ক'রে দেবেন। দণ্ডী স্বামীর চণ্ডীপাঠ; সে শক্তি তুমি কি বুঝবে, পরাশর? চুনো-পুঁটী তো, জানে সেই জজের মেয়ে, কামাক্ষ্যাতে বসে যে ক্রিয়া করিয়েছিল, পুরী হতে আজ টেলিগ্রাফ মনি-অর্ডারে পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছে! বিশ্বাস না হয় 'তার' দেখ, এ-সব কলিজা চাই, বিশ্বাস চাই, নিষ্ঠা চাই; স্বামী তার ব্যারিষ্টার, তবু সে—দণ্ডীবাবা থামিলেন।

পরাশরের অন্তরে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল! সঙ্গে-সঙ্গে তারকের স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া গেল।

দণ্ডীস্বামী কহিলেন, 'কামাক্ষ্যা মায়ের মন্দিরে আমায় দিয়ে মেয়ের বিয়ের জন্যে সাত দিন চণ্ডীপাঠ করালে, কামনা পূর্ণ হোলো, বাস, মনের মত পাত্র—রূপ গুণ, পয়সা! বাপ-মা তার একেবারে রাজি—বিয়ের এক রকম ঠিকঠাক্! সেইটে পাকাপাকি করে নিতে তিনি পুরী হতে নবরাত্রি চণ্ডীপাঠ, পূজো-হোমের জন্য পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছেন! কবচ আমি করে পাঠিয়েছি!—পাত্র এইবার সুড়-সুড় করে পুরী যাবেন, পাত্র বিলেতের মস্ত পাশ-করা; সাহেবদের মত দেখতে! মেয়ে কালো, মোটা, কিন্তু ওই যে বললুম, তারা-বেটীর লীলা—আর তোমায় বললুম, একশো টাকা আন, সব ঠিক করে দেব! তুমি মাত্র পাঁচটা টাকা দিয়ে বললে,—বাবা, পরিবার—'

পরাশরের চক্ষে জল আসিল। বাবার এত বড় কৃপা,—মাত্র একশো টাকার জন্য পরাশর বঞ্চিত হইতেছেন। গদগদ স্বরে পরাশর কহিলেন,—'যেমন করে পারি, আপনাকে একশো টাকা দেব, আমাকেও মেয়ের জন্য কবচ ক'রে দিতে হবে।'

বাবা স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন।

অন্তরের একটা গভীর কৌতূহল পরাশরকে ভীষণ তাড়া দিতেছিল। কহিলেন, 'ব্যারিষ্টার সাহেবের বুঝি একটিই মেয়ে—'

সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'হুঁ!'

তবু কৌতূহল থামে না। পরাশর কহিলেন, 'ওরা কায়স্থ তো—আমাদেরই স্বঘর বোধ হয়?'

ছোট্ট প্রত্যুত্তর, 'হ্যাঁ'! কিন্তু স্বর বিরক্তিপূর্ণ। পরাশর জানিতেন, গুপ্তসমিতির ন্যায় এখানে একের কাছে অপরের

নাম প্রকাশ একান্ত নিষেধ। দণ্ডী-স্বামী তাই বিরস। পরাশর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।

হোমের কাষ্ঠ নিবিয়া গিয়াছিল। দণ্ডী-স্বামী সেই দিকে তাঁহার ভ্রূকুটি-বক্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

পরাশর মৃদুস্বরে কহিলেন,—'বাবা, আমার কবচটা ?'

'বিশ্বাস রাখ, কাজ আপনি হবে ! তোমার স্ত্রীটিই হচ্ছে—'

'কিন্তু তার হাতেই চাবিপত্র সব ! যদি দয়া করে একটু তাকে'—

'আচ্ছা, সিঁদুর পড়ে দেব, এই ভস্ম নিয়ে যাও ; কিন্তু খরচ পড়বে দশ টাকা—'

পরাশর জামা হইতে সোনার বোতাম খুলিতে উদ্যত হইলেন।

'আহা, কর কি ! কর কি ? আমি সিঁদুর-পড়া অমনি দেব।'

'তাই কৃপা করবেন', বলিয়া আর এক দফা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পরাশর প্রস্থানের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গৈরিক-বস্ত্রপরিহিতা রমণী উপস্থিত হইয়া কহিল—'শিবপুরের বাবু,—শ্যামবাজারের বাবুরা—'

'ওঃ ! অপেক্ষা করতে বলো—'

পরাশর বুঝিল বিদায়ের ইঙ্গিত ; সেই কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন।

কিন্তু জাঁকালো বৃষ্টি—প্রত্যাগমনের বাধা সৃষ্টি করিল। বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিতেই দেখিলেন—তিন জন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। এক জন খপ্‌ করিয়া পরাশরকে প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি বাবার কৃপা পেয়েছেন ?'

মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে পরাশর কহিলেন, 'নিশ্চয়ই ! তিনি কৃপাময়।'

অন্য জন কহিলেন,—'তা সত্যি ! আমি শুনেছি, ওঁকে চেপে ধরতে পারলে,—আচ্ছা, আপনার ক্রিয়া কি কামাক্ষ্যাতে করালেন ?'

পরাশর কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি কহিলেন, 'আমি যখন বিলেতে থাকতুম, এত সব মানতুম না ! এখন দেখছি, বর্ণে বর্ণে সত্য ! আশ্চর্য্য ক্ষমতা ! দেখ উমাপতি, তোমার ও-চাকরী ফস্‌কাবে না।

রমণী আসিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'বাবা আপনাদের স্মরণ করেছেন।'

* * * * *

যথাবিহিত অনুষ্ঠানে দীক্ষাক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেল। সাধুবাবা কহিলেন, 'তিন মাস ব্রহ্মচর্য্য করে থাক্‌ ব্যাটা ! তার পরে সন্ন্যাস দেব।'

পরাশর মহা ব্যাকুল,—কাঁদিয়া বাবার শ্রীচরণে পতিত হইলেন। 'আমায় সন্ন্যাস দিন ! সংসারে আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে।'

'কিন্তু আর ইচ্ছে হ'লেও ঘরে ফিরতে পারবিনি ব্যাটা ! দেখ, মন ঠিক কর।'

পরাশরের বুকের ভিতর একবার ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল। পত্নী, পুত্র, কন্যা পলকের জন্য চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তে পরাশর আত্মসম্বরণ করিলেন।

বাবা পরাশরের দিকে চাহিয়া ছিলেন ; কহিলেন, 'কি পরাশর, মন ঠিক করতে পারলে ? না—এখনও ঘরের মায়া তোমার মন টানছে ?'

শুষ্কস্বরে পরাশর কহিলেন, 'ঘর কোথা বাবা ? কেবল স্বার্থকুমির দংশন ! দু'দিনের মায়া !'

পিঠ চাপড়াইয়া দণ্ডী-স্বামী কহিলেন, 'ঠিক ! ঠিক ! সাচ বাত বলেছ পরাশর ! আচ্ছা, বিরজা এখন থাক, শুধু দণ্ড-কমণ্ডলু, আর গেরুয়া নে !'

পরাশরের প্রার্থনাও তাহাই। আনন্দে আপ্লুত হইয়া তিনি কহিলেন, "আপনার কৃপা, আমায় তাই দিন বাবা !'

'কিন্তু মস্তক মুণ্ডন, মাধুকরী।'

মাথা নাড়িয়া পরাশর সম্মতি দিলেন।

* * * *

নীহারের মনটা ভাল নাই—শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় ভারাক্রান্ত। কয় দিন হইল, পরাশর নিরুদ্দেশ ! রাগের মাথায় নীহার প্রথম দিন স্থির করিয়াছিল, সে যেখানেই থাক, তার খোঁজ-খবর লইবে না। কিন্তু হরি বাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে তাহার মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। স্থির করিয়াছে, স্বামীর টাকাকড়ি সম্বন্ধে সে আর কোন কথাই কহিবে না।

সন্দীপ বক্সের টিকিট আনিয়াছিল, কহিল, 'বুড়ী, চল মানসীকে নিয়ে ! খুব ভাল ফিল্ম এসেছে।'

'না দাদা, তুমি যাও, আমার শরীর ভাল নেই।'

মানসী সঙ্কুচিত কণ্ঠে কহিল,—'আমি কি যাব ?'

'তোমার মামা, মামী যাচ্ছেন—যাও ! কিন্তু দাদা, শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ করতে গেলে কেন ? ওটো টাকার জন্যেই এত জ্বালা !'

সন্দীপ হাসিয়া বলিল, 'তবু মাঝে-মাঝে এমন খরচ করতে হয় !' অতঃপর ভাগিনীর দিকে চাহিয়া কহিল,—'নে ভাল করে সাজ-গোজ করে নে ; বিলিতি বায়োস্কোপে যাচ্ছিস্‌ মনে থাকে যেন,—তেমনি পরিষ্কার স্মার্ট হওয়া চাই।'

নীহার হাসিয়া কহিল, 'দাদা, মানু সাজতে যেমন ভালবাসে, দেখায়ও তেমনি চমৎকার, তবে রূপে আর কি হবে ? ঘরে তো রূপো নেই।'

সিনেমা দেখার পরদিন সন্দীপ আসিয়া হাজির। একটা তুড়ি দিয়া কহিল, 'বুড়ী, বাজিমাৎ !'

কিছু বুঝিতে না পারিয়া নীহার কহিল, 'কি হয়েছে ?'

'তেমন কিছু নয় ! কেবল মানসীর বিয়ের একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পরাশরকে দেব। মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভেবে বেচারা নিরুদ্দেশ হোলো।'

কথাটা নীহারের ভাল লাগিল না ; কহিল, 'কি যে বলো দাদা ! আজ চার দিন মানুষটার দেখা-সাক্ষাৎ নেই ! মন আমার ছটফট্‌ করছে—এমন রাগ কখন দেখিনি। হ্যাঁ দাদা, রেডিও আফিসে, কি পুলিশে—'

সন্দীপ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। 'থাম ! থাম বুড়ী ! তোর মাথা খারাপ হলো না কি ? বুড়ো মিন্‌সে হারিয়ে গেছে—রেডিওতে কি বলব,—পত্নীর সহিত কলহ ক'রে শ্রীমতী নীহারবালা মিত্রের স্বামী নিখোঁজ হয়েছেন ! যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সন্ধান দিতে পারেন তো শ্রীমতী নীহারবালা মিত্র তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিবেন। না—'বসুমতী'তে বিজ্ঞাপন দেব,—বাবা ফিরে এসো, মা অন্নজল ত্যাগ করে শয্যা নিয়েছেন। আর এমন হবে

না। টাকা না থাকে বেয়ারিং পত্র দাও,—টাকা পাঠাব—মানসী!'

নীহার রাগিয়া উঠিল। 'তোমার কথার যেমন ছিরি! কেবল ঠাট্টা! মানুষটা কোথা গেল, পথে-ঘাটে—' নীহার কথাটা শেষ করিতে পারিল না। বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় একটা আতঙ্ক নিমেষে তাহাকে নির্ব্বাক্ করিল।

সন্দীপ কহিল, 'বুড়ী, তুই পাগল হ'য়ে তিলকে তাল করছিস! কিসের কান্নাকাটি? সে-দিন মোটর থামিয়ে জিজ্ঞেসা করলুম, কোথা যাচ্ছ? একবার বল্লে, হ্যারিসন্ রোড; একবার বললে, কালীঘাট; আবার বল্লে,—দক্ষিণেশ্বর! উঠল কিন্তু হাইকোর্টের ট্রামে। খবর পেয়েছি, কাল আফিসে গিয়ে পুরো এক মাসের মাইনে এ্যাড্‌ভান্স নিয়েছে।'

নীহার ভীষণ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, 'কি! কি বললে? পুরো এক মাসের মাইনে? মানে একশো টাকা!'

সমস্ত আতঙ্ক নিমেষে রোষাগ্নিতে পরিণত হইয়া তীব্র বেগে জ্বলিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে নীহার কহিল, 'আসুক আগে, এত আস্পর্দ্ধা! না দাদা, আর সহ্য হয় না! আমি গলায় দড়ি দেব।'

সন্দীপ কহিল, 'রেস্-টেস্ খেলতে আরম্ভ করেছে না কি?'

নীহারের ক্রোধরক্তিম মুখ পাণ্ডুর দেখাইল; সে কহিল,—'না দাদা, সে সব নয়! কেবল রাতারাতি বড়লোক হবার চেষ্টা! রাজ্যের সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, কবচ, মাদুলী—'

'ঠিক, ঠিক! ভবানীপুরে এক ব্যাটা ভণ্ড সাধু—দণ্ডীবাবা না কে এসেছে! তার ওখানে বোধ হয়—কিন্তু ওদিক নিয়ে ব্যস্ত না হ'য়ে এমন পাত্তর—'

সবিস্ময়ে নীহার কহিল, 'পাত্তর?'

'হ্যা রে, হ্যাঁ! সেই ফন্দী করেই তো মানসীকে কাল সিনেমা নিয়ে গেলুম। রোস, মানসীকে ডাকি—ও মেনী, ও মেনী!' সন্দীপ হাঁক দিল।

মানসী পান সাজিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া কহিল, 'কি?'

'হ্যা রে, কাল মিঃ দত্তকে কেমন দেখলি?'

সুগৌর কপোল আবীর-রঞ্জিত হইয়া উঠিল। 'যাও, আমি জানি নে!' বলিয়া মানসী তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল।

সন্দীপ হাসিতে হাসিতে পরিচয় দিয়া কহিল, 'দত্ত সাহেব এক ব্যারিষ্টারের একটা কালো ভুঁদো মেয়ের সঙ্গে শুধু টাকার লোভে ছেলের বিয়ে ঠিক করেছিলেন! মেয়েরা পুরী গেছেন। অরুণকেও যেতে অনুরোধ করে পত্র লিখেছেন! দত্ত সাহেবের জিদ—অরুণ পুরী যাক! অরুণ কিন্তু মোটে রাজি নয়! চট্ করে আমার মেনীর কথা মনে হোলো!'

সংশয়াকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীহার কহিল, 'কিন্তু দাদা, তারা বড়লোক!'

'হোক বড়লোক! বুড়ো বয়েসে মানুষ যেমন টাকা ভালবাসে, যুবা বয়েসে তেমনই রূপ ভালবাসে। অরুণই বায়োস্কোপের ক'খানা টিকিট কিনেছিল। মানুকে দেখে তার খুবই মনে ধরেছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'য়েছে বলে পুরী যাওয়া পেছিয়ে দিয়েছে। আমায় বললে, সন্দীপ বাবু, আপনি উপায় বাতলান। আমি বললুম, 'কুষ্ঠী আছে, দিন জন্ম সময় তারিখ? তাই নিয়ে আচার্য্যিকে দিয়ে ঠিকুজি ক'রে নিয়ে গেলুম মিসেস্ দত্তর কাছে! বললুম, অরুণকে নিয়ে এক মস্ত সাধুর কাছে গেছলুম, হাত দেখে তিনি কুষ্ঠী করে দিলেন, বললেন, ওর শনি, মঙ্গল, চক্রী গ্রহ! খুব দেখে শুনে বিয়ে দেবেন! তা না হ'লে, ফাঁড়া আছে। বিয়ের কি কোথাও কথা হচ্ছে?'

'মিসেস্ দত্তর কাণে কথাটা খট্ করে লাগল। বল্লেন, সন্দীপ বাবু, অরুণের বার্থ বিজার্ড! সব ঠিক ঠাক! হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো! এ বোধ হয় ওরই সূত্রপাত! সাধু তো তিনি!'

আমি বল্লুম—'নিশ্চয়! কত বড় বড় লোক যাতায়াত করে।'

মিসেস্ দত্ত বল্লেন, 'আমায় নিয়ে যেতে হবে, সেই মহাপুরুষের কাছে—'

'রাজি হয়ে সাধুর সঙ্গে সময় নির্দ্ধারণ করে এলুম। কালীঘাটে এক দণ্ডীবাবা এসেছে, আগে থাকত পদ্মপুকুরে। সোজা গিয়ে তার হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে, যা যা বলতে হবে—খসড়া লিখে দিয়ে বল্লুম, মুখস্ত করে রাখুন। মিসেস্ দত্তর কলিক্ পেন, ওঁর মায়ের বাত, বাঁ পা-টা ঈষৎ খোঁড়া! এক মামা ইষ্টিমার-ডুবিতে মারা গেছেন। দত্ত সাহেব অনেক দিন লিভারের অসুখে ভুগছেন। তাঁর ছোট ভায়ের টি, বি! অরুণ দশ বছর বয়সে ছাদ হতে পড়ে গেছল! গত বছরে কলেরা হয়েছিল, ইত্যাদি। সাধু বাবার সঙ্গে চুক্তি করলুম, বিয়েটা হলে নগদ একশো। কি কি লক্ষণ দেখে বউ করতে হবে, তাও সব লিখিয়ে দিলুম। সন্ধ্যেবেলা মিসেস্ দত্তকে নিয়ে গেলুম, সাধু-বাবা একবার সার্চ লাইটের মত তীব্রদৃষ্টি মিসেস্ দত্তর মুখের উপর নিক্ষেপ করল, তার পর চোখ বুজে গড়-গড় করে বলতে আরম্ভ করল। মিসেস্ দত্ত হতভম্ব!'

সন্দীপ থামিয়া কহিলেন, 'মেনী, এক গেলাস খাবার জল দে তো।'

'না, না, চা করে আন খুকী! বড়-দা চা খাও—তার পর—'

'তার পর আর কি! মিসেস্ দত্ত বলেছেন, আমি পাঁচটা মেয়ে নিজে দেখে তবে বউ করব। আমি মেনীর নাম করেছি, আমার ভাগ্নী, শুনে দেখতে রাজি আছেন। সাধু-বাবাকে দিয়ে গোটাকতক চিহ্ন লিখিয়ে রেখে এসেছিলুম। যথা, নাকের উপর কৃষ্ণ তিল, চুল কাল, কোঁকড়া, কপাল ছোট, পা ছোট, গৌরবর্ণা, বাঁ পায়ের চেটেতে লাল জড়ুল, পিঠে একটা লাল জড়ুল। একটা খাম এঁটে তিনি মিসেস দত্তর হাতে দিয়েছেন। আমি ন্যাকার মত মিসেস্ দত্তকে জিজ্ঞেস কল্লুম, 'কোন ওষুধ দিলেন না কি?' গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

অরুণ বল্লে, 'মা আমি পুরী যাব। ভদ্রলোককে যখন কথা দেওয়া আছে;—শুনে মিসেস দত্ত ছেলেকে খুব ধমক দিয়েছেন, 'খবরদার, তার কপাল বড়, রং কাল, চুল সোজা, সে মেয়ে বউ হবে না! তবু অরুণ জিদ করায় দত্ত সাহেব বলেছেন, 'বাইরে আমরা যত সাহেব হই, ভেতরে তেমনি হিঁদুই আছি। তোমার মার সঙ্গে আমার ঠিকুজি মিল করে তবে বিয়ে হয়েছিল। তাই লক্ষ্মী উথলেছে।'

নীহার কহিল, 'দাদা, তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি!'

সন্দীপ হাসিতে লাগিল; কহিল, 'শ্মশানে, বিবাদে আর বিবাহে মিথ্যে কথায় দোষ হয় না। হ্যাঁ বুড়ী, তোর বিয়ে না ঠিকুজি মিল ক'রে হয়েছিল? পরাশর না তোকে বিয়ের আগে

দেখে কত কবিতা লিখত ? তুই তোর বউদিকে বলেছিলি,—ওর সঙ্গে না বিয়ে হ'লে, কি একটা করবি ? কেরোসিন না কি—?'

'যাও দাদা,—বাজে বোকো না।'

'না, না, বলছি ; আজ সেই তোর জ্বালাতেই ব্যাচারা বিবাগী হয়ে গেল ! উঃ ! বিয়ের পর কি রকম—'

'কি হচ্ছে দাদা ? ছেলেমেয়েরা রয়েছে না ?' বলিয়া নীহার তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। চক্ষুতে তাহার জল, প্রথম যৌবনের প্রেম যেন ইন্দ্রধনুর বর্ণ, বিচিত্র মনোরম !

* * * *

পরণে গেরুয়া কৌপীনের উপরে গেরুয়া বহির্বাস ; চরণে গেরুয়া রংএর কেড্‌স্ জুতা, মাথায় গিরিমাটী-ছোপান পাগড়ী-বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা, হাতে চিমটা, কমণ্ডলু ! ললাটে অর্ক-গোলকের মত সিন্দূরের টিপ। আরসীতে এই অপূর্ব্ব সজ্জা দেখিয়া পরাশর মুগ্ধ হইয়া গেল। একবার মনে হইল, সাপুড়ের মত দেখাচ্ছে না তো ? অপরের হাস্য উদ্রেক করবে না তো ? তখনই মনে হইল, পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দেরও পরিব্রাজক মূর্ত্তি এমনি সাপুড়ের মত !

মাধুকরী করিতে পরাশর ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। তিনি ভদ্র সন্তান। জীবনে কখন এ কথা ভাবিতেও পারেন নাই ! উঞ্ছবৃত্তি অসহ্য ! কিন্তু মনের ভিতর বল আনিলেন, আজ যাহাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা চাহিবেন, এক দিন তাহারাই তাঁহার শ্রীচরণ সমীপে যুক্তকরে ভিক্ষা মাগিবে।

দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটাইয়া পরাশর এক গৃহস্থের বাড়ী প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীর গৃহিণী সাড়া পাইয়াই কহিলেন, 'ভেগে পড়।' ঝি কহিল, 'জোচ্চোর মিন্‌সে, সাজ করে এসেছে দেখ !'

অপমানে ক্রোধে পরাশরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। দ্বিরুক্তি না করিয়া সরিয়া পড়িলেন।

চট্ করিয়া মাথায় আসিল,—নিজেদের পাড়াটা একবার ঘুরিয়া আসিবেন,—সদরে দাঁড়াইয়া শুধু একবার দেখিবেন, ছেলে, মেয়ে, নীহার কেহ চিনিতে পারে কি না !

সেই স্থান দিয়া একখান বাস বাগবাজার অভিমুখে যাইতেছিল; সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাতে চড়িয়া বসিলেন। দুই জন ভদ্রলোক একটু সরিয়া বসিল। এক জন বিরক্তিভরে মুখ ঘুরাইয়া লইয়া কহিল,—'আজকাল এ ও একটা মস্ত লাভের ব্যবসা—'

এক জন হিন্দীতে সুধাইল, 'সাধুজীর কি হাত-টাত দেখা আসে ?'

পরাশর মুখ ঘুরাইয়া অন্য দিকে চাহিলেন। একটি বৃদ্ধ চুপে চুপে কহিল, 'সাধুজী, অর্শের মাদুলী আছে ?'

পরাশর নির্ব্বাক্ ! গন্তব্যস্থল আসিতেই নামিয়া পড়িলেন। শুনিতে পাইলেন, এক জন ভিতর হইতে কহিল, 'সাচ্চা বোধ হয় ; দেখলে না, কোন আড়ম্বরের ঘটা নেই !'

সেই আবাল্য পরিচিত গলি। সাধু ভাষায়—যাহা শৈশবের মাতৃক্রোড়, বাল্যের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের কর্ম্মক্ষেত্র, বার্দ্ধক্যের বারাণসী। পরাশর ধীর-মন্থর গতিতে প্রবেশ করিলেন।

হরি বাবুদের বাড়ীটা নজরে পড়িল। শ্রাদ্ধবাড়ী, কাঙালী বিদায় হইতেছে। ভিখারীর ভিড়ে রাস্তা বন্ধ ! তেমনি গোলমাল চীৎকার শব্দ, কাণে যেন তালা ধরিয়া যায় !

পরাশর চমকিয়া উঠিলেন। বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল।

এক জন অপরিচিত ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কহিতেছেন, 'মাতাল হোক, যা হোক, তবু ছেলেগুলার ভরসা ছিল, আশ্রয় ছিল। তুমিও যেমন ! খুড়ো, জ্যাঠা আবার আশ্রয় !'

হরি বাবুর বাড়ীর সম্মুখের বাড়ীখানাই নিজের গৃহ ! পরাশর ভীড় ঠেলিয়া সদর দ্বারে উপনীত হইলেন, বারান্দাতে ছেলেমেয়েরা কাঙালী বিদায় দেখিতেছে। ভেজান কপাট খুলিয়া পরাশর বাড়ীর ভিতরে পা দিলেন, 'নমো নারায়ণ !'

ঠিকে ঝি বাসন মাজিতে মাজিতে সাধুর কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া মুখ তুলিল ; কহিল, 'এখানে কেন বাছা, ওই সামনের বাড়ী যাও, কাঙালী বিদেয় ঐখানে হচ্ছে।'

কোন উত্তর না দিয়া পরাশর উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করিলেন,—

'এ সংসারে কেবা কার
মায়া-পাশে বদ্ধ জীবগণ।
আপন আপন ভাবি,
দুঃখ পায় অনুক্ষণ।
মন চিন্ত তুমি সদা,
চিন্ত নারায়ণ।'

'মিনার্ভাতে' পরাশর বহু বার বুদ্ধদেব-চরিত অভিনয় দেখিয়াছেন ; আফিসের থিয়েটারেও একবার স্বয়ং বুদ্ধদেব সাজিয়াছিলেন ; তবে এ ছিল তাঁহার নিজের রচনা।

ঝি কিন্তু অত-শত বুঝিল না ! কটু স্বরে কহিল, 'সন্ন্যাসী মিন্‌সে পাগল না কি ? না চোর ? বাড়ীতে পুরুষ-মানুষ নেই জেনে ঢুকেছে। সোজা-মুখে পথ দেখ ঠাকুর ! আমি একাই একশো !'

নীহার ভাঁড়ার ঘর হইতে কহিল, 'কাকে বকছিস্ মঙ্গলা ?'

'ওই দেখ না মা ! কে একটা সাধু এসেছে।'

পরাশর তেমনি উদাত্ত স্বরে কহিল,

'এ সংসারে কেবা কার,
মায়া-পাশে বদ্ধ জীবগণ।'

পরিচিত স্বর ! এমনি কত আবৃত্তি নীহার মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করিয়াছে। ভাঁড়ার হইতে ত্রস্তপদে ছুটিয়া আসিল। একেবারে সন্ন্যাসী ঠাকুরের বহির্বাস চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'হাঁ গা, শেষে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে ! পাঁচটা ছেলেমেয়ের বাপ, তাদের খাওয়া-পরার চিন্তা মনে এল না ?'

সাধুজী বহির্বাসটা টানিয়া লইবেন, কি কি করিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময় জননীর কণ্ঠস্বরে মানসী দৌড়াইয়া আসিল। পিতাকে দেখিয়া সাহ্লাদে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মণ্টু ; অনু, টেবু, দেখবি আয়, বাবা এসেছে !'

ছেলে-মেয়েরা পড়ি কি মরি করিয়া ছুটিয়া আসিল, 'বাবা, বাবা এসেছ ?'

মণ্টু কহিল, 'বাবা, দিদির বিয়ে ! বড় মামা তোমায় খুঁজতে গেছে।'

নীহার ততক্ষণে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাগড়ী টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়াছে। পতির মুণ্ডিত মস্তক দেখিয়া সে গালে হাত দিল, 'ছি ! ছি ! করেছ কি, একেবারে ন্যাড়া হয়ে সঙ্ সেজেছ ? মেয়েটার বিয়ের পর না হয় যা ইচ্ছে করতে ; মাথা মুড়ুতে, ঘোল ঢালতে ! এ করেছ কি ? জান, কত বড় ঘরে মেয়ে

যাচ্ছে? বালিগঞ্জের মন্মথ দত্ত। তাঁর ছেলে বিলেত হতে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে এসেছে! বাপের কত বড় ব্যবসা!'

সাধু চমকিয়া উঠিলেন। মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, 'মন্মথ দত্ত! তারকের লীলা না—'

'না গো না! সে মেয়ে কাল, মোটা! অরুণ আমার জামাই হবে। তার মা এসে আমার মেয়ের সব চিহ্ন দেখে মিল করে গেছে। কিছু দিতে হবে না।'

'বল কি? বাবার কবচ তা হ'লে ফল দিলে।"

অবাক্ হইয়া নীহার কহিল, 'বাবার কবচ?'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ! যার জন্যে পাঁচ টাকা নিয়েছিলুম। এই একশো টাকা খরচ করে—জামার আস্তিন তুলিয়া পরাশর কবচ বাহির করিতে গেলেন; কিন্তু কবচ কোথায়? পরাশরের মুখ বিবর্ণ হইল। কহিলেন, 'ওই যা! গঙ্গাস্নান করতে পড়ে গেছে তা' হ'লে।'

এতটুকু ক্ষুব্ধ না হইয়া নীহার কহিল, 'আপদ গেছে, তাই ঘরে শান্তি এল।'

পরাশর পত্নীর কথায় প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, মেয়েটার বিয়ে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হ'লেই সাধু-বাবার অলৌকিক মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিবেন। বিবাহটা হইল শুধু কবচের জোরেই।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

অশ্রু-অর্ঘ্য

'চিন্তামণি'র খনির খবর পেয়েছিলে তুমি হে সন্ধানি!
ঘোম্‌টা সরায়ে প্রকৃতি-রাণীর মুখ দেখেছিলে,
জানি গো জানি।

ভারতী তাঁহার সোনার বীণাটি
দেছিলেন সঁপি তোমারি হাতে,
ঝুমুর-ঝুমুর নূপুর বাজায়ে বর্ষা-বধূ সে শ্রাবণ-রাতে
কয়েছিল কথা তোমা সনে কবি
বাদর-ধারায় দে'ছিল সাড়া,
আজিকে মোদের নয়নে বাদল
ঝরিতেছে হ'য়ে তোমারে হারা।
বাংলার কবি, ভারতের কবি, বিশ্বের কবি তুমি যে ছিলে,
মাথার উপর রবি-সম তেজে অপরূপ জ্যোতিঃ ছড়ায়ে দিলে,
সেই সে জ্যোতির অণু-পরমাণু নূতন-বিশ্ব করিল সৃজন,
তারি ছটা লভি শত তারা জ্বলে,
উজল করিয়া কাব্য-গগন।

তোমারি গর্ব্বে চলিতাম মোরা শির উঁচু করি বিশ্ব-সভায়,
হায় রে মরণ তোমারে হরণ করিয়
আজিকে মোদেরে কাঁদায়,
তুমি রবীন্দ্র, তুমি কবীন্দ্র, নিতি অনন্ত নাগের মতই,
রেখেছিলে ধরি বিস্তারি ফণা,
কাব্যজগৎ আদরে কতই।
কণ্বের মত সোহাগে যতনে তব সাহিত্য-শকুন্তলায়,
পালন করেছ হে ঋষি মহান্
তুলনা তাহার মিলিবে কোথায়?
তুমি চলে গেলে ভারতের ভালে রাখিয়া শুধুই ভস্ম-টীকা—
অবসান করি তব দেহ আজি নিভিল
চিতার বহ্নিশিখা।

কিন্তু হে দেব, তুমি যে আসন লভেছ বিশ্ব-মানব-হৃদে,
সাধ্য কি তার সেথায় মরণ তোমারে নিঠুর সায়ক বিঁধে?
গঙ্গার কূলে দুলে আলো-ছায়া থেমে যায় গীতি স্বর্ণবীণের
হে নব-যুগের পরাশর ঋষি, অশ্রু-অর্ঘ্য লহ এ দীনের।

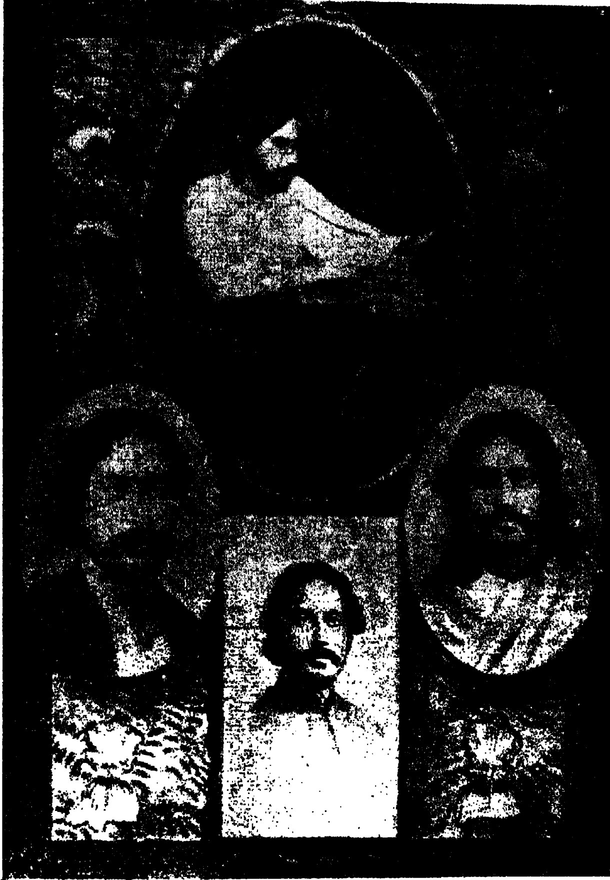
কাদের নওয়াজ।

মহামানব রবীন্দ্রনাথ

অবতার-তত্ত্ব লইয়া যাঁরা গভীর ভাবে মস্তিষ্ক চালনা করেন, তাঁদের মতো অতখানি মস্তিষ্কতার দাবী আমাদের নাই বলিয়া হয়তো সে সব গভীর গবেষণার মানে আমরা সব সময়ে ঠিক বুঝিতে পারি না! কিন্তু অবতার-তত্ত্বের মূলে যে কথা আছে, অর্থাৎ সেই

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।

এ কথার অর্থ আমরা সহজ সাধারণ মানুষ বুঝি এই যে, যখনি গ্লানি ও হীনতার বিষে আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব ও লাঞ্ছিত হইয়াছে, তখনি এমন মহাপুরুষ আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি নানা দিক দিয়া সে-গ্লানি মোচন করিয়া মানুষকে তার মনুষ্যত্বের আসনে আবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন! রবীন্দ্রনাথের সারা-জীবনের সাধনার কথা একান্ত নিরপেক্ষ-ভাবে যদি আজ আমরা আলোচনা করি, তাহা হইলে এ-কথা বোধ হয় অকুণ্ঠিত চিত্তে এবং অকম্পিত ভাষায় স্বীকার করিতে হইবে, শ্রীচৈতন্যের পর রবীন্দ্রনাথের মতো আর-একজন দরদী মহাপুরুষ বাঙলা দেশে আবির্ভূত হন নাই!



বিভিন্ন বয়সে রবীন্দ্রনাথ

যে-সময় রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়, সে সময় প্রকৃত শিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝি, এমন শিক্ষিতের সংখ্যা এদেশে খুব বেশী ছিল না! এবং তাঁদের মনের চেতনা যে খুব জাগিয়াছিল, এমন পরিচয়ও পাই না!

আজ নানা দিক দিয়া শিক্ষার প্রসার বাড়িয়াছে; শিক্ষিতের সংখ্যা এখন নির্ণয় করা হয়তো দুঃসাধ্য, এবং এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, একালের শিক্ষিতদের যে-মন সম্বন্ধে আমরা এতখানি সচেতন দেখি, সে-মনকে জাগাইয়া আজিকার এ-ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ!

এ কথা কেন বলিতেছি, তাহা বুঝিতে হইলে রবীন্দ্র-নাথের রচনাবলীর আলোচনা প্রয়োজন। পরিপূর্ণ আলোচনা আমরা করিতেছি না; রবীন্দ্র-রচনাবলীর মোটামুটি আলোচনা করিয়া আমাদের এ কথা কতখানি সঙ্গত ও সত্য, তাহা বুঝিবার প্রয়াস পাইব।

আমরা জানি, খুব ছোট বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা-লেখা শুরু করেন। তাঁর মনের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত

ভাবগুলি প্রথম রূপ পায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। এ কবিতায় কিশোর-কবি লিখিয়াছেন—

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর!
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখীর গান!
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!

* * * *

মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
জগত-মাঝারে লুটিতে চায়!

* * * *

ভাঙ্গ রে হৃদয় ভাঙ্গ রে বাঁধন
সাধ রে আজিকে প্রাণের সাধন!

* * * *

আমি ঢালিব করুণা-ধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা!

এ কবিতায় কবি-হৃদয়ের প্রথম জাগরণ আমরা প্রত্যক্ষ করি। দেখি, জাগিয়াই সে হৃদয় চাহিল মুক্তি! কবি বলিলেন, করুণা-ধারা ঢালিয়া, পাষাণ-কারা ভাঙ্গিয়া, জগৎ প্লাবিয়া গাহিয়া বেড়াইবেন! এ ক'টি ছত্র খেয়ালী রচনা নয়! এ কয় ছত্রে রবীন্দ্রনাথের সারা-জীবনের সাধনার ইঙ্গিত পাই সুস্পষ্ট!



বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ

আজ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ পড়িয়া মনে পড়িতেছে এগারো বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ সত্তর-বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথা! কথা-প্রসঙ্গে সেদিন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—

আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি,—আমি চোখ মেলে যা দেখলুম, চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হোলো না, বিস্ময়ের অন্ত পাইনি। * * * প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।

* * * আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জ্জনীয় জিনিষ ভূরি ভূরি আছে, তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জ্জনা বাদ দিয়ে যা থাকে, আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে—যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্ম-নিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। * * * আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি ও ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তাঁরি বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

মহা-মানবত্বে এই যে তাঁর দীক্ষা,—এ-দীক্ষার প্রথম পরিচয় আমরা পাই তাঁর কিশোর-কালের রচনাবলীতে! তাঁর এই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতার পর পড়ি,

"কুঁড়ির মধ্যে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে"।

প্রভাত-সঙ্গীতে সেই

জগৎস্রোতে ভেসে চল যে যেথা আছ ভাই,
চলেছে যেথা রবি-শশী চলরে সেথা যাই।

তার পর

ধূপ আপনারে মিশাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে—
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
* * *
অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তে অসীমে-সসীমে এই যে মিলন; বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনাকে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত করিবার জন্য এই যে-চাঞ্চল্য—এই চাঞ্চল্য হইতেই কবি-চিত্তে বিরাট্ ব্যাপকতার বিকাশ দেখিতে পাই।

মনে এই যে ব্যাপকতার প্রয়াস—এ-প্রয়াস কবির মনকে সর্ব্বদেশে সর্ব্ব-সমাজে নিজেকে মিশাইয়া সকলকে আপন করিয়া লইবার জন্য অধীর আকুল করিয়াছে চিরদিন! পৃথিবীর মাটী, জল, আকাশ, বাতাস, রবি, শশী, তারা—সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া সকলের সঙ্গে তিনি প্রাণের যোগ চাহিয়াছেন! তাঁর পূর্ব্বে বহু কবি আকাশ, বাতাস, রবি-শশী-তারা লইয়া অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁদের সে-কথা যেন ছন্দে-বাঁধা কবিতার কথা! সে-কথায় প্রাণের সাড়া পাই নাই! রবীন্দ্রনাথের রচনার সর্ব্বত্র তাঁর অন্তরকে পাই; তাঁর প্রাণকে সর্ব্বত্র হিল্লোলিত দেখি। তিনিই প্রথম মন খুলিয়া চোখ মেলিয়া সকলের সহিত প্রাণের সংযোগ নিবিড় করিতে চাহিয়াছেন! এই আকাশ-বাতাস, জল, মাটী, ফুল-ফলকে আমরা যে আজ প্রাণের মতোই উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছি, সে শুধু রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়; তাঁর এই প্রাণের মন্ত্রে!


রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ


১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে নবেম্বর "নোবেল পুরস্কার" লাভ-উপলক্ষে কবিবরের সম্বর্দ্ধনা
(বাম হইতে দক্ষিণে) রেভারেণ্ড জর্ডন মিলবার্ণ, কবিবর, স্যর আশুতোষ চৌধুরী

সখ করিয়া বা কবি-যশের প্রার্থী হইয়া রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন নাই। পৃথিবীকে তিনি যে-চোখে দেখিয়াছিলেন, সেই-চোখের সেই দৃষ্টি দিয়া সকলের দৃষ্টি-প্রদীপ জ্বালিতে চাহিয়াছিলেন! পৃথিবীকে কোনো দিন

তিনি জীর্ণ দেখেন নাই; পৃথিবীকে তিনি দেখিয়াছেন জীবনের অনন্ত উৎস! তাই তিনি পৃথিবীকে ভালো বাসিয়াছিলেন প্রাণের মতো; পৃথিবীর জীবকে, সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি আপনার অন্তর দিয়া ভালো বাসিয়াছিলেন! এবং প্রাণের এই সত্যকার ভালোবাসার জন্যই তাঁর কেবলি মনে হইয়াছে,

মানব-হৃদয়ের বাসনা
বিস্ময়ে কারে চাহে করে হায় হায়!

মানুষকে মনে-প্রাণে জানিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষ কি চায়, চাহিয়া কোথায় সে তাহা পাইবে না জানিয়া অস্থির চঞ্চল দিশাহারা কল্পনাকে দিকদিগন্তরে পাঠায়, এ-কথা তাঁর অবিদিত ছিল না। আজীবন কবি তাই সন্ধান করিয়াছেন, আমরা কি চাই! মানবমনের এই ক্ষুব্ধ বাসনাকে কেন্দ্রিত করিয়া সে-বাসনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে, কোথায় তা পাই—কিসে মানুষের মনের অশান্তি ঘুচিবে অর্থাৎ তাহারি সন্ধানে তাঁর মনে ব্যাকুলতার সীমা ছিল না।

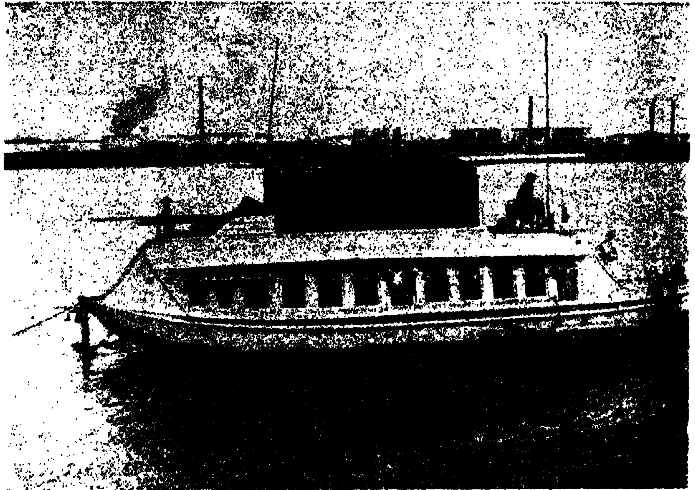
সন্ধানে বাহির হইয়া কতবার দিকভ্রান্ত হইয়াছেন, নিরাশ হইয়াছেন—তবু গতির বিরাম নাই! সোনার তরীতে তাই এই নিরুদ্দেশ যাত্রা স্মরণ করিয়া কবি ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন,

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরি,
বল কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?

কোথায়? কোথায় এ-বাসনার পরিতৃপ্তি? এ-জীবনে সে পরিতৃপ্তি মিলিবে না? কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর প্রাণের নিবিড় যোগ—পৃথিবী ছাড়িয়া অন্যত্রও তাই সন্ধান করিবেন না! কবি বলিয়াছেন,—

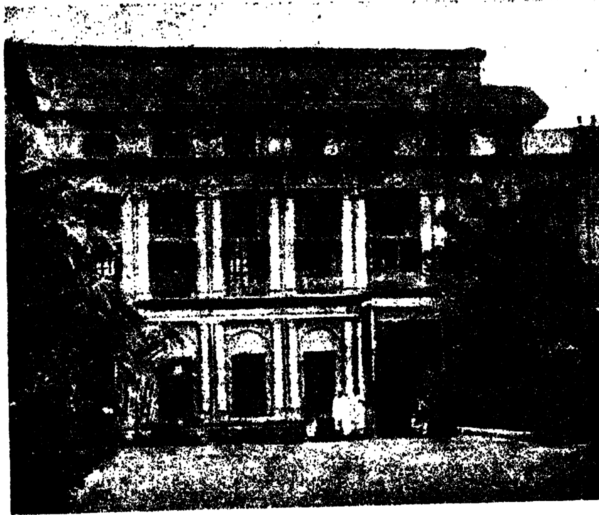
মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে!


১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর "হিন্দী ভবন" উদ্বোধন-দিনে
রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু


গঙ্গা-বক্ষে কবিবরের বজরা



বিশ্ব-ভারতী "কলা-ভবনের" ছাত্র-নিবাস



কবিবরের জন্মস্থান—৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা

প্রবোধ দিয়া শান্ত করিয়া কবি বলিয়াছেন—

ওরে বিহঙ্গ, মন-বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা !

সম্মুখ-পথে এই অগ্রগতির ছন্দে কবির মন আরাম চাহে নাই, বিরাম মানে নাই! দুর্দ্দিন ও দুর্য্যোগের রাত্রি মাথায় করিয়া তিনি চলিয়াছেন সত্যের সন্ধানে—যে সত্যের সন্ধানে সিদ্ধার্থ একদিন রাজ্য-ঐশ্বর্য্য স্ত্রী-পুত্র-সংসার ছাড়িয়া অগ্রগতির ছন্দে অগ্রসর হইয়াছিলেন; শ্রীচৈতন্য শচী-মায়ের স্নেহে, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণের বন্ধেও বাঁধা পড়েন নাই।

পথ চলিতে গিয়া নৈরাশ্যে ব্যথায় আমরা পথ ছাড়িয়া আশ্রয়-নীড়ে ছুটি! সামনের পথ ছাড়িয়া পিছনের পানে তাকাই। কবির ভাব-চিত্ত কিন্তু পিছনে ফিরে নাই। দুর্দ্দিনে দুঃসময়ে মনকে কবি অবিরাম শক্তি দিয়াছেন। বলিয়াছেন—

চাবনা পশ্চাতে মোরা মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
হেরিব না দিক্।
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক-বিচার
উদ্দাম পথিক!

তিনি জানেন, জগতের পথে চিরদিন এই যাওয়া-আসা চলিয়াছে! তিনি জানেন, এ জগৎ বন্দীশালা নয়! জগৎ আনন্দময়! তাই তিনি বলিয়াছেন—

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

তাঁর

ইচ্ছা করে আপনার করি
যেখানে যা কিছু আছে…

এবং জগৎকে এই আপন করিবার বাসনায় অফুরান্ পথে অফুরান্ রাত্রি জাগিয়া অজানা নূতন ঠাঁইয়ে কবির গতির বিরাম নাই। সন্ধ্যার অন্ধকার বারে-বারে ঘনাইয়া আসিয়াছে—ঝড়-বাদলে প্রলয়ের মাতন—তবু মনকে

অগ্রগতির ছন্দে পৃথিবী চিরদিন সম্মুখে চলিয়াছে! এক হাজার দু'-হাজার বৎসর পূর্ব্বে মানুষ যে-ভাবে জীবনাতি-পাত করিয়া গিয়াছেন, আজ নানা কারণে সে-ভাবে জীবনাতিপাত করা চলে না! শুধু ভারতবর্ষ বলি কেন, পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই জীবনধারা আজ ভিন্ন-খাতে চলিয়াছে—এবং আজিকার পৃথিবীর জীবনধারার সঙ্গে আমাদের জীবনধারার সংযোগ যদি না রাখিতে পারি, তাহা হইলে

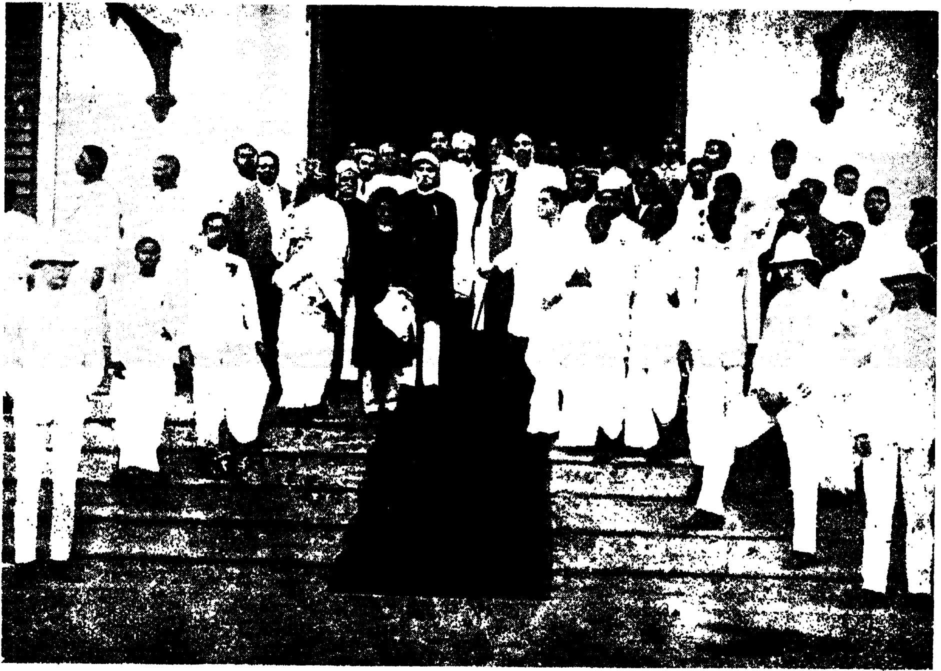
আমাদের জীবনের প্রবাহ মন্থর হইবে। যুগে-যুগে জীবনধারার এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের প্রাণের ধারা সংযুক্ত করিবার জন্য শ্রীভগবান 'অবতার' হইয়াছেন অর্থাৎ মহামানবের মূর্ত্তিতে আসিয়া নব-ধারায় আমাদের দীক্ষিত, আমাদের প্রাণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন!

এক হাজার দু'-হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৈরাগ্যই হয়তো ছিল মুক্তির মার্গ! আজিকার যুগ কর্ম্মযুগ—এ-যুগে

অজানা পথে ভুলের সীমা নাই, কবি তাও জানেন! তিনি বলিলেন, সে-ভুলে ভয় নাই, লজ্জা নাই, নৈরাশ্য নাই! পথ ভুল হয়, হোক! তিনি বলেন—

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম কাজের পথে!
নইলে অভাবিতের দেখা ঘটতো না কোনোমতে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনাকে যাঁরা কাব্য-সাধনা বা রস-সাধনা বলিয়া ধরিবেন, তাঁরা ভুল করিবেন।



কলিকাতা টাউন-হলে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ

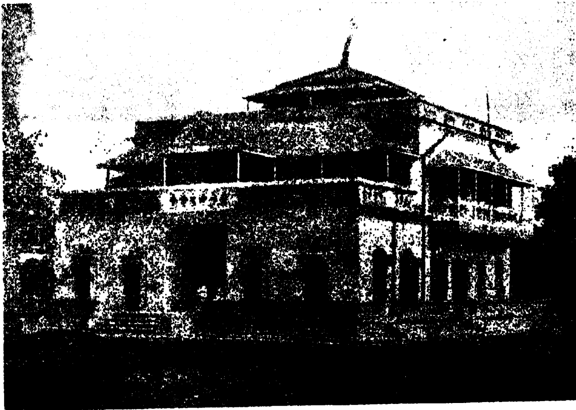
বৈরাগ্যে মুক্তি-সাধন চলিবে না! কিন্তু এ-সব জটিল-তত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই। আমরা যে-জগতে বাস করিতেছি, সে-জগতে কর্ম্মই আমাদের সাধনা, মনে-প্রাণে তাহা বুঝিতেছি! তাই এ-যুগে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণকে সেই দিকে সচেতন করিয়া দিতে চাহিয়াছেন! আমাদের ভীরু মন যখনি প্রশ্ন করিয়াছে, কে পথ দেখাইবে? ও-পথ যে অজানা! তখনি আশ্বাস দিয়া কবি বলিয়াছেন—

পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।

বহু সাহিত্য-রথীর, বহু কবির ও নাট্যকারের রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। তাঁদের সে সাহিত্য-সাধনায় আমরা দেখি, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ধারা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনায় কিন্তু অপরূপ ঐক্য দেখিয়া বিস্মিত হই, বিমুগ্ধ হই! এ-সাধনা যেন স্তরে স্তরে বিপুল বিরাট্ হইয়াছে। এ-সাধনা হইয়াছে অভিন্ন এবং অদ্বিতীয়। বিশ্লেষণ করিলে এ-সাধনাকে সাহিত্য-সাধনার ছোট গণ্ডীতে আবদ্ধ করা চলিবে না! তাঁর এ-সাধনা জীবন-সাধনা! বাঙালী, বেহারী, পাঞ্জাবী, মার্হাট্টা, ইংরেজ,



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ-বাসরে
(উপরে—বামদিক হইতে)—গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র, সমরেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, সোমেন্দ্র, সত্যপ্রসাদ
(মধ্যে—বামদিক হইতে)—জ্যোতিরিন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, সুরেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, সুধীন্দ্র
(সম্মুখে—বামদিক হইতে)—দিনেন্দ্র, রবীন্দ্র, শমীন্দ্র, অমরেন্দ্র, রথীন্দ্র, কৃতী



"কুঠী বাড়ী"—শিলাইদহে কবিবরের বাস-ভবন

ফরাশী, মার্কিণ, জার্ম্মানের জীবন-সাধনা নয়; এ-সাধনা বিশ্ব-মানবের সাধনা! তাই তিনি বিশ্ব-কবি।

সরল গল্পেও এ কথা তিনি বার-বার বুঝাইয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

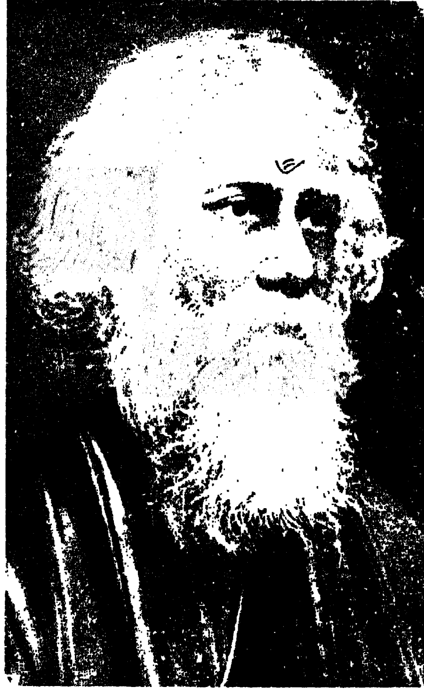
"জল-স্থল আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের মঙ্গল কর্ম্মে সম্বন্ধ পাই। আমরা জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এই জন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমার সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতম রূপে জানিয়া তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।"

মনের ছোট গণ্ডীকে প্রসারিত করিয়া গৃহকোটরের তুচ্ছ মানুষটির মধ্যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি—প্রাচ্য মনের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের এমন সুস্পষ্ট পরিচয় পাইয়াও আমাদের মধ্যে অনেকে এক দিন নিতান্ত মূঢ়ের মতো রবীন্দ্রনাথকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া লেখনী কলুষিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই! কিন্তু সে মূঢ়-জনের সে মূঢ়তার কথা থাক্! রবীন্দ্রনাথের মন আর পাঁচ জনের মতো নয়। তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা, ঋষি—তাই তিনি কাহারো বিদ্রূপে কোনো দিন সত্য-সাধনা হইতে বিচলিত হন নাই—অটল নির্ভীক সাধনায় সত্যকে তিনি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এবং সে-সত্য সকল ক্ষেত্রে প্রচার করিয়া গিয়াছেন মানব-জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে।

মানুষের মধ্যে ব্রহ্মোপলব্ধি এ দেশে নূতন কথা নয়! কিন্তু পাণ্ডিত্যের চাপে, অহঙ্কারের মত্ততায় এ কথা কোনো দিন আমাদের মনে থাকে না! তাই আমাদের মূঢ় মনকে সচেতন করিতে এক দিন আসিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য। আর এক দিন আসিয়াছিলেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। কবি চণ্ডীদাসও বলিয়াছিলেন, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই! সে-তত্ত্ব আরো ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছিলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ! বিচার করিয়া দেখিলে এই তিন



১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর-বাড়ীতে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র অভিনয়ে "বাল্মীকির" ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ



বিশ্বকবি

দুঃখ-ক্লেশের পীড়ন হইতে জীবকে পরিত্রাণ করিবার জন্য বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন সদ্ধর্ম্ম! রবীন্দ্রনাথও এই জরা-মৃত্যু দুঃখ-ক্লেশে আমাদের সান্ত্বনা দিবার জন্য, শক্তি দিবার জন্য কর্ম্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিলেন—"এই কর্ম্মজালবেষ্টিত পৃথিবীকে যখন বৃহৎ ভাবে দেখি, তখন দেখি, তাহা চিরদিন অক্লান্ত, অক্লিষ্ট, প্রশান্ত, সুন্দর—এত কষ্টে, এত চেষ্টায়, এত জন্মমৃত্যু সুখ-দুঃখের অবিশ্রাম চক্ররেখায় সে চিহ্নিত, কিন্তু ভারাক্রান্ত হয় নাই! এত বৈচিত্র্য এবং প্রয়াসের মধ্যে এই স্থির শান্তি ও

মহামানবের বাণী অভিন্ন;—শুধু বলিবার এবং সাধনার প্রণালীতে দেখি যুগোপযোগী পার্থক্য!

এই মাটীর পৃথিবী এবং পৃথিবীর এই তুচ্ছ হীন মানুষকে রবীন্দ্রনাথ সবার বড় দেখিয়াছেন; প্রত্যক্ষ সত্য জানিয়া তাকে ভালো বাসিয়াছেন। কীট-পতঙ্গের প্রাণের স্পন্দনে, শিশুর সরল হাসিতে, ফুলে-ফলে, লতায়-পাতায় অপূর্ব্ব মহিমা দেখিয়া তাদের জয়-গান গাহিয়াছেন। ছোট-বড়র পার্থক্য ভাঙ্গিয়া তাঁর কাছে বিশ্ব-নিখিল সমান একাকার হইয়াছিল।

তিনি গাহিয়াছিলেন,

ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী!

জরা-মৃত্যু বিরোধ-দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া



রবীন্দ্রনাথ—পিতৃশ্রাদ্ধের পর



গ্র্যাণ্ড হোটেলে রবীন্দ্রনাথ

সৌন্দর্য্য, এত কলরবের মধ্যে এই পরিপূর্ণ সঙ্গীত কি করিয়া সম্ভবপর হইল ? ইহার এক উত্তর এই যে—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।"

মাটীর পৃথিবীতে বাস করিয়া, মাটীকে ভালোবাসিয়া সাধনায় মনকে তিনি মলামাটীর ছোঁয়াচ হইতে এতখানি উর্দ্ধে রাখিয়াছিলেন, তার কারণ, ভারতের উপনিষদকে নিজের জীবনে পরিপূর্ণ-প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি বরণ করিয়াছিলেন। তাঁর জীবনের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সাধনার পরিচয় যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই ইহা জানেন। মৃত্যু আসিয়া বহু বার তাঁর মনের দ্বারে হানা দিয়াছে; কিন্তু এ সব আঘাত রবীন্দ্রনাথকে কোনো দিন কাতর, হতাশ বা বিচলিত করিতে পারে নাই! দুঃখে আঘাত পাইয়া প্রশান্ত চিত্তে তিনি বলিয়াছেন,

দুঃখের বেশে এসেছো বলিয়া
তোমারে ডরিব না!

বলিয়াছেন,

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য কর দহন-দানে!

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধী মুনিরুচ্যতে।

রবীন্দ্রনাথের জড়-জীবনের পরিচয় যিনি জানেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ-বাণীর সার্থকতাও তিনি উপলব্ধি করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই!

তাঁর প্রতিভাকে আমরা দেখিয়াছি সর্ব্বতোমুখী! এবং প্রতিভার এমন সর্ব্বতোমুখী বিকাশ—পৃথিবীর মানব-ইতিহাসে অদ্বিতীয়; উহার আর তুলনা নাই!

কিন্তু আমরা যে কথা বলিতেছিলাম, সে-কথার সঙ্গে হয়তো অন্য কথা মিশাইয়া ফেলিয়াছি। উপায় নাই! যাঁর কথায় সমস্ত মন ভরিয়া আছে, তাঁর কথা বলিতে গিয়া কত কথা মনে ভিড় করিয়া আসিয়া প্রকাশের পথ খুঁজিতে চায়—আর কেহ না বুঝুন, মনের এ অসংযত প্রগল্‌ভতা অন্তর্য্যামী রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় বুঝিবেন! বুঝিয়া তিনি আমার এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

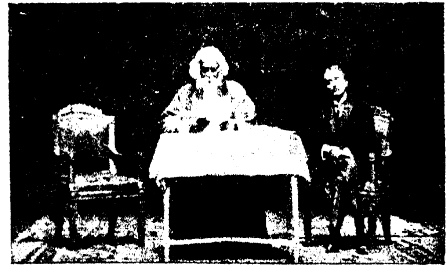


বোম্বাই : কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

কবির ভাব-গতির কথা বলিতেছিলাম, চিরদিন এই ভাব-ধারা অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে। তিনি বলেন,—

আগে চল্ আগে চল্ ভাই
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই!

ভাব-গতির এই মুক্ত-ধারা তাঁর সকল রচনার মধ্য দিয়া সকল বাধা-বন্ধ ভাঙ্গিয়া উত্তীর্ণ হইয়া স্বচ্ছন্দে বহিয়া চলিয়াছে—ঠিক আমাদের এই মা-গঙ্গার মতো! মা-গঙ্গার এই ধারা বহু জনপদ স্পর্শ করিয়া,



থিয়েটার ভুইরিণোতে রবীন্দ্রনাথ

বহু দেশকে উর্ব্বর করিয়া, বহু আবর্জ্জনা ভাসাইয়া, গ্লানি ঘুচাইয়া বহু ভূমিকে যেমন শুচিশুভ্র করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের ভাব-গতির ধারাও তেমনি মানব-মনের

কুসংস্কার ও বদ্ধ আবর্জ্জনা ধুইয়া, ক্ষুদ্রতাকে ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া, বহু চিত্তকে চিন্তায় ও কর্ম্মোৎসাহে উর্ব্বর করিয়া বহিয়াছে চিরদিন। গঙ্গার ধারা কালের স্পর্শে যেমন বিলুপ্ত জীর্ণ ক্ষীণ হইবার নয় —কবির ভাব-গতি-ধারাও তেমনি কোনো কালে বিলুপ্ত জীর্ণ বা ক্ষীণ হইবার নয়। এ ভাব-গতির ধারা জাতি, দেশ ও কালের সমস্ত ব্যবধান চূর্ণ করিয়া মহা-মানবের মহা-মিলনে যে কল্যাণ-সূচনার আভাস দেয়, সে কল্যাণকে কোনো দিন যদি আমরা সাধনায় বরণ করিতে পারি, তাহা হইলে মানুষ সেদিন শাশ্বত সুখ-শান্তির অধিকারী হইবে, —তার সকল বিরোধ, সকল অশান্তির বিলয় ঘটিবে!



দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষ মানুষ চিরদিন সুখ ও শান্তি চাহিতেছে। সেই সুখ ও শান্তি-লাভের যে সাধন-উপায় কবি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—ধর্ম্মে-কর্ম্মে, রাজ-নীতিতে—সে সাধন-প্রণালী বুঝিবার মতো সুবুদ্ধি যদি বিশ্ব-মানবের কোনো দিন সমুদিত হয়, তাহা হইলে মানুষের অগ্রগতিও কোনো দিন রুদ্ধ হইবে না। এ পথে দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে, সত্য। সে দুঃখে, সে মৃত্যুতে আমাদের ভীরু মন যদি সচকিত হয়, গতি যদি মন্থর হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষণে স্মরণ করিব আমরা কবির সেই বাণী—

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু
বিরহ-দহন লাগে ;
তবুও শান্তি তবু আনন্দ,
তবু অনন্ত জাগে।
তবু প্রাণ নিত্য ধারা, হাসে চন্দ্র সূর্য্য তারা
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে,
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অভিনয়



বিসর্জ্জন নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

[ঠাকুর-বাড়ীর অভিনয়—১৮৯৩



বিসর্জ্জন নাটকে—জয়সিংহ ও রঘুপতি

রঘুপতি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

[জয়সিংহ—অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বার্ষিক বসুমতী—১৩৩৩]

[ঠাকুর-বাড়ীর অভিনয়—১৮৯০



বাল্মীকি-প্রতিভায়—দস্যুগণ ও বাল্মীকি

দক্ষিণ হইতে—বাল্মীকি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দস্যু-সর্দ্দার—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দস্যুগণ—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়গণ।

বার্ষিক বসুমতী—১৩৩৩] [ঠাকুর-বাড়ীতে লেডী ল্যান্সডাউনের সম্বর্দ্ধনার অভিনয়—১৮৯৩



“কৃপাণ খর্পর ফেলে দে—দে— বাঁধন কর ছিন্ন—মুক্ত কর এখনি রে !”

—বাল্মীকি-প্রতিভা।

বালিকা—শ্রীমতী অভিজ্ঞা দেবী। অন্যান্য ভূমিকা—৩য় চিত্র দেখুন।

[ঠাকুর-বাড়ীতে লেডী ল্যান্সডাউনের সম্বর্দ্ধনার অভিনয় বার্ষিক বসুমতী—১৩৩৩]



“—যাও লক্ষ্মী অলকায়—যাও লক্ষ্মী অমরায় এসো না—এসো না এ দীন-জন কুটীরে !”

—বাল্মীকি-প্রতিভা।

বাল্মীকি—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লক্ষ্মী—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, এম্-এ।

[ঠাকুর-বাড়ীর অভিনয়।

বার্ষিক বসুমতী—১৩৩৩]

কবিবরের স্বহস্তলিখিত কবিতা

শেষ

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কি অপূর্ব বেশ,
কি মহিমা!
জ্যোতিহীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি'
যায় গলি',
গড়ে' তোলে অসীমের অলঙ্কার।
হয় সে অমৃত পাত্র, সীমার ফুরালে অহংকার।
শেষের দীপালি রাতে, হে অশেষ
অমা-অন্ধকাররন্ধ্রে দেখা যায় তোমার উদ্দেশ॥

ভোরের আকাশে
শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে,
তারা-হারা রাত্রির বীণার
চরম ঝঙ্কার।
যামিনীর অশ্রুহীন বিদায়ের বাণী
প্রভাত আকাশে লেখে, করুণ মাধুরী
শেষ করে' যায় তার,
উদয় সূর্যের পায়ে শান্ত নমস্কার।
দুঃখের কঠিন দিন
ম্লান ক্ষীণ,
শেষ-অশ্রুর বিন্দু সম সন্ধ্যার সমীরে
চলে ধীরে আঁধারের তীরে —

অমনি সোনার পাত্র হতে
কি অজস্র স্রোতে
তাহারে করাও স্নান অন্তিমের সৌন্দর্য্যধারায়?
যখন বর্ষার মেঘ নিঃশেষে হারায়
বর্ষণের সকল সম্বল,
শরতে শিশুর জন্ম দাও তারে শুভ্র সমুজ্জ্বল;—
হে অশেষ তোমার অঙ্গনে
ভাবমুগ্ধ তব সাথে ক্ষণে ক্ষণে
খেলাবারে রঙের খেলায়,
ভাসাবে সোনার ভেলা,
বিচিত্র করিয়া তোলে তব শেষ বেলা।

তবু আমি, তারি লাগি অন্তর উৎসুক,—
যত দূরে আছে সেই খেলা-ভরা মুক্তির সম্মুখ।
রবি যথা গোধূলিতে শেষ দানভরে,—
বেণুচ্ছায়াঘন পথে অন্ধকারে ফিরে যায় ঘরে,
সেইমত, হে সুন্দর, মোর অবসান
তোমার মাধুরী হতে
সুধাস্রোতে
ভরে দিতে চায় তব দিনান্তের দান।

হে জীবন, হে সর্ব্বগত
অকস্মাৎ
মোর সুপ্ত চিত্ত হতে কবে
চরম বেদনা-উৎস মুক্ত করি' অগ্নি-মহোৎসবে
অন্তরের যত দুঃখ, যত অসম্মান
উচ্ছ্বসিত রুদ্রহাস্যে করি' দিবে মোর দীপ্যমান ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭ অক্টোবর
১৯২৪
স্টীমার আণ্ডিস
Equator পার হয়ে
আজ দক্ষিণ মেরুর
মুখে ॥

বার্ষিক বসুমতী—১৩৩২

স্মৃতি

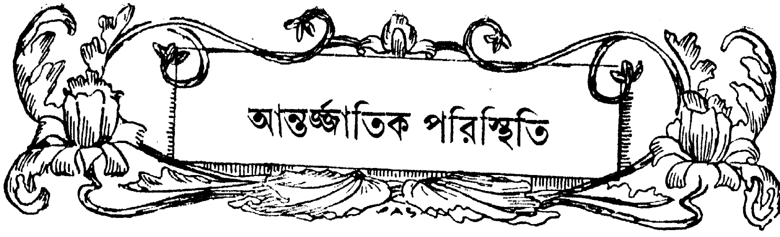
তোমার প্রীতি করুণ স্মৃতি
যেন শ্যামলি-কলিকা
নয়ন জলে পরাণতলে
উঠিল ফুল ফুটিয়া।
সজলঘন মেঘের ছায়ে
দুটি সুবাস দিলো বিছায়ে,
না-দেখা কোন পরশ-ঘায়ে
পড়িলো টল-টলিয়া

তোমার বাণী-সুরখানি
আজি বাদলপবনে
নিশীথে বারি-পতনসম
ধ্বনিছে মম শ্রবণে।
সে বাণী যেন গানেতে লেখা
দিতেছে আঁকি' সুরের রেখা
যে পথ দিয়ে তোমার, প্রিয়ে,
চরণ গেল চলিয়া ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ আষাঢ়
১৩৩৪

বার্ষিক বসুমতী—১৩৩৪]



সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সঙ্ঘর্ষ—

জুন মাসের শেষ ভাগে পূর্ব্ব-য়ুরোপের সার্দ্ধ-সহস্র মাইলব্যাপী রণক্ষেত্রে যে ভীষণতম সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, এখনও তাহার প্রাবল্য বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতায় এই সংগ্রাম বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয়। ইহাতে দুই মাসে জার্ম্মাণীর ২০ লক্ষ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইয়াছে; ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪ বৎসরব্যাপী যুদ্ধে জার্ম্মাণীর ইহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল। দুই মাসে সোভিয়েট রুশিয়ার সৈন্যক্ষয়ের পরিমাণ ৭ লক্ষ; গত মহাযুদ্ধে ইহার এক-ত্রয়োদশাংশ মাত্র জারের সৈন্যক্ষয় হয়।

পূর্ব্ব-য়ুরোপের এই বিরাট্ যুদ্ধ সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সঙ্ঘর্ষ নামে অভিহিত হইলেও বস্তুতঃ ইহা ৮ কোটি নরনারী-অধ্যুষিত জার্ম্মাণীর সহিত ১৬ কোটি অধিবাসীপূর্ণ সোভিয়েট রুশিয়ার যুদ্ধ নহে—ইহা সমগ্র য়ুরোপের বিরুদ্ধে রুশীয় নর-নারীর স্বাধীনতা সংগ্রাম। জার্ম্মাণীর অনুগত কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ভাবেই জার্ম্মাণীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছে; অন্য শক্তিগুলি সৈন্য বা সমরোপকরণ, অথবা উভয়ের দ্বারাই তাহাকে সাহায্য করিতেছে। ফ্রান্সের শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠান, স্কোডার অস্ত্র-নির্ম্মাণের কারখানা, রুমানিয়া ও গ্যালিসিয়ার তৈল, সুইডেনের লৌহ, নরওয়ের পশুচর্ম্ম ও কাষ্ঠ, বলকান অঞ্চলের কৃষিসম্পদ প্রভৃতি আজ জার্ম্মাণীর করায়ত্ত। এই সকল উপাদান জার্ম্মাণীর আসুরিক শক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে; এই শক্তি আজ প্রায় সমগ্র ভাবেই সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োজিত।

পূর্ব্ব-য়ুরোপের যুদ্ধ তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম অধ্যায়ে জার্ম্মাণ-বাহিনী অতর্কিত ভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিয়া বহু সোভিয়েট বিমান ধ্বংস করে, এবং সোভিয়েট রুশিয়ার পশ্চিম দিকের প্রসারিত সীমান্তে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করে। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাময়িক বিরামের পর জার্ম্মাণ-বাহিনী দ্বিতীয়বার প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ পরিচালন করে। এইবার রুশিয়ার রাজধানী মস্কোর উদ্দেশে স্মলেনস্ক অঞ্চলে তিন সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধে প্রচুর সৈন্য ও সমরোপকরণ ক্ষয় করিবার পর জার্ম্মাণ-বাহিনী স্মলেনস্কের ধ্বংসস্তূপে নাৎসী-পতাকা উড্ডীন করে; কিন্তু তাহাদিগের গতি রুদ্ধ হয়। তাহার পর, আগষ্ট মাসের প্রথম হইতে জার্ম্মাণ-বাহিনীর তৃতীয় আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। এই আক্রমণের প্রথম ভাগে সমগ্র রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণদিগের বেগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল; দক্ষিণ রণক্ষেত্রে তাহারা বিশেষ সাফল্যও অর্জ্জন করে। সম্প্রতি তাহারা এক অভিনব রণনীতি অবলম্বন করিয়াছে; যে তিন জন সেনাপতি রুশ-বাহিনী পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদিগের পারস্পরিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রত্যেকের সেনাদলকে পৃথগ্‌ভাবে পরাভূত করিবার জন্য জার্ম্মাণ-বাহিনী সচেষ্ট হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আক্রমণ আরম্ভ হইবার পর দক্ষিণে ইউক্রেণ প্রদেশে নীপার নদীর পশ্চিমে প্রায় সমগ্র অঞ্চল জার্ম্মাণদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে; তবে, এক দল সুদক্ষ সোভিয়েট বীর এখনও ওডেসা বন্দর রক্ষা করিতেছে। এই অঞ্চলের রুশ সেনাধ্যক্ষ মার্শাল বুদেনী নীপার নদীর পূর্ব্বতীরে নূতন রক্ষাব্যূহ রচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি নীপার নদীর নিম্নভাগে পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন।

উত্তরে লেনিনগ্রাডের উদ্দেশে জার্ম্মাণ-বাহিনীর প্রচণ্ড অভিযান আরম্ভ হইয়াছে; এস্তোনিয়া হইতে জার্ম্মাণ-বাহিনী অগ্রসর হইয়া, কিঙ্গিসেপ্, সাণ্টা-রাস্তা, নভোগ্রোড্ প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করে। সম্প্রতি তাহাদিগের গতি মন্দীভূত হইলেও লেনিনগ্রাড নিরাপদ নহে; এই অঞ্চলের রুশ অধিনায়ক মার্শাল ভোরোশিলফ লেনিনগ্রাড রক্ষার জন্য বিরাট্ আয়োজন করিয়াছেন।



মার্শাল ভোরোশিলফ্

মধ্য-রণক্ষেত্রে গোমেল্ অঞ্চলে জার্ম্মাণরা একটি আক্রমণে বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল; সম্প্রতি সেখানে রুশ-বাহিনীর প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হয়। ইহাতে তাহারা সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই সাফল্যের জন্য দক্ষিণ-ইউক্রেণে সোভিয়েট-বাহিনীর পরিবেষ্টিত হইবার সম্ভাবনা অপসারিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব-য়ুরোপের যুদ্ধের সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায়, জার্ম্মাণরা

রিগা-মস্কো রেলপথে ভিলিকাই-লুকি নামক জংশন-ষ্টেশনটি অধিকার করিয়াছে। এই অঞ্চলটি উত্তর-রণক্ষেত্রের রুশ অধিনায়ক মার্শাল ভোরোশিলফ্‌ এবং মধ্য-রণক্ষেত্রের অধিনায়ক মার্শাল টিমোসেঙ্কোর বাহিনীর সংযোগস্থল। জার্ম্মাণ-বাহিনী এই অঞ্চলে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ পরিচালিত করিয়া ঐ দুইটি বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিতে চাহিতেছে। মধ্য-রণক্ষেত্রে গোমেল অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালিত করিয়া জার্ম্মাণরা মার্শাল টিমোসেঙ্কো ও মার্শাল বুদেনীর বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। এই ভাবে শত্রুর অটুট প্রতিরোধ-প্রাচীর ভেদ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে তিনটি বাহিনীকে পরাভূত করাই জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য।

দুই মাসের অধিক কাল পূর্ব্ব-য়ুরোপে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিবার পর এখন নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে—এই যুদ্ধের চরম জয়-পরাজয় সুদূরবর্ত্তী। সোভিয়েট রুশিয়া আশা করে, সমগ্র শীতকাল এবং আগামী বৎসর গ্রীষ্মকালেও এই যুদ্ধ চলিবে; সুদীর্ঘ যুদ্ধের জন্যই সে প্রস্তুত হইতেছে। জার্ম্মাণীও না কি দ্রুত সাফল্য লাভের আশা ত্যাগ করিয়াছে; শীতকালীন অভিযানের জন্য সে-ও প্রস্তুত হইতেছে।

সুদীর্ঘ সংগ্রামে জার্ম্মাণীর বিজয় অসম্ভব। জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-রণক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিবার সময় বৃটেন দ্রুত প্রস্তুত হইতেছে। ঐ অঞ্চলে জার্ম্মাণীর শক্তি ক্ষয়ের পর বৃটেন যদি প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর পরাজয় নিশ্চিত। তবে, কোন বিশেষ কারণে বৃটেনে যদি রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটে, এবং নাৎসীবিরোধী চার্চ্চিল, ইডেন প্রভৃতি ক্ষমতাচ্যুত হন, তাহা হইলে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—সমুদ্রবক্ষে নাৎসী-সাবমেরিণের উপদ্রবে বৃটেনে অন্ন-সমস্যা যদি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, তাহা হইলে বৃটেনে নাৎসীবাদ ও কম্যুনিজমের সঙ্ঘর্ষে ঔদাসীন্য প্রদর্শনের অনুকূলে জনমত সংগঠিত হইবার আশঙ্কা আছে। তখন হিটলারের শান্তির প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবার জন্য মন্ত্রিসভার প্রতি প্রভাব প্রযুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে; তাহার ফলে চার্চ্চিল-ইডেন ক্ষমতাচ্যুত হইতে পারেন। অবশ্য, এখনও এইরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই; বৃটেনের সামুদ্রিক বাণিজ্যের অবস্থা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়াই জানা যাইতেছে। বিশেষতঃ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখন বৃটেনের বাণিজ্য-জাহাজ গমনাগমনে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতেছে; আইস্‌ল্যাণ্ডে মার্কিণী সৈন্য যাইবার পর হইতে ঐ দ্বীপটি পর্য্যন্ত বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজ মার্কিণী রণপোতের রক্ষণাধীনে যাইতেছে।

সোভিয়েট রুশিয়া যদি বৃটেনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে বঞ্চিত হয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও যদি হুভার-লিণ্ডবার্গের দল প্রবল হইয়া উঠে, তাহা হইলেও রুশ-বাহিনীর পরাজয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে না। গত দুই মাসের যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে—জার্ম্মাণী কিছু অঞ্চলগত সুবিধা লাভ করিলেও সোভিয়েট-সেনাবাহিনী এখনও অটুট আছে; তাহারা কোন স্থানে ছত্রভঙ্গ হয় নাই। প্রবল শত্রুর আক্রমণে সুশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণে পরাজয় নিকটবর্ত্তী হয় না। দুই মাস পরেও বাল্‌টিক সাগরে সোভিয়েট প্রভুত্ব অটুট আছে; অন্তরীক্ষেও সোভিয়েট-আধিপত্য যে হ্রাস পায় নাই, তাহার প্রধান প্রমাণ—মস্কো ও লেনিনগ্রাডে জার্ম্মাণীর বিমান আক্রমণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এমন কি, সোভিয়েট-বিমান বার্লিনেও আক্রমণ চালাইতেছে।

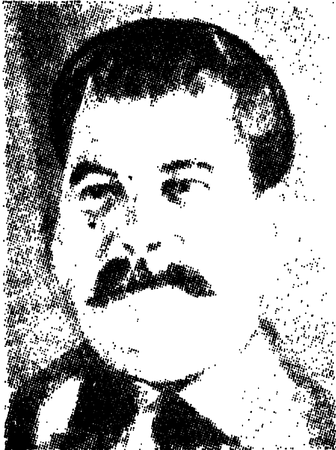
যে সকল অঞ্চল জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারাও সে উপকৃত হইতেছে না। ষ্ট্যালিনের নির্দ্দেশে রুশিয়ার শ্রমিক ও কৃষক তাহাদিগের পরিত্যক্ত অঞ্চল শ্মশানে পরিণত করিতেছে। জার্ম্মাণবাহিনী কোথাও তাহাদিগের অধিকৃত অঞ্চলে এক মুষ্টি অন্ন অথবা এক ইঞ্চিও আশ্রয় পাইতেছে না—নূতন স্থানে উপস্থিত হইয়া জার্ম্মাণ সৈন্য চতুর্দ্দিকে ধ্বংসের ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিতেছে; আর মধ্যে মধ্যে লুক্কায়িত গরিলা সৈন্যের চোরা-গুলী দ্বারা তাহারা অভিনন্দিত হইতেছে। সমৃদ্ধ নগর, উর্ব্বর ভূমি, ফল-পুষ্পশোভিত উদ্যান—সবই যেন ষ্ট্যালিনের যাদুমন্ত্রে অকস্মাৎ ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইতেছে।

তাহার পর, রুশিয়ার গরিলা-বাহিনী। জার্ম্মাণ-অধিকৃত অঞ্চলে ইহারা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক সুহৃদেহ


মার্শাল টিমোসেঙ্কো


মার্শাল বুদেনী

কৃষক এই গরিলা-বাহিনীতে যোগদান করিয়া শত্রু-পুরীতে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং অতর্কিতে আক্রমণ পরিচালন করিয়া শত্রুর রসদ লুণ্ঠন করিতেছে, পেট্রোলের ট্যাঙ্কে অগ্নি-সংযোগ করিতেছে, পথঘাট ধ্বংস করিতেছে। রুশ গরিলা সৈন্যের অসাধারণ বীরত্বে সমগ্র জগৎ আজ বিস্ময়বিমুগ্ধ! গরিলা-যুদ্ধ যে কত দূর ভয়ঙ্কর, এবং অর্দ্ধভুক্ত, ছিন্ন বেশ-পরিহিত মৃত্যুঞ্জয়ী গরিলা-সৈন্য যে কি অসাধ্য সাধনে সমর্থ, তাহা প্রবল প্রতাপী মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে মারাঠা দিগের যুদ্ধে, জার শাসিত রুশিয়ায় নিহিলিষ্ট-দিগের কার্য্যে, আয়র্লণ্ডে বিপ্লবী দলের বীরত্বে, প্যালেষ্টাইনে আরব-বিদ্রোহে, এবং চীনে কম্যুনিষ্ট-বাহিনীর সামরিক প্রচেষ্টায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। রুশিয়ার গরিলা-যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, গরিলা যোদ্ধ‌্গণ আধুনিক সমরোপকরণ ব্যবহারের সুযোগ পাইতেছে, এবং বিমানযোগে ও অন্যান্য উপায়ে সোভিয়েট সমর-বিভাগের সহিত তাহাদিগের সংযোগ রক্ষিত হইতেছে।



মঃ ষ্টালিন

গত আষাঢ় মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে বলিয়াছি, পূর্ব্ব-য়ুরোপের এই যুদ্ধ দুই দেশের বেতনভুক্ সেনাবাহিনীর যুদ্ধ নহে; ইহা জার্ম্মাণ-বাহিনীর সহিত সমগ্র রুশ নরনারীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম। এ কথা যে কত দূর সত্য, তাহা রণক্ষেত্রে রুশ-সৈন্যের দৃঢ়তায়, এবং রুশ গরিলা সৈন্যের দুঃখ-বরণে প্রতিপন্ন হইতেছে। রণক্ষেত্রে রুশ-সৈন্য বন্দী হইয়া কিছুতেই নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চাহে না। জার্ম্মাণ-সেনাপতি তাহাদিগের এই "নির্ব্বুদ্ধিতার" জন্য যথেষ্ট অনুযোগও করিয়াছেন। রুশিয়ার এই দৃঢ়তা, তাহার রাজ্যগত বিশালতা ও বিপুল সম্পদের বিষয় বিবেচনা করিয়া নিশ্চিত বলা যাইতে পারে, সোভিয়েট রুশিয়া যদি শত্রুর সহিত একাকীও যুঝিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলেও তাহার পরাজয়ের আশঙ্কা নাই; সুদীর্ঘ কাল সঙ্ঘর্ষের পর যুদ্ধ অচল অবস্থা (Stalemate) প্রাপ্ত হইবে।

রুজভেল্ট-চার্চ্চিল সাক্ষাৎকার—

আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে জাহাজে পরস্পরের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই আলোচনার পর আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে বিশ্ব-শান্তি সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের নীতি ঘোষিত হইয়াছে। এই আট দফা ঘোষণাবাণীতে বড় বড় কথা আছে। বিশ্বশান্তির এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; বিপদের সময় এইরূপ গালভরা প্রতিশ্রুতি-প্রদান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বৈশিষ্ট্য। গত মহাসমরের সময় যে সকল কথা বলা হইয়াছিল, তাহা এত শীঘ্র বিস্মৃত হওয়া যায় না। তাহার পর, প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের চৌদ্দ দফায় সমগ্র জগতে গণতন্ত্র নিরাপদ হইবার পরিবর্ত্তে ভণ্ডামীই যে নিরাপদ হইয়াছিল, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আইরিস্ ঐতিহাসিকের ভাষায়—"Instead of making the world safe for democracy as he (President Wilson) promised, he made it safe for hypocrisy."

রুজভেল্ট-চার্চ্চিল সাক্ষাৎকারের পর সোভিয়েট রুশিয়াকে মার্কিণী সাহায্য-প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে; এই সম্পর্কে



মিঃ হুভার

সত্বর মস্কৌএ এক সম্মেলন হইবে। গত জুন মাসে জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক সোভিয়েট রুশিয়া আক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই মার্কিণ সরকারের পক্ষ হইতে ঘোষিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রকে সাহায্যদান করিবেন। ইহাতে মিঃ হুভার মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়া বলেন, এই সাহায্যদানের ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের পোষকতা সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতির নৈতিক মূল্য হ্রাস পাইবে। ইহার কিছু পরেই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কথায় জানা গিয়াছিল—মিঃ হুভার যে ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, তাহাদিগের "নীতিজ্ঞান ক্রয়" করিবার উপযোগী প্রচুর উপকরণ সোভিয়েট রুশিয়ার আছে; সে নগদ মূল্যেই পণ্য ক্রয় করিবে। আটলাণ্টিক-সম্মিলন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের

পর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সেই কথাটি স্মরণ করাইয়া বলিয়াছেন, ইজারা ও ঋণদান সম্পর্কিত বিধান সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না; পণ্যের মূল্য প্রদানের সামর্থ্য তাহার আছে। কাঞ্চন-মূল্যের যাদুস্পর্শে মার্কিণী ধনিকদিগের কম্যুনিজম্-বিদ্বেষ কত সহজে বিদূরিত হইতে পারে, তাহা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জানেন। ইহার পর, কম্যুনিষ্ট রুশিয়াকে পণ্যপ্রদানে আপত্তি দূরে থাকুক, নগদ মূল্যে পণ্য-বিক্রয়ের জন্য মার্কিণী ধনিকদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়াই স্বাভাবিক।

মার্কিণী পণ্যে সোভিয়েট রুশিয়া যে বিশেষ ভাবেই উপকৃত হইবে, তাহা সত্য। বিশেষতঃ, জার্ম্মাণীর আক্রমণে তাহার কৃষি ও শ্রমশিল্পে সমৃদ্ধ ইউক্রেণ অঞ্চল এখন বিপন্ন; তাহার সর্ব্বপ্রধান তৈলকেন্দ্র ককেসাস্ বিপন্ন হইবার সুদূরবর্ত্তী সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু পশ্চিম-য়ুরোপে অথবা অন্য কোথাও যদি এখন জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে বৃটেনের পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ হইত, তাহা হইলেই সোভিয়েট রুশিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হইত। সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইবার পর মঃ লিটভিনফ্



মঃ লিট্ভিনফ্



রসিদ আলি

এই আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্যই বৃটেনের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন। জার্ম্মাণী এবং জার্ম্মাণ-অধিকৃত অঞ্চলে বৃটেনের বিমান-আক্রমণ ব্যতীত স্থলভাগে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনের কোন প্রয়াসের এখনও অভাব। জুলাই মাসের মধ্যভাগে যে ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাহাতে হিটলারী জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আশা হইয়াছিল, এই চুক্তির পর বৃটেন হয় ত প্রত্যক্ষ আক্রমণ আরম্ভ করিবে। বিশেষতঃ, মিঃ চার্চ্চিল ঐ সময় এক বক্তৃতায় বলেন—"The German air-superiority has been broken," অন্তরীক্ষে জার্ম্মাণীর প্রাধান্যের জন্যই বৃটেনের পক্ষে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালন সম্ভব নহে বলিয়া পূর্ব্বে রটান হইয়াছিল। কাজেই, মিঃ চার্চ্চিলের এই উক্তির পর বৃটেনের প্রত্যক্ষ আক্রমণের সঙ্গত আশা সকলে করিয়াছে। বিশেষতঃ, জার্ম্মাণী এখন পূর্ব্ব-য়ুরোপে বিশেষ ভাবে বিব্রত—বিপন্ন বলিলেও হয় ত অত্যুক্তি হয় না।

অন্যত্র আক্রমণ পরিচালন করিয়া পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণ-বাহিনীর বেগ হ্রাস করিবার পরিবর্ত্তে সোভিয়েট রুশিয়াকে সাহায্যদানের এই ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়—জার্ম্মাণীকে পূর্ব্ব-য়ুরোপে দীর্ঘকাল নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে। চীনের প্রতিরোধ-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া জাপানকে ঐ রাজ্যে আটক রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং সেই সুযোগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র শক্তি সঞ্চয় করিতেছে; বৃটেনও প্রাচী সম্পর্কে কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। সেইরূপ এখন সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিরোধ-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া জার্ম্মাণীকে ঐ রাজ্যে আটক রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে; সেই সুযোগে বৃটেন স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। সুদীর্ঘ সংগ্রামে সোভিয়েট রুশিয়ার কতকগুলি প্রধান প্রধান শ্রমশিল্প-কেন্দ্র ও তৈল-উৎপাদনকেন্দ্র যদি তাহার হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে বৃটিশ ও মার্কিণী সাহায্যে তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে বটে, কিন্তু তাহাকে ক্রমে পরনির্ভরশীল হইতে হইবে।

ইরাণে ইঙ্গ-সোভিয়েট সমর-প্রচেষ্টা

গত মে মাসে ইরাকে বিদ্রোহের সময় হইতে ইরাণে জার্ম্মাণদিগের সন্দেহজনক গতিবিধির কথা শুনা যাইতেছিল। তাহার পর, ইরাকের বিদ্রোহী নেতা রসিদ আলি এবং প্যালেষ্টাইনের আরব নেতা গ্রাণ্ড মুফতী (ইনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইন হইতে পলায়ন করিয়া সিরিয়ায় যান) ইরাণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইরাণের শ্রমশিল্প কেন্দ্রে এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিভাগে জার্ম্মাণরা কার্য্য করিতেছিল। বৃটিশ এবং সোভিয়েট সরকার আশঙ্কা করেন—এই সকল জার্ম্মাণ ঐ রাজ্যে বিশেষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল; সুযোগ উপস্থিত হইলেই সোভিয়েট রুশিয়া এবং বৃটেনের চরম অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইত। এই জন্য তাঁহারা জার্ম্মাণদিগকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য ইরাণী সরকারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ইরাণী সরকার ঐ রাজ্যে জার্ম্মাণদিগের অবস্থানে গুরুত্ব আরোপ করিতে অস্বীকার করেন। তাহার পর, গত ২৫শে আগষ্ট বৃটিশ ও সোভিয়েট বাহিনী সম্মিলিত ভাবে ইরাণে প্রবেশ করে। তাহারা কতকগুলি স্থান অধিকার করে। ইরাণী সরকার প্রতিরোধ-প্রয়াস ত্যাগ করিয়া মীমাংসার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সোভিয়েট রুশিয়া ও বৃটেনের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তাঁহারা ইরাণ রাজ্যে কোন প্রকার সুবিধা

চাহেন না, কেবল জার্ম্মাণদিগের ষড়যন্ত্র বিফল করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, ইরাণে প্রায় তিন সহস্র জার্ম্মাণের সন্দেহজনক অবস্থিতি সোভিয়েট রুশিয়া ও বৃটেনের পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ। ইরাণ হইতে পশ্চিম দিকে ইরাক, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, এমন কি, সুয়েজও বিপন্ন হওয়া সম্ভব। ভারতবর্ষ ইরাণের অদূরে অবস্থিত। বিশেষতঃ, ইরাণের পেট্রল শত্রুকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে পারে। সোভিয়েট রুশিয়ার বাকুর তৈলকূপগুলি পর্য্যন্ত ইরাণের অদূরবর্ত্তী। এই কূপগুলি হইতে তাহার শতকরা ৭১ ভাগ তৈল উত্তোলিত হয়। বিশেষতঃ, জার্ম্মাণ-বাহিনী এখন কৃষ্ণসাগরের উত্তর-তীরপথে ঐ দিকেই অগ্রসর হইতেছে। জার্ম্মাণসৈন্য পূর্ব্ব দিকে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে ইরাণ প্রবাসী জার্ম্মাণগণ হয় ত নিজমূর্ত্তি ধারণ করিত, এবং তাহার ফলে ঐ রাজ্যে অনায়াসে নাৎসী-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত।


ইরাণের শাহ রেজা খাঁ পহ্লবী

ইরাণে ইঙ্গ-সোভিয়েট প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে রুশিয়ায় বৃটিশ ও মার্কিণী সাহায্য প্রবেশ সহজসাধ্য হইবে; কারণ ইরাণের মধ্য দিয়াই রুশিয়ায় গমনের সংক্ষিপ্ততম পথ বর্ত্তমান। ইহা ব্যতীত ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত মিত্রশক্তির রক্ষাপ্রাচীর নির্ম্মিত হইবে। তুরস্কের উপর ইহার প্রভাব পতিত হওয়া স্বাভাবিক। সিরিয়ায় বৃটিশ-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তুরস্কের পূর্ব্ব-সীমান্তেও যদি মিত্রশক্তির প্রভাব স্থাপিত হয়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে তুরস্ক জার্ম্মাণীর সহিত নিজের ভাগ্য গ্রথিত করিতে ইতঃস্তত করিবে।

সুদূর প্রাচী—

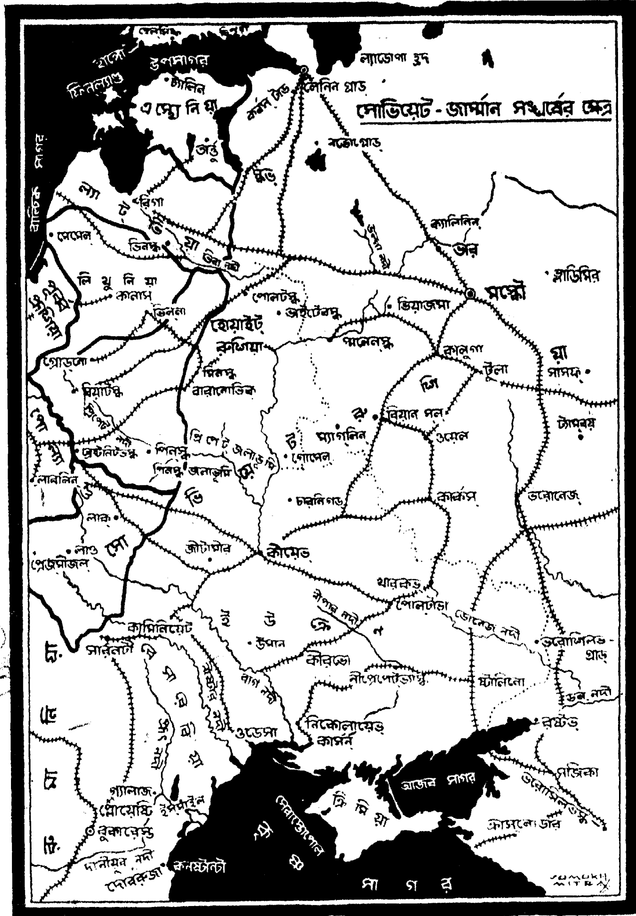
জাপান জুলাই মাসের মধ্যভাগে মন্ত্রিসভার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ মাসের শেষে ইন্দোচীনে সামরিক প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। মন্ত্রিসভা হইতে পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুয়োকাকে অপসারণের প্রয়োজন হইয়াছিল; কারণ, তিনি জাপানের শান্তিপূর্ণ মনোভাবের কথা একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ভিসি কর্ত্তৃপক্ষ হয় ত জার্ম্মাণীর ইঙ্গিতে ইন্দোচীন সম্পর্কে জাপানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। গত ২৫শে জুলাই জাপানের সহিত ভিসি-কর্ত্তৃপক্ষের যে চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে জাপান ইন্দোচীনের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সম্মিলিত ভাবে ঐ রাজ্যের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে; কার্য্যতঃ, সে দক্ষিণ ইন্দোচীনে ২টি নৌঘাঁটী এবং ৮টি বিমানঘাঁটী লাভ করিয়াছে। ক্যামরাণ উপসাগর ও সাইগণের নৌঘাঁটী জাপানের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কাম্বোডিয়ায় সীম্-রীপ, কম্পংথম্ ও নম্-পেনের বিমানঘাঁটী, কোচীন-চায়নায় সক্‌ট্রাং, সাইগণ ও বীনহোয়া বিমানঘাঁটী এবং আনামে নাগাট্রাঙ্গ ও টোরেণের বিমানঘাঁটী জাপানের কবলে গিয়াছে।


মস্কোএ মিঃ মাৎসুয়োকা রুশিয়ার সহিত নিরপেক্ষতা-চুক্তি স্বাক্ষর করিতেছেন

দক্ষিণ-ইন্দো-চীনে জাপানের এই সামরিক আয়োজনে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহারা জাপানকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সম্পত্তি আটক করিয়াছেন।

ইন্দো-চীনের পর জাপান থাইল্যাণ্ড সম্পর্কেও সন্দেহজনক উক্তি করিতেছিল। কিন্তু থাইল্যাণ্ডের পক্ষ হইতে দৃঢ়তা সহকারে বলা হয় যে, সে আক্রমণকারীকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিরোধ করিবে; ইহার ফলে যদি সে নিশ্চিহ্ন হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। এই দৃঢ়তা প্রকাশের পর জাপানের সুর কিছু নামিয়াছে; কারণ, সে জানে, থাইল্যাণ্ড যদি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে। তবে, জাপান এখন কৌশলে কূটনীতিক প্রভাব প্রয়োগ করিয়া থাইল্যাণ্ডকে স্বদলভুক্ত করিবারই প্রয়াস করিতেছেন।

কিছু কাল হইতে মাঞ্চুকো-সাইবেরিয়া সীমান্তে জাপানী সৈন্য সমাবেশের কথা শুনা যাইতেছে। অথচ, সোভিয়েট-জাপান নিরপেক্ষতা চুক্তির পর মাঞ্চুকো-মঙ্গোলিয়ার সীমানা নির্দ্ধারণের জন্য যে মিশ্র কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহারা কার্য্য বন্ধ করেন নাই। সম্প্রতি তাঁহাদের কাজ শেষ হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।



জাপান সোভিয়েট-রুশিয়া সম্পর্কে এক নূতন চাল চালিয়াছে; সে সোভিয়েট সরকারকে জানাইয়াছে যে, তাহার রাজ্যের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র দিয়া মার্কিণী পেট্রল ও অন্যান্য পণ্যের রুশিয়ায় প্রবেশ সে সহ্য করিবে না। সোভিয়েট সরকার জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদিগের স্বাভাবিক বাণিজ্যাধিকারে যদি জাপান আপত্তি করে, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ কার্য্য শত্রু-মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিবেন।

বলা বাহুল্য, জাপান এই ভাবে পরোক্ষে জার্ম্মাণীকে সাহায্য করিতেছে। সে জানে, সোভিয়েট রুশিয়া এখন যে ভাবে পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাপৃত, তাহাতে জাপানের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় সে প্রবৃত্ত হইবে না। অথচ, জাপান যদি এই সময় জার্ম্মাণীর মন যোগাইয়া চলে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ত্রিশক্তির চুক্তি অনুসারে সে এশিয়ায় মোড়লী করিবার অধিকার পাইবে। চীনে সোভিয়েট-সাহায্য প্রবেশ সম্পর্কে কঠোরতা-প্রবর্ত্তনের পরোক্ষ উদ্দেশ্যেও জাপান সোভিয়েট রুশিয়াকে এই ভাবে চাপ দিতে পারে।

শ্রীঅতুল দত্ত।

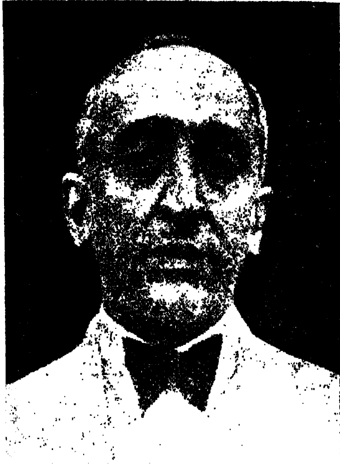
অস্তরবি

আত্মার আত্মীয়রূপে ছিলে তুমি প্রিয় সবাকার,
আনন্দ-মূরতি রবি তুমি নাই,—সব অন্ধকার!

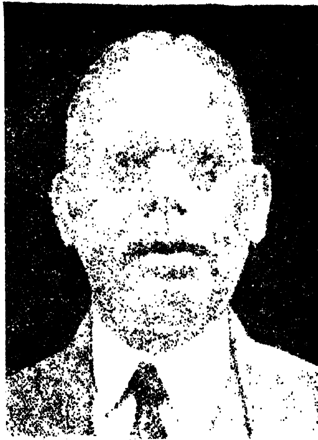
শ্রীবঙ্কুবিহারী রায়।

পরিষদের প্রসার-বৃদ্ধি

ভারত-সরকারের শাসন-পরিষদের দেহের পূর্ব্বাপেক্ষা স্ফীতি-বিধান হইয়াছে। ৫ই শ্রাবণ সিমলা হইতে ভারত-সরকার যে ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে, বড় লাটের শাসন-পরিষদের দেহ কিছু বর্দ্ধিত করা হইয়াছে, এবং নাগরিক রক্ষাসাধন-সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। ঐ ইস্তাহারে



সার হোরমসজী পি, মোদী



সার সুলতান আমেদ

বলা হইয়াছে, যুদ্ধ উপস্থিত, সুতরাং কাজের ভীড় অত্যন্ত বাড়িয়াছে; সেই জন্য শাসন-পরিষদে আরও ৫ জন অধিক সদস্য গ্রহণ করা হইতেছে। শাসন-পরিষদে সদস্য-সংখ্যা ছিল—বড়লাট ও জঙ্গীলাট সমেত ৮ জন। ইহার উপর আর ৫ জন অতিরিক্ত সদস্য লওয়ায় উহার সংখ্যা দাঁড়াইল ১৩ জন। এই ১৩ জনের মধ্যে বড়লাট এবং জঙ্গীলাট ত থাকিবেনই,—অবশিষ্ট ১১ জনের মধ্যে তিন জন য়ুরোপীয় সিভিলিয়ানের অতিরিক্ত বাকী ৮ জন সদস্য হইলেন ভারতবাসী। যথা (১) সরবরাহ বিভাগে সার হোরমসজী পি মোদী, (২) সমাচার-বিভাগে রাইট অনারেবল্ সার আকবর হায়দারী, (৩) নাগরিক আত্মরক্ষা-বিভাগে ডক্টর ই, রাঘবেন্দ্র রাও, (৪) শ্রম-বিভাগের মালিক সার ফিরোজ খাঁ নূন, (৫) সাগরপারস্থ ভারতবাসীর জন্য মিষ্টার এম, এস, এনি, (৬) শিক্ষা-স্বাস্থ্য-ভূমি বিভাগে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, (৭) আইন-সদস্য হইলেন সার সুলতান আমেদ, (৮) বাণিজ্য-বিভাগে দেওয়ান বাহাদুর সার এ, রামস্বামী মুদেলিয়ার।

এখন জিজ্ঞাস্য, যুদ্ধ বাধিলে কাজের ভীড় বাড়ে কাহাদের? যে মন্ত্রীর হাতে দেশ-রক্ষার ভার আছে, তাঁহার কাজই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাড়িয়া যায়। তাহার পর অর্থ-সচিবের কাজও অনেক বাড়ে। তাঁহাকে অনেক বিষয় সম্বন্ধেই চিন্তা করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, যানবাহন-বিভাগের সদস্যেরও কাজ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়। এই তিন জন সদস্য যথাপূর্ব্ব তথাপর কায়েমীই রহিলেন। তবে সাবেক মন্ত্রীদিগের মধ্যে সার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ ছিলেন আইন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য, এবং ভারতীয় সিভিলিয়ান সার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী ছিলেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং ভূমিবিভাগের সদস্য। ইঁহাদের দুই জনই অন্য কাজে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের স্থানে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমি সম্পর্কিত বিভাগের কার্য্য করিবেন, আর সার সুলতান আমেদ সার মহম্মদ জাফরুল্লার স্থানে আইন-সচিবের পদ পাইলেন। ভারতসচিব মিষ্টার আমেরী এই সংবাদটা বিলাতের কমন্স সভায় সমুচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন, ভারতের জন্য আর চিন্তা নাই, তাহার মোক্ষলাভ অদূরবর্ত্তী!

বৃটিশ পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যই ভারত সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ; তাই তাঁহারা হয় ত মনে করিয়াছেন, মিষ্টার আমেরী ভারতবাসীকে ভয়ঙ্কর বিরাট একটা অধিকার দান করিয়া ফেলিয়াছেন! বস্তুতঃ, বৃটিশ শাসন-পরিষদের সদস্যের সহিত ভারতীয় শাসন-পরিষদের সদস্যের প্রভেদ যে কত অধিক, তাহা তাঁহাদের বুদ্ধির আয়ত্তাতীত। কিন্তু ইহাতে ভারতবাসীর ক্ষতি ভিন্ন কোন দিক দিয়াই লাভ হয় নাই। প্রথম ক্ষতি, শাসন-কার্য্য-পরিচালনে ব্যয়বৃদ্ধি। এই ৫ জন অতিরিক্ত মন্ত্রীর বেতন বাবদ বার্ষিক অন্যূন ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইল। ইহা ভিন্ন সেক্রেটারিগণের বেতন ও অন্যান্য খরচ 'বোঝার উপর শাকের আঁটি'। সে ব্যয়ও অল্প নহে, লক্ষ লক্ষ টাকা!

তাহার পর এই পাঁচ জন বা সাত জন মন্ত্রী যে ভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, কোন মতে তাহার সমর্থন করা যায় না। ভারতীয় শাসনপরিষদের সদস্য হইলেও ইঁহারা ভারতবাসী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত নহেন, বড় লাট কর্ত্তৃক মনোনীত। সত্য বটে, ইঁহারা বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্য; কিন্তু সে নির্ব্বাচন এ ক্ষেত্রে কি গণতন্ত্রসম্মত? বিলাতের ব্যবস্থা এরূপ নহে। বিলাতে শাসন পরিষদের সদস্যরা জনসাধারণের নির্ব্বাচিত-নেতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত, তাহা কমন্স সভার অধিকাংশ সদস্যের অনুমোদিত। অবশ্য, কেহ হয় ত বলিবেন, বিলাতের ন্যায় ব্যবস্থা এখন এখানে অচল। কিন্তু মার্কিণ মুলুকে যে সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্র চলিত আছে, তাহার ব্যবস্থাও এরূপ বে-আবেদা নহে।

আমাদের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদ আছে সত্য, কিন্তু সম্রাটের মনোনয়নই চূড়ান্ত। কাজেই এই মনোনয়নকে গণতন্ত্র-সম্মত ব্যবস্থা বলা যায় না। ইহা অবশ্য আইনের দোষ। গান্ধীজীও বলিয়াছেন, কংগ্রেস ইহা চাহেন না।

—সার তেজ বাহাদুরপ্রমুখ মডারেট দল যাহা চাহিয়াছিলেন, এই ব্যবস্থায় তাহাও দেওয়া হয় নাই। মডারেট দল সমস্ত বিভাগের কার্য্যই ভারতবাসীর হস্তে ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু সরকার আসল বা মূল বিভাগের ভার, যথা—দেশ-রক্ষা, অর্থ, এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভার বিশ্বাস করিয়া ভারতবাসীর হস্তে ছাড়িয়া দিতে পারেন নাই। কংগ্রেস যাহা চাহিয়াছেন, তাহা করিতে হইলে আইনের পরিবর্ত্তন করিতে হইত, ইহা সত্য। কিন্তু মডারেটরা যাহা দিতে বলিয়াছিলেন—তাহাতে সম্মত হইলে ত আইনের পরিবর্ত্তন করিতে হইত না। তবে তাঁহারা তাহা করিলেন না কেন? তাহা করিলেই তাঁহাদের শুভেচ্ছা সূচিত হইত। মিষ্টার জয়াকর বলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রস্তাবে যদি সরকার সম্মত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে এ দেশের জনসমাজ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিত। কিন্তু সরকার তাহা করিলেন না দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে, এ দেশের দেশরক্ষা কার্য্যে সরকারের চেষ্টা আন্তরিক নহে। সরকারী ব্যবস্থা দেখিয়া দেশের বহু লোকেরই এ কথা মনে হইয়াছে।

মিষ্টার আমেরী বলিয়াছেন, যে সকল লোককে তাঁহারা ভারত-সরকারের শাসন-পরিষদে লইয়াছেন, "যোগ্যতায় এবং অভিজ্ঞতায় ভারতে বা ভারতের বাহিরে অন্য কোন দেশে তাঁহাদের জুড়িদার পাওয়া ভার।" যদি উহা তাঁহার বা তাঁহার দলের আন্তরিক কথা হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীর হস্তে দেশরক্ষা, অর্থ, এবং স্বরাষ্ট্র-বিভাগের ভার না দেওয়ার কারণ কি? সরকারের মনোনীত সদস্যদিগের যোগ্যতা সম্বন্ধে যখন তাঁহাদের এত উচ্চ ধারণা, তখন তাঁহাদিগকে ঐ সকল বিভাগের ভার না দেওয়াতে কি এ দেশবাসীর উপর তাঁহাদের ঘোর অবিশ্বাসই সূচিত হয় না?

গত ১১ই শ্রাবণ পুণা সহরে মডারেট নেতাদিগের যে পরামর্শ পরিষদ বসিয়াছিল, ভারতের বহু রাজনীতিক ধুরন্ধর তাহাতে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ জয়াকর যথার্থই বলিয়াছেন, "সরকার চিরদিনই ভারতবাসীকে যে ভাবে অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, এখনও সেইরূপ অবিশ্বাস করিতেছেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—বড় লাট তাঁহার বিশ্বস্ত অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এ কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু কর্ম্মচারীরা কেহই ত চিরস্থায়ী নহেন; লাট, বড়লাটদিগকেও গদী ত্যাগ করিতে হয়, অন্যের ত কথাই নাই; তবে এই আয়ার বিলাপ কেন? শ্রীযুত জয়াকর বলিয়াছেন যে, বলা হইয়াছে—



শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার



ডক্টর ই, রাঘবেন্দ্র রাও



সার ফিরোজ খাঁ নূন



মিঃ এম, এস, এান

সামন্ত রাজ্যের রাজন্যবর্গ বড়লাটের শাসন-পরিষদে সমস্ত পদ ভারতবাসীদিগকে প্রদান করিতে সম্মত হইবেন না। জয়াকর মহাশয় এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। সামন্ত রাজ্যের রাজারা সরকারী রাজনীতিক বিভাগের প্রভাবমুক্ত হইতেই চাহেন; শাসন-পরিষদ লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহেন না। ইহা সত্য কথা। ইংরেজ রেসিডেন্টের মোলায়েম ব্যবহারে তাঁহারা সরকারী বাংসল্যের যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যে বড়লাটের শাসন-পরিষদে ইংরেজ অভিভাকের অভাব দেখিলে তাঁহাদের বিরহে অশ্রুবর্ষণ করিবেন, এরূপ আশার অবকাশ কোথায়?

মিষ্টার আমেরী বলিয়াছেন, কাজের ভীড় অত্যন্ত অধিক হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাদিগকে এই ঘোর অপব্যয়জনক কার্য্য করিতে হইতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, কোনও সদস্য কাজের ভীড় অত্যন্ত অধিক হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন কি?



সার রামস্বামী মুদেলিয়ার



সার আকবর হায়দারী

ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকিষণ বলিয়াছেন, গত দেড় শত বৎসর বৃটিশজাতি ভারতে যে শাসন চালাইয়া আসিয়াছেন, তাহা খাঁটি স্বৈরশাসন; উহার ফলে আমরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়াছি। ইংরেজ জাতি অহিংসা-ধর্ম্মে একান্ত আস্থাবান্ বলিয়া ভারতবাসীদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছেন, অথবা পৃথিবীর জনসঙ্ঘকে বৈরাগ্য-মন্ত্রে দীক্ষাদানের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা কি বিশ্বাস-যোগ্য? কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ভারতবাসীরা ইংরেজের সহযোগে রণক্ষেত্রে বৈরীর সহিত সংগ্রাম করিতেছে। সার জয়াকিষণ কৌল বলেন, ভারতে বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য দায়ী—সরকার। তিনি সুস্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন, বৃটিশ সরকারকে এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ এবং এক সম্প্রদায়ের সমর্থন-নীতি ছাড়িয়া দিতে হইবে।

সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, কোন রাজনীতিক কারণে বা সাম্প্রদায়িক কারণে শাসন-পরিষদের প্রসার-বৃদ্ধি করা হয় নাই। মুখে বলিলেই বা হাতে-কলমে লিখিলেই একটা অনুসৃত কার্য্যপদ্ধতির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না। যখন শাসন-পরিষদের আসল আদি এবং মূল কাজের বিভাগগুলি য়ুরোপীয়দিগের হাতে রাখিয়া কেবল কতকগুলি অবান্তর বা গুরুত্বহীন বিভাগের ভার দেশীয়দিগের হস্তে অর্পিত হইল, তখন তাহাতে রাজনীতিক রঞ্জন দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু যখন সাম্প্রদায়িক অনুপাত ছাড়াইয়া সম্প্রদায়বিশেষকে অধিক পদ দেওয়া হইয়াছে, তখন কেহ উহাকে সাম্প্রদায়িক-দোষদুষ্ট বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাহার প্রতিবাদ করিবার উপায় আছে কি? মিষ্টার আমেরী বার বার উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন,—"গত বৎসরের আগষ্ট মাসে সরকার যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন,—ইহাতে তাহাই দেওয়া হইয়াছে,—একটুও রদ-বদল করা হয় নাই।" এ কথা বলিবার সার্থকতা কি? দেশের লোক কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সরকার যাহা দিয়াছেন, তাহা অশ্ব-ডিম্বের সহিতই তুলনীয়? আর মিষ্টার আমেরী সেই একই কথা বার বার বলিয়া লোকের মনে আঘাত করিতেছেন যে, ইহাতে আইনের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, এবং যখন সর্ব্বজন একমত হইয়া একটা রফা করিবে—তখনই শাসনযন্ত্র-সম্পর্কিত আইনের পরিবর্ত্তন করা হইবে। এ হেঁদো কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারে—ভারতবাসীর সেটুকু বুদ্ধি আছে—ইহা কি তাঁহার বুঝিবার শক্তি নাই?

তাহার পর এই ইস্তাহারেই সরকার সিভিল ডিফেন্স-কাউন্সিল বা নাগরিক আত্মরক্ষা-পরিষদ গঠনের কথা বলিয়াছেন। এই পরিষদের কাজ বিশেষ গুরু বা দায়িত্বপূর্ণ হইবে না। "দুই মাসে এক-বার করিয়া এই পরিষদের অধিবেশন হইবে, এবং বড়লাট ইহার চেয়ারম্যান বা সভাপতি হইবেন। 'গুপ্ত-প্রকোষ্ঠে' এই পরিষদের অধিবেশন হইবে,—ইহার কথা যাহাতে বাহিরে জাহির না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরিষদের সদস্যরাই কেবল ইহাতে উপস্থিত থাকিবেন; তবে বড়লাটের অভিপ্রায় অনুসারে এবং আমন্ত্রণে শাসন-পরিষদের সদস্যগণ অথবা অন্য কোন রাজপুরুষ ইহাতে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। প্রত্যেক অধিবেশনে পরিষদের কার্য্য ত হইবেই, অধিকন্তু ইহার সদস্যগণ যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ ও গোপনীয় বিবরণ জানিতে পারিবেন, এবং সরবরাহ ব্যাপারের অবস্থাও জানিতে পারিবেন। প্রাদেশিক সরকারের এবং কেন্দ্রী সরকারের সামরিক চেষ্টায় মিলনসাধক রূপেও এই পরিষদকে কার্য্য করিতে হইবে।"

এই নাগরিক দেশরক্ষা-পরিষদের হস্তে বিশেষ যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হইয়াছে, ইহা বুঝা যাইতেছে না। সামরিক ভাবে দেশরক্ষার ভার এই পরিষদের হাতে একেবারেই থাকিবে না। সে ভার থাকিবে য়ুরোপীয়দিগের হস্তে। এই বিভাগের কার্য্য হইবে,—যে সকল লোক বিমান আক্রান্ত স্থান হইতে পলায়ন করিবে, তাহাদিগকে অথবা যাহারা গোলাবর্ষণে-বিধ্বস্ত স্থানে গৃহহীন ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবে, তাহাদিগকে সাহায্য করা এবং রক্ষা করা; অর্থাৎ কাজটা অনেকটা রেডক্রস-সোসাইটীর ও সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স-সমিতির কার্য্যের অনুরূপ। ডক্টর ই, রাঘবেন্দ্র রাওয়ের উপর এই বিভাগের ভার অর্পিত হইবে। তিনি বিলাতে—এ কার্য্যের কিছুই জানেন না। তবে তিনি বিলাতের সিভিল-ডিফেন্স সমিতির নিকট শিক্ষানবিশী করিয়া এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ইনি আইনজ্ঞ মন্ত্রীর কার্য্যে দক্ষ, এবং অতি অল্প দিন মধ্যপ্রদেশের শাসনকর্ত্তার কাজও করিয়াছিলেন। সে হিসাবে তিনি যোগ্য লোক সন্দেহ নাই; কিন্তু নাগরিক অধিকার-রক্ষায় তাঁহার অভিজ্ঞতা কোথায়? তাঁহাকে তাহা শিখিতে হইবে। সে দিকে তাঁহার বুদ্ধি কিরূপ খুলিবে—তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। আর যাঁহারা এই পরিষদের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে আর্ত্তত্রাণ-কার্য্যে কত দূর পারদর্শী, তাহা বুঝা কঠিন। অনেকে সাম্প্রদায়িক ভাবে ভরপুর। বাঙ্গালার প্রধান সচিব মিষ্টার ফজলুল হক উহার এক জন সদস্য।—পূর্ব্ববঙ্গের ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখিয়া ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সকল সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া, এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য উঁহাদের কতকগুলি লোক দ্বারা পরিচালিত হইলে কিরূপ হইবে, তাহা বুঝা যায়। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "যখন উপদ্রুত অঞ্চলে সহস্র সহস্র লুঙ্গী প্রেরিত হয়, অথচ একখানিও ধুতি প্রেরিত হয় না, তখন ইহাকে অন্নবস্ত্রহীন হিন্দুদিগের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া জাতীয়তা লইয়া খেলা করা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।"—এইরূপ মনোভাবসম্পন্ন মনস্বীরা যদি নাগরিক আত্মরক্ষা-পরিষদের সদস্য হন, তাহা হইলে তাহাতে হিন্দুদিগের লাভ কতটুকু হইবে, তাহাও বিচার্য্য। এই প্রতিষ্ঠানে সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, সার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, সার মুথিয়া চেটিয়ার, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জন ধনবান্ ব্যবসায়ী আছেন; কিন্তু তাঁহারা হাতে-কলমে কতটা কাজ করিবেন, তাহাও বলা যায় না। অথচ বড়লাটের সহিত তাঁহাদের পরামর্শ করিতে যাইবার বারবরদারী প্রভৃতি বাবদ টাকা এই দরিদ্র দেশের জনসাধারণের উপর ট্যাক্স বসাইয়াই আদায় করা হইবে। বস্তুতঃ, ইহার দ্বারা লাভ কিছু হইবে না, অথচ খরচ হইবে বহু লক্ষ টাকা, এমন কি, কোটি টাকাও হইতে পারে।

—

বস্ত্রের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

১৫ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত বাঙ্গালা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, যুদ্ধের পর হইতে ধুতি, সাড়ী, লুঙ্গী প্রভৃতি বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি সরকার পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। জুলাই মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বস্ত্রের মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্ব-মূল্য অপেক্ষা শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সরকার বলেন, তূলা, মিলের উপকরণ ও রংএর মূল্য বৃদ্ধি ও যুদ্ধের জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন বস্ত্রাদির মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ। সরকার বলিয়াছেন, তাঁহারা ফাটকাবাজীর জন্য মূল্যবৃদ্ধি সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা অতিরিক্ত লাভের পথ কঠোর হস্তে বন্ধ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। আমদানিকারক ও পাইকারী বিক্রেতাগণকে মাল মজুত না করিয়া বিক্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্যথা সরকার মাল মজুত রাখা বন্ধ করিতে ও বস্ত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে বাধ্য হইবেন বলিয়াছেন। জাপানী কাপড় ও সূতা আর আমদানী হইতেছে না। সূতার মূল্যবৃদ্ধির জন্য অনেক তাঁত বন্ধ হইয়াছে। গত জ্যৈষ্ঠ মাসেই সরকারের ফাটকাবাজী নিবারণ জন্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য ছিল। সূতার মূল্য যেরূপ বাড়িয়াছে, তাঁতের কাপড়ের মূল্য সে অনুপাতে বর্দ্ধিত হয় নাই।

—

বাঙ্গালায় অন্ন-সমস্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গত ১০ই ভাদ্র বাণিজ্য ও শ্রমিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মিঃ এইচ, এস, সুরাবর্দ্দি বলিয়াছেন,—সরকার মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আলোচনা করিতেছেন, এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গালা সরকার ভারত সরকারের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন। চাউল সম্পর্কে সরকার বাঙ্গালায় মজুতের অবস্থা এবং চাউলের মূল্য সম্বন্ধে সর্ব্বদা বিবেচনা করিতেছেন। গত বৎসর বাঙ্গালায় যথেষ্ট পরিমাণে ফসল উৎপন্ন না হওয়ায় এবং ব্রহ্মদেশের চাউলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

চাউল মজুত সম্বন্ধে বৎসরের প্রথম ভাগে অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়াছিল। কারণ, বোম্বাইয়ে চাউলের দর বৃদ্ধি হওয়ায় কোচিন হইতে কলিকাতায় মাল প্রেরিত না হইয়া বোম্বাইএ প্রেরিত হইত। কিন্তু সরকারের হস্তক্ষেপণের ফলে এখন বাঙ্গালায় প্রচুর চাউল আমদানী হইতেছে। একমাত্র কলিকাতার বাজারে এক লক্ষ মণ চাউলের স্থলে দশ লক্ষ মণ চাউল মজুত হইয়াছে। ব্যবসায়িগণ যাহাতে অতিরিক্ত লাভ করিতে না পারেন, তজ্জন্য কলিকাতায় ও মফঃস্বলে নিয়মিত তদন্ত করা হইবে। আরাকান হইতে যে চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, ব্রহ্ম সরকার ঐ আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং আরাকান হইতে প্রচুর চাউল আমদানী হইয়াছে। চাউলের দর কমিয়াছে,—বর্ম্মা চাউল প্রতিমণ পাঁচ টাকা এক আনা দরে কলিকাতায় বিক্রয় হইতেছে। ইহাই সরকারের বিবৃতি।

কিন্তু বাঙ্গালা সরকার ইতিপূর্ব্বে অধিক পরিমাণ চাউল ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করিলে বাঙ্গালায় চাউলের মূল্য হ্রাস হইতে পারিত। বস্তুতঃ, কলিকাতায় চাউলের মূল্য কিছু কমিলেও মফঃস্বলে মূল্য হ্রাস হয় নাই। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কি ভাবে কলিকাতা হইতে চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করিতে পারেন, সরকারী বিবৃতিতে তাহা বলা হয় নাই! মফঃস্বলে চাউলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। মফঃস্বলে যাহাতে চাউলের মূল্য হ্রাস হয়, সরকারকে সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এ বিষয়ে তাঁহারা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে জনসাধারণকে অনাহারে থাকিতে হইবে। সরকার এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অবিলম্বে যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করুন।

রুজভেল্টের নিকট সাভারকরজীর নিবেদন

মিষ্টার রুজভেল্ট মিষ্টার চার্চিলের সম্মিলনের পর, হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকর মার্কিণ রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেল্টের নিকট ৪ঠা ভাদ্র তার করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—ইঙ্গ-মার্কিণ সমরোদ্দেশ্য সংক্রান্ত ঘোষণা ভারত সম্বন্ধে প্রযোজ্য কি না, এবং যুদ্ধাবসানের পর এক বৎসরের মধ্যে ভারত যে পূর্ণ রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভ করিবে, মার্কিণ এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছে কি না, তাহা তিনি কি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবেন? মার্কিণ ইহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইলে ভারতবাসীদের মনে হইবে—এই ঘোষণা জার্ম্মাণীর সহিত বৃটেনের গত যুদ্ধের সময়ের ঘোষণার মত ধাপ্পাবাজি মাত্র।

সাভারকরজী সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ মার্কিণ রাষ্ট্রপতির নিকট এই দরখাস্ত পেশ না করিলে আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না, কিন্তু স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ বহু দিন পূর্ব্বে আমাদের দেশবাসীর ব্যর্থ আন্দোলনে যে দুঃখপ্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আবেদন আর নিবেদনের থালা বয়ে বয়ে নত শির!'—এখনও সাভারকরজী যে তাহারই অনুসরণ করিয়া জগৎ সমক্ষে হিন্দু মহাসভার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিলেন, ইহাই ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয়। গত যুদ্ধের সময় মার্কিণ রাষ্ট্রপতি উইলসনের সুবিখ্যাত ১৪ দফার দুর্গতির কথা স্মরণ থাকিলে সাভারকরজী আশ্বস্ত হৃদয়ে এবার মার্কিণের কৃপাপ্রার্থী হইতে নিশ্চিতই কুণ্ঠা অনুভব করিতেন। এমন কি, মিঃ এটলী তাঁহার বক্তৃতায় যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ভারতের নাম পর্য্যন্ত ছিল না। ভারতবর্ষকে যুদ্ধের পর স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করিলে বিলাতী কর্ত্তৃপক্ষ ক্রমাগত বলিয়া আসিতেছেন,—'আগে তোমরা ঘর সামলাও', অথচ রাজনীতি ক্ষেত্রে ভেদমন্ত্র তাঁহাদের প্রধান আয়ুধ।

ইংরেজের নিকট প্রতিশ্রুতি না পাইয়া সাভারকরজী আশা করিয়াছেন, ইংরেজ এখন মার্কিণ সাধারণতন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, এ অবস্থায় মার্কিণ হইতে ঐ প্রকার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইলে ইংরেজ তাহা পালন করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু বৃটেন স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া কোন্ দিন কাহার কি উপকার করিয়াছে? জার্ম্মাণী অষ্ট্রিয়া অধিকার করিলে বা ইটালী আবিসিনিয়া দখল করিলে য়ুরোপের কোন জাতি তাহার প্রতিবাদ করে নাই। আজ যখন ইংরেজের স্বার্থের জন্য হাইলে সেলাসীকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন হইল, তখনই ইংরেজ আবিসিনিয়ার পক্ষ সমর্থন করিল। ভারত বৃটিশ রাজমুকুটের শ্রেষ্ঠতম রত্ন, ইংরেজ সেই ভারতের স্বাধীনতা দান করিবে, এবং ইংরেজ আজ বিপন্ন বলিয়া তাহার সাহায্য করিতে আসিয়া মার্কিণ জাতি তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নে বঞ্চিত করিবে,—এক দিকে হিত চেষ্টায় অন্য দিকে তাহাকে নিঃস্ব করিবে, সাভারকরজীর ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ কিরূপে এরূপ আশা করিলেন, তাহা দেশের লোকের বুদ্ধির অগোচর! ফ্রান্স যখন জার্ম্মাণীর নিকট আত্ম-সমর্পণের পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নিকট কাতর ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, যদি সে সময় ফ্রান্স প্রচুর মার্কিণ বিমানের সাহায্য পাইত, তাহা হইলে ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশ আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইত না। ইংলণ্ড আজ মার্কিণের যে সাহায্য লাভে সমর্থ হইয়াছে, ইহাও মার্কিণ সাধারণতন্ত্রের নিঃস্বার্থ পরোপকার নহে, মার্কিণের ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কাই এই সাহায্যের কারণ। এবং বৃটেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে অবজ্ঞাভরে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকেও এই কারণেই বৃটেন আজ বিপদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই ভারতের স্বাধীনতায় প্রতিশ্রুত হইয়া বৃটেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহার অসন্তোষভাজন হইবে, এরূপ আশা করিবার কোন কারণ নাই।

—

দেশরক্ষা পরামর্শ-পরিষদ

রাজপ্রতিনিধির সুপারিশ অনুসারে ২১শে জুলাই দেশরক্ষা সংক্রান্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন অনুমোদিত হইয়াছে। আগামী মাসে উক্ত দেশরক্ষা পরামর্শ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন হইবে।' এই পরিষদে প্রায় ত্রিশ জন সদস্য থাকিবেন। দেশ-রক্ষা পরিষদে বৃটিশ ভারতের নিম্নলিখিত প্রতিনিধিরা থাকিবেন,—

ডাক্তার বি, আর, আম্বেদকার, আসামের প্রধান সচিব মৌলবী সৈয়দ সার মহম্মদ সাদুল্লা, বাঙ্গালার প্রধান সচিব মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, ছত্তরির নবাব সার মহম্মদ আহম্মদ সৈয়দ খাঁ, চেটিনাদের কুমার রাজা সার মুথিয়া চেটিয়ার, দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ, সার মাধব রাও দেশমুখ, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল সার হেনরী গিডনি, সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর। খল্লিকোটের রাজা রাজা বাহাদুর, মালিক খোদাবক্স খাঁ, শ্রীযুত যমুনাদাস মেটা, মিঃ জি, বি মট, শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লেফটেনাণ্ট সর্দ্দার নাউনিহল সিং, বেগম সা নওয়াজ, পঞ্জাবের প্রধান সচিব খাঁ বাহাদুর সার সিকান্দর হায়াৎ খাঁ, রাও বাহাদুর এম, সি, রাজা, অধ্যাপক ই, আমেদ সা, সিন্ধুর প্রধান সচিব খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স, মহম্মদ উমর সুমরো, সার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এবং খাঁ বাহাদুর সার মহম্মদ ওসমান। এতদ্ভিন্ন, ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির যে চারি জন সদস্য দেশরক্ষা পরামর্শ-পরিষদের সদস্য হইতে সম্মত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম (১) শ্রীযুত লালা রামশরণ দাস (২) মিঃ ভি, ভি, কালিকর (৩) সার মহম্মদ ইয়াকুব এবং (৪) সর্দ্দার ভুটা সিং। এই বিভাগের জন্য এক জন অতিরিক্ত সেক্রেটারী গ্রহণ করা হইবে। ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল সার গুরুনাথ বেউর আই, সি, এস এই অতিরিক্ত সেক্রেটারীর পদ পাইবেন। তিনি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে দেশরক্ষা-বিভাগের মুখপাত্র ও দেশরক্ষা পরামর্শ-সমিতির সেক্রেটারী হইবেন।

জঙ্গী লাট বলিয়াছেন, ভারতবাসীরা যদি বৃটিশ জাতিকে সাহায্য করিতে ও সহযোগিতায় সঙ্কুচিত হইতেন, তাহা হইলে সিরিয়া অধিকার করা সম্ভব হইত কি না, বলা কঠিন। ভারতের জনবল ও সমর-সম্ভার সাহায্য না পাইলে মধ্য প্রাচীর অভিযান এ ভাবে সফল হইত না—ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়। ভারতের দুইটি বিশিষ্ট দল অসহযোগিতা করিতেছে, এজন্য তিনি দুঃখিত। ভারতের ন্যায় বিশাল দেশ রক্ষা করিতে হইলে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রচুর সৈন্যের প্রয়োজন, এজন্য সকল প্রদেশ হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করা উচিত। পরামর্শ-পরিষদেও সকল সম্প্রদায় হইতে বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গকে গ্রহণ করা উচিত। মস্লেম লীগের সদস্যগণ এই সমিতিতে থাকিতে

পারিবেন বলিয়া মনে হয় না; কারণ, ইঁহাদের অনেকেই পদত্যাগ করিতেছেন, না করিলে শাস্তিদানের ভয়-প্রদর্শন করা হইয়াছে।

নূতন করের কল্পনা

নানা কারণে ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, এ বিষয়ে সমাজের উচ্চ, নীচ সকলেই সমান অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। যাহারা অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহারা হয় কৃষিজীবী না হয় শিল্পী; কিন্তু এই উভয় শ্রেণীরই অর্থোপার্জ্জনে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত। যে অল্পসংখ্যক লোক ব্যবসায় বাণিজ্যে নির্ভর করেন, তাঁহাদেরও ব্যবসায় প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। জাপান ও জার্ম্মাণ পণ্য বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের অনেকে অর্থোপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু এই উভয় দেশের পণ্য সংগ্রহ করিবার আর উপায় নাই। প্রকাশ, এবার সরকারী বজেটে বিস্তর টাকার ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা। জাপ-ভারত বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং পেট্রল-নিয়ন্ত্রণের ফলে ভারত-সরকারের তহবিলে অর্থাভাব হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই; ইহার প্রতিবিধানকল্পে সরকারকে নূতন কর বসাইতে হইবে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এই অনুমান কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনাই সমধিক। সরকারের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তহবিলে অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু কেবল আমাদিগকে নহে, সরকারকেও এজন্য চিন্তিত হইতে হইবে, হয় ত এখনই তাঁহারা চিন্তা করিতেছেন; কারণ, যত উপায়ে কর ধার্য্য হইতে পারে, তাহার কোন উপায়ই সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই! দেশের লোকও দুঃসাধ্য হইলেও সেই সকল কর জোগাইয়া আসিয়াছে; আর কি নূতন কর ধার্য্য হইতে পারে? প্রজারা মাথা নাড়িয়া বলিতে পারে—

"স্থান নাই, স্থান নাই, ছোট এ তরী
তোমারই করের ভারে গিয়াছে ভরি!"

কিন্তু ইতিমধ্যেই বাজারে নানা গুজব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, কেহ বলিতেছেন—আয়করের পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত হইবে; কেহ বলিতেছেন, অন্য কোন নূতন কর আবিষ্কৃত হইবে। এ বিষয়ে আবিষ্কার-কার্য্য কঠিন নহে, মস্তিষ্ক এবং কাগজ-কলমের সংযোগে ইহা সংসাধিত হয়। জনরব, রাজস্ব-সচিব না কি এক অতিরিক্ত বজেটে প্রস্তাব পেশ করিবেন। ভারতবাসী পিঠে হাত দিয়া দেখিতেছে—আর স্থান কোথায়? জনরবের পরিণাম কি, সকলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহাই চিন্তা করিতেছেন। এদিকে যুদ্ধও অবিরাম গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

ভারত-ব্রহ্ম-চুক্তি

ভারতবাসীর ব্রহ্মদেশে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য এক চুক্তি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাকে চুক্তি বলা ভুল; কারণ,—কোন স্বাধীনবৃত্ত ভারতবাসী বা ব্রহ্মবাসী এই চুক্তি করেন নাই,—চুক্তিটা হইয়াছে ভারত সরকার ও ব্রহ্ম সরকারের মধ্যে। ইহাতে একরকম সরাসরি ভাবেই ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীর প্রবেশ-পথ প্রায় রুদ্ধ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেশে অত্যন্ত অধিক সংখ্যক ভারতবাসী প্রবেশ করায় ব্রহ্মবাসীদিগের আর্থিক ব্যাপারে অনেক অসুবিধা ঘটিতেছে; তাই ব্রহ্মবাসীরা তাহাদের দেশে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ভারতবাসীদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করিতেছে। কিন্তু কথাটা সত্য বলিয়া মনে হয় না; কারণ, ব্রহ্মদেশে কেবল ভারতবাসীই প্রবেশ করিতেছে না; চীনা, প্রভৃতি বিদেশীরাও ব্রহ্মে প্রবেশ করিতেছে। প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে সকল বিদেশীরই ব্রহ্মদেশে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। মগদিগেরও ভারত-প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। কারণ, কোন একদেশদর্শী চুক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডফরিণের আমলে যখন ব্রহ্মদেশ জয় করা হয়, তখন ভারতীয় সৈন্যগণের সাহায্যেই এই কর্ম্মটি সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হয়, তখন ভারতবাসীরাই ব্রহ্মদেশে যাইয়া উহার শাসন-ব্যবস্থায় সহায়তা করিয়াছিল। ভারত সরকারের তহবিল হইতে ব্রহ্মবিজয়ের ব্যয়ভার বহন করা হইয়াছিল বলিয়া ব্রহ্মদেশ ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় আজ শাসন-সংস্কার ব্যপদেশে ব্রহ্মদেশকে স্বতন্ত্র করিয়া উহাতে ভারতবাসীর প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া কোন্ যুক্তিতে সঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? এই চুক্তি অসঙ্গত ভাবে কঠোর হইয়াছে। এখন হইতে নিয়ম অনুসারে পাসপোর্ট বা গমনের অনুমতি-পত্র ভিন্ন কোন ভারতবাসীই আর ব্রহ্মদেশে যাইতে পারিবেন না। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই হইতে নয় বৎসরের মধ্যে কোন ভারতবাসী যদি ৭ বৎসর কাল ব্রহ্মদেশে বাস করিয়াছেন বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারেন, তবেই তিনি ব্রহ্মদেশে ও ভারতে স্বাধীন ভাবে যাতায়াত করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার ব্যবসায় বাণিজ্য ও সম্পত্তিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না। যে সকল ভারতীয় ব্রহ্মদেশে জন্মিয়াছেন, এবং তথায় যদি তাঁহাদের স্থায়ী স্বার্থ থাকে, তাহা হইলেই তাঁহারা ব্রহ্মদেশের ডোমিসাইল বা স্থায়ী বাসেন্দা বলিয়া গণ্য হইবেন। ছাড়-পত্র ৩ প্রকার হইবে। (ক)-শ্রেণীর ছাড়পত্র-প্রাপ্ত ভারতবাসীরা ব্রহ্মে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বাস করিতে এবং চাকুরী গ্রহণ করিতে পারিবেন। (খ)-শ্রেণীর ছাড়পত্র-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বড় জোর ব্রহ্মদেশে তিন বৎসর কাল বাস করিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহারা ডোমিসাইল বা স্থায়ী বাসেন্দার অধিকার পাইবেন না। (খ)-শ্রেণীর ছাড়পত্র-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা (ক)-শ্রেণীর ছাড়পত্র-প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন। (ক)-শ্রেণীর অনুমতি-পত্রের ফিস হইবে ৫ শত টাকা আর (খ)-শ্রেণীর অনুমতি-পত্রের ফিস হইবে ১২ টাকা, এবং প্রবেশ-ফিস লাগিবে ৫ টাকা। ইহা শ্রমিকদিগের জন্য। শ্রমিক ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের লোককে (খ)-শ্রেণীর ছাড়পত্রের জন্য প্রবেশ-ফি ৩০ টাকা, এবং প্রবাস-ফি দিতে হইবে ২০ টাকা। ইহা ভিন্ন (গ)-শ্রেণীর ছাড়পত্রও আছে; তাহা বিস্তৃত ও জটিল, অথচ গোল টেবিল বৈঠকে ব্রহ্ম সাব-কমিটীতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, ভারতবাসীর পক্ষে ব্রহ্ম-প্রবেশে কোনরূপ বাধা দেওয়া হইবে না। ব্রহ্মদেশ হইতে যে সকল প্রতিনিধি ঐ সাব-কমিটীতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ইহাতে একটুও আপত্তি করেন নাই। ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের বিচ্ছেদও অনেক ব্রহ্মবাসী সমর্থন করেন নাই; কিন্তু তাহা হইলেও বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীর উপস্থিতিতেই ব্রহ্মবাসীদিগের আপত্তি। আজ ব্রহ্মদেশ যদি আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ভারতীয় সৈন্য দ্বারা

তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে ব্রহ্ম সরকার কি ইতস্ততঃ করিবেন? ইহার মধ্যেই তথায় বহু ভারতীয় সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। যখন ভারতের সাহায্য ব্যতীত ব্রহ্মদেশ রক্ষার অন্য উপায় নাই, তখন ভারতবাসীর ব্রহ্ম-প্রবেশের জন্য এত জটিল এবং কড়া নিয়ম করিবার কি অনিবার্য্য প্রয়োজন ছিল? তবে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ না করিলে সাম্রাজ্যবাদী হওয়া যায় না। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সবই সম্ভব।

বিদেশবাসের যে সকল নিয়ম সভ্যজনসমাজে প্রচলিত, গান্ধীজী সে সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এই ব্যবস্থার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই নিতান্ত স্বৈরিতা এবং স্বার্থপরতাপূর্ণ! ব্যাক্সটার রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ইহা বলিলে ভুল হয়। কারণ, উক্ত কমিশন কেবলমাত্র তথ্য সম্বন্ধেই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। উক্ত কমিশন বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা ব্রহ্মবাসীদিগের কাজ কাড়িয়া লয় নাই, তাঁহারা ব্রহ্মবাসীদিগের অনুষঙ্গীরূপে কার্য্য করেন। সুতরাং ব্রহ্মবাসীরা যে ভারতবাসীর তথায় গমনে আপত্তি করিয়াছেন, কেহই সে কথা বিশ্বাস করেন না। বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভাও ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ধীরপন্থী গান্ধীজীও বলিয়াছেন, ব্রহ্মবাসী ও ভারতবাসী যে বৃটিশ জাতি কর্ত্তৃক পদদলিত, এই চুক্তি তাহাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আসল কথা, বৃটিশ বণিকগণ অপ্রতিহত প্রভাবে ব্রহ্মদেশের সার শোষণ করিবেন বলিয়াই তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে ব্রহ্ম হইতে সরাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

——

বাঙ্গালার বাজার-নিয়ন্ত্রণ বিল

বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলী বাঙ্গালায় বাজার-নিয়ন্ত্রণ বিল নামে একখানি পাণ্ডুলিপি গত ১৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট সহ আলোচনার্থ উপস্থিত করিয়াছেন। গত বৎসর এই সচিবসঙ্ঘ বঙ্গীয় কৃষিজ পণ্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিল নামে আর একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আইন রচিবার ক্ষমতার দৌড় সত্ত্বেও সমর্থকের অভাবে বিলখানি সরকারকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সরকার ত আপনাদের আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিতে পারেন না। কাজেই তাঁহারা সেই বিলের নাম এবং ধরণটা পাল্টাইয়া 'বঙ্গীয় বাজার-নিয়ন্ত্রণ বিল' নামে আর একখানি বিল ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছেন। সিলেক্ট কমিটী তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। এই বিলে বাঙ্গালাদেশের বাজারের লাইসেন্স গ্রহণ এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা থাকিবার কথা। কৃষি-মন্ত্রী তামিজুদ্দিন খাঁ বিলখানি আলোচনার্থ উপস্থিত করিলে, কৃষক প্রজা-দলের সদস্য সৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমী উহা পুনরায় সিলেক্ট কমিটীর হাতে দিতে বলিয়াছেন। মিষ্টার হাসেমী বলেন, এই বিলখানির দ্বারা বাজারের বা চাষী প্রজাদের কোন উপকারই হইবে না। প্রকৃত পক্ষে ইহার অনেক ধারাই অবাঞ্ছনীয়। সত্য বটে, এখনও বাজারে দান, তোলা প্রভৃতির রেওয়াজ আছে এবং তাহা ক্ষেত্রবিশেষে ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের পক্ষে পীড়াজনক হয়, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে যে ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে,—তাহা অনেক ক্ষেত্রেই বিক্রেতাদিগের পক্ষে অধিকতর কষ্টকর হইবে। ইহার উপর বাঙ্গালার ইউনিয়ন বোর্ডের যেরূপ ব্যাপার, তাহাতে বাজারের নিয়ন্ত্রণভার ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে দিলে কখনই ভাল হইবে না। বিষয়টি গুরু, সুতরাং ব্যবস্থা পরিষদের সব দিক্ ভাবিয়া কাজ করা উচিত।

——

গণনায় গোল

সাম্প্রদায়িকতার কুফল যে কত দূর ব্যাপ্ত হইতে পারে, তাহা বাঙ্গালায় এবারকার লোকগণনা কার্য্যে গোলযোগ দেখিলেই বুঝা যায়। গতবার অনেক হিন্দু কংগ্রেসের নির্দ্দেশে লোক-গণনা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেজন্য বহু হিন্দু গৃহস্থ সেন্সসে নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সংখ্যা দেন নাই। কাজেই হিন্দুর সংখ্যা অনেক কম হইয়াছিল। ইহাতে মুসলমানদিগের এবং যে সকল শ্বেতাঙ্গ মুসলমানদিগের সহিত একমত হইয়া প্রদেশে মুসলমান-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট, তাহাদেরই স্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছিল। সেন্সাস হিসাবেও অনেক ভুল ধরা হইয়াছিল। এবার লোকগণনার সময় বাঙ্গালায় যে সচিবের হাতে লোক-গণনা কার্য্যের ভার ছিল, তিনি একেবারে কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরির ন্যায় নির্ব্বাক্ নিশ্চল ছিলেন। কিন্তু মুসলমান প্রধান সচিব ডাক দিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে সংখ্যাল্প প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। গায়ের জোরে বা পদমর্য্যাদার প্রভাবে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বারংবার বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার সেই সদম্ভোক্তি সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। এদিকে অন্যান্য প্রদেশের গণনার ফল প্রকাশিত হইলেও বাঙ্গালা প্রদেশের গণনা-ফল প্রকাশিত হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতে থাকিল। তাহাতে লোকের মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ সেন্সাস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত যে হিন্দু কর্ম্মচারীটি ছিলেন, তাঁহাকে সরাইয়া শিক্ষা বিভাগের এক সাব-ইনস্পেক্টরকে সেই পদ প্রদান করা হইয়াছিল। বিদ্যাবুদ্ধি কাহারও চাপা থাকে না। কাজেই এই ব্যাপারে লোকের অনেক সংশয় হইয়াছিল। এখন বাঙ্গালার সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার আর, এ, ডাচ, বলিতেছেন, "সব ঠিক হায়!" গতবার বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমানের যে তারতম্য ছিল, এবারও ঠিক তাহাই রহিয়াছে। এখনও কিন্তু ত্রিপুরা এবং কুচবিহার রাজ্যের হিসাব প্রকাশিত হয় নাই। আবার মুসলমানদিগের নিযুক্ত ফিরিঙ্গী লেখক বলিতেছেন যে, মুসলমানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে,—হিন্দুদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না। তাহাই কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে, হিন্দুর অবস্থা হীন হইতেছে, শাসন প্রভাবে হিন্দু জনসাধারণ নিঃস্ব হইয়া মরিতেছে?—আর মুসলমানগণ সম্পন্ন ও বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে? আমরা এ কথা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। মিষ্টার ডাচ বলিতেছেন যে, তিনি পূজার ছুটির সময় বাঙ্গালার লোকগণনার হিসাব বাহির করিবেন। এত বিলম্ব দেখিয়াই ত মনে নানা সন্দেহ জন্মে। এত হাঙ্গামা না করিয়া সোজা কথায় বলিলেই হয় যে, বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের মধ্যে হিন্দুই অধিক হউক আর মুসলমানই অধিক হউক অথবা খৃষ্টানই অধিক হউক, বাঙ্গালায় এইরূপ শাসনই চলিতে থাকিবে। সোজা কথার মার নাই।

স্থায়ী শান্তি

বিশাল বারিধিবক্ষে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে—সম্ভবতঃ নোভাস্কোসিয়ায় সন্নিহিত কোন নিভৃত অঞ্চলে মার্কিণের প্রেসিডেন্ট মিষ্টার রুজভেল্ট এবং বিলাতের প্রধানমন্ত্রী মিষ্টার চার্চ্চিল সম্মিলিত হইয়া ধরাতলে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। স্বার্থ-সংঘর্ষের ফলেই যুদ্ধ হয়। যেখানে কোন বলবান্ পক্ষ আত্মশক্তির দম্ভে আত্মহারা হইয়া দুর্ব্বল পক্ষের স্বাধীনতা হরণে বা পররাষ্ট্রগ্রাসে প্রবৃত্ত হয়, সেইখানেই বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এই উভয় রাষ্ট্রনায়কদিগের সহিত পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীরাও ছিলেন। অস্ত্র-সরবরাহের কথাও তাঁহাদের মধ্যে আলোচিত হইয়াছিল। তাহার পর হইয়াছিল জয়লাভের পর স্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠার কথা। তাঁহারা পৃথিবী হইতে সমর নির্ব্বাসিত করিবার জন্য আট দফা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যথা—(১) আমরা রাজ্যবিস্তার দ্বারা আমাদের অধিকার বাড়াইতে চাহি না। (২) দেশের লোকের স্বাধীন ইচ্ছা ব্যতীত কোন রাষ্ট্রীয় সীমানার পরিবর্ত্তন আমাদের অভিপ্রেত নহে। (৩) সকল দেশের লোকেরই নিজ নিজ শাসনযন্ত্র গঠনের অধিকার আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি। যে সকল দেশের স্বাধীনতা বলপূর্ব্বক অপহৃত হইয়াছে, তাহা তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। (৪) ছোট, বড়, বিজিত এবং বিজেতা সকল দেশের লোকই যাহাতে নিজ নিজ প্রয়োজনমত পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার এবং কাঁচা মাল পাইবার অধিকার পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা আমরা করিব। বর্ত্তমানে আমাদের সহিত অন্যের যে বাধ্য-বাধকতা আছে, তাহা বলবৎ রাখিতে হইবে। (৫) শ্রমিকদিগের আর্থিক উন্নতিসাধন এবং সামাজিক নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার জন্য আমরা সকল জাতির সহিত একযোগে ব্যবস্থাপন করিব। (৬) নাজী-অত্যাচারের ধ্বংসসাধন করিয়া, সকলের পক্ষে নির্ভয়ে সংসারে বাসের ব্যবস্থা করিব। (৭) সমুদ্রে সকলের অবাধে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৮) পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক কারণে সকলকে বল-প্রয়োগের ব্যবস্থা ত্যাগ করিতে হইবে; নিরস্ত্রীকরণ-নীতিও প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।—ব্যবস্থাগুলি সবই ভাল, তবে উহা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র বিনিয়োগ করিবার মত হৃদয় ও শক্তি থাকা চাই। সেইটিই ত এই ইহকাল-সর্ব্বস্ব জগতে দুর্লভ। দুঃখের সময় মানুষের উচ্চ আদর্শের কথা মনে পড়ে,—পরে কিন্তু মানুষ সেটা সহজে ভুলিয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পূর্ব্ববর্ত্তী মার্কিণের প্রেসিডেন্ট উইলসন বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধ অবসান হইবার পূর্ব্বে অনেক উচ্চস্তরের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু বিজেতাদিগের অতি লোভ হেতু তাঁহার সে আদর্শ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। লোভই শয়তান। উহা সঙ্কীর্ণতার জনক। গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর মিষ্টার সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রেসিডেন্ট উইলসনকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা বিদিত ভুবনে। তখন ভারতের দানের কথা আর কাহারও মনে ছিল না। এবারও ভারতের হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকর আবার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট তারযোগে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এশিয়াস্থ দেশগুলির সম্বন্ধে ঐ আট দফা ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে কি? এখন রুজভেল্ট তাহার কি জবাব দেন, তাহা জানিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। ভারতে যদি ঐ আট দফা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছা সরকারের থাকিত, তাহা হইলে এখনও পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী বহাল থাকিত না। ভারতবাসীর স্বরাজলাভের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত, এ কথা আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও সে দিন বলিয়াছেন।

পাট-কর ধার্য্য বিল

১লা ভাদ্র সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাট-কর ধার্য্য বিলখানি পাশ হইয়া গিয়াছে। মিষ্টার এইচ, এস, সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন যে, পাটের মূল্য নির্দ্ধারণ, পাটচাষীদের উন্নতিসাধন এবং পাটশিল্পের উন্নতিবিধান এই বিলখানির উদ্দেশ্য। সিলেক্ট কমিটী এই বিলখানি সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, ঐ দিন তাহার আলোচনা হইয়াছিল। মিষ্টার জালালউদ্দীন হাসেমী বলিয়াছিলেন, তাঁহারা কাঁচা পাটের উপর শুল্ক ধার্য্যের পক্ষপাতী নহেন; অতএব বিলখানি পুনরায় সিলেক্ট কমিটীর হাতে দেওয়া হউক। ঐ প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য হয়। অন্যান্য প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইয়া যায়। শেষটা বিলখানি পাশ হইয়া গিয়াছে। এই বিলখানি আইনে পরিণত হইলে যে পাটচাষীদিগের কোন সুবিধা হইবে, এমন মনে হয় না। কিন্তু সরকার পক্ষের বাঁধা ভোটে সবই পাশ করা সম্ভব।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলখানির বিরুদ্ধে যেরূপ তীব্র আন্দোলন হইয়াছে এবং হইতেছে, এরূপ তীব্র আন্দোলন ইদানীং অন্য কোন বিলের বিরুদ্ধে হয় নাই। কিন্তু তথাপি বাঙ্গালা সচিবসঙ্ঘ এই বিলখানি পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহেন। সম্প্রতি সরকার এক বিস্তৃত কমিটী গঠিত করিয়া তাহার হাতে এই বিলখানির পরিবর্ত্তন-ভার দিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, ইহার মধ্যেই জটিল সমস্যার সকল মীমাংসার পথ দেখা দিয়াছে। বিলে যে সকল ত্রুটির জন্য এত আন্দোলন, তাহা সংশোধন করিতে গেলে বিলখানি ত ঢালিয়া সাজিতে হয়। কমিটী তাহা করিতে পারিবেন কি? কমিটী কি বিলের মূল নীতির পরিবর্ত্তন করিবেন? বোর্ড গঠনের ব্যাপার আর মোক্তবের ব্যবস্থা কি বদল হইবে? আসল কথা, সম্প্রদায়বিশেষের শিক্ষায় সঙ্কোচবিধান এবং কৃষ্টির বিঘ্নতা উৎপাদন যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই চাই। বিষয়টির ন্যায়সঙ্গত ভাবে মীমাংসা করা আবশ্যক।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার প্রতিবাদ

৭ই ভাদ্র কলিকাতা য়ুনিভারসিটী ইনিষ্টিটিউটে আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-বিরোধী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। আচার্য্য রায় উদাত্ত স্বরে বলিয়াছিলেন যে, "আমাদের জাতি হিসাবে সকলে সম্মিলিত হইয়া এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য।" তিনি বলেন যে, "হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়মধ্যে বিদ্বেষের বীজ ছড়াইয়া দিয়া ভারতবাসীর স্বরাজ লাভে বাধা দিবার উদ্দেশ্যেই এই সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।"—ডক্টর

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে "ইহাতে কেবল আমাদের ভবিষ্যৎ সঙ্কটসঙ্কুল হয় নাই, পরন্তু ইহার ফলে হিন্দুরা রসাতলে যাইবে,—যদি সরকার তাঁহাদের নীতির পরিবর্তন না করেন, তাহা হইলে হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ এবং ভারতের স্বাধীনতা সুদূর-পরাহত হইবে।" শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত বলেন, "এই বিষময় ব্যবস্থার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ইচ্ছা করিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।" শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার ফলে হিন্দু মুসলমানে ভেদ—সাম্প্রদায়িক মন্ত্রি-সভা—আর ঢাকার দাঙ্গা, আমাদের এই তিনটি লাভ হইয়াছে। নাজীবাদ—ফ্যাসিষ্টবাদ পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তিনি উহাকে ঘৃণা করেন। সাম্প্রদায়িকতা নাজীবাদ ফাসিষ্টবাদ হইতেও অধিক ভয়ঙ্কর, কারণ, উহা মানবজীবনের সকল উৎসমূলকে একেবারে বিষাক্ত করিয়া দেয়। এই বিষময় ব্যবস্থা হইতে পাকিস্থানের প্রস্তাব আবির্ভূত হইয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক প্রভাব-দুষ্ট প্রস্তাব যে বিদ্বেষ-প্রসূত—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।" শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতিও এই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বক্তৃতা সুচিন্তিত ও সারগর্ভ—জাতীয় কল্যাণকর।

ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি

১৯৩৯ এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ব্যাঙ্কের অবস্থা সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের হিসাব সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ—যুদ্ধের সময় ব্যাঙ্কে বিশেষতঃ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের সর্ব্বশ্রেণীর আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারের জানিত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে (Scheduled Banks) আমানতের টাকা অনেক বাড়িয়াছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ব্যাঙ্কগুলিতে ২৫৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা জমা ছিল, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের শেষে দাঁড়াইয়াছে ২৮১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এই বৎসর কোন ব্যাঙ্কই ফেল হয় নাই। কেবল মাত্র ৮০টি ছোট ছোট ব্যাঙ্ক কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতে ১ হাজার ২টি ব্যাঙ্ক হয়, তন্মধ্যে ৬২টি মাত্র ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত। এখন ব্যাঙ্কের কাজ ভালই চলিতেছে। তাহার কারণ, বাঙ্গালায় মহাজনী আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর ঋণ প্রদান বন্ধ হওয়ায় মহাজনগণ ব্যাঙ্কেই নাম-মাত্র সুদে টাকা আমানত করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহাতে উপযুক্ত মূলধনের অভাবে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির সম্ভাবনাই সমধিক।

সত্যমূর্ত্তির প্রস্তাব

মিষ্টার এস সত্যমূর্ত্তি কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্য—মতের জন্য বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া মাদ্রাজের কংগ্রেস হাউজ ময়দানে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের নীতির আমূল পরিবর্তন করা আবশ্যক। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের রাজনীতির গতিক যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে পাকিস্থানের প্রস্তাবই লোকের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। কংগ্রেস যদি দৃঢ় নীতি অবলম্বন করিয়া সাহসের সহিত রাজনীতিক আসরে না নামেন, তাহা হইলে এইরূপ ভিন্নতাসাধক ভাব অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে। কংগ্রেস সাতটি প্রদেশের মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তাঁহারা অন্য প্রদেশকে সম্মত করাইয়া স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথা উঠাইয়া দিতে পারিতেন। মিষ্টার সত্যমূর্ত্তি ইদানীং কিছু দিন ধরিয়া সরকারী মন্ত্রিত্বাদি গ্রহণ করিবারই অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এখন কংগ্রেসওয়ালাদিগের পক্ষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হইবে কি? তাহা যে এখন আমাদের শাসনকর্ত্তাদিগের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিতেছে। সরকার পক্ষ বলিয়াছেন, উপস্থিত ঐ সকল প্রদেশের আইনানুগ শাসন ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হইয়াছে,—এখন প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদিগের এবং বড়লাটের অনুমতি বা সম্মতি ব্যতীত তাহা কি আর পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হইবে? মিষ্টার আমেরীও বার বার বলিতেছেন যে, ভারতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসননীতি একেবারেই নিষ্ফল হইয়াছে। উহা ভারতবাসীর ধাতুতে সহে না। তাঁহার এ কথা নিতান্ত অসত্য হইতে পারে, কিন্তু ভিন্ন দেশের লোকরা তাহা অনেকটা বুঝিবে। আসল কথা, আমরা একটুও ক্ষমতা পাই নাই—বিভিন্ন শাসন-সংস্কারের ফলে আমাদের ক্ষমতা কেবল খর্ব্বই করা হইয়াছে। মিষ্টার আমেরীর ঐ কথায় মার্কিণ প্রভৃতি দূরদেশের লোক ভারত-শাসন সম্বন্ধে এবং ভারত-বাসীর সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়া বসিবে, ইহা সত্য। মিষ্টার আমেরী প্রভৃতি চাহেন, একটা দর্শনধারী শাসন-যন্ত্র খাড়া রাখিয়া ভিতর হইতে কলকাঠি নাড়িতে। তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই তাঁহাদের নীতির জয়-জয়কার। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসের অসহযোগ নীতি বর্জ্জন করা কতটা সঙ্গত হইবে, তাহাই বিবেচ্য।

ভারতরক্ষা সমিতিতে যোগদানে আপত্তি

মুস্‌লিম লীগের সভাপতি মিষ্টার জিন্না মুস্‌লিম লীগের সদস্যদিগকে নব গঠিত ভারতরক্ষা কমিটীতে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই নিষেধ মান্য করিয়া আসামের প্রধান সচিব সার মহম্মদ সাদুল্ল এবং পঞ্জাবের প্রধান সচিব সার সিকান্দার হায়াৎ খাঁন সদস্য পদ ত্যাগ করিতে সম্মত হইয়াছেন। সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাবক্স বেপরোয়া—তিনি লীগের নেতৃত্ব না মানিয়া ভারতরক্ষা সমিতির সদস্য থাকিবেন। কিন্তু বাঙ্গালার প্রধান সচিব মিষ্টার ফজলুল হক কি করিবেন, তাহা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি নীরব থাকিবার লোক নহেন—এই উপলক্ষে কয়েকটি বিবৃতিও জাহির করিয়াছেন। তিনি মিষ্টার জিন্নাকে এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, "But I would respectfully request Mr. Jinna to shut up the underdogs of the Muslim League who generally raise such a clamour that the voice of reason is drowned in the uproar." তিনি বলিয়াছেন, "আমি সসম্মানে মিষ্টার জিন্নাকে অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি যেন মুস্‌লিম লীগের যে সকল নিম্নে পতিত কুকুরগুলি চীৎকারে বিচার-বুদ্ধির রবকে ডুবাইয়া দেয়, তাহাদিগকে চুপ করিতে বলেন।" এ ক্ষেত্রে মিষ্টার হকের ভাষা শিষ্টজন-সম্মত হইয়াছে কি? underdog বলে কাহাকে? শব্দটা অপ-ভাষায় ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ—যুদ্ধে নিরত দুইটি কুকুরের মধ্যে যেটি তলায় পড়িয়া যায় সেইটি। ইতর ভাষায় উহা পরাজিত প্রায় পক্ষকেও বুঝায়, কুকুর বুঝায় না। Oxford Dictionary

দ্রষ্টব্য। সুতরাং তিনি তাঁহার প্রতিপক্ষকে কুকুর না বলিলেও তাহারা যে তাহার সহিত কামড়া-কামড়িতে নীচেয় পড়িয়া গিয়াছে, ইহাই বলা হইয়াছে। বাঙ্গালার যিনি প্রধান মন্ত্রী, তাঁহার মুখে বা লেখনীতে ইতর ভাষা শোভন ও সুরুচি-সঙ্গত কি? অবশ্য পরে তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ রীতি অনুসারে ঐ ভাষার পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু মুস্‌লিম লীগ ত কংগ্রেসের ন্যায় অহিংসার সেবক নহেন। যাহারা অহিংসার সেবক, তাঁহারাই অসহযোগকে তাঁহাদের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। মুস্‌লিম লীগ ত অহিংসা নীতি বা অসহযোগ নীতি অবলম্বন করেন নাই। তবে কি জন্য তাঁহারা ভারতরক্ষা কমিটিতে যোগদানে নিষেধ আজ্ঞা জারী করিয়াছিলেন?

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ মহাতাব জি সি আই ই, কে সি এস আই, সি আই ই বাহাদুর ৬০ বৎসর বয়সে, ১২ই ভাদ্র অপরাহ্ণ ৫টার সময় বর্দ্ধমান-প্রাসাদ হইতে পরলোকে গমন



মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব

করিয়াছেন। তিনি সুশিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী, সামাজিক শিষ্টাচার-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি ১৯০৯ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল, ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য—১৯১৮ হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে তিনি স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজা শাসন-সংস্কার কমিটীর—১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কর-তদন্ত কমিটীর সদস্য হইয়াছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি কয়েক বার বিলাতে গমন করিয়া কিছু কাল বাস করিয়াছিলেন। একাদশী—ত্রয়োদশী—আবেগ—ত্রি-চিত্র প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়নে—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে সাধক-কবি কমলাকান্তের পদাবলী প্রকাশ জন্য অনুরোধ—উৎসাহ প্রদানে—কোন প্রবীণ সাহিত্যিককে সরকার হইতে উপাধি ও স্বয়ং বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া তিনি সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রকট করিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবান শোকার্ত্ত বর্দ্ধমান-রাজপরিবারের শান্তি প্রদান করুন।

স্বর্গীয় ডক্টর জে, এন, দাসগুপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডীন অফ ফ্যাকাল্‌টী অফ ল' ডক্টর জে, এন্, দাসগুপ্ত গত ১৪ই জুলাই ৫০ বৎসর বয়সে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশে যাঁহারা শিক্ষিত সমাজের গৌরব, তাঁহারা বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনের অলঙ্কারস্বরূপ।

ডক্টর দাসগুপ্ত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাওয়ায় একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি দর্শনে এম, এ, পাশ করেন। আইনের পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এল, উপাধি লাভের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি, এল, উপাধি প্রাপ্ত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর দাসগুপ্ত বিংশবর্ষাধিক কাল নিযুক্ত ছিলেন, অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন।

পরলোকে দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় ৮৪ বৎসর বয়সে, বারাণসী ধামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জিলার মালিয়াড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাঁকুড়া জিলা-স্কুল হইতে প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাটনা কলেজ হইতে এল, এ, পাশ করেন এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি এম, এ, ও বি, এল, পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে করিতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের জজ হইয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও সরল—অনাড়ম্বর [illegible] যাপন করিতেন। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান [illegible] অভাবে হিন্দু-সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁহার ন্যায় স্বধর্মনিষ্ঠ—পবিত্র-জীবন লাভ শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই স্পৃহনীয়।



২০শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৪৮ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

জগদম্বার উদ্দেশে

যুগে-যুগে তুমি ভাঙ্গিছ গড়িছ
এই অভাগা দেশ,
শুধাই জননি, কবে বা তোমার
শেষ-গড়া হবে শেষ।
আজিকে যেখানে বহে নদী, সেথা
কালি করে বালি ধু-ধু,
আজিকে যেখানে জনপদ, সেথা
ভাঙ্গা মন্দির শুধু।
আজিকে যেখানে শ্যাম প্রান্তর
কালি সেথা মরুভূমি,
কত না গৌড় ভাঙ্গিয়া গড়িলে
ঘন অরণ্য তুমি।
যেই ভূমি ছিল নীর-প্রস্থ, সেথা
প্রেত তাণ্ডবে নাচে,
কত খাণ্ডবে পাণ্ডব-পুরী
গড়িছ তাহারি কাছে।
তোমার বন্যা তোমার ঝঞ্ঝা
ঘরে ঘরে, চরে চরে,
তব ভূকম্প, তব ভ্রূ ভঙ্গ—
কেহ ভাঙ্গে, কেহ গড়ে।

হিমালয় হ'তে পাঁচ হাতে তুমি
গড়িতেছ নব নব
আর পাঁচ হাতে তাহাই ভাঙ্গিছ,—
এ কেমন লীলা তব ?
প্রান্তর মাঝে কুটীরে কুটীরে
মোরা সদা ভয়ে কাঁপি,
নদী তীরে তীরে, পবন-তাড়িত
দীপের জীবন যাপি।
গৃহতল হ'তে ধ্রুব আমাদের
অশথতলের ছায়া
বিনা সাধনায় শ্লথ সব ডোর,
ঘুচেছে ঘরের মায়া।
আজি শয্যায় আরামে ঘুমাই,
কালি সার হবে ভেলা,
হাসায়ে কাঁদায়ে ভাসায়ে উঠায়ে,
এ কেমন তব খেলা ?
গতবার তোমা পূজেছি কুটীরে,
এবার বৃক্ষতলে।
আগামী বছর কোথায় পূজিব ?
অনলে —না—নদীজলে ?

শ্রীকালিদাস রায়।

অদ্বৈতবাদের মূল সন্ধানে

পূর্ব্বানুবৃত্ত

এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই জীব ও জগতের স্রষ্টা। জীব ও জগতের স্রষ্টা বলিয়াই তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা বলা হইয়া থাকে। ঋগবেদে এই বিশ্বকর্ম্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনিই আমাদের পিতা, পালক ও বিধাতা। তিনি নিখিল বিশ্ব ও বিশ্বের প্রাণিবর্গের স্রষ্টা ও রহস্যজ্ঞ। তিনি ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণকে উৎপাদন করিয়াছেন, এবং উঁহাদিগকে ঐ সকল নামাঙ্কিত করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই এক অদ্বিতীয় স্বয়ম্ভু, দেবতাকে প্রাণিগণ পরমেশ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। এই পরমেশ্বরই হৃদয়গুহায় অবস্থিত থাকিয়া অহংরূপে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। আমাদের দৃষ্টি অজ্ঞানের আবরণে আবৃত আছে, সুতরাং অহং-প্রত্যয়-বেদ্য সেই পরমেশ্বরকে আমরা বুঝিতে পারি না, দেহাভিমানী জীবকেই বুঝিয়া থাকি। পরমেশ্বর বলিয়া নিজেকে পরিচিত করি না, দেবতা, মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এইরূপ শ্রেণি ও জাতিবিভাগ দ্বারা পরিচিত করিয়া থাকি। নিজের উদরের চিন্তায়, দেহ-মনের তৃপ্তিসাধনে ব্যাকুল হইয়া আমাদের অন্তর্যামী পরমদেবতাকে আমরা ভুলিয়া যাই।১

ঋগবেদের ১০ম মণ্ডলে ১২১শ সূক্তে এই একেশ্বরবাদ আরও স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। উক্ত সূক্তে পরমেশ্বরকে প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং প্রজাপতির উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির উষায় একমাত্র প্রজাপতিই বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই ছিলেন নিখিল প্রাণীর এক অদ্বিতীয় অধীশ্বর—'ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।' তিনিই পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করেন, প্রাণিগণের আত্মারূপে বিরাজ করেন এবং প্রাণিগণের হৃদয়ে শক্তি আধান করেন (আত্মদাঃ বলদাঃ)। তাঁহার শাসন নিখিল জগৎ ও দেবগণ মানিয়া চলেন। তিনি স্বীয় মহিমা দ্বারা প্রাণি-জগতের একচ্ছত্র রাজারূপে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনিই দেবগণের আদিদেব—'যো দেবেষ্বধিদেব এক আসীৎ।' উক্ত দেবতার অন্তরালে এক সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই যে বিরাজ করিতেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে কি ?২

এতদ্ব্যতীত বেদান্তের "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ব্রহ্মভাব এবং সোঽহংভাবের কথাও ঋগবেদসংহিতাপাঠে স্পষ্টতঃই জানিতে পারা যায়। ঋগবেদের প্রসিদ্ধ বাকসূক্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অম্ভৃণ ঋষির কন্যা স্বীয় আত্মায় সমস্ত দেবতা ও চরাচর নিখিল-বিশ্বের অন্তর্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন। অন্তরেও আমি, বাহিরেও আমি, আমিময় এ ত্রিভুবন, আত্মার এই সর্বাত্মভাব বা বিরাটরূপ ঋষি-কন্যার জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই জন্যই ঋষি-কন্যা বলিয়াছিলেন—

আমিই রুদ্র ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি; আমিই আদিত্যগণের সহিত, এমন কি, নিখিল দেবতার সঙ্গে অবস্থান করি। আমি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। অখিল

১। যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা॥
ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি॥
ঋগ্বেদ ১০।৮২।৩,৭

২। **প্রজাপতিসূক্তটি পাঠ করিয়া পণ্ডিত মোক্ষমূলর মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন—**

"The whole hymn must have been the expression of a yearning after one supreme deity, who had made heaven and earth, the sea and all that in them is." See Maxmuller: The six systems of Indian Philosophy, p. 60. **পুনশ্চ তিনি তাঁহার** History of Ancient Sanskrit Literature **গ্রন্থে (৫৬৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন—**"I add only one more hymn, in which the idea of one God is expressed with such power and decision, that it will make us hesitate before we deny to the Aryan nations an instinctive Monotheism."

বিশ্বে সর্বত্র আমিই অধিষ্ঠিত। আমি জীবাত্মারূপে সকল প্রাণিগণের মধ্যে আবিষ্ট আছি। আমি দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকের অন্তরালে অধিষ্ঠিত আছি। আমার এরূপ মহিমা যে, আমি দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া এখানেই নিঃশেষ হইয়া যাই নাই, দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরিক্ষলোককে অতিক্রম করিয়াও বিরাজ করিতেছি। এই বিশ্বরাজ্যের আমিই অধীশ্বরী। যাঁহারা যাজ্ঞিক, তাঁহাদিগের মধ্যে আমিই প্রথমে জ্ঞানযজ্ঞের তত্ত্বালোক বিকীর্ণ করি। দেবতাগণ আমাকেই নানা স্থানে নানা রূপে বিকাশ করিয়াছেন। আমার আশ্রয়ের অন্ত নাই। এক আমিই বহু স্থানে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছি। দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়ক ক্রিয়া সকল আমার সহায়তায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা আমাকে জানে না, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রুদ্রদেব যখন শত্রুবিনাশে উদ্যত হয়, আমিই তাঁহাকে শক্তিদান করি, আমিই তাঁহাকে ধনুঃ ও শত্রু-নাশক অস্ত্র প্রদান করিয়া থাকি। আমিই বায়ু বা স্পন্দন-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া এই বিশ্বসৃষ্টির গোড়াপত্তন করি। আমিই আকাশ সৃষ্টি করিয়াছি, সমুদ্রজলে, বাষ্পে ও নীহারিকাপুঞ্জে আমিই বিশ্বসৃষ্টির বীজ আধান করিয়াছি।১

ঋগ্বেদের চতুর্থমণ্ডলের বামদেবীয় সূক্তে (৪।২৬) ঋষি বামদেব বলিয়াছেন—

আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছি, কক্ষবান্ নামক যে প্রসিদ্ধ ঋষির কথা শুনিতে পাও, তাহাও আমি। আমিই কবি উশনা, আমাকে দর্শন কর। আমিই ইন্দ্ররূপে শম্বরাসুরের নিরানব্বইটি পুর বা নগর ধ্বংস করিয়াছি।২ বামদেবীয় সূক্তের অনুরূপ উক্তি চতুর্থমণ্ডলের স্থানান্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়। ৪র্থমণ্ডলের ৪২শ সূক্তে ঋষি বলিতেছেন—আমিই সমগ্র বিশ্বের অধিপতি। সমস্ত দেবগণই আমার আশ্রিত। দেবতা সকল আমার ক্রিয়ারই অনুবর্তন করিয়া থাকে। মনুষ্যগণের মধ্যে আমিই রাজা। আমিই ইন্দ্র। আমার মহিমা সুগভীর ও অপরিমেয়, আমার শক্তি অপ্রতিহত। আমিই জড়ে চৈতন্য সম্পাদন করিতেছি। আমিই সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীল। যাহা কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য, সকলই আমি।

ঋগ্বেদোক্ত সার্বভৌম আত্মজ্ঞানবাদের পরিচয় দেওয়া গেল। এই সার্বভৌম আত্মজ্ঞানই বেদোক্ত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। এই জ্ঞান ঋগ্বেদে কি ভাবে ক্রমশঃ প্রসার-লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে ঋগ্বেদোক্ত আত্ম-তত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা আবশ্যক। ঋগ্বেদে অনেক স্থলে 'আত্মন্' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের সেই সকল স্থলের তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বেদে আত্মন্ শব্দ দ্বারা প্রথমতঃ আমাদের প্রাণবায়ুকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ষোড়শ সূক্তে "সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা" (ঋগ্বেদ ১০।১৬।৩) বলিয়া মৃতব্যক্তির আত্মাকে বায়ুতে মিশিয়া যাইবার কথা বলা হইয়াছে, এবং উক্ত মণ্ডলের ৫৮শ সূক্তে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে যমলোক, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতি হইতে পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসিয়া অক্ষয় জীবন লাভ করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। ইহা হইতে বৈদিক ঋষি দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে নিঃসন্দেহ ছিলেন, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। পাঞ্চভৌতিক দেহপতনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না। দেহপাতের পরেও আত্মা অবস্থান করে। এই সম্বন্ধে ঋগ্বেদে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। এই সকল সূক্তে আত্মা শব্দে সাধারণতঃ মন, প্রাণ (life) বা অসুকে (vital breath) বুঝাইয়া থাকে। এই প্রাণই মৃত্যুকালে জীবশরীরকে পরিত্যাগ করে। ফলে জীবের মৃত্যু হয়, শরীর বিনষ্ট হয়। প্রাণের বন্ধনেই শরীর সুস্থ, সবল ও ক্রিয়াশীল থাকে; সুতরাং মানুষের মধ্যে যাহা সত্য (real essence), তাহাই এই প্রাণ। এই প্রাণই আত্মা। স্থানান্তরে দেখা যায় যে,

১। অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্।
ইত্যাদি বাক্‌সূক্ত ১০।১২৫।১-৮ দ্রষ্টব্য।

২। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং কক্ষবান্ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কবিরুশনা পশ্যতা মা। ঋগ্বেদ ৪।২৬।১
অহং পুরোমন্দসানো ব্যৈরং
নব সাকং নবতীঃ শম্বরস্য। ঋগ্বেদ ৪।২৬।৩

ঋগ্বেদের ঋষি প্রাণ-আত্মবাদে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলে প্রাণের অভ্যন্তরে কোন সর্বান্তর আত্মা বিরাজ করেন কি না, তাহা জানিবার জন্য বৈদিক ঋষি অধীর হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন যে, অস্থিময় এই দেহ অস্থিবিহীন হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কে জানে? জগতের প্রাণ বা আত্মা কোথায় অবস্থান করে, ইহাই বা কে জানে? ১ অশরীরী আত্মা হইতে কি ভাবে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই উক্ত মন্ত্রে বৈদিক ঋষি প্রশ্ন করিতেছেন। এখানে আত্মা শব্দে প্রাণকে বুঝায় নাই। প্রাণের অভ্যন্তরে যে আত্মা বিরাজ করে, সেই আত্মাকেই এখানে সূক্তস্থ আত্মন্‌শব্দে বুঝাইয়াছে। কখনও বা ব্যক্তি আত্মা বা জীবাত্মাকে বেদে আত্মন্‌শব্দে বুঝা যায়। ঋগ্‌বেদের নবমমণ্ডলে "বলং দধান আত্মনি" "(ঋগ্বেদ ৯-১১৩-১) বলিয়া যে আত্মন্‌শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ আত্মন্‌শব্দে জীবাত্মাকে বুঝাইতেছে (Individual spirit or soul). এই জীবাত্মাই মৃত্যুর পর পরলোকে স্বীয় কর্মানুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। শুভকর্মের ফলে স্বর্গসুখের অধিকারী হয়, অশুভকর্মের ফলে নিরয়গামী হইয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করে এবং কর্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্মচক্রের আবর্তনে বার বার পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করে, এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পড়িয়া দুঃখের জ্বালায় জ্বলিয়া মরে।২ জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের উপদেশ অতি স্পষ্ট না হইলেও শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থে জন্মান্তরবাদের স্পষ্ট নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।৩ বৈদিক শুভাশুভ কর্ম বলিতে এখানে বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদিকর্মকেই বুঝাইয়া থাকে। পরবর্তী কর্মবাদ ও তাহার ফলে যে ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির কথা অন্যান্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বৈদিক কর্মবাদই যে তাহার বীজ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১। কো দদর্শ প্রথমং জায়মান
মস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা
ক স্বিৎ কো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ। ১।১৬৪।৪

২। ঋগ্‌বেদ ১০।১৪।৪, ১।১৬৪।৩০, ৩৮, ৪।২৬।১, ১০।৮৮।১৫, ৪।২৭।১ সূক্ত আলোচ্য।

৩। শতপথব্রাহ্মণ ১।৯।৩।২, ১১।২।৭।৩৩, ১।৫।৩।৪, ১০।৩।৩।৮ দ্রষ্টব্য।

ঋগ্বেদোক্ত ব্যক্তি-আত্মবাদই ক্রমে প্রসারলাভ করিয়া ভূমা-আত্মবাদে পরিণত হইয়াছে। প্রস্তাবিত বাক্ ও বামদেবীয় সূক্তে সেই ভূমা-আত্মবাদ এবং ব্যক্তি-আত্মা ও ভূমা-আত্মার অভেদই অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেখা যায় যে, প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ঐ প্রজাপতিই জগদাত্মারূপে প্রকাশিত হইলেন (তৈঃ আঃ ১।২৩)। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে ঐ আত্মাকে সর্বব্যাপী সর্বান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (তৈঃ ব্রাঃ ২।২।৯, ২।৮।৯), শতপথব্রাহ্মণেও জগদন্তর আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, যে, সেই এই আত্মা, নিখিলভূত জগতের অধিপতি এবং সকলের রাজা—স বা অয়মাত্মা সর্বেষাম ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং ভূতানাং রাজা—শতপথ ১৪, ৫, ৫, ১৫। এই জগদাত্মার সহিত আমিত্বের বা জীবাত্মার অভেদদর্শনই বেদান্তের চরম ও পরমদর্শন। এই দর্শনই উল্লিখিত বাক্ ও বামদেব-সূক্তে বিবৃত হইয়াছে। বৈদিক আত্মজিজ্ঞাসার সূচনায়ই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, বৈদিক ঋষি নিজের অন্তরও যেমন পরীক্ষা করিতেছেন, সেইরূপ বিশ্বের অন্তরতত্ত্বও পরীক্ষা করিতেছেন এবং এই পরীক্ষার ফলে জীব ও জগতের অন্তরবিহারী পরমাত্মা সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান। জীব ও জগতের মধ্যে যে একই আত্মসূত্র বিরাজ করে, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাই বৈদিক আত্ম-জিজ্ঞাসার রহস্য। এই রহস্যজ্ঞানের ফলেই ঋষি-কন্যা ও বামদেবের হৃদয়ে সর্ব্বাত্ম-ভাবের উদয় হইয়াছিল।

বিশ্বের দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টিরহস্যও ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্তে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নাসদীয় সূক্তে (ঋগ্‌বেদ ১০ম মণ্ডল, সূক্ত ১২৯) সৃষ্টিরহস্য প্রকাশ করিতে গিয়া ঋষি বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। সকলই অব্যক্ত ও অনির্ব্বাচ্য ছিল। শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সৎ, মূল কারণ হইতেই অসৎ জগৎ প্রপঞ্চ উদ্‌ভূত হইয়াছিল, তথাপি তখন ঐ মূলকারণকে সৎ শব্দদ্বারা অভিহিত করা সম্ভব হয় নাই, অর্থাৎ সৎ থাকিলেও উহা অবাঙ্‌মনসগোচর, এইজন্য তাহাকে সৎও বলা চলে না,

অসৎও বলা চলে না, তাহা সদসতের অতীতাবস্থা। প্রলয়াবস্থায় পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, ভোগ্যও ছিল না, ভোক্তাও ছিল না, আবরণও ছিল না, আবরণীয় বস্তুও ছিল না। সর্বসংহারকারী মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না, প্রাণিবর্গও ছিল না। সূর্য্যও ছিল না, চন্দ্রও ছিল না, সুতরাং দিবাও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। একমাত্র অধ্যক্ষ পরমপুরুষ বা পরব্রহ্মই অবস্থিত ছিলেন, তিনি ভিন্ন কিছুই ছিল না।১ রাত্রির অন্ধকারে যেমন সমস্ত পদার্থ আবৃত থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানের গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত আবৃত ছিল—'তম আসীত্তমসাগূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতম' ঋগ্‌বেদ ১০।১২৯।৩। সর্বাচ্ছাদক অজ্ঞানই শ্রুতিতে তমঃ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। সেই তমঃস্বভাবা মায়া হইতেই নামরূপাত্মক সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ আবির্ভূত হইয়াছে। এইরূপ আবির্ভাবের নামই জন্ম।২ এই মায়া অনাদি। এই মায়াই ছিল জগৎ সৃষ্টিতে সেই অধ্যক্ষ পুরুষের একমাত্র সহচরী। মায়ার সাহচর্য্য করার ফলে সেই মায়াতীত পরম পুরুষও মায়াময় বলিয়া মনে হইয়াছিল। ঐ মায়াধীশ অধ্যক্ষই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে পরমেশ্বরের যে সিসৃক্ষা বা সৃজনী বৃত্তির উদয় হইয়াছিল, শ্রুতির ভাষায় তাহাই তাঁহার কাম বা কামনা। ইহাই তাঁহার সৃষ্টি-উন্মুখ মনের প্রথম বিস্ফুরণ। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋগ্‌বেদের ঋষি বলিয়াছেন—কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ—ঋগ্‌বেদ ১০।১২৯।৪। এই কামনাই মায়া। প্রলয়ের তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে মায়ার গর্ভে সমস্ত জগৎ লুক্কায়িত ছিল। সমস্তই ছিল তখন অব্যক্ত ও অনির্বাচ্য। জগতের এই অব্যক্ত, অনির্বাচ্য অবস্থাকেই শ্রুতিতে অসৎ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অব্যক্ত, অনির্বাচ্য অবস্থা হইতে ব্যক্ত, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, সাগর, ভূধর প্রভৃতি বিভিন্ন নাম-রূপ-বিশিষ্ট বিচিত্র জগতের উৎপত্তিই অসৎ হইতে সতের, অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি বলিয়াই ঋগ্‌বেদে বর্ণিত হইয়াছে—দেবানাং পূর্বে যুগে অসতঃ সদজায়ত, ঋগ্‌বেদ ১০।৭২।২। উপনিষদও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছে—অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত—তৈত্তিরীয় উপঃ ২।৭।১, তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত—ছাঃ ৬।২।১। সৃষ্টির আদিতে জগতের অব্যক্ত অনির্বাচ্য অবস্থাই নাসদীয় সূক্তে "নাসদাসীৎ নো সদাসীত্তদানীম্" বলিয়া অতি গম্ভীর ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রুতিতে আত্মবাদ বা সৎ অদ্বিতীয়বাদই আদৃত হইয়াছে। অসদ্‌বাদ বা শূন্যবাদ আদৃত হয় নাই। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। সৎ হইতে ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কার্য্য জগৎপ্রপঞ্চ উৎপত্তির পূর্বে কারণ-শরীরেই বিদ্যমান ছিল। কারণ হইতে কার্য্যের কোন পৃথক সত্তা ছিল না। কেবল এক অদ্বিতীয় জগৎকারণ-পরমাত্মাই সৃষ্টির আদিম অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না, ইহাই নাসদীয় শ্রুতিতে "নাসীদ্ রজঃ" এইরূপ নিষেধমুখে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সৃষ্টির রহস্য নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। এইজন্যই বৈদিক ঋষি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছেন 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ?' আর এই সৃষ্টিরহস্য কে জানে? দেবতারা এই রহস্য অবগত নহেন, কারণ, তাঁহারাও সৃষ্টির পরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সুতরাং সৃষ্ট দেবতারা সৃষ্টির পূর্ব্বরহস্য জানিতে পারেন না;

১। নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়াতদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরং কিঞ্চনাস॥
ঋগ্‌বেদ ১০।১১৯।১-২,

ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যের মতে উক্তস্থ স্বধাশব্দের অর্থ মায়া।
স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়তে
আশ্রিত্য বর্ত্ততে ইতি স্বধা মায়া। তয়া
তদ্‌ব্রহ্ম অবিভাগামাপন্নমাসীৎ। যদ্যপি
অসঙ্গস্য ব্রহ্মণঃ তয়া সহ সম্বন্ধো ন সম্ভবতি
তথাপি তস্মিন্নবিদ্যয়া তৎস্বরূপমিব সম্বন্ধোঽধ্য-
স্যতে যথা শুক্তিকায়াং রজতস্য। সায়নভাষ্য ১০।১২৯।২,

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৃষ্টির আদিম অবস্থার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা নাসদীয় সূক্তেরই প্রতিধ্বনি।
নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমির্নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্নচান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ॥
বিঃ পুঃ ২।৩২।

২। আত্মতত্ত্বস্যাবরকত্বান্মায়াপরসংজ্ঞং ভাবরূপাজ্ঞানমেব তম ইত্যুচ্যতে। তেন তমসা নিগূঢ়মাচ্ছাদিতং ভবতি। আচ্ছাদকাত্তস্মাত্তমসো নামরূপাভ্যাং যদাবির্ভবনং তদেব জন্ম ইত্যুচ্যতে। সায়নভাষ্য ১০।১২৯।৩।

এই বিশ্বসৃষ্টি কি ভাবে, কোথা হইতে হইল? কে সৃষ্টি করিল, বা করিল না, তাহা একমাত্র সর্ব্বসাক্ষী পরম পুরুষই বলিতে পারেন।১ সেই পুরুষ সহস্র-মস্তক, সহস্র-নয়ন ও সহস্র-চরণ। তিনি বিশ্বব্যাপী হইয়াও বিশ্বাতিগ। এই নিখিল বিশ্ব তাঁহার এক-চতুর্থাংশমাত্র। তাঁহার তিন-চতুর্থাংশ অমৃতলোকে বিরাজ করে। তাঁহার এক অংশেই তিনি সমস্ত চেতন ও অচেতনে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। যাহা কিছু ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহাও সেই পুরুষেরই আত্মস্বরূপ।২ সেই একমাত্র প্রভু যাঁহাকে সহস্রলোচন, সহস্রনয়ন বলিয়াও ঋষি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, সেইজন্য তাঁহার অপরিমিত শক্তি ও গতির পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া ঋষি বলিয়াছেন যে, সকল দিকেই তাঁহার চক্ষুঃ, সকল দিকেই মুখ এবং সকল দিকেই তাঁহার কর ও চরণ বিসারিত। এই পুরুষ সৃষ্ট জীবসমূহের সমষ্টি বলিয়া অনন্ত অসংখ্য জীবের অনন্ত অসংখ্য মস্তকই তাঁহার মস্তক। এই জন্যই ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে পুরুষকে সহস্রশীর্ষ সহস্রবাহু, সহস্রপাৎ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সূক্তে বিশ্বের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে একটি বিরাট্ যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরুষ এই বিশ্বসৃষ্টি-যজ্ঞে নিজকে বলি দিলেন। বলির পশুর মত ছিন্ন পুরুষের বিভিন্ন অবয়ব হইতে বিশ্বের বিচিত্র বিভিন্ন সৃষ্টির বিকাশ হইল। তাঁহার মস্তক হইতে আকাশ, নাভি হইতে অন্তরিক্ষ ও পদ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। তাঁহার মনঃ হইতে চন্দ্রের, চক্ষু হইতে সূর্য্যের এবং নিঃশ্বাস হইতে বায়ুর উদ্ভব হইল। এক কথায় চরাচর বিশ্বের যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে এবং হইবে, সমস্তই সেই বিরাট্ পুরুষেরই আংশিক বিকাশ। জড়-জগৎ ও প্রাণিজগৎ পুরুষেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি। এই পুরুষই শতপথব্রাহ্মণে বৃহত্তম বা 'ব্রহ্ম' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শতপথব্রাহ্মণ বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি স্বয়ম্ভু। তিনিই দেবতাদিগকে এবং এই চরাচর বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া ভূলোকে অগ্নিকে, অন্তরিক্ষলোকে বায়ুকে ও দ্যুলোকে সূর্য্যকে সংস্থাপিত করিলেন। এই জগতের ঊর্দ্ধে যে লোক এবং এই দেবতাদিগের ঊর্দ্ধে যে সকল দেবতা বিদ্যমান আছেন, ব্রহ্ম তাহারও ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেলেন। তার পর তাঁহার মনে হইল, কেমন করিয়া আবার চরাচর জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তিনি মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন যে, নাম ও রূপ এই দুইকে অবলম্বন করিয়া পুনরায় তিনি জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন (রূপেণৈব চ নাম্না চ) যাহা কিছু নাম ও রূপে বিদ্যমান সমস্তই সেই ব্রহ্ম। নাম ও রূপ সেই ব্রহ্মেরই মায়িক বিকাশ (Illusive manifestation)১ সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে এই ব্রহ্ম বা বিরাট্ পুরুষের আশ্রয় কি ছিল? কোন্ স্থান হইতে কিরূপে তিনি এই সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিলেন? সে কোন্ বন? কোন্ বৃক্ষের কাঠ, যাহা হইতে বিশ্বপতি এই দ্যুলোক ভূলোক প্রভৃতি গঠন করিয়াছেন? হে মনীষিগণ! তোমরা একবার তোমাদের আপন আপন মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, বিশ্বপতি কিসের উপর দাঁড়াইয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন?২ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই প্রশ্নের উত্তরে

১। কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৬

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সোঽঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।
নাসদীয়সূক্ত ১০।১২৯।৭।

২। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানোযদন্নেনাতিরোহতি।
এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।
পুরুষসূক্ত ১০।৯০। -৪

১। ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদ্দেবানসৃজত, তদ্দেবান্ সৃষ্ট্বা এষু লোকেষু ব্যারোহয়দস্মিন্নেব লোকেঽগ্নিং বায়ুমন্তরিক্ষে দিব্যেব সূর্য্যম্। অথ যে অত ঊর্দ্ধা লোকাস্তদ্ যা অতঊর্দ্ধা দেবতাস্তেষু বা দেবতা ব্যারোহয়ৎ। অথব্রহ্মৈব পরার্দ্ধমগচ্ছৎ। তৎপরার্দ্ধং গত্বৈক্ষত, কথংন্বু ইমান্ লোকান্ প্রত্যবেয়ামিতি। তদ্দ্বাভ্যামেব প্রত্যবৈৎ রূপেণৈব চ নাম্না চ তে হৈতে ব্রহ্মণো মহতী যক্ষে। শতপথব্রাহ্মণ ১১।২।৩

২। বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখ বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ।
কিংস্বিদ্বনং কউস বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্।
বিশ্বকর্ম্মসূক্ত ১০।৮১।৩-৪

বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই সেই বন, ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ, যাহা হইতে দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ—তৈঃ ব্রা ২ কাঃ ৮ প্রঃ ৯ অনুবাক।১ সেই স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মই সৃষ্টির ঊষায় হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি আত্মবিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বভূতের ও বিশ্ব প্রপঞ্চের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। আমরা 'ক' অর্থাৎ সুখস্বরূপ, অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, অজ্ঞেয় সেই পরম দেবতাকে হবির্দ্বারা যজ্ঞে পূজা করিব। যিনি জীবকে আত্মা দিয়াছেন, শক্তি দিয়াছেন, দেবতারা—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও যাহার বশ, অমৃত যাহার ছায়া, সেই আনন্দময় দেবতাকে আমরা যজ্ঞদ্বারা পরিতুষ্ট করিব। যিনি নিজ অপার মহিমাদ্বারা প্রাণিজগতের, সমস্তদ্বিপদ ও চতুষ্পদের এক অদ্বিতীয় প্রভুরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যিনি অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা ও কাননকুন্তলা, সাগর-মেখলা এই বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, আকাশকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছেন, বায়ুমণ্ডলকে স্ববশে রাখিয়াছেন। নির্ম্মল জলরাশিকে প্রবর্তিত করিয়াছেন, স্বর্গলোককে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এক কথায় চরাচর জগতের যিনি রাজা, সেই প্রেমময়, কল্যাণময়, প্রজাপতিকে আমরা হবির্দ্বারা পূজা করিব।২ উল্লিখিত সূক্তে বৈদিক ঋষি তাঁহার শ্রদ্ধার হবিতে বেদান্ত-বেদ্য সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষকেই যে অর্চনা করিয়াছেন তাহাতে সত্যজিজ্ঞাসুর কোন সন্দেহ নাই। সেই পরম পুরুষকে একদিকে যেমন আমরা ব্রহ্মাণ্ডের অখণ্ড কারণরূপে এবং সমস্ত জাগতিক শক্তির আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠারূপে উপলব্ধি করিতে পারি, অন্যদিকে তেমন আমাদের পিতা, জনিতা, বিধাতারূপে, আমাদের সর্ববিধ কল্যাণের আস্পদরূপে, আমাদের বুদ্ধির প্রেরকরূপে তাঁহাকে আমরা হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া শান্তিলাভ করি। জগৎকারণ পরম পুরুষকে বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ, এই দুই রূপেই ঋষি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই দুইয়ের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানও তিনি লাভ করিয়াছেন। যে প্রেরণায় উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার উদ্‌বোধ হইয়াছিল, সেই প্রেরণা ঋক-মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিও লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্যই ঋগ্‌বেদের জ্ঞানগর্ভ সূক্তগুলির সহিত উপনিষদুক্ত তত্ত্ববিদ্যার ঘনিষ্ঠ যোগ পরিলক্ষিত হয়।

ঋকসংহিতার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার যে ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তদনুরূপ চিন্তাধারা আমরা অথর্ব্ববেদেও দেখিতে পাই। অথর্ব্ববেদের স্কম্ভ (support) ব্রহ্মের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, স্কম্ভ ব্রহ্মের বিরাট্ দেহের মধ্যেই এই নিখিল বিশ্ব নিহিত রহিয়াছে। শুধু কেবল বিশ্বই নহে, সেই বিরাট্ স্কম্ভেরই বিভিন্ন অঙ্গে তপঃ, শ্রদ্ধা, ঋত ও সত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহার কোন অঙ্গ হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, চন্দ্র আলোক প্রদান করিতেছে। তাঁহারই কোন অঙ্গে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ ও স্বর্গোত্তর-লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শাখা যেমন বৃক্ষেতে সন্নদ্ধ থাকে, সেইরূপ সমস্ত দেবতাগণ সেই বিরাট্ শরীরী

১। ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্ম্ম সূক্তে বন ও বৃক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া বিশ্বকর্ম্মার যে দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করার কথা বলা হইয়াছে, ইহার অনুরূপ বর্ণনা অনেক পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতি ও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সূক্তে জল হইতে যে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে এবং ঐ জলের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিহিত আছে বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে, অনুরূপ বর্ণনাও পুরাণে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়—সুতরাং বেদের এই সৃষ্টিব্যাখ্যাকে পৌরাণিক ব্যাখ্যার বীজ বলিয়া ধরা যায়। ঋগ্‌বেদে "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্" বলিয়া অব্যক্ত অসৎ হইতে যে ব্যক্তজগতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং "পুরুষ এবেদং সর্বং" বলিয়া এই নিখিল জগৎই পুরুষের বিবর্তনের ফল বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা এই সৃষ্টিব্যাখ্যার মূলে ক্রম-বিবর্তনকে অঙ্গীকার করা হইয়াছে বলিয়া উহাই সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকৃত দার্শনিক ব্যাখ্যা। এই দার্শনিক ব্যাখ্যাই নানা যুক্তিতর্কের সাহায্যে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে।

২। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বা এক ইদ্‌রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যোঽন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥
ঋগ্‌বেদ ১০।১২১।১-৪

উল্লিখিত শ্রুতির কস্মৈ পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—
কিং শব্দোঽনির্জ্ঞাত স্বরূপত্বাৎ প্রজাপতৌ বর্ত্ততে
যদ্‌বা কং সুখং তদ্‌রূপত্বাৎ ক ইত্যুচ্যতে। সায়নভাষ্য।

ব্রহ্মে সম্বদ্ধ রহিয়াছেন। এই ব্রহ্ম শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তিনি অন্ধকার বিদূরিত করেন। চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি যে সকল জ্যোতিঃপদার্থ প্রজাপতির শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সকলই স্তম্ভব্রহ্মে অবস্থিত আছে। ১

এই ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া অথর্ববেদে বলা হইয়াছে যে, যিনি অতীত ও অনাগত, ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্তকে আবৃত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, স্বর্গলোক যাঁহার অধীন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যাহা কিছু স্থাবর, জঙ্গম ও বিমানচারী, যাহা কিছু প্রাণবান্ ও প্রাণহীন, এবং যাহা এই বিশাল বিচিত্র পৃথিবীর বিবিধ বৈচিত্র্যের মূল, তাহা সমস্তই সেই ব্রহ্মশরীরে একীভূত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা কিছু অনন্ত ও যাহা সান্ত, সমস্তই তাঁহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যাহা হইতে সূর্য্য উদিত হয় এবং যাহাতে অস্ত যায়, তিনিই সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। সেই অকাম, অমৃত, ধীর, আত্মতৃপ্ত, স্বয়ম্ভূ, এবং সর্বতঃ পরিপূর্ণ অজর চির-তরুণ আত্মা বা ব্রহ্মকে জানিলে মৃত্যুভয় থাকে না।২

অথর্ববেদে স্কম্ভ-ব্রহ্মের যে বর্ণনা পাওয়া গেল তাহাতে স্পষ্টতঃই ব্রহ্মকে সর্বব্যাপী এবং জগদাধার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মশব্দের বেদে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্মশব্দে বেদ, বেদোক্ত প্রার্থনা, প্রার্থনাকারী ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানকে বুঝায়। ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থ বিচার করিলে দেখা যায় যে, যাহা সবচেয়ে বড় বা বৃহত্তম তাহাই ব্রহ্ম, অথবা যাহা সর্বব্যাপী তাহাই ব্রহ্ম। বৃহ্ ধাতু হইতে ব্রহ্মশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃহ্ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধির যাহা পরাকাষ্ঠা তাহাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই পরম মহান্ ও ভূমা বলিয়া বেদান্তে পরিচিত। বিবৃদ্ধি অর্থ হইতে যাহা জীব ও জগতের বিবৃদ্ধির হেতু, সেই জীবজগদ্ব্যাপিনী চৈতন্যময়ী মহা-ব্যক্তিকেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

স্কম্ভব্রহ্মের বর্ণনায় ব্রহ্মতত্ত্ব অতি স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করা হইয়াছে। এই এক অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই সকলের আত্মা। আত্মবাদ এবং ব্রহ্মবাদের উপরেই ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি; সুতরাং ভারতীয় দর্শন বুঝিতে হইলে এই আত্মবাদ ও ব্রহ্মবাদই বুঝা আবশ্যক। বৈদিক বিভিন্ন দেবতাবর্গ বিশ্বদেবের শরীরে একীভূত হইয়া প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিরূপে বেদে যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টতঃই দেবতাবর্গের বহুত্ব হইতে একত্বে পর্য্যবসান সূচিত হইয়া থাকে। ঐ একদেবতাবাদ পুরুষসূক্তে পুরুষ-বাদের মধ্যে বিলীন হইয়াছে এবং বৈদিক পুরুষ-বাদ এক অদ্বিতীয় আত্মবাদ বা ব্রহ্ম-বাদে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

অধ্যাপক ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ, পী, আর, এস, পী, এইচ, ডী, কাব্যব্যাকরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

১। কস্মিন্নঙ্গে তপোঽস্যাধিতিষ্ঠতি,
কস্মিন্নঙ্গ ঋতমস্যাধ্যাহিতম্।
ক্ব ব্রতং ক্ব শ্রদ্ধাস্য তিষ্ঠতি
কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতম্। অথর্ববেদ ১০।৭।১
কস্মাদঙ্গাৎ দীপ্যতে অগ্নিরস্য
কস্মাদঙ্গাৎ পবতে মাতরিশ্বা।
কস্মাদঙ্গাৎ বিমিমীতেঽধি চন্দ্রমাঃ
মহ স্কম্ভস্য মিমানোঽঙ্গম্। অঃ বেঃ ১০।৭।২
তস্মিন্ শ্রয়ন্তে যে উকে চ দেবাঃ
বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পরিত ইব শাখাঃ। অঃ বেঃ ১০।৭।৩৮
অপতস্য হতং তমো ব্যাবৃত্তঃ বা পাপ্মনা
সর্বাণি তস্মিন্ জ্যোতীংষি যানি ত্রীণি প্রজাপতৌ
অথর্ববেদ ১০।৭।৪০

২। যো ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ সর্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি,
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ।
অঃ বেঃ ১০।৮।১
যদেজতি পততি যচ্চ তিষ্ঠতি
প্রাণদ প্রাণং নিমিষচ্চ যদ্ভুবং।
তদ্দধার পৃথিবীং বিশ্বরূপং
তং সম্ভূয় ভবত্যেকমেব। অঃ বেঃ ১০।৮।১১

অনন্তং বিততং পুরুত্রা
অনন্তমন্তবচ্চাসমন্তে। অঃ বেঃ ১০।৮।১২
যতঃ সূর্য্য উদেতি অস্তং যত্র চ গচ্ছতি
তদেব মন্যেঽহং জ্যেষ্ঠং তদুনাত্যেতি কিঞ্চন।
অঃ বেঃ ১০।৮।১৬

অকামোধীরোঽমৃতঃ স্বয়ম্ভুঃ
রসেন তৃপ্তোন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যো-
রাত্মানং ধীরমজরং যুবানম্। অঃ বেঃ ১০।৮।৪৪



১৯

মাসখানেক পরের কথা। রাত্রে সুধীশের খাওয়া হইয়া গেলে হিমানী ও গায়ত্রী খাইতে বসিল। সুধীশ তাহার শয়ন-কক্ষের সম্মুখে বারান্দায় দাঁড়াইয়া ধূমপান করিতেছিল; বলিল, "রাত্রে তোমরা ভাত খাও কেন বলো ত?"

গায়ত্রী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই হিমানী বলিল, "তবে কি খাব, লুচি?"

সুধীশ নিজে রাত্রে যাঁতা-ভাঙ্গা আটার রুটী খায়; বলিল, "দোষ কি?"

হিমানী মৃদু হাসিয়া বলিল, "যত বেয়াড়া অভ্যাস করিয়ে দিতে চাও তুমি, তার পর এই বদ্ অভ্যাস টানবে কে শুনি! চিরজীবন কি তুমি পুষবে?"

গায়ত্রীর সামনে কথা হইল, সেই কিছু বুঝিল না, হাসিমুখে খাইতে লাগিল; কিন্তু সুধীশ কথাটার গূঢ় ইঙ্গিত বুঝিয়া চুপ করিয়া গেল। কথাটা সত্য; রাজকুমারীর কন্যা ছিল না, হিমানীকে তিনি কদাচিৎ মায়ের কাছে যাইতে দিতেন। হিমানী তাঁহাদের গৃহে থাকিয়া তাঁহাদের সমান চালে চলিয়াছে; দরিদ্রের ঘরে গিয়া সেজন্যও তাহার কষ্ট গিয়াছে কম নয়।

আচমনান্তে যে যাহার ঘরের দিকে গেল। সুধীশ তখনও দাঁড়াইয়া ছিল; সে বাঁ-হাতে গায়ত্রীর কটি বেষ্টন করিয়া তাহাকে লইয়া ঘরে গেল।

হিমানী যে তাহাদের লক্ষ্য করিয়াছে, তাহা তাহারা ধারণাও করে নাই। রহস্যপ্রিয়, কৌতূহলা নারীপ্রকৃতি সহসা হিমানীর মনের মধ্যে মাথা নাড়া দিয়া উঠিল; তা ছাড়া একটা অসংযত বাসনা হইতেছিল—সুধীশ গায়ত্রীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করে দেখিবার।

ছবি, মৃণা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হিমানী দুয়ারটা ভেজাইয়া দিয়া খুব সঙ্গোপনে বারান্দার এক পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। রঙীন কাচের জানালা, গায়ত্রী বা সুধীশ তাহাকে দেখিতে না পাইলেও হিমানী তাহাদের স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

সুধীশ গায়ত্রীর প্রসাধন করিয়া দিতেছিল। হিমানী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল। মুখে পাউডার মাখাইয়া সে কেমন লঘুহস্তে ঠোঁটে লিপষ্টিক বুলাইয়া দিল, চোখে সুরমা টানিয়া দিল, সিন্দুর-কৌটায় তর্জ্জনী ডুবাইয়া কপালে একটি বড় সিন্দুর-টিপ পরাইয়া দিল। তাহার পর ফুলদানী হইতে বাছিয়া বড় বড় তিনটি গোলাপ তাহার মাথায় পরাইয়া দিল এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহার মুখখানি বার বার দেখিতে লাগিল,—যেমন করিয়া চিত্রকর তাহার মানসীর অঙ্গে শেষ-রেখাপাত করিবার পর দেখে,—তেমনই করিয়া। তাহার পর গায়ত্রীকে বুকে লইয়া আদর করিতে লাগিল। গায়ত্রী যেন সোহাগের নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে; সে নিস্পন্দ হইয়া লুটাইয়া পড়িল,—তাহার কমতনুখানি যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে, সুধীশের প্রশস্ত বুকের উপর সে তাহার সমস্ত দেহভার ছাড়িয়া দিয়াছে!

হাঁ, সুধীশের ওষ্ঠে বোধ হয় বিষ আছে! এমনই মাদকতা, এমনই আবেশ হিমানীরও লাগিত, এমনই করিয়া বিহ্বল ভাবে সেও লুটাইয়া পড়িত তার বুকে! এক দিন রাজকুমারীর চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছিল,—তিনি সুধীশকে হাসিমুখে অনুযোগ করিয়াছিলেন,—'ওরে যত দিন বিয়ে দিতে না পাচ্ছি, তত দিন অমন করিসনি বাবা, হিমুও যে বড় হ'য়েছে। ইহার পর হইতে তাহারা অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিয়া ছিল। এমনই করিয়া সুধীশ কত দিন তাহাকে সাজাইয়া দিয়াছে; এমনই করিয়াই আদর করিয়াছে, এমনই নিবিড় বাহু-বন্ধনে বাঁধিয়াছে! অথচ আজ সে তাহার কাছে

একেবারেই অপ্রয়োজনীয়—কুটুম্ব ব্যতীত আর কেহই নয় ; অধিকন্তু আশ্রিতা গলগ্রহ !

হিমানী ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া মেঝেতে পড়িতেছিল। হিমানী সেখানে গিয়া বসিল। গরাদের উপর মাথা রাখিতেই মনে পড়িল, তাহার নিজের বিবাহিত জীবন, তাহার স্বামীকে,—রূপবান্, গুণবান্, চরিত্রবান্ স্বামীই সে পাইয়াছিল। বিবাহের পর স্বামি-গৃহে আসিয়া সে দেখিল, দ্বাদশী গায়ত্রী ব্যতীত সংসারে আর কেহ নাই। স্বামী অনুপ বিবাহের তিন-চারি দিন পরে, অভ্যাগতরা বিদায় লইলে—তাহাকে বলিয়াছিল, গায়ত্রী বড় হয়েছে, ওকে একা শুতে দেওয়া উচিত নয়, তুমি ওর কাছে শুয়ো।···আমার কথায় কি রাগ করলে? আদর করিয়া ম্লান হাস্তের সহিত বলিয়াছিল,—রাগ কোর না লক্ষীটি, ভেবে দেখ, কেন বলছি,—আমার উপায় নাই।

তদবধি হিমানী গায়ত্রীর কাছে শয়ন করিত, মাঝের দুয়ার মুক্ত রাখিয়া ; অনুপ থাকিত পাশের ঘরে। হিমানী তখন সুধীশের বিরহে ব্যথাতুর,—তাই স্বামীর সান্নিধ্য এ ভাবে ত্যাগ করিয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়া, সে যেন বর্ত্তাইয়া গেল।

অনুপ তাহাকে ভালবাসিত, সর্ব্বান্তঃকরণেই ভালবাসিত। গায়ত্রীর আড়ালে তাহাকে কত আদরে, স্নেহে নিষিক্ত করিয়া দিত।—ভাবিতে ভাবিতে পুরাতন স্মৃতির ব্যথায় হিমানীর গণ্ড বহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। অনুপ তাহাকে ভালবাসিয়াছিল—সুধীশের অপেক্ষা কোন অংশে তাহার প্রেম ন্যূন ছিল না, সুধীশ যদি তাহার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন করিয়া না থাকিত, তবে স্বামীর প্রেমে সে সুখী হইতে পারিত ; তখন তার স্বামী ছিল দেব-চরিত্র !

তার পর কালক্রমে ছবি জন্মগ্রহণ করিল, দুই বৎসর পরে মৃণাও জন্মিল। হিমানীর অন্তরের প্রেম বিশুদ্ধ না হইলেও, তাহার সন্তানদের জনকের প্রতি স্নেহের অল্পতা ছিল না ; কিন্তু সুখ তাহার অদৃষ্টে নাই, তাই সে স্বামীর প্রতি স্নেহবতী হইতে না হইতেই অনুপের পদস্খলন হইল। তাহার পর সে এমন করিয়া এত দ্রুত নামিতে লাগিল যে, হিমানীর চেষ্টা করিয়া দেখিবার আর কিছুই রহিল না। পত্নী ও ভগিনী যাহার প্রাণাধিক প্রিয়তমা ছিল, শিশু-সন্তান দু'টি যাহার পঞ্জরাস্থির মত প্রিয় ছিল, গৃহ বলিয়া আর তাহার মনেই রহিল না ! যুবতী পত্নী ও অনূঢ়া ভগিনীর দিন-রাত্রি যে কেমন করিয়া কাটে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার সময়ও তাহার রহিল না।

অবশেষে একটা বারবনিতাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পাঁচ বৎসরের জন্য কারাগারে গিয়াছে ; কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। হিমানীর চোখের জল আবার অদম্বরণীয় হইয়া উঠিল, কি কষ্টই পেতে হয় জেলে, অমন কন্দর্পের মত সুন্দর আকৃতি তার, হয় ত পীড়নে যাতনায় অতিসার, মসীবর্ণ হইয়া গিয়াছে ! নাই বা সে তাহাকে ভালবাসিল সুধীশের সমান, তবু ত তার স্বামী,—তার ছবি মৃণার জন্মদাতা ; তার সুখ-দুঃখে জড়ানো পবিত্র বন্ধনে বাঁধা জীবনের সাথী !

হিমানী অন্যমনস্ক হইল। এখনও প্রায় আড়াই বৎসর বাকী,—তাহার পর অনুপ আসিবে। আসিবে,—কিন্তু কলঙ্কলিপ্ত হত্যাকারীর ছাপ লইয়া। হিমানী তখন এই পরাশ্রয় ছাড়িয়া স্বগৃহে যাইবে তার স্বামীর কাছে,—হত্যাকারীর কাছে ! তার জীবনে গৌরবের, সুখের, শান্তির আর কিছুই অবশিষ্ট নাই ; সে সর্ব্বপ্রকারে দলিত, লাঞ্ছিত, পিষ্ট। সুখরবি তাহার সেই দিনই অস্তমিত হইয়াছে—যে দিন সুধীশ মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল !

হিমানীর গাল বহিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল কঠিন হর্ম্ম্যতলে ঝরিতে লাগিল।

কখন্ সেইখানে বসিয়া সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, জানে না। স্বপ্ন দেখিল, অনুপ তাহার পাশে বসিয়া আছে। তেমনই স্বাস্থ্যবান্, তেমনই সুন্দর, তেমনই কমনীয় ! হিমানীর আলুলায়িত কেশগুচ্ছ লইয়া নাড়িতে নাড়িতে স্মিতমুখে বলিতেছে,—কেন কাঁদছ, আমার হিমরাণী ? এই ত আমি। আমায় তুমি ভালবাস না বুঝি ? তুমি কেঁদ না, আমার যে বড় কষ্ট হয় !

হিমানী চমকিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল ! মায়া, মায়া, সবই মায়া ! কৈ অনুপ, কে তাহার চোখের জল দেখিয়া ব্যথিত হইবে ? সে যে কারাগারের নিবিড় অন্ধকারে ধরা-শয্যায় পড়িয়া মশক-দংশন সহ্য করিতেছে !

হিমানী গরাদের উপর মাথা লুটাইয়া অস্ফুট রোদনের সহিত বলিল, কত দিনে তোমায় দেখতে পাব! আড়াই বছর কেটে গেল, তোমার চাঁদমুখ আমি দেখিনি!

২০

দুই জনে বসিয়া গল্প করিতেছিল, গায়ত্রী ও সুধীশ। মৃণা একটা হাণ্ডবিল লইয়া ঘরে ঢুকিল, বায়স্কোপের ছবি। গায়ত্রীর কোলে বসিয়া কাগজখানা মেলিয়া-ধরিয়া বলিল, "দেখেছ পিসিমা, কেমন ছবি?"

আলিঙ্গনবদ্ধ নর-নারীর ছবি।

গায়ত্রী হাসিয়া বলিল, "ওমা, এ যে মিণুরাণীর শ্বশুর-শাশুড়ী!"

মৃণা পাল্টাইয়া বলিল, "না, তোমারই শ্বশুর-শাশুড়ী!"

গায়ত্রী কুণ্ঠিত হাসির সহিত বলিল, "দূর পোড়ামুখী!"

সুধীশ মৃনার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, "মিণু মা, তুমি ত আমার মা, নও?"

মৃণা গম্ভীর হইয়া বলিল, "হাঁ, আমার ছেলে, আমার সোণাছেলে!"—বলিয়া সুধীশের গলা জড়াইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, বলুন ত, এ আমার শ্বশুর-শাশুড়ী—না পিসিমার?"

সুধীশ হাসিয়া বলিল, "এই রে! শক্ত সমস্যায় যে ফেললে মা তুমি!—বা বলে ওরা তোমার পিসিমার শ্বশুর-শাশুড়ী ত নয়ই,—তোমার হ'লেও হতে পারে।"

মৃণা বলিল, "ওঃ বুঝেছি, এ তবে মায়ের শ্বশুর-শাশুড়ী। মাকে দেখাই গিয়ে।"...বলিয়া চঞ্চল পদে দৌড়াইয়া চলিয়া গেল।

গায়ত্রী বলিল, 'আমি কখনও সিনেমা দেখিনি। আচ্ছা, ঐ রকম ছবিগুলো কি ক'রে দেখায় ওরা বলো ত?"

সুধীশ সবিস্ময়ে বলিল, "সিনেমা দেখনি? সে কি! সত্যি?"

গায়ত্রী হাসিমুখে বলিল, "কেন! বিশ্বাস হচ্ছে না?"

সুধীশ বিস্মিত ভাবেই বলিল, "কি করে বিশ্বাস করব? তুমি কি সত্যিই পৌরাণিক যুগে জন্মেছ?"

গায়ত্রী হাসিতে লাগিল, বলিল, "সকলেরই কি সুযোগ মেলে? দাদা বৌদি কখন কখন যেতেন, আমি ইচ্ছে করেই যেতুম না। দাদার কাছে বসে ঐ-সব ছবি দেখা যায়? আর পরের সঙ্গে দাদা আমায় যেতেও দিতেন না।"

সুধীশ বলিল, "চলো, আজ তোমায় দেখিয়ে আনি। আমার কাছে বসে দেখতে লজ্জা করবে না বোধ হয়?"

গায়ত্রী হাসিতে লাগিল; তাহার পর বলিল, "বৌদিকে নিয়ে যাবে ত?"

সুধীশ বলিল, "যেমন হুজুর অনুমতি করবেন!"

গায়ত্রী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "হুজুর অনুমতি করছেন।"

সুধীশ বলিল, "তবে ছ'টার শোতে চলো, আজ আমার বিশেষ কাজও নেই। হিমানীকে বলে এসো—কিন্তু ইংরেজী ছবি!"

গায়ত্রী ত হাসিয়াই অস্থির, "ওঃ, তবে ত আমি সবই বুঝব! বৌদি বরঞ্চ বুঝতেও পারে, আমি ত গবেট!"

সুধীশ অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিল, "এ দাস থাকিতে বিদ্যমান,—কেন এ ভাবনা দেবী! চক্ষের নিমেষে করিব তর্জ্জমা,—দিব বুঝাইয়া—"

গায়ত্রী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল, তাহার পর শিথিল বসন গায়ে জড়াইয়া—উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যাই, বৌদিকে বলে আসি।" সে বাহির হইয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সুধীশ কি যেন ভাবিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি মায়ের কি কি গয়না পেয়েছ রাণী?"

সুধীশের মুখে এ কথা একেবারেই অভিনব। গায়ত্রী তাৎপর্য্য বুঝিল না, তবুও ফর্দ্দ দিল, "চুড়ী, তাগা, হার, নাকছাবি, কানফুল, এই যা পরে আছি; এ-ছাড়া হীরের নেকলেস, হীরের বালা, পান্নার হার, পান্নার ব্রেসলেট। আর ঠাকুরমার দরুণ কঙ্কন, নারকেলফুল, যবদানা, চন্দ্রহার, তাবিজ, যশম, সাতনর, কানবালা, চৌদানী, সীঁথি—"

সুধীশ বলিল, "যত সব রাবিশ!"

গায়ত্রী বলিল, "গয়নার হিসেব হঠাৎ চাইলে কেন বল ত?"

সুধীশের গলায় কথাটা আটকাইতেছিল; ঢোক গিলিয়া বলিল, "হিমানী শুধু কাচের চুড়ী পরে থাকে; কেমন বিশ্রী লাগে না? আমার সঙ্গে দু'জনে যাবে, তুমি সর্ব্বাঙ্গে গয়না-পরা, আর ওর হাতে শুধু কাচের

চুড়ী, বড্ড বেমানান ঠেকে না ? নিজেদেরই যেন খেলো হতে হয়।"

এ ব্যথা গায়ত্রীকে অনুক্ষণ বিঁধিতে থাকে, বলিল, "আমার তা সব সময়েই মনে হয়—কিন্তু কি করব ?"

সুধীশ তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "কেন, তোমার স্বামীর অবস্থা কি এমন নয় যে, তুমি ইচ্ছে করলে কাককে একখানা গয়না দিতে পার ?"

গায়ত্রী মাথা হেঁট করিয়া রহিল, তাহার পর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ও নেবে কেন ?"

সুধীশ বলিল, "নিতে কি সহজে চাইবে? এ ত জানা কথাই; কিন্তু তোমার স্নেহের দাবী কি এতটুকু নেই—যাতে জোর করে ওকে পরাতে পার ?"—একটু নীরব থাকিয়া ভাবিয়া বলিল,—"পরে যা হয় গড়িয়ে দিও, কিন্তু আজ কি উপায় করবে ?"

গায়ত্রীও একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল, "আমি ত কুড়ি গাছা চুড়ী পরে আছি; বলো যদি, এই থেকে দশ গাছা ও পরুক, আর এই হার ওর গলায় পরিয়ে দিই। আমি পান্নার হাড়ছড়া পরব। কানের গয়না আমার ঢের আছে; ভাল দেখে একজোড়া কানবালা পরিয়ে দিলেই হবে,—কি বলো ?"

সুধীশ প্রীত-কণ্ঠে বলিল, "সেই ভালো।"

কিন্তু গহনা পরান ব্যাপারটা অত সহজে হইল না। হিমানী কাপড়ের ভিতর হাত লুকাইয়া বলিল, "আরে মলো! তুই ক্ষেপে গেলি না কি ? তোর বর ভাববে কি ? মনে করবে, কি ডোকলা-ঘরের মেয়ে এনেছি,—সাতগুষ্ঠি পুসছি, তাতেও আশ মিটছে না, শেষে দেখছি, গায়ের গয়না খুলে দিতে আরম্ভ করেছে !"

গায়ত্রী তাহার হাত টানাটানি করিতে করিতে বলিল, "না বৌদি, তা মনে কোর না ভাই! ওঁর মনটা খুব উঁচু আর দেবতার মতই স্বভাব। উনি খুসীই হবেন।"

হিমানী হাসিল, বেদনাবিধুর ম্লান হাসি,—হায় রে! আজ সুধীশের পরিচয় দিতেছে গায়ত্রী! সুধীশকে দোষে-গুণে হিমানীর চেয়ে সে না কি বেশী চেনে!

তাহার দুই চোখের জলে মুখ ভাসিয়া গেল; রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ঠাকুরঝি, তোর পায়ে পড়ি, আমায় মাপ কর। আমি পরতে পারব না।"

পূর্ব্ব-ব্যবস্থামত সুধীশ ভিতরে আসিল। সে জানে, হিমানীর ব্যথা কতখানি। মা এ অলঙ্কার রাখিয়া গিয়াছিলেন—সুধীশের পরিণীতা বধূ হিমানীর জন্য, আজ তাহাই লইতে হইবে অনুগ্রহের দানস্বরূপ গায়ত্রীর হাত হইতে? তাহার চোখেও কি জল ঝরিতেছে? ও বুঝি বুক-নিংড়ান রক্ত!

গায়ত্রী নিরুপায় ভাবে সুধীশের দিকে চাহিল,—অর্থাৎ পারিলাম না।

সুধীশ বলিল, "বলুক, তুমি পরিয়ে দাও।"

কিন্তু গায়ত্রী তাহার মুষ্টিবদ্ধ হাত কিছুতেই খুলিতে পারিল না, চুড়ী পরাইবে কাকে? ইঙ্গিতে সুধীশকে বলিল, হাতখানা ধরিতে। সুধীশের শক্তিশালী হাতের মধ্যে হিমানীর মুষ্টি শিশুর মত সহজে খুলিয়া গেল; ফুলের মত নরম হাত, গায়ত্রী এক টানে পাঁচ গাছা চুড়ীই তুলিয়া দিল। তাহার পর গলার হার খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া কানে একটা কটকী-কাজের বড় কানবালা পরাইয়া দিল। তৃপ্তিতে এবার গায়ত্রীর বুক ভরিয়া উঠিল।

হিমানী ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতেছিল। হাত ছাড়া পাইয়া চুড়ী খুলিতে উদ্যত হইতেই গায়ত্রী বলিল,—"আমার মাথা খাবি বৌদি, যদি খুলবি—"

হিমানী তাহাতে কর্ণপাত করিল না; সহসা চোখ পড়িল সুধীশের চোখের উপর—সে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, দুই চোখে কি অব্যক্ত বেদনাভরা মিনতি! এক মুহূর্ত্তমাত্র; তাহার পর হিমানীর ক্ষিপ্র হস্ত শিথিল হইয়া আসিল।

সুধীশ বলিল, "গায়ত্রীর মাথা খেতে পারলেও, আমারটা খেতে পারবে না বলেই আমার মনে হয়। গায়ত্রীর সঙ্গে সেটাও আটক দেওয়া রইল।—উঠে এস গায়ত্রী, হিমানী পারে খুলে ফেলুক।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

হিমানী হাত সরাইয়া লইল। দুই জানুর মাঝে মুখ ফিরাইয়া সে গভীর মর্ম্মবেদনায় নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

বৈকালে তিন জনে সিনেমায় চলিল।

ছবি দেখান সুরু হইলে হিমানী ও সুধীশ সহসা যেন

সজাগ হইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, আর গায়ত্রী প্রথম দর্শক হিসাবে অভিভূতের মত ছবি দেখিতে লাগিল, সুধীশকে প্রশ্ন পর্য্যন্ত করিল না।

"আরাবেলা ও জন গ্রাম্য চাষীর সন্তান,—দু'জনে গভীর প্রেম। এই সময় দেশে যুদ্ধ বাধিল, জন গেল রণক্ষেত্রে। আহত জনের সহিত প্রেম হইয়া গেল নার্শ লুসির। লুসি লক্ষপতির কন্যা, দেশের কাজ করিবার উদ্দেশ্যে নার্শ হইয়াছে। দু'জনের প্রেম গভীর হইয়া উঠিল। লুসির দৌলতে জন অভিজাত মহলে মিশিবার সুযোগ পাইল। আরাবেলাকে সে একেবারে ভুলিয়া গেল। এ দিকে গ্রামেও এ সংবাদ পৌছিল, আরাবেলা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

"দিন যায়। আরাবেলার পিতা ঋণী ছিল, গ্রামের মহাজন আইজ্যাকের কাছে। আইজ্যাক পাকা সুদখোর; অকৃতদার, নির্ম্মম, বয়স চল্লিশ বৎসর। সে আরাবেলার ভগ্নস্বাস্থ্য পিতাকে বলিল, যদি তোমার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দাও, আমি ঋণের দাবী ছাড়িয়া দিব।

"নিত্য ঋণের তাগাদায় তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পিতার দিবানিশি প্ররোচনা, এবং দেখা হইলেই আইজ্যাক দাঁত বাহির করিয়া হাসে, বলে, Ay Miss, you can save your father from misfortune.

"অবশেষে নিরুপায় হইয়া আরাবেলা স্বীকার করিল, এবং অবিলম্বে বিবাহ হইয়া গেল।

"ওদিকে জন লুসির সহিত খুব ঘনিষ্ঠ হওয়ায় অভিজাত মহলে তাহা লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। একদা নাচের আসরে, লুসির অভিজাতবংশীয় প্রণয়ী রেমণ্ড জনের নাকে ঘুসি মারিয়া জানাইয়া দিল, সে চাষার ছেলে, চাষার সমাজই তাহার উপযুক্ত। উচ্চবংশীয়দের সহিত তাহার মিশিতে যাওয়া—দাঁড়কাকের ময়ুর-পুচ্ছ ধারণের মত। লুসি তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ত করিলই না, বরং উপমাটা শুনিয়া খুব হাসিল, এবং রেমণ্ডকে সুরসিক বলিয়া অভিনন্দিত করিল।

"তখন জনের চক্ষু ফুটিল; সে তাহার উপেক্ষিতা প্রিয়তমাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া ক্ষমা চাহিল। এই পত্র যে দিন আসিল, সেই দিন আরাবেলার বিবাহ। তাহার পিতা পত্রখানা নিজে পড়িল, পরে চুল্লীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

"হৃদয়হীন কুসীদজীবীর ঘরে আরাবেলা শান্তি পাইল না। এক দিন সন্ধ্যায় বিবাদ করিয়া তাহার গৃহত্যাগ করিয়া আরাবেলা পিতৃগৃহে যাত্রা করিল। পথে তাহাদের বাল্য ও কৈশোরের ক্রীড়াভূমিগুলি দেখিতে দেখিতে আরাবেলা সজল নেত্রে অগ্রসর হইতেছিল। বুড়া ওক বৃক্ষের সামনাসামনি দেখা হইয়া গেল জনের সহিত,—সে এইমাত্র গ্রামে প্রবেশ করিতেছে!

"এক মুহূর্ত্ত—তার পর বিপুল আবেগে দু'জনে দৃঢ় বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হইল, এবং তৃষিত ওষ্ঠ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া রহিল।"

সেই ছবি, কম আলোয়, বেশী আলোয়, ছোট করিয়া, বড় করিয়া কতকটা সময় দেখাইবার পর বন্ধ হইল। গায়ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। সুধীশ হিমানীর একটা আঙ্গুল স্পর্শ করিয়া বলিল, "চলো।"

হিমানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর তিন জনে নিঃশব্দে আসিয়া মোটরে বসিল। তিন জনই নিস্তব্ধ, হিমানী ও সুধীশ স্মৃতির দহনে দহিতেছিল এবং গায়ত্রী ভাবিতেছিল, এই ছবি তাহার ভাববিলাসী স্বামীকে না জানি কতখানি আঘাত করিয়াছে!

এই অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলিতেও যেন সুধীশের কষ্ট হইতেছিল, সে একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগল গায়ত্রী?"

অন্ধকারের মধ্যে গায়ত্রী স্বামীর হাতখানি দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়াছিল; ব্যথাতুর মনটা যেন সুধীশের সান্নিধ্য একান্ত ভাবে চাহিতেছিল, ভারী-গলায় বলিল, "আরাবেলার জন্যে বড় দুঃখ হয়।"

হিমানী বলিল, "কিন্তু ওর ত দুঃখের দিন কেটে গেল ঠাকুরঝি!"

গায়ত্রী বলিল, "হাঁ, তা বটে! ওদের মধ্যে বিয়ে ভাঙ্গা যায়। কিন্তু ও নিয়মটা কি ভালো?"

হিমানী উত্তর দিল না, অন্ধকারে অল্প হাসিল, গায়ত্রী ভালোমন্দর বিচার করিতেছে! যে চিরদিন রাজভোগ খাইয়া উদ্গার তোলে, সে কি বোঝে—অনশনের কি জ্বালা! গায়ত্রীর মুখের কথা ঠোঁটে মিলাইতে পায় না, সুধীশ তখনই আগ্রহের সহিত তাহার বাসনা পূর্ণ করে,—সে কি জানিবে অবহেলার—অনাদরের ব্যথা!

বাড়ী পৌছিয়া গায়ত্রী হিমানীর চোখের পানে চাহিয়া বলিল, "ছবি দেখে এত কাঁদলে বৌদি! চোখ দুটো যে জবাফুল হয়ে উঠেছে।"

হিমানী উত্তর দিল না, সুধীশ গলা বাড়াইয়া দেখিল, দুই জনের চক্ষুর মিলন হইলে উদ্গত শ্বাস টানিয়া উভয়েই নীরব রহিল।

আহারে বসিয়া সুধীশ খাইতে পারিল না, সামান্য দুই-এক গ্রাস মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িল। গায়ত্রী অনুরোধ করিল না: সে জানে, ঝড় উঠিয়াছে, এইটুকুমাত্র তার বাহ্যিক বিকাশ।

হিমানীও খাইতে পারিল না, মাথা ধরিয়াছে বলিয়া উঠিয়া গেল।

গায়ত্রী ঘরে আসিয়া দেখিল, আজ ইহার মধ্যেই সুধীশ শুইয়া পড়িয়াছে। গায়ত্রী নিঃশব্দে গিয়া শয়ন করিল, কথা বলিল না। সে জানে, এ সময় বৃথা প্রশ্নোত্তর করিলে সুধীশ লজ্জা পাইবে। সে কোন দিক দিয়া স্বামীকে এক তিল আঘাত করিতে চায় না। জিজ্ঞাসার কিই বা আছে? সবই ত সে জানে।

সুধীশ ঘুমায় নাই, জাগিয়াই ছিল, সে নিত্যকার মত গায়ত্রীর মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। এই নির্ব্বাক্ সঙ্গিনী যেন তাহাকে মৌন সান্ত্বনায় নিষিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

তাহার পর গায়ত্রী ঘুমাইয়া পড়িল।

গায়ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। একটা করুণ সুর কক্ষমধ্যে যেন কাঁদিয়া ফিরিতেছিল। অর্দ্ধজাগ্রতাবস্থায় গায়ত্রী উহাকে কান্না বলিয়াই ভ্রম করিয়াছিল, একটু সজাগ হইয়া বাঁশী বলিয়া বুঝিবামাত্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

সুধীশ শয্যায় নাই!

তবে কি সে-ই বাঁশী বাজাইতেছে? এমন করুণ, এমন বেদনামাখা!

গায়ত্রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, শব্দানুসরণ করিয়া বুঝিল, সে পাশের ছাদে আছে। শুক্লা-দ্বাদশীর রজতধারায় সমস্ত দিগন্ত প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, বাগানের সুপারী গাছের মাথায় বাতাসে পত্র-আন্দোলনের সঙ্গে যেন লক্ষ চন্দ্র জ্বলিয়া উঠিতেছে। বড় অশ্বত্থ গাছের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া একটি বিরহী পিক আর্ত্তবেদনায় কাঁদিতেছিল। বাগানে বড় গন্ধরাজ গাছটায় অজস্র ফুল ফুটিয়াছে, বুঝি সুগন্ধে বাতাস ভরপুর। দক্ষিণা বাতাসের একটা ঝাপ্টা আসিয়া গায়ত্রীর স্বেদসিক্ত ললাট চুম্বন করিল। গায়ত্রী মিনিট-খানেক সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মৃদুপদে বাহিরে আসিল।

একটা প্যাকিং কেসের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া সুধীশ বাঁশী বাজাইতেছে, চক্ষু মুদ্রিত, চোখের কোণে দু'-ফোঁটা জল—আলো পড়িয়া চকচক্ করিতেছিল। গায়ত্রী নিঃশব্দ-পদে কাছে গিয়া দাঁড়াইল, বাঁশীটা হাত হইতে লইয়া কাঁধের উপর একটা হাত রাখিল।

সুধীশ চমকিয়া চাহিল, দুই চোখে তার কি ব্যাকুল আর্ত্তি, কি বিষাদমগ্ন মুখ! গায়ত্রী আঁচল তুলিয়া চোখের কোণের জলটুকু মুছাইয়া-দিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "ওঠো, ঘরে চলো।"

ঘরে আসিয়া বসিলে গায়ত্রী ক্ষীণ হাসির সহিত বলিল, "পয়সা খরচ করে বেশ যাহোক কুগ্রহ দেখা হ'ল!"

সুধীশ অপ্রতিভ ভাবে হাসিল, কিছু বলিল না।

গায়ত্রী বলিল, "ছবি দেখতে দেখতেই বুঝেছি, আজ অনেক ঝক্কি সামলাতে হবে! ও পোড়ামুখীরা শুধু কাঁদতেই আছে, চোখ মোছাতে আছি আমি!"

সুধীশ কুণ্ঠিত হাসির সহিত বলিল, "বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে যে!"

গায়ত্রী বলিল, "বড় বৈ কি! আমি নিশ্চয়ই তাদের চেয়ে ঢের ছোট!"

সুধীশ বলিল, "বয়সে ছোট ত বটেই; আমি সে কথা বলিনি। সম্পর্কে তুমি তাদের চেয়ে বড়ো।"

গায়ত্রী ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "বটেই ত, তাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে একাটি বসে কাঁদছিলে! আমি যদি তোমার বর্ত্তমানের বৌ না হয়ে অতীতের প্রণয়িনী হ'তুম, তুমি বোধ হয় আমায় বেশি ভালবাসতে—"

সুধীশ জানে, এগুলা গায়ত্রীর অন্তরের অভিযোগ নয়। সে সুধীশকে এমনই ব্যথিত দেখিলে ছেলে-মানুষের মত ভোলায়। সুধীশ বিষণ্ণ হাসির সহিত বলিল, "তুমি আমার সবার বড়, সবার ওপর। এর মধ্যে এক ফোঁটা মিথ্যে নেই।"

গায়ত্রী দুষ্ট হাসি চাপিয়া বলিল, "আহা হা, তাই কাঁদছিলে? মরে গেলে যে আর দেখতে পাব না, নাহ'লে ইচ্ছে করে, মরে গিয়ে দেখি, আমার জন্যে তুমি কত কাঁদ!"

সুধীশের মুখে গভীর ক্ষোভের ছায়া পড়িল, ম্লান মুখে বলিল, "শুধু এইটুকু দেখবার লোভে আমায় ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় গায়ত্রী? আমি হয় ত তোমায় ভালবাসি না, কিন্তু তুমি ত বাস? আমি যদি তোমার জন্যে কাঁদি, কি দুঃখ পাই, তা দেখে কি তুমি সুখী হবে? তুমি নেই, আমার পাশে নেই, আমার ঘরে নেই, এ পৃথিবীতে নেই, এ আমি ভাবতে পারিনে! জানি, এ এক দিন হবেই। আমাদের দু'-পুরুষের মধ্যে কোন বৌ

বিধবা হয়নি। তুমিও হবে না, আমাকে ছেড়ে তুমিও যাবে। কিন্তু আমি সে কথা মনে করতেও পারি না; তুমি না থাকলে আমি কি করে বেঁচে থাকবো ?” বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

গায়ত্রী ঢিল ছুঁড়িয়া পাটিকেল খাইল, সুধীশের করুণ কণ্ঠস্বর তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সে কাঁদিয়া সুধীশের কোলে উপুড় হইয়া পড়িয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, “আমি কি সত্যি করে বলেছি, তুমি কেন তাকে সত্যি মনে করলে ?”

সুধীশ শুধু তাহার পিঠের উপর দুই হাত রাখিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। খানিকটা পরে গায়ত্রী শান্ত হইল, উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিল, “তুমি বড় দুষ্ট!”

সুধীশ একটু হাসিয়া বলিল, “তুমি বড় শিষ্ট! আর কোন দিন বলবে না ত ?”

গায়ত্রী সুধীশের বুকের উপর মাথা ঘষিতে-ঘষিতে বলিল, “না। আমি কি সত্যিই তোমায় ছেড়ে যেতে চাই ? তোমায় ছেড়ে বৈকুণ্ঠেই আমি যেতে চাই না। তুমিই আমার স্বর্গ, আমার ধর্ম্ম।”

সুধীশ গেঞ্জির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অনুযোগের সহিত বলিল, “কি করলে বল দিকি, সিন্দুর মাখিয়ে লাল করে দিলে, এটা কাল কি করে কাচতে দেব বল ত ?”

গায়ত্রী হাসিমুখে বলিল, “কাচতে দিও না, খুলে তুলে রেখ। এক দিন ত মরবই, তখন আলমারী খুলে ওটা দেখো, আর আমায় মনে কোর।”

সুধীশ তাহার গালে একটা মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিল, “ফের ?”

গায়ত্রী জিভ কাটিয়া হাসিল।

সুধীশ বলিল, “এখনই মরবার কথা কেন রাণু ? এই ত সবে জীবনে প্রবেশ করলে! আগে খোকাখুকু হোক, তাদের মানুষ করো, তার পর বুড়ী হয়ে এক দিন চলে যাবে; আমি নিজে হাতে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেব। কেমন ? তার পর সাত দিন পরে আমায় ডেকে নিও। তুমি ত আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে না! এই বেশ, না ?”

আবেশে গায়ত্রীর চোখ বুজিয়া আসিল, সে যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল; সুধীশ শ্বেতশীর্ষ গোলাপের মালা দিয়া তাহাকে সাজাইয়া দিতেছে! [ক্রমশঃ

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।

শরৎ কি আসিল এখন ?

বৎসরের পুঞ্জীভূত সীমাহীন জর্জ্জর ব্যথায়
বর্ষ পরে আসিল আশ্বিন—
বঞ্চিত অসংখ্য মনে সে আসিল স্বপন-দোলায়
ঝঙ্কারিয়া মরমের বীণ ?

চাষীর নয়নকোণে উথলিছে সজল বাদল
ঘরে নাই কণিকাও ধান—
কি করিয়া চলে দিন; বহু দেরী ফলিতে ফসল
কৃষকের ব্যাকুল পরাণ।

বঙ্গদেশ ভরা আজ জীবনের মলিন আঁধার
বেদনার রূপে মায়াময়—
বিদগ্ধ বিশুষ্ক প্রাণ—আলোয় কে ভরিল আবার
জাগাইয়া বিপুল বিস্ময়!

পুঞ্জীভূত সব গ্লানি দহনের যেন অবশেষ
শেফালিতে ভরে দিগঙ্গন—
আমার মনের বনে প্রেয়সীর মনোহর বেশ
শরৎ কি আসিল এখন ?

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান-জগৎ

ক্যামেরার কেরামতি

ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইন্‌ষ্টিটিউট-অফ টেক্‌নলজির অধ্যক্ষ ডক্টর হ্যারল্ড এজার্টন আলট্রা-স্পীড-রশ্মিযুক্ত ক্যামেরা তৈয়ারী করিয়াছেন।

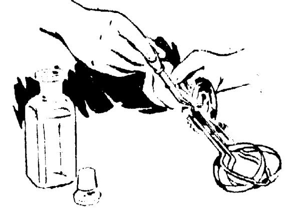


নাচের পলক ছন্দ

এ-ক্যামেরার সঙ্গে গ্যাস-পূর্ণ ফ্ল্যাশ-টিউব সংলগ্ন আছে—সেটি চলে বৈদ্যুতিক-প্রবাহে। ক্যামেরার এ-টিউবে যে তীব্র আলোক-রশ্মি ফোটে, তাহাতে চোখ ঝলসায় না; অথচ এই আলোক-রশ্মির সাহায্যে এ-ক্যামেরায় এক সেকেণ্ডের ত্রিশ-হাজার-তম ন্যূন সময়ে—অর্থাৎ চোখের পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সে সময়ের চেয়েও আট-শত গুণ অল্প-সময়ে ছবি তোলা চলে। এই ক্যামেরায় তোলা নর্ত্তকীর নৃত্যলীলার চকিত নৃত্য-গীতির ছবি দেখিলে ক্যামেরার কেরামতি বুঝা যাইবে।

ঘোল-মৌনি

ঘোল-মৌনিতে মরিচা পড়িয়া 'জাম্‌' ধরিলে ক'ফোঁটা গ্লিসারিন লাগাইয়া দিবেন,—গ্লিসারিন লাগাইয়া দশ-বারো বার মৌনিটি



মৌনি সাফ্‌ করা

চালনা করিলে মরিচা ও জাম্‌ ঘুচিবে।

স্বর মঞ্জুষা

আজ এই সবাক্‌-ছবির যুগে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কোন্‌ চিত্রনাট্যে কোন্‌ দেশের লোক সাজিতে হইবে—তার ঠিক-ঠিকানা নাই। আমাদের কলিকাতা-বাসী অভিনেতা-অভিনেত্রী হয়তো



পল্‌ মুনি

কখনো সাজিলেন সাহেব-মেম, কখনো মেদিনীপুরের লোক, কখনো উড়িয়া, কখনো বা চট্টগ্রামবাসী! যে দেশের লোক সাজিবেন, অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সেই দেশের স্বর ও উচ্চারণ-ভঙ্গী অবলম্বন করিতেই হইবে। একটা দৃশ্যে যে-রকম স্বর-ভঙ্গী প্রকাশ করিলেন,



জন্ সাটন্ এবং জীন্ টিয়ার্নি

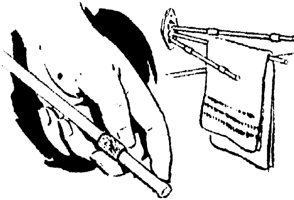
অপর দৃশ্যগুলিতেও হুবহু সেই স্বর বজায় রাখা চাই। কি-রকম স্বর পূর্ব্বদৃশ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে স্বর তুলিয়া রাখার জন্য নূতন রেকর্ডিং-যন্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে। পরের দৃশ্য অভিনয় করিবার সময় এই যন্ত্র চালাইয়া পূর্ব্বোচ্চারিত স্বরের সঙ্গে স্বর মিলাইয়া প্র্যাকৃটিশ করিয়া লইলে খুঁত থাকিবার আর আশঙ্কা নাই! ছবি দু'খানিতে দেখিবেন, এ রেকর্ড খুলিয়া বাজাইয়া পল্ মুনি, জন্ সাটন্ ও জীন্ টিয়ার্নি স্বর সাধনা করিতেছেন।



জাহাজে গাড়ী তোলা

তোয়ালে রাখা

বাথ-রুমে তোয়ালে রাখিবার সময় তোয়ালে রাখিবার রডে বা হ্যাণ্ডেলে



তোয়ালের র‍্যাক্

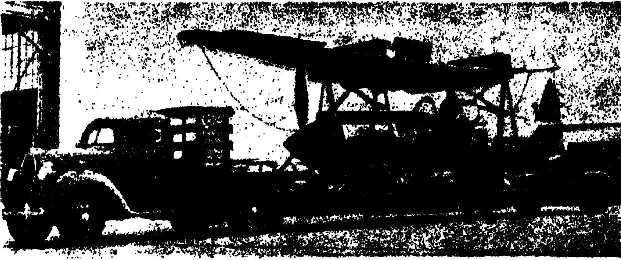
যদি রবারের একটি নল লাগাইয়া লন, তাহা হইলে রড হইতে তোয়ালে পড়িয়া যাইবে না।

আমেরিকার রণসজ্জা

যুদ্ধে কোন্ জাতির কি কাজে কোথায় কি অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহা দেখিয়া আমেরিকা যে ব্যবস্থা করিয়াছে, সে ব্যবস্থার কোথাও এতটুকু খুঁৎ নাই। এ-যুগে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে চাই



কামান চলিয়াছে



গাড়ীর মাথায় এরোপ্লেন

লোক-বল, রশদের বল, আর মারণ-যন্ত্র-বল,—তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ত্রি-শক্তি থাকিলেও সময়মতো যদি এ তিন শক্তিকে যেখানে যখন প্রয়োজন পাঠানো না যায়, তাহা হইলে এ ত্রি-শক্তির সমন্বয় সত্ত্বেও জয়-লাভের আশা থাকে না। এ-জন্য আমেরিকা জল, স্থল ও আকাশ-পথ দিয়া যেখানে যখন প্রয়োজন, চকিতে এই ত্রি-শক্তি প্রেরণের চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছে। নূতন যে ট্রেলার গাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে, সে ট্রেলারের মাথায় মেশিন-গানের গাড়ী তুলিয়া যেমন অতি দ্রুতবেগে তাহা চালান দেওয়া যাইবে, তেমনি জাহাজে মোটর-তোলা, জাহাজ হইতে মোটর নামানো এবং ট্রেলারের বুকে চাপাইয়া বড় বড় এরোপ্লেনও যন্ত্র-তন্ত্র অতি দ্রুত চালান দিতে এতটুকু অসুবিধা ঘটিবে না।

—

ফোনে জনান্তিকী

অফিসে বা বৈঠকখানায় টেলিফোন থাকিলে সে-ফোনের সাহায্যে প্রাইভেট-কথাবার্ত্তা চালানো কঠিন হয়। অফিসে-বৈঠকখানায় পাঁচ জন লোক থাকেন, তাদের উঠিয়া যাইতে বলা ভদ্রতায় বাধে; কাজেই টেলিফোনে সে সময় প্রাইভেট কথা বলা দায়। মার্কিণ-শিল্পী সম্প্রতি জনান্তিকী-ফোন তৈয়ারী করিয়াছেন। এ-ফোনের মাউথপীশে (অর্থাৎ যে চোঙ্ দিয়া কথা কহিতে হয়, সেই চোঙে) প্লাষ্টিকের আবরণ এমন সুকৌশলে সংযোজিত করিয়াছেন যে, সেটি মুখে ধরিয়া কথা কহিলে বাহিরের লোক সে-কথা শুনিতে পাইবেন না। তাছাড়া এ-আবরণে আর একটি সুবিধা আছে এই যে, অফিস-ঘরে বা বৈঠকখানায় যদি কলরব চলে, কোরাস-গানের তরঙ্গ ছোটে, তবু ফোনের কথা তাহাতে এতটুকু অস্পষ্ট হইতে পারে না।

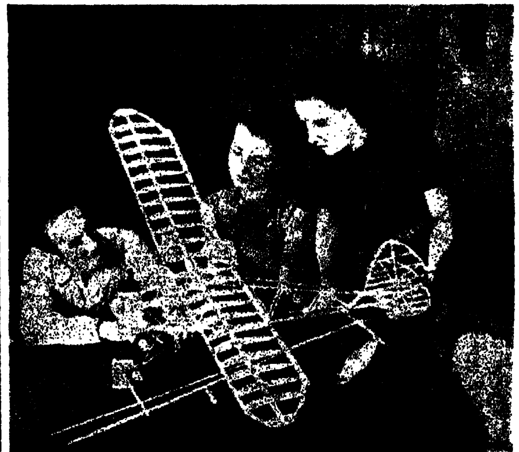


ফোনের কথা অপরে শুনিবে না

—

বিমান-বিহার-শিক্ষা

দেশ-রক্ষা করিতে এ-যুগে বিমান-বিহার শেখা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য—ইহা বুঝিয়া আমেরিকায় বিমান-পোত ও বিমান-বহর সম্বন্ধে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। লেখাপড়ার সঙ্গে বিমান-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে না পারিলে সেখানে আর পাশের সার্টি-ফিকেট মিলিবে না। এ-বিদ্যার প্রথম পর্ব্বে এরোপ্লেনের নানা অংশ; সে-সব অংশের কি কার্য্যকারিতা; মডেল-প্লেন নাড়াচাড়া করিয়া ছেলেমেয়েদের তাহা শিখিতে হয়, তার পর ছেলেমেয়েদের নিজেদের হাতে খেলনা-প্লেন তৈয়ারী করা চাই। খেলার প্লেন হইলেও সে প্লেন আকাশে ওড়ে। তৃতীয় পর্ব্বে এই খেলার প্লেনকে বড় আকারে তৈরী করা চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লেন-চালনা শিখিয়া নিজেদের তৈরী প্লেনে চড়িয়া খানিকটা করিয়া ওড়ার পরীক্ষা দিতে



খেলার প্লেন তৈরী



খেলার প্লেন ওড়ে

হয়। এতগুলি পরীক্ষা দিবার পর ওড়ার জটিল কঠিন বিদ্যা আয়ত্ত করে।

—

মজবুত শ্যাময়-চর্ম্ম

শ্যাময় চর্ম্মের প্রয়োজন আজ ঘরে ঘরে। কাচ ও গহনাদি সাফ



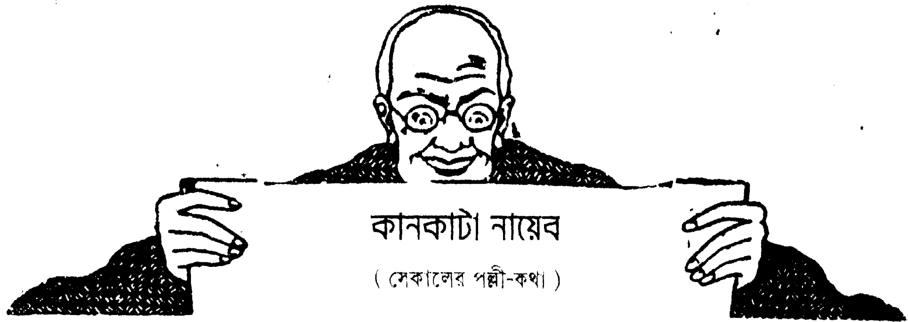
শ্যাময়-চামড়া মজবুত করা

করিতে শ্যাময়-চর্ম্মের প্রয়োজন হয়। অথচ শ্যাময়-চর্ম্ম বেশী দিন টেঁকে না বলিয়া ব্যয়-বিভ্রাট ঘটে! এ-বিভ্রাট নিবারণের উপায়, এক-টুক্‌রা কাপড় কিম্বা চট যদি শ্যাময়-চর্ম্মের পিছন দিকে সেলাই করিয়া আঁটিয়া লন, তাহা হইলে শ্যাময়-চর্ম্ম বহু বৎসর টিঁকিবে—এবং সাফ ও পালিশ করার কাজেও অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বোধ করিবেন। যাঁদের বাড়ীতে সেলাইয়ের কল আছে, তাঁরা সেই সেলাইয়ের কলে চকিতে সেলাইয়ের কাজ সারিতে পারিবেন। যাঁদের ঘরে কল নাই, তাঁরা কাঁথা-সেলাইয়ের ছুঁচ দিয়া সেলাই করিবেন।

দেবতার নাহি প্রয়োজন

স্বর্ণ মন্দির-মাঝে মূর্ত্তি গড়ি' হেমে
দেবতা তোমারে আর   চাহি নাকো পূজিবারে,—
আজি হ'তে যা'ক পূজা-অভিনয় থেমে।
ছাড়ি দেবতার বেশ   নর-রূপে হৃষীকেশ
এস তুমি স্বর্গ হ'তে ধরণীতে নেমে
দেবতার লীলা ঢালি' মানুষের প্রেমে!
প্রিয়রূপে পৃথিবীতে এস তুমি আজ,—
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন   মথুরার সিংহাসন
ত্যজিয়া ধরার বুকে এস ব্রজরাজ!
রাজবেশ দ্বারকার   চাহি না দেখিতে আর,
অসি ও কিরীটে আর নাহি কোন কাজ;—
ধরাতলে এস পরি' কাঙালের সাজ।
নাশিতে বিশ্বের ব্যথা-বেদনার ভার
বাল-গোপালের বেশে   পুত্ররূপে হেসে হেসে
এস তুমি যুগে যুগে কোলে যশোদার,—
আভীর পল্লীতে ঘুরি'   ক্ষীর সর ননী চুরি
করিয়া বাড়াও জ্বালা দিবা-নিশি মা'র;
স্বরগের দেবতায় নাহি চাই আর।
সমপ্রাণ সখারূপে রাখালের সনে
পাঁচনী লইয়া হাতে   শিখিচূড়া বাঁধি' মাথে
হৃদয়-যমুনা তীরে ল'য়ে ধেনুগণে
গোকুল করিয়া আলো   সবারে বাসিয়া ভালো
এস পুনঃ মানুষের চিত্ত-বৃন্দাবনে,—
তোমারে পূজিবে সবে প্রেম-নিবেদনে।
দরদী দয়িতে মোরা করি আবাহন,
গোপ-গোপী-মনোহারী   বনমালী বংশীধারী
প্রেমময় রসরাজ! দাও দরশন,—
বসা'য়ে প্রেমের মেলা   কর পুনঃ রসখেলা
যতনে রচনা করি নব কুঞ্জবন;
দেবতায় আমাদের নাহি প্রয়োজন!

শ্রীনীলরতন দাশ (বি-এ)।



কানকাটা নায়েব

(সেকালের পল্লী-কথা)

এক সময় সুবিস্তীর্ণ বাট্‌কেমারি কান্‌সার্ণের অধীন যে চৌদ্দ-পনেরটি নীল-কুঠী পনের-ষোল মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল, সেই সকল কুঠীর প্রত্যেকটিতেই এক-এক জন ইংরেজ ম্যানেজার থাকিত। সেই সকল ম্যানেজার সাধারণতঃ কান্‌সার্ণের মালিকগণেরই আত্মীয়-স্বজন। স্বদেশে ভদ্রভাবে অন্নসংস্থানের যোগ্যতার অভাবে তাহাদিগকে এ দেশে পাঠাইয়া ঐ সকল নীল-কুঠীর ম্যানেজারের পদে স্থাপন করা হইত। এই সকল হোঁৎকা ইংরেজ যুবক ঘোড়ায় চড়িয়া মাঠে মাঠে নীলের আবাদের তদারক করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে, আর নিরীহ প্রজাগুলিকে কুঠীতে ধরিয়া-আনিয়া অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া তাহাদের পিঠে শ্যামচাঁদ ঠুকিতে পারিলেই— কোম্পানীর পরিচালক-সমিতির মুরুব্বিরা ভাবিতেন— কুঠীর ম্যানেজারী করিবার যোগ্যতার আর উহাদের অভাব কোথায়? এই সকল যুবকের কেহ কেহ কুঠীর ম্যানেজার হইয়া চরিত্রও কলুষিত করিত; তাহারা পল্লীগ্রামের কোন কোন সহজলভ্যা বুনো বা বাগ্দী যুবতীকে কুঠীতে রাখিয়া ঘোড়া-কুকুরের মতই সাদরে প্রতিপালন করিত, এবং আত্মসম্মানবর্জ্জিত অশিক্ষিত নায়েব, গোমস্তা ও মুহুরীগুলাও তাহাদিগকে 'মেম সাহেব' বলিয়া সেলাম করিতে কুণ্ঠিত হইত না!

এই ষণ্ডামার্কাগুলাকে পরিচালিত করিবার জন্য বাট্‌কেমারির সদর কুঠীতে এক জন জেনারেল ম্যানেজার থাকিতেন। তাঁহাকে এই কান্‌সার্ণের সকল কুঠীর কার্য্যই যথানিয়মে পরিদর্শন করিতে হইত। কোম্পানীর প্রধান অংশীদারগণেরই কোন এক জন এই পদে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার পদের দায়িত্ব ও বেতন উভয়ই প্রচুর ছিল। ইংরেজ সিভিলিয়ানগণের অপেক্ষা [illegible] তাঁহাদের সম্মান-প্রতিপত্তি অধিক ছিল; এবং স্ব স্ব এলাকায় তাঁহাদের ক্ষমতারও তুলনা ছিল না।—সে ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় জন ষ্টুয়ার্ট ম্যাক্‌ফার্শন বাট্‌কেমারি কান্‌সার্ণের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। লোকটি প্রবীণ, বহুদর্শী। তিনি প্রতিমাসে একবার সকল কুঠীই পরিদর্শন করিতেন। বাঘাডোবার জঙ্গলে বন্যবরাহ শিকারের জন্য ভারত সরকারের বড় বড় ইংরেজ কর্ম্মচারীদের নিমন্ত্রণ করিয়া অতিথিসৎকার করিতেন। শীতকালে তাঁহার পাঁচ-সাতটা ওয়েলার ঘোড়া মহকুমার সদরে টহল দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। এই সময়ের কিছু দিন পূর্ব্বে নদীয়া ও যশোহরের নীল-বিদ্রোহের অবসান হইয়াছিল; এবং নীলকররা নীলের আবাদ প্রায় বন্ধ করিয়া জমিদার-মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন কোন কুঠীর এলাকায় তখনও নীলের আবাদ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই; আমডাঙ্গা কুঠী তাহাদের অন্যতম।

আমডাঙ্গা কুঠীর তিন মাইল দূরবর্ত্তী গোদাবকরী গ্রামের মাঠে কুড়ি বিঘার একদাগ জমিতে ঐ গ্রামের কয়েক জন মুসলমান প্রজা ভাগে আউস ধান বপন করিয়াছিল। আমডাঙ্গা কুঠীর নূতন ম্যানেজার ব্রাউন স্মিথকে কুঠীর বুড়া নায়েব এক দিন জানাইল,—ঐ জমিতে পূর্ব্বে ভাল নীল হইত; গোদাবকরীর প্রজারা উহা মাঠান বন্দোবস্ত করিয়া সেই ক্ষেতে ধান বুনিয়াছে; কিন্তু এখনও নীল বুনিবার সময় উত্তীর্ণ হয় নাই, হুজুরের হুকুম হইলে ঐ জমিতে লাঙ্গল দিয়া নীলের আবাদ করা যাইতে পারে। প্রজাদের এরূপ শক্তি নাই যে, তাহারা জমিদার-কোম্পানীর সহিত বিরোধ করিবে।

নায়েবের প্রস্তাব শুনিয়া ম্যানেজার স্মিথ বলিল, "প্রজালোকডিগকে সেরিষ্টা হোইটে ঐ উট্টম জমি

বণ্ডোবাষ্টো দেওয়া বোহুট্ বুল্ হইলো! নায়েব, টুমি শালা ঐ জমির বিল্‌কুল ডান বাঙ্গিয়া নাঙ্গল ডিয়া নীল বুনানী করাও। শালা প্রজালোক গোলমাল-বাডাইবার চেষ্টা কোরিলে সমুডায় শালা-লোককে মাইরা বাগাইয়া ডিটে হোইবো। আমীন শালা জনমেজয় ভট্‌চাযকে জল্‌দি এই বার লোইটে হুকুম ছারো। সে এক ডজন পাইক, টাকট্‌গির, আউর বরকণ্ডাজ লোইয়া হুকুম টামিল কোরিবো। কোটীর টিন নাঙ্গল ঐ কার্য্যে পাটাও—গাফিলী করো মট্।"

নায়েব নিধিরাম বিশ্বাস জানিত—গোদাবকরীর মুসলমান প্রজারা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত; তাহারা নায়েবকে কুঠীর এলাকাস্থিত অন্যান্য গ্রামের প্রজার মত খাতির সম্মান করিত না, এবং পূজার সময় এক পয়সাও নজরাণা, পার্ব্বণী না দিয়া তাহাকে হাঁকাইয়া দিত; এমন কি, নায়েবী চাল চালাইবার চেষ্টা করিলে কোৎকাইবার ভয় দেখায়! নায়েব ভাবিল—সে যে ফন্দী খাটাইয়াছে—এবার বেটারা জব্দ হইয়া যাইবে। আমীন জনমেজয় ভট্‌চাযের সঙ্গেও নায়েবের সদ্ভাব ছিল না; উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিয়া ম্যানেজারের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিত। আমীনের উপর প্রজার ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনিবার আদেশ হওয়ায় নায়েব খুসী হইয়া ভাবিল—"ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারুক্—দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে।"

কার্য্যতঃ তাহাই হইল। নায়েব আমীন জনমেজয় ভট্‌চাযকে ডাকিয়া বলিল, "গোদাবকরীর মাঠে নীলের যে জমিতে প্রজারা ধান বুনেছে, তুমি জন-বারো তাগাদ-গিরি (নীল-ক্ষেত্রের প্রহরী) আর পাইক, বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে ঐ জমির ধান ভেঙ্গে নীল বুনে এস। ধান ভেঙ্গে জমিতে চাষ দিতে কুঠীর তিনখানা লাঙ্গল নিয়ে যাও।"

আমীন এই আদেশ শুনিয়া দুই হাত কচ্‌লাইতে-কচ্‌লাইতে বলিল, "নায়েব মশায়, মুখ থাক্‌তে কেও নাকে ভাত খায় না তো; আপনি থাক্‌তে আমি যাব? আর গোদাবকরীর মোচলমান প্রজাগুলা কি রকম দুদ্ধারিষ, তা তো জানেন; তারা যদি দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায়, তা সামলাবে কে?"

নায়েব গম্ভীর হইয়া বলিল, "সে কৈফৎ আমি কি ক'রে দেবো? তবে এ তোমারই কাজ, সায়েব তোমার ওপরই এই ভার দিয়েছেন; আমাকে তো যেতে হুকুম করেননি। তোমার আপত্তি থাকে, সায়েবকে জানাও। আমি হুকুমের চাকর; তাঁর হুকুম তোমাকে জানিয়ে দিলাম।"

কিন্তু ম্যানেজার স্মিথ সাহেব কি চীজ—আমীন তাহা ভালই জানিত। সাহেবের বেত দুই-তিন বার তাহারও পিঠে পড়িয়াছিল; তাহার মধুর আস্বাদন সে ভুলিতে পারে নাই। কাজেই সাহেবকে এই আদেশের প্রতিবাদে কোন কথা বলিতে সে সাহস করিল না। সে কুঠীর দশ-বারো জন পাইক, তাগাদগিরি ও বরকন্দাজ সহ তিন-খানি লাঙ্গল লইয়া প্রজাদের ক্ষেতের ধান ভাঙ্গিয়া নীল-বপনের জন্য প্রস্তুত হইল। সে জানিত, গ্রামের কয়েক জন দুর্দ্দান্ত প্রজা ভাগাভাগি করিয়া সেই জমিতে ধান বুনিয়াছিল। এই সকল মুসলমান প্রজা হিন্দু প্রজাদের মত সহিষ্ণু ও নিরীহ নহে। কিন্তু সে জন্য দুশ্চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই; মনিব-সরকারের আদেশ পালন করিতেই হইবে। কিন্তু সে ইহাও জানিত, যদি কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার উন্নতিরও আশা আছে। নায়েব নিধিরাম বিশ্বাস বুড়া হইয়াছিল; সে বিদায় গ্রহণ করিলে কুঠীর গোমস্তা নকুড় তরফদারই নায়েবীর প্রধান দাবীদার বটে, কিন্তু ম্যানেজার সাহেব সদয় থাকিলে গোমস্তার ন্যায্য দাবী উল্লঙ্ঘন করিয়া নায়েবীতে কায়েমী ভাবে বাহাল হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। স্মিথ সাহেব মধ্যে মধ্যে তাহাকে বেত মারিত বটে, কিন্তু সেটা তাহার প্রতি অনুগ্রহের চিহ্ন! তাহার কার্য্যদক্ষতায় বিশ্বাস থাকাতেই সাহেব বুড়া নায়েবের পরিবর্ত্তে অনেক কঠিন কার্য্যের ভার তাহারই হস্তে অর্পণ করিত। বিশেষতঃ, নীলের আবাদ-সংক্রান্ত মাঠের কার্য্য আমীনেরই কর্ত্তব্যের অঙ্গ; সুতরাং জনমেজয় আমীন অতঃপর ইতস্ততঃ করা সঙ্গত মনে করিল না; এবং এই আদেশ পালনে দুই-এক দিন বিলম্ব করিতেও তাহার সাহস হইল না।

* * * * *

বর্ষার জলে নীল গাছের পাতা ও ডাঁটা পচিয়া যে সার হয়, তাহা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে; তাহার উপর

প্রজারা গোদাবক্রীর মাঠের পূর্ব্বোক্ত কুড়ি বিঘা জমিতে গোবরের সার দিয়া সেখানে আউস ধানের আবাদ করায়, এবং সময়ে কয়েক পশ্‌লা বৃষ্টি পাওয়ায় সেই ক্ষেতের ধানের চারাগুলি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই ধূসর জমি ঢাকিয়া-ফেলিয়া বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে হরিৎ শোভা বিকাশ করিতেছে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি পাওয়ায় ক্ষেতের উলু ও শ্যামা-ঘাসগুলি সতেজ হইয়া ধানের চারার ক্ষতি করিতেছে দেখিয়া ক্ষেত্রস্বামীরা দশ জন মেঠো-মজুরকে ক্ষেতে পাঠাইয়া তাহাদিগকে নিড়াইতে বসাইয়াছে। সেই সকল মজুর পাশাপাশি সারি দিয়া বসিয়া নিড়ানী চালাইয়া ক্ষেতের ঘাসগুলি নির্ম্মূল করিতেছে। মজুররা বাড়ী ফিরিবার সময় এই সকল ঘাস আটি-বাঁধিয়া লইয়া যায়, এবং গ্রামে যে সকল গৃহস্থের গরু আছে, তাহাদের নিকট প্রতিবোঝা আট-দশ পয়সা মূল্যে বিক্রয় করে; ইহা তাহাদের উপরি লাভ। মজুরদের প্রত্যেকের হাতে নিড়ানী, কাঁধে গামছা, মাথায় বাঁশের চটা দ্বারা নির্ম্মিত মাথাল। ছত্রাকার মাথালগুলি রজ্জুদ্বারা তাহাদের চিবুকের সহিত আবদ্ধ। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র, দশটা না বাজিতেই খোলা মাঠে রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত প্রখর হইয়াছে; এজন্য মজুরদের মাথায় মাথাল থাকিলেও তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মধারায় প্লাবিত কিন্তু এই সকল সরলপ্রকৃতি, অল্পে সন্তুষ্ট, অর্দ্ধাহারে অভ্যস্ত দিন-মজুরের মনে সন্তোষ ও শান্তির অভাব নাই; কোন উচ্চাভিলাষ তাহাদের মনে স্থান পায় না। তাহারা নিড়ানী চালাইতে চালাইতে গল্প করিতেছে—তাহাদের পারিবারিক জীবনের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের গল্প।

সঙ্গীদের গল্প উপেক্ষা করিয়া ঐ দলের অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ মজুর উজীর মাল্‌তে বিস্তীর্ণ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া গান ধরিল—

"যখোন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বস্যা ধান কাটি,
ও মোর মোনে জাগে তার নয়ান-দুটি।"

অল্প দিন পূর্ব্বে প্রতিবেশী নাজীর ঘরামীর মেয়ে ফাতিমার সঙ্গে উজীরের সাদি হইয়াছিল। উজীর প্রত্যূষে যখন ক্ষেতে কাজ করিতে আসে, সেই সময় তাহার বিবি কোমরে আঁচল জড়াইয়া নতমুখে উঠানে ঝড়া-ঝাঁটি দিতেছিল, আর তাহার মাথার সঙ্গে নাকের নোলকটি আন্দোলিত হইতেছিল। সেই দৃশ্য মনে পড়ায় উজীরের প্রাণে কবিত্বের তরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠিয়াছিল। তাহার উচ্চ মেঠো স্বর-লহরী কর্ম্মশ্রান্ত সহকর্ম্মীদের কানে যেন মধু বর্ষণ করিতেছিল। উজীর তাহাদের পাড়ার বেহুলার দলের প্রতিষ্ঠাপন্ন গায়ক। সুগায়ক বলিয়া চাষীর দলে তাহার খ্যাতি ছিল; এজন্য সঙ্গীত-চর্চ্চায় তাহার বিরাম ছিল না।

তাহার গান শুনিয়া তাহার সহকর্ম্মী দরবেশ সেখ হাসিয়া বলিল, "আরে ও মাল্‌তের পো! তামান মাঠ কেঁপিয়ে তো গান কত্তি নেগেচো। তা সেই নিড়েন ধ'রে-ইস্তোক একবারও তামুক খাওয়া হয়নি, সে দিকে খেয়াল আছে? এক সিলেম তামুক সাজ্‌লি হোতো না?"

"সে আর এ্যামোন শক্তো কাম কি?" বলিয়া উজীর গান বন্ধ করিয়া হাতের নিড়ানী ক্ষেতের ভিতর কাত করিয়া গুঁজিয়া-রাখিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং অদূরবর্ত্তী আইলের যে স্থানে উপস্থিত হইল—সেই স্থানে তাহার ডাবা হুকাটা গেঁটে কল্‌কে মাথায় লইয়া কাত হইয়া পড়িয়া ছিল। তদ্ভিন্ন, একটা ছোট চটের থলির ভিতর একদলা তামাক, ইস্পাতনির্ম্মিত একখান ঠুক্‌নী, চকমকি ঠুকিবার জন্য একখানা কালো পাথর, একখান সোলা, ও আউসের পোয়ালের একটা বঁদিও সঞ্চিত ছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি—সে সময় এ দেশে দিয়াশলাই প্রস্তুত হইত না; তখন গ্রামাঞ্চলে জাহাজ-মার্কা যে সকল 'সুইস্' দিয়াশলাই আমদানী হইত, তাহা এরূপ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য ছিল যে, গ্রামস্থ সম্পন্ন ভদ্রলোক ভিন্ন সাধারণ গৃহস্থরা তাহা কিনিতে পারিত না। সাধারণ গ্রামবাসীরা ধূমপানের জন্য চকমকি ও সোলার সাহায্য গ্রহণ করিত। রাখাল কৃষাণেরা মাঠে কাজ করিতে যাইবার সময় অগ্নি-উৎপাদনের ঐ সকল সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া যাইত; এবং গৃহে দীপ-জ্বালিবার জন্য গ্রামস্থ জনসাধারণ গন্ধক-সংযুক্ত পাকাটি ব্যবহার করিত। একালে আর ঐ সকল হাঙ্গামা নাই; এখন ঘরে ঘরে দিয়াশলাইএর বাক্স! সরকারের অসঙ্গত ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য চল্লিশ কাঠির দিয়াশলাইএর বাক্স পল্লীগ্রামে এখন একটি দুই পয়সায় কিনিতে হইলেও দরিদ্র গৃহস্থেরা তাহাই কিনিয়া অভাব দূর করিতেছে; তথাপি তাহারা চকমকি

ঠুকিবার কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে ; এজন্য সরকারের ধারণা, এ দেশের জনসাধারণ সভ্য হইয়াছে, এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল হইয়াছে!

'মালুতের পো' তাহার থলে হইতে ঠুকনী, পাথর ও সোলাখানা বাহির করিয়া, ঠুকনী দ্বারা সেই পাথরে ঠোকা দিয়া হস্তস্থিত সোলার মাথায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিল। সোলাখানার যে মাথায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইল, সেই অংশ পুড়াইয়া রাখা হইয়াছিল ; অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শমাত্রে তাহাতে আগুন ধরিয়া গেল। সাধারণ সোলার মাথায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িলে নিবিয়া যায়, আগুন ধরে না,—এই জন্যই সোলার মাথার দিকটা পুড়াইয়া রাখিবার নিয়ম ছিল।

সোলায় আগুন ধরিলে 'মালুতের পো' পোয়ালের বঁদি হইতে খানিক পোয়াল ছিঁড়িয়া দলা করিয়া পাকাইয়া লইল, এবং সোলার আগুনে তাহা ধরাইয়া-লইয়া, কল্কেটাতে দা-কাটা কড়া তামাক সাজিয়া, তাহার উপর সেই জলন্ত দলাটা স্থাপন করিল। তাহার পর জলহীন হুঁকাটার মাথায় কল্কে বসাইয়া সবেগে হুঁকা টানিতে লাগিল। দুই-তিন টানেই পোয়ালের দলাটা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, এবং তাহার নাক-মুখ দিয়া প্রচুর ধোঁয়া বাহির হইল। তখন উজীর হুঁকা লইয়া তাহার সহযোগিগণের নিকট আসিতে আসিতে গান ধরিল,—

"গেটে কল্কেয় তামাক-খরসান,
খেতে খেতে যেন যায় রে পরাণ!"

তাহার গান শুনিয়া মিঞাজান সেখ হাসিয়া বলিল, "সুমুন্দির সখের আর সমোর নেই, গান মুখে নেগেই আচে! আমরাও বিয়ে-সাদী ক'রেচি রে, আমাদের তো তোর মতোন ভাব নাগে না!—তা দে এখন হুঁকোটা দে,—এট্টা টান মারো লিই!"—সে উজীরের হাত হইতে হুঁকা টানিয়া লইয়া এমন এক দম কসিল যে, কল্কের আগুন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর তাহার সঙ্গীরা হাতের নিড়ানী মাটীতে ফেলিয়া-রাখিয়া একে একে ধূমপান করিতে লাগিল। সেই সময় ক্ষেতের অদূরবর্ত্তী পথের দিক হইতে "ঐ দিকে চল্, ঐ দিকে' শব্দ শুনিয়া মজুররা হুঁকা ফেলিয়া-রাখিয়া একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহারা শব্দ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইল,—জন দশ-বারো পাইক, তাগাদগিরি, তিন জন কৃষাণ ও তিনখান লাঙ্গল বলদ সহ কুঠীর আমীন জনমেজয় ভটচায্যি ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাদেরই ক্ষেতের দিকে আসিতেছে ; আর মাথায় লাল-পাকড়ী দুই জন বরকন্দাজ লম্বা লাঠী ঘাড়ে লইয়া তাহাদের আগে আগে চলিতেছে! —তাহাদিগকে ধানের ক্ষেতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মজুরের দল ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে পারিল না ; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে অধিক বিলম্বও হইল না। জনমেজয় আমীন তাহাদের সম্মুখে আসিয়া ঘোড়ার পিঠে বসিয়াই কর্কশ স্বরে বলিল, "এ ধানের ক্ষেতে আর তোদের নিড়েন দিতে হবে না। আমাদের সায়েব হুকুম দিয়েছেন—এ জমিতে চাষ দিয়ে নীলের বীজ ছড়াতে হবে। এখনই আমরা লাঙ্গল জুড়বো। তোরা-সব ক্ষেত থেকে স'রে পড়। বেশী গোলমাল করিস্ তো তাগাদগিরি, বরকন্দাজদের হাতে দেখ্‌ছিস্ তো কোঁৎকা? ঠেঙ্গিয়ে ভূত-ছাড়িয়ে দেবে।"

আমীনের কথা শুনিয়া মজুরের দল পরস্পর মুখ-চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল। উহাদের দলে উজীর মালুতেই অধিক সাহসী ও বলবান্ ছিল। সঙ্গীদের নীরব দেখিয়া সে প্রতিবাদের স্বরে আমীনকে বলিল, "আপুনি বুলুচো কি গো আমীন বাবু? এ রহিমতুল্লা মিঞা আর পাঁচ মিঞার ভাগের জমি। এ ক্ষ্যাতে তিনারা ধান বুনেচে। ধানের চারাগুলা ডব্‌কা হ'য়ে ঝোঁপিয়ে উটেচে। এই ধান ভেঙ্গে ক্ষ্যাতে চাষ দিয়ে আপনারা নীল বুন্‌বা? তিনারা শুন্যা বুল্‌বে কি কও তো! এ্যাক-জ্যাগোর ট্যাকা খরচ ক'রা তিনারা ক্ষ্যাতে ধান বুনেচে, আমাদের নিড়েনে বসিয়েচে ; তিনাদের এই-রকোম নোকসানড়া কোরবা না কি আপনারা? এ যে বড্ডাই আন্‌কা তরো কতা!"

আমীন ঘোড়ার পিঠে বসিয়া বেত্র আস্ফালন করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোদের কাছে আমরা সে কৈফৎ দিতে আসিনি। কোঁৎকা খাবার সাধ না থাকে তো মুখ বুজে সোজা গাঁ-পানে স'রে পড়। মুজুর-পাট তোরা—তোদের সঙ্গে তক্‌রার কর্ত্তে চাইনে। উঠে শীগ্‌গির পালা সব ভেড়ো!"

তাহার পর তাগাদগিরিদের ডাকিয়া আমীন আদেশ

করিস্, "লাঙ্গল জুড়ে তাড়াতাড়ি ক্ষেতে চাষ লাগিয়ে দে। সাঁজের ঘুলি না হোতেই কাজ হাসিল ক'রে কুঠীতে ফিরতে হবে—তা যেন মনে থাকে। বেশী দেরী হ'লে কাজে বাগড়া প'ড়তে পারে।"

তাগাদগিরিদের আদেশে তিনখান লাঙ্গল একসঙ্গে জুতিয়া দেওয়া হইল। ধানের চারাগুলি উপ্‌ড়াইয়া, ঢেলা মাটী উল্‌টাইয়া তিনখান লাঙ্গলই পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কৃষাণদের মাথায় মাথাল, হাতে লাঙ্গলের মুঠা; ঝুরো মাটীর ভিতর তাহাদের পায়ের 'বাদা' বসিয়া যাইতে লাগিল; তাহারা সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বলদের ল্যাজ ডলিয়া তাহাদিগকে জোরে তাড়াইতে লাগিল। মজুরের দল মাথাল ও নিড়ানী হাতে লইয়া আইলের ধারে সরিয়া-দাঁড়াইয়া এই অরাজক কাণ্ড দেখিতে লাগিল। তাহারা ঠিকে-মজুর মাত্র, এই ব্যাপারে তাহাদের কোন স্বার্থ না থাকিলেও সেই সকল লাঙ্গলের ফাল যেন তাহাদের বুকের ভিতর বিঁধিতে লাগিল! এই অত্যাচারে তাহারা স্তম্ভিত হইল।

কিছুকাল সেই স্থানে দাঁড়াইয়া এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিবার পর উজীর মালুতেই আমীনের সম্মুখে গিয়া তাহাকে বলিল, "আপুনি তো গাঁয়ের গেরোস্তোদের গলায় ছুরী দিতি নাগ্‌লে: তা যাই, তিনাদের খবোর দিইগে। তিনারা-সব ক্ষ্যাতে আস্তে ঠ্যাকাতি পারে, ঠ্যাকাবে; কিন্তুক ভাল কাম কল্লে না আপনারা।—চলো ভাই-সব, আজ আর প্যাটের ভাত জুটবি না: খোদা নসিবে মাপালে তো জুটবি।—তবে স্থালাম, আমীন বাবু!"

মজুরের কথা শুনিয়া আমীন উগ্রস্বরে বলিল, "গাঁয়ের চাষাদের তোরা খবর দিবি? তা দিস্ খবর। তারা যেন পিঠে ছালা-বেঁধে ক্ষেতে আসে। ইস্মিথ সায়েবের শামচাঁদের গুঁতোর চোটে সব মিঞাই আক্কেল পেয়ে যাবে। বেটাদের যত-বড়ো মুখ নয় তত-বড়ো কথা! যা, সরে পড় এখুনি। দেখেছিস্ তো কোৎকা!"

"কোৎকা তিনাদের ঘরেও আছে—আপনারাই পিঠে ছালা বাঁধো।" বলিয়া মজুরের দল কাঁধের গামছা কোমরে জড়াইল, এবং নিড়ানীগুলি হাতে লইয়া, মাথাল মাথায় দিয়া, তামাকের সরঞ্জাম আইল হইতে তুলিয়া লইয়া আমীন ও তাহার অনুচরদের গালি দিতে দিতে গ্রামে ফিরিয়া চলিল।

এবার আমীন তাগাদগিরিদের ডাকিয়া বলিল, "মজুরগুলা এখনই গাঁয়ে গিয়ে ক্ষেতের মালিক-শালাদের খবর দেবে। তারা দল-বেঁধে ক্ষেতে এসে হল্লা জুড়ে দিলে ভারী মুস্কিলে প'ড়তে হবে। হয় তো গাঁয়ের অনেক প্রজাই এসে জুটবে। আমরা তো আছি এখানে মোটে পোনেরো-ষোল জন; কৃষাণ তিন-বেটা গোলমাল দেখ্‌লে লাঙ্গল-গরু নিয়ে আগেই সট্‌কান দেবে। তোমরা ক' জনে কি অতো লোকের মহড়া নিতে পারবে? এতখানি জমিতে লাঙ্গল দিয়ে বীজ ছড়াতে সময় তো কম লাগবে না! গোলমাল দেখ্‌লে তোমাদের কেউ-কেউ কুঠীতে গিয়ে সায়েবকে আগেই খবর দিও; তিনি সব কথা শুনে বন্দুক নিয়ে এলে আর কোন ভাবনা থাক্‌বে না। বন্দুক দেখলে সব্ বেটাই স'রে প'ড়বে। তেমন-বেশী গোলমাল দেখি তো আমিই না-হয় আগে কুঠীতে ফিরে যাব।—কি বলো?"

পাইক তাগাদগিরিদলের সর্দ্দার ইয়াসিন হালসানা মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা কি হয়? আপুনি আমাদের কাছে না থাক্‌লি রায়েৎগুনোর সঙ্গে বুজাপড়া করবি কোন্ সুমুন্দি? এই ক্ষ্যাতে আপনাকে শেষ-নাগাদ হাজির থাক্‌তিই হবে। নৈলে, আপুনি পেলিয়েছ শুন্‌লি সায়েব ক্ষাপ্পা হ'য়ে চাবুক নিয়ে আপনাকে তাড়া কোরবি না?"

আমীন চিন্তিত ভাবে বলিল, "তা বটে, তোমার কথা বড় মিথ্যে নয় ইয়াসিন! আচ্ছা দেখি, ছরাদ কদ্দ'র গড়ায়।"

আমীন ঘোড়ায় চড়িয়া ক্ষেতের চারিধার ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। তিনখানি লাঙ্গল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধানের ক্ষেত চষিতে লাগিল। তাগাদগিরিরা বরকন্দাজ দু'জনকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেতের অদূরবর্ত্তী প্রকাণ্ড বটগাছটার ছায়ায় দাঁড়াইয়া ক্ষেত পাহারা দিতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি পথের দিকে।

কিছু দূরে জিলা-বোর্ডের প্রশস্ত পথ—হিঙ্গুলীর থানার পাশ দিয়া হাজিপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত। মাঠের ভিতর হইতে সেই পথ দেখা যাইতেছে। গোদাবকরী গ্রামে

যাইতে হইলে ঐ পথ ধরিয়া আধ ক্রোশ যাইবার পর গ্রামে প্রবেশের সুঁড়ি পথ পাওয়া যায়।

মজুরের দল ক্ষেত হইতে প্রস্থান করিবার পর ঘণ্টা-দেড়েক অতীত হইয়াছে। সেই সময় [illegible] দেখিতে পাইল, শতাধিক লোক জিলা-বোর্ডের পথ দিয়া দল-বাঁধিয়া মাঠের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে! তাহাদের অধিকাংশেরই হাতে মোটা-মোটা লম্বা বাঁশের লাঠী; কাহারও হাতে শড়কি, কাস্তে বা হেঁসো। কাহারও হাতে বড় বড় দা—এমন ধারাল যে, দুই-তিন কোপেই এক একখানা মোটা বাঁশ দ্বিখণ্ডিত হইতে পারে;—মানুষের মাথা একটি কোপেই 'ধড়' হইতে বিচ্ছিন্ন করা সহজ!

তাহাদিগকে দ্রুতবেগে ক্ষেতের দিকেই আসিতে দেখিয়া এক জন বরকন্দাজ ধান্য-ক্ষেত্রের অন্য ধারে আমীনকে সংবাদ দিতে ছুটিল। আমীন সেই দিকের ক্ষেত চসাইতেছিল, এবং এক জন পাইক একটা বেতের কাঠায় নীলের বীজ লইয়া তাহার অদূরে বসিয়া ছিল।

প্রজাদের দলবদ্ধ ভাবে আগমনের সংবাদ শুনিয়া আমীন জনমেজয় ঘোড়া ছুটাইয়া সেই বট গাছের দিকে অগ্রসর হইল। সে দেখিল, শতাধিক লোক মালকোঁচা আঁটিয়া, লম্বা লম্বা তৈলপক্ক বাঁশের লাঠী, শড়কি, দা ও কাস্তে প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সেই ক্ষেতের দিকেই দৌড়াইয়া আসিতেছে! কাহারও কাহারও হাতে কাঁদাল ও পাঁচমুখো তীক্ষাগ্র টাঁ্যাটা;—যেন তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিতেছে!

তাহারা 'মার মার' শব্দে ক্ষেতের নিকট আসিয়া পড়িলে তাগাদ্‌গিরি ও বরকন্দাজরা হাতের লাঠীগুলি বাগাইয়া-ধরিয়া আমীনকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদিগকে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত দেখিয়া প্রজাদের দলপতি গ্রামের প্রধান চাষী-প্রজা রহিমতুল্লা মৃধা তাহার সঙ্গিগণকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং আমীনের ঘোড়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং উগ্রস্বরে তাহাকে বলিল, "শালা, তুমি আমাদের ক্ষেতের ধান ভেঙ্গে নীল বুনতে এসেছ? আজ আর তোমাকে শালু, জান্ নিয়ে কুঠীতে ফিরে যেতে হবে না; তোমার কোন্ বাবা তোমার মাথা বাঁচায়—তা দেখা যাবে। তুমি আমাদের এ-রকম লোকসান কেন ক'রলে—তারই আগে জবাব দাও শালা!"

আমীন ঘোড়ার পিঠে বসিয়া-থাকিয়াই বলিল, "আমি কুঠীর ম্যানেজার-সায়েবের হুকুমের চাকর। সায়েব আমাকে যে হুকুম দিয়েচে—তাই আমি তামিল ক'রতে এসেচি। বোঝা-পড়া করতে হয়, কুঠীতে সায়েবের কাছে যাও; না যাও, থানা, কাছারী আছে—সেখানে গিয়ে এক নম্বর নালিশ রুজু ক'রতে পারো। আমার কাছে এসে তম্বি-গম্বি করলে কি হবে? ক্ষ্যামতা থাকে কুঠীতে গিয়ে চোখ রাঙ্গিও।"

রহিমতুল্লা তাহার হাতের সুদীর্ঘ লাঠীতে ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "শালা, তুমি তোমার বোনাই ম্যানেজার-শালার হুকুমের চাকর? সে-শালা তোমাকে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিবার হুকুম দিলে তুমি ঘরে আগুন দিবা?—ভাই সকল, এই আমীন-শালাই যত নষ্টের গোড়া; ও শালা ঘুঘু দেখেছে—ফাঁদ ত্যাখেনি! দাও শালুর পিঠে দু'ঘা নাদনা বসিয়ে। আর যে শাস্তি দিতে হয়, তা পরে দেওয়া যাবে।"

দলপতির এই আদেশ শ্রবণ মাত্র তাহার কুড়ি-পঁচিশ জন সঙ্গী আমীনের অঙ্গসেবার জন্য লাঠী লইয়া তাহার ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হইল। তাহা দেখিয়া তাগাদ্‌গিরির দলপতি ইয়াসিন হালসানা গর্জ্জন করিয়া বলিল, "খবরদার! যে শালা আগে লাঠী তুলবে, লাঠী মেরে তারই মাথা দু'-ফাঁক ক'রে দেব।"

তাহার এই কথার পর উভয় পক্ষে ভীষণবেগে লাঠা-লাঠী আরম্ভ হইল; কিন্তু মুষ্টিমেয় তাগাদ্‌গিরি ও পাইক বরকন্দাজ উদ্বেলিত নদীর প্রখর জলস্রোতের ন্যায় দুর্বার সেই শতাধিক আততায়ীর বিরুদ্ধে লাঠী চালাইয়া কি করিতে পারে? তাহারা কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরাভূত হইল। কাহারও মাথা ফাটিল, কাহারও পিঠ ফাটিয়া রক্তের স্রোত বহিল, কাহারও হাত-পা ভাঙ্গিল। তাহারা আর আক্রমণের চেষ্টা না করিয়া আহত পাইক, তাগাদ্‌গিরিদের ধরিয়া-লইয়া প্রজাদের গালি দিতে-দিতে সরিয়া পড়িল। কেহ কেহ ম্যানেজারকে সংবাদ দিতে কুঠীর দিকে ছুটিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই মাঠ হইতে আমডাঙ্গা কুঠীর দূরত্ব তিন মাইল। ম্যানেজার প্রজাদের

সদলে ক্ষেতে দাঙ্গা করিতে আসিবার সংবাদ পাইবামাত্র কুঠীর লাঠীয়ালগুলাকে জুটাইয়া-লইয়া তাড়াতাড়ি সেই ক্ষেতে উপস্থিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

অবস্থা বিলক্ষণ সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমীন ক্রুদ্ধ জনতা ভেদ করিয়া ঘোড়া লইয়া পলায়নের চেষ্টা করিল; কিন্তু ঘোড়ার মুখে সজোরে এক ঘা লাঠী পড়িতেই ঘোড়াটা 'চিঁহি' শব্দে পশ্চাতে হটিয়া-গিয়া সম্মুখের দুই পা ঊর্দ্ধে তুলিল। সে পশ্চাতে হটিতেই তাহার উল্টা পদাঘাতে দুই-তিন জন প্রজা মাটীতে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তাহাদের সঙ্গীরা সক্রোধে আমীনকে আক্রমণ করিয়া তাহার হাতের বেত কাড়িয়া লইল, এবং তাহাকে ঘোড়া হইতে টানিয়া মাটীতে ফেলিল; তাহার পর তাহারা ঘোড়াটাকে লাঠীপেটা করিয়া দূরে তাড়াইয়া দিলে সোয়ারহীন ঘোড়া লাগাম মুখে লইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

ধরাশায়ী আমীনকে ধনঞ্জয়দানের জন্য চারি-পাঁচ-খানি সুদীর্ঘ স্থূল লাঠীর সঘন আস্ফালন চলিল! অসহায় নিরস্ত্র আমীন আততায়িগণের কবল হইতে মুক্তিলাভের কোন উপায় না দেখিয়া মাটীতে পড়িয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তোরা আমাকে খুন করবি? বেশ, খুনই কর; কিন্তু শালারা জেনে রাখ—তোদের সকলকেই এর ফল-ভোগ করতে হবে। ঠিক তোদের ফাঁসি হবে। আর আমার সায়েব তোদের আণ্ডা-বাচ্চা সক্কলকে জেলে পুরবে।"

নবীজান হালসানা পূর্ব্বে আমডাঙ্গা কুঠীতেই হাল্‌সানা-গিরি চাকরী করিত; কিন্তু আমীনের সঙ্গে ঘুষের বখরা লইয়া তাহার বিরোধ থাকায়, কিছু দিন পূর্ব্বে সে কুঠীর ক্ষতিকর একটা অন্যায় কাজ করিয়া ধরা পড়িলে, জনমেজয় আমীন তাহার বিরুদ্ধে ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট করে; এজন্য তাহাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সেই সময় হইতে সে আমীনকে মহাশত্রু মনে করিত। সে প্রজার দলে যোগ দিয়া দাঙ্গা করিতে আসিয়াছিল। তাহার হাতে একখান সুশাণিত কাস্তে ছিল—অতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র!

নবীজান হালসানা হাতের কাস্তেখানা বাগাইয়া-ধরিয়া বলিল, "আমার এই হেতের দেখচো তো? লাঠী তোমরা সক্কাই সরিয়ে-রেখে আমার পাশে দেঁড়িয়ে থ্যাখো—আমি আমীন-শালার কি খোয়ার করি। ও-শালা আমার চাকরীর মাথা খেয়েচে; আজ তার শোধ লেবো। তোমরা ক'জন শালুকে মাটীতে খুঁস্যা ধরো—যেন মাথা তুল্‌তি না পারে।"

তাহার কথা শুনিয়া চার-পাঁচ জন প্রজা আমীনকে মাটীতে চাপিয়া ধরিয়া রহিল। নবীজান তাহার তীক্ষ্ণধার কাস্তের এক পোঁচেই আমীনের বাঁ-কানটি সমূলে কাটিয়া ফেলিল। রক্তস্রোতে জনমেজয়ের চোখ ও নাকমুখ প্লাবিত হইতে লাগিল। যন্ত্রণায় সে মাটীতে পড়িয়া ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া কেহই সহানুভূতি প্রকাশ করিল না; সকলেই দূরে সরিয়া-গিয়া ক্ষেতের দুরবস্থা দেখিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল।

সেই সময় দূরে বন্দুকের শব্দ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া প্রজাদের দলপতি বলিল, "কুঠীর ম্যানেজার-শালা বন্দুক নিয়ে আমাদের গুলী করতে আস্‌চে। চল, আমরা চম্পট দিই। নীল-বোনার বোধ করি এইখানেই খতম্! ফসলগুলো সব পৈলট্‌ ক'রে দিলে, এ কি সামান্যি আপ্‌শোষের কথা!"

ছিন্নকর্ণ আমীনকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ক্ষেতের ভিতর ফেলিয়া-রাখিয়াই আততায়ী প্রজার দল দ্রুতবেগে গ্রামের দিকে পলায়ন করিল। জমিদার-কোম্পানীর সহিত বিরোধ! সঙ্কটের গুরুত্ব বুঝিয়া তাহাদের দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। নবীজানকে কেহ কেহ বলিল,—"তোমাকে দায়রা-সোপরদ্দ হ'তে হবে,—ক'বছর ঠেল্‌বে কে জানে?"

নবীজান বলিল, "তা হোক, হাতের সুখ ক'র‍্যা লিয়েচি; যাঁহা পঞ্চান্ন তাঁহা ছাপ্পান্ন, দুটো কান সাবাড় কল্লেই ভাল হোত। এখন বড্ডা পস্তানী হ'চ্ছে!"

কুঠীর ম্যানেজার ব্রাউন স্মিথ অশ্বারোহণে সদলে ধানের ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া কোন দিকেই কুঠীর কোন লোককে দেখিতে পাইল না। তাহার আদেশ অসম্পন্ন রহিয়াছে দেখিয়া তাহার সাদা মুখ লাল হইয়া উঠিল। আমীন কৃষাণ তিন জনকে লাঙ্গল-গরু লইয়া পলায়ন করিতে দিয়াছে দেখিয়া আমীনকে চাব্‌কাইয়া শায়েস্তা

করিবার জন্য সে প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিল; কিন্তু বিদ্রোহী প্রজাদের বিশ্বাস নাই ভাবিয়া সে তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইবার জন্য হাণ্টারের পরিবর্ত্তে বন্দুক লইয়া আসিলেও মাঠের কোন দিকে একটিও প্রজাকে দেখিতে পাইল না।

আমীন ক্ষেতের যেখানে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল —স্মিথ অবশেষে সেই স্থানে আসিয়া ঘোড়া থামাইল। বহু দিন সে প্রজাদের কুঠীতে ধরিয়া-আনিয়া তাহাদের পিঠে শ্যামচাঁদ ঠুকিলেও কোন দিন তাহারা তাহার বিরুদ্ধে হাত তুলিতে সাহস না করায়, সে তাহাদিগকে নিতান্ত অপদার্থ ও কাপুরুষ বলিয়াই মনে করিত; কিন্তু আমীনের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহার সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সে স্তম্ভিত হইল। এরূপ ঘটিতে পারে, ইহা সে আশঙ্কা করে নাই।

আমীন ম্যানেজারকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, এবং কাটা কান দেখাইয়া তাহার দুরবস্থার জন্য অভিযোগ করিল। ম্যানেজার ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার কানের ক্ষত পরীক্ষা করিল। তাহার পর গ্রাম হইতে গরুর গাড়ী আনাইয়া আমীনকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া কুঠীতে লইয়া যাওয়া হইল। কুঠীর ডাক্তার তাহার কর্ণমূলে মলম দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। নায়েব নিধিরাম বিশ্বাস আমীনের অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতিভরে মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "ভাগ্যে একটা কানের ওপর দিয়েই গ্যালো! নাকের ওপর নজর আয়নি দেখ্‌চি; নাকটাও বজায় রেখেচে! প্রজা বেটাদের কিঞ্চিৎ আক্কেল আছে বল্‌তে হবে।"—আমীন কোন কথা না বলিয়া প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে শয্যায় মুখ-গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। গ্রামে গিয়া মুখ দেখাইতে তাহার লজ্জা হইল। প্রজারা তাহার দুই কানই কাটিয়া লইলে বোধ হয় গ্রামের ভিতর যাইতে তাহার লজ্জা হইত না।

ইহার পর দাঙ্গাকারী প্রজাদের বিরুদ্ধে মহা-আড়ম্বরে মহকুমার আদালতে ফৌজদারী মামলা চলিতে লাগিল। অসহায় প্রজাদের প্রসঙ্গে মহকুমার শিক্ষিত লোকরা বিজ্ঞের মত বলিলেন,—

"অসময়ে হরিণ মোলো, লংএর হোলো কারাগার,
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার!"

সকল সংবাদ পাইয়া কানসার্ণের জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার ম্যাক্‌ফার্শন বাটকেমারি কুঠী হইতে এই ব্যাপারের তদন্তের জন্য আমডাঙ্গার কুঠীতে আসিলেন। তিনি কুঠীর সকল কর্ম্মচারীকেই চিনিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া জনমেজয়ের কাটা কানের শোক প্রবল হইল। সে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে তাহার কাটা কানের দিকে মিঃ ম্যাক্‌ফার্শনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিল—কুঠীর ম্যানেজার-সাহেবের আদেশ পালন করিতে গিয়াই তাহার এই দুর্গতি! কাটা কান লইয়া সে গ্রামের দশ জনকে কিরূপে মুখ দেখাইবে? ভদ্রসমাজে যাইতে তাহার বড়ই লজ্জা করে! তাহার কাটা কান দেখিয়া সকলেই মুখ টিপিয়া হাসে; ছেলেরা হাত-তালি দিয়া বলে, "ঐ কানকাটা আমীন!"—এ অপমান অসহ্য! এ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হওয়াই ভাল।—এই সকল কথা বলিতে বলিতে সে মিঃ ম্যাক্‌ফার্শনের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। সে বুঝিয়াছিল—কাজ গুছাইয়া লইবার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুযোগ!

মিঃ ম্যাক্‌ফার্শন তাহার অবস্থা দেখিয়া ও আক্ষেপ শুনিয়া তাহাকে উঠিয়া-দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন, এবং সহানুভূতিভরে বলিলেন, "টুমি ডুস্‌খ না কোরিবো জন্‌-জয়! হামি টোমার সোনার কান প্রস্‌টুট্‌ কোরিয়া ডিবে। টুমি কোটীর বহুট সাচ্চা নওকর আছে। হামি টোমার অবস্থা বিবেচোনা কোরিবে। টোমার জলডি উন্নটি হোবে। টুমি রোডন বান্‌ডো করো জন্‌জয়!"

ম্যাক্‌ফার্শন তাহাকে 'জন্‌জয়' বলিয়া ডাকিতেন।

তিনি 'জন্‌জয়' আমীনের জন্য সোনার কান 'প্রস্‌টুট্‌' করাইলেন না বটে, কিন্তু যাহা করিলেন, সোনার কান তাহার তুলনায় তুচ্ছ! বৃদ্ধ নায়েব নিধিরাম বিশ্বাস অকর্ম্মণ্য বলিয়া তাহাকে 'বরতরফ' করিয়া জনমেজয়কে আমডাঙ্গা কুঠীর নায়েব নিযুক্ত করিলেন। কুঠীর গোমস্তা নকুড় তরফদার মেঠো আমীন অপেক্ষা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী; তাহার ন্যায্য দাবী উপেক্ষিত হওয়ায় সে ক্ষুণ্ণমনে মিঃ ম্যাক্‌ফার্শনের নিকট অনুযোগ করিলে, তিনি হাসিয়া

বলিয়াছিলেন, "ওয়েল নকুর, টোমার নাক অটবা কান কাইটা আনিটে হোইবো; পশ্চাট্ হামি টোমার ডাবী বিবেচোনা কোরিটে প্রস্টুট্ আছে।"—অগত্যা গোমস্তাকে অধোমুখে সরিয়া পড়িতে হইল।

আমীন জনমেজয় ভট্টচায কুঠীর নায়েব হইয়া প্রজা-পীড়ন করিয়া এরূপ দক্ষতার সহিত কাজ চালাইতে লাগিল যে, দুই বৎসর পরে বাটকেমারি কান্সার্ণের সদর নায়েব হলধর সরকারের মৃত্যু হইলে মিঃ ম্যাক্ফার্শন কান্সার্ণের চোদ্দটা কুঠীর নায়েবের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া জনমেজয়কেই সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। এই পদের মাসিক বেতন এক শত টাকা হইলেও তাহার গ্রামের জনসাধারণ বলিত—জনমেজয় নায়েব মাসে দেড়টা সদরালার 'ব্যাতোনের' টাকা উপার্জ্জন করে! সে যখন ডান কানে পৈতা গুঁজিয়া জলের ঘটি লইয়া পথের ধারে শৌচে বসিত, তখনও তাহার সেই ঘটিতে পর্য্যন্ত 'পান খাবার' টাকা আসিয়া পড়িত! সুতরাং তাহার কাটা কানের আক্ষেপ দূর হইল; কিন্তু গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা ছড়া বাঁধিয়া তাহাকে শুনাইত,—

"কান দিয়ে নায়েবী পেলাম—টুম্-টুমাটুম্ টুম্!"

—ইত্যাদি।

কানসার্ণের সদর নায়েব হইয়া জনমেজয় ভট্টচায তাহার বাড়ীর পৈতৃক খড়ের ঘর ভাঙ্গিয়া সেখানে প্রকাণ্ড দোতলা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইল। কয়েকখানি মহাল ক্রয় করিয়া জমিদার হইয়া বসিল। সে প্রতিবৎসর মহা সমারোহে দুর্গোৎসব করিতে লাগিল; কিন্তু সে এই উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত বিভিন্ন কুঠীর কর্ম্মচারী এবং কান্সার্ণের মাতব্বর প্রজাগণের নিকট হইতে যে প্রণামী ও ভেট পাইত, তাহাতে ঐরূপ তিনটি দুর্গোৎসব সুসম্পন্ন হইতে পারিত! সে গ্রামে দুই-তিনটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইল, এবং পুষ্করিণীর চারি ধারে বড় বড় আম-কাঁটালের বাগানও করিল। গ্রামের লোকরা বলিতে লাগিল—জনমেজয় ভট্টচাযের একটা কান কাটাতেই তার এত দূর প্রাদুর্ভাব, প্রজারা তার দুই কানই সাবাড় ক'রলে না-জানি আরও কি হোত! কাটা কানই ওর লক্ষ্মী। অত বড় তুদ্ধারিষ বড়-ম্যানেজার সায়েব ওর মুঠোর মধ্যে! একেই বলে কপাল! কি শুভক্ষণেই প্রজারা ওর কান কাট্‌লো!—ইত্যাদি।

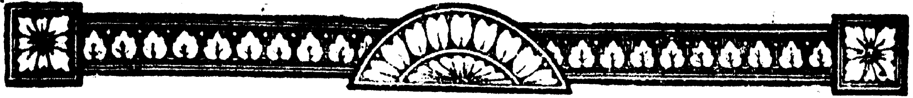
জনমেজয় বহু দিন পূর্ব্বে লোকান্তরিত হইয়াছে; কিন্তু গ্রামের লোক এখনও তাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলে—"কানকাটা নায়েবের বাড়ী।" জেলেরা তাহার পুষ্করিণীর মাছ বিক্রয় করিতে আনিয়া বলে,—"এ রকম মিষ্টি মাছ এ তল্লাটের আর কোনও পুকুরে নেই,—এ কানকাটা নায়েবের পুকুরের মাছ।" নিকিরীরা তাহার বাগানের আমের প্রশংসা করিয়া বলে, "এ কানকাটা নায়েবের বাগানের আম,—এত ভাল আম এ অঞ্চলের আর কোন বাগানে পাবার যো কি?"—গ্রামের লোক এখনও কানকাটা নায়েবের কীর্ত্তি-কাহিনী ভুলিতে পারে নাই। গোদাবকরীর যে মাঠে জনমেজয় আমীনের কীর্ত্তির নিদর্শন—এই ধানের ক্ষেত অবস্থিত, সেই মাঠ এখন 'কানকাটা মাঠ' নামে পরিচিত; এবং সরকারের সেট্‌লমেণ্ট-জরিপের পরচায় তাহা এই নামেই অভিহিত হওয়ায় সরকারী দপ্তরেও কানকাটা নায়েবের কীর্ত্তি স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

তপস্যা

ধরণীর তলে তপ করে বীজ পল্লবে ফলে-ফুলে,
সিদ্ধি লভে সে তাই।
মানুষেরই হোক বিধাতারই হোক সকল সৃষ্টি-মূলে
গূঢ় তপস্যা চাই।

শ্রীকালিদাস রায়।



পরব্রহ্মমহিষী শ্রীশ্রীচণ্ডিকা

সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পরমাচার্য্য শ্রীভাস্কর রায় ৺শ্রীশ্রীসপ্তশতী চণ্ডী গ্রন্থের বিশ্রুতকীর্ত্তি টীকাকার। তাঁহার এই অপূর্ব্ব টীকার নাম 'গুপ্তবতী'। গুপ্তবতীর উপোদ্‌ঘাতে 'চণ্ডী' শব্দটির বিবরণ করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন—'চণ্ডী দেবী পরব্রহ্মের পট্টমহিষী'। 'চণ্ড'-শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্-প্রত্যয় করিলে 'চণ্ডী'-শব্দটি সাধিত হয়। যিনি নির্গুণস্বরূপে 'দেশ-কাল-বস্তু—এই ত্রিবিধ ইয়ত্তা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন ও কল্পিত সগুণরূপে অসাধারণ গুণশালী—সেই পরমেশ্বরই 'চণ্ড' শব্দের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত—ইহাই ভাস্কর রায়ের অভিপ্রায়; কারণ, ইয়ত্তাপরিচ্ছেদের অভাব একমাত্র পরব্রহ্মেরই বিশিষ্ট লিঙ্গ। আবার কেহ 'চড়ি কোপে'—এই 'চড়ি' ধাতু হইতে 'চণ্ড'-পদের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে—যাঁহার প্রসাদ ও কোপ উভয়ই নিষ্ফল—তাঁহাকে কেহ প্রভু বলিয়াই মানিতে চাহে না ১। অতএব, যিনি সর্ব্বেশ্বর, তাঁহার কোপও অতি প্রচণ্ড বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই কারণে 'শতরুদ্রীয়ে'র প্রারম্ভেই রুদ্ররূপী পরমেশ্বরকে 'নমস্তে রুদ্রমন্যবে' বলিয়া নতি-জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এ প্রকরণে 'মন্যু'-শব্দের অর্থ 'ক্রোধ'—গুপ্তবতীতে ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে ২। উপনিষদেও নানা স্থানে পরমেশ্বর যে মহাভয়জনক—তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপে কঠ ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে—'তাঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হন, সূর্য্য উদিত হইয়া তাপ প্রদান করেন, বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীবের জীবন রক্ষা করেন, ইন্দ্র বর্ষণের দ্বারা জীবলোক পালন করিয়া থাকেন; এমন কি, মৃত্যুও তাঁহারই ভয়ে সংহারকৃত্য সম্পাদন করেন' ৩। অতএব, পরমেশ্বর সকলের ভয়হেতু—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে ৪। এবংবিধ ভয়জনক 'চণ্ড'-শব্দবাচ্য পরব্রহ্মের যিনি পট্টমহিষী-স্থানীয়া, তিনিই শ্রীশ্রীচণ্ডী।

'রত্নত্রয়পরীক্ষা' নামক গ্রন্থে ৫ উল্লিখিত হইয়াছে—'ব্রহ্মচৈতন্য দোষগন্ধবিহীন নিত্য নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ, 'একমেবাদ্বিতীয়'। কিন্তু মায়াবশে এই অখণ্ড চৈতন্যও ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী—এই দ্বিবিধ ভেদবিশিষ্টরূপে প্রতিভাসিত হইয়া থাকেন। এই 'ধর্ম্ম' কি? সকল বিষয়ের অনুভূতি, সর্ব্ব কার্য্যের অনুকূল জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়ারূপা শক্তি ও

---

১ "প্রসাদো নিষ্ফলো যস্য কোপোঽপি চ নিরর্থকঃ। ন তং ভর্ত্তারমিচ্ছন্তি ষণ্ঢং পতিমিব স্ত্রিয়ঃ॥"- গুপ্তবতী, উপোদ্‌ঘাত।

২ শতরুদ্রীয়—রুদ্ররূপী পরমেশ্বরস্তুতি – যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। "মন্যুর্দৈন্যে ক্রতৌ ক্রুধি—মন্যু শব্দের অর্থ – দৈন্য,যজ্ঞ ও ক্রোধ। এ স্থলে ক্রোধই অর্থ।

৩ "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"।–(কঠ ২।৬।৩) "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"।—(তৈ ৮।১)

৪ "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" (কঠ ২।৬।২)—ব্রহ্মসূত্রের কম্পনাধিকরণে (১।৩।৩৯) বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে, পরব্রহ্ম ভয়জনক বলিয়া ভয়দায়ক বজ্রের সহিত উপমিত ও 'বজ্র' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

৫ এই রত্নত্রয়পরীক্ষা কাহার কৃত, তদ্বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। গুপ্তবতীতে মহামতি ভাস্কর রায় বলিয়াছেন—"তৎস্বরূপং চোক্তং রত্নত্রয়পরীক্ষায়াং দীক্ষিতৈঃ"। এই দীক্ষিত কে? যিনি প্রথমে শৈবাচার্য্য ও পরে অদ্বৈতাচার্য্য হইয়াছেন, সেই অপ্পয়-দীক্ষিতই কি এই দীক্ষিত? শৈবাগমের আটটি প্রকরণ-গ্রন্থ "অষ্টপ্রকরণ" নামে বাণীবিলাস প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অন্যতম প্রকরণের নাম—"রত্নত্রয়"। অথচ উহার উপসংহার-শ্লোকে আছে—"রত্নত্রয়পরীক্ষেয়ং কৃতা শ্রীকণ্ঠ-সূরিণা"। ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয়, এই গ্রন্থখানির নাম রত্নত্রয়-পরীক্ষা ও উহা শ্রীকণ্ঠসূরি-কর্ত্তৃক প্রণীত। এই শ্রীকণ্ঠ কে? ইনিই কি প্রসিদ্ধ শৈবাচার্য্য শ্রীকণ্ঠ, যিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার ও যাঁহার ভাষ্যের উপর অপ্পয়দীক্ষিত "শিবার্কমণিদীপিকা" টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন? যাহা হউক, এই রত্নত্রয় বা রত্নত্রয়পরীক্ষার উপর অপ্পয়দীক্ষিত (বা অন্য কোন দীক্ষিত) টীকা রচনা করিয়াছেন কি না, জানা যায় না। অঘোর শিবাচার্য্য উহার উপর টীকা লিখিয়াছেন, উহা ঐ সঙ্গে ছাপা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দুইটি উক্ত গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় মনে হয়, গুপ্তবতী-কার নিশ্চয়ই অপর কোন রত্নত্রয়পরীক্ষার কথা বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অন্য কোন তথ্য না পাওয়া পর্য্যন্ত বিশেষ নিশ্চয় করা সম্ভব নহে।

বিবিধ কল্যাণগুণই 'ধর্ম্ম' বলিয়া খ্যাত। আর এই ধর্ম্মের আশ্রয়ই 'ধর্ম্মী'; তিনি এক ও জগতের পঞ্চবিধ সৃষ্টিকার্য্যে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম যখন পুরুষরূপে কল্পিত হন, তখনই তিনি এই সৃষ্ট জগতের উপাদানভাব প্রাপ্ত হন। আর দিব্য স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলে তিনি নিজের আশ্রয়ভূত আদিকর্ত্তার মহিষীরূপে পরিগণিতা হইয়া থাকেন। ধর্ম্মের এই দ্বিবিধ রূপভেদই ধর্ম্মীর ন্যায় ব্রহ্মকোটীর অন্তর্নিবিষ্ট' ৬।

ভাস্কর রায় এই গভীরার্থক উক্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—একই ব্রহ্ম অনাদিসিদ্ধ মায়াদ্বারা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী এই দ্বিবিধ রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে 'একমেবাদ্বিতীয়' সদ্রূপ ব্রহ্মবস্তুর যে প্রাথমিক 'ঈক্ষণের' কথা বিবিধ শ্রুতিতে বিভিন্ন ভাষায় উপবর্ণিত হইয়াছে,৭ সেই ঈক্ষণ বলিতে বুঝায় ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়া। পরমেশ্বরের এই জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়া যে স্বভাবসিদ্ধ, ইহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ৮। এই জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াই 'ব্রহ্মধর্ম্ম', আর স্বরূপতঃ ইহা ধর্ম্মী হইতে অভিন্ন। এই ধর্ম্মেরই অপর নাম 'শক্তি'।

'কৌলোপনিষদে'র প্রথম সূত্রে এই রহস্যই সংক্ষেপাকারে সূচিত হইয়াছে। এই সূত্রটির বাহ্য আকার মহর্ষি জৈমিনি-রচিত পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের প্রথম সূত্রের অবিকল অনুরূপ—"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।" কিন্তু কৌলোপনিষদের সূত্রটির অর্থ জৈমিনির প্রসিদ্ধার্থক সূত্রের অর্থ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জৈমিনি ধর্ম্মের লক্ষণ দ্বিতীয় সূত্রেই পরিষ্কার ভাষায় বুঝাইয়াছেন—'ধর্ম্ম বেদবিহিত বিধিরূপ—উহা আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধিজনক'; অর্থাৎ জৈমিনিসূত্রোক্ত এই ধর্ম্ম বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত অনুষ্ঠেয় বৈদিক কর্ম্মের বাচক। উহা জড় বস্তু মাত্র। পক্ষান্তরে, কৌলোপনিষদে উক্ত 'ধর্ম্ম'-শব্দের অর্থ 'ব্রহ্মধর্ম্মরূপ চিচ্ছক্তি'। উহাও চিদ্রূপ ৯।

যাঁহারা কৌলোপনিষদের রহস্য সাম্প্রদায়িকভাবে অবগত নহেন, এরূপ ব্যাখ্যাতৃগণ প্রথমসূত্রস্থ ধর্ম্ম-পদের সহিত গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিয়া ধর্ম্ম-শব্দটির স্থানে ব্রহ্ম-শব্দ বসাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ভাস্কর রায় ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। এই ধর্ম্মই ব্রহ্মধর্ম্ম—চিচ্ছক্তি। ইহার অন্য বহু পর্য্যায় 'নাগানন্দসূত্রে' উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল নামান্তরের মধ্যে—'বিমর্শ,' 'চিতি,' 'চৈতন্য,' 'পরা বাক্,' 'সত্তা,' 'মাতৃকা,' 'মালিনী,' 'স্পন্দ' প্রভৃতি নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'বিমর্শ' ও 'স্পন্দ' নাম দুইটি কাশ্মীর-ত্রিক-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। 'চিতি' সংজ্ঞাটি ৺শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে ১০।

যাহা হউক, উক্ত 'ধর্ম্ম' বস্তু উপাসকগণের নিকট কখন বা পুরুষ কখন বা স্ত্রীরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। পুরুষরূপে তিনি মহাবিষ্ণু। অবশ্য মহাবিষ্ণু বলিলে কেবল পারিভাষিক বৈষ্ণবস্বরূপ বুঝা উচিত নহে। মহাবিষ্ণু বলিতে পরমেশ্বরকেই বুঝিতে হইবে। আর এই দৃষ্টিতে মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর বা পরমশিব অভিন্ন। স্ত্রীরূপে এই ধর্ম্মই ভবানী। এই দ্বিবিধ রূপে ধর্ম্ম জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-তিরোধান-অনুগ্রহ-রূপ পাঁচটি কার্য্য করিয়া থাকেন ১১।

৬ "নিত্যং নির্দ্দোষগন্ধং নিরতিশয়সুখং ব্রহ্মচৈতন্যমেকং ধর্ম্মো ধর্ম্মীতি ভেদদ্বিতয়মিতি পৃথগ্ ভূয় মায়াবশেন। ধর্ম্মস্তত্রানুভূতিঃ সকলবিষয়িণী সর্ব্বকার্য্যানুকূলা [illegible] ভবতি গুণগণস্যাশ্রয়স্ত্বেক এব। কর্ত্তৃত্বং তত্র ধর্ম্মী কলয়তি জগতাং পঞ্চসৃষ্ট্যাদিকৃত্যে ধর্ম্মঃ পুংরূপমাস্তা সকলজগদুপাদানভাবং বিভর্ত্তি। স্ত্রীরূপং প্রাপ্য দিব্যা ভবতি চ মহিষী স্বাশ্রয়স্যাদিকর্ত্তুঃ প্রোক্তে ধর্ম্মপ্রভেদাবপি নিগমবিদাং ধর্ম্মিবদ্ ব্রহ্মকোটী"।

৭ "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"—ছান্দোগ্য উপ (৬।২।৩)। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা"—ঐতরেয় উপ (১।১।১)। "স ঈক্ষাঞ্চক্রে। স প্রাণমসৃজত"—প্রশ্ন উপ (৬।৩)।—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে 'ঈক্ষণে'র কথা বলা হইয়াছে। এই ঈক্ষণই 'জ্ঞান'। "সোঽকাময়ত" (বৃহঃ ১।২।৪; তৈঃ ১।৬) ইত্যাদি বাক্যে 'ইচ্ছা'র বিকাশ। আর "স তপোঽতপ্যত" (তৈঃ ১।৬) ইত্যাদি বাক্যে 'ক্রিয়া'শক্তির প্রকাশ।

৮ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" শ্বেতাশ্বতর উপ (৬।৮)।

৯ "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ইতি কৌলোপনিষৎ প্রথমসূত্রে জৈমিনিতন্ত্রস্থপ্রথমসূত্র ইব ন ধর্ম্মশব্দশ্চোদনালক্ষণার্থ জড়বস্তুপর, অপি তু ব্রহ্মধর্ম্মরূপচিচ্ছক্তিপর এব"—গুপ্তবতী, উপোদ্‌ঘাত।

১০ "চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ"—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫ম অঃ, ৩৪ শ্লোক।

১১ "জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরের উপোদ্‌ঘাত-শ্লোকে (৩) মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—"শৈবাগমে পরমব্রহ্মরূপী পরমশিবের পাঁচটি মূর্ত্তি—ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত। ইহারা যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-নিরোধন-অনুগ্রহ-রূপ পঞ্চবিধ কার্য্যের সম্পাদক। "সর্ব্বাসূপনিষৎসু প্রতীয়মানং যৎ পরং ব্রহ্ম তদেব শৈবাগমেষু সৃষ্টিস্থিতিসংহারনিরোধনানুগ্রহলক্ষণপঞ্চকৃত্যসিদ্ধ্যর্থমীশানতৎপুরুষাঘোরবামদেবসদ্যোজাতলক্ষণানাং পঞ্চানাং মূর্ত্তীনাং......" জৈ, ন্যা, মা, বি, (৩)।

ইহা ত গেল ধর্ম্মের কথা। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—ধর্ম্মীর স্বরূপ কি? ইহা বুঝাইতে হইলে একটি দৃষ্টান্ত দিতে হয়। একখণ্ড স্বচ্ছ শুদ্ধ স্ফটিক এক স্থানে পড়িয়া আছে। তাহার নিকটে একটি রক্তবর্ণের জবাফুল রাখা গেল। স্বচ্ছ স্ফটিকে রক্তবর্ণ জবাকুসুমের প্রতিবিম্ব পড়ায় মনে হইতে লাগিল যে, স্ফটিকটি রক্তবর্ণ। এস্থলে যথার্থ রক্তবর্ণ জবাকুসুমেই। কিন্তু তাহার প্রতিবিম্বের আশ্রয়ভূত স্বচ্ছ স্ফটিকটিকে কেবল জবাফুলের সান্নিধ্য-বশতঃই লোহিতবর্ণ বোধ হইয়া থাকে। ঠিক সেইরূপ যথার্থ কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মের থাকা সত্ত্বেও ধর্ম্মের আশ্রয়ভূত শুদ্ধ ধর্ম্মী ধর্ম্মগত কর্ত্তৃত্বের প্রভায় অনুরঞ্জিত হইয়া কর্ত্তৃত্ব-বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি অকর্ত্তা। আর তাঁহাতে আশ্রিত ধর্ম্ম জড় নহেন—জীবও নহেন—পরন্তু 'চিতি'। 'শক্তিসূত্রে' শক্তির স্বরূপ-বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—'চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ' (এই চিতিশক্তি স্বতন্ত্ররূপে বিশ্বোৎপত্তির হেতুভূতা)। অর্থাৎ এই চিতিশক্তিই জগৎকারণ ঈশ্বর বা উপনিষদের সগুণ কারণ-ব্রহ্ম। অতএব, শাক্তাগম-সিদ্ধান্তের সহিত উপনিষৎ-সিদ্ধান্তের এ বিষয়ে কোনই মতভেদ নাই। উপনিষদের মতে মায়াশক্তি শবল নির্গুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। তাহারও দুইটি অংশ—চিৎ আর মায়া। শাক্তাগমেও এই মতের পোষকতা দেখিতে পাওয়া যায়। একই ব্রহ্মের দুইটি ভাগ অবশ্য কাল্পনিক বা মায়িক—ধর্ম্ম + ধর্ম্মী। এই ধর্ম্ম আবার ধর্ম্মী হইতে অভিন্ন। অর্থাৎ—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ—ইহাই শাক্ত-সিদ্ধান্ত।

আমরা যখন বাহ্য জড় পদার্থ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করি, তখন আমাদিগের অন্তঃকরণ জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া-কারা বৃত্তিরূপে পরিণত হয় ১২। আমাদিগের অন্তঃকরণ জড়-ঘন-স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া আমাদিগের জ্ঞানেচ্ছাকৃতিরূপা অন্তঃকরণপরিণামাত্মিকা বৃত্তিও জড়-ঘনাকারে প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের প্রাথমিক বীক্ষণ আমাদিগের অন্তঃকরণবৃত্তির ন্যায় জড়ঘনাকার নহে; কারণ, অন্তঃকরণ-সম্বন্ধ উহাতে নাই। অন্তঃকরণ সৃষ্টির পূর্ব্বেই এই বীক্ষণের প্রারম্ভ। এই বীক্ষণই ব্রহ্মধর্ম্ম। উহা সাধারণ ধর্ম্মের ন্যায় জড়রূপ নহে, পরন্তু চিদ্রূপ। আর এই কারণে উহাকে প্রকৃতিকোটিতে নিবেশ না করিয়া ব্রহ্মকোটিতে নিবেশ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ শাক্তসিদ্ধান্ত অনুসারে উহা ব্রহ্মধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্মী জগৎকারণ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন—পরমেশ্বরের শক্তি বলিয়া গণ্য ও পরমেশ্বরের ন্যায় চিৎস্বরূপ। ইহাই রত্নত্রয়পরীক্ষা-কারের অভিপ্রায় বলিয়া মহামতি ভাস্কর রায় বিবৃতি দিয়াছেন।

ইহার পর গুপ্তবতীতে "বৃহদ্বাশিষ্ঠের" উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের উৎপত্তি-প্রকরণে দ্বাদশসর্গে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল ব্রহ্মসত্তাই বর্ত্তমান ছিল। উক্ত সন্মাত্ররূপ ব্রহ্ম যখন ঈক্ষণ করিলেন যে, 'আমি লোক সৃষ্টি করিব', তখনও অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় নাই; অতএব কেবল নিজ সন্মাত্রস্বরূপকেই অহংরূপে পরামর্শনপূর্ব্বক তিনি সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখন বিষয়সৃষ্টিও আরম্ভ হয় নাই; এ কারণ ভাবী বিষয়সমূহের সহিত তাঁহার যে কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-সম্বন্ধ তাহাও যথার্থ নহে—কল্পিত; অর্থাৎ তিনি যেন কর্ত্তা ও সৃজ্যমান বিষয় যেন কর্ম্ম—এইরূপ কল্পিত কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-সম্বন্ধ লইয়াই তাঁহার সিসৃক্ষা। এবংরূপ ঈক্ষণ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্য আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম (কারণ আকাশও তাঁহা হইতেই উৎপন্ন)। সৃষ্টিদশায় জড়ত্ব-ঘনত্ব-মালিন্য-বিরহিত এই সদ্‌ব্রহ্ম যেন বিষয়রূপে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। তৎকালে ঈক্ষণবৃত্তিদ্বারা বিশিষ্টরূপে অভিব্যক্ত ব্রহ্মচৈতন্য ঈক্ষণবৃত্তি-প্রধান হওয়ায় কথঞ্চিৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য হইয়াছিলেন; অর্থাৎ ঈক্ষণধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্য বাক্যগোচর হইয়া 'চিৎ' এই নামগ্রহণের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শুদ্ধাবস্থায় তাঁহার কোনরূপ নামই ছিল না। অনন্তর এই ঈক্ষণবৃত্তি প্রথমে অতি সূক্ষ্ম থাকিলেও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির ফলে ঘনত্ব প্রাপ্ত হন। ইঁহার ঘনীভূত অবস্থা প্রকৃষ্ট পরিণতি প্রাপ্ত হইলে ইনি সূক্ষ্ম (মানস) দ্বৈত-জগতের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া পরিচ্ছিন্নাকারে প্রকাশ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠেন। এই অবস্থায় ইঁহার মূলাধিষ্ঠানভূত অপরিচ্ছিন্ন ভূমানন্দস্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলে এই

১২ 'বৃত্তি'-শব্দের অর্থই অন্তঃকরণের পরিণাম। যখন যে জ্ঞান হয়, তখন অন্তঃকরণ সেই বিষয়ের আকারে আকারিত হইয়া থাকে। ইহাই অন্তঃকরণ-বৃত্তি।

পরিচ্ছিন্ন চিন্মাত্রস্বরূপই হিরণ্যগর্ভরূপ আদি সমষ্টি-জীব (বা কার্য্য-ব্রহ্ম) নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ১৩। ইহাই সৃষ্টির প্রথম অভিব্যক্তি বা প্রথম কার্য্য-সৃষ্টি। চণ্ডী এই ঈক্ষণবৃত্তিরই নামান্তরমাত্র ১৪। ইনিই সর্ব্বপ্রথম অতি সূক্ষ্মাবস্থায় 'চিৎ'নামে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। এই অবস্থাপন্ন চণ্ডিকারই অন্যান্য নাম অম্বিকা, শান্তা, পরা প্রভৃতি—তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে। ইনিই ব্রহ্মের সমষ্টি-বৃত্তিরূপা শক্তি—ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ব্রহ্মধর্ম্ম। ক্রমশঃ যতই সৃষ্টির পরিণতি হইতে থাকে, ততই এই সূক্ষ্মসমষ্টিরূপিণী চণ্ডিকা স্থূল ব্যষ্টিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। জ্ঞানেচ্ছা-কৃতি এই বৃত্তিত্রয়ের সমষ্টিরূপে ইনিই চণ্ডিকা। আর এই বৃত্তিত্রয় ব্যষ্টিরূপে যখন গৃহীত হয়, তখন এই চণ্ডিকাই মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সত্ত্বগুণময়ী মহাসরস্বতী জ্ঞানবৃত্তিরই মূর্ত্ত প্রতীক, তমোগুণাত্মিকা মহাকালী ইচ্ছাবৃত্তির ও রজোগুণ-বতী মহালক্ষ্মী ক্রিয়াবৃত্তির রূপ মাত্র ১৫। এই তিন মহাদেবীর সমষ্টিরূপা চণ্ডিকা পরমব্রহ্মশক্তিরূপা পরমব্রহ্ম হইতে অভিন্না। তাঁহার জ্ঞানেচ্ছাকৃতি বৃত্তিত্রয় পুনশ্চ ব্যষ্টিদশায় বামা-জ্যেষ্ঠা-অতিরৌদ্রী নামে, পশ্যন্তী-মধ্যমা বৈখরীভাবে ও [illegible] প্রতিভাত হইয়া থাকে। ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপা বৃত্তিময়ী মহাশক্তির স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণরূপ ব্যতীতও একটি তুরীয়রূপের উল্লেখ "শক্তি-রহস্যা"দি গ্রন্থে পাওয়া যায় বলিয়া ভাস্কর রায় বর্ণনা করিয়াছেন। স্বয়ং আচার্য্য ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করও মহা-শক্তির এই তুরীয় রূপের ইঙ্গিত করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'হে দেবি ! বেদবিদ্গণ আপনাকে ব্রহ্মার পত্নী বাগ্‌দেবী, হরির পত্নী পদ্মা, অথবা হরসহচরী পার্ব্বতী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আপনার মহিমার সীমা-নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। আপনি তুরীয়রূপা ! হে মহামায়ে ! পরমব্রহ্ম-মহিষি ! আপনি সকল বিশ্বকে ভ্রামিত করাইতেছেন' ১৬।

আচার্য্য ভগবৎপাদের ন্যায় অদ্বৈতবাদীও পরমভক্তি-ভরে যাঁহাকে একাধারে গুণত্রয়ময়ী ও গুণত্রয়াতীতা তুরীয়া নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ যে ব্রহ্মাভিন্ন চিন্মাত্র—তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতেই পারে না। যদিও শ্রীশ্রীসপ্তশতী গ্রন্থে তাঁহাকে 'পরমা প্রকৃতি' 'মহামায়া' প্রভৃতি পদদ্বারা সম্বোধন করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে সাঙ্খ্যোক্তা 'প্রকৃতি'র ন্যায় স্বতঃপরিণামিনী জড়রূপা অথবা অদ্বৈতবেদান্তসম্মতা 'মায়া'র ন্যায় জড়মিথ্যারূপিণী বলা অসঙ্গত। 'পরমা,' 'মহা' প্রভৃতি বিশেষণ [illegible] তাঁহাকে [illegible] 'প্রকৃতি' বা বেদান্তসিদ্ধান্তকথিতা 'মায়া' হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে—ইহা শ্রীশ্রীচণ্ডীর তাৎপর্য্য। অন্যথা চণ্ডী কখনও এ কথা বলিতেন না—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" ॥ (চণ্ডী ৫।১৩)

আমরাও এই মহাশক্তিরূপিণী চৈতন্যদায়িনী বাঙ্গালার শারদোৎসবে মৃন্ময়ী প্রতিমাতে চিন্ময়ীরূপে আবির্ভূতা শ্রীশ্রী[illegible] শ্রীচরণসরোজে যথাশক্তি বাক্যপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে করিতে প্রণাম করি—

"ব্রহ্মা যস্যৈ হরির্যস্যৈ রুদ্রো যস্যৈ ব্যধান্নমঃ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥"

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

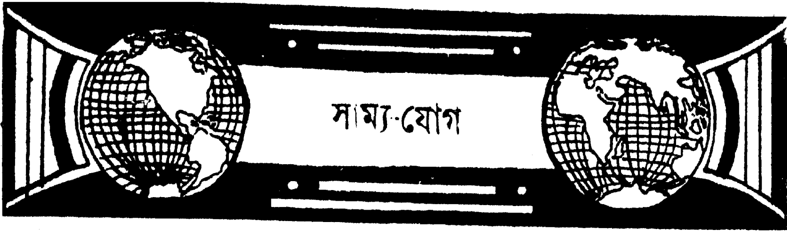
---

১৩ কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি-সূক্ষ্ম-শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য-স্বরূপ। তাঁহাকে সমষ্টি-অন্তঃকরণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট চৈতন্য (Cosmic Mind) বলা চলে। ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে—তিনি সকল ভূত-গণের পতি—ও প্রথম অভিব্যক্ত পুরুষ। তিনি সমস্ত সূক্ষ্ম দ্বৈতজগতের সহিত তাদাত্ম্যভাবাপন্ন। কিন্তু তিনি ঈশ্বর নহেন—ঈশ্বর সমষ্টি-কারণোপাধিক চৈতন্য—হিরণ্যগর্ভ তাঁহার প্রথম কার্য্য; এই কারণে একজীববাদীর দৃষ্টিতে তিনি ঈশ্বরকোটী—সমষ্টিভূত প্রথম জীব মাত্র।

১৪ "তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিচ্চেত্যতামধিগচ্ছতি।
অগৃহীতাত্মকং সংবিদহংমর্শনপূর্ব্বকম্ ।
ভাবিনামার্থকলনৈঃ কিঞ্চিদূহিতরূপকম্ ।
আকাশাদণু শুদ্ধং চ সর্ব্বস্মিন্ ভাতি বোধনম্ ।
ততঃ সা পরমা সত্তা সচেতশ্চেতনোন্মুখী।
চিন্নামযোগ্যা ভবতি কিঞ্চিল্লভ্যতয়া তদা।
ঘনসংবেদনা পশ্চাদ্ভাবিজীবাদিনামিকা।
সম্ভবত্যাপ্তফলনা যদোজ্ঝতি পরং পদম্ ।"
(গুপ্তবতীতে উদ্ধৃত বৃহদ্বাশিষ্ঠ)

১৫ "ঈদৃশেক্ষণাত্মকচণ্ডী চিদাদিনামকসমষ্টিবৃত্তিরূপ-ধর্ম্মাত্মকশুদ্ধব্রহ্মাভিন্নানাং জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াণাং তিসৃণাং ব্যষ্টীনাং মহাসরস্বতী-মহাকালী-মহালক্ষ্মী-রিতি-প্রবৃত্তি-নিমিত্তবৈলক্ষণ্যেন নাম-রূপান্তরাণি"—গুপ্তবতী।

১৬ "গিরামাহুর্দেবীং দ্রুহিণগৃহিণীমাগমবিদো
হরেঃ পত্নীং পদ্মাং হরসহচরীমদ্রিতনয়াম্ ।
তুরীয়া কাপি ত্বং দুরধিগমনিঃসীমমহিমা
মহামায়ে বিশ্বং ভ্রময়সি পরব্রহ্মমহিষি !" ।
শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃতা আনন্দলহরী (৯৮ শ্লোক)



(দার্শনিক গবেষণা)

সাম্যযোগ সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির চিরাচরিত কর্ম্মযোগ। প্রাকৃতিক সত্য ও শক্তি এর ভিত্তি। বিজ্ঞান এই কর্ম্মযোগের প্রশস্ত পন্থা মাত্র। বিজ্ঞানে ও সাম্যযোগে নিত্য-সম্পর্ক বিদ্যমান।

বিরাট্ বিশ্বপ্রকৃতি অসংখ্য ও বিচিত্র সৌরজগৎ সহ অনন্তের বুকে অসীমের পথে আত্মপ্রকাশে রত। বিচিত্র বৈষম্যময় বিশাল সৌরজগৎ সমূহ অসংখ্য জগন্মণ্ডল সৃষ্টি করতে করতে কোন্ অলক্ষ্য আকর্ষণে ভীমবেগে ধাবিত হচ্ছে। বিচিত্র বিষম বিশাল ব্রহ্মাণ্ডগুলি প্রাকৃতিক সমবায় শক্তিতে সমবেত হ'য়ে প্রতিমুহূর্ত্তেই অনন্ত বিশ্বজগৎ রচনা ক'রে চলেছে। এই বৈচিত্র্য, এই বৈষম্য, এত দ্বন্দ্ব, এত-ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে আমরা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে জীবনের যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছি। প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিরোধের মধ্যে মিলন, বিক্ষোভের মধ্যে শান্তি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, এবং বৈষম্যের মধ্যে সুসমতা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রশস্ত মিলনতন্ত্রই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য সাম্যযোগ বা প্রাকৃতিক কর্ম্মযোগ। সাম্যযোগের অবদান-বৈচিত্র্যে একের প্রতিষ্ঠা, বৈষম্যে সাম্যের নিষ্ঠা, বিরোধে মিলন-প্রতিষ্ঠা এবং বিক্ষোভে শান্তিপ্রচেষ্টা। বিশ্বমানব-কল্যাণই সাম্যযোগের একমাত্র লক্ষ্য।

সাম্যময়ী বিশ্বপ্রকৃতি বিশাল বিশ্বের পূর্ণকল্যাণ কামনা ক'রেই বিশ্বময় বৈষম্যের অবতারণা ক'রে চলেছেন! পরিপূর্ণ চরিত্রের পূর্ণবিকাশের প্রধান সহায় বৈষম্যবিস্তার। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মধুমঙ্গলা বিশ্বজননী তাঁর প্রত্যেক বিশ্বসজ্জায় বৈষম্যের চারুকারুতা বিশিষ্ট উপায়ে প্রতিফলিত রেখেছেন। উদ্দেশ্য—বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র্য ও সৌন্দর্য্যবিস্তার। প্রাকৃতিক গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বৈচিত্র্যে সমবায় এবং বৈষম্যে সাম্যব্যবস্থাই বিশ্ব-বিরাটের সকল সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও মহত্ত্বের মূল রহস্য মাত্র। প্রাকৃতিক সাম্যযোগের অসদ্ভাবে বিশ্বে বিশ্বে, সৌরজগতে সৌরজগতে, গ্রহে-গ্রহে, গ্রহে-উপগ্রহে, পদার্থে-পদার্থে, প্রতিপদে পলে-পলে সংঘর্ষণে বিশ্বসৃষ্টিরই আমূল ধ্বংস হওয়া সম্ভব বা স্বাভাবিক বিপত্তি মাত্র। কিন্তু সুবিশাল সৌরবিশ্বগুলি, অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ সমূহ, কত কোটি কত প্রকার বস্তুবৈষম্য ও পদার্থ-বৈচিত্র্য নিয়ে স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে বিশ্বসমবায়কে সম্পূর্ণ রেখে অলক্ষ্য পথে অনন্তের অসীম বক্ষে প্রধাবিত হ'য়েছে; এর রহস্য কোথায়? এর মূল রহস্য প্রাকৃতিক সমবায়শক্তির বা সংঘশক্তির অমোঘ মিলনতন্ত্রে বা সাম্যযোগে। এই বিশ্বমানবকল্যাণ সাম্যযোগ, বিজ্ঞানসম্মত কর্ম্মযোগ মাত্র।

সাম্যযোগ প্রাকৃতিক সৃষ্টি-শৃঙ্খলারই মূল রহস্য। সাম্যবাহিনী বিশ্বরাণী মরণজয়ী সাম্যগুণের প্রভাবে বিশাল বিচিত্র বৈষম্যের মরণ-প্রাঙ্গণে বিজয়-গৌরবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত। মরণের রুদ্রতাণ্ডব সাম্যময়ী প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করতে পারে না। তাই কোটি কোটি বৈষম্য বিভক্তির একটিও সাম্যসংযত বিশ্ববিরাটের বিপুল সংঘশক্তিকে অনুমাত্র চঞ্চল করতে পারেনি। অন্তর্নিহিত সাম্য-শক্তির প্রাকৃতিক সংঘসমবায়গুণের সাহায্যেই বিশ্ব তার প্রত্যেক কার্য্য অগণ্য বৈষম্য, অনন্ত বৈচিত্র্য এবং অসংখ্য বিক্ষোভের মত সুচারু ভাবে সম্পাদিত করতে পারছে। সাম্যযোগই শুধু বিশ্ব-বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে অসংখ্য বৈষম্যের নিদারুণ বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মধ্যে। বিরোধ-বিচ্ছেদ, প্রভেদ ও দ্বন্দ্বের মধ্যে সাম্যই শান্তি, প্রতিষ্ঠা, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করছে। অথচ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমবায় ও সমন্বয়, সাম্য ও প্রতিষ্ঠার অমোঘ বার্ত্তা ঘোষিত ক'রে চলেছে। বৈচিত্র্যের রণদুন্দুভি অবাধে ধ্বনিত হ'য়ে চলেছে। বৈষম্যের জয়ধ্বনিতে দশ দিক্ প্রমত্ত হ'য়েছে। তবু একেরই জয়বার্ত্তা সাম্যের বিজয় নির্ঘোষে নিত্য অণুরণিত!

বিচিত্র বৈষম্যময়ী বিরাট্ বিশ্বপ্রকৃতির গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে মনুষ্যপ্রকৃতি প্রবৃত্তি-বৈষম্যের বিচিত্র নাট্যনিকেতনে প্রধানা নটীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তার পর মানুষ কল্পনার অসীম প্রাঙ্গণে সবেগে ধাবিত হ'য়ে তার প্রবৃত্তি কৌতুকের অসংখ্য পরিধি রচনায় প্রবৃত্ত। কামনা মানুষের মনে অসংখ্য ও বিচিত্র চিন্তার কল্পনা-রাজ্য সংগঠিত করছে! মনুষ্যপ্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিরই ছাঁচে গড়া। বিশ্বপ্রকৃতির অনুকরণেই মানবস্বভাব গঠিত। বিশাল বিশ্ব-চরিত্রেরই অনুসরণে মানবমস্তির বিপুল বৈষম্যবাদ ও তার বিচিত্র রসমাধুর্য্য। অতএব বিশ্বপ্রকৃতির একনিষ্ঠ বিজ্ঞানী মানবমন প্রকৃতির চিরাচরিত সাম্যযোগের একান্ত অনুশীলন করতে স্বভাবতঃই বাধ্য হবে।

ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মদ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাজ্যদ্বন্দ্ব, নীতিক্ষেত্রে বাদ-বিসংবাদদ্বন্দ্ব এবং অর্থক্ষেত্রে জীবনদ্বন্দ্ব (struggle for existence) প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত দ্বন্দ্বদানবের রণপ্রাঙ্গণে মরণজয়ী দ্বন্দ্বঘ্ন সাম্যযোগেরই একশেষ কৃষ্টিসাধন করতে হবে। ধর্ম্মক্ষেত্রে আদর্শ, দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে সাম্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'লেই সকল প্রকার ধর্ম্মদ্বন্দ্বের বা ধর্ম্মযুদ্ধের ও সাম্প্রদায়িক কোলাহলের চিরনির্ব্বাণ সাধিত হবে। ধর্ম্মক্ষেত্রে বিপুল ঐক্যসমাবেশ সম্ভব হবে সাম্যে, দ্বন্দ্বে নয়। রাজ্যলোলুপ রাষ্ট্রক্ষেত্রে সাম্যযোগের বিশাল আন্দোলন ও বিপুল অভিযানের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। সমগ্র রাষ্ট্রনীতি সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-মহামারীর শান্তিময় অবসান সম্ভব হয়। রাষ্ট্রসাম্যের বা national harmonisation-এর নিদারুণ অসদ্ভাবেই আজ চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা তার দুরন্ত পৈশাচিক মূর্ত্তিতে বিশ্বমানবকে গ্রাস করতে উদ্যত। বিশ্ব-প্রাকৃতিক আদেশ অমান্য ক'রে সাম্য ছিন্ন হওয়াতেই বর্ত্তমান জাতীয় দুর্গতি সকলকে সমূলে গ্রাস করতে উদ্যত হ'য়েছে।

নীতিবিপ্লবের বা social revolution-এর আপাত সাম্যবাদে সমাজের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হতে পারে না। সামাজিক দেহে গুণবৈশিষ্ট্যের বা সম্পত্তিবিশেষের উৎখাত ক'রে গুণসমতা বা বিত্তসমতার অবতারণা অসম্ভব হবে মাত্র। ব্যষ্টিবাদকে উৎপন্ন করে সমষ্টিবাদ কোন দিনই অভ্যুন্নত হতে পারবে না। প্রকৃতি-সিদ্ধ সাম্যযোগসূত্রে সকল আতিশয্য ও অসদ্ভাবের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও উচ্ছেদবিহীন মিলনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সর্ব্বনীতি-বিপ্লবেরই মূলোচ্ছেদ সম্ভব হবে। ব্যষ্টিবিশেষত্বের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রেখে ব্যষ্টি আতিশয্যের তিরোধান করাই প্রকৃতি-সম্মত সাম্যযোগবিধি। সাম্যযোগের প্রকৃতিগত ও স্বভাবসুলভ সাম্যভাবের আশ্রয় নিয়ে অর্থসম্পত্তির সাম্যময় বিতরণ, অর্থপ্রাচুর্য্য ও অর্থাভাবের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক সাম্যস্থাপন, বিত্তপ্রসার ও বাণিজ্যবিস্তারের সার্ব্বজনীন অবাধ অধিকার, এবং সেই সঙ্গে সকল প্রকার স্বাতন্ত্র্যসংযম প্রভৃতি মহাযোগ ব্রত পালন করতে পারলে বিপ্লবের ঘনবহ্নি প্রজ্বলিত না করেও সর্ব্বপ্রকার অর্থ-সমস্যার প্রাকৃতিক সমাধান-সাধন সম্ভব হয়।

সাম্যযোগের আর একটা বিশেষ বলবার কথা আছে। আমরা সাধারণতঃ বিরুদ্ধপ্রকৃতি বা বিপরীত স্বভাবগুলির মধ্যে কতক গ্রহণ করি, পালন করি ও তাদের উৎকর্ষের জন্য সাধনাও করি। এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে বৃত্তিক্ষেত্রে একদর্শিতার আশ্রয় লওয়া হয় মাত্র। আমরা আত্মরক্ষায় উদাসীন হয়ে যখন পররক্ষাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করি, তখন প্রাকৃতিক সাম্যব্যবস্থার কথা স্মরণ থাকে না। আত্মরক্ষায় উদাসীন ব্যষ্টি বা জাতি উৎপন্ন হয়। পররক্ষার মোহে নিজের সর্ব্বনাশ মাত্র সংঘটিত হয়। অপরন্তু, পররক্ষায় বিমুখচরিত্র আত্মরক্ষার আতিশয্যে দস্যু, চোর অপহরণদক্ষ হ'য়ে পরের সর্ব্বনাশ করে। সে আত্মহত্যাও বটে। আত্মরক্ষার ও পররক্ষার বৃত্তিগুলির আতিশয্য ঘটিলেই পরিণামে আত্মহত্যা ও পরহত্যা মাত্র ঘটে। উভয় পক্ষের বৃত্তিগুলির সাম্য ঘটাতে পারলেই আত্মোন্নতি ও পরোৎকর্ষ উভয়ই সম্ভব হয়। প্রকৃতির সাম্যোদ্দেশ্য তাই। সাম্যময়ী বিশ্বপ্রকৃতি মনুষ্যচরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধন করতেই মনুষ্যস্বভাবের অন্তর্ব্বর্ত্তী পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি-প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। সকল প্রবৃত্তিরই পরিপূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও সর্ব্ববৃত্তিসাম্যযোগ যুগপৎ ঘটাতে পারলেই সমগ্র নৈতিক বিপ্লবের পথ চিরতরে অবরুদ্ধ থাকবে।

সমগ্র প্রাকৃতিক জীবনক্ষেত্রটাই অসংখ্য বৈচিত্রের সমবায় মাত্র। জীবনমরণের বিচিত্র গতিই সারা বিশ্ব আন্দোলিত রাখে। বৈচিত্র্যই সম্পূর্ণতা। সম্পূর্ণতাই বৈচিত্র্য। অতএব ব্যষ্টির জীবনে সমষ্টির চরিত্রে সম্প্রদায়ের আদর্শে এবং জাতির অভিযানে কোথাও এককপ্রাধান্যের প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। ধর্ম্মক্ষেত্রে এককপ্রাধান্য স্বৈরাচার ও ব্যভিচারের দিগন্তপ্লাবী মহামারী এনে দেবে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে এককপ্রাধান্য জনসাধারণের পঙ্গুতা ও সর্ব্ব-সাধারণে রিক্ততা এনে দেয়। তার ফল দিগন্তব্যাপী বিপ্লব, ও ব্যাপক সমরানল। নীতিক্ষেত্রে একক প্রাধান্য প্রজ্বলিত বিদ্রোহানল এবং স্বাতন্ত্র্যবাদের বিশাল আন্দোলন এনে দেবে। অর্থক্ষেত্রে এককপ্রাধান্য দৈন্য ও দারিদ্র্যের অসহ্য বেদনা অসংশোধনীয় হীনতার চিরন্তন মোহান্ধকার নিয়ে আসে। সর্ব্বসাধারণ ক্ষেত্রেই এককপ্রাধান্যবাদ বিশ্বজনীন উচ্ছেদ ও বিপ্লববাদের নিদারুণ অশান্তি সৃষ্টি করবে; যার ফলে সমগ্র মানব জাতিরই আমূল বিনাশ অনিবার্য্য হয়ে উঠে। ব্যষ্টির চরিত্র ও প্রবৃত্তিকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে হত্যা দ্বারা নিবৃত্তির এককপ্রাধান্য প্রতিপন্ন করলে সমগ্র মনেরই সর্ব্বনাশ সংঘটিত হবে। প্রবৃত্তির সাম্যবদ্ধ ভাবই উৎকৃষ্ট নিবৃত্তি মাত্র। বিগতপ্রবৃত্তি হয়ে নিবৃত্তিমার্গে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক ও অস্বাভাবিক; সেটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ অভিযান মাত্র। বিশ্বপ্রকৃতিই বিজ্ঞানময় যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বিজ্ঞানী মন প্রকৃতিসম্মত সাম্যযোগেরই সাধক। সাম্যযোগের সাধকমাত্রেরই এই তত্ত্ব স্বতঃই বোধগম্য হবে।

শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মহাকবি প্রয়াণে

তুমি চ'লে গেছ অমরায়
পারিজাত-মালা শোভে তোমার গলায়!
জানি মোরা, জানি, সব জানি।
তবু কেন বলিতে পারি না,
ভুলে যাই সব জানা-শোনা
ভুলে যাই সান্ত্বনার বাণী!
কি লিখিব, লিখে কি জানাবো শোক
কতটুকু পারি, জানি কতটুকু মোরা!
তুমি যা' লিখেছ লেখা, তাই সাক্ষী হোক
বিশ্ব-চোখে, অশ্রুজল-পোরা।

যত কাল রবে গ্রহ-তারা,
চন্দ্র-সূর্য্য উঠিবে আকাশে
নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত,
পুষ্প-গন্ধ বহিবে বাতাসে,
যত দিন রবে এ ধরণী
আসুক দুর্দ্দিন যত, ঝড়-জল যতই বহুক
বাঙালীর শিরে;
কভু মোরা ভুলিব না, ভুলিব না বারেকের তরে,
আমাদের একমাত্র বিশ্বের কবিরে।

শ্রীপ্রদোষকুসুম মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয় সঙ্গীতে রাগরাগিণীসাধনা

ভারতীয় সঙ্গীতের পশ্চাতে বহু শতাব্দীর সাধনা ও ইতিহাস বর্ত্তমান! কাজেই এই শাস্ত্র ও কলা নানা আয়োজন ও অলঙ্করণের বাহন হ'য়ে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত চলে এসেছে। ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার যে দু'টি স্রোতঃ প্রবহমান, তাহাদের একটি উত্তর-ভারতের, অন্যটি দক্ষিণ-ভারতের। উত্তর-ভারতের স্রোতে পারস্য ও মোগলাই রঙ পরিস্ফুট, এবং তা'তে বস্তুতঃ হিন্দু-সাধনাই জয়যুক্ত হ'য়েছে। কারণ, বাইরের সঙ্গীত-সংগ্রহ ভারতের বৃন্তেই ফলিত হ'য়েছে। সেগুলি সমস্তই নানা জাতির অর্ঘ্য-স্বরূপ। ভারতের সঙ্গীত-চর্চ্চার চন্দ্রাতপতলে নানা সভ্যতা যুক্তকরে উপহার নিয়েই এসেছে—এ কথা বলা যায়। কারণ, সে সব স্থান পেয়েছে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর কলেবরে। দক্ষিণ-ভারতীয় পদ্ধতিতে মুসলমান-সভ্যতার দান পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু ঘাত-প্রতিঘাতে এবং মিশ্রণে যে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী—তা হ'তেই এই পদ্ধতি বঞ্চিত। হিন্দু সভ্যতার নানা তত্ত্ব যেমন বৈদেশিক ভাবসমূহকে গঠিত করে' নূতন দিগ্বিজয়ে বহু ধনসম্ভার প্রাপ্ত হ'য়েছে—উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতকলাও তেমন বিস্ময়-জনক রসশ্রীতে মণ্ডিত হ'য়েছে।

এদেশে সঙ্গীত বল্‌তে তিনটি জিনিসের অঙ্গাঙ্গিত্ব বুঝায়। 'সঙ্গীত-দর্পণে' আছে,—

"গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ঃ সঙ্গীতমুচ্যতে।"

শুধু এ তিনের সঙ্গম মাত্র নয়, এ তিনের সমবায় লোকরঞ্জন ক'রতে পারলেই তাকে সঙ্গীত বলা হবে—প্রাচীন সঙ্গীতরসজ্ঞগণ এই ব্যবস্থা প্রদান ক'রেছেন। 'সঙ্গীত-দর্পণে' আছে,—

"গীতবাদিত্রনৃত্যানাং রক্তিঃ সাধারণোগুণঃ।
অতো রক্তিবিহীনং যৎ তন্ন সঙ্গীতমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য—এসব রঞ্জনগুণে ভরপুর থাকা প্রয়োজন। উক্ত গুণ না থাক্‌লে তা' সঙ্গীতই হবে না। কাজেই সঙ্গীতে দেখ্‌তে হবে জ্যামিতিক পারিপাট্য বা গণিতগত কৌশলমাত্র নয়; সঙ্গীতের সাহায্যে রসের উদ্রেক হওয়া চাই। এই রস নানা ভাবে ও উপচারে হিন্দুচিত্তকে আনন্দ দান ক'রে এসেছে। উত্তর-ভারতে ত্রিধা বিভক্ত গীতকলা সম্প্রতি Solo বা প্রত্যেকটি একক হ'য়ে প'ড়েছে; কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে গীত, বাদ্য ও নৃত্যের অঙ্গাঙ্গিত্ব এখনও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে। এজন্য নৃত্য কাকে বলে, এরূপ আলোচনায় গীত ও বাদ্যেরও উল্লেখ আছে। 'সঙ্গীতদামোদরে' আছে,—

"দেশরুচ্যা প্রতীতোঽথ তালমানসমাশ্রয়ঃ।
সবিলাসোঽঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥"

হিন্দুশাস্ত্রের পরম্পরা রক্ষা ক'রেই সঙ্গীতশাস্ত্র রচিত হ'য়েছে। কাজেই বেদের অনুসরণেই সঙ্গীতবিদ্যার সৃষ্টি। সামবেদের ঝঙ্কারিত পাঠ ও ঋগ্বেদের আবৃত্তিতে সঙ্গীতের পূর্ব্বাভাস সুস্পষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক ধারণায় মহাদেব হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। মহাদেবের পঞ্চমুখ ও গৌরীর এক মুখ হইতেই ছয় রাগের সৃষ্টি হয়েছে—প্রামাণ্য গ্রন্থচয় এইরূপই বলে থাকে। এ সম্বন্ধে পঞ্চম শতাব্দীর ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' প্রামাণ্য গ্রন্থ ব'লেই কীর্ত্তিত। তাঁর সঙ্গীত বিষয়ক অধ্যায়ে স্বর, শ্রুতি, গ্রাম ও মূর্চ্ছনা ও জাতির বিচার আছে। প্রাচীনতম যুগে এ কয়টি অঙ্গেই ভারতীয় সঙ্গীত গঠিত হ'ত। 'নাট্যশাস্ত্রে' ২৩ শ্লোকে ভরত কর্ত্তৃক স্বরকে বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী—এ কয়টি ভাগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অতি উচ্চ সুর-বোধ ও বিশ্লেষক বিধান অপরিজ্ঞাত থাকলে এরূপ বিভাগ সম্ভব হ'ত না। ভরতে ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রামের উল্লেখ আছে; (২৫ শ্লোক) 'নাট্যশাস্ত্রে' দ্বাবিংশতি শ্রুতির উল্লেখ আছে। পূর্ব্বতন গ্রন্থাদিতেও সঙ্গীতের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের রচনা। এই গ্রন্থে গীত, যান্ত্রিক সঙ্গীত, নৃত্য, বীণাবাদ্যের বিষয় বলা হয়েছে—অবশ্য রাগরাগিণীর কল্পনা এ সমস্ত গ্রন্থে দেখা যায় না। মনুসংহিতা দ্বিতীয় শতকের গ্রন্থ; এই গ্রন্থে নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রসঙ্গে অনেক বিষয় উল্লেখ আছে।

বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র পঞ্চম শতাব্দীর রচনা। এই গ্রন্থে শৃগাল ও গর্দ্দভ আখ্যানে গর্দ্দভ গান করিতে উন্মুখ হয়ে সঙ্গীতকলার সাতটি স্বর, তিনটি গ্রাম, একুশটি মূর্চ্ছনা, ঊনপঞ্চাশ তান, তিন মাত্রা, তিন স্থান, নব রস, ছত্রিশ

রাগ, চল্লিশটি ভাষা ইত্যাদির উল্লেখ করে। পাণিনির ব্যাকরণ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ শতকের—গ্রহবাক নৃত্যকলা ও সঙ্গীতের আলোচনা ক'রেছেন। অবশ্য, রামায়ণ ও মহাভারতে এবং জাতকের গল্পাদিতেও সঙ্গীতের প্রসঙ্গ আছে। এ সম্বন্ধে মতঙ্গমুনির 'বৃহদ্দেশী' এক খানি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ চতুর্থ শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় রচিত হয়। তিনি লিখেছেন—জাতি হ'তে গ্রামরাগের উৎপত্তি হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি রাগের উল্লেখও ক'রেছেন।

ভরতে রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই ; কাজেই রাগ-রাগিণী ক্রমশঃ কি ভাবে ভারতীয় লৌকিক সঙ্গীতে স্থানলাভ ক'রেছে, তা আলোচ্য সন্দেহ নেই। সোমেশ্বরের 'মান সোল্লাস' দ্বাদশ শতকের (১১৩১) রচনা। এ গ্রন্থে নানা রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। নারদের 'সঙ্গীত-মকরন্দ' (সপ্তম হ'তে একাদশ শতক) একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ—এই গ্রন্থে রাগরাগিণীর উৎপত্তির আখ্যান আছে। এই সকল গ্রন্থেই রাগ-রাগিণীর প্রথম বিচার ও আলোচনা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।



শ্রীরাগ

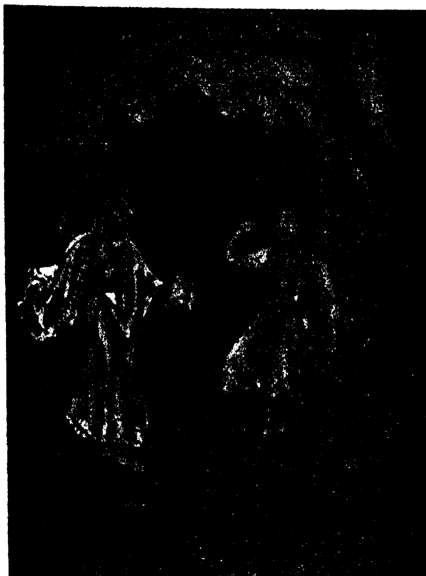


শ্রীমালবশ্রী



শ্রীত্রিবণী


শ্রীগৌরী


শ্রীভূপালী


শ্রীবরাটী


শ্রীকল্যাণী

নান্য দেবের 'সরস্বতী-হৃদয়ালঙ্কার' ১০৯৬—১১৩৭ খৃষ্টাব্দের রচনা। এই গ্রন্থে কতকগুলি দেশী রাগেরও উল্লেখ আছে, যথা:—দাক্ষিণাত্য, সৌরাষ্ট্রী, গুর্জ্জরী, বাঙ্গালী ও সৈন্ধবী। শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' এই শ্রেণীর গ্রন্থের ভিতর (১২১০—১২৪৭ খৃঃ) শ্রেষ্ঠতম। এই গ্রন্থে বিশদ ভাবে সঙ্গীতকলার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা হ'য়েছে।

এ সম্বন্ধে অন্যান্য বহু গ্রন্থ ধারাবাহিক ভাবে রচিত হ'য়েছে। শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত-সময়সার' একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। উত্তর-ভারতে ত্রয়োদশ

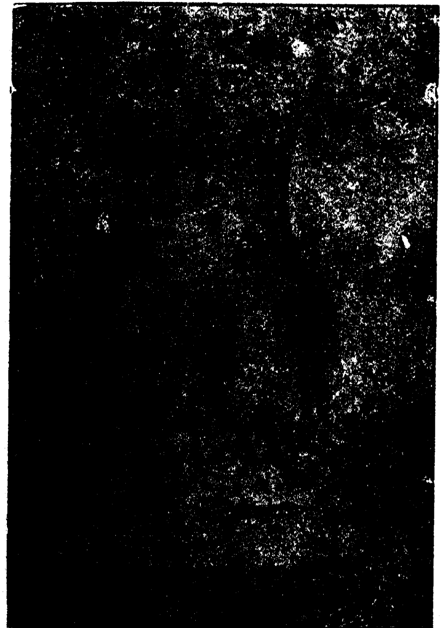


শ্রীবসন্তরাগ

শতাব্দীতে 'রাগার্ণব'কে প্রামাণ্য বলে সকলে গ্রহণ করে। শুভঙ্করের 'সংগান-সাগর', জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর,' রাণা কুম্ভকর্ণের 'সঙ্গীতরাজ' এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সন্দেহ নাই। এসব ছাড়াও বহু গ্রন্থ আছে,—কাজেই ভারতীয় সঙ্গীত বিচার করবার গ্রন্থের অভাব কোন কালেই হয়নি। আহাবোলের 'সঙ্গীতপারিজাত,' এবং পুরুষোত্তম মিশ্রের 'সঙ্গীতনারায়ণ' এই ধারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহন ক'রে এনেছে। ফলে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে দুই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রামাণ্যরূপে



শ্রীহিন্দোলী



শ্রীগুর্জ্জরী



শ্রীমালবী



শ্রীসাবেরী



শ্রীপটমঞ্জরী



শ্রীকৌশিকী

ব্যবহৃত হ'য়ে এসেছে। উত্তর-ভারতে 'সঙ্গীতমকরন্দ', 'সঙ্গীতরত্নমালা,' 'মানসোল্লাস', 'রাগার্ণব' ও 'রাগসাগরের' প্রভাব লক্ষিত হয় এবং দক্ষিণ-ভারতে 'সঙ্গীতরত্নাকর', 'সঙ্গীততরঙ্গিণী', 'স্বরমেলকলানিধি', 'রাগবিরোধ', 'চতুর্দণ্ডী-প্রকাশিকা' ও 'সঙ্গীতসুধা' প্রভৃতি প্রামাণ্য ব'লে আদৃত হ'য়ে আসছে।

পরবর্ত্তীকালের কয়েকখানি গ্রন্থের নামও উল্লেখযোগ্য। মোহাম্মদ রেজা খাঁর 'নাগমালে-এ-আসফি' বিখ্যাত গ্রন্থ। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম'ও উল্লেখের যোগ্য। সম্প্রতি ভাটখণ্ডে মশায়ের সঙ্গীত-বিচার অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ ক'রছে। তাঁর শ্রীমল্লক্ষণসঙ্গীত ও অভিনব রাগমঞ্জরী রাগরাগিণীকে দশচক্রে বিভাগ করতে অগ্রসর হ'য়েছে, এবং অনেকেরই তা' হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছে।



শ্রীভৈরব রাগ

ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে মতভেদ বহু দূরগামী। প্রাচ্য সঙ্গীতবিদ য়ুরোপীয় ধ্বনি-সুষমাকে বিশৃঙ্খল চিৎকার ও হট্টগোল ব'লেই মনে করে। তাতে উত্থান-পতনের বা স্বরবিন্যাসের পারম্পর্য্য নেই—সব যেন এলো-মেলো—একসঙ্গে



শ্রীভৈরবী



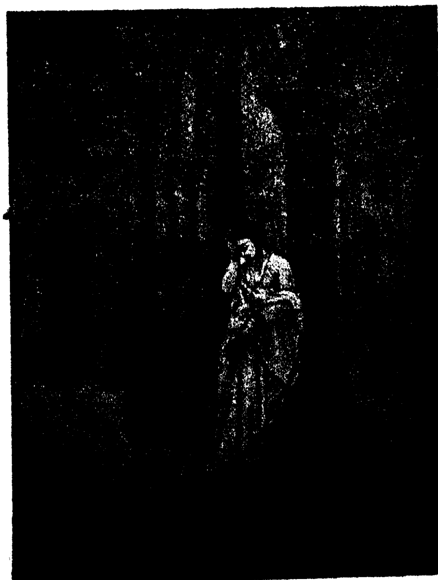
শ্রীতোড়ী



শ্রীরামকিরী



শ্রীবাঙ্গালী



শ্রীগুণকিরী



শ্রীসৈন্ধবী

নানা বিচিত্র ধ্বনির অবতারণা সমগ্র ব্যাপারটিকে যেন উমার্গগামী ক'রেছে। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য গায়কগণ ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমকে একঘেয়ে ও নীরস মনে করে, কারণ তাতে বৈপরীত্য (?) (Contrast) নেই—স্বরবিন্যাসের বৈচিত্র্য এবং আলো ও ছায়ার মত গুরুলঘুর সামঞ্জস্যও তারা লক্ষ্য ক'রতে পারে না। এই সকল কারণে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সভ্যতা ও রসজ্ঞানের পার্থক্য এক দুঃসহ ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে! S. J. Sirkies এই ব্যাপারকে বলেন,—"oppresive monotony of short melodies repeated over and over again." Popely বলেন,—"The European multiplicity of sound in music bewilders Indians who like to elaborate one particular melody to what seems to the west, tedious lengths."

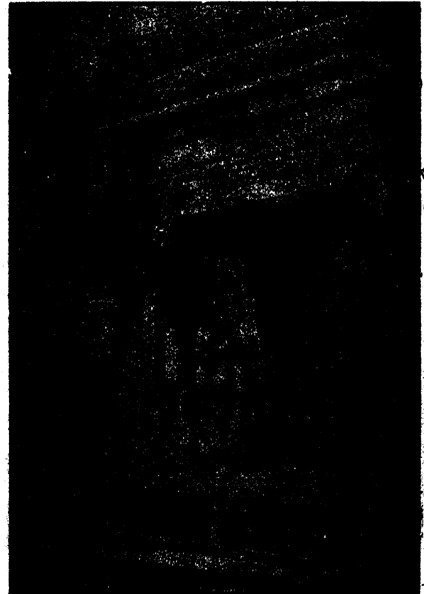


শ্রীপঞ্চম রাগ

য়ুরোপীয় সঙ্গীত কতকগুলি স্বরসমষ্টিকে একসঙ্গেই উপস্থিত করে, এবং তাদের ভিতর



শ্রীদেবকিরী



শ্রীললিতা



শ্রীবিভাষা



শ্রীবড়হংসিকা



শ্রীকর্ণাটী



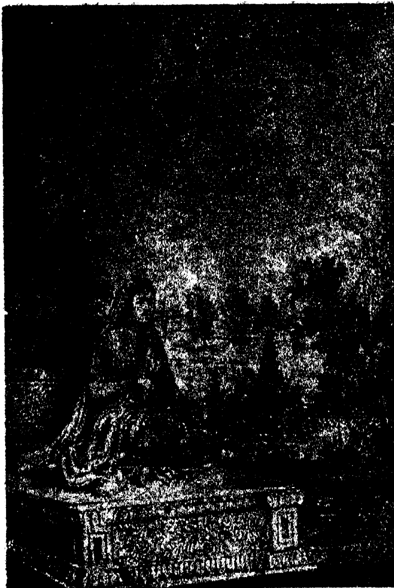
শ্রীআভীরী

কোনটিকে হ্রস্ব, অন্যটিকে গুরু, কোনটি স্পষ্ট, অন্যটি অস্পষ্ট—এরূপ ব্যবস্থায় অগ্রসর হয়। একে ওরা Orchestration বলে। বস্তুতঃ, ওদের সঙ্গীত Chamber music বা গৃহকলা-স্থানীয়, এজন্য বৈচিত্র্যে প্রাধান্য দিয়া ওরা সকলের সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। উত্তেজনা সৃষ্টি করতে হ'লে contrast বা আকস্মিক বিপর্য্যয় উপস্থিত করা হয়, কারণ, এই উপায়ে মানুষের অন্তরে আঘাত করা চলে। বস্তুতঃ, ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্যে চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করা এক কথা, আর একটি সুরের লীলায়িত বিকল্পের সাহায্যে রসসৃষ্টি করা অন্য কথা। ভারতীয় সঙ্গীতসৃষ্টির লক্ষ্য—রস উদ্‌ঘাটন করা—সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করা নয়। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা যেরূপে হয়—মনের ভিতর রসসৃষ্টি সে ভাবে হয় না।



শ্রীমেঘরাগ

ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই চরম লক্ষ্য যেখানে, সেখানে য়ুরোপীয় 'হারমণি' সৃষ্টির প্রয়োজন হ'তে পারে। কোন কোন স্থলে ভারতীয় সৃষ্টিও গমকের ভিতর দিয়ে এই বিপরীত বিধান সঙ্ঘটন করে, কিন্তু সেটা একটা আলঙ্কারিক গৌণ ব্যাপার—মুখ্য অঙ্গ নয়। য়ুরোপীয় সমালোচকগণ



শ্রীমধুমাধবী



শ্রীমল্লারী



শ্রীসোরাটী



শ্রীহরশৃঙ্গারা



শ্রীগান্ধারী



শ্রীসারঙ্গী

এজন্য ভারতীয় কলাকে তুচ্ছ মনে ক'রতে ইতস্তুতঃ করেনি—"It is deplorable that India stands today so far as harmony is concerned where Europe stood in the eleventh century,"—বস্তুতঃ, য়ুরোপীয় সঙ্গীতে আছে বৈপরীত্যের সামঞ্জস্য, ভারতীয় সঙ্গীতে আছে বৈচিত্র্যের সমতান। প্রথমটিতে discord-কেই ভিত্তি ক'রে সঙ্গীত অগ্রসর, দ্বিতীয়টিতে concord-ই হচ্ছে তার মেরুদণ্ডস্থানীয়। এজন্য ভারতীয় সঙ্গীতে শুধু melody হচ্ছে প্রধান ব্যাপার; কিন্তু ওদের সঙ্গীতে harmony সৃষ্টিই মুখ্য।



শ্রীনটনারায়ণ

সঙ্গীতরত্নাকর দুই শ্রেণীর সঙ্গীতের উল্লেখ করেছেন—মার্গ ও দেশী। মার্গ সঙ্গীত সনাতন, এমন কি, অপৌরুষেয়। এ শ্রেণীর সঙ্গীত চিরন্তন ও অবিভাজ্য। বিশিষ্ট দেশ ও কালের গানকে 'দেশী' সঙ্গীত বলা হ'য়েছে—নানা যুগের এসব অভিনব সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রোড়ে স্থান পেয়েছে। কাজেই ভারতীয় কলা বর্জ্জন-নীতির উপর সংরক্ষিত নয়; অনেক ভিন্নদেশী সঙ্গীতকে নিজের অঙ্গীভূত ক'রেই তা' একটা সার্ব্বভৌম পদ্ধতির



শ্রীপহাড়ী



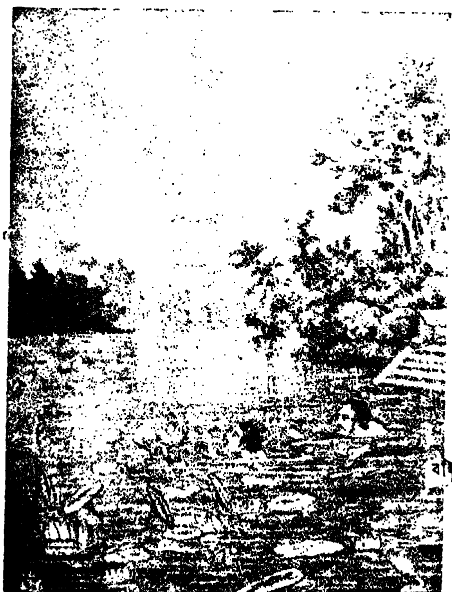
শ্রীদেশী



শ্রীকেদারী



শ্রীনাটিকা



শ্রীকামোদী



শ্রীহাম্বীরী

সৃষ্টি ক'রেছে। কাজেই মুসলমান আমলের পারস্য তানগুলি সহজেই ভারতীয় সঙ্গীতের ভিতর স্থান পেয়েছে। আমির খসরু—আলাউদ্দিনের (১২৯৫—১৩১৬ খৃঃ) সমসাময়িক সঙ্গীতকার। তিনি এদেশে যে কাওয়ালী সঙ্গীতের প্রবর্ত্তন করেন, তা' ভারত ও পারস্য-সঙ্গীত সংমিশ্রণের ফল। তিনি ভারতীয় হিন্দোল রাগ ও পারস্য মোকামের সহযোগে ইমন কল্যাণের সৃষ্টি করেন। তিনি ভারতে নিম্নলিখিত সুরগুলি প্রবর্ত্তন করেন,—ইমন, সরফরদা সাজগিচি, সবানী, গারা, কাফি, সাহনাজ, কাওয়ালি, কাল ওয়ানা, নকস্, গুল ও তারানা। এ যুগটি ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে একটি প্রধান কাল সন্দেহ নেই। কথিত আছে, আমির খসরু বিখ্যাত সঙ্গীতনায়ক গোপালকে গীতবিদ্যায় পরাজিত করেন। পরবর্ত্তী যুগে তানসেন ভারতীয় সঙ্গীতকলাকে এক অভিনব মর্য্যাদা দান করেন। সে ইতিহাসও ভারতীয় সঙ্গীত সৃষ্টির রাজ্যে এক যুগান্তকর ব্যাপার। তানসেন হিন্দু ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মুকুন্দরাম পাঁড়ে এবং তানসেনের নাম ছিল রামতনু। পরে তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণ করেন। তাঁর ভারতীয় গুরু ছিলেন—রামদাস স্বামী। রামদাস স্বামী শুধু গায়কই ছিলেন না, উচ্চ শ্রেণীর সাধকও ছিলেন। তাঁর আরব্য ওস্তাদ (গুরু) ছিলেন—হজরত মহম্মদ গৌস। তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁ ও জামাতা মিশ্রীসিংজি তানসেনের সঙ্গীতকলার গৌরব ও ধারা রক্ষা করেন; সে ধারা আজ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়নি।

'সঙ্গীতরত্নাকর' ভারতীয় সঙ্গীতকলার মুখ্য অঙ্গগুলির সুনিপুণ বিচার ক'রেছে। সেই বিচারই ভারতীয় কলার উপর প্রভূত আলোক-সম্পাত ক'রেছে। পরবর্ত্তী সমগ্র অনুশীলনের ভিত্তিই এই প্রামাণ্য গ্রন্থে নিহিত আছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের আদলা, আশ্রয় ও উপাদান তুরীয় স্তরে নিহিত। নানা ধ্বনির বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্যের সন্ধান মানুষ প্রাকৃতিক আবেষ্টনের (Nature) ভিতর লাভ করেনি। ভারতীয় সঙ্গীতের "নাদ" ব্রহ্মস্থানীয় সঙ্গীত-রত্নাকরের প্রথম স্বরাধ্যায়ের তৃতীয় প্রকরণে ব্যাখ্যাকার কল্লিনাথ শব্দব্রহ্মের আশীর্ব্বাদ কামনা করেন—

"চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং বিবৃতং জগদাত্মনা।
নাদব্রহ্ম তদানন্দমদ্বিতীয়মুপাস্মহে॥"

সঙ্গীতচর্চ্চার উদ্দেশ্য কোন বৈষয়িক ঐশ্বর্য্য মাত্র নয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভই সঙ্গীত-কলার কাম্য—

"তস্য গীতস্য মাহাত্ম্যং কে প্রশংসিতুমীশতে।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামিদমেকৈকসাধনম্।"

৩০শ ১ম প্রকরণ

নাদকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হ'য়েছে, আহত;—অনাহত।

"আহতোঽনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে"। ৩।১

প্রথমটি ধ্বন্যাত্মক—তা' সঙ্গীত নামে পরিচিত; দ্বিতীয়টি বর্ণাত্মক তা' মন্ত্র নামে অভিহিত। প্রথমটি হ'তে ষড়জাদি ধ্বনি এবং দ্বিতীয়টি হ'তে অ হ'তে ক্ষ মাতৃকার উৎপত্তি হ'য়েছে।

য়ুরোপীয় দৃষ্টি সৃষ্টির নানা আধার হ'তে বিচিত্র ধ্বনি সংগ্রহে ব্যস্ত। ভারতীয় দৃষ্টি মানুষের দেহের ভিতরই স্বরসমষ্টি আবিষ্কার ক'রেছে—

"তত্র নাদোপযোগিত্বান্মানুষং দেহমুচ্যতে"

ধ্বনির কেন্দ্র সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে—

"ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতঃ সোঽথ ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরন্।
নাভিহৃৎকণ্ঠমূর্দ্ধাস্যেষ্বাবির্ভাবয়তি ধ্বনিম্॥" ৪।৩।১

এই ভাবে বিশ্লেষণ পথে অগ্রসর হ'য়ে হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞগণ দ্বাবিংশ শ্রুতি আবিষ্কার ক'রেছেন। এই সকল শ্রুতি হ'তে সপ্তস্বর অনুধ্যাত হ'য়েছে।

"শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ স্বরাঃ ষড়্জর্ষভগান্ধারমধ্যমাঃ।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চাথ নিষাদ ইতি সপ্ত তে॥" ২৪।৩।১

এই স্বরগুলির তুলনার জন্যও সঙ্গীতজ্ঞগণ বাহিরের একটি পরিমাপ সৃষ্টি ক'রেছেন। ষড়জ ময়ূরকণ্ঠের মত, ঋষভ চাতকধ্বনির অনুরূপ, গান্ধার ছাগকণ্ঠের সহিত তুলনীয়, মধ্যম বককাকলীপ্রতিম, পঞ্চম কোকিল-কুহুর মত, ধৈবত ভেকের মকধ্বনি তুল্য। নিষাদ হস্তীর বৃংহিত-ধ্বনির অনুরূপ। তির্য্যক্ জাতির কণ্ঠ অপরিবর্ত্তনীয় ব'লেই এরূপ একটি নির্দ্দেশ অবশ্যম্ভাবী হ'য়েছে। নির্দ্দিষ্ট শ্রুতিসংখ্যা-বিশিষ্ট স্বরসমূহের নাম 'গ্রাম', এবং এই স্বরসমূহের ক্রমিক আরোহ ও অবরোহ মূর্চ্ছনা নামে অভিহিত। প্রত্যেক গ্রামের মূর্চ্ছনা সাত প্রকার। ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীই চরম সৃষ্টি। এ সব সৃষ্টির ভিতর লক্ষ্য ক'রবার

বিষয় 'আলাপ', 'গ্রাম', 'ঠাট' তালবিলম্বিত দ্রুত ও মধ্য 'তান' ও 'গমব'। কাজেই দেখা যাচ্ছে, হিন্দু-সঙ্গীতের ভিতর বৈচিত্র্য যথেষ্ট। উপযুক্ত দীক্ষা লাভ ক'রলে হিন্দু-সঙ্গীতে একঘেয়ে কিছুই পাওয়া যাবে না। সারা জীবন ধ'রে সাধনা ক'রেও ওস্তাদেরা ভারতীয় সঙ্গীতে পারদর্শী হয় না। এক দিকে তা' অপৌরুষেয়, অন্য দিকে অসীম।

রাগরাগিণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি উপাখ্যান আছে—একটি শৈব, অন্যটি বৈষ্ণব। শৈব মতে শিবের মুখ হ'তে পাঁচটি, এবং গৌরীর মুখ থেকে একটি—মোট এই ছয়টি রাগ আছে, এবং আনুসঙ্গিক রাগিণীও আছে ছত্রিশটি। বৈষ্ণব মতে—ষোল হাজার গোপিনী হ'তে ষোল হাজার রাগিণীর সৃষ্টি!

শিবের অঘোর মুখ হ'তে ভৈরব রাগ, সদ্যোজাত মুখ হ'তে শ্রীরাগ, বামদেব মুখ হ'তে বসন্তরাগ, তৎপুরুষ মুখ হ'তে পঞ্চম রাগ, ঈশাণ মুখ হ'তে মেঘ-রাগের উৎপত্তি। গৌরীর মুখ হ'তে নটনারায়ণ রাগ উৎপন্ন হ'য়েছে।

উত্তর-ভারতের সহিত দক্ষিণ-ভারতের এ বিষয়ে সাদৃশ্য কম। যদিও উভয়তঃ কয়েকটি রাগের অভিন্ন রূপ দেখা যায়, তবুও এ সম্বন্ধে ধারণা ও তত্ত্ব সম্পূর্ণ পৃথক। দক্ষিণ-ভারতে জনক মেল হ'তে জন্য রাগের উৎপত্তি কল্পিত হ'য়েছে। প্রধান ছত্রিশটি রাগের ভিতর 'হনুমটোড়ী' 'মায়ামালবগৌল' 'ভৈরব' 'ক্ষরহরপ্রিয়া' (কাফি) প্রকৃষ্ট। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাগের সংখ্যা বহু; বস্তুতঃ, এ রকমের প্রায় আট শত রাগ দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতকলায় ব্যবহৃত হয়।

এ সমস্ত রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য রস উদ্ঘাটন। কোন কোন রাগে সাদৃশ্য থাকলেও বিভিন্ন ঋতু, প্রহর ও দিনে এই দুই জায়গায় সে সব ব্যবহৃত হয়।

উত্তর-ভারতের রাগের নাম হ'চ্ছে—ভৈরব, শ্রী, বসন্ত (মালকোষ) পঞ্চম (হিন্দোল) মেঘ ও নটনারায়ণ বা (দীপক)। এর এক একটির রসোৎপাদক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রকার; এবং এজন্য এ সমস্ত রাগাদি গান করবার সময়ও বিভিন্ন। মহাদেবের অঘোর মুখ হ'তে উৎপন্ন ব'লে ভৈরব রাগে ভয়ঙ্করত্ব আছে। ভৈরব রাগের আলাপের ঋতু হচ্ছে গ্রীষ্ম; মেঘ রাগ বর্ষা ঋতুর উপযোগী, শ্রীরাগ শীতের ঋতুর যোগ্য, পঞ্চম রাগ শরতের এবং নটনারায়ণ হেমন্তের উপযোগী। 'গীতদর্পণে' আছে,

> শ্রীরাগো রাগিণীযুক্তঃ শিশিরে গীয়তে বুধৈঃ।
> বসন্তঃ সসহায়স্তু বসন্তর্ত্তৌ প্রগীয়তে॥
> ভৈরবঃ সসহায়স্তু ঋতৌ গ্রীষ্মে প্রগীয়তে।
> পঞ্চমস্তু তথা গেয়ো রাগিণ্যা সহ শারদে॥
> মেঘরাগো রাগিণীভির্যুক্তো বর্ষাসু গীয়তে।
> নটনারায়ণো রাগো রাগিণ্যা সহ হেমকে।
> যথেচ্ছয়া বা গাতব্যাঃ সর্ব্বর্ত্তুষু সুখপ্রদাঃ॥ ৩০॥

ঋতুরাগ ছাড়া রাগবেলাও একটি মুখ্য বিষয়। 'সঙ্গীত-দর্পণে' আছে,—

> "মধুমাধবী দেশাখ্যা ভূপালী ভৈরবী তথা।
> বেলাবলী চ মল্লারী বল্লারী সোমগুর্জ্জরী॥
> ধানশ্রী মালবশ্রীশ্চ মেঘরাগশ্চ পঞ্চমঃ।
> দেশকারী ভৈরবশ্চ ললিতা চ বসন্তকঃ।
> এতে রাগাঃ প্রগীয়ন্তে প্রাতরারভ্য নিত্যশঃ।"

এই ভাবে গুর্জ্জরী, কৌষিকী প্রভৃতির শ্রেণী প্রথম প্রহরের পরে গাইবার ব্যবস্থা আছে; ভৈরবী, টৌড়িকা প্রভৃতির শ্রেণীকে গান ক'রতে হয়—দ্বিতীয় প্রহরের পর। শ্রী, মালবী ও গৌরী প্রভৃতির শ্রেণীকে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত গান করাই প্রশস্ত ব'লে বিবেচিত হ'য়েছে। তবে রাজাজ্ঞা অনুসারে সকল গানই, সব সময় করা যেতে পারে।

> "যথোক্তকাল এবৈতে গেয়া পূর্ব্ববিধানতঃ।
> রাজাজ্ঞয়া সদা গেয়া ন তু কালং বিচারয়েৎ॥"

এ সমস্ত ঋতু ও কালের আবেষ্টনের ভিতর রাগ-রাগিণীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বস্তুতঃ, কিছু উত্তেজনা সঞ্চার করা বা নূতনত্বের নেশায় সাময়িক ভাবে আবিষ্ট ক'রবার চেষ্টা ভারতীয় সঙ্গীতে নেই। ভারতীয় সঙ্গীতের যে রসসৃষ্টি লক্ষ্য, তা' কোন বিশেষ কাল বা স্থানের নয়। যত দিন মানব জাতির অস্তিত্ব থাকবে, তত দিনই করুণ, শৃঙ্গার, হাস্য ও বীভৎসাদি রসে মানবসমাজ ওতঃপ্রোত থাকবে; এ জন্য সাময়িক কোন সচলতাকে বা নূতনত্বের কোন ভেল্‌কিকে ভারতীয় সঙ্গীত গ্রহণ করেনি। শ্রীরাগে প্রেমের উৎপত্তি হয়, বসন্ত আনন্দের সঙ্গে জড়িত,

ভৈরবরাগ সন্ন্যাস, অনাসক্তি ও ভক্তি ভাবের উদ্রেক করে; পঞ্চম রাগ বিরহের নির্জ্জন নিস্তব্ধতাকে আহ্বান করে; প্রশান্ত নিশীথে এই রাগের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয়। আনন্দ আশা ও সুখ-স্বপ্নে হৃদয় পূর্ণ করে,—মেঘরাগের প্রভাব। নটনারায়ণ সাহস ও বীরত্বের দ্যোতক। এ-সব ভাব ও রসশ্রী সকলের উপলব্ধির জন্য চিত্রার্পিত হ'য়েছে। দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গীতকলাও এরূপ রূপদর্শন সম্ভবপর ক'রেছে। টোড়ি ও ভৈরবী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ পিলে বলেন,—

"They are associated with majesty and impression like the march of stately king decked in all his regal glory and spreading the pomp and circumstance of his lofty position—a grand and sublime spectacle."

রাগরাগিণীর ধ্যানমূর্ত্তি এই ভাবে ভারতের সর্ব্বত্র কল্পিত হ'য়ে যা অদৃশ্য, কল্পনায় যার অধিষ্ঠান—তাকে বাহ্য দৃষ্টিগোচরে এনেছে। সঙ্গীতদর্পণে ভৈরব রাগের যে ধ্যানমূর্ত্তি কল্পিত হ'য়েছে, তার উল্লেখ করলেই এ-বিষয়ের একটা সুস্পষ্ট ধারণা হবে,—

"গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ
সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।
ভাস্বৎত্রিশূলকর এব নৃমুণ্ডধারী
শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব আদিরাগঃ।"

ভৈরবের রাগিণী ভৈরবীর যে ধ্যানমূর্ত্তি দেওয়া হ'য়েছে তা' এই,—

"স্ফটিকরচিতপীঠে রম্যকৈলাসশৃঙ্গে
বিকচকমলপত্রৈরর্চ্চয়ন্তী মহেশম।
করধৃতঘনবাদ্যা পীতবর্ণায়তাক্ষী
সুরুচিভিরিয়মুক্তা ভৈরবী ভৈরবস্ত্রী॥"

ভৈরবের অন্যান্য রাগিণীর নাম—গুর্জ্জরী, রামকিরী, গুণকিরী, বাঙ্গালী ও সৈন্ধবী। অন্যান্য রাগিণীগুলির নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

শ্রীর রাগিণী :—মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী ও পাহাড়িকা।

বসন্তের রাগিণী :—দেবকিরী, বরাটি, তোড়িকা, [illegible], হিন্দোল।

পঞ্চমের রাগিণী :—বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়-হংসিকা, মালবী, পটমঞ্জরী।

মেঘের রাগিণী :—মল্লারী, সৌরবী, সাবেরী, কৌলীকা, গান্ধারী, হরশৃঙ্গারী।

নটনারায়ণের :—কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, সারঙ্গী, নটহাম্বীরা।

এই সমস্ত রাগ ও রাগিণীর মূর্ত্তির কল্পনা করা হ'য়েছে। ভৈরবরাগের মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ ক'রেছি। শ্রীরাগের কল্পনা বিপরীত।—শরীর দিব্য, [illegible] বসনে সুশোভিত, প্রমোদকাননে স্ত্রীগণের সহিত পুষ্পচয়নে রত।

তোড়ীর কল্পনা এইরূপ,—শুভ্র তুষারকল্প দেহ, শ্বেত কাশ্মীরী কর্পূরে দেহ প্রলিপ্ত। বীণা-বাদন দ্বারা মৃগ-যূথকে বিমোহিত ক'রছে।

এই সমস্ত রাগিণীমূর্ত্তি ভারতীয় চিত্রকলার সম্পদস্বরূপ। রাগরাগিণীর রচনা রাজপুত চিত্রকলার একটি প্রধান রসক্ষেত্র। মোগল-চিত্রশিল্পও সহজ, এ সমস্ত কল্পনার আলবালে তা' জলসিঞ্চন ক'রেছে। বস্তুতঃ, মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ, রাধা প্রভৃতিও অনেক সময় এই সকল রাগিণীচিত্রের বিষয়রূপে ব্যবহৃত হ'য়েছেন।

তানসেনের দীপক-রাগ গানের প্রসিদ্ধি আছে। ভারতীয় সঙ্গীত ভারতীয় সংস্কার মনে ক'রে মনের ভিতর যেমন রসসৃষ্টি ক'রতে সক্ষম, তেমনই প্রকৃতির ভিতরও তা' বিপর্য্যয় উপস্থিত ক'রতে পারে। কথিত আছে—তানসেনের শত্রুরা তানসেনকে জব্দ ক'রবার মতলবে এক কৌশল অবলম্বন করে। তারা বাদশাহকে অনুরোধ করে—তানসেনকে যেন দীপক রাগিণী গান ক'রতে আদেশ করা হয়। বাদশাহ তানসেনকে সেই আদেশই ক'রলেন। তানসেন নিজের বিপদ বুঝতে পারলেন, কারণ, তিনি জানতেন, এই গানের প্রভাবে অগ্নির উৎপত্তি হ'লে, সেই আগুনে তাঁর পুড়ে মরবার আশঙ্কা ছিল। [illegible] তানসেন ভেবে-চিন্তে এজন্য বাদশাহের নিকট পনের দিনের সময় প্রার্থনা করলেন। এদিকে তিনি বাদশাহের দরবার থেকে নিজের বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়ে, তাঁর কন্যা সরস্বতী দেবী ও হরিদাসের শিষ্যা রূপবতীকে মেঘরাগ শিক্ষা দিলেন। এক দিকে আগুন যখন দাউ-দাউ

ম... মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার প্রধান সচিব মিষ্টার ফজলুল হককে এক প্রশ্ন করিয়া, গত বৎসর ফাল্গুন মাসের শেষে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে মিষ্টার হক লিখিয়াছিলেন যে, তিনি হিন্দুদিগকে এই বিষয়ে যথাসম্ভব সুবিধা করিয়া দিতে উৎসুক এবং তিনি অতি শীঘ্র তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। কিন্তু মহাসচিবের উত্তর দিবার ফুরসৎ হয় নাই! অগত্যা সার মন্মথনাথ আবার একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে মন্মথবাবু এই মর্ম্মে এক পত্র পাইলেন:—"স্বরাষ্ট্রসচিব এবং চীফ সেক্রেটারী এখন কলিকাতায় নাই, আপনার পত্রে যে সকল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার উত্তর আমি গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিবামাত্র আমি আপনাকে সরকারের মত জানাইব।" এ উত্তরও মন্মথবাবু প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে পাইয়াছেন। তদবধি মিষ্টার হক আর কোন উত্তর দেন নাই। স্বরাষ্ট্রসচিব ও প্রধান সেক্রেটারী ত কলিকাতা হইতে অগস্ত্য যাত্রা করেন নাই, তাঁহারা ত বহুদিন পূর্ব্বেই ফিরিয়াছেন। আসল কথা, যুক্তিযুক্ত জবাব গড়িয়া তোলাই কঠিন। অতএব মন্মথবাবুকে নিষ্ফল প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতে হইবে। দুর্গাপূজা আসন্ন, বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রার বাদ্যধ্বনিতে আবার কোথাও না বিভ্রাট বাধে।

——

দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা

গত ১৪ই ভাদ্র কলিকাতায় গড়ের মাঠে কার্জ্জন বাগানে, বাঙ্গালার স্বনামধন্য বাগ্মী—দেশাত্মবোধের উন্মেষকারী সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালার রাজনীতিক ইতিহাসে সার সুরেন্দ্রনাথের স্থান যে অতি উচ্চে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এত দিন পরে যে বাঙ্গালায় তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল,—ইহাতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই। সার তেজবাহাদুর সপ্রু এই মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সকল সম্প্রদায়ই এই মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুত মদনমোহন মালব্য এবং বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ এই অনুষ্ঠানের সহিত পূর্ণ সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সার তেজবাহাদুর সপ্রু বলিয়াছেন,—"সার সুরেন্দ্রনাথ ভারতবাসীকে যে মহামূল্য সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন তাহা, দেশের সেবায় কি ভাবে আত্মনিবেদন করিতে হয়,—কি ভাবে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়,—কি ভাবে জনসাধারণের মধ্যে ভেদবুদ্ধি অপসারিত করিতে হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত।" কথা সম্পূর্ণ সত্য। প্রকৃত রাজনীতিকের যে সকল গুণ থাকা অত্যাবশ্যক, তাহা তাঁহাতে সমস্তই ছিল। তিনি মহৎ ও উদার ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় ভাব উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সত্য বটে, তিনি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনকেই তাঁহার রাজনীতিক প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে স্বাধীনতা চাহিতেন না, তাহা নহে। তিনি বলিতেন, স্বাধীন হইবার মত শক্তি অর্জ্জন কর, স্বাধীন হ[illegible] স্বাধীনতা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। উহা লাভ[illegible] মত শক্তিস[illegible] প্রয়োজন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁহার [illegible] যে, আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান [illegible] অতি বড় তিনিও সুরেন্দ্রনাথের নিকট সম্মানের সহিত নতি স্বী[কার] করিতে গর্ব্বানুভব করেন। তিনিই আমাদিগের প্রকৃত জাতী[য়তা] বুদ্ধি জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সে জাতীয়তা বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা বুদ্ধি নহে। তাহা আপনাকে বড় বড় দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখে না,—সে জাতীয় বুদ্ধি মহত্বের এবং নির্ভীকের স্বদেশপ্রেমে উদ্ভাসিত।" সার তেজ বাহাদুর স্বীকার করিয়াছেন যে, সুরেন্দ্রনাথই তাঁহার রাজনীতিক জীবনের শিক্ষাগুরু। সে কথা বর্ত্তমান যুগের অনেক বড় বড় রাজনীতিকই স্বীকার করেন। তাহার মূর্ত্তিটি ঠিক তাঁহার দেহের দৈর্ঘ্যানুরূপই হইয়াছে। তিনি যেরূপ ভাবে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন, উহা সেইরূপ ভাবের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি।

——

রবীন্দ্র-স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৪ই ভাদ্র হাবড়া টাউনহলে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পবিত্র স্মৃতিরক্ষাকল্পে এক মহতী জনসভা হইয়াছিল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই সভায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নিজে একজন কবি। তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা শুনিবার আগ্রহে এবং শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য সভায় বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে,"রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মময় জীবনের—সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার যদি বিচার করা যায়,—তাঁহাকে যদি কবি হিসাবে, সাহিত্যসাধক হিসাবে, শিক্ষক হিসাবে, দার্শনিক হিসাবে, পর্য্যটক হিসাবে পুনরভ্যুত্থিত ভারতের প্রতীক হিসাবে বিচার করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়, রবীন্দ্রনাথ যে পূর্ণ মানব ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।" রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীকে সর্ব্ববিধ সামাজিক এবং রাজনীতিক বন্ধন মুক্ত করিবার জন্য আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতের একজন জীবন্ত প্রতীক। শ্রীমতী নাইডু পৃথিবীর যেখানেই গিয়াছেন, সেইখানেই কবিবরের নাম শুনিয়াছেন। বুডাপেষ্টের হাসপাতালে রোগীরা বিশ্বকবির পুস্তকের তর্জ্জমা পড়িত,—স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় নরওয়ের পর্ব্বতের সম্মুখদেশে, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণীতে, কানাডায়, আমেরিকায়, এমন কি, তিনি পূর্ব্ব-আফ্রিকার অসভ্য লোকসমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তি বিভাসিত দেখিয়াছেন। তাঁহার একজন ইংরেজ বন্ধু কবি ইয়েটস গীতাঞ্জলি পড়িয়া যেন পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, উহাতে স্মৃতিহীন এবং আত্মহারা য়ুরোপের জন্য একটি বাণী আছে। রবীন্দ্রনাথ প্রদীপ্ত নক্ষত্রের ন্যায় তাঁহার প্রতিভার জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সমস্ত ভারতবাসীকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন। মিষ্টার মণ্টে[গু] ভারতে আসিয়া জঙ্গলী জাতি কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের গান গাও[য়া] হইতেছে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইহজীবনে যে[রূপ] সকলের শ্রদ্ধা, ভক্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তেমন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

——

পুণায় ধীরপন্থীদিগের সভা

গত ৯ই এবং ১০ই ভাদ্র পুণা সহরে বে-দল নায়কদিগের [illegible] ফেডারেশনের এক সভা বসিয়াছিল। এই স[illegible]

[illegible] বাছে। (১)

সামরিক বিভাগের ভার অর্পণ করিতে হইবে। (২) ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে হইবে এবং ভারতবাসীকে বৃটেনবাসী ও উপনিবেশবাসীদিগের সমান মনে করিতে হইবে। আর একটি প্রস্তাব এই ছিল যে, প্রদেশগুলিতে বে-সরকারী পরামর্শদাতা লইতে হইবে। বিষয়-নির্ব্বাচক সমিতি প্রস্তাবটি পরিত্যাগ করাতে উহা আর গৃহীত হয় নাই। এখন দেখা যাইতেছে যে, শাসন-পরিষদের কলেবর বৃদ্ধির ব্যবস্থায় মডারেটরাও সন্তুষ্ট হন নাই।

কথায় কাজে খেলাপ

সার জর্জ আরুণ্ডেল বলিয়াছেন যে, "তিনি বড় লাটের শাসন পরিষদের বিস্তৃতি সাধনের এবং জাতীয় দেশরক্ষা সমিতি গঠনের সমর্থন করেন না। তাহার কারণ, এই উভয় কার্য্যের মধ্যে কোন কার্য্য দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলনের সহায়তা করা হয় নাই। যাঁহারা এই দুই পরিষদে পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি এরূপ সর্ত্ত করিতেন যে, বৃটিশ সরকার যদি ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট পরিচায়ক কোন কাজ করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা পদগ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে ভাল হইত! ডক্টর আরুণ্ডেলের কথা খুবই সত্য। কিন্তু যেরূপ দেশাত্মবোধ থাকিলে ঐ কথা লোক বলিতে পারে, সেরূপ দেশাত্মবোধ ইঁহাদের কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না। শাসন পরিষদের বিস্তৃতি সাধন বা দেশরক্ষা সমিতির গঠন দ্বারা যে সরকার ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার পথে ভারতবাসীকে এক চুলও অগ্রসর করেন নাই, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাজনীতিক আসরে নামিয়া গলাবাজী করিবার সাধ অনেকের থাকে। কিন্তু রাজনীতি বুঝিবার এবং রাজনীতিক হইবার মত দেশাত্মবোধ অতি অল্প লোকেরই আছে। ডক্টর আরুণ্ডেল আর একটা কথা যথার্থ ভাবে বলিয়াছেন। মোসলেম লীগের যে দুই জন প্রধান-সচিব মিষ্টার জিন্নার নির্দ্দেশে দেশরক্ষা সমিতির পদত্যাগ করিয়াছেন, ডক্টর আরুণ্ডেল তাঁহাদের কাজে দোষ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ দুই জন সচিবের পদত্যাগ যে অন্যায় এবং অসঙ্গত হইয়াছে, তাহা নহে,—পরন্তু ইহাতে ইহাই বেশ বুঝা যায় যে, ইঁহারা মনে করেন যে, ইঁহারা অগ্রে মুসলমান এবং পরে ভারতবাসী, অর্থাৎ তাঁহারা মনে করেন যে, মুসলমানদিগের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহারা ভারতের অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন করিতেও পারেন; উঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে তাঁহারা ইতস্ততঃ করিবেন না। আমরা এই উপলক্ষে পঞ্জাবের প্রধান সচিব সার সিকান্দর হায়াৎ খাঁর কথায় এবং কাজে এইরূপ অসামঞ্জস্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বহু বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বৃটিশ সরকারের এই সমর-প্রচেষ্টায় সকল ভারতবাসীরই সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করা উচিত। এখন কেবল মাত্র মিষ্টার জিন্নার এক হুমকিতে তাঁহার সেই গালভরা কথা কোথায় গেল? তিনি স্বয়ংই জাতীয় দেশরক্ষা সমিতির পদত্যাগ করিলেন! অর্থাৎ তিনি বৃটিশ সমর-চেষ্টায় সহায়তা ...ত সম্মত হইয়া মিষ্টার জিন্নার কথায় সে চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি পাকিস্থানের বিরোধিতা ...-ছিলেন। এখন তিনি মিষ্টার জিন্নার এতদূর ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, অবিচারিত ভাবে তিনি তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনা তাঁহার পদে সমর্পণ করিলেন। ইঁহার পদত্যাগ পাকা কি না, সে বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে। সরকার বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে মুসলমান বলিয়া জাতীয় দেশরক্ষা সমিতিতে গ্রহণ করা হয় নাই, প্রধান-মন্ত্রী বলিয়াই ঐ সমিতিতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে এখন কি তাঁহারা মতের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রধান-সচিবের পদ ত্যাগ করিবেন? আর মিষ্টার ফজলুল হক যে বাঙ্গালার প্রধান সচিবত্ব ত্যাগ করিবেন, ইহা দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সম্মাননা

২০শে ভাদ্র আশুতোষ হলে, সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বাঙ্গালার সাহিত্যসেবিগণ সম্মিলিত হইয়া, তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা—সম্মাননা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ—ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্বর্দ্ধনা সভার উদ্বোধন করেন। সম্বর্দ্ধনা সমিতির পক্ষ হইতে চৌধুরী মহাশয়কে রৌপ্যাধারে এক সহস্র টাকা ও একখানি মানপত্র প্রদত্ত হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজে সহাধ্যায়ী ছিলাম। তখন হইতেই অবসর বিনোদনের সময় চৌধুরী মহাশয় লাইব্রেরীতে যাইয়া জ্ঞানভাণ্ডার হইতে মধুসঞ্চয় করিতেন। কিন্তু তখন এক দিনও ভাবিতে পারি নাই যে, ইনি পরে 'বীরবল'রূপে আত্ম প্রকাশ করিবেন। লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষা লইয়া তখনকার যুগে একটা বাক্‌বিতণ্ডা চলিত। অনেকেরই ধারণা ছিল, লিখিত ভাষা হইতে কথিত ভাষাকে স্বতন্ত্র করিতে হইবে। বাক্‌বিতণ্ডার যে যুদ্ধ চলিত, তাহার সম্মুখে প্রমথ চৌধুরীমহাশয় অগ্রসর হইলেন। তিনি পথ-প্রদর্শক হইয়া গল্পে ও প্রবন্ধে চলতি ভাষার মধুরতা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর তিনি কত প্রবন্ধ, গল্প অন্তর্ভেদী সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতির দিক দিয়া তাহা অক্ষয় সংগ্রহ।" সম্বর্দ্ধনার উত্তরদান প্রসঙ্গে চৌধুরীমহাশয় বলেন, "আমার সুনাম এবং দুর্নাম আছে যে, আমি বাঙ্গালায় মৌখিক ভাষাকে লিখিত ভাষায় প্রমোশন দিয়েছি। যা কাণের বিষয়, তাকে চোখের বিষয়ে রূপান্তরিত করেছি।...অনুকূল কি প্রতিকূল কোন সমালোচকই আমার লেখা কোনো দিন উপেক্ষা করেননি। প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টিই হোক আর নিন্দার শিলাবৃষ্টিই হোক, উভয়কেই আমি শিরোধার্য্য করেছি।" পরিশেষে তিনি বলেন, "সাহিত্য সাধনায় যিনি আমার উত্তর-সাধক ছিলেন, যাঁর মাভৈ বাণী আমাকে সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর করেছে, সেই রবীন্দ্রনাথ আজ নেই।"...তাঁহার মত স্বনাম-ধন্য প্রবীণ সাহিত্য-সাধকের সম্মাননায় আমরা বিশেষ আনন্দিত। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন—তাঁহার প্রতিভার দানে বঙ্গ-সাহিত্য সমৃ...ক।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
...র ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হ'য়ে জ্বলে উঠবে ; তখন তার প্রতিরোধের জন্য তিনি নিজের ঘরে এই ভাবে মেঘরাগ-গানের ব্যবস্থা ক'রে রাখলেন। তার পর যে দিন তিনি বাদশাহের দরবারে দীপক গান ক'রলেন, সেই দিন তাঁর নিজের ঘরে মেঘরাগ রাগের গান গাওয়া হ'ল। তানসেনের গানে দরবারের সব আলো একসঙ্গে দপ্ ক'রে জ্বলে উঠ্‌লো, আর দরবার-ঘরও দাউ-দাউ ক'রে অগ্নিরাশিতে আচ্ছন্ন হ'ল। আত্মরক্ষার জন্য বাদশাহ ও আমীর ওমরাহেরা দরবার-কক্ষ হ'তে নিজ নিজ বাসগৃহে পলায়ন ক'রলেন। এদিকে মেঘরাগ-গানের ফলে সহসা দিল্লী নগরী নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হ'ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বারিবর্ষণ! সেই প্রবল ধারায় অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত হ'ল এবং তানসেনের দগ্ধ কলেবর সেই বর্ষণে শীতল হওয়ায় তাঁর প্রাণরক্ষা হ'ল।

ভারতীয় সঙ্গীতের বিধানে এই অঘটন-ঘটন-পটুত্ব স্বীকৃত হ'য়েছে। Mr. H. A. Popely তাঁর রচিত গ্রন্থে আর একটি গল্প লিখেছেন,—"Once the celebrated Tansen was ordered by the Emperor to sing a night Raga at noon. As he sang darkness came down on the place where he stood and spread around as far as the sound reached."

তানসেনের ধারা এই সমস্ত রাগরাগিণীকে উচ্চতর মর্য্যাদা দান করে। প্রাচীন রাগ হ'তে আরও নূতন নূতন রাগের সৃষ্টি হয়। রাগরাগিণীর আলাপে ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতির কাঠামো স্থিরীকরণ বিষয়েও হিন্দুস্থানী সঙ্গীত অদ্বিতীয় ছিল। দক্ষিণ-ভারতে এরূপ রীতি প্রচলিত নেই। ধ্রুপদের দ্রুত, বিলম্বিত ও মধ্য গীত আছে। তানসেনী প্রভাব তা'তে চারিটি বাণী স্থির করে ; ডাগর, খাণ্ডার, গৌড়ী ও নোহার বাণী। ধ্রুপদ শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়না। ভক্তিসঙ্গীত, সাধু, ফকির বা বাদশাহের কীর্ত্তি বা স্তুতি ধ্রুপদের বিষয়। বস্তুতঃ, উচ্চশ্রেণীর সকল সঙ্গীতের ভিত্তিই ধ্রুপদে নিহিত

রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের
বহু ব্যয়ে অঙ্কিত চিত্রের প্রতিচ্ছবি

ওস্তাদেরা বিকৃত ভাবে ধ্রুপদ গায় ব'লেই জিনিসটির প্রকৃত মূল্য কম নয়। সঙ্গীতের চার বাণীর ভিতর গৌড়ীয় বাণীকে রাজার স্থান, ডাগর বাণীকে মন্ত্রীর স্থান, খাণ্ডার বাণীকে সেনাপতির স্থান, ও নোহার বাণীকে ভৃত্যের স্থান দেওয়া হ'য়েছে। রাগরাগিণীগুলি এক সময় যান্ত্রিক ও মৌখিক দুই উপায়েই গাওয়া হ'ত। তানসেনের বংশধরেরা দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে রবাবীয়া ও বীণকর নাম ধারণ করে। রবাবীয়া তানসেনের উদ্ভাবিত রবাব যন্ত্র ও বীণকরেরা বীণা ব্যবহার ক'রতো। ওস্তাদ মহম্মদ ওয়াজীর খাঁ বীণকরদের ধারা বহন করেন ; ওস্তাদ মহম্মদ আলী খাঁ রবাবীদের প্রতিনিধি হ'য়ে সেই ধারা বাহাল রাখেন। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে (১২৯৫—১৩১৬ খৃঃ) আমীর খসরু সেতারের প্রবর্ত্তন করে। পারস্য ভাষায় সহ শব্দের অর্থ তিন—তিন তার ব'লে সহ্‌তার সেতার নাম পেয়েছে।

মুসলমান আমলে নূতন নূতন রাগের সৃষ্টি হ'য়েছে। কথিত আছে, তানসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য অনেকেই প্রার্থী হয়। তানসেন এই আদেশ করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর মৃতদেহকে মাঝে রেখে একে গুণীই একে একে গান ক'রবে। যাঁর গানে তাঁর ডান হাত উঁচু হ'য়ে উঠবে, তারই বংশে সঙ্গীত-সাধনা প্রবর্ত্তিত হ'বে।

মৃত্যুর পর সকলেই শেষ দৃশ্য দেখতে এলে—কথিত আছে, এক জন য়ুরোপীয়ও সেই স্থলে উপস্থিত হয়। কারো গানে মৃত ব্যক্তির হাত উঁচু হ'ল না। অবশেষে তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁ তোড়ি রাগিণীর একটি ধ্রুপদ গাইলেন। সেই গানটির প্রথম ছত্র এই,—"কোন্ ভ্রম ভুলোরে মন অজ্ঞানী!" গানের সঙ্গে সঙ্গেই মৃতের দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে উঠলো। এই তোড়ী বিলাসখানি তোড়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছে। তখন তানসেনের সঙ্গীত-বিদ্যার উত্তরাধিকারী ব'লে বিলাস খাঁকেই সকলে বরণ ক'রলেন।

শ্রীঃ

রাগরাগিণীর-লেখমালা

শ্রীরাগ

লীলা বিলসনে কেলি কুঞ্জবনে
কুসুম-চয়নে প্রমদাসনে,
বিলাস সুন্দর, বর মূর্ত্তিধর
শ্রীরাগ মাধুরী কবীন্দ্র ভণে।

শ্রীমালবশ্রী

ললিত কোমল করে নব রক্তোৎপল
প্রেমচিন্তাবিভাবিতা ক্ষীণ তনু-লতা,
মালবশ্রী চূততলে নিষণ্ণা উজ্জ্বল,
মৃদুহাস্যে মুখপদ্মে কত কোমলতা।

শ্রীত্রিবণী

অম্ভোরসে সুমসৃণ রম্ভাবীথিতলে
নব গোরোচনা গৌরী ত্রিবণী সুন্দরী
তারা-ধারা-কারা চারু হারাবলি গলে
কান্তসহ কান্তিরূপা মাধুরী বল্লরী।

শ্রীগৌরী

মালিকা চন্দন-পঙ্কে চারু চিত্রাঙ্কিতা,
পূর্ণেন্দুবদনা গৌরী সুভগারূপসী
চন্দ্রক চিত্রিতা-শুদ্ধা-বর-বেশান্বিতা,
গজমতি হার কণ্ঠে উঠিছে ঝলসি।

শ্রীবরাটী

দয়িতার বিনোদনে নিপুণা সুকেশী,
কঙ্কণ নিক্বন নীত চামর চালনে
মন্দার-মঞ্জরী কর্ণে বরাটী সুবেশী
বরাঙ্গনা বরবর্ণা কানন-ভবনে।

শ্রীভূপালী

প্রেমমদাকুল দৃষ্টি লীলা উল্লসিতা,
পুষ্পক্ষেপে আকুলিত করিছে নায়কে—
ভূপালিকা বর-বামা কবীন্দ্র-বন্দিতা
আপনি জর্জ্জর বামা কুসুম-শায়কে।

শ্রীকল্যাণী

কান্ত-অনুরাগবতী মৃদুভারযুতা
কটাক্ষ-ক্ষেপণ-দক্ষ হরিণলোচনা,
মৃদু গৌরীতনুলতা দশন মুকুতা,
নট-পটু নায়কের বিলাস-লোভনা।

শ্রীবসন্তরাগ

চূতাঙ্কুর-কর্ণিকারে শোভে শ্রুতিমূল
স্বর্ণকান্তি বরতনু, যুবতীর প্রিয়।
অরুণ-নয়ন-পদ্ম, কটাক্ষ আকুল
পীতাম্বরে বসন্তের রতি রমণীয়।

শ্রীহিন্দোলী

কৌমুদী-কোমল দৃষ্টি কান্তের আননে
মুকুতা কপোত-কান্তি কান্তা কৃশতনু
কলকণ্ঠী হিন্দোলিকা কন্দর্পের ধনু
ভাবশুদ্ধা প্রেমমত্তা প্রণয়-কূজনে।

শ্রীগুর্জ্জরী

মৃদুল পল্লবমাঝে নিষণ্ণা গুর্জ্জরী
শ্যামদ্যুতিমতী কান্তা মনোজ মধুরা,
চিত্রা পুষ্পাঙ্কিতা শয্যা রভস-বল্লরী
প্রিয়া-সঙ্গ-অভিলাষ সঙ্কেত-চতুরা।

শ্রীমালবী

বিবশা ধূসরা পতি-বিরহ-বিধুরা,
চির-প্রিয়-মুখধ্যানে বিনিদ্র-নয়না
স্ফুট গৌর তনু কান্তি প্রেম-রাগপূরা
মালবিকা ধূলিলগ্না অশ্রুপূর্ণেক্ষণা।

শ্রীপটমঞ্জরী

আত্মনেত্রে-অশ্রুস্নাতা প্রিয়ধ্যানরতা।
পতির বিরহ-দুঃখে অবনতমুখী,
মুহুঃশ্বাস কম্পিতাঙ্গে প্রণয়-দীনতা,
পট-মঞ্জরীর প্রেম দিব্য অহৈতুকী।

শ্রীসাবেরী

গজেন্দ্র মৌক্তিকদামে মণ্ডিতা যুবতী
চিত্র চীনাংশুকবদ্ধ ভূষণ-ঝঙ্কৃতা
পদ্মপাণি স্মরস্মের রঞ্জিতা মূরতি
গৌরবশ্রী সাবেরীর বপু অলঙ্কৃতা।

শ্রীকৌশিকী

নায়ক-বিচ্ছেদ-ভীরু প্রেমারুণেক্ষণা
লীলালোল-তনুলতা দয়িতার দেহে
স্বেদাঙ্কিতা মুখ-ইন্দু কৌশিকী-শোভনা
ভ্রমিছে চপল পদে আনন্দে-সন্দেহে।

শ্রীভৈরব রাগ

গঙ্গা-তরঙ্গ-রঙ্গিত মৌলী
শশিখণ্ড-মণ্ডিত ললাট দীপ্ত
কপর্দ্দককৃত বর-বীরবৌলি
ত্রিনেত্র ভাব বিলাস বিলিপ্ত।
নৃমুণ্ডমালাঙ্কিত-কম্বুকণ্ঠ,
অম্বুদ পিঙ্গ গজ কৃত্তিবাস,
সিতাম্বর নীললোহিত চণ্ড
রুদ্রাক্ষ ক্ষেম বিভূতি-বিলাস।
রাগশ্রী ভৈরব রুণ্ডী ত্রিশূলী,
ভুজঙ্গ-রঙ্গা সঙ্গীত-দক্ষ,
পঞ্চমকার বিলসন্নকুলী
চণ্ডিকা মুখেন মণ্ডিত-বক্ষ।

শ্রীভৈরবী

সরসী সরোজ স্বর্গে স্ফটিক মন্দিরে
ভৈরবী করিছে পদ্মে ভৈরব অর্চ্চনা,
তানলয়-শুদ্ধগীতি গায়িছে গম্ভীরে
প্রেম-বিগলিতা-চিত্তা বিশাল-লোচনা।

শ্রীতোড়ী

তুষার-কুন্দের-কান্তি তোড়ীর শরীরে
কাশ্মীর কর্পূর-গন্ধে অবলিপ্ত বপু
বীণা-বাদ্যে বিনোদিছে মৃগ-দম্পতীরে
বনান্তরে লীলামত্ত ধ্বনিমত্ত কভু।

শ্রীরামকিরী

ভাস্বর-ভূষণে আঢ্যা দেহে হেমপ্রভা
সম ইন্দ্রনীলে গাঁথা মণির মালিকা,
মানোন্নতা রামকিরী নায়িকা রসিকা,
পদোপান্তে কান্ত, হেরে দূরে ইন্দু-সভা।

শ্রী গুণকিরী

প্রিয় দুরবৃত্ত বলি বালা শোকাকুলা
অরুণিত দীন দৃষ্টি—ক্ষোভনম্রাননা
শিথিল কবরী গাত্রে ধরণীর ধূলা
করুণার্দ্রা গুণকিরী বিশদ-যৌবনা।

শ্রীবাঙ্গালী

পুষ্পকরণ্ডিকা করে বসি কক্ষমাঝে
ভস্মোজ্জ্বলা আয়তাঙ্গী জটা-মুকুটিতা
ভাস্বর ত্রিশূল বর বামহস্তে রাজে
বাঙ্গালী বালার্ক-বর্ণা ভক্তিসম্পুটিতা।

শ্রীসৈন্ধবী

রক্তাম্বরা ত্রিশূলিনী শিবভক্তিযুতা
বন্ধুজীব বরপুষ্পা করপদ্মশোভা
বীররস মদগর্ব্বে দর্পিতা সর্ব্বদা
সৈন্ধবী ভৈরবী-রাণী অতি চণ্ডকোপা।

শ্রীপঞ্চমরাগ

রক্তবস্ত্র অর্ণকান্তি বিশাল লোচন,
তরুণ মনস্বী মুখে পিক-মঞ্জু-ভাষ
প্রসাধনে বরতনু নয়ন-মোহন
সুন্দর পঞ্চম রাগ যোষিৎ-উল্লাস।

শ্রীদেবকিরী

চিত্রাম্বরা চারুনেত্রা চকোর-প্রেক্ষণা,
হারবল্লী-বলয়িতা শ্যামা তুঙ্গ-স্তনী
মদালসা মহামেঘ-মেদুর-বরণী
বরারোহা দেবকিরী প্রগাঢ় যৌবনা।

শ্রীললিতা

প্রফুল্ল কনকাম্বুজ সপ্তপর্ণ হাতে
স্তনভারে নমিতাঙ্গী মন্থরগামিনী
ললিতা অলসনেত্রা আসিল প্রভাতে
প্রকোষ্ঠের বহির্দ্দেশে প্রেম-প্রমোদিনী।

শ্রীবিভাষা

যুগল তাণ্ডব লাস্যে যাপি বিভাবরী
প্রভাতে প্রবুদ্ধা গেহে বিভাষা সুন্দরী
প্রমোদ-বিলাসে দৃপ্তা মৌনা নিদ্রালসা,
রসময়ী চারুবেশা চন্দন-পরশা।

শ্রীকর্ণাটী

শিখীকণ্ঠ দ্যুতিমতী ইন্দুমৌলিবালা
গজদন্ত কর্ণভূষা গাঁথা শ্রুতিমূলে
স্ফুট শুভ্র কর্ণাটিকা রূপ রত্নমালা
কণ্ঠকলগীতি-রবে তোষে দেবকুলে।

শ্রীবড়হংসিকা

প্রিয়-মিলনের সুখে মধুর হৃদয়
বড়হংসিকার মুখে স্ফুরে মৃদুহাস
রোমাঞ্চিতা চারুদেহা রূপরসময়
অপাঙ্গে বিলোল দৃষ্টি লাস্য সুবিলাস।

শ্রীআভীরী

উন্নিদ্র চম্পক চারু বর তনুলতা
বাহুবল্লীবলয়িত ঝঙ্কৃত কঙ্কণে
শ্রীকণ্ঠ ভূধর শিরে ঢালে মধুরতা
আভীরী মৌক্তিকময়ী চন্দ্রিকা ভরণে।

শ্রীমেঘরাগ

ঘননীল কান্তিধর বিহার-বিলাসী
পিঙ্গল যুগল নেত্রে, আবেশে আতুর
কামিনীর মঞ্জুভাষি, অন্তরে উল্লাসি
গজেন্দ্রবাহন মেঘ-মল্লার চতুর।

শ্রীমধুমাধবী

প্রফুল্ল নীলাব্জ নেত্রে ক্ষীণ দেহলতা,
নব নীলাম্বর নীল নিচোল-চঞ্চলা,
তমাল-বেদিকা পরে প্রেমধ্যানরতা
মধুমাধবিকা মূর্ত্তি রাগ-রসোজ্জ্বলা।

শ্রীমল্লারী

সৌম্য-কান্তি ইন্দুবর্ণা পলিতকুন্তলা
রতিরঙ্গরসলীলা, কৌষেয়বসনা
দীর্ঘ শ্রুতি মল্লারিকা মূর্ত্ত-রতিকলা
মন্দেক্ষণা দৃষ্টিপাতে সঙ্কেত-প্রেরণা।

শ্রীসৌরাটী

পীনোন্নত স্তন-শোভা হার-তরলিতা,
গৌরাঙ্গী মদন-মূর্ত্তি সৌরাটী-সুন্দরী
কর্ণোৎপলে ভ্রমরের গুনে প্রেমগাথা
প্রিয়াস্তিকে যেতে শ্লথ সুভুজবল্লরী।

শ্রীগান্ধারী

জটাবিভূষণা শুচি মুদিতলোচনা
নীলাম্বর-ধরা শান্ত উন্নত মূরতি
কণ্ঠে যোগ-পট্টবাস পরমশোভনা
গান্ধারী যোগিনী দিব্যা নবীনা যুবতী।

শ্রীহরশৃঙ্গারা

প্রমোদিনী-প্রিয়-সঙ্গ-রঙ্গ-সঞ্চারিণী
চির-রঙ্গ-তরঙ্গিণী হর-শৃঙ্গারিকা
নানা গীতি-কলা-লীলা নিপুণবর্ণিনী
হিমকর গৌরকান্তি হৃদয়-হারিকা।

শ্রীসারঙ্গী

সখিজন সঙ্গে বসি কল্পতরু-মূলে
করে বীণা, দৃঢ়তর-নিবদ্ধকবরী
সারঙ্গী সে সুরঙ্গিণী বিচিত্র দুকূলে
কাম-কমনীয় দৃষ্টি চঞ্চলা সফরী।

শ্রীনটনারায়ণ

চারুতুরঙ্গম-পৃষ্ঠে বদ্ধবরভুজ
স্বর্ণাভ শোণিত-শোণ মসৃণ সুগাত্র
সংগ্রাম-ভূমির মাঝে হেরে রক্তাম্বুজ
বীর-মুণ্ড সে প্রতাপী বীররঙ্গ পাত্র।

শ্রীপাহাড়ী

বসি রক্তাম্বরা মঞ্জু কদম্বের মূলে
গায় গীতি চারুবীণা বিনোদ-সঙ্গিনী
সুন্দরাঙ্গি নন্দনাদ্রি-গুহা-বিহারিণী
পাহাড়ী কবরী গাঁথা মুকুতা-মুকুলে।

শ্রীদেশী

কুটিল কপট কোপে নিদ্রালসা বালা
সুরত লোলুপকান্ত ভাঙ্গিছেন ঘুম
শুকপুচ্ছবাসা দেশী রূপরত্নমালা
রস-বিলাসিনী বর্ণে কুমুদ-কুঙ্কুম।

শ্রীকেদারী

জটা-মুকুটিতা শশি-খণ্ড-শিখরিণী
নাগ-নিচোলিকা অঙ্গে যোগপীঠ-ধরা
গঙ্গাধর ধ্যানমগ্না যোগ-ক্ষেমপরা
কেদারী উদার-চিত্তা স্বরসঞ্চারিণী।

শ্রীকামোদী

শুকপুচ্ছবাসা গৌরী যৌবন-উছলা
জল নয়, পদ্মবন পদ্মবাস-জলে
কান্তসনে হেমকান্তি কামিনী চঞ্চলা
পদ্মগন্ধে মাতে মন, কত পদ্ম তোলে।

শ্রীনাটিকা

রম্যবেশা সুবিচিত্র রত্ন-আভরণা
সজ্জাবিভূষিত চারু রঙ্গ-বেদী পরে
কৃশাঙ্গী কিশোরী নাচে কনকবরণা
গতিরাগে তালছন্দ ফুল হয়ে ঝরে।

শ্রীহাম্বীরী

শ্যামাঙ্গী শোভনা নটী বয়সে কিশোরী
সখী করে পুষ্পবনে কুসুম চয়ন
সখীহস্ত নিজ-হস্তে সঞ্চরে হাম্বীরী
সঞ্চর-ভঙ্গীর ছন্দে নৃত্য-লীলায়ন।

{ অপ্রকাশিত কবিতা—স্বর্গীয় কবিবর মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ



বান্‌চাল

সুরবালার মৃত্যুর পর সংসার ছাড়িয়া, বিবাগী হইব মনে করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, হয় হরিদ্বারে, না হয় কাশীতে গিয়া সুরবালার ধ্যানে বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিব। কিন্তু ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। ভাগ্যে যাহা ঘটিল, তাহাই বলিতেছি। আমার মনে হয়, লেখকেরা বানাইয়া-বানাইয়া যে-সব কাল্পনিক গল্পাদি মাসিকপত্রে [illegible], তদপেক্ষা ইহা পড়িবার উপযুক্ত না হইবার কারণ নাই।

সুরবালাকে যখন কিছুতেই বাচাইতে পারিলাম না, বুক খালি করিয়া যখন বুকের নিধিকে বিদায় দিতে হইল, তখন স্থির করিলাম, আমিও সংসার হইতে বিদায় লইব। হরিদ্বার আর কাশী বাছিয়া লইলাম। কাশীই বেশী পছন্দ হইল। যোগাড়-যন্ত্র, আয়োজন-প্রয়োজন সবই শেষ করিলাম। পাঁজি দেখিয়া যাত্রার দিনওধার্য্য করিয়া ফেলিলাম। এমন সময় হঠাৎ—

হঠাৎ আমার মনে হইল—কিম্বা কে যেন মনের ভিতর হইতে মনকে নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, 'তার ঐ শয়ন-ঘরখানাই যে তোর পরম তীর্থ ; তা ছেড়ে তুই কোথায়, কোন্ চুলোয় যাবি ?'

ঠিকই ত ! যে-ঘরের সুরবালা ছিল লক্ষ্মী, যেখানে দীর্ঘ বিশ বৎসর কাটাইয়া গিয়াছে, যেখানে সে কিশোরে আসিয়া, যৌবন-সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিল, [illegible] সেই প্রিয়-নিকেতন আমার পরম তীর্থ ই ত বটে !

সুতরাং কাশী-হরিদ্বার বাতিল করিলাম [illegible] সেই শয়ন-কক্ষ[illegible]কে ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া, সেইটাই [illegible] আসামী আশ্রমে পরিণত [illegible]রিলাম। সুরবালা[illegible]ইয়া দিনরাত সেই ঘরেই কাটাই।

কিন্তু শান্তি মিলিল না ; বুকের জ্বালা নিবিল না। ঘরের আকাশ-বাতাস-আবেষ্টনী মনটাকে যেন আরও বিষাক্ত করিয়া তুলিল !

ভাবিলাম—নাঃ, এ চলিবে না। তাকে ভুলিতে হইবে। ভালবাসার ভিতর দিয়া তাকে ভুলিতে হইবে। ত্যাগের ভিতর দিয়া চূড়ান্ত প্রেমের ছাপ রাখিয়া যাইতে হইবে।

নীচের বৈঠকখানাঘরে একখানা দোকান খুলিলাম। চা'ল, ডাল, আটা, ময়দা, ঘি, মশলা-পাতির দোকান। ভাবিলাম,—"এর ভেতর ডুবে থেকে তাকে ভুলবো। তার সেই মুখখানি—কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি—এই উপায়েই ভুলতে হ'বে।"—কিন্তু হইল না। সুরবালাকে ভুলিতে পারিলাম না। দোকানী সাজিয়া বসি[illegible] কি হইবে ? মন যে সন্ন্যাসী সাজিয়া, তারই ধ্যানে মগ্ন।

খদ্দের চায় চিনি, আমি তাকে দিই করক[illegible] করকচ্ চাহিলে দিই কাবাবচিনি ! ঘিয়ের পা[illegible] খেসারী ডাল ভ'রে ওজন করি ; পাঁচ ছটাক দিতে, আড়া[illegible] সের ওজন চাপাই ; পাঁচ আনা কেটে নিতে, এগারো আনা কেটেনি ; সাত আনা দিতে গিয়ে, তের আনা দিয়ে ফেলি !

সুতরাং চলিল না ; অন্ততঃ আমার দ্বারা চলিল না [illegible] লোক এক জন রাখিয়া, তাহার দ্বারা দোকান চালাইতে হইবে। দিলাম কাগজে বিজ্ঞাপন। কিন্তু তার ফলে—সে আর কহতব্য নয়। উঃ ! বাপ্ রে বাপ্ ! লেখক হইলে তিনি তার সঠিক এবং চমকপ্রদ বর্ণনা দিতে পারিতেন ; আমি ঐ 'উঃ !' আর 'আঃ' ! ছাড়া কি বা বলিব ! স্বর্ণলতার নীলকমলকে যেমন এক দিন কালী-ঘাটের ভিখারীর দল ঘেরাও করিয়া তার 'বাছা হনুমানকে'

অবস্থা ঘটাইয়াছিল, আমার অবস্থা তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর এবং সাংঘাতিক। নীলকমল তবু প্রশস্ত রাজ-পথ এবং মুক্ত বায়ুর সুবিধাটুকু পাইয়াছিল; কিন্তু স্বরাজ আমলের বেকার কোম্পানীর মেম্বারগণ দলে দলে আসিয়া আমার সেই ক্ষুদ্র দোকানঘরের মধ্যে আমাকে দম বন্ধ করিয়া পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিল। সেই লোমহর্ষণ ঘটনার কথা লিখিতে গিয়া এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতেছে!

খাওয়া, থাকা, এবং মাসে ৯ টাকা বেতনের কথা উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম। ফলে, প্রায় ৯ শত কর্ম্মপ্রার্থী আমার উপর চড়াও করিয়াছিল। কেহ ঢেঙ্গা, কেহ বেঁটে, কেহ বা মাপ-সই; কারও গায়ের রং কালো, কারো সাদা, কারো সাদায়-কালোয় মিশানো, কারও বা তামাটে। কারো গোঁফ আছে, কারো নাই, আবার কারো বা 'ফ্লাই'-গোঁফ, কারো বা 'লাইন'-গোঁফ—ঠোঁটের উপর দিয়া যেন একটি সরু রেখার টান। পনের দিন ধরিয়া তাহাদের উৎপাতে আমার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছিল, দোকানের জানালা-কবাট খসিয়া পড়িয়াছিল, আর জিনিস-পত্র, র‍্যাক্-সেলফ, একেবারে সব ওলোট্-পালট্! যুদ্ধের বোমা পড়িলে কি অবস্থা হয় তা আমার জানা নাই, কিন্তু আমার উপর এই বেকার-বোমাবর্ষণের ধাক্কা বোধ হয় তার চেয়ে কিছু কম নয়। তবে একটা শুভ হইয়াছিল। ঐ পনের দিন যেমন আমাকে আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম ভুলিতে হইয়াছিল, তেমনি সুরবালার চিন্তাও একেবারে ভুলাইয়া দিয়াছিল। তা' ছাড়া, এদেরই ভিতর থেকে আমি গদাইকে পাইয়াছিলাম। 'পাইয়াছিলাম' কথাটা ঠিক হইল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি ত সাহিত্যিক নই, সাহিত্যিক হইলে লিখিতাম—'আমার ভাগ্যে গদাই-লাভ হইয়াছিল।'

যাহা হউক, সে এক স্মরণীয় দিন। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। বিশ-পঁচিশ জন কর্ম্মপ্রার্থী আমাকে চারি দিক হইতে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। বাহিরের রোয়াকের উপর ঠেলা-ঠেলির সূত্রে দুই জনের মধ্যে ভীষণ মারামারি বাধিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে পথে লোক জমিয়া উঠিল। তৃষ্ণায় আমার গলা শুকাইয়া উঠিয়াছিল, বুকের ভিতরটা আঁই-ঢাঁই করিতেছিল। কিন্তু সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার কোন উপায়ই নাই।

এ হেন সময়ে, ভীড় ঠেলিয়া দেখা দিল—গদাই। গদাই যেন মন্ত্রবলে, চক্ষের নিমেষে, কাহাকেও [illegible], কাহাকেও বুঝাইয়া, কাহাকে-বা ধাক্কা দিয়া, সেই বিপুল আততায়ী দলকে হঠাইয়া দিল।

একটু চেতনা হইলে দেখিলাম, দোকানের মধ্যে বসিয়া আছি—আমি আর গদাই। সকাতরে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম, "একটু বসো ত ভাই, ভেতর থেকে একটু জল খেয়ে আসি।" গদাই উঠিয়া-দাঁড়াইয়া কহিল, "আপনি বসুন, সার, জল আমিই এনে দিচ্ছি।" গদাই বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট দুই-তিনের মধ্যে, সামনের পাণ-ওলার দোকান থেকে বরফ-দেওয়া লিমনেড এক গ্লাস আনিয়া আমার হাতে দিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?"

গদাই বলিল, "আমার নাম, সার্, গদাধর।"

খানিকক্ষণ গদাইয়ের সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিলাম, গদাই অতি চমৎকার ছোকরা। তাহাকেই আমি বাহাল করিলাম। গদাই কহিল, "আমাকে বাহাল কল্লেই হ'বে না। সমস্ত দিন ধরেই 'ক্যাণ্ডিডেটে'র দল এসে আপনাকে বিরক্ত কোরে মারবে; ঐ দেখুন, চার-পাঁচ জন আবার বোধ হয় আসচে!"

ঠিকই বটে। গদাই দু'একটা কথা কহিয়া অতি সহজেই তাহাদের ভাগাইয়া দিল। অতঃপর গদাই একখণ্ড কাগজের উপর বড় বড় করিয়া লিখিল, 'এখানে লোকের আবশ্যক নাই। ৩২নং কাওরাবাড়ী লেনে অনুসন্ধান করুন।' কাগজখানি দোকানের দরজায় আঁটিয়া দিয়া, গদাই হাসিতে হাসিতে কহিল, "মরুক খুঁজে কাওরাবাড়ী লেন্!"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাওরাবাড়ী লেনটা কোথায়?"

গদাই কহিল, "তা কিন্তু জানি না। ঐ নামে যদি লেন্ থাকে, তাহ'লে কেওড়াতলার ঐ দিকেই হওয়া সম্ভব।" বলিয়াই হি-হি করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

২

মাস[illegible]র কথা।

[illegible] দিয়াছি। তবে গদাইকে ছাড়িতে প্রা[illegible] না। কেন পা[illegible] না, সে-

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বাড়ীতে চারিটি প্রাণী থাকি ; গদাই, আমি, কেলা-রাম চাকর, আর ঠাকুর। দিন কোন রকমে কাটিতে লাগিল। খাই-দাই, ঘুমাই, গদাইয়ের সঙ্গে গল্প-সল্প করি, আর সুরবালার কথা চিন্তা করি। কখন কখন কেওড়াতলার শ্মশানে গিয়া বসি। যেখানে আমার যথা-সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি, সেই দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। কিন্তু শান্তি কিছুতেই পাই না, মনের আগুন কিছুতেই নিবিতে চায় না। শূন্য প্রাণ সর্ব্বদাই হু-হু করিতে থাকে। গদাইকে বলিলাম, "গদাই, আমি কোলকাতায় আর কিছুতেই থাকবো না।"

"কেন দাদা ?"

আমাকে আর গদাই 'সার্' বলে না, দাদা বলিয়াই ডাকে। কহিলাম, "এখানে আর আমি থাকতে পাচ্চি না।"

"কোথায় যাবেন ?"

"যেখানে হো'ক্। কোনও পাড়া-গাঁয়। যেখানে মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, ফাঁকা মাঠ, বন-জঙ্গল, পাখীর ডাক, শ্যামল প্রান্তর, ঘুঘুর করুণ—যেমন আমার এই কাতর অন্তরের সকরুণ—"

"ওরে দাদা, ম্যালেরিয়ার যা' কাঁপুনি, কোনো পাড়া-গাঁয় গিয়ে কি তার ধাক্কা বরদাস্ত করতে পারবেন ?"

"একেবারে অজ্-পাড়াগাঁয় যাবো কেন ? না-সহর, না-পাড়াগাঁ, এই রকম কোন একটা জায়গায়। সেখানে গিয়ে প্রকৃতির মধ্যে ডুবে থাকবো।"

স্থির করিলাম, হয় নবদ্বীপ, নয় কাল্না, এই দু' জায়গার এক জায়গায় গিয়া বাস করিব। পরদিনই দ্বিপ্রহরে আহারান্তে নবদ্বীপের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে রহিল—গদাই।

নবদ্বীপে আমার এক জানা-লোকের বাড়ী ছিল ; সেইখানেই উঠিলাম ও রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন সকালে কিছু জলযোগান্তে সমস্ত সহরটা ঘুরিয়া আসিলাম। কিন্তু—কিন্তু—! অর্থাৎ, দূরে থেকে মনের মা[illegible] ধারণাটা গড়ে তুলেছিলাম, সেটা ভাঙ্গিয়া গে[illegible]ন ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা খুলিয়া বলিতে গেলে, [illegible] দেবতাদের [illegible]লতে 'ডিফামেশন-কেসের' আসামী হইয়া দা[illegible]বে। তবে অপছন্দের একটা কিছু কৈফিয়ৎ অবশ্য আবশ্যক। সে কৈফিয়ৎ আমার এই যে, বড্ডই ঘেঞ্জি, আর পথ-ঘাট বড় নোংরা ; আর অনেকটা বালির চড়া ভেঙ্গে গিয়ে তবে গঙ্গায় নামতে পারা যায়।

নবদ্বীপ ছাড়িয়া কাল্নায় আসিলাম। অম্বিকা-কাল্না। এখানে আমার শ্বশুরমশা'য়ের এক শিষ্যের বাড়ী আছে। শিষ্যের নাম—প্রহ্লাদ রক্ষিত। বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। তাহার বাড়ীতেই উঠিলাম। গদাই কহিল, "ভালই হ'ল। শিষ্যবাড়ী ; খাতির-যত্নের কসুর হবে না। ঠাকুর্দ্দার আমলে আমাদেরও অনেক ঘর শিষ্য-সেবক ছিল।"

লেখক নই বলিয়া, ঠিক মিল রাখিয়া সব কথা লিখিতে পারি নাই। একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছি। গদাইরা আমাদেরই ব্রাহ্মণ। উহারা গোস্বামী। শিষ্য-সেবক থাকিবার কথা বটে।

যাহা হউক, প্রহ্লাদ খুবই খাতির-যত্ন করিল। বৈঠক-খানার বারান্দা গঙ্গাজলে ধুইয়া, সেইখানে আমাদের 'স্ব-পাকে'র ব্যবস্থা করিয়া দিল। ময়দা, ঘি, আলু, বেগুন, মশলা ইত্যাদি এবং তাহার সঙ্গে ঘরের সের-দুই দুধও আনিয়া হাজির করিল। প্রহ্লাদ যোড় করিয়া কহিল, "আর যা-কিছুর আবিশ্যিক হুকুম করবেন, দেব্‌তা !"

রান্নার কাজে গদাই বিশেষ-রকম পটু। তাই ভাবি, কি শুভক্ষণেই যে আমি তাহাকে পাইয়াছিলা[illegible]। রাত এক প্রহরের মধ্যেই সে লুচি, বেগুনভাজা, আ[illegible] পটল-কুমড়ার ছক্কা, আর পেঁপের চাট্‌নি বানাইয়া ফেলি[illegible] এবং আগে আমাকে খাওয়াইয়া দিল। খান-আষ্টে লুচি আর আধ-সেরটাক দুধ খাইয়াই আমার উদরটি ঢক্কাকার ধারণ করিল। আমাকে পান দিয়া গদাই খাইতে বসিল। আমি পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার ভোজ-নের ঘটা দেখিতে লাগিলাম। হাঁ, ব্রাহ্মণ-ভোজন বটে ! অনুমান শ্রীমান্ গদাধর অন্যূন গণ্ডা-আষ্টেক লুচি অধ[illegible]-ক্রমে উদর-গহ্বরে প্রেরণ করত [illegible]ন্তে গণ্ডূষ করিবার উপক্রম করিতেছে [illegible] আমি ভীত হইয়া কহিলাম, "গদাই, আর [illegible]জ নেই ; শেষকালে কি······বুঝ্‌ছ না ?"

গদাই কহিল, "না দাদা, আর খাবো না"—বলিয়া সে সেই দেড় সের দুধের বাটিটা তুলিয়া মুখে ধরিল।

"ভরা পেটে ঐ অতটা দুধ না-ই খেলে, গদাই!"

"খাব না বলচেন ?" কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ছটাক-খানেক ছাড়া সব দুধটাই তাহার উদরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; দেখি, গদাধর নাই। এত রাত্রে সে কোথায় গেল ? মিনিট পাঁচ-সাত কাটিয়া গেল, তবুও গদাই আসিল না। ঘরের এক কোণে মিটি-মিটি হেরিকেন্ জ্বলিতেছিল; দেখিলাম, দুয়ারের পাশে গাড়ুটিও নাই। উভয়ের ত নিকট সম্বন্ধ। বুঝিলাম। ভয়ানক ঘুম ধরিয়াছিল, আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। শেষ-রাত্রে কিসের একটা শব্দে আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এবারেও দেখি গাড়ু এবং গদাই, দুই-ই নাই! একটু ভীত হইয়া পড়িলাম, সঙ্গে-সঙ্গেই আমার ঘুম ছুটিয়া গেল। খানিক পরেই গদাই গাড়ু হাতে ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যাপার বল ত ? কতবার……?"

আমার কথার উত্তর দিবার অবকাশ গদাই পাইল না। পেটটা টিপিয়া ধরিয়া এবং মুখখানাকে সিঁটকাইয়া তাড়াতাড়ি সে গাড়ু লইয়া আবার অদৃশ্য হইল।

দেখিলাম, ব্যাপার তেমন সুবিধার নয়। মনে একটা আতঙ্ক হইল। প্রহ্লাদকে ডাকিয়া তুলিলাম। প্রহ্লাদ আবার পাড়ায় গিয়া এক হোমিওপ্যাথী ডাক্তারকে তুলিল। তার পর দু' ডোজ ওষুধ খাইবার পর গদাইকে আর গাড়ু লইতে হইল না, এবং সারা রাত্রির অনিদ্রার পর সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কালনা আর ঘুরিয়া দেখাই হইল না। কোন রকমে সে দিনটা কাটাইয়া, পরদিন সকাল-সকাল স্বপাকে দু'টি মাছের ঝোল-ভাত খাইয়া কলিকাতার গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম। গদাইকে কহিলাম, "কালনাটা আর দেখাই হ'লো না!" গদাই কহিল, "না দেখা হোয়েচে, ভালই [illegible]; ভারি অপয়া স্থান!"

[illegible] পঁচিশ জ্বালিলে বলিলাম, "গদাই, বদ্দিবাটীর [illegible] ধরিয়াছে নিতে হবে; তুমি একবার নেবে [illegible]।" [illegible] সূত্রে দুই জনে

কাহাকেও খাইতে বলা শ্রুতিমধুর না হইলেও, [illegible] মধুর ফলটি আমি একটু ভালবাসি। কথাটা কিন্তু মিথ্যা বলা হইল। অর্থাৎ একটু নয়, বিশেষ রকমই ভালবাসি। কদলী ভাল বাসিবার যোগ্য ফলও বটে। আয়ুর্ব্বেদে পক্ক কদলীর গুণ—রুচিকর, পিত্তনাশক, [illegible] রস-রক্তবৃদ্ধিকারক এবং পুষ্টিজনক। কিন্তু পোড়া বা কাঁচা অবস্থায় ইহার গুণ যে বিপরীত, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কাঁঠালি কলা কিঞ্চিৎ লবণ-সংযোগে অমৃত-তুল্য হয়। বালক-বালিকাদের দুধ-কলার মত পুষ্টিকর আহার নাই বলিলেই হয়। সর্পকেও এই দ্রব্য দ্বারা প্রথমটা পোষ মানানো যায়, যদিও পরে সে ছোবল মারিতে ছাড়ে না। যাই হোক, এত গুণ থাকাতেই কলার প্রতি আমার এত প্রীতি।

পরিপক্ক এবং পরিপুষ্ট একটি ছোট কাঁদীই কেনা হইল। লোলুপদৃষ্টি ও [illegible] গদাই কদলীগুলির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিল। আমি তাহাকে কহিলাম, "ও-দিকে আর নজর দিও না। তুমি 'ভারবাহী মাত্র হ'য়ে থাক'; উদর-গহ্বরে ওর প্রয়োগের লোভ ত্যাগ কর।"

গদাই মৃদু হাসিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

৩

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে শয্যায় শুইয়া ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিলাম। ঘুম আসিল না, কেবল এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলাম। বুকে যাহার [illegible] দাউ-দাউ চিতা জ্বলিতেছে, তাহার নিদ্রা আসিবে কেন! ও-ঘরে গদাইয়ের নাক ডাকিতেছিল। নীচের বারান্দায় ফেলা আর বামুনঠাকুরের মধ্যে কিসের একটা ভয়ানক তর্ক বাধিয়া গিয়াছিল। দেওয়ালের ঘড়িটা ঠং করিয়া বাজিয়া উঠিল; দেখিলাম বেলা আড়াইটা। হায় রে! সময় আর কাটে না। আগে এই সময় কোথা দিয়া যে কাটিত, তা জানিতেই পারিতাম না! মনে ভাবিতাম, অনন্তকাল ধরিয়া সুরবালার সহিত গল্প করিলেও, তাহার শেষ হইবে না।

সহসা কাণে একটা সুন্দর সুর আসিয়া বাজিল। [illegible]দের বাড়ীতে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিতেছিল—

'তারই তরে যোগীর বেশে।' কাণে এবং প্রাণে [illegible] তুলিয়া দিল। উৎকর্ণ হইয়া একমনে শুনিতে লাগিলাম। রেকর্ড গাহিয়া চলিল—

[illegible] তারই তরে যোগীর বেশে